৩৬ বর্ষ ১৩৭৬ ।

(৪০ সংখ্যা থেকে ৫১ সংখ্যা পর্যন্ত)

—অ—

অতি বৃষ্টি—গ্রাম শহরে— ... ৩২৫

অন্দরের দিল্লি—দূরবেশ ৮৭, ১৮১, ২৮২, ৩৪৫, ৪৫১, ৫৫৩, ৬৫৫, ৮০৯, ৮৬৯, ১০২৯, ১১২৯, ১২০৭

অন্ধকারে—রাগে (কবিতা)—শ্রীকুমার রায় ... ৮৫৭

অনা মা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ১৬০

অপু ও বিভূতিভূষণ—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৪৪৫

অমর্ত্য মহাকাশ—শ্রীসমরজিৎ কর ২৭, ১৪১

অরণ্যদেব— ১০৩, ২০৭, ৩১১, ৪০৬, ৫১৯, ৬২৩, ৭২২, ৮০৩, ৯৪৭, ১০৫৫, ১১৫২, ১২৫২

অলকাপুরী—শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য ... ৪৩৯

অসাড় (কবিতা)—শ্রীমতী সুচেতা ভট্টাচার্য ... ৯৬৭

—আ—

আমার জন্য ভেব না (কবিতা)—শ্রীফিরোজ চৌধুরী ... ১১৮১

আমি ভাঙায় গড়া মানুষ (কবিতা)—শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায় ... ৭৪৫

আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত ৬৭, ১৭৭, ২৭৩, ৩৭৬, ৪৯২, ৫৯৭, ৬৮৯, ৮০১, ৯০১, ১০২৫, ১১১০, ১২২০

আফ্রিকার চিঠি—শ্রীঅংশু দত্ত ... ১৫১

আলো অন্ধকারে—শ্রীপ্রণব সেন ... ৩৩৫

আলোচনা—৯৩, ১৮৯, ২৮৩, ৩৮৩, ৪৯৪, ৬০৩, ৭০৫, ৮৬৭, ৯২২, ১০৩৩, ১১৪১, ১২৪১

—ই—

ইন্ধন—শ্রীসুনীল বাগচী ... ৩৭

—এ—

এই সন্ধ্যা চিঠিগুলি (কবিতা)—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী ... ৮৫৭

এই নির্মল খাঁচায় (কবিতা)—শ্রীমতী দীপা সেন ... ৯৬৭

এখন তোমাকে (কবিতা)—শ্রীপিণাকেশ সরকার ... ৯৬৭

—ক—

কবিতা—বনফুল ... ৭৬৩

কবি বনারসী দাস জৈনের আত্মজীবনী অর্ধকথানক—শ্রীঅসীমকুমার রায় ... ৫৭

কুষ্ঠ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ—শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী ... ৩৮১

কোনদিন কেউ শর্তহীন (কবিতা)—শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৫

কলকাতার চিঠি—শ্রীনীলাদ্রি চাকী ... ১১০৫

—খ—

খেলার মাঠে—একলব্য ৯৩, ১৯৭, ২৯৯, ৪০১, ৫০৭, ৬১৩, ৭১৭, ৮২৫, ৯৩৭, ১০৪৫, ১১৪৯ ১২৪৯

খোলামকুচি—শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়

—গ—

গণতন্ত্রের কলঙ্ক— ...

গানের আসর—শাঙ্গদেব ১৭৩, ৩৪১, ৫৮৩, ৭৮৫, ১

—ঘ—

ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেলে (কবিতা)—শ্রীপলাশ মিত্র ...

ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী ৬৫, ১৮৭, ৩৭৭, ৪৭৩, ৫৮৭, ৮০৫, ৮৯৭, ১

—চ—

চক্রবেড় রেল— ...

চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় ৭৩, ১৭৯, ৩৭৯, ৪৯৩, ৫৯৯, ৮১১, ৯১৭, ১০২৭, ১০৯১, ১

—ছ—

ছেলেবেলার বাতক (কবিতা)—শ্রীঅরুণেশ ঘোষ ...

—জ—

জমেছে নতুন রণ (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ...

জলে নামলে (কবিতা)—শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ১

জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২৫, ২৪৫, ৩ ৪৫৩, ৫৫৭, ৬৭৯, ৭৬৫, ৮৭৭, ১০১৯, ১০৯৩, ১

—ট—

টোকিওর চিঠি—শ্রীবিকাশ বিশ্বাস ...

—ড—

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দাঁতিয়েন ৬৯, ১৪৫, ২৫৯, ৩ ৪৬৯, ৫৭৩, ৬৯৩, ৭৯৭, ৯১৩, ১০১১, ১১২৫, ১২

—ত—

তবলা বাদনের ঐতিহ্য ও কণ্ঠে মহারাজ—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২

—দ—

দময়ন্তী ও দেবতারা : দময়ন্তীর স্বয়ংবর (কবিতা)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ... ১

দুর্গোৎসব— ... ১১

দৃশ্যপট—শ্রীনরনারায়ণ গুপ্ত ১৬, ১২০, ২২৪, ৩২৯, ৪৩ ৫৩৫, ৬৩৯, ৭৩৯, ৮৫১, ৯৫৯, ১০৭১, ১১

দ্বিতীয় [illegible]—শ্রীসমীর রক্ষিত ... ৭৫

—ন—

নর্তকীর হলো শিখর হিমাদ্রির—শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় ... ২১
নতুন রাষ্ট্রপতি— ... ৬৩৭
না আমি তোমাকে (কবিতা)—শ্রীহেনা হালদার ... ৪৩৭
নিউজিল্যান্ডের চিঠি—শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয় ... ৫৯১
নির্বোধ—শ্রীনিশীথ দে ... ১০৭৭

—প—

পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলি ১৮৫, ২৪১, ৩৪৩, ৪৩৮, ৬০১, ৬৫৯, ৮১৩, ৯১৯, ৯৬৯, ১২২৩, ১১৮৭
পরীক্ষা ও পরীক্ষক— ... ২২১
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৯, ১৫৩, ২৬১, ৩৪৯, ৪৬৫, ৫৭৭, ৬৬১, ৭৭৭, ৮৮৯, ৯৯৩, ১১১৫, ১২১১
[illegible]—শ্রীঅমিতাভ ঘোষ ... ১১৮৩
পুস্তক পরিচয়— ৯১, ১৯৫, ২৯৬, ৩৯৯, ৫০১, ৬১১, ৭১৫, ৮২৩, ৯৩৩, ১০৪১, ১১৪৭, ১২৪৭
প্যারিসের চিঠি—শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫৫, ১১৯১
প্রতিদিন একই ঘর (কবিতা)—শ্রীঅঞ্জন কর ... ১১৮১

—ব—

বন্ধু হুমায়ুন কবির—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত ... ৪৪৯
[illegible] : আজাহার, মুর্শিদাবাদ— ... ৫৩৩
বর্ষামঙ্গল—ইন্দ্রজিৎ ... ২৩৭
[illegible], বাঙালী ও গান্ধীজী—
শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ৯৭১
বাংলার চালচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার ৩৯, ১৬৭, ২৬৭, ৩৬৩, ৪৭৫, ৫৬৭, ৬৬৯, ৭৮৯, ৯০৩, ১০০৫, ১১০৩, ১২১৩
বার্লিনের চিঠি—শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্ম ... ২৫১
[illegible] (কবিতা)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ... ৩৩৩
বিদেশীর চোখে পথের পাঁচালী—শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ ... ৩৭১
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৬১
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর ৪৫৭, ৫৬৩, ৬৮৩, ৭৭১, ৮৮৩, ১০০১, ১০৯৯, ১১৯৭
বৈদেশিকী—[illegible] ১৮, ১২২, ২২৩, ৩২৮, ৪৩২, ৫৩৭, ৬৪২, ৭৪১, ৮৫৪, ৯৬৪, ১০৭৪, ১১৭৮
ব্যঙ্গচিত্র—১৪, ১১৮, ২২২, ৩২৬, ৪৩০, ৫৩৪, ৬৩৮, ৮৫০, ৯৫৮, ১০৭০, ১১৭৫
[illegible]আইনকানুন—মুকুল ১৬, ১১৯, ৩০২, ৪০৫, ৫০৮, ৬১৬, ৭২০, ৮২৮, ৯৪০, ১০৪৮, ১১৫১, ১২৫১

—ভ—

[illegible]চিত্রে নব অধ্যায়—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ... ৪৭৯
ভুল (কবিতা)—শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৮৫৭
ভ্রান্তিবিলাস (কবিতা)—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ... ৪০৭

—ম—

মস্কোর চিঠি—শ্রীননী ভৌমিক ... ৪৬১
মহাত্মা গান্ধী— ... ৯৫৭
মানুষ পারে (কবিতা)—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ... ৩৬
[illegible] ঘোড়া—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ... ৬৪৫

—র—

রঙ্গজগৎ— ৯৭, ২০১, ৩০৩, ৪০৭, ৫০৯, ৬১৭, ৭২৩, ৮২৯, ৯৪৯, ১০৪৯, ১১৫৩, ১২৪৩
রবীন্দ্রনাথের কবিতিকা—[illegible] পুরকায়স্থ ... ২৪৩
রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে—[illegible]নাথ পুরকায়স্থ ... ৪৮৫
রাজার টুপি—[illegible]পাধ্যায় ... ৫৪৩
রাজা শিক্ষা [illegible]— ... ১৩
রাষ্ট্রপতি শ্রী[illegible] ... ৪১৯
রূপ ও রূপকার [illegible]—শ্রীশিশির রায়চৌধুরী ... ৩৯১
রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য— ১৫, ১১৯, ২২৪, ৩২৭, ৪৩১, ৫৪১, ৬৪১, ৭৩৮, ৮৫৩, ৯৬২, ১০৭৩, ১১৭৭
রেঙ্গুনের চিঠি—বিক্রমাদিত্য ... ৬৭৫

—ল—

ল্যাম্পপুন (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ... ৭৪৫

—শ—

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র—
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৫৩
শহর-ইয়ার—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ... ৮১
শান্তিনিকেতনে কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ—
শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৮৩
শান্তিনিকেতনের হাওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ—
শ্রীঅশোক রুদ্র ... ৭৪৭
শ্রীমতী গান্ধীর কলকাতা সফর— ... ৭৩৭

—স—

সাধ (কবিতা)—শ্রীরমেন আচার্য ... ২২৯
সাপ্তাহিক সংবাদ— ১০৭, ২০৮, ৩১২, ৪১৬, ৫২০, ৬২৪, ৭২৮, ৮৩৬, ৯৪৮, ১০৬৬, ১১৬০, ১২৬২
সাহিত্য সংবাদ— ৮৯, ২৯৩, ৩৯৭, ৪৯৯, ৬১০, ৭১৩, ৮২১, ৯৩১, ১০৩৯, ১১৪৫, ১২৪৫
সীমান্ত গান্ধীর ভারত দর্শন— ... ১০৬৯
সীমান্তের এই শৈল শহরে—শ্রীকিরণশঙ্কর মৈত্র ... ৩৯৫
সুখের সন্ধানে—শ্রীশিশির লাহিড়ী ... ২০৯
সুনন্দর জার্নাল—১৯, ১২৩, ২২৭, ৩৩১, ৪৩৫, ৫৩৯, ৬৪৩, ৭৪৩, ৮৫৫, ৯৬৫, ১০৭৫, ১১৭৯
সুরেশচন্দ্র— ... ২২১
[illegible] চিঠি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৮৭[illegible]
স্বপ্নের চাঁদের মুকুটে (কবিতা)—
শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় ... ৩৬

—হ—

হেমচন্দ্র বাগচী—শ্রীসমরেন্দ্র সিংহ রায় ... ২৭৭

প্রমথনাথ বিশীর নূতন উপন্যাস

বিপুলা সুদূর তুমি যে ৭॥

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

ধর্ম ও সমাজ ১০৲

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

সুভগা বসন্ত ৪৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়িবদল ৪৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

নতুন তোরণ ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

নগরে অনেক রাত ৪॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অন্যদেশ অন্যদাহ ১৫৲

জরাসন্ধের

বন্যা ৪৲

তারাশঙ্করের

রাধা (নূতন সং) ৮৲

'তন্দ্রাভিলাষী'খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥

প্রফুল্ল রায়ের

অন্য ভুবন ৪॥

প্রমথনাথ বিশীর কাব্যসংকলন

প্রাচীন পারসীক হইতে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

কাজললতা ৬৲

অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আঁধি ৭॥ অমৃত সমান ৪॥

আলোর অরণ্য ৬॥ দ্বিধা ৭॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

লীলা মজুমদারের

আর কোনখানে ৫৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবজন্ম ৪৲ জন্মেছি এই দেশে ৪॥

একদা কী করিয়া ১৩৲

রমাপদ চৌধুরীর

জরির আঁচল ৪৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুমারী গিরিপথে ৫॥ গঙ্গাবতরণ ৫৲

হিমালয়ের পথে পথে ৭৲

স্বামী দিব্যজ্ঞানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

(ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী)

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

শঙ্কু মহারাজের নূতন ভ্রমণ-কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সুবর্ণলতা ১৩৲

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজিনীলা ৭৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ফোন ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭১১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রবন্দ—ইরাসন্দারি কাওয়াবাতা	...	৩৭
বাংলার জলচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার	...	৩৯
টোকিওর চিঠি—শ্রীবিকাশ বিশ্বাস	...	৪৩
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	৪৯
শরৎচন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র —শ্রীগোপালচন্দ্র রায়	...	৫৩
কবি বানারসীদাস জৈনের আত্মজীবনী অর্ধকথানক—শ্রীঅসীমকুমার রায়	...	৫৭
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	...	৬৫
আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	...	৬৭
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	...	৬৯
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	৭৩
দ্বিতীয় বক্তৃতা—শ্রীসমীর রক্ষিত	...	৭৫
শহর-ইয়ার—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৮১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অদূরের দিল্লি—দরবেশ	...	৮৭
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৮৯
আলোচনা—	...	৯০
পুস্তক পরিচয়—	...	৯১
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৯৩
ব্যাডমিন্টনের আইনকানুন—মুকুল	...	৯৬
রঙ্গজগৎ—	...	৯৭
অরণ্যদেব—	...	১০৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	১০৪

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামল নন্দী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪০
শনিবার ১৭ শ্রাবণ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক ...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক ...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক ...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক ...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক " ...	১৫.০০
ত্রৈমাসিক " ...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক ...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক " ...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক ...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক " ...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক " ...	১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক ...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 2nd August 1969

রাজ্য শিক্ষা-দপ্তরের নব উদ্যম

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মশাই খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলার কারণ, তিনি প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ—তারও বেশি হলেও হতে পারে—বছর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কোনো একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম নয়। তা ছাড়া ইনি এই রাজ্যের শিক্ষকদের যে প্রধান সমিতিটি রয়েছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন দীর্ঘকাল। এমন একজন পারদর্শী ব্যক্তি যখন শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আসেন তখন স্বীকার করতেই হবে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের নানারকম গলদ ও নৈরাজ্য তাঁর দৃষ্টিতে যতটা ধরা পড়বে ততটা রামা-শ্যামার চোখে নিশ্চয় নয়। আর এরই সঙ্গে আশা করাও সঙ্গত যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে চলতি অরাজকতাও দূর হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর আসনে বসার পর শ্রীরায় আমাদের মাঝে মাঝেই তাঁর অভিমত এবং শিক্ষা নীতির কথা শোনান। কিছুদিন আগে তিনি আজকালকার এগারো ক্লাসকে বারো ক্লাস করার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে কমবেশি হইচইও শুনেছি। আজকালকার দশ, এগারো, বারো—এমনই একটি জটিল জিনিস যে অনেক মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত এর ভালমন্দ ঠাওর করতে পারেন না। যা চলে তাকেই আমরা স্বীকার করে নি। অবশ্য, আমাদের মনে হয়, উনিশে-বিশে যে তফাত এগারো-বারোর তফাত বোধ হয় তার চেয়ে বেশি হবার কথা নয়। তবু শিক্ষামন্ত্রীর বারো রাখার ইচ্ছে কেন? শিক্ষার স্বার্থে কী?

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জনৈক কর্মকর্তাকে নিয়েও ইতিমধ্যে একটা দুঃখজনক ব্যাপার ঘটেছে: রায়-মশাইয়ের নামও পরোক্ষে তাতে জড়িয়ে পড়ল। কর্মকর্তা পদত্যাগ করলেন। শোনা যায়, পর্ষদের সভাপতি পদত্যাগের সময় সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগের প্রধান বিষয় ছিল—স্বয়ং-শাসিত পর্ষদের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ। শিক্ষামন্ত্রী কী চেয়েছিলেন জানি না,—তবে তিনি হাবেভাবে জানালেন, এ ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না, তবে 'সরকারের মধ্যে সরকার' চলতে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, শিক্ষামন্ত্রী যে কোথাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রতি গত বুধবার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শিক্ষা সম্পর্কে টানা একবেলা আলোচনা হয়ে গেল। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সভায় শিক্ষামন্ত্রী ভবিষ্যতের কর্মসূচীর বেশ কিছু আভাস দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান হল: ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে সরকার শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। দ্বিতীয় হল: এই রাজ্যের ছয়-সাত হাজার মৌজায় কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রত্যেক মৌজায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তৃতীয় প্রস্তাব হল, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করার ইচ্ছাও সরকারের রয়েছে।

এ সব ছাড়াও সরকার একটা বড়রকমের দায় হাতে নিচ্ছেন আগামী বছরের শুরু থেকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চব্বিশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এই বছর থেকেই জাতীয়, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের সূচনা করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। বোধ হয়, আপাতত যা করা হচ্ছে বা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন—এগুলিই জাতীয়, গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শুরুর প্রথম ধাপ। বা হতে পারে এর বাইরেও কিছু আছে।

নীতিগতভাবে আমরা শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোনো দোষ দেখি না। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা সর্বদাই প্রশংসনীয় উদ্যম। কিংবা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করাও বড় কাজ হবে। বিনামূল্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কম দায় নয়। আমরা এ সবেরই প্রশংসা করি।

তবে কোনো কোনো প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, শহরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাবার আগে কেন মৌজার দিকে চোখ দেওয়া হল না। যেখানে ছ-সাত হাজার মৌজায় প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারেই নেই, সেখানেই কী সরকারের দৃষ্টি আগে পড়া উচিত ছিল না? শহরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর শিক্ষামন্ত্রীর এই বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টি অনেকের কাছে ভাল নাও ঠেকতে পারে।

আর নহ তুমি কুমারী বা সতী!!

চন্দ্রলোক বিজয়ী আমেরিকান নভচর, অ্যাপোলো-১১-র কম্যান্ডার নীল আরমস্ট্রং-এর সঙ্গে প্রার্থীপতি পদপ্রার্থী শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডির শুধু যে নামের আদিতে মিল তাই নয় উভয়েরই একই রকম অ্যাডভেঞ্চারে ব্রিত। অদ্ভুত নীল আরমস্ট্রং-এর কেপ কেনেডি থেকে চন্দ্রলোক অভিযান এবং কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড থেকে নীলম সঞ্জীব রেড্ডির রাষ্ট্রপতি ভবন অভিযাত্রা একটু একটু দুঃসাহসিক এবং উভয়ের যাত্রাপথও বহুপরিমাণে দুর্গম।

শুধু তাই নয়, এই উভয় অভিযানের আরও কয়েকটি সাদৃশ্যের দিক আছে। যথা : যে দুঃসাটার রকেট মার্কিন নীল ও তাঁর সঙ্গীদের নিজ নিকেতন থেকে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপ করে তার ইংরাজি নাম স্যাটার্ন এবং নম্বর ফাইভ—বঙ্গার্থে শনি—পাঁচ। ভারতীয় অভিযাত্রী নীলম-এর উৎক্ষেপক শক্তির নাম সিন্ডিকেট এবং ওঁরাও সংখ্যায় পাঁচ।

আমেরিকান নীলকে উপরে ছুঁড়তে প্রতি সেকেন্ডে ৩৪০০ গ্যালন কেরোসিন তেল এবং তরল অক্সিজেন পোড়াতে হয়েছে। এবং মোট চাপ লেগেছিল ৭৫ লক্ষ পাউন্ড। আমাদের নীলমকে উৎক্ষেপ করতেও কাঠ খড় এবং তেল বিস্তর পুড়েছে—সঠিক পরিমাণ এখনও জানা হয়নি। আর চাপ যে কী প্রচণ্ড লেগেছে তা বাঙ্গালোরের এ আই সি সি এবং দিল্লিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে মাপা আছে।

তিন স্তর রকেটের দ্বারা আমেরিকার নীলকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা এবং কক্ষপথ থেকে অভিকর্ষ কাটিয়ে মহাকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

আমাদের নীলমকেও তিনটি স্তরে ধাপে ধাপে কক্ষপথে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্তর : বাঙ্গালোরে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় স্তরে পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর গোষ্ঠী ওরফে ইন্ডিকেট ও সিন্ডিকেটের মধ্যে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে সংঘর্ষ উত্তাপ সৃষ্টি, অবশেষে ভোটাভুটি, এবং ৪—২ ভোটে ইন্ডিকেটের পরাজয় এবং বদলা নিতে প্রধানমন্ত্রীর তড়িঘড়ি মোরারজি বর্জন ও নতুন ইকেজ সৃষ্টিকল্পে ব্যাংক জাতীয়করণ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তৃতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন জানানোর প্রতিশ্রুতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে কক্ষপথের আবর্তন থেকে মুক্ত করে তাঁর অভিলাষের অভিকর্ষ অভিমুখে আপাতত রওনা করিয়ে দিয়েছে। এই ভাষ্য ছাপাখানায় দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে জানা গিয়েছে, এই অসম সাহসিক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভারতীয় নভচর পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে এগিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছে এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অরুচি দেখা দিচ্ছে। তবে গ্রাউন্ড কনট্রোল থেকে তাঁর নিশ্চিত সাফল্য সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত আশ্বাসবাক্য শোনান হচ্ছে। ফলে তাঁর

হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ১৬ আগস্ট তাঁর লক্ষ্য অবতরণের যে দিনক্ষণ ধার্য করা হয়েছে তার কোনও পরিবর্তন হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রার শুরুতে গ্রাউন্ড কনট্রোলে যে-সব গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, যাত্রার মধ্যপথে এসে সে-সব নাকি সাময়িকভাবে মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। অকুস্থলে আমাদের নীলমের পতন যাতে স্বচ্ছন্দগতিতে হয়, প্রধানমন্ত্রী সেজন্য তাঁর সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে দ্বিধা করবেন না বলে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন। তবে নারীর মনে কি আছে তা যখন স্বয়ং কমরেড জ্যোতি বসুই বুঝতে পারেন নি, তখন আর কার উপর ভরসা!

তা সত্ত্বেও জনান্তিক ব্যাংক অবজার-ভেটরির তুল্য নয়া দিল্লির রাজনৈতিক দপ্তর মণ্ডলের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, নীলম সঞ্জীব রেড্ডির মহাকাশ যাত্রা নিতান্ত নির্বিঘ্ন হবে না। উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আর লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে শুধু যে অসীম মহাকাশের ব্যবধানটাই দুস্তর তা নয়, অন্তর্বর্তী আবহমণ্ডল তরুণ তুর্কী, কচ্ছী কলা কংগ্রেসী, কমিউনিস্ট, সোশ্যা-লিস্ট ইত্যাদি নানাপ্রকার সমাজ নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগের মহাজাগতিক ধূমকেতু কণিকা ইত্যাদিতেও কণ্টকিত।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নিজ গ্রহের আবহ-মণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করা মাত্র নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে ইংরাজিতে যাকে 'হেট ক্যাম্পেন' বলে, তাই শুরু হবে। এবং এই ঘৃণা বা বিদ্বেষ পাঁচ হাজার সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। আমেরিকান চন্দ্রচর নীল আরমস্ট্রংকেও পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশকালে এই পরিমাণ উত্তাপের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর চন্দ্রযানের সামনে এই উত্তাপ নিরোধক বর্ম বা 'হিট শিল্ড' থাকায় নীল বা তাঁর সঙ্গীরা কেউ পুড়ে মরেননি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, অনুরূপ একটা 'হেট শিল্ড' বা ঘৃণা প্রতিরোধক বর্ম যদি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির উৎক্ষেপক-গণ বানিয়ে দিতে না পেরে থাকেন তবে সাফল্যের কক্ষপথে পুনঃপ্রবেশকালে নীলমের আশা ভরসা সেই ঘৃণার প্রচণ্ড আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কিংবা পুনঃপ্রবেশের সেই চূড়ান্ত সংকটময় সময়টির কথা স্মরণ করুন, যা প্রতিটি নভচরেরই নিদারুণ শিরঃপীড়ার কারণ। নীল আরমস্ট্রং-এর চন্দ্রযানটিকে পূর্ব নির্ধারিত সরু এক গলিপথে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশ করতে হয়েছে। নির্ধারিত কোণের একটু এধার ওধার হয়ে গেলে হয় চন্দ্রযানটি ছিটকে চিরকালের মত মহাকাশে বিলীন হয়ে যেত অথবা পৃথিবীর মাটিতে ধপাস করে আছাড় খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকেও একদিকে ভি ভি গিরি এবং অন্যদিকে সি ডি দেশমুখ—এই দুই প্রবল অভিকর্ষের মধ্য-বর্তী কণ্টক প্রণালীর ভিতর দিয়ে পথ করে সাফল্যের ভূমিতে অবতরণ করতে হবে। নিপুণ পরিচালন ব্যবস্থায় একটু হেরফের হলেই একেবারে লুনা-১৫-এর মত সগৌরবে পপাত চ মমার চ।

আমাদের আদি

এতকাল আমরা জেনে এসেছি যে বানর জাতীয় জীবই মানুষের পূর্ব-পুরুষ। সম্প্রতি দেশ পত্রিকার এক পাঠক আমাদের জানিয়েছেন, বানর নয়, আমাদের আদিতে হুকো।

একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক খুব নীচু গলায় কথা বলছিলেন। বয় এল কফি দিতে। মন্ত্রী মহাশয় থেমে গেলেন। ইশারায় আমাকেও বললেন, চুপ। বয় চলে গেল। মহামান্য মন্ত্রী বললেন : জানেন, এখন দিল্লিতে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কে যে কার চর কেউ জানে না। সর্বদিক নজর রেখে সতর্কভাবে চলাই ভাল।

এক এম পির বাড়ি গেলাম। বিহারের প্রতিনিধি। টেলিফোন এল। ভদ্রমহিলা বললেন : হ্যাঁ, পিছু বাত হোগা। হামহি বা রহা আপকা উঁহা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম : আপনি কথা বলে নিন। আমি বাইরে আছি। এম পি লজ্জা পেলেন। বললেন : না, না, আপনার জন্য কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আসলে কি জানেন আমার টেলিফোনে সারাক্ষণ আড়ি পাতা আছে। যা বলব ও'রা জেনে যাবেন। তাই টেলিফোনে সিরিয়াস বাতচিতই ছেড়ে দিয়েছি।

কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে দেখা হল। বললাম, এসে গিয়েছেন! ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন : ঠিক আসিনি; আসতে বাধ্য হয়েছি। ডাক পড়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন ডাক পড়েছে? শিল্পপতি এবার কুণ্ঠিত হয়ে বললেন : মত্ পুছিয়ে। আগার কোই জেনে যায় তো আমার গর্দান চলে যাবে। আপনি রিপোরটার আছেন। কোথায় কি কখন লিখে দেবেন। আমি 'কসমসে' বললাম, কাউকে বলব না। বারংবার অনুরোধে এবং 'কসমসে' বলায় ভদ্রলোক একটু যেন আশ্বস্ত হয়ে বললেন : সাপোরট করতে হবে। কিন্তু দয়া করে এসব কথা কাউকে বলবেন না। এত্তে বড় বড় লিডার লোগ কুছু করতে পারছেন না তো হামরা কী করবো! ধমকালেই ভয় পাই। জানি বেগর করলে লাইসেন মিলবে না, ইনকোয়ারি হবে। আপনার সঙ্গে যে হামার দেখা হয়েছিল কাউকে বলবেন না দয়া করে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

গোটা দিল্লির উঁচু মহলে এখন একটা অদ্ভুত আবহাওয়া। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না। সকলেরই ভয়, আমার ওপর কে যেন নজর রাখছে; আমার গেটে কে যেন ওঁৎ পেতে আছে; আমার টেলিফোনে কে যেন আড়ি পেতে সব শুনছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, ফিসফিসানিতে মিলে মিশে আজ গোটা রাজধানীতে একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্রমূলক আবহাওয়া।

*

প্রশ্ন উঠবেই, দিল্লির এই হাল হল কেন?

উত্তরটা আমার কাছে খুবই সহজ : কারণ রাজধানীতে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে এবং এই লড়াইর সামনে আদর্শ বা নীতির কথা আমদানী করা হলেও মূলত এটা ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলের লড়াই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি লড়াইটা শুধু আদর্শ বা নীতির হত তাহলে এত গোপন অভিসার, এত ফিসফিসানি, এত ব্যাকস্টেজ খেলা চলত না। আদর্শগত লড়াই চিরকালই খোলা মাঠে হয়—নীতির লড়াই হলে দিল্লির এবারের সংগ্রামটাও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই হত।

কেউ কেউ অবশ্য প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে এটা প্রধানত নীতিরই লড়াই। এই প্রচারটা কিন্তু ধোপে টেকে না। ধরে নিলাম না হয়, মোরারজী ও পাতিলের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নীতিতে ফারাক আছে। কিন্তু কামরাজ ও চবনের সঙ্গে আদর্শগত প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর তফাত কতটা? শ্রীমতী গান্ধীকে যদি সমাজতন্ত্রী বলতে হয় তাহলে কামরাজ বা চবন নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম সমাজতন্ত্রী নন! ডিভ্যালুয়েশনের সময় কে বেশি সমাজতন্ত্রী ছিলেন—কামরাজ না ইন্দিরা? স্বয়ং কামরাজ এবার দিল্লিতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বলেছেন : আমি যখন জব্বলপুর কংগ্রেসে বললাম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ চাই তখন এই ইন্দিরাই তাতে বাধা দিয়েছিলেন। যদি এটা কংগ্রেসের ভেতরের আদর্শের সংঘাত হত তাহলে নিশ্চয়ই কামরাজ এবং চবনও ইন্দিরার দিকেই থাকতেন।

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একালের প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস 'জীবন যে-রকম' আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রসঙ্গটা ধরে অনেকে আবার প্রশ্ন তুলছেন, কেন, এটা কি একটা সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নয়? এই নিয়েই কি লড়াই নয়? এই প্রশ্নের দুটো দিক আছে : (এক) ব্যবস্থাটা কি উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে? এবং (দুই) এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিনা?

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে শিশুও বুঝেছে যে এ পদক্ষেপ অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক। সঞ্জীব রেড্ডি যদি রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনীত না হতেন তাহলে মোরারজীও যেতেন না, সরকার ব্যাঙ্কগুলিও নিতেন না। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ক্ষমতার লড়াইয়ে জনগণকে সঙ্গে রাখার জন্যই এই পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রীই নিজেই শিল্পপতিদের সে কথা জানিয়েছেন। যদি এটা সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হত তাহলে প্রধানমন্ত্রী শিল্পপতিদের ডেকে রাজনৈতিক কাঁদুনি গাইতেন না এবং তাঁদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। মাস তিনেক আগে এই প্রধানমন্ত্রীই ফরিদাবাদ কংগ্রেসে বলেছিলেন, ব্যাঙ্কগুলিকে এখনই নিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই—আগে দেখা যাক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেমন চলে। তিনমাসের মধ্যে হঠাৎ এমন কি অর্থনৈতিক কারণ ঘটল যে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর অভিমত একেবারে পাল্টে ফেলতে হল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ কি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা? তত্ত্বগত বিচারে জবাব, হ্যাঁ; কিন্তু বাস্তব বিচারে জবাব, না। জাতীয় জীবনবীমা ব্যবসা দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এল আই সি যে টাকা খাটায় তার বেশিটাই পান বড় বড় শিল্পপতিরা। এবারের হিসাবে দেখা গিয়েছে, এল আই সি যে টাকা লগ্নী করেছে তার শতকরা ২৫ ভাগ পেয়েছেন ভারতের ২০টি বড় শিল্পগোষ্ঠী। এটা সরকারী হিসাব। সরকারী তদন্তেই দেখা গিয়েছে হরিদাস মুন্দ্রার মত ব্যবসায়ীরা কিভাবে জাল শেয়ার জমা দিয়ে এল আই সির টাকা পেয়েছেন। জাতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাও জাতীয় জীবন বীমার পথেই যেতে বাধ্য। কারণ এ ক্ষেত্রেও মালিকানা পালটালেও পরিচালনা পালটাবে না—বরং আরও খারাপ হবে। যেমন হয়েছে এল আই সির। ফলে দেখা যাবে, জাতীয় ব্যাঙ্কে বড় বড় শিল্পপতিদেরই সুবিধা হয়েছে বেশি। কারণ তাঁরা মন্ত্রী, সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান প্রভৃতিকে ধরতে পারবেন, তাঁদের দিয়ে কাজ করাতে পারবেন। মরবে তাঁরাই যাদের সে ক্ষমতা হবে না। অর্থাৎ ছোটরা—যাঁরা দল কিংবা

লক্ষ টাকার ব্যবসা করেন, যাঁদের কারবার প্রধানত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সঙ্গে, যাঁদের খুব বেশি ওপরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে কালো টাকার কারবারীদের। তাঁরা এখন আরও বেশি সুদে টাকা খাটাতে পারবেন—ছোট ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবেন। প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ করতে পারতেন ডিমনিটারাইজ করলে। অর্থাৎ একশ টাকা এবং দশ টাকার নোট পালটাতে পারলে। কিন্তু সে পথে তিনি পা বাড়ান নি; কারণ সে পথে কালো টাকার ব্যবসায়, মুনাফাবাজীতে, বড় বড় মালিকদের অনেকেরই তাতে ঘা পড়বে। অথবা তিনি বেনামী সব শেয়ার "ফ্রিজ" করতে পারতেন। তাতেও অনেক কালো টাকা, পাপ ব্যবসা ধরা পড়ত। মনোপলির দুর্গে আঘাত লাগত। সে পথেও তিনি জাননি। গরীব দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বহুক্ষেত্রেই ভাল; কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাঁওতা গরীবের পক্ষেই সবচেয়ে মারাত্মক।

যদি ব্যক্তির বিচারে আসা যায় তাহলেও দেখা যাবে নীতির কথাটা কি রকম ভাঁওতা। কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী কে কে? শ্রীমতী ইন্দিরা, বাবু জগজীবন রাম, রাজা দীনেশ সিং, কে ডি মালব্য ইত্যাদি, ইত্যাদিরা। জগজীবনবাবু যদি সমাজতন্ত্রী হন তাহলে নিশ্চয়ই শ্রীরাম চ্যাটার্জিও কমিউনিস্ট! আমার এক প্রগতিশীল সাংবাদিক বন্ধুকে একবার বলেছিলাম, হাঁ মশাই, আপনারা জগজীবনবাবুকেও সোস্যালিস্ট বলেন? বন্ধুবর লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন। সেই বহু আলোচিত সিরাজুদ্দিনের খাতায় বেরিয়েছিল, "মিসেস মালব্যকে দিয়ে দো পেটি হুইস্কি।" তবু মিঃ মালব্য প্রগতিশীল মেহনতি মানুষ। আমি বলছি না, বিপক্ষের ওঁরা ভাল—ধোয়া তুলসী পাতা! আমার শুধু প্রশ্ন, ওঁরা যদি খারাপ হন, প্রতিক্রিয়াশীল হন, এঁরা প্রগতিশীল কোন কাজটার জন্য? শুধু মুখে সোস্যালিজম সোস্যালিজম বলেন বলে?

✻

দেশের কয়েকটি বামপন্থী দল, বিশেষ করে সি পি আই অবশ্য কংগ্রেসের এই ক্ষমতার লড়াইটাকে আদর্শের সংঘাত বলে জাহির করার খুব বেশি চেষ্টা করছেন। ওঁদের বর্তমান রাজনৈতিক কৌশল বা তত্ত্বে একথা বলতেই হবে। কারণ ওঁরা এখন 'পারলামেন্টারি ক্যু'-তে বিশ্বাসী এবং সেই 'ক্যু' হতে পারে না যতক্ষণ না কংগ্রেসের একটা দলকে সঙ্গে পাওয়া যায়। তাই কংগ্রেসের যে পক্ষকে সঙ্গে পেতে চান সেই পক্ষকে ওঁরা প্রগতিশীল বলে জাহির করতে সচেষ্ট। সেইজন্যই ওঁদের বলতে হচ্ছে ইন্দিরা, জগজীবনবাবু, মালব্য সাহেব সব সমাজতন্ত্রী; সেইজন্যই তাঁরা চেঁচাচ্ছেন ওঁদের হয়ে; এবং বলছেন, এটা আদর্শের লড়াই।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এখন দুই শক্তিশালী বিদেশী গোষ্ঠীর মোটামুটি দুটো চিন্তাধারা। একপক্ষের স্ট্র্যাটেজি : ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভাঙন তোল নিয়ে এস—যাতে ভারত খুব বেশি এগিয়ে বিশ্বের বাজারে বড় বড় পশ্চিমা শক্তির প্রতিযোগী না হতে পারে। তাই কংগ্রেসের ভাঙনটাকে ত্বরান্বিত কর। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক হাল ধরার তখন আর কেউ থাকবে না। এবং রাজনৈতিক স্থিরতা না থাকলে অর্থনীতিও দুর্বল হতে বাধ্য। দ্বিতীয় পক্ষের কৌশল : কংগ্রেসের ভাঙন ধীরে ধীরে না এসে দ্রুত আসুক। দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি যেন ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ না পায়। তার আগেই যেন একটা বিকল্প মোর্চা পারলামেন্টারি 'ক্যু'র পথে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে বসতে পারে। এজন্য কংগ্রেসের একটা অংশকেও সঙ্গে চাই। সি পি আই-এই দ্বিতীয় চিন্তাধারার ভাবিবাহক। সি পি আই তাই কংগ্রেসের ভাঙন ত্বরান্বিত করে "প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের" সঙ্গে পেতে চাইছেন।

কংগ্রেসের ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াইর সুযোগে একপক্ষ যেমন শুধু কংগ্রেসের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন, আর এক পক্ষ তেমনি অবিলম্বে বিকল্প মোর্চা মারফৎ ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সচেষ্ট। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বিকল্প জাতীয় 'বামপন্থী' সরকার গঠনের উদ্যোগও তাই খুব দ্রুত শুরু হয়েছে। যেমন, ভূপেশ গুপ্ত, প্রভৃতিরা সারা ভারত ছুটে বেড়াচ্ছেন। এমন যে সি পি আই এম, যাঁরা এই সেদিনও বলেছেন পারলামেন্টারি ম্যানুভারিং-এ আমরা বিশ্বাস করি না, তাঁরাও কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। এইখানেই রুশী এবং সি পি আই নীতির জয় হয়েছে।

এজন্য সব বামপন্থীকেই অবশ্য একটা বড় মূল্য দিতে হচ্ছে; কংগ্রেসের ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলের লড়াইকে আদর্শের সংঘাত বলে জাহির করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন।

কিন্তু ওঁরা বললেই কি ব্যক্তিগত লড়াই আদর্শগত সংঘাত হয়ে যাবে!

✻

আসলে ব্যাপারটা ম্যানুভারিং, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত লড়াই, ব্যাপারটা আগেভাগে আঘাত হানার বলেই আজ দিল্লিতে এত কানাকানি, এত ফিসফাস, এত গোপন অভিসার, এত বিদেশী লীলা খেলা। এবং সব মিলিয়ে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর পাশা খেলা!

ভারতের ইতিহাসের নজির এ ব্যাপারে খুবই খারাপ। সম্মুখ সমরে ভারতের ভাগ্য খুব কমই নির্ধারিত হয়েছে। বহুবার ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং গোপন লড়াইয়ে কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য বদলেছে। এবং সবচেয়ে মজার, চিরকালই রাজধানীতে যখন এইসব কাণ্ড ঘটেছে ভারতবাসী তখন তা জানতে পারেনি।

এবারও কি তাই হবে?

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

গ্রহান্তরে

১৯৬১ সনে কেনেডি যখন এ দশক শেষ হবার আগেই তাঁর চান্দ্রায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন করবার সংকল্প নেন তখন রুশ নেতারা মুচকে হেসেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাপুরুষও। মহাকাশ অভিযানে রুশিয়ার তখন জয়জয়কার। তারাই সর্ব-প্রথম একজন মানুষকে পাঠিয়েছে মহাশূন্যে, সেখানে পাড়ি দিয়ে সে নির্বিঘ্নে মর্ত্যে ফিরে এসেছে। তারও আগে লুনা-১ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছে, লুনা-২ চাঁদে নেমেছে, লুনা-৩ চাঁদের অদেখা পিঠের ছবি তুলেছে। সারা দুনিয়ার লোক বাহবা দিচ্ছে রুশীদের মহাকাশ অভিযানে আশ্চর্য সাফল্যের জন্যে। সে ব্যাপারে আমেরিকার তখন তো সবেমাত্র হাতে খড়ি। কেনেডির চাঁদে মানুষ পাঠাবার সংকল্প লোকে ধরে নিয়েছিল খানিকটা আমেরিকানদের প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা, খানিকটা বা অক্ষমের আস্ফালন। কাজেই আমেরিকাকে কেউ রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আমল দেয়নি, কেউ মনে করেনি তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, তার নাগালও আমেরিকা পেতে পারে। সবাই তাকিয়েছিল মস্কোর দিকে কখন গ্রহ গ্রহান্তরে সে মানুষ পাঠিয়ে ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে অন্য রকম। চাঁদে যিনি প্রথম পা দিলেন মর্ত্যের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রুশী নন, আমেরিকান। মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন ২১ জুলাই সোমবার শ্রীনীল আর্মস্ট্রং। তিনি আর তাঁর সাথী শ্রীঅলড্রিনের নাম অমর হয়ে থাকবে সভ্যতার ইতিবৃত্ত কথায়। এমন যে হবে ১৯৬১ সনে বোঝা যায়নি। কিন্তু তারপর ধাপে ধাপে যখন এগুতে লাগলো আমেরিকার অ্যাপোলো পর্ব তখন আস্তে আস্তে রুশীদের বাঁকা হাসি মিলিয়ে গেল, লোকের ধারণা হলো মার্কিনীরা চাঁদে পৌঁছলেও পৌঁছতে পারে। তখনও কিন্তু কেউ ভাবেনি এ মর্যাদার লড়াইয়ে রুশিয়া হেরে যাবে। দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন বাজীমাত রুশিয়াই করবে সর্ব-প্রথম চাঁদে পাড়ি দিয়ে, তবে তাদের পিছু পিছু একদিন না একদিন মার্কিনীরা ঠিকানায় পৌঁছবে। অনেকেই অধীর আগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন চাঁদমারির বাজীতে দু' পক্ষের মুরোদ কতটা, কে কেমন পাঁয়তাড়া কষছে।

কিন্তু সকলকে তাক লাগিয়ে বাজী জিতলো আমেরিকাই। কেনেডি দেখে যেতে পারলেন না যে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তাঁর ব্রত যখন উদ্‌যাপিত হলো তখন তিনি তো নেই-ই, তাঁর দলও রাষ্ট্র-পতির গদি হারিয়েছে। তা হারালেও তাতে তাঁর দলের কোনও ক্ষোভ নেই। মহাকাশ অভিযানে তারা যে রুশীদের চেয়েও এগিয়ে আছে তার প্রমাণ দুনিয়াকে যে দিতে পেরেছে এতেই আমেরিকার সকলেই খুশী, দল তাদের যাই হোক না কেন। অথচ এ ব্যাপারে যা হয়েছে তাতে স্বচ্ছন্দে একটা রাজত্ব কেনা যায়, একটা গরীব দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙেচুরে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা যায়, এমন কী খাস আমেরিকায় দারিদ্র্য আর অবনতির যেসব অন্ধকূপ আছে তাদের অনেকগুলিকেই আলোতে ভরিয়ে তোলা যায়। কিন্তু তাতে কী? যেখানে জেদের প্রশ্ন, আত্মমর্যাদার প্রশ্ন সেখানে তুচ্ছ টাকার তোয়াক্কা কে করে। অত বুদ্ধির নিক্তিতে সব কিছু ওজন করে যদি মানুষ চলতো তা হলে লড়াই কখনও কী কোথাও হতো?

রুশীদের ক্ষমতার ওপর লোকের এমন অটল বিশ্বাস ছিল যে অ্যাপোলো দশম পর্ব সাঙ্গ হবার আগে পর্যন্ত অনেকে ভেবেছিল মার্কিনীদের তারা লেজে খেলাচ্ছে—হঠাৎ চাঁদে মানুষ পৌঁছে দিয়ে তারা সবাইকে দেখিয়ে দেবে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে কাকে বলে। এত যে জল্পনা-কল্পনা তা কিন্তু চলেছে রুশিয়ার বাইরে। সে দেশ থেকে ভাল মন্দ কেউ কিছু বলেনি; আমেরিকার সঙ্গে মহাশূন্যে রুশিয়া পাল্লা লড়ছে এমন আভাসও কেউ দেয়নি। ওরই মধ্যে একবার শোনা গেল ১৯৭০ সনে একটা বিরাট প্রদর্শনীতে চাঁদের মাটি দেখানো হবে রুশিয়াতে। সঙ্গে সঙ্গে সবজান্তারা দিব্য চোখে দেখতে পেলেন চাঁদে মানুষ না পাঠাক একটা যন্ত্রচালিত যান পাঠিয়ে অ্যাপোলো-১১ পর্ব শেষ হবার আগেই সেখানকার মাটি নিয়ে এসে রুশিয়া বোকা বানিয়ে দেবে আমেরিকাকে। গোটা পৃথিবীকে এক ধাঁধায় ফেললো মস্কো যখন লুনা-১৫ উড়ে চললো ১৩ জুলাই চাঁদের দিকে। তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ তখন পাড়ি দিয়েছে মহাকাশে।

কল্পনার গতি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠলো উদ্দাম—কী চায় পঞ্চদশী লুনা? মার্কিনী-দের ওপর টেক্কা দিয়ে চাঁদের মাটি আনতে? তাদের চূড়ান্ত অভিযান ভেস্তে দিতে? অ্যাপোলো-১১র ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে? সোজাসুজি কোনও প্রশ্নের জবাবই মস্কো থেকে পাওয়া গেল না। শুধু সেখান থেকে এটুকু আশ্বাস দেওয়া হলো, আর্মস্ট্রং-অলড্রিন-কলিন্স ত্রয়ীর কোনও অনিষ্ট লুনা করবে না। যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাও বললেন চাঁদের ধূলি ছুঁয়ে মর্ত্যে ফিরে আসার নজির কোনও লুনার নেই। হলোই তাই। আর্মস্ট্রং দৃপ্ত ভঙ্গিতে চাঁদে পা দিলেন ২১ জুলাই, খানিক পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর দোসর অলড্রিন। তাঁরা সেখানকার অমূল্য মাটি তুলে ভরলেন পাত্রে, দিব্যি সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটালেন, খেলেন, তারপর ফিরে এলেন চাঁদের টান কাটিয়ে ২৪ জুলাই এই পৃথিবীতেই। ওদিকে লুনা গিয়ে আছড়ে পড়লো চাঁদের সংকট সাগরে—যে প্রশান্ত সমুদ্রে অ্যাপোলোর যাত্রা শেষ তার থেকে অনেক দূরে।

অ্যাপোলো পর্বের শেষ এখনও হয়নি। এ পর্যায়ের আদশ অভিযান শুরু হবে ১৪ নভেম্বর। দেখতে দেখতে চাঁদে যাওয়া আসা অনেক সহজ হয়ে আসবে, তার ঝুঁকি চলে যাবে। চাঁদে যেতে আসতে লাগছে দশ দিন, পরে হয়তো অনেক কম সময়ই লাগবে। আমেরিকানরা ইতিমধ্যেই মঙ্গল গ্রহে যাত্রার কথা ভাবছে। আসছে দশকের শেষাশেষি সে-পরিকল্পনা সফল হওয়া বিচিত্র নয়। তাতে কিন্তু সময় লাগবে দু' বছর কিংবা আড়াই বছর। চাঁদ তখন হবে একটা মাঝ-পথের স্টেশন। আর রুশীরা? তারা কী মহাকাশ অভিযান ছেড়ে দেবে? তা কিন্তু মোটেই নয়। বিজ্ঞানীদের মতে রুশিয়া মোটেই পিছিয়ে পড়ে নেই, এখন অনেক ব্যাপারে তারা আমেরিকানদের চেয়ে এগিয়ে। যেমন মহাশূন্যে রকেট জুড়ে দুরন্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। মহাকাশে যদি এমন প্ল্যাটফর্ম পরের পর তৈরী করা যায় তা হলে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার পথ অনেক সুগম হবে। নীল আকাশে কালো মেঘের ভেলার মত রকেটের মালা সাজিয়ে মানুষ খুঁজবে অন্তহীন মহাশূন্যে দূরের নক্ষত্রলোকের গোপন রহস্য।

'চন্দ্রচার্চা'।

একটি সাংবাদিক ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চন্দ্র-বিজয় সম্পর্কে কী ধারণা আপনার?'

বললুম, 'ভালোই।'

একটু আশ্চর্য হল ছেলেটি : 'নেহাৎই ভদ্রতা করলেন মনে হচ্ছে। সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে গেল, আপনার তো বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না।'

'উৎসাহটা ছিল অল্প বয়সে। ছেলেবেলায় যখন জ্যুল ভার্ন কিংবা এইচ-জি ওয়েলস-এর বই পড়তুম, তখন। কলেজী জীবনে স্যার জেমস জীনসের বই পড়ে মন দমে গিয়েছিল—এই মহাবিশ্বের মহাকাশে আমাদের এই পৃথিবী যে মাইক্রোসকোপের লেনসেও ধর্তব্য নয়—সেই নগণ্যতার অনুভূতিতে। তারপর শেষ শিহরণ জেগেছিল ১৯৬১ সালের বারোই এপ্রিল। ব্যাস, তারপর থেকে আর কিছু নেই।'

'১৯৬১র বারোই এপ্রিল? ও হো, মনে পড়েছে। য়ুরি গ্যাগারিন। কিন্তু তারপর থেকে আর আপনি রোমাঞ্চিত হননি?'

'না। দরজা খোলাই আসল কথা—তারপরে পথ তো রইলই। এগিয়ে চলাটা সময়ের ব্যাপার। তা ছাড়া মার্কিনীরা চাঁদে পৌঁছোন কিংবা রুশ লুনা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক—তাতে আমার কী?'

'এ আবার কি রকম কথা।' —ছেলেটি বিমর্ষ হল : 'মার্কিন-রুশ—ভাবে দেখছেন কেন? এ তো সমস্ত মানুষের অ্যাচিভমেন্ট!'

'সমস্ত মানুষের? তা হবে। কিন্তু আমার বন্ধুরা আমাকে সাইকোলজিক্যালী যদিচ বিবিধ চতুষ্পদের সঙ্গে তুলনা করতে চান, ফিজিয়োলজিক্যালী আমি একটি মনুষ্য, এ কথা যে-কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। এই চন্দ্র-বিজয়ে আমার মাইনে বাড়বে, না রেশন বাড়বে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিঞ্চিৎ চান্দ্র-মৃত্তিকা ভিক্ষে চেয়েছেন—ভারতের চিরন্তন বেগারস বাউল—তা থেকে এক গ্রেনও কি পাওয়ার কোনো আশা আছে আমার? সেই ভিক্ষের মাটি—যদি পাওয়াও যায়—তা দিয়ে লিটারেসি বাড়বে ভারতবর্ষে, হাসপাতাল বাড়বে, সেই চাঁদের সুধায় আকণ্ঠ ভরে যাবে কয়েক কোটি নিরন্ন মানুষের?'

ছেলেটি চটে গিয়ে বললে, 'ফিলিস্টাইনের মতো কথা বলছেন আপনি। এভাবে দেখলে—'

'আচ্ছা, উইদড্র করছি।' —আলোচনাটা একটা বাঁকা দিক নিচ্ছে দেখে আমি সামলে গেলুম : 'ওসব বাজে কথা থাক। যতীন সেনগুপ্ত কোট্ করে বলছি—"ক্ষমা করো সখা, বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।" তবে

চন্দ্র-বিজয়ে আমি যে একেবারেই অনুপ্রেরণা পাইনি, তা-ও নয়। ভাবছি, ওরা যদি চাঁদে কখনো আমাকে একটা ফ্রী-প্যাসেজ দেয়—অবশ্য কোনোদিনই দেবে না— তা হলে একটা জিনিস আমি ভেরিফাই করে আসতুম।'

'কী সেটা?'

'ম্যাব্ল্যা লিখেছেন, চাঁদ আর আস্তো নেই, মানে প্রায় নেই-ই—কারণ পৃথিবীর মানবীরা তার তিন চতুর্থাংশ মগজে পুরে ফেলেছে। আমি দেখতে চাইছিলুম, চাঁদের গর্তগুলো মর্তনারীদের দাঁতের দাগ কিনা।'

ছেলেটি এবার হেসে ফেলল।

'ঠিক আছে, কয়েক বছর অপেক্ষা করুন। এই ভারতবর্ষ থেকেই আমরা আপনাকে চাঁদে পাঠাবো দাঁতের দাগ দেখতে।'

'ভারতবর্ষ থেকে—আমাকে?' —মাথা নেড়ে বললুম, 'নিজের আয়ু সম্পর্কে অতটা অপ্‌টিমিস্টিক হওয়া আমার পক্ষে শক্ত।'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন?' —ছেলেটি আমাকে অভয় দিলে : 'একটা সায়েন্টিফিক কার্ভ দেখলেই বুঝবেন, এ কালে বিজ্ঞান এক বছরেই এক শো বছর করে এগোচ্ছে। আমাদের ছেলেরাও পিছিয়ে থাকবে না।'

'নিশ্চয় থাকবে না। ডক্টর খোরানাই কি পিছিয়ে রয়েছেন? নিশ্চয় এগোবেন তাঁরা—তবে হেথা নয়, হোথা নয়, আর কোনখানে!'

'ব্রেন-ড্রেনের কথা বলছেন? আমরা রুখে দেব এবার।'

'রুখবে নাকি? সাধু সাধু। তা হলে

আমাদের অদূরে-তীর্থ ইয়োরোপেরই একটা স্ট্যাটিটিকস নিয়ো ব্যাপার। ব্রেন-ড্রেন সেখানেও এক জ্বলন্ত সমস্যা—দলে দলে এনজিনীয়ার-টেকনিশ্যান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে আমেরিকার দিকে। ওরাই ঠেকাতে পারছে না—তোমরা ঠেকাবে? টাকা যার, চাঁদ-কাদ তারই। আমরা ভিক্ষুক এবং ভিক্ষারাং নৈব নৈব চ।'

'নাঃ, আপনার মুড নেই।'—ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'খালি এলোমেলো, লিংকলেস ড্রক' করছেন।'

'যা বলেছ। একদম মুড নেই। তোমার চাঁদের চাইতে অনেক জ্বলন্ত সমস্যা আমার সামনে। সকাল থেকে সেই প্রোবলেমই আমার কাছে বার্নিং ব্রাইট। মানে দুটো পোকা বেগুন।'

'দুটো পোকা বেগুন!'—সব্‌লাইম থেকে রিডিকুলাস-এ আমার এই অবতরণে ছেলেটির মুখ ব্যাদিত হল।

'আজ বাজারে গিয়ে চন্দ্রানন্দে এক টাকা কিলোর দুটো বেগুন কিনেছিলুম। আমি আবার ওগুলো চেনবার মতো অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী নই, বেগুনওলাও তখন চাঁদ নিয়ে পাশের মুলোওলার সঙ্গে গভীর ভাবে আলাপিত ছিল—সেই চান্সে সে আমার দুটো পোকা বেগুন গছিয়েছে। তা দেখে তোমার বউদি—নাঃ, এখনো ফিরে করেনি, বাকীটা বলে তোমাকে আর নার্ভাস করে দিতে চাই না।'

'ওই বেগুনের পোকা নিয়েই থাকুন।'—হেসে ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো : 'আপনি সিনিক হয়ে যাচ্ছেন।'

সিনিক? ভদ্রতা করেই বলল, কারণ সিনিকের সঙ্গে ইন্‌টেলেক্‌টের কিছু সম্পর্ক আছে। মনে মনে নিশ্চয় বলতে চাইছিল, একটি গর্দভ হয়ে যাচ্ছেন।

অনুতপ্ত চিত্তে চাঁদ নিয়ে কিছু গভীর ভাবনা ভাবতে গিয়েই—আরে—সামনের দেওয়ালে যে হিন্দী ছবির পোস্টার!' 'চাঁদ পর চড়াই!' কে বলে, 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!', দুই মার্কিন কস্‌মোট যখন টলো-মলো পায়ে চাঁদের কিছু নুড়ি-বালি কুড়িয়েই ফিরে এসেছেন—তখন পোস্টারে দেখা যাচ্ছে—চন্দ্রপৃষ্ঠে দুই ভারতীয় বীর প্রবলভাবে তলোয়ার খেলছেন, আর এ অবস্থায় — বলাই বাহুল্য — ভারতীয় মোহিনীরা—কিংবা দুটি চন্দ্রকন্যা কিনা তাই বা কে জানে সঙ্গে সঙ্গে লাস্য নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। কোথায় লাগে আমেরিকা-রুশিয়া? চাঁদে এই নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে এখনো দেরি আছে তাদের।

আমার হঠাৎ দরাজ গলায় হিন্দী ফিল্‌মের গান গাইতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কোনো গানই তো জানা নেই। অগত্যা খবরের কাগজ খুলে, সিনেমার হেডলাইন দেখেই গান ধরলুম : 'চাঁদ পর চড়া—।' আয়া শাওন ঝুমকে। এক কলি মুশকারী—সপনো কা সওদাগর। খয়ত্তী কহে পুকারকে : বদ্‌মাস—বাদ্‌মাস—?

সিঁড়িতে গিন্নীর জুতোর শব্দ। অগত্যা চান্দ্র-গীতি বন্ধ করতে হল।

অ্যাপোলো বাড়ি ফিরল

নতশির হলো শিখর হিমাদ্রির

পৃথ্বী হতে নিলাম পাড়ি,
নভঃগ্রহে কত না দিন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি,
ঘুরিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো কেঁপে,
কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যু আর ভাগ্য-লিখন—
ওইখানে গোল রইল মোর।"

এটির বোধ হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই শুধু এইটুকু বলা ছাড়া যে ওমর খৈয়ম ভাগ্য-লিখনে বিশ্বাসী ছিলেন না।

এইবার চাঁদে আসি। সবাই জানেন বেশি সরাব পান করলে মাথায় চন্দ্রদেবতা ভর করে আমাদের loony বানিয়ে দিতে তা পারেই এমন কি lunatic বানালেও আশ্চর্যের কিছু নেই। যাই হোক আমরা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্গগত মহাপুরুষদের লেখা থেকে। আমি এই প্রবন্ধে স্বর্গগত অমর ওমরের জ্ঞান-গরিমার বিজ্ঞানসম্মত কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি যদিও ওমর খৈয়মের অমৃতের সন্ধান আমরা পাই ইংরাজ কবি ফিটজেরাল্ডের অপূর্ব তর্জমা থেকে। তাঁরই তর্জমা ৪ লাইন প্রাসঙ্গিক বলে এখানে তুলে দিলাম:

"There was many a night and
day
Ere ever thou or I were born;
And still the spinning skies
are sworn
To persevere upon their
play...."

তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী মহাবিশ্ব পারাবারে আমাদের নিকটতম ক্ষুদ্র "আবর্তনশীল আকাশটির বুড়ী ছুঁয়ে নিরাপদে ফিরে হর্নেট রণতরীতে উঠে তারপর সংক্রমণরোধী পোশাক পরেন এবং

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ডাঙ্গায় নেমে ১৮ দিনের জন্য সংক্রমণরোধী কাঁচের ঘরে গেছেন।

একটি উপকথা মনে পড়ে গেল। এক ইতালীয় কৃপণ নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার সময় বললে: "হে ভগবান, তোমার কাছে হাজার বছর আর কতটুকুই বা সময়?"

"এক মুহূর্ত মাত্র।"

"আর এক হাজার ডুকাট?" (ইতালীর প্রাচীন মুদ্রা যার কথা শেক্সপীয়ার Marchent of Venice গল্পে লিখেছেন —(লেখক)

"কত আর, এক পেনি?"

"ভগবান আমায় তাহলে ঐ পেনিটাই দাও!"

"আচ্ছা এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর, আমি আনছি।"

ভগবানের মুখে "এক মুহূর্ত" কথাটি শুনে কৃপণ তো হতাশ কারণ মুহূর্তে মানে হাজার বছর।

সময়ের এই বাইবেলীয় মানদণ্ড অনুসারে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেন ৫½ মুহূর্তে অর্থাৎ ৫৫০৮ বছরে। কিন্তু স্বয়ং খৃষ্টানরাও স্বীকার করেন যে, পৃথিবী তথা গোটা সৌর-পরিবারের সৃষ্টি হয় বহু লক্ষ বছর আগে (ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী জাঁ এফেলের কথা তো ছেড়েই দিলাম)।

আজ আমরা জানি যে ছায়াপথের তারকা-মণ্ডলের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে স্বয়ং সূর্যের লাগে ২০ কোটি বছর যার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা **ছায়াপথ-বৎসর**। এই মানদণ্ডে বিচার করলে মাত্র এক "বছর" আগে পৃথিবী ছিল মধ্যজীবীয় যুগে যখন অতিকায় ডাইনোসরেরা ছিল জৈব জগতের রাজা। আর মানুষ? আরে ছোঃ, সে তো প্রসব হয়েছে মাত্র "২ দিন" হলো। মানুষের জীবন? কয়েক সেকেণ্ড বড়জোর। এই যখন অবস্থা, তখন মানুষ কি কোনদিন ছায়াপথ-শতাব্দীর হদিস পাবে? একজন কবি লিখেছেন:

Nature does not know the past.
Our fleeting years are nothing
to her.

কিন্তু প্রকৃতি নাই বা জানল—মানুষের স্বস্তি নেই সব কিছু না জানা পর্যন্ত। সে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, উল্কা, ধূমকেতু, সবই খুঁটিয়ে দেখতে, বিশ্লেষণ

করতে সে বদ্ধপরিকর কারণ ঐগুলির পিঠেই লেখা আছে আদিকালে সৃষ্টিক্রিয়ার ইতিকথা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিশানা। ঐগুলিই পাঁজি মেলে ধরবে ছায়াপথ-বৎসরের মানদণ্ডে। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" শুধু চাঁদের আলো ছড়িয়ে যায় না, আলোক রশ্মি আপতিত হয় সূর্য-তারা-গ্রহ-উপগ্রহের (শেষের দুটির আলো অবশ্য কর্জ করা), তাই পল্লী-গ্রামে অমানিশাতেও ক্ষেত-খামার-আল্-খাল আবছা আবছা নজরে আসে। মহাজগতের অসীম সীমার মধ্যে আছে নবীন নক্ষত্র ও প্রবীণ গ্রহ, যুবসূর্য, প্রৌঢ় সূর্য, অন্তিম-কালের সূর্য—সূর্য মানে নক্ষত্র। তারা চিরকাল পুনরাবৃত্তি করে এসেছে, ভবিষ্যতেও করবে আমাদের সৌর জগতের মত নিত্য নতুন জগতের বিবর্তন। মহা-শূন্যপটে অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা চলেছে কোটি কোটি বছরের মহাবিশ্বেতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাটি পৃথিবীতে। আবহমণ্ডল, জল, বাত্যা, অবক্ষয়, সাগর ও পর্বতের পতন ও উত্থান এবং উত্থান ও পতন ইত্যাদির জন্য ময়লা হয়ে মুছে গিয়েছে, প্রায় পড়াই যায় না। কিন্তু চাঁদের সেই পৃষ্ঠাটি আজও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। মানুষ তাই চাঁদে যাচ্ছে আদিম পৃথিবীর চেহারা দেখবার ও ইতিহাস অনুশীলন করার আগ্রহে। তাছাড়া অন্য সব গ্রহ-নক্ষত্র দূরবীন ও বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ যন্ত্র দিয়ে পৃথিবীর চেয়ে অনেক কাছে ও পরিষ্কার দেখাবে, চাঁদে আবহমণ্ডল নেই বলে। তারপর জ্যোতিষীয় গবেষণাগারের পক্ষেও ঐ একই কারণে চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে উপযোগী হবে এবং চাঁদ থেকে নির্গমন বেগ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ⅕ ভাগ বলে ট্যাক্সির মত ছোট ছোট মহাকাশ-যান নিয়ে খুব সহজে এদিক ওদিক যাওয়া যাবে। চাঁদ বিপুল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ—এটাও চাঁদে যাবার একটি কারণ।

চাঁদের অনেকগুলি অনন্য স্বকীয়তা আছে যা পরে অন্য একটি লেখায় আলোচনা করব অ্যাপোলোর যাত্রীরা কি সব নতুন তথ্য নিয়ে এলেন সেগুলি জানার পর। এখানে শুধু মহাবিশ্ব পারাবারে ভেলা ভাসিয়ে চাঁদের কূলের ৬০ মাইলের মত দূর থেকে খেয়ানৌকা নিয়ে চাঁদের জমিতে ওঠা এবং তারপর ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরে আসার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেব কারণ ঐ ৬০ মাইল কেন, তার শেষ ৯ মাইলের অভিজ্ঞতাটাই আনকোরা নতুন। বাকি সবই অ্যাপোলো-১০-এর পরিক্রমার পুনরাবৃত্তি। যাত্রার পর প্রথম দুদিনের বিষয়ে এর আগের লেখাটি লিখেছি। সুতরাং তৃতীয় দিন থেকে শুরু করে নবম দিনে শেষ করা যাক—শেষ থেকে শুরু নয়, শুরু থেকে শেষ।

মার্কিন সময় হিসাবে (ভারতীয় সময়ের চেয়ে মোটামুটি ১২ ঘণ্টা পিছনে) ১৯শে জুলাই অ্যাপোলো-১১ সঞ্চিত গতীয় শক্তি এবং জাড্যবেগের দ্বারা মহাশূন্যের সেই সমতলক্ষেত্রের বিন্দুবিশেষে পৌঁছায় যেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর অভিকর্ষক্ষেত্র পরস্পরের উপর এসে পড়েছে। সেই বিন্দুর এক পাশে নামলে পৃথিবীতে এসে পড়তে হবে, অন্য পাশে নামলে চাঁদের দিকে নেমে যেতে হয়। সেইজন্য ঐ সমতল ক্ষেত্রের উপাদান প্রতিটি বিন্দুকে বলা হয় নিরপেক্ষ। তত্ত্ব অনুসারে কোন যান সেখানে পৌঁছলে সব দিকেই not নড়ন-চড়ন হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সব সময় হয় না, কারণ অনেক সময় যানে সঞ্চিত গতীয় শক্তির কিছুটা অংশ তখনো বাকি থেকে যায় বলে যানটি "নিরপেক্ষ" সীমানা ডিঙিয়ে যায় অবশ্য যদি সেই শক্তি পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে বার হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে গণ্ডী পার হয়ে চাঁদের দিকে এগোলেও সে গতি হবে অত্যন্ত শ্লথ। ঐ গণ্ডী চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছে অ্যাপোলোর সারথিরা মহাকাশ-যানের সংলগ্ন স্যাটার্ন রকেটের শেষ পর্যায়ের এঞ্জিনগুলি (পৃথিবীকেন্দ্রিক কক্ষ থেকে বার হবার পর ঐ নিরপেক্ষ বিন্দু অবধি যানটি এঞ্জিন বন্ধ করে সঞ্চিত গতীয় শক্তি ও জাড্যবেগে আপনা থেকেই ভেসে চলে, যেমন মোটরগাড়ি চলে ফ্রী হুইল্ ড্রাইভে।) চালু করে চন্দ্রগামী বেগ বাড়ান এবং চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু অ্যাপোলো-১১ ওতঃস্থ লুনারমডিউল নিয়ে যেই চাঁদের পিছন দিকে যায় অমনি বন্ধ হয়ে যায় তার পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ যে অবস্থা থাকে ৩৪ মিনিট।

আজন্ম বাসভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল পদচিহ্নবিহীন পথ পার হয়ে চাঁদ ও নক্ষত্রের চুমকি-বসানো মহাগগনে তাঁরা চাঁদের অদৃশ্য ওপাশের আকাশে চলে যান ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ৪৩ মিনিটে। তারপর কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়, রাত ১১টা ১৭ মিনিটে তাঁরা আবার চাঁদের এ পিঠে প্রবেশ করেন।

তারপর নামবার উদ্যোগ-আয়োজন। প্রথম কাজ যানের গতিবেগ কমানো সার্ভিস এঞ্জিন চালিয়ে। এঞ্জিনটি ৬ মিনিট ২ সেকেন্ড চলার পর যানের বেগ ঘণ্টায় ৩২১৮ কিলোমিটার কমে দাঁড়াল ৬১১৫ কিঃ মিঃ। তখন অ্যাপোলোর কক্ষ চাঁদের আকাশে ৭০ ও ১৯৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেন কক্ষের এই ৭০ থেকে ১৯৫ মাইলের মধ্যে ওঠানামা? আগের প্রবন্ধে কারণটা লিখেছি। সূর্যের

মহাকর্ষ, বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির আকর্ষণ, চন্দ্রগর্ভে নিহিত চুম্বকধর্মী ধাতুস্তরের আকর্ষণ এবং চাঁদের আকার পুরো গোল নয় বলে কক্ষের এই বিসর্পিল গতি। অবশ্য অ্যাপোলো শেষ পর্যন্ত অত উপরে থাকেনি, আবার এঞ্জিন চালিয়ে চাঁদের ৬২ থেকে ৭৫ মাইলের মধ্যে আবর্তন শুরু করে, লুনার-ডিউল নামাবার জন্য। লুনার-ডিউলের নামার জন্য প্রশান্ত সাগরে যে জায়গাটি বাছাই করা হয়েছে তার গর্ভে যে চুম্বকধর্মী ধাতুস্তর নেই তা অ্যাপোলো-৮ ও অ্যাপোলো-১০-এর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়। পৃথিবীতে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে খেয়াতরী নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘণ্টা আগেই চন্দ্রস্পর্শ করবে।

খবরটা পড়ে আফসোস হচ্ছে কেন লন্ডনের অধুনাখ্যাত যুবক ডেভিড থার্ফলের মত চাঁদে নামার সময় নিয়ে বাজী ধরিনি। ধরলে এই গরীব দেশের তস্য গরীব ইতস্তত-প্রবন্ধ-নিক্ষেপক বার্তাজীবী হয়ে ফোকটে কিছু টাকা হাতে পড়ত। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল যে আমেরিকানরা জুলাই মাসে চাঁদে নামবেন। সেটা নিছক কল্পনা নয়। আমার কাছে “সোভিয়েট ইউনিয়ন” পত্রিকার গাগারিন সংখ্যাটি সযত্নে রাখা আছে, সেই ১৯৬১ সালের। তাতে রুশ ও মার্কিন মহাশূন্য কার্যসূচী পরম্পরার একটি নকশা আছে—তুলনামূলক। তাতে আমেরিকান কার্যসূচীতে চাঁদে যাত্রার আগে অন্তগ্রহ নির্মাণের কথা নেই কিন্তু রুশ কর্মসূচীতে চন্দ্রলোকে যাত্রার আগে কক্ষ-পরিক্রমাশীল অন্তর্গ্রহ স্টেশনের নকশাচিত্র আছে এবং মার্কিন ও রুশ কার্যসূচী ঠিক সেইভাবেই চলে আসছে। মহাশূন্যে দুটি বিরাট সোয়ুজ মহাকাশযানের সংযোজন ও যাত্রী বিনিময় ছিল সেই স্টেশন নির্মাণের উপক্রমণিকা। কিন্তু সেটি তো ঘটেছে হালে। সেইজন্য আমার মনে হয়েছিল যে রুশদের স্টেশন তৈরি করে চাঁদে যেতে দেরি আছে এবং মার্কিনরাই আগে যাবেন। আমার ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বাজী ধরলে জিতে যেতাম। তবে টাকা পেতাম কটাই বা—বড়জোর ১০ টাকা? ডেভিড জড়ো করেছেন ২৪ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং! পাউন্ডের বিনিময় মূল্য এখন আগেকার ১৩।১৪ টাকার চেয়েও বেশি। কিন্তু ১৩ টাকা করেও যদি ধরি তাহলে মোট সংখ্যা হয় ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা! যাক আফসোস করে লাভ নেই কারণ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

“ঈগলকে” নিয়ে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রস্পর্শ করেন ভারতীয় সময় অনুসারে ২০শে জুলাই রাত পৌনে একটার সময়, জলহীন প্রশান্তি সাগরের কঠো রক্ষের গহ্বর-খচিত বিস্তৃতির উপর। জোরে তাঁরা যান “প্রশান্তি হলে।” ওদিকে কলিন্স ‘কলাম্বিয়া’ নিয়ে চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করে চলেন। কলাম্বিয়া থেকে বার হয়ে ২ ঘণ্টার বিপজ্জনক সাগরবেলা পার হয়ে একবার একটু বিশ্রামের পর ঈগল চাঁদের জমি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মস্ট্রং পৃথিবীতে খবর পাঠান যে “ঈগল অবতরণ করেছে।”

ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৪২ মিনিটে প্রথমে আর্মস্ট্রং ঈগলের ঢাকনি খুলে মই বেয়ে চাঁদে নেমে যান এবং একটু পরেই অলড্রিন তাঁর অনুগমন করেন। চাঁদে তাঁরা ঘুরে বেড়ান ও কর্তব্য সারেন আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। তার মানে নামার সময় থেকে তাঁরা চন্দ্রলোকে ছিলেন ২২ ঘণ্টার মত। ফেরার সময় লুনার ডিউলের উত্থানাংশের এঞ্জিন বিকল হলে তাঁদের বেঘোরে মৃত্যু ছিল অনিবার্য এবং যন্ত্র যে বিকল হবে না এমন কথা জোর গলায় কোন বিজ্ঞানী বলতে ভরসা পাননি। অবশ্য সেরকম বিপদে পড়লে খেয়ে মরবার জন্য অভিযাত্রীরা কোন বিষ-বড়ি নিয়ে যাননি—দরকারও ছিল না কারণ চাঁদের আবহবিহীন প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে ধড়াচূড়া খুলে ফেললেই বায়ুর অভাবে তাঁদের হৃৎস্পন্দন থেমে যেত। আনন্দের বিষয় ঐ রকম কোন শোচনীয় ব্যাপার ঘটেনি এবং আরো তারিফ করার বিষয় অভিযাত্রীদের মৃত্যুঞ্জয়ী মনোবল। কাপুরুষের মত বহুবার মৃত্যুভয়ে কম্পিত হবার মত লোক এই তিনজন ইন্দ্রজিৎ নন। তাঁরা একবারের বেশি “মরতে” রাজী নন। এইটিই হচ্ছে অ্যাপোলো-১১ মিশনের সাফল্যের সবচেয়ে প্রশংসনীয় সারবস্তু কারণ “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।” —এটি চণ্ডীদাসের উক্তি। অ্যাপোলো-১১-এর জয়বার্তা বিশ্বমানবেরই জয়বার্তা—যন্ত্রের জয়বার্তা নয় কারণ এই অগ্নিরথের নির্মাতাও মানুষ—হাজার হাজার মানুষ। তাই চাঁদের জমির উপর দণ্ডায়মান আর্মস্ট্রং যখন বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করেন যে সেখানে “একটি ক্ষুদ্র কদম বিশ্বমানবের এক বিরাট পদক্ষেপের সমতুল্য ও সূচনা”—বক্তব্যটি আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তিনি মই বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে টেলিভিশন ক্যামেরাটি চালিয়ে দেন। শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি অতি সন্তর্পণে একটি পা চাঁদের জমিতে এদিকে ওদিকে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে লাফ দিয়ে নামেন। তার ২০ মিনিট অন্বেক্ষণের পর অলড্রিন তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন এবং দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ান ২ ঘণ্টার উপর। চারিদিকে ছোট্ট ছোট্ট পায়ের চেটোর আয়তনের গর্ত আর ছোট ছোট পাথর ছড়ানো। তারপর তাঁরা যে বার্তাখচিত ফলকটি নিয়ে যান সেটির আবরণ উন্মোচন করেন। তাতে প্রেসিডেন্ট

নিকসন ও তিনজন অভিযাত্রীর দস্তখতের উপর লেখা: "এইখানে ইতিহাসে সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষেরা এসেছিল, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে। আমরা সমস্ত বিশ্বমানবের শান্তি কামনা করি।" এর পর চাঁদে আমেরিকার রাষ্ট্র পতাকা পুঁতে দেওয়া। সবশেষে চাঁদের মাটিতে ভূকম্পন যন্ত্র (বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র-সন্নিবিষ্ট) ও লেসার রশ্মি-প্রতিফলক স্থাপনা, যেটি তখনই পৃথিবী থেকে প্রেরিত লেসার রশ্মি প্রতিফলিত করে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপবার সুযোগ দেয়। এ ছাড়া তাঁরা সৌরবাত্যাবাহিত রশ্মি যা বস্তুকণা বন্দী করার যন্ত্রে সেগুলি বন্দী করে নিয়ে লুনার ডিউলে ফিরে যান। কারণ আবহমণ্ডলের বর্ম সৌর বাত্যাকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয় না। কর্তব্য শেষ করে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে তাঁরা যানে ফিরে যান।

আবার পৃথিবীর দিকে

ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৪ মিনিটে তাঁরা লুনারডিউলের এঞ্জিন চালু করে অবতরণাংশ থেকে উত্থানাংশ আলাদা করে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। (নিম্নাংশটির উপগ্রহের উপ-উপগ্রহ হয়ে ঘুরপাক খাবার কথা ছিল। সেইমত কাজ হয়েছে কিনা জানি না।

কলাম্বিয়া তখন ৬৯ মাইল উপরে কক্ষপথে পরিক্রমা করে যাচ্ছে। খেয়া তরীটি ৭½ মিনিটে পরে নিজ কক্ষে পৌঁছবার পর শুরু হয় ৩½ ঘণ্টাব্যাপী অনুধাবনের পালা। তাঁর কক্ষ চাঁদের ১৬ কিঃ মিঃ উপরে। সেখানে চন্দ্রজয়ীরা যখন পৌঁছান, তখন কলাম্বিয়া অবতরণ কেন্দ্র থেকে ১৯০ মাইল দূরে ছিল। অলড্রিন বেতারে জানালেন যে, চাঁদের কোথাও তাঁদের পা ½ ইঞ্চের বেশি বসে যায়নি। এক জায়গায় মাটি কিছুটা নরম এঁটেল মাটির মত চটচটে ছিল একটু ভিতরে। ঈগল তখন চাঁদের আকাশে ১১ থেকে ১৫ মাইল উচ্চতার মধ্যে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করছে। কক্ষের এই উঠতি-পড়তি কেন, তা আগেই বলেছি। অল্পক্ষণের মধ্যে ঈগল আবার উপরে উঠে চলল কলাম্বিয়ার সামনাসামনি হবার জন্য। তার ৪ মিনিট পরেই উচ্চতা যখন ৩২ হাজার ফুট দাঁড়ায়, সেই সময় রুশ রবট-যান লুনা-১৫ অন্য এক সাগরে অবতরণ করে। ৩½ ঘণ্টা পরে ঈগল কলাম্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার পর কিছু পরে চাঁদের পিছন দিক থেকে অ্যাপেলোর শেষ পর্যায়ের এঞ্জিন চালিয়ে যাত্রী তিনজন বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে এসে চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষ ত্যাগ করার সময় ঈগলকে বন্ধনমুক্ত করে সূর্যের গ্রহে রূপান্তরিত হবার রাস্তায় চালু করে দেয়।

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে অ্যাপোলো-১১ ঘণ্টায় ২৯৮৮ মাইল বেগে চাঁদ থেকে ২৪০০০ মাইল দূরে চলে আসে। যাত্রীরা তখন নিদ্রামগ্ন। রাত ১০টা ৪০-এ তাঁদের ঘুম ভাঙ্গার কিছু কম ১ ঘণ্টা পরে তাঁরা সেই ৩৭০০০ মাইল দূরে নিরপেক্ষ বিন্দুটি, বেগ বাড়িয়ে অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে থাকেন এবং এই ধরণ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ফেরবার দিন অবধি বজায় রাখা হয়। আবহমণ্ডলের প্রবেশ করার প্রাক্কাল পর্যন্ত (ঘণ্টায় ৯১০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত)। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পথের দৈর্ঘ্য ৩৮৬০০০ কিঃ মিঃ। রাত ১০টায় একটু পরে তাঁরা যখন ঘুমিয়ে ওঠেন, অ্যাপোলো-১১ তখন অর্ধেক পথ পার হয়ে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১৩১২৬৮ মাইল দূরে ঘণ্টায় ৩৬৬৩ মাইল বেগে ছুটে আসছিল। কিন্তু আবহমণ্ডলের কাছে তার বেগ পৃথিবীর অভিকর্ষের দরুণ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৩৯৭১১ কিঃ মিঃ। তাঁরা প্রশান্ত মহাসাগর স্পর্শ করার আগেই চাঁদে রেখে-আসা সিস্মোমিটারটি কয়েকটি চন্দ্র কম্পন রেকর্ড করে পাঠায়।

(পূর্ব নির্দিষ্ট) ভারতীয় সময় রাত সাড়ে নটায় অ্যাপোলো তার শেষ এঞ্জিন-ঘরটি খসিয়ে ১০টা ৫ মিনিটে আবহমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকৃতি যানটির কিনারা বরাবর আয়নিত গ্যাস খোলসের মত তাকে আবরিত করে। তখন শুরু হয় বেগ মন্দায়ন এবং পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ৩½ মিনিট বিচ্ছিন্ন থাকে। আর্মস্ট্রং তখন যানটির গতি এমন ভাবে আরো কোণাকুণি করে দেন, যাতে সেটি পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আড়াই শো মাইল পূবে গিয়ে জলে পড়ে। সেই বাড়তি দূরত্ব যানের গতি দেয় ৪০ মিনিট পেছিয়ে।

পৃথিবী থেকে ৪০০০০০ ফুট উপরে আবহমণ্ডলের গাঢ় স্তরে যানের বহিস্তক থেকে ঘর্ষণজাত বহ্নিশিখা উদ্গত হতে থাকে। তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৪২০০ ফারেনহাইট। কিন্তু ভিতরের তাপমাত্রা থেকে যায় ৮০ ডিগ্রীতে। প্রশান্ত মহাসাগরের দিগ্বলয় তখন সবে উষার প্রথম আলোয় রাঙ্গা হয়ে উঠছে। তার মধ্যে দেখা গেল একটি জ্বলন্ত লাল উল্কাপিণ্ডের মত জিনিস শোঁ শোঁ করে ছুটে আসছে। হর্নেট জাহাজের নাবিকদের সেটি চোখে পড়তেই রব উঠলো: ঐ, ঐ, ঐ নেমে আসছে। উড়ে গেল হেলিকপ্টার, নিয়ে এল বিজয়ীদের সংসর্গ প্রতিষেধক পোষাক পরিয়ে। শেষ হোল চন্দ্রলোকে যাত্রা। যাত্রীরা এখন সংসর্গ প্রতিষেধক কাঁচের ঘরে আছেন।

তিন পথিকের [illegible]

অ্যাপোলো ১১-এর সর্বাধিনায়ক নীল আর্মস্ট্রং। অ্যাপোলো ১১-র পরিচালন-কক্ষের মহাবৈমানিক মাইকেল কলিন্স। অ্যাপোলো ১১-র লুনারডিউলের সারথি এডউইন অলড্রিন।

উপরের এই কটি লাইন ইতিহাসের অগ্রগতি পথে যন্ত্রকৌশলের ও মহানভোচারণার যুগান্তরসূচক ফলকে সোনার জলে লেখা থাকবে চিরকাল, যেমন লেখা আছে গাগারিনের নাম। অপঘাত মৃত্যু গাগারিনকে যুবা বয়সে পঞ্চভূতে বিলীন হতে বাধ্য করেছে। তাঁর "ওড়ার মত ওড়া" অর্থাৎ চন্দ্রলোকে উড়ে যাওয়ার সাধ ও সাধনা সার্থক করলেন আমেরিকার এই তিনজন মাঝবয়েসী অসাধারণ সাধারণ মানুষ। আমরা দেবদূতের কথা পুরাণে পড়েছি, কিন্তু নরদূতের কথা শুনিনি। এই তিনজন মার্কিন নাগরিক ধরার নরদূত হয়ে দেবলোকে পরিচয়পত্র দাখিল করে এসেছেন। তিনজনেরই জন্ম ১৯৩০ সালে—চান্দ্র প্রভাবের সময় কিনা জানি না। তাঁদের ভূমিষ্ঠ হবার সময় পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীতে যদি উজানের সময় হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারি যে, চাঁদের দশায় জন্ম বলে তাঁরা আজ হতে পারলেন চন্দ্রবিজয়ী। আর্মস্ট্রং ও কলিন্স ৩৯-এর কোঠা এই বছরেই পূর্ণ করবেন; অলড্রিন তা করে ফেলেছেন গত জানুয়ারিতে। ওজন তাঁদের মোটামুটি ২ মণের একটু বেশি। সকলেই বিবাহিত, মোট সন্তান ৮টি। তাঁরা সকলেই প্রবীণ জেট-বৈমানিক (হাজার তিন-চারেক ঘণ্টা উড়েছেন)। সবাই আগেকার জেমিনী পর্বে একবার করে মহাশূন্যের উপকূলের কাছাকাছি সাঁতার দিয়ে এসেছেন।

আমেরিকা বিমান বহরের লেঃ কর্নেল কলিন্স ছিলেন জেমিনী-৭ মহাকাশযানের জন্য। প্রয়োজন হলে যাবার জন্য তাঁকে তৈরি রাখা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর যাবার দরকার হয়নি। পরে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে জেমিনী-১০এ তিনি জন ইয়ং-এর সহযাত্রী হিসাবে অন্য দুটি চালকবিহীন আগেনা রকেটের সঙ্গে মহাকাশযানটি সংযোজন ও আগেনা রকেটের শক্তি ব্যবহার করে জেমিনীর কক্ষ পরিবর্তন করায় সাহায্য করেন। তাছাড়া তিনি সে যাত্রা ২বার মহাশূন্যে পদচারণা করেন এবং দ্বিতীয় আগেনা থেকে এক উল্কাণু পরীক্ষা যন্ত্র উদ্ধার করে এনে মহাশূন্য যাত্রায় উল্কার বিপদ সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষিত তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেন। সেবার জেমিনী-১০ ৪৪ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে রেকর্ড স্থাপন করে।

কলিন্স নাসার "অনন্যসাধারণ কৃতী" পদক, বিমান বহরের নভোচারী 'উইংস' (ব্যাজ) এবং 'ফ্লাইং ক্রস' পদক লাভ করেন।

সংঘর্ষ প্রতিরোধক পোশাক পরে অ্যাপোলো থেকে নেমে আসছেন মহাকাশচারীরা

১৯৬৩ সালে তিনি মহাকাশচারী দলে গৃহীত হন।

রোমে জন্মগ্রহণের পরবর্তী কালে তিনি ওয়াশিংটনে বাসা বাঁধেন এবং মহাকাশচারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবার পর কেনেডি অন্তরীপের হিউস্টনে আস্তা গাড়েন। অন্য দু-জনও সেখানেই থাকেন।

আর্মস্ট্রং টেস্ট পাইলট হিসাবে আমেরিকার নতুন সামরিক বিমান ("এক্স-১৫") চালিয়ে ২ লক্ষ ফুট উপরে অর্থাৎ মহাশূন্যের এদিককার সীমানা ঘেঁষে ওড়েন এবং বিমানের বেগ বাড়িয়ে শব্দের বেগের ৫ গুণ করেন (ঘণ্টায় ৪০০০ মাইল)। গাগারিনও ঠিক এইরকম টেস্ট পাইলটি করতে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান। আর্মস্ট্রং সামরিক বিমানের আরো নতুন মডেল পরীক্ষা করেন এবং প্যারা-গ্লাইডার (দেখতে অনেকটা প্যারাসুটের মত) নিয়ে উড়ে আসেন।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে জেমিনী-৮-এর অধিনায়ক হিসাবে আর্মস্ট্রং (এবং তাঁর সহযাত্রী ডেভিড স্কট) জীবন-বিপন্ন অবস্থা তুচ্ছ করে তাঁর যানকে অন্য একটির সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে তিনি একটি তালিমী লুনারমডিউল নিয়ে আকাশে ওঠার পর যানটি বিগড়ে যায়। সেবারেও আর্মস্ট্রং-এর কানের পাশ দিয়ে যমদূতকে চলে যেতে হয়—যানটি টেকসাসের তালিম-ক্ষেত্রে আছাড় খেয়ে ভস্মাবশেষে পরিণত হবার কয়েক মুহূর্ত আগে আর্মস্ট্রং প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে পড়েন। হয়ত চন্দ্রের দশায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে। মহাশূন্যযাত্রার গবেষণা কেন্দ্রে (ক্যালিফর্নিয়ায়) তিনি ভর্তি হন ১৯৫৫ সালের পর। তার আগে তিনি মার্কিন নৌতরী বহরের বৈমানিক হিসাবে ৭৮ বার বিমান চালনা করেন কোরিয়ার যুদ্ধে।

আর্মস্ট্রং বিমান-মহাবিমান বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউটের **অক্টেভ চ্যানিউট** পুরস্কার (১৯৬২) মার্কিন বিমান ও মহাবিমান

চালনা ইনসটিটিউটের পুরস্কার (১৯৬৬), নাসার "অসাধারণ কৃতী পদক" এবং জন গ্রুটগোআরী পুরস্কার (১৯৬২) লাভ করেন।

আর্মস্ট্রং-এর জন্ম ওহাইওতে। তার দুটি ছেলে—একটির বয়েস ১২, অন্যটির ৬।

চন্দ্রগামী খেয়া নৌকার পাটনী এডউইন অলড্রিন চন্দ্রস্পর্শী হিসাবে অধিকার করেছেন ২য় স্থান।

মহাকাশচারণা বিজ্ঞানে তিনি "ডক্টরেট" লাভ করেন ম্যাসাচুসেটসের টেকনোলজিক্যাল ইনসটিটিউট থেকে। ১৯৬৩ সালে তিনি তাঁর বিষয় সম্পর্কে যে থিসিস লেখেন, তার শেষ বাক্যঃ "ওঃ। আমি যদি ওদেরই এক জন হতে পারতাম!" ওদের মানে মহাকাশচারীদের।

"ওদেরই একজন" হয়ে অলড্রিন ১৯৬৬ সালের নবেম্বরে জেমিনী-১২ মহাকাশযানে জেমস লাভেলের (জুনিয়ার) সহযাত্রী হিসাবে ৪ দিনব্যাপী ৫৯ বার মহাশূন্যে ভূপ্রদক্ষিণের সময় যানের ঢাকনা খুলে শরীরের উপরাংশ বাইরে বার করে ২০৮ মিনিট ধরে পৃথিবীর ফটো তোলার পর ১২৯ মিনিট মহাশূন্যে পায়চারি করেন।

কোরিয়ার যুদ্ধের সময় অলড্রিনের বিমান ৬৬ বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং জার্মানির বিটবুর্গে তিনি মার্কিন সামরিক বিমান বহরের একজন নায়ক এবং রণতরী বহরের বোমারুর চালক ছিলেন।

কর্নেল অলড্রিন একটি ওক পত্রগুচ্ছ খচিত ফ্লাইং ক্রস, ২টি ওক পত্রগুচ্ছ খচিত পদক, মার্কিন বিমানবহরের প্রশংসাসূচক পদক, নাসার "অসাধারণ কৃতী" পদক, বিমানবহরের মহাকাশচারী 'উইংস' এবং মহাশূন্যে অন্য মহাকাশযানের মুখোমুখি হবার পরিকল্পকদের অন্যতম হিসাবে "সমবেত কৃতিত্ব" পুরস্কার লাভ করেন। কারুকর্মী ও বৈমানিক-মহাবৈমানিক কর্মীদের আন্তর্জাতিক সংস্থার অন্যতম অবৈতনিক সদস্য এবং বৈমানিক-মহাবৈমানিকদের চিকিৎসা সংসদের অবৈতনিক সদস্য।

অলড্রিন নিউ জার্সির মণ্টক্লেয়ার শহরের নাগরিক। তাঁর ২ ছেলে আর একটি মেয়ে।

অ্যাপোলা-১১এর মাতৃযানের আসনটির আরোহী কলিন্সের পক্ষে ঝুঁকি ও খাটি তাঁর "পার্শ্বরক্ষী" দুজনের চেয়ে সামান্য কম ছিল বটে, কিন্তু তাঁর দায়িত্ব বড় সামান্য ছিল না। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যদি মূল জাহাজে ফিরে যাবার সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেন, তাহলে অ্যাপোলা-১১কে প্রয়োজন মত অন্য পথে চালিয়ে সঙ্গী দুজনকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ষোল আনা।

জুলে ভার্ন, সিরানডিবার্জেরাক ও গডার্ডের স্বপ্ন আজ আর আকাশে কল্পনার কুসুম রচনা করছে না—নেমে এসেছে এই পৃথিবীর বস্তুব মাটিতে নিরাকার থেকে সাকার হয়ে। ঐ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন এ যুগের তিনজন প্রমিথিউস—আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্স। কলিন্সের এ যাত্রা চন্দ্র স্পর্শ করার সৌভাগ্য হলো না বলে তাঁর আফসোসের কিছু নেই। অ্যাপোলো মিশন তো একবার চাঁদের বুড়ি ছুঁয়ে এসে মিশনের স্বর্গারোহণ পর্ব রচনা করবে না। এতো সবে উদ্যোগ পর্ব। এরপর আরো কতকগুলি প্রমিথিউসের অগ্নিরথ চাঁদে যাতায়াত করবে এবং কলিন্স নিশ্চয়ই হবেন তার কোন না কোনটির সারথি। আর তিনি যে নির্বিঘ্নে একা অ্যাপোলোকে বার বার চাঁদের চারদিকে চক্কর দিইয়ে, তাঁর ২ জন চাঁদফেরৎ সঙ্গী নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলেন এটাই কি কম কৃতিত্বের কথা?

অমর্ত্য মহাকাশ

সমরজিৎ কর

॥ এক ॥

পৃথিবীর সীমায়িত গণ্ডীকে আশ্রয় করে মানুষ কোন দিনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আরও আলো, আরও ব্যাপকতার সন্ধানে এর বায়ুস্তরের শেষ সীমা অতিক্রম করে সে চলে যাবে বহু দূরে। প্রথমে সন্তর্পণে। তারপর পুরো সৌরমণ্ডলটাকেই একদিন সে জয় করবে নিজের প্রয়োজনে।' কথাগুলি বলেছিলেন সোভিয়েত দেশের

নিকোলাই কিবালচিক

অন্যতম বিজ্ঞানী এং আধুনিক মহাকাশ যাত্রার জনক কনসতানতিন এডোয়ারডোভিচ জিওলকভসকি। চাঁদে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর দুজন মানুষ অবতরণ করেছে, তাদের সম্মুখে পাহাড়, পায়ের নীচে নুড়ি, আশ-পাশে ছোট বড় গহ্বরের ভিড়। ঠিক এমনই একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন ১৮৯৬-এ। তাঁর সে বর্ণনার অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল গত ২১শে জুলাই ১৯৬৯এ। ভারতীয় সময় তখন সোমবার সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। মানুষের ইতিহাসের সবচাইতে রোমাঞ্চকর, সবচাইতে গৌরবমুহূর্ত রচিত হল। সার্থক হল জিওলকভসকির স্বপ্ন। মারকিন দেশের দুজন মানুষ, নীল আরমস্টং এবং এডুইন অলডারিন চাঁদের বুকে এঁকে দিলেন তাঁদের পদচিহ্ন। [illegible] সেই সঙ্গে প্রথম বর্ণনাটি, যা এল জিওলকভস্কির বর্ণনায় সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল। ব্যতিক্রম শুধু জিওলকভসকি যে দুজন মানুষের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁরা রুশ। কিন্তু বাস্তবে চন্দ্রহার গলায় পরলেন আতলান্তিকের ওপারের দুজন মানুষ নীল আরমস্টং এবং এডুইন অলডারিন।

সংকীর্ণ প্রতিযোগিতার কথা থাক। আজকের এ সাফল্য কোন বিশেষ মানুষ, কোন বিশেষ দেশ, অথবা কোন বিশেষ অঞ্চলের নয়, পৃথিবীর সর্বজনের। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেদিন মহা-বিশ্বের জানালা খুলে দিয়েছিল, কেপলারের গ্রহ-গতি তত্ত্ব যেদিন কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল সহস্র মানুষের মনে, নিউটন যেদিন ব্যাখ্যা করলেন চাঁদ কেন উপগ্রহরূপে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে তারপর থেকেই মহাকাশ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সেদিন থেকেই বলা চলে মানুষ যেন যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণের কথা ভাবতে শুরু করল। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অবলম্বন করে গল্প রচনা করলেন এডগার অ্যালেন পো, হেল, এইচ জি ওয়েলস, জুল ভারন এবং আরও অনেকে। এঁরা স্বপ্ন দেখলেন পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে বিচরণ করছে, অথবা ভিন্ন গ্রহে। এমন কি কোন কোন লেখক সুদূর নক্ষত্র মণ্ডলের কোন গ্রহের মাটিও দখল করে বসলেন। তবে এ সমস্তই কল্প কথা। বাস্তবে মহাকাশযাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে যাঁরা তখন কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাদের সঙ্গে এঁদের মিল খুবই নগণ্য।

বস্তুত, ১২০ খৃষ্টাব্দে লুকিয়ান বিরচিত 'ট্রু হিসটোরি' গ্রন্থে প্রথম চন্দ্রাভিযানের একটি বিশদ বিবরণ আমরা দেখতে পাই। এই বিবরণে রাজহাঁসের পিঠে মহাকাশযান বহনের কথা বলা হয়। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভয়েজ ডালস লা লিউন' এবং 'হিসটোরি দ্যাম ইটাটস এট এমপায়ারস দু সোলেইল।' রচয়িতা কাইয়েনো দা বার-জারস। ইনি রকেট চালিত একটি মহাকাশ যানের বর্ণনা দেন। এই বর্ণনায় কোন কোন স্থানে অবিজ্ঞানীসুলভ চিন্তাধারা প্রকট হয়ে উঠলেও মহাকাশ যাত্রার যে সমস্ত অসুবিধের কথা তিনি আলোচনা করেন তার ভেতর যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। উত্তরকালে প্রখ্যাত কল্পকাহিনীকার জুল ভারন-এর বর্ণনায় কামানের গোলার মুখে চড়ে চন্দ্রাভিযানের যে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত মেলে তার সঙ্গে আধুনিক রকেট যাত্রার বেশ কিছু মিল দেখা যায়। সব চাইতে মজার ব্যাপার জুল ভারন-এর নায়কদের চাঁদে যেতে সময় লেগেছিল প্রায় ৯৭ ঘণ্টা, নীল আরমস্টং এবং এডুইন অলডারিনের সময় লেগেছে ১০৮ ঘণ্টার কিছু বেশি। মহাকাশ বিজ্ঞানের সেই শৈশব দিনে ভারন-এর পক্ষে এতটা কাছাকাছি হিসেব রেখে চলা নিশ্চয় বিস্ময়কর।

তবে বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল, যদি দূর নভোমাঝে মানুষকে কোন দিন পাড়ি দিতে হয় তাহলে রকেটের দ্বারাই একমাত্র তা সম্ভব। এই রকেটের সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সাফল্য

ডঃ জিওলকভস্কি
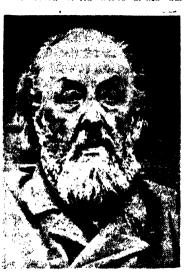
ইউরোপে একদিন যুগান্তকারী উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম কনগ্রেভ। কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে যে সমস্ত রকেট তিনি তৈরি করেন প্রথম দিকে তা মুখ্যত যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল পরে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপন্ন জাহাজের যাত্রীদের রক্ষা করার ব্যাপারে কনগ্রেভ রকেট কাজে লাগান শুরু হয়। মানব কল্যাণে রকেটের ব্যবহার এই প্রথম।

অবশেষে রকেটের পাল্লা যত বাড়তে লাগল, মানুষের কল্পনাও প্রসারিত হতে লাগল সমান তালে। জিজ্ঞাসা, যে মহাকাশ যুগ যুগ ধরে তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কি তার স্বরূপ? কি আছে সেখানে? মহাকাশ যাত্রা কি রকেটের সাহায্যে সফল করা যায় না?

সেটা বিংশ শতাব্দীর পাদপীঠ। প্রকাশিত

হল প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী, কালুগা গ্রামের একজন সামান্য স্কুল শিক্ষক কনস-তানতিন এডুয়ারডোভিচ জিওলকভস্কির অসামান্য রচনা 'একসপ্লোরেশন অব স্পেস বাই রকেট ডিভাইসেস'। ইতিপূর্বে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম যুগান্তকারী প্রবন্ধ। বিষয় মহাকাশযাত্রা 'নেচার অ্যান্ড ম্যান' নামে একটি বিজ্ঞান-পত্রে লেখাটি প্রকাশ পাবার পর রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা জিওলকভস্কির চিন্তাধারাকে এক নতুন পথে পরিচালিত করল। মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে এবার তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ভাবতে লাগলেন।

গ্রহান্তরের মাঝখানে পড়ে রয়েছে মহাশূন্য। অতএব নভোচর যে যানে চড়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবে সেটিকে সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন করে তৈরী করতে হবে। তার মধ্যে থাকবে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে বায়ু বিশুদ্ধ করণেরও। নভোচরের পোশাকটি হবে চাপ-সহ। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু শূন্যের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, মহাকাশযানটিকে চালাতে হবে ঘাতের সাহায্যে ধাক্কা মেরে। অর্থাৎ রকেটের সাহায্যে। অবশ্য মানুষের মহাকাশ বিচরণের জন্যে রকেটের প্রয়োজন হবে, এ কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন নিকোলাই আইভানোভিচ কিবালচিক, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সাধারণ কঠিন জ্বালানিতে চলে এমন রকেটের ক্ষমতা খুবই কম। উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন রকেটের জন্যে চাই প্রচন্ড নির্গম বেগ বা এগজস্ট ভেলোসিটি, অর্থাৎ রকেটের জ্বালানি পোড়ার পর যত বেগে তার উত্তপ্ত বায়বীয় অংশ নির্গত হবে রকেটের গতিও সেই হারে বেড়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ কঠিন জ্বালানি পুড়িয়ে এই সুবিধেটি পাওয়া সম্ভব নয়। জিওলকভস্কি বললেন, মহাকাশ যান চালাতে গেলে কেরোসিনের মত কোন তরল জ্বালানির প্রয়োজন। একটি মহাকাশ যানের ছকও তৈরি করে ফেললেন তিনি, যা তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনে চলতে পারে। জ্বালানি পোড়ার সময় যে প্রচন্ড উত্তাপ তৈরি হবে তা থেকে কি করে রকেট-ইঞ্জিনকে বাঁচান যায় সে কথাও চিন্তা করলেন তিনি।

এ ছাড়া সুদূর মহাকাশে পাড়ি দিতে গেলে যে বহুস্তর রকেটের প্রয়োজন হবে রীতিমত তত্ত্ব দিয়ে জিওলকভস্কিই প্রথম তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বললেন, মনে করুন, রকেটের ডগায় করে এক টন ওজনের একটি মানব-বাহী কক্ষকে আমরা চাঁদে পাঠাতে চাই। এর জন্যে আমাদের নির্গম-বেগ হবে প্রতি সেকেন্ডে ৩০০০ মিটার। এই নির্গম বেগই রকেটকে ধাক্কা মেরে
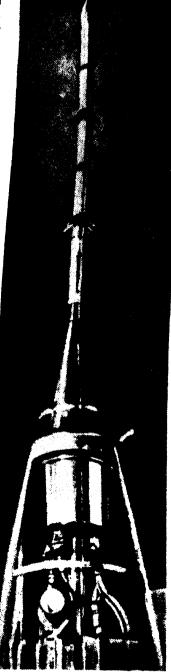
১৯৩৩এ তরল জ্বালানির সাহায্যে সোভিয়েত দেশ এই রকেটটি আকাশে পাঠান

চালিয়ে থাকে। যদি একটি রকেটেই কাজ সারতে হয় তাহলে যতটা জ্বালানি আমাদের ব্যবহার করতে হবে তার পরিমাণ ঐ রকেটের ওজনের ষাট গুণ বেশি। প্রযুক্তির দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে এত বেশি বোঝা নিয়ে ঐ রকেটটির পক্ষে আকাশে ওড়াই অসম্ভব। কিন্তু একটির বদলে যদি পর পর একাধিক রকেট সাজিয়ে বহুস্তর করে নেওয়া যায়, তাহলে জ্বালানির পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

তাঁর মহাকাশযানে খাদ্য উৎপাদন, অক্সিজেন প্রস্তুত এবং স্বাস্থ্য-বিধি অটুট রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। সেই সঙ্গে সৌর শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ বা তাপ উৎপাদন এবং প্রয়োজনে মহাকাশ যান চালান, এমন অনেক কথাই রীতিমত তত্ত্বগতভাবে আলোচনা করলেন একের পর এক, মোট সাত খানি গবেষণাপত্রে।

মোট কথা পুরো সমস্যাটিকেই নানাভাবে খতিয়ে দেখেন জিওলকভস্কি এবং ১৮৯৮-এর মধ্যে তাঁর প্রারম্ভিক গবেষণার কাজ শেষ হল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সায়েন্স সার্ভে' পত্রিকায় তাঁর নতুন গবেষণার কথা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অল্পদিন পরেই 'সায়েন্স সার্ভে'র এই সংখ্যাটি পুলিস বাজেয়াপ্ত করে। কারণ, জারকে সমালোচনা করে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সেই মুহূর্তে প্রবন্ধটি যথাযথ প্রচার পেল না। তবে সৌভাগ্যবশত জিওলকভস্কির নিজস্ব কপিটি রক্ষা পায় এবং পুরনো প্রবন্ধগুলি আরও বিশ্লেষণ করে ১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত 'এভিয়েশন রিপোর্টার' নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি শিষ্যরূপে পান ডঃ জেকভ আই পারেলম্যানকে। ডঃ পারেলম্যানই পরে তাঁর গুরুদেবের মূল তথ্যবহুল রচনাগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রচার করেন। ফলে মহাকাশবিজ্ঞানে জিওলকভস্কি রাশিয়ার অন্যতম মৌল গবেষক হিসেবে পরিচিতি পান। তবে দুঃখের বিষয়, মূল রুশ ভাষায় লিখিত তাঁর সমস্ত গবেষণা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত না হওয়ায় রাশিয়ার বাইরের মানুষ এত বড় ঘটনা সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে গেল।

কিন্তু পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা তখন শুরু হয়ে গেছে নানা দেশে, নানা উদ্দেশে। ১৯০৬-এ বয় নামে জনৈক বিজ্ঞানী কঠিন জ্বালানি দিয়ে একটি রকেট তুললেন প্রায় তিন হাজার ফুট ওপরে। এতে খানিকটা বিস্ফোরক পদার্থ বহন করা হয়েছিল। তার সাহায্যে আকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে অনেককে তিনি বাঁচান। অ্যালফ্রেড মল নামে আর একজন ইঞ্জিনিয়ার রকেটের সাহায্যে উঁচু থেকে চারপাশের ছবি তোলার চেষ্টা করেন। কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১২ সালে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হন। এই রকেটটি আকারে বেশ বড় ছিল। জ্বালানি সহ মোট ওজন সাড়ে বিরানব্বই পাউন্ড। যাতে

সাম্যতা বজায় রেখে উড়তে পারে তার জন্যে এর নীচে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে আট ইঞ্চি চওড়া এবং দশ ইঞ্চি লম্বা প্লেটের একটি ক্যামেরা। দূর থেকে বৈদ্যুতিক প্রণালীতে রকেটটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। রকেটের বিবর্তনে এ এক নতুন দিক।

১৯১৪। ইউরোপে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিভিন্ন সরকার রকেটের ওপর সমস্ত গবেষণা লুকিয়ে ফেললেন। মুখ্যত অনেকে পুরোপুরি যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যবহার করতে লাগলেন রকেট। এ সময়ে যথেষ্ট উন্নত ধরনের রকেট তৈরি হয়ে গেলেও তাদের সঠিক খবর বাইরে পৃথিবীর অজ্ঞাতেই থেকে গেল।

অবশেষে রকেটবিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের সূচনা হল ১৯১৯-এর ২৬শে মে। ঐ দিন ম্যাশাচুসেটের অন্তর্গত ওয়ারচেস্টারের ক্লার্ক কলেজের অধ্যাপক ডঃ রবার্ট হাচিন্স গডার্ড উনসত্তর পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের কাছে। ১৯২০তে ২৫৪০ নম্বর প্রকাশনীরূপে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট। শিরোনাম : 'এ মেথড অব রিচিং একস্ট্রিম অলটিচুডস'। এই গ্রন্থে গডার্ড বিশদভাবে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের কথা আলোচনা করেন। মূল বিষয়বস্তু এবং তার ব্যাখ্যা খুব একটা আকর্ষণীয় কিছু হল না। তবে শেষের কয়েকটি লাইন অনেকের মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করল। এই অংশে রকেট চড়ে চাঁদে যাওয়া এবং সেখান থেকে এক ঝলক আলোক সৃষ্টি করে পৌঁছনোর সংকেত পাঠানোর বর্ণনা ছিল।

কিন্তু ১৯২৩ পর্যন্ত পরীক্ষাকার্য চালানোর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না গডার্ড। ইতিমধ্যে মিউনিকের আর ওল্ডেনবার্গ নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা 'রকেট আন্তর্গ্রহ যাত্রা' নামে একটি বই ছেপে ফেলল। লেখক এইচ ওবার্থ। এই গ্রন্থে মডেল-ই নামে একটি মহাকাশযানের ছক এবং তরল জ্বালানির কথা উল্লেখ করেন। মোটামুটিভাবে তাঁর সমস্ত বক্তব্য জিওলকভস্কির মূল তত্ত্বের অনুরূপ। তবে ওবার্থ রুশ ভাষা জানতেন না এবং তাঁর পক্ষে জিওলকভস্কির মূল রচনা সংগ্রহ করাও কঠিন ছিল। এ কথা ভেবে বলা যেতে পারে মহাকাশযান সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা মৌলিক। গডার্ডও রুশ ভাষা জানতেন না। অথচ তরল জ্বালানি নিয়ে রকেটের ওপর তিনি যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন সে কথা ১৯৩৬-এর আগে তিনি বাইরের জগতে প্রকাশ করেন নি।

আধুনিক মহাকাশযান নির্মাণের পরিকল্পনায় ওবার্থের অবদান অনস্বীকার্য। অঙ্ক কষে তিনি দেখিয়ে দিলেন, তাঁর মহাকাশযানকে সেকেন্ডে সাত মাইল গতিবেগ দেওয়া সম্ভব। কারণ, ঐ গতিবেগে কোন বস্তুকে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপ করলে তা পৃথিবীর অভিকর্ষ অতিক্রম করে চলে যেতে পারবে। কিন্তু প্রথম দিকে দারুণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল রুমানিয়ার এই বৈজ্ঞানিককে। এমন কি, ডঃ লয়েডের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী এক কথায় তাঁকে নাকচ করে দিয়ে বললেন, অসম্ভব। সেকেন্ডে সাত মাইল গতিবেগ পাবার মত ক্ষমতা ওবার্থের মহাকাশযানের নেই।

হাল ছাড়লেন না ওবার্থ। বার্লিনে চলে এলেন তিনি এবং স্বাধীনভাবে গবেষণার কাজে লেগে গেলেন। এই সময় সাহায্যকারীরূপে তিনি পেলেন রুডলফ নেবেল। ইনিই হলেন তাঁর প্রথম সহকারী। এঁর ওপর দায়িত্ব রইল উচ্চ জ্বলনক্ষমতার জ্বালানি

১৯৩৫। নিজের তৈরি রকেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডঃ গডার্ড

এবং তাপসহ সংকর ধাতু তৈরি করার। তাঁর দ্বিতীয় সহকারীরূপে কাজ করতে লাগলেন একজন রুশ ছাত্র। নাম আলেকজান্ডার বোরিসোভিচ সেরেসেভেসকি। এঁদের সহযোগিতায় ওবার্থ মহাকাশযান নির্মাণের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন করলেন। পরে নেবেল নিজেও বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরোদস্তুর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গডার্ড। ১৯২২-এ তিনি তাঁর প্রথম রকেট ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করলেন তরল জ্বালানির সাহায্যে। অবশেষে ঐতিহাসিক উৎক্ষেপণ পর্ব সম্পন্ন হল ১৬ই মার্চ, ১৯২৬। পৃথিবীর প্রথম একটি আদর্শ তরল জ্বালানির রকেট সাফল্যের সঙ্গে মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। এই রকেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তরল অক্সিজেন এবং গ্যাসোলিন। আগুন ধরান হয় একটি গ্যাস ব্লোয়ার দিয়ে। উৎক্ষেপক মঞ্চ তৈরী হয় লোহার কাঠামোর সাহায্যে। ঐতিহাসিক এই পরীক্ষায় ক্যামেরা অপারেটাররূপে কাজ করেন মিসেস গডার্ড, সহকারী হেনরী শাখস এবং পি এম রুপ। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে রকেটটি ১৮৪ ফুট পর্যন্ত গমন করে। এর পর ১৭ই জুলাই, ১৯২৯-এ তিনি যে রকেটটি উৎক্ষেপ করেন সেটিই পৃথিবীর জটিল যন্ত্রবাহী রকেট। এতে ছিল একটি তাপমান যন্ত্র, একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র এবং একটি ক্যামেরা। ঊর্ধ্বাকাশে গবেষণা চালনার জন্যেই তিনি এই ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৫-এর ২৮শে মার্চ গডার্ড যে রকেটটি উৎক্ষেপ করেন, আধুনিক রকেট পরিকল্পনায় তার প্রভাব অনেক বেশী।

এদিকে ১৯১৭র সোস্যালিস্ট আন্দোলনের পর ওয়াই ভি কনড্রাতুক রকেট পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে ১৯২৯-এর মধ্যে জিওলকভসকি তত্ত্বকে পরিবর্ধিত করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। আর তারপরই সোভিয়েত দেশে প্রথম তরল জ্বালানি-চালিত জেট ইঞ্জিন তৈরি করলেন জানডার। গ্যাসোলিন এবং বাতাসে চালিত ও আর-১ তাঁর ইঞ্জিনটি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করলো। পরে জাণ্ডার একটি শক্তিশালী রকেটও তৈরি করেন। জ্বালানি হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল এবং তরল অক্সিজেন। ওজন ৬৫ পাউণ্ড। লম্বা ৭·২ ফুট। ব্যাস ৫·৫ ইঞ্চি। এটি ৩·৪ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বাকাশে উঠেছিল।

এর পর চলতে লাগল দ্রুত সংস্কার। ১৯৩০-এ একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন টেট্রোকসাইড, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, টেট্রানাইট্রো মিথেন এবং পারক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণ রকেট ইঞ্জিনের অক্সিজেন সরবরাহকরূপে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। অবশেষে ১৯শে মে, ১৯৩৯-এ সোভিয়েত দেশের প্রথম বহুস্তর-বিশিষ্ট রকেট মহাকাশে পাঠিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মারকুলভ। মারকুলভের পরীক্ষা এই প্রথম মহাকাশযাত্রাকে সহজতর করার পথ প্রদর্শন করল।

কিন্তু আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে রকেট নিয়ে মানুষ একদিন পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল এবং বিভিন্ন গবেষণাক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল তাকে নিয়ে এবার শুরু হল সমরসজ্জা। নতুন ধরনের উচ্চ তাপ এবং চাপ সহ সংকর ধাতু তৈরি হল। পরীক্ষা চলতে লাগল আরও নতুন বিস্ফোরক জ্বালানির সন্ধানে, গতির পাল্লাকে বৃদ্ধি করার প্রয়াসে। এই সময়ে বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে দু' ধরনের রকেট সবচাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল তারা হল ভি-২ এবং 'রাইনবোটে'। এদের তখন ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এই 'রাইনবোটে' রকেটটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৩৭ ফুট লম্বা এই ত্রি-স্তর রকেটটিকে ঠেলে তোলার জন্যে বুস্টার ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি ডাই গ্লাইকল-ডাইনাইট্রেট। তিনটি স্তরের একটির জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে বিশেষ এক ধরনের বিস্ফোরক চূর্ণ এবং নাইট্রোগ্লিসারিনের সাহায্যে অপরটিতে আগুন ধরানর ব্যবস্থা ছিল। অগ্রভাগের অংশটি লম্বায় ছিল তেরো ফুট। ব্যাস ৭·৫ ইঞ্চি। আগুন ধরার সাড়ে পঁচিশ সেকেণ্ডের মধ্যে এর গতিবেগ দাঁড়াত সেকেণ্ডে এক মাইল। দূরত্ব অতিক্রম করত ১৩৭ মাইল। আধুনিক মহাকাশযানে যে রকেট ব্যবহার করা হয় 'রাইনবোটে' এবং ভি-২। তারই পূর্বপুরুষ। ভি-২র অন্যতম উদ্ভাবক ওয়ারনহার ফন ব্রাউন। বর্তমানে মারকিন মহাকাশ গবেষণার তিনি অন্যতম নায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার পর মহাকাশ গবেষণার প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে। আর তখনই শুরু হল,

মহাকাশযাত্রার আধুনিক যুগ। জুল-ভার্ন-এর কল্পকাহিনীর বাস্তব চিত্রকররা এগিয়ে এলেন মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে রূপ দিতে। এই প্রথম ব্যাপকভাবে সোভিয়েত দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স মহাকাশ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেন আরও অনেকে। মানুষের মহাকাশযাত্রার কথা তখনও কেউ ভাবেন নি। এ'দের তখন প্রথম লক্ষ্য দূরাকাশে রকেট পাঠিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং বিভিন্ন ব্যাপারের ওপর গবেষণা চালান। আর সেই সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কল্যাণকর কাজে হাত দেবেন।

১৯৪৭-এ ভাইকিং এবং এরোরবি রকেটের নাম প্রকাশ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৬তে একটি এরোরবি অদ্ভুত একটি তথ্য পাঠান ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে। আমাদের চারপাশে যে বাতাস রয়েছে তার মধ্যেকার অক্সিজেন অণু গঠন করে থাকে। অর্থাৎ সব সময় দুটি করে অক্সিজেন পরমাণু একত্রে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। রাসায়নিক নিয়মে এটাই বিধের। কিন্তু ঊর্ধ্বাকাশে সৌরশক্তি বাতাসের সেই অণুকে ভেঙে পরমাণুতে পরিণত করে। সেখানে তাই পারমাণবিক অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী। এই তথ্য ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান যোগাল। এই তথ্য পরবর্তী কালে নানাভাবে নভোচরদের সাহায্য করেছে।

॥ দুই ॥

অক্টোবর ৪, ১৯৫৭। সেদিন পৃথিবীর প্রতিটি সংবাদপত্রের হেড লাইন : সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করলেন স্পুটনিক-১। মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পঁয়ষট্টি ডিগ্রী উত্তর আকাশে বিচরণ করছে। আর তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে অবিরাম বিপ, বিপ, বিপ...! মার্কিন মুলুকের অন্যতম টেলিভিশন সংস্থা সংক্ষেপে এই সংবাদটি পরিবেশন করার পর মন্তব্য করলেন, 'শব্দটা যেন একটি ঝিঁ ঝিঁ পোকার ধরা গলার ডাক।' আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সাফল্যে বিস্মিতও যেমন হয়েছিল, সেই সঙ্গে ভীতও। পৃথিবীর হাটে মর্যাদার লড়াই-এ এ যেন তার প্রচণ্ড পরাজয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তখন অদম্য কৌতূহল। সকলের মুখেই এক জিজ্ঞাসা : একশ চুরাশি পাউণ্ডের অত বড় গোলকটি কি করে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে? নতুন এই চাঁদ কি আমাদের পুরনো চাঁদের মত আলো দিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, হ্যাঁ, পারে। কিন্তু চাঁদের মত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাটা? বিজ্ঞানীরা বললেন, এ তো বহু পুরনো কথা। নিউটনই তো বলেছিলেন চাঁদ কি করে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

বস্তুতঃ, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিক' গ্রন্থে উপগ্রহের কক্ষপথ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন গাণিতিক হিসেব ধরে। তাঁর মূল বক্তব্য হল, কোন বস্তুকে যদি ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে গিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরাল তলে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে ধাক্কা মেরে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ বস্তুটি পৃথিবীর চারপাশে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পথে চিরদিন আবর্তন করবে উপগ্রহের মত। নিউটন এই গতিবেগের নাম দেন 'সারকুলার ভেলোসিটি' বা বৃত্তীয় গতিবেগ। তিনি অবশ্য ধরে নিয়েছিলেন পৃথিবী পুরোপুরি গোল, যদিও পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে এটা ঠিক নয়।

পৃথিবীর কাছ থেকে এত প্রচণ্ড বেগে চলার সব চাইতে বড় বাধা হল বায়ুস্তর। বাতাসের ঘর্ষণে বস্তুটির গতিবেগ কমে যায় এবং অবশেষে কক্ষচ্যুত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর নেমে আসে। তাছাড়া অত বেগে চলায় বাতাসের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হয়ে বস্তুটি পুড়েও যেতে পারে। নিউটন বললেন, এই ঘর্ষণের হাত থেকে বাঁচানর জন্যে উপগ্রহকে অন্ততপক্ষে একশ পঞ্চাশ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপ করতে হবে। এতটা ওপরে তুলেই তাকে ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল করে নিক্ষেপ করা দরকার। এখানে বাতাস হাল্কা। তাই ঘর্ষণ অনেক কম হবে। পৃথিবীর আকর্ষণও কম।

অতএব বৃত্তীয় গতিবেগও কম হলে চলবে। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক হাজার মাইল ওপরে বৃত্তীয় গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪·৪ মাইল হলেই চলে। আর ৭৭০০ মাইল ঊর্ধাকাশে সেটা ২·৯ মাইলে গিয়ে দাঁড়ায়। আর পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে কোন বস্তুকে যদি দূরে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তাকে ঐ একই ভাবে আকাশে তুলে ভূ-তলের সমান্তরাল করে ছুঁড়ে দিতে হবে সেকেণ্ডে সাত মাইলের বেশি গতিবেগ দিয়ে। অতএব তত্ত্বের দিক দিয়ে মহাকাশে কৃত্রিম-উপগ্রহ স্থাপন করা বা দূরে নভোমাঝে মহাকাশ যান পাঠান তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

তবু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হল সত্যিকার সাফল্যের অপেক্ষায়। কারণ পৃথিবীর অভিকর্ষ সীমা পর্যন্ত মাত্র এক পাউণ্ড বস্তুকে পাঠাতে গেলেই প্রয়োজন ১৭০ পাউণ্ডের মত জ্বালানি।

১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে সুদূর মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে কিভাবে গবেষণা চালান যায় তার ওপর একটি আলোচনাচক্র বসে। উপস্থিত বহু বিজ্ঞানী সেদিন রুদ্ধশ্বাসে সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেও অনেকেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেননি। ব্যাপারটা আবার তোলা হয় ১৯৫৪-তে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বৎসর সম্মেলনে। ভূ-পদার্থ-বৎসর কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল, পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল, মহাকাশের সুদূরতম অঞ্চল থেকে জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক সমস্যা প্রভৃতির ওপর গবেষণা চালান। কিন্তু সেদিনও কেউ মনে করতে পারেননি, কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা খুব সহজ কাজ হবে। অবশেষে ১৯৫৫-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম প্রকাশ করলেন প্রজেক্ট ভ্যানগার্ডের কথা। বলা হল, ১৯৫৮র মধ্যে কুড়ি পাউণ্ড ওজনের কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তাঁরা মহাকাশে স্থাপন করবেন। দু' বছর ধরে চলল দারুন প্রচারকার্য। 'ভ্যানগার্ডের' রকেটটি কেমন হবে, উপগ্রহটিই বা কিভাবে আবর্তন করবে, কি কি অসুবিধের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, এমন নানান ব্যাপারের ওপর চলল হাজারো আলোচনা। অথচ এক দিকে যখন সাজ সাজ রব, তখন ভল্গা নদীর পাশের মানুষ নীরব। এই সময় সোভিয়েত দেশ রুশ ভাষায় সংক্ষেপে শুধু একটি সংবাদ প্রচার করলেন : '১৯৫৭-৫৮তে মহাকাশে তাঁরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করবেন।' ব্যস। এরপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

তবে ভ্যানগার্ডের ব্যাপারটা সোভিয়েত বিজ্ঞানপত্র 'এভিয়েশন উইক'-এ আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কাইরিন স্ট্যান্যুকোভিচ একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, পশ্চিমী সংবাদপত্রে আপাতত যে ধরনের

ডঃ ফন ব্রাউন একটি রকেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

কৃত্রিম উপগ্রহের কথা বলা হচ্ছে, তার চেয়েও বড় কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করা কঠিন কিছু নয়।' এতে পরিষ্কার বোঝা গেল, সাড়া শব্দ না করলেও সোভিয়েত দেশ একেবারে থেমে নেই। আর অবশেষে সত্যি সত্যিই ১৯৫৭র ১০ই জুন রুশ কর্তৃপক্ষ বেলজিয়ামে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বৎসর সংস্থার প্রধানকে একটি নোটে জানালেন, তাঁরা প্রস্তুত। ঐ বছরেই তাঁরা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করবেন। ওরা আগস্ট মাসে এটার সংবাদ দিল, অধ্যাপক এভজেনি ফাইয়েডেরভকে সোভিয়েত দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থার প্রধান রূপে নির্বাচিত করা হয়েছে।

অবশেষে ১৯৫৭তে এল সেই যুগসন্ধিক্ষণ। দানবাকার রকেট তৈরি করলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। তারই ডগায় চড়ে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুতনিক-১ বিশ্ববাসীকে চমকিত করে আকাশে উঠে গেল। ঠিক কি ধরনের রকেটের সাহায্যে এটিকে উৎক্ষেপ করা হয়, সে খবর এখনও অজানা। তবে আকাশে উঠেই উপগ্রহটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সম্মুখ ভাগে থাকে তেইশ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮৪ পাউণ্ডের একটি গোলক। এরই নাম স্পুতনিক-১। স্পুতনিক-১ এর পেছনে পেছনে চলতে থাকে যার সাহায্যে সেটিকে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল সেই রকেটটি। আর গোলকের সম্মুখে যেন একটা খোলা সুঁচলো ঢাকনার মত চলতে থাকে আর একটি অংশ। আকাশে ওঠার সময় বাতাসের ঘর্ষণ জনিত তাপে যাতে স্পুতনিক-১ পুড়ে না যায় তার জন্যে গোড়ার দিকে এই সুঁচলো ঢাকনাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। উপবৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করার সময় এটি যখন পৃথিবীর নিকটতম স্থানে এগিয়ে আসে তখন তার দূরত্ব ছিল ১৩৬ মাইল এবং দূরবর্তীতম স্থানে সরে গেলে ঐ দূরত্ব দাঁড়ায় ৫৮৫ মাইল। পরে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে স্পুতনিক-১-এর গতিবেগ ক্রমেই কমে আসতে থাকে, ওদিকে রাসায়নিক তড়িৎ কোষের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেই বিপ, বিপ...বেতার সংকেতও তিন সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। শেষে ১৯৫৮র ৪ঠা জানুয়ারী শেষবারের মত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে স্পুতনিক-১ বায়ুমণ্ডলের চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

প্রথম সাফল্যের উত্তেজনা না কাটতেই আবার চমক। মাত্র এক মাস পরে, ৩রা নভেম্বর সোভিয়েত দেশ আকাশে তুলল স্পুতনিক-২। আরও বড়। ওজন ১১২০ পাউণ্ড। বিভিন্ন পরীক্ষা চালনার জন্যে জটিল যন্ত্রপাতি ছাড়াও এবারকার অভিযানে সত্যি সত্যিই অংশ গ্রহণ করল একজন জীবিত অভিযাত্রী। মহাকাশের বুকে প্রথম নভোচর লাইকা মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহে বসে বিচরণ করতে লাগল।

লাইকা কুকুর হলেও একজন বিজ্ঞানীর মত মহাকাশের নিয়ম মেনে কাজ করেছিল। উপগ্রহের কক্ষে বিশুদ্ধ বাতাস রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যে। বিশেষ এক ধরনের পাম্পের সাহায্যে তার দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আর জিলেটিনের মত খাবার খাইয়ে তাকে সুস্থ রাখা হয়। তার দৈহিক, মানসিক এবং কাজকর্মের যাবতীয় খবর বেতার সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীর গবেষণাগারে নিয়মিত পৌঁছতে থাকে। মোট কথা মহাকাশে মানুষের নিরাপত্তার জন্যে যা যা তথ্য জানা দরকার তার অনেক কিছুই সরবরাহ করল লাইকা। অবশেষে অক্সিজেন গেল কমে। হয়ত বা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে দৈহিক ক্ষমতাও লোপ পেল। যে বহু আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর বিজ্ঞানীদের ব্যস্ত করে রেখেছিল, একদিন আর তা শোনা গেল না। মুহূর্তে বেতার সংকেত এল, লাইকা আর নেই। প্রথম নভোচর লাইকা। মহাকাশ অভিযানের প্রথম শহীদ লাইকা।

স্পুতনিক-২-এর পরীক্ষায় মহাকাশে জীবদেহের ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নতুন তথ্য ছাড়াও সূর্যের বিকিরণ ক্ষমতা, মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা এবং ঊর্ধাকাশে বাতাসের চাপের ওপর অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তবে গোড়া থেকেই সোভিয়েত

বিজ্ঞানীরা উৎক্ষেপণ সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ আগে থেকে সরবরাহ করেননি। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য বা গবেষণার পর পাওয়া কোন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে সব সময়ই প্রায় নীরব থেকে গেছেন।

স্পুটনিক-২-এর ঐতিহাসিক উৎক্ষেপণের পর ১৯৫৮র ১লা ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে প্রথম গর্জন শোনা গেল জুপিটার-সি রকেটের। সেদিন গ্রিনিচ মিন টাইম সকাল তিনটে বেজে আটচল্লিশ মিনিটে মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছল মার্কিন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১। তার পরই একে একে এক্সপ্লোরার ২, ৩, ৪। বিলম্বিত এ যাত্রা। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিপক্ষ সোভিয়েতের মধ্যেকার ব্যবধান প্রচণ্ড বেগে কমিয়ে আনল।

১৯৫৮তে এক্সপ্লোরার-১ আবিষ্কার করল 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'। পৃথিবীকে ঘিরে ঊর্ধ্বাকাশে একটি পুরু আবরণীর মত এই বেল্ট একটি আচ্ছাদন সৃষ্টি করে অবস্থান করছে। চল্লিশ ডিগ্রী উত্তর এবং চল্লিশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিস্তৃত এই আচ্ছাদন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সূর্য থেকে বিকিরিত ইলেকট্রন এবং প্রোটন কণিকাদের নিরন্তর শোষণ করে নেয় বলেই অত্যন্ত ক্ষতিকর ঐ কণিকাদের হাত থেকে জীবজগত রক্ষা পায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল। পুরুত্ব প্রায় ততটা। কিন্তু একটি নয়, আরও একটি 'ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট'-এর সন্ধান পেল এক্সপ্লোরার-৩। এটির দূরত্ব প্রায় চার হাজার মাইল। তবে প্রথমটির মত এটি তেমন জোরাল নয়। ইলেকট্রন বা প্রোটনকে ধরে রাখার ক্ষমতাও এর মাঝে মাঝে হ্রাস পায়। কখনও বা অন্তর্হিতও হয়ে পড়ে।

গোড়ার দিকে 'এই ভ্যান অ্যালেন বেল্ট' একটি মস্ত সমস্যা রূপে পরিগণিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেছিলেন, দূরে আকাশের যাত্রীকে যদি বেতার তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, তাহলে সেই তরঙ্গ ঐ আচ্ছাদন শোষণ করে নিতে পারে। তথ্য সরবরাহ, মহাকাশযান এবং তার বিভিন্ন যন্ত্রাবলীর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এটা একটা বিরাট বাধা স্বরূপ। সুখের কথা, পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট-এর ভেতর দিয়ে বেতার তরঙ্গ গতায়াত করতে পারে।

এরপর এল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার কথা। মহাকাশে যে যানে মানুষ বা অপর কোন প্রাণী বাস করবে, তাকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন গবেষণা কার্যের পরিচালনা, পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ, এমন কি প্রয়োজনে নভোচরকে ঘুম পাড়ান বা জাগিয়ে তোলা, তার জন্যে চাই প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি। এ ব্যাপারে গোড়ার দিকে মার্কিন এবং সোভিয়েত দেশের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে নিকেল-ক্যাডমিয়ামের মত সঞ্চয়ক তড়িৎ কোষ ব্যবহার করা হয়। পরে সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারটা সহজ হওয়ায় সে সমস্যাটিও দূর করা সম্ভব হল।

কিন্তু তখনও প্রশ্ন হাজারো। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে সমৃদ্ধ এই যে জীবন, মহাকাশ যানের কৃত্রিমতার মধ্যে সে কি বেঁচে থাকতে পারবে? ১৮ আগস্ট, ১৯৫৮তে তৈরি হল 'ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যান্ড স্পেস এডমিনিস্ট্রেশন' বা 'নাসা।' অনুরূপ একটি সংস্থা সোভিয়েত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষকে মহাকাশে পাঠানর ব্যাপারে নানারকম অনুসন্ধান এবং পরীক্ষাকার্য চালাতে শুরু করলেন এঁরা। মহাজাগতিক রশ্মি বা ভাসমান উল্কাপিণ্ড কোন ক্ষতি করতে পারে কিনা সেটাও দেখতে লাগলেন। মানুষ যখন মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তার মানসিক এবং দৈহিক অবস্থা যাতে স্বাভাবিক থাকে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হল। এরই জন্যে সোভিয়েত দেশ লাইকাকে মহাকাশে পাঠান।

মানুষ পারে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

না, আর কখনো আমি ব্যবহার করবো না তোমাকে'
শিশুকে মধুর মিথ্যাও শেখানো পাপ
তাই আমি আকাশ শেখাতে গিয়ে
আর কখনোই পুনর্বিবেচনা করবো না পূর্ণিমা।
পূর্ণিমা শব্দটি বড় মুগ্ধকর, কেননা সেখানে আজও এক
"মা" মিশে রয়েছে।
একদিন, সেই কবে বহুদিন
আগে, আমার মা প্রতি চান্দ্রসন্ধ্যাবেলা সংসার থামিয়ে এসে
মল্লিকা, টগর, করবীর সমবেত সুগন্ধের
ভিতর আমাকে কোলে নিয়ে বাইরে দাঁড়াতেন; আমি
মাকে ভীষণ বিশ্বাস করে ভাবতাম
একদিন নিশ্চয়ই চাঁদ টিপ দিয়ে যাবে।
অথচ এখনো আমার কপাল খালি পড়ে আছে,
শুধু খণ্ড খণ্ড কলকাতার নীলিমায় তাকিয়ে ভাবছি আমার শিশুকে
আমি কোন নতুন খেলার সঙ্গী খুঁজে দেবো শূন্যে!

শিশুকে মধুর মিথ্যাও শেখানো পাপ
না হ'লে বলতাম দেবতা যা পারে না, মানুষ
তা পারে। আনন্দে পদানত জ্যোৎস্নাকে কাঁপিয়ে তীব্র
শেষ বলে উঠতে পারে "কোথায় কোথায়
তুমি, হে দেবতাশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর? আমরা
পাথর, গহ্বর, ধুলো ছাড়া
কেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখানে?"

স্বপ্নের চাঁদের মৃত্যুতে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর প্রথমতম কবিতা চাঁদকে নিয়েই লিখেছিল
আদিম মানুষ;
তারপর যুগযুগান্তর ধরে ইতিহাস হেঁটে গেছে,
কত যুগল স্বপ্নের প্রতীক এই চাঁদ,
তাকে একক ভাবাই যায় না কখনো;
একজনের হৃদয়ে চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে
প্রতিফলিত আরেকজন:
কত দ্বৈত সঙ্গীত, কত দ্বৈত কূজন,
কত দ্বৈত শিহরনের সাক্ষী আর উৎস
এই চাঁদকে আমরা হারালাম একুশে জুলাই,
—আমাদের স্বপ্নের চাঁদের মৃত্যু হল।

আমরা পৃথিবীর মানুষের পক্ষ থেকে
একটা ফলক রেখে এসেছি তার বুকে,
স্মারক হিসেবে।

হে নীল আরমস্টং তোমার আরেকটা ফলকও
রেখে আসা উচিত ছিল
কবিদের তরফ থেকে;
এবং আরেকটা শবাধার,
যাতে থাকতো হাজার হাজার বছর ধরে
চাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা কবিদের সমস্ত গান ও কবিতা।
পরিচিতির ফলকটাতে লেখা থাকতো,
'হে চাঁদ তোমাকে ঘিরে
আমাদের স্বপ্ন যত সব
শেষ হল; এইখানে রাখা থাক্
সঞ্চিত কবিতার শব,
তোমার জ্যোৎস্নার রঙে আমরা অবাধ
কলম ডুবিয়ে এতদিন যা গিয়েছি লিখে,
জানি আর ভাঙবে না তোমার হাসির ওই বাঁধ,
আর কোনদিন কোন কবির নিরিখে।'

川端康成

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক **ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা**

ইন্দ্রধনু

॥ আট ॥

সে রাতে গিনকো কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটঘরে ফিরে এল না। ইতিপূর্বে অভিনয়ের কাজে কোনো দিন সে অনুপস্থিত হয়নি, মহড়ার সময় কখনো সে বিলম্বও করে নি। এ যে তার সময়ানুবর্তিতা—তা নয়, বরং ঘরের বাইরে কোথাও বেরোতেই সে আলস্য বোধ করতো।

মহড়ার কাজ শেষ করে আয়াকো যখন রাস্তায় বেরুলো তখন ভোর হয়ে গেছে। পথের ভিখিরীরা খাবার দোকানের পেছন দিকের দরজা থেকে আগের দিনের বাসী খাবারগুলো কুড়িয়ে খাচ্ছে। প্রচন্ড শীতে তারা একেবারে কুঁকড়ে গেছে। এক আধ জায়গায় রোদের আলো এসে পড়তে শুরু করেছে। অবলোকেশ্বর মন্দিরের পায়রা-গুলো তাদের ডানা মেলে দিয়েছে সকালের আকাশে। রাত্রে মহড়ার কাজ শেষ করে ক্লান্ত তিনটি মেয়ে পরস্পরে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। প্রত্যেকেরই পোশাক এলোমেলো অবিন্যস্ত। পিচের রাস্তাগুলো গত রাতের শিশিরে এখনো ভেজা।

"আমাদের কিমুরাটি একটি বিচিত্র ধরনের মানুষ। ওর বোধ হয় শীতটিত বলে কিছু লাগে না।" ছোওকো একটু হেসে হাই তুলতে তুলতে বলল। "গিনকো না আসায় মেঝের ওপরে শুয়েই কিমুরা সারাটা রাত দিব্যি ঘুমিয়ে নিল। মেঝেতে ঠান্ডা লেগে যাবে ভেবে তুলে দিলাম। তখনই কিমুরা আমাকে বলল, নাটকের কাজ ছেড়ে দেবো ভাবছি; এর চেয়ে বিমানের চালক হয়ে আকাশে রামধনুর ভেতর দিয়ে উড়ে যেতেই আমার বেশী ইচ্ছে করে।"

"রামধনু! ওই ছেলে কোনো দিন রামধনু দেখেছে নাকি? ও মানুষ আবার আকাশে রামধনু দেখবে—অসম্ভব।" ফুজিকো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কথাগুলি বলল।

কিন্তু ছোওকো কিছু না ভেবেই একটু মজা করে বলল, "কিমুরা যদি এরোপ্লেন নিয়ে রামধনুর ভেতর ঢোকে, তা হলে অত আলোয় ও একেবারে ঝলসে যাবে।"

"প্লেনের চালক হতে গিয়ে কিমুরা মাটির তলায় রেলের কন্ডাক্টর হয়েছিল। মজার বটে।" এ কথা ব'লে আয়াকো মনে মনে হাসে।

কিন্তু ফুজিকো একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে, "ভাগ্য আর কি। গিনকো না আসায় নাকানে মশাইয়ের মেজাজটা প্রথম থেকেই তো তিরিক্ষি হয়ে ছিল।"

শহরের মাটি থেকে এখনো কুয়াশার সব পর্দা সরে যায় নি। নির্জন রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যেন বাতাসে ভেসে বেরিয়ে গেল।

শীতের রাত এখনো যেন কাটে নি মনে হয়। ঠান্ডা হাওয়ায় চারদিকে একেবারে জমে যাচ্ছে।

গিনকো এখনো ফিরেছে কিনা কে জানে। কাল রাতে যে তার কি হলো কেউ তা বুঝতে পারছে না।

রাস্তা থেকেই গিনকোর ঘরের কাচের দরজাটা দেখা যাচ্ছে। শিশিরে কাচগুলো ভেজা। তিনটি মেয়েই গিনকোর কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যায়। তারপর দরজা খুলেই—

"গিনকো—?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিনকোই তো!"

"হানাকোর সঙ্গে শুয়ে!"

"তবে মহড়ার সময় গেল না কেন—কি ব্যাপার?"

"মনে হচ্ছে, দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে।"

"গিনকো, এই গিনকো—।"

"থাক্, থাক্, ডেকো না।"

"কী সুন্দর!"

"ঘুমনোর সময় সত্যিই ওকে ভারি সুন্দর দেখায়।"

"ও কি নাটকের জামা পরেই শুয়েছে নাকি?"

"না না।"

"হানাকোর সঙ্গে তবে ফিরে এসেছে না-কি?"

"উঃকি কনকনে শীত রে বাবা!"

"কয়েকটা খবরের কাগজ যোগাড় করে একটু আগুন জ্বালাও না।"

"আরে কাগজ এখনে কোথায় পাবে?"

"এই খাটটা দেখতে কেমন যেন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে লাগে।"

"ঘরটাই বিচ্ছিরি।"

"গিনকো, গিনকো" বলে সবাই ডাকাডাকি আরম্ভ করে। হাঁকডাকে হানাকোর প্রথমে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলেই সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। তিনজনকে দেখে হানাকো ঘুম চোখেই একটু হাসে। তারপর পাশ ফিরে সে গিনকোকে জড়িয়ে শুতে গিয়েই হঠাং যেন চমকে উঠে বসে। খাটে থেকে সে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে চেঁচিয়ে

সেই নীরবতার মাঝে হানাকো গিনকোকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদতে শুরু করে

বলে, "গিনকোর গা যে বরফের মত ঠাণ্ডা!"

হানাকোর এ চীৎকারে কিছু না বুঝেই সকলে গিনকোর কপালে হাত দেয়।

সেটি ছিল গিনকোর শীতল মৃতদেহ।

কপালে হাত দিয়েই তারা দেখে একেবারে বরফ। তবু গায়ে ধাক্কা দিয়ে গিনকোর নাম ধরে তারা ডাকাডাকি চেঁচামেচি করতে থাকে। তারা কে যে কি কথা বলছে নিজেরাই বুঝতে পারে না।

কিমুরা যে কখন দরজার গোড়ায় শান্ত একটি হাওয়ার মত এসে দাঁড়ালো কেউ লক্ষ করল না।

"হানাকো, হানাকো, বলো গিনকোর এ কী হলো? তুমি তো ওর কাছেই শুয়েছিলে?"

"আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।"

"তুমি পাশে শুয়েছিলে, আর গিনকো কখন মারা গেল তুমি জান না?"

"আমার আসার আগে থেকেই তো গিনকো ঘুমিয়েছিল। একলাই ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে ডেকে বিরক্ত করব না ভেবেই—"

"আস্তে আস্তে পাশে শুয়ে পড়লে?"

হানাকো ঘাড় নাড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ।" হানাকোর চোখে ততক্ষণে জল নেমে এসেছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

এই দেখে অন্যেরাও একসঙ্গে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিল। সেই অবস্থাতেই 'পুলিস', 'ডাক্তার' ইত্যাদি বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আয়াকো বাইরে বেরোতে গিয়েই দরজার সামনে কিমুরার সঙ্গে ধাক্কা খায়।

"আরে!" রীতিমত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আয়াকো কিমুরার দিকে তাকায়। তারপর কড়া সুরে বলে, "কিভাবে এ ঘটলো?"

কিমুরা দু তিনবার অর্থহীনভাবে মাথা নাড়ায়।—"এ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই সকাল পর্যন্ত তো আমি স্টেজেই ছিলাম। সারাটা রাত গিনকোর জন্যই অপেক্ষা করে রইলাম।"

হানাকো মেঝেতে উবু হয়ে বসে কাঁপছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেয়ে খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে কি কুড়িয়ে আনলো। সেটা ছিল সাদা ওষুধের একটা ছিঁড়ে মোড়ক।

মোড়কটা দেখা মাত্র ছোওকো বললে, "এই মেয়েটাই মেরেছে—হানাকোই তবে বিষ খাইয়েছে।"

"না, না।" হানাকো চেঁচিয়ে আপত্তি করে। তারপর চোখ দুটো কুঁচকে কিমুরার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, "ওকেই আমি খুন করবো।"

সেই মুহূর্তে সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায়। সেই নীরবতায় মধ্যে হানাকো গিনকোকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদতে শুরু করে।

"না, না, হানাকো, ছেড়ে দাও"—বলে আয়াকো হানাকোর হাতটা গিনকোর গলা থেকে ছাড়িয়ে নিতে থাকে। আয়াকোর তখনো যেন মনে হয় গিনকো বেঁচে আছে।

"গিনকোর দেহের কি আবার ময়না তদন্ত হবে নাকি?"

"সত্যিই কি ও মারা গেছে? আর কি কোনো আশা নেই? ও কি আর বাঁচবে না?" বলতে বলতে ছোওকো আয়াকোর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গিনকোর দিকে তাকায়।

কিন্তু ছোওকোর এ সব কোনো কথাই আয়াকোর কানে যায় না। সে পুলিস, ময়না তদন্ত ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে গিনকোর আরো কাছে উঠে বসে। তারপর লেপের মধ্যে গিনকোর বুক থেকে পা পর্যন্ত আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেখে, কোথায় এতটুকু কোনো এলোমেলো ভাব নেই। এই দেখেই আয়াকোর মনে পড়ে যায়—ঘুমোনোর সময় গিনকোর দেহভঙ্গী তারি সুন্দর দেখাতো। এ কথা মনে পড়া মাত্র কেন জানি না, সব যেন বুঝতে পেরে গেছি বলে আয়াকোর মনে হয়। আকুল হয়ে সে আবার গিনকোকে জড়িয়ে ধরে।

কিমুরা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

জানলার সাদা পর্দাগুলোই শুধু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু সকালের আলো এখনো ঘরে এসে পৌঁছোয় নি।

(সমাপ্ত)

অনুবাদ

কাদুও আদুয়ে ঃ [illegible]

শ্যামগঞ্জের বড় সরদার

উনিশ শো আটাশ সালে চটকল বসল শ্যামগঞ্জে—হুগলী নদীর আড়-বাঁধির ওপরে। দিনদুপুরে মড়া নিয়ে টানাটানি করত শিয়ালে, তিন কটকের পোলের পাশে—পুটেখালির খোলে। হরকোচ, গেঁয়ো, কেওটাল, কালীজনসা, বিল-বনদুর্বানি, বাজ-বরণ, লঙ্কাসিয়ে, আশ-শ্যাওড়া, হাটাং, জীবনন্ত, বনকাপাসের জঙ্গল ছিল নদীর ধার দিয়ে বরাবর। একলা যেতে গা শিউরে উঠত। শনি-মঙ্গলবারের হাট বসত শ্যামগঞ্জে। খটির নৌকো থেকে ধান, কাটাল কিনত লোকজন। বাক্‌সীর দোকো ন্যাকচা বেগুন আসত হাটে। এক পয়সা সের। আসত হালি শহরের কুমড়ো। একটা আধমণ কুমড়ো—থোকো দাম দু' আনা। ধান দু' টাকা চার আনা মণ। তখন চারটে করে জন-মজুর টাকায়। দেড় সের সাত-পো একটা ইলিশ এক আনায়। ষোলটা ইলিশ টাকায়। শ্যামগঞ্জের বাজারে ইলিশের 'টাল' দিত জেলেরা। মাক্কোর নৌকো ভাসত নদীতে। নদীর ঘোলাজলে লালচে-হয়ে-যাওয়া-গামছার-কৌপীন-আঁটা-ভিজে গা কালো-চেহারার জেলেরা লাল চোখ মেলে বসে বসে হাটের মাঝখানেই তাড়ি খেত, গাঁজা টানত। মাছি ভিনভিন করত পাকা আম কাঁটালের গায়ে। একটা টাকা ট্যাঁকে খুঁসে নিয়ে হাটে এলে তিন বাপ-ব্যাটায় সেই পয়সার মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারত না।'

'এমন আকালের দিন তখন ছিল না।' —কথা বলে আব্বাস হালদার। ছ-ফুটের ওপর দীর্ঘ চেহারা বুড়োর। বয়স এখন নাকি তিন কুড়ি দশ। কি চার কুড়িও হতে পারে। কে আর গুণে রেখেছে। বাপ ছিল মুর্খ। সুন্দরবন কেটে তারা বসত করেছিল এখানে। নিজের হাতে কত গন্ডা বাঘ মেরেছে নাকি তারা।...'শ্যামগঞ্জে চটকল বসতে মোরা কাজ শিখতে গেনু। মুই তখন জোয়ান। মোর ভাইপো সিরাজটাকে নিয়ে যেতুম কাজ শিখতে। বড় সায়েব 'তলায়' যখন জুতো মসমসিয়ে আসত চার-দিকে চেয়ে চেয়ে, মুই তখন সিরাজকে সরদারের হুকুমে বড় একটা 'বাই ঝোড়া' চাপা দিয়ে রাখতুম। সায়েব কাছে এলে ছুটে যেয়ে সালাম দিতুম। সেই সিরাজ, নবা, বক্কে, রহমান, আজাহার সবাই 'সার-পোষ' (সার্ভিস) 'পেনসিল' (পেনসন) পেয়ে বুড়ো-হাবড়া হয়ে মরে গেল।' সবাইয়ের মাগছেলে ভেসে গেছে। দেনার দায়ে বেচারীরা কাবুলীর হাতে মার খেয়ে মরেছে। "মুই শুধু এখনো আছি। মোর 'সাম্‌নে' কত ম্যানেজার, কত বাবু এল গেল, চটকলের বয়েস হল চাল্লিশ বছর, তবু আমাকে কেউ ভোলে না। আমি পয়লা 'ইসপিনে' কাজ শিখি। তাপ্তি মেরে নলি খোলা হাতের তেলো দিয়ে 'টেকো' ধরে হাতে পায়ে বাঁদরের মতন কড়া পড়ে গেল। তখন 'হপ্তা' ছিল তিন টাকা চোদ্দ আনা। ছ-বছর পরে এনু 'দেয়ানে', সেখান থেকে 'বিমে'। হার্ডিকল, ষাড়কল, পাঁজচাপা, রোপিং, বোপিন, ফুকোনলি, ইস্পিনিং, দেয়ান, বিম, তাঁত সব 'ডিপারটের'ই কাজ আমি জানি। আমি হয়ে গেনু বড় সরদার। দেশ স্বাধীন হবার আগে। সারা কারখানায় একশো জন সরদার—তার ওপরে বড় সরদার আমি। কত নাম। কেরানী বাবুরা আমাকে সালাম করত। আমি যার কথা বলব তাকেই কাজ দিতে হবে। বড়বাবু বললেও আমি 'কাজ

পড় তো পড় একেবারে লাল-মুখো ইংরেজ ম্যানেজারের সামনে

জানে না' বলে 'খাঁকচ' করে দিতে পারতুম। ম্যানেজার সায়েব আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার লোকের হদ্দ-হদিস নিত। বাবুদের সম্বন্ধেও আমার 'রিপোর্ট'ই চূড়ান্ত। কে কেমন চুরি করে, কোন্ সরদার তার নিজের ঘরের কাজে কত জন কলাতু লোক রাখে, কত গাঁট পাট এল, কত গাঁট চট প্যাকিং হয়ে ক্রেন দিয়ে জাহাজে নামল আব্বাস আলীর ছিল সব নখদর্পণে। তার চোখ কান এড়াতে পারত না কেউ।'

হালদারের পিটপিটে চোখ দুটো দেখলে সে যে বুদ্ধিমান তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ভুরু দুটো তার পেকেছে, পেকেছে মাথার অর্ধেক চুল আর দাড়িগুলো। আব্বাস আলীর হাতে রুপো বাঁধানো দামী ছড়ি। এখন তার দোতলা পাকা বাড়ি। হজ করে এসেছে মক্কা থেকে। আজ গাঁয়ে একটা সালিশি বসলে ডাকে সেই 'আব্বাস হাজীকে'।

অথচ...

"একদিন ছিল আমার তালপাতায় কুঁড়ে। বর্ষাকালে মাটি-কাদার মেঝে থেকে কেঁচো উঠত। বুড়ী মা ভিজে জুবুথুবু হয়ে বকের মতন বসে থাকত সারা রাত জেগে। একটা হাজ ছিল না। ছিল মা একটা 'হেরকেন' (হ্যারিকেন)। মা পরের বাড়ি ঢেঁকি ঠেঙিয়ে যে এক-আধ মুঠো 'খুদ' পেত তার জাউ খেয়ে কলে যেতুম। একদিন খুব পানি হচ্ছে, মানপাতা মাথায় দিয়ে কারখানায় গেছি, আর পড় তো পড় শালা একেবারে লাল-মুখো ইংরেজ ম্যানে-জারের সামনে। সায়েব কাছে এল। পাতাটায় হাত দিয়ে দেখলে। নীল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার তো পরাণ খাঁচা ছাড়া। পাতাটা নিয়ে সায়েব তার কুঠিতে চলে গেল। ভাবনু, মহা অপরাধ করেছি। কারখানার 'ভিতরে' কেন শালার মানপাতা 'লেস্তে' (নিয়ে+আসতে) গেনু মুই! চাকরিটা আমার যাবে!"

'বেলা নটার সময় দেখি মোরা সায়েব কারখানায় এসে ঢুকেছে। সবলোকের পাশে পাশে যাচ্ছে, ডমডম করে কাকে যেন খুঁজছে! শেষে আমাকে দেখতে পেলে। আমার দিকে এগোতেই, ওরে বাপ—দে শালা দৌড়...বিমের পেছনে লুকোলুম। সায়েব ঠিক এসে ধরল আমাকে, মোরগ যেমন ছুটে এসে ধরে মুরগিকে—আর খোঁপর বসায় তার মাথায়—আর পাকড়াও করে নিজের আয়ত্তে।...আমার পচা ময়লা ঘাম-ভেজা মবে-ধরা জামার কলার ধরে নীল-চোখো লাল-মুখো সায়েব টেনে আনলে অফিসে। নিজের খাস-কামরায়। বড়বাবু পিয়ারীলালকে ঘন্টা বাজিয়ে ডেকে

পাঠালে। বাব্র বড় বড় গোঁফ। খই ফোটার মতন চড়বড় করে ইংরিজি বলে সে। সায়েব তাকে মানপাতাটা দেখিয়ে শুধোলে—'হুট ইস দিস?' বাব্ বললে, 'ইট ইস্ মানপাতা!' সায়েব আমাকে ইশারা করে দেখালে, বাব্ মারতে গেল।—'ব্যাটা বাঁদর, কারখানার ভেতরে কে তোকে মানপাতা আনতে বললে!'...আমি 'কসুর হয়েছে' বলে হাতজোড় করে মাফ চাইলুম। সায়েব তখন বাবুকে 'ড্যাম ফুলিস' বলে গাল দিয়ে বোধহয় আমার সব কিছু জানতে চাইলে। নামধাম। কিসে কাজ করি। বছরে কদিন কামাই। বাব্ খাতা দেখে এসে বললে, মিল পত্তনি থেকে কাজ করছে, একদিনও কামাই নেই! নাম [illegible] আলী হালদার। মোহামেডান!'

'হ্যাং ইওর মহামেডান!' সায়েব খুশী। নীল চোখ নাচিয়ে [illegible]। বললে, 'তুমার ছাতা নাই?'

'না হুজুর বাবা!'

'তুমার আউর কে আছে?'

'মা—[illegible]!'

'[illegible]?'

'[illegible] নাই [illegible] হত [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]!'

বাব্ সব [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

সায়েবের [illegible] [illegible] আমাকে। কুঠি-[illegible] নিয়ে চলল। [illegible] সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। [illegible] কাপড় জামা কিনবার টাকা দিলে। সরদার করে দিলে। দশ টাকা '[illegible]' [illegible]। উপরি আরো দশ টাকা—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চললে

মেয়েটার ছবি তুলছে সাহেব

দিত সরকারের নজরানা। একদিন সায়েব কলকাতায় যাবে—ঘোড়ার গাড়ির কোচে উঠে বসতেই গাড়ি টগবগিয়ে গেট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি, সায়েব ব্যাগ ফেলে গেছে। চেন টেনে দেখি অনেক টাকা। টাকার বাণ্ডিল। ছুটলুম সায়েবের গাড়ির পেছনে। অনেক দূর যেয়ে চেঁচামেচি করে তবে ধরনু। সায়েব নেমে এল। ব্যাগ দেখে অবাক। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল। আমি হয়ে গেনু গোটা মিলের মধ্যে—শ্যামগঞ্জের বড় সরদার।

তারপর সেই সায়েব এল আমার বাড়ি দেখতে। নাম তার হেনরী মিচেল। এই তিরিশ বিঘে বাস্তু ভাঙা কিনে দিয়ে গেল তিন হাজার টাকা দিয়ে। দোতলা পাকা বাড়ি সেই বেঁধে দেবার খরচ জোগালে। মিচেল ছিল আমুদে লোক। আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। হেঁটে হেঁটে গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় যেতাম। রামপুর, কাশী-পুর, আলমপুর, হাঁসনাচা, আমিপুর, রাজিবপুর, গদাখালি, নলদাঁড়ি কত গ্রামে যেতুম। ছেলেদের দেখলেই সায়েব নাচতে বলত তাদের সামনে পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে। তারপর ফটো তুলত। নথ নাকে কিম্বা নোলক নাকে কোনো মেয়েকে দেখলে সায়েব তাদের নথ নোলক ধরে নাড়া দিয়ে মজা করত। তার ভাষা তখন সব আমি বুঝতুম। একদিন হল কী জানো ভাই, গদাখালীর বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আসতে পারে না একটা কাদের অতি সুন্দরী বছর আঠারো বয়সের মেয়ে। সায়েবও বাঁশের সাঁকো পার হতে পারে না। আমি দুজনকে পার করে দিলুম। মেয়েটার ছবি তুললে সাহেব। মেয়েটি মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল আড়ে আড়ে। আর ব্যাটা সায়েব করলে কী তাকে 'কলকে' ফুলের বনটার পাশে ধরে চুমো খেয়ে দিলে। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে পালাল। দশটা টাকা দিয়ে আমি তার ঠিকানা জেনে নিলুম সায়েবের হুকুমে। তারপর মেম আমাকে সেই মেয়েটির ছবি দেখিয়ে বলেছিল, কে এই মেয়ে? সায়েব নাকি রোজ সন্ধ্যার পর লঞ্চ নিয়ে যায় কাটাখালির ঘাটে—প্রথম দিন সে মামার বাড়ি আসছিল—সেখানে লঞ্চে ওঠে মেয়েটি। তার মা বাপ জানে। তারা টাকা নেয়!'...

'মিচেল সায়েব বছর পনেরো থেকে দেশে চলে গেল। বিরাট বড়লোক তারা। বিলেতে বাড়ি গাড়ি ব্যবসা ছিল। তার একটা চিঠি আছে আমার কাছে।'

বুড়ো আব্বাস হালদারের সাত বেটা। সাতখানা ঘর তারা দখল করেছে। চিলে কোঠায় থাকে এখন বুড়ো। তোরঙ্গ থেকে সায়েবের চিঠিখানা বার করে এনে দেখালে। উপদেশ বাণী পাঠিয়েছে হেনরী মিচেল।

সূর্য ডুবে আসছে। ছাদে বসে লোটার-পানিতে 'অজু' করলে আব্বাস আলী। মাদুরী বিছিয়ে মগরেবের নামাজ পড়লে। দোওয়া-দরুদ পড়তে লাগল অনেকক্ষণ।

ছাদ থেকে শ্যামগঞ্জের গোটা মিলখানা স্পষ্ট দেখা যায়। বাদশাহ শাহজাহানের তাজমহল দেখার মতন আব্বাস আলী কারখানাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রতি শনিবার এখনো তাকে একবার যেতে হয়। বাবুরা চেয়ার দেয়। 'পেনসন' পায় হালদার। মাসে চল্লিশ টাকা।

শুধোলাম, 'তুমি বড় সরদার হয়ে যে টাকা কামিয়েছিলে সেই টাকায় বাড়ি, সেই টাকায় মজার গিয়েছিলে বলে কেউ কেউ রটায়, সেটা কি সত্যি?'

'হজে যাওয়ার টাকা আমার গতর খাটানীর। শুনেছিলুম, কালো টাকা নিয়ে গেলে নাকি আরবের উট পিঠে নেয় না। আর হজ জায়েজ (অনোনীত) হয় না। বাড়ির টাকা মিচেল সায়েবের। তবে যে-সব টাকা দিয়ে শতখানেক বিঘে জমি কিনেছিলুম সেগুলোর কথা বলতে পারো। পরের টাকা না হলে বড়লোক হওয়া যায় না। মিচেল সায়েবও অনেক টাকা মারত!'

'তুমি যে সতেরোটা গরু, একশো খাসী, একশো মণ চাল, তিন নৌকো দই করে সাতটা গ্রামের লোককে ইস্তাহার ছড়িয়ে 'খানা' খাইয়েছিলে তার খরচ কোথায় পেলে?'

'সবই আল্লার দয়ায় ভাই। ঐ চাঁদনীর পুকুরটা কাটাবার সময় দু-ঘড়া সোনার মোহর পেয়েছিলাম বাদশাহী আমলের। সে সব ঐ মানুষজনকে খাইয়ে শেষ করে দিয়েছিলুম। লোকে বলে একটা 'কালো জীন' আছে নাকি আমার বাস্তুতে—সে সব জোগায় আমাকে!' হাসতে থাকল বড় সরদার।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমাদের চা দিয়ে গেল। আলো জ্বালালে আব্বাস হালদার। বললে, 'টাকা হল গাঙের বালি। যখন আসে রাশি রাশি। যখন যায় ভাটার টানে বেরিয়ে যায়। আজ আমার সব বেরিয়ে গেছে। ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শিখলে না। ভাগচাষের জমি সব বেরিয়ে বেদখল হয়ে গেল। ছেলেরা চাষও জানে না। আলাদা করে দিতে বলে কারখানায় যাচ্ছে। কেউ তাঁতে বিয়ে দেয়ানে গোপনে কাজ করে। বজবজের কারখানায় যায়—শ্যামগঞ্জের কারখানায় বাপের নাম ডোবাবার জন্যে যায় না বেটারা। এখন চোখটা বুজলেই বাঁচি। পাকা কবরটাও গেঁথে রেখেছি। মরণ আর আসছে না। আজ একটু দুধ পাই না। চালের দর এক টাকা আশী পয়সা কিলো। গত বছর তিন টাকাও হয়ে গেল। এখন আমার বাড়ির সামনে ছেলেদের নাম ধরে কাবুলী এসে হাঁক মারে। শ্যামগঞ্জে এখন দুশো জন কাবুলী, আড়াই হাজার ভিন জায়গার লোক এসে আছে। তাদের আগে কাজ দিতে হয়। তারা সবাই নাকি 'কমিউনিস্ট'! অনেক 'বাঙাল'-বাবু এসেছে। এখানের লোকেরা কাজ পাচ্ছে না। তবে ইউনিয়ন হয়েছে, 'ট্রেড ইউনিয়ন' হয়েছে—অনেক 'গুণ্ডা'—তবু আমাদের কালের মতন সুখ নেই। কারখানার লোকগুলোর চেহারা যেন মুখপোড়া হনুমানের মতন। আমার সেজো ছেলেটার এখন হাড় সার। হঠাৎ সেদিন তাকে দেখে চিনতে পারিনি। মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। দশ বিঘে করে ধানজমি দিয়েছিলুম সব্বাইকে—সবাই উড়িয়ে দিয়েছে। মেজোটা আবার মদ খায় নাকি। তওবা আসতাগ ফেরুল্লা!'...

একটা মাঠ পারের বিস্তীর্ণ এলাকায় আজ অনেক কারখানা শ্যামগঞ্জে। চটকল, ফাইবার, লিনোলিয়াম, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, ক্যালসিয়াম কারবাইড, কার্পেট, পাওয়ার হাউস কত কি! হাজার হাজার লোক কাজ করছে। বাঙালী, ওড়িয়া, বেহারী, চুলিয়া, ভোজপুরী—হরেক জাত—হরবোলার মতন ভাষা। ঝমঝম করছে কারখানার শব্দ রাতদিন।

হাজী আব্বাস হালদার এখনো মরে নাই কিন্তু তার সাদা পাকা কবরটা রাত্রির জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে। কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ আসছে সেখান থেকে।

হেনরী মিচেলের চিঠির ভাষায় জটিল বক্তব্য কেউ নাকি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেনি আব্বাস হালদারকে। বড়-

বন্ধ পিঞ্জরটাকে আকড়ে ধরতে পারত। সে পাত্রের ওই চাপা পড়ে মরে গিয়েছিল লাঙল আঁকড়ে থাকতেই। তার জন্যে একদিন ছুটি হয়ে গেল গোটা কারখানা। কত হাজার লোককে চিনত হাসদার, তবু চিঠিটা ভাল করে পড়তে পারেনি।

আমি পড়ে দিতে হাসী আব্বাস হাসদার [illegible]

মরেছে। চিঠিতে লেখা ছিল : "প্রিয় আব্বাস, তুমি মানপাত্র মাথায় দিয়ে কার-খানায় এসেছিলে, তোমার মাথায় রাজচ্ছত্র তুলে দিয়ে এলাম। যদি কখনো বিপদে পড় আমাকে লিখ। তোমার মধ্যে আমি একজন বীর্যবান, সচ্চরিত্র, মহৎপ্রাণকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। যদি তুমি লেখাপড়া জানতে তাহলে ভাল হতো। কেন না কাঁচা মাটির পাত্রে কড়া মদ ধরে রাখা কঠিন। তোমার ছেলেদের মানুষ করতে না পারলে কাঁকড়ার বাচ্চার মতন তারা তোমাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। তোমার খোলা পড়ে থাকবে। তুমি কতুর হয়ে যাবে। অতএব সাবধান, পথে হঠাৎ ভাগ্য কুড়িয়ে পাওয়া— পাগলজনের যে বড় সমস্যা!"...

আব্দুল জব্বার

"The green revolution has taken hold . . . . If India can feed itself, if its industrial growth rate continues, and if its leadership continues to demonstrate its sense of social reform, including population control measures, it can become an even more important force for stability in all of Asia." খবরটা বলেছেন আমেরিকার সহকারী রাষ্ট্র-সচিব জোসেফ জে সিসকো। পরিবেশটা ছিল তাঁদেরই, হাউস অফ করেন অ্যাফেয়ারস কমিটি। ছাপা হয়েছিল ৯ জুলাই ১৯৬৯-এর জাপানের কোনো এক সান্ধ্য দৈনিক-পত্রের ভিতরের পাতাতে, খুব ছোট করে।

মনে হয়, এমনই একটি বৃহৎ আকারের মুখবন্ধ যা উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের প্রধান-মন্ত্রী কয়েকদিন আগে দূরপ্রাচ্য সফর করে গেলেন। ভারতে বহু কথিত এশিয়ার দূরপ্রাচ্য প্রতিবেশী মহলের সঙ্গে সখ্যতার উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। আরও ভাল লাগল যে, ভারতের অস্তিত্বকে জাপানে এক বিশেষ সময়ে দীপ্তভাবে ঘোষণা করে গেলেন।

মহাত্মাজীর "প্রিয়দর্শিনী", এবং তাঁরই মন্ত্রশিষ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবননীতিতে উদ্বুদ্ধ একান্ত আদরিণী এবং স্বহস্তে গড়া, ভারতের গণতন্ত্রের স্বীকৃতির প্রতিকৃতি আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাপান ঘুরে গেলেন। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই প্রথম দেখলাম। দু-এক জায়গায় কথা-বার্তা শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

গত বছরই একবার কথা হয়েছিল আসবেন। আসা হয়ে ওঠেনি। খবর হিসাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতের রাজনীতির আভ্যন্তরীণ গোলযোগই নাকি এর কারণ। তৎকালীন কাগজে বারবার ওই কথাটুকুই উত্থাপিত হয়েছিল। এবারেও যে হয়নি তা নয়। যেমন এবারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সব খবরের শেষে একবার করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার সোজা বাংলাতে মানে দাঁড়ায়, জাপানের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু বেশী চাওয়াটাই এই পরিভ্রমণের একটি মূল উদ্দেশ্য। এই সংবাদটিতে যে শুধু আমার মনেই খটকা লেগেছিল তা নয়। যখন দেখলাম শ্রীমতী গান্ধী বিদেশী

টোকিওর বিদেশী সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

সাংবাদিক সম্মেলনে নিজে থেকেই কথাটি তুলে বললেন যে, তিনি লক্ষ্য করেছেন ভারতের কোন কোন সাংবাদিক বন্ধু তাঁর এই পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য থেকে শুধু সাহায্য নেবার পরিকল্পনাটিই মূলমন্ত্র করেছেন। কিন্তু তিনি সকলের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছেন যে, তিনি শুধু ওই একটি কারণের জন্যই আসেন নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিখতে এসেছেন অনেক কিছু। অবশ্যই ভারতের আজ সাহায্যের প্রয়োজন।

সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় জাপানের সাধারণ জনগণের মনে তেমন কোনো সাড়া জাগে নি। বিচারের প্রশ্ন হিসাবে অনেক পত্র-পত্রিকা বারো বৎসর আগের নেহরুর কথা উল্লেখ করেছে। তবুও যেটুকু সাড়া দেখা গেছে তা মূলত খবর হিসাবে যেটুকু বার হয়েছে। 'কারণ'—নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, ভেবেছি—আজকের অর্থকরী বাস্তবতায় এর বেশী হবেই বা কেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যদি আকর্ষণের একটি পাল্লা থাকে, তাহলে অপর পাল্লাতে নেহরুর কন্যা আর নারী প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পরিচিতি জাপানের মানুষের কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়েছে; অন্তত সংবাদ সরবরাহের সমারোহে সেইটুকুই আমার মনে হয়েছে। আমরা এখনও ভুলতে পারিনা, ভারতের ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে কি জাপানে আসেনি? ভারতই একমাত্র দেশ, যে দেশের মানুষ ডঃ রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ই কি জেনারেল তোজোর 'দেশদ্রোহী' আখ্যার প্রতিবাদে দীপ্ত হয়ে ওঠেন নি? আর যুদ্ধ-শেষে ধ্বংস-প্রায় জাপানের দুর্দিনে ভারত কি রক্ত-ঋণ গ্রহণে অস্বীকার করে নি? সে সব তো আজকে পুঁথির কথা। না—রাজনীতি আর ইতিহাস বড় ক্ষণভঙ্গুর, যা জাতি-সমাজ-মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়, ভুলে যেতে চেষ্টা করে, ভুলে যেতে ভালবাসে।

কাগজে, টেলিভিশনে প্রায়ই দেখছিলাম শ্রীমতী গান্ধীর জাপান্ আগমনের খবর। এর আগে ১৯৫৭ সালে জওহরলাল নেহেরুর আগমন উপলক্ষে ছোট-বড় সব কাগজই তাঁর জীবনী, ছবি, কর্মপদ্ধতি বেশ বড় বড় করে তুলে ধরেছিল। আর ছিল ভারতের নীতি, যা অনেকটা বুদ্ধের বাণীর মত শোনাত, তার বিশদ বিবরণ। এবারেও খবর বার হয়েছে। বড় বড় কয়েকটা কাগজ প্রথম পাতাতে খবর দিয়েছে। কিন্তু তেমন হেড লাইন হয়ে দেখা দেয়নি। ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আসা কালীন দেখেছিলাম জাপানের সম্রাট স্বয়ং বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। এবারে তেমনটি দেখলাম না।

কেন জানি না, এবারে ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমার মতন অভাজনকে টেলিফোন করা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচী জানিয়ে। বেশ ভাল লেগেছিল, কারণ এমনটি আমার চার বছরের জীবনে এই প্রথম। কর্মসূচীর একটা লিখিত বিশদ বিবরণ এসেছিল, সেটা প্রধানমন্ত্রী পৌঁছুবার তিনদিন পর। অবশ্যই অনুরোধের অংশ হিসাবে, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আগমন এবং প্রত্যাগমন মুহূর্তে স্ব স্ব উপস্থিতি। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, কোনো কিছুর স্বার্থক অর্থ করা আমাদের অনেকেরই স্বভাব, তার মাঝে আমিও একজন। অতএব বিশেষভাবে আগমন এবং প্রত্যাগমন-এ উপস্থিতির অর্থ দু' ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এক ভিড় বাড়ানো—দুই সত্যকারের আন্তরিকতা। আর যখন বিমানবন্দরে পদমর্যাদার পরি-প্রেক্ষিতে সমবেতবৃন্দের প্রতি বিশেষ সীমানার ব্যবস্থার কথা শুনলাম তখন আরও খারাপ লাগল। দুঃখের বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আমার পক্ষে বিমানবন্দরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে পরদিন দূতাবাসে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে, অনেককে অনুপস্থিত দেখে এবং পরবর্তীতে তাঁদের বিমানবন্দরের ঘটনায় অভিমানাহত তাদের শুনে আমার ধারণা কিছু বদ্ধমূল হবার অজুহাত পেল।

২৩ জুন সোমবার বিকাল পাঁচটায় হানেদা বিমানবন্দরে শ্রীমতী গান্ধী উপস্থিত হলেন। বলা হয়েছিল, পরদিন সকাল ১০টাতে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। হাজির ছিলাম। সাধারণ-ভাবেই শ্রীমতী গান্ধী ব্যস্ত। অতএব কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনার প্রশ্নই আসে না। সময় মতন হাজির হলেন। দূতাবাসের যে দরজা দিয়ে উনি ঢুকবেন সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দর্শন মিলল, এবং সে-পথ দিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঢুকবার ব্যবস্থা দেখলাম। আমার মতন যাঁরা, তাঁদের ব্যবস্থা ছিল পাশের দরজা দিয়ে। বেশ কিছু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নিলেন সকলেই হিন্দী বুঝতে পারেন কিনা? স্বাভাবিকভাবেই জনতা নিশ্চুপ রইলেন। সেদিন উপস্থিতদের মাঝে সাধারণভাবে একটা প্রশ্নই ছিল—"ভারত কোথায় চলেছে—কেমনভাবে চলেছে—উদ্দেশ্যই বা কি? বিদেশী সাংবাদিকদের কলমে যে খবর এসে পড়ে তার সত্যতাই বা কতটুকু? ভাল লাগল, এই না বলা প্রশ্নগুলি ধরেই ইন্দিরাজী তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। প্রথমেই জানালেন, তাঁর যদিও উচিত ছিল, যাঁরা এই এতদূর দেশ ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁদের সকলের কথা শোনা, জানা এবং সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সময় এবং সুযোগ এতই কম যে তাঁর পক্ষে তেমন সুবিধা হয়ে উঠল না। মনে করিয়ে দিলেন যে সরকারীভাবে মুখ্য রাজদূত মহাশয় হয়ত আছেন। তবুও প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই ভারতের প্রগতিকে বহন করছেন। সেদিক থেকে দায়িত্ব তাঁদের কারোর এতটুকু কম নয়। তাঁদের উপরই নির্ভর করছে ভারতের সুনাম-দুর্নাম। কথাটি খুবই সত্য এবং মূল্যবান। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি কজন তা মনে রাখে; আবার এমন কথা সদাসর্বদা মনে রেখে চলে ফিরে বেড়ানতেও বিপদ অনেক, কারণ সাধারণের ক্ষেত্রে এসব কর্তব্যবুদ্ধি অনেক বিশেষ দায়িত্বশীল ভারতীয় ব্যক্তির মতে স্পর্ধা বলে বিবেচিত হয়। যাক সেসব আত্মচিন্তা। ভারতের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে বললেন, আজ ভারতের নানা রকম সমস্যা, অনেক রকম পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। একটিকে পূরণ করতে করতেই আরও দশটি এসে হাজির হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে যে ভারতকে স্বাধীনতার পর সম্পূর্ণ নূতন করে সব কিছু শুরু করতে হচ্ছে। তার বনিয়াদ তৈরী করে তবেই ইমারত স্থাপন। দায়িত্ব আমাদের সকলের। অতএব ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না। এমন আরও কিছু কথা বললেন। নূতন কিছু শোনা গেল না, শোনাবারও কিছু নেই। ত্যাগ এবং ধৈর্য একথা দুটি শুনেছি, শুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশ-সমাজ-সংসার-কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই সেই এক ত্যাগ এবং ধৈর্য; কিন্তু আজ সকলে শুনতে চায় তারপর? তার কোন উত্তর কিন্তু মিলল না, মেলা সম্ভবও বুঝি নয়; তবুও মন যেন কি শুনতে চায়, সে সব একই কারণে সব জেনে শুনেও ঘুরে ঘুরে এক কথা শুনবে জেনেও সর্বত্র হাজিরা দেবার তাগাদা অনুভব করে। ইতিমধ্যে দশ মিনিট পার হয়ে গেল। তিনি নমস্কার জানাতে জানাতে সকলের মাঝ দিয়ে হাসি-মুখে এগিয়ে গেলেন।

২৩শে জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত ছিল তাঁর এখানের পরিভ্রমণের কার্যসূচী। দীর্ঘ বার বৎসর পর আজ আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাপানে এলেন। যদিও ১৯৫৭ সালে নেহরুর সঙ্গে এবং মাঝে একবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাপান ঘুরে গেছেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই প্রথম।

এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধের পর ভিয়েতনাম, লাল চীন, Nuclear Non Proliferation, ভারত ও জাপানের মাঝে আরও সৌহার্দ্য সূচক সম্পর্ক স্থাপন এবং জাপানের ভারতের উন্নতির পথে সাহায্য প্রভৃতি আলোচনাই হচ্ছে মুখ্য কারণ। এইসব কথার আলোচনার মাঝে একটি কথা শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে জাপানকে ভারত কোন সময়ই প্রতিযোগী হিসাবে গ্রহণ করে না বা করবে না। যেটা ইদানীংকালে বিশেষ কয়েকটি ব্যবসায়িক কারণে জাপানের একদল চিন্তানায়ক ভাবতে শুরু করেছেন। বললেন, ভারত আজ চাইছে কিভাবে জাপানের সঙ্গে এশিয়া এবং ব্যক্তিগত সমস্যার দিকগুলি একে অপরের সহায়তায়, সমাধান করতে পারে। অনুরোধ করলেন, জাপানও যেন ভারতকে কোন সময়ই প্রতিযোগী সুলভ চিন্তাধারায় বিচার না করে। আমাদের ভারতের চিন্তাধারা এমন সময়ে জাপানের কাছে তুলে ধরে, শ্রীমতী গান্ধী এক বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিলেন। বক্তব্য আর লেখনীতে অনেক কথা রয়ে গেল, ফলাফলের জন্য রইলো সময় আর ভবিষ্যত।

দ্বিতীয়বার ব্যক্তিগতভাবে আমি উপস্থিত

ছিলাম এখানকার বিদেশী সাংবাদিক সঙ্ঘের (Foreign Press Club) মধ্যাহ্ন-ভোজের প্রশ্ন-উত্তর পর্যায়ে। আমার জনৈক আমেরিকান সহকর্মী ওই সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি। তিনিই আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপস্থিত হবার জন্য। সময়মত উপস্থিত হলাম। তিলধারণের জায়গা নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে বহু নারী-পুরুষের উপস্থিতি, চিত্র সাংবাদিকদের ছড়াছড়ি। যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে হাততালি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালাম। প্রেস ক্লাবের সভাপতি তাঁর স্বভাব সুন্দর ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করলেন। বললেন, আজকের জগত যেখানে "পুরুষের পৃথিবী" হিসাবেই সমধিক পরিচিত, সেখানে ভারতের নারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এক বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই আছে এবং আমরা সকলে বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। শুধু তাই নয়, আজকের উপস্থিত সভ্যবৃন্দের সংখ্যা এক রেকর্ড স্থাপন করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, টোকিওর এই Foreign Press Club-এ পৃথিবীর সেরা সেরা রাজনীতিক চিন্তানায়ক, লেখক ও সুধিবৃন্দের পদার্পণ ঘটেছে। সেদিক থেকে প্রত্যেক ভারতীয় গর্ব বোধ করল বই কি। নারীর প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে সভাপতি বললেন যে আমেরিকার সামরিক বাহিনীতে নারী সর্বাধিনায়ক হতে পারে বলে যদিও আইন পাশ হয়ে গেছে, তবুও তার বাস্তব রূপ বুঝি সুদূরপরাহত।

লোকের ব্যক্তিগত জীবনেও পুরুষ এমনই স্থান অধিকার করেছে যে ক্যারি গ্রানট ৬২ বছর বয়সেও প্রথম সন্তান "ছেলে" চাইছেন। এক কথাতে তিনি সমস্ত পরিবেশটাকে বেশ আনন্দ দিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভাষণ শুরু করলেন। মনে হল যে নেহরুর উত্তর সুরী হিসাবে তিনি সফল।

প্রথম কথাতেই কিছুটা হাসির রোল উঠল। সভাপতির ভাষণকে টেনে এনে বললেন যে, নারী হিসাবে অসুবিধাও যেমন আবার অপরদিকে সুবিধাও তেমনই আছে। তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আজকের উপস্থিতি। তবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর ঠাকুর্দা ও বাবার কষ্ট ও ত্যাগের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুল্লেখিতভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর ঠাকুমা ও মার অবদানও তাঁদের তুলনায় এতটুকু কম নয়। পরবর্তীতে উনি উল্লেখ না করলেও আমার ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল স্বাধীনতার যুদ্ধে অনুল্লেখিত কত মা-ছেলে-পিতা ইতিহাসের ধুলায় স্বীকৃতি-হারা হয়ে হারিয়ে গেছে।

ভারতের কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেন। সাহায্য চাওয়া বা পাওয়া পর্যায়ে তাঁর বক্তব্য আগেই উল্লেখ করেছি। বললেন খাদ্য সমস্যা অবশ্যই আছে। তবে তিনি জানেন যে, জনৈক অবস্থাপন্ন ভারতীয়ের কাছে তাঁদের এক বিদেশী বন্ধু একটা খাবার প্যাকেট পাঠিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের খাদ্য-সমস্যাকে সাহায্য করা। উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ, তবে তিনি মনে করেন যে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে ঠিক এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য ভারতের পক্ষে উপযোগী নয়। আজ আমরা আস্তে আস্তে নিজেরাই সে সমস্যার উপায় অনুসন্ধান করছি এবং কিছুটা সফলতাও লক্ষনীয়। দ্বিতীয়ত কেন্দ্র এবং প্রদেশের মাঝে তথাকথিত বিবাদ। অবশ্যই তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত দল ভারতে এবং যে কোন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক। মনে হয় কথাটি উল্লেখ করে গত সাধারণ নির্বাচনের মুখে ওঁর জাপান সফর বন্ধ করার পরিপ্রেক্ষিতে যে খবর বার হয়েছিল, তাকেই সমর্থন করলেন। জানালেন যে, প্রদেশে যে-দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, নির্বাচনের পর কেন্দ্র সর্বদাই সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি প্রসারণ করে থাকে। তবে সকল প্রদেশেরই কেন্দ্রের কাছে চাহিদার মূলগত কারণ অর্থ। কেন্দ্রেরও অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হচ্ছে। অতএব এই আভ্যন্তরীণ বিসংবাদের মাঝে বাইরের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ মত পার্থক্য থাকলেও কেন্দ্রের প্রতি সকলেই পোষণ করেন সমান মনোভাব। অতএব এই দুটি বিষয়ে কোন প্রশ্ন না তুললেই তিনি খুশী হবেন।

এশিয়াতে বিদেশী শক্তির উপস্থিতি প্রসঙ্গে বেশ স্পষ্টই বললেন যে, এশিয়-বাসীদের নিজেদেরই নিজেকে রক্ষার ক্ষমতা আছে। কোথাও কোন বিদেশী শক্তি চলে গেলে শূন্যতা আসবে এমন ধারণা ঠিক নয়। যেমন ভারত থেকে একদিন ব্রিটিশ চলে গেছে। সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হলেও, ভবিষ্যতে সেই তথাকথিত শূন্যতা পূরণ করতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। কথাটি আমার বেশ ভাল লাগল। ভাবলাম সত্যই তো, কারোর যদি তেমন শূন্যতার প্রতি সত্যই আন্তরিক সহানুভূতি থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী মোতায়েন না করে সর্বতোভাবে সে দেশ নিজেই যাতে রক্ষা কবচ তৈরী করতে পারে সেই ব্যবস্থা পাকা করতে দোষ কি? কিন্তু মাতব্বরী ছাড়তে কেউ রাজী নয়। অনেক ডাক্তার যেমন রোগ নির্ণয়ের পরেও রোগ জিইয়ে রেখে পয়সা নেবার ব্যবস্থা রাখে; আন্তর্জাতিক দুর্বলতাতেও তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে প্রথম জাপানের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বলেছেন যে, আজকের পৃথিবীতে নিজের নিজেকে রক্ষার ক্ষমতা অর্জন না করতে পারলে কেউই সম্মান করবে না আর কথাও শুনবে না। অতএব মনে হয় জাপানও এ বিষয়ে ভারতকে গুরু করেছে। সেই মুহূর্তেই মধ্যবয়সী এক শ্রেণী জাপানীদের মুখ থেকে শুনেছি যে, তাই যদি হয় তাহলে সেদিনের জেনারেল তোজোর চিন্তাধারাকে কি খুব বেশী দোষারোপ করা যায়। শুধু সেদিনের পৃথিবীর মর্যাদা আর সম্মানের মাপকাঠি সামনে রেখেই তিনি তাঁর মতবাদ আর চিন্তাধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, হৃদয় এবং জঠর উভয়ের পরিপূর্ণতাই মনুষ্য সমাজের কাম্য; এতে দেশ-কাল ভেদাভেদ নেই।

তিব্বতের উপর লালচীনের অধিকার প্রসঙ্গে, বিশেষ কিছু বলতে না চেয়ে মনে হয় ভালই করলেন। শুধু বললেন যে পরিস্থিতি বড়ই জটিল।

ইদানীং কোসিগিনের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে একটা বড় রকম হাওয়া বইছে যে ভারত মহাসাগরে রাশিয়ার নৌবহর হয়ত ঘাঁটি গাড়বার মতলব আঁটছে। এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী জানালেন যে, তেমন কোন কথা তিনি জানেন না বা শোনেনওনি। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে বিশেষত অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা হয়েছিল।

লালচীন প্রসঙ্গে উত্তরে জানালেন যে লালচীন সম্পর্কে কোন বিশেষ মতামত ব্যক্ত করা বা পোষণ করা বড়ই দুরূহ। তবে

ভারত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন বিভেদের ফয়সলার জন্য সদাসর্বদাই তার দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে।

পাকিস্তান এবং কাশ্মীরের কথায় বললেন, কাশ্মীরের ইতিহাস বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের গোলযোগ বেশীর ভাগই রাজনীতিতে। কূটনীতিগত বিচারের বাইরে আজও একে অপরের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব দুই দেশেই বর্তমান। শুধু তাই নয়, ভারতের অনেক কূটনীতি-বিদ, সরকারী কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর লোকজনের আত্মীয় স্বজন পরিচিত-পরিজন একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে পাকিস্তানে অবস্থান করছেন। অতএব সরকারীভাবে, কাগজে কলমে রাজনীতিগতভাবে হয়ত অনেক বিভেদ আছে, কিন্তু তার বাইরে সর্বদাই একটা বিশেষ ভাবের বন্যাধারা আমাদের দুই দেশের মাঝে সদা বিরাজমান। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সময়কালীন ইতিহাসে অবশ্যই একটা সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক দুই দেশের মাঝে গড়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহকে ভারত অবশ্যই কোন বিশেষ একপেশে মনোভাব নিয়ে বিচার করবে না। প্রত্যেকটা বিষয়কে ভিন্ন ভিন্নভাবে সময় এবং অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করে তবেই সে বিষয়ে সঠিক কোন মত পোষণ করবে।

জাপানের সাংবাদিক মহলের একজন ভারত ও জাপানের মাঝে হাল্কা বিষয়ক প্রশ্ন তুললেন। "আচ্ছা, জাপান তাদের দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে বিদেশী পোশাকের দিকে ঝুঁকছে, কিন্তু বিদেশী ইংরাজী ভাষাটাকে রপ্ত করতে পারছে না। অপরদিকে ভারত তাদের শাড়ি কোন মতেই বর্জন করছে না, কিন্তু এমন ইংরাজী বলছে, কোন কোন সময় ইংরেজদেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর মতামত শুনতে পারলে খুশী হবেন।" শ্রীমতী গান্ধী বেশ হাসিমুখেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন যে, কিমনোর সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে যদিও তিনি বড় বেশী ওয়াকিবহাল নন, তবে শাড়ি পরে দৌড়ন, পাহাড়ে চড়া, ঘোড়ায় চড়া এমন কি সাঁতার দেওয়াও চলে। আর ইংরাজী এখন বলা চলে আন্তর্জাতিক ভাষা। এ বিষয়ে আত্ম-কেন্দ্রিক সমবৃত্তিতে ইংরাজীকে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে নানা ভাষা আছে। সাহিত্য ইতিহাস এবং গুরুত্বের দিক থেকে সকলেরই নিজস্ব আভিজাত্য আছে। কোনটা বেশী ভাল বা কোনটা কম ভাল এমন বিচার করা বা মনে করা মোটেই উচিত নয়। তবে তার মাঝে যে ভাষাটি ভারতের সব থেকে বেশী মানুষ ব্যবহার করে সেইটিকেই চলতি হিসাবে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য করলাম, হিন্দির কথা তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না। উপরন্তু সবশেষে বললেন যে আমাদের ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষা মনে করি। সব দিক থেকে বিচার করলে উত্তরে বেশ বুদ্ধি দীপ্তের পরিচয় ছিল। তবে বিদেশী সাংবাদিক মহলের অনেকেরই বিশেষ মনঃপুত হল না মনে হল। তার কারণ কিছু উত্তরের শেষে বেশ গুঞ্জরণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আমার ডান পাশে বসে ছিলেন রাশিয়ার টাস্-এর এক সাংবাদিক। বাঁ পাশে এক পক্বকেশ আমেরিকান সাংবাদিক, যিনি জীবনে একাধিকবার বিভিন্ন দেশে নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলন শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক উত্তরের শেষেই তিনি একবার করে পুরনো নেহরুর উত্তর-প্রত্যুত্তরের উল্লেখ করছিলেন। একজন সাংবাদিক যিনি আমেরিকার এক বিশেষ পত্রিকার হয়ে বেশ কয়েক বছর ভারতে কাটিয়েছেন তিনি বললেন, "আমি অবশ্য Cool কথাটি ব্যবহার করব না, কারণ সেটা বড় কঠোর শোনাবে, তবে আমাকে খুব একটা impress করেনি।" বাইরে বার হয়ে আসতেই কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা খুবই উৎফুল্ল। চোখা-চোখি হতেই একজন বললেন, যার বাংলা দাঁড়ায় "দেখেছেন কেমন দিল একখানা...।" আর একজন বললেন "যেন Badminton-এর shuttle-Cock-এর মতন উত্তর ছুঁড়ে মারছিলেন..." really extraordinary ..." পরিচিত এক ভারতীয় অধ্যাপকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমার পরিচিত জাপানে যদি সত্যই জাপান সম্বন্ধে কেউ বিশেষজ্ঞ থেকে থাকেন, আমার মতে তিনি। এখানেই কয়েকটা কলেজে কয়েকটি জটিল বিষয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর চোখের হাসিতে একটা গন্ধ ছিল। সেটা না বলে পারছি না। কিছুকাল আগে তিনি ভারতে যান এবং স্বাভাবিকভাবেই চাকরীর জন্য সচেষ্ট হন। বহুকাল জাপানে থেকেছেন। যেটুকু শিখেছেন সেটুকু যদি দেশের শিক্ষাতে আরোপ করা যায়। তদুপরি এখন যখন ভারত-জাপানের সখ্যতা দৃঢ় করবার কথা সকলের মুখে শোনা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর চাহিদা অনস্বীকার্য। কিন্তু জাপানে তিনি আবার ফিরে এসেছেন। দেশে কি হয়েছে জানি না। তবে তাঁর মৌখিক ভাষ্যে কিছু শুনে-ছিলাম। বলেছিলেন, প্রথমত যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি গিয়েছিলেন, তাঁদের কর্ণধারবৃন্দ মনে করেন তাঁরা বিদেশের সমস্ত জ্ঞান এবং অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন বা জ্ঞানী। অতএব সেখানে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিতে গেলে তাঁদের আভিজাত্য বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এমন অবস্থায় তিনি তাঁর শিক্ষা বেচতে রাজী নন। আর দ্বিতীয় কথাটি বলেছিলেন, সে কারণে ওই হাসিটি ভারতীয় মহলের উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে হেসেছিলেন। বলেছিলেন "জানেন, দেশে গিয়ে দেখলাম দেশকে সত্যই ভালবাসে, দেশের সরকারকে সত্যই ভালবাসে একজন আছেন। যাঁরা পরস্পরের সবটুকুই ভাল দেখেন, ভাল ভাবেন, ভাল-বাসেন। তাঁরা জানেন—ধনী সম্প্রদায় এবং মোটা মাইনার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বৃন্দ। এঁদের দেশপ্রেমে সত্যই কোন ভেজাল নেই। কিন্তু রাস্তা থেকে যে কোন একজন সাধারণকে তুলে আনুন, দেখবেন সে শুধু এক জ্বালাতে জ্বলছে। হতাশা আর শূন্যতা ছাড়া কিছুই পাবেন না।" অতএব সেইক্ষণের হাসিটিতে ছিল "নিন মশাই মিলিয়ে নিন—বলেছিলাম না।"

তবে পাশের টাস-এর সাংবাদিককে দেখলাম সর্বদাই এক অদ্ভুত ভালবাসা নেহরু আর তার কন্যার প্রতি বহন করছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গৌণ। আমায় ডেকে তাঁর গাড়িতে বসালেন। আমার বাড়ি পৌছে দিতে দিতে অনেক কথা বললেন। বোম্বাইতে ছিলেন কয়েক বছর। খুব বড় একটা কথা শোনালেন—"জানেন, জওহরলাল নেহরু আমাদের দেশে ভারতের বন্ধুত্বকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন আর আমাদের সখ্যতাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম ভারতের জনগণকে উপহার দিতে।" ভাবলাম সত্যই এইটুকুরই আজ অভাব। আমাদের দেশ কেন, কত দেশের বড় বড় মানুষ কত দেশে আসছে যাচ্ছে, কাগজে নাম বার হচ্ছে, হইচই হচ্ছে, যার উপর পরিভ্রমণের সফলতা অসফলতা নির্ভর করছে, কিন্তু কোথায় সেই হৃদয়ের বিনিময়, তেমন মানুষেরই আজ বড় অভাব। সেই কারণে আমেরিকা ভারতের বন্ধুত্ব দাবী করে হিসাব দেখাচ্ছে রাশিয়ার তিন গুণ সাহায্য দান। রাশিয়ার অনেকে আসছে যাচ্ছে কিন্তু সে দিনের সে সুর আর ধরা যাচ্ছে না। ভাবলাম আজ ভারত জাপানকে কতটুকু দিতে পারল আর ভারতই বা তার জনগণের উদ্দেশ্যে কতটুকু বহন করে নিয়ে যেতে পারল। এ নিয়ে কাউকে ভাবতে দেখলাম না, কারোরই মাথা ব্যথা নেই।

বিকাশ বিশ্বাস

সতেরো

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার দেখিয়ে দেয়—বাথরুম ঐদিকে। ললিত দৌড়ে যায়। বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বেসিনের ওপর দেয়ালে আয়না। বমি করার পর মুখ তুলে ললিত দেখে তার জলে ভেজা মুখখানা ফ্যাকাশে। মোটাসোটা লক্ষ্মীকান্তর পাশে তাকে এতটুকুন দেখাচ্ছে। কালো বিশাল হাতখানা দিয়ে তার কপাল ধরে রেখেছে লক্ষ্মীকান্ত, যাতে দুর্বল মাথা টলে না পড়ে যায়। ফর্সা কপালের ওপর কালো আঙুল।

এখন একজন আধমরা লোককে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ললিত। এ শরীর আর তার নয়। অথচ যে শরীর ছিল এটা কখনো আলাদাভাবে টের পায়নি ললিত। এখন সে তার হাল্কা, ছিপছিপে শরীরটাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে।

লক্ষ্মীকান্ত মায়ামমতার চোখে তার দিকে তাকায়। ভেজা হাতে কানের পিঠে আর ঘাড় ভিজিয়ে দেয়—এইবার একটু ভাল লাগছে না দাদা—অ্যাঁ?

—ভাল। বেশ ভাল।

লক্ষ্মীকান্তর হাত ছাড়িয়ে একা হাঁটার চেষ্টা করে ললিত। পৃথিবী টলে যায়।

বাথরুমের দরজায় সঞ্জয় দাঁড়িয়ে ছিল। ললিত মুখোমুখি হতেই সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে বলল—আয়। এখন কেমন লাগছে?

এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে গেল শরীর। সঞ্জয় বগলের তলায় কাঁধ দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। ললিত হঠাৎ লক্ষ করে যে, সঞ্জয়ের চেয়ে সে লম্বা। অন্তত ইঞ্চিখানেক। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। বরং এক ইঞ্চি লম্বা হয়েও তার লজ্জা করছিল। একজন মানুষের পক্ষে যুবাবয়সে এর চেয়ে বেশী আর কী লজ্জায় থাকতে পারে যে, সে আর একজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে—ব্যাপারটা কীরকম বুঝছিস? মেয়েটা কি কেটেই পড়ল! প্রেস্টিজ-প্রেস্টিজ আর...কী ব্যাপার বল তো!

ঘরে ঢুকতেই বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে—আপনার কী হয়েছে বলুন তো। আমি ডাক্তার।

ডাক্তার! ঘরে অথচ ডাক্তারির চিহ্ন নেই। ওষুধের কোনো গন্ধও না। স্টেথসকোপটাই বা কোথায়! হঠাৎ ললিত দেখতে পেল টেবিলের ওপর জার্নালের স্তূপ। ডাক্তারই হবে। হয়তো প্র্যাক্টিস বেশী নেই। কিন্তু ললিত কিছুতেই এখন লোকটাকে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। ধুতির ওপর ঝোলানো শার্ট, ফুলহাতায় লিঙ্ক বোতাম, বুকপকেটে ঠাসা কাগজপত্র আর ছোটো ডায়েরী। তোবড়ানো শুকনো মুখ—যে মুখ মনে থাকে না। চশমা জোড়াই যেন লোকটার চোখ—আলাদা চোখ নেই।

ললিত দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। লোকটা লাজুক মিনমিনে গলায় বলে—আমি অবশ্য চোখের ডাক্তার, কিন্তু জেনারেল রোগ-টোগ বুঝতে পারি।

চোখ বুজে, ঘাড় হেলিয়ে মন দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়ী দেখে জিজ্ঞেস করল—কোনো অসুখবিসুখ আছে? অম্বল-টম্বল?

—গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা।

—কী?

—ক্যান্সার।

একটা শ্বাস ফেলার শব্দ হয়। অতি সম্মানের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার হাতখানা নামিয়ে দেয় লোকটা।

হতাশ লাগে ললিতের।

—সাবধানে থাকবেন।

ললিত সোফায় গা ছেড়ে একটু হাসে।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার লক্ষ্মীকান্তর দিকে ফিরে বলে—কী, তোমার পার্টি কই?

—দেখে আসি। লক্ষ্মীকান্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

ললিত সোফার পিছনে মাথা রেখে দু হাতে মুখ ঢেকে আছে। কপাল চকচক করছে ঘামে। মাথার চুল একটু আগে পাট করা ছিল, এখন আবার এলোমেলো।

সঞ্জয় সিগারেট ধরায়। পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ পর লক্ষ্মীকান্ত ফিরে আসে—নাঃ, ধারে-কাছে নেই।

বুড়ো লোকটা গম্ভীর হয়ে ঘড়ি দেখে—এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

ললিত দেখছিল—সবুজ দেয়ালে রঙ চটে গেছে। একটা ভেজা নোনা ধরার গন্ধ। মাথার ওপর দুই ব্লেডের একটা পাখা চলছে, পুরোনো আমলের পাখা, কিচকিচ শব্দ হয়। জানালা দরজায় সবুজ পর্দাগুলো ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুরোনো আমলের ডেস্কে, কুমিরের গায়ের মতো খসখসে সোফার ঢাকনায়, চটে বেরিয়ে আসা মেঝের লিনোলিয়ামে—সব জায়গাতেই ধুলো জমে আছে বলে মনে হয়। কিংবা ঘরটা অন্ধকার বলে ওরকম ধুলোটে দেখায়।

এই ঘরে বিয়ে হয়। বর এসেছে বলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় না, শাঁখ না, উলু না, কিংবা সেই রোমাঞ্চকর চোখে শুভদৃষ্টি। তবু বিয়ে হয়। হয়ে যায়। এই ধুলোটে জায়গায়। আধো অন্ধকার কৃত্রিম গোধূলিতে। চোরের মতন। 'রেজিস্ট্রিই ভাল'—চিরকাল এই কথা বলে এসেছে ললিত। তবু এখন তার মন সায় দেয় না। একটু আগে শাশ্বতী বসে ছিল এই ঘরে। কেঁদেছিল। হায়, তার কড়ি খেলা হল না, আর একজন কুড়িয়ে দেবে বলে সে মাদুরের ওপর ঘট উপুড় করে ছড়িয়ে দিল না চাল, তাকে সম্প্রদান করল না কেউ, সে নিজে হেঁটে এল। এই ঘরে বড় বেমানান লাগছিল শাশ্বতীকে। যশোরে কপোতাক্ষতীরে ওর দেশ। কলকাতায় জন্মেছিল শাশ্বতী? হবেও বা। তবু বাংলার গভীর হৃদয়ে লুকোনো ছিল ওর মায়াবী গ্রাম—মধুসূদনের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। যশোরের কপোতাক্ষতীরে ...সে কেন আসবে এখানে—রুগী দেখা ঘরে লজ্জাহীনা সে কেন বলবে, 'আমরা বিয়ে করতে এসেছি। বিয়ে দাও!' বাংলা দেশে কে কবে শুনেছে এই কথা? 'বিয়ে করলাম।' এই কথা বলে রেস্তরাঁয় খেয়ে বিছানায় চলে যায় বর-বউ? কোন্ জন শুনি না হাসিবে এই কথা? এখানে হয় না বিয়ে—কিছুতেই হয় না। পালাও শাশ্বতী, আমি একদিন সুন্দর বিয়ে দেবো তোমায়। ঐ কি সাজ? হাতে, কলেজ-

ফেরত বইখাতা, পরনে সুতীর শাড়ি, পায়ে চপ্পল? তুমি কপালে সিঁথিমোর, হাতে গাছকৌটো নিয়ে সেজে এসো। অনেক দূর থেকে নৌকোয় করে আসবে তোমার বর। কপোতাক্ষ বেয়ে, গভীর বাংলা দেশে মায়াবী এক গ্রাম জুড়ে বেজে উঠবে শাঁখ, উলুধ্বনি। কড়িখেলার শব্দ হবে।

লক্ষ্মীকান্ত আবার ঘরে আসে, দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—নাঃ।

দেয়ালের গোল ঘড়িটায় পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা ঝিকমিকিয়ে ওঠে—সে কী? সব জায়গায় দেখেছিলে? কাছাকাছি রেস্তরাঁয়? পার্কে?

—সব। লক্ষ্মীকান্ত হাঁফায়।

সঞ্জয় আদিত্যর কাঁধে হাত রেখে বলে—জেগে থাক।

আদিত্য মুখের ওপর থেকে মুখঢাকা হাত সরিয়ে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একটু চেয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে কাকে খুঁজল। আবার সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—কেন?

ওর বোকা মুখখানার দিকে চেয়ে লোভ সামলাতে পারল না সঞ্জয়, বলল—ঘুমোচ্ছিলি? ঘুমোস না। ঘুমোলে সে এসে যদি ফিরে যায়? জেগে থাক রে, আশা রাখ।

খানিকক্ষণ সঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠাট্টাটা ধরতে পারল আদিত্য। মুহূর্তে লাল—ভীষণ লাল হয়ে যায় আদিত্যর মুখ। চাপা গলায় সে বলল—ঐ শালা—ঐ শালার সব দোষ—আমার প্রেস্টিজ —আাঁ—আমার প্রেস্টিজ—

ললিত অবাক চোখে দেখছিল, আদিত্যর এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে, রোগা ফর্সা শরীরে তামার রঙের মতো একটা আভা। তার দিকে চেয়ে কী যেন বলছে আদিত্য! তারপরই লাফিয়ে এগিয়ে এল।
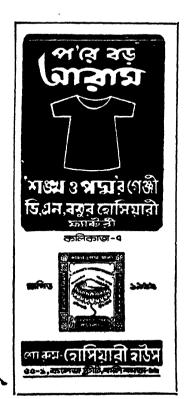
আদিত্যকে এগিয়ে আসতে দেখেও কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছিল না ললিত। সে হয়তো তখন খুব তুচ্ছ কোনো কিছু ভাবছিল—হয়তো মুখোশপরা একজন ডাক্তারের মুখ—কিংবা একটা টিকটিকি—লুডোর দানে ছক্কা—একটা নৌকোর মাস্তুল—কিংবা ওরকমই অপ্রাসঙ্গিক কিছু। তাই সে নিজের গালে আদিত্যর লম্বা আঙুলের চড় মারার চটাস শব্দটা শুনতেই পেল না। নরম সোফার ওপর তার দুর্বল শরীরটা একবার দুলে উঠেই গড়িয়ে পড়ল।

সঞ্জয় দৌড়ে এসে আদিত্যকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—কী হচ্ছে? আদিত্য ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর আচমকা হাঁটু ভেঙে বুকের কাছে পা তুলে সঞ্জয়ের তলপেটে একটা লাথি মারল সে। সঞ্জয় 'আঁক' শব্দ করে দু ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আবার ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে ললিতের বুকের ওপর উঠে হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধরে আদিত্য। গলায় তার সরু আঙুলগুলো। চাপা গলায় আদিত্য বলে—তোর জন্য—তোর জন্যই যত গণ্ডগোল—শালা, আমার বাপ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আর সতী—সতী—সব শালা, সরে যা—

ললিত টের পায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে তার শরীর শূন্যে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আরো কিছু দিন তার এই পৃথিবীর সঙ্গে লেগে থাকা বড় দরকার। তাই সে প্রাণপণে হাত বাড়িয়ে একটা কিছু—এই পৃথিবীর কোনো ঘাস লতা-পাতা চেপে ধরার চেষ্টা করছিল।

আদিত্যর কাঁধের ওপর দিয়ে গোল দেয়াল ঘড়িটা এক পলকে দেখা গেল। পাঁচটা দশ মিনিট...সে মরে যাচ্ছে...কিন্তু আর কয়েকটা দিন...আর মাত্র কয়েকটা দিন তার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে...কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল—স্যার স্যার...কে যেন বলছে ছক্কা, ছক্কা...সে পাঁচফোড়নের গন্ধ পায়...আর বৃষ্টির গন্ধ...

আদিত্যর আঙুলগুলো কর্তৃত্বক তার গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে গেল না। অসাড় হয়ে লেগে রইল। আস্তে আস্তে চোখ খুলে ললিত খুব অবাক হয়ে দেখল—আদিত্য তার বুকের ওপর বসে কাঁদছে। ললিতের কপালে তার গালে গড়িয়ে পড়ছে তার চোখের জল।

লক্ষ্মীকান্ত হাত ধরে টেনে তুলল আদিত্যকে—কী করেন দাদা, কী করেন—এঃ হেঃ—

উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠে দাঁড়ায় আদিত্য। খ্যাপা চোখে চারদিকে চায়। হাওয়ায় উড়ছে ওর রুক্ষ চুল। গায়ের ফর্সা রঙ তামার রঙের মতো হয়ে গেছে।

—হারামীর বাচ্চা—সব শালা হারামীর বাচ্চা...বলতে বলতে হাতের পিঠে চোখের জল মোছে। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ ওকে আটকায় না।

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে—কী হচ্ছে এসব—আাঁ? কী হচ্ছে, লক্ষ্মীকান্ত?

লক্ষ্মীকান্ত ললিতকে ধরে বসায়—খুব লেগেছে, দাদা?

না—ললিত মাথা নাড়ে। উঠে বসে। কষ্টে একটু হেসে ললিত—আমি ঠিক আছি লক্ষ্মীকান্ত।

শরীরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে, তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়ায় সঞ্জয়। কুঁজো হয়ে পেটটা চেপে ধরে ব্যথা-বেদনায় 'ইঃ' শব্দ করে। তারপর সোফায় বসে একটু হাঁফায়।

আশেপাশে অনেক কুঠুরি-অফিস রয়েছে। সেসব জায়গা থেকে ছুটে এসেছিল কিছু লোক। তারা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে, জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে দাদা', 'কী ব্যাপার দাদা?' তাদের ছায়ার মতো দেখতে পায় ললিত। লক্ষ্মীকান্ত তাদের ঘরের বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় দু হাত ছড়িয়ে বলছে 'কিছু না, কিছু না, মানুষে মানুষে কতরকমের হয়। আপনারা বাইরে চলুন, হাওয়ার রাস্তা দিন।' এর মধ্যে কোনো মেয়েকে না দেখে হতাশ হয়ে কালো বেঁটে একটা লোক চেঁচিয়ে বলল—'বিয়েহল্লীটি কোথায়—আাঁ? কাকে নিয়ে পড়াচ্ছে এত দূরে? নাকি কেবল পুরুষে পুরুষে!'

ললিত চারদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। সঞ্জয়ের মুখ লাল, কিন্তু সে ললিতের চোখে চোখ পড়তেই ক্লিষ্ট একটু হাসে। মাথা নেড়ে জানায় যে, সে ঠিক আছে। কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি। খুব সাংঘাতিক কিছুই না! সব ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর তারা সরু কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছিল। সামনে রেলিঙে হাতের ভর রেখে, পেট চেপে কুঁজো হয়ে সঞ্জয়, পিছনে লক্ষ্মীকান্তর কাঁধে শরীরের ভার রেখে ললিত।

সঞ্জয়ের গাড়িতে ললিত সামনের সীটে সঞ্জয়ের পাশে বসল। পিছনে লক্ষ্মীকান্ত। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ললিতের দিকে বাড়িয়ে দেয় সঞ্জয়। ললিত মাথা নেড়ে বলে—থাক।

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে একটু ইতস্তত করল সঞ্জয়। তারপর ললিতের দিকে বিব্রত চোখে তাকিয়ে একটু হাসল। কোনো প্রশ্ন করল না সঞ্জয়, কিন্তু ললিত বুঝতে পারে এবার সে ললিতের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছে। কেন এরকম হল! কী ব্যাপার!

বুক দুরদুর করে ওঠে ললিতের। সঠিক সেও তো জানে না কী ব্যাপার। তবু ওরা সকাই শুনেছে আর বুকের ওপর বসে আদিত্য আক্রোশে বলছে—তোর জন্য, তোর জন্যই যত গণ্ডগোল। ললিতের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে সে কী উত্তর দেবে ওদের?

কিন্তু সঞ্জয় ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞেস করল না। হয়তো ললিতের অসহায় মুখখানা দেখে তার মায়া হল একটু। হয়তো সে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল। প্রশ্ন করল না। মাথার ওপরের ছোট্ট আয়নাটা ঘুরিয়ে সে নিজের মুখটা একটু দেখল। আপন মনে বলল—শালার এখনো মায়া দয়া আছে—বুঝলি! লাথিটা জোরে মারলে এতক্ষণে আমি হাসপাতালে—কিংবা লাথিটা তলপেটে না হয়ে আর একটু নীচে লাগলে—মাইরি—

কথাটা শেষ করল না সে। গীয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওয়েলেসলী দিয়ে বিকেলের ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে যাচ্ছে সঞ্জয়ের গাড়ি। মন্থর ট্রামের জানালায় উদাসী মানুষদের বিষণ্ন মুখ। ধুলোময়লা মাখা কলকাতার রাস্তায় হাঁটছে জীর্ণ মানুষেরা—মুখে রুগ্ন, বিরক্তি, হতাশা, থুথু ফেলে চলে যাচ্ছে—সিনেমা হলের সামনে সঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা করছে একটি ছেলে—তার হাঁটুর কাছে মুখ তুলে একটা বাচ্চা ভিখিরির ছেলে—সে লক্ষ করছে না—ট্রাফিকের পুলিস হাত বাড়িয়ে কার অদৃশ্য চুলের মুঠি ধরল—হঠাৎ থেমে দুলতে থাকে গাড়ি—

সঞ্জয় তার দিকে তাকিয়ে বলে—শরীর কেমন?

ললিত মাথা নাড়ে—ভাল। বেশ ভাল।

—শালা বেজন্মা মেরে গেল। ধরতে পারলে শালাকে...

ললিত চুপ করে থাকে। দুরদুর করে বুক—পাখির মতো।

কিন্তু সঞ্জয় কথা ঘুরিয়ে নিল। চাপা গলায় বলল—অনেক দিন মারধর খাইনি—বুঝলি—পেটে চর্বি জমে গেছে, লাথিটা লাগতেই দম আটকে গেল। মনে হল, মরে যাচ্ছি। আসলে বয়স—বুঝলি! এই বয়সে চোট-কোট লাগলে ভড়কে যাই...

সরে যাচ্ছে ট্রাফিক-পুলিসের হাত। গীয়ার বদলের শব্দ হয়। সঞ্জয় হাসে, বলে—লাথিটা লেগে দম আটকে যেতেই মনটা হায় হায় করে উঠল। কত কিছু বাকী রয়ে গেল জীবনে—কতরকমভাবে বাঁচা যেত! তখন আমি তাড়াতাড়ি ভেবে দেখছিলাম কোন কাজটা সবচেয়ে জরুরী যেটা আমি বাকী রেখে যাচ্ছি! হঠাৎ মাইরি আমার ভেতর থেকে একটা চ্যাঁচানি বেরিয়ে আসছিল—চার হাজার টাকা—চার হাজার টাকার চেকটা কোথায় গেল!

ললিত অবাক হয়ে বলে—কিসের চার হাজার টাকা?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে—তখন কি আমিই জানি কিসের চার হাজার টাকা! কিন্তু মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে আমি কেবল ঐ চার হাজার টাকার কথা ভাবছি। তখন আমার পিকলুর মুখ মনে পড়েনি—রিনির কথাও না—কেবল ঐ চার হাজার টাকার কথা। অথচ বুঝতে পারছি না কিসের টাকা। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল।...কী হয়েছিল জানিস?

হঠাৎ গলা খুব নীচু করল সঞ্জয়, প্রায় ফিসফিস করে বলল—আমার যে ছোট্ট কোম্পানিটা আছে তার একটা বকেয়া পেমেন্টের জন্য পরশুদিন দাদার হাতে একটা চার হাজারী বেয়ারার চেক দিয়েছিলাম। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক—দাদার আর আমার সই থাকে। আজ বেলা এগারোটা নাগাদ ফোন করে দাদা জানাল যে, পরশুদিনই চেকটা দাদার পকেটমার হয়ে গেছে। বুকপকেটে রেখেছিল টের পায়নি। আজ ব্যাঙ্ক খোলার ঘণ্টাখানেক পরে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, কিন্তু চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফোন করলাম। এজেন্ট আমার চেনা লোক, তক্ষুনি ক্যাশ থেকে লোক ডেকে পাঠাল। আমি তাকে চেক-এর নম্বর দিয়ে বললাম যে, যে লোকটা আজ চেকটা ক্যাশ করেছে তার চেহারাটা মনে আছে কিনা। লোকটা স্পষ্ট কিছু বলতে পারল না, কিন্তু আবছাভাবে যা বলল তাতে চেহারাটা একজনের সঙ্গে মিলে যায়। যদি সেই লোকটাই চেক ক্যাশ করে থাকে তবে এটা নিশ্চিত যে, চেকটা দাদার পকেটমার হয়নি—বুঝলি! তা ছাড়া দাদা আবার সব জিনিসই তার মানিব্যাগে রাখে—এমন কি দেশলাইটা পর্যন্ত—তবে চেকটা বুকপকেটে রাখতে গেল কেন? তাই সারা দিন আমি মনে মনে চেকটা ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম—কোথা থেকে কীভাবে কার মারফত গিয়েছিল চেকটা—কীভাবে ধরা যাবে ব্যাপারটা। আর, যখন হঠাৎ আদিত্যর লাথি খেয়ে মরে যাচ্ছি তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঐ চেকটার জন্য কেঁদে উঠল। কিন্তু বিশ্বাস কর, টাকাটার জন্য নয়—আমার মাসের রোজগার ওর চেয়েও বেশী। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে চার চারটে হাজার টাকা আমার ঠকা রয়ে গেল—জিত হল না। আমার হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল একটা অঙ্ক—যার উত্তরটা আমি মনে মনে মিলিয়ে ফেলেছি—অথচ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে—খাতা টেনে নিচ্ছে গার্ড। চেঁচিয়ে বলছি—আর একটু সময় দাও—আর একটু—এই চার হাজার টাকার চেকটা ট্রেস করেই আমি চলে যাবো—আর কিছু না—। মাইরি, এখন হাসি পাচ্ছে—শালা, অন্তিম মুহূর্ত এসে গেল—পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি—অথচ কোনো ভালবাসার মানুষের কথা মনে পড়ল না? ঐ চেকটার মধ্যে এমন কী রস ছিল যে, পিকলুর কথা—রিনির কথা মনে পড়ল না?

পার্ক স্ট্রীটে গাড়ি ঘুরিয়ে থামিয়ে ফেলেছিল সঞ্জয়, বলল—নামবি? একটু সেলিব্রেট করে যাই চল।

—কিসের সেলিব্রেট?

—আদিত্যের লাথিটার।

ললিত ম্লান হেসে মাথা নাড়ে—না। আমার ওসব বারণ।

—ঠিক তো! ভুলে গিয়েছিলাম। বলে জিভে আফসোসের চুক্ চুক্ শব্দ করে সঞ্জয়। গাড়ি ছেড়ে বলে—তা হলে চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ একটু লোড করতেই হবে। বডি পড়ে যাচ্ছে মাইরি!

বাসায় এসে ললিত শুনল তুলসী এসে ফিরে গেছে।

—ওকে ধরে রাখলে না কেন মা?

—অনেকক্ষণ বসে ছিল তো। সিনেমার টিকিট কাটা ছিল বলে চলে গেল। খুব খুশী ছিল আজ, বলল কোথাকার ফুটবল খেলায় ও গোল দিয়েছে।

—গোল! কিসের গোল?

—কী জানি।

তলপেটটা ফুলে ঢিবি হয়ে আছে। ভারী। যেন ন' মাসের বাচ্চা রয়েছে পেটে। দাঁতে দাঁত টিপে হাসল সঞ্জয়।

লক্ষ্মীকান্তকে ছেড়ে দিল রাসবিহারীর মোড়ে। লক্ষ্মীকান্ত নেমে যাওয়ার সময়ে সঞ্জয় নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—খবর ঠিক তো?

—ঠিক—লক্ষ্মীকান্ত মাথা নাড়ে।

ঠিক। খবর ঠিক। তিন কাঠা জমি, চার হাজার করে কাঠায় কেনা। সরলা সেনের নামে। উত্তরপাড়ায়। খবর ঠিক।

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরা এক হাতে, অন্য হাতে আবার ছোটো আয়নাটা ঘুরিয়ে মুখ দেখে সঞ্জয়, বলে—কী মিস্টার সেন, খুব

এই সেটই হয়ে গেল তো? হয়তো বলবেন ছোট হে, সারতে সময় লাগবে। চাই কি প্রেসিডেন্ট প্যান্ত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সুখে নেই হে তুমি, যতই গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আগলাও, কোথা থেকে যে সংসারের লাথিটা আসবে, টেরই পাবে না।

দাঁত চেপে হাসে সঞ্জয়। গাড়ি চালায় পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

ব্যাঙ্কের লোকটার সঙ্গে সাতটায় অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট। মোকাম্বোর সামনে।

সঞ্জয় এসে দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বেঁটে ভালমানুষের মতো চেহারা। পরনে শার্ট প্যাণ্ট, লম্বা চুলের মধ্যে লুকোনো একটা টিকি আছে। সঞ্জয় জানে। অবাঙালী, কিন্তু অনর্গল বাংলা বলতে পারে। এই সাহেবী জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটা অস্বস্তি বোধ করছিল, সঞ্জয়কে দেখে স্বস্তির হাসি হেসে এগিয়ে এল—মিস্টার সেন...

সঞ্জয় তাকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে বসল। ছট ডগ আর হুইস্কি বলে দিল। চুপ করে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। লোকটা চোরা চোখে চারদিকে চেয়ে স্বপ্নের মতো আলো আর স্বপ্নের মানুষজন দেখছে।

মৃদু হাসে সঞ্জয়। লোকটা কাঁটা ছুরির ব্যবহার জানে না। সেটা চাপা দেওয়ার জন্য খুব সন্তর্পণে ছুরি চালাচ্ছে—যেন শব্দ না হয়—কিন্তু শক্ত রুটির টুকরো কাটতে পারছে না—পিছলে যাচ্ছে ছুরি।

সঞ্জয় মুখ ফিরিয়ে নেয়। যা তুমি জানো না, তা তুমি জানো না—তাতে কী এসে যায়—পৃথিবীতে সরলভাবে বেঁচে থাকো।

খাওয়া হয়ে গেলে লোকটাকে পাশে বসিয়ে আবার গাড়ি হাঁকে সঞ্জয়। নীচু গলায় বলে—আপনি গাড়িতেই বসে থাকবেন। আমি লোকটাকে গাড়ির কাছে নিয়ে আসবো। ওখানে রাস্তায় খুব আলো নেই, চিনতে পারবেন তো?

লোকটা ইতস্তত করে, তারপর এক পেগ হুইস্কির নেশায় একটু হাসে—চেষ্টা করব।

কালীঘাটের সদানন্দ রোডের একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করায় সঞ্জয়। এইখানেই থাকে তার দাদা অজয়ের শালা সমরেন্দ্র।

চারদিকে জ্যোতিষীর বই ছড়ানো, বিছানার ওপর বসেছিল লোকটা। রোগা, খুব লম্বা নয়। পাকানো চেহারা। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। সঞ্জয়কে দেখে বলে উঠল—আরে!

হাসল সঞ্জয়—আপনি ছক দেখে বলেছিলেন ডিসেম্বরের আগে আমার গাড়ি হবে না। অগাস্টেই হয়ে গেল।

—শুনেছি। কাল অজয় বলছিল।

—গাড়িটা এনেছি। দেখবেন না?

—ব'সো, ব'সো—

মাথা নাড়ে সঞ্জয়। না।

—গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম দেখিয়ে যাই। বসব না।

কিছুক্ষণ পর ব্যাঙ্কের লোকটাকে গড়িয়াহাটায় ছেড়ে দিল সঞ্জয়। যশোদা ভবনের দিকে চলে গেল লোকটা। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। লোকটা চিনতে পেরেছে। এই সেই লোক। সঞ্জয় মৃদু হাসে আপনমনে।

রোজই ভুল হয়ে যায়। এখনো কেনা হয়নি রিনির রোজি ক্রিম আর পিকলুর বিলিতী ফিডার। আজ কিনে নিল সঞ্জয় গড়িয়াহাটার প্রকাণ্ড দোকান থেকে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার ভালবাসার লোকজন বোধ হয় খুব কমই আছে পৃথিবীতে। যখন সে ভাবছিল এই তার শেষ মুহূর্ত—মরে যাচ্ছে সে—তখন তার রিনি কিংবা পিকলুর কথা মনে পড়তে পারত—কিংবা অনীতা—তার অন্ধ বোনটির কথা—হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসে চুপ করে পাশ ঘেঁষে বসে থাকে—কিংবা মা—কিংবা যে-কেউ—কিন্তু মনে পড়েনি। কেবল একটা চার হাজারী চেক-এর কথা মনে পড়েছিল। আশ্চর্য! তবে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? অ্যাঁ? কী?...একটু শিউরে উঠে মৃদু হাসে সঞ্জয়। ঠিক আছে। তবে তাই হোক। আমেন।

বাসায় ফিরে দেখল বাইরের [illegible] মুখে তার দাদা অজয় বসে [illegible]। টেবিলে খালি চায়ের কাপ, [illegible] চাপায় ভাঁজ করা একটা নতুন [illegible]।

—কী ব্যাপার!

অপরাধী মুখে দাদা বলে—[illegible] সই করে দে। পেমেন্টটা আটকে আছে।

এই লোকটা—অজয়—তার দাদা এক সময়ে ব্যাঙ্কের পিওন ছিল, খাকী পোশাক পরা লোকটা সাহেবদের সেলাম দিয়েছে অনেক। অনেক দিন আগে এ লোকটাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল প্রায় অকারণে। সেই থেকে দরিদ্র সঞ্জয় আলাদা হয়ে গেল, এখনো আলাদা রয়েছে তাদের পরিবার। এখন লোকটার চোখে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের চকচকে চশমা, গায়ে নীল টেরিকট, গাল কামানো, মাথায় অভিজাত গোলাপী রঙের টাক। তবু ব্যাঙ্কের পিওন ছিল—আর তাকে একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল বলে অজয়কে খাতির করে না সঞ্জয়, তার সামনেই সিগারেট খায়, মদের গন্ধ লুকোতে চেষ্টা করে না।

সঞ্জয় উত্তর দিল না। ধীরেসুস্থে জামা প্যাণ্ট ছেড়ে বাথরুম ঘুরে ডাইনিং টেবিলে এসে চায়ের সামনে বসল। অনেকটা সময় নিল সে।

তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখল অজয় স্থিরভাবে বসে আছে। তাকে দেখে একটু নড়ল।

নিঃশব্দে চেকটা সই করে দিল সঞ্জয়।

একবার ইচ্ছে হল বলে যে, যে লোকটা চেক ভাঙিয়েছিল তাকে চিনতে পেরেছে ব্যাঙ্কের ক্যাশ-ক্লার্ক। শুনে অজয় চমকে উঠে সাদা মুখে তাকাবে। কিংবা সঞ্জয় ইচ্ছে করলে বলতে পারে, উত্তরপাড়ায় বউদির নামে জমি কিনেছো—আমি কি জানি না?

জানে। সঞ্জয় সব জানে। কিন্তু তার ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না। অজয়কে নিরাপদে চলে যেতে দেয় সে।

তলপেট ভারী হয়ে আছে। কত দূর গড়াবে কে জানে। একদিন আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দেবো। যুক্তলে রিনি। সব ছেড়েছুড়ে—তারপর সাধু হয়ে যাবো রমেনের মতো। না, রমেনের মতো নয়। রমেন সব কিছুর মাঝখান থেকে হঠাৎ খেলা ভেঙে উঠে গিয়েছিল। আমি তত দূর পারবো না। আগে কোম্পানীটা ট্র্যান্সফার করব অনীতার নামে—আহা, অন্ধ বোনটা—টাকা ছাড়া কে আর ওকে পথ দেখাবে? তোমার আর পিকলুর জন্য ব্যাঙ্কে রাখব কয়েক লাখ টাকা—তারপর—হ্যাঁ, তারপর সাধু হয়ে যাওয়া যায়। তারপর সাধু হওয়া শক্ত নয়।

(ক্রমশ)

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

গোপালচন্দ্র রায়

৮ ॥ তিন ॥

শিবপুরের বি ই কলেজের অধ্যাপক কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন স্নেহভাজন বন্ধু। এই সুরেনবাবুর মাধ্যমেই তাঁর ছোট ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়।

দ্বিজেনবাবু ছিলেন কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন। তাঁর কোয়ার্টার ছিল গঙ্গার ধারে হাসপাতালের প্রকাণ্ড ছাদের উপরে। দ্বিজেনবাবু বৃত্তিতে চিকিৎসক হলেও একজন সাহিত্য-রসিক ও সঙ্গীত-প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর কোয়ার্টারে হাপাতালের প্রশস্ত ছাদের উপরে একটা সুন্দর পরিবেশে সাহিত্যিক ও সঙ্গীত-শিল্পীদের নিয়মিত একটা আড্ডা বসত। ঐ আড্ডায় কখন কখন রবীন্দ্রনাথও গেছেন, আর শরৎচন্দ্রও যেতেন।

দ্বিজেনবাবুর বাসায় ছাদের উপরের ঐ আড্ডা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অমল হোমকে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—'দেখ, আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ যে কত বড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত! মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে গঙ্গার আলো হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা, আর শিবপুরে তার ভাই সুরেন মৈত্রর ওখানে, সেও ঐ গঙ্গার ধারে। তারপর তোমাদের ভারতীর আড্ডা। তেমনিটি আর হবে না।'

শরৎচন্দ্র এঁদের সব আড্ডাতেই যেতেন। গিয়ে গল্প করতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফেরেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। দেশে আসার অল্প দিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুরেন মৈত্রর এবং পরে দ্বিজেন মৈত্রর পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র এই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই ডিসেম্বর মাসে একদিন দ্বিজেনবাবুর বাসায় তাঁদের আড্ডায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি দ্বিজেনবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটা এই—

5, 1st By Lane,
Baje Shibpur,
Howrah,
19. 12. 16.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সেদিনের কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়। ভারি আনন্দে বিকালটা কেটেছিল। আর একদিন গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা

[illegible] কথাটা আমার প্রায়ই হয়। কিন্তু আপনার সময় বড় কম, পাছে বিঘ্ন [illegible] সেই ভয়েই ওদিকে যেতে পারি না। [illegible] যেন ত আর একদিন গিয়ে পড়ি। [illegible] আমার নিজের একটু গরজ আছে। আমি পল্লী কাহিনী বলে একটা বই লিখছি এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে এবং সুরেন বাবুর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই

5. 1st Bye Lane
Baje Shibpur
Howrah

19 12/16

~~[illegible]~~

শ্রদ্ধাস্পদেষু —

সেদিনের কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়।
ভারি আনন্দে বিকালটা কেটেছিল।
আর একদিন গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা
বার্তা কহবার লোভটা আমার প্রায়ই হয়।
কিন্তু, আপনার সময় বড় কম, পাছে বিঘ্ন
হয় সেই ভয়েই ওদিকে যেতে পারিনে।
তবু যেন ত আর একদিন গিয়ে পড়ি।
তা ছাড়া আমার নিজের একটু গরজ আছে।
আমি পল্লী-কাহিনী বলে একটা বই
লিখচি। এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে
এবং সুরেনবাবুর সঙ্গে একটু আলোচনা
করতে চাই। আর কিছু [illegible]
[illegible]
পল্লী সম্বন্ধে আমার নিজের অনেক
মত [illegible] কিছু [illegible]
[illegible]
[illegible]

যদি দু এক দিন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।
ইতি শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আর কিছু না হোক তাতে উপদেশ দেওয়াটা ত হবে।

পল্লী সমাজে আমার নিজের খেয়াল মত যা হোক একটা কিছু লিখেছিলাম। এবার পাড়া গাঁয়ের কোন্ বিশেষ দিকটা নেব তাই ভাবছি।

যদি দু ছত্র লিখে সময়টা নির্দেশ করে দেন ত সেই মত যাবো।

আমার তামাকের বন্দোবস্তটা কিন্তু এবার নেহাত চাইই। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

নিঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে যে 'পল্লী কাহিনী' লেখার কথা বলেছেন, সেই পল্লী-কাহিনী বইটির তেমন কোন নির্দিষ্ট হদিস পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে—হয় তিনি ঐ কাহিনীটি লিখতে লিখতে ত্যাগ করেছিলেন, নয়ত পল্লী কাহিনীকে তাঁর ঐ সময়কার লেখা কোন বইয়ের নামে নামকরণ করেছিলেন।

কিন্তু একাধিক ব্যক্তির কাছে বলা, শরৎচন্দ্রের একটা কথা থেকে জানা যায় যে, তাঁর লেখা একটা বই তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলু নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই এ থেকে মনে হয়, শরৎচন্দ্র পল্লী-কাহিনী লিখে শেষ করেছিলেন এবং ভেলু এই বইটিই হয়ত নষ্ট করেছিল।

ভেলুর এই বই নষ্ট করা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর পার্শ্বচর বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায়কে যা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে মণিবাবু লিখেছেন—'আমায় একদিন দুঃখ করে বললেন—মণি, ভেলু আমার সর্বনাশ করেছে—একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভেলু একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কী বা বলবো ওকে—ও বোধ হয় বুঝতে পারেনি, বুঝলে কখনই এ কাজ করত না।'—নবশক্তি, ১লা আশ্বিন ১৩৩৮।

শরৎচন্দ্র ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে গেলে, সেখানে কবি সজনী ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গেও এ নিয়ে কথা হয়েছিল। সজনীবাবু তাঁর 'শরৎ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'...জিজ্ঞেস করা হ'ল—আপনার মালিনী না কি একখানা বই নষ্ট হয়ে গেছে, না?

—হ্যাঁ। ভেলু (প্রিয় কুকুর) নষ্ট করে ফেলেছিল। আমি আলগা কাগজে লিখি। সেদিন লিখবার ঘরের দরজাটা খোলা রেখেই পায়খানায় গিয়েছিলুম। ভেলু বই ছিঁড়ত না, আলগা কাগজ ছিঁড়ত। পায়খানা থেকে এসে দেখি, এক তাল কাগজ নিয়ে ভেলু ছুটোছুটি করছে—ছিঁড়ে কামড়ে ল্যাফ্‌টে সব শেষ করে দিয়েছে। এক বছরের পরিশ্রম গেল।'

দ্বিজেনবাবুকে লেখা এই চিঠিটিতে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র পল্লী-কাহিনী নিয়ে দ্বিজেনবাবু ও সুরেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেনবাবু 'বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ' বা 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর' সম্পাদক ছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন।

॥ চার ॥

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ১ম পর্বের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন, কে সি সেন ও থিয়োডোসিয়া টমসন। এবং ঐ বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন, বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ এড্‌ওয়ার্ড জে টমসন। থিয়োডোসিয়া টমসন এডওয়ার্ড টমসনেরই কেউ ছিলেন বলে মনে হয়।

কে সি সেন বা ক্ষিতীশচন্দ্র সেন হলেন বোম্বে হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব জজ। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে পূর্ব পল্লীতে ক্ষিতীশবাবুর 'রক্ত-করবী' ভবনে শ্রীকান্ত ইংরাজি অনুবাদ করা সম্পর্কে ক্ষিতীশবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে ক্ষিতীশবাবু সেদিন বলেছিলেন—

সেটা বোধ হয় ১৯২০।২১ খ্রীষ্টাব্দ হবে। আমি তখন মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি

অনেকটা ইংরেজি কাগজে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করছি। সেই সময় একদিন আমি বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাই। গেলে সেদিন শরৎচন্দ্রের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। সেই হিসাবেই পরে আমি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ইংরেজি অনুবাদ করি। আমি অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপিটি শরৎচন্দ্রকে পড়তে দিই। আমার অনুবাদ শরৎচন্দ্রের তেমন পছন্দ না হওয়ায় তিনি এক ইংরাজ ভদ্রমহিলাকে ওটা দেখতে দেন। ভদ্রমহিলা কিছু কিছু সংশোধন করে ছিলেন বলে তখন দুজনের নামেই বইটা বেরিয়েছিল। তবে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আবার যখন আমি ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করাই, তখন ঐ ভদ্রমহিলার সংশোধনগুলো বাদ দিয়ে আমার লেখাই প্রকাশ করেছিলাম। তাই ২য় সংস্করণে অনুবাদক হিসাবে শুধু আমার নামই ছিল।

শ্রীকান্ত ১ম পর্ব ইংরাজি অনুবাদের ১ম সংস্করণ থিয়োডোসিয়া টমসন সংশোধন করা সত্ত্বেও, এ বই শরৎচন্দ্রের তেমন পছন্দ হয়নি। এই যে পছন্দ হয়নি, এর প্রমাণ পাই শ্রীমতী গারট্রুড সেনকে লেখা একটি চিঠিতে।

এই গারট্রুড সেন হলেন, বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেনের স্ত্রী। বশীশ্বর সেন ও তাঁর স্ত্রী বর্তমানে আলমোড়ায় বাস করছেন। বশীশ্বরবাবু আগে দীর্ঘদিন কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বশীশ্বরবাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে গারট্রুড সেনের নাম ছিল গারট্রুড এমারসন। ইনি আমেরিকার বিখ্যাত কবি প্রবন্ধকার ও দার্শনিক রালফ ওয়ালডো এমারসনের পৌত্রী।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গারট্রুড সেনের পরিচয় ছিল, তাই দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি'র ইংরাজি অনুবাদ করলে তখন একখানা ঐ অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়ার জন্য শ্রীমতী সেন শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তখন দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন—

'বশীশ্বর সেনের আমেরিকান স্ত্রী আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তোমার নিষ্কৃতির অনুবাদ দেখবেন বলে। খবর পেয়েছেন তাতে শ্রীঅরবিন্দের কলমের দাগ পড়েছে, তাই প্রবল আগ্রহ। বলেন, এর একটা কপি তিনি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমেরিকা নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে ছিলেন 'এশিয়া' কাগজের এডিটর, সেখানকার বহু পাবলিশারের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি ভাবি এটা নিষ্কৃতি না হয়ে শ্রীকান্ত হলেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে নিষ্কৃতি আদর পাবে কিসের জোরে।'

শরৎচন্দ্র শ্রীমতী সেনকে তখন নিষ্কৃতির অনুবাদ দিতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে দিলীপবাবুকে এই চিঠি লেখার দিন কয়েক পরে শরৎচন্দ্র শ্রীমতী সেনকে একখানা ইংরাজি শ্রীকান্ত ১ম পর্ব দিয়েছিলেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্র শ্রীমতী সেনকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা এই—

P 566 Monoharpukur,
Kalighat, Cal.
2. 4. 35

Dear Mrs. Sen,

I am sending my car and a copy of Srikanta in English. This was the only copy available from the publishers as the edition has been completely exhausted.

I did not want much to give it to you as I thought the translation was done really very badly, however.

As you go home and Boshi to his father-in-law's my best wishes or rather 'Ashirvad' to you both. Please write to me sometimes if you find time.

Yours Sincerely,
Sarat C. Chatterjee

I have a Hope that by the time you come back to India, I would though very old, be still alive.

॥ পাঁচ ॥

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন এক সময় বাংলা কংগ্রেসের 'বিগ্ ফাইভ' বা পঞ্চ প্রধানের একজন, আর শরৎচন্দ্রও ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, তাই এই কংগ্রেসের সূত্রেই নির্মলবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

নির্মলবাবু পেশায় এটর্নী হলেও সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। তাই তিনি এক সময় সম্পাদক হিসাবে নিজের নামের সঙ্গে শরৎচন্দ্রেরও নাম দিয়ে দুজনের নামে একটা সাপ্তাহিক কাগজও বার করেছিলেন।

নির্মলবাবু এটর্নী ছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের বিষয়াদির দলিলপত্র নির্মলবাবুই করতেন। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্মলবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি এখানে দেওয়া গেল—

গ্রাম সামতাবেড়
পোস্ট পানিত্রাস, জেলা হাওড়া
৪ঠা ডিসেম্বর '২৫

পরম কল্যাণবরেষু,

কাল রাত্রে লোকের হাত মারফৎ তোমার চিঠি এবং মদন সাহেবের১ contract পত্র পেলাম। সাহেবের ঔদার্য দেখে চোখে জল এল। নগদ পাঁচশ এবং ভবিষ্যতে দুশো এতো সোজা টাকা নয়।২ ব্রাহ্মণ সন্তান যুগলের সম্পদ।৩ আমার সমস্ত বই এখন থেকে পনেরো বৎসরের জন্য৪ তাঁর মর্জি ও খোশ খেয়ালের উপরে নির্ভর করছে—এ আর বেশি কথা কি?

তবে আর একটা জরুরি সর্ত তিনি বোধ করি তাড়াতাড়ির জন্যেই করে নিতে ভুলে গেছেন। গ্রন্থকারকে এই পনেরো বৎসর একবার সকালে ও একবার বিকালে গিয়ে কুর্নিশ করে আসতে হবে। আমার মনে হয় শুধু একখানা বইয়ের জন্য ও-টাকা ঢের বেশি। সুতরাং এই clauseটুকু চুকিয়ে নিলে দেখতে শুনতে সবদিকেই বেশটি হবে।

চিতু ভায়ার৫ সাধ, এবং আমিও 'পণ্ডিত মশাই'র জন্য কথা দিয়েছি। নইলে,—থাক।

দিন ১০।১২ হল আমি এ বাড়িতে আছি। পরশু বোধ করি একবার যাবো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আশা করি বউমা ও ছেলেরা ভাল আছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—

দাদা

১। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ম্যাডান থিয়েটারের মালিক ম্যাডান সাহেব। ইনি একজন পার্শী ছিলেন। এখন কলকাতার যেটা এলিট সিনেমা, আগে ঐটিই ছিল ম্যাডান থিয়েটার।

২। টাকা অল্প হওয়ার জন্যই শরৎচন্দ্র এই কথা লিখেছিলেন। কারণ ঐ সময় তিনি তাঁর এক একটা বই সিনেমা করবার জন্য নগদ দেড় হাজার টাকা করে নিয়ে দিতেন। বিভিন্ন চিত্রপ্রযোজক প্রভৃতিকে লেখা শরৎচন্দ্রের ঐ সময়কার এ সংক্রান্ত চিঠিপত্র থেকে এই টাকার অঙ্কটা জানা যায়।

৩। খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র নিজেকে এবং ছোট ভাই প্রকাশকে মনে করেই এ কথা বলেছিলেন।

৪। মনে হয় শরৎচন্দ্র তাঁর কোন কোন বই পনের বছরের সিনেমা-স্বত্বে ম্যাডান সাহেবকে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন।

৫। চিত্ত ঘোষ। ইনি ছিলেন ফিল্ম ল্যান্ড কাগজের সম্পাদক। চিত্তবাবু শরৎচন্দ্র এবং ম্যাডান সাহেব উভয়েরই খুব পরিচিত ছিলেন।

॥ ছয় ॥

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন বঙ্গবাণী অফিসে গেলে বঙ্গবাণীর অন্যতম মালিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁর সহপাঠী বন্ধু নির্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের হাত দেখেছিলেন। নির্মলবাবু কিন্তু তখনও শরৎচন্দ্রকে চিনতেন না। হাত দেবার পর জানতে পারেন। নির্মলবাবু শরৎচন্দ্রের হাতের রেখা দেখে শরৎচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বলে দিলে শরৎচন্দ্র তাঁর উপর খুব প্রসন্ন হন এবং তাঁর কাছে হাত দেখা শিখতে চান।

পরে এই নির্মলবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয়ের মধ্যে কয়েকটা চিঠিপত্রেরও বিনিময় হয়েছিল।

নির্মলবাবুর বাড়ি বাঁকুড়া শহরে। তাই তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি তাঁর কাছে আছে কিনা জানবার জন্য তাঁকে চিঠি দিলে তিনি উত্তরে আমাকে লিখেছিলেন—'...উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার একান্ত বন্ধু স্থানীয় সহপাঠী। আমরা উভয়ে শরৎচন্দ্রের সহিত দেখাশুনা ও নানা আলোচনা স্যার আশুতোষের বাড়িতে ও শরৎচন্দ্রের পল্লীগৃহে করিয়াছি। স্যার আশুতোষের গৃহেতে শরৎবাবুর হাত দেখার সৌভাগ্য আমার হয় এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েকটি পত্রালাপ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া মাত্র একটি পোস্ট কার্ড পাইলাম। তাহারই ট্রু কপি আপনার নিকট পাঠাইলাম। শরৎবাবু মহাপ্রাণ দরদী লেখক ছিলেন এবং বাঙলার নারীর সমাজের ও দেশের দুঃখে আমার নিকট অশ্রুপাতও করিয়াছিলেন।'

নির্মলবাবু তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন তা এই—

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

পরমকল্যাণীয়েষু,

নির্মল, ঠিকানাটা ঠিক না থাকার জন্য তোমার চিঠিখানি হাতে পেতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। যাই হোক, মারা যাই নি। দেহ নিয়ে কি দুঃখটাই পেলাম। তবে এখন মনে হয় ভালর দিকেই যাচ্ছে।

একটা কথা। আমার হাতের লেখাও তোমার মনে আছে। বলতে পার 'পথের দাবী'র দ্বিতীয় সংস্করণ করালে না সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

বোধ হয় ২।৪ দিনে একবার কাশী যাবো। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইতি ৮ই কার্তিক ৩৩

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাকে লেখা চিঠিটিতে নির্মলবাবু 'বাঙলার নারী সমাজের ও দেশের দুঃখে শরৎচন্দ্রের অশ্রুপাত করার' যে কথা লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের ঐরূপ অশ্রুপাত করার কথা আমি আরও জানি। দেশের পরাধীনতার দুঃখে শরৎচন্দ্রের অশ্রুপাত করার একটা ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি—

দেশবন্ধুর সহকর্মী হিসাবেই সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। বাঙলা দেশের ফজলুল হকের কোয়লিশন মন্ত্রিসভার সামনে এই সত্যেনবাবু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (উচ্চতর পরিষদের) সভাপতি ছিলেন।

শহীদ সুশীলকুমার দাশগুপ্তর দাদা সেকালের কংগ্রেস কর্মী বিনয়কুমার দাশগুপ্ত (বিনয়বাবু বর্তমানে ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের কাছে কালিয়ানগর কলোনীতে বাস করছেন) একদিন আমাকে বলেছিলেন—

সত্যেন মিত্র যখন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সেই সময় একদিন রবিবারে দুপুরের দিকে আমি শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। শরৎচন্দ্র আমাকে স্নেহ করতেন, তাই তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে সেদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

আমি গেলে দু একটা কথার পর শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন—সত্যেন মিত্রকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

আমি সত্যেনবাবুর বাড়ি থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলে, শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে বসিয়ে আবেগ ভরে বললেন—সত্যেন, দেশটা কিভাবে কবে স্বাধীন হবে বলতে পার?

শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে যখন এই কথাগুলো বলেন তখন ঘরে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। দেখলাম শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে ঐ কথাগুলো বলবার সময় তাঁর দু চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সমাপ্ত

কবি বনারসীদাস জৈনের আত্মজীবনী—অর্ধকথানক

অসীমকুমার রায়

১৬৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ১৬৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে শাজাহানের রাজত্বকালে বনারসীদাস জৈন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন। তখন তাঁর বয়স ৫৫ বছর। বনারসীদাসের বিশ্বাস ছিল যে মানুষের পরমায়ু ১১০ বছর। তাই ঠিক অর্ধেক জীবনে লেখা আত্মজীবনীর নাম তিনি দেন অর্ধকথানক।

উত্তর ভারতে বনারসীদাস ছাড়া ইংরেজ-পূর্বকালে কেউ আত্মজীবনী লেখেননি। (বাবর আর জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর কথা অবশ্য ধরছি না।) একমাত্র আত্মজীবনী বলেই কিন্তু শুধু এই বইয়ের মূল্য নয়। যথাসম্ভব সত্য কথা বলে নিজের দোষগুণ, বোকামি, কুৎসিত রোগ, ভাগ্যবিড়ম্বনা, সৌভাগ্য ইত্যাদি যথাযথ বর্ণনা করে, অকবর ও জাহাঙ্গীরের যুগের উত্তর ভারতের যে ছবি বনারসীদাস এঁকেছেন সে রকম আর কোন বই থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

আত্মজীবনী লেখা যে বড় কঠিন কাজ সে কথা বনারসীদাস ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন। একটা মানুষের মাত্র একদিনের জীবনেই যে কত ঘটনা ঘটে তাও বর্ণনা করা অসম্ভব—

এক জীবকী একদিন,
    দসা হোই জো তীক।
সো কহি ন সকে কেবলী,
    জানৈ জদ্যপি ঠীক॥ ৬৬০

'একটি জীবের একদিনে যত দশা হয়, সেগুলি ঠিক ঠিক জেনেও তার বর্ণনা করতে কেবলজ্ঞানীও অসমর্থ'।

বনারসীদাস কোন নামজাদা লোক ছিলেন না। লেখবার শখ ছিল বলে দু-চার খানা ধর্ম সম্বন্ধীয় বই লেখা ছাড়া তিনি বিশেষ আর কিছু লেখেননি। তিনি সাধারণ বেনের ছেলে ছিলেন। সোনারুপো বা কাপড় ইত্যাদি জিনিসের কেনাবেচা করা তাঁর ব্যবসা ছিল। কিন্তু তবু তিন শ' বছর আগের উত্তর ভারতের সজীব ছবি পাওয়া যায় বলে তাঁর আত্মজীবনী পড়তে ভাল লাগে—'আমি যার জীবনের কথা শুনতাম, সেদিন শুনাবে তাহা কাঁদিবের সব'।

বনারসীদাসের পিতামহ মূলদাস মালবের নবাবের মুদী ছিলেন। তাঁর সেখানে কিছু জাগীর ও অন্যান্য সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু সেকালে জাগীরদারদের পুরো সম্পত্তি শেষ ভিউটিতে চলে যেত বলে পুত্র খড়্গসেন পিতার মৃত্যুর (১৬৬৩ খৃীঃ) পর কোন সম্পত্তি পাননি। নবাব এসে তাঁর পিতার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন।

আউ মুগল উতাবলো,
    সুনি মূলাকো কাল।
মুহর ছাপ ঘর খালসে,
    কীনো লীনো মাল॥ ২২

তখন খড়্গসেন তাঁর মার সঙ্গে জৌনপুরে মাতামহ মদনসিংহ জোহুরী বাড়িতে এসে ওঠেন। খড়্গসেনের বয়স তখন পাঁচ বছর। আট বছর বয়সে খড়্গসেন লেখাপড়া আরম্ভ করলেন, আর হাটে বসে সোনারুপোর কারবার শিখতে লাগলেন। তারপর আরও চার বছর পরে তিনি রোজগারের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। বাঙলা দেশের সুলতান সুলেমান পাঠানের শালা লোদী খানের দেওয়ান ছিলেন ধন্না রায়। খড়্গসেন তাঁর কাছে চাকরীর চেষ্টায় গেলেন। ধন্না রায় খড়্গসেনকে চারটি পরগনার পোতদার বানিয়ে দিলেন। খড়্গসেনের সঙ্গে দুজন কারকুন (কেরানী) দেওয়া হল, আর তিনি খাজনা আদায় করে সেই টাকা লোদী খাঁর জন্য ধন্না রায়কে পাঠাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে ধন্না রায় পেটে শূল হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন।। খবর পেয়ে খড়্গসেন চাকরী ছেড়ে পালিয়ে সোজা মার কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর।

বছর চারেক জৌনপুরে থেকে খড়্গসেন ব্যবসার জন্য আগ্রাতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। আরও চার বছর পরে, বাইশ বছর বয়সে মীরাটের সুরদাস শ্রীমালের মেয়েকে খড়্গসেন বিয়ে করলেন। ১৬৩৩ সংবতে খড়্গসেন জৌনপুরে ফিরে এসে মণিমুক্তোর ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৬৩৫ সংবতে তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, কিন্তু মাত্র দশ দিনের মধ্যে শিশু মারা যায়। তারপর দু' বছর পুত্রকামনায় স্বামীস্ত্রী রোহতকে সতীর স্থানে তীর্থ যাত্রা করেন, কিন্তু পথে চোরে সর্বস্ব লুঠে নেওয়াতে, দুজনে পরিহিত বস্ত্র মাত্র সম্বল করে বাড়ি ফিরে আসেন।

১৬৪৩ সংবতের (১৫৮৭ খৃীঃ) মাঘ মাসে বনারসীদাসের জন্ম হয়। পুত্র জন্মাবার ছ' সাত মাস পরে শিশুকে নিয়ে খড়্গসেন পার্শ্বনাথ যাত্রা করেন। সেখানকার পূজারী উপদেশ দেন যে পার্শ্বনাথের জন্মভূমি বারাণসীর নামে শিশুর নাম রেখো। তাই তাঁর নাম বনারসীদাস রাখা হয়।

পাঁচ বছর বয়সে বনারসীদাসের সংগ্রহণী (উদরাময়) হয়। এক বছর অনেক চিকিৎসা করার পর তিনি আরোগ্য হন। আবার একবছর ভাল থেকে তাঁর বসন্ত রোগ হয়। বসন্ত ভাল হবার কিছুদিন পরেই তাঁর একটি বোন জন্মায়।

যখন বালকের বয়স আট বছর, তখন তাঁকে চটসালে গুরু পাণ্ডের কাছে বিদ্যা শিখতে পাঠান হয়। এক বছর বিদ্যা শিখে তিনি ব্যুৎপন্ন হন।

বনারসীদাসের ন' বছর বয়সে খয়রাবাদের কল্যাণমলের পুরোহিত নাপিতের সঙ্গে এসে তাঁর সগাই (সম্বন্ধ) কল্যাণমলের মেয়ের সঙ্গে করে যান। ঠিক হয় যে, দু বছর পরে বিয়ে হবে।

তার পরের বছর ১৬৫৩ সংবতে অর্থাৎ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে দুর্ভিক্ষ হয়। ১৬৫৪ সংবতের মাঘ মাসে বনারসীদাস বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি আসেন। সেইদিনই তাঁর দিদিমার মৃত্যু হয় ও তাঁর আর একটি বোন জন্মায়।

মাস দুই পরে বউয়ের কাকা এসে ভাইঝিকে খয়রাবাদে নিয়ে যান। এদিকে জৌনপুরে তখন এক হুলস্থূল ব্যাপার। জৌনপুরের নবাব কিলিচ খান হঠাৎ সব জোহুরীদের ধরে জবরদস্তী টাকা আদায় আরম্ভ করলেন। (কিলিচ খান এলাহাবাদের তখনকার সুবেদার শাহজাদা দানিয়েলের গৃহশিক্ষক ও শ্বশুর ছিলেন।) জোহুরীদের ধরে প্রথমে তিনি কুঠুরীতে বন্ধ করলেন। যখন তাতে টাকা আদায় হল না তখন সবাইকে কাঁটা দেওয়া চাবুক মেরে আধমরা করে ছেড়ে দিলেন। জোহুরীরা সব বাড়ি এসে ভাবলেন যে এদেশে আর থাকা উচিত নয়। খড়্গসেন নিজের পরিবার নিয়ে পশ্চিমে গঙ্গা পেরিয়ে শাহজাদপুরে চলে এলেন। সেখান থেকে তিনি এলাহাবাদে এসে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। অকবরের ছেলে দানিয়েল তখন সেখানকার সুবেদার।

বসৈ প্রয়াগ ত্রিবেণী পাস।
    জাকৌ নাঁউ ইলাহাবাস॥
জহাঁ দানী বসুধা-পুরহূত।
    অকবর পাতিসাহকৌ পূত॥ ১০৩

বনারসীদাস এই সময় কিছুদিন ফত্তেপুরে, এলাহাবাদ ও আবার ফত্তেপুরে বাস করেন।

সংবত ১৬৫৬তে শোনা গেল যে, নবাব কিলিচ খান আগ্রা চলে গেছেন। তখন সব জোহুরীরা এক এক করে জৌনপুরে ফিরে এলেন। খড়্গসেনও ফিরে এসে কারবার আরম্ভ করে দিলেন। বছর খানেক শান্তিতে কাটল। তার পর হঠাৎ জৌনপুর শহরে একদিন যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব উঠল। জৌনপুরের নবাব তখন নুরম সুলতান। বাদশাহ তাঁকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, সলীম যিনি সেই সময় এলাহাবাদের সুবেদার ছিলেন তিনি যেন শিকার করতে কোলহুবন না যান। (সেই সময় সলীম অকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সলীমের মতলব ছিল যে নুরম খানের জায়গায় নিজের লোক লালাবেগকে জৌনপুরের নবাব বানান। তাই শিকারের ছুতো করে তিনি জৌনপুরের দিকে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলেন।) নুরম সুলতান সলীমকে ঠেকাবার জন্য বন্দোবস্ত করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধের আয়োজন দেখে প্রজারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বহু লোক নগর ছেড়ে পালাতে লাগল। জোহুরীরা সবাই নুরম খানকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা কি করবেন।

নুরম কহৈ সুনহু রে সাহু।
ভাবৈ ইহাঁ রহৌ কৈ জাহু॥
মেরো মরণ বনৌ হৈ আই।
মৈঁ ক্যা তুমকো কহৌ উপাই॥ ১৫৯

"নুরম সাহুদের বললেন যে তোমরা থাকবে না পালাবে নিজেরাই বুঝে ঠিক কর। আমার নিজের মরণ ঘনিয়ে এসেছে—আমি আর তোমাদের কি উপায় বলব।" এই কথা শুনে সবাই জৌনপুর থেকে পালালেন। দিন ছয় সাত পরে খবর পাওয়া গেল যে সলীম গোমতীর ধারে এসে লালাবেগকে শহরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নুরমকে বুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। নুরম গিয়ে সলীমের পা জড়িয়ে ধরাতে এখন দেশে শান্তি ফিরে এসেছে। এই খবর শুনে সকলে নিজের বাড়ি ফিরে এলেন।

এতদিনে বনারসীদাসের বয়স চোদ্দ বছর হয়েছে। পণ্ডিত দেবদত্তর কাছে তিনি বিদ্যা অভ্যাস করতে গেলেন। নামমালা (মহাকবি ধনঞ্জয়-কৃত সংস্কৃত কোষ), অনেকার্থ (ঐ কোষের অন্তিম অংশ), জ্যোতিষ, অলঙ্কার ছাড়া তিনি লঘু কোক-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করলেন। বিদ্যা লাভ করে বিদ্যা খাটাতেও দেরী হল না।

বিদ্যা কপাটি বিদ্যামৈঁ রমৈ।
সোলহসৈ সতবনে সমৈ॥
তজি কুল-কান লোককী লাজ।
ভয়ৌ বনারসী আসিখবাজ॥ ১৭০

চোদ্দ বছরের ছেলে বনারসীদাস কোক-শাস্ত্র পড়ে লোক লজ্জা ত্যাগ করে আসিখবাজ হয়ে উঠলেন। বাপের মণিমুক্তো চুরি করে পেসকসী পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এই বয়সে তিনি এক হাজার দোহা ও চৌপাইতে নবরস সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। এমনি করে দুবছর কাটল।

তব পঞ্চদস বরসকে,
তিস উপর দস মাস॥
চলে পাউনা করনকো,
কবি বনারসীদাস॥ ১৮২

যখন তাঁর বয়স পনর বছর দশ মাস কবি বনারসীদাস তখন স্ত্রীকে ঘরে আনতে চললেন। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এক মাস পরেই হঠাৎ তাঁর আসিখবাজির ফল আরম্ভ হল। তাঁর সারা শরীরে অগুনতি বিস্ফোটক বেরোল। শরীর কুষ্ঠ রোগীর মত হয়ে গেল। শালা শ্বশুর বা অন্য কোন লোক তাঁর সঙ্গে ভোজন করা ছেড়ে দিলেন। এই কুৎসিত রোগ হওয়াতে স্ত্রী আর শাশুড়ী ছাড়া সকলে তাঁর কাছে আসা ছেড়ে দিলেন। এঁরা দুজনও বেশী ক্ষণ গন্ধের চোটে তাঁর কাছে টিকতে পারতেন না—

ওখদ ল্যাবহিঁ অঙ্গমৈ, নাক মূদি উঠি জাঁহি। ১৮৮

"শরীরে কোন রকমে ঔষধ লাগিয়ে নাক বন্ধ করে উঠে যেতেন।"

ছয় মাস ভুগে ভাল হয়ে বনারসীদাস বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু

সাস সসুর অপনী সুতা,
গৌনৈ ভেজী নাঁহি।১৯০

শ্বশুর শাশুড়ী এইরকম জামাইয়ের সঙ্গে নিজের মেয়েকে পাঠাতে রাজি হলেন না। বনারসীদাসের মা বাপ লজ্জিত হয়ে ছেলেকে অনেক ভালোমন্দ বললেন, তবে তাঁর নিজের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হল না। তিনি আবার লেখাপড়া আর আসিখিতে মত্ত হলেন।

চার মাস পরে তিনি আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন।

বাড়িতে গুরুজনেরা ভাবলেন যে ছেলের চরিত্র দোষের একটা কারণ তাঁর লেখাপড়ায় বেশী মন। তাঁরা বললেন যে বেশী লেখাপড়া না করে একার ব্যবসায় মন দাও—

বহুত পঢ়ৈ বাম্ভন অরু ভাট।
বণিক পুত্র তো বৈঠে হাট॥
বহুত পঢ়ৈ সো মাঁগৈ ভীখ।
মানহু পুত্ত বড়ে কী সীখ॥ ২০০

"বেশী লেখাপড়া ব্রাহ্মণ আর ভাটেরা করে, বেনের ছেলে তো হাটে বসে। যে বেশী লেখাপড়া করে তাকে ভিক্ষে করে খেতে হয়। বড়দের কথা বাপু শুনতে হয়।" বনারসীদাস কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করলেন না, তিনি আগের মতই চলতে লাগলেন।

১৬৬০ সংবতে বনারসীদাসের প্রথম মেয়ে জন্মাল, কিন্তু মেয়ে ছয় সাত দিনের মধ্যেই মারা গেল।

এর আগের বছর তাঁর এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সন্ন্যাসী বলেছিল যে, তার কাছে এক মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্র যদি কেউ এক বছর প্রতিদিন পাইখানায় বসে জপ করে তাহলে বছর পূর্ণ হলে সে প্রতিদিন নিজের বাড়ির দরজার কাছে একটি করে দিনার (মোহর) কুড়িয়ে পাবে। বনারসীদাস লোভে পড়ে সন্ন্যাসীর হাতে পায়ে ধরে এই মন্ত্র শিখে নিয়ে এক বছর ধরে নিয়মমাফিক জপ করেন। যখন বছর পূর্ণ হল—

বরস এক জব পূরা ভয়া।
তব বনারসী দ্বারে গয়া॥
নীচী দিষ্টি বিলোকৈ ধরা।
কহুঁ দীনার ন পাবৈ পরা॥ ২১৬

তখন বনারসী বাড়ির দরজায় গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কোথাও কোন দিনার খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন যে তার পরদিন হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সেদিনও কিছু ছিল না। বুঝলেন যে এতদিন বৃথাই কষ্ট করেছেন।

এর কিছুদিন পরে আর এক যোগীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সে একটি ছোট শঙ্খ বনারসীদাসের হাতে দিয়ে বলে যে এটি একটি শিবমূর্তি। এটিকে পুজো করলে শিবলোক প্রাপ্ত হবে। সেই থেকে তিনি রোজ ভক্তিভরে শিবপুজো আরম্ভ করলেন।

সংবৎ ১৬৬১র চৈত্র মাসে সলীমের জোহুরী হীরানন্দ সব জৈনদের খবর পাঠালেন যে, তিনি সম্মেদশিখর (শিখর) পাহাড়ে সংঘ নিয়ে যাবেন, সব ধর্মভীরু জৈনরা যেন তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। বনারসীদাসের পিতা খড়্গসেনও এই কথা শুনে হীরানন্দের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গেলেন। যে সময় খড়্গসেন তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছিলেন সেই সময় বনারসীদাস একবার কাশী ঘুরে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে সংঘ তীর্থযাত্রা করে ফিরে এলো। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে মারা গিয়েছিল, আর অনেকে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খড়্গসেনও পথে পাটনায় খুব উদরের রোগে ভুগেছিলেন। কোন রকমে জৌনপুরে ফিরে অনেকদিন শুয়ে থেকে তার পর ভাল হন।

সেই সময় বনারসীদাসের একটি ছেলে হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

সংবৎ ১৬৬২ (১৬০৫ খ্রীঃ) কার্তিক মাসে খবর এল যে অকবর বাদশাহ আগ্রা শহরে দেহত্যাগ করেছেন। খবর শুনে

জৌনপুরের লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন যে, এবার বোধ হয় অরাজকতা আরম্ভ হয়ে যাবে। বনারসীদাস সিঁড়ির উপর বসেছিলেন। খবর শুনে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল। এদিকে জৌনপুর শহরে তখন আতঙ্ক ছেয়ে গেছে—

ইসহী বীচ নগর মেঁ শোর,
ভয়ো উদণ্ডাল চারিহুঁ ওর।
ঘর ঘর দর দর দিয়ে কপাট,
হটবানী নহী বৈঠে হাট॥ ২৫২
ভলে বস্ত্র ঔর ভূসন ভলে,
তে সব গাড়ে ধরতী তলে।
হণ্ডবাই গাড়ী কহুঁ ঔর,
নগদী মাল নিভরমী ঠৌর॥ ২৫৩
ঘর ঘর সবনি বিসাহে অস্ত্র,
লোগহন পাহিরে মোটে বস্ত্র।
ঠাড়ো কম্বল অথবা খেস,
নারিন্‌হ পাহিরে মোটে বেস॥ ২৫৪
উঁচু নীচ কেউ ন পহিচান,
ধনী দরিদ্রী ভএ সমান।
চোরী চারী দীসে কহুঁ নাহি
ইয়োঁ হী অপভয় লোগ ডরাহী॥ ২৫৫

পারতপক্ষে লোকে বাড়ি থেকে বেরোন ছেড়ে দিল। হাটুরেরা হাটে বসা বন্ধ করে দিল। বাড়িতে লোকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে বসল। নেহাত বাইরে বেরোতে হলে লোকে মোটা সস্তা কাপড় পরে বেরোতে লাগল। কে যে ধনী আর কে গরীব কোন বোঝবার উপায় রইল না। কোথাও যে চুরি, ডাকাতি হচ্ছিল তা নয়, শুধু গুজবের চোটেই লোকে ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। দিন দশেক এইরকম হইচই চলল। তারপর সবাইকার কাছে যখন আগরা থেকে খবর এল তখন দেশে শান্তি ফিরে এল:—

প্রথম পাতিশাহী করী,
বাওন বরস জলাল।
অব সোলহসৈ বাসঠৈ,
কাতিগ হুও কাল॥ ২৫৭
অকবরকো নন্দন বড়ো,
সাহব সাহ সলেম।
নগর আগরে মেঁ তখত,
বৈঠো অকবর জেম॥ ২৫৮
নাঁও ধরাও' নূরদী,
জহাংগীর সুলতান।
ফিরী দুহাই মুলকমেঁ,
বরতী জহাঁ তহাঁ আন॥ ২৫৯

বাহান্ন বছর রাজত্ব করে জলালুদ্দীন অকব্বর বাদশাহ সংবৎ ১৬৬২ সালের কার্তিক মাসে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বড় ছেলে সলীম নুরুদ্দীন জাহাংগীর নাম গ্রহণ করে আগ্রা শহরে আকবরের মত সিংহাসনে বসেছেন।

এদিকে বনারসীদাসের হঠাৎ মনে হল 'মৈ শিবপূজা কীনী কেম?' আমি এতদিন শিবপূজা করলাম কেন? জব মৈ গিরয়ো পরয়ো মুরঝায়। তব সিব কছু ন করী সহায়। যখন আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম, শিব তো আমার কোন সাহায্য করলেন না। সেই থেকে তিনি শিবপূজো ছেড়ে দিয়ে পাকা জৈন হয়ে গেলেন আর নবরসের যে পুঁথি লিখেছিলেন সেটিকে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

১৬৬৪ সংবতে বনরাসীদাসের আর একটি পুত্র হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

আর যখন তিন বছর কেটে গেল আর পিতা খড়গসেন যখন দেখলেন যে, ছেলের মতিগতি ভাল হয়ে গেছে, তখন তিনি বাড়িতে জমান মুণি মুক্তা, কিছু টাকা ও কিছুটা তেল ছেলের হাতে দিয়ে বললেন যে, আগ্রাতে গিয়ে ব্যবসা কর, আর এখন থেকে সংসার চালাবার ভার নিজের হাতে তুলে নাও।

বনারসীদাস মণিমুক্তা ইত্যাদি দামী জিনিস কোমরে বেঁধে নিলেন আর বাকি জিনিস গরুর গাড়িতে বোঝাই করে অন্য অনেক গরুর গাড়ির সংগে আগ্রা রওনা হলেন। রোজ তাঁরা পাঁচ ক্রোশ পথ চলতেন।

এমনি করে এটোয়া শহরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গাড়িগুলো সব গোল করে রাখা হল। এমন সময় হঠাৎ মেঘ করে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই দৌড়ে বাজারের দিকে গেলেন, যদি কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও জায়গা পেলেন না। সবাই দরজা বন্ধ করে বসেছিল। অগ্রহায়ণ মাসের রাত, শীত করছে, পায় কাদা ভরে গেছে, কিন্তু কেউ আশ্রয় দিতে নারাজ। এক জায়গায় "নারি এক বৈঠন কহ্যো, পুরুষ উঠৌ লে বাঁস—" একজন নারী যদি বা বসতে বলল, তো পুরুষ বাঁশ উঁচিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল। শেষকালে বনারসীদাস আর দুজন সঙ্গী একটা কুঁড়ে ঘরে জায়গা পেলেন। সেই ঘরে যে লোকেরা ছিল তারা বলল যে আমরা বাড়ি যাচ্ছি, তোমরা তিনজন রাত্রে এইখানে থাক। কাল কিন্তু আমাদের বকশিশ দিতে হবে। এঁরা তিনজন ভাবলেন, যাক, আজ রাত্রের মত জায়গা পাওয়া গেল। কিন্তু, এমন সময় হঠাৎ একজন জোয়ান লোক এসে বলল এটা আমার শোবার জায়গা এখনই তোমরা বেরিয়ে যাও, তা নইলে চাবুক খাবে। অনেক খোশামোদ করার পর ঠিক হল যে সেই লোকটা খাটে

শোবে, আর এ'রা তিনজন খাটের তলায় শুলেন। সেই ব্যবস্থাই হল :—

পড়েবে খাটপর লোরা ভলে,
তিনো জন খাটকে তলে

পরদিন সকালে উঠে আবার চলতে আরম্ভ করলেন। এমনি করে কয়েকদিন পরে আগ্রা পৌঁছে বনারসীদাস নিজের ছোট ভগিনীপতি বন্দীদাসের বাড়ি উঠলেন।

আগ্রাতে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আগ্রা বড় শহর, সেখানে নানা রকমের লোক। কিছুদিনের মধ্যেই কতক মাল ঠকেদের হাতে খুইয়ে, কিছু বা হারিয়ে, আর কখন বা বাজার মন্দা হওয়ার দারুন লোকসান দিয়ে, বনারসীদাস নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। যা কিছু ঘরে ঘটি বাটি ছিল, তাই বেচে খেতেন, আর রাত্রে তিনি বাড়িতে বসে মৃগাবতী আর মধুমালতীর পুঁথি পড়তেন। পাড়ার লোকেরা তাই এসে শুনত। মৃগাবতী লিখেছিলেন জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহর আশ্রিত কবি কুতবন। এতে চন্দ্রনগরের রাজকুমার আর কাঞ্চনপুরের রাজকন্যা মৃগাবতীর প্রেমের কথা আছে। মধুমালতীর কবির নাম মনঝন। এটিও একটি প্রেমের গল্প। দুটি বইই সেকালে প্রেমকাব্য হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।) শেষকালে বাড়িতে বেচবার মত কিছু রইল না। একজন কচুরিওয়ালা রোজ রাত্রে কাব্য শুনতে আসত। তার কাছে রোজকালে বনারসীদাস ধার করে কচুরি খেতে আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন পরে কচুরিওয়ালাকে একলা পেয়ে বনারসীদাস বললেন, অনেক ধার দিলে, কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই, দাম কহাঁসো দেহু? দাম কোথা থেকে দেবে? কচুরিওয়ালা বললে, তুমি যদি বিশ টাকার কচুরি খাও, তাহলেও তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, তুমি কিছু ভেব না।

এমনি করে ছ সাত মাস কেটে গেল। তারপর তিনি তাঁর শালা তারাচন্দের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন রইলেন। সেখানে ধর্মদাস বলে আর একজন লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ধর্মদাস আর বনারসীদাস একসঙ্গে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। চুনি, মণি, মুক্তোর ব্যবসা আরম্ভ করে কিছুদিনের মধ্যে পয়সা রোজগার হতে লাগল। তখন সেই কচুরিওয়ালাকে ডেকে হিসাব করে দেখলেন যে ছ মাসে ঠিক চোদ্দ টাকার কচুরি খেয়েছিলেন। টাকা দিয়ে তিনি কচুরিওয়ালাকে হরষিত করলেন।

এমনি করে যখন দুবছর কেটে গেল, তখন বনারসীদাসের শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য মন কেমন করতে লাগল। তিনি ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবেন ঠিক করলেন। দু বছর ব্যবসার ফল খতিয়ে দেখা গেল যে এই সময়ে বনারসীদাস যা লাভ করেছেন, প্রতি দিনকার খরচেই সেই টাকা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আবার তাঁর কপর্দকহীন অবস্থা হয়ে গেল। একদিন বনারসীদাস পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটি পুঁটলি কুড়িয়ে পেলেন। খুলে দেখেন তার মধ্যে আটটি মুক্তো রয়েছে। সেই মুক্তো কটি একটি মাদুলীর মধ্যে পুরে কোমরে বেঁধে বনারসীদাস শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলেন।

চলতে চলতে একদিন সন্ধেবেলা তিনি খয়রাবাদে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন। রাত্রে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন যে এতদিন ব্যবসা করে কত রোজগার করলে। যখন বনারসীদাস বললেন যে, যা কিছু রোজগার করেছিলেন সব খরচ করে ফেলেছেন তখন তাঁর স্ত্রী প্রথমে তো তাঁর এই কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিলেন না। পরে যখন বুঝলেন যে স্বামী সত্য কথাই বলছেন, তখন তিনি যাতে আবার থেকে ব্যবসা আরম্ভ করতে পারেন সেইজন্য গোপনে তাঁর হাতে কুড়ি টাকা দিলেন। পরদিন তাঁর স্ত্রী নিজের মাকে বললেন যে, কাউকে বলো না, আমি কুড়ি টাকা স্বামীকে দিয়েছি। তাঁর মা তখন আরও দু' শ' টাকা মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন যে বনারসীদাসকে বলো আবার আগ্রা গিয়ে ব্যবসা করতে। বনারসীদাস ঠিক করলেন যে আগ্রাতে গিয়ে কাপড় আর মণিমুক্তার ব্যবসা করবেন। তিনি কয়েক মাস খয়রাবাদে শ্বশুরবাড়িতে থেকে বাজার থেকে কাপড় কিনে সেগুলি ধোয়াতে লাগলেন, আর মণিমুক্তার খোঁজ করতে লাগলেন। সেই কয়মাসে তিনি 'অজিতনাথকে ছন্দ' আর 'নামমালা' নামে দুটি বইও লিখে ফেলেন। সব কাজ যখন শেষ হয়ে গেল তখন কিছু ধোয়া কাপড় নিয়ে আর চল্লিশ টাকা দিয়ে একটি মুক্তোর মালা কিনে অগ্রহায়ণ মাসে বনারসীদাস আবার আগ্রা যাত্রা করলেন।

আগ্রাতে ব্যবসা আরম্ভ করে দেখলেন যে কাপড়ের বাজারে বেশ মন্দা চলেছে, কাপড় বেচাতে লাভের জায়গায় লোকসানই হচ্ছে—অথচ যে মুক্তোর মালাটি তিনি চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, সেটি সত্তর টাকায় বিক্রী হয়ে গেল। কাজেই তিনি ঠিক করলেন যে কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শুধু মণিমুক্তার ব্যবসা করবেন। কিছুদিন আগ্রাতে ব্যবসা করবার পর এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে বনারসীদাস পুঁজির টাকা প্রায় সব শেষ করে ফেললেন। সেই সময় তাঁর আর এক বন্ধু নরোত্তম দাস পরামর্শ দিল যে চল পাটনায় গিয়ে ব্যবসা করা যাক।

বনারসীদাস, নরোত্তমদাস আর নরোত্তমের শ্বশুর, তিনজনে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে পাটনা রওনা হলেন। সাহিজাদপুর অবধি সেই গাড়িতে এসে সন্ধেবেলা সরাইতে পৌঁছে তাঁরা গাড়ি ছেড়ে দিলেন, আর মাল সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য একজন

মুটে ঠিক করালেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে উঠে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না দেখে তাঁরা ভাবলেন যে, বুঝি ভোর হয়ে এসেছে। মুটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে তিনজনে চলতে আরম্ভ করলেন। কিছু দূর চলবার পর তাঁরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললেন। মুটে বোঝা ফেলে পালাল। তখন অর্ধেক রাত। কি আর করবেন। বোঝা তিন ভাগ করে তিনজনে কাঁধে মাথায় তুলে নিলেন। চলতে চলতে তাঁরা এক চোরেদের গাঁয়ে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কে যায়?' তিনজনের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। পরমেশ্বরের নাম করে বনারসীদাস এক শ্লোক পড়ে সেই লোকটিকে আশীর্বাদ দিলেন। সেই লোকটি ভাবল যে এরা ব্রাহ্মণ, তাই উত্তর দিল যে, কোন ভয় নেই, আমার উঠানে আজ রাত্রে থাক। এই তিনজনের তখন ভয়ে বুক কাঁপছে। রাত্রে তিনজন কাপড় থেকে সুতো বার করে পইতে বানালেন, আর জল মাটি গুলে কপালে তিলক কাটলেন। সকালে যখন চৌধুরী লোকজন নিয়ে এল, এঁরা উঠে তাদের আশীর্বাদ দিলেন। চৌধুরী বলল, কোন ভয় নেই, আমার সঙ্গে এসো পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এঁদের ফতেপুরের পথ দেখিয়ে দিয়ে চৌধুরী ফিরে গেল। ফতেপুরে পৌঁছে দুজন মুটে ঠিক করে বনারসীদাস আর তাঁর দুই সঙ্গী চলতে চলতে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন।

এলাহাবাদে সরাইতে নেমে গঙ্গার ধারে ভোজন সেরে নিলেন। তারপর বনারসীদাস শহরে বেড়াতে বেরোলেন। হঠাৎ সেখানে তাঁর পিতা খড়্গসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পিতা পুত্রকে দেখে আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বনারসীদাস ডুলি করে পিতাকে জৌনপুরে পৌঁছে দিলেন, আর পাটনা না গিয়ে কখন-বা বারাণসী আর কখন বা জৌনপুরে থেকে নরোত্তমদাসের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করে দিলেন। এই সময় বনারসীদাস খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে জৈন-ধর্মের নিয়ম উপবাস ইত্যাদি পালন করতে আরম্ভ করেন।

একদিন বারাণসীতে তিনি পিতার চিঠি পেলেন যে, খয়রাবাদে তাঁর স্ত্রীর একটি ছেলে হয়ে পনের দিন পরে মা ও ছেলে দুজনেই মারা গেছে। বনারসীদাসের শ্বশুর তাঁর ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রস্তাব করে নারিকেল পাঠিয়েছেন। তাই খড়্গসেন বিয়ের শুভ দিন ঠিক করে জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। বনারসীদাস চিঠি পেয়ে অনেক কান্নাকাটি করলেন। ছ' মাস পরে তাঁর মন অনেক শান্ত হয়ে গেল।

কিলিচ খানের বড় ছেলে চীনী কিলিচ খান চার হাজারী মনসবদার ছিলেন। তিনি শুধু যে বীর ছিলেন তাই নয়, দাতা আর পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি বনারসীদাসের বিদ্যাপ্রেমের কথা শুনে তাঁকে শিরোপা দেন, আর তাঁর রচিত অজিতনাথের ছন্দ আর নাম মালা শোনেন। মাঝে একবার কিছু দিনের জন্য চীনী কিলিচ খানকে বাইরে যেতে হয়। সেই সময় যিনি জৌনপুরের চার্জে ছিলেন তিনি বনারসীদাসকে অনেক দুঃখ দেন, কিন্তু মাস দুই পরে চীনী কিলিচ খান ফিরে এলে তাঁর সুখের দিন আবার ফিরে আসে।

১৬৭২ সংবতে চীনী কিলিচ খান মারা যান। তার পর ছ' সাত মাসের জন্য বনারসী-দাস আর নরোত্তমদাস ব্যবসার উদ্দেশে পাটনা যান, তবে সেখানে ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হয়নি বলে আবার ফিরে এসে তাঁরা কাশী আর জৌনপুরে নিজেদের ব্যবসা আরম্ভ করে দেন। এই সময় আগানুর বলে একজন ওমরাহ জৌনপুরের নবাব নিযুক্ত হন। তিনি আসছেন শুনেই নগরে হইচই আরম্ভ হয়ে গেল—লোকেরা সব দিকে দিকে পালাতে লাগল। দুই বন্ধুও পালিয়ে অযোধ্যা চলে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা রৌনাই বলে এক জায়গায় গিয়ে দিন সাতেক ধর্মনাথের মন্দিরে সেবক হয়ে থাকলেন। তারপর ভাবলেন যে, এবার ঘরে ফেরা যাক। পথে শুনলেন যে, আগানুর এসে জৌনপুর আর কাশীর মাঝামাঝি জায়গায় ভীষণ অত্যাচার করেছেন। ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে হুণ্ডিওয়ালা, জহুরী আর শরাফদের ধরে কাউকে চাবুক মারিয়েছেন, কাউকে পায়ে বেড়ি পরিয়েছেন আর কাউকে বা অন্ধ কুঠরিতে বন্ধ রেখেছেন। শুনে দুই বন্ধু পালিয়ে এক জঙ্গলে লুকিয়ে রইলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, আগানুর আগ্রা চলে গেছেন তখন জৌনপুরে এসে সকলে একত্র হলেন।

কিছু দিন পরে নরোত্তমদাস তাঁর পিতার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠিটি তিনি বনারসীদাসকে পড়তে দেন। তাতে লেখা ছিল "বনারসীদাস আর তার পিতা খড়্গসেন ধূর্ত লোক। ওদের সঙ্গে বেশী দিন থাকলে তোমাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে।" নরোত্তমদাস বললেন যে, তিনি এই-সব কথা বিশ্বাস করেন না। বনারসীদাস ভাবলেন যে, এই রকম মিত্র আর হয় না। তিনি 'ইকতিসা সবৈয়া' ছন্দে একটি কবিতা লিখলেন। এই কবিতার চার লাইনের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে 'ন', 'রো', 'ত্ত' আর 'ম'। কবিতাতে নরোত্তমদাসের গুণগান ছিল। সেই কবিতাটি তিনি ভাটদের দিয়ে শহরে কীর্তন করালেন।

তারপর দুই বন্ধু ঠিক করলেন যে, আগ্রাতে গিয়ে ব্যবসা করবেন। এমন সময় হঠাৎ খড়্গসেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বনারসীদাসের আর তাই তখনকার মত আগ্রা যাওয়া হল না। দুজনের বাড়াবাড়ি দেখে ব্যবসার টাকাকড়ি, পুঁজিপাটি দুই ভাগ করে নিয়ে নরোত্তমদাস নিজের ভাগ নিয়ে আগ্রা চলে গেলেন। বনারসীদাস জৌনপুরে থেকে পিতার সেবা করতে লাগলেন। কিছু দিন পরে খড়্গসেন মারা গেলেন। বনারসীদাস কিছু দিন জৌনপুরে ব্যবসা করবার পর ঠিক করলেন যে আগ্রা যাবেন।

আষাঢ় মাসে ভাল দিন দেখে বনারসীদাস আগ্রা যাত্রা করলেন। সঙ্গে তিনি একটা ঘোড়া আর ন'জন চাকর নিলেন। প্রথম রাত্রে বেসুয়া গাঁয়ে উঠলেন। সেখানে মহেশ্রী বলে একজন আগ্রাবাসী ঘোড়সওয়ার তাঁর সঙ্গী হল। তারপর আরও দুজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ দুজন চাকর নিয়ে তাঁদের সহযাত্রী হল। এমনি করে উনিশ জনের একটি দল তৈরি হয়ে গেল।

অনেক নগর আর গ্রাম পেরিয়ে তাঁরা কোররা বলে একটি গ্রামে পৌঁছে সরাইতে এসে উঠলেন। সেই ব্রাহ্মণ দুজন খাবার কিনতে গ্রামের ভিতরে গেল। বাজারে খাবার কেনবার জন্য শরাফের দোকান থেকে টাকা ভাঙিয়ে খাবার কিনে যখন তারা এক জায়গায় বসেছিল তখন শরাফ এসে তাদের বলল, যে টাকাটা দিয়েছিলে সেটা বদলাও,

বদলে দাও। ব্রাহ্মণরা বলল যে, এটা তাদের দেওয়া টাকা নয়। এই নিয়ে কলহ বেধে গেল। এমন সময় সেই শরাফের ভাই এসে ব্রাহ্মণদের কাপড় থেকে পঁচিশটা টাকা বার করে বলল যে, এইসব টাকা মেকী, এখনই আমি কোতোয়ালের কাছে যাচ্ছি। এই বলে সে বাড়ি গিয়ে পঁচিশটা মেকী টাকা নিয়ে কোতোয়ালের কাছে গিয়ে নালিশ করল যে কোথা থেকে এক জালিয়াতের দল এসে গাঁয়ে মেকী টাকা চালাচ্ছে। কোতোয়াল গিয়ে এই কথা হাকিমকে বললেন। হাকিম দেওয়ানকে কোতোয়ালের সঙ্গে যেতে বললেন। কোতোয়াল আর দেওয়ান সরাইতে এসে এঁদের উনিশজনকেই বেঁধে নিয়ে গেলেন। হাকিমের কাছে সকলে নিজের নিজের পরিচয় দিলেন। বনারসীদাস বললেন—

লাখী নেমা সাহূকে,
তখত জৌনপুর ভৌন।
বেওপারী জগমে প্রকট,
ঠগহে লচ্ছন কৌন॥ ৫২০

আমার সঙ্গে নেমা সাহুর পার্টনারশিপ ডিড রয়েছে, জৌনপুরে বাড়ি, দেখতেই পাচ্ছ আমি ব্যাপারী—ঠকের লক্ষণ কি দেখলে?

তখন হাকিম আর দেওয়ান ইত্যাদি পারসী ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। তারপর দেওয়ান বললেন যে, রাত্তির বেলা কিছু ঠিক করা গেল না, এখন এদের কিছু ব'লো না, সকাল হলেই এদের জাতি জানা যাবে। কোতোয়াল তখন এঁদের বললেন যে, কোররা, ঘাটমপুর আর বরী, এই তিন গাঁয়ে যদি তোমাদের পরিচিত কেউ থাকে তা হলে বল। অন্য গাঁ আমি মানি না। এই বলে এঁদের চারিদিকে পাহারা বসিয়ে ও'রা চলে গেলেন।

সেই মাহেশ্রী আর বনারসীদাস সারা রাত ধরে পরামর্শ করতে লাগলেন যে, কি করা যায়। যখন মাত্র আর এক প্রহর রাত বাকি আছে তখন হঠাৎ মাহেশ্রী বলল, "ভাল কথা মনে পড়েছে, এই বরী গাঁয়েতেই তো আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল। এইখানেই তো আমরা বরযাত্রী এসেছিলাম।" বনারসীদাস বললেন, "মূর্খ, এতক্ষণ এ কথা বলিসনি কেন?" মাহেশ্রী বলল, "ভয়ের চোটে সব ভুলে গিয়েছিলাম, এখন সব মনে পড়েছে, তুমি এবার নিশ্চিন্ত হও।"

তখন বনারসীদাসের মনে শান্তি ফিরে এল। কিন্তু তবুও যে ভাবনা একেবারে গেল তা নয়, কারণ কে জানে মাহেশ্রী সত্য কথা বলছে কিনা।

সকাল হতেই মুটের মাথায় উনিশটা শূল চাপিয়ে পেয়াদা এসে হাজির হয়ে গেল। পেয়াদা আবার ব্যাখ্যা করে বলল—

তুম উনীস প্রাণী ঠগ লোগ,
এ উনীস সূলী তুম জোগ॥ ৫৩২

"তোমরা উনিশ জন ঠক, এই উনিশটা শূল তোমাদের যোগ্য!"

কিছুক্ষণ পরে কোতোয়াল আর দেওয়ান লোকজন নিয়ে এসে হাজির হলেন। বনারসীদাস তাঁদের বললেন যে, "বরী গাঁয়ে আমাদের পরিচিত লোক আছে।" দেওয়ান শুনে বললেন, "সাবাস, এতক্ষণে ভাল কথা বলেছ। আমার সঙ্গে বরী গাঁয়ে চল। যা বলছ তা সত্য কিনা যাচাই করি।" মাহেশ্রী ঘোড়ায় চড়ে দেওয়ানের সঙ্গে বরী গাঁয়ে গেলেন। দেওয়ান ফিরে এসে বললেন, "সত্যিই তোমরা সাধু, আমাদের ভুল হয়েছিল, মাফ কর।" এই বলে কোতোয়াল আর দেওয়ান চলে গেলেন।

তখন মস্ত নষ্টের গোড়া সেই ব্রাহ্মণরা বলল, "কিন্তু আমাদের টাকা যে গেছে।" তাই শুনে বনারসীদাস দু' হাত দেয় ফুলেল কিনে কোতোয়াল, দেওয়ান আর হাকিমের বাড়ি কিছু কিছু পৌঁছে দিয়ে বললেন, "সেই শরাফরা ব্রাহ্মণদের টাকা নিয়ে পালিয়েছে, তার কি ব্যবস্থা হবে?" হাকিম বললেন, "সে খোঁজ আমি আগেই করেছিলাম। তারা সবাই তখুনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে।" বনারসীদাস ফিরে এসে ব্রাহ্মণদের বললেন, "তোমাদের টাকা আর নেই।"

তার পরদিন তাঁরা সকলে আবার চলতে লাগলেন। পথে বনারসীদাস একটি চিঠি পেলেন যে তাঁর বন্ধু নরোত্তমদাস মারা গেছেন। বনারসীদাস এই সংবাদ শুনে প্রচন্ড শোক পেলেন, কিন্তু স্নেহই দুঃখের মূল এই কথা ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন।

যখন আগ্রার কাছে যমুনার অপর পারে তাঁরা পৌঁছলেন, তখন সেই দুই ব্রাহ্মণ এঁদের পথ আটকে বলল যে, তাদের টাকা না পেলে তারা মরে যাবে। যখন অনেক বোঝানোতেও তারা বুঝল না তখন বনারসীদাস বার টাকা আর মাহেশ্রী তের টাকা দিয়ে ওদের বিদেয় করলেন।

আগ্রা পৌঁছে বনারসীদাস আগেকার সব ব্যবসায়ের সম্পর্ক ত্যাগ করে একলাই ব্যবসা আরম্ভ করে দিলেন।

ষোল শ' তিয়াত্তর সংবতের শীতকালে আগ্রাতে প্রথম মহামারী আরম্ভ হল।

ইসহী সময় ঈতি বিস্তরী,
পরী আগরে পহলী মরী।
জহাঁ তহাঁ সব ভাগে লোগ,
পরগট ভয়া গাঁঠি কা রোগ॥ ৫৭২
নিকসৈ গাঁঠি মরৈ ছিনমাঁহি,
কাহূকী বসাই কিছু নাঁহি
চুহে মরহিঁ বৈদ মর জাহিঁ,
ভয়সোঁ লোগ অন্ন নহিঁ খাহিঁ॥ ৫৭৩

"এই সময় ঈতির বিস্তার হয়ে আগ্রাতে প্রথম মহামারী দেখা দিল। যে যেখানে পারল লোকে পালাতে লাগল। গ্রন্থির রোগ প্রকট হল। গ্রন্থি বার হতেই ক্ষণমাত্রেই লোকে মরে যেত—কারুরই কিছু করবার ছিল না। ইঁদুর মরতে লাগল, বৈদ্য মরতে লাগল, ভয়ে লোকে অন্ন ছেড়ে দিল।"

[জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের দশম বছরে

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই প্লেগ রোগ আরম্ভ হয়, ও প্রায় আট বছর ধরে উত্তর ভারতে মহামারীর মত ছড়িয়ে থাকে। তুলসীদাস এই মহামারী থেকে বাঁচবার প্রার্থনা করে জনগণের উদ্দেশে একটি স্তব লিখেছিলেন]।

বনারসীদাস এই সময়ে পালিয়ে পাশের এক গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। মহামারী কম হলে আবার আগ্রা ফিরে আসেন। কিছু দিন পরে তাঁর মা জৌনপুর থেকে ছেলের কাছে আসেন। বনারসীদাস এই সময়ে খয়রাবাদ গিয়ে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসেন। বিয়ের পর হঠাৎ বনারসীদাসের ধর্মে মতি বেড়ে যায়। তিনি অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি জৈন তীর্থ দর্শন করে আসেন ও তীর্থঙ্করদের বিষয়ে স্তবস্তুতি ইত্যাদি লেখা আরম্ভ করেন।

১৬৭৬ সংবতে তাঁর এক পুত্র জন্মায়। তার এক বছর পরে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। ১৬৭৯ সংবতে তাঁর পুত্রের আর দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই বছরই তিনি আবার খয়রাবাদে সগাই করেন ও তার পরের বছর সংসার করেন। এই সময় তিনি জৈনধর্মের গ্রন্থ পাঠ ও রচনা আরম্ভ করেন ও জৈন-ধর্মের নানারকম অভ্যাস আরম্ভ করেন।

১৬৮৪ সংবতের আষাঢ় মাসে তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর প্রথম পুত্র হয় ও কয়েক দিনের মধ্যে মারা যায়। এই বছরই

ছত্রপতি জহাংগীর দিল্লীস,
কীনৌ রাজ বরষ বাইস।
কশ্মীরকে মারগ বীচ,
আওত হুই অচানক মীচ॥ ৬১৫
মাস চার-অন্তর পরবান,
আউ সাহিজহাঁ সুলতান।
বৈঠ্যৌ তখত ছত্র সিরতান,
চহু চকমেঁ ফেরী আন॥ ৬১৬
সোলহ সে চৌরাসিয়ে,
তখত আগরে থান।
বৈঠ্যৌ নাম ধরায়কে প্রভু,
সাহিব সাহি কিরান॥ ৬১৭

ছত্রপতি দিল্লীশ জহাঙ্গীর বাইশ বছর রাজত্ব করে কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ মারা যান। চার মাস পরে শাজাহান সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৬৮৪ সংবতে তিনি সাহিবে কিরান উপাধি গ্রহণ করে আগ্রার তখতে বসেন।

১৬৮৫ সংবতে বনারসীদাসের আর এক পুত্র জন্মায় ও মারা যায়। ১৬৮৭ সংবতে তাঁর এই স্ত্রীর গর্ভে তৃতীয় পুত্র জন্মায়। ১৬৮৯ সংবতে এক মেয়ে জন্মায় ও মারা যায়।

এর পরের কয়েক বছর তিনি আবার জৈন গ্রন্থ পাঠ ও রচনাতে লেগে থাকেন।

১৬৯৮ সালে তাঁর শেষ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই ছেলেটি আট ন' বছর বেঁচে ছিল। যদিও ছেলেটি চিররুগ্ণ ছিল, তবু নয়টি ছেলেমেয়ের মধ্যে এই একটিই কিছু দিন বেঁচে ছিল বলে এর মারা যাওয়াতে বনারসীদাস গভীর শোক পান।

এই সময় পঞ্চান্ন বছর বয়সে বনারসীদাস তাঁর এই আত্মজীবনী অর্ধকথানক লেখেন। শেষের কিছু পদ্যটি উদ্ধৃত করা হল। নিজের জীবনের ঘটনাবলীর কথা তিনি তার আগেই এই কথা লাইনে লিখে শেষ করেছেন—

কহী পচপন বরস লৌঁ,
বানারসীকী বাত।
তীন বিবাহী ভারজা,
সুতা দোই সুত সাত॥ ৬৪২
নৌ বালক হুয়ে মুয়ে,
রহে নারি নর দোই।
জ্যোঁ তরবর পতঝর হুয়ে
রহে ঠুঁঠসে হোই॥ ৬৪৩

"পঞ্চান্ন বছর অবধি বনারসীর কথা বললাম—তিন বিয়ে, দুই মেয়ে, সাত ছেলে। নটি সন্তান হয়ে মরেছে, শুধু নারী আর নর বাকি আছে। যেমন পাতা ঝরে গেলে গাছ থেকে তেমনি ঠুঁটো হয়ে রয়েছে।"

বনারসীদাস এই সময় জৈনধর্মের চর্চা করে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন। নিজের অর্ধজীবনের কথা শেষ করতে বনারসীদাস বলেছেন—

ভাষৈ অর্ধ কথান হৃদ,
বানারসী চরিত্র।
দুষ্ট জীব সুনি হংসহিঁগে,
কহৈঁ সুনহিঁগে মিত্র॥ ৬৭৪
সব দোহা অরু চৌপাই,
ছসৌ পিচত্তরি জান।
কহৈঁ সুনৈঁ বাঁচৈঁ পঢ়ৈঁ,
তিন সব কৌ কল্যান॥ ৬৭৫

"এই অর্ধকথানক বনারসী চরিত্র দুষ্ট লোক শুনে হাসবে। যারা মিত্র তারা এটি পড়বেন বা শুনবেন। দোহা আর চৌপাই ইত্যাদি সব মিলিয়ে এতে আছে ৬৭৫টি। যাঁরা এইগুলি কইবেন, শুনবেন, ব্যাখ্যা করবেন বা পড়বেন তাঁদের সবাইকার কল্যাণ হোক।"

[অর্ধকথানক লেখবার পর বনারসীদাস আর প্রায় দুই বছর বেঁচে ছিলেন।]

এমিলি স্মিথ আর টিনা বসু

টিনা বসু ছোট্ট মেয়ে। আনন্দবাজার পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি ডঃ তারাপদ বসুর কন্যা। তার কাছেই প্রথম আমি task force-এর কথা শুনেছিলাম। টিনা লণ্ডনের South Hampstead High School-এ পড়ে। সেখানে তারা পালা করে বুড়ো মানুষের দেখাশুনো করে। পাড়ার আশেপাশে কোথায় অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা একা একা দিন গুজরান তার খবর নিয়ে তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করাই টাস্ক ফোর্সের কাজ। স্কুলের যেমন হোম টাস্ক, এও তেমনই এক অবশ্যকরণীয় কর্ম। তা থেকেই সম্ভবত নাম হ'য়েছে টাস্ক ফোর্স। টিনার উপর ভার রয়েছে মিস স্মিথকে মাঝে মাঝে দেখে আসবার। তাঁর কি দরকার অল্প বিস্তর সাহায্য করাও টিনার দায়িত্ব। টিনা যে একাই এই মহিলার খোঁজ-খবর করে তা' নয়। তার একার এত সময় কোথায়? স্কুলের কাজকর্মও তো যথেষ্ট থাকে। বাড়িতে মা-বাবা আছেন, দিদি ম্যাঞ্চেস্টারে গণিত পড়েন। সপ্তাহের শেষে বাড়ি আসেন। সবাই তো টিনাকে পেতে চায় কাছে। কাজেই টিনা যায় মিস স্মিথের কাছে সপ্তাহে একবার। অন্য দুটি বন্ধু যায় এক সঙ্গে আর একদিন। স্কুলের রুটিনের সঙ্গে সময় মিলিয়ে ব্যবস্থা হয়।

মিস স্মিথের বয়স বিরানব্বই। একেবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের মানুষ। চাঁদে মানুষ যাবার কথা শুনে কানে হাত দেন। ছি ছি ছি। চাঁদ, আকাশের চাঁদ। তার এত পবিত্রতার এই পরিণাম! আবার ছোট ছোট বাচ্চাগুলি যারা তাঁর কাছে আসে তারাও চাঁদে মানুষ পাঠাবার গল্প করে। এমন বাচ্চারা এসব কথা জানবে কেন? ভাগ্য ভাল যে মিস স্মিথ চাঁদ চর্চা বেশীদূর করতে পারেন না।

মিস স্মিথের আর্থিক সম্পত্তিও তেমন কিছু নেই। সম্বলহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা সে দেশে সরকারের কাছ থেকে পেনসন পান। তাতেই তাঁর দিন চলে যায় বেশ একরকম-ভাবে। এসব বুড়ো মানুষদের সব চেয়ে বড় সমস্যা একাকিত্ব। জীবনের শেষ দিন কটা যেন আর কাটতে চায় না। যখন বয়স কম থাকে, হাতে কাজ থাকে, পকেটে পয়সা

থাকে, সমাজ থাকে, থিয়েটার ককটেল পার্টি ও সম্পত্তি মত জুটে যায়, কিন্তু বার্ধক্যে? কেমন করে যেন সব কিছু হারিয়ে যায়। ভারতবর্ষে এতকাল এ সমস্যা আমরা কমই দেখেছি। যৌথ পরিবার। পাঁচজন আশে-পাশে থাকতো। বয়সের মর্যাদা ছিল, বয়স্কের সংসারে বিশিষ্ট স্থান ছিল। এখনও যে ঠিক তাই আছে এতটা বলার ভরসা পাই কই? ক্রমশ বুড়ো মানুষ আমাদের দেশেও বড় একা হ'য়ে পড়েছেন। ধারে কাছে যারা থাকে তারা এত ব্যস্ত যে তাঁর সঙ্গে দুদণ্ড বসবার অবসর থাকে না। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের মত নিঃসঙ্গতার হাহাকার এখনও আমাদের দেশের প্রাচীন বয়স্কদের মধ্যে আসেনি ঠিক।

মিস স্মিথ চিরকুমারী। বিবাহিত হ'লে বা দু একটি সন্তান থাকলে হয়তো বা তারা সপ্তাহের শেষে বা মাসের একদিন মায়ের দেখা পেতে আসতো। কিন্তু মিস এমিলি স্মিথ একেবারে একা। আপন বলতে আর বেশী কেউ নেই। প্রতিবেশী কেউ বা একটু বাজার করে দেয়। কারও সঙ্গে বা ব্যবস্থা আছে বরদোর একটু গুছিয়ে দেওয়ে যায়। সামান্য একটু খাবার নিজে নিজে করে নেবার শক্তিটুকু এ বয়সেও আছে। এরকম বৃদ্ধবৃদ্ধাও প্রচুর আছেন যাঁদের নিয়মিত W. V. S বা Womens Voluntary Service গরম খাবার পরিবেশন করে যান। এই meals on wheelse নাকি চমৎকার একটি আয়োজনে

পরিণত হ'য়েছে। তাঁদিকে করে সদ্য রান্না করা তাজা খাবার অসমর্থ বৃদ্ধবৃদ্ধার হাতের কাছে, কারও বা একেবারে মুখের কাছে পৌঁছে দেন মহিলা সমাজসেবীরা। এমন সুন্দর আদর যত্ন হ'চ্ছিল এত Welfare-এর ঘটা বললেই বোধ হয় পারিবারিক জীবন থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধাকে আলাদা করে রাখতে এদেশে কারও বাধে না। সরকারী সাহায্য তো আছেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যে মন বলে কিছু থাকে তাও বোধ হয় মাঝে মাঝে এদের মনে থাকে না।

যাক, মিস স্মিথ আর আমাদের টিনার কথাতেই ফিরে যাই এখনকার মত। এদের কিন্তু মনের খবর অন্য। টিনা ভারতীয় মেয়ে। এমিলি স্মিথ তাকে বড্ড ভালবাসেন। নিজের একটি নাতনী থাকলে যেমন করে আদর করতেন তাই করেন। টিনাকে আসা যাওয়ার পথ চেয়ে থাকেন। টিনাকে তিনি বলেন টাইনা। এই ছোট্ট টাইনা তাঁর জীবনের এক বিরাট শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে। ঠাকুমার মতই তিনি টাইনার জন্য সদাসতর্ক। পথেঘাটে দেরি হলে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। ভেবে চিন্তে অস্থির হন।

একদিনের একটি ঘটনা বলছি। টিনা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলো মিস স্মিথের মুর্গীর স্যুপ খাবার ইচ্ছা হ'য়েছে। কে আর বসে সে স্যুপ রান্না করে। যদি টিন একটা কিনে আনা যেতো বেশ হ'তো। টিনা বেচারা বাচ্চা মানুষ। বাড়িতেও কোনদিন বাজার হাট করেনি। তা হ'ক, পয়সা নিয়ে সে স্যুপের সন্ধানে রওনা হ'লো। হয়তো যে দোকানে স্যুপের টিন পাওয়া যায় সেটাই বাদ দিয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে টাইনার পাতানো ঠাকুমা ভাবনায় পড়লেন। টাইনার এত দেরি হচ্ছে কেন? রাস্তায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি তো? যতই সময় যায়, বৃদ্ধা ততই চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। আহা বাচ্চাটাকে স্যুপের কথা না বললেই হ'তো। ক্রমে এমিলি স্মিথ বিষম চিন্তায় ছটফট করতে লাগলেন। নাঃ, আর অপেক্ষা করা চলে না। আজকাল ঘর থেকে বেশী বের হন না। কোথায় জুতো আর কোথায় টুপী খুঁজে পেতে পরে ফেলে টাইনার খোঁজে বাড়ির বাইরে পা দেবেন তখন স্যুপের টিন হাতে তাঁর টাইনা দেখা দিল। মিস স্মিথের স্বস্তির নিঃশ্বাস, ছোট্ট টাইনার ছোট্ট প্রয়াসে সেদিন যে যোগাযোগ রচনা হ'য়েছিল তা' অনির্বচনীয়। হয়তো এককালে ঠাকুমা আর নাতনীতে যে বন্ধন থাকতো তারই এক অদ্ভূত স্পর্শ টাইনা আর মিস স্মিথকে বেঁধে ফেলেছিল। আশ্চর্য নয় কি? সমাজ একদিন স্বেচ্ছায় যে বন্ধনকে ভেঙে চুরমার করে চলে যায়, তারই মাঝে ধরা দেবার জন্য দুদিন পরে আবার নূতন পথ খোঁজে। আপন ঠাকুমা দিদিমা দূরে চলে গেছে, তাই আবার এই প্রয়াস। এ থেকে হয়তো সাবধান হবার সংকেত আমাদের ভারতীয় সমাজের মিলতে পারে।

১৯৬৪ সালে ইংলণ্ডে টাস্ক ফোর্স-এর সূত্রপাত হয়। হয়তো অপরিকল্পিত সেবার পত্তন আগেই হয়েছিল সকলের অজ্ঞাতে। প্রথম প্রথম তো বৃদ্ধবৃদ্ধারা নিজেরাই জানতেন না বা বুঝতেন না কারা তাঁদের এই অসহ্য নিঃসঙ্গতায় অপরিকল্পিত সাথী হ'তে চাচ্ছে। তাঁরা কেউ বা টাস্ক ফোর্সকে বলতেন Tak force। বুদ্ধুদ্ধো কে কোন কোণায় লুকিয়ে কাটাচ্ছে দিন খবরও নেয় হ'তো অদ্ভুতভাবে। দুধওয়ালা বা ডাকঘর-কর্মী ইত্যাদিরা দিত খোঁজ। তখন টাস্ক ফোর্স থেকে ঠিক হ'তো কে বা কারা সময় করে তাঁদের দুদণ্ড দেখে আসবে। কাছে বসে গল্প করবে, দরকার হ'লে একটু কাজ করে দেবে।

সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে টাস্ক ফোর্স-এর চাঁদা নেই, মেম্বারশিপের ঝামেলা নেই, একগাদা কমিটি, নিত্য মিটিং-এর ব্যবস্থা নেই। অন্য যে কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েও Task force-এর একজন হওয়া যায়। যে কোন স্কুল কলেজ দপ্তরের একজন হয়েও টাস্ক ফোর্সে যোগ দেওয়া যায়। বয়স তিরিশের নীচে হ'লেই হ'লো।

টাস্ক ফোর্স-এর সর্বদাই সমাদর হয় তাও নয়। অনেক বুড়ো মানুষ হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেন। অনেকে বাইরের সাহায্য নিতে নারাজ। কেউ বা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের বড্ড বেশী জ্বালাতন করেন। বুড়ো মানুষের অবুঝপনা কচি ছেলেমেয়ের যেন অসহ্য ঠেকে। অমুক দোকানের মাছ না হ'লে হবে না, অমুক পনীর না হ'লে চলবে না এইসব জুলুমভরা কেনাকাটার হুকুম দিয়ে অনেক বুড়োবুড়ি জ্বালাতনও করেন। হয়তো পয়সাকড়ি আছে তবু মুখের তোড়ে চাকরাণী কাজ করে না, কেউ বা পয়সা থাকলেও খরচ করেন না। আশা করেন বাচ্চাগুলি অনেক কাজ করে দেবে। কিন্তু মোটামুটি হিসাবে ধরলে উপকারের মাত্রাই বেশী। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নাতিনাতনী পান এবং আর নাতি নাতনীরা পায় দাদু দিদা বা ঠাকুমা। মানুষের সঙ্গে বাস করার শিক্ষা মানবতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা। পাশ্চাত্য দেশে তো দারুণ এক নূতন ধারণায় এখন সব মেতে উঠেছে। ছোট শিশুর নাকি অতি অল্প বয়সে মানসিক ভবিষ্যতের পত্তন হয়। তাই ছোট বাচ্চাদের Community living দেখাবার দারুণ মহড়া চলেছে। Community living-এর আর একটা দিক যে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং কচি ও যুবকরা পরিপূর্ণ করছে সে বিষয় সন্দেহ নেই। নেশা আর শৃঙ্খলাবিহীন জীবনের একটা লক্ষ্য তো মিলেছে। ঐশ্চর্যের প্রাচুর্যের আর বাধাহীন লক্ষ্যহীনতাই নাকি পশ্চিমের যুবসমাজকে মজিয়েছে। কাজেই টাস্ক ফোর্স কতটা করেছে কি করেছে তার হিসাব করতে যাওয়ার দরকার নেই। কিছু তো করেছে। দুর্নিবার যুবসমাজ আর গতিহীন শক্তিহীন বার্ধক্যের মাঝে সেতু তো রচনা করেছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সরকারী ক্ষেত্রে ১৪,৩৯৩ কোটি টাকা খরচ হবে। ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী এই টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় করতে পারলে এবং তা ঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে পারলে দেশের উন্নয়ন শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ভাগ হারে বাড়তে পারে বলে আশা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তা কতটা সম্ভব হবে বলা কঠিন। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে জনপ্রতি জাতীয় আয় যথাক্রমে শতকরা ৭·৯ ভাগ এবং ১·৬ ভাগ কমে গিয়েছিল। অনাবৃষ্টি এবং অজন্মার ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে আয় কমে যাবার দরুনই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে জন প্রতি জাতীয় আয় শতকরা ৬·২ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়তো জনপ্রতি জাতীয় আয় আরও একটু বেড়ে থাকবে। কথা হচ্ছে, জন-সাধারণের মাথাপিছু জাতীয় আয় অল্প বাড়লেই আমরা এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, লক্ষ্য অনুযায়ী সরকারের সঞ্চয়ের হার বাড়ানো সম্ভব হবে। কারণ, সঞ্চয় বৃদ্ধি অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী ধরা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় দেশের ভিতর অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে হলে প্রধান প্রয়োজন ব্যয় সংকোচ করা। সরকারী অর্থের সুষম বণ্টন এবং অপচয় দূরীকরণের মাধ্যমে কিছু টাকা বাঁচতে পারে। তা না হলে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘাটতি বাজেটের আশ্রয় বরাবরই নিতে হবে। অবশ্য ঘাটতি বাজেট থাকা যে খারাপ তা নয়। তবে দেখতে হবে অতিরিক্ত ঘাটতি অর্থসংস্থানের বোঝা যেন মুদ্রাস্ফীতির পথ সুগম না করে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ তার লক্ষ্য থেকে অনেক বেশী হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি অর্থসংস্থানের লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা; শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩৩ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় যদি ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ লক্ষ্যের চেয়ে অনেক বেশী হয়, তবে আবার মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে।

অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করার অর্থ বিদেশ থেকে আরও বেশী পরিমাণে টাকা ধার করা নয়। অতীতে আমরা যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছি, তার সুদ দেওয়ার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আরও বাড়ানো সহজ নয়। তাই রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। গত চার বছর ধরে সিংহল থেকে চা রপ্তানির পরিমাণ ভারতের চা রপ্তানি থেকে অনেক বেশী হয়েছে। পাটের তৈরী জিনিস রপ্তানির ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। রপ্তানি উন্নয়ন কর্মসূচীকে স্থিতিশীল করতে পারলে এবং রপ্তানির পরিমাণ যে হারে বাড়াবার প্রস্তাব চতুর্থ পরিকল্পনায় করা হয়েছে (শতকরা ৭ ভাগ হারে) তা করতে পারলে আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। কর ধার্য করে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ করার সম্ভাবনায় যে সুযোগ আছে তার সদ্ব্যবহার করা দরকার। বর্তমান বছরে কৃষি-উৎপাদনের অবস্থা খুবই ভাল। ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ভালই হয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনও গত বছর ৯৮ মিলিয়ন টন হয়েছে। জাতীয় আয়ের পরিমাণও গত বছর বেড়েছে এবং আয় বৃদ্ধির অধিকাংশ এসেছে কৃষিক্ষেত্র থেকে। যদি কৃষিক্ষেত্রের বর্ধিত আয় সুসংহত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়, এবং উচ্চ-আয়সম্পন্ন কৃষকদের আয় আরও বেশী করে কর-ব্যবস্থার আওতায় এনে গরীব কৃষকদের উৎপাদন বাড়াবার কাজে সাহায্য করা হয়, তবে সামগ্রিকভাবে কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে বেড়ে যাবে। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা আমরা গত তিন বছর ধরে দেখছি তা এখনও অব্যাহত আছে। দেশকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে হলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর বরাবর নির্ভর করে না থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বৃত্ত, প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা এবং কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের উপর বেশী নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসংস্থাগুলির অবস্থা

সম্প্রতি "Labour in West Bengal" নামে রাজ্য সরকার যে বইটি প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি ছিল আর্থিক অনটন, অর্ডারের অভাব, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা, ঘেরাও এবং ধর্মঘট শৃঙ্খলাভঙ্গ হিংসাত্মক কাজ, কর্মচারীদের কর্মমন্থর নীতি এবং অন্যান্য কারণে শ্রমিক অশান্তি। ধর্মঘট এবং লক-আউটের দরুন ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪৬৯টি শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে যায়; তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন ২,৭৬,৩২০ জন এবং কাজের দিন নষ্ট হয় ৭০,৫৬,৯০১টি। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৮ সালের শিল্প-অশান্তির পরিমাণ বেশী ছিল; কাজ বন্ধের পরিমাণও বেশী ছিল। ১৯৬৮ সালে ৩২৭টি সংস্থায় মোট ১২,৮০২ জনকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়। একই বছরে ১৪৯টি শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার দরুন ২৬ হাজার লোক কর্মহীন হন।

সমগ্র ভারতেই ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-মন্দার প্রধান কারণ ছিল শ্রমিক অশান্তি। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার এখনও পর্যন্ত এমন কোন শ্রমনীতি ঘোষণা করতে পারেননি যার ফলে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক অশান্তির একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ট্রেড ইউনিয়ন বিল রচিত হয়েছে তাও ফ্রন্ট গঠনকারী সবগুলি দলের ঐক্য-মতের উপর ভিত্তিশীল নয়। যদিও ১৯৬৮ সালের শিল্প-মন্দার জন্য বর্তমান সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই (কারণ তখন রাষ্ট্রপতির শাসন চালু ছিল), তবুও ১৯৬৮ সালের শিল্প-মন্দার কুফল যাতে ১৯৬৯ সালে কাটিয়ে ওঠা যায় এবং শ্রমিক অশান্তির

পরিমাণ কমিয়ে ফেলা যায় তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকাই কাম্য। ঘেরাও সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষিত হওয়া দরকার। ঘেরাও যে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাসের একটি কারণ সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কিন্তু ঘেরাও কেন হয় তার কারণও বিশ্লেষণ করা দরকার। ঘেরাও বন্ধ করা যেমন দরকার, তেমনি ঘেরাও যে কারণগুলির জন্য হয় সেগুলিও নিরসন করা দরকার। এটা সম্ভব হতে পারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে। শ্রমিকদের ও মালিকের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা কিন্তু একটি সর্বনিম্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই আজ একটি প্রগতিশীল শ্রম-নীতির প্রয়োজন যার ফলে শিল্পে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। [illegible] হবে, আর যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যগুলিতে মূলধন ও শিল্প-উদ্যোগ চলে না যায়।

সুব্রত দত্ত

॥ ৪ ॥

নবাগন্তুক

আমার গরিবখানার চৌকাঠে কোনো নবাগন্তুকের পদধূলি পড়া মাত্র ক্যালেণ্ডারের পাতা দেখে আমি বুঝে নিই, কেন এই শুভাগমন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে মিশনারী স্কুলে চাকরির জন্য উমেদারি; আর যদি বিদ্যালয়ের বর্ষ শুরুর পালা আসন্ন, মিশনারী স্কুলে ভর্তির জন্য ঝুলোঝুলি।

সেদিন বিকেলে তাই যখন টোকা পড়ল দরজায়, এক ঝটকায় আমি নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে নিতে লেগে গেলাম। অভ্যর্থনা ত্রুটিহীন হবে, প্রাথমিক আলাপও যথাযথ সৌজন্যের সঙ্গেই সারব, এবং যখন শেষ পর্যন্ত সেই অবশ্যম্ভাবী কথাটি উক্ত হবে, যত্ন করে বিনীত ভঙ্গিতে নিবেদন করব আমার অপারগতা, সর্বপ্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই আমার সর্বপ্রকার সংযোগের অভাব...

কিন্তু না, আমার আজকের অতিথিটি এ সব কিছু চায় না, চায় শুধু ফরাসী পড়ার ব্যাপারে আমার সাহায্য।

ফরাসী ভাষা শিক্ষায় উৎসুক বাঙালীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ে। কারো কারো আগ্রহ রুখ্য ফরাসীতে—বৃত্তি জুটিয়ে বিদেশ যাবার আশায় অগ্রিম প্রস্তুতি, কেউ কেউ আবার বাংলা দেশে থেকেই মূল ভাষায় বোদল্যায়র, র‍্যাঁবো কি ভালেরি পড়তে পারার স্বপ্ন দেখে।

...ছেলেটি কিন্তু ফরাসী ভূমিতে অবতরণের আকাঙ্ক্ষায় যেমন অধীর নয়, তেমনই ফরাসী সাহিত্যের চূড়ায় আরোহণের চেয়ে রসাস্বাদনের গবেষণায় নিমজ্জনেই অধিকতর উৎসাহী [র‍্যাঁবো কিংবা ভালেরির নামও সে জানে না, বোদল্যায়রের নামটা অবশ্য বলল "শোনা শোনা লাগছে"]। কিন্তু রোম্যাঁ রোলাঁর সে রীতিমতো এক ভক্ত, এবং সম্প্রতি কোনো এক লাইব্রেরিতে অ্যাঁদ্ [ভারতবর্ষ] বইখানা আবিষ্কার করে দারুণ উত্তেজিত। পাঁচশো পাতার এই বইটিতে রোলাঁর জার্নাল থেকে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর ভারত বিষয়ক সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত ও একত্রিত করা হয়েছে; কালব্যাপ্তি ১৯১৫ থেকে '৪৩।

"অতএব আসতেই হল আপনার কাছে, ফাদার...আমি তো ফরাসী প্রায় কিছুই জানি না।"

আর আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি এখনো ভুলি নি...। বস্তুত বইখানার মোটাসোটা চেহারা দেখে বেশ ভড়কে গিয়েছিলাম। কি করি কি করি ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে অর্ধমনস্কভাবে পাতা উল্টে যাচ্ছি, হঠাৎ বিদ্যুতের মতো দৃষ্টির পথে ঠাহর হয়ে গেল। কোনো এক প্রাজ্ঞ পাঠক খুব মন দিয়ে বইটা পড়েছে এবং তার ভালো-লাগা অনুচ্ছেদ গুলোর নিচে মোটা পেনের ব্লু-ব্ল্যাক কালিতে দাগ দিয়ে গিয়েছে উদারভাবে। লাইব্রেরির বই দাগানো দেখলে আমি দাগা পাই; কিন্তু সে মুহূর্তে লোকটিকে আমার মনে হল পরম বন্ধু।

বললাম, "দ্যাখো হে, পুরো বইটি বুঝিয়ে বলার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই—সর্বত্র সমানভাবে রস পাবে না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ঠিক ঠিক প্যাসেজগুলোই চিহ্নিত করা হয়েছে; সেগুলোই অনুবাদ করা যাক।" ছেলেটি অগত্যা সম্মত হল। বোধ হয় ভাবল, উপবাসই যেখানে বিকল্প, অর্ধভোজনই সেখানে ভূরিভোজ।

সন্ধেটা সেদিন কেটেছিল সুন্দর।

ভারতবন্ধু রোলাঁ

বইয়ের প্রায় প্রতিটি পাতায় ভারতীয় অতিথিদের উল্লেখ: রাজেন্দ্র প্রসাদ, লাজপত রায়, স্ত্রী কন্যা ও ভগিনী সমভিব্যাহারে জওহরলাল নেহরু......। তবে অধিকাংশই বাঙালী আগন্তুক: দিলীপ রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্র ঠাকুর, অন্নদাশংকর রায় (রোলাঁ ভ্রমক্রমে লিখেছেন এ এস রাজ), প্রশান্ত মহলানবীশ (রোলাঁ লিখেছেন প্রশান্ত), জগদীশচন্দ্র বসু, ধনগোপাল মুখার্জি, রামানন্দ চ্যাটার্জি, সুধীন ঘোষ (রোলাঁর দৃষ্টিতে "উজ্জ্বল, সংস্কৃতিবান, পল্লবগ্রাহী একটি মানস, য়ুরোপের মোহিনী

অর্ধমনস্কভাবে পাতা উল্টে যাচ্ছি

ভায়া যাঁকে অর্ধেক জয় করে নিয়েছে।")।

রোম্যাঁ রোলাঁ ইংরেজী জানতেন না; এদিকে, কালিদাস নাগের মতো অতি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁর ভারতীয় আগন্তুকেরাও ভালো রকম ফরাসী বলতে পারতেন না। রোলাঁর ভগিনী উপস্থিত থাকতেন দোভাষী হিসেবে।

সমস্ত আলাপ ও কথোপকথনের সারাংশ এবং প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—জার্নালভুক্ত করেছেন রোলাঁ। শুধু তা নয়, নবপরিচিতদের চেহারার বৈশিষ্ট্য, পোশাক-আশাক, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কোথাও বা রয়েছে ইতালীয় অনুবাদে 'শ্রীকান্ত' পড়ার পর তাঁর মনোভাবের উন্মীলন: শ্মশানে ও গঙ্গাবক্ষে রাত্রির বর্ণনা তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে।

রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ—অবশ্যই—বারবার ঘটেছে দিনপঞ্জীর পাতাগুলিতে, কিন্তু ঋষি অরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রতিও তাঁর কৌতূহল সুস্পষ্ট: অরবিন্দের মধ্যে পীয়র্সন তাঁকে বলেছিলেন, মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও বাণীবিভূতি এবং গান্ধীর সঙ্কল্পদার্ঢ্য ও চরিত্রবৈভব। এদিকে অরবিন্দের 'আভিজাত্যপনা', সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর দূরত্বরক্ষা, রোলাঁকে বেদনা দিয়েছে। দুর্দশা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এমন মর্মন্তুদ সংগ্রামের দিনে তাঁর এই আত্মরচিত ব্যবধান ও অন্তরালচারিতা রোলাঁকে প্রতিহত করেছে।

তীব্র সমালোচনা

আগন্তুকদের প্রতি ত্রুটিহীন আতিথেয়তা রোলাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁদের চারিত্রিক ন্যূনতার প্রতিও তিনি অন্ধ ছিলেন না। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ—প্যারিসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম সন্ন্যাসী—রোলাঁর বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছেন; এদিকে

রোলাঁ

অপর কয়েকজন সন্ন্যাসী-অভ্যাগতের আত্মদর্পী উগ্রতা তাঁকে বিতৃষ্ণ করে তুলেছে।

"আমি পীড়িত না হয়ে পারি না য়ুরোপে আগত ভারতীয় তরুণদের নির্বোধ স্বাজাত্যাভিমানের বহর দেখে। য়ুরোপ সম্পর্কে কিছুমাত্র না শিখেই তার প্রতি তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে; য়ুরোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।" ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের স্তুতিগানে মুখর এবং আপন শৈশবের ধর্মের সঙ্গে ছিন্নযোগ হয়েও তিনি অকস্মাৎ এই কথঞ্চিৎ হঠকারী মন্তব্য করে বসেন: "ভারতবর্ষে নৈতিক ধর্ম বলে কিছু নেই। হিন্দু ধর্মের বিধিনির্দেশগুলি বহিরংগনির্ভর, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক—নৈতিক নয়। যে অশুচিতাবোধ সব কিছুর উপরেই সর্বগ্রাসী প্রভাবে আসীন, তার মান নীতিমূল্যবিরহিত বিধিলঙ্ঘন আর প্রকৃত নৈতিক অপরাধ—দুটোতেই সমানভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।" এদিকে তাঁর মতে, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাদের জীবনযাত্রায় খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অবদান সর্বত্র বিদ্যমান: "কর্মযোগী, ক্রুশভোগী খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমহিমা, বিবেকের অতন্দ্র প্রহরা, প্রাত্যহিক অন্তর পরীক্ষা, পাপস্বীকার..."

বাঙালীদের প্রতি রোলাঁর প্রস্ফুট পক্ষপাত: তারা বুদ্ধিদীপ্ত, শীলিত-আচরণ, বাক্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে আতিশয্য-প্রবণ, ঠিক ইতালীয়দের মতো—কিন্তু অধ্যবসায়ে দীন; যেমন চট করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তেমনি টুক করে ক্লান্ত হয়ে যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বার্লিন আগমনের সংবাদে, স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত সাধারণীকরণের প্রেরণায়, তিনি লিখে বসেন, "এই বাঙালীরা...এত উগ্র, এত আবেগপ্রবণ...যুক্তিযুক্ততার ধার এরা ধারে না। এরা শুধু মানে নিজেদের সংরাগের তাড়না, ঈর্ষা ও দম্ভজনিত আবেগাতিশয্য, আশু উত্তেজিত কাঁচা মতের স্পর্শকাতরা।"

বিরক্তির তিক্ততা কিন্তু সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে বইয়ের সর্বশেষ পাতাটিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারিস-প্রবাসী ভারতীয়েরা 'স্বাধীন ভারতবর্ষ কেন্দ্র' নামক এক সংস্থায় যোগদানের জন্য রোলাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। "তাঁরা জানেন, ভালো মতোই জানেন, তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দেবার উপায় আমার নেই—আমার নিজেরই মাতৃভূমি আজ শৃঙ্খলিত। কিন্তু তাঁরা শুধু আপন দেশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত; এবং তার মুক্তির জন্য যে-কোনো উপায়ই অবলম্বন-যোগ্য—এমনকি অপরের বন্দীদশাও।"

রবীন্দ্রনাথ

১৯৩০ পর্যন্ত, অর্থাৎ জার্নালের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে, রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য—শেষার্ধে যেমন গান্ধীর। রোলাঁ তাঁদের তুলনা করেছেন যথাক্রমে প্লেটো ও সন্ত পলের সঙ্গে। এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে চরিত্রগত ব্যবধান বুঝতে দেরি হয়নি রোলাঁর। দুজনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন "মানবসমাজের দুটি গোষ্ঠী, দুটি শ্রেণীকে—একদিকে অভিজাত পুরুষ, রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত, আরেক দিকে জনপ্রিয় সার্বজনীন গুরুর প্রতিচ্ছবি। যেন দ্বৈরথে মুখোমুখি যুগল—চূড়ান্ত শিল্পী আর আধ্যাত্মিক তথা রাজনীতিক প্রবক্তা।" প্রকৃতপক্ষে, ভারত-দর্শনে ব্যাকুলভাবে উৎসুক হয়েও যে-সব কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি বিরত হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ হল এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দোটানায় পড়ে দ্বিধাহীন হবার আশঙ্কা।

রোম্যাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তাধারার সাধর্ম্য ছিল প্রবল। এই চিৎসাদৃশ্য সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ১৯১৬

সঙ্গে টোকিয়ো-র প্রদত্ত রবীন্দ্র-ভাষণের প্রতি রোলাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মানবেতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ বলে ঐ মুহূর্তটিকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের উক্তির উদ্ধৃতিসাক্ষ্য : প্রতীচীতে যতজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, রোলাঁই ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি, আমার অন্তঃপ্রকৃতির নিকটতম আত্মীয়।"

প্রথম সাক্ষাৎকারের কাল [১৯২১] থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঋষিপ্রতিম দিব্যকান্তি ও মনোমুগ্ধকর সর্বতোভদ্র ব্যক্তিত্ব রোলাঁর মন কেড়ে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূর—যাঁকে তিনি বরাবর উল্লেখ করেছেন 'প্রতিমা' বলে—মাধুর্য ও সম্ভ্রম জাগানো উপস্থিতি ও আচরণ, এবং রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথের "মনোরম শিষ্টাচার, আত্মসংহত ও নিখাদ সহানুভূতিশীল বিনম্রতা"ও তাঁর মনে গভীর স্নিগ্ধ ছায়াপাত করেছিল। কয়বার লক্ষ করেছেন রোলাঁ রথীন্দ্রনাথের সচেতন আত্মবিলোপী নেপথ্যবিহার, যেন পিতার সেবাতেই তাঁর জীবনের চরিতার্থতা : সমস্ত জাগতিক চিন্তাভাবনার বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পিতাকে তিনি আপ্রাণ প্রয়াসে ভারমুক্ত করেছেন।

য়ুরোপের সঙ্গে প্রতি তুলনায় এশিয়ার—বিশেষত ভারতবর্ষের—শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয়তার কথা রোলাঁ লিপিবদ্ধ করেছেন বিনা মন্তব্যে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, য়ুরোপ এক দক্ষ কারিগর, সুন্দর একটি বাদ্যযন্ত্র সে রচনা করেছে, কিন্তু তাতে সঙ্গীত-যোজনা করতে পারেনি; সঙ্গীত ভারতেরই প্রাণসম্পদ। য়ুরোপীয় ভারততত্ত্বজ্ঞদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আস্থাহীন; তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা পর্যন্ত, তাঁর মতে, প্রকৃত হিন্দু মানস-ঐতিহ্যের অবধারণায় অক্ষম।

সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ আর রোলাঁ, দুজনেই ছিলেন সঙ্গীতের সমজদার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি গান নিজ কণ্ঠে রোলাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। রোলাঁর অভিমত : "গান দুটি স্পষ্টরেখ, ছন্দোস্পন্দন বাঁধা, অনেকটা য়ুরোপীয় মেলোডির মতো; খুব বেশী ঔৎসুক্য জাগায় না, কিন্তু সহজেই মনে রাখা যায়, সহজে শেখানোও যায়।"

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বিষয়ে রোলাঁর বক্তব্য : রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় কিছুই জানেন না। রোলাঁর ভারি বিস্ময় লেগেছে ভাবতে যে এই বিরাট প্রতিভার শিল্পী, এতকাল প্রতীচীতে অতিবাহিত করেও এবং য়ুরোপীয় সমাজের বিভিন্ন মহলে সহজ যাতায়াতের সুযোগ পেয়েও, এমন একজনও য়ুরোপীয়ের সঙ্গে বন্ধুসূত্রে আবদ্ধ হননি

রবীন্দ্রনাথ

যাঁর সত্যি-সত্যি কথঞ্চিৎ সাঙ্গীতিক দক্ষতা আছে। গ্লাক্-এর নাম পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিচিত। তাঁকে বীঠোফেনের একটি সঙ্গীতাংশ বাজিয়ে শোনাতে গিয়ে প্রতিহত হয়েছিলেন রোলাঁ; বুঝতে পেরেছিলেন, সঙ্গীতের সুরমহিমার কোনো অভিঘাতই পড়ছে না শ্রোতার মনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিতার রস দেশ থেকে দেশান্তরে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত কদাপি নয়। রোলাঁর উত্তর : য়ুরোপে ঠিক উল্টো; গোটে কিংবা শেলিকে কিছুতেই অনুবাদে ধরা যাবে না, অথচ উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বীঠোফেনের সুরলহরী অনুভূতির অব্যবহিত তরঙ্গ তোলে।

আরেকটি বিষয় ঔৎসুক্যজনক ঠেকেছে রোলাঁর কাছে : রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার উপর স্থান দেন, তাঁর গানকে, এবং গানের উপর তাঁর ছবিকে : 'এখন আমার আর সব কাজ সম্পর্কেই আমি উদাসীন; শুধু একটি বিষয়ের জন্য আমি গর্ব অনুভব করি, তা আমার ছবি।' আসলে, রোলাঁর মন্তব্য, পাশ্চাত্ত্যে তাঁর ছবি যে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছিল, তার নেশার ঘোর লেগেছিল রবীন্দ্রমানসে—তিনি খুঁটিয়ে দেখেননি কতটা তার খাঁটি, আর কতটা শুধুই ভদ্রতা-সম্মত অলীকভাষণ আর ফোতোবাবুদের সবজান্তা মনোভাবের প্রকাশ। বার্ধক্যপ্রাপ্ত মহাকবির শিশুসুলভ অহংবুদ্ধি বলে এর উল্লেখ করেছেন রোলাঁ—এবং স্মরণ না করে পারেননি যে ঠিক এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশে দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে চলেছে লড়াই, দেশনেতারা কারারুদ্ধ। আচার্য জগদীশের সঙ্গে প্রতি তুলনা রোলাঁর মনে এসেছে : ভারত ও ভারতের কষ্টের সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না, তাঁর নিজের গবেষণা পর্যন্ত থেমে আছে : "সত্যই আলাদা ধাতুতে গড়া এই মানুষটি : স্বীকার করি তিনি আমার মনকে টানেন অনেক বেশী।"

জনান্যের চোখে

রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে রোলাঁর কৌতূহলী ও সশ্রদ্ধ মনোভাবের প্রমাণ মেলে আরেকটি তথ্যে : রবীন্দ্রনাথকে চেনেন এমন অতিথি-অভ্যাগতের কাছে তাঁর বিষয়ে তিনি নানান আগ্রহী প্রশ্ন প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত করতেন, এবং তাঁদের অভিমতগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন তাঁর ডায়েরিতে।

পল্ রিশার—অরবিন্দের এক প্রাক্তন বন্ধু; এঁরই স্ত্রী পরবর্তী কালে পণ্ডিচেরীর

'মা' হবেন—রোলাঁকে জানান, "রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হল বিত্তবান বংশে জন্মগ্রহণ, যার ফলে পারিপার্শ্বিক সমাজের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তিনি ছিন্নযোগ। সংরক্ষিত কম্পার্টমেন্টে ছাড়া তিনি কখনো ভ্রমণ করেন না। আর তাঁকে ঘিরে থাকে এক অমাত্য ও সভাসদমণ্ডলী। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় নয়, ছোটোখাটো নন্দন-কানন একটি, দেবতার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করে দেবদূতেরা বন্দনারত।"

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী এলম-হার্স্টের কাছ থেকে রোলাঁ শোনেন, "সজ্জন ও স্নেহপ্রবণ তিনি, অপরের প্রতি সহানু-ভূতিশীল, কিন্তু অতিমাত্রায় অভিমানী ও স্পর্শকাতর। তাঁকে যারা ভালোবাসে, তাদের প্রতি তাঁর ইচ্ছাশক্তির উপর চাপ-সৃষ্টির সন্দেহ তিনি এড়াতে পারেন না। মানুষের মনঃসমীক্ষায় তাঁকে তেমন কুশলী বলা যায় না। ঝোঁকের বশে চলেন বড্ড বেশী, আত্যন্তিকভাবে কল্পনাপ্রবণ, লোক চিনতে প্রায়শই ভুল করে বসেন। অপাত্রে বিশ্বাস ও সুপাত্রে অনাস্থা তাঁর স্বভাবগত, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁকে ফেরাতেও দুরূহ।"

এইসব সমালোচনার উপর নিজের মতা-মত প্রকাশে, সম্ভবত ইচ্ছে করেই, বিরত থেকেছেন রোলাঁ। তথাপি, রবীন্দ্রনাথের আচরণভঙ্গিমার কোনো কোনো লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যে তাঁকে বিরূপ করেছে—এ সত্য তিনি গোপন করেননি। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ : নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালো-বাসেন রবীন্দ্রনাথ, বাগ্মিতার আত্মতৃপ্তির টানে ভেসে যান, বুনে যান কথার পর কথা; যাকে তিনি সংলাপ বলে মনে করেন আসলে তা স্বগতোক্তি, দীর্ঘায়িত নিরুপদ্রব বাক-বিস্তার তাঁর পছন্দ, সূত্র থেকে সূত্রান্তরে চলে যান অকস্মাৎ...। নিজের বলার কথাটি বলতে না পেরে রোলাঁ অধীর হয়ে ওঠেন। তাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথের বারো দিন অবস্থানের পর রোলাঁ লিখছেন, "আমি তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসি, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি; আর তবু স্বীকার করব কি, এমন একটিমাত্র কথোপকথনের কথাও মনে পড়ছে না আমার, যার মধ্যে, কথার

গান্ধী
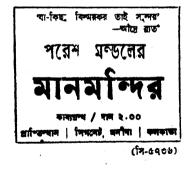
মাঝখানেই, হঠাৎ উঠে বেরিয়ে আসার প্রবল প্রলোভন অনুভব না করেছি।"

তথাচ, তাঁর অনুরক্তিতেও যে বিন্দুমাত্র ফাঁক ছিল না, ভারতীয় বন্ধুর বিদায়কালে, স্টেশনে, ভারতবন্ধুর আন্তরিক অশ্রুধারা তার প্রমাণ দিয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী

এই আন্তরিকতা গান্ধীর প্রতি রোলাঁর মনোভাবেও পূর্ণ মাত্রাতেই পরিস্ফুট : "সমকালের অন্য যে কারও চাইতেই আমি তাঁকে অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করি।" অথচ, প্রথম থেকেই এ-ও তিনি লক্ষ করতে ভুল করেননি, গান্ধীর মধ্যে তাঁর মতো কোনো আন্তর্জাতিকতাবাদীর সন্ধান মিলবে না। গান্ধী জাতীয়তাবাদী, মহত্তম ও বরেণ্যতম জাতীয়তাবাদী : কোনো শর্তেই নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন না তিনি কোনো মুসল-মানের সঙ্গে: একজন মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য একটি গভীর প্রাণহত্যা তাঁর পক্ষে অসম্ভব...

গান্ধী সম্পর্কেও তাঁর অতিথিদের অভিমত তিনি টুকে রেখেছেন : "রাম-কৃষ্ণের প্রভাবমুগ্ধ তিনি" (ধনগোপাল মুখার্জি); "দরিদ্রনারায়ণের ধারণা তিনি বিবেকানন্দের কাছেই পেয়েছেন" (এণ্ড্রুজ); "ভারতীয় জনসাধারণের উপর নৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর একটুকু ক্ষীণ হয়নি, কিন্তু ভারতের এলিটের উপর রাজনীতিক নেতৃত্বক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন" (নেহরু)।

রোলাঁর মতে মহাত্মার এক মহৎ গুণ এই যে, প্রশংসার চেয়ে সমালোচনার প্রতিই তিনি অধিকতর উৎসুক, তার জন্য, তিনি অধিকতর কৃতজ্ঞ। তাঁর আশ্রমের দু' শো সভ্যের কেউ-ই আশ্রমগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা-পোষণে দীন নন, কিন্তু তাঁরা সকলেই স্বাধীন বিচারের দায়িত্বে ও অধিকারে মণ্ডিত: 'এই ক্ষেত্রে কিংবা ঐ বিষয়ে আমার ধারণা অন্যরকম...' এ কথা বলতে কেউ সঙ্কুচিত হন না, এবং গান্ধী মতান্তরের মূল্য জানেন, ভিন্ন মতের অবাধ প্রকাশ তাঁকে তৃপ্তিই দেয়। আপন শিষ্যদের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ নেতাদের তিনি লালন করে তুলেছেন—যে নেতারা একদিন তাঁকে এবং পরস্পরকে ছাড়াই আপন কাজ করে যেতে পারবেন। মহাপুরুষদের মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল।

গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কথঞ্চিৎ প্রতিকূল মনোভাব পীড়া দিয়েছে রোলাঁকে : গান্ধীর ক্ষুদ্রতর দিকগুলিই উনি দেখেন; মহত্তর বৃত্তিগুলিকে স্বীকার করলেও তদ্বিষয়ে অধিক কালক্ষেপ করেন না; নিজ উপবাসসমূহ সম্পর্কে গান্ধীর অতি-বিজ্ঞাপনী প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিহত করে। রোলাঁর মনে হয়, গান্ধী তাঁর আন্দোলনে এই কল্পনার বরপুত্রকে যে ভূমিকায় নির্দিষ্ট করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে তাচ্ছিল্য দেখেছিলেন, এবং সেই ক্ষোভ তিনি ভুলতে পারেননি। "আমাকে এই কর্মযজ্ঞে কোনো অংশ দিতে পারেন না?" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন গান্ধীকে। গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন, "চরকা কাটুন।" রবীন্দ্রনাথ কখনও তা কাটেননি।

রোলাঁর মত : দেশের যুবসমাজ রবীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে : নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন গান্ধী; রবীন্দ্র-নাথ এখন গতদিনের সূর্য। এমন কি, মহান উপন্যাসগুলিতেও বয়সের ছায়া : 'ঘরে-বাইরে'র মতো রচনায় নব্য ভারত আর নিজেকে খুঁজে পায় না : সে-সব উপন্যাসে বর্ণিত পরিস্থিতি এখন অতিক্রান্ত।

...তবু দুই মহান ব্যক্তিত্বের এই পার-স্পরিক সম্পর্কের ইতিকথা শেষ হয়নি বিষাদের সুরে। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে রোলাঁ স্মরণ করেছেন ১৯৩৭-এ কলকাতায় গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের কথা—যার মধ্য দিয়ে আরেকবারের মতো, সমস্ত বিরোধ, ব্যবধান ও মনান্তরের পরেও—ব্যক্ত হয়েছিল উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি।

এই সুন্দর, মধুর, মর্মস্পর্শী চিত্রে সেদিন ইতি টেনেছিলাম পাঠে; পরিপূর্ণ আবিষ্ট চিত্তে বিদায় নিয়েছিল আমার বাঙ্গালী বন্ধু—ঐ অবিস্মরণীয় মিলনছবির অনুপ্রেরণা স্পষ্টত আলো ফেলেছিল তার মুখে।

"তা হলে আসি, দাদার...বেলগাছিয়ার শেষ ট্রাম এখুনি ছাড়ল বলে...চলি।"

বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁদের গ্যালারীতে শিল্পী পরিতোষ সেনের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা ছবি, স্কেচ ও ড্রয়িং-এর অনেকগুলি নিদর্শন দেখা যায়।

নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করার জন্য পরিতোষ সেন সুপরিচিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিকতম শিল্পকার্যে তাঁর চিন্তাধারা ও বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যাঁরা গত কয়েক বছর যাবৎ শিল্পীর রচনাধারা দেখে আসছেন তাঁরা তাঁর আধুনিক নিদর্শন-গুলিতে কোনও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন বলে মনে হয় না। শিল্পী আকার অপেক্ষা রঙ ব্যবহার পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্ব দেন। আধুনিকতম ছবিগুলির জন্য তিনি বৃহদাকার ক্যানভাস ব্যবহার করেছেন ও সেগুলি প্রধানত নীল, কালো, সবুজ ও হলুদ রঙে ভরে ফেলেছেন—ক্যানভাসের সামান্যতম প্রয়োজনীয় অংশও তিনি রঙের সাধারণ টোন দ্বারা পূর্ণ করেন নি। ছোট ও ভগ্ন নানা বহুমুখী আঁচড়ে তিনি রচনাক্ষেত্রটি পূর্ণ করে ফেলেছেন ও তাদেরই মধ্য থেকে নানা সমবিমূর্ত ও বিচিত্র আকার শেষ পর্যন্ত ফুটে বেরিয়েছে, এবং ক্যানভাস অনুযায়ী সেগুলিও বিরাট আকার ধারণ করেছে। সুতরাং একমাত্র এই বৃহৎ আকার বা মনুমেন্টাল রূপ ছাড়া তাঁর রচনায় নতুন কোনও শিল্পধারার সন্ধান পাওয়া গেল না। এবং একথাও ঠিক যে তাঁর অংকন পদ্ধতির জন্য কয়েকক্ষেত্রে ক্যানভাসগুলি অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ অনেক স্থলে ছোট ও বিভিন্নমুখী রঙরেখা ব্যবহার করার ফলে ছবির অন্তর্নিহিত আকার অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে—যেমন বড়ে গোলাম আলি খাঁর দ্বিতীয় ছবি। পরিকল্পনা ও সুকৌশল রঙ ব্যবহার প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিল্পী এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিখানি অনেকের মনে থাকবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছবির নাম উল্লেখযোগ্য—পোর্ট্রেট অব অ্যান অ্যানিম্যাল। যে ক্ষেত্রে শিল্পী রঙপাত্রটির সদ্ব্যবহার করেছেন সেখানেই তিনি সুফল-লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ফ্লোটিং ফিগার-১-এর নাম করা চলে। শিল্পীর রঙ ব্যবহার পদ্ধতি, বিশেষ করে ছবির মধ্যস্থ

হেড ইন রেড —পরিতোষ সেন

বিভিন্ন অপরিস্ফুট বা অর্ধপরিস্ফুট আকার দেখে নোলদে-র রচনার কথা অনেকের মনে পড়বে। হলুদ রঙপ্রধান ফ্যামিলি পোর্ট্রেট ও পোর্ট্রেট অব মিঃ এচ ভিন্ন মেজাজের। ফরাসীপ্রভাব থাকলেও ছবিদুটির সরলতা ও অঙ্কনরীতি অনেককে মুগ্ধ করবে। শিল্পীর গান্ধী প্যাভিলিয়নের জন্য রচিত বিরাট ক্যানভাসটির অঙ্কনরীতি দেখে এটিকে প্রাচীন চিত্রের পরিবর্তে সুবৃহৎ পেন্টিং বলে মনে হয়। ছবিখানি

পটারীশিল্পের নিদর্শন —শ্রীআলো দত্ত ও শ্রীমতী শর্বরী দত্ত

এখনও অসমাপ্ত, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করাই ভাল।

অপরাপর ছবির মধ্যে ফিগার ইন ব্লু ও হেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা রঙ-সমুদ্রের মধ্যে আকার অনেক ক্ষেত্রে চাপা পড়ে গেলেও শিল্পীর বলিষ্ঠ রঙ ব্যবহার তথা স্তরভেদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা সকলেই স্বীকার করবেন।

পরিতোষ সেনের স্কেচ ও ড্রয়িংগুলি দেখবার মত। শিল্পী হিসাবে তাঁর বুনিয়াদ যে কত সুদৃঢ় তা এগুলি দেখেই বোঝা যায়। এখানে শিল্পীর ভাষা সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট। তাঁর প্রত্যেকটি রেখা দৃঢ়, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত, মনে হয় কলমের লেখার মত সেগুলি যেন তুলির মুখ থেকে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এসেছে। কয়েকস্থলে শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবে ক্যারিকেচারের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন যা আকারকে ঈষৎ বিকৃত করেছেন। তাতে রুচিপূর্ণ [illegible] নেই। এই প্রসঙ্গে ৯, ৩০, ২৯, ২৭, ১৮, ১৯ ও বিশেষ করে ৩৬নম্বরের [illegible] করা যায়।

✽

স্কুল-কলেজে সাধারণভাবে লেখাপড়া করে প্রয়োজনের খাতিরে ধাপে ধাপে জীবিকা অর্জন করলেও অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে হয়ত শিল্পচেতনা অথবা প্রীতি লুকিয়ে থাকে। তার আহ্বানে একদিন না একদিন তাঁদের সাড়া দিতে হয়। সম্প্রতি এজাতীয় এক তরুণের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁর নাম শ্রীআলো দত্ত। তিনি ও তাঁর তরুণী স্ত্রী শ্রীমতী শর্বরী দত্ত উভয়েই পটারী শিল্পী, এবং সম্প্রতি কয়েকজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের তৈরী পটারী নিদর্শন দেখান।

আলো দত্ত অর্থনীতিশাস্ত্রে গ্র্যাজুয়েটের ডিগ্রীলাভ করে সকলের মত একটি অফিসে চাকরি করতেন। কিন্তু তাঁর প্রচ্ছন্ন শিল্পী মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। অবশেষে একদিন তিনি চাকরির মায়া ত্যাগ করে কলকাতার কাছেই একটি গ্রামে কুমোরের চাকা ভাড়া নেন ও একটি কুমোর রেখে সস্ত্রীক পটারীর নানা জিনিস তৈরি করতে শুরু করেন, এবং তাঁদের ডিজাইন অনুযায়ী কুমোরও পরীক্ষামাধ্যমে নানা নতুন আকারের ব্যবহারযোগ্য জিনিস সৃষ্টি করেন। সেদিন যে নিদর্শনগুলি দেখলাম তাদের মধ্যে কুঁজো, জগ, ফুলদানি, বোতল ও বাটি জাতীয় পাত্র উল্লেখযোগ্য। সবগুলিই কুমোরের চাকে তৈরী অর্থাৎ ইংরাজীতে যে আকারকে বলে thrown shape। প্রত্যেকটি বস্তুই মাটির তৈরি—কোনওটির নীচের দুই একটি স্থান তোবড়ান, দেখে মনে হয় যেন কেউ স্থানগুলিতে আঙুলের চাপ দিয়েছে। আকারের দিক থেকে বিদেশীর প্রভাব থাকলেও কতকগুলির মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। দত্তদম্পতী পোড়ামাটির জিনিসগুলির ওপর চকচকে নানা মনোমুগ্ধকর রঙ ব্যবহার করেছেন ও তার ওপর আবার বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙে নানা বিচিত্র রচনাকারুকার্য (texture) সৃষ্টি করেছেন—ফলে সেগুলি পটারীর সুন্দর নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। এগুলির প্রধান আকর্ষণ হল বিচিত্র আকার ও উজ্জ্বল রঙ বা গ্লেজ। বিশেষ করে সাদা কুঁজো, ময়ূরকণ্ঠী রঙের জগ, ও পিরামিড আকারের বোতল উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য ঘরের শোভা বর্ধন করার পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী। আশা করি এগুলির প্রচার ও প্রসারের জন্য দত্তদম্পতী যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চিত্রপ্রিয়

দ্বিতীয় ধরিত্রী

সমীর রক্ষিত

পোর্সেলিনের টবে স্ফুট গোলাপের পাপড়িগুলি ঝরে গেল; হরিৎবৃন্তে পড়ে রইল রক্তাভ গর্ভকোষ—পরাগ এবং সজল বাতাসে উদ্‌ভ্রান্ত কিছু সৌরভ। পাপড়িগুলি লুটোচ্ছে এখন টবের মাটিতে ব্যাল্‌কনিতে—থিরথির করে কাঁপছে বাতাসে। বৃষ্টি এসেছিল—বিষন্ন আকাশে শোকার্ত বর্ষণ; পাপড়িগুলি ঝরে যাবার আগেই বৃষ্টি পড়েছিল কিনা মনে নেই, শুধু মনে আছে উঁচু নীচু ছোটবড় অসংখ্য ঊর্ধ্বগ্রীব স্থবির জিরাফের মত ঠাসাঠাসি দালান কোঠা ঘরবাড়ির মাথার ওপরে বহু-দূর এক জ্যামিতিক নীলিমায় গাঢ় কৃষ্ণমেঘ উঠে এসেছিল—হঠাৎ মনে হয় যেন ঐ ঘর-বাড়ির থেকেই কালো ধোঁয়া উঠছিল—দূরে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল এবং বজ্রের গর্জন আর সর্বত্র তার উন্মাদ প্রতিধ্বনি ফিরছিল। আকাশ উপুড় করে অতঃপর বর্ষণ—আপাতত হাওয়া সজল এবং চতুর্দিকে অপরাহ্নের বৃষ্টিশেষে নিরুত্তেজ রোদ—ক্যানভাসের ওপরে দ্রুত হাতে এসব আঁকা হয়ে গেল। প্যালেটে রঙ ছিল—আমার হাতের তুলি অনভ্যস্ত দ্রুততায় রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ঈপ্সিত রেখায় টানে ক্যান-ভাসের দৈর্ঘপ্রস্থে অবলুণ্ঠিত পাপড়িগুলি—হরিৎ বৃন্তধৃত রক্তাভ গর্ভকোষ এবং পরাগের অবয়ব দিল এবং জ্যামিতিক নীলিমায় হঠাৎ-উঠে-আসা গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ উচ্চগ্রীব নিষ্প্রাণ জিরাফের মত অসংখ্য বাড়িঘর ও শোকার্ত বর্ষণ—এই পরিপার্শ্ব ও আকৃতি পেল। কিন্তু আমার হাতের উদ্‌গ্রীব তুলির গতি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে—মনের ভিতরে সংশয়—একটা বিষাদ শীতের কুয়াশার মত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। জানলা দিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের তার ল্যাম্প পোস্ট এবং বিজ্ঞাপন—দ্রুতগামী যান-বাহন—ত্রস্তব্যস্ত অসংখ্য মানুষ দেখি, আবছা কোলাহল কানে আসে, চোখ ঝাপসা হয়ে যায়—আজই প্রথম আমি ধরিত্রীর প্রতিকৃতি আঁকলুম না, এই প্রথম ধরিত্রী আর আমার সামনে বসে নেই—অথচ ধরিত্রীকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলুম—

ধরিত্রীর কথা মনে পড়ে। বস্তুত ধরিত্রী আছেই, সতত আমার চারিদিকে হাওয়ার মত, আমার চোখে আলোঅন্ধকারের মত আমার ভিতরে ইচ্ছার মত। তবু এই মুহূর্তে সমস্ত চেতনায় ব্যাপ্ত বিষাদে সে স্পষ্ট হল—"তোমার ছবি কোনদিনই শেষ হবে না"—ধরিত্রী বলত, বলে এমন করে হাসত যেন এই মুহূর্তে একটি নদী পর্বত থেকে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সে হাসির স্রোত আমার রক্তেও বয়ে যেত। আমি কোনদিনই ধরিত্রীর কোন ছবি শেষ করতে পারিনি, তবু আমি তুলির উল্টোদিক তার কল্লোলিত ঠোঁটে রেখে হেসে বলতুম—"আজ হলনা, কোনদিন হবে।" যেন আমার কথায় সবটাই স্তোক—ধরিত্রী এমনিভাবে তার দুই ভুরু এক করে ভ্রূকুটি করত—আকাশের দুই প্রান্ত যেন সেই মুহূর্তে এক হয়ে যেত, রাত্রি হলে দুই প্রান্তের অগণ্য নক্ষত্র ধ্রুব কাছাকাছি এসে যেত, দিন হলে মনে হত আকাশ কত ছোট। আমি ধরিত্রীকে ভালবেসেছিলুম। আমি অতি শৈশবে গভীর বিস্তৃত শেষহীন গাঢ় হরিৎ যে অরণ্য দেখেছিলুম, আপাতত যা ধূসর স্মৃতি—একমাত্র ধরিত্রীর অবিন্যস্ত কৃষ্ণ-কুন্তলেই তা কখনো কখনো উজ্জ্বল হত; আমি কোনওকালে যে উদার অনাহত নিষ্কলঙ্ক ধোঁয়াহীন নিপাট সুনীল অখণ্ড আকাশ দেখেছি সে কেবল স্পষ্ট হত ধরিত্রীর প্রশান্ত প্রশস্ত ললাটে। আমার চতুষ্পার্শ্বে এখন উঁচুনীচু অসংখ্য নিষ্প্রাণ উন্মত্ত

ঘরবাড়ি, আমি আর প্রত্যুষে সন্ধ্যায় উদভ্রান্ত দেখিনা. কিন্তু আমি পূবে-পশ্চিমে দুই প্রান্তে ধরিত্রীর দুচোখ দেখতুম। আমি শৈশব হইতে কৈশোর—কৈশোর থেকে এই যৌবনে ধরিত্রীকে ভাল-বেসে এসেছি। ধরিত্রীও আমায় ভাল-বেসেছিল। কখনো-সখনো সে খুব কাছে এসে, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যখন তার উত্তাল দীর্ঘ দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে তার কাছে টেনে নিত তখনই আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে যেত, বুকের ভিতরে যেন গুড়গুড় করে উঠিত, আমার ভীরু অসহায় শৈশব ছুটে আসত আমার কাছে আর আমি শান্ত এক আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে ক্রমাগত তার শরীরের সংলগ্ন হয়ে যেতুম, ধরিত্রীর উন্নত উরু যুগল স্তনের নিবিড় অধিত্যকায় আমি পুষ্পিতবৃক্ষের মত—

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নির্মাণের কথা মনে পড়ত। নির্মাণ আমার সহোদর। একই মায়ের গর্ভে আমরা পাশাপাশি প্রাণ পেয়েছি, জন্মের আকাঙ্ক্ষায় দশমাস দশদিন গর্ভের অন্ধকারে পাশাপাশি অপেক্ষা করেছি, মায়ের ছত্রিশ নাড়ীর পাকে আমরা দুজনে জড়িয়ে ছিলাম; মায়ের হৃৎপিণ্ডের রক্ত একই সঙ্গে আমাদের দুজনের হৃৎপিণ্ডে শিরায় উপশিরায় শরীরের কোষে কোষে বয়ে যেত; ওর হাত আমার হাতের স্পর্শ পেত, আমার শরীরের স্পর্শ ওর শরীরে —আমরা পরস্পরের উত্তাপে ঘনিষ্ঠ ছিলাম —আমরা যমজ। আমাদের দুজনের মধ্যে কার চোখে প্রথম আলো পড়েছিল আমরা জানি না—মাও বলতে পারেনি। মায়ের ধারণা হয়তো আমি নয় নির্মাণই আগে এসেছিল। কারণ নির্মাণ স্বভাবে আমার ঠিক বিপরীত—নির্মাণ দুরন্ত বেপরোয়া দুর্দম। শৈশবেই নির্মাণ নাকি বাঘ পোষ মানিয়েছিল, কৈশোরে দেখেছি সে একটা ঘনকালো জোয়ান বুনো ঘোড়ার কেশর জাপটে ধরে ছুটছে। আজো মাঝে মাঝে আমি চমকে উঠি, সহসা নীল আলো-প্লাবনে ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দ শুনে আমি জানলায় ছুটে যাই— নির্মাণ কী? নির্মাণ কোনদিন মায়ের কোলে থাকেনি—মাকে ও খুব যন্ত্রণা দিয়েছিল, কোথায় কোথায় ও উধাও হয়ে যেত। মা কেঁদেছে—মায়ের প্রাণ, মা তখন আমাকে কোলে নিয়ে আদর করত আর তার আরক্ত দুচোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়ে যেত। আমি টের পেতুম মায়ের চোখের জল আমার বুকের ওপর ঝরলেও মায়ের বুকের ভেতরে এই মুহূর্তে নির্মাণ। আমার ভেতরটা কী ঈর্ষায় জ্বলে উঠত? রক্তে কিসের গুড়গুড় শব্দ। আমি একান্তে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে ফুল নিয়ে খেলতুম, নদী যেপথে যায় আমি মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে চলে যেতুম, আমি পাখীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করেছি; সূর্যোদয়ে যে ফুল ফোটে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ফুল পূব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে আমি সেই ফুলের অনুসরণ করেছি। আমি চঞ্চল হাঁসের সঙ্গে জলের মধ্যে এপার ওপার করেছি—পদ্মবনের কণ্টকে আমার শ্যামল শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। মা ডাকলে আমি ঘনবনের খয়েরী ধূসর মলিন ঝরা-পাতার আলোছায়া মাড়িয়ে মার কাছে ছুটে গেছি। মাকে দেখেছি—দ্যুলোকে মাথা হেলিয়ে ক্লান্ত বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে—এক-হাত বিশাল হরিৎ প্রান্তরে স্থাপিত, অন্য হাত কোলের ওপর—যেন তাঁর শুভ্র পদ-যুগল পৃথিবীর শরীর ছাড়িয়ে কিছুটা বাইরে মহাশূন্যে ডুবে আছে। তাঁর চতুর্দিকে গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাপুঞ্জ দ্রুতবেগে পরি-ক্রমারত—মায়ের চোখে সজল আলোর বিষণ্ণ উদ্ভাস—সেই মাকে কবে হারিয়েছি। মনেও পড়ে না, কী ধূসর স্মৃতি। মাকে আমি পরিত্যাগ করে এসেছি। মা কাঁদত নির্মাণের জন্য; নির্মাণ তখন অনেক দূরে—ঘোড়ায় খুরে খুরে ধুলোর মেঘ কুলফলবৃক্ষলতা প্রান্তর নিসর্গ আবৃত করে দিত, বিশাল পেখম তুলে যেন এক ময়ূর তাকে অনুসরণ করত; আজ যে মেঘ উঠে এসেছিল তা দেখে ধাবমান নির্মাণের কথাই মনে পড়ে-ছিল আমার। সেই কৈশোরেই নির্মাণ উত্তুঙ্গ পর্বতের গভীরতম গুহায় চলে যেত, দুর্গম বনে হিংস্র পশুর রাজ্যে মৃগয়া করত। আমার মনও ভয় আশংকা উদ্বেগে কেমন করে উঠত তার জন্য। আমিও অস্থির হয়ে যেতুম—"মা, নির্মাণ এখনো ফিরছে না কেন?" মায়ের দু চোখে জল—নির্মাণের জন্য উতলা হয়ে মা কাঁদত আর তখন আমাকে কাছে টেনে নিয়ে রুদ্ধ আবেগে বলত, "তুই কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাস না ধীমান।" আমি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি সজল চোখে—"না মা, কখনো আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না"—তবু আমি মাকে ছেড়ে এসেছি, আমি পালিয়ে এসেছি, ধরিত্রীকে নিয়ে—মাকে ছেড়ে আমি পালিয়ে এসেছি—

কারণ ধরিত্রীকে আমি ভালবেসেছিলুম; কিন্তু নির্মাণও ভালবাসত ধরিত্রীকে। নির্মাণও ধরিত্রীর সঙ্গ চাইত এবং নির্মম-ভাবেই চাইত। সেখানে ধরিত্রী অসহায়—যে কেউ অসহায়। নির্মাণ ছিল বলিষ্ঠ দেহে ও মনে। তার দৃঢ় উন্নত কপাটবক্ষ পেশীবহুল দীর্ঘ উজ্জ্বল হাত, কমঠ কাঁধ, কঠিন কঠোর মুখমণ্ডল এবং সুগঠিত উরু ও জঙ্ঘায় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির দম্ভ। তার চালচলনে ছিল গভীর আত্মপ্রত্যয় আর নির্ভয়তা। ওই প্রথম আমাকে আগুন জ্বালাতে শিখিয়েছিল, ওর চোখেই আমি প্রথম আগুনের শিখা দেখেছি। ও বহুবার আমাকে হিংস্র পশুর উদ্যত থাবা থেকে বাঁচিয়েছে। সেসব সময় ওর চোখেও আমার জন্য উদ্বেগ টলটল করত। কৃতজ্ঞতায় আমি ওকে বলেছি, "তোকে আমি গান শিখিয়ে দেব নির্মাণ, ফুল ভালবাসতে শেখাব।" সহসা ওর মুখ কেমন গম্ভীর স্তিমিত হয়ে যেত। বিব্রতভাবে ও বলত, "ওসব আমার হবে নারে—" তখন ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হত কোথায় যেন ওর একটা বেদনা আছে, বুকের ভেতরে একটা ক্ষত আছে। ও খুব অন্যমনস্কভাবে আস্তে করে বলত, "জানিস, ধরিত্রী তোকে বেশী ভালবাসে"—নির্মাণের দৃঢ় মুখও তাহলে বিষণ্ণ হয়—আমি অবাক হয়ে যেতুম। অথচ ও ছিল শক্তি সচেতন দাম্ভিক, ওর আচার আচরণে ছিল সহজ অহংকার। ধরিত্রী নিবিড় চোখে দেখত ওকে। ধরিত্রীর চোখে যত না ভয় তার চেয়ে বেশি স্ফূর্তি ফুটে উঠত। ধরিত্রীর আপাত উদাসীনতার মধ্যে প্রকৃত-পক্ষে আকর্ষণটাই ছিল প্রবল, আমার মনে

হত ধরিত্রী নির্মাণকেই বেশি ভালবাসে। সেই কৈশোরেই দুর্দম নির্মাণ ধরিত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেত। আমার পোষা কুকুরটা কঁকিয়ে উঠত, ততক্ষণে নির্মাণের দুরন্ত ঘোড়া ধুলোর ঝড় তুলে দ্রুত ধাবমান; ধরিত্রীর ঘনকালো চুল হাওয়ায় উড়ত, তার চোখেমুখে যেন স্মিত-উত্তেজনা, তার সর্বাঙ্গ নির্মাণের সর্বাঙ্গে সংলগ্ন; নির্মাণের বলিষ্ঠ হাতে চাবুক গর্জে উঠত। সূর্যের তেজ সে সময় ক্রমশ ম্লান হয়ে আসত, পাখি পাখালির কণ্ঠ স্তব্ধ। সেই কৈশোরেই নির্মাণ ভোগ করত ধরিত্রীকে।

কিন্তু নির্মাণের খুব বেশীক্ষণ—বেশিদিন ভাল লাগত না ধরিত্রীকে। ঘৃণায় যেন মুখ বিকৃত হয়ে যেত ধরিত্রীর—"ও একটা পশু।"—তারপর কিছুদিন কেমন অন্যমনস্ক অসহিষ্ণু রুক্ষ দেখাত ওকে। এসব দিনে ওর মধ্যে যেন নির্মাণের প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা জন্ম হত—"ও শুধুই ভোগ করতে জানে।" ধরিত্রীর সারা অঙ্গে বিদ্বেষ। আমি দেখেছি ক্রমে এসব কখন কেটে গেছে, আবার ওর চোখে স্ফূর্তি ফুটে উঠছে—চঞ্চল হয়ে উঠছে ধরিত্রী, আবার নির্মাণের অশ্বখুরের শব্দের প্রতীক্ষা করছে। আমার বুকের রক্ত গুড়গুড় করে উঠত, আমি অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছি—

তাই একদিন ধরিত্রীর সেই বিভ্রান্ত দিনে তার বিতৃষ্ণা ঘৃণা আর ক্রোধের সুযোগে তাকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। শৈশবের সেই গভীর বিস্তৃত অরণ্য—হাঁসের জলক্রীড়া—পদ্মবনের কণ্টক এবং ফুলের সৌরভ, ধূসরজীর্ণ ঝরঝরী পাতার মর্মর ছেড়ে চলে এসেছি। হরিণশিশুর কান্না—সারসের কেংকার এবং আমার মাকে ছেড়ে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের আলোয় উদভ্রান্ত উল্কার নির্দেশিত পথে অনেক রাত্রি পার হয়ে বহু যোজন পথ অতিক্রম করে আমি ধরিত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। পলায়নের পথে পথে কতদিন আমি ঘননীল প্রস্তরময় পর্বতের সানুদেশে, অরণ্যে নির্মাণের ক্রুদ্ধ অশ্বখুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি। আমার পোষা কুকুর কঁকিয়েছে। আমি ধরিত্রীর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিপাত করেছি। ধরিত্রী ক্রমশ যেন অন্য ধরিত্রী হয়ে যাচ্ছে। তার চোখে কখনো নিবিড় প্রশান্তি—কখনো অকরুণ ভ্রূকুটি। নীলিমার মত তার নির্জন শরীরে অস্ফুট শস্যের বেদনার ভার—তার চোখে অফুরন্ত তৃষ্ণার মরুভূমি এবং তার স্ফীত স্তন ও দীর্ঘ উত্তাল হাতে উন্মাদ উত্তাপস্পৃহা, তার পায়ে অবারিত পথযাত্রার উত্তেজনা, সে কখনো বন্ধনে পুলকিত, কিম্বা মুক্তিতে ক্ষুব্ধ। ধরিত্রীকে আমি কোনদিনই সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। ধরিত্রী খুব কাছে এলে তাকে দূরতম মনে হত, ওর কোথাও অন্ধকার আছে—সেখানে নিঃসর্ব দুর্গমতা, আমি উতলা হয়ে সব রহস্য জানতে চেয়েছি—ওর সম্পূর্ণ রূপ আমি স্পষ্ট করতে চেয়েছি। পলায়নের পথে উত্তুঙ্গ পর্বত শীর্ষে নিবিড় পূর্ণিমায় ওকে বসিয়ে—বিস্তৃত সমতল থেকে আমি ওর প্রতিকৃতি এঁকেছি—ওর দক্ষিণ পার্শ্বে ঊর্ধ্বে মুক্তাকার দুগ্ধবর্ণ চাঁদ—শরীরের একদিকে প্লাবিত জ্যোৎস্না অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকার, আমি ভীষণ উৎসাহে তুলির রেখায় তার প্রতিকৃতি এঁকে গেছি, কিন্তু ক্রমে আমার হাত শ্লথ হয়ে এসেছে, নিবিড় বিষাদ ব্যাপ্ত হয়েছে সমস্ত চেতনায়, ধরিত্রী বলেছে, "তোমার ছবি কোনদিনই শেষ হবে না"—

একটা অসহ্য অজ্ঞাত যন্ত্রণায় আমি

অস্থির হয়ে উঠেছি, আমার হাতের পেশী শিথিল হয়েছে, দৃষ্টি হয়ে উঠেছে শানিত। আমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়েছে আর সেই মুহূর্তে নির্মাণের চিন্তা একটা বিষাক্ত তীরের মত আমার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছে। আমার পোষা কুকুরটা ছটফট করে উঠেছে। ধরিত্রী যেন আমার সামনে বসে আমায় ব্যঙ্গ করছে। তবে কখন জানি না আমি আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে শুরু করেছি। আমার ভেতরে আমারই অজ্ঞাতে বিকৃত নির্মাণ আমাকে গ্রাস করেছে দশদিক থেকে। আমার চারিদিকে সংখ্যাতীত দেয়াল তুলেছি। ধরিত্রীকে ঘিরে ক্রমে গড়ে উঠেছে দালানকোঠা ঘরবাড়ী—উঁচুনিচু স্থবির জিরাফ—আকাশ হয়েছে খণ্ডিত, রুদ্ধ হয়েছে বায়ুপ্রবাহ। আমি অন্ধকারাক্রান্ত আলোর ধরিত্রীর বিচিত্র সব আয়োজন থেকে গেছি। জানি না কখন আমাকে ঘিরেছে অগণ্য গড়ে বিষাক্ত প্রাচীন [illegible] মত অলিগলি, সরীসৃপের মত কদর্য জটিল দিকভ্রান্ত পথ; ভ্রুক্ষেপ করিনি ত্রস্ত ব্যস্ত ভীত মানুষের হাহাকার; এখন শব্দে শব্দে আলোড়িত চরাচর—কোথাও অগ্নি-কাণ্ডের কোলাহল—দমকলের ঘণ্টার ঘণ্টা-

ধূলি, বাতাসে দগ্ধ কয়লাধোঁয়ার দুর্গন্ধ—খোলা হাট বাজার বন্দর নীলামের উচ্চ হাঁক, মাটির ভিতরে গলিত নর্দমা, ওপরে টিমটিমে, ল্যাম্পপোস্ট, অন্ধ লাইট হাউস আর হাজার সাইরেনের দুঃসহ তীব্র আর্তনাদ—

সেই আর্তনাদকে বিদ্রূপ করে দূরে কোথায় যেন নির্মাণ অট্টহাসি হেসে উঠেছে—তার ধাবমান অশ্বের খুরোর কেঁপে উঠেছে জলমাটি মহাশূন্য। আমার কুটিল দৃষ্টি আতংকে আশংকায় আচ্ছন্ন হয়েছে আর নির্মাণের অশ্বখুরের অনুসন্ধানী বিপদের শব্দ ক্রমাগত নিকট থেকে নিকটতর হয়েছে। বিবশ ধরিত্রীর শরীর দূরে জানালার গরাদে—তার দৃষ্টি বহুদূরে প্রসারিত, তার সর্বাঙ্গে প্রতীক্ষার অবসাদ, তার দীর্ঘ আলুথালু কেশ যেন অশনিবিদ্যুত নিদ্রিত. তার রক্তের প্রবাহ মরা কটাল এবং বৃত্তাকার চাঁদের স্বপ্নে উদ্বেল। হঠাৎ রাজপথে নীল আলোর প্লাবনে ট্রামের ঘর্ঘরে সে উন্মন; ময়ূরের পেখমের মত সঞ্চারিত-খোলা নিরত চঞ্চল। নির্মাণ অস্থির—কোথাও যেন তার আবাস নেই—স্থিতি নেই—যে ভাবনার চেয়েও ক্ষিপ্র—শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী, তার অশ্বখুরের ঘর্ষণে প্রাচীন পাথর ভেঙে চৌচির হয়ে যায়—মাটির শরীর থেকে গৈরিক ধুলো ওড়ে, তার ঊর্ধ্ব হাতের অঙ্গুলি নির্দেশেই যেন মৃতোপম আগ্নেয়গিরি সহসা অগ্নি উদ্গীরণ করতে থাকে, ভূমিকম্পের গর্জনে কম্পনে মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপ তোলপাড়—পৃথিবী গর্ভের আদিম উষ্ণ তরল লাভা বিস্ফারিত হয়ে প্রস্রবনের মত ঊর্ধ্বে উঠে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে; সে-লাভাস্রোতে লোহা তামা সোনা গন্ধকের ঢল—উত্তাপে বায়ুমণ্ডল রক্তাভ। তার অশ্বখুরের আঘাতে আঘাতেই সে ঢল চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে—ক্রমশ শীতল কঠিন হচ্ছে। দীর্ঘ লৌহপথ অনবরত পাচ্ছে—সুউচ্চ সুবর্ণ তোরণ তারা গ্রহ ফুঁড়ে উঠছে—ঘূর্ণমান প্রপেলারের দুরন্ত গুঞ্জন—যন্ত্র চক্রের বিরামহীন ধাতব আওয়াজে মুখর বাতাস: আকাশ প্রজ্জ্বলিত—একটা অস্থির অগ্নিবলয় যেন সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে নির্মাণকে।

চতুর্দিকে আমার ঘরের কৃকলাস দেয়ালের মধ্যে স্থির বন্দী ধরিত্রী, তার আয়ত চোখের পল্লবে অকূল নির্জনতা, "আমি হাঁপিয়ে উঠেছি ধীমান।" তার কণ্ঠস্বরে আবিল বিষাদ—গাঢ় পীত তার মুখমণ্ডল, তার শরীর দূরে জানলার গরাদে; ধরিত্রীর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাইনি,—প্রত্যুত্তরহীন আমি অন্ধকারাক্রান্ত মুমূর্ষু আলোর দ্যুত তার প্রতিকৃতি এঁকে গেছি। তার নিরাবরণ নিরাভরণ শরীর—মুখমণ্ডল পীত বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—পীতবর্ণ কী ঊষার আলোর প্রতীক? নাকি পীতবর্ণে শোকের ব্যঞ্জনা—নাকি রহস্যের ইঙ্গিত? ধরিত্রী নিজের ভিতরে যে ধরিত্রীকে আগলে রেখেছে—আড়াল করে রেখেছে—যার কাছে আমি কোনদিন পৌঁছুতে পারিনি—হাত বাড়িয়ে দিয়েছি হাত কেঁপেছে, কোনদিন যার স্পর্শ পাইনি, যার কণ্ঠস্বর শুনেছি অথচ যাকে কোনদিন দেখিনি—যে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশের মত—সমুদ্রের তলদেশের মত—যে বীজের ভিতরে অঙ্কুরের মত পীত বর্ণ কী সেই ধরিত্রীর আভাস? নাকি পীতবর্ণ আমার বেদনার পরিভাষা, নাকি পীত ধরিত্রী আমার বেদনার প্রতিকৃতি? "তুমি কী আমায় ভালবাস না ধরিত্রী?"

প্রত্যুত্তরে ধরিত্রী যেন বহুদূরে থেকে থেকে ক্লান্ত নিরুত্ব কণ্ঠে বলেছে—"ধীমান, তুমি আমার অনুভবে নিবিড় হয়ে আছ; সঙ্গীতের মত তুমি আমাকে না ছুঁয়েই"—

"আর নির্মাণ?"

ধরিত্রী ঘুরে দাঁড়াত একবার—চূর্ণ কুন্তলে আবৃত তার সারা দেহ, আমি তার মুখ দেখতে পেতুম না—"আবার ওর কথা কেন ধীমান? চলো আমরা ফিরে যাই—"

"কোথায় যাব?" আমার নির্লিপ্ত প্রশ্নে

ধরিত্রী যেন অবাক—"তোমার কী কিছুই মনে পড়ে না ধীমান?" পোড়া মাটির টবে জল সিঞ্চনরত ধরিত্রী থেমে যায় সহসা, একটা ক্ষোভ যন্ত্রণা তার সারামুখে—"তুমি গান গাইতে ভুলে গেছ ধীমান, তুমি আর ফুল ভালবাস না—" চঞ্চল পায়ে দরজার দিকে চলে যায় ধরিত্রী—"এখানে আর এক মুহূর্তও আমার ভাল লাগছে না ধীমান—এই অন্ধকারে—" আশংকা দীর্ঘ-শ্বাসের মত ঘুরে ওঠে আমার বুকের ভিতরে, ধরিত্রীর সর্বাঙ্গে আমার নখের আঘাত—"তুমি কী আমায় ছেড়ে চলে যাবে ধরিত্রী?" ধরিত্রী নির্বাক, তার মলিন দু-চোখ অশ্রুপূর্ণ। আমি শান্ত হয়ে নিজের ভিতরে ফিরে এসে দেখেছি—বিস্মরণ সব আড়াল করে দিয়েছে—মায়ের কাছের থেকে যে পথ ধরে আমি পালিয়ে এসেছিলুম তার নিশানা আমি ভুলে গেছি। আমি আর প্রত্যুষে সন্ধ্যায়, রক্তবর্ণ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখি না, পাখীর কণ্ঠস্বর শুনি না কতদিন—পদতলে মাটির উষ্ণতা নেই, পদ্মবনের সৌরভ নেই কোথাও—আমি মায়ের মুখ ভুলে গেছি—তাঁর দীর্ঘবাহু শুভ্র পদযুগল দেখি না যে কতদিন। আমি কী আর ফুল ভালবাসতে পারি না? আমার সর্বাঙ্গে ত্বক রুক্ষ—লোমশ হাতের পেশী কঠিন হয়ে গেছে?

বহুবর্ণে চিত্রিত ক্যানভাসের ওপর আমার দ্রুত হাতের গতি ক্রমাগত শ্লথ হয়ে আসে—তুলি নিশ্চল, আমার ক্লান্ত শরীর ক্রমাগত ভারী হয়ে আসছে; অবলুণ্ঠিত গোলাপের পাপড়িগুলি পোড়া মাটির টবে ব্যালকনিতে থির থির করে কাঁপছে, সজল বাতাসের নিরাকার সৌরভ আমার বুকের পাঁজরের ওপর সিরসির করছে। সমস্ত শরীরে বিষাদ। জানলা দিয়ে ইলেকট্রিকের তার ল্যাম্পপোস্ট এবং বিজ্ঞাপন—দ্রুতগামী যানবাহন—ত্রস্তব্যস্ত অসংখ্য মানুষ দেখি, আবছা কোলাহল কানে আসে—চোখ ঝাপসা হয়ে যায়—আজই প্রথম আমি ধরিত্রীর প্রতিকৃতি আঁকলুম না, এই প্রথম ধরিত্রী আর আমার সামনে বসে নেই। আমার সব ঘর শূন্য—সেসব ঘরে আলো নেই—কপাট রুদ্ধ—বন্ধ জানালা চারদিকে নিঃস্পর্শ ছাত—সেখানে কারো নিঃশ্বাস পড়ে না—ধুলোয় ধুলোয় কেবল অসংখ্য পায়ের চিহ্ন—এইসব জড়িত বিবর্ণ পরিত্যক্ত ঘরে ভগ্নচূর্ণ অসংখ্য কংকালের মত ধরিত্রীর অগণিত পীত প্রতিকৃতি ছত্রাকারে পড়ে আছে—ধরিত্রী নেই। আমার সব ঘর শূন্য করে দিয়ে ধরিত্রী চলে গেছে—আমার অজ্ঞাতে সব ঘর নির্জন করে দিয়ে ধরিত্রী কখন পালিয়ে গেছে—

হয়তো বৃত্তাকার দুগ্ধবর্ণ চাঁদ তাকে লুব্ধ করেছে—হয়তো কোন নিবিড় সঞ্চর-মান বিশাল গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে হঠাৎ-স্ফুরিত-বিদ্যুৎ কিম্বা রূঢ় দ্রুতগামী শব্দমালা তাকে ঘরছাড়া করেছে; আমার পোষা কুকুরের পাহারা এড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে নির্মাণের খোঁজে? কিন্তু কী করে ধরিত্রী পাবে নির্মাণকে। মা পারেনি তাকে বুকের কাছে রাখতে—মায়ের বাৎসল্যের দৃঢ় গ্রন্থি উন্মুক্ত করে দিয়ে, তার স্নেহের পিঞ্জর-কঠিন দু হাতে ভেঙ্গে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে; মা কেঁদেছে; তবু নির্মাণ ফেরেনি; তার কোন আবাস নেই—কোন স্থিতি নেই—ভাবনার চেয়ে ক্ষিপ্র শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী তার ঘোড়া; এক অস্থির-অগ্নিবলয় নিয়ত তাকে ঘিরে রয়েছে—ধরিত্রী কী করে পৌঁছুবে তার কাছে, কী করে তার স্পর্শ পাবে? নাকি ধরিত্রী চির-কাল তার অন্বিষ্ট রইবে? তার উত্তাল দু হাত সম্মুখে প্রসারিত—কোমল তার ওষ্ঠাধর—করুণ স্তন, ক্লান্ত ধীর গতিতে সে যেন শেষহীন পথে ফিরবে—যেন তাকে আরো—আরো দূরে যেতে হবে; সময়ের নিরবচ্ছিন্ন রেখা তার সর্বাঙ্গে চিহ্ন রেখে যাবে। তার দৃষ্টি সজল, নিঃশ্বাসে মাঘী রাত্রির শীতলতা—তার বুকের একদিকে নির্মাণ অপরদিকে ধীমানের স্মৃতি—তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি অথচ বহু যোজন দূরে। নাকি ধরিত্রী মায়ের পথ খুঁজছে—যে পথে আমরা মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলুম? হয়তো ধরিত্রী কোনদিন মায়ের উদ্যান খুঁজে পাবে—পদ্মবনের সৌরভ হরিৎ অরণ্য পাখিপাখালির কণ্ঠস্বর ফিরে পাবে—হয়তো মায়ের দীর্ঘ বাহু—শুভ্র পদযুগল সে স্পর্শ করবে; সন্তান পরিত্যক্ত মায়ের নির্জন বুকের কাছে চলে যাবে ধরিত্রী—মায়ের আরক্ত চোখের আলো আভা আর দীপ্তি তার সর্বাঙ্গ ধুয়ে দেবে। ধরিত্রী হয়তো আবার আমাকে খুঁজবে। অথচ আমি সে পথ ভুলে গেছি—মায়ের নির্মাণের ধরিত্রীর স্মৃতি বুকে নিরবধি কাল কী আমার এই অজ্ঞাতবাসে কেটে যাবে? আমি মায়ের চোখের জল মুছে নিয়ে মাকে কথা দিয়েছিলুম, "মা মা, কক্ষনো আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না"। আমি মাকে প্রতারণা করেছি। অথচ আমার মাজ্জায় মায়ের নাড়ীর দাগ—আমার হৃৎপিণ্ডে শিরায় ধমনীতে মায়ের রক্ত—আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ধারণ করে আছে মায়ের আকাঙ্ক্ষা। অথচ আমি আর তেমন করে গান গাইতে পারি না, আমি আর ফুল ভালবাসতে পারি না—

"তোমার ছবি কোনদিন শেষ হবে না"—তীক্ষ্ণ বিষাদ শীতের গাঢ় কুয়াশার মত আমার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে যায়—উৎকণ্ঠিত হাতে তুলি কাঁপে, নিজের ভিতরে যেন অন্য কারো অস্থিরতা। জড়িত বিবর্ণ ঘরের নোনাধরা কৃষ্ণাভ দেয়ালে দেয়ালে ধরিত্রীর প্রাচীন কণ্ঠস্বর নৈঃশব্দ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—উত্তপ্ত বাতাসে তার নিঃশ্বাস—আমার ইচ্ছায় ধরিত্রী পলায়নের মত নির্বাধ—অন্তহীন শূন্যতার তরঙ্গে তরঙ্গে তার উত্তাল হাত; ধরিত্রী আজ দূরতম তবু যেন সর্বত্র সে। আজ পীত ধরিত্রীর অবয়ব নেই—পীত প্রতিকৃতি নেই—আমার চোখের ভিতরে বাহিরে অন্ধকার—অন্ধকার; এ অন্ধকার চেনাচেনা—এ অন্ধকার স্মৃতি-বিস্মৃতি—মায়ের গর্ভের বিস্তৃত অন্ধকার পট যেন সৃজনের মত আমার সর্বদিকে উঠে আসে—জন্মকালীন অস্থিরতায় চঞ্চল সাধ; বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত আমার ক্যানভাস—যতদূর চোখ যায় উঁচু-নীচু ছোট বড় অসংখ্য ঊর্ধ্বগ্রীব মন্দির গির্জার মত ঠাসাঠাসি দালান কোঠাঘর বাড়ি—প্রাচীন গুহার মত অলিগলি চতুর্দিকে গলিত নর্দমা—মাথার ওপরে বহু-ভুজ এক জ্যামিতিক নীলিমা আর সহসা সঞ্চারিত গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ—দীর্ঘ জটিল স্ফুরিত বিদ্যুতের মেরুন রেখা—শোকার্ত বর্ষণ এবং অপরাহ্ণের নিস্তেজ রোদ—পোড়ামাটির টবে ব্যালকনিতে অবলুণ্ঠিত গোলাপের পাপড়িসমূহ এবং উজ্জ্বল হরিৎ বৃন্ত ধৃত বীজের সম্ভাবনাময় রক্তবর্ণ গর্ভকোষ—আমার অনাদ্যন্ত এ-ছবির রঙে রেখায় কোন অবস্থানে অস্থির নির্মাণ রইবে? আমার এ দিগন্তহীন ছবির কোথায় রইবে মায়ের শুভ্র শান্ত শোকার্ত প্রতিমা? এ ছবির কোন্ জটিল রেখায় রইবে ধীমান? সমস্ত রঙ রেখা স্পর্শ করে এ ছবির দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ধরিত্রী কী প্রস্ফুটিত হবে? আমার এ ছবি কোনদিন শেষ হবে?

আপনাকে বলেছি কি সেই গল্পটা? এটি আমি শুনেছি বাচ্চা বয়সে আমাদের বাড়ির এক নিরক্ষরা দাসীর কাছ থেকে। তাই এটা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনী মাত্র—কেতাব-পত্রে স্থান পায়নি বলে হয়তো আপনার অজানা।

এক বাদশা প্রায়ই রাজধানী থেকে দূরে বনের প্রান্তে একটি নির্জন উদ্যান-ভবনে চলে যেতেন শান্তির জন্য। সেখানে বালক যুবরাজের ক্রীড়াসঙ্গী নর্মসখারূপে

সৈয়দ মুজতবা আলী

জুটে যায় এক রাখাল ছেলে। তাদের সঙ্গে রাজপুত্রে কৃষক-পুত্রের ব্যবধান ছিল না।

বাদশা মারা গেলে পর যুবরাজ বাদশা হলেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে যুবরাজ আর সুযোগ পাননি সেই উদ্যানভবনে আসার। যখন এলেন, তখন সন্ধান নিলেন তার রাখাল বন্ধুর—স্বয়ং গেলেন তার পর্ণকুটিরে। রাখাল ছেলে পূর্বেরই মত মোড়ামুড়ি দিল। যুবরাজ শুধোলেন, "তোমার বাপকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো কবে গত হয়েছেন? আল্লা তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।"

"গোর দিলে কোথায়?"

"ঐ তো হোথায়, খেজুর গাছটার তলায়। বাবা ঐ গাছের রস আর তাড়ি খেতে ভালবাসতো বলে আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন ওরই পায়ের কাছে গোর দি।"

(নাগরিক বিদগ্ধ ওমর খৈয়ামও দ্রাক্ষা-কুঞ্জে সমাধি দিতে বলেছিলেন, না?)

রাখাল ছেলে জানতো, আগের বাদশা গত হয়েছেন। তাই শুধলো, "আর হুজুরের বাদশা'র গোর কোথায় দেওয়া হল?"

ঈষৎ গর্বভরে নবীন রাজা বললেন, "জানো তো রাজাবাদশারা বড় নিমকহারাম হয়, বাপের গোরের উপর কোনো এমারৎ বানায় না। ...আমি, ভাই, সে-রকম নই। বাবার গোরের উপর বিরাট উঁচু সৌধ নির্মাণ করেছি, দেশবিদেশ থেকে সর্বোত্তম মার্বেল পাথর যোগাড় করে।...এই বনের বাইরে গেলেই তার চুড়োটা এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।"

রাখাল ছেলে বললে, "সে আর দেখিনি? কিন্তু তুমি, ভাই, করেছ কি? শেষ বিচার কিয়ামতের দিন, আল্লা হুকুমে ফিরিশতা ইসরাফিল যখন শিঙে বাজাবেন, তখন কত লক্ষ মণ পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেহেশ্‌তপানে। তাঁর জন্য এ মেহেনতী তৈরি করলে কেন?... আর আমার বাবা তাঁর গোরের উপরকার আধ হাত মাটি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে হুশ হুশ করে চলে যাবে আল্লার পায়ের কাছে।"

*

প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আপনাকে লিখছি জ্যান্ত গোর বিরাট ইট-সুরকির এই বাড়িতে। বধূ হয়ে যে-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি, তখনই আমার সর্বাঙ্গটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে শিরশির করেছিল, যদিও আমার পরনে তখন অতি পুরু কার্পেট-মোড়া বেনারসী শাড়ি, কিংখাবের জামা আর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আপনার ভাসুরের ঠাকুমার কাশ্মীরী শাল—যার সমস্ত জরির ওজনই হবে আধ সের।

আপনি এ-বাড়ির অতি অল্প অংশই চেনেন। এ-বাড়ির পুরো পরিক্রমা দিতে হলে ঘণ্টাটাক লাগার কথা। আমাকে রোজ দিন পর পরই এ-পরিক্রমা লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম দু-একটা মন্দ লাগতো না—প্রাচীন দিনের কতশত সম্পদ, টুকিটাকি, নবীন দিনের সম্ভারও কিছু কম যায় না—এস্তেক কার যেন প্রেজেন্ট দেওয়া একটা টেলিভিশন সেট—যদিও কবে যে এটা কাজে লাগবে, সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে। যেন যাদুঘরে এটা-ওটা দেখছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু চিন্তা করুন, যদি আপনাকে যাদুঘরে আহারনিদ্রা দাম্পত্যজীবন যাপন করতে হয়, তবে কি রকম হাল হয়।

শুধু বলি, এও কিছু নয়। সামান্য ইট-পাথর, প্রাচীন দিনের সম্ভার—এরা প্রাণহীন। এরা আমার মত সজীব প্রাণচঞ্চল জীবকে আর কতখানি সম্মোহিত করবে?

কিন্তু এরা যে সবাই সর্বক্ষণ চিৎকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে,

"ট্রাডিশন! ট্রাডিশন ঐতিহ্য ঐতিহ্য!!

সবাই বলছে, সাত পুরুষ ধরে এই খানদানী পরিবারে যা চলে আসছে, সেইটে তোমাকে মেনে চলতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং মরার সময়ও তার ভবিষ্যতের জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আর বাকি জ্যান্ত? নায়েব, তাঁর পরি-বারবর্গ, এ-বাড়ির দারওয়ান ড্রাইভার বাবুর্চি চাকর হালালখোর, পাশের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন সক্কলের চেহারাতেই ঐ একটি শব্দ নিঃশব্দে ফুটে উঠছে : ট্রাডিশন। বিগলিতার্থঃ বেগমসাহেবা যদি খানদানী প্রাচীন পন্থা মেনে চলেন, তবে আমরা তাঁর গোলামের গোলাম, আমরা নামাজের পর পাঁচ বেকৎ আল্লার পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলবো,

"হুয়া খুদা, এই শহর-ইকার বান্দ পীরজলেরা', এই দুনিয়ায় 'আল্লার ছায়া'। তাঁরই সুশীতল ছায়াতে আমাদের জীবন, আমাদের সংসার, আমাদের মৃত্যু, আমাদের মোক্ষ। তুমি তাঁকে শক্তমান করো, সহায়বান করো! আমেন!"

আমি সিনিক নই। তাদের এ-প্রার্থনায়, তাদের ঐতিহ্য রক্ষার্থক মনায় প্রচুর আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই আদিম ইনসটিন্‌কট, জীবন সংগ্রামে কোনোক্রমেতে টিকে থাকবার, কোনোগতিকে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা। ...আজ যদি কালি-ঘাটের মন্দির নিশ্চিহ্ন করে পুরুৎ পুজোরী-দের আদেশ দেন "চরে খাও গে!" তবে তারা যাবে কোথায়? বর্তমান যুগোপযোগী জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ করার মত কোনো ট্রেনিং তো এদের দেওয়া হয়নি। এদের অবস্থা হবে, খাঁচার পাখিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যা হয়। খাঁচার লৌহদুর্গে দীর্ঘকাল বাস করে সে আত্মরক্ষার কৌশল ভুলে গিয়েছে, দু' বেলা গেরস্তের তৈরি ছোলা-ফড়িং খেয়ে খেয়ে ভুলে গিয়েছে আপন খাদ্য সংগ্রহ করার ছলা-কলা।

আবার আমার 'লোক-লস্করের' কথায় ফিরে আসি। এদের সবাইকে যদি আমি কাল ডিসমিস করে দি,—সে এক্তেয়ার ডাক্তার আমাকে দিয়েছেন—তবে কি হবে? অধিকাংশই না খেয়ে মরবে। তারা শুধু জানে ট্র্যাডিশন। তাদের জন্ম হয়েছে এ শতাব্দীতে, কিন্তু মৃত্যু হয়ে গিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

আমি একাধিক বার চেষ্টা দিয়েছিলুম এ-বাড়িতে ফ্রেশ ব্লাড আমদানি করতে। চালাক চতুর দু' একটি ছোকরাকে বয় হিসেবে নিয়ে এসেছি। জানেন কি হল? পক্ষাধিক কাল যেতে না যেতেই তারা ভিড়ে গেল প্রাচীনপন্থী দারওয়ান বাবুর্চির সঙ্গে। রুখে গেল, রুটির ঐ-পিঠেই মাখন মাখানো রয়েছে। সিনেমা যাওয়া পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিল। অক্রেশে হুঁশিয়ার করলুম, দেড় শ' কিংবা তারো বেশি ট্র্যাডিশনের মায়াজাল ছিন্ন করার মত মোহমুদ্গর আমি রাতারাতি —রাতারাতি দূরে থাক, বাকি জীবনভর চেষ্টা করলেও—নির্মাণ করতে পারবো না।

অবশ্য আমার দেবতুল্য স্বামী আমাকে বাসরঘরেই সর্বস্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সর্ব বাবদে—সে-কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যায় না। স্বাধীনতা পেয়ে খাঁচার পাখিটার কি হয়েছিল? অনাহারে যখন ভিরমি গিয়ে চৈত্রের ফাটা-চেরা মাঠে পড়ে আছে, তখন শিকরে পাখি তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে কুরে কুরে তার জিগর-কলিজা খেল।

*

সে-কথা জানে বলেই এ-বাড়ির লোক আমাকে প্রথম দিনই খাঁচাতে পুরতে চেয়ে-ছিল। ওরা সবাই ট্র্যাডিশনের খাঁচাতে। খাঁচার ভিতরকার নিরাপত্তা, অন্নজল বাইরে কোথায় পাবে? আমাদের এক সমাজতত্ত্ববিদ নাকি বলেছেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা না পেলেই নাকি আমাদের পক্ষে ভালো হত। ও'র বক্তব্য, ইংরেজ আমলে নাকি আমাদের ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

এইবারে মোদ্দা কথা বলি। সেই রাখাল ছেলের বধুর পিতা বাদশাহ তাঁর সমাধি-সৌধের প্রস্তর ভেঙে ভেঙে উঠতে যত না হিমসিম খাবেন, তার সঙ্গে আমার এই উৎকট সঙ্কটের কোনো তুলনাই হয় না। জ্যান্ত গোরের মানুষ আপন ছটফটানিতে নিরুদ্ধ নিশ্বাস হয়ে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে।

তথাপি আমি ঐ খানদানী পাষাণদুর্গে থাকতে চাইনি। ঠিক মনে নেই, তবে গল্পটি খুব সম্ভব সার্থক সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর; একটি বালিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যুবকের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। অহেতুক যোগাযোগের ফলে তার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল এক অতি দুর্ধর্ষ কৃষাণরক্তশোষক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। আমার মনে নেই, মেয়েটি হয়তো বা অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিল, কিংবা হয়তো বলদৃপ্ত পদে স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছিল, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এ-জমিদার পুরুষ-ক্রমে যা করছেন, যেটা দু ছত্রে বলা যায়,

"পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে
দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায়
সে চার-ঘুড়ি।"

(আবার রবীন্দ্রনাথ!) এই মুহূর্তে [illegible] রায়মোহন উপর তিনি [illegible] করে থাকবেন।) সেই পিতৃপুরুষ [illegible] সে চিরতরে বন্ধ করবে—আত্মার [illegible] দিয়ে, প্রয়োজন হলে পরমাত্মার [illegible] পর্যন্ত চালান দিয়ে, তিনিই [illegible]।

এবং দিকেও ছিল সে [illegible] তাঁর খান্ডারিণী শাশুড়ীর [illegible]—তিনিই ছিলেন এই [illegible] চক্র-বর্তিনী।

সংক্ষেপে সারি। তার বহু বৎসর পরে কি পরিস্থিতি উদ্ভাসিত হল? সেই পূর্বেরটাই। যথাপূর্বং তথা পরং। যদ্বৎ তদ্বৎ পূর্ববৎ। ইতিমধ্যে শাশুড়ি মারা গিয়েছেন এবং সেই পিয়াসী তনু-দেহ ধারিণী বধূটি [illegible] শাশুড়ীর কলেবর ধারণ করে হয়ে গেছেন সে-অঞ্চলের ডাক-সাইটে রক্তশোষিণী।

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন! সেই দ' থেকে বাঁচে কটা ডিঙি?

কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন:

"বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'...দেবতা দয়া করে বললেন...'লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক—না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'"

সেই ভূতই হল ট্র্যাডিশন।

তার পর মনে আছে সেই ভূত-ট্র্যাডি-শনের পায়ের কাছে "দেশসুদ্ধ সবাই-কে" কি খাজনা দিতে হল?

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, [খাজনা দেবে] "আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।"

সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-'খাজনা' দিতে রাজী ছিলুম না। তার কারণ, এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে যে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে আমার ধর্ম আমার ইমান যাবে।

সুভদ্রা আশাপূর্ণার সেই বধূর মত দিনে দিনে আপন সত্তা হারিয়ে হারিয়ে আমি আমার শ্বশুর বাড়ির অন্তরায়তনে বিলোপ হতে চাইনি। সেইটেই হত আমার মহতী বিনষ্টি।...

কিন্তু তবু জানেন, সৈয়দ সাহেব, হাসি-কান্না হীরাপান্না রান্নাবান্না নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কেটে যাচ্ছিল। আমাদের কাঁচাকাঁচা বয়সে একটা মামুলি রসিকতার কথোপকথন ছিল "কি লো, কি রকম আছিস?" "কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না।" আমার বেলা কিন্তু "দিন কাটার" সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড কেটে কেটে রক্ত ঝরে ঝরে ফুসফুসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধনিশ্বাস

[illegible] ফুলেছিলো। [illegible] বুকে [illegible] হবে, [illegible] ছিন্নভিন্ন হলো। [illegible] রক্তের [illegible] এক অংশে যদি [illegible] চাকে [illegible] করতে পারে তবে তাহাই [illegible] অনন্ত [illegible] টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং [illegible] আপন [illegible] হয়ে যায়া যায়।

অবশ্য আমার [illegible] টুকরো নয়। ঐ [illegible] ট্র্যাডিশনের একখানা আস্ত চাই।...

আপনি অবশ্যই শুধোবেন, অকস্মাৎ তোমার এ-পরিবর্তন এল কি করে?

পরিবর্তন নয়। জাগরণ। নব জাগরণ।

✽

"রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ..."

আমার 'নব জাগরণের' পর আমি এ কবিতাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। স্পষ্টত এখানে রূপনারান রূপকার্থে। অবশ্য এর পিছনে কিছুটা বাস্তবতাও থাকতে পারে। শুধু পদ্মার নয়, কবি গঙ্গাতেও নৌকোয় করে সফরে বেরুতেন। হয়তো বজবজ অঞ্চলে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে যেখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। জেগে উঠলেন রূপনারায়ণের কূলে, 'কোলে'ও হতে পারত। 'স্বপ্ন' দেখছিলেন এতক্ষণ। অর্থাৎ তাঁর আশী বৎসরের জীবন স্বপ্নে স্বপ্নে, স্বপ্নের অবাস্তবতায় কাটাবার পর রূপনারায়ণের কূলে পরিপূর্ণ বাস্তবের অর্থাৎ 'রূপের' সম্মুখীন হলেন। এক আলংকারিক রূপের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূষণ না থাকলেও যাকে ভূষিত বলে মনে হয় তাই 'রূপ'। অর্থাৎ পিওর, নেকেড রিয়ালিটি। তার কোনো ভূষণ নেই।

আর 'নারায়ণ' অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

আমি অন্তত এই অর্থেই কবিতাটি নিয়েছি।

তাই আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে, তাঁর রূপস্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম "লতীফ" (সুন্দর)। এবং তিনি শিব এবং সত্যও বটেন।

কারণ আমি যখন আমার রূপনারায়ণের তীরে পৌঁছলুম, রুঢ়তমরূপে আমার নিদ্রা-ভঙ্গের 'বিজয়ের' সম্মুখীন হলুম তখন শুধু যে আমার পূর্ববর্ণিত

ট্র্যাডিশন। ট্র্যাডিশন!

ট্র্যাডিশনের পাষাণপ্রাচীর নির্মিত 'অচলায়তন' দেখতে পেলুম, তাই নয়।

আতঙ্ক, বিস্ময়, এমন কি নৈরাশ্যে [illegible] আরো অনেক [illegible], [illegible] চতুর্দিকে যে রকম [illegible] ইলেকট্রিকাইড [illegible] বাঁকা [illegible] থেকে সেগুলোও দেখতে পেলুম।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক বিভীষিকা-ময় : ভুল আদর্শ, ভুল মরালিটি, বেকার 'পরোপকার', মহাশূন্যে দোদুল্যমান আলোক-লতার উপর স্তরে স্তরে ফুটে-ওঠা সঙ্গীতের কল্পধারী আকাশকুসুম, কবি বায়রনের ভাষায়

"এ যেন জীর্ণ প্রাসাদ বেড়িয়া
পরগাছিকার শোভা,
নিকটে দূরের জর্জর ভিত
দূর হতে মনোলোভা!"

আর কি সব ভুল দেখেছিলুম তার ফিরিস্তি আপনাকে দিতে গেলে পুরো এক-খানা "মোহমুদ্গর পত্রিকা" লিখতে হবে। এক কথায় দেহের ভুল, হৃদয়ের ভুল, মনের ভুল—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভুল। অর্থাৎ কিশোরী অবস্থা থেকেই শুরু করেছি ভুল এবং চলেছি ভুল পথে।

আমি নিরাশবাদী নই; অতএব ঢেলে সাজতে হবে নতুন করে। জীবনের সঙ্গে রিটার্নম্যাচের এখনো সময় আছে—প্রস্তুতি করবার।

✽

কিন্তু পন্থা কি?

শিশু যেমন মায়ের হাতে মার খেয়ে মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তেমনি "রূপনারায়ণের কূলে" নয় "রূপনারায়ণের কোলে" আছাড় খেয়ে পড়লুম।

"বিশ্বরূপের" [illegible] এই পৃথিবীতে আমরা যাকে "সৌন্দর্য" বলি। তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। অতি ক্ষুদ্র কীট ও তার জীবনস্পন্দনে অন্তহীন গ্রহসূর্য তারায় তারায় যে জীবন-স্পন্দন আছে তার লক্ষকোটিভাগের এক ভগ্নাংশ যতখানি অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, ঠিক ঐ অতি অল্পখানি। সে-ই প্রচুর পর্যাপ্তেরও প্রচুরতর অপর্যাপ্ত। আরব্য রজনীর অল্-নশ্কার একঝুড়ি ডিম দিয়ে কারবার আরম্ভ করে উজিরবানুকে বিয়ে করবার প্ল্যান করেছিল। তার হিসেবে রত্তিভর ভুল ছিল না—ভুল ছিল তার হঠকারিতায়। আর আমার হাতে তো কুল্লে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি ডিম। কার্ডিনাল নিউম্যান কি গেয়েছিলেন—স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি

"আমি তো যাত্রাপথের দূরদিগন্তের কামা-ভূমি দেখতে চাই নে; আমাকে প্রভু, একটি পা ফেলার মত আলো দেখাও।" "আই ডু নট্ উয়োণ্ট টু সী ডিসটেণ্ট সীন; ওয়ান স্টেপ ইনাফ ফর মী।" তাই আমি "বিশ্বরূপে লতীফের" সন্ধানে বেরলুম।

এরপর আমার যে সব নব নব অভিজ্ঞতা হল তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই, কখনো হবে না, কারণ আমি তাপসী রাবেয়া নই। আমি সব-কিছু ঝাপসা দেখছি। তাই আপনি আমার চোখ কেমন যেন কুয়াশা-ভরা ফিল্মে-ঢাকা দেখেছিলেন।

অতএব অতি সংক্ষেপে সারছি।

প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখলুম, আপনি স্বপ্নমগ্ন না হলেও রূপনারায়ণের তীরে আপনি এখনো পেঁাছননি। প্রার্থনা করি, কখনো যেন না পেঁাছতে হয়।

সবাইকে যে পেঁাছতে হবে এমন কার, কোন্ মাথার দিব্যি? যদি রূপনারায়ণে পেঁাছতেই হয় তবে যেন পেঁাছেন আপনার গুরুরই মত আশী বছর বয়সে। আমার কপাল মন্দ (মুনি ঋষিরা হয়তো বললেন "ভাগ্যবন্ত" আমি "অখণ্ড সৌভাগ্যবতী"), আমি যৌবনেই সেখানে পেঁাছে গিয়েছি। কোনো ইয়োরোপীয় বিলাসরসে নিমজ্জিত এক ধনীর সন্তান, যৌবনে বলেছিলেন "স্যালভেশন, মুক্তি, মোক্ষ? নিশ্চয়ই চাই, প্রভু। কিন্তু নট জাস্ট ইয়েট" অর্থাৎ একটু পরে হলে হয় না প্রভু? আমার বিলাসবাসনা তেমন কিছু-একটা নেই, কিন্তু আমার যে ভয় করে।...আপনার কাছে যাওয়া হল না।

তখন গেলুম পীর সায়েবকে। আমার বড় আনন্দ, আপনি তাকে ভুল বুঝেননি। তিনি কক্‌খনো আদৌ আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চাননি। বরঞ্চ তিনি যেন হলেন এমবারাসড—যেন একটা ধন্দে পড়লেন। বুঝে গেলুম, তাঁর যেন মনে হয়, যৌবনের কাম বাসনা ইত্যাদি খানিকটা পুড়িয়ে নিয়ে তার পর ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নামা প্রশস্ততর।

আপনি জানেন, যদিও ধর্মকর্মে আমার

আগ্রহ ছিল সামান্যই, তবু আমি শ্রীঅরবিন্দের 'আর্যধর্ম'-আর্য-কালচারাল লেখাগুলো সব সবারই মন দিয়ে পড়েছি। বুঝেছি অবশ্য সিকি পরিমাণ। তাঁর কথা আমার মনে পড়ল সর্বশেষে। কৃপণ যে-রকম তার শেষ মোহরটির কথা স্মরণ করে সব খতম হয়ে যাওয়ার পর।

তাঁর সে-লেখাটির নাম বোধ হয় উত্তর-পাড়া ভাষণ।

আলীপুরের বোমার মামলা তখন সবে শেষ হয়েছে। সমস্ত বাঙলা দেশ উদ্‌গ্রীব, এবারে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলা দেশকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন। আর বাঙলা দেশের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ।

কী গুরুতর দায়িত্ব। মাত্র একটি লোকের স্কন্ধে।

তখন তিনি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে, তিনি আপন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু দিনের জন্য নির্জনে চিন্তা করতে চান।

আর আমি তো সামান্য প্রাণী। আমার এ-ছাড়া অন্য কোনো গতি আর আছে কি?

আমি শুধু ভালো করেই জানি, আমার স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হবে। এ-রকম ফেরেশতার মত স্বামী কটা মেয়ে পায়। তাই জানি, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইব তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। তিনি নিজে ধার্মিক—তাই বলে যে তিনি আমার ধর্মজীবনের অভিযানে বাধা দেবেন না, তা নয়। আমি যে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে বসে ঝুরে মরবো সেটা তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

হায় আল্লা তালা! আমাকে তুমি এ কী নির্দেশ দিলে যার জন্য আমার এই প্রাণপ্রিয় স্বামী আমার মালিককে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। সৈয়দ সাহেব, আমি জানি আর আমার স্বামী জানেন, আমাদের আজও মনে হয়, আমাদের বিয়ে যেন সবেমাত্র কয়েকদিন আগে হয়েছে। আমরা যেন এইমাত্র বাজ্‌ণ্‌শতী (বাঙলায় কি বলে? মিয়াগাজম?) সেরে স্টীমারের কেবিনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একে অন্যকে চিনে নিচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "আমি কী ভাগ্যবান!" লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁর পদস্পর্শ করে বললুম, "আপনি এ কী বললেন? আমি যে এখখুনি এই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলুম।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলেন "পাগলী!"

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজ প্রমাণ হয়ে চললো, আমি পাগলিনী। নইলে আমি আমার এমন জনীব ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি কেন?

কত বলবো? এর যে শেষ নেই।

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের জন্য কষ্ট হয়,—আপনি কতখানি বেদনা পাবেন, সে-কথা আমি ভাবছিনে। যাবার বেলা শেষ একটি কথা বলি। যবে থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় (আল্লা সে-দিনটিকে রোশনীময় করুন!) তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আপনার ভক্ত চেলার সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। হয়তো আপনার চেয়ে কাঁচা লেখকের ভক্তের সংখ্যা আরো বেশী। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এবং অতিশয় পুলকিত হয়েছিলুম। আপনার "ভক্তা" নেই, আপনার কোনো রমণী উপাসিকা নেই। আমিই তখন হলুম আপনার অদ্বিতীয় সখী, নর্মসহচরী—যে নামে ডাকতে চান, ডাকুন। এ-হেন গৌরবের আসন ত্যাগ করে যেতে যায় কোন্ মূর্খী! তবু যেতে হবে।

সর্বশেষে আপনাকে, নিতান্ত আপনাকে একটি কথা বলি:

ঐ যে কবিতা—কবিতা বলা ভুল, এ যেন আপ্তবাক্য—"রূপনারায়ণের কোলে/জেগে উঠিলাম" এর শেষ দুটি লাইনকে আমি অকুণ্ঠ স্বীকার দিতে পারছি না। লাইন দুটি:

"সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

এখানে আমি কুষ্টিয়ার লালনফকীরের আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। তিনি বলেছেন "এখন আমার দেহ সুস্থ, মন সবল, পঞ্চেন্দ্রিয় সচেতন। এ-অবস্থায় যদি আল্লাকে না পাই তবে কি আমি পাব মৃত্যুর পর?—যখন আমার দেহমন প্রাণহীন, অচল অসাড়?" আমি "সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে" মৃত্যু দিয়ে "সকল দেনা শোধ" করবো না।

আমার যা পাবার সে আমি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই পাব।

খুদা হাফিজ্! ফী আমানিল্লা!!

আপনার স্নেহধন্যা কনীজ্
শহর্-ইয়ার

হাত থেকে ঝর ঝর করে সব কটি পাতা বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল।

এতক্ষণ আমার (এবং শহর্-ইয়ারেরও) আদরের আলসেশীয়ান কুকুর "মাস্টার" আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

এখন হঠাৎ বারান্দার পূর্ব প্রান্তে গিয়ে নিচের দুপায়ের উপর বসে উপরের দু'পা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়তে আরম্ভ করলো। সম্পূর্ণ অহেতুক, অকারণ।

তবে কি মাস্টার বুঝতে পেরেছে, তার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ! আল্লাই জানেন সে গোপন রহস্য।

অবসন্ন মনে শ্রান্ত দেহে শয্যা নিলুম। ঘুম আসছে না।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ দেখি মাস্টার বিদ্যুৎ-বেগে নালার দিকে ছুটে চলেছে। হয়তো শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে।

তার খানিকক্ষণ পরে ঐ দুপুর রাত্রে কে যেন বারান্দায় উঠল। উঠুক। আমার এমন কিছু নাই যা চুরি যেতে পারে।

হঠাৎ শুনি ডাক্তারের গলা। আমার কামরার ভিতরেই।

এক লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলুম। বাতি জ্বাললুম।

এ কী! আমি ভেবেছিলুম ওকে পাবো অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায়। দেখি, লোকটার মুখে তিন পোঁচ আনন্দের পলস্তরা।

কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বললে,

"নাম্বার ওয়ান: আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।

নাম্বার টু: আমরা আগামীকাল যাচ্ছি সুইডেনে। আমার রিসার্চের কাজ সেখানেই ভালো হবে?

নাম্বার থ্রী: (কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন) শহর্-ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা।

নাম্বার ফোর:—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কোথায়?"

বারান্দায়। মাস্টারকে খাওয়াচ্ছে।

বারান্দায় এসে শহর্-ইয়ারকে বললুম, "সুইডেনে তুমি নির্জনতা পাবে।"

তারপর শুধালুম, "আবার দেখা হবে তো?"

সে তার ডান হাত তুলে—দেখি, আমি তাকে ঢাকা থেকে এনে যে শাঁখার কাকণ দিয়েছিলুম সেইটে পরেছে—সে হাত তুলে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, "কী জানি, কী হবে।"

আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুর্বল হাত তুলে বলেন—তখন তাঁর চৈতন্য ছিল কি না জানিনে—"কী জানি, কী হবে।"

সমাপ্ত

অদূরের দিল্লী

হাত হাত বাড়ালেই চাঁদ। আর সেই চাঁদ অসীম নিষ্পলক চোখে যেন আমাদেরকে দেখছে, এই স্পন্দমান জীব-জগৎটা যেখানে ছিল সেইখানেই আছে নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে। আর কেন না আমি এই জীবজগতের বাসিন্দে তাই আমার চিন্তা এখনো আমাকে নিয়েই, আমার স্বার্থকে নিয়ে। আর কেননা ভালো হোক মন্দ হোক আমার স্বার্থ-গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে অন্য মানুষের স্বার্থকে ঘিরে কাজেই নিজেকে নিয়ে ভাবার অর্থ অন্য মানুষকে নিয়েও ভাবা।

সকালে ঘুম ভাঙাতে নিজের কথাই ভাবছিলাম, ভাবতে ভাবতে বিশেষ একজন

দঃকেশ

মানুষের চিন্তা এগিয়ে এল আমার কাছে। ভাবলাম সেই বিশেষ মানুষটিকে আজ একটু দূরে থেকে দেখব। দূরে থেকে দেখার দ্রষ্টব্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেই মানুষটিকে দূরে থেকে দেখতে চেয়েছি কি, বুঝলাম, না উনি নিজেই অন্য দিনকার চাইতে আজ দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এখন ও'কে অন্য দিনকার চাইতে অনেক স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে।

লোকসভায় গিয়ে ও'র দিকে দূরে থেকে তাকালাম। শান্তভাবে উনি বসে রয়েছেন। আগেকার আসনে নয়, অন্য আসনে। স্মিত-মুখে।

পাকেচক্রে পড়ে প্রায় বছর দশেক আগে উনি দিল্লী এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে। কামরাজ প্ল্যানের তাগিদে কিছুকাল উনি মন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনকার সরে দাঁড়ানর সঙ্গে আজকের সরে দাঁড়ানোর বিস্তর প্রভেদ।

বলছি আমি গুজরাতি ব্রাহ্মণ মোরারজী দেশাইয়ের কথা। মোরারজী শব্দটা গুজরাতি "মোর" শব্দ থেকে এসেছে। যার মানে ময়ূর। ব্যক্তিগত জীবনে ময়ূরের মতনই সদাসর্বদা মাথা উঁচু করে চলেন মোরারজী। কিন্তু কোথাও জীবনে কোনো অহঙ্কার নেই। নির্লোভ সাদাসিধে এবং প্রচণ্ড আত্মাভিমানী এমন পুরুষ শুধু কেবল ভারতেই নয়, যে কোনো দেশে দুর্লভ। উনি এক অনন্য পুরুষ; জীবনভর শুধু যুদ্ধই করে গেছেন বুঝি ভাগ্যের সঙ্গে, কখনো বিশ্রাম দিয়েছেন নিজেকে এমন কেউ দেখেনি। ও'র ব্যক্তিগত জীবনের আলেখ্যটাই আজ আমি তুলে ধরব।

মোরারজী দেশাই

মোরারজী দেশাইয়ের শোবার ঘরে ঢুকলে দেখা যাবে দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো তিনটি ছবি। একটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের। অন্যটি স্বামী বিবেকানন্দের। তৃতীয়টি একান্ত নিরিহগোছের একজন গ্রাম্য ইস্কুল টীচারের। এই ইস্কুল টীচারের বয়স যখন পঞ্চাশ তখন মাইনে পেতেন তিনি পঁয়ত্রিশ টাকা। নাম রনছোদি দেশাই।

রনছোদি দেশাই ছিলেন মোরারজী দেশাইয়ের পিতা। মোরারজী যখন সবে মাত্র চৌদ্দ, দুদিন বাদেই যাঁর বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে, তখন ওঁর পিতা আত্মহত্যা করেন কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কুয়োয় ডুবে মরেছিলেন ও'র আগের পক্ষের স্ত্রী, মোরারজীর বিমাতা।

দারিদ্র্য কাকে বলে মোরারজী তা হাড়ে হাড়ে দেখেছেন। বাড়ির উনি বড় ছেলে ছিলেন। সংসারের সমস্ত ভার ও'র মাথায় এসে ভেঙে পড়ল। ম্যাট্রিক পাশ করলেন ১০ টাকা জলপানি পেয়ে। বম্বেতে চলে গেলেন। কলেজে ভর্তি হলেন ফ্রী। হস্টেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটাও ফ্রী হয়ে গেল। জলপানির সমস্ত টাকাটাই, গুনে গুনে প্রতিমাসে দশ টাকা, উনি পাঠাতে লাগলেন অসহায় বিধবা মাকে। তাই দিয়ে কোনরকমে গ্রামের সংসার চলে। নিজের বলে কোনো খরচ-খরচা ছিল না মোরারজীর। আর কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, বি এ ক্লাশেও বৃত্তি পেলেন। পঞ্চাশ টাকা মাসে। উপরি গুটিকয়েক টিউশনিও জুটিয়ে নিলেন। তখন ও'র অবস্থা সচ্ছল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা আমি বলছি। উনি যে কী ধরনের জেদী পুরুষ তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। ও'র বয়স যখন বুঝি মাত্র নয়, ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন সাহেব বঙ্গভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছেন, এই শুনে রাগে মোরারজী চা পান করা ছেড়ে দেন তৎক্ষণাৎ; জীবনে আর কখনো চায়ের মুখ দেখেননি। আজও উনি চা তো খানই না, এমন কি সিগারেট কফি কোকাকোলা এ সবেরও ধারে কাছে ঘেঁষেন না। মদের গন্ধ কখনো শোঁকেননি। মদ স্পর্শকে উনি ঘোরতর অন্যায় এবং "পাপকর্ম" বলে মনে করেন। মাছ মাংস স্পর্শ করেন না। ওঁর নিত্যকার আহার ভাত, ডাল, একটি তরকারী। বেশি হলে একটু দুধ কিংবা দই। ওঁর যাবতীয় পোশাক পরিচ্ছদ মাঝারি মাপের যে কোনো একটি সুটকেসে স্বচ্ছন্দে এঁটে যায়। এবং সেই সুটকেশ নিয়ে যে কোনোদিন যে কোনো সময়ে উনি যে কোনো কর্মস্থল ছেড়ে অন্য শহরে বিদায় নিতে

পারেন। ওঁর নিত্যকার সংগী ওঁর স্ত্রী, গঙ্গাবেন।

যা মোরারজী দেশাই নিজে করতে পারেন না তা করার উপদেশ তিনি অন্য কাউকে কখনো দেন না।

বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মোরারজী প্রভিনশিয়েল সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ছুটিয়ে তখন উনি স্যুট-ব্যুট খুব পরেছেন। আরামে তো থেকেছেনই। কিন্তু ক্রমশ শাসকদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। পরাধীনতা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ যাঁর চাকরি করবো, যাঁর দেওয়া মাইনে পেয়ে তোফা আরামে থাকবো, ঘরে বসে অষ্টপ্রহর তাঁর সমালোচনা করতেও বিবেকে বাধে। সুতরাং বারো বছর চাকরির পর সে চাকরিতে মোরারজী ইস্তফা দিলেন। চাকরিতে ঢুকেছিলেন ১৯১৮ সনের মে মাসে। আহমেদাবাদে ডেপুটি কালেকটার। মে মাসেরই একদিন, ১৯৩০ সনে, পদ-ত্যাগপত্র দিয়ে ওঁর ছোটভাই আম্বাভাইয়ের বাসায় গিয়ে উঠলেন। ওই আহমেদাবাদ শহরেই। তারপর মহাত্মা গান্ধী এলেন জীবনে।

জীবনের সমস্ত কিছু তখন অন্য খাতে বইতে লাগল। কখনো কোনো কাজ না ভেবেচিন্তে ঝোঁকের মাথায় উনি নেননি। যে কাজ হাতে নিয়েছেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে করেছেন। কংগ্রেসী নেতারা জেলে গিয়ে যখন 'বি' কিংবা "এ" ক্লাশের বরাদ্দ আহার করেছেন উনি তখন চেয়ে নিয়েছেন স্বেচ্ছায় সবচাইতে নিম্ন শ্রেণীর আহার। দেখেছেন কোনো কোনো কংগ্রেসী নেতা জেলে গিয়ে নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করতে পিছপাও হননি, মোরারজী তাঁদের মধ্যে কখনো থাকতেন না। যেমন ছিল বাড়িতে, সেই চাকরিকাল থেকে, তেমনি জেলে উনি প্রতিদিন ভোরে বিছানা ছেড়েছেন, হাতমুখ ধুয়ে গায়ত্রী পাঠ করেছেন, গীতা পাঠ করেছেন। এমন কি কংগ্রেসী মন্ত্রী হবার পরেও কি বোম্বাই প্রদেশে, কি দিল্লী কেন্দ্রে এই ছিল এবং এখনো আছে ওঁর প্রাতঃকালীন একই নিয়মনিষ্ঠা।

যেমন কথা তেমনি কাজ। তেমনি সংযত আচরণ। কোনোপ্রকার ডাবল-ডিলিং ওঁর ধাতে সয় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের সময় নিজের অধীনে সমস্ত কর্মচারীদের উনি তালাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওঁর ব্যবসাদার ছেলে কান্তি দেশাইকে যেন কোনোপ্রকার ফেভার না দেখানো হয়। এমন কি এ নির্দেশও স্পষ্টভাবে দিয়েছিলেন ছেলে কান্তি দেশাই সরকারী কোনো পারমিট টারমিট চাইলে সে কাগজপত্র যেন তখনি ওঁর কাছে সোজাসুজি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একথা অনেকেই জানতেন, কি কংগ্রেসী মহলে কি বাইরে, কান্তি দেশাইকে উনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন সে যদি সরকারের কাছ থেকে কোনো অন্যায় সুযোগ নেয় তাহলে উনি আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত কোনোপ্রকার দ্বিধা করবেন না।

বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই ঠাট্টাতামাশা করতেন এবং করেন তাঁর বাতিকগুলো নিয়ে। সিগারেট না খাওয়া, মদ খাওয়াকে পাপজ্ঞান করা ইত্যাদি। সব উনি হাসিমুখে সয়ে যান। নিজের বাতিকগুলো তো উনি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চান না। অবশ্য মদের ব্যাপারটা আলাদা।

মোরারজীর চোখের নীলের মধ্যে তাকিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় কোথায় যেন উনি ভীষণভাবে একলা মানুষ। একবার একজন জিগ্যেস করেছিলেন, 'কোথাও কি আপনি অসুখী? কোথাও কি আপনি না ভুলতে পারার মতন ব্যথা পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।' উনি জবাব দিয়েছিলেন।

ওঁর ছোট মেয়ে, ইন্দু যাঁর নাম, আত্মহত্যা করে মরেছিল। বছরটা ১৯৫৫। মোরারজী দেশাইয়ের সেই অনূঢ়া কন্যা বিয়ে করতে চেয়েছিল বাপের যে ছেলে পছন্দ নয় তাকে। বাপ কিছুতেই মত দিলেন না। কিছুতেই না।

ইন্দু আত্মহত্যা করল।

বাইরে মোরারজী দেশাইকে দেখে মনে হয় উনি বুঝি খুব একটি কঠোর ঠাঁই। অথচ ওঁর অন্তরঙ্গরা জানেন ওঁর মতন নরম পুরুষ বুঝি আর হয় না। উনি সত্যবাদী, সত্যের পূজারী। উনি চান অন্তত আশ-পাশের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনরা তাই হোন। হন না বলে অশান্তি। এমন কি বিদেশী অতিথিরা আমাদের দেশে এসে যখন তাঁদের দেশাচার নিয়ে মাতামাতি করেন তাতেও উনি অশেষ কষ্ট পান। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মিসেস জন এফ কেনেডি ওঁর ছোট বোনকে নিয়ে এদেশে এসেছিলেন ভারত সরকারের অতিথি হয়ে। ১৯৬২। সে সময় জয়পুর মহারাজা মান-সিংহের সংগে জয়পুরে গিয়ে ওঁরা রাত জেগে জেগে খুব নাচানাচি করেছিলেন। মদ খেয়েছিলেন। তাতে উনি মহাখাপ্পা হয়ে বলেছিলেন, 'আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম এমন হতে দিতাম না।'

ভালো হোক মন্দ হোক, মোরারজী দেশাই অনেক দিক দিয়ে আপসহীনভাবে সেকালের মানুষ। মন্ত্রী হয়ে উনি কোনোপ্রকার দশদিকে ক্রিক করে বেড়াতে পারেননি, শুধু থেকেছেন আপিসের ফাইল নিয়ে সর্বক্ষণ, প্রত্যেকদিনের কাজ প্রতিদিন যথাসময়ে শেষ করেছেন নিয়মিতভাবে। এ অভ্যাস ওঁর চিরকালের। ওঁর টেবিলে "পেণ্ডিং কেস" বলে কোনো ট্রে থাকত না। ১৯৩০-র মে মাসে যেদিন ডেপুটি কালেক্টারের চাকরিতে ইস্তফা দেন ওঁর ঊর্ধতন ইংরেজ সাহেব ওঁকে হুকুম দিয়ে-ছিলেন, 'পেণ্ডিং কেসগুলো জমা দিয়ে যেও।' উনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, 'কিছুই জমা দেবার কেস আমার নেই। এমন কি আজকের পাওয়া কেসগুলিও আমি ডিস-পোজ করে দিয়েছি।' ব্যাপারটা ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগে। কেননা অনেকেই জানেন, কোনো মন্ত্রী আপিস থেকে বিদায় নেবার সময় বিস্তর সরকারী কাগজপত্র নিজে উপস্থিত থেকে জ্বালিয়ে টালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে তবে বিদায় নেন। অথচ এই ১৬ই জুলাই মোরারজী দেশাইয়ের অর্থ-মন্ত্রক যখন প্রায় অশ্রদ্ধেয়ভাবে ওঁর কাছ থেকে হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেওয়া হলো তখনো উনি কোনো পেণ্ডিং কেস আপিসের টেবিলে অন্যের জন্য ফেলে রেখে আপিস পরিত্যাগ করেননি। এমন কি একটিও সরকারী কাগজপত্র এদিক ওদিক গায়েব করার দুর্নাম ওঁর হয়নি। অথচ খামোকা দুর্নাম রটনা করার মানুষের অভাব নেই কোনো রাজধানীর দপ্তরেই। তাতে বুঝি পদোন্নতি।

সব কথা গুছিয়ে সামান্য একটি রচনায় লেখা আজ সম্ভব নয়। চলেন যে মানুষ সদাসর্বদা লম্বা পায়ে, কথা বলেন কাটা-কাটা, অভব্য ব্যবহারে যাঁর বুকটা যখন-তখন চুরমার হতে পারত, এবং পারে, আজকে যে মানুষটিকে গদিচ্যুত করা হলো তাঁর বিশুদ্ধ ভালোর দিকটা অনেকেই হয়ত ভালো মনে দেখতে চাইবেন না। তবু আমি বলব, কুরু-পাণ্ডবকালের এই ইন্দ্রপ্রস্থে মোরারজী ভাইয়ের মতন দেবতুল্য মানুষ আমি খুব একটা দেখে থাকি বলে মনে হয় না। "দেবতুল্য" বিশেষণটা অনেক ভেবেচিন্তে ব্যবহার করলাম আমি।

অনেক বছর আগে বোম্বাই শহরে উনি একদিন আমাকে নিজের পাশে বসিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'জীবন থেকে তুমি কি শিখেছ?'

বালক বয়সে আমিও আমার বাবাকে জন্মের মতন হারিয়েছিলাম। আমিও ছিলাম বাড়ির বড় ছেলে। মোরারজী-ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে তখন আমি পারিনি। আজকে যদি উনি সেই একই প্রশ্নের জবাব চান তাহলে আমি বলব, 'জীবন থেকে কি পেয়েছি কি পাইনি কথায় বলে বোঝানো তা বৃথা।' তবু যদি উনি জিদ করে বলেন, 'বাট ইডন দেন?'

'লাইফ ইজ এক্সপ্রেসড ইন দি চয়েসেস ওয়ান মেকস', তাহলে এই আমি বলব। চলার পথের চৌরাস্তায় থমকে গিয়ে পরে কোন রাস্তাটা আমি ধরলাম সোজা, তাই আমি। চলার রাস্তাটা।

আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থার রাজনীতি

আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থা পি ই এন (পোয়েটস প্লে-রাইটস, এডিটরস, এসেইস্টস, নভেলিস্টস)-এর সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। পর পর দু' বার এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলার। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত আরও দু' মাস তিনি কাজ চালিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন।

সবাই জানে, এই ধরনের সংস্থাগুলিতে সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে না। সাধারণত বয়স্ক নিরীহ লেখকরা মিলিত হয়ে পানাহার ও আলাপচারি করেন, ভাষার ব্যবধানের ফলে, ইংরেজী ভাষার লেখকরা ছাড়া আর সবাই প্রায় অন্যদের লেখা সম্পর্কে অজ্ঞ সুতরাং ভাববিনিময়ের নামে খানিকটা সৌজন্যভাবে ভাসা ভাসা উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়। অতএব, এর সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে যে সাহিত্য-কৃতি ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারই প্রাধান্য পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। তবু, সংস্থাটি যেহেতু আন্তর্জাতিক এবং আকারে বেশ বড় —প্রায় ৬০টি দেশের লেখকরা এর সদস্য, তাই আলোচনার যোগ্য। উপকরণ পেয়েছি লণ্ডন টাইমস থেকে।

মার্চ মাসে এদের আন্তর্জাতিক কার্যকর সমিতির সভায় সভাপতি পদের জন্য তিনটি নাম উঠেছিল। বিদায়ী সভাপতি আর্থার মিলার প্রস্তাব করেছিলেন, মেক্সিকান লেখক কারলোস ফিউয়েন্টিস-এর নাম। কিন্তু তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজী নন। বাকি দুজন হলেন, ব্রাজিলের একজন সমাজতত্ত্ববিদ জোসুয়ে ডি ক্যাসট্রো এবং বিখ্যাত ইটালিয়ান ঔপন্যাসিক ইগনাৎসিও সিলোনে। ডি ক্যাসট্রোর নাম প্রস্তাব করেছেন পি ই এন-এর ফরাসী শাখা। সিলোনের সমর্থক প্রচুর, তাঁর নামের প্রস্তাবক ডাচ শাখা, বেলজিয়ানরাও সমর্থন জানিয়েছেন, এবং চারজন সহ-সভাপতি রোজামুণ্ড লেহমান, স্টর্ম জেনসন, রবার্ট নিউম্যান এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়া') সিলোনের পক্ষে।

দু' জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোটাভুটি হবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু এই উপলক্ষে আন্তর্জাতিক পি ই এন-এ ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ডাচ শাখার সম্পাদক ডেভিড কারভার আবার আন্তর্জাতিক পি ই এন-এরও সম্পাদক, তিনি ইগনাৎসিও সিলোনের পক্ষ নিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন ফরাসী শাখার সম্পাদক জাঁ দ্য বিয়ের। দ্য বিয়ের সিলোনে-কেও চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজনৈতিক প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে এবং পুরো সংস্থাটাকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতায় আনার জন্য।

সাহিত্যিক হিসেবে সিলোনের আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডি ক্যাস্ট্রোকে লেখক বলাই কষ্টকর। তিনি একজন সমাজতত্ত্ববিদ এবং অতি কষ্টে তাঁকে প্রাবন্ধিক-এর আওতায় ফেলা যায়। অর্থাৎ বোঝার সুবিধের জন্য এইভাবে বলা যেতে পারে, তাঁর যোগ্যতা আমাদের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি দেবেশ দাসের কাছাকাছি। অপর পক্ষে সিলোনে-র দোষ তাঁর রাজনৈতিক পটভূমিকা। ইটালীর রাজনীতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৯৫৩ সালে সিলোনে ভোটের ফলাফলে আন্তর্জাতিক পি ই এন-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেবার তিনি পদত্যাগ করেছিলেন ইটালীর পার্লামেন্টে যোগ দেবার জন্য। সিলোনে এক সময় ছিলেন সাম্যবাদী, ইটালীর কম্যুনিস্ট পার্টির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—কিন্তু ১৯৩০ সালে পার্টি ত্যাগ করেন। সুতরাং অনেকের ভয় এই, সিলোনের মতন একজন পার্টি-ত্যাগী সভাপতি নির্বাচিত হলে, পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি কম্যুনিস্ট দেশের সদস্যরা নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন, পি ই এন ছেড়ে চলে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাই হোক, সমস্যা সমাধানের জন্য সিলোনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন, যদি তাঁর প্রতিপক্ষ ডি ক্যাসট্রোও নাম প্রত্যাহার করেন। সেই অনুসারে দু' জনেই নাম তুলে নিয়েছেন।

শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য, ইংল্যাণ্ড থেকে প্রস্তাব করা হয় ফরাসী কবি পীয়ের ইমানুয়েলের নাম। পীয়ের ইমানুয়েল বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আনুষ্ঠানিক কবি। সম্প্রতি তিনি আকাদেমি ফ্রাঁসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এবং আন্তর্জাতিক কালচারাল ফ্রিডম সংস্থার সভাপতি।

গণতন্ত্র ও গুন্টের গ্রাস

পৃথিবীর কোনো দেশেই লেখকদের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায় না। অনেক সময় লেখকদেরও জড়াবার চেষ্টা হয়—কিন্তু রাজনীতি ও সাহিত্যের মিলন কখনো খুব সুখকর হয়নি।

তা বলে সব লেখকই যে রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তা বলা যায় না। যিনি গাছের পাতার রং পাল্টানো পর্যন্ত লক্ষ করেন, তিনি গোটা দেশের পট পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকবেন না, তা হতেই পারে না। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, লেখকরা রাজনীতির কুটিলতা, নানা রকম বিধি নিষেধ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করতেই চান।

এক্সট্রা পারলামেন্টারি অপোজিশান অবশ্য এখন দু' রকম। সব দেশেই কলেজের ছাত্ররা এই ভূমিকা নিয়েছে, তারা অবশ্য শাসনতন্ত্র বদলাতে চায় পটকা ও ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে। আর লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা চান—এর সমালোচনা ও ভেতরকার ধ্বংসের ছবি ফুটিয়ে পরিবর্তন আনতে।

বিখ্যাত জার্মান লেখক গুন্টের গ্রাস ('টিন ড্রাম'—এর বহু পরিচিত উপন্যাস) কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে নেমে পড়ায় বিশ্বাসী। গ্রাস গণতন্ত্রের সমর্থক, তিনি মনে করেন গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে তার সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসা উচিত। আগামী জার্মান নির্বাচন উপলক্ষে তিনি সোস্যাল ডেমোক্রাটস দলের সমর্থনে একটি সমিতি গঠন করেছেন। এই সমিতির নাম

জোটারস ভলান্টারি অ্যাকশান ফর দা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটস'। এ'দের কাজ সমমর্মীদের কাছে সোসাল ডেমোক্রাটসদের হয়ে প্রচার চালানো, শুধু তাই নয়, অনুরাগী পাঠকদের কাছেও এ'রা এই দলের স্বপক্ষে আবেদন জানাবেন বেতার-টেলিভিশনে ও জনসভায়। এ'দের এই কাজ স্বার্থশূন্য এবং প্ররোচনাহীন।

গ্রাসকে বলা যায় নরম বামপন্থী। তিনি শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে আগ্রহী। সোস্যাল ডিমোক্রাটস দলের প্রতি তাঁর অনুরক্তি যুক্তিহীন অন্ধ নয়। অনেক সময়েই তিনি এই দলকেও কড়া আক্রমণ করতে ছাড়েন না। তিনি মনে করেন, "গণতন্ত্রকে উন্নত করার অন্যতম সার্থক উপায় হচ্ছে এর সমালোচনা করা।" এবং তিনি এই জন্যই গণতন্ত্র চান—কারণ তা সমালোচনা করার সুযোগ দেয়। একজন লেখকের পক্ষে এ অধিকার ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

গুন্টের গ্রাসের বয়েস এখন ৪২। তাঁর যখন ১৪ বছর বয়েস, তখন তিনি হিটলারের যুব সংস্থার সদস্য হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে অনুতপ্ত এই আদর্শবাদী যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যে কোনো ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস করাই বিপজ্জনক। "আপনাদের পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই যে আপনাদের পছন্দ হয় না—সেটা অত্যন্ত সত্যি কথা। কিন্তু এটা ভুল হবে, যদি মনে করেন, গণতন্ত্র ছাড়া আর কোনো উপায়ে এর পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সনাতন পাঠক

আলোচনা

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য

শনিবার ২৭শে আষাঢ় "দেশ" সপ্তত্রিংশত্তি সংখ্যায় 'রূপদর্শীর' সংবাদ-ভাষ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। রূপদর্শী মহাশয় অতি বিচক্ষণতার সহিতই অধুনা-লুপ্ত রাঢ় দেশের "লাঠি যার মাটি তার" ঐতিহ্যটির পুনরুদ্ধারের জন্য (ভূমিহীন-দের) ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহাশয়কে 'বাংলার মাও' খেতাবটি দিয়েছেন। সত্যই আমাদের এই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে হরেক রকমের মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মেছেন হরেক অবতার। কিন্তু আসল মাও'এর জীবদ্দশাতেই 'বঙ্গীয় মাও'এর আবিষ্কার ও উপহার সত্যিই বিস্ময়কর।

তাঁর লেখার শেষের দিকের ইঙ্গিত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' শুরু করেছে। তাঁদের এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপে যে শরিকই প্রতিবন্ধক হবেন তাঁদেরই ও'রা লিকুইডেট করবেন। এ বিষয়ে ও'দের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে ও'দের নীতি হলো :—

"The Communist Party has always proclaimed its belief in 'United Front' tactics. Invariably, however, the united front has been nothing but a tactic by which the Communist Party seeks to reach the membership of other groups or parties in order to discredit their leadership and destroy their organisation. The real operating maxim behind all united front organisations into which Communists enter is: 'Rule or Ruin'—Resolution & Speeches at the Seventh Congress of the Communist International—1935."

"Each Communist member must remember that he is not a 'legislator' who is bound to seek agreements with the other legislators, but an agitator of the party, detailed into the enemy's camp in order to carry out the orders of the Party there. The Communist member is answerable not to the wide mass of his constituents, but to his own Communist Party—whether lawful or unlawful." Thesis of the Third Congress of the Communist International, 1921.

রূপদর্শী মহাশয়ের বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্ম। আইন করে জমির সর্বোচ্চ সীমা যদি নূতন করে আবার নির্ধারণ করা হয়, তবে তা সকলের উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে আইনের দিক থেকে। কিন্তু হুজুগ করে দখল করলে তা বেছে বেছে করা হয় বিশেষ বিশেষ জমির উপর। আর আমরা যারা এইসব বিষয় যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, তারা কেউই সাচ্চা নয়, তারা 'ব্ল্যাকশিপ'।

'অজাতশত্রু'

ভারতীয় গণতন্ত্রে সমতা

গত ৫ই জুলাইয়ের দেশে আলোচনা বিভাগে এণ্টালির হাফেজ আমির আজি "ভারতের গণতন্ত্রে আরও সমতার প্রয়োজন শীর্ষক" আলোচনায় এক জায়গায় লিখেছেন যে, সম্পত্তি হস্তান্তর করতে গেলে ভারতীয় মুসলমানদের অঞ্চলের প্রধানের বা গ্রাম প্রধানের সার্টিফিকেট লাগে যে, বিক্রেতা ভারতীয় নাগরিক। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু লাগলেও একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা ততটা অন্যায় বলে মনে হবে না। আজি সাহেব কি অস্বীকার করতে পারেন যে, এমন বহু পাকিস্তানী মুসলমান নাগরিক আছেন, যাঁদের প্রকৃত সম্পত্তি এখনো ভারতে আছে। ঐ সকল ব্যক্তি যদি তাঁদের ভারতীয় সম্পত্তি সুবিধা-মত বিক্রি করে ভারতীয় টাকা বিদেশে নিয়ে যান (এটা ওপেন সিক্রেট যে টাকা পাচারের বহু গোপন পথ আছে), তা হলে কি দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে না? গণ-তন্ত্রের খাতিরে কি এতটাও সহ্য করতে হবে? এছাড়া সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করেই অপ্রিয় হলেও লিখছি, এখনো এমন বহু হিন্দু পাকিস্তানে আছেন, যাঁরা ভারতকেই তাঁদের মাতৃভূমি বলে জানেন, অপর পক্ষে ভারতেও এমন বহু মুসলমান আছেন যাঁরা পাকিস্তানকেই আপন দেশ বলে ভাবেন এবং সুযোগ পেলেই সম্পত্তি বিক্রি করে পাকিস্তানে চলে যান। আজি সাহেব কি এমন গ্যারাণ্টি দিতে পারেন যে, যাঁরা উৎকোচাদি দিয়েও সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়েছেন, তাঁরা সবাই এখনো সশরীরে ভারতেই বসবাস করছেন? পক্ষান্তরে একটি কথা বলতে চাই, পাকিস্তানের শাসকরা আমাদের চেয়ে বিচক্ষণ। ওখানে আইনের কোন ফাঁক নেই। পাকিস্তানে হিন্দুরা কোন মতেই সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাবে গণতন্ত্রের খাতিরে তাও সহ্য করতে হবে, এটা কেমন কথা? যদি জানা থাকে, তবে আজি সাহেবের উচিত যে সকল ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করতে সাহায্য করছে তাদের ধরিয়ে দেওয়া।

সুনীলকুমার চক্রবর্তী
জলপাইগুড়ি

ংকলন ঃ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

চলচ্চিত্রকথা। অসীম সোম সম্পাদিত। পরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কাতা-৯। ১৫·০০ টাকা।

বেশ কিছুকাল যাবৎ এদেশে চলচ্চিত্র পর্কে সাধারণভাবে কৌতূহল ও উৎসাহ দ্ধ পেয়েছে। চলচ্চিত্র যে শুধুই প্রমোদ-করণ নয়, বরং স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি ল্প মাধ্যম—এ-সত্য ক্রমশই অধিকতর থ্যক লোক উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রমাণ ফিল্ম সোসাইটি জাতীয় সংস্থার বর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সংখ্যা। শুধু কাতাতেই এ রকম চোদ্দটি সংস্থা রয়েছে খানে দেশী-বিদেশী প্রকৃত শিল্পগুণ-পন্ন ছবি নিয়মিতভাবে দেখানো এবং ভন্ন আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। ফলে, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস, ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ শিল্পজিজ্ঞাসার ান্য শাখায় অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানার্জনের পথ খোলা রয়েছে, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, লা ভাষায়, তা নেই। চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রকাগুলির অধিকাংশই শিল্পগত শুদ্ধ লোচনাকে, ব্যবসায়িক কারণেই হয়তো, াগুক্ত্রেয় মনে করেন। মুদ্রিত গ্রন্থের খ্যাও অতি নগণ্য। চলচ্চিত্রবোধের প্রতিক চাহিদা মেটানোর পক্ষে সেগুলিকে কোনমতেই পর্যাপ্ত বলা চলে না। এদিক থেকে, অসীম সোম পরিকল্পিত ও সম্পাদিত বর্তমান গ্রন্থটি সময়োপযোগী একটি অনন্য উপহার।

বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে বইটির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, বইটি যে এককভাবে কারো রচিত নয়, বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা-সংগ্রহ, গ্রন্থপাঠকালে তা প্রায়শই বিস্মৃত হতে হয়। এর পূর্ণ কৃতিত্ব সম্পাদকের প্রাপ্য। কয়েকটি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রের উদ্ভব, বিবর্তন, ইতিহাস, সমস্যা, সম্ভাবনা, নেপথ্যচিত্র আন্দোলন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কোনোক্ষেত্রেই অন্তঃসংহতি ক্ষুণ্ণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লেখকের রচিত বলেই গ্রন্থটি সর্বক্ষেত্রেই বিষয়নিষ্ঠ হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, একক-রচনায় এই সর্বতোমুখী অভিজ্ঞতার ছাপ আশা করাও যেত না। পরিশিষ্টে চলচ্চিত্রের পারিভাষিক শব্দাবলী ও সংজ্ঞার্থ প্রদান এবং সুনির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন, তেমনই বইটিকে চলচ্চিত্রের একটি অপরিহার্য কোষগ্রন্থ করেও তুলেছে।

চলচ্চিত্রকথা আটটি সুপরিকল্পিত অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় ঃ দৃশ্যের দর্পণে। চলচ্চিত্রের স্বরূপ ও শিল্প-স্বয়ম্ভরতার সম্ভাবনাময় প্রকৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসুরায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অসিত গুপ্ত ও অসীম সোম এই আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন। চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ একমাত্র তার নিজস্ব ভাষাতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এ বিষয়ে, দেখা গেল, সকলেই এক মত।

'সমীক্ষা ঃ সেকাল-একাল' অধ্যায়ে চলচ্চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর ও সমকালীন চলচ্চিত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় (অবয়ব-আবরণ) সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত আলোচনা। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়—এই চারজন চিত্রপরিচালক চলচ্চিত্রের ভাষা-শব্দ-ভঙ্গি-আঙ্গিক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। চলচ্চিত্রের গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সহজেই গড়ে তোলে আলোচনাগুলি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পরূপের সম্পর্ক উদ্ঘাটিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও দিব্যেন্দু পালিত যথাক্রমে সঙ্গীত ও সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নৈকট্য, ঋণ ও নির্ভরতার ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। এই অধ্যায়ের তৃতীয় লেখক গুরুদাস ভট্টাচার্য চিত্রনাট্যকে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম রূপে উপস্থাপন করতে চান। এতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে

সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে তার তার বিচ্ছিন্ন ও হঠকারী মনে হতে পারে। কোনো রকম বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েই তিনি এখনকার রচনায় 'সার্থকতা সীমাবদ্ধ এবং ক্ষমতার সীমা আজ স্পষ্ট', এই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন কী ক'রে, অনুমান করা দুষ্কর। তাছাড়া যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রচনায় বাজার ভরে যাচ্ছে বলে তাঁর মন্তব্য, চিত্রনাট্যের শিল্পরীতি যদি সাহিত্যের মাধ্যম রূপে গৃহীতও হয় (তর্কের খাতিরে ধরা গেল), তাহলে নতুন রীতির টানেই কি সেগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনায় উন্নীত হবে?

'স্বদেশবীক্ষণ' শীর্ষক অধ্যায় প্রধানত বাংলা ছবির ধারাবাহিক দিকচিহ্ন নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার অন্যান্য ভারতীয় ছবি ও হিন্দী ছবি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ দুটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রয়েছে। আশীষ বর্মণের 'একালের ছবি ও তার বিচার' আলোচনাটি যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেককারী।

চলচ্চিত্রের নেপথ্য লোকের আনন্দ-যন্ত্রণাময় নানান টুকরো ও তীব্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুনিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, বিমল মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায় ও রাজেন তরফদার। 'চিত্রবিচিত্রা' অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর চলচ্চিত্র সৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায় : রসিক অরসিকেষু।

মুখ্যাত দর্শক ও চিত্রসমালোচকের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে রচিত এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে সুলিখিত। মৃণাল সেন-এর হাতে কলমও যে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে 'একটি জীবনী' তার নিশ্চিত প্রমাণ। এই অধ্যায়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা ধ্রুব গুপ্তের 'ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সমস্যা'। চিত্র-সমালোচনা সম্পর্কে বিমল ভৌমিকের সচেতন আক্ষেপোক্তিও মননশীল বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র-সাংবাদিকের দায়িত্ব বৃদ্ধি করবে। পঙ্কজ দত্তের 'চলচ্চিত্র : নির্মাতা : দর্শক' ও প্রদীপ্তশঙ্কর সেনের 'চলচ্চিত্র, সমাজ, দর্শক' তেমনই চলচ্চিত্রভোক্তার নিজস্ব প্রস্তুতির ক্ষেত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোকপাত।

'চলচ্চিত্র কথা'য় বেশ কিছু দেশী ও বিদেশী ছবি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই ছবিতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিচয় অনুল্লিখিত। গ্রন্থটির সামগ্রিক আবেদনের দিক থেকে বিচার করলে একে অসম্পূর্ণতাই বলতে হয়। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এ-ত্রুটি দূর হবে, কারণ 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়' এ-কথা মনে করানো নিশ্চয় সম্পাদকের উদ্দেশ্য নয়। ১৭০/৬৯

কিশোর সাহিত্য

কেমন করে এলো। **অমরনাথ রায়।** অশোক প্রকাশন, এ-৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। ২·৫০ টাকা।

শিশুর বয়েস যত বাড়ে, পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে তার কৌতূহল ও প্রশ্ন ততই বৃদ্ধি পায়। এটা কী, ওটা কেন— সদাজাগ্রত এই সব প্রশ্নের সদুত্তর জোগাতে অধিকাংশ অভিভাবকই বিব্রত হয়ে পড়েন। শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় কিশোরপাঠ্য বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর আরেকটি সাধু প্রয়াস। আমাদের চারপাশের নানান টুকরো বস্তুর জন্মকথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর ভাষা সহজ ও প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বও সরল ক'রে হাজির করতে পেরেছেন তিনি। এমন একটি বই নিঃসন্দেহে স্কুলের নিচু ক্লাসে 'দ্রুতপঠন' রূপে পাঠ্য হতে পারে। তা না হলেও, শিশুদের একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। ১২৭/৬৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নক্ষত্র জয়ের জন্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সুরভি প্রকাশনী : ১৮/১ দেওদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯। মূল্য : ৩·০০।

জাতির জনক গান্ধীজি। শ্রীরঘুনাথ মাইতি। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন : ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য : ১·০০।

সত্যাগ্রহের কথা। শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন : ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য : ০·৫০।

নারী উন্নয়ন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন : ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য : ০·৫০।

হারেমের নায়িকা। সুভাষ মজুমদার। সাহিত্য প্রকাশ : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৬·৫০।

সূর্য রাত্রি নক্ষত্র। দিলীপ দে। ৯২/এ প্রফুল্লনগর, কলিকাতা-৫৬। মূল্য : ২·০০।

দশটি গল্প। শেখর বসু। এই দশক : ৬ সাহাপুর মেইন রোড, কলিকাতা-৩৮। মূল্য ৩·০০।

দিব্য সুন্দর। শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। শাণ্ডিল্য প্রকাশনী : সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি। মূল্য : ১·২৫।

সূর্যটা একটা বাজনা। বাণীপ্রসন্ন। ভূপতি ভট্টাচার্য : ১১৪/৪ বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬১। মূল্য ২·০০।

বেকারের জর্নাল। হরি সিংহরায়। নবপত্র প্রকাশন : ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

বৌভাতের থালা বা মেয়ে মন্দাল। ডাঃ শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী ক্ষমারাণী দেবী : ১০৩ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬।

ছড়া। সুধীরকুমার দাস। মীরা প্রকাশনী : ১৪৮এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ০·৬০।

রবীন্দ্র অভিধান (৪র্থ খণ্ড) সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

স্বর্গপ্রেম। শ্রীপশুপতি প্রধান। শ্রীসন্তোষকুমার ভক্ত : শ্রীরামপুর উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি বিদ্যালয় : পোঃ শ্রীরামপুর, মেদিনীপুর। মূল্য ২·৫০।

আদিম লিপ্সা। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশ : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·৫০।
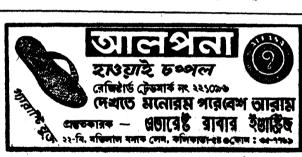
বই সত্যি কথা। আইনের বয়ান তাই কিন্তু অফসাইডের ব্যাপারে প্রতি- এই ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হবার কিফা যে শেষ নির্দেশ দিয়েছেন য়াড় অফসাইডের থাকলেই তার ধ বাঁশী বাজানো উচিত সেটাও তো । এর ফলে হয়তো বহু ক্ষেত্রে বিনা নে বাঁশী বাজিয়ে খেলার গতি মন্থর হতে পারে। এবং এ কথাও সত্যি বিনা নে বাঁশী না বাজাবারও পরামর্শ । কিন্তু অফসাইডের ব্যাপারে াই বিতর্কের উদ্ভব হওয়ায় ফিফার ক বাধ্য হয়ে রেফারিদের পরামর্শ ছন, আক্রমণে খেলোয়াড়ের অংশ আর না থাক অফসাইডে থাকলেই তার ধ বাঁশী বাজানো উচিত। কারণ ওই ায় তার সুযোগ লাভের যখন সম্ভাবনা তখন হয়তো আর অফসাইড দেওয়া া। খেলোয়াড় অন-সাইড হয়ে যান। হক, মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলের । ওই বিতর্কমূলক গোলের ব্যাপারে র রত্নাঙ্কুর ঘোষ স্বমতে অবিচল থেকে ঢ়তা দেখিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারেন। রেফারি- াই গুণ বর্তমানে বিরল।

কথা

ারিয়ানার মধ্যে বাঁধা এই বড় খেলার কছু বলতে হলে প্রথমেই দুই দলের াগের দুর্বলতার কথা বলতে হয়। ক্ষণব্যূহে বহুবার ফাটল ধরেছে. ারডরা বহুবার গোলের মুখে এমন পয়েছেন যা থেকে সহজেই গোল হতে । অথচ দুই দলেরই রক্ষণব্যূহ নাকি াটা। সব বাঘাবাঘা খেলোয়াড়। ইস্ট নর তিন ব্যাক প্রথার খেলায় রক্ষণ- ফাটল ধরার তবু কারণ খুঁজে পাওয়া কিন্তু মোহনবাগানের ৪ বাঘা ব্যাক ার কেন পরাজিত হলেন? যে গোল র্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে অফসাইডের প্রশ্ন থাকলেও ইস্ট ফরোয়ার্ডরা কিন্তু সি প্রসাদ ও কে ক পর পর কাটিয়ে তারপর গোল ন। সত্যি কথা বলতে কি, এ খেলায় লের সামনেই গোল করার যত সুযোগ ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের কোন এত সুযোগ সৃষ্টি হতে দেখিনি। াটি সামগ্রিক ক্রীড়ামান মাঝারিয়ানার াধা থাকলেও মাঝে মাঝে দক্ষতার ও না মিলেছে, এমন নয়। হাবিব ও দের একটি করে দর্শনীয় ভলি, াই শট বাঁচানো, এ বি গাঙ্গুলি এবং অশোক চ্যাটার্জীর একটি করে হেডের ক্ষেত্রে উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় মিলেছে।

নীচে চারটি ডিভিসনের লীগ টেবল দেওয়া হল।

ফুটবল লীগ টেবলে কে কোথায়

প্রথম ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	পক্ষে	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৬	১৩	৩	০	৩০	২	২৯
মোহনবাগান	১৬	১২	৩	১	৩০	৪	২৭
পোর্ট কমিঃ	১৬	৯	৪	৩	১৯	৯	২২
বি এন আর	১৬	৯	৩	৪	১৯	৭	২১
বাটা	১৬	৮	৫	৩	১৯	১২	২১
ইঃ রেল	১৬	৮	৪	৪	২৩	১২	২০
উয়াড়ি	১৬	৬	৭	৩	১৩	১০	১৯
কালীঘাট	১৬	৭	৩	৬	১৬	১৭	১৭
এরিয়ান	১৬	৭	২	৭	১৪	১১	১৬
খিদিরপুর	১৬	৬	২	৮	১৩	১৪	১৪
হাওড়া ইউঃ	১৬	৩	৭	৬	১০	২৩	১৩
মহঃ স্পোর্টিং	১৬	৩	৫	৮	৬	৬	১১
স্পোর্টিং ইউঃ	১৬	২	৭	৭	১১	২৪	১১
বালি প্রতিভা	১৬	৪	৩	৯	৯	২০	১১
রাজস্থান	১৬	০	৩	৮	৮	১৬	৮
জর্জ টেলিঃ	১৬	৩	২	১১	১০	৩৩	৮
পুলিশ	১৬	১	২	১৩	৫	৩২	৪

মহমেডান স্পোর্টিং শেষ চারটি ম্যাচ খেলেনি। কালীঘাট মাঠে না আসায় মোহনবাগান ওই খেলায় ওয়াক ওভার পেয়েছে। উপরের পাঁচটি দলের সুপার লীগে খেলার কথা। কিন্তু ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে উয়াড়ি ক্লাবের প্রতিবাদের ব্যাপার নিয়ে উয়াড়ির কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা করেছেন। সুতরাং ব্যাপারটি বিচারাধীন। তবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং পোর্ট কমিশনার্স দলের সুপার লীগে যাবার প্রশ্নে কোন অন্তরায় নেই।

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ

কুমারটুলি	১৬	১০	৩	০	২৬	১২	২৯
টালিগঞ্জ অগ্রগামী	১৬	১২	৪	০	৩৮	৬	২৮
ভ্রাতৃ সংঘ	১৬	১২	৪	০	৩৫	৭	২৮
ঐক্য সম্মিলনী	১৬	১০	২	৪	২৪	১৪	২২
ইয়ং বেঙ্গল	১৬	৭	৪	৫	২৫	২১	১৮
ফিলখানা	১৬	৭	৪	৫	২৭	১৬	১৮
ডবলিউ বি পুলিশ	১৬	৭	২	৭	২২	১১	১৬
সালকিয়া ফ্রেন্ডস	১৬	৭	২	৭	৩৩	২৯	১৬
আর এইচ এ সি	১৬	৫	৫	৬	২৪	২৭	১৫
ইন্টারন্যাশনাল	১৬	৬	২	৮	১৮	২৪	১৪
বেনিয়াটোলা	১৬	৬	১	৯	২২	২৬	১৩
গ্রীয়ার	১৬	৪	৩	৯	১৯	৩৪	১১
রেনজারস	১৫	৪	৩	৮	১৮	২৯	১১
অরোরা	১৬	২	৭	৭	১৪	২৫	১১
সি এ সি	১৬	৫	০	১১	২৫	২৮	১০
সুবারবন	১৫	৩	০	১২	১৩	২৭	৬
বি ওয়াই এম ইউনিয়ন	১৬	১	২	১৩	৫	৪৪	৪

চ্যাম্পিয়ন কুমারটুলি আগামীবার প্রথম ডিভিসনে খেলবে। টালিগঞ্জ অগ্রগামী এবং ভ্রাতৃ সঙ্ঘের মধ্যে কে প্রথম ডিভিসনে খেলবে তা খেলার সময় পর্যন্ত অমীমাংসিত।

তৃতীয় ডিভিসন লীগ

ভবানীপুর	১৬	১৪	১	১	২৩	৫	২৯
বেহালা ইউথ	১৬	১৩	১	২	২৮	১৬	২৭
মৌড়ী স্পোর্টিং	১৬	১২	০	৪	৩০	১৭	২৪
জোড়াবাগান	১৬	১০	১	৫	৩৩	২১	২১
কাস্টমস	১৫	৯	২	৪	২৩	৯	২০
উত্তরপাড়া স্পোরটিং	১৬	৭	৩	৬	১৮	২৪	১৭
চন্দু মেমোঃ	১৫	৮	০	৭	২২	২৭	১৬
খড়দা স্পোরটিং	১৫	৮	০	৭	১৫	১৫	১৬
তালতলা	১৬	৫	৫	৬	১৯	২০	১৫
ভিক্টোরিয়া	১৫	৫	৪	৭	২৪	২৬	১৪
টাউন	১৫	৫	৪	৬	২১	১৮	১৪
এলবার্ট স্পোরটিং	১৬	৬	১	৯	২৪	২০	১৩
মিলন সমিতি	১৬	৫	১	১০	১৮	২৫	১১
ডালহৌসী	১৬	৩	৩	১০	২২	৩৩	৯
ইউনাইটেড স্পোরটিং	১৬	২	৫	৯	১৪	২৫	৯
সিটি	১৬	৩	২	১১	১৫	৩৪	৮
শ্যামবাজার ইউনাইটেড	১৬	২	১	১৩	৮	২২	৫

চতুর্থ ডিভিসন লীগ

চৈতালী সঙ্ঘ	১৭	১৫	১	১	৩৮	৯	৩১
বেলেঘাটা এ সি	১৭	১০	৪	২	২০	৪	২৮
কালীঘাট মিলনী	১৭	১২	২	৩	৪৫	১৮	২৬
মির্জাপুর ইউনিয়ন	১৭	১০	৩	৪	২৭	১৩	২৩
কাশীপুর সরস্বতী	১৭	১১	০	৬	৩২	১৯	২২
ক্যালঃ পুলিশ	১৭	৮	৬	৩	২৫	১১	২২
যাদবপুর অগ্রগামী	১৭	১০	১	৬	২৪	১৭	২১
বার্ণপুর	১৭	৯	২	৬	২৬	১৯	২০
মেকং	১৭	৬	৪	৭	২৮	১৫	১৬
ইউনাইটেড স্টুডেন্টস	১৬	৭	১	৮	২২	২৩	১৫
গার্ডেনরিচ	১৭	৫	৪	৮	১৮	২৫	১৪
বেনিয়াপুকুর	১৭	৫	২	১০	১২	৩৫	১২
রামকৃষ্ণ স্পোরটিং	১৬	৩	৬	৭	১৪	২৭	১২
বাণীনিকেতন	১৭	৪	৩	১০	১৬	৩৬	১১
ব্যাটোর স্পোরটিং	১৭	৩	৪	১০	১৮	৩৯	১০
অনুশীলনী	১৭	৩	৩	১১	১৫	২৪	৯
হোয়াইট বর্ডার	১৭	২	৩	১২	১১	২৮	৭
শ্যামবাজার ক্লাব	১৭	২	১	১৪	৬	৩৫	৫

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

সৃষ্টি কথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কলকাতায় জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার স্মারক পুস্তিকায় ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তির ইঙ্গিত দিয়ে একখানি চমৎকার ব্যাঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল। চিত্রের বিষয়বস্তু : গাছ থেকে একটি সুন্দর সিমুল ফুল নীচের দিকে ঝরে পড়ছে, ব্যাট হাতে দুটি ছেলে সেই ফুলকে পেটাবার জন্য

ব্যাডমিণ্টন খেলার আধুনিক পোশাক

প্রস্তুত হয়ে আছে—যেমন ব্যাডমিণ্টন কোর্টে সাট্‌লকক পেটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে দুজন খেলোয়াড়।

ব্যাডমিণ্টন খেলার সৃষ্টির পেছনে কি সত্যিই এমন কোন ঘটনা আছে? না, সাটলককের সিমুল ফুলের আকৃতি দেখে শিল্পী তাঁর কল্পনার তুলিতে ওই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন? হয়তো মূলে কিছু সত্যতা আছে, না হয় সবটাই রঙীন মনের কল্পনা। তবে প্রায় দুশো বছর আগে শুকনো ফলে পাখির পালক গুঁজে ব্যাটের আকারের ছোট হাতিয়ার দিয়ে 'অইবেন' (oiben) নামে জাপানে যে ব্যাডমিণ্টন খেলার মত এক ধরনের খেলা হত তার প্রামাণ্য চিত্র আছে। ফ্রান্সেও ব্যাডমিণ্টন অতি প্রাচীন খেলা।

কিন্তু ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তির ইতিহাস যাই হোক, ভারতের মাটি থেকেই যে ব্যাডমিণ্টন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব স্পোর্টস'-এর পৃষ্ঠাতেই সে কথা স্বীকৃত।

ভারতের খেলাটির নাম ছিল 'পুনা' খেলা। সম্ভবত পুনার অধিবাসীরাই খেলাটি প্রথম আরম্ভ করেছিলেন। কিছু ব্রিটিশ আর্মি অফিসার পুনায় অবস্থান কালে ভারতীয়দের কাছ থেকে খেলাটি শিখে নেন এবং ১৯৬০ সন নাগাদ ব্রিটিশ সামরিক ছাউনিতে খেলাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৭১ কিংবা ১৮৭২ সনে খেলার কিছু উপকরণ পাঠানো হয় ইংলণ্ডে। ইতিমধ্যে কিছু আর্মি অফিসারও ইংলণ্ডে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'পুনা গেমস' খেলতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৩ সনে বোফোর্টের ডিউক গ্লস্টার-শায়ারে তাঁর পল্লীভবন 'ব্যাডমিণ্টন'-এ এক ভোজসভার আয়োজন করেন। বোফোর্টের ডিউক ইংলণ্ডের নামী পুরুষ। তাঁর বাড়ির ভোজসভায় বহু গণ্যমান্যদের সঙ্গে ভারত থেকে ফিরে যাওয়া আর্মি অফিসাররাও নিমন্ত্রিত। খানা-পিনা এবং আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টনের হল ঘরে পুনা গেমসেরও আসর বসে। কিন্তু ওখানেই মৃত্যু ঘটে পুনা গেমসের। নামী পুরুষ বোফোর্টের ডিউকের বাড়ির নাম অনুযায়ী খেলাটির নতুন নামকরণ হয় 'ব্যাডমিণ্টন'।

গ্রামীণ শিল্পে পাখির পালক দিয়ে তৈরি সাটলকক এবং 'গাটস' দিয়ে গাঁথা অতি সাধারণ ধরনের র‍্যাকেট দিয়েই খেলা চলতে লাগল। ১৮৮৭ সন পর্যন্ত খেলার আইনও ছিল ভারতীয়। কিন্তু সাহেবরা ১৮৮৭ সনেই ওই আইন কানুন বদলাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং খেলার উপকরণও তৈরি হতে আরম্ভ হল বৈজ্ঞানিক প্রথায়।

ইংলণ্ডের একদল খেলোয়াড়কে নিয়ে

শুকনো ফলে পাখীর পালক গুজে ছোট ব্যাট দিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলার মত 'অইবেন' নামে এক রকমের খেলা জাপানে প্রচলিত ছিল

গড়া বাথ ব্যাডমিণ্টন ক্লাবই পৃথিবীর প্রথম ব্যাডমিণ্টন ক্লাব। তারাই ১৮৮৭ সনে খেলার নতুন আইন কানুন রচনা করেন। ১৮৯৫ সালে বাথ ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের বদলে ব্যাডমিণ্টন খেলার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ইংলণ্ডের ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৯৯ থেকে অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের সূচনা। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ক্যানাডা, আয়ার্লাণ্ড, নেদার-ল্যাণ্ডস, স্কটল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েলসকে নিয়ে গঠিত হয়—ব্যাডমিণ্টনের বিশ্ব সংস্থা বা ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ থেকেই ভারত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন সংস্থার সদস্য।

টেনিস খেলার মত ব্যাডমিণ্টনেও ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা নেই। তিন বছরের ব্যবধানে পুরুষ ও মহিলাদের দেশগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় টমাস কাপ এবং উবের কাপের খেলার ব্যবস্থাও হয়েছে যুদ্ধোত্তরকালে। ১৯৪৮—৪৯ থেকে টমাস কাপ এবং ১৯৫৬—৫৭ থেকে উবের কাপের প্রবর্তন।
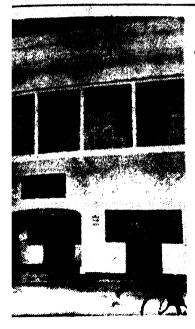
ব্যাডমিণ্টন আদিকালে এক জনৈকা মহিলার খেলার ছবি, পরিচ্ছদ লক্ষণীয়

মুকুল

আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত

*

মহিলা শিল্পী মহল : দুঃস্থ অভিনেত্রীদের বাসগৃহ

এত অল্পকালের মধ্যে তাঁদের করতলগত।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না। মহিলা শিল্পীমহল তাঁদের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করলেন। গালভরা বুলি নয়, সত্যি বড় কিছু তাঁরা করে দেখিয়ে দিলেন—এই কথাটি বিশেষ করে সেদিন অনুভব করেছেন নিমন্ত্রিত প্রতিটি ব্যক্তি।

এত বড় সাফল্যের দিনে মহিলা শিল্পী মহলের সভ্যারা যেন আরও বিনম্রী, কৃতজ্ঞতায় তাঁদের চোখ অশ্রুসিক্ত। কৃতজ্ঞতা তাঁদের কাছে যাঁরা তাঁদের বড় কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা বাংলার শিল্পরসিক জনসাধারণের কাছে। সে কথাই সেদিন বললেন কানন দেবী

সহায় অভিনেত্রীদের জন্য মহিলা শিল্পী মহল যে একটি বাড়ি ...ছেন এ-সংবাদ আগেই প্রকাশ করা ...ছিল। গত সোমবার (২১ জুলাই) ...ণ কলকাতার গরচা লেনে ওই ...তলা বাড়ির দ্বার উন্মোচন হল। ...ার শিল্পজগতের ইতিহাসে এটি একটি ...ণীয় ঘটনা। দ্বার উদ্ঘাটনের উৎসবটিও ...ছিল মনোরম। সকালে হল পুজো-...না, বিকালে প্রীতিসম্মেলন। বহু ...ষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিক ওইদিন মহিলা ...পী মহলের সভ্যাদের আন্তরিক ...নন্দন জানালেন। কপালে চন্দনের ...া দিয়ে, অতিথিদের স্বাগত জানানো

দুঃস্থ অভিযাত্রীদের আশ্রয় নিবাস ...কাতায় কেন, ভারতে আর কোথাও ...। ভাবতে আরও আশ্চর্য লাগে, শুধু-মহিলা শিল্পীদের প্রচেষ্টায় এই বাড়ি ...া হল। সিনেমা ও থিয়েটারের নামকরা ...নেত্রীরা এখানে-ওখানে ছুটে গিয়ে ... পারিশ্রমিকে দিনের পর দিন অভিনয় ... টাকা তুলেছেন। বহু কষ্ট ও ত্যাগ ...কার করে তাঁরা একটি মহৎ উদ্দেশ্য ...ল করে তুললেন। এমন একতা ও ...্যা শিল্পীদের জগতে এর আগে আর ...া যায়নি। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ...পীই হয়ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও ...বাসের ছায়ায় রয়েছেন। কিন্তু যখন ...ো শিল্পী মহলে, তখন শুধু একটি ...ল্পের আদর্শেই তাঁরা অনুপ্রাণিত। ...্র সাধন কিংবা শরীর পাতন—এ-ছাড়া ...ী নেই, এ-ছাড়া লক্ষ্য নেই। তাই সিদ্ধি

কলকাতায় তৈরি গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপের রঙিন হিন্দী ছবি 'জাহাঁগীর' (পরিচালনা: ...ভাংশু মজুমদার) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির নায়িকা ... রায়

মলিনা দেবী, সরযূ দেবী, চন্দ্রাবতী, সাধনা রায়চৌধুরী, মঞ্জু দে, নমিতা সিংহ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, সীতা মুখার্জি, সুলতা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা। সরকারী সাহায্য পাননি বলে তাঁদের কোন ক্ষোভ নেই। তাঁদের আত্ম-বিশ্বাস আছে, এতটুকু যখন পেরেছেন বাকিটুকুও পারবেন। ক্ষোভ আমাদের। এত বড় একটা কাজ চলছে অথচ আজও

পর্যন্ত সরকারী সাহায্য জুটল না। এ চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে। ব কাজ আমাদের দেশে খুব বেশী একা হয় না। যখন কদাচিৎ একটা হয়, তখ সবাই আশা করেন সরকার অন্তত এ কাজের সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য করবেন সময় এখনও আছে, কাজ আরও অনে বাকি। তাই সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা এখনও আশা করতে পারি।

কত বড় কাজ সাধিত হল তা সেদিন আমরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করলাম নিমন্ত্রিত একজন পুরুষশিল্পী বললেন : "ও'রা আমাদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আমরা তো কিছুই করতে পারলাম না।" সত্যি কথা, শিল্পীদের সংস্থা সব জায়গাতেই আছে। আবার একটি নয়, একাধিক। এক একটি সংস্থার ভাঙন ও ফাটলের কথাও আমরা জানি। বড় কাজ তো দূরের কথা, সঙ্ঘবদ্ধতা কী তা-ই দেখবার সুযোগ মেলে কম। এই ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পী মহল নতুন ইতিহাস তৈরি করলেন। এবং এই সত্য আমরা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম সেদিন উৎসবে গিয়ে। মহিলা শিল্পী মহলের প্রতিনিধিরা জানালেন, এখন থেকেই দুঃস্থ শিল্পীরা এ-বাড়িতে থাকতে পারবেন।

বাড়িটিতেও সেদিন পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের মাঙ্গলিক পরিবেশ। ধূপের গন্ধে সমস্ত বাড়ি ভরপুর। বাড়ির সাদা রঙে কেমন যেন শুভ্রতার শ্রী। সভ্যাদের অপরিসীম ব্যস্ততা, বাড়িটি কর্মচঞ্চল লোকের ভিড়—আবার তারই মধ্যে কেমন যেন এক শূন্যতা। বেদনার সুরে বুঝি শিল্পীদের মনেও। দেওয়ালে টাঙানো সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, আঙ্গুরবালা দেবী প্রমুখের ছবি। মহিলা শিল্পী মহলে একদিন তাঁরা ছিলেন, আজ এমন একটি দিনে তাঁরা নেই। যাঁরা নেই, এবং যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের সাধনা দিনে দিনে আরও উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করবে—এই প্রত্যয়ের কথাই সেদিন বললেন মহিলা শিল্পী মহল।

মস্কো উৎসবের ফলাফল

মস্কোর ষষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসবের ফল বেরিয়েছে। এবার কাহিনীচিত্র বিভাগে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছে কিউবার "লুসিয়া", ইতালির "সেরাফিনো" এবং সোভিয়েট রাশিয়ার "আনটিল মানডে"।

ভারতীয় চিত্র "মেঘ ও রৌদ্র"-র জন্য চিত্র-পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। ছবিটি রুশ নারী সমিতি (সোভিয়েট কমিটি অব উইমেন) কর্তৃক পুরস্কৃত। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ-ছবি প্রেরণা দেবে—এই কথা বলা হয়েছে পুরস্কার প্রসঙ্গে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

গুরু বাগচী পরিচালিত 'তীরভূমি' ছবির মুক্তি আগামী সপ্তাহে—একটি দৃশ্যে মঞ্জু দে ও বিকাশ রায়

আঁধার সূর্য

নায়ক যদিও উপনিষদের সত্যকামের মতই বলতে চেয়েছে—আমি শুধু আমার মায়েরই ছেলে, না-ই বা রইল পিতৃপরিচয়—কাহিনীকার কিন্তু তাকে একালের কর্ণ বা সত্যকাম রূপে উপস্থিত করতে ভরসা পাননি। আসলে অপরিণীতার পুত্র নয় "আঁধার সূর্য"-র (সুধীর মুখার্জি প্রোডাকশন্স) নায়ক শঙ্কর—একথা একটু বাদেই দর্শককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবাঞ্ছিত অবৈধ বলে জন্মের পরমুহূর্তেই সন্তানটিকে অভিভাবক (গর্ভধারিণীর পিতা) নার্সের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—নিয়ে যাও একে, ইচ্ছা হলে আবর্জনার মত ফেলে দিতেও পার।

নার্স অপর্ণা নবজাতককে ডাস্টবিন-এ ফেলতে পারেনি, নিজের সন্তানের মত তাকে মানুষ করেছে। সিনেমার নিয়ম অনুযায়ী শঙ্কর য়ুনিভার্সিটির সেরা ছাত্র হয়েছে, সুগায়ক হয়েছে এবং অধ্যাপকের (যার অধীনে সে রিসার্চ করে) কন্যার (সুরমা) প্রেমে পড়েছে। তার জন্মরহস্য নিয়ে নাটক সৃষ্টি শেষ অধ্যায়ে—তখন সে তার পিতার সঙ্গে মিলিত। তার মা তো তাকে জন্ম দিয়েই মারা গেছেন।

কাহিনীকার—চিত্রনাট্যকার গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুকে মিছে দোষ দেব না। সিনেমার কাহিনীতে যে-সব উপকরণ ও ফরমুলা দর্শকের কাম্য তিনি সযত্নে সেগুলিই আবার ঢেলে সাজিয়েছেন। নায়কের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে, এবং আর এক দিকে নার্স অপর্ণার জীবনের ঘটনা কেন্দ্র করে আলাদা নাটকীয়তাও তিনি ছবিতে রেখেছেন। সব মিলে "আঁধার সূর্য" আশানুরূপ নাট্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ কী? শিথিল চিত্রনাট্য? না শিথিল বিন্যাস? চিত্রনাট্যে কিন্তু অবান্তর ঘটনা কম। যতখানি কাহিনী প্রায় ততখানি ঘটনা। প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় নাটকের মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে আগাগোড়াই সজাগ ছিলেন, দর্শক কী-ভাবে আমোদিত হতে পারেন সে-বিষয়েও তিনি ভেবেছেন। শঙ্কর-সুরমার মনে অনুরাগের কলি ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলেছে, যদিও তা খুবই পরিচিত ছকে। এবং প্রেমিকের কলঙ্কিত জন্মপরিচয়ের কথা জেনেও সুরমা ঘর ছেড়ে তার কাছেই ছুটে এসেছে। ক্লাইম্যাক্সে প্রেমিকার এই গৃহত্যাগ ও অভিসার সিনেমার অতি পুরনো বস্তু হলেও দর্শকের তা মন্দ লাগল না। অর্থাৎ দর্শকের ভাল লাগার মত অনেক পরিস্থিতি তৈরির কাজে পরিচালক নিশ্চয়ই সফল।

তবে প্রথমদিকে শিশুটিকে নিয়ে চিত্রনাট্যের অতিরিক্ত বিস্তার ক্লান্তিকর। সে অংশ একটু আগেই মুক্ত হতে পারত। আর সেই মন্দিরের পাগল সাধকের (সে আবার কালীর সঙ্গে কথা বলে) বিরক্তিকর ব্যাপারটি কি বাদ দেওয়া যেত না?

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষমতা যতই থাকুক, কাহিনীর মধ্যে তাঁরা কী-ই বা করতে পারেন। তবু এরই মধ্যে দীপ্তি রায় (অপর্ণা) অনেকদিন পর একটি বড় ভূমিকায় তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন।

রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা রূপে মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও রিণা ঘোষকে দর্শকরা খুশিমনে নেবেন। সিনেমার রোমান্টিক প্রেমের নিয়ম-কানুন তাঁরা বেশ ভালভাবেই পালন করেছেন। মাতৃভক্ত শঙ্কর, প্রেমিক শঙ্কর, যন্ত্রণায় জর্জরিত শঙ্কর—সব রূপেই মৃণাল মুখোপাধ্যায় চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা দেখিয়েছেন। রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে রিণা ঘোষ আজকালকার সঙ্গে প্রেমের ললিতকলা ও আবেগ সুন্দরভাবেই প্রকাশ করেছেন।

অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় ছায়া দেবী, কমল মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায় নিজেদের ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। অবাক করে দেন তরুণকুমার—একটি ছোট ভূমিকায় অল্পক্ষণের জন্য এসে দর্শককে দেখিয়ে দিলেন অভিনয় কী বস্তু।

ছবির গানগুলি সত্যি শোনবার মত। সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। সুররচনা সুকল্পিত ও পরিবেশানুগ, যেমন বৃষ্টির সময়কার গান। শ্যামল মিত্র গাওয়া "রাত নিঝুম" গানটি (দুবার আছে) আরও কয়েকবার শোনালেও দর্শকের ক্লান্তি আসত না।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

বুদ্ধদেব বসুর অসামান্য নাটক "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" আকাশ-বাণীতে অভিনীত

হয়েছিল কিছুকাল আগে। প্রথম মঞ্চস্থ হল গত ২০ জুলাই, কলামন্দিরে।

পুরাণের খণ্ডাংশ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই নাটক পাঠকমহলে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, তেমনি "তপস্বী ও তরঙ্গিণী"র নাট্যাভিনয় সম্পর্কে দর্শকদেরও কৌতূহল জাগবার কথা। কবিতাভবনের প্রযোজনায় এবং প্রতিভা বসুর পরিচালনা ও সুর-সংযোগে এই নাটকের আরও কয়েকটি অভিনয় অচিরেই মঞ্চস্থ হবে। নাটকের প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী : দেবপ্রসাদ সিংহ ও মীনাক্ষী দত্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান

"আজকাল বহু অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা নাটক অভিনয় করছেন। এই ধরনের ক্লাব ঠিক অ্যামেচার নাট্যগোষ্ঠীর মত নয়। রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলির এই নাট্যচর্চা আধুনিক নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে আন্দোলন না হলেও একটি আলাদা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। এ-যেন এক পৃথক জগৎ—পেশাদার অভিনয়-জগৎ কিংবা একালের নবনাট্য আন্দোলনের পাশাপাশি এই অনুশীলন চলছে। সামগ্রিক নাট্য-আন্দোলনে তাই রিক্রিয়েশন ক্লাবের দানও কম নয়।"

গত ২৪ জুলাই স্টার রঙ্গমঞ্চে আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের তৃতীয় নিবেদন "দুই পুরুষ" নাটকাভিনয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। শ্রী ঘোষ আরও বললেন :

"আনন্দ পাওয়াটাও কম কথা নয়। বছরে একটি দিনে এই অভিনয়-বাসরের মধ্য দিয়ে সারা বছরের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসূচীকে যেন রঙিন করে তোলা। এর মূল্যও কম নয়। তার চেয়েও বড় কথা, এই ধরনের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আমরা, সহকর্মীরা, পরস্পরের আরও কাছে আসি; এরই মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সহযোগিতা, একতা। এইখানেই 'রিক্রিয়েশন' ক্লাবের অনুষ্ঠানের আত্মিক মূল্য—একে যেন আমরা কম হতে না দিই।"

অনুষ্ঠান সূচিত হয় সুগায়ক শ্রীচিন্তাপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি" রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। শ্রীবিদ্যুৎ ভট্টাচার্য সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীগোপাল চক্রবর্তী।

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ "দুই পুরুষ" নাটকটি মঞ্চস্থ করে শুধু যে নিজেরাই আনন্দ পেয়েছেন তা নয়, অফুরন্ত আনন্দ দিতে পেরেছেন দর্শকদেরও। বিশেষ করে অমরেশ ভট্টাচার্য (নুটবিহারী), অমরনাথ ঘোষ (মহাভারত), কৃষ্ণকুমার ঘোষ (সুশোভন), অশোককুমার দাশগুপ্ত (শিবনারায়ণ), অমিতাভ দাশগুপ্ত (দেবনারায়ণ) এবং সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় খুবই ভাল অভিনয় করেছেন। স্ত্রী-চরিত্রে সবিতা মুখোপাধ্যায়ের বিমলা এবং মমতা চট্টোপাধ্যায়ের কল্যাণী রীতিমত উচ্চাঙ্গের। সাতু ঠাকরুণের ভূমিকায় লীলাবতী (করালী), শ্যামার ভূমিকায় সন্ধ্যা সর্বজ্ঞ এবং মমতার ভূমিকায় প্রতিমা পালের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন শম্ভুলাল বসু, সুশীলকুমার দাস, মুকুন্দ মাইতি, অনাদি মহাপাত্র, অমরেন্দ্রনাথ সেন, সুধীরচন্দ্র মাইতি, রমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সমগ্রভাবে নাটকটির সাফল্যের জন্য পরিচালক শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্য প্রশংসা পাবেন।

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী ফিরে এসেছেন। গুটি কতক প্রশ্ন নিয়ে রবিবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী অরুন্ধতী বললেন, 'কালই ফিরেছি। রাত দুটোর শুয়েছি। বড্ড ক্লান্ত। উৎসব অভিজ্ঞতার কথা আজই গুছিয়ে বলতে পারব না।'

কিউবা, ইটালী ও রাশিয়ার স্বর্ণপদক পাওয়া ছবি 'লুসিয়া', 'সেরাফিনা' ও 'আনটিল মানডে' নিয়ে কথা উঠল। শ্রীমতী অরুন্ধতী বললেন, 'লুসিয়া দেখা হয়ে ওঠেনি। সেদিন আমাদের একটা পার্টি ছিল। সেরাফিনা ও আনটিল মানডে আমি দেখেছি। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।"

তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমেরিকান দুটি ছবি—'ওলিভার' ও '২০০১-এ স্পেস ওডিসি'।

অরুন্ধতী পরিচালিত 'মেঘ ও রৌদ্র' নিয়ে কথা উঠল। উৎসবে সোভিয়েট নারী সমিতি (সোভিয়েট কমিটি অফ উইমেন) ছবিটিকে পুরস্কৃত করেছেন। "কী ধরনের পুরস্কার এটি?" জিজ্ঞাসা করলাম। অরুন্ধতী বললেন, "সম্মানজনক তো বটেই। এই নারী সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ। সমিতি প্রতিবারেই মস্কো উৎসবের একটি ভালো ছবিকে এই পুরস্কারটি দিয়ে থাকেন। একটি ডিপ্লোমা। এ বছর 'মেঘ ও রৌদ্র'র ভাগ্যে তা জুটল।"

উৎসবে এ বছর নানা দেশের তারকার সমাবেশ ঘটেছিল। ভারতের দেব আনন্দ তো জুরীদের মধ্যেই একজন ছিলেন। তাছাড়া বৈজয়ন্তীমালা ছিলেন, সরোজা দেবী ছিলেন, পাকিস্তান থেকে শামিম আরাও হাজির ছিলেন। আর ছিলেন সোফিয়া লরেন। "সোফিয়াকে 'মিট' করলেন?" জিজ্ঞাসা করলাম। অরুন্ধতী অনুচ্চহাসের সঙ্গে বললেন "হ্যাঁ, তবে মেনশন্ করবার মত কোন কথাবার্তা হয়নি আমাদের মধ্যে।"

ভারতের ছবি বলতে রাশিয়ানরা বোম্বাই ছবিই বোঝে, অরুন্ধতী জানালেন সেকথা। কারণ, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেখানে শুধু হিন্দী ছবিই চলে। বাংলা ছবি একেবারেই না।

—বিচক্ষু

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

সেবার নাট্যভারতীতে মেক্-আপের টেবিলে মাথা গুঁজে জহর গাঙ্গুলির সে কি কান্না। কান্নার হেতু জানতে ডাক পড়ল তুলসী চক্রবর্তীর। তিনি দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। ভাবলেন, নিশ্চয়ই বিরাট কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় কণ্ঠস্বর কতটা কোমল করতে হবে, কতটা সহানুভূতি মাখাতে হবে, সেটা ঠিক করে নিলেন।

তারপর কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে খুব মোলায়েম সুরে ডাকলেন, "সুলাল— এই সুলাল।"

কান্নার ফোঁস-ফাঁস ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

এবারে গলাটা একটু চড়ালেন তুলসীবাবু। বললেন, "কী হয়েছে বলবি তো! তা নয়, তখন থেকে কেবল কেঁদেই ভাসাচ্ছে। বলি, কেউ মারা গেল নাকি রে, অ্যাঁ?"

হিরণ্ময় সেন পরিচালিত তীর্থভারতীর "বালক গদাধর" চিত্রে চুমকী : ছবিটি অবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে

এতক্ষণে মুখ তুললেন জহর গাঙ্গুলি। চোখের জলে দু-গাল ভেসে যাচ্ছে। তুলসী চক্রবর্তীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে বললেন, "এর চেয়ে মরাই যে ভাল ছিল তুলসীদা! মোহনবাগানের গো-হারান হারাটা অহলে চোখের সামনে দেখতে হতো না!"

এই ব্যাপার! হায় ভগবান!

দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যয় না করে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে-যার মেকআপ নিতে।

তুলসী চক্রবর্তী একটু রাগত স্বরেই বললেন, "এরই জন্যে এত কান্না! তোর কি ভীমরতি ধরেছে রে সুলাল!"

তুলসীবাবু বুঝলেন জহর গাঙ্গুলির মনের ব্যথা। বুঝলেন, মোহনবাগান জহর গাঙ্গুলির কী এবং কতটা। তাই সান্ত্বনার সুরে বললেন, "যাক গে, ভুলে যা ওসব কথা। ফার্সটো না হয় হতে পারেনি, কিন্তু সেকেণ্ড তো হয়েছে। ফেল তো আর করেনি। তা হলেই হলো। এখন নে দিকি, চটপট মেকাপ নিয়ে নে। ড্রপ ওঠার সময় হয়ে গেছে।"

ঠিক সময়ে ড্রপটি তোলা যাবে কি না, অথবা সেদিন টিকিটের দাম ফেরৎ দিতে হবে কি না—এ ভাবনায় প্রায়শই ভুগতে হতো স্টেজ-মালিকদের। তবে তা একটি দিন—ওই মোহনবাগানের খেলার দিনই। জহর গাঙ্গুলি তখন থিয়েটারের টপ-ক্লাস আর্টিস্টদের একজন।

পরবর্তীকালে জহর গাঙ্গুলি মোহনবাগান ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের একজন হয়েছেন, হকি-সেক্রেটারি হয়েছেন, কিন্তু ছেলেমানুষি ব্যাপার-স্যাপারগুলি ছাড়তে পারেন নি। মোহনবাগান গোল দিলে ছেলে-মানুষের মতই নাচতে শুরু করে দিতেন। ঠিক একটি সাধারণ মানুষের মতই। চলচ্চিত্রের অথবা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁরা জহর গাঙ্গুলিকে কতটা বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন জানি না, তবে তিনি নিশ্চয় বেঁচে থাকবেন ঐসব সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে।

সেদিন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উত্তম-কুমারও তাই বললেন। বললেন, "কোন চরিত্রে হয়তো আমি আমার নিজের মত করেই অভিনয় করলাম, পরে পর্দায় দেখলাম সুলালদার ছাপ সে চরিত্রে স্পষ্ট। অবচেতন মনে কোথায় যেন সুলালদা বেশ একটা ছাপ রেখে গেছেন—যেটা মুছে ফেলা মোটেই সহজ নয়।"

সহজ নয় বলেই ঘুরে-ফিরে কত কথা মনে পড়ছে ওই জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে। মনে পড়ছে, একটি সকাল থেকে আর একটি সকালে পৌঁছবার জন্য কত না কৃচ্ছ্রসাধন। মনে পড়ছে একটি অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে আর এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় উপনীত হবার জন্য কী নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ।

কিন্তু সে-কথা আজ থাক। আজ শুধু দু-ফোঁটা চোখের জলেই জহর গাঙ্গুলির স্মৃতিপূজা করতে চাই। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি!

সমাপ্ত

—বসুদেব

বোম্বাই বিচিত্রা

সাংবাদিক, লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা খাজা আহমেদ আব্বাস বর্তমানে সাত হিন্দুস্থানী নামে একটি ছবি করছেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরা স্টেজ এবং চলচ্চিত্রের সাতজন অভিনেতাকে নিয়ে গোয়ায় তাঁর কাজ চলছে। এবং ছবির আগে তিনি একটি ছবি করেছিলেন, নাম ছিল "বোম্বাই রাত কী বাহোঁ মে." সেই ছবিতে আব্বাস সাহেব দিল্লির মঞ্চ এবং টেলিভিশন অভিনেতা বিমল আহুজাকে নিয়ে এসেছিলেন। "বোম্বাই রাত কী বাহোঁ মে'তে কাজ করার পর উল্লেখযোগ্য কোন চরিত্র হাতে তুলে নি

বিমল আহ্‌জার। যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করেছেন উনি বোম্বাই বাজারে, কিন্তু তেমন কিছু উৎসাহ পাননি কারো কাছ থেকে। তবু ভেঙে পড়েননি বিমল। আব্বাসের ছবির কাজ করতে এসে বিমল বম্বের চটকদার হোটেলে থেকেছেন, গাড়ি করে ঘুরে বেড়িয়েছেন (সম্ভবত নিজের পয়সায়) বম্বের গ্ল্যামার রাজ্যে একটু ঠাঁই করে নিতে, কিন্তু কালক্রমে আবিষ্কার করেছেন নিষ্ঠুর প্রাণ-ব্যবসায়ী বোম্বাইকে, বুঝেছেন ব্যবসায়ী বোম্বাই বণিকতা কার হাতে হাত রাখে! সেই বোধের হাত ধরে বিমল আহ্‌জা আরো কয়েকজনের হাতে হাত রেখে মাত্র সাড়ে ষোল দিনে একটি ন' হাজার (৯০০০) ফিটের ছবি শেষ করে ফেলেছে। কয়েকদিন হোল। একমাত্র দুঃখ এই যে, ছবিটি হিন্দীতে নয়, ইংরেজিতে! যদিও ছবির ঘটনা একটি নামকরা হিন্দী নাটকের থেকে নেওয়া। নাটকটির নাম 'হত্যা এক আকার কী'। ইংরেজিতে নাম হয়েছে "এ্যাট ফাইভ পাস্ট ফাইভ।" মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকে কেন্দ্র করে এ নাটক। একটি মাত্র সেট। মাত্র চারটি চরিত্র। গান্ধী হত্যার পেছনে যে ষড়যন্ত্র, এবং সেই ষড়যন্ত্রের পেছনে যে মানসিকতা তারই বাক্য বিন্যাস এই চিত্র-নাটকে। নাটকটিকে হিন্দী থেকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেছেন জুল ভেলানি। সেই সঙ্গে একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। বাকি তিনটি চরিত্রের অভিনেতা ডেভিড, ইফতেকার এবং

কুমার বাসুদেব পরিচালিত এক্সপেরিমেন্টাল ছবি "অ্যাট ফাইভ পাস্ট ফাইভ": ডেভিড ও জুল ভেলানি

প্রযোজক অভিনেতা বিমল আহ্‌জা নিজে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা এক উৎসাহী যুবক। নাম কুমার বাসুদেব। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন কমল বোস। সম্পাদনা করছেন অমিত বোস, সঙ্গীত নির্দেশনা বসন্ত দেশাই-এর। বোম্বাই-এ তৈরী এই ছবিটি ইংরেজিতে করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারের আলোকধন্য হতে হয়ত খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু হিন্দীতে বানালে হয়ত ছবিটি রিলিজ-ই হোত না। এবং প্রকৃতপক্ষে সেই ভয়ই ছবিটিকে হিন্দী হতে দিল না।

সরল শর্মা

ফরাসী চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল সংবর্ধিত

ভারত সরকারের উদ্যোগে দিল্লিতে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় হবে ১৫ আগস্ট। উৎসব উপলক্ষে ফরাসী চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল ভারতে এসেছেন—এঁদের মধ্যে আছেন একজন চিত্রপরিচালক (জাঁ দ্যানিয়েল সিম) এবং একজন অভিনেত্রী (শ্রীমতী দ্যারিয়েল)। গত সপ্তাহে তাঁরা কলকাতা-সফরে এসেছিলেন। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গত ২১ জুলাই গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীতপন সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেন্ট্রাল—ক্যালকাটা, জাপান দূতাবাসে এবং ইন্দো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন-এর যুগ্ম উদ্যোগে কলকাতায় ওজু ও কুরোসাওয়ার চিত্র সহ কয়েকটি সমকালীন জাপানী ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। অপেরা সিনেমায় ১ থেকে ৭ আগস্ট উৎসব চলবে।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

২/৪
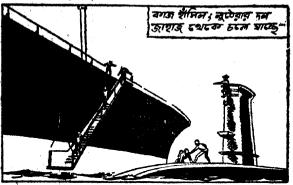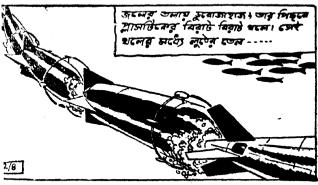
দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে দু' দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমায় চাকালিয়া থানার কাঁকি গ্রামে ২২ জুলাই দাঙ্গা এবং পুলিসের গুলিতে ৯জন নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এই গ্রামে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও সশস্ত্র জনতার আক্রমণ ঘটে। এ দাঙ্গায় উভয় দলের পক্ষ থেকে তীর-ধনুক, বল্লম ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়। দু' শতাধিক বাড়ি ও দোকান লুণ্ঠিত হয়। অগ্নি সংযোগের ফলে ২৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৪০।৪৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে ৭২ ঘণ্টার জন্য কারফ্যু জারি এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক বিবৃতিতে বলেন : দাঙ্গার আগের দিন রাত্রে কাঁকি গ্রামের কিছু লোক স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীশ্যামলাল কেডিয়ার কাছে ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই ক্ষতিপূরণ দাবির কারণ : এই ব্যক্তির এক ভাই কিছু দিন আগে স্থানীয় এক মহিলাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন। এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। কেডিয়াকে সমর্থন জানান শ্রীকনক রায় নামক জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক এবং আরও কিছু স্থানীয় লোক। এইভাবে গ্রামে দুটি পরস্পর বিরোধী দল গড়ে ওঠে। দু' দলে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দু'জন নিহত হওয়ার পরেই সম্ভবত ঘটনাটি সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে ত্রাণকার্য চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনটি রিলিফ সেণ্টার খুলে খাদ্যশস্য এবং তাঁবু ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। তিনজন মন্ত্রীও সেখানে গিয়েছেন। বিচারমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল জানান—এ দাঙ্গার পেছনে এমন কতকগুলি সিরিয়াস ব্যাপার আছে যা মন্ত্রিসভার গোপন বৈঠকে রিপোর্ট করা হবে।

দেশী সংবাদ

২১ জুলাই—শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় বলেন : আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়ে তাঁর পক্ষে বর্তমান মন্ত্রিসভায় আর কাজ করা সম্ভব ছিল না। প্রধানমন্ত্রীও এক বিবৃতিতে জানান, শ্রীদেশাইর হাত থেকে কেন অর্থ দফতর বদল করতে হলো। শ্রীমতী গান্ধী এটাকে শুধু অর্থ দফতর বদলের প্রশ্ন বলেই বিবেচনা করেছিলেন।

সংসদের অধিবেশন বসার ঠিক দুদিন আগে সরকার কেন ১৪টি প্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করলেন প্রধানমন্ত্রী আজ লোকসভায় তা বিশ্লেষণ করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, জনস্বার্থবিরোধী কোনরকম উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্য হঠাৎ কিছু করা দরকার এবং অর্ডিন্যান্স ছাড়া তা সম্ভব নয়।

২২ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপ বিলটি আজ রাজ্যসভায় অনুমোদিত হয়। লোকসভায় আগেই হয়েছে। সব দলের সদস্যরাই বিলটি সমর্থন করেন। ২৬ জুলাই থেকে বিলোপ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা।

ইন্দিরা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বি কে ডি, স্বতন্ত্র পার্টি এবং জনসঙ্ঘ অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সি পি আই (এম) ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ নেবেন। ওই দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরায়া আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এই নীতি ঘোষণা করেন।

২৩ জুলাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ডগলাস কোম্পানীর জনৈক প্রতিনিধি নাকি ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইনস কর্তৃক ডি সি-৯ বিমান ক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ১৫ হাজার ডলার (১,১২,৫০০ টাকা) ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করে ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইনস-এর জনৈক অফিসারের কাছে এক পত্র দিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আজ রাজ্যসভায় খুবই হইচই হয়।

২৪ জুলাই—জনসঙ্ঘ সদস্য শ্রীবলরাজ মধোক কমিউনিসট দলগুলিকে "রাশিয়া ও চীনের দল" এবং তারা দেশকে শাসনের শৃঙ্খলে

শৃঙ্খলিত করতে চান বলে মন্তব্য করলে লোকসভায় আজ তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে হট্টগোল চলে। এই মন্তব্যে কমিউনিসট সদস্যগণ তীব্র আপত্তি জানান এবং শ্রীমাধোককে তাঁরা ওই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বলেন।

ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে বিরোধের সালিশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের জন্য পাক প্রস্তাব ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ ফরাক্কা এবং অপরাপর পূর্বাঞ্চলের নদী পরিকল্পনা নিয়ে সচিব পর্যায়ে ভারত-পাক আলোচনায় এই দাবি করা হয় বলে জানা যায়।

২৫ জুলাই—আজ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে লোকসভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীকরণের বিল উত্থাপিত হয়। স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘ সদস্যরা একযোগে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিলটি উঠতে দিতে বাধা দেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ২৬০—৪৬ ভোটে বিলটি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও এই বিল আনার পক্ষে ভোট দেন। গতকাল কংগ্রেসের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও দলের বহু নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং কোন কোন মন্ত্রী আজ সভাকক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন।

২৬ জুলাই—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র আজ রিটার্নিং অফিসার পরীক্ষার পর বাতিল করেন। পনেরজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই ১৫ জনের মধ্যে আছেন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, শ্রী ভি ভি গিরি এবং শ্রী সি ডি দেশমুখ। আগামী ১৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

২৭ জুলাই—শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমা থানায় মধুসূদনপুর গ্রামে একদল জোতদার ও কৃষকদের একটি বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যে সংঘর্ষে জোতদারদের গুলিতে ২ জন কৃষক নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। অধিক রাত্রে আলিপুর জেলা পুলিস দফতরে যোগাযোগ করে কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি।

তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে শ্রী টি এস সদালক্ষ্মীর পৌরোহিত্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় স্থির করেছেন যে, আগামী শুক্রবার থেকে হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ এবং তেলেঙ্গানার অন্যান্য অঞ্চলে পুন সত্যাগ্রহ পুনরায় শুরু করা হবে।

বিদেশী সংবাদ

২১ জুলাই—চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন পা দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নিকসন মর্তের মাটি থেকে সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার পর আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে তা একটি থলের রাখেন।

২২ জুলাই—নভোচারদের নিয়ে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান মর্তের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। ওদিকে জডরেল ব্যাঙ্কের মতে ঘণ্টায় তিনশত মাইল বেগে লুনা-১৫ চাঁদের বুকে গিয়ে আছড়ে পড়ে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সোভিয়েট ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে আভাষ দেওয়া হয়েছে যে, লুনা আর পৃথিবীতে ফিরে আসছে না।

২৩ জুলাই—যুবরাজ জুয়ান কারলোস আজ রাত্রে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। পারলামেন্টের ডেপুটিরা ওই সময় হর্ষধ্বনি করেন। জেনারেল ফ্র্যাংকো প্রশান্তচিত্তে অনুষ্ঠান দেখেন।

২৪ জুলাই—চন্দ্রচারীরা চাঁদে যে সিসমোমিটার যন্ত্রটি রেখে এসেছেন, সেটি মঙ্গলবার রাত্রি ১-৫০ মিনিটে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে, সবেমাত্র চাঁদে একটি ভূমিকম্প হয়ে গেল। ইতিপূর্বে চাঁদের কোন ভূমিকম্প পৃথিবীতে রেকর্ড করা সম্ভবপর ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

২৫ জুলাই—মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে চন্দ্র জয় করে তিন মহাকাশচারী আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন একেবারে নির্দিষ্ট লগ্নে, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০-১৯ মিঃ-এ (ভারতীয় সময়) মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে। নভোচারীরা চন্দ্র থেকে কোন অদৃশ্য ও অজানা জীবাণু বহন করে এনেছেন কিনা তা দেখার জন্য তাঁরা এখন কোয়ারান্টাইনে আছেন।

২৬ জুলাই—নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা আজ ম্যানিলায় ফিলিপিন সফরে আগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রাণ নাশের এক চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন এবং বন্দুকের লড়াই-এ তাঁরা একজন কমিউনিসট চরকে হত্যা করেন।

২৭ জুলাই—হিউস্টনের চন্দ্র গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন—চাঁদের মাটি ও পাথরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। চাঁদের পাথরগুলির প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করে মহাকাশ কেন্দ্রের ভূতত্ত্ববিদ ডঃ কিং এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন—আমরা আগে যেমনটি অনুমান করেছিলাম, চাঁদ তত সহজে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে বলে মনে হচ্ছে না।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

সুরেশচন্দ্র—	...	২২১
পরীক্ষা ও পরীক্ষক—	...	২২১
ব্যঙ্গচিত্র—	...	২২২
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	২২৩
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	২২৪
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	২২৬
সুনন্দর জার্নাল—	...	২২৭
জমেছে নতুন রঙ্গ (কবিতা)—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	২২৯
সাধ (কবিতা)—শ্রীরমেন আচার্য	...	২২৯
সুখের সন্ধানে—শ্রীশিশির লাহিড়ী	...	২৩১
বর্ষামঙ্গল—ইন্দ্রজিৎ	...	২৩৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	২৩১
রবীন্দ্রনাথের 'কার্বাতকা'—শ্রীশ্যামল পুরকায়স্থ	...	২৪৩
জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৪৫
বার্লিনের চিঠি—শ্রী[illegible] বক্সী	...	২৫১
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—[illegible]	...	২৫৯
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	২৬১
বাংলার চলচ্চিত্র—শ্রীআব্দুল জব্বার	...	২৬৭
তবলা বাদনের ঐতিহ্য ও কণ্ঠে মহারাজ — শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৭৩
আর্থিক ভারত—শ্রী[illegible]	...	২৭৫
হেমচন্দ্র বাগচী—শ্রী[illegible] সিংহরায়	...	২৭৭

৫0 পয়সা লাভ!

ষ্টক থাকা পর্য্যন্ত

প্রতি টিনে বোর্নভিটার পরিমাণ আগের মতনই রয়েছে (৪৫০ গ্রাম নীট)

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য— ক্যাডবেরিস্‌ বোর্নভিটা!

ব্যাঙ্ক, কারখানা আর গুদামে ব্যবহার হয়—কেন না এটি নির্ভরযোগ্য।
সূক্ষ্ম এর কারিগরী, প্রতিটি তালা'র জন্যে আলাদা আলাদা রকমের চাবী তৈরি হয়, তাছাড়া নব-তাল এমন ভাবে ডিজাইন করা—যাতে, খুলে বা ভেঙে চুরি করা না যায়, তাই নব-তাল দেয় সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা। পেতল আর ইস্পাতের ডবল খাপ থাকে ব'লে এটি দারুণ মজবুত।
এটি তৈরি করছেন গোদরেজ—নিরাপত্তার সরঞ্জাম তৈরি করতে যাদের আছে ৭০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা।

নব-তাল

তিন সাইজে পাবেন :
৫০ মিলিমিটার (৬ লিভার)
৬৭ মিঃ মিঃ (৭ লিভার)
৮৫ মিঃ মিঃ (৮ লিভার)

Godrej গোদরেজ সবসময় অ্যাঙ্কর ব্র্যাণ্ড চাইবেন

জবাকুসুম
কেশ তৈল

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪২
শনিবার ৩১ শ্রাবণ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২০-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষান্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক " ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৫০.০০
ষান্মাসিক " ... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৪২.০০
ষান্মাসিক " ... ২১.০০
ত্রৈমাসিক " ... ১১.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩১.০০
ষান্মাসিক ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 16 Aug., 1969

সুরেশচন্দ্র

গত ছাব্বিশে শ্রাবণ (বারোই আগস্ট) স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার-মহাশয়ের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। সুরেশচন্দ্র ছিলেন আমাদের নিকটজন, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। শুধু মাত্র সে-কারণেই তাঁকে আমরা স্মরণ করি এমন নয়, বাংলা দেশের বিশেষ একটি যুগের অন্যতম প্রতিভূ হিসেবেও স্মরণ করি। বাংলা দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসেও যেমন তিনি অগ্রণীদের অন্যতম, তেমনই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক হিসেবে, বিপ্লবী বাংলার কর্মযজ্ঞের কর্মী হিসেবেও তিনি নমস্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যথার্থ আদর্শবাদী, কর্মী-পুরুষ। বাংলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর একটি ভূমিকা ছিল প্রচ্ছন্নে। তবু সংবাদপত্র মারফতই তিনি দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর পরলোকগমনের স্মৃতি আমাদের ব্যথিত করে। সশ্রদ্ধ চিত্তে আজ তাঁকে স্মরণ করি।

পরীক্ষা ও পরীক্ষক

কয়েকদিন আগে জনৈক অধ্যাপক ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে একটি চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। চিঠিটি পড়ার পর বোঝা যায়, আজকাল পরীক্ষার খাতা দেখার রীতিটি মোটামুটি কী ধরনের। পত্রলেখক জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত কোনো এক পরীক্ষককে ট্রেনের কামরার ভিড়ে অল্প সময়ের মধ্যে গুটি চারেক খাতা দেখা শেষ করে গন্তব্য স্থানে নেমে যেতে দেখে তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই খাতাগুলি কলেজের মামুলি পরীক্ষার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার (বি এস-সি, নতুন, পার্ট টু)। ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছেন বলে পত্রলেখক যতটা ক্ষুব্ধ অতটা ক্ষুব্ধ হবার কারণ বোধ হয় নেই। কারণ পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে এও এক বড় কৃতিত্ব। রেল কামরায় প্রচণ্ড ভিড়ে, জনতার কোলাহলের মধ্যে, চোখের সামনে, ঠিক পঁচিশ মিনিটে চারটি পরীক্ষার খাতা যিনি দেখতে পারেন তিনিই তো যথার্থ পরীক্ষক। এই তৎপর পরীক্ষক ভদ্রলোক স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করেন না, হাত থেকে সময় পালিয়ে যেতে দেন না, পরীক্ষার গোপনীয়তা স্বীকার করেন না। সক্ষম ও কর্মতৎপর পরীক্ষক হিসেবে এঁর জন্যে বারান্তরে আরও বহু খাতা আসা উচিত। ইনি নমস্য পরীক্ষক, আদর্শ পরীক্ষক।

শোনা যায়, আজকাল পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারটা মোটামুটি এই নীতি ধরেই চলছে। স্কুল ফাইন্যাল হোক, হায়ার সেকেণ্ডারী হোক—বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই হোক—পরীক্ষার্থীর চাপে পরীক্ষকের যোগ্যতা বিচারের অবকাশ নেই, প্রয়োজন নেই। কোনো রকমে যে-যোগ্যতাটুকু কাগজেপত্রে থাকা দরকার সেটুকু থাকলেই তাঁর পরীক্ষক হবার যোগ্যতা দাঁড়িয়ে যায়। এঁরা কী দেখেন, আদৌ নিজে উত্তরপত্র দেখেন, না বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অন্যকে দিয়ে দেখিয়ে নেন তাই বা কে জানছে! কে দেখছে, এঁরা শ দুই খাতা পাঁচ দিনে না সাত দিনে দেখে ফেলছেন! ঝোঁকার মুখের মতো খাতার একটা মোট নামিয়ে দিতে পারলে আরও দু'পয়সা কিছু পাওয়া যায়। সেটাও তো লাভের অঙ্ক। কর্মপটু বলে প্রশংসাও কুড়ানো যায়।

পরীক্ষার কেলেঙ্কারি যত পরীক্ষার খাতা দেখার কেলেঙ্কারিও তত। হারানো খাতাতেও নম্বর দেওয়া হয়—এসব খবরও তো আমরা শুনেছি। এমনও শুনেছি, ফল বেরোবার দশ পনেরো দিন আগে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ সাত দিনে হায়ার সেকেণ্ডারীর বিজ্ঞানের একটি বিষয়ের শ' দেড়েক খাতা দেখে দেবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো কোনো বিচক্ষণ হেড্ এগজামিনার সঙ্কোচে স্বীকার করেন, তাঁদের অধীনে যাঁরা খাতা দেখছেন তার মধ্যে দু চারজন ছাড়া অন্য পরীক্ষকরা একেবারেই অযোগ্য। বলাতে বাধা নেই, এঁদের অযোগ্যতার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা পর্ষদের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় ছাত্রদের। পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে বহু ছাত্রছাত্রীর (যারা সত্যিই লেখাপড়া করে) অভিযোগ হামেশা আমরা শুনতে পাই। এবং মনে করি এটা একেবারে অকারণ নয়। অবশ্য পরীক্ষার ব্যাপারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যখন পর্ষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-সম্প্রদায় তখন ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় নম্বর পা[illegible]টা ভাগ্যের ব্যাপার বলেই সান্ত্বনা পেতে হবে, উপায় কি!

পুলিস গার্ড অব অনার!

ত্রয়োবিংশতি বৎসরে আমরা কোন্ পথে?

আরও একটা বছর কেটে গেল। স্বাধীন ভারত বাইশ পেরিয়ে তেইশে পা দিল।

১৯৪৭-এ যাঁরা জন্মেছিলেন এখন তাঁরা পুরোপুরি যুবক। সেদিন যাঁরা যুবক ছিলেন আজ তাঁরা অনেকেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। যাঁরা তখন প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে তাঁদের প্রায় সকলেই এজগত ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

সেদিন ক্ষমতা যাঁদের হাতে এসেছিল এখন তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই বেঁচে আছেন। সেদিন শাসনভার যে দল পেয়েছিলেন এখন তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা যেন যায় যায় করছে। সেদিন যেসব দল টিম টিম করছিল বা যাঁদের অস্তিত্বও ছিল না আজ তাঁরা কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছেন।

১৯৪৭-এর ভারত আর ১৯৬৯-এর ভারতে বিরাট তফাৎ—সে ভারত আর এ ভারতে অনেক পার্থক্য।

কিন্তু এই দীর্ঘ বাইশ বছরে পরিবর্তন এসেছে একটা ধারায়। ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। সেইজন্যই বোধ হয়, ভারতবাসী এই পরিবর্তনের মধ্যে থেকেও তাকে আলাদা করে দেখতে পারেনি। এই

পরিবর্তন সকল ভারতবাসীকেই স্পর্শ করেছে; কিন্তু সে স্পর্শ আচমকা ধাক্কা নয় বলে আমরা অনেকেই বিশেষভাবে সেটা বুঝতে পারিনি। এই পরিবর্তনের হাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে চলতে চলতে আমরা অনেকেই নিজেদের অজান্তেই বাইশ বছর এগিয়ে এসেছি।

বাইশ বছর পেরিয়ে তেইশে পা দিয়েই কিন্তু আমরা একেবারে একটা নতুন জগতে এসে পৌঁছেছি। এমন একটা নতুন জগৎ যেখানে হঠাৎ একটা বড় হাওয়া এসে আমাদের ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কায় আমরা কিছুটা [illegible] এখনও বলা কঠিন। কিন্তু এই ধাক্কা [illegible]

★

আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে অবিচারের প্রশ্ন তুলেছি। আসামীয়ারা বলেছেন, বাঙালীরা বলেছেন, মাদ্রাজীরা বলেছেন, ওড়িয়ারা বলেছেন, বিহারীরা বলেছেন—প্রায় সকলেই অবিচারের অভিযোগ এনেছে। কিন্তু এইসব অভিযোগের মধ্যেও আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও হানাহানি হয়েছে, সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু সেইসব সাময়িক বিচ্ছেদ সম্পর্কে পাকা ছেদ টেনে দিতে পারেনি। এখনও বাংলা ও বিহারের কয়লা, উড়িষ্যার লোহা আকর এবং ম্যাঙ্গানিজ নিয়ে বাঙালী, ওড়িয়া, বিহারী পাঞ্জাবী, মারাঠী, কারিগর রাউরকেলায় ইস্পাত তৈরী করে। এখনও কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি প্রভৃতি শহরে সব প্রদেশের লোক পাশাপাশি বাস করে।

আমাদের দেশে এখনও নানা দল, নানা মত, নানা পথ। [illegible]

কলকাতার বড় ডাকঘরে সম্প্রতি রেল ডাকের থলির মধ্যে একটি বোমা বিদারিত হওয়ায় তেরজন ডাক-তার বিভাগের কর্মী আহত হয়েছেন। সংবাদে মাত্র এইটুকু বিষয়ই উল্লিখিত হয়েছে। যদিও প্রেরক ও প্রাপকের—কারো ঠিকানাই এখনও জানা যায়নি, বিদীর্ণ পারসেলের অণু পরমাণু ঘেঁটে পুলিস ওইসব ঠিকানা কোনও দিনই বের করতে পারবে কি না সন্দেহ, তবু এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বোমা-বাহিত পারসেলটির একটি গন্তব্য ছিল এবং গন্তব্যে পৌঁছুবার একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। 'হ্যান্ডলিং'-এর দোষে পারসেলটি ডাকঘরে বিদীর্ণ হওয়ায় বোমাটি যে স্বকার্যসাধনের জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না, প্রেরকের পক্ষে এর থেকে ক্ষোভ এবং দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে?

এর দ্বারা কি নিঃসংশয়ে এটাও প্রমাণিত হল না যে, পারসেল নাড়াচাড়ার যে-পদ্ধতিটি ডাক ও তার বিভাগ সেই মান্ধাতার আমল থেকে অনুসরণ করে আসছেন, বর্তমান যুগে তা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। ডাক বিভাগের কর্তব্যই হল, ডাক পারসেল ইত্যাদি ঠিক ঠিকানায় অক্ষতভাবে পৌঁছে দেওয়া। বোমা-বাহিত পারসেলটি গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই ডাকঘরে বিদীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ডাক ও তার বিভাগের এবং নীতিগতভাবে এই দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। ডাক ও তার বিভাগ যদি অবিলম্বে তাঁদের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করে বোমার পারসেল ঠিক ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে, এ গ্যারান্টি দিতে না পারেন তবে লোকে ডাকের পারসেলে বোমা বা ওই জাতীয় দ্রব্যাদি পাঠাতে উৎসাহ পাবে কেন?

এবং ডাক ও তার বিভাগের এ কথাটি জেনে রাখা ভাল, পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি বোমা-নির্মাণ শিল্পের প্রায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কুটির শিল্পের পর্যায়ে এর যে শুধু ব্যাপকতাই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, কোনও কোনও শিক্ষায়তনের বীক্ষণাগারে বিজ্ঞানসম্মতভাবেও এর ক্রিয়াশক্তি, ডায়নামাইট ইত্যাদি বৃদ্ধির নানারূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা সফলতা অর্জন করেছে। কিছুদিন আগে মার্কিন কনস্যুলেট ভবন এবং ইউসিস পাঠকেন্দ্রে প্রায় একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে এ-দেশে নির্মিত দুটো টাইম বোমা বিদারিত করে এইসকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার আনুষ্ঠানিক সফলতা ঘোষণা করা হয়।

এই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ যেরকম নাটকীয় হয়ে উঠছে তাতে বোমা-নির্মাণ শিল্পে এখন ভয়ংকর তেজী অবস্থা। যুক্ত ফ্রন্টের চোদ্দটি শরিকের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলি আত্মরক্ষার্থে মজুতের মাত্রাই যে বাড়িয়ে চলেছেন তাই নয়, বেনামী জমি দখলকালে বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বা ধর্মঘটের সমর্থক ও অসমর্থকদের মধ্যে এইসকল দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষার

প্রয়োজনও হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিচ্ছে। ফলে বোমার বাজার বেশ চড়াই আছে।
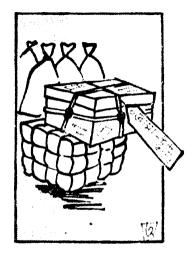
স্বভাবতই অন্যান্য আর পাঁচটা অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মত ডাকযোগে বোমার অর্ডারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং আরও পাবে। অথচ ডাক ও তার বিভাগ এই বিশেষ দ্রব্যটি বিশেষভাবে বহনের জন্য আজ পর্যন্ত কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করেন নি। কেন্দ্রীয় এই সংস্থাটির ব্যর্থতার জন্য ধিক। সাধে কি লোকে কেন্দ্রের উপর চটে।

জনগণের হাতে বন্দুক

ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা মহাবলী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার পুলিসের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন, তাঁরা জনগণের হাতে বন্দুক তুলে দেবেন। এবং যুক্ত ফ্রন্টের কোনও শরিকই আজ পর্যন্ত কমরেড কোঙারের এ উক্তি সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। এমন নয় যে, কমরেড কোঙার কথাটা হঠাৎ একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন, বা ফিসফিস করে কারও কানে কানে বলেছেন। বাংলার মাও এ কথা প্রকাশ্যেই এবং প্রায়ই ঘোষণা করে চলেছেন। বেশ কিছুকাল আগে কলেজ স্ট্রীটে এক শোকসভায় তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যও ছাত্রদের হাতে বন্দুক দেবার সাধু সংকল্প ঘোষণা করেন।

যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের দুজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যখন একই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন এবং অন্যেরা সে কথা শুনে যখন নীরব থাকেন তখন এই নীরবতার মাত্র দুটো অর্থই হয়। (এক) 'পাগলে কী না বলে' গোছের ধারণা করে সেই উক্তিতে কান না দেওয়া, অথবা (দুই) 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' এই নীতিবাক্য অনুসারে তা মেনে নেওয়া। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব এবং তথ্য ও প্রচার—এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যুক্ত ফ্রন্ট যে দুটো পাগলের হাতে তুলে দেননি, সে কথা পাগলেও জানে। তাই এই কথাই ধরে নিতে হয় জনগণের হাতে বন্দুক তুলে দিতে যুক্ত ফ্রন্ট অরাজী নন। তবে এ কাজটি তাঁরা সরকারীভাবে সাধন করছেন না কেন? কেন্দ্র বাধা দেবেন? নকশালেরা ওত পেতে আছেন? কেন্দ্রের মতো রাজনীতি তো নকশালদেরই সমগোত্রীয়। না কি জনগণের হিসাব নিয়ে আবার শরিকে শরিকে নতুন বিবাদের আশঙ্কা?

বন্দুক হাতে না পেয়েও আলিপুরদুয়ারে আর এস পি-র জনগণ বনাম সি পি এম-এর জনগণ, কোচবিহারে সি পি আই-এর জনগণ বনাম ফরোয়ার্ড ব্লকের জনগণ, ইসলামপুরের বীরভূমে ফরোয়ার্ড ব্লকের জনগণ বনাম সি পি এম-এর জনগণ এবং পাথরপ্রতিমায় সি পি এম-এর জনগণকে শিক্ষা দেবার জন্য এস ইউ সি-র জনগণ যে বীভৎস তাণ্ডব দেখালেন, তার ঘা কতদিনে শুকোবে কে জানে। এর উপর আবার বন্দুক হাতে তুলে দিলে তো সোনায় সোহাগা। কেন্দ্রের ভয় কমরেড হরেকৃষ্ণ করেন না। সেখানে, তাঁরা জানেন, সব থেকে বড় গলদই তাঁদের দাঁড় বাঁধা। তবে যে নকশালপন্থীদের মতে "রণদিভে-সুন্দরায়া-জ্যোতি-প্রমোদ চক্রের কেন্দ্রীয় মুখপত্র নিক্সনকে নীরবে ভজনা করছে" সেই নকশালপন্থী জনগণের হাতে বন্দুক গিয়ে পড়ুক, এমন সম্ভাবনা আছে বলেই কমরেড কোঙার এখন শুধু আওয়াজই দিচ্ছেন।

আগে কে বা

কলকাতার পৌরপিতাগণ ধর্মতলা স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে নাম রেখেছেন লেনিন সরণি—সংবাদ। কিন্তু মারক্সের কী হইল?

আজকাল অনেক স্ত্রীর 'কি কবির' গায়ের গন্ধে ভূত পালায় কিন্তু স্বামীরা পালায় না।

গিন্নীরা যখন নস্যি নেন আমাদের অন্নপ্রাশনের অন্ন বের হয়ে আসে

'সুরভি-সমাচার'

"সিংহাসনে বসল রাজা, বাজল কাঁসর-ঘণ্টা,
ছটফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রী-বুড়োর মনটা—"

উদ্ধৃতি ভুল হল কিনা জানি না, ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে লিখছি। কিন্তু উপরকার পংক্তি দিয়ে যে অমর কবিতাটির আরম্ভ সেটি যে অমর সুকুমার রায়ের অমর 'আবোলতাবোল' আলো করে আছে, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই বাহুল্য। কোন্ সুবুদ্ধিপুর তল্লাটের কোনো এক হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী পোশাকে কিছু আতর মেখে সভায় এসেছিলেন, তারপরই বিপর্যয় ব্যাপার! সেনাপতি কোটাল-পাত্র-মিত্র সব থরহরি কম্পমান—রাজা প্রায় রসাতলে যায়-যায়! এই ঘোরতর সমস্যার সমাধান কিভাবে হল, তা আপনারা সকলেই অবগত আছেন—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

আতরের গন্ধে যে এই রকম একটা ঘোরতর পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে, ছেলেবেলায় সেটা সরল চিত্তেই বিশ্বাস করা গিয়েছিল। তারপর বড়ো হয়ে ও-সম্পর্কে আর কোনো দুর্ভাবনা কখনো জাগে নি। কিন্তু সম্প্রতি শিহরিত হতে হল একটি মার্কিনী-বার্তা প্রমুখাৎ।

কোনো মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। কারণ আর কিছুই নয়, স্বামী একটি বিশেষ ধরনের এসেন্স্ ব্যবহার করে থাকেন।

এসেন্সের জন্যে ডিভোর্স? স্বামীর নাক ডাকে বলে ঘুমে ব্যাঘাত হয়, অতএব বিচ্ছেদ; স্বামী অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে চাকরিতে যান আর স্ত্রীকে ভোরবেলাতেই ঠেলে তুলে কাজে পাঠান—একন্যে বিচ্ছেদ, এসব ভালো ভালো কারণ এর আগেই শুনেছি। কিন্তু এসেন্সের জন্যে? সেটা যেমনই হোক—নিশ্চয় 'গারবেজ্-ক্যানে'র নির্গলিত তরলসার নয়, তার একটা চিত্তহারী সৌরভ থাকা স্বাভাবিক।

ভদ্রমহিলার পক্ষে গন্ধটা নাকি নিছক রুচিগতভাবে আপত্তিকর নয়; প্রতিক্রিয়াটি দেখা দেয় একেবারে শারীরিকভাবে, অর্থাৎ তাঁর জ্বর এসে যায়। আমাদের বাংলা মতে 'গায়ে জ্বর আসে' নয়, দস্তুরমতো টেম্পারেচার দেখা দেয়। অতএব প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই তাঁকে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে হয়েছে, তিনি তা পেয়েওছেন। এক্স-পার্টি ডিগ্রী হয়েছে কিনা জানি না, স্বামী সেই 'বিশেষ সুগন্ধিটি' মেখে এসে আদালত গন্ধ-বিধুর করেছেন কিনা খবরে তাও প্রকাশ নেই।

একজন নিতান্তই আটপৌরে বান্ধবিনী নাক কুঁচকে বললেন, 'ওদের আর কী—একটা ছুতো খুঁজছিল, পেলেই হল। যত সব—'

তাঁর বাকী মন্তব্যগুলো নিতান্তই বর্জনীয় এবং আদৌ প্রশংসাব্যঞ্জক নয়। সুতরাং সেগুলো থাক।

বান্ধবিনী ব্যাপারটা এই পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের তদারকিতে চলে গেলেন। মেয়েরা—অন্য মেয়েদের সম্পর্কে—কী বলে বরাবরই একটু ক্রিটিক্যাল্, স্বজাতি সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুরো নির্ভরযোগ্য নয়। তাই পুরুষের শিভাল্‌রি নিয়ে আমি কিঞ্চিৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হতে চাইলুম। মাসের প্রথম দিকে—স্বাভাবিক কারণেই মন প্রসন্ন থাকে, তখন ভালো ভালো জিনিসই আমি ভাবতে চেষ্টা করি।

গন্ধে জ্বর হয়? হতেও পারে—বাংলা দেশের কোনো কোনো ফুলের এ-রকম অপবাদ আছে। কিন্তু তারা তো নিতান্তই বন-বাদাড়ের, তাদের নিয়ে কেউ এসেন্স্ তৈরী করে না। আর মার্কিনীরা নিশ্চয় বাজারে এপিডেমিক এসেন্স্ চালু করবে না।

একটি উত্তর আছে—ডাক্তারি-শাস্ত্রের সেই গোলোকধাঁধা—যার নাম অ্যালার্জি। ও যেন সংস্কৃত শ্লোক মেলাবার সেই 'চবৈতুহি', আর কিছু যখন মেলে না, তখন ওটা বসিয়ে দিলেই হল। জলে, স্থলে, আলোয়, বাতাসে, চিংড়ি মাছে, পুঁই-ডাঁটায়—কোথায় নেই অ্যালার্জি? এই ভদ্রমহিলারও বোধ হয় তাই—কোনো বিশেষ সৌরভেই তাঁর অ্যালার্জি, ফলে জ্বর এবং ডিভোর্স।

সত্যি-মিথ্যে ঠিক জানি না, মহিলাদেরই সুগন্ধি সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণ আছে বলে

বেতো মানুষের চাঁদ সয় না...

জনশ্রুতি। আর জনশ্রুতি সবটাই যে উড়িয়ে দেবার মতো নয়, তার প্রমাণ কোনো অনুষ্ঠানে বেরুবার সময় তাঁদের অধিকাংশেরই সেই যোজনগন্ধারূপ (কোনো কোনো পুরুষও অবশ্য কম যান না, আমার পরিচিত জনৈক তো রুজ-লিপস্টিক পর্যন্ত ব্যবহার করেন শোনা যায়)।

কিন্তু এইখানে একটি কূট-জিজ্ঞাসা মনে জাগল। সুগন্ধটাও কি রিলেটিভ নয়? সানন্দ বারের মতো কমন মানুষের অনুভূতি-গুলোও মোটামুটি কমন, অর্থাৎ জ্যোৎস্না-মাখানা বসন্তের হাওয়াটি মিঠে, গোলাপ ফুলটি দেখতে ভালো, ফুলকো লুচি কিংবা নিতান্ত বাটি-চচ্চড়িও উপাদেয়। কিন্তু যাঁরা আন্‌কমন—অর্থাৎ সাধারণের চাইতে কিছু আলাদা, তাঁরা হয়তো বসন্তের হাওয়ায় চটে যান, গোলাপের গন্ধে তাঁদের গা গোলায়, ফুলকো লুচি দেখলে কেবল মারতে বাকী রাখেন। উত্তরের কনকনে হাওয়া তাঁদের পছন্দসই, গোলাপের চেয়ে তাঁদের মনোহরণ শাঁটকির গন্ধ, লুচি ফেলে হয়তো একটা রসুনই চিবুতে লেগে গেলেন। সেইখানেই তাঁদের বাহাদুরি, তাঁদের ক্যারাকটার, তাঁরা 'পার্সোনালিটি', আমাদের মতো 'মাস' নন।

আমার কোনো আত্মীয়কে মনে পড়ল। ছেলেবেলা থেকেই তার গন্ধরুচি অসাধারণ। কেরোসিন তেলের বোতল দেখলেই খানিক ঢেলে হাতে মাখিয়ে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলত: 'কী চমৎকার গন্ধ রে!' আমরা বলতুম, 'এ রাম রাম, তুই কী!' সে যে কী—মানে কত ডিস্টিংগুইশড, তার প্রমাণ দিলে বড়ো হয়ে। পার্টিশন হওয়ার পরে সবাই যখন পালাবার তাল খুঁজছে, সে উল্টো বর্ডার হয়ে পাকিস্তানে ব্যবসা করতে। এমন চুটিয়ে ব্যবসা করল—যে চোরাকারবারে রপ্তানিকারক তাকে দু-হাতে সেলাম ঠুকতে লাগল। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে পাকিস্তানও তাকে হজম করতে পারে না—ভারতে প্রত্যাবর্তন। কী কারবার চলে এখন কে জানে, একটা কানাকড়িও রোজগার আসতে হল না। সম্প্রতি তার আর কারবারে মন নেই—সে কেন্দ্রীয় সরকারের এক একটি [illegible]

গোয়াবাগানের খাটালে মালিক ও গরু, খোর, পুতিগন্ধ সমেত

বিভাগের চাকুরে। [illegible] হলেই পরম কারুণিক ঈশ্বর [illegible] থাকেন। ওই গোয়ালাদের গন্ধ—তার জয়যাত্রার সূচনা।

শুনেছি সেকালে, কালো মাথায় সুগন্ধি তেলের গন্ধ থাকলেই পণ্ডিত মশাই ক্ষেপে যেতেন। এর মধ্যেই নাকি শূদ্র, কালেজ, ফক্কুড়ি [illegible] কিন্তু কেবল [illegible] করা হয় না। [illegible] সংস্কৃত ব্যাকরণের এমন একটি [illegible] কিন্তু পণ্ডিত মশাই [illegible] নিয়ে [illegible] না, তাঁর দরকার একটি [illegible] এবং—

পণ্ডিতমশাই কি বিলাসিতার হাত থেকে বাঁচাতে চাইতেন আমাদের? কে জানে! আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি আন্-কমন বলেই (নিশ্চয় আন্-কমন, নইলে অমন ভয়ঙ্কর-ভাবে সংস্কৃত-ব্যাকরণ জানা সম্ভব!) এই কমনপ্লেস সৌরভ সইতে পারতেন না। কে জানে, ওই গন্ধে তাঁর অ্যালার্জি জাগত কিনা, অনবরত হাঁচি হাঁপানি দেখা দিত কিনা! এই মার্কিন মহিলাও হয়তো তাঁরই মতো আউটস্ট্যান্ডিং—হয়তো হিথ-গ্রামারে তিনি অথরিটি।

আমিও আউটস্ট্যান্ডিং হওয়ার চেষ্টা করব কিনা ভাবতে ভাবতে—উঃস, বাইরে বর্ষায় পচা আবর্জনার গন্ধ! জানালাটা বন্ধ করতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

জমেছে নতুন রঙ্গ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একজন প্রগতিশীল নাট্যকার পুনর্বাসনের
অপেক্ষায় আছে।
একজন সাহসী যুবা মুহুর্মুহু পোশাক পাল্টায়।
একজন বিশুদ্ধ গণতন্ত্রী আজ স্বৈরশাসনের
সমর্থনে বক্তৃতা দেবেন।
একজন প্রেমিক গিয়ে কখনো জমায় গল্প ব্যাঙের
সমাজে
কখনো সাপের মুখে চুমু খায়।
একজন বস্তুত-ভাঁড় মনস্বীর ভূমিকায় মঞ্চে
নেমেছেন

মুখোশ পাল্টাতে যার [illegible] পরিবর্তিত আলোকে,
[illegible] চতুরকে [illegible]।

জমেছে নতুন রঙ্গ কলকাতায়, দর্শকের চোখে
পলক পড়ে না।

একটি কুকুর-ছানা সিংহের গর্জনে দশদিগন্ত কাঁটাতে
সহসা উৎসুক।
একজন আদর্শবাদী সন্ধ্যার আঁধারে অন্য শিবিরে
গেলেন।
একজন প্রগতিশীলা ভিন্ন-প্রেমিকের সঙ্গে বসন্ত
কাটাতে
ভিন্ন ছাঁদে বেঁধে নেয় বেণী।
একজন জ্যোতিষী গিয়ে জলের দর্পণে দেখে' মুখ
অম্লানবদনে বলে দিয়েছেন
"আমার দাদার জমিদারিতে কখনো কেউ নালিশ
করেনি।"

সাধ

রমেন আচার্য

কিছু ভাল লাগছে না। যেন এর জন্যে কেউ দায়ী হ'লে
ভাল হ'ত। যেন সত্যি কারো কেউ দায়ী হ'লে
কাঁচের জানলায় কিছু শক্ত ক্রোধ ছুঁড়ে মারা যেত।
ঝনঝন্ শব্দ বাজতো। আহা, কাঁচের উজ্জ্বল দেহ খসে পড়তো ধুলোর কাদায়।

শরীরে বারুদ মাখা, বুকে চাপা আলো, তবু সেই ষাটটি কাঠির
যৌবন ফুরালে পর দেশলাইটা অন্ধকারে সারা রাত ধরে
একলা বৃষ্টিতে ভিজবে। রেসের ঘোড়ার দীপ্ত মুখচ্ছবি
হঠাৎ অর্ধেক পথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে আহত শরীরে।

উদাসীন ব্যস্ত মুখ চতুর্দিকে, স্টেশনের সব ট্রেন একে একে ছেড়ে চলে গেল।
মার্কারী ল্যাম্পের ধূর্ত বর্ণচোরা বিভ্রান্তির আলো
প্রিয় মুখ রক্তহীন করে। যেন ক্রমে পাল্টে যাচ্ছে। যেন কীর্তিনাশা নদী ক্রোধ নিয়ে
ক্রমেই ঘরের কাছে, সাজানো বাগানে, প্রিয় মাধবীলতার
শিকড়ের কাছে আসছে।

অথচ এখনো সন্ধ্যা হ'লে
আমার একরত্তি ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে সাধ হয়।

Pond's
Angel Face

সুখের সন্ধানে

শিশির লাহিড়ী

আপনি তো মশাই আমাকে জর্নালিয়ে খেলেন। আমার মত নগণ্য একটা লোকের জীবনকাহিনী জানার জন্যে আপনি কেন যে এত হন্যে হয়ে উঠেছেন জানি না। যাই হোক আপনি যখন এত করে ধরেছেন, তখন আপনাকে বিমুখ করা সাজে না। আপনি বলেছেন, "যাহা বলিবে সত্য বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না।" কিন্তু জীবনের সব সত্যি কথাই কি মানুষ হজম করতে পারে? আমার ধারণা, পারে না। যাই হোক আপনি যখন বলেছেন তখন আমি চেষ্টা করে দেখছি, কিন্তু শেষ অবধি পিণ্ডি যে, কি ছাই দাঁড়াবে, বলতে পারি না। তবু সব বলার শেষে আমি একটু নিবেদন রাখব, যদি সম্ভব হয় সে বিষয়ে একটু সচেষ্ট হবেন, তাহলে হয়তো আমার কিছু উপকার হলেও হতে পারে।

...আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দামশাই বিয়ে করে জোড়া শ্যালিকা যৌতুক পেয়েছিলেন। ঠাকুর্দার বাবামশাই সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ দুটি কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করেও সাধন ভজনের জন্য গুটি তিনেক ভৈরবী রেখেছিলেন। ঠাকুর্দামশাই পেটরোগা, সারাজীবন গিমে শাক দিয়ে গেঁড়ির ঝোল খেয়েই কাটালেন। বউ বলতে, সাধন সঙ্গিনী বলতে, সখা-সচিব-ললিত-কলা-বিধৌ ঐ একটি, আমার ঠাকুমা মোক্ষদাময়ী ঠাকরেণ। ঠাকুমা প্রাতঃস্মরণীয়া চরিত্র, বলতে গেলে তাঁরই শাসনে বাবামশাই কিছু ইতিহাস সৃষ্টি করবার মত বয়সকাল পাবার আগেই সাধনোচিত ধামে চলে যান। সুতরাং বংশে বাতি দেবার মত সবেধন নীলমণি, আমি, শেষরাতের সলতের মত জ্বলছি।

আমার ঠাকুমা আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর আদরে আদরে আমি

সুরভি পিসির একথা না বলে উপায় ছিল না, তাঁর হাত-পা বাঁধা, ভবিষ্যতের আশাভরসাই তাঁকে আমার পক্ষ নিতে বাধ্য করত। ঠাকুমার আদরের গুপালের ক্ষতি করা তাঁর সাধ্যের বাইরে।

মিনতি ফুলত। রাগে ফুলত। এক-একদিন বলত, আমিও একদিন মারব বলে রাখছি।

সুরভি পিসি রেগে যেতেন।—কি বললি! গায়ে হাত তুলবি। তুলে দেখিস। দেখিস তোকে আমি আঁশ বটি দিয়ে কুচি কুচি করে কুটব। দেখি তখন তোর কোন বাপ এসে বাঁচায়!

একই ধরনের মজা বার বার "রিপিট" করলে মজার ধার কমে আসে। একই ধরনের নিষ্ঠুরতায় নিপীড়নের মজা আসে না। মিনতিকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অন্য রকমের সাজার কথা চিন্তা করতুম। এক-একদিন ভাবতুম আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে দি, কি ওর পায়ের নখে হাতুড়ি মারি। কিন্তু এগুলো ভাবলেও ঠিক করে উঠতে পারতাম না। মা মিনতিকে বড় চোখে চোখে রাখতেন।

একদিন বাগানে জামরুল গাছে চড়চা-পিঁপড়ের কামড় খেয়ে আমার হঠাৎ একটা নতুন ভাবের উদয় হল। চড়চা-পিঁপড়ে আপনি দেখেছেন কিনা জানি না। কালো কাঠ পিঁপড়ে দেখেছেন নিশ্চয়ই, লাল ডেঁয়ো-পিঁপড়েও। লাল আর কালো এই দুই পিঁপড়ের সারবস্তু নিয়ে যে মডার্ন তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন ভগবান, পিঁপড়ে-দের জগতে তার নাম চড়চা-পিঁপড়ে। সরু ছিপছিপে দেখতে, হিপ-সেক করা মেয়েদের মত পেছন, আর হুলের ধারে কটুভাষিণীরাও লজ্জা পায়।

এ নতুন আইডিয়াটা আমায় মজায় মাতাল করে তুলল। আমি একটা টিনের কৌটো যোগাড় করে তার মাথার টিনে অল্প দু'চারটে হাওয়া যাতায়াত করার মত ছোট ছোট ফুটো করলাম। তারপর ঠাকুমার পাকা চুল তোলার সোন্নাটা যোগাড় করে নিয়ে বাগানে বসে বসে এক কৌটো পিঁপড়ে ধরলাম।

সুরভি পিসি আর মিনতি মার ঘরের মেঝেয় শুতো। দু'একদিনের মধ্যে আমার সুযোগ জুটে গেল। সুরভি পিসি দিবা-নিদ্রা সেরে চলে গেলেন, মা অন্য কোথাও। মিনতি উবু হয়ে বসে দু' হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাঁটুর ওপর মুখ রেখে ঘুমের খোঁয়ারি ভাঙাচ্ছিল। আমি আলতো চুপি চুপি পায়ে ঘরে ঢুকলাম। মিনতি সজাগ হয়ে তাকাবার আগেই উপোসী পিঁপড়ে-গুলোকে কৌটো থেকে উপুড় করে মিনতির গায়ে মাথায় ঢেলে দিলাম।

প্রথমে মিনতি ঠিক বুঝতে পারেনি অল্প পরেই বুঝল। মাথার চুলে হন্যে হয়ে কয়েকটা ঘুরছিল, কয়েকটা ঘাড়ে কামড়েছে, কয়েকটা ঘাড় আর গলার পাশ দিয়ে গলে বোধ হয় বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। মিনতি চমকে লাফিয়ে মাথা ঘাড়ের পিঁপড়ে ফেলতে ফেলতে, বোধ হয় বুকে কামড় খেল। এক-একটা কামড় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত, তার জ্বালা ভয়ংকর। জ্বালায় অকস্মাৎ জামা ধরে টানল মিনতি, টিপকলের মুখবন্ধ বাঁধন খুলে জামাটা অনেক নিচে নেমে এল। আমি এই প্রথম কিশোরী-দেহ দেখলাম।

অল্প পরেই মিনতি জামা ঠিক করতে করতে দাঁতে দাঁত টিপে ঘর্ষণ করল,—অসভ্য। জানোয়ার!

আমি বোধ হয় জানোয়ারই ছিলাম, আমার কোন দুঃখ হচ্ছিল না, আমি দুঃখের মধ্যে অন্য একটা আনন্দের সন্ধান পাচ্ছিলাম। আর এক জগতের, অন্য জগতের। সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি নিচের স্বপ্নটা দেখি :

লম্বা একটা ধারালো ছুরি নিয়ে আমি একটা আপেল কাটছিলাম। প্রথমে দু'

ভেতরেই থাকে, খিটিমিটি করে, মায়েদের জ্বালাতন করে। বাইরে কাপড়জামা শুকোবার উপায় নেই, সারা ঘরে ভিজে কাপড় ঝুলছে। গুদোম ঘরে এমনিতেই আলোর অভাব, এখন মেলে দেওয়া কাপড়ে আরো অন্ধকার। অনুমান করা কঠিন নয় যে ঘরের মধ্যে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ হয়েছে। ঘুঁটে গুলে বাইরে শুকোতে দিত, এখন কি করছে কে জানে। তার উপরে আবার টাইলের ছাউনিটির যা অবস্থা তাতে বৃষ্টির সময় ছাত দিয়ে জল গড়ানো কিছু বিচিত্র নয়। আজ কদিন যাবৎ আরেক ফ্যাসাদ হয়েছে— রাস্তার ধারের টিউব-ওয়েলটি বিকল হয়ে আছে। এখন অনেকটা দূরে থেকে জল টানতে হচ্ছে। গিন্নীদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে চড়া গলা, ছেলেপেলেগুলোকে কারণে অকারণে ধমকাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে নানা রকমের অসাচ্ছন্দ্য মনের মধ্যে জমা হয়ে হয়ে এদের মেজাজ চড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে গলার আওয়াজ।

বর্ষার দৌরাত্ম্যে এদের কষ্ট দেখে প্রথমটায় মনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছি। তার পরে যেমনটা হয়, আমাদের নির্বিকার

মন অতি সহজেই তার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পায়। দুর্ভোগ যে ভোগে অভ্যাসে যেমন তা গা-সহা হয়ে যায়, যে দেখে তারও মন-সহা হয়ে যায়। ভুলেই যেতাম, হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মনটা আবার সজাগ হয়ে উঠল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে দিবানিদ্রার আমেজটা সবে জমে এসেছিল; হঠাৎ চমকে উঠে শুনি আমার রিফিয়ুজি প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড কলহ বেধে গিয়েছে। প্রতিবেশী না বলে প্রতিবেশিনী বলাই ভালো কারণ পুরুষ অধিবাসীরা তখন গৃহে ছিল না। পাঁচ ছজন গিন্নী এক সঙ্গে সমস্বরে চেঁচাচ্ছে। সে কলরবের মধ্য থেকে কলহের হেতুটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারিনি, বোঝবার চেষ্টাও করিনি। থেকে থেকে দু একটা প্রাকৃত শব্দ কানে এসেছে, সে বড় সুশ্রাব্য নয়। প্রথমে দু একটা ছেলের নাম ধরে বকুনি, হয়তো ঘরের মধ্যে হুটোপাটি করতে গিয়ে এর জিনিস ও ভেঙেছে, তারপরে কল—টিউবওয়েল, হয়তো বা কারো জলের কলসী কোনো ছেলে উল্টে দিয়েছে, তারপরে না ছোট লোক, ছোট জাত ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ছোট জাত' কথাটা কানে যেতেই কৌতূহল হল - দেখি তো এদের মধ্যে ছোট জাতের মানুষটি কে? জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, এখানকার যে বউটি সব চাইতে সুন্দরী তাকেই উদ্দেশ করে উক্তরূপে সম্ভাষণ চলছে। বউটি শুধু সুন্দরী নয়, শান্ত স্বভাবও বটে। বেচারী অপরাধীর মতো জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হয়ে অন্য দুটি বউ লড়ছে। বোধ করি এরাও ওরই মতো ছোট জাতের। বউটির করুণ মুখ করুণ চাউনি ওকে আরোই যেন সুন্দর করে তুলেছে। ভাবছিলাম কলহান্তরিতা নায়িকাকে নিয়ে অনেক কাব্য রচনা হয়েছে, এই কলহ-নিপীড়িতাকে নিয়ে কি কাব্য রচনা হতে পারে না? হতে পারে, কিন্তু কাব্য রচনা এক কথা আর নিপীড়িতাকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা অন্য কথা। অন্যায়ের প্রতিকার করা কাব্যের কর্ম নয়। কাব্য-কথা ঐ বধূটির মতোই দুর্বল, সুন্দর বলেই দুর্বল। না পারে চেঁচাতে না চোখ রাঙাতে। এত মৃদুভাষী, ওর কথা লোকের কানেই ঢোকে না। তার উপরে আবার অতিমাত্রায় সূক্ষ্মভাষী, লোকে যেটুকু শোনে সেটুকুও বোঝে না। এই ধরুন আমি যদি মঞ্চস্থ থেকে ওদের ঝগড়া মেটাতে যেতাম আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কাব্য আওড়িয়ে বলতুম—

মোর কথা শোনো
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো

—সে কথা কি ওরা শুনত, না শুনলে বুঝত? মাঝখান থেকে বিরক্ত হত; নিশ্চয় বলত, ঐ দেখ, উনি আবার এলেন আমাদের শোলোক শোনাতে। কিম্বা যদি শুধু সোজা করেই বলতুম—সুন্দরের কোনো জাত নাই—বলা বাহুল্য এও আমার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথেরই কাব্য কথা (সুন্দরের কোনো জাত নাই, মুক্ত সে সদাই)—তাতে বোধ করি আরোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। আহা, উনি আর ন্যাকামি করবার জায়গা পেলেন না। বড় নতুন কথা শোনাতে এসেছেন—সুন্দরের কোন জাত নাই! আরে মশায়, সুন্দরই তো একটা জাত। সে জাতের গুমর কত, সব আমাদের জানা আছে। আর আপনি যে বড় ওনার হয়ে ওকালতি করতে এলেন

সেও তো ঐ সুন্দর মুখের—বুঝুন তাহলে, এর পরে আমি কি আর পালাবার পথ পেতাম?

ভেতরে ভেতরে একটু ঈর্ষার ভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সুন্দরী বউটিকে এরা বোধ করি খুব নেকনজরে দেখে না। কিন্তু রাগরজ্গ, হিংসা বিদ্বেষ যদি থেকেও থাকে তাহলেও এতদিন তো দিব্যি মিলেমিশেই ছিল. আজকে তবে এই বিস্ফোরণ কেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই কলহনাটের আসল Villainটি এই বর্ষা। বর্ষার শুরু থেকেই প্রত্যেকে নানা অসুবিধায় ভুগছে, মনের মধ্যে একটু একটু করে তিক্ততা জমছিল, সামান্য কোন একটা ছুতোয় সেটা ফেটে পড়েছে।.....তারপরে এক সপ্তাহ যেতে না যেতে এই তো সেদিন আরেক দফাও হয়ে গেল।

আজ কদিন ধরে এই কথাটাই ভাবছিলাম। আমি শান্তিনিকেতনের অধিবাসী। সেখানে বর্ষাটা শুধু একটা ঋতু নয়, ঋতু উৎসব, রীতিমতো সমারোহের ব্যাপার। শুষ্ক রুক্ষ কাঁকর মাটির দেশ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কি নিষ্করুণ তার মূর্তি। আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষণ ঐ কারণেই সেখানে এমন উপভোগ্য, এত তার সমাদর। চোখের সম্মুখে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়, চতুর্দিকে ঘন সবুজ হয়ে প্রাণমন স্নিগ্ধ করে দেয়। আবার যত বর্ষণই হোক, উঁচু নিচু জমি বলে জল দাঁড়ায় না, গড়িয়ে ঢালু খোয়াই এর দিকে চলে যায়। 'জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে'—এ দৃশ্য একেবারেই শান্তিনিকেতনের নিজস্ব। জল জমে না বলে কাদাও হয় না। বৃষ্টি যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ চারদিক জলে থই থই। বৃষ্টি থামল তো আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে রাস্তাঘাট দিব্যি খটখটে। একথা নিশ্চিত যে শান্তিনিকেতনে থেকে বর্ষার অস্বাচ্ছন্দ্য খুব একটা ভোগ করতে হয় না। ঐ সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে শান্তিনিকেতন খানিকটা আমাদের Corrupt করেছে। প্রকৃতির ঋতু পর্যায়কে আমরা দেখেছি প্রকৃতির অলংকরণ হিসাবে। এক বৈশাখের রুদ্র মূর্তিটিকে বাদ দিলে প্রকৃতির অপ্রসন্ন মূর্তির কথা অন্তর দিয়েই শিখিনি। প্রত্যেক ঋতুর দাক্ষিণ্য মূর্তিটিকেই শুধু দেখেছি। আসল কথা বর্ষাকে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে। সে দেখা সুন্দর হলেও সম্পূর্ণ দেখা নয়। আষাঢ়ের বর্ষণ যদি মনকে বহু যুগের ওপারে নিয়ে যায় তাবে এ যুগের আষাঢ়কে তো ঠিক চিনতে পারব না। রেবা নদীর তীরে মেঘদূতের মেঘের ঘটা যতই মনোহর হোক অলকার বিরহিণীর বক্ষপাতের তটে মেঘের ঘটাকে কেউ মনোহর বলবে না। আষাঢ়ের বর্ষার মূর্তি আগের মতো স্নিগ্ধ প্রসন্নতার নয়। কালো মেঘের ছায়ার মধ্যে যে চাহনি দেখা দেয় সে চাহনি মাধুর্যের নয়, বিভীষিকার।

বর্ষা এখন সমস্ত দেশের পক্ষেই এক বিষম সমস্যা। অতিবর্ষণে পাহাড়ের ঢল নেমে নদী নালা ফুলে ফেঁপে ওঠে, বন্যায় শহর গ্রাম ভাসিয়ে দেয়, প্রাণহানি ঘটে, সম্পত্তি নাশ হয়। কলকাতার বর্ষায় প্রাণ যদি বা বাঁচে, মন বাঁচে না। গত বর্ষার জলাতঙ্ক কলকাতাবাসী সহজে ভুলতে পারবে না। শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের মতো কলকাতাবাসীরাও বর্ষা সম্বন্ধে একটা পোশাকী ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা ভাবেন বর্ষাটা চাষ আবাদের কাজে চাষীদেরই প্রয়োজন। গ্রীষ্ম তাপের পরে এক আধ পশলা বর্ষণে তনুমন অবশ্যই স্নিগ্ধ হয়, এ ছাড়া শহরে বন্দরে বর্ষার আর কি প্রয়োজন। বর্ষা এখন তার শোধ তুলছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—বিশেষ করে যে দেশ কৃষিপ্রধান সে দেশে বর্ষার চাইতে মঙ্গলকামী ঋতু আর কিছু হতে পারে না। সেই শুভঙ্করীর এই ভয়ংকরী মূর্তি কেন? ভয়ংকরী তো বটেই আবার এক দিক থেকে বর্ষাকে বলা যেতে পারে কৌতুকময়ী। ধারাবর্ষণে ধুয়ে মুছে প্রকৃতির সর্বাঙ্গ মার্জনা করে দেয়। গাছপালার চেহারা কী সজীব, কী সতেজ। কিন্তু মানুষের মূর্তি ঠিক তার উল্টো। আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে—সে রূপটা কি রকম? বেশির ভাগেরই তো দেখছি ভেজা কাকের মতো চেহারা। আমার মতো প্রাকৃতজনরা কিংবা আমার দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবেশীরা তো বটেই, যাঁরা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান—ভাল বাড়িতে থাকেন, ভাল গাড়িতে চড়েন, তাঁরাও দেখছি এরই মধ্যে একটু যেন চুপসে গিয়েছেন। বড় ছোট, ধনী দরিদ্র সকলের জীবনই অল্পাধিক [illegible]। প্রকৃতিদেবীর আক্রোশ [illegible]। নিজের জিনিসটুকু ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়েছেন। কিন্তু মানুষের [illegible]

[illegible]

[illegible] আজ বিকেলের দিকে যখন অঝোরে বৃষ্টি চলছিল তখন এদের দেখলুম দোর গোড়ায় বসে শূন্যদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাঙলা দেশের বহুযুগের আষাঢ় এদের চাহনিতেই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছিল—

একদা আষাঢ় মাসে আষাঢ়ান্ত দিন
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়।

লোকগীতির বেলা এটা আকছারই হয়।) মুর্তাজা সাহেব শুদ্ধ পাঠটি তুলে দিয়েছেন (এবং আমার কাছে যে পাঠটি আছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়)। তার প্রথম চার ছত্র,

"আমি হইতে আল্লারসুলে
আমি হইতে কুল+
পাগলা হাসন রাজায় বলে
তাতে নাই ভুল।
আমা হইতে আসমান জমিন
আমা হইতে সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ,
আমি হইতে রবা।"

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে 'কুল'+ আরবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুল=সম্পূর্ণ, সর্ব-বিশ্ব; বাঙলা 'বিলকুল'এ এই 'কুল'টি আছে। এবং 'রব'+ এস্থলে 'ধ্বনি' নয়; বরং এস্থলে 'প্রভু', 'সৃষ্টিকর্তা'।

এমনিতেই আমার মগজে যেটুকু দর্শন-জ্ঞান আছে, তা দিয়ে একটা মাছের টোপ হয় না, তদুপরি হাসন রাজার এই দম্ভভরা দর্শন যে স্বয়ং আল্লাতালা—রব্—তার মুণ্ডু থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, এযে নাস্তিক-রাজ চার্বাককেও হার মানায়!

হাসান রাজা স্বয়ং সে তত্ত্ব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাই এই গানেরই শেষের দিকে আছেঃ

"পাগল হইয়া হাসান রাজায়
কিসেতে কি কয়
মরব, মরব দেশের লোক
মোর কথা যদি লয়।"

কিন্তু গানের শেষের দুই ছত্রে হাসন রাজা তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেনঃ—

"আপন চিনিলে দেখ,
খোদা চিনা যায়,
হাসন রাজা আপন চিনিয়া
এই গান গায়।"

*

কী রবীন্দ্রনাথ, কী শ্রীযুক্ত সনাতন, কী মুর্তাজা সাহেব একজন পল্লী কবিতে দার্শনিক প্লাতো প্রচারিত দর্শন পেয়ে উল্লসিত সম্মোহিত।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি আমার দর্শনজ্ঞান ধূলি পরিমাণ।

আমি হাসন রাজাতে পেয়েছি হিউমার ও রসবোধ। কিন্তু তাঁর দার্শনিক রূপের পরিচয় দিয়ে পটভূমি নির্মাণ না করলে এই বৃদ্ধ লেখকের দু-চারজন অগা পাঠক হাসন রাজাকে হয়তো 'ভাঁড়' বলে ভুল করতেন। তাই অতিশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সুদীর্ঘ অবতরণিকা।

ওদিকে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। তাই অদ্যকার মত মাত্র একটি চুটকিলা নিবেদন করছি। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে সবিস্তর হবে। এবং আমার সঙ্গে হাসন রাজার ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা মাত্র একবারের তরেও বয়ান করবো। অবশ্য তাঁর বয়স তখন ষাট, আমার সাত! কত-টুকুই বা বুঝেছি, কতটুকুই বা স্মরণে আছে!

এইবারে সেই কবিতাটি; এস্থলে বলে রাখি, হাসন রাজা তাঁর হৃদয়ের 'সু' আর 'কু' দুই-ই চিনতেন। সু-কে নাম দেন হাসন জান, আর কু-কে হাসন রাজা।

"কত দিন আর খেলবে হাসন
ভবের এই খেলা?
খেলতে খেলতে হাসন রাজার
না লাগে আর ভালা।
এই যে দেখ ভবের বাজার
কেবল এক জ্বালা
স্ত্রীপুত্র কেউ নয় তোর
যাইতে একেলা॥
হাসন জানে হাসন রাজায়
মারলো এক ঠ্যালা,
চল্ চল্ শীঘ্র করি,
চল্ শালার শালা॥"

tal] জীবনের গাঁটছড়া বন্ধন; যা 'কবিতিকা'র ভাব ও রূপের আবশ্যিক লক্ষণ হিসেবে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। অধিকন্তু সীমা-অসীমের এই রোমান্টিক বিলাসে অযথা গুরু শব্দের প্রয়োগ, উপমা ও চিত্রকল্পের বর্ণালী বিহার কবি মনে প্রভাব বিস্তার করেনি। ছন্দ-শৈলীর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পংক্তিগুলোকে "কণিকা"র হালকা চালেও বিন্যস্ত না করে গম্ভীর অথচ সহজ চালিকু রীতিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

ঐতিহাসিক মর্যাদার প্রশ্নেও একথা পুনরায় স্মর্তব্য যে, এর মধ্যে দিয়ে "চয়নিকা" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছে। বিশেষত এই ভাবনাই যেহেতু আলোচ্য 'কবিতিকা'য় রবীন্দ্র ভাবনার অভিব্যক্তি; সেহেতু "চয়নিকা" ব্যতিরেকে রবীন্দ্র ইতিহাসের পরিধি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা মুক্ত দৃষ্টির স্থলে দৃষ্টি সংকোচের পরিচায়ক হবে সন্দেহ নেই। তাছাড়া এ যাবৎকাল কাব্য সংকলন "সঞ্চয়িতা" নিয়েই রবীন্দ্র চর্চাকারীদের আগ্রহ সীমাহীন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কবিও যে "চয়নিকা"র প্রতি কম আগ্রহী ছিলেন না, তার প্রমাণ এই কটি ছত্রেই অনুস্যূত হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে দ্রষ্টার নিজস্ব ভূমিকা সর্বদাই সংযোজিত হওয়ায় তা সেই সবক্ষেত্রে ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণের অমূল্য দলিল গ্রহণ করেছে। কিন্তু কাব্য সংকলন "চয়নিকা"য় এরকম কোন ভূমিকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে পাঠকের পক্ষে রচয়িতার প্রত্যক্ষ অভিমত জানার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং বর্তমানে যখন এই সংকলন প্রসঙ্গে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত অভি-কথন পাওয়া গিয়েছে, তখন একেই "চয়নিকা"র মুখবন্ধরূপে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা উচিত। সেই সঙ্গে এ প্রসঙ্গে নিশ্চয় অনুচিত হবে না যে, অধুনা প্রচলিত "চয়নিকা"র পুনঃপ্রকাশের সময় এই 'কবিতিকা'কে মুখবন্ধের পর্যায়ে দিয়ে সংযোজিত করা হোক। তবেই "বিশ্বভারতী" কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিপালনের একটি যথার্থ প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবেন।

১। রবীন্দ্রনাথ 'কবিতিকা'র কবিতার রস-রূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কে ১৩৩৫-এর কার্তিক সংখ্যা "প্রবাসী"তে লিখেছিলেন..."দু চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্য-বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড় বড় কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলেই তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে।"

২। রবীন্দ্রনাথের মতে, চীন-জাপান ভ্রমণকালে স্বাক্ষর সংগ্রাহকদের অনুরোধে কাগজ, রেশমের কাপড় ও তালপাতার পাখায় লিখিত ছোট ছোট রচনাগুলোই 'কবিতিকা'র বহির্মুখী প্রেরণা ছিল।

৩। 'কবিতিকা'র সূচনা হয় ১৩০৬ সালে [১৮৯৯] "কণিকা" প্রকাশের মধ্য দিয়ে; গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবি-বন্ধু প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর [১৮৭২-১৯৪৯] উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। আর ১৯২৬-এ কবির বিদেশ ভ্রমণকালে বুডাপেস্টে স্বহস্তাক্ষরে বাংলা ও ইংরেজী কবিতামালা একত্রে "লেখন" শিরোনামায় মুদ্রিত হয়। এবং 'লেখন'-এর যাবতীয় রচনা ২৬শে কার্তিক ১৩৩৩ সালের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। অথচ কবি অসতর্কভাবে "লেখন"কেই 'কবিতিকা'র প্রথম রচনা কাল হিসাবে নির্দেশ করেছেন। তবে কাব্য রসের বিচারে 'কণিকা'র চেয়ে "লেখন" অনেক বেশি সার্থক বলে প্রথমটিকে সূচনা ও দ্বিতীয়টিকে প্রকৃত সূচনা বলা যাবে। আরো পরে 'কবিতিকা'র আর একটি সংকলন "স্ফুলিঙ্গ" [১৩৬২—১৯৫৬] নামে আত্মপ্রকাশ করে।

৪। 'বিশ্বকবি' শব্দ ব্যবহারে কবির আন্তর্জাতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর বিশ্ব সাহিত্যবোধ সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রয়েছে। ১৩১৩ সালে রবীন্দ্র [illegible] 'Comparative Literature'-এর প্রতিশব্দ রূপে উল্লিখিত [illegible] Goethe কথিত 'Weltliteratur' [illegible] ক্ষেত্রে [illegible]।

৫। 'কবিতিকা'র কবিতাকার [illegible] Limerick-এর কথা বলা হয়েছে [illegible] রবীন্দ্রনাথের Limerick জাতীয় রচনার [illegible] "খাপছাড়া" [১৯৩৭] [illegible] 'কণিকা'র কথা উল্লেখ করেও [illegible] খাপছাড়া ছড়াগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছে।

॥ ২ ॥

পরমেশ এসেছিল ওদের বাসে তুলে দিতে। ঝকঝকে লাল রঙের ডি লাক্স বাস, ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ছাড়ার কথা। কিন্তু পাঁচ মিনিটেও ছাড়ছে না। রুংটাদের বাড়ির একজন চাকর ঐ বাসে টাটানগর থেকে বরফ আনতে যাবে, সে তখনও এসে পৌঁছোয় নি। রুংটারা এই এলাকায় রাজা-মহারাজার চেয়েও বেশী প্রতাপশালী, তাদের বাড়ির চাকরকে অবহেলা করবে কে? পরমেশ এই নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল, সেও সরকারী অফিসার, সে তার প্রতাপ দেখাতে চায়। অথচ সেই রাত্তিরের আগে ট্রেন নেই, আর বাসে টাটানগর পৌঁছোতে লাগবে বড় জোর দু'ঘণ্টা—দীপু বিনা উত্তেজনায় বসে আছে জানলায় মাথা হেলিয়ে। পরমেশকে এখন বড় একা দেখাচ্ছে, তার রোগা লম্বা চেহারাটা এখন অসহায়ের মতন—একটুক্ষণের মধ্যেই দীপু আর অরূপ চলে গেলে, ও ফিরে গিয়ে ওর কোয়ার্টারের অন্ধকার বিছানায় চুপচাপ একা শুয়ে থাকবে।

—দীপু, পৌঁছেই একটা টেলিগ্রাম করিস কিন্তু! চলন্ত বাস থেকে হাসি মুখে দীপু বললো, যদি ভালো খবর থাকে, তা হলে টেলিগ্রাম করবো। যদি না করি, বুঝবি ব্যস্ত আছি। আবার আসবো।

—আসিস, শিগগিরই আসিস। অরূপ আসবি তো?

আজ হাটবার, ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল বাস, চাইবাসা ছাড়াতেই দীপুর মন খারাপ হয়ে গেল। একটু আগে বাবার অসুখের কথা ভেবে তার প্রথম মন কেমন করতে শুরু করেছিল, তার মনে হচ্ছিল—মৃত্যুর আগে বাবার কাছে পৌঁছুতেই হবে তাকে। আবার এখন, এই চাইবাসা হঠাৎ ছেড়ে যেতেও তার কষ্ট হচ্ছে। যদি সত্যি সত্যি নিলামে পৌনে সাতশো টাকায় একটা টিলা কিনে তার ওপর একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে সে ওখানে থেকে যেতে পারতো চিরকাল! ভালো লাগতো না? এইটাই তো মুশকিল, ঠিক করে কিছু বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে মানুষজনের দেখা না পেলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে, হুল্লোড়ে পৃথিবী কাঁপাতে ইচ্ছে করে, মেয়েদের চুলের ঘ্রাণ নাকে নেবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা জাগে। আবার মাঝে মাঝে এও মনে হয়, সারাজীবন কোনো নির্জন জায়গায় বসে ধ্যান করতেও আমার ভালো লাগতো। কাঠবিড়ালী আর মেটে শালিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যেত!

খানিকটা অপরাধীভাবে সে অরূপের দিকে ফিরে বললো, খুব খারাপ লাগছে রে, আমার জন্য তোকেও ফিরে আসতে হলো! তোকে হেসাডির বাংলো দেখাবো বলেছিলাম!

অরূপ নম্রভাবে বললো, তাতে কি হয়েছে, আবার আসা যাবে!

—যাঃ, তোর তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দু' মাস বাদে। তখন কি আর

—তাতে কি হয়েছে। ওকেও নিয়ে আসবো।

—সে হয় না। বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবার সময় কেউ বন্ধুকে নিয়ে যায় না। টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড!

—তুই তো দেখেছিস স্বপ্নাকে, ও লোকের সঙ্গে মিশতে, আড্ডা দিতে খুব ভালোবাসে।

—সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু সত্যি বিশ্বাস কর, হেসাডির বাংলোটা অপূর্ব, চারদিকে কাচের জানলা—সারাদিনে একটাও সভ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না—মাঝে মাঝে শুধু ট্রাকের শব্দ—এ ছাড়া আর সব শব্দই প্রকৃতির।

—তোর এসব জায়গায় আসতে খুব ভালো লাগে, নারে?

—সারাণ্ডা ফরেস্ট আমার এত দেখার ইচ্ছে, কিন্তু দু'বার এসেও তো ঠিক দেখা হলো না। জানিস, সারাণ্ডা ফরেস্টে সাতশো পাহাড়, ওখানকার শালগাছগুলো ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা—এক একটা একশো-দেড়শো বছরের পুরোনো। পুরোনো দুর্গে বেড়াতে গেলে যে-রকম অদ্ভুত লাগে, এই সব জঙ্গলেও সেই রকম একটা—

—তুই যে প্রায়ই বাড়ি থেকে এরকম চলে আসিস, কোনো অসুবিধে হয় না?

—কি অসুবিধে?

—তোর বাড়ির লোকজনের, মানে, তুই কোনো চাকরি টাকরি

—আমি তো কখনো চাকরি করবো না।

—চাকরি করবি না?

—না!

যেন একথাটার আর কোনো ব্যাখ্যা দেবার দরকার নেই, তাই দীপু ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে একটু হাসলো। অরূপ বললো, তা হলে কি ব্যবসার কথা ভাবছিস?

—ব্যবসা করবো, ক্যাপিটাল কোথায়?

ঠোঁটে হাসিটা অবিকৃত রেখে দীপু বললো তুই জানিস না, আমি একবার চাকরিতে ঢুকেছিলাম, সেখানে চুরি করেছিলাম বলে আমার চাকরি যায়!

—যাঃ!

—তুই বিশ্বাস করছিস না? চুরি করাটা অন্যায়, তুই একথা বলবি তো, কিন্তু হঠাৎ একবার অন্যায় করতেও আমার লোভ হয়েছিল। সত্যি বলছি, টাকাটার ওপর আমার লোভ ছিল না, কিন্তু খুব ইচ্ছে হয়েছিল—অন্যায় করতে কেমন লাগে—সেটা দেখতে।

অরূপের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে, যেন কোনো রসালো গোপন কথা• বলছে এই ভঙ্গিতে দীপু বলতে লাগলো, বি কম পাশ করার পর আমি দাশগুপ্ত অ্যান্ড সেনগুপ্ত ফার্মে আর্টিকেলড্ হয়েছিলাম কিছুদিন। ওটা খুব বড় চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেন্টস ফার্ম

—চিনি। আমাদের কম্পানিতেও ওরা অডিট করতে আসে

—প্রোফেসার দাশগুপ্তকে চিনিস?

—দু'একবার দেখেছি।

—ঐ প্রোফেসার দাশগুপ্ত আমার মেসোমশাইয়ের খুব বন্ধু। আর্টিকেলড হতে তো হাজার চারেক টাকা জমা লাগে, আমার কাছ থেকে সেটা নেয়নি। একবার একটা স্কুল অডিট করতে গিয়েছিলাম বসিরহাটে। আমি প্রোফেসার দাশগুপ্তর সঙ্গে গিয়েছিলাম কেরানী হিসেবে। স্কুলের অ্যাকাউণ্টসে অনেক গোলমাল ছিল, হেড মাস্টার মশাই দেড় হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন প্রোফেসর দাশগুপ্তকে। ঘুষ দেওয়া নেওয়াটা তো আর নতুন কিছু নয়—কিন্তু ব্যাপারটা এমন সহজ আর শান্তভাবে

হয়ে গেল, সেটাতেই আমার দারুণ অবাক লেগেছিল। হেড মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আগে কি কথা হয়েছিল জানি না, উনি এমনি স্বরে ঢুকে বললেন, আপনাদের কাজ মশার জন্য ঘুমোতে খুব কষ্ট হয়েছে, না? শহরের লোক আপনারা—। বলতে বলতে উনি একটা খাম টেবিলের ওপর রাখলেন, প্রফেসার দাশগুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, মানুষ মারার এত অস্ত্র বেরিয়েছে, আজ পর্যন্ত মশা মারার একটা কিছু আবিষ্কার হলো না। খামটা তিনি পকেটে ভরে নিলেন অন্যমনস্কভাবে। খামটার মধ্যে কি আছে দেখার জনাই আমি মিঃ দাশগুপ্তর পকেট থেকে সেটা নিয়েছিলাম—রাত্রে গাড়িতে ফেরার সময়। উনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। পাঁচ টাকার নোটে দেড় হাজার টাকা। আমার তখন মনে হলো এম এ বি টি পাশ হেড মাস্টার, আমেরিকার ডিগ্রি আছে প্রোফেসার দাশগুপ্তর—ইউনিভার্সিটিতে পড়ান—আমি কি এদের থেকে আলাদা? তুই জানিস, প্রোফেসার দাশগুপ্তকে মনে হয় দেবতুল্য লোক। কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। হেড-মাস্টারটিকেও খারাপ লোক মনে হয়নি। অথচ ওরা ঘুষে বিশ্বাসী। ও'রা যা করছেন, সে রকম করতে আমারও কি রকম লাগে—সেটা দেখার জনাই আমি সাড়ে সাত শো টাকা নিয়ে নিলাম।

যেন চোখের সামনে ভূত দেখছে, এমন-ভাবে তাকিয়ে আছে অরুপ। তার নরম মন, টাকা-পয়সার বিশেষ মূল্য দেয় না সে কখনো। দীপুর সঙ্গে বেড়াতে এসে সে দীপুকে একটাও পয়সা খরচ করতে দেয়নি। [illegible] দীপু ওরকম করবে, সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

মুচকি হেসে দীপু বললো, আমার আসল বোকামিটা কোথায় জানিস? প্রোফেসার দাশগুপ্তর সাধ্য ছিল না, আমাকে মুখের ওপর চোর বলার। আমার একটা ফ্যামিলি ব্যাক গ্রাউন্ড আছে তো! কিন্ত টাকাটা নিয়ে আমি কি করবো বুঝতে পারিনি। জ্বলন্ত কাঠকয়লার মতন টাকাটা কিছুতেই নিজের কাছে রাখতে পারছিলুম না। আমি কথাটা বাবাকে বলে ফেললুম। তারপর—আচ্ছা থাক—

—কি? তোর বাবা বুঝি

—সে অনেক জটিল ব্যাপার। এখন থাক। আচ্ছা অরুপ, তোদের কম্পানি থেকেও প্রোফেসার দাশগুপ্তকে ঘুষ দেওয়া হয়, না রে?

—না, মোটেই না।

দীপু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগলো। মিলিটারি অফিসারদের ঘুষ খাওয়াবার ব্যাপারে অরুপের বাবার কৃতিত্বের কথা কে না জানে! 'রত্নেশ্বর ঘোষাল দুটো একটা কর্নেলকে গলায় চেন দিয়ে ঘোরাতে পারে'—একথা অরুপের কাকাকেই সে বলতে শুনেছে। অরুপের দিদি ছাই রঙের উল দিয়ে সোয়েটার বুনেছিল জওয়ানদের জন্য। কি হবে এসব কথা বলে। অরুপের মনটা বড় নরম।

এক্সপ্রেস বাস ছুটছে সাঁ সাঁ করে, আর কোথাও থামবে না। অন্ধকারে মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে ডোবা বা খালের জল। দূরে ঝিকমিক করে গ্রামের আলো। আকাশের এক পাশটায় শুধু এক চাকা কালো মেঘ, বাকি অংশে তারা ফুটেছে।

তবু হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। এ যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার পাখির ডাক। এই রাত্তির বেলা! সত্যি, পাখির ডাকই প্রথম মনে হয়েছিল দীপুর হয়তো তার সামান্য তন্দ্রা এসেছিল। আসলে আটত্রিশটা মেয়ে,

সেই হল্দে পুকুর।

স্কুলের বাসটা এক পাশে কাত হয়ে আছে। একটুর জন্য পুরোপুরি অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। টিটাগড় থেকে মেয়েরা এসেছিল পিকনিক করতে। ফেরার পথে এই ব্যাপার। মেয়েরা সব রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে থামিয়েছে বাস, পুরো থামার আগেই ওরা দৌড়াদৌড়ি করে উঠে পড়লো। একটু আগে ওরা বাস উল্টে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুটা যেন হাসির ব্যাপার, ওরা হেসে হেসে সেই ভয়ের গল্প করছে।

মাত্র তিন চারটে সিট খালি ছিল, বাকি লোকেরা কেউ উঠে ওদের জায়গা দিল না। বোঝা যায়, ওরা সবাই মিশনারি স্কুলের মেয়ে, সবাই সচ্ছল পরিবারের, সপ্রতিভ, কারুরই স্বাস্থ্য খারাপ নয়, অনেকেই বেশ সুন্দরী। তিনজন শিক্ষয়িত্রী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গুণে গুণে তুললেন ওদের, সঙ্গে একজনও পুরুষ মানুষ নেই—সেজন্য কোনো অসহায় ভাবও নেই। মেয়েদের সবারই নীল পোশাক, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অরূপই প্রথম বললো, আয় আমরা উঠে ওদের বসতে দিই। দীপু সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়েকে বললো, আপনারা বসুন। স্কুলের উঁচু ক্লাসের মেয়ে, কতই বা বয়েস, পনেরো-ষোলো, কিন্তু এই বয়েসের মেয়েদের আপনি বলে সম্বোধন করলে তারা খুশী হয়, দীপু জানে। অবশ্য লজ্জা নেই ঐ মেয়েদের, তারা ইতিমধ্যেই অনেকে ব্যবস্থা করে যেখানে যেটুকু খালি জায়গা পেয়েছে বসে পড়েছে, যেসব সীটে একজন করে পুরুষ বসেছিল, তাদের এক জায়গায় উঠে যেতে বলে ওরা দখল করে নিয়েছে কয়েকটা সীট।

এই মেয়ে দুটি কিন্তু বললো, না, না, আপনারা বসুন না, আমরা দাঁড়িয়েই যেতে পারবো! দীপু অত্যন্ত সম্মান করে বললো, তা কি হয়! আমরা বসে যাবো, আপনারা দাঁড়াবেন, বসুন না! বাসে দীপু আর অরূপের বয়সী আর কোনো ছেলে ছিল না, তাই মেয়ে দুটি অত সচেতন। বাংলা স্কুলের মেয়ে হলে লাজুকভাবে হয়ে ওদের সঙ্গে কথাই বলতো না, নিজেদের মধ্যে ফিকফিক করে হাসতো। মেয়ে দুটি আর প্রতিবাদ করলো না, ঝপ করে বসে পড়লো, তারপর চেপেচুপে একটু জায়গা খালি করে বললো, আপনারাও বসুন না!

অরূপকে কোনো সুযোগ না দিয়েই দীপু বললো, বসবো? আচ্ছা! বসে পড়ে বললো, আমাদের বাস যদি এখানে না থামতো, তাহলে কি করতেন আপনারা? আর তো বাস নেই!

দুটি মেয়ের পোশাক তো একরকমই, চেহারাও প্রায় একরকম, দুজনেই ফর্সা, চোখ-নাক-মুখ বেশ তীক্ষ্ণ কাটালো, কিন্তু একজন বললো, ইস, থামবে না মানে? আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম, চাপা দিয়ে যাবে নাকি? আর একজন বললো, বাস না পাওয়া গেলে বেশ মজাই হতো, আমরা সারারাত এখানে বেশ মজা করতুম!

এই থেকেই মেয়ে দুটির চরিত্র তার বোঝা হয়ে গেল। দ্বিতীয় কথাটা যে বললো, জানলার ধারে বসেছে সেই মেয়েটি। তাকেই দীপুর বেশী ভালো লেগে গেল। তার পাশে যে বসেছে, তার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে দীপু বললো, আমিই তো প্রথম দেখতে পেয়েছিলুম আপনাদের। আমিই ড্রাইভারকে বললুম, রোককে, রোককে—

পাশের মেয়েটি একটু দ্বিধা না করে বললো, আপনাকে তা হলে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের।

দীপুর ইচ্ছে হলো বলে, ধন্যবাদ দেবার বদলে তুমি ওদিকে বসে, জানলার পাশের মেয়েটিকে এ পাশে বসতে দেবে? কিন্তু তা বলা যায় না। জানলার পাশের মেয়েটিকে বললো, সারারাত না ফিরলে বাড়ির লোক চিন্তা করতো না?

—[illegible]। [illegible]। [illegible] তো ফিরে যেতুমই।

—যদি ডাকাত আসতো?

—ইস, আমরা আটত্রিশজন, ডাকাত এলে হতো আর কি!

কলকাতার মেয়েরা কি এরকম সুন্দর হয়! কি সরল সাহসী মেয়েটির। দীপুর ইচ্ছে হলো, সেও মেয়েটির হাত ধোর। কিন্তু তা করা যায় না, না? একটু আগে মনে হয়েছিল, তাদের সীট ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন পাশে বসবার পর খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের কাঁধের ওপর হাত রাখে, ওদের মসৃণ সুন্দর গালে আঙুল বোলায়, তার উরুর সঙ্গে যে মেয়েটির উরু লেগে আছে, তার শরীরে কি মধুর উত্তাপ। আর তো কিছু নয়, ওদের গায়ের এই ভাবটা পেয়াতে দারুণ ভালো লাগে।

—আপনাদের দুজনের নাম কি?

—আমাদের আপনি বলছেন কেন? আমার নাম ইরা ব্যানার্জি, আর ওর নাম লোপামুদ্রা ঘোষ।

জানলার পাশের মেয়েটির নাম ইরা। দীপু একটুও দ্বিধা না করে বললো, ইরা? আমার একজন বন্ধু ছিল, তারও নাম ছিল ইরা। তোমার মতনই দেখতে ছিল।

—ছিল কেন? এখন নেই বুঝি?

—এখনও সে আছে, কিন্তু এখন আর সে আমার বন্ধু নয়।

—তা হলে আপনার এখনকার বন্ধুর নাম কি?

—এখন একজনও বন্ধু নেই। আমি ঠিক করেছিলুম, ইরা নামের অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা না হলে—আর কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বই করবো না!

আজকাল বাচ্চা মেয়েরাও এসব বোঝে। বুঝতে পেরেও এর অন্তর্নিহিত দুষ্টু উপেক্ষা করতে পারে না। মেয়ে দুটি পরস্পর চোখাচোখি করে হাসলো। তারপর লোপামুদ্রা জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কি?

—আমার নাম দীপাঞ্জন সরকার। আর এই আমার বন্ধু—অরূপ ঘোষাল।

—ইস উনি বসতে পারলেন না।

অরূপ মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে দুটির কথা শুনে একটু ভদ্রতার হাসি হাসতে হয় তাই হাসলো। দীপু এর পর থেকে অরূপের কথা ভুলেই গেল। মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা টীটাগড়ে কোথায় থাকো?

—শাকচি। আপনি?

—আমরা তো টীটাগড়ে থাকি না।

—কলকাতায় থাকেন? আজ রাত্তিরেই ট্রেন ধরবেন?

—কলকাতায় থাকি, কিন্তু এখন কলকাতায় যাবো না। টীটাগড়ে পৌঁছে ঠিক করবো। হয়তো বহরমপুরের দিকে চলে যেতে পারি।

—কোথায় যাবেন ঠিক নেই? এর আগে কোথায় গিয়েছিলেন? চাইবাসা?

—এখন চাইবাসা থেকে আসছি। আজ সকালে ছিলাম হাটগামারিয়া বলে একটা জায়গায়। সেখান থেকে আমরা কারো নদী আবিষ্কার করতে গিয়েছিলাম।

ইরার মধ্যে রহস্য ও বিস্ময়বোধ বেশী। সে চোখ বড় বড় করে বললো, নদী আবিষ্কার করতে গিয়েছিলেন? কোথায়? লোপামুদ্রা এত সহজে অবাক হয় না। ও হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে, যারা বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে জয়েন্ট লাইফ ইনসিওরেন্স করায়. অচেনা বাড়িতে বেড়াতে গেলেও ঠিক বুঝতে পারে কোথায় বাথরুম আছে, সে কেন অত সহজে ভুলবে। সে বললো, নদী আবার আবিষ্কার করবেন কি? এদিককার সব নদীই তো কেউ না কেউ চেনে। কারো নদীর নাম তো আমিও শুনেছি।

দীপু তবু লোপামুদ্রার ওপর রাগ করলো না। তার উত্তর উত্তাপ তো সে পরীকে নিচ্ছে। অনায়াসভাবে বললো, আমরা তো কাউকে পথ জিজ্ঞেস করিনি, কোনো ম্যাপ ছিল না, গাইড ছিল না, নিজেরাই খুঁজে বার করেছি সেই আমাদের আবিষ্কার! আমরা দুজনে দুটো ঘোড়ায় চড়ে—

ইরা আবার তার বিশাল চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত করে বললো, ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলেন?

—আমরা লোকেশনের থেকে ঘোড়ায় চেপে চলে গিয়েছিলেম পশ্চিমমুখে, পাহাড়ের দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে. সেই ঘন জঙ্গলে সূর্যের আলো ঢোকে না—হঠাৎ যখন আমরা নদী দেখতে পেলাম—কি নির্জন সুন্দর সেই জায়গাটা, মনে হয় সন্ধ্যেবেলা অপ্সরীরা সেখানে খেলা করতে আসে। আমরা সারা রাত ছিলাম সেই নদীর পারে, জ্যোৎস্নায় জলের ঝিকিমিকি দেখে সত্যিই মনে হচ্ছিল—

অবিশ্বাসী লোপামুদ্রা অবাক হয়ে দীপুকে জিজ্ঞেস করলো, কি করে বুঝলেন সেটাই কারো নদী? নদীর গায়ে তো আর নাম লেখা থাকে না?

—নদীর গায়ে নাম লেখা থাকে না ঠিকই, কিন্তু এক একটা নদী দেখলেই চেনা যায়। তা ছাড়া, কাছেই একটা বাংলো পেয়েছিলাম, সেই বাংলোর নাম কারো ভিউ। অনেক সাহেব টাহেব সেই বাংলোতে বেড়াতে আসে ওখানকার দৃশ্য দেখবার জন্য।

ইরা বললো, ঐ জঙ্গলে কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই?

—আমরা হাতির পাল দেখেছিলাম দূর থেকে। বাঘের ডাকও শুনেছি। নদীর পাশে দেখেছি হরিণ। আমাদের সঙ্গে তো বন্দুকও ছিল. আমার ঐ বন্ধু অরূপ—ও তো খুব ভালো শিকারী।

স্টেশন আসবার বেশ খানিকটা আগেই ওরা সবাই নেমে গেল। দীপু উঠে দাঁড়িয়ে ওদের বেরিয়ে আসার জায়গা করে দিল। ইরাকে একবার ছোঁবার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল তার—কিন্তু লুকিয়ে-চুরিয়ে ছুঁতে তার একটুও ভালো লাগে না। ইরাকে বললো, খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে। আবার দেখা হবে।

—টাটানগরে আবার আসবেন? যদি আসেন, শাকচিতে আমাদের বাড়ি—

—টাটানগরে আসবো কিনা জানি না। কিন্তু যেখানেই হোক, আবার দেখা হবে।

ওরা চলে যাবার পর অরূপ আবার বসে একটা হাঁপ ছাড়লো। বললো, ওদের ঐ ঝুড়ি ঝুড়ির মিথ্যে কথা বলে তোর কি লাভ হলো?

—মিথ্যে কথা কোথায় বললাম?

—সব ডাহা গাই, আবার বলছিস—

—মিথ্যে ঠিক নয়, আমার এগুলো কল্পনা করতে ভালো লাগছিল, তাই বলে গেলাম। খুব যেতে ইচ্ছে করে তো, তাই এমনভাবে বললাম—যেন সত্যিই গিয়েছি! মেয়েগুলোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না—আমাদের সত্যি পরিচয় ওরা জানতেও পারবে না—ওরা ভাববে, এখনো এমন মানুষ আছে, যারা ঘোড়ায় চড়ে নদী আবিষ্কার করতে যায়—কখন কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এই সব রোমান্টিক ব্যাপার কল্পনা করতে ওদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

—তুই যে একটা মেয়েকে বললি, আবার দেখা হবে। তুই বুঝি ঐ মেয়েটার সঙ্গে—

—না, ঐ একটাই মিথ্যে কথা বলেছি। ওর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আর কোনদিন দেখা হবে না। তবু বললাম। (ক্রমশ)

"ছোট বেলা থেকেই উনি আমাকে চিনতেন। একদিন পথে ডেকে বললেন, আজ সন্ধ্যায় এসো ত আমার কাছে, দরকার আছে...। সন্ধ্যা বেলায় তাঁর কাছে যেতেই, উনি সব খুলে বললেন, তাঁর ইচ্ছা। গুপীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য—। বুঝুন, সিনেমায় নামবার কথাই কোন দিন ভাবিনি, আর সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে হিরোর পাঠ। সে চরিত্রের জন্যে এবং যাঁর ছবিতে অভিনয় করার জন্যে বাঙলা দেশের সেরা অভিনেতারা উন্মুখ হয়ে আছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কি না উনি আমাকে—?"

ইতালীর পুরস্কারপ্রাপ্ত—"নিঃসঙ্গ আসন" ছবিতে শিল্পীর ভূমিকায় ফ্রাংকো নেরো —বার্লিনে চাঞ্চল্য আনে

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরোয়া পরিবেশে গল্প করতে করতে তপেন চট্টোপাধ্যায় যখন সে গল্প করছিলেন, তখনও তাঁর কথাবার্তা, হাব ভাব আর বিস্ময় বোধ দেখে মনে হচ্ছিল—এখনো যেন তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না—তপেনই সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিতে গুপীর চরিত্রে এত মন মাতানো পরিপূর্ণ সার্থক অভিনয় করেছেন। "বাঘা" রবি ঘোষের মুখেও ঠিক একই বিস্ময়! এ-ই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়। যিনি রূপকথার গল্পের মত রাখাল বালককে ধরে চলচ্চিত্র রাজ্যের রাজকন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন।

আসর জমেছে আমাদের মাননীয় কনসাল জেনারেল পি দাশগুপ্তের বাড়ীতে। বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে যাঁরা এসেছেন, সস্ত্রীক পুত্র সহ সত্যজিৎ রায়, অভিনেতা রবি ঘোষ ও তপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক-পরিবার রাখাল দত্ত ও অসীম দত্ত, দু'একজন সাংবাদিক এবং স্থানীয় বেশ কয়েকজন ভারতীয় সুধীজনকে শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রীমতী দাশগুপ্তের রান্না ও ভোজ্যবস্তুর আয়োজন যে কত প্রসংশাযোগ্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল—আরেক বার "বাঘা" ও "গুপীর" খাবারের দৃশ্যে। শুটা যেন আপনা থেকেই ঘটে গেল। এবার সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায় নয়। সভার মাঝখানে সবাই যখন খেতে ব্যস্ত, তারই মধ্যে উপস্থিত সবার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল —"গুপী" আর "বাঘা"র সাঁত্যা সাঁত্যা হাত দিয়ে খাবারের দৃশ্যে। একবের পুরস্কার সত্যজিৎ রায়ের নয়—শ্রীমতী দাশগুপ্তের। সেখানে আলোচনা জমে উঠল বাঙলা দেশের সিনেমা শিল্পের সমস্যা নিয়ে।

সত্যজিৎবাবুকে পাওয়া গেল ঘরোয়া পরিবেশে। আপনজনের মত। বলছিলেন বাংলা দেশের, ভারতের ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সমস্যার কথা। নানা বিষয়ে প্রশ্নও করছিলেন তিনি। বিশেষ করে এদেশের ছাত্র আন্দোলনের ওপর। কে জানে, তাঁর মনে আবার কোন ডাক পড়েছে। তাঁকে প্রশ্ন করাতে, তিনি খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছিলেন—কেবল তাঁর ছবিকে নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধেও বাঙলা দেশের একদল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাঁকে কি ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাঁর ছবি তোলার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার চক্রান্ত চালিয়েছে। তিনি বললেন—আমার ছবি তোলার বাধা যদি ও'রা সৃষ্টি করেন, তবে আমাকে বম্বে বা লণ্ডনে ছবি তুলতে হবে। আমাকে আটকাবেন ও'রা কি ভাবে?"

বাঙলা দেশ, বাঙলা দেশের সর্বস্তরের ঘৃণ্য দলাদলি, ঈর্ষাবোধ, স্বার্থপরতা, অর্থ-শিকারের চক্রান্ত কোথায় পৌঁছুলে, সত্যজিৎ রায়ের মত পৃথিবী খ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পীকে দুঃখ করে এ কথা বলতে হয়! বিদেশ থেকে আমাদের দুঃখ হয়—একেই বাঙলা দেশের সমস্যার অন্ত নেই, তার ঘরে বাইরে সমস্যা। একেই হিন্দী আর বাঙলা ছবি প্রায় দেখার অযোগ্য হতে চলেছে—আন্তর্জাতিক পর্যায় ত একেবারেই [illegible]

আপ্যায়নের [illegible] সেখানে আয়োজন ও [illegible] সত্যজিৎ রায়—যাঁর [illegible] মত।

অনেকেই জানেন, বার্লিনের এই উৎসব ঐতিহ্যশালী। তার একটা বৈশিষ্ট্য আমরা গত ১৮ বছর ধরে দেখেছি। বাঙলা দেশের সঙ্গে বার্লিনের যেন এক হৃদয়ের আত্মার

Rani Radovi (Early Works)-এর নায়িকা

সম্পর্ক। সত্যজিৎ রায় তার সেতু। পর পর তিন বৎসরের বার্লিনের সেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকের পুরস্কার অর্জন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর "মহানগর" আর "চারুলতা"র কথা এখনো অনেকের মুখে। একদিকে ভারতের মত চলচ্চিত্র শিল্পোৎপাদনের গজদেহসম্পন্ন ভূরি ভূরি আমোদ-প্রমোদ আর কান্নাকাটির ফিল্মের বিপুল অপচয়, অন্যদিকে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রশিল্পে মাঝে মাঝে অঢেল নগ্নতা—যিনি আর বিকিনিতেও সে নির্লজ্জতা ঢাকে না—তার ব্যভিচারের আনন্দ—এই দুই প্রান্তের মধ্য

...দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অন্য যে কয়জন মহৎ চলচ্চিত্র শিল্পী বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্পকে এখনো বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সত্যজিৎ রায়, ছবিতে যিনি এখনো এক বিপুল ব্যক্তিত্ব। তাঁর আসন আজ এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে অন্য উৎসবে।

আর সব বছরের মত এবারও বার্লিনের এই উৎসব ১৯ বারের মত উৎযাপিত। তবে এবারের উৎসবে অন্যান্য বৎসরের চাইতে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা কম, চলচ্চিত্রের সংখ্যাও কম—তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে আর সব বছরের চাইতে এবারের উৎসব যেন কম জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তবে উৎসবের যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ কান বা ভেনিসে দেখা যায় না, বার্লিনে তা আছে। বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসব যতটা না বার্লিনবাসীর বা জার্মানদের তার চাইতে অনেক বেশী যেন বিদেশী চিত্র প্রযোজক, চিত্র পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী আর সাংবাদিকদের। জুন-জুলাই-এর এই সময়টা যেন সত্যি এই বিদেশীদের বার্লিন মস্ত আপন করে নেয়। বার্লিন গভর্নমেন্টের এই সমগ্র প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছেন তার কর্ণধার। বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবকে পশ্চিমী চলচ্চিত্র আন্দোলনের অলিম্পিক বলা চলে। যদিও কান ও ভেনিসের তুলনায় বার্লিনের স্থান হয়ত কিছুটা নীচে, তবু বার্লিন চলচ্চিত্র ব্যবসার বাণিজ্যিক কেন্দ্র। কেবল বাণিজ্য করার নামে ভারতের হিন্দী ছবির যাচ্ছে বিকৃতির নিদর্শনের জন্যে ভারত সরকারের কিছু বিদেশী মুদ্রার অপব্যয়। যেসব ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন, তাঁদের প্রদর্শিত ছবি ত একটাও বিক্রি হয় না—উপরন্তু এই ছবি দেখার পর বিদেশী কয়েকজন সংগ্রহ করা দর্শকদের মুখেতে কষ্ট হয় না—ভারতের অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাদগতি কেন?

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, নাটক আর সাহিত্যের মত মহান আসন চলচ্চিত্র কোনদিন পাবে কি না, আজও সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। তবে চলচ্চিত্র শিল্প যে আজ এক বিপুল শক্তির অধিকারী, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে নতুন যুগের তরুণ চিত্র পরিচালকেরাও। আর তাঁদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক নতুন অতি সচেতন দর্শক সমাজ, বহু অসংখ্য ছোট ছোট পুষ্পিত প্রেক্ষাগৃহ বক্স অফিস যাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য নতুন শিল্প আর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পর্দায় তুলে ধরার। আমাদের দেশে আজকাল কিছু ফিল্ম ক্লাব গড়ে উঠেছে। মুষ্টিমেয় কিছু, সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের কপাল ভাল। সেখানে অক্ষত অবস্থায় বিদেশী ছবির সবটুকু সৌন্দর্য গ্রহণ করবার সুযোগ ঘটছে। যৌন দৃশ্যের অজুহাত তুলে আমাদের দেশের বহু চিন্তাশীল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই সব ছবিকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলে আসছে। প্রশ্ন জাগে, তাতে আমাদের দেশের মানুষের চরিত্র কি এ দেশের মানুষের চাইতে ভাল থাকছে? না, যাঁরা এই সব ছবি দেখছেন, তাঁরা কি সাধারণ মানুষের চাইতে বেশী চরিত্রবান? গত এক শ বছরের ইউরোপের বিভিন্ন বিপ্লব, যুদ্ধ আর যন্ত্র সভ্যতা তথা নাগরিক সভ্যতা মানুষের যৌন সম্পর্কের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে, তার ফলাফল দেখি আমরা আজ রূপালী পর্দায়। ইনগমার বার্গম্যানের "দি সাইলেন্স" ছবির পর সারা ইউরোপে যে ঝড় উঠেছিল, তা এখন শান্ত। যৌন

ভারতীয় পরিচালক হুসেন-এর পরিচালিত ব্রিটিশ ছবি—"A touch of love"-এর কয়েকটি দৃশ্য

দৃশ্যগুলি এখন দর্শকদের খুব একটা বিচলিত করে না। বরং যৌন দৃশ্য বহু স্থলে ছবির একটা শৈল্পিক ফোর্স তৈরি করছে। তার জন্যে প্রয়োজন, শুধু সুষ্ঠু প্রয়োগ। জাপানও তাকে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও এমন একটা সময় আসবে, যখন তাকে আর আটকে রাখা যাবে না। সেদিনের জন্যে এখন থেকেই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ চলচ্চিত্রবিদ ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের চিন্তা শুরু করা উচিত। সেদিন শ্রীদাশগুপ্তের বাড়িতে সত্যজিৎ রায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশানের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ শর্মাকে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছিলাম। আমাদের দেশে সবই শুরু হয়—তবে বড্ড দেরিতে। আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক চরিত্র যেখানে নেমে এসেছে, শিল্প ও সাহিত্যের সুস্থ খোলামেলা আবহাওয়ার এর চাইতে বেশী খারাপ হবার চান্স নেই। আর লুকিয়ে লুকিয়ে খারাপ ছবি দেখা, খারাপ গল্প পড়া আর খারাপ আলোচনা করার চাইতে, সিনেমার হলে গিয়ে দু'একটা খোলামেলা ছবি দেখলে দেশের মানুষের মনটাও খোলামেলা হবে। ফেলিনির "৮½" ছবির মত বলতে ইচ্ছা করছে—"আমি নৈরাশ্যবাদী নই—আমি বিশ্বাস করি, মানুষ তার আত্মিক সত্তাকে ধীরে ধীরে জয় করে নিচ্ছে।"

আজ দ্বিধা বিভক্ত পৃথিবীতে দেশে দেশে যখন যুদ্ধ আর ধ্বংস, হত্যা আর ঘৃণার জর্জরিত পৃথিবী, সে সময় কোন নতুন আলোর আশা—বিশেষ করে জর্মানীর দ্বিধা দ্বিখণ্ডিত রূপকে নতুনভাবে এক মঞ্চে সব রাজনৈতিক তিক্ততাকে ভুলে গিয়ে শিল্পগত-ভাবে সমস্যার সমাধান খোঁজার যে আয়োজন তার সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা দেখি, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এই চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্যে বার্লিনের ফিল্ম কমিটির তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে। আর দর্শকদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষা পুরাতনকে ভেঙে চলচ্চিত্র উৎসব নতুনকে দেখবে, তার জন্যে যে শিল্পা-ন্দোলন, তার সারথিরা যে তরুণ চলচ্চিত্র-কারেরা হবেন, সে আশা নিয়েই দেশ বিদেশ থেকে এই ইউরোপ সেন্টারে মানুষের সমাবেশ।

তবে এবারের জয়টা ছিল তরুণদের, তরুণেরও বটে। বারলিন ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালের যারা রথী মহারথী ছিলেন, তাঁরা সবাই অভিমন্যুদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। জাঁ-লুক গদার, সত্যজিৎ রায়, কার্লো সাউরা, পাসোলীনি, রড স্টাইগার আর রিচার্ড লেসটারদের। কেউই পুরস্কার পান নি। জয় হয়েছে বামপন্থীদের, মাও পন্থীদের আর অতি তরুণ পন্থীদের। দর্শকদেরও।

প্রশ্নটা বামপন্থী দর্শকদের নয়। প্রশ্নটা APO (আইন সভার বাইরের বিরোধী পক্ষ) SDS (জর্মান সোস্যালিস্ট ছাত্র সংস্থা) বা

সমগ্রশালী তরুণ সমাজের আন্দোলনের প্রশ্ন নয়, সমস্ত নিপীড়িতের প্রশ্নও নয়, প্রশ্নটা বিপ্লবতত্ত্বের দ্বন্দ্ব, বাঙলা দেশের সকলকাল-পন্থী বা ৬৮ সালের ফরাসী দেশ অভ্যুত্থানের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা কোন রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোর নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে—একটা ফিল্মের উৎসবে আজ আমরা কি আশা করি?

কোন শিল্পী কতটা নিখুঁত শিল্প দেখাতে পারলেন, কে কত সুন্দর কাহিনী পরিবেশন করতে পারলেন, কে দর্শকদের কতটা আনন্দ দিতে পারলেন,—শুধু সেই উদ্দেশ্য। না, সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর নগ্ন সমস্যাগুলি আর বর্তমানের ঘটনা—প্রতি ঘটনাগুলির ওপর ভিত্তি করে, শিল্প আমাদের জীবন ও পৃথিবীকে দেখাবার চেষ্টা করবে শিল্পসম্মতভাবে।

দুঃখ হচ্ছে ৩০ বছরের অনূর্ধ্ব যুবক হুসেনের পরিচালিত তিউনিসের ছবি—"A touch of Love" ছবিটা কেন যে পুরস্কার পেল না। এত সুন্দর একটা ছবি—যা আমাদের সমাজের একটা বিরাট সমস্যাকে অতি মনোগ্রাহীভাবে সকলের সামনে উৎসবে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছে। একটি ছাত্রী হঠাৎ করে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে, কি হয়—সেই সমস্যাকে অভিনেত্রী মানাফ ভেঙিস অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। হুসেনের জয়ের মালা দর্শকরা দিয়েছেন।

ফিল্ম কমিটি পুরস্কার দিয়েছেন নিম্নলিখিত ছবিগুলিকে—

প্রথম পুরস্কার—

(বার্লিনার স্বর্ণ ভল্লুক)

RANI RADOVI (Early Works)

যুগোস্লাভিয়া।

বিচারকরা বলছেন—

"For its challenging confrontation of ideology and reality, and for the casual brilliance with which it humanizes political abstractions to make a drama as modern in its form as in its content."

এবার শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আর অভিনেত্রীর জন্যে পৃথক পৃথক পুরস্কার বার্লিনার রৌপ্য ভল্লুক প্রদান না করে, আরো ৩খানি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকে তাদের সামগ্রিক শিল্প কর্মের জন্যে বার্লিনার রৌপ্য ভল্লুক দেওয়া হয়েছে। বিচারকরা বলছেন—শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্ভর করে প্রায় সামগ্রিক ছবির ওপর। তাই তাঁরা সামগ্রিকভাবে ছবিগুলিকেই পুরস্কার দিচ্ছেন।

বার্লিনার রৌপ্য ভল্লুক

BRAZIL ANO 2,000

পরিচালক—ওয়ালটার লিমা; বিচারকদের অভিমত—

"For its unhackneyed theme and lively characterisation."

বার্লিনার রৌপ্য ভল্লুক

Made in Sweden (সুইডেন)।

বিচারকরা বলছেন

"For its force of argument and the courage with which its director has unhesitatingly affronted one of the most sensitive aspects of modern life."

ছবিটাকে ধনতন্ত্রবিরোধী ছবি বলা চলে। ২৪ বছরের তরুণ পরিচালক Johan Bergenstrahleকে বাহবা দিতে হয় তাঁর প্রচণ্ড নির্ভীকতার জন্যে—যে ভাবে তিনি এই ছবির মধ্যে দিয়ে নিজের দেশের—সেই সঙ্গে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতির নগ্ন চরিত্রটা তুলে ধরেছেন, তার জন্যে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে ওদিকের লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত পৃথিবীর যত অনুন্নত দেশ আছে

সেই সব দেশগুলির কদর্যতার আর বন্য সভ্যতার বাজিতে ইউরোপ-আমেরিকার কাছে অর্থ সংগ্রহের শিকার ছবি। তার সমরূপ দেখা যায় Bergenstrahle এর Made in Sweden ছবিতে। তাঁর ছবিতে দেখতে পাই ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে থাইল্যাণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের সমাবেশ, তাঁদের শৌখিন ব্যবহার আর পোশাকের অন্তরালে কুৎসিত অস্ত্রের ব্যবসা। তাঁর ছবিতে দেখতে পাই ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের চরম পরিণতি—কলকাতা, বাণারসী আর দিল্লীর পথ থেকে তোলা ভয়ংকর সব দৃশ্যাবলী—যে সব দৃশ্য চোখে আর সহ্য না করতে পেরে, হলের অর্ধেক দর্শক চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল। গল্প হচ্ছে—

Joerjen একজন মেধাবী মানুষ। জীবনে অনেক বারই সে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নষ্ট করেছে প্রতিবাদ মিছিল আন্দোলন আর রাজনীতি করতে গিয়ে। অর্থ তার জীবনের কোন নীতিই নয়। ধনোপার্জন না করে, তাই করে সে নির্ভীক সাংবাদিকতা। তার বান্ধবী Kim-এর ভালবাসা আর রাজনৈতিক লেখা তার জীবনের সম্পদ। কিম পড়াশুনা করে সমাজতত্ত্ব। তারা প্রায়ই নানা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করা। তাদের সব চাইতে বেশী বিচলিত করে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দুঃখ দুর্দশা। তাদের সামনে প্রশ্ন দেখা দেয়—কিভাবে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি দিনেদিনেই এইসব অনুন্নত দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করে চলেছে। তাদের আন্দোলন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। নানা ঘটনা চক্রে একদিন Joerjen ও Kim আবিষ্কার করে তারা যাদের হয়ে কাজ করছে তারাও এক বিরাট অর্থের শিকার সন্ধানী এবং এই দলটা তাদের দুজনকেও দলে ভিড়িয়ে ফেলেছে। সেই ফার্মের হয়ে তাদের যেতে হয় ব্যাংককে—যেখানে ভিয়েৎনামের বিশাল ছায়া এসে পড়েছে, যে সুযোগে সেই থাইল্যাণ্ডের নির্জন শৌখিন বাংলোগুলিতে পৃথিবীর ধনকুবেরদের বাগানে চলছে ডলার-পাউণ্ড-মার্কের পাশা খেলা। Joerjen বান্ধবীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে থাইল্যাণ্ডের জলপথে—কোথায় ভেসে চলেছে গোপনে তার ফার্মের কুৎসিত গোপন ব্যবসা—অস্ত্র সরবরাহ, সেই উৎস খুঁজতে। তাঁদের জীবন সেখানে বিপন্ন হয়ে পড়লে, তারা আবার ফিরে আসে সুইডেনে। প্রেস কনফারেন্সে ফাঁস করে দেন তার ডকুমেণ্টারী ছবির মাধ্যমে তার ফার্মের নগ্ন চেহারা। শেষ দৃশ্যে দেখাচ্ছেন তিনি বাঙলা দেশের এক শহরতলির নদীর ধারের দৃশ্য, যেখানে গরীব মানুষেরা আনন্দ উৎসব করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে প্রতিমা বিসর্জন দিতে। সেখানে তিনি বলছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে—এইসব গরীব শান্তিকামী মানুষেরা কোন যুদ্ধের কামান বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না, তারা যাচ্ছেন তাঁদের উৎসবের প্রতিমা বহন করে।"

এই ছবি দেখার পর মনে প্রশ্ন জাগে—আমাদের দেশের সমস্যার ছবি বোধ হয় এখন থেকে বিদেশী ছবির মাধ্যমেই দেখতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য দেখতে হবে জাঁ-লুক গদারের "আনন্দিত বিজ্ঞান" ছবিখানি, নয় তো ইতালীর "His glorious day" কিংবা পাসোলিনির ছবি "Amore e rabbia" (আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব)। এই-সব ক্ষেত্রে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প নির্বিকার— তাঁদের লক্ষ্য কেবল বক্স অফিস। দেখতে হয়—কি ভাবে ইউরোপ এগিয়ে চলেছে।

বার্লিনার রৌপ্য ভালুক

"Ich bin ein Elefant, Madame" (আমি একটি হাতি, মহাশয়া)—পশ্চিম জারমানির জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি। বিচারকরা বলছেন—

"For the freshness, intelligence and technical confidence of its direction."

ছবিটিতে দেখতে পাওয়া যায় বর্তমানের জারমান স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের সমস্যা ও কারণ। ছবিটার মধ্যে দিয়ে পরিচালক Peter Zadek বর্তমান জারমান সমাজটা ও যুব সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলিকে তীক্ষ্ম ব্যাঙ্গাত্মক দৃশ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আর দেখিয়েছেন Rull-র মত ছাত্র যাঁরা, যাঁরা বিপ্লব করে এই সমাজটাকে বদলাবার চেষ্টা করেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই অতি অবস্থাপন্ন সমাজ ব্যবস্থায় একা সঙ্গীহীন।

বার্লিনার রৌপ্য ভালুক

Greetings (আমেরিকা)

বিচারকদের মত—

"For its light-hearted non-conformity and immaculate teamwork of its actors and directors."

"শুভেচ্ছা" বইটি যেন আমেরিকার আর এক সমাজের সম্ভাষণ এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবিটা আমেরিকা থেকে প্রতিবাদ ছবি হিসাবে এই উৎসবে যোগদান

বাহুমূলে
চুল থাকলে
এ রূপের কী দশা
হত ভাবুন তো...
কুঞ্চিত, অবাঞ্ছিত চুলের জন্যে আপনার অমন সৌন্দর্য কেন মাটি হতে দেন? এই বালাই এখন আপনি অনায়াসে দূর করতে পারেন। উঁহু, ক্ষৌরকর্মের ধার দিয়েও যাবেন না। ওসব পুরুষদেরই সাজে। তাছাড়া, কামালে চুল তাড়াতাড়ি বাড়ে...কড়াও হয় বেশি। ব্লীচ করবেন? লোকে দেখলেই ধরে ফেলবে। তার চেয়ে এ আপদ দূর করার ঢের সহজ নিরাপদ এক রমণীয় উপায় আছে। সে হল মৃদু সুবাসিত অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার। শুধু একটু লাগিয়ে দিন। তারপর মিনিট কয়েক পরে মুছে ফেললেই...ব্যাস। আর নেই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একেবারে ঝকঝকে তকতকে...মসৃণ ছিমছাম।
Anne French
অ্যান ফ্রেঞ্চ
হেয়ার রিমুভার
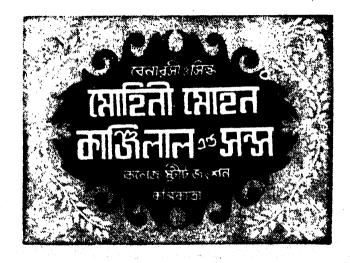
করেছে। এই প্রতিবাদ একদল আমেরিকান যুবকের, একদল ভবঘুরের যারা আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতাকে মানে না, বরং প্রতি পদে পদে ব্যঙ্গ করে বেড়ায়, যারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাঁরা এই ছবির মধ্যে দিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, আর খাস আমেরিকান সমাজের ছবিকে এত সুন্দর তীব্রভাবে কটাক্ষ আর ব্যঙ্গ করে তার নগ্ন রূপটাকে দেখিয়েছেন যে, কেবল ছবির শেষে নয়, পুরস্কার বিতরণের দিনও এই ছবিটিকে পুরস্কার দেবার সময় সমস্ত হল উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাঁদেরও প্রতিবাদ যেন বর্তমান আমেরিকান সভ্যতার বিরুদ্ধে। অভিনন্দন জানাতে হয় ফিল্ম ফেসটিভাল কমিটিকে—যে তাঁরা এবার "Made in Sweden", "Greetings", "Early Works", গদারের "Happy Science", ইতালীর "তার গৌরবময় দিন" আর পোসোলীনির ছবির মত সমস্ত রাজনৈতিক সচেতনময় সুন্দর ছবিগুলিকে এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের এক নতুন রাজনৈতিক বিশ্ব চেতনাকে স্থান দিয়েছেন—যেখানে রূপ পেয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র আন্দোলন, যুব চেতনা, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অনুন্নত দেশগুলির ওপর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নিজের জাতি ও সমাজের তীব্র সমালোচনা, যেখানে আলোচিত হয়েছে, ব্রেখ্‌ট, মার্কস্‌, চি গুয়েভারা, মাও সে-তুং আর বিপ্লবের কথা। চলচ্চিত্র মানে কেবল কাহিনী আর গল্প হবে— ছবি দেখাতে কেবল মানুষ অবসর বিনোদন হবে—তার বিরুদ্ধে যেন এবারের বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসব এক মূর্ত প্রতিবাদ। চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার করে এই সমাজে বিপ্লব ঘটাতে হবে, মানুষকে পরিবর্তন করাতে হবে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে, সমাজের যা কিছু স্থবির চিন্তা আর চিন্তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে—তারই রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র যেন এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সচেতনতার জন্যেই প্রথম পুরস্কার পায় যুগোস্লাভিয়ার "Early Works", তার গল্প বলছে—

"রূপবতী তরুণী মেয়ে যুগোস্লাভার চুলে সোনা ঢেলে দিয়েছে ব্লনড রঙ, তার দেহের গঠনে এতটুকু খুঁত নেই—সেই সঙ্গে আছে এক নিষ্পাপ হৃদয়। তার বাবা ছিলেন—"কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন।" সেই জন্যে যুগোস্লাভাকে, তার মাকে আর তার বোনকে কঠোর পরিশ্রম করে জীবনযাপন করতে হয়েছে। একদিন যুগোস্লাভার অন্তরে জেগে ওঠে এক তীব্র ইচ্ছা—এই পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করতে হবে। তাই একদিন আর তিন সাথীর সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে জ্ঞানী পুরুষ কার্ল মার্কস-এর বাণীকে রূপ দেবার জন্যে—কি ভাবে মানুষ তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে। তারা সাত পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে বন বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে। প্রথম প্রথম জনসাধারণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, যেহেতু তারা ন্যায়ের জন্যে এবং সুন্দর জীবন যাত্রার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু দিনে দিনেই সেইসব মানুষকে যখন এদের লক্ষ্যের জন্যে সংগ্রাম করতে হয়, তখন তারা কেটে পড়ে। যুগোস্লাভা। তার দেহের ব্যাপারে খুব উদার। সে অতি সহজেই বন্ধুদের জন্যে তার দেহকে উৎসর্গ করে। কিন্তু তার আত্মা বাঁধা পড়ে থাকে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বপ্নের সাথে। যখন যুগোস্লাভা ও তার বন্ধুরা দেখল, কেউ তাদের কথায় আন্দোলন চালাচ্ছে না, নতুন জীবনের জন্যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত নয়, তখন তারা ঠিক করল—তারাও জনসাধারণের ভাগ্যের কাছে তাদের ভাগ্যকে আত্মসমর্পণ করার এবং জনসাধারণের দুঃখের সঙ্গে তাদের দুঃখকে জড়াবার। কিন্তু দিনে দিনে যতই তারা দুঃখ সিদ্ধান্তে আসতে লাগল—এই পৃথিবীটা বড় নোংরা, এবং এই পৃথিবীর মানুষ অসৎ, স্বার্থপর আর কুৎসিত এবং তাতে যুগোস্লাভার জীবনে কেবল দুঃখই বাড়ছে, তখন তারা তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করল। তারা যুগোস্লাভার সুন্দর দেহে পেট্রোল ঢালল, আগুন ধরিয়ে দিল, সে পুড়ে গেল। তার আত্মা আকাশে ভেসে গেল। যারা পেছনে পড়ে রইল, তারা আবার আমোদ প্রমোদে মেতে উঠল।"

"গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি সেদিন Zoo-Palast-এর দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। দর্শকরা ছবিটি খুবই উপভোগ করেছে, যদিও অনেক জায়গায় বাংলা ছবির রস উপলব্ধি করতে পারে নি। ছবিটির সমালোচনার ব্যাপারে এদেশের পত্রিকাগুলির মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়, বার্লিনের দৈনিক পত্রিকা "দেয়ার ডাগেসস্পিগেল" সত্যজিৎ রায়ের উপস্থিতিকে উচ্চ কণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়। স্প্রিংগারের ২য় শ্রেণীর পত্রিকা "মরগেন পোস্ট" ছবিটির প্রশংসা করে, বিশেষ করে সঙ্গীতের। "গুপী গাইন ..." ছবির সঙ্গীত এদেশের দর্শকদের মন জয় করেছে। অন্যদিকে পশ্চিম জরমানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী দৈনিক পত্রিকা ফ্রাংকফুরটার রুন্‌ড্‌শাউ-র অভিযোগ ফিল্ম কমিটির বিরুদ্ধে এ ধরনের একটা রূপকথার গল্পের ছবিকে চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হল কেন?

সত্যজিৎবাবু অবশ্য এখানে প্রেস কন্‌ফারেন্‌সে বলেছেন রূপকথার আগাত্ত কি? দেশে সমস্যা আছে, সেই সমস্যা জর্জরিত অবস্থা থেকে দেশের লোক একটু আনন্দ পেতে চায়। তিনি এই ছবির মধ্যে দিয়ে সেই আনন্দই উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

রূপচর্চায়

প্রসাধনী

শোক-সংবাদের স্তম্ভে

খবরটা বেরিয়েছে দৈনিক পত্রের শোক-সংবাদের স্তম্ভে—আঠারো বছরের অশোক সোমের মৃত্যু-সংবাদ।

পাঁচ-ছ' বছর আগে—অশোক পড়ত তখন আমাদের পাড়ার বহুমুখী এক হাইস্কুলে—প্রায়ই আসত আমার কাছে : আসত ওর নিজের আঁকা ছবি দেখাতে, আসত নিজ-রচিত কবিতার ছন্দ ঠিক করতে, প্রায়ই আসত বিনা কারণে। প্রাইজ পেত না, ফেল করত না, খেলাতে না ফার্স্ট ইলেভেনে—অতি সাদাসিধে সাধারণ ছেলে। ওর বাবার সঙ্গে আমার একটিবারও আলাপ করার সুযোগ হয় নি; ওঁর না কি বিরাট কারবার : বিলেত থেকে মাল-আমদানি।

মধ্যস্তরে উত্তীর্ণ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে, সেকেণ্ড ডিভিশনের সার্টিফিকেট নিয়ে অশোক পড়তে গেল কি জানি কোন্ কলেজে। হাজার কাজের ব্যস্ততায় ওর খোঁজখবর নিইও নি, পাইও নি...আর আজ কাগজের শোক সংবাদের স্তম্ভে...

পুরানো ডায়েরি ঘেঁটে উদ্ধার করলাম অশোকদের বাড়ির ঠিকানা। চাপলাম বালিগঞ্জের বাসে, গড়িয়াহাটা অভিমুখে। দারোয়ান জানাল, "বাবু তো দেড় বরষ হুয়া মর গয়া..." কিন্তু হাঁ, অশোকের মা আছেন।

আমারই দোষ

প্রথমে চিনতে পারি নি তাঁকে—এলো-মেলো শুভ্র কেশ, তুবড়ে-পড়া ফেকাশে গাল, অনিদ্রাপূর্ণ চোখ। বসতে বলে তিনি নিজেও বসলেন, আমার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে। রাস্তা থেকে আসছিল ট্রামের ঘণ্টা, রিকশার ঠুং ঠুং, বাসের হর্নের উদাসীন ঐকতান। খুঁজছিলাম কিছু বলতে, যা হোক কিছু, সান্ত্বনার কিছু, সহানুভূতি আর সমবেদনার।

সম-বেদনা...কথাটা আমার কানে যেন কেমন শোনাচ্ছিল। আমার না কি আছে বেদনা, সেই পুত্রহারা বিধবার বেদনার সমান ?... পাড়তে লাগলাম ভগবানের মঙ্গল বিধানের কথা, পরমপিতার রহস্যময় পরিকল্পনার কথা। তিনি শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকলেন, "আমার দোষ, আমারই দোষ...আমিই অশোকের মৃত্যুর কারণ!"

"আপনি ও-সব বলছেন কেন ? আপনি তো ওকে কত ভালোবাসতেন, আপনি ওর কত সেবা-শুশ্রূষা করেছেন।"...কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, আমি ভুল বলেছি—মারাত্মক ভুল। তিনি একটু যেন অবাক হয়ে চুপি চুপি বলতে লাগলেন, "তাহলে জানেন না ? শোনেন নি এখনও ? অশোক আত্মহত্যা করেছে...আমার দোষে।"

আমি কিছু বলার আগে তিনি উঠে আলমারির এক ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন, "পড়ুন, বুঝবেন সবই। ওর জামার পকেটে পাওয়া গেছে—স্লীপিং পিল্-এর খালি বাক্সের মধ্যে।"

পড়লাম—আর বুঝলাম অশোকের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

অশোকের চিঠি

"পূজনীয়া মা, জীবিত অশোকের জন্যে তোমার সময় ছিল না; মৃত অশোকের জন্যে পাবে কি সময় ? আমাকে তুমি ক্ষমা করবে কিনা, জানি না; বুঝবে কিনা তাও জানি না। 'যাও...আমার এখন সময় নেই...' কথাটা তোমার মুখে কত শুনেছি, মা! আজ আমার জন্যে তোমাকে সময় করতেই হবে। জানি, বাবার মৃত্যুর পর থেকে তোমার কাজ বেড়েছে খুব, তোমার হাতে ব্যবসারও উন্নতি হয়েছে প্রচুর; মানি সব, তুমি ছিলে ব্যবসা-সর্বস্ব মা। তোমার কত-না ছিল জরুরি কাজ—চিঠি লেখা, বিল্ সই করা, অফিসে অফিসে মিটিং, বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রণ—এত জরুরি কাজের মধ্যে তোমার অশোকের জন্যে সময় ছিল কই ?

"আমার স্নেহতৃষিত, স্নেহবঞ্চিত অন্তর এমন এক মাকে চাইত, মা, নির্মলের মা-র মতো। জানি, তিনি সুন্দরী নন, শিক্ষিতা নন, আধুনিকাও নন; জানি, তোমাদের

একটা কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন

উনিশ

বর্ধমানের কয়েক স্টেশন আগে ডাউন লাইনের ধারে এক নিরালা জায়গায় ঝাঁকড়া গাছের একজন লোক কলকাতার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। দুঃখী লোকটা। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে বেঁচে আছে, পৃথিবীতে, আজ তার শেষ দিন। রেললাইন বাঁক নিয়ে চলে গেছে পশ্চিমের দিকে উদোম মাঠের ভিতর দিয়ে। নিষ্ফলা মাঠের ওপাশে প্রকাণ্ড সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পূবে বহু দূর থেকে হরেন সাঁইয়ের ধানকলের শব্দ আসছে ধকাধক। নাবাল জমিতে এখনো জমে আছে গত বর্ষার জল, ব্যাঙ ডাকছে। একটু আগে হালকা একটা মেঘ বৃষ্টি দিয়ে গেল। বেশ বিকেলটি—জলে-ভেজা মাঠঘাট পড়ন্ত রোদে পাকা ফসলের মতো দেখায়। দুঃখী লোকটা দেখে। কাঁধের গামছাখানা নিয়ে চোখের জল মুছে নেয়। বেশ বিকেলটি বড় সুন্দর! যদি এমন সুন্দর হত জীবন—এমন ভরভরন্ত নিস্তব্ধ বিকেলটির মতো! কিন্তু তা তো হয়নি। বাবার ঋণ ছিল অনেক, জমি চলে গেল মহাজনের ঘরে। ভাগচাষে চলছিল দিন—কিন্তু পর পর দু বছর অজন্মা। ধানের দর পড়ে গেল। হরেন সাঁইয়ের কলে ঝাড়াই হচ্ছে তারই বোনা কাটা ধান। এখন আর তার কোনো দুঃখ নেই—এক্ষুনি রেলগাড়ি চলে আসবে—ধড়ফড়িয়ে হেঁকে সাঁইমশাইয়ের। ঝাড়া হাত পা তার, কাঁদবার কেউ নেই—এক বোন বারুইপুরে মেয়েটার কাছে খবর যায়! তা সে খবরও যাবে দুলকি চালে—পৌঁছতে পৌঁছোতে মাসখানেক—ততদিনে হাওয়া-বাতাসে জলে-মাটিতে মিশে কোথায় চলে যাবে সে! তার খানিকটা চলে যাবে আকাশে, মেঘ হয়ে চোখের জল ফেলবে, তার আর খানিকটা মাটিতে মিশে বুকে করে নেবে সেই জল, তার আর খানিকটা হু-হু বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে ধানের আগা দুয়ে চলে যাবে কোথায়! দুঃখী লোকটা তার চারধারে অলৌকিক বিকেলটা দেখে নেয়। ফলিডল কেনারও পয়সা ছিল না বলে সে আড়াই মাইল হেঁটে এসেছে রেল-রাস্তা পর্যন্ত। উঁচু জমিতে দাঁড়াতেই ফুরফুরে হাওয়া লাগছে। বাতাসে এখন বড় আদর। সেই আদরে বাতাস সত্যিই একটা শব্দ নিয়ে আসে। গুরুগুরু শব্দ। দূরে রেলব্রিজে উঠে এল গাড়ি। তারপর পায়ের নীচে মাটি চড়াইয়ের বুকের মতো কাঁপে। মাইলখানেক দূরে বাঁকের মুখে পিঁপড়ের সারির মতো কালো ট্রেনখানা উদোম মাঠের ওপর দিয়ে চলে আসছে। ড্রাইভার সাহেব দেখে ফেলবে। লোকটা দু কদম নেমে যায় ঢালু বেয়ে। উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরায়। খুব জোরে টানতে থাকে। বাঁকের ওপর দিয়ে পাক মেরে আসছে গাড়িখানা। বিড়ি ফেলে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। গামছা-খানা জড়িয়ে নেয় মুখে, তারপর দুই লাফে উঠে আসে ঢালু বেয়ে। গামছার আবছায়ার ভিতর থেকে একবার কালো ট্রেনখানা দেখে, মার মার ক্ষ্যাপা শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলে—ব-কু-ল, যা-আ-ই! বাতাসের একটা ধাক্কা লাগে জোর।

অনেক হিজিবিজি দেখতে পায় লোকটা। দেখে কোমরের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত একটা রেলগাড়ির কামরা। কিন্তু খুব ভার লাগে না। তার শরীরের ভিতর দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে—ভিজে যাচ্ছে ঘাস মাটি। সে জলের জন্য একবার হাঁ করে। দু' বার তিন বার। মুখে কথা ফোটে না। ঘাড়টা কাত হয়ে যায়। অনেক মানুষের পা বৃষ্টির মতো মাটিতে পড়ছে। অনেক লোক—অনেক লোক—কথা বলছে। কিন্তু সে কেবল অন্তরে নদীর শব্দটা শোনে। তার শরীরের ভিতর থেকে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। সে জলের জন্য হাঁ করে। কেউ তার কথা বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে বৃষ্টির জলে যেন ধুয়ে যাচ্ছে মুখগুলো! সে জলে

চোখের—জল। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ আবছায়ার মধ্যে কোথা থেকে সুন্দর একখানা মুখ তার মুখের ওপর নেমে আসে। বড় সুন্দর মুখ—দয়াল দুটি জল-ভরা চোখ। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এইরকম—এইরকম একজন মানুষ-কেই সে তো সারাজীবন নিজের অজান্তে খুঁজেছে। কখনো আলপথে লণ্ঠন হাতে যেতে যেতে, কিংবা যখন বর্ষার একবুক জলে নেমে ট্যাঁটায় গাঁথা বস্তুটা শোলমাছ না কেউটে না জেনে হাত ডুবিয়েছে জলে, কিংবা কখনো যখন দিকশূন্য বৈশাখী দুপুরের ধুধু মাঠ আর অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে পৃথিবী ও আকাশের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে নি, কিংবা কখনো যখন বাইরের দাওয়ায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ অস্পষ্টভাবে নিজের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়েনি—তখন সেই সব সময়ে সে তো আবছাভাবে একেই খুঁজে ফিরেছে এতদিন। এই দয়ালু মুখখানা—আহা, যা পরের জন্য কাঁদে—সময়ে দেখা হল না গো—এ ঠিক নিয়ে যেত তাকে সেইখানে যেখানে ঈশ্বর আছেন। কচু পাতায় জল মুখ ভরে ঢেলে দিচ্ছে মানুষটা, চোখে মুখে পড়ছে জলের ছিটে। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—তুমি কি অচেনা মানুষ! না গো। দুঃখী মানুষ তোমাকে দেখলেই চিনে নেবে।

অন্ধকার মনে আসে। সূর্যের মুখ তে দয়ালু মুখখানা তার দিকে চেয়ে থাকে এই একজন মানুষ, যে তার জন্য কাঁদে লোকটা নিশ্চিন্তে চোখ বোজে।

আস্তে আস্তে তার মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দেয় রমেন। তারপ উঠে দাঁড়ায়। ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে নাবাল জমিতে যেখানে জ জমে আছে। হাতের রক্ত ধোয়, ধুতি ভিজিয়ে নেয়, মুখে জলের ছিটা দেয় উঠে আসবার সময়ে দেখে লোকটার ক ডান হাতখানা পড়ে আছে। যত্নে তুলে নে সেটা। ভিড় ঠেলে মৃতদেহের কাছে রে দেয়। তারপর একটু দূরে এসে দাঁড়ায় দিগন্তে নীল মেঘের রঙের একটা আস্তর সূর্য দু-আধখানা হয়ে অস্ত যাচ্ছে। রমে নিঃশব্দে হেঁটে এসে নিজের কামরায় ওঠে

কামরার ভিতরে ভিড়ের মানুষ তাকে রাস্তা করে দেয়। অন্যমনে সে এ দাঁড়ায় তার পুরোনো জায়গায় দুই বেঞ্চে মাঝখানে। শান্তভাবে।

সভয়ে তার কাছ থেকে সরে গে একজন লোক, বলল—আপনার কাপ এখনো রক্ত!

বেঞ্চ জুড়ে হোল্ড-অলের বিছানা পে বসে আছে একজন খিটখিটে চেহারার লোক সংগে তিনটে বাচ্চা, আর গোলগাল ব রমেন প্রথম গাড়িতে উঠতে এই লোক তাকে জায়গা দিতে চায়নি, বলেছে দেখছে তো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছি, এর মা কোথায় বসবেন! সেই লোকটা এখ রমেনকে জিজ্ঞেস করল—লোকটা মরে গেছে

রমেন মাথা হেলায়।

—ইস্। লোকটা বলে তারপর হোল্ড অলের একটা অংশ উল্টোন দিয়ে জায়গা ক দিয়ে বলে—আপনি বসুন।

—আমি...মানে...আমার কোলেই লোক মারা গেছে। আপনার বিছানাপত্র ছোঁ যাবে।

—তাতে কী? বৃহৎ কাষ্ঠাসনে দো নেই।

রমেন বসল না।

দুর্গাপুর থেকে গাড়ি ছাড়ার শে সময়ে একটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেছিল। ওর দৌ দেখে বোঝা গিয়েছিল যে, ছেলেটা দৌড়ু জানে। তার গায়ে হ্যান্ডলুমের চমৎক একটা চেক শার্ট, পরনে কর্ডের প্যান্ট, পা হান্টিং বুট, কাঁধ থেকে একটা মাঝারি বি ব্যাগ ঝুলছে। গায়ের রঙ ফর্সা, এক নিষ্ঠুর চৌকো ধরনের মুখ, চোখ দু স্থির। স্থির, কিন্তু শান্ত নয়। ক একরোখা। একটি কিংবা দুটি খুন কর পর মানুষের চোখ ওরকম স্থির হয়ে আসে তখন চোখের পাতার একটা গাঢ় ছায়া পা চোখের মণিতে।

ছেলেটা গাড়িতে ওঠার পর থেকেই হোল্ড-অলওলা লোকটার সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে। ছেলেটা বসার জায়গা চাইতেই লোকটার বউ বলল—কী করে জায়গা হবে? আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা...এত জিনিসপত্র... ওঁর শরীর খারাপ...। ছেলেটা মুখ বিকৃত করে ঘেন্নার চোখে লোকটা, তার বউ আর তিনটে বাচ্চাকে দেখেছিল একটু, কিছু বলেনি। ট্রেন ঘণ্টাখানেক লেট চলছিল, তাই হোল্ড-অলওলা লোকটা একবার রমেনকে বলেছিল—গেরো দেখেছেন? পৌঁছোতে প্রায় রাত হয়ে যাব। আমি আবার থাকি কাঁথা যতীনে—এলাকাটা ভাল নয়। অত রাতে ছিনতাই ফিনতাই...তা ছাড়া ট্যাক্সিওয়ালা-কেই বিশ্বাস কি? তখন দুর্গাপুরের ছেলেটি একটু আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলল—আমিও ঐ দিকেই যাবো। আমাকে সঙ্গে নেবেন? আমি সঙ্গে থাকলে ভয় নেই। লোকটা বিব্রত চোখে ছেলেটাকে একটু দেখে মাথা নেড়ে বলল—না, না, তার দরকার নেই। ছেলেটা ঠাট্টার গলায় বলল—কেন, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? লোকটা বলল—না, তা নয়। ভগবান দেখবেন। ঠিক পৌঁছে যাবো। ছেলেটা একটু হাসল—ভগবান তো একটু আগেও ছিলেন, যখন আপনি ভয়ের কথা বলছিলেন! লোকটা সে কথার উত্তর দেয় নি, রমেনের দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গ আনবার চেষ্টা করে বলেছে—আজ আমার আসার কথা ছিল না—জানেন! ঠিক ছিল পরশু দিন আসবো। কিন্তু শুনলাম পরশুদিন স্ট্রাইক—বাংলা বন্‌ধ, তাই আজকেই বেরিয়ে পড়লাম। পাঁজিকায় দেখেছি অমৃতযোগ ছিল আজ... যাত্রার সময়ে। তারপর একটু ম্লান হেসে বলল—কাশীতে সেবার ভৃগুবিচার করালাম—দুর্ঘটনায় মৃত্যুর যোগ। তাই পঞ্জিকা না দেখে বেরোই না বড় একটা...। দুর্গাপুরের ছেলেটা দু দিকের বাঙ্কে দুখানা লম্বা কেঠো হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটু ঝিলিক দিল তার হাসি, বলল—কেটে পড়ুন দাদা, কেটে পড়ুন। পৃথিবীতে জায়গা বড় কমে যাচ্ছে। ছ জনের জায়গা দখল করে বসে আছেন, কুড়িজনের খাবার টেনে নিচ্ছেন...

ঠিক সেই সময়ে ইঞ্জিন থেকে তীব্র বাঁশি বেজে ধীরে ধীরে থেমে আসছিল গাড়ি।

সেই ছেলেটা এখন রমেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একটু অনন্যমনস্ক ছিল রমেন, ছেলেটা তার কানের কাছে মুখ এনে বলল—কেমন দেখলেন?

—কী

—লোকটা যে মরে গেল! কোনো কষ্ট পেল না। ইনস্টান্ট।

রমেন উত্তর দিতে পারল না। তার ঠোঁট একটু কেঁপে গেল মাত্র।

ছেলেটা নীচু গলায় বলল—আপনি খুব শক্‌ড্‌? প্রথম প্রথম ওরকম হয়। কলকাতায় নেমে একটা বড় ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নেবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মানুষকে মরতে অনেক দেখেছি।

খুব ধীর চাপা গলায় রমেন বলল—জানি।

ছেলেটা খুব সামান্য একটু চমকে উঠল।

রমেন সরে এসে গাড়ির খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজার মুখে ভিড়ে। দুটো লোক একে অন্যের বিড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছে, তাদের দুজনের মুখের ঠিক মাঝখান দিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য।

মেঝেতে উবু হয়ে বসে ছিল বেঁটে মতো একটা লোক। এত বেঁটে যে, আর দু এক ইঞ্চি ছোটো হলেই বামনবীর হয়ে যেতো। পরনে ময়লা হাফশার্ট আর ধুতি। সে ভিড়ের মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে রমেনকে দেখছিল। হ্যাঁ, ঐ তো সেই লোক, যে ট্রেনে কাটা-পড়া মানুষটার মাথা কোলে করে বসে ছিল, অচিন মানুষের জন্য কেঁদেছিল—ঐ তো সেই লোক! লম্বা লোকটা, ফর্সা,

গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি—হ্যাঁ, ঐ লোকটা। মরন্ত মানুষটা ঐ মুখখানার দিকে চেয়ে মরে গেল। মরন্ত মানুষ লোক চেনে, ভুল হয় না। এ লোকটাকে দুঃখের কথা বলা যায়, এ বুঝবে ঠিক। সে একে বলবে গতবার তার কোলের ছেলেটো কীভাবে মারা গেল। মিঠিপুরে তার গাঁ, চব্বিশ পরগনায়। গতবার বান ডাকল রাত দুটোয়। ঘরে সে, তার বউ আর দেড় বছরের ছেলে। জলের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে ঘরের মেঝেয় হাজার সাপের মতো জলের খেলা। মুহু-মুহু জল বেড়ে ওঠে, সে বউকে ডাকে—সামাল! গরীব মানুষ, জিনিসপত্র তেমন কিছু ছিল না—যায় তো সেগুলো যাক, কিন্তু মানুষগুলো বড় আপন। বউকে বলল—আমার কোমর প্যাঁচায়ে ধর। বউ ধরল। ছেলে কোলে করে জলে নামল সে। ঘরে তখন তার কোমর-জল, বাইরে নামতেই গলা পর্যন্ত। তখন মাঠঘাট কিছু ঠাহর হয় না, অন্ধকার, অঝোর বৃষ্টি, বাতাস ডাকে, উথালপাথাল গাঁই-গাঁই জলের ডাক। লোকটা জলের মধ্যে টালমাটাল ছুটেছিল, সঙ্গে কোমর-ধরা বউ, বুকে ছেলে। পশ্চিম দিকে বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান—সেই জায়গাটাই সবচেয়ে উঁচু, সেখানে বাঁধানো বেদী আছে। শতখানেক গজ দূরে। ঐ এক শ' গজ রাস্তা তার বুকে ধরা ছিল ছেলেটো—জলের তলায়। গলা-জল ভেঙে যখন গিয়ে উঠল বাবার থানে তখন খেয়াল করে দেখে—আরে, এ আমি করেছি কি? অ্যাঁ! বুকের মধ্যে জোরে চেপে ধরেছি ছেলে, দেখি নাই তার মুখ ডুবে রয়েছে জলের মধ্যে! ছেলে শ্বাস নেয় নাই! অ্যাঁ?

লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করল—এরে কবো? হ্যাঁ, এরে কওয়া যায়।

লোকটা হাত বাড়িয়ে রমেনের পা ছুঁয়ে ডাকে—ও কর্তা।

রমেন নীচু হয়ে লোকটাকে দেখে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জল-টসটসে চোখ। একে দেখেছে রমেন। যখন ট্রেনে কাটা-পড়া লোকটা রমেনের কোলে মাথা রেখে মরে যাচ্ছে তখন এ লোকটাই দৌড়ে গিয়ে কচু পাতায় জল এনে দিয়েছিল, রমেনের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলেছিল—বাঁচিয়ে দিন, কর্তা, বাঁচিয়ে দিন—আপনি পারেন। হে ঠাকুর—

রমেন নরম গলায় বলে—কী?

লোকটা একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরে। তার আর কিছুই দেওয়ার নেই।

রমেন বিড়িটা নেয়। লোকটার মুখো-মুখি উবু হয়ে বসে বিড়িটা ধরায়। লোকটা গলে যায় এই সোহাগে। বিড়বিড় করে তার দুঃখের কথা বলে। তারপর আস্তে আস্তে রমেনের বুকের কাছে ঝুঁকে আসে লোকটার মাথা, তীব্র ফিসফিসানির স্বরে লোকটা বলে—বলেন কর্তা, কেন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল! কী হয়েছিল আমার! কাঁধে তুলে নিলেই ছেলেটো বেঁচে যেত, কিন্তু কেন বুদ্ধি হয় নাই?

হাতে কচলে চোখের জল মোছে লোকটা। রমেনের সুন্দর মুখ স্তব্ধ হয়ে দেখে। তারপর বলে—তারপর থেকেই আমি বন্ধকী করবার ছেড়ে দেলাম, ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছি, তীর্থে যাই মাঝে মাঝে, ভিখিরিরে ভিক্ষে দিই, মানুষের বিপদ দেখলে মন কেমন করে, ছুটে যাই—কিন্তু এখন আর লাভ কী? বুদ্ধিনাশে ছেলেটো মরে গেল। তার ওপর দেখেন আমি ঈশ্বরেচ্ছায় বামন-বীর, আপনার মতো লম্বা হলে পর—কিন্তু ভগবান চান নাই—

মনে মনে মৃদু হাসে রমেন। লোকটা জানে না বামনবীরের মতো তার চেহারার রূপ করে পড়ছে। সত্য বটে, কখনো-সখনো আমাদের প্রিয়জন চলে যায়, তার শূন্য স্থানে অন্তরে চলে আসে দয়া, মায়া, কিংবা বিস্তার। লোকটা এখনো টের পায় নি। ছেলে না থাকার দুঃখই ছেলে হয়ে তার কাছে আছে।

রমেন তার কাঁধে হাত রেখে চুপ করে বসে থাকে।

লোকটা বিড়বিড় করে—আপনার বড় দয়ামায়া। মরন্ত মানুষটার ভুল হয় নাই।

গাড়ির গতি কমে আসে। অনেক লাইনের জটিল ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। হোল্ড-অলওলা লোকটা গলা বাড়িয়ে ডাকল—ও দাদা।

রমেন তাকাতেই হাতের প্লাস্টিকের জলের বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্লান মুখে বলল—বারবার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। সামনেই বর্ধমান, একটু জল এনে দেবেন দাদা, কাইন্ডলি! আপনি ইয়ংম্যান, ছুটে গিয়ে আনতে পারবেন—আমার সায়াটিকা—আসানসোলে একে একবার জল এনে দিয়েছিল রমেন।

অভ্যাসবশত বোতলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল রমেন, কিন্তু হাতটা ফেরত নিল। দুর্গাপুরের ছেলেটো শিথিল চোখে তাকে দেখছিল। রমেন ছেলেটাকে দেখিয়ে লোক-টাকে বলল—একে দিন। ইনি এনে দেবেন। আমি মড়া ছুঁয়েছি।

লোকটা ইতস্তত করে। হঠাৎ ঘেন্নায় ছেলেটার মুখ বেঁকে যায়। রমেনের চোখে স্থির চোখ রাখে ছেলেটা। মৃদু একটু হাসল রমেন—বন্ধুত্বের হাসি। ছেলেটা হাসিটুকু ফেরত দিল না। রমেন মনে মনে বলল—আমি তোমার শত্রু নই।

ছেলেটা চোখ সরিয়ে নিয়ে লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—দিন। এনে দিচ্ছি।

গাড়ি বর্ধমান পার হয়ে গেল। দুর্গা-পুরের ছেলেটা জল এনে হোল্ডঅলওলার বেঞ্চে জায়গা পেয়ে গেছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমেন দেখে অপরাহ্ণের আলোয় প্রকাণ্ড একখানা আদি-অন্তহীন মাঠ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে তাদের রেলগাড়ি। চষা জমির ছায়ার মতো আকাশে ফুটে আছে কোদালে মেঘ।

জানালার ধারে একতেরে সীটটিতে বসে ছিল বুড়ো একটা লোক। সে রমেনের ধুতিতে রক্তের ছোপ দেখছিল, লক্ষ করল রমেনের বিষণ্ণ মুখ। তারপর বলল—লোকটা বাঁচল না, না?

রমেন মাথা নাড়ল।

লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল—চারদিকেই লোক মরে যাচ্ছে খুব। খাদ্য-সমস্যা। এই বাজারে মানুষ বাঁচে?...... আপনি কোথায় যাবেন?

—কলকাতায়।

—কলকাতায় কোথায়?

—ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? সে কী? বাড়ি-বাসা নেই সেখানে?

রমেন একটু ইতস্তত করে বলে—ছিল। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের একখানা বাড়ি ছিল। শুনেছি সেটা উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছে। আমি কোনো বন্ধুর বাসায় উঠবো।

—ইস্, বাড়িটা বেদখলে চলে গেল! আপনি এতকাল করছিলেন কী? আজকাল কি একটা বাড়ি করা সহজ! গঙ্গার ধারে ঐ জায়গায় এখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা কাঠা!

লোকটা উদ্বিগ্ন হয় খুব। বলে—আদি বাড়ি ঐটাই?

—না, রমেন বলে—আদি বাড়ি ময়মনসিং।

—ময়মনসিং! লোকটা নড়ে-চড়ে বসে। ময়মনসিংয়ের কোথায়?

—কালীবাড়ীর কাছে।

—কার বাড়ি?

—রায় হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

লোকটা সোজা হয়ে বসে—তিনি আপনার কে হন?

—দাদু।

লোকটা ফিসফিস করে বলে—ছোটো কর্তা! আপনি আমাদের ছোটো কর্তা না?

বুড়ো লোকটার খোলা চোখে জল চলে াসে, সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়—সেন, বসেন—

রমেন তার কাঁধে হাত রাখে। লোকটা বহ্বলভাবে বসে পড়ে। সে বুঝতে পারে া এর মানে কী! ছোটো কর্তার ময়লা ়িতে রক্তের ছোপ, একটু আগে কাটা-ড়া লোকটাকে বুকে করে ধুলোয় বসে চল! গালে না-কামানো দাড়ি! মেঝের সে একটা ভিখিরি মানুষের সঙ্গে বিড়ি কা! কী করে হয়! সে ছোটো কর্তাকে ড়ায় চড়তে দেখেছে, বন্দুক চালাতে খেছে, সে দেখেছে ছোটো কর্তা তেরো বছর সে একা মোটর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়। ই বাড়ির দেউড়ির ওপর সিংহের মূর্তি, ঠে পেখম-ধরা ময়ূর, বড় কর্তা বারান্দায় রবীর হাতে বসে আছে, ছোটো কর্তা বুট র চামড়ার বল মারছে দেয়ালে। কী করে া!

—আর হায় রে, এ আপনার কী চেহারা টো কর্তা! জমি নাই—বাড়ি বে-দখল—য় হায় রে—

রমেন তার পাশে ঘেঁষে দাঁড়ায়, কী বে ভেবে পায় না রমেন। কেবল তার ার হাত বুলিয়ে দেয়।

লোকটা কতবার সেই বাড়িতে ছুটে ছ দায়ে দফায়! মুশকিল-আসান ছিল ঃ বাড়ি। পাকিস্তানের পর যখন খালি । গেল বাড়িটা—লুটে পড়ে গেল—তখন দিন তার বুক ব্যথিয়ে উঠেছে। কল-তায় এসে কতবার অভাবে দুঃখে তার মনে ড়ছে ময়মনসিংয়ের সেই বড় বাড়ির কথা। ছ হয়েছে—কাশীপুরে একবার ছোটো ার কাছে যায়। আপনারাই চিরকাল াদের দেখেছেন, আমরা আর কোথায় া? কিন্তু আর হায় রে—ছোটো কর্তার ন আর কিছু নাই। কেমন শূন্য লাগে , নিঃস্ব ভিখিরির মতো লাগে নিজেকে। ীপুরে ছোটো কর্তা আছেন, এই াস নিয়েই সে এতকাল অনেক দুঃখে না পেয়েছে। কিন্তু এখন সে কী ভেবে না পাবে!

—আমি মুকুন্দ ঘানিওয়ালা—মনে নাই?

মেন মাথা নাড়ে—মনে আছে।

সং জমিদার পিতার মতো। শাসনে ন, সোহাগও করেন। নিষ্কর জমি দিয়ে বসত করান, ধর্মে-কর্মে মতি আনেন ষর। কী মানুষ ছিল সব—মাথা নুয়ে আসত আপনা থেকেই। তার চেয়ে কি এখনকার বি ডি ও-রা ভাল! না কি সরকারী লোকেরা! অনেক হয়রানির পর মুকুন্দ বুঝে গেছে—সব জোচ্চোর, ঠক। এখন আর সেইসব স্বপ্নের মানুষেরা জন্মায় না, যাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দুঃখের কথা নিঃশব্দে বলা হয়ে যেত।

নীরবে রমেনের হাতে বে-খেয়ালে হাত বুলোয় মুকুন্দ। বলে—সব চলে গেল, ছোটো কর্তা! আমরা তবে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো?

রমেন ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে—মুশকিলে পড়লে আমি আছি। আমার কাছে এসো।

কিন্তু সে বড় অহংকারের কথা। রমেনের মুখ ফুটে বেরোয় না। সে কেবল মুকুন্দর হাতে হাত রেখে ছোট্ট জায়গাটিতে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে ওর পাশে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর, আর একটা পুরোনো মোটরগাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু সবুজ মাঠে ধূসর রঙের ময়ূরটা এক বোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে—এই দৃশ্য মনে পড়ে। কিংবা লক্কড়ে পুরোনো, ক্যাম্বিসের হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বৃষ্টির দিনে পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কখনো বা মনে একটি দুটি ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ, তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে—রায় রমেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে প্রকাণ্ড দেউড়ির ওপর পুরোনো জং-ধরা লোহার আর্চ, তাতে একটা চৌকো কাচের বাতি ঝুলছে, আর লোহার ফ্রেম বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। কিংবা সেই লোনা-ধরা, শ্যাওলার সবুজ দেয়ালগুলি—যা তাদের বাড়ির সীমানা ছিল, যার ওপর দিয়ে দু হাত দু দিকে পাখনার মতো ছড়িয়ে টাল খেতে খেতে চোখ বুজে কতদিন হেঁটেছে রমেন! কিংবা মনে পড়ে তাদের ভূতগ্রস্ত, প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিতের কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছে।

এখন সেই বৃষ্টির দিন, আর পামগাছের তলায় দাঁড়ানো তাদের সেই বুড়ো অন্ধ গাড়িটার ভিজে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে সেই বুড়ো ময়ূরটার পেখমের বোঝা টেনে টেনে সতর্ক চলা, গ্র্যান্ড পিয়ানোর গায়ে লেখা তার পুরোনো নাম, আর আতসকাচ হাতে বাড়ির পশ্চিমের ভিতের কাছে দাদুর বসে থাকার দৃশ্য মনে পড়ে গেল। তার চারধারে এখন একবার তাকিয়ে দেখলে কিছুতেই মনে হয় না যে, সে সব সত্যিই একদিন ছিল—সেই ময়ূর, পুরোনো গাড়ি, সেই গ্র্যান্ড পিয়ানো, কিংবা সেই দাদু। যেমন, মনে হয় না ছেলেবেলায় সত্যিই তাকে ঐভাবে তার নাম লিখতে বা বলতে শেখানো হয়েছিল—রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

(ক্রমশ)

সাপ মন্ত্র এবং সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি

বাঁশের ভুঁইফোঁড় থেকে চোখে রূপোর টিপ বসানো কুমীরমুখো বেত বাঁধানো সরষের তেলে পাকানো লাল টকটকে ছড়ি তৈরি করেছে ঈশ্বর ঢালি। সেই ছড়িটাই তার হাতের অস্ত্র। আর পেটে আছে মন্ত্র—মন্ত্রের সমুদ্র। সে বিখ্যাত সাপুড়ে, আবার ওঝাও। গ্রাম নয় থানা নয় জেলা পার হয়ে তার নাম চলে গেছে কত শত মানুষের ঘরে ঘরে। কত মানুষের ঘরের মেঝে খুঁড়ে সে পদ্মগোখরো, খরিশ কেউটে, কাল কেউটে, উদয় নাগ, কাল নাগিনী বার করে দিয়েছে। সাপে-কাটা মরা মানুষকে মন্তর ক্যাপলা করে বাঁচিয়ে তুলেছে, সাপ খেলা দেখাতে গিয়ে বাঁশি বাজিয়ে নিজের তৈরি ছড়া-কবিতা শুনিয়ে কত মানুষকে সম্মোহিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঈশ্বর ঢালি নাম শুনলেই সবাই ভক্তিভরে গড় করে। এ যুগের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর ও-বেটা। গলায় ওর সাপের মালা। বিষধর কাল ফণীকে নিয়ে খেলা করে।

মাথায় চুড়োবাঁধা চুল ঈশ্বর ঢালির। হাতে ফুলের মালা জড়ানো। গলায় লাল পুঁতির মালা। বাম বাজুতে রুদ্রাক্ষ। দক্ষিণ বাজুতে ওস্তাদ কালু কয়ালের বখসিস দেওয়া রুপোর তাবিজ। তাতে আরবী হরফে লেখা ইসলামের মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা—মোহম্মদুর রসুলাল্লা।' গেরুয়া লুঙ্গি গেরুয়া পাঞ্জাবী গায়ে ঈশ্বর ঢালির। পাঞ্জাবীর বোতাম নেই, চাদরের সাবেকী ঢঙের জামা। মুখে কটা রঙের গোঁফ দাড়ি। চমৎকার গড়ন তার দেহের। তীক্ষ্ম খাঁড়ার মতো নাক। চোখ দুটো দীর্ঘ, বিকশিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। যেন ভেতরের আগুন জ্বলছে। কপালে একটা লাল ফোঁটা। এ মানুষকে চাষীবাসীরা দেখলেই দেখে সে-ই গড় করে। তার চারপাশে ভিড় হয়।

বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ঈশ্বর ঢালি। সাপ ধরে বেড়ায়। হাজার হাজার গাছ ঘাস লতাপাতার নাম তার মুখস্ত। সে লেখাপড়া জানে না।

রজব সেখের বড় বেটার বউকে সাপে কামড়েছে। ঈশ্বর ঢালিকে আনা হল। সে পথের মোড়ের মাথায় বসল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়ল। একালের অনেক শিক্ষিত লোক মন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা ঠাট্টা করে। ঈশ্বর ঢালি হাসে। তার কাছে একটা চামড়ার সুটকেশ আছে। একটা হাঁড়িতে বিরাট একটা গোঁড়ভাঙা কেউটে। পথে আসতে আসতে ধরে এনেছে। রজব বললে, 'মাঠের মাঝখান দিয়ে আসতে আসতে উনি একটা বিলের পাশে থমকে দাঁড়ালে। জাঙালের গর্তগুলোর ওপরে কান পেতে কী যেন শুনলে বললে, রজব এর মধ্যে সাপ আছে। পাড়ার ছেলেরা এসে পড়তে বললে, একটা হাঁড়ি আনতো বাবারা। পরে উনি একটা গর্তের মধ্যে মন্ত্র পড়ে জোরে ফুঁ দিলে। একটা পানশিউলীর ডাল ভেঙে গর্তে ঢুকিয়ে নাড়া দিলে। তারপর গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করে আনলে সাপটাকে। ল্যাজ ধরে শূন্যে চাগিয়েই মাটিতে ফেলে ছড়ি দিয়ে চেপে ছুরি দিয়ে বিষের থলি বিষদাঁত উপড়ে ফেলে দিলে।'

ঈশ্বর ঢালি সাপ খেলাতে লাগল

সাপটা বার করে দেখালে সবার অনুরোধে ঈশ্বর ঢালি। তারপর খেলাতে লাগল। তার চোখে মায়া আছে, জাদু আছে। সাপটা সেদিকে চেয়ে থাকে। ফণা তুলে দোল খায়।

ঈশ্বর বললে, 'একটা চোখ কানা। শিকার করতে গিয়ে বেজির নখের চোট খেয়েছিল। দেখো, সামনে কিছু নড়লেই তাকে সাপ ছোবল হানে। কেউটে ফণা ধরে। ঢোড়া ফণা ধরতে পারে না। ফণা না ধরতে পারলে কেউটে কামড়াতে পারবে না। সে শব্দ করে—জানান্ দেয়। হিস্‌হিস করে। সাপ ভয় করে। ভয়, মেরুদণ্ডের একটা গাঁট যদি একটা চোট খেয়ে ছেড়ে যায় তবে তার মরোদ গেল। তাই ভয়ে এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়। তেড়ে এসে ছোবল দেয়। সে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

'সাপ নাকি তেড়ে কামড়ায় না, বইয়েতে যে লেখে?' শুধোয় একটি শিক্ষিত ছেলে।

ঈশ্বর ঢালি বলে, 'বইয়ে অনেক কথা লেখে, সে সব কি সত্যি? তারা রিসার্চ করা পণ্ডিত, শহুরে লোক! কেউটে জাতীয় সাপ, বিশেষ করে তেঁতুলে খরিশ, গোখরো এরা তেড়ে কামড়ায়। আসামের জঙ্গলে থাকে শঙ্খচূড়—বিরাট সাপ—সাড়া পেলেই খেড়ে ওঠে—দেখে তার চেয়ে কে আবার বিরাট বীর আছে! তার জীবনসংশয় ব্যাপার কেউ ঘটাবে সন্দেহ করলেই তেড়ে এসে আগেভাগেই শত্রুকে ঘায়েল করে। সাপের যখন ক্রোধ আছে, সে যখন ছুটতে পারে তখন তার তেড়ে আসতে বাধা কিসের? সাপ যদি কামড় দিয়ে বাঁ দিকে মোচড় মারে তাহলে বেশি বিষ ঢালে। ডান দিকে ওরা খায়। বাঁ দিকের বিষের থলি বাঁচিয়ে রাখে। কেউটে কামড়ালে আগুন লাগার মতন 'জ্বলে গেল পুড়ে গেল' বলবে।

'আপনার হাতে এই যে রুদ্রাক্ষ, এটা কি 'শক্ত'?'

'না, এটা 'নিরেট'!'

কাজেই ঈশ্বর ঢালির বুদ্ধি পরীক্ষা করতে যাবেন না—নিজে ঘায়েল হবেন। তার সঙ্গে লাগা মানেই কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা করা। সে সাতঘাটের ঘেটো। আগে সমাজের কলঙ্ক থানার দালাল মদন দাসকে খুন করে সত্য স্বীকার করে সাত বছর জেল খেটেছে। তারপর সাপুড়ে ছিল বহুদিন, সাপ খেলা দেখাত। সখির নাচের ছড়া কাটত আর বাঁশি বাজাত। আজ

বিখ্যাত ওঝা। সাঁওতাল পরগণায়, কামরূপে ছিল সে বহুদিন। পাহাড়ী সাঁওতালী এক মেয়েকে এনে রেখেছিল বছর দুই ওর ঘরে। এখন সাপ বিক্রি করে আসে চিড়িয়াখানায়। সাপ, ব্যাঙ, বেজি, উদ্‌বিড়াল, ভাম, খট্টাশ হোঁ-হাড়গেল এসবের, চামড়া বিক্রি করে আসে কলকাতার চামড়ার গুদামখানা-ভরা ফিয়ার্স লেনে।

ঈশ্বর ঢালি একটা মন্ত্রের বই লিখে ছেপেছে। সে বই তার শিষ্য হলে তবে পাওয়া যাবে। চার আনা দাম।

ঈশ্বর ঢালি বললে, থিওরিটিক্যাল আর প্রাকটিক্যাল তফাত বাবা। প্রাকটিক্যালকে একটা থিওরিতে আনতে হয় সত্য কিন্তু উপন্যাস গল্পের চন্দ্রবোড়া যখন প্রায় কণ্ঠিহীন তল্‌তা বাঁশের ঝাড়ের মাথায় উঠে শিষ দিয়ে পাড়া মাত্‌ করে তখন তাকে বাস্তব বলবে কেমন করে? চন্দ্রবোড়ার গায়ে ২৩ থেকে ২৭টা চাকা। লম্বা আড়াই হাত। কণ্ঠিঠাসা জাওয়া বাঁশের ঝাড়ে হয়তো উঠতে পারে মানুষখানেক—কিন্তু কেন উঠবে—সাপটা যে নিরীহ—চুপচাপ পড়ে থাকে পাতাঘাসের মধ্যে। চোখে চোখে পড়লে তবে সনসন করে পালায়। হঠাং

পা তুলে দিলে তবে কামড়ায়। শহরের লোকেরা জানে না—তারা যদি সাপকে বাঁশ বাজাতেও দেখত, বলত, বীরভূমের সাপ—হতেও যা পারে! আরে বাবা, চন্দ্রবোড়া কি শিষ দেয় নাকি? আমি সাপুড়ে—সাপের ব্যাপার আছে বলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' সিনেমা দেখতে গিয়ে ক্ষেপে গেলাম। বাংলা দেশটাকে একটা তামাশার জায়গা পেয়েছেন বটে! 'উদয় নাগে'র বর্ণনাও—একেবারে—অবাস্তব। হাঁ, একমাত্র প্রায় নির্ভুল হলেন বিভূতি বাড়ুজ্জে। তাঁর লেখা পড়ে আমি হাঁ হয়ে গেছি। গাছপালার ঠিক নাম ভদ্রলোক এত কেমন করে জানলেন?

'আপনি মন্ত্রে বিশ্বাস করেন?'

'মন্ত্র মানসিক ক্রিয়া করে—হিপ্‌নোটিজম। বাগুণেই আসল। দেখুন না, শিবঠাকুরের গায় সাপ কেন? তিনি ছিলেন সে যুগের সর্পবিশারদ। সাপ নিয়ে তিনি খেলা করতেন। অনেক জড়ি বটি জানতেন। সে এখন আমরা প্রায় ভুলে গেছি। তবে বা তোমাদের বলি, সাপ কামড়ালেই [illegible] বাঁধবে—পুরোনো ঘি খাইয়ে দিয়ে [illegible] ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। [illegible] বিশ্বাসে হাতুড়ে বদ্যি ওঝাদের ডেকো [illegible]। এখন ভাল ভাল ইঞ্জেকশন হয়েছে। [illegible]বোড়া কামড়ালে নাক মুখ দিয়ে রক্ত [illegible]—গা ফেটে যায়—রস ঝরে। বোড়ার বিষ [illegible] গাঁটে—এই আছে এই নেই যেন। [illegible] কামড়ালে ১৫ মিনিটের মধ্যে [illegible] ঢলে পড়বে। তবে কেউটের বিষ [illegible] দ্রুত ওঠে তেমনি দ্রুত নেমেও যায়। [illegible]র বিষ ভয়ংকর। বাঁচানো কঠিন। [illegible]কেষার বিষও খুব তীব্র। চাং বোড়া [illegible] বিষুতে বোড়া চ্যাংমাছের মতন—লাফ [illegible] কামড়ায়। আগে চন্দ্রবোড়ার কামড়ে [illegible] মরত—এখন শতকরা ৯০টা বেঁচে [illegible] হাসপাতালে গেলে। আমি ইঞ্জেকশন [illegible] করি। বিষধর সাপ কামড়ালেই [illegible] পারবে। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ইলেকট্রিক [illegible] লাগার মতন লাগবে। কাটা জায়গায় [illegible] পারম্যাংগানেট লাগিয়ে দাও। চুল [illegible] দাঁত তুলে ফেলো। সবার আগে কষে বাঁধন দাও পর পর। তারপর ওঝা-[illegible] হাসপাতাল।'

[illegible]টি বুড়ি মেয়ে এসে বললে, 'হাঁ বাবা, তোর সেই সাঁখর নাচ শোনাবি না!

লাল কাপড়ের দুটো সাঁখ বার করলে

এতকাল পরে এলি?'

ঈশ্বর ঢালি বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে গড় করলে। বললে, 'মা, সাপেকাটা দেখতে বেরিয়েছি। দেরি হয়ে যাবে।'

বুড়ি বললে, 'তোর নাম শুনলে সাপে-কাটা রোগী ক্ষেড়ে উঠবে! গানটা বলে যা বাবা—সবাই শুনুক।'

ঈশ্বর ঢালি হাসলে। সুটকেশ খুললে। লাল কাপড়ের দুটো সাঁখ বার করলে। নাচাতে শুরু করলে। মুখের শব্দ করে ছেলে-কাঁদা শোনাতেই যে-যেখানে ছিল ছুটে এল। গান শুরু হল। অদ্ভুত চলানি সুর।

> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> বর গেছে ধান কাটিতে
> সতীন আছে ঘরে
> দুই সতীনে ধান ভানিতে
> চুলোচুলি করে।
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> বাঁজা খাঁদির হয় না ছেলে
> বাছার টপটপানি
> ছোটগিন্নীর হিজড়ে ছেলে
> তাতেই কী বাখানি!
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে...
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> কি শাক রাঁধলি খাঁদি
> পাটশাকের ঝোল
> খাঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি
> পাড়ায় গণ্ডগোল।
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে...
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> টিপির টিপির পানি হয়
> রথেরো মেলায়
> দুই সতীনে যুক্তি করে
> কাঁটাল কিনে খায়।
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> একটি বেটি বউ ছিল
> কলা গাছের আড়ে
> কলা পড়ে টিপির টাপির
> বুড়ো ভাসুরের ঘাড়ে।
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
> ভাল নাচবি খাঁদি॥
> মিনসে এলে দুই সতীনে
> এক বিছানায় শোয়
> দুই সতীনের চোখে আগুন
> জেগেই রাত পোয়।
> র-সে-র বি-নো-দি-য়ে
> ভাল নাচবি খাঁদি॥

গান শেষ হলে সবাই বাহবা দেয়। ঈশ্বর ঢালি উঠে পড়ে। সুটকেশ আর সাপের হাঁড়ি নেয় তার সঙ্গের লোকটি।

রজব সেখের বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার। রজবের বউমা রমিশা খাতুনকে সাপে কেটেছে। অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে। বছর আঠারো বয়েস। ঈশ্বর ঢালি তার চোখ দেখলে। নাড়ি দেখলে। বুকের মধ্যে হাত দিয়ে হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করলে।

'কি সাপ কামড়েছে কেউ দেখেছ?'

কেউ কিছু বলতে পারলে না। রজবের স্ত্রী বললে, 'রাত বারোটা একটার সময়

পুকুরে গোপনে গোসল করতে গেছিল—এসে বললে ঘাটে তাকে কি কামড়ে নিয়েছে।'

'অতো রাত্রে 'গোসল' করা কেন?' রসিকতা শুরু করলে ঈশ্বর ঢালি। শাশুড়ি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সরে গেল লজ্জা ঢাকবার জন্যে।

ঈশ্বর ঢালি উঠোনে একটা গন্ডি দিয়ে মন্তর পড়ে। দুটো কাঠের পিঁড়ে আর একটা সুপারি আনতে বললে। একটা পিঁড়ের ওপরে সুপারি বসিয়ে তার ওপরে পিঁড়ে দিয়ে মন্তর ক্যাপনা আরম্ভ করলে। একটা ছেলেকে পিঁড়ের ওপরে তুলে দিলে। মজার কান্ড। নিচের পিঁড়ে মাটি ঠেলে এগোতে লাগল মানুষকে নিয়ে। ঈশ্বর বললে, 'বিষ অনেক দূরে উঠে গেছে। কেউটে সাপ কামড়েছে মনে হচ্ছে। রোগীকে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে দাও।'

বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে ঈশ্বর মেয়েটির চেহারা দেখলে। সুন্দরী মেয়ে। সন্তানাদি হয় নাই এখনো। বাক্স খুলে ইঞ্জেকশন দিয়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হাসপাতালে পাঠাও নি কেন?'

রজবের বউ বলে, 'ও বাবা, হাসপাতালে কি বউমানুষকে পাঠাবো! তারা নাকি তেজী মানুষ পেলেই মেরে ফেলে 'তেল' করে! মাথা ধড় কেড়ে লেয়। বিক্রি করে। তুমি এয়েছ, ও বেটি বেঁচে যাবে।'

'না, আমি বাঁচাতে পারব না।'

পায়ে জড়িয়ে ধরে তখন বউটির আপন মা। পা ছাড়ে না। কাঁদতে থাকে।

যার বউ তাকে বলে ঈশ্বর ঢালি, 'কিরে তুই এই বউ চাস, না আবার বিয়ে করবি!'

'এই বউ চাই।' লজ্জার মাথা খেয়ে মুখ নিচু করে বললে ছোঁড়াটা।

'বেটা পীরিতের নাগর! দে একশো টাকা দে। না হলে আমি মন্তর ক্যাপনা করব না। এখানে কে একটু খুদে ওঝা আছে। ভেরেছে। তোর বউয়ের কোলুজেটা বার করে নিয়ে যেয়ে শালুক পাতায় ভাসিয়ে রেখেছে! একটা কাক সেখানে কা-কা করছে। যদি খেয়ে ফেলে তবে আর বাঁচানো যাবে না! নে টাকা ছাড়।'

তখন বউয়ের মা তার গলার সোনার হারটা ওঝা ঈশ্বর ঢালির পায়ের কাছে রাখলে। ঈশ্বর বললে, 'বাবা একেই বলে মায়ের টান—নাড়ির টান!'

একটা নতুন সরায় জল দিয়ে তর্পণ করে কি সাপ দেখালে ঈশ্বর ঢালি! খারাপ কেউটে!

'মা মাসীরা খুঁটি ছেড়ে দাও, চুলের গেরো খুলে ফেলো, মেয়েদের কারু শরীর খারাপ থাকলে এখান থেকে চলে যাও না হলে রক্তস্রাব হবে, যদি কেউ 'ভেরে' থাকো এখনি কাটান দাও, নইলে 'বাণ' মেরে তার মুখ থেকে রক্ত বার করব ফিনকি দিয়ে। ছাগল থাকলে সরিয়ে নিয়ে এস মাঠে। যারা মন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা সরে যাও। নইলে বিশ্বাস করো। মন্তর পড়তে শুরু করলে সে:

"কচু পাতার জল
যেমন করে টলটল
মা বাসুকি ধরে আছে
এই পিথিমির তল।
মা বাসুকির মাথায় জটা
কালো চোখের মণি
ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘটা
বিষের ধারা ঝরায় রে কালফণী!
কামরূপে ধাম তার কামরূপী কালী
শিবকে ফেলে পায়ের তলায়
করে টলাটলি।

শিবকে জাগায় কে
কেউটে যোড়া অঙ্গে জড়ায় যে
শিবের চোখের আগুন মারে শিষ

সেই আগুনে পড়ে মরুক বিষ।
[ফুঁক]

লাগ কামিক্ষের কালী মন্তর
শিব মন্তর, মন্তর পাথর ছুঁড়ে
কালীদহের করাল মরাল
মারবো মন্তর ছুঁড়ে।
খরিশ কেউটে'র বাঁকা দাঁত
আমার মন্তর তার করাত
লাগ লাগ লাগ মা মনসার বরে
জলের মতন যাক না বিষ ঝরে। [ফুঁক]

মা মনসার ডালা দোব
দোব জবাফুল
হলুদ সিঁদুর খুনসি সরা
মেতি মাথা চুল।
চুলের বেণী ফণা
ফণায় মারি ঝাঁটা—
আমার মন্তর ফণী মনসার কাঁটা। [ফুঁক]
লাগ মন্তর লাগ।
সাতালী পর্বত ফেড়ে লাগ
সাঁওতালের তীরের মতন লাগ,
সাঁওতালীর পাছা ফেড়ে লাগ
রক্ত পড়ুক ঝরে
কালীর নিশাচর শিয়াল থাক শুয়ে পড়ে পড়ে।
কালী বাসুকি মনসা শিব
মাথায় থাক।—মারি চাপড় পিঞ্জিমতে
উড়ুক ধুলো।—কোন্ শালা ডারে?
তার মা
গোবর কুড়ুনী মাগী—
তার ঝোড়ায় এ কি! চন্দ্রবোড়া?
পদ্মগোখুরো, তেঁতুলে খরিশ, কালকেউটে,
গেঁড়িভাঙা কেউটে, শিয়র চাঁদা, শাখামুটি,
কালনাগিনী, উদয়নাগ, শংখচূড়, চামর-
জোয়া, বরাচিতি, দুধে বোড়া, রক্তে বোড়া,
বিদ্যুতে বোড়া, জল বোড়া, ময়াল...হাজার
রকমের সাপ...
ওরে বাপরে বাপ!
'চ্যাংমুড়ি কানি!'
কী বললি শালা?
পালা বিষ পালা! [ফুঁক]
কামরূপের কামরূপী
বামাচারী কালী
তার আজ্ঞে মন্তর বানাই
আমি ঈশ্বর ঢালি॥ [ফুঁক]

রোগীর পায়ের সাপে দংশানো জায়গাটা
র দিয়ে চিরে দিলে ঈশ্বর ঢালি। বসিয়ে
ল রোগীকে। গাল থেকে তার লালা
ত লাগল। লোকে লোকারণ্য চারদিক।
দেখ করছে তারা।

শ্বর বোঝে রোগী বেঁচে যাবে। কতক-
না শিকড় বাটতে দিয়েছিল সে। বাটা
রোগীর গালে ঢোকানো হল। আস্তে
স্ত নড়তে লাগল রোগী ঘণ্টা চারেক
।

ন্তর আওড়াতে লাগল ঈশ্বর ঢালি :

'ধা ধা কেউটে বনে তোর বাস
নে থেকে বেরিয়ে কেউটে মানুষ কামড়াস।
বারোচিতি বোল বোড়া
আদ্যের কাহিনী
এই মন্ত্রে ঝাড়িলাম বিষ
মা মনসা জগতিনী।
রশিমা খাতুনের অঙ্গে নাই বিষ
বিষহরির আজ্ঞে
মা মনসার আজ্ঞে নাই..." [ফুঁক]

*

"শাক তুলতে গেল বউড়ী
লাকে লতাপাতা
কি সাপ কামড়ালো বউড়ী
ওঝা পাবো কোথা?
ওঝা হল ধন্বন্তরী মা মনসার বরে
চরা চৌষট্টি কালকুট্টি সাপের বিষ
এই মন্তরে মরে...
অমুকের অঙ্গে"...ইত্যাদি। [ফুঁক]

*

কাকা-কাকি উড়ে যায় সঙ্গ
তাহা দেখে আউলেরা বাপে ঝিয়ে
বড়ই রঙ্গ!
তাহা দেখে আউলেতে জন্মিল ঈষ
উড়ে যায় ভস্ম যায় অমুকের অঙ্গে
নাই বিষ...ইত্যাদি। [ফুঁক]

রোগীর চেতন ফিরল। চোখ মেলে তাকাল। সবাই তখন খুশী। ঈশ্বর ঢালি গোঁফে গোঁফে হাসতে লাগল। অনেক যুবতী মেয়ে জুটেছে দেখে সে এবার পচাল খেউড় অর্থাৎ বোড়ার বিষ ঝাড়া মন্তর শুরু করলে। সেসব ভীষণতম অশ্লীল। মেয়েরা পালাতে শুরু করলে। ঘরের মধ্যে আড়ালে থেকে শুনতে লাগল। খিল খিল করে হাসতে লাগল তারা।

অশ্লীল শব্দ তুলে দিয়ে একটি বোড়া সাপের মন্তর নমুনা দেওয়া গেল :

লাউ কাটতে গেল ছুঁড়ি
লাউ রইল 'মাচায়'
কোথা ছিল বিদ্যুতে বোড়া
কামড়ে দিল পাছায়।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রোগিনী সেরে উঠলে ঈশ্বর ঢালি খাওয়া-দাওয়া করে টাকা, নতুন কাপড়, চাল, মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরে। তার মুখে তখন কেমন আনন্দের জ্যোতি!

বাড়ি গিয়ে দেখবে হয়তো অন্য কোথাও থেকে ডাক এসেছে। যেতেই হবে। কিছুতেই হাসপাতালে পাঠাবে না। অন্ধ বিশ্বাস। নিজেরও তার ভয় করে। কত লোক মরে। তবু বলে, 'দানা নেই—হায়াত নেই—নিয়তি।'...

যখন ডাক আসে না তখন সাপ গো-সাপ ইত্যাদির চামড়া নিয়ে ফিয়ার্স লেনে বিক্রি করে আসে। তারা ট্যানিং করে ঘড়ির বেল্ট, ব্যাগ, জুতোর নকশা কত কি করে।

ঈশ্বর ঢালি নির্ভীক। বাড়িতে থাকলে অধিকাংশ সময় সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গল সে ভালবাসে। ছায়া, নির্জনতা, সরীসৃপের নড়াচড়া দেখা তার ভাল লাগে। সেসব অকৃত্রিম। কৃত্রিমতায় সে বিরক্ত। মানুষ কথা বললেই সে রং চড়ায়, মিথ্যা বলে, তাই তার দিকে সে তাকায় কুটিল তীক্ষ্ন চোখে।

সাঁওতাল মেয়েটা যে ছিল তার মন ভরে যৌবনের ভরা দেহের জোয়ারে নিয়ে, সে যখন সাপের ছোবলে মারা গেল সাপ ধরতে গিয়ে সেই থেকে তার মনে যেন কেমন একটা জ্বলন্ত দাহ—একটা ভীতি। রাত্রে তাকে ভাল করে ঘুমুতে দেয় না।

কিন্তু প্রশংসার কেমন যেন একটা মোহ আছে—তাকে সবাই 'শিব ঠাকুর' বলে—গড় করে—তাই সে মানুষের সত্য-মিথ্যার অন্ধবিশ্বাসে সমাজকল্যাণে জড়িয়ে পড়েছে।

সে স্বপ্ন দেখে একটা সাপের চিড়িয়াখানা যদি নিজে করতে পারে! আর গাছ গাছড়ার বাগান। কিন্তু টাকা? হাঁড়ির মধ্যে পুরে আছে দোঁড়ভাঙা কেউটেটা চক্রাকারে। বাড়িতে আরো তিনটে আছে। কালকে তাদের কলকাতায় দিয়ে আসবে চামড়া ছাড়িয়ে। গো-হাড়গেলের চামড়া সব চাইতে বেশি দামে বিক্রী হয়, কিন্তু লোকজন দেখতে পেলে তার দুর্নাম হবে। গো-হাড়গেল সাপ খায়—মানুষের ক্ষতি করে না—ছোট্ট কুমিরের মতন দেখতে—তাকে দেখতে পেলে ঈশ্বর ঢালি যেমন করে হোক মারবেই। অন্য কাউকে মারতে দেখলে সে ভয় দেখা 'খবরদার মারবে না, কামড়ালে যতক্ষণ ন আকাশ ডাকে ততক্ষণ ছাড়বে না। আকাশ ন ডাকলে ঘোড়ার 'পেচ্ছাব' খেতে হবে, তবে বাঁচোন।' তারপর হাসে ঈশ্বর ঢালি। হা হাসিটি ভারি মিষ্টি।

আবদুল জব্বার

তবলা বাদনের ঐতিহ্য ও কণ্ঠে মহারাজ

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় এক শতাব্দীগত তবলা বাদনের ঐতিহ্য নিয়ে কণ্ঠে মহারাজ এতদিন বেঁচে ছিলেন আমাদের মধ্যে। বহু আসরে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ বাদনশৈলী এখনও সজীব রয়েছে অগণিত শ্রোতার মনে। বারাণসী ঘরানার এই ধারক ও বাহক আর ইহজগতে নেই। পয়লা আগস্ট রাতে ৯০ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন বারাণসীর পুণ্য-ভূমিতে। কিন্তু তাঁর খ্যাতির পরিমাণ এতই বিস্তৃত ছিল যে সমগ্রভাবে তা অমরত্বের দাবী করতে পারে।

প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তবলার ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তাল প্রক্রিয়ায় এই যন্ত্রটির সঙ্গে খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী শ্রেণীর গানের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে গানের উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে উপযুক্ত তবলা বাদনের উপরই নির্ভরশীল। এই হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গনে তবলা শিল্পীদের অবস্থান উৎকর্ষেরই দ্যোতক। কিন্তু এই তবলা বাদনের ক্ষেত্রে ঘরানার ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রধানতঃ চারটি ভাগে এই ছাপকে ভাগ করা চলে—যথাঃ দিল্লী, ফরাক্কাবাদ, অজরাড়া ও পূরবী (বারাণসী)। তবলার মনোহারিত্ব নিয়ে এদের পার্থক্য গড়ে উঠেছে এবং এদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তবলা বাদনের ক্ষেত্রে দিল্লী বাজই মনে হয় সর্বপ্রাচীন। এই বাদন পদ্ধতির প্রথম শিল্পী সুধার খাঁ এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে উত্তরকালে যে সব তবলা-শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেন তাঁদের সমগ্র চেষ্টার ফলেই গড়ে ওঠে এক বিরাট গোষ্ঠী যা দিল্লী ঘরানা নামে পরিচিত হয়। মহম্মদজান খিরকুয়া ও নামসুদ্দীন এই ঘরানারই অন্তর্গত।

ফরাক্কাবাদ ঘরানার আদিপুরুষ বকসু খাঁ। একাধিক শিল্পীর সমাবেশ এ ঘরানায়ও দেখা যায়। পরবর্তীকালে মহম্মদজানও এই গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। বাদন বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে এ-ঘরানার মসিত খাঁ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র করামতুল্লার নাম সকলেই জানেন।

অজরাড়া ঘরানার মুখপাত্র হিসাবে মীরাটের হবিবুদ্দীন খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর শিক্ষণ প্রধানতঃ দিল্লী ঘরানার নাথু খাঁর কাছে। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দিয়ে তিনি আহৃত জ্ঞানকে পৃথক আকারে গড়ে তোলেন এবং তা কড়া বা কঠিন প্রকৃতির হলেও বৈচিত্র্যহীন নয়।

পূরবী ঘরানার প্রধান কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ এবং এখান থেকেই আবির্ভূত হন তবলার

কণ্ঠে মহারাজ

অপ্রতিম শিল্পী আবিদ হোসেন খাঁ। আবিদ হোসেনের ছাত্র বাংলার কৃতি তবলা বাদক হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী। বেনারসের বিরু মিশ্র আবিদ হোসেনের আর এক কৃতী শিষ্য। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ কথক নাচের প্রাণকেন্দ্র হওয়াতে নাচের আঙ্গিক ও ছন্দের বাহার তবলা বাদনের মধ্যেও এসে পড়ে।

বারাণসী ঘরানা লক্ষ্ণৌ ঘরানারই শাখা এবং সেখানকার তবলার ধারা নিম্নপ্রকারের—

মদু খাঁ, রাম সহায়, ভৈরো সহায়, বলদেও সহায়। বলদেও সহায় গোষ্ঠী থেকে আবির্ভূত হন কণ্ঠে মহারাজ। এই গোষ্ঠীর অপর উল্লেখযোগ্য শিল্পিবৃন্দের নাম—কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং কণ্ঠে মহারাজের পুত্র কিষাণ মহারাজ।

এ ছাড়া পাঞ্জাবকেও এক পৃথক ঘরানা ধরা হয়। এই ঘরানার অন্তর্গত আল্লারাখার নাম সকলেই জানেন।

কণ্ঠে মহারাজের জন্ম ১৮৭৯ সালে বারাণসীধামে। পিতা দিলীপজী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধো প্রসাদও ছিলেন তবলায় বিশিষ্ট শিল্পী। মাত্র ৭ বৎসর বয়সে কণ্ঠে মহারাজ পিতৃব্য বলদেও সহায়ের কাছে তবলা শিক্ষা শুরু করেন। কিন্তু মাত্র ৫ বৎসর শিক্ষাদান করে বলদেও সহায়কে চলে যেতে হয় নেপাল দরবারে সভাশিল্পীর পদে। গুরুর অনুপস্থিতি কণ্ঠে মহারাজকে নিরুৎসাহ না করে আহৃত বিদ্যা অনুশীলনের প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলে। নিভৃতে তিনি এ কাজ করে চলেন একাগ্র চিত্তে।

বহুদিন পর বলদেও সহায় যখন বারাণসীতে ফিরে আসেন, তখন ছাত্রের এই অধ্যবসায় ও গুরুপ্রীতি লক্ষ্য করে এতই সন্তুষ্ট হন যে তবলার সবকিছু কণ্ঠে মহারাজকে দিতে মনস্থ করেন। তবলা সঙ্গতের ব্যবহারিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে কণ্ঠে মহারাজের সম্যক জ্ঞান গুরুরই কৃপা সুস্পষ্ট টোকা, বোলপরনের ঘন বাঁধুনি, ছন্দের অপূর্ব বিন্যাস এবং সর্বোপরি বাদনকালীন নবসৃষ্টি ও তার বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সম্পাদন কণ্ঠে মহারাজকে যশের শিখরে নিয়ে যায়। সুজন অনুরাগী মহলে তাঁর বাজনার প্রতি অকুণ্ঠ আসক্তি বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে এবং ক্রমে উত্তর ভারতের সর্বত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে তাঁর তবলা বাদনের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সংস্কৃত শ্লোকাংক তবলা বোলের আকারে গ্রথিত করে কণ্ঠে মহারাজ এক নূতন পথের সন্ধান দেন। এ ধরনের বাদন যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন কী অপূর্ব তার গঠনপ্রণালী এবং গতিভঙ্গী। আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন, তবলার উপযুক্ত জবাব না হলে কণ্ঠ সঙ্গীতেই হোক বা যন্ত্রসঙ্গীতেই হোক সঙ্গীত যেন জমে ওঠে না, শিল্পী ও শ্রোতা উভয়ের মনেই যেন একটানা অতৃপ্তি থেকে যায়। কণ্ঠে মহারাজের ক্ষেত্রে এ অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যেতো না। সর্বাঙ্গসুন্দর তাঁর জবাবের ধারা শ্রোতার মন অভিভূত করতো। তবলা বাদনের মধ্যেও যে অপ্রতুল সঙ্গীত রসের প্রাচুর্য আছে কণ্ঠে মহারাজের বাদনে একথাই বারবার মনে হতো। বহু প্রখ্যাত শিল্পীকে তাঁর সঙ্গে গাইবার বা বাজাবার সময় অভিভূত হতে এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখেছি।

বহু বৎসর যাবৎ কণ্ঠে মহারাজ বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে যে বাদনশৈলী প্রদর্শন করেছিলেন তার তুলনা হয় না। বাদনকালীন তাঁর হৃষ্ট মনোভাবেই তা প্রকাশ পায়। ছন্দের স্রোতে ভেসে চলতো সঙ্গীতের তরী—যেন হাল্কা হাওয়ায় পাল তুলে অগ্রসর হওয়ার এক প্রীতিমূর্তি। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধ আঙ্গিকের মূলে তিনি বসে থাকতেন হাল ধরে পথের নিশানা ঠিক করতে। সঙ্গীত যেন তাঁর বাদনের সহায়তায় প্রাণ পেতো।

একথা যে কতো সত্য তার সঠিক সন্ধান পেয়েছিলাম একবার। প্রখ্যাত সরোদশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়—কার তবলা তাঁর ভালো লাগে। কোনও দ্বিধা না করে সোজাসুজি তিনি উত্তর দেন, কণ্ঠে মহারাজের তবলা হলে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলতে থাকেন—একবার কণ্ঠে মহারাজের তবলার সঙ্গে তাঁর সরোদ বাজনা চলছে। ক্রমে এমন এক আধ্যাত্মিক স্তরে তাঁরা দুজনেই গিয়ে হাজির হন যে লয়ের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পার্শ্বে উপবিষ্ট রবিশঙ্কর শিল্পীদ্বয়ের সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে হাতে তালি দিয়ে লয় দেখাতে শুরু করেন। হঠাৎ হেসে উঠে আলাউদ্দীন খাঁ বলেন—এই অপার্থিব মুহূর্তে লয় অকিঞ্চিৎকর। রবিশঙ্কর আমাকে লয় দেখায়! অবচেতন মন তখন তাঁদের রসের সীমাহীন রাজ্যে উন্মুক্ত বিচরণে ব্যস্ত, সেখানে ছন্দ ও সুরের মিলনে কোনও ব্যাকরণসিদ্ধ ধারা তাঁরা মানতে রাজি নন। অবশ্য এ-অবস্থা সাময়িক এবং উচ্চশ্রেণীর রসাস্বাদনের অভিব্যক্তি মাত্র। রসজ্ঞ মনের এই অভিভূত অবস্থা লক্ষ্য করবার সৌভাগ্য হয়তো অনেকেরই হয়নি।

ব্যক্তিগতভাবে কণ্ঠে মহারাজ ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির লোক। প্রচারের মোহ তাঁর রসঘন ধারাকে কখনও প্রভাবিত করেনি। সঙ্গীতকে খর্ব করে তবলার প্রয়োগ তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। গায়ক বা বাদকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমান পা রেখে চলাই ছিল তাঁর ধারা। সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তাঁর বাদন পদ্ধতি ছিল সত্যই রস সৃষ্টির পরম সহায়ক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৃতিত্বের কাঠামো ক্ষীণ হয়ে এলেও শেষ বয়সেও তিনি যে ছন্দের লহর সৃষ্টি করতেন তা সত্যই বিস্ময়কর এবং সমগ্রভাবে তা স্বাতন্ত্র্যের সম্মান লাভ করতে পারতো। বারাণসী ঘরানার এই সঙ্গীত সাধকের জীবনাবসানের সঙ্গে এই কথাই বারবার মনে আসে যে, সঙ্গীত জগত দিন দিনই অবসন্ন হয়ে পড়ছে। সঙ্গীত ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে কণ্ঠে মহারাজের অবদান মনে হয় লোপ পাবে না।

বলদেও সহায় প্রবর্তিত তবলা বাদনের ধারা শান্তা প্রসাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছে। কণ্ঠে মহারাজের পর কিষণ মহারাজ ইতিমধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বারাণসী ঘরানার এসব তবলা শিল্পীর কল্যাণে ভারতের সঙ্গীত অঙ্গন আজ সমৃদ্ধ। কথক নৃত্যের সঙ্গে তবলা বাদনের বিশিষ্ট ভঙ্গী এই গোষ্ঠীরই অবদান। বোল, পরণ, টুকরার প্রাচুর্য নিয়ে বারাণসী ঢং যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মধ্যে চমক লাগাবার অবকাশ অনেক। কথক নৃত্যের সন্ধান যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন নৃত্যের আঙ্গিক বিশ্লেষণে বারাণসী ঘরানার তবলার অবদান কতো। শুধু নৃত্যানুগ এ ধারা নয়। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের উপযোগী তবলা পরিবেশনেও এ ঘরানার অবদানও সামান্য নয়। লহরা বাদনের ক্ষেত্রে যে বলিষ্ঠ ধারা বারাণসী ঘরানা থেকে উদ্ভূত হয়েছে তার স্বকীয়তা সারা ভারতে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই বলিষ্ঠ ও রসোত্তীর্ণ ধারার সামনে এলে মন ছুটে যায় সেই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসা তবলা শিল্পীর কাছে যাঁর গতিপথ আর পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আশা করি, কণ্ঠে মহারাজের অবদান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অঙ্গন থেকে মুছে যাবে না। সে-সম্ভাবনা যাতে না আসে তার জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে।

এখন দরকার শ্রম-নিবিড় উৎপাদন-ব্যবস্থা

তুর্থ পরিকল্পনায় শ্রম-নিবিড় উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা য়েছে। মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির ıpital-intensive method of production) মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ই দ্রুত হয় সন্দেহ নেই; কিন্তু ার সমস্যা ভারতে এত তীব্র ছে যে, পরিকল্পনা কমিশন সংস্থান-সৃষ্টিকারী প্রকল্প আরও বেশী চালু করার জন্য রাজ্য সরকারগুলির ; আবেদন জানিয়েছেন। সম্প্রতি পরি- না কমিশনের কর্মসচিব রাজ্য সরকার- ের কর্মসচিবদের কাছে এক চিঠিতে য়েছেন যে, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ার হার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার পিছিয়ে আছে। এখন অর্থনৈতিক ন প্রচেষ্টায় যাতে কর্মসংস্থানের ণ আরও বাড়ে তার প্রচেষ্টা চালানো া দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ন্যায় উভয় দৃষ্টিভংগীর থেকে বিচার করলেই এই নীতির কতা প্রতিভাত হয়। এই বিশেষ কোণ থেকে বিচার করে রাজ্য সরকার- চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসূচী পুন- চই হওয়া দরকার বলে পরিকল্পনা মনে করেন। শ্রম-নিবিড় ন পদ্ধতি অনুযায়ী এমন- উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত হবে যেন আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করা কলাকৌশলের উপর নির্ভরশীল হয়ে না থাকতে হয়; দেশে কারিগরি উন্নতি যতদূর হয়েছে তার ভিত্তিতেই শ্রম-নিবিড় উৎপাদন-প্রকল্প চালু করা হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে।

উৎপাদন পদ্ধতি এবং বিনিয়োগের লক্ষণ (Investment criterion) কী হওয়া উচিত তা নিয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে যে বিনিয়োগ-নীতি অনুসৃত হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। গ্যালেনসন ও লিবেনস্টিন (Galenson and Leibenstein) নামে অর্থবিজ্ঞানীদ্বয় মনে করেন, মূলধন-নিবিড় গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর যদি বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তবে এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ দ্রুত বাড়বে এবং তখন সেই লাভের টাকা যদি আবার বিনিয়োগ করা হয়, তবে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব দ্রুত বাড়বে। এভাবে যদি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়, তবে শিল্প-সম্প্রসারণের মাত্রাও বাড়বে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়বে। কিন্তু, ভারতের ক্ষেত্রে বর্তমান পর্যায়ে এই বিনিয়োগ-লক্ষণ গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। এখন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন খাদ্য সমস্যা এবং বেকার সমস্যার সমাধান করা। এ দুটো সমস্যার সমাধান অর্জিত হবার পর ভারত শুধু যন্ত্রপাতির মাধ্যমেই দ্রুত শিল্পায়নের পথে এগোতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যদি শ্রম নিয়োগ অপেক্ষা মূলধন নিয়োগ বেশী গুরুত্ব লাভ করে তবে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়বে। আর কৃষির উন্নতির মাধ্যমেও দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে পারে—যেমন ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ এগিয়েছে। তা ছাড়া, গ্যালেনসন ও লিবেনস্টিন নির্দেশিত বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা খুবই খরচ-সাপেক্ষ; এত টাকা খরচ করার ঝুঁকি বর্তমানে ভারতের গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই বর্তমানে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষভাবে কাম্য।

শ্রম-নিবিড় উৎপাদন প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করতে হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্র উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা উচিত, এবং তা করা হলেই আরও বেশী করে শ্রমিক নিয়োগ করার মাধ্যমে শিল্প ও কৃষির যুগপৎ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে মূলধনের স্বল্পতা। তবে বর্তমানে যখন বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা

হয়েছে তখন উৎপাদনমুখী কর্মপ্রচেষ্টা সৃষ্টির জন্য মূলধন সরবরাহে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। তাই পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির উচিত অধিক শ্রম-নিয়োগকারী উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবিলম্ব অগ্রাধিকার দেওয়া।

রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন কর্মসূচী

ভারতের ফলিত অর্থনীতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ (National Council of Applied Economic Research) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় রপ্তানি বৃদ্ধির একটি নতুন কর্মসূচীর প্রতিবেদন দিয়েছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী আমদানির সঙ্গে রপ্তানির যোগসূত্র বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য সমীক্ষায় তিনটি বিকল্প পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থা অনুযায়ী রপ্তানি-কারীগণ শতকরা ২০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত আমদানির যোগ্য সামগ্রী আমদানি করার সার্টিফিকেট পাবেন। যে জিনিসগুলি আমদানি করা হবে সেগুলি কী পরিমাণে (অর্থাৎ, স্বল্প; মাঝারি অথবা বেশী) রপ্তানি-সামগ্রী উৎপাদনের কাজে লাগবে তার উপর আমদানি সার্টিফিকেটের শতকরা হার নির্ভর করবে। দ্বিতীয় ব্য অনুযায়ী দুইটি নির্দিষ্ট হারে আম সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে—তার একটি হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগ হারে অপরটি হচ্ছে শতকরা ৩০ ভাগ হা এটা নির্ভর করবে রপ্তানিযোগ্য সাম গুলির উৎপাদন কতটা আমদানির উ নির্ভরশীল তার উপর। তৃতীয় ব্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট জিনিস রপ্তানির বিপ যে আমদানি করা হবে সেগুলি তি শ্রেণীতে বিভক্ত করে যথাক্রমে শত ১৫ ভাগ, ৩০ ভাগ এবং ৪৫ ভ আমদানি করার সার্টিফিকেট দেওয়া যে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমদ করার যতটা ক্ষমতা বা লাইসেন্স দে হয়েছে, তার শতকরা ২০ ভাগ কম দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। প কল্পনার সাফল্যের জন্য কোন বি ক্ষেত্রের গুরুত্ব কতটা এবং কোন যে জিনিসের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দে উচিত অথবা উচিত নয়—সব দিক বিবে করেই এই সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচী চালু করার এক বছর আমদানির পরিমাণ অরও শতকরা ভাগ কমানো যেতে পারে।

আলোচ্য প্রতিবেদনে রপ্তানি উন্ন রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধ জন্য অর্থ সরবরাহ, রপ্তানিযোগ্য সাম বিক্রয়করণের ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর বি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই বা গুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারি দেওয়া হয়েছে। রপ্তানি সামগ্রীর উৎপাদ আরও বেশী করে মূলধন সরবরাহ হব প্রতিবেদনে ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধা এ ক্ষেত্রে অনেক বাড়ানো হয় এবং কোটি টাকা মূলধন নিয়ে একটি প রপ্তানি ব্যাংক অথবা আমদানি-রপ্ত ব্যাংক গঠিত হয় তারও সুপারি আলোচ্য প্রতিবেদনে করা হয়েছে। ১৯ ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে হয়ত রপ্তা সামগ্রী উৎপাদনে দেশের শিল্পগুলি অ বেশী করে ব্যাংকের প্রদত্ত আর্থিক সা পাবে, তবুও বর্তমানে ভারতে এ রপ্তানি ব্যাংকের প্রয়োজনীয় অস্বীকার করা যায় না। আলো প্রতিবেদনে এ কথাও বলা হয়েছে রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কর্পোরেশন (Export credit guarantee Cor ration) প্রস্তাবিত রপ্তানি ব্যাংকের স একত্রিত করে দেওয়া উচিত। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ধরনের রপ্তানি বা গঠিত হয়েছে, অনুরূপ একটি রপ্ত ব্যাংক ভারতেও অবিলম্বে গঠিত হও দরকার।

সুব্রত গু

হেমচন্দ্র বাগচী

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

কল্লোল যুগের কবি হেমচন্দ্র বাগচী আজ জীবিত থেকেও মৃত। সাহিত্য জগতে একটি বিস্মৃত প্রায় নাম। অথচ একদিন তাঁর লেখনী কি কবিতায়, কি গল্পে, কি প্রবন্ধে কেবল নূতন ধারারই সৃষ্টি করেননি, এক চঞ্চলতা এনেছিল। তাঁর "দীপান্বিতা" পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তা আজও স্মরণ করিয়ে দেয় কবি হেমচন্দ্রের প্রতিভাকে।

কল্যাণীয়েষু, কলিকাতা

তোমার দীপান্বিতা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ দান করার শক্তি তোমার আছে। ইতি—২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীয়ার সাহিত্য জগতে যে সমস্ত সাহিত্যিক, কবি, লেখক জন্ম গ্রহণ করে সাহিত্য ভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করেছেন তার মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বাগচীর নাম, তাঁর কাব্য-গ্রন্থ আজও সমাদৃত। কবি নদীয়ার গোকুলনগর গ্রামে ১১শে আশ্বিন, রবিবার, মহানবমীর মধ্যাহ্নে জন্মগ্রহণ করেন (ইং ১৯০৪)। কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রামের নিকটবর্তী এই গোকুলনগর গ্রাম। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি গোকুলনগরেই কবির বাল্যজীবন কাটে পল্লীর খোলা মাঠে, গরু চরানোর ছবি, খালবিলের ধারে। তাই ছোট থেকেই পল্লী প্রকৃতির সাহচর্যেতে কবির ঝিল, মন নানান কল্পনায়, রঙিন স্বপ্নে ভরে ওঠে। পিতা রাধাবিনোদ বাগচী জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। মায়ের নাম নিস্তারিণী দেবী। গৃহ-শিক্ষকের কাছেই কবির লেখা পড়া শুরু হয়। এ গ্রামেই রামায়ণ গান, বৈষ্ণবদের ভিক্ষার গানের মধ্য দিয়েই কবি প্রথম কাব্যের সুধা রস আস্বাদন করেন। কবির কাছেই শুনেছি গ্রামের পাশের নমসার বিল আর গাঙের প্রভাব তাঁর কবি জীবনের প্রেরণা যুগিয়েছে অনেক।

কিশোর কবি পিতার সঙ্গে গ্রামের বাইরে শহরের দিকে রওনা হলেন। চাকরির জন্য পিতা বদলী হলেন ক্যানিং-এ। পিছনে পড়ে রইল বহুস্মৃতি বিজড়িত পৈতৃক গ্রাম গোকুলনগরের মাঠ, ঘাট, নমসা বা নোয়াসার বিল, গঙ্গা আর গ্রামের সাথী বন্ধু, চাষীর ছেলেরা। তাঁর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ট্রেনে চড়া। ক্যানিংয়ের কাছারিতে বসে বাবা কাজ করেন পুত্র হেমচন্দ্র পরিচিত স্থান ছেড়ে এসে বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় বিষণ্ণ মনে বিদ্যাধরী নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান। বড় একা, বড় ফাঁকা মনে হতে লাগল। তবে বিদ্যাধরী নদীর ধারে বসে খানিকটা

হেমচন্দ্র বাগচী

শান্তি পেতেন, মনে পেতেন প্রেরণা। এখানে কয়েকটি বই, পত্রিকার সন্ধান পেলেন কবি, তার মধ্যেই পেলেন সাহিত্যের আস্বাদন।

এর কিছুদিন পর কবি এলেন কৃষ্ণনগরে—ঘূর্ণীতে। ঘূর্ণীতেও তাঁদের পৈতৃক বিরাট বাড়ি। সেখানে থেকেই কলেজিয়েট স্কুলে কবি পড়াশুনা শুরু করেন। এখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন তিনি। তারপর বিভিন্ন পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে লাগলেন। রবীন্দ্র প্রভাব কিশোরমন গ্রাস করল এবং সেই প্রভাবেই কবিতা লেখা শুরু করলেন। এরও পরে কবি করুণানিধান ও মোহিতলালের কাব্য ও সাহিত্য প্রভাবও কবি মনকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু কবি হেমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সব কিছু প্রভাবকে এড়িয়ে নিজ ভঙ্গিমায় নিজ বৈশিষ্ট্যে যে কাব্য, যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা আজও নূতনত্বের দাবি রাখতে পারে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় 'তৃষিত' নামে কবিতাটি স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় এবং কবির এই কবিতাটিই প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত কবিতা। ১৯২১ সালে কলেজিয়েট স্কুল হতেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর কৃষ্ণনগর কলেজ হতে আই এস সি পাশ করে বি এস সি পড়ার সময় তাঁকে কলকাতায় চলে যেতে হয় এবং সিটি কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বি এ পাশ করলেন বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। কলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। তখনকার দিনের লেখকগোষ্ঠীর নানান লেখার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করেছেন কবি। প্রবাসীতে কবিতা প্রকাশিতও হতে লাগল। নূতনের সৃষ্টিতে কবি তখন একের পর এক লিখে চলেছেন। সেই সময় অচিন্ত্যকুমার ও দীনেশরঞ্জন কবি হেমচন্দ্রকে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি যেন পথ খুঁজে পেলেন। কল্লোলে লিখতে শুরু করলেন কবি। তাঁর অনেক কবিতা কল্লোলের প্রথম পাতায় ছাপা হতে লাগল। কবি হেমচন্দ্র বাগচী সাহিত্য জগতে কেবল প্রতিষ্ঠা লাভই করতে লাগলেন তা নয়, নূতন সৃষ্টির পথে সুনাম অর্জন করলেন। কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনামূলক লেখা লিখতে লাগলেন। বি এ পাশ করার পর প্রথমে সংস্কৃতে, পরে বাংলায় এম এ পাশ করেন কবি।

কবিরা চিরকালই কল্পলোকবাসী। কবি হেমচন্দ্র কল্পনার রঙিন তুলি বুলিয়ে যেসব কবিতা, কাব্য সাহিত্য রচনা করেছেন তাতে কল্পনার ছোঁয়াচ থাকলেও বাস্তবরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়। তাই তাঁকে বাস্তবের কবি বললে অত্যুক্তি হবে না। কবি সংসার ধর্মে প্রবেশ করলেন। [illegible] ভোলানাথ সান্যালের কনিষ্ঠা কন্যা সুবোধনীর সঙ্গে ১৩২৮ সনে ২৩শে বৈশাখ কবির বিবাহ হলো। তিনি বাস্তব জগতে নানান কাজে জড়িত হলেন। ভবানীপুরে পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে প্রায় দশ বছর শিক্ষকতা করেন (১৯৩১-১৯৪১) সেই ফাঁকে বি টি পড়েন কবি। কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনার কাজও করেন। যখন রাজসাহী সরকারী কলেজে হেমচন্দ্র অধ্যাপনা করছিলেন সেই সময় ও তার কিছু পরে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বাগচী এন্ড সন্স নামে পুস্তক প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। কয়েকটি পত্রিকার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। 'অলকা' পত্রিকাখানি কিছুকাল তাঁর সম্পাদনাতেই চলে। এর কিছুদিন পর তিনি আবার তাঁর কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণীর বাড়িতে ফিরে আসেন।

শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হলেও কৃষ্ণনগরে এসে সাহিত্য চর্চায় মেতে ওঠেন। কৃষ্ণনগরের "সাহিত্য সঙ্গীতি", "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কৃষ্ণনগর শাখা" প্রভৃতি কয়েকটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গান-লেখায়, পাঠে আলোচনায় মেতে ওঠেন। এই সময় থেকেই কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগই কেবল হয় না, তাঁর লেখার সঙ্গেও পরিচয় হয় ভালভাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবি তাঁর কবিতা শোনাতেন, আবৃত্তি করতেন, বহু পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা। কৃষ্ণনগরে বসেই আরও দু'একটি বই প্রকাশ করেন কবি। ১৩৫৮ সালে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণনগর থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'বৈশ্বানর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায়। সম্পাদনা ছাড়াও প্রকাশের দায়িত্বও ছিল তাঁর। এই সময় হতে তাঁর শরীরটা আরও খারাপ হতে থাকে। এই পত্রিকার যোগসূত্রে কবির সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। 'বৈশ্বানরের' চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। কবি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অসুস্থ অবস্থায় আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন, আমিও যেতাম তাঁর বাড়িতে। অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত—'আমার বই, পাণ্ডুলিপিগুলি ছাপা হলো না।' আজও সেই বেদনা নিয়ে কবি পল্লীর একপ্রান্তে নিভৃতে আশা পথ চেয়ে বসে আছেন—তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি ছাপা হবে। লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেল, কল্লোল যুগের কবি জীবিত থেকেও সাহিত্য জগতে আজ মৃত। কবির কাব্যগ্রন্থ অল্পই আলোচিত হয়েছে, প্রচারিত হয়েছে সাহিত্য ক্ষেত্রে। অনেকদিন পর কবির কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীর বাড়িতে গিয়ে জানলাম কবি গ্রামে আছেন। কবির ছোট ছেলে কবির পাণ্ডুলিপিগুলি, বহু চিঠিপত্র, প্রশংসাপত্র দেখালেন, দেওয়ালে টাঙানো অভিনন্দন পত্রগুলিও দেখলাম। দেখলাম আলমারিতে কবির বহু পুস্তক আজও রয়েছে। ঘরের মাঝে কবির ব্যবহৃত আরামকেদারা আর চারিদিকে

কবির স্মৃতি। কেবল কবিই নেই ঘরে। 'বৈশ্বানর' প্রকাশের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেমদার সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনায় এই ঘরেই কাটিয়েছি। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার দশমবার্ষিকী উপলক্ষে (১৮৫৭-১৯৫৭) নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটী ১৫ই আগস্ট ১৯৫৭ কবি হেমচন্দ্র বাগচীকে গুণীজন সম্বর্ধনায় যে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করেন তা আজও দেওয়ালে ঝুলছে। ১৩৬৩ সালে ঘূর্ণীর সুভাষ সংঘ ও ৫নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের সভাবৃন্দ কবিকে যে অভিনন্দনপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করেন তাও দেখলাম। পুরাতন চিঠিপত্রের বাণ্ডিল ঘাটতে ঘাটতে কবির কাব্যগ্রন্থ দীপান্বিতা পড়ে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার কবিতায় যে চিঠিখানি কবিকে লেখেন তা দেখে এখানে উদ্ধৃত না করে পারলাম না। ঢাকা, নীলক্ষেত, রমনা থেকে ১৩৩৫। ৮ই পৌষ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার এই কবিতা চিঠিখানি লেখেন।

দীপান্বিতা দর্শনে

শ্রীমান হেমচন্দ্র বাগচী করকমলেষু,

যে নবীন বৈতালিক বাণীর নিকুঞ্জতলে বসি'
প্রভাত কাকলিগানে অরুণের করিছে বন্দনা,
তার কানে অন্ধরাত্রি আঁধারের তিমির মূর্চ্ছনা
কেমনে শুনায়ে দিল! আকাশের দশমীর শশী
যে নিশারে করেনি অনাথা, সেই বিস্মরণী মসী
ঢালিয়াছে সংসার যে কালরক্ত ললাটের লাঞ্ছনা
হরিয়াছে অন্তরের কামিনীর মাঙ্গল্য মূর্চ্ছনা,
আলোর জননী সেকি—নহে বন্ধ্যা ত্রিযামা-তামসী?
সে ডাকিনী স্বপ্নঘোরে করিয়াছে মোরে গৃহহীন—
যার পিছে, রুদ্ধ আঁখি, ফিরিতেছি কাননে কান্তারে,
পিঠের তমিস্রা যার হেরি শুধু অগোলক লুণ্ঠিতা
এলোকেশী নিশীথিনী। তারি লাগি আমি উদাসীন।
আমিও দেখিনি যাহা, তুমি কোন প্রীতে হেরিলে সে-মুখ তার—তব চক্ষে উপহারে সে দীপান্বিতা।

এই রকম বহু চিঠি, প্রশংসাপত্র ছাড়াও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলি পড়বার মত। তার-মধ্যে কয়েকখানি চিঠি এখানে উদ্ধৃত না করে পারলাম না। একখানি চিঠি লিখেছেন কবি করুণানিধান কলম্বো থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। অপরখানি লিখেছেন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম জেলার রূপসীপুর (গোপালপুর) হতে। চিঠিখানিতে কোন তারিখ ছিল না। কবি করুণানিধানের চিঠির ছবি এখানে দেওয়া হলো। আর শৈলজানন্দ

কলম্বো।
৮. ৯. ৩৭

প্রিয়বরেষু,

ভাই হেম, [illegible]
[illegible]
[illegible] Examiner [illegible]
[illegible]
[illegible] M.A. [illegible]
[illegible]
[illegible] Govt. represent
[illegible] Lahore [illegible] All-India. Industrial Exhibition
[illegible]
[illegible]

তোমার
করুণা

হেমচন্দ্রকে লেখা কবি করুণানিধানের পত্র

মুখোপাধ্যায়ের লিখিত চিঠির নকল এখানে সম্পূর্ণটি উদ্ধৃত করলাম।

রূপসীপুরে
গোপালপুর, বীরভূম
(বীরভূম)

ভাই হেম,

তোমাদের অভাব বড় বেশি করিয়াই অনুভব করিতেছি। লিখিতে এখনও কিছুই পারি নাই। লিখিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছি মাত্র।

তোমাকে আলাদা করিয়া বড় চিঠি আর লিখিলাম না। একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চিঠিখানি লইয়া টানাটানি করিতে গিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। তাহার পর আর লেখা হয় নাই। সুবলের চিঠিখানি তোমাদের দুজনের জন্যই লেখা আসিবার দিন তোমাদের বড় কষ্ট দিয়া আসিয়াছি। দেখা করিয়া আসিতে পারি নাই বলিয়া নিজেও কম কষ্ট পাই নাই।

তোমার 'প্রদোষ ও নিশা' আর একবার পড়িলাম। গল্পটি সুধীর লইয়া ভাল কাজ করে নাই। সাধারণ মেয়েদের ভাল লাগিবে না। অর্থাৎ বুঝিতে পারিবে না।

এই সঙ্গে হরিদাসবাবুর চিঠিখানি পাঠাইলাম। তোমার 'বিজয়া দশমী' গল্পটি তাঁহাকে দিয়া আসিবে।

বঙ্গের বাগদি জাতি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী, এম-এ

[illegible]

হেমচন্দ্রের হস্তাক্ষর

তোমার বাড়ীর অসুখ-বিসুখ কিছু কমিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।

কিছুদিন পরে আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে হয়ত দু'দিনের জন্য আমার দুই স্ত্রীকে লইয়া একবার কলিকাতা যাইতে পারি। যদি যাই ত কোথায় উঠিব? তোমার বাড়ীতে উঠিব কি? অবশ্য যদি তখন তোমার বড়ী এমনি গোলমালশূন্য হয়। দু'তিন দিনের বেশী থাকিব না।

নাটকটি কাল হইতে লিখিব ভাবিতেছি। তুমি কি আর নূতন কিছু লিখিলে? একটি উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা কর না?

কলিকাতার খবর দিও। আশা করি ভাল আছ। আমাদের ভালবাসা জানিও। ইতি

তোমাদের
শৈলজা-দা

হরিদাসবাবুর চিঠিখানি একটি খামের ভিতর দিয়া উপরে ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসিবে।

কবি হেমচন্দ্রের হাতের লেখাও ছিল স্পষ্ট ও সুন্দর। তাই কবির লেখার নমুনা-স্বরূপ 'বঙ্গের বাগদি জাতি' শীর্ষক লেখাটি হতে খানিকটার ছবি এখানে দিলাম। এই লেখাটির শেষে লিখিত ঠিকানা থেকে জানা যায় কবি তখন মালদহ জেলার বজ-[illegible] এক [illegible] কলেজে [illegible] সংস্কৃতের অধ্যাপনা করছেন।

বর্তমানে কবি হেমচন্দ্র [illegible] গ্রামে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে [illegible] পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে ফাঁকা মাঠের [illegible] সরাপুকুরের পারে নতুন করে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাড়ী করেছেন। সেই বাড়ীতে অসুস্থ কবি আপন মনে খেয়ালখুশীমত লিখে চলেছেন। শরীর অসুস্থ, মাথারও ঠিক নেই কিন্তু লেখার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি আজও। লিখেই চলেছেন কবি। এইসব লেখার মধ্যে অসংলগ্নতা থাকলেও কবিতার একটা সুর, একটা রেশ আজও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

বহুদিন পর কবির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। প্রণাম করলাম কবিকে। বহুদিন পর দেখা তবুও চিনতে পারলেন, নাম ধরে হাসতে হাসতে আহবান করলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন?'

উত্তরে বললেন, 'শরীর ভাল যাচ্ছে না, দাঁত, পেট, আর মাঝে মাঝে জ্বর। তোমার শরীর ভাল ত?' কি করছেন জিজ্ঞাসা করায়, নাসা নিয়ে বললেন, 'শ্লেট ওয়ার্ক করছি।' বলে হাতের শ্লেটটি এগিয়ে দিলেন—। লেখার খানিকটা উদ্ধৃত করলাম এখানে।

অদূরের দিল্লী

খাস কনট প্লেসে। এই সেদিন। কনট প্লেসের চোখ ঝলসানো ঝকমকে করিডরে দিনদুপুরে সেদিন যখন জনৈক ইউরোপিয়ান অ্যাংরি ইয়ংম্যান, যাকে বলে একেবারে উলঙ্গ-দিগম্বর ভাই হয়ে, দিব্বি হাসিমুখে ঘোরাফেরা করছিলেন তখন শপিং-এ বেরুনো দিগ্বসনা-প্রায় অজন্তা স্টাইলের তন্বী-তরুণীদের কেউ কেউ হয়ত ভুরু কুঁচকে বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন। তারপর সে যে কি মজার হুলুস্থুলু হুটোপাটি, পুলিশ! এবং অবশেষে খাজুরাহো টাইপের ইউরোপিয়ান পুরুষ মহোদয়টিকে অন্তর্বাস পরিয়ে যখন মাননীয় আদালত তাকে দশ টাকা জরিমানা করে রেহাই দিলেন তখন তা শুনে আমাদের এক তরুণ অধ্যাপক বন্ধু সখেদে বলে উঠলেন, 'মাত্র, মাত্র দশ টাকা? প্লাস আণ্ডার উইয়ার? এমন জানলে আমিও—' বন্ধুবরের মন্তব্যটি শোনামাত্র আমি একটি ভিন্ন আস্বাদের প্রয়োজনে হইহই করে তন্মুহূর্তে ওর সঙ্গে ঘন হয়ে উঠলাম। কদিন ধরেই ভাবছিলাম কথাটা কি করে পাড়ি। সুযোগ জুটে গেল। হালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় একরকে বিস্ময় নিয়ে অসম্ভব হইচই হচ্ছিল, পার্লামেন্টে চেঁচিয়ে মেচিয়ে প্রশ্নাদি উঠেছিল ছাত্রসমাজটা নাকি অধঃপতনে যাচ্ছে। তাতে অনেকের হৃদকম্প। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়লোকী ফ্যাশনেবল ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ নাকি চরস নিয়ে আজকাল খুব চারশোবিশ করছে। তাই নিয়ে এই কদিন অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে যখন তখন সমানে আমার কথা হচ্ছিল, মওকা বুঝে এখন ওঁকে নিবেদন করলাম, 'মে আই জয়েন দি জয়েণ্ট?'

'য়ু?—অ্যাণ্ড দা জয়েণ্ট?'

ওর বুঝি বিশ্বাস হলো না। বন্ধুটি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বদান্যতায় প্যারিস নিউইয়র্ক টোকিওর নাইটলাইফ দেখেছেন। বললাম 'হোয়াই নট?' কেন আমি কোন্ সাধুসন্ত মহারাজ যে চরসের আড্ডায় যেতে আমার মাথা নিচু হবে? ফর এ পট্ অফ মারিজুয়ানা?

পঞ্চনদীয়দের মধ্যে এমনিতেই বাঙালী রুচিবিরুচির বেশখানিক কেমন যেন তুরীয় ধারনা আজও আছে। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে কিরকম যেন চোখে তাকিয়ে থেকে অধ্যাপক বন্ধু রাজী হয়ে গেলেন, 'অল রাইট। আই উইল ফিক্স য়ু।—লেকিন দুসরে কিসিকো বতানা নহি জী।'

আমি তো জানি আমার মতলবটা সাধু। বললাম, 'না কাকপক্ষী জানতে পারবে না।'

দুরাশা

বাস্। সর্বদিকে অমনি চিচিং ফাঁক।

আসলে কে না জানে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি অত্যাধুনিক পাশ্চাত্ত্যঘেঁষা শহরতলিতে মারিজুয়ানা নিয়ে বে-আইনি মাতামাতি এবং ফলাও কারবার চলছে। ওর চল হঠাৎ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য সরকারি আইনকানুনে আইনত এ বিষয়ে দিব্বি কড়ারকম। তবে আভিজাত্য শহরতলিগুলোর বেচারা থানাদাররা ও-সব দেখেশুনেও না দেখার ভান করে বসে থাকেন।

আমার অধ্যাপক বন্ধু তাঁর এক ধনীর দুলাল ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অর্ধেক কথা শুনল কি শুনল না, ছাত্রটি প্রশ্ন করে বসল, 'মারিজুয়ানা?'

'চরস, ইয়ার, চরস।'

এ নাহলে আর দিল্লীতে অধ্যাপক! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এমন সুন্দর শব্দে এবং এত সংক্ষেপে জিনিসটাকে এত সহজে বুঝিয়ে দিতে পারতেন না। ধনীর দুলালটি অনতিবিলম্বে বাড়ির গ্যারেজ থেকে নিজের গাড়ি বের করে তাতে আমাকে তুলে নিল, নিয়ে হাই স্পীডে এল দশ না বারো মাইল দূরের নয়নাভিরাম কৈলাশ সুবার্বে। এসে এখানে সাড়ম্বরে পরিচয় করিয়ে দিল ওর সিন্ধী ক্লাস-মেটের সঙ্গে। দুর্দান্ত স্মার্ট তরুণী ক্লাস-মেট। পরনে হলুদ হলুদ ফুটকি দেওয়া জামরঙের জামা আর শালপাতা রঙের স্ল্যাকস্। পরিচিত হলাম ড্রইংরুমে বসে যেখানে টেলিভিশন। অতঃপর বাড়ির বাগানে ডেকচেয়ারে বসে ফ্রীজ-কোল্ড ডাচ্ বীয়ার খেলাম। এইখানে বীয়ার খেতে খেতে ছাত্রদের চরস চক্রের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনাটা এবার রয়েসয়ে পাড়া হলো। 'এ আর বেশি কথা কী।' এই স্ল্যাকস্ পরা ডার্ক-ব্লু গগ্‌লস্ চোখের সিন্ধী ছাত্রীটি তার নিজের গাড়িতে করে পরের দিন যথাসময়ে আমায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সোজা নিয়ে এলো। পথে আমায় পইপই করে শিখিয়ে নিয়েছে আমি যেন চরস-চক্রে ঢুকে নিজে থেকে মুখ না খুলি। পরিচয় টরিচয় যা দেবার সব ও নিজে দিয়ে দেবে। 'আপনার পকেটে গগ্‌লস্ আছে? গগ্‌লস্?'

'গগ্‌লস্?'

'হ্যাঁ ডার্ক গগ্‌লস্?—চশমাটা খুলে ফেলে এখন গগ্‌লস্ পরুন।' মেয়েটি এম-এ ক্লাসের ছাত্রী। বাবা শুনেছি বিগ বিজনেসম্যান। ব্যাঙকক-এ। দিল্লীতেও। 'কিন্তু গগ্‌লস্ তো আমার নেই।'

'নেই?' মেয়েটি বুঝি একটু অপ্রস্তুত হলো। ওর উত্তম ধরনের ফলসী-টি কখন যেন কোন সময়ে বুকের ভেতর থেকে খসে ফেলেছে। তাই বুকদুটো এখন নিরু-নিরু লাগছে। বললাম, 'না গগ্‌লস্ আমার নেই।'

চট করে কি ভেবে নিয়ে স্ল্যাকস্ পরিহিতা ছাত্রীটি আহত নিঃশ্বাসে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে এমনিই চলুন।—তবে দোহাই আপনার। যা দেখবেন শুনবেন অন্য কাউকে যেন ঘুণাক্ষরেও তা বলবেন না কিন্তু।'

ক্ষেত্রবিশেষে এইরকম যোগাযোগে আমি মিছে কথা বলে থাকি। তাই বললাম, 'আচ্ছা।'

ক্যাম্পাসে ঢুকে নামকরা একটি স্টুডেণ্ট হস্টেলে এলাম। আমার সঙ্গী আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে একা একা হস্টেলবাড়ির ভেতরে গেল। মিনিট কয়েক বাদে ফিরে এসে বলল, 'না। আপনার দেখছি বরাত খারাপ। এখানে আপনাকে ইনট্রোডিউস করা যাবে না।'

'তাহলে?' খুব দমে গেলাম।

'আসুন দেখি। আরেকটায়।' মেয়েটা অসম্ভব চটপটে। ক্যাম্পাসের বাইরে এসে বলল, 'আসলে কি জানেন, ওরা নতুন লোক-টোক তেমন পছন্দ করে না। একটা ঝুঁকি তো আছে। হাজার হলেও ইউনিভার্সিটির মধ্যে কি-না।'

মিরাণ্ডা কলেজের রাস্তায় ও যখন গাড়িতে মোড় নিল তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা আমি যে শুনি এখানে মহিলাদের

হস্টেলেও মদটদ নাকি একটু আধটু চলে?'

'চললে খারাপটা কী?'

'না আমি এমনি বলছিলাম আর কি।' খবরের কাগজে পড়েছি নামকরা একটি মেয়ে-হস্টেলের মেন গেটে নাকি প্রত্যেক সোমবার-সোমবার ভোরবেলায় কবাড়ি-অলাদের ভিড় জমে যায়। খালি শিশি-বোতল কিনবার জন্য। রবিবার-রবিবার সন্ধ্যায় নাকি খুব জমে এই বড়লোকী হুল্লোড়।

এবার আমরা সুন্দর ফিটফাট একটি মডার্ন বাড়িতে এলাম। ছিমছাম বাগান। ক্যাম্পাস থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সঙ্গী আমাকে বাগানের শ্বেতপাথরের চৌকিতে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। মিনিট-দুই হয়েছে কি হয়নি, সে এসে বলল 'আপনাকেও কিন্তু ওরা যা দেবে তা খেতে হবে। [illegible] আসুন।'

সন্ধ্যা তখন সোয়া সাতটা। কব্জি ঘড়িতে তাই দেখলাম।

বড়সড় যে আলোছায়া মাখা [illegible] ঘরটায় আমরা ঢুকে এলাম সে ঘরে অনেকেই ছিল। [illegible] ছাড়া। ছোট ছোট জটলা। একটু একটু গুঞ্জন। নতুন আগন্তুককে দেখে কেউ যে বিরক্ত হলো বা কেউ খুশী তা বুঝতে পারলাম না। কেন না [illegible] আলোয় [illegible] কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। কে যেন আমার দিকে একটা [illegible] এগিয়ে দিল। [illegible] তাও আবার [illegible] দিয়ে বেশ শক্ত করে জড়িয়ে [illegible]। [illegible] কে যেন আমায় বলল, [illegible] সরোদ। [illegible] আসরটা বেশ জমেছে বলে অনুমান করলাম। কেউ আধশোয়া, কেউ বসা, কেউ টান টান শোয়া। যার যেমন মর্জি। ঘরের এক কোণায় বড়মাপের একটি রেকর্ড প্লেয়ার। তা কেউ বাজাচ্ছে না। কে যেন গুমরে উঠল, 'একটু জল।' 'ট্রানসিস্টার'ও আছে। তাও স্তব্ধ। যে যার খুশী মতন চুপচাপ। বা একটু আধটু কথা বলছে নিকটের মানুষের সঙ্গে। নজরে পড়ছিল, প্রথম থেকেই, বিন্দু বিন্দু আগুনের টিপ। সিগারেট। সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে চরস। যে চরসের কালোবাজার চীনিচক। যেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে বুঝি সমস্ত কোকাকোলার দোকানে। চরসের ফলাও কারবার। চোরাগোপ্তা। লেনদেন আছে শুরুতে হাই ফিনেনসিয়ারদের; পরে খুচরো কুইক প্রফিটওলারা যে যা পারে দাঁও মেরে উসুল করে নেয়। পুলিস সব জানে। সরকারও সব জানে। তবে কি না কোনো জানাজানিতেই শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না। এইসব ছেলেমেয়েদের অন্তত কারো কারো মা-বাবারাও জানেন। ওঁরা হয়ত ছুটিয়ে ককটেল পার্টি করছেন। ওঁদের ছেলেমেয়েরা আসে চরসচক্রে। একা একা নয়। সমষ্টিগতভাবে। টীম ওয়ার্ক। কারো আর্থিক অভাব থাকার কথা নয়। কলেজ থেকে বেরিয়ে কেউ যে বেকারত্বকে বরণ করতে বাধ্য হবে তাও মনে হয় না। তবে এর কৈফিয়তটা কী? এই দুঃখময় সত্তার? কে যেন হেঁড়ে গলায় বলল, 'দাদা ঘাবড়াবেন না।'

এই পরিমণ্ডলের মানেটা কী? এরাই কি নতুন বুদ্ধিজীবীশ্রেণী? গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা? ভবিষ্যৎ ব্যুরোক্র্যাটস? চলচ্চিত্রে নাটকে সাংবাদিকতায় এরাই পথ দেখাবে? আমি কি লিখব না লিখব সে পাঠ দেবে আমায় এরা?

নিরীহের মতন চেয়ে চেয়ে আমি সব দেখতে লাগলাম। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল, বেনারসে ঘাটে গঙ্গার তীরে দেখতাম ছাই ভস্মমাখা সাধুদের। ওঁরা কষে গাঁজায় দম দিতেন। বিদঘুটে বিকট দুর্গন্ধ। কই, ওঁদের তো কেউ খারাপ বলত না।

এ কি ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এতক্ষণে কে যেন আমায় বসতে বলল। বলে আমার হাত ধরে বসিয়ে দিল একটা সোফার গদিতে। ভাষার টান শুনে কেমন যেন মনে হলো ছেলেটা বুঝি বাঙালী।

নির্ঘাত বাঙালী।

এবার অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে আসছে

আলোর ছায়া। আরেকটি ছেলে, যার মুখখানা একদম সাহেবদের মতন টকটকে ফর্সা, চরস-ভরা একটা জ্বলন্ত সিগারেট আমার আঙ্গুলে গুঁজে দিল। দিয়ে জিগ্যেস করল হিন্দীতে, 'আপকা ইসমে শরীফ?'

যে তরুণীটি এখানে আমাকে এনেছিল আমার হয়ে সে তখুনি জবাব দিল 'ইনি মহবুব আলী। কবি। গাজিয়াবাদ কলেজের লেকচারার।'

মনে মনে আমি খুব একচোট হাসলাম। পাল্টা আমি কারো নামধাম শুধোলাম না। যে আমাকে এনেছে দেখলাম তারও মুখে চরস-সিগারেট। দেখলেই বোঝা যায় চরস। এতে নীল নীল সর্পিল ধোঁয়া।

মিহি একটি কণ্ঠস্বর 'এত রাজ্যিসুদ্ধ তোমায় কে আনতে বলেছিল?' উত্তরটাও কানে এলো, 'রাজ্যিসুদ্ধ আবার কী। মাত্র একজন।'

'দেখিস, ঢলে পড়িস না আবার।'

দেখলাম প্রায় সকলের চোখেই ডার্ক গগলস্। জানতাম না আলো লেগে চরসের নেশা মিইয়ে যায়।

সকলের মুখে ঠোঁটে বুদ্ধির ছাপ। সুন্দর সব স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতী। কেউই বিশ বাইশ বছরের উপর নয়। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে তাহলে এদের জন্মমুহূর্ত।

নতুন জেনারেশন। বিত্তবানদের সন্তান আর্গরি জেনারেশন? এখনো জানি না। এরাই কি তাহলে "বিচ্ছিন্নতাবোধ"-এ ভুগছে? তাও এখনো জানি না। সবার অঙ্গে মূল্যবান পোশাক। প্যান্ট সার্ট। শাড়ি সালোওয়ার। গাড়িবারান্দায় দেখে এলাম বিদেশী মার্কা লিমোজিন। প্লাইমাউথ, ডজ, শেভরলে। খুব সম্ভব এস টি সি থেকে নিলামে চড়া ডাক দিয়ে কেনা। কে জানে।

এদের নালিশটা কী? যৌবনের ক্ষোভ? নিরাপত্তার অভাব? শহুরে জীবনে বিতৃষ্ণা? নাকি সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ? কেন এই নেশা পয়রেজ্যানিং?

শারীরিকভাবে এভাবে শুকিয়ে মরার আত্মশাসানি কেন? এরাই হবে লেখক কবি বিপ্লবী?

বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে?

কেন এই শ্লথ মনোভাব? না কি বিস্ফোরক? নাকি এরাই হবে নতুন যুগের বাহন?

এদের যুক্তিগুলো এতই জানা, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আশ্চর্য উন্মার্গ পরিবেশ। এটা চরস-চক্র না নবদেশাত্মবোধ চর্চা? যে মেয়েটি আমায় এখানে এনেছে ওকে দেখে তো তীক্ষ্ন বুদ্ধির অধিকারিণী বলে মনে হলো। একদিন ওরই কাছ থেকে আশা করি এ বিষয়ে কিছু আলো দেখব। এখন ওকে ডেকে ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করলাম, 'খেতে কি রকম লাগে?'

'এখনো খেয়ে দেখেন নি?'

মাথা নাড়লাম।

'দিশিশালির ওতে টান দিন, নইলে আবার বিপদে পড়বো।'

অস্বস্তিকর। এটা কি রিক্রিয়েশন?

দিলাম আস্তে করে একটা টান সিগারেটে। এখনো ওতে আগুন ছিল। আবার দিলাম টান জোরে। মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে উঠল। কে যেন এক কোণ থেকে দাদা আস্তে করে আবার টান দিলাম। এই দেখতে চেয়ে যে লোকগুলো এতে কী পায়।

ঝিম ধরে এল সমস্ত দেহ। খুব জোরে টান দিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে ঘরটা আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেল। কারো মুখচ্ছবি আর আমি স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম না। ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়ে আসছে। শিরদাঁড়াটা কেমন নরম হয়ে গেল। একে বলে এল এস ডি? তা কেন হবে। এ তো ভারতীয় চরস। কিন্তু এখন এ নেশা নতুন স্টাইলে মোড়কে মারিজুয়ানায়। নূতন বসনে আসছে ভূস্বর্গ আমেরিকা থেকে। ওদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ না পেলে আমাদের আর চলে না। কে যেন বলেছিল—হোয়েন দে জার্ক, উই জার্ক লাইক ম্যাড। হোয়েন দে টুইস্ট, উই টুইস্ট লাইক হেল।

ওদের নরকও আমাদের স্বর্গ।

মাথাটা আমার ঘুরপাক খাচ্ছে। নূতন অন্ধকার এসে দাঁড়াল সামনে। আলোর বিন্দুগুলিও ঘুরপাক খাচ্ছে চোখের সামনে। ছাত্রছাত্রীরা চিৎপাত হয়ে শুয়ে বসে আধশোয়া। আমি জানি এদেরই কেউ কেউ হবে আই এফ এস, আই এ এস, কেন না এদের সমাজ ইংরেজি বলে আমেরিকানদের ইয়াঙ্কি-সুরে নকল করে পড়ে ইংরেজি মিডিয়াম ইস্কুলে, খায় ডিনার টেবিলে বসে কাঁটা-চামচে দিয়ে। এরা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। সমাজের মাথায় চড়ে বসতে এদের আত্মভোলা যোগ্যতা আছে।

রাত তখন সোয়া নটা।

কে যেন আমার কানের পাশে বলল, 'কী, মজা দেখতে এসেছিলেন?'

আরো ক্ষণকাল চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। পর্দা সরিয়ে বাইরের বাগানে এলাম সোজা। চমৎকার বাতাস দিচ্ছে বাইরে আর টুপটাপ বৃষ্টি। মনে পড়ল, সেই ইউরোপিয়ান ইয়ং অ্যাংরি ম্যান মহোদয় আজ ফের আবার কনট প্লেসে একদম নগ্ন-দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মনে পড়ল, পার্লামেন্টে আজকে মন্ত্রীমশাই ঘোষণা করেছেন।—"দু-জন মাননীয় এম পি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে হাতে দাবী জানিয়েছেন, যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হোক!" কেন? নো মোর কোয়েশ্চেন প্লীজ।

ইন্দ্রজাল আলী সাহেবের রচনাগুলিকে আচ্ছন্ন করে আছে ১৩৭৩ পর্যন্ত তা যেন হঠাৎ রঙিন কথার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। 'শহর-ইয়ার'-এর স্টাইল 'চাচা-কাহিনী' ও 'দেশে বিদেশে'র অসামান্য গদ্য-শিল্পের শোচনীয় ট্র্যাজেডি। অথচ বিশ্বাস করতেও মন চায় না যে 'শবনম্'-এর লেখকও কোনোদিন বন্ধ্য হ'তে পারেন, তাঁরও প্রতিভায় ভাটা পড়তে পারে।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্কটিশ চার্চ কলেজ

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় আলী সাহেবের 'শহর-ইয়ার' উপন্যাসটি তাঁর পূর্বে লিখিত 'শবনম্'-এর মতনই পাঠকদের বহু প্রশংসা অর্জন করবে বলে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। তাছাড়া বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির, বিশেষ করে 'শহর-ইয়ারে'র কথোপকথনের মধ্যে আলী সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রচনা পদ্ধতির নৈপুণ্যে বাড়তি 'ফাও' হিসেবে আমাদের অজানিত বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। এই অতিরিক্ত পাওনার অধিকাংশ তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে যার ফলে কবির বহু কবিতা ও গানের অন্তর্নিহিত ভাব যথোপযুক্ত স্থানে আলী সাহেব উপস্থাপিত করে আলোচ্য চরিত্রটি পাঠকদের মানসপটে মূর্ত ও বাস্তব আকারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। আর সেইজন্যেই হয়ত শবনম্ চরিত্রের স্রষ্টার কৃতিত্বকে শহর-ইয়ারের মত আর একটি নারী চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে অকপটে স্বীকার করে নিতে ভুল হয় না। রবীন্দ্র কাব্যাশ্রিত হয়ে চরিত্রটি এক অসাধারণ সৌন্দর্য বহন করে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। অবশেষে বাড়তি পাওনা স্বরূপে রবীন্দ্র সাহিত্য ছাড়া মাঝে মধ্যে কবির ব্যক্তিগত দু' একটি ঘটনা যে আলী সাহেব আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে উপন্যাসের এক জায়গায় উল্লেখিত, "শুভ্রতম লগ্নে আজন্ম নিত্য গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করেছেন" এই উক্তিটির মধ্যে কবির দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার পূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। যদিও কবির আধ্যাত্মিক চেতনার নিদর্শন আমরা তাঁর বহু কবিতায়, গানে এবং সর্বোপরি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে পেয়েছি কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাত্রা প্রসঙ্গে, পত্রাবলী, আত্মকথা এমন কি কোন প্রবন্ধেই তার প্রতিপালনের উল্লেখ নেই। তাঁর এই ধ্যানী রূপটি আমাদের মানসপটে কাল্পনিকভাবেই রেখেছি। তাই এই উপন্যাসে উল্লেখিত এই রূপটি কবির একান্ত সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে নূতন না হলেও সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে একটি নূতন তথ্য। আলী সাহেবের বর্ণিত এই ঘটনাটির অনুরূপ আর একটি ঘটনা আমি বহুদিন পূর্বে স্বর্গীয় ক্ষিতীমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে তিনি কলকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করেছিলেন। সহৃদয় পাঠকদের কাছে নিবেদন যে আমার বিস্মৃতিবশতঃ যদি কোন দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা যেন নিজ গুণে সংশোধন করে আমাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রীমহাশয় কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটি এই যে, তিনি শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রোজই লক্ষ্য করতেন কবির এই পরিচিত রূপটি। কৌতূহল বশতঃ কবি কখন ঘুম থেকে উঠে এই ক্রিয়া শুরু করেন সত্যকে দেখবার জন্য তিনি উদগ্রীব হন। সেইমত কোন একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে চুপি চুপি গিয়ে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, কবি স্নান সেরে নিজ হাতে আসন বিছিয়ে শুভ্র আচ্ছাদনে পূর্ব দিকে মুখ করে একই ভঙ্গিতে বসে আছেন আর তাঁর দৃষ্টি সুদূর দিগন্তে নিবদ্ধ। প্রায় দু' ঘণ্টাকাল একইভাবে বসে থেকে যখন আসন ত্যাগ করলেন তখন তিনি শাস্ত্রীজি কবির কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন তিনি কিসের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। কবি নাকি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "আমি সেই ক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকি যেই ক্ষণে দেখতে পাব পূর্ব দিগন্তে, প্রত্যুষের প্রথম সূর্যের প্রথম কিরণ এই বিশ্বপ্রকৃতি-রূপ পদ্মে বিকীর্ণ করে এক একটি পাপড়িকে বিকশিত করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করবে, আর তারই উপর আমার আনন্দ যেন নৃত্য করতে থাকবে।"

পরিশেষে উপন্যাসটির শেষ পর্যায় প্রসঙ্গে গুরুদেবের "রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম" কবিতাংশটুকুর প্রকৃত ভাব বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখ করে আলী সাহেব যথার্থ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। কবির

জীবন সায়াহ্নে লিখিত শেষ লেখা পর্যায়ের মৌলিক ভাব সন্নিবেশে কাহিনীর শেষ রেশটুকু যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। তার ইঙ্গিত সেই মহা অজানার দিকে। পাঠককে কবির মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে অস্ফুট উচ্চারিত "কী জানি কী হবে" উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যে আলী সাহেব উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

অনিল রায়চৌধুরী
সিভিল লাইনস
কানপুর

॥ ৩ ॥

গত ৩রা শ্রাবণের দেশে সৈয়দ মুজতবা আলী শহর ইয়ারের চিঠিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালায়—একটু ব্যতিক্রম দেখা গেল।

"তরুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।"

কিন্তু রবীন্দ্র রচনাবলীর (বিশ্ব ভারতী সংখ্যা) ১৭শ খণ্ডে গানটি আছে,—

"করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।"

অর্থের দিক থেকে শব্দ দুটির ব্যতিক্রম লক্ষণীয় এবং ভাবের দিক থেকেও। কোন শব্দটি শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়েছে জানালে সুখী হব।

জ্যোতির্ময় অধিকারী
গৌহাটি—১

লেখকের বক্তব্য

আমার কাছে যে-সব বইপত্র আছে তাতে সর্বত্রই 'করুণ'। আমি কপি করার সময় হয় 'তরুণ' লিখেছিলুম, কিংবা ছাপাখানা ভুল করেছেন। তবে ছাপাখানা সচরাচর একম ভুল করেন না।

অতএব আমি, মি লর্ড্, হাফ গিল্টি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিশ্ববিজ্ঞান

অধ্যাপক জিতেনবাবুর যে দ্বিতীয় চিঠি ছাপা হয়েছে সেটির এবং তৃতীয়টির জবাব খুব সংক্ষেপে দিলাম। পরিভাষা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই কারণ মতের মিল হবে না। যে বন্দুকের গুলি পলায়মান মানুষভেদী তা সবসময় লোকটির শরীরের মধ্যে গিয়ে থেমে যায় না—এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। শব্দভেদী সেই অর্থে প্রযোজ্য। জিতেনবাবুকে আমি অল্ট্রা-সনিক, হাইপার-সনিক ও সুপার-সনিক্-এর বাংলা পরিশব্দ জিগ্যেস করেছিলাম, মানে নয়। কোন একটি আতস কাঁচের একদিক ফুলো এবং অন্যদিকে ফোঁপরানো হলে সেটা উত্তলাবতল না সব তলোত্তল বলা হবে সেটা কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে বা কোন যন্ত্রে কোন দিক কোন কাজ করছে তার উপর নির্ভর করে কিন্তু আতস কাঁচ একই। বিষম শব্দটি আমারও পছন্দ নয় কিন্তু বই-এ আছে বলে ব্যবহার করেছি—চিন্তা করে অন্য শব্দ বাছাই করার সময় ছিল না।

জিতেনবাবুর দুটি প্রধান প্রশ্নের একটি স্বাভাবিক অন্যটি তাঁর কাছ থেকে আশাও করা যায় না। যাই হোক স্থানাভাবের দরুণ ২।৪ কথায় জবাব দিচ্ছি:—

(১) শুক্রের ঘূর্ণন ও আবর্তনের গতি যে পুব থেকে পশ্চিমে সেটা নিঃসন্দেহে জানা যায় ভেনেরা-৪ প্রেরিত বেতার তথ্য থেকে, আরো জানা যায় যে শুক্র দাহ্য অজৈব তৈল সাগরে আবৃত—ডঃ হায়লের এই অনুমিতি ভ্রান্ত। এই দুটি আবিষ্কার হালের মাত্র ২।৩ বছর আগেকার। ভেনেরা-৪ শুক্রে অবতরণ করার আগেই ১৯৬৪ সালের ৩০শে অগস্ট অ্যাকাডেমিশিয়ান বারাবাশফ্ শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে শুক্রের সাদা মেঘাবরণের উপর ২ কোটি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এক কলংকের আবির্ভাব দেখতে পান। সেটি ছিল আসলে মেঘ গভীর ভাবে ফেটে যাওয়ার ফলে একটি গহ্বর। সেই জায়গাটি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা শুক্রের গতিদিক সম্পর্কে প্রথম সন্দিহান হন। ১ থেকে ৪ নম্বর পর্যন্ত শুক্রগামী মহাকাশযানগুলিকে গণনা করে দিন ক্ষণ স্থির করে উৎক্ষেপ করা হতো, মঙ্গলগামী মহাকাশযানকে যেমন পৃথিবী ও সূর্যের গতির অনুকূলে উৎক্ষেপ করা হয়। সেই জন্য ১ম ২য় ভেনেরা শুক্রে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, ৩য়টি গিয়ে আছড়ে পড়ে। চতুর্থটি ধীরে ধীরে প্যারাসুটের সাহায্যে শুক্রের ভূমি স্পর্শ করে বহু অজ্ঞাত তথ্য পাঠায় যেমন শুক্রের ঘূর্ণন-আবর্তন বিপরীত দিকে এবং বেগ সেকেণ্ডে ৩৫ কিলোমিটার, শুক্র তৈল সাগরে আবৃত নয়, এবং সে আগেকার ধারণা মত সবসময় চাঁদের মত সূর্যের দিকে রেখে ঘোরে না, পৃথিবীর মতই ঘোরে। এইসব আসল খবর পাওয়ার পর কেঁচে গণ্ডুষ করে, নতুনভাবে গণনা করে, সূর্যের দিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ৫ ও ৬ নম্বর ভেনেরা দুটিকে, যে দুটি শুক্রের কক্ষ অবধি পৌঁছে পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে সূর্য কেন্দ্রিক কক্ষ ধরে এগোতে থাকে। ওদিকে শুক্র আসছিল ঘড়ির কাঁটার মত দিকে ঘুরতে ঘুরতে ফলে মাঝপথে শুক্র ও মহাকাশযানের, সামনা-সামনি (পাশ থেকে নয়) দেখা হয়ে গেল এবং শুক্রের অভিকর্ষে যান দুটি গ্রহে

গিয়ে নামল—সময় লাগল মোট ২ মাস, আগেকার ৫ মাসের জায়গায়। এই সময় সংক্ষেপই তো শুক্রের বিপরীত দিকে গতির প্রমাণ তবু জিতেনবাবুকে বিশ্বাস করানোর জন্য ২।১টি উদ্ধৃতি বাংলায় তর্জমা করে দিলাম:—

(১) "...এমন কি শুক্রের আবর্তন-দিকও আমাদের জানা ছিল না। তেজস-অবস্থিতি-নির্ণয় কৌশলের কল্যাণে আজ আমরা জেনেছি...যে সূর্যের সঙ্গে আপেক্ষিক বিচারে গ্রহটির একটি ঘূর্ণনে ১১৭ দিন (পার্থিব) লাগে এবং সে আবর্তন করে সূর্যের বিপরীত দিকে...।" (রুশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর মহাশূন্যে গবেষণা ভবনের অধ্যক্ষ আচার্য কুর্টের গত ১৮ই মার্চ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত)।

(২) "নবতম তেজস-অবস্থিতি-নির্ণয় কৌশল ব্যবহার করে এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে শুক্র উল্টা দিকে ঘোরে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে নয়, পূব থেকে পশ্চিমে।..." ("শুক্র তার গোপন রহস্য প্রকাশ করছে" শীর্ষক, অ্যাকাডেমিশিয়ান মিখাইলফের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

শুক্র উল্টোদিক কাছাকাছি আসার অর্থাৎ মুখোমুখি হবার পর ভেনেরার লক্ষ্যভেদকে তাই রুশ বিজ্ঞান-ভাষ্যকার মিঃ মারিনিন "hitting the bull's eye" বলে বর্ণনা করেন—পাশের দিক থেকে কি bull's eye-এ আঘাত করা যায়?

জিতেনবাবু, মীন, বৃষ প্রভৃতি কেন রাশির সঙ্গে শুক্রের গতি মিলিয়ে দেখলে সত্য প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না। শুক্রের গতি নির্ণয় করতে হয় সূর্য বা লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে।

জিতেনবাবুর জানা উচিত যে ২য় মহাযুদ্ধের আগেই মার্কিন বিজ্ঞানাচার্য রাসেল এক "সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব" তত্ত্ব ছাড়া স্যার জেমস জীন্সের সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পর্কিত অনুমিতি ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। রাসেল বলেন যে অন্য একটি নক্ষত্র আকস্মিকভাবে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ায় (যা হতে পারে না) সেই নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গ্রহ-উপগ্রহগুলি সৃষ্টি করে—জীন্সের এই আকস্মিকতা ভিত্তিক সৃষ্টি ছাড়া যুক্তি সত্য হলে, গ্রহগুলি সূর্যের আরো অনেক কাছে ঘুরত, সূর্যের প্রচণ্ড মহাকর্ষের সঙ্গে লড়ে এত দূরে চলে যেতে পারত না এবং ফলত সৌর গর্ভজাত হলে সেগুলির তাপমাত্রা আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত এবং সেই বহির্গত অত্যুত্তপ্ত প্লাজমার খণ্ড বিখণ্ড হওয়া অসম্ভব। বস্তুর চারটি দশা। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও প্লাজমা এবং প্লাজমার অবস্থায় কোনো বস্তুর খণ্ডিত হতে পারে না। জীন্সের অনুমিতি সত্য হলে প্লাজমার প্রচণ্ড তাপ ও সূর্যের নৈকট্যজাত তাপে জৈব জগতের উদ্ভব অসম্ভব হতো। তারপর সূর্যের ঘূর্ণন বেগ সেকেন্ডে মোট ১২' মাইল কেন এবং গ্রহগুলির বেগ এত বেশি কেন তারও কোন জবাব রাসেলের মতে জীন্স দিতে পারেননি। জিতেনবাবুকে অনুরোধ, তিনি অটো স্মিড্টের "A Theory of the Origin of the Earth" বা B Levin-এর "Evolution of the Earth and Planets" বই দুটি যোগাড় করে পড়ুন কারণ স্মিড্টের তত্ত্বই আজ স্বীকৃত।

অধ্যাপক জিতেনবাবুর "সূর্যের আবার বার্ষিক গতি কি?" প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের ঘূর্ণন (আহ্নিক) ও আবর্তন (বার্ষিক) আছে। সূর্যের সপরিবারে ছায়াপথের কিনার কাছ বরাবর কক্ষে (ছায়াপথের মর্ম কেন্দ্রের তারা সমবায়ের চারিদিকে) একবার আবর্তন করতে লাগে ২২.৫ কোটি পার্থিব বছর, জ্যোতিষীয় ভাষায় যাকে বলা হয় ছায়াপথ বৎসর বা মহাজাগতিক বৎসর (Galactic or Cosmic Year)

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সুনন্দর জার্নাল

গত শনিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৭৬ দেশ-এতে সুন্দর একটা প্রবন্ধ পড়লাম। সেটা সুনন্দের 'রথ'। সুনন্দের লেখনীতে যে মাধুর্য ফুটে উঠেছে রথের সেই দিনগুলোর বর্ণনায় তা মনকে অভিভূত করে দেয়। বাংলা দেশের এই জনপ্রিয় উৎসবকে এতটা গভীরভাবে আরো কেউ লিখেছেন কিনা জানি না। রথের দিনের কলকাতাকে তিনি আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থিত করেছেন।

ভাবতে ভাল লাগছে যে কলকাতাতেও এমন সুন্দর একটা উৎসব হয়। যে উৎসবে প্রাণ ভরে ওঠে এক নির্মল প্রসন্নতায়। যে উৎসব শিশুদের, যে উৎসব শিশুদের মত মিষ্টি।

সুনীল মুখোপাধ্যায়
মধ্যপ্রদেশ।

স্ত্রী শিক্ষা

গত ২০শে আষাঢ়, ১৩৭৬ তারিখের দেশ-এ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিলাম না। যদি "সেকালের বাঙালীর চোখে স্ত্রী শিক্ষা"—ইহাই বর্তমান পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরা লেখকের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব যে, এই প্রবন্ধে সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সেই বিগত যুগকে লেখক এক চক্ষুর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সেদিনকার বাংলা সমাজের একটি অংশের মানুষের কথাই তিনি বলিয়াছেন।

নীরদবাবু লিখিতেছেন যে, স্ত্রী শিক্ষা-বিরোধী লেখকরা ১৯ শতাব্দীর "বেশীর ভাগ বাঙালীর কাছে বাহবা পাইয়াছিল।" এই উক্তিটি কতদূর সত্য, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ "বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি"তে "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ নারী" নামক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করিয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই ইহার দুই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়।" ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে, স্ত্রী শিক্ষা সমর্থক লেখকগণও কম বাহবা পান নাই। এবং সে যুগে একটি বইয়ের দুই বৎসরে দুই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় বুঝা যায় যে, সমর্থকদের দলও কম ভারী ছিল না।

লেখক বলিয়াছেন যে, সে যুগের হিন্দুরা মেয়েদের কলেজে পড়া ভাল চক্ষে দেখেন নাই। লেখক কেবলমাত্র হিন্দু সমাজেরই দোষ ধরিয়াছেন। সেই ভদ্র-পল্লীর মধ্যে "বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের ন্যায় নারীর শিক্ষাদানের কেবল প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ নহে, ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেও বিরুদ্ধ আপত্তি করিয়াছিলেন।" (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি)। ডঃ মজুমদার তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা (চৈত্র, ১৮০২ শকাব্দ) হইতে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন: "স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ প্রকৃতি প্রধানতঃ বুদ্ধি প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা বুদ্ধি প্রধান শিক্ষা, হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রী জাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"

সে যুগেও যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রচুর সমর্থক ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবিতায়। ১৮৮৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি এ পরীক্ষা পাশ করেন। প্রথম দুই বঙ্গনারীর এই কৃতিত্ব উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হয়।" (বিদ্যাসাগর-বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার)। কবিতার কয়েকটি লাইন এইরূপঃ—

"হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে",
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চিরসুখে আর
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার?"

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালীর মধ্যে একটা দ্বিত্বভাব দেখিয়াছেন এবং তাহাতে কিছুটা বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "বাঙ্গালীর মানসিক জীবনের এই আলোকের পাশে বেশীর ভাগ বাঙালীর মানসিক জীবনের অন্ধকারও পুরা-পুরি বর্তমান।" কিন্তু যে কোন সমাজেই এই "দ্বিত্বটা" থাকা আশ্চর্য নহে। নীরদবাবুর পরম প্রিয় "সুসভ্য ইংলণ্ডে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে প্রহার করিলেও কোন প্রতীকার ছিল না: স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখাও স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে পর্যাপ্ত অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইত না:..." (বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার)। নীরদ-বাবু শুনিলে আঁতকাইয়া উঠিবেন যে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে "শিল্প বিপ্লব" বা Industrial Revolution-এর একশত বৎসর পর অর্থাৎ যেই সময় কিনা ইংলণ্ড শিল্প ও সাহিত্যে পৃথিবীর সবার উপরে। এই দ্বিত্বটা কি বাংলার "দ্বিত্বটা"-র চেয়ে কিছু কম প্রকট?

ডঃ মজুমদারের গ্রন্থ হইতে এতবার উদ্ধৃতি দিবার কারণ একটি। ডঃ মজুমদার বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, তাঁহার মতামতকে চ্যালেঞ্জ করিবার মত লোক নাই বলিলেই চলে। নীরদবাবু সেকালের বাঙ্গালী সমাজকে বড্ড বেশী হেয় করিয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছেন। সেদিনও যে সমাজের একটি বিরাট অংশ নারী শিক্ষাকে সমর্থন করিত তিনি তাহা বেমালুম চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডঃ মজুমদারের উদ্ধৃতিগুলি নীরদবাবুর সিদ্ধান্তের সমুচিত জবাব দিতে পারিবে।

এবার একটু বর্তমানের দিকে তাকান যাক। নীরদবাবুর মতে আজকে মেয়েদের শিক্ষাদানের পিছনে একটি কারণ হইল যে তাহারা তাহাদের অকর্মণ্য কম্যুনিস্ট ভ্রাতাদের অন্ন যোগাইবে। যুক্তিটি মন্দ নহে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইবার সিদ্ধান্ত লন পিতা, মেয়ের অকর্মণ্য ভ্রাতা নহে। কোন পিতাই আশা করেন না যে তাহার পুত্রটি বড় হইয়া ভগ্নীর কষ্টার্জিত অন্ন ধ্বংস করিবে। কোন ছেলেই বদ বা কম্যুনিস্ট হইয়া জন্মায় না, একটি বিশেষ বয়সে সে বখাটে বা কম্যুনিস্ট হয়। ইহার বহু পূর্বেই পিতা ঠিক করিয়া ফেলেন যে তিনি তাঁর কন্যাকে বিদ্যালয় পাঠাইবেন কি পাঠাইবেন না বা উচ্চশিক্ষা দিবেন কি দিবেন না।

নীরদবাবু তাঁহার গতানুগতিক ভঙ্গীতে বর্তমান সমাজের দোষত্রুটিই কেবল উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষা কোন পথে গেলে দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে সে কথা বলেন নাই। তিনি প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন "সারা জীবন একটা না একটা সংগ্রামে নিযুক্ত আছি।" আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি—"সংগ্রাম" এবং "সমালোচনা" কি একই বস্তু? নিজের কথা শুনাইতে শুনাইতে সহসা কেন যে লিখিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে ঠিক উল্টা হইয়াছে" তাহা বুঝিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংগ্রামী। তিনি একদিকে যেমন সমাজের

কুপ্রথাগুলিকে আক্রমণ করিয়াছেন অপরদিকে আবার সমাজকে দিয়াছেন নূতন আলোকের সন্ধান। সেখানেই একজন সমালোচকের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। কোন সমালোচক যদি রবীন্দ্রনাথের সহিত নিজেকে তুলনা করিবার মত দুঃসাহস রাখেন তাহা হইলে বলিতে হয় যে কশাইয়ের সহিত শল্যচিকিৎসকের তুলনা করাও অসম্ভব নহে।

সুদেব দাস
কলিকাতা-১৯

ল্যাটিন শব্দের ভাবার্থ

দেশ পত্রিকার (৩৯ সংখ্যা, শ্রাবণ ১০, ১৩৭৬) "অগ্নিরথের প্রথম দুদিন" আরম্ভে লেখক শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় Per aspera ad astra এর একটি অদ্ভুত "ভাবার্থ" দিয়েছেন। "Hey you/Heaven/ Take off your hat"। এহেন উদ্ভট ভাবার্থ তিনি কোথা থেকে পেলেন জানি না। ল্যাটিন জানা না থাকলে যে-কোনো অভিধানে সহজেই তিনি এর সহজ অর্থ পেতে পারতেন: to the stars through hardships। রমারচনার খাতিরে মূল অর্থের এমন রূপান্তর করার কোনো প্রয়োজন ছিল কি?

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

সংবাদ ভাষা ও দৃশ্যপট

'দেশ' পত্রিকার গত ৩রা শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত রূপদর্শী লিখিত 'সংবাদ ভাষা ও' ... লেখক লিখিত 'দৃশ্যপট' সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাতে বুর্জোয়া ও দলীয় পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনের সততা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে যার পটভূমি কিছুদিনের আগের কিছু ছাত্র কর্তৃক সংবাদপত্র অফিস আক্রমণ। বুর্জোয়া সংবাদপত্র যে কী পরিমাণ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে ইত্যাদি লিখে রূপদর্শী যে শ্লেষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, তা এবং 'দৃশ্যপটে'র লেখকও ঠিক সেই একই বক্তব্য দিয়ে তাঁর 'দৃশ্যপট' শুরু করেছেন, যার সঙ্গে সত্যের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। অনেক আজেবাজে কথার মধ্য থেকে যেটুকু সারবস্তু পাওয়া যায় এ দুটি রচনা থেকে তার মূল বক্তব্য দুটি (১) বুর্জোয়া সংবাদপত্র সম্পর্কে যে সব উক্তি করা হয় তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং (২) বুর্জোয়া-বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনা তো আরো অসৎ, ত্রুটিপূর্ণ ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

আমার প্রধান আপত্তি প্রথম বক্তব্যটি সম্পর্কে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও তার

ভূমিকা সম্পর্কে একজনের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক, যিনি নিশ্চয় একজন কমিউনিস্ট ছিলেন না। পুঁজিবাদের অধীনে ব্যক্তি-মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা কিরকম প্রায় অসম্ভব সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আইনস্টাইন লিখেছেন, "Under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main source of information, Press . . . It is thus extremely difficult, and indeed in most cases quite impossible, for the individual citizen to come to objective conclusions and to make intelligent use of his political rights (Einstein: "Why Socialism", page 10 M. R. Press).

কেন মনীষী আইনস্টাইন একথা লিখলেন? সমগ্র প্রবন্ধটিতে (why

socialism?) তার পরিচয় আছে। এক কথায় পুঁজিপতি শ্রেণী তার হাতে যা কিছু পাবে তা কেবল নিজের শ্রেণী-স্বার্থে লাগাবে এবং তার মূল কথাটা হচ্ছে "for profit, not for use" (উক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১১) মুনাফা, সর্বসাধারণের প্রয়োজনের জন্যে নয়—এই হচ্ছে পুঁজিপতিদের স্লোগান। এবং তার জন্যে জনসাধারণকে সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করাটা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং তার প্রমাণ আমরা অহর্নিশি পেয়েছি। আমরা কি ভুলতে পারি রম্যাঁ রোলাঁ যখন বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে সর্বহারাদের পক্ষে কলম তুলে ছিলেন, তখন তদানীন্তন ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি তাঁর সম্পর্কে কি ব্যবহার করেছিল? এটাও কি বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব যে, যখন রাশিয়ার বিপ্লবকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিগুলি লিখেছেন তখন তদানীন্তন বৃটিশ বুর্জোয়া প্রেস সেই চিঠির বক্তব্যগুলির প্রতি কি 'সুবিচার' করেছিল? এবং মাত্র কয়েক বছর আগে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল ভিয়েতনামের ওপর একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। উক্ত পত্রিকাটি রাসেল সাহেবের বক্তব্যটিকে বিকৃত করে পাল্টে অথচ তাঁরই লেখক পরিচিতিতে প্রকাশ করে কী নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছিল—সেটাও কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? রাসেল সাহেবের 'Crimes in Vietnam' গ্রন্থের একটি অধ্যায় জুড়ে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। জানি না, রূপদর্শী অথবা নবারুণবাবু এসব জানেন কিনা। (অথবা জেনে শুনেও না জানার ভান করছেন, কেননা বহুলপ্রচারিত একটি পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে অত্যধিক কাগজ জুড়ে এইসব বিষয় নিয়ে লিখে আসছেন অথচ এই সমস্ত খবর জানেন না একথা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।) মূল কথা স্বাধীন বা মুক্ত 'প্রেস' বলে যে কথাটা শোনা যায় সেটা একটা বিশুদ্ধ ধাপ্পা। পৃথিবীর কোথাও কখনো 'মুক্ত' প্রেস ছিল না, আজও নেই—কি ধনতান্ত্রিক দেশে, কি সমাজতান্ত্রিক দেশে। সংবাদপত্র সর্বত্র তার মালিকের স্বার্থকে সেবা করে। মালিক কখনো পুঁজিপতি, কখনো রাষ্ট্র। এবং একথা মানতেই হবে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অন্তত পুঁজিপতিদের তুলনায় জনসাধারণের বেশি কল্যাণ কামনা করে ও করতে বাধ্য। 'রূপদর্শী' ও নবারুণবাবুর জ্ঞাতার্থে আর একটি তথ্য নিবেদন করছি: রাষ্ট্রের হাতে পড়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষতির অনেক বিস্তর যুক্তি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ রবার্ট হাচিনস্-এর পরিচালনাধীনে "The Commission on Freedom of the Press" শেষ পর্যন্ত এই উক্তিটি করেন:

"Protection against government is now not enough to guarantee that a man who has something to say shall have a chance to say. The owners and managers of the press determine which persons, which facts, which version of the facts and which ideas shall reach the public" (Commission's Report; 1947)

এর পর নবারুণবাবু কি আলোকপাত করবেন জানতে ইচ্ছে করছে। এই কমিশনের রিপোর্ট এবং আইনস্টাইনের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটি কি যথেষ্ট নয়?—বলা বাহুল্য, এ দুটির কোনটাই মার্কসবাদীদের নয়।

তাঁদের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কে বলব এই যে—একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র এবং একটি 'দলীয়' পত্র—কখনোই এক হতে পারে না। এবং তুলনামূলক বিচার সম্পর্কে যাঁর একটুও জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন—দুটি ভিন্ন ধরনের [illegible] তুলনা চলে না। এবং এটাই comparative studies-এর ভিত্তি। দলীয় পত্র কখনোই একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র নয়, কেননা সে যে দলের মুখপত্র নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে সে দলের উদ্দেশ্য ও [illegible]। সুতরাং [illegible]

[illegible] পরিণত করত। কারণ তার [illegible] একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র কখনোই 'গণশক্তি' নয়।

সুতরাং যেহেতু আনন্দবাজার পত্রিকা নিজেকে 'গোষ্ঠীর' সংবাদপত্র বলে স্বীকার করেন না, এবং যেহেতু এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র—তাই [illegible] কোন দিক থেকেই 'গণশক্তির' সাথে এর তুলনা চলে না।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
বাঁকুড়া

শলোকভের ক্ষেত্রে)—এ ব্যাপারটা কি অত্যন্ত অস্বস্তিকর নয়? সাহিত্য নিয়ে ও'দের অতখানি মাথা ব্যথা কেন? পাস্তেরনাকের উপন্যাসে যে বিপ্লবের খানিকটা ভিন্ন চিত্র ফুটেছে, তাতে কি ক্ষতি হয়েছে সোভিয়েট দেশের? নিন্দুকেরা সুযোগ নেবে? অতএব বিশাল দেশেরও নিন্দুকদের ভয়? এতই যদি ভয় হয়, তবে পঞ্চাশ কি একশো বছরের জন্য কাব্য-সাহিত্য রচনা বন্ধ করে দিলেই হয়—প্লেটো যেমন তাঁর কল্পিত রিপাবলিকে কবিদের বাদ দিতে চেয়েছিলেন। সত্যিই তো সাহিত্য-শিল্প তো আর মানুষের খাদ্য-বস্ত্রের সমস্যায় কোনো কাজে লাগে না। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় চেকোস্লোভাকিয়া প্রভূত উন্নতি করেছেন, সেখানে এখন মানুষের মনের স্বাধীনতা দিলে কি রূপ দাঁড়ায়—সেটা কি দেখার যোগ্য ছিল না? আজ সাম্যবাদের চেহারা নানা রকম—যুগোস্লাভীয়, রাশিয়া এবং চীন পরস্পর—বিরোধীভাবে সাম্যবাদী। চেকোস্লোভাকিয়ায় তার আর একটি নতুন রূপ দেখা দিতে পারতো—সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে কণ্ঠ রোধ করা সমস্ত যুক্তি ও শুভবুদ্ধির পরিপন্থী।

চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনায় বহু রুশ লেখকের মধ্যেই বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সত্তরজন অগ্রগণ্য লেখক এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এই ঘটনায় তারা বুঝতে পেরেছেন, শুধু চেকোস্লোভাকিয়ার নয়, রাশিয়াতেও লেখকরা কোনো রকম স্বাধীনতার জন্য দাবি জানালে তাঁদের প্রতিও একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। লেখার স্বাধীনতা না-পাওয়াই লেখকদের প্রধান মর্মদাহের কারণ হয়। যারা স্বার্থপর বা সুবিধাবাদী নয়, দেশদ্রোহী নয়, বিদেশের টাকা প্রলুব্ধ নয়—যারা শুধু ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা চায়, সেই সমস্ত লেখকের ওপরেও যদি সরকারী খড়গহস্ত নামে, তবে তাদের উপায় কি? আর, যে-লেখকের সামান্যতম আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না—তাঁর নিজের লেখায় অন্য কারুর কাঁচি চালানো। রাশিয়ায় অনেক লেখকের রচনাই সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে ছাপা হয় না। যেমন, কুজনেৎসভের হয়নি। তাঁর দুটি উপন্যাস "বাবি ইআর" এবং "ফায়ার"—দুটিরই কিছু অংশ কাটা গেছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার পর থেকেই কুজনেৎসভ দেশ ছাড়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। সুযোগ এসে গেল, যখন তিনি লেনিনের জীবনী রচনায় হাত দিলেন। লেনিন কিছুদিন কাটিয়েছিলেন লন্ডনে, সে সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য তিনি লন্ডনে আসার অনুমতি পান। লন্ডনে সব সময়েই তাঁর সঙ্গে একজন রুশ সরকারের প্রতিনিধি থাকতো। সোহো এলাকায় স্ট্রিপটিজ দেখতে গিয়ে সামান্য সুযোগ পেয়েই তিনি আত্মগোপন করেন এবং একটি সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে তাঁর বিবৃতি দেন। তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন বৃটিশ সরকারের কাছে এবং তা অনুমোদিতও হয়েছে। রুশ দূতাবাসের কাছে প্রথমে এ সংবাদ এতই বিস্ময়কর লেগেছিল যে তাঁর সত্যতা অস্বীকার করেছিলেন। স্বয়ং রুশ রাষ্ট্রদূত কুজনেৎসভের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। কুজনেৎসভ দেখা করেন নি, বলে পাঠিয়েছেন, আগে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হোক, তারপর দেখা করবো!

সনাতন পাঠক

বই পড়ুয়ার ঝাঁপি

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে না

আশা করা গিয়েছিল 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' খুব কম সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হবে কারণ বাংলা ভাষায় ঠিক এই রকম প্রামাণ্য শব্দকোষের প্রয়োজন এখন নয়, রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই ছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং বলা যায় সারা-জীবনের সাধনার ফসল শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে, এই মূল্যবান গ্রন্থটির চাহিদা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে এখনও তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। এক বদ্ধ ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন মাথা খুটে নিরুপায় বন্দী হয়ে বইগুলি পড়ে থাকত না। অথচ এ রকম একটি অভিধান বাংলা ভাষায় এর আগে বেরোয় নি।

ভূমিকায় সংকলক অভিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে বলেছেন "যখন বিশ্বভারতীর শৈশবাবস্থা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম—সেই সময়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ কবিবর আমাকে বাঙলা ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়নের কথা বলিয়াছিলেন। তখন আশ্রমের বিদ্যার্থী-গণের পাঠের কোন সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক ছিল না; কবিবরের নির্দেশানুসারে সংস্কৃত প্রবেশ রচনা করিতে ছিলাম। সুতরাং তখনই তাঁহার কথানুসারে অভিধানের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। সংস্কৃত প্রবেশ রচনা ক্রমে ক্রমে তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইলে, আমি একদিন কবিবরের নিকটে পূর্ব প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া অভিধান-সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনিও আমার ইচ্ছানুসারে আনন্দের সহিত তৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি দিলেন। সেই দিন হইতেই আমি তদীয় অনুমতিক্রমে অভিধান রচনায় নিরত হইলাম। অভিধান প্রণয়নের ইহাই মূল কারণ। সে অনেকদিন পূর্বেরই কথা তখন ১৩১২ সাল।"

১৩১২ সাল থেকেই কাজ শুরু হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র প্রথম শব্দ সংগ্রহের সমাপ্তির দিন। তারপর সংগৃহীত শব্দমালা মাতৃকাবর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করতে প্রায় দু বছর কেটে যায়। ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রথম দিকে শব্দানুক্রমণিকা শেষ হয়। পরে বাঙলা শব্দের সঙ্গে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শিষ্ট প্রয়োগ ইত্যাদির কাজ চলতে থাকে।

অভিধান রচনার কাজ কিছু দূর এগোনার পরই প্রকট আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়ে হরিচরণবাবু কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের কানে আসে। তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজি হয়ে মণীন্দ্র নন্দী হরিচরণবাবুকে প্রথম ন' বছর ৫০·০০ হিসাবে পরে চার বছর ৬০·০০ হিসাবে বৃত্তি দেন।

১৩৩০ সালে আধুনিক বাঙলার প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদের বাছা বাছা সাত-চল্লিশটি বই থেকে দ্বিতীয়বার শব্দ সংগ্রহ ও সংযোজন করে হরিচরণবাবু আগের পাণ্ডুলিপির সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেন। 'শব্দকোষ' বই আকারে প্রকাশ করার আগ্রহ বিশ্বভারতীর ছিল কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্যই তা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও হরিচরণবাবু বইটি প্রকাশের জন্য আবেদন করেন। পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়, অভিধানখানি প্রকাশযোগ্য বলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্তব্য করে কিন্তু এখানেও বাধ সাধল টাকা। বিপুল খরচ বহন করতে বিশ্ববিদ্যালয় সাহস করল না।

এতেও হরিচরণবাবু নিরাশ হননি। অভিধান প্রকাশের জন্য অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে তিনি কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তা দিয়েই কাজ শুরু করলেন। আশা ছিল শব্দকোষ প্রকাশিত হলে গ্রাহকদের আনুকূল্যে ধীরে ধীরে কাজ চলতে থাকবে। কিন্তু শব্দকোষের অর্ধেক খণ্ড-সংখ্যা ছাপা হওয়ার পরই প্রেসে অসুবিধে দেখা দিল, পরে অন্য একটি প্রেসে ছাপার কাজ শেষ হল। তখন অভিধানটির ছাপার খরচ প্রধানত গ্রাহকদের টাকাতেই চলেছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা কায়িক বা একবারীন কিছু সাহায্যও করেছেন। তাছাড়া প্রচ্ছদে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিজ্ঞাপন ছেপে বিশ্বভারতী যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেছেন। এইভাবে বিশ্বভারতী, গ্রাহকগণ, ছাত্র ও বন্ধুবর্গের আনুকূল্যে দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে অভিধানটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে টাকার অভাবেই বেশী কপি ছাপা সম্ভব হয়নি। পাঁচ ভাগে বিভক্ত অভিধানটি অবশেষে নিঃশেষিত হয়।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে, পুনর্মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। হরিচরণবাবুর জীবিত-কালেই সাহিত্য আকাদমি এ বিষয়ে উৎসাহী হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে সাহিত্য আকাদমি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তাও প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দুটি খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির দাম ৫০·০০। এই সুবৃহৎ অভিধানটি সাহিত্য আকাদমির পক্ষেও এই দামে দেওয়া সম্ভব হত না যদি না পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থসাহায্য করতেন।

আগের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, পাঠাগারের সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর মত একটি প্রামাণ্য অভিধান সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না। তখনকার শান্তিনিকেতন শিক্ষা-ভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর কঠোর পরিশ্রমের মূল্যায়ণ তাঁর উত্তরাধিকারীদের জাগ্রত মানসে কবে হবে কে জানে।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'দুই পুরুষ' হিন্দীতে

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত বই 'গণদেবতার' হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। জ্ঞানপীঠ প্রকাশ করেছেন। 'গণদেবতা' হিন্দীতে জনপ্রিয়তাও পেয়েছে প্রচুর। সম্প্রতি হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'দুই পুরুষ'। বইও বেরিয়ে গেছে। অনুবাদ করেছেন হংসকুমার তেওয়ারী। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথার দাম ১০·০০ ও 'দুই পুরুষ' ৩·০০। 'গণদেবতা' মালয়ালামেও অনুবাদ হচ্ছে। অনুবাদ করছেন রবি বর্মা। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 'পঞ্চ পঞ্চাশৎ'-এরও হিন্দী অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। অনুবাদ করেছেন রঘুনাথ রাকেশ। ছাপার কাজ শেষ হবে পূজোর আগেই। এটিও জ্ঞানপীঠ প্রকাশ করছেন।

'প্রতিনিধি সংকলন'

বাংলা হিন্দী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, মরাঠি, গুজরাটী মলয়ালাম, কানাড়ী—প্রত্যেকটি ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় নাট্যকারদের বাছাই করা নাটক নিয়ে হিন্দীতে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা থেকে নাট্যকার মন্মথ রায়ের একটি নাটক এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশ করেছেন জ্ঞানপীঠ।

হিন্দীতে 'দেবতাত্মা হিমালয়'

প্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত বই 'দেবতাত্মা হিমালয়' এর হিন্দী অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। আগামী দু তিন মাসের মধ্যে তা বই আকারে প্রকাশিত হবে। এটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীমতী কুন্থা জৈন। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

পতঞ্জলি শর্মা

কুমার মুখার্জীর স্মৃতি বহনকারী শীল্ডের প্রতিযোগিতা অতীতে স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে এবং স্কুলের ছাত্রদের কম মূল্যে খেলা দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন যদিও ২৩ আগস্ট খেলার দিন ধার্য করেছেন, আশা করব, তাঁরাও ছাত্রদের কম পয়সায় খেলা দেখার সুযোগ দেবেন।

বাঙালী বনাম অবাঙালী

হিন্দু, মুসলিম, ইউরোপীয়ান, পার্শী, অবশিষ্ট—এই পাঁচটি দল নিয়ে আয়োজিত পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ছিল বলে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও খেলার মধ্যে কখনো সাম্প্রদায়িকতার কদর্য চেহারা ফুটে ওঠেনি এবং পাঁচ দলের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় মিলেছে এবং পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেটের ফলে ভারতীয় ক্রিকেট সমৃদ্ধ হয়েছে বহুলাংশে। তবু দেশের তখনকার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ায় জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেন্টাঙ্গুলারের প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেই দেশ দু' ভাগ হয়েছে। কিন্তু দেশের বর্তমান আবহাওয়া সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে এমন কথা বলা চলে না।

এই অবস্থায় ক্যালকাটা লীগ কমিটির বাঙালী বনাম অবাঙালীর প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন সমীচীন কিনা ভেবে দেখা দরকার। অবশ্য খেলাকে নিছক খেলা হিসেবে ধরে নেওয়া যায় এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে প্রকৃত স্পোর্টসম্যানস্পিরিট তবে দোষের কিছুই থাকে না। তবু খেলাকে কেন্দ্র করে সামান্য কারণে গোলমাল বেঁধে উঠতে পারে বলে এই ধরনের খেলার আয়োজন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বড়িষা স্পোর্টিং

দ্বিতীয় ডিভিসন ক্রিকেট লীগের রানার্স এবং জুনিয়র নক-আউট চ্যাম্পিয়ন বড়িষা স্পোর্টিং এর এক কর্মকর্তা শ্রীপ্রদোষ চ্যাটার্জি সি এ বি-র কাছ থেকে বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণের পর ক্লাবের গ্রুপ ছবি সহ অফিসে হাজির। অনুরোধ, তাঁদের ছবি ছাপতে হবে। কয়েক বছর ধরেই অপর দল তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। এবার ক্লাবের প্রথম সাফল্য। ছবি ছাপলে খেলোয়াড়রা অনুপ্রেরণা পাবে, আরও ভাল খেলবে, তাই একটু পাবলিসিটির আবদার।

খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, খুব ছোট আকারের সূচনা থেকে ক্লাবটি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে বড়িষা অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে নানারকমের খেলাধুলো, জনহিতকর কর্মপ্রচেষ্টা আর সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের উদ্যোগ। ওদের ক্রীড়াঙ্গন অক্সফোর্ড মিশন মাঠের কোন সময় বিরাম নেই। ক্রিকেট মরসুমে ক্রিকেট, ফুটবল মরসুমে ফুটবল এবং অন্য সময়ে অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, ভলিবল ইত্যাদি। ক্রিকেটে গতবারের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। লীগে রানার্স এবং নক-আউটে বিজয়ীর সম্মান ছাড়াও প্রীতি খেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কয়েকজনের নামের পাশে সেঞ্চুরির অঙ্ক। ক্রিকেট মরসুম আরম্ভ হতে বেশ কিছু দেরি আছে। ইতিমধ্যে ওদের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রদোষবাবুর প্রতিশ্রুতি—'আপনি ছবি ছাপুন, সামনের বার আমরা আরও ভাল খেলবই খেলব'। সেই প্রতিশ্রুতিতেই বড়িষা স্পোর্টিং-এর ছবি ছাপছি।

একলব্য

ক্রিকেট জুনিয়র নক আউট বিজয়ী এবং দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন বরিষা স্পোর্টিং ক্লাব

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

আগের সপ্তাহেই লিখেছি, ব্যাডমিণ্টন ইনডোর খেলা হিসাবে গণ্য। সুতরাং আইনের ধারায় উল্লেখ না থাকলেও ব্যাডমিণ্টনের হল তৈরীর স্পেসিফিকেশন বা মাপজোক সমেত নিয়ম আছে। সে আলোচনা আইনের ধারার পরে। এখন দুই নম্বর আইন।

পোস্ট

২। জাল খাটাবার পোস্টের উচ্চতা হবে 'সারফেস' বা মেঝে থেকে মাথা পর্যন্ত ৫

পোস্ট ছাড়া নেট খাটাবার নিয়ম
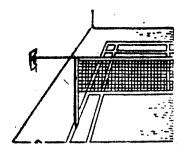
ফুট ১ ইঞ্চি বা ১·৫৫ মিটার। পোস্ট দুটি সাইড বাউন্ডারি লাইন বা পার্শ্ব সীমা রেখার উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে, ৩ নম্বর আইনে যেমন বলা আছে তেমনভাবে জালকে টান টান করে রাখবার পক্ষে ওই পোস্ট যথেষ্ট মজবুত ও শক্ত হয়। যেখানে এটা সম্ভব নয়, অর্থাৎ যেখানে সাইড বাউন্ডারি লাইনের উপর পোস্ট পোঁতা সম্ভব নয় সেখানে নেটের যে জায়গার নীচে দিয়ে সাইড বাউন্ডারি লাইন গিয়েছে তা নির্দেশের জন্য অবশ্যই কোন ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ হয় কোন সরু পোস্ট, না হয় দেড় ইঞ্চির কম চওড়া নয় এমন কোন সরু জিনিস, সাইড বাউন্ডারি লাইনের উপর থেকে নেটের ফিতে পর্যন্ত সোজাসুজি খাটিয়ে দিতে হবে যাতে কোর্টের প্রস্থের সঙ্গে নেটের দুই সীমার সমতা বোঝা যায়। ডাবলস খেলার কোর্টে এই ব্যবস্থা করতে হলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে ডাবলস কোর্টের সাইড লাইনের উপর থেকে। তা সে কোর্টে ডাবলস খেলাই হক আর সিঙ্গলস খেলাই হক।

নেট

৩। টান করা সরু শক্ত সুতোর এমন-ভাবে নেট বা জাল তৈরী হবে সে জালের খোপগুলি [illegible] ইঞ্চি থেকে [illegible] ইঞ্চি হয়।

জালের চওড়া হবে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ০·৭৬ মিটার। জালের উপরের দিকে ৩ ইঞ্চি চওড়া সাদা ফিতে এমনভাবে থাকবে যাতে দুদিক থেকেই সমানভাবে ওই ফিতে দেখা যায়। ফিতের মধ্য দিয়ে শক্ত সুতো বা তার নিয়ে গিয়ে দুই পোস্টের মাথায় মাথায় সংযুক্ত করে এমনভাবে বাঁধতে হবে যে জাল যেন টান টান হয়ে থাকে। এক পোস্টের মাথা থেকে আর এক পোস্টের মাথা পর্যন্ত টান টান করে বাঁধা জালের মাঝখানটার ফিতে থাকবে মাটি বা মেঝে থেকে ৫ ফুট উঁচু, আর পোস্টের কাছে মাটি থেকে ফিতে পর্যন্ত জালের উচ্চতা থাকবে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি।

জ্ঞাতব্য—নেট টানাবার শক্ত সুতো বা তার পোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখাই বাঞ্ছনীয়।
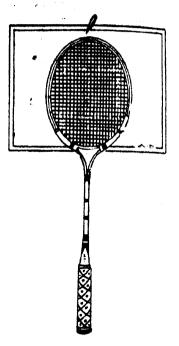
ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট

ব্যাডমিণ্টন খেলার নেটের মাপ জোক

যেখানে পোস্ট পোঁতা সম্ভব নয় সেখানে হলের দেওয়ালের সঙ্গে বা অন্য কোন শক্ত জিনিসের সঙ্গে বাঁধা যেতে পারে কিন্তু পোস্ট না থাকলে আইনে যে পোস্ট নির্দেশক কিছু খাটাবার কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই খাটাতে হবে। সঙ্গের ডায়গ্রাম দ্রষ্টব্য।

র‍্যাকেট

ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রধান উপকরণ র‍্যাকেট। কিন্তু আইনে র‍্যাকেটের গঠন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে সবাই জানেন কাঠের ফ্রেমে তৈরী ব্যাটমিণ্টন র‍্যাকেটে 'গাটস' অর্থাৎ জীব জন্তুর শুকনো অন্ত্র দিয়ে গাঁথা। বহুদিন থেকে নাইলনের তন্তুও র‍্যাকেটে ব্যবহৃত হচ্ছে। র‍্যাকেটের ওজন সাড়ে পাঁচ আউন্সের মত।

র‍্যাকেটের হ্যাণ্ডেল সম্পর্কেও কোন নির্দেশ নেই। সাধারণত মেয়েরা ছোট হ্যাণ্ডেল পছন্দ করেন। যে উপাদানে র‍্যাকেট গঠিত হয় তা অত্যন্ত পলকা। পলকা অর্থে ভেঙে যায় তা নয়। তবে বেঁকে যায়। সেই জন্য খুব দামী র‍্যাকেটও সব চাপের (প্রেসের মধ্যে) রাখতে হয়।

মুকুল

গ্রীসের ছবি "মেডুসার মুখ"

ফিল্মে শিল্পের শর্তে চুম্বন, নগ্নদেহ

শিল্পের শর্তে অথবা গল্পের প্রয়োজনে ফিল্মের নায়ক-নায়িকার চুম্বন ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির মতে আপত্তিকর নয়। কমিটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। বলেছেন, শিল্প-বোধের সঙ্গে উপস্থিত করা হলে সিনেমায় নগ্নদেহের দৃশ্যও থাকতে পারে।

এই ধরনের সুপারিশ ভারতীয় চলচ্চিত্র-কারদের কাছে অভাবনীয় মনে হবে সন্দেহ নেই। নানারকম বিধিনিষেধের বেড়ার মধ্যে এতদিন তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। যৌন উপাদানের সওদা করতে চান হয়ত অনেক প্রযোজক অথবা পরিচালক। কিন্তু সেন্সর প্রথার চাপে বাস্তবকে সোজাসুজি দেখাতে বাধা পেয়েছেন অনেক শিল্পনিষ্ঠ চলচ্চিত্র-কার। যাই হোক, এই সুপারিশ যদি কার্যকর হয় তবে ভারত আর পিছিয়ে থাকবে না।

তবে এই দেশের সঙ্গে অন্য দেশের তফাত আছে। এ দেশে স্বাধীনতা বা গণ-তন্ত্রের সঙ্গে যথেচ্ছাচারের সংযোগ বড় নিবিড়। সুতরাং আশঙ্কা হয়, স্বাধীনতার অপব্যবহার না ঘটে।

এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। তিনি বলেছেন, এই সুপারিশ চালু হলে না আবার পরিচালকরা বক্স-অফিসের স্বার্থে আদিরসাত্মক দৃশ্য দেখাতে শুরু করেন। শ্রীরায়ের এই ধারণা অমূলক নয়। অর্ধনগ্ন দেহ তো বোম্বাইয়ের পরিচালকরা অনেকাল যাবতই দেখাচ্ছেন। পূর্ণ নগ্নতার চেয়ে যে তা আরও কুৎসিত, আরও অশ্লীল। নগ্নদেহের দৃশ্য দেখানোর ব্যাপারে রুচি ও উদ্দেশ্যই বড় কথা। আসল কথা হচ্ছে 'মোটিভ'। এর বিচার করবেন কে? এই প্রশ্নও শ্রীসত্যজিৎ রায়ের। নগ্নদেহ কোথায় শিল্পসম্মত, কোথায় নয়, তার বিচার হবে কোন্ মানদণ্ডে?

সাহিত্যে কী শ্লীল কী অশ্লীল তার বিচার যেমন কঠিন, তেমনি সিনেমায় কোনটা 'পোর্নোগ্রাফি' আর কোনটা বাস্তবচিত্র তার বিশ্লেষণও মোটেই সহজ নয়। সুতরাং এর বিচার কে বা কারা করবেন তার উপর নতুন সুপারিশের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে সাহিত্যের চেয়ে ফিল্মের ভাগ্য অনেক ভাল বলতে হবে। জীবনকে খোলাখুলি দেখাবার অনেক বাধা ছিল ফিল্মে, এবার তা দূর হল। সাহিত্যের এখনও বন্দীদশা। আমাদের দেশের ফিল্মে শিল্পের রুচি, লক্ষণ ও শর্ত বজায় রেখে জীবনের অনাবরণ রূপকে কতখানি দেখাতে পারবেন তা আমাদের এখনও দেখা বাকি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন শক্তিমান শিল্পীর অভাব নেই যাঁরা শিল্পকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও জীবন যে-রকম দেখাতে পারেন। তবু সাহিত্যের সপক্ষে কোন সুপারিশ নেই। সে যাক্।

ফিল্ম তদন্ত কমিটির সুপারিশে একটি মৌল প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, শিল্পের স্বার্থে কিংবা গল্পের প্রয়োজনে না-হয় নগ্নদেহ দেখানো যেতে পারে। কিন্তু চুম্বনের জন্যও কি এই শর্ত অবলম্বনীয়? চুম্বন তো নরনারীর প্রেমের একটি স্বাভাবিক সাধারণ বহিঃপ্রকাশ। সিনেমায় চুম্বন যদি নীতিবিরুদ্ধ না হয় তবে প্রেমের দৃশ্য মাত্রেই চুম্বন থাকতে পারে। চুম্বন শিল্প-বোধের সঙ্গে যুক্ত কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না, প্রেমবোধের সঙ্গে হলো। এবং প্রায় সব ছবিতেই প্রেম বা রোমান্স থাকে।

তবে মনে হয়, এ দেশের সিনেমায় চুম্বন যদিও বা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, উলঙ্গ দেহ কখনই হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংস্কার ও লজ্জা এবং সর্বোপরি দেশীয় ঐতিহ্যের প্রশ্ন জড়িত। তবে কদাচিৎ কোন পরিচালক হয়ত সংস্কারমুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী খুঁজে বের করে নগ্নদেহ দেখাতে পারেন। সেখানেও শিল্পের বা আর্টের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

তদন্ত কমিটি শিল্পীর মৌল অধিকারে হস্তক্ষেপ অন্যায় বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা খুব বড় কথা। শিল্পীর স্বাধীনতা না থাকলে বড় সৃষ্টি হয় না। এবং সত্যিকারের শিল্পী স্বাধীনতার অপব্যবহারও করেন না।

তান্দ্র আভেক ঝে সি...(ফ্রান্স)

ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চলচ্চিত্রকর (অথবা শিল্পী) দেশের আইন মেনে চলবেন ততক্ষণ তাঁর চিন্তাপ্রকাশের মৌল অধিকারে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গত ৬ আগস্ট সংসদে পেশ করা হয়। কমিটির সভাপতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা। কমিটি লক্ষ করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র চলচ্চিত্র সেন্সর ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক উদার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে—বিশেষ করে আদিরসাত্মক বিষয়ে।

কমিটি মনে করেন, এই স্বাধীনতা থাকলে মননশীল পরিচালকের পক্ষে আর্ট-চিত্র তৈরির কাজ সহজ হবে।

তবে রিপোর্টে উল্লেখ আছে, যদি সমগ্রভাবে কোনও ছবিকে রুচিহীন ও বিকৃত মনে হয় তবে সেন্সর কর্তৃপক্ষ চিত্রটিকে নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন।

তদন্ত কমিটি স্বাধীন, স্বনির্ভর, বিশজন সদস্যযুক্ত কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছেন। বলা হয়েছে, সদস্যদের যেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়, তাঁদের বেতনভোগী হওয়া দরকার। কমিটির সুপারিশ : বোর্ডের সভাপতির বেতন মাসিক ৪০০০ টাকা এবং অন্য সদস্যদের বেতন ৩০০০ টাকার মত হতে পারে।

পরলোকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লইজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ আগস্ট কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালে ৫৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান।

কিছুকাল যাবৎ তিনি পাকস্থলীর রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাশিয়াতে পাঠিয়েও কোন ফল হয়নি।

১৯৫৬ সনে তিনি বি এম পি ই ইউর সাধারণ সম্পাদক-পদে বৃত হন। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চিত্রগৃহ এবং কলকাতার স্টুডিওগুলি বন্ধ রাখা হয়।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীসুধীন কুমার, শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনুপকুমার, শ্রীরবি ঘোষ, শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এম এ সঈদ প্রমুখ।

সাবিত্রী সত্যবান

পৌরাণিক বাংলা কথাচিত্র "সাবিত্রী সত্যবান"-এর মুক্তি এ-সপ্তাহে। এ ছবির প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক রমেশ নাইডু এবং নির্দেশক বিষ্ণু ভাওয়াল। সংলাপ লিখেছেন অরুণ রায় এবং গান রচনা করেছেন শ্যামল গুপ্ত ও শ্যামল ঘোষ। গানগুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, গীতা দত্ত ও নির্মলা মিশ্র।

মুক্তিস্নান

রাধারাণী পিকচার্সের "মুক্তিস্নান" ছবির কাজ প্রায় শেষ। কাহিনী শক্তিপদ রাজগুরুর। পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী এবং সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, কলী ব্যানার্জি, ছায়া দেবী, জহর রায়, গীতা দে, শোভা সেন, লালিতা চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

রক্তের রঙ লাল

শ্রীদীপক গুপ্তের পরিচালনায় নিও ফিল্মসের "রক্তের রঙ লাল" চিত্র প্রস্তুতির পথে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার তিন বীর সন্তান বিনয়-বাদল-দীনেশ ভারতের বুক থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উচ্ছেদ করার যে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন তারই রক্তরাঙা অধ্যায় অবলম্বনে শ্রীগুপ্ত চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—যার মূলে প্রখ্যাত কাহিনীকার শ্রীশৈলেশ দে। চিত্রের তিন মুখ্য চরিত্রে চরিত্রানুগ নতুন শিল্পীদের দেখা যাবে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

তীরভূমি

ছবিটি কিন্তু অন্যমনস্ক হতে দেয় না কিছুতেই। শরৎতে তো নয়ই। প্রথম থেকেই এই ছবি একটু একটু করে অবাক করে দর্শককে। সিচুয়েশন, চরিত্র সবই কেমন যেন নতুন, আবার স্বাভাবিক। কোন দৃশ্যই থেমে থাকে না। সব মিলে যেন একটা নতুনত্বের আমেজ। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, এর নায়ক-নায়িকা কারা? সদ্য চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া তপন মুখার্জি ও তার স্ত্রী নেলী? না অনুপম ও সোমা?

গল্প অবশ্য তপন, নেলী ও সোমাকে নিয়েই। তপনের মেয়ে সোমা, নেলীর মেয়ে নয়। নেলীকে পরে সব খুলে বললেন তপন মুখার্জি, বিলেতে থাকতে তিনি ভালবেসেছিলেন রোজিকে। রোজি বাংলা শিখত তপনের কাছে। [illegible] দেখানো হয়েছে, বিদেশিনী যুবতী সুন্দর বাংলা বলছে। তপন মুখার্জি তার নাম দিয়েছিলেন [illegible]। সেই ভাবে মেয়ে সোমা পরিষ্কার বাংলা বলবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বিলেতে যার জন্ম, যার চব্বিশ বছর কেটেছে বিলেতে, মা যার রোজি পার্কার, তপন মুখার্জিই সেই মেয়ে সোমা। রোজিকে দিয়ে ঝরঝরে বাংলা বলিয়ে [illegible] ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক লাগে না। সিনেমার লাইসেন্স তো কিছু থাকবেই।

শেষ জাহাজটি বন্দরে পৌঁছিয়ে দিয়ে কর্মজীবন থেকে সবে অবসর নিয়েছেন তপন মুখার্জি। কিন্তু চব্বিশ বছরের মেয়ে যখন এসে সামনে দাঁড়াতে পাইলট মুখার্জি কেমন যেন দিশেহারা হলেন, নেলী মুখার্জি তার স্বামীর কন্যাকে মেনে নিতে পারলেন না। সংসার-সমুদ্রে তপন মুখার্জি এখন তীরভূমি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সোমার অনেক দিনের সাধ সে বাবার কাছে আসবে। সেও কি তীরভূমি খুঁজে পেয়েছে? তপন-নেলীর একমাত্র মেয়ে মিলি মারা গেছে। নেলী তখনও সোমার মধ্যে মিলিকে খুঁজে পাননি। তীরভূমিতে তিনিও পৌঁছুতে পারলেন না। তীরে এসে সকলের তরীই ভিড়ল শেষ কালে। পথে ছিল মেঘ আর কুয়াশা, যেখানে নাটক।

নাটকের সব উপাদানই কিন্তু অভিনব নয়। নেলী কিছুতেই সোমাকে গ্রহণ করলেন না—এ-নিয়ে প্রথমে দুঃখ-অশান্তি। পরে যখন নিজেকে মানিয়ে নিলেন নেলী, তখন দেখা গেল দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ। সাধারণত [illegible], যার মনে-প্রাণে ভারতীয় হবার কথা নয়, সে একটু বেশী পরিমাণেই ভারতীয় হয় (সোমার প্রত্যহ সূর্য বন্দনা যেমন)। আবার যার বিলেতের আদবকায়দার প্রতি আকর্ষণ, তার মোহও দেখি মগ্ন হীন। এই পরিচিত নিয়মেই নেলী ও সোমার মধ্যে বিরোধ। নেলীর মনের মত পাত্র, "আলট্রা-মডার্ন", বড়লোকের ছেলে অভিজিৎকে বিয়ে করতে চাইল না সোমা। সোমা বিয়ে করল খাঁটি ভারতীয় অধ্যাপক অনুপমকে। তারা কটকে চলে গেল। তারপরেও নাটক থামেনি, বরঞ্চ তা আরও উগ্র, মেলোড্রামার রূপ নিল। নেলীর অভিশাপ ফলে গেল (এটা বুঝি জননীর অন্তরের কথা নয়), অনুপম-সোমার একমাত্র সন্তান মুখে-ভাতের একদিন আগেই মারা গেল, নেলীর মস্তিষ্ক বিকৃতি তখন শুরু। শেষ পর্যন্ত গৌতম (তপন-নেলীর একমাত্র ছেলে—যে সোমাকে সহ্য করতে পারত না) গিয়ে সোমাকে নিয়ে এল তার মায়ের কাছে। গৌতম বুঝি বুঝতে পেরেছিল, মায়ের অপ্রকৃতিস্থতার কারণ তীব্র অপরাধবোধ, সোমার প্রতি। পরিণতিতে, সোমা মা বলে জড়িয়ে ধরেছে নেলীকে।

"তীরভূমি"-র (চিত্রভারতী) দ্বিতীয় ভাগে স্বাদবদল—প্রথমে যে নাটক ছিল সূক্ষ্ম ও জটিলতার আভাসে জীবনানুগ, পরে তাই অতি-তীব্র, অতি নাটকীয় হয়ে উঠল। গতানুগতিক কিছু উপকরণও জড়ো হল। তবে নাট্যামোদীদের দ্বিতীয়ার্ধে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। নাটকের স্বাদ—যা কখন-সখনও দুই চোখ ঝাপসা করে—তারা পাবেন। ছবিটির ঘটনাবিন্যাসও গতিসম্পন্ন। কোন দৃশ্য বা ঘটনা অকারণে দীর্ঘায়িত নয়। গুরু বাগচীর চিত্রপরিচালনার কাজ আগাগোড়া সুষ্ঠু, যার ফলে সামগ্রিকভাবে একটি উপভোগ্য ছবি দর্শকরা পেলেন। এক্ষেত্রে সুরচিত চিত্রনাট্যের (বিকাশ রায় কৃত) দানও কম নয়।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত "বনজ্যোৎস্না" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির একটি দৃশ্যে কাজল গুপ্ত ও কামু মুখার্জি। ফটো—দেশ

আসলে অভিনয় সকলেরই উঁচু দরের। সে-কারণে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ছবিটি সুখভোগ্য। বিকাশ রায় হয়েছেন তপন মুখার্জি। এমন অদ্ভুত, সুন্দর চরিত্র-বিশ্লেষণ তাঁর কাছ থেকে অনেক দিন পাইনি। মঞ্জু দে (নেলী) অনেক কাল পর তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকদের মুগ্ধ করলেন। অনুপমের চরিত্রে যথোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। মাধবী মুখার্জি সোমার অস্ফুট যন্ত্রণা, দ্বিধা ও অসহায়তার সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছেন। রবি ঘোষের অভিজিৎ শিল্পীর আর একটি স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। অবাক করেছেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস, খুব স্মার্ট তাঁর অভিনয়। তেমনি ভাল লাগার মত রুমা গুহঠাকুরতার বৌদি (অনুপমের)। গৌতম-রূপী শংকরও চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

ছবিতে গান বেশী নেই। যে-তিনটি আছে শুনতে ভাল লাগে সুর রচনার গুণে। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিজন পাল।

রূপসী

এ আর সি প্রোডাকসান্সের "রূপসী" চিত্রের কাজ শেষ পর্যায়ে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলীর। অরুণ রায়চৌধুরী এ ছবির প্রযোজক এবং অনিল বাগচী সংগীত পরিচালক। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জী ও শমিত ভঞ্জ।

RELEASING ON 15TH AUG. IN BOMBAY
PADMINI,
SANJEEV KUMAR
JEEVAN
AKASH DEEP
BELA BOSE
ASHOO
ULHAS
MOHAN CHOTI
BIPIN GUPTA
PRATIMA DEVI
ZEBUNNISA
KESTO MUKERJEE
RANDHIR
with
MEHMOOD Jr.
and Master SACHIN
GURU DUTT FILMS COMBINE
CHANDA AUR BIJLI
in EASTMANCOLOR
DIRECTED BY
ATMA RAM
MUSIC
SHANKER JAIKISHAN
PHOTOGRAPHY
HASRAT NEERAJ INDIVAR
Y. K. MURTHY
WAJAHAT MIRZA
NABENDU GHOSH
ART DIRECTION
SOUREN SEN L. G. PATIL
SHIKAR
in REGAL CALCUTTA

ভেনিস পুরস্কারপ্রাপ্ত "ভুবন সোম" ছবিতে সুহাসিনী মুলে

ভেনিসে আবার ভারতের জয়

(ডাইনে) মৃণাল সেন

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে মৃণাল সেন প্রযোজিত-পরিচালিত "ভুবন সোম" (কাহিনী : বনফুল) পুরস্কৃত। এই হিন্দী চিত্রটি পাবে স্বর্ণ পদক। প্রসঙ্গত উল্লেখ, উৎসবে এখন "গ্রাঁ প্রি" বলে কিছু নেই। উৎসবের জন্য নির্বাচিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছবিকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। মৃণাল সেনের এই ছবি এখনও মুক্তি পায়নি। ইতিমধ্যে যাঁরা "ভুবন সোম" দেখেছেন, তাঁরা ছবিটি সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রায় সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা এই ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মুলে, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। জানা গেল, ভেনিস পুরস্কার ঘোষণার আগেই পিয়ারলী ফিল্মসের অসীম দত্ত ছবিটির বিশ্ব পরিবেশনস্বত্ব নিয়েছেন। অচিরেই "ভুবন সোম" মুক্তি পাবে।

টলি-টিপ্পনী

চুম্বন নিয়ে এত তোলপাড় হয়ে গেল, তারকা মহলে কিন্তু তার এতটুকুও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি মুহূর্তে সবাইকে চঞ্চল করে তুলল। ফিল্মে "চুম্বন ও নগ্নতার" সুপারিশ! কলকাতার চলচ্চিত্র মহলে বিষয়টি রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এমন মুখরোচক বিষয় আর কী হতে পারে? সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে এ বিষয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা **উত্তমকুমারের** উক্তি, "চুম্বনের আগে নায়িকার ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট চাইব।"

উত্তমবাবুর এই সরস মন্তব্যে নায়িকা মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। "আমরাও নায়কের ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট চাইতে পারি।" বলেছেন অনেক অভিনেত্রী।

"এই প্রসঙ্গে মাধবী মুখার্জী (চক্রবর্তী) জানালেন, চুম্বন এবং নগ্নদেহ যদি ছবিতে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয় তবে তাতে তাঁর আদৌ আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যদি অনুরূপ কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয় তবে তিনি অবশ্যই সেরকম রোলে নামতে সংকোচ করবেন। কারণ শত হোক বাঙ্গালী তো, তার ওপর ঘরের বউ, সংস্কারে বাধবে!

সুপ্রিয়া দেবী কিন্তু সেদিক থেকে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত। উত্তমকুমারের বক্তব্যের সঙ্গে স্বভাবতই তিনি একমত। শ্রীমতী সুপ্রিয়া কমিটির সুপারিশকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নিঃসন্দেহে এটা একটা বোল্ড স্টেপ। প্রগতির গতিপথের সঙ্গে সবাইকেই সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে বৈকি!" ছবিতে চুম্বনের উপস্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্বাভাবিক ছন্দে চুম্বনের আর বাকী কী থাকে! বোম্বাইয়ের দুড়দুড়ির চাইতে সরাসরি চুম্বন ঢের ভালো।"

এই প্রসঙ্গে উত্তমবাবুর 'নায়িকার ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট চাওয়া' কথাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তিনি বলেন, "ও ঠিক বলেছে। অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকও উত্তমবাবুর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে উত্তমবাবুর বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী ইন্টারেস্টিং।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক ডি এন ভট্টাচার্য কিন্তু এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের দর্শক ছবিতে ধূমপান অথবা মাতলামোই সহ্য করতে চায় না। চুম্বন অথবা নগ্নদেহের দৃশ্য কিছুতেই তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।" শ্রীভট্টাচার্যের মতে, "সপরিবারে বসে দেখার মত ছবি না হলে বাংলা ছবি কিছুতেই ব্যবসায়িক আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয় না।"

ডি এন ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের সঙ্গে অবশ্য অঞ্জনাও একমত। তিনি বললেন, "তাল দিলে চলবে না, আমরা বাঙালী। নিজেরা মদ খেতে পারে, কিন্তু অন্যকে মদ খেতে দেখলে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারে না। এমন কি বাঙালী মেয়েদের হাতে সিগারেটও অসহ্য।"

"অনেকটা এই কারণেই 'সপ্তপদী'র মিলন ব্যবসায়িক আনুকূল্য পায়নি।" বললেন প্রযোজক-অভিনেতা **দিলীপ মুখার্জি**, "সুচিত্রা সেন মদ খাচ্ছেন, দর্শকরা কিছুতেই নিতে পারেননি।"

কিশোরী নায়িকা **মৌসুমী চ্যাটার্জি** এ-বিষয়ে যা বলেছেন তা ভারী মজার, কিশোরীসুলভ। তিনি বলেন, "বুঝতে পারছি না কী বলা উচিত। আমার দ্বারা কিছুতেই চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করা সম্ভব হবে না। নগ্ন দৃশ্য তো আরো নয়। লজ্জাতেই মরে যাব।"

"যদি সবাই পারে আপনিই বা পারবেন না কেন?" জিজ্ঞেস করেছি মৌসুমীকে। উত্তরে উনি বলেছেন, "সবাই আর আমি তো এক নই। সবার বয়েস হয়েছে। ডাকো-

মন বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে। আমি এখনও কিশোরী।"

সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল। তিনি কমিটির রিপোর্টটিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। বিষয়টিতে তিনি বিস্মিত। ছবিতে চুম্বন ও নগ্নদেহের উপস্থাপনা? এ যেন তিনি ভাবতেই পারছেন না। তিনি বলেন, "যুগের সঙ্গে মানুষ হয়তো অনেক কিছুই মেনে নেবে। তবে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। মডার্ন জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। আছে শুধু এইটুকু সম্বল, রমণীর লজ্জা ও আবরণ। যদি তাও চলে যায়, তাহলে আর থাকে কী?" কথায় কথায় শ্রীমতী সন্ধ্যা আরো ইমোশনাল হয়ে বলেন, "আজ বাঙালীর অস্তিত্বের কথা ভাবলে চোখে জল আসে। জানি না নারীর কোমল হৃদয়ের আর কত কঠিন হতে হবে।" সন্ধ্যা রায়ের মধ্যে নৈরাশ্য এসেছে বলে মনে হল।

*

শিল্পী নির্বাচনে 'রেজিমেনটেশন' কথাটি ইদানীং খুবই শোনা যাচ্ছিল। রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল অনেক শিল্পীর কাছে। মনে হচ্ছে, 'কোল্ড ওয়ার' কাটছে। হয়তো আদপেই এমন কোন আশঙ্কার ব্যাপার ছিল না। 'রেজিমেনটেশন' ছিল অনেকের কল্পনা। যাই হোক, কাল্পনিক ভয়ের আর কোন কারণ নেই। যে সাংগঠনিক পরিচালক একদিন সংরক্ষণ সমিতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরই দুজনের ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করছেন বলে খবর পাওয়া গেল। একটি ছবি বিভূতি লাহার 'অগ্নি অপেরা', অন্যটি অরুন্ধতী দেবীর 'দুপুর'। পরিচালক পীযূষ বসুও সমিতি ছেড়েছিলেন, কিন্তু উত্তমকুমারকে নয়। তাঁর ছবিতেও নায়ক উত্তম। ছবির নাম 'দুটি মন'। চলচ্চিত্রলোকে আর দুটি মন নয়, সব এক।

—বিচক্র

সকলকেই পরিতৃপ্ত করেছে। বিশেষত, কোনো সূক্ষ্ম, জটিল বা দুরূহ স্বর-প্রকরণে না গিয়েও বেহাগের মাধুর্যটিকে শিল্পী যেমন সহজ আবেগে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। আরও উল্লেখ-যোগ্য, আলাপের অংশে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বোঝা গেল প্রধানত লঘুরসাত্মক আধুনিক গানের আসরে অবতীর্ণা থেকেও ধ্রুপদী সংগীতের সুগভীর অনুধ্যানেও তাঁর নিষ্ঠার অভাব নেই।

প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীমতী মনু পোলের কথক-নৃত্য এবং ওস্তাদ শান্তাপ্রসাদের সংগত-সহ শ্রী ভি জি যোগের বেহালা—এই দুটি অনুষ্ঠানই, শোনা গেল, যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনিবার্য কারণে বর্তমান সমালোচক ততক্ষণ উপস্থিত থাকতে না পারায়, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা সম্ভব হল না।

—আনন্দবর্ধন।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

বেতার-যন্ত্র নষ্ট করে দেবার হুকুম পেয়েও তুমি তা নষ্ট করোনি। তুমি আমাদের লোক নও। তুমি কে?
মাথার উপরে হাত তোলো। চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না।

দেয়ালের ধারে সার বেঁধে দাঁড়াও!

কে তুমি? পুলিসের লোক?
না।
আমরা পঞ্চাশজন, তুমি একা। কী করতে পারো তুমি?
প্লাসটিকের থলের মধ্যে গুলি চালিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে, তোমাদের পঞ্চাশজনকে পুড়িয়ে মারতে পারি।
সেক্ষেত্রে তুমি নিজেও মারা পড়বে! হাঃ হাঃ!

আরে!
অল্পের জন্যে গুলিটা লাগেনি!
পরের বারে সত্যি-সত্যি আগুন জ্বলবে!
কী চায় এই লোকটা?
ক্র্যাক!

কী চাও তুমি? কত চাও? দশ লাখ? ত্রিশ লাখ?
আপাতত এখান হতে বেরোতে চাই। পেরিসকোপে চোখ লাগাও ময়না; দ্যাখো, তেলের জাহাজটা চোখে পড়ে কিনা।

জাহাজটা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে।
উত্তম। ওহে ক্যাপটেন, ডুবো-জাহাজটিকে এবার চটপট জলের উপরে ভাসিয়ে তোলো।

আরে, আরে, দ্যাখো!
?

ওর কথা শুনে ভাল করোনি। এবারে সবাইকে পুলিসের হাতে পড়তে হবে।

ভোর পেরোবার
অনেক পরেও
ভোরের মতোই
তাজা মনে হবে...
স্নান সমাপন ক'রে সদ্য ভোরের সতেজ
অনুভূতি অনেকক্ষণ ধ'রে রাখতে পারেন
আপনিও—পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার
ট্যালকাম পাউডার মাখুন। পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌কের হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধ
বহুক্ষণ শরীরে জড়িয়ে থাকে...
পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক গায়ে
মাখতে না-মাখতেই ঘাম টেনে নেয়।
গুমোট গরমেও স্নিগ্ধ-সতেজ ও
সুগন্ধে ভরপুর রাখে—আপনি
কাছে থাকলে সবার ভালো
লাগে। বছরের যে-কোন সময়েই
এই ট্যালকাম পাউডার
ব্যবহার করতে পারেন।
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc
পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
—এর চেয়ে মোলায়েম
সৌখীন ট্যালকাম আর হয় না।
চীজব্রো-পণ্ড্স ইনক

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিবৃষ্টি : গ্রাম শহরে—	-	৩২৫
ব্যঙ্গচিত্র—	-	৩২৬
রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য—	-	৩২৭
বৈদেশিকী—দেবরাজ	-	৩২৮
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	-	৩২৯
সুনন্দর জার্নাল—	-	৩৩১
বাহুকের স্বগতোক্তি (কবিতা)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু	-	৩৩৩
আলো অন্ধকারে—শ্রীপ্রলয় সেন	-	৩৩৫
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	-	৩৪১
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	-	৩৪৩
অদূরের দিল্লি—দরবেশ	-	৩৪৫
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	-	৩৪৯
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	-	৩৫৩
প্যারিসের চিঠি—শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	-	৩৫৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাংলার চালচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার	-	৩৬৩
জীবন যে রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	-	৩৬৭
বিদেশের চোখে পথের পাঁচালী—শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ	-	৩৭১
আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	-	৩৭৬
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	-	৩৭৭
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	-	৩৭৯
কুত্ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ—শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী	-	৩৮১
আলোচনা—	-	৩৮৩
রূপ ও রূপয়ার রূপকথা—শ্রীশিশির রায় চৌধুরী	-	৩৯১

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
সীমান্তের এই শৈল শহরে—শ্রীকিরণশঙ্কর মৈত্র	-	৩৯৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	-	৩৯৭
পুস্তক পরিচয়—	-	৩৯৯
খেলার মাঠে—একলব্য	-	৪০১
ব্যাডমিণ্টনের আইন কানুন—মুকুল	-	৪০৫
অরণ্যদেব—	-	৪০৬
রঙ্গজগৎ—	-	৪০৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	-	৪১৬

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০ পয়সা দামের
নতুন ডিজাইনের প্লাস্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের ভেতরে পাবেন।
Bournvita
Cadbury's
Bournvita
OFFER!
deal food drink
ngth and vigour
450g
net

একেবারে হালফিল
মারফি'র
মুন্না
খুব দাওঁতে
পাচ্ছেন
মাত্র
১১০ টাকায়
murphy
munna
মুন্না
মডেল টি-বি ০১১৫
এই সোনার জাদুটিকে
আজই
ঘরে তুলুন
নতুন বার হল মারফি-র সবচেয়ে সুন্দর মিডিয়াম ওয়েভ ট্রানজিস্টর—মুন্না। এতে স্টেশন আসবে যেমন স্পষ্ট, তেমনি জোরালো। গমগমে, পরিষ্কার ছিমছাম আওয়াজ। ৪ টর্চ সেলে চলে; সহজেই সর্বত্র মেলে।
*বিক্রয় কর আর অন্যান্য স্থানীয় কর স্বতন্ত্র।
(ব্যাটারির দাম আলাদা।
বাড়িতে আনন্দের নির্ঝর মারফি

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৩
শনিবার ৬ ভাদ্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮০৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৩.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৩

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩৩.০০
ষান্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩৩.০০
ষান্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষান্মাসিক "	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষান্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 23 Aug., 1969

অতিবৃষ্টি : গ্রাম ও শহরে

পশ্চিমবাংলায় এখন বর্ষার ঘনঘটা চলছে। কিছুদিন আগেও আকাশে যতটা মেঘাড়ম্বর ছিল, বর্ষণ ততটা ছিল না। গ্রামাঞ্চলে, কৃষিকর্মের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ তাঁদের মুখে উদ্বেগের ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল। শ্রাবণ যায় যায়, অথচ আকাশে জল নেই, চাষবাসের কী গতি হবে, কে জানে! যাবার মুখে খ্যাপা শ্রাবণ সে দুশ্চিন্তা অবশ্য দূর করে দিয়েছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে এ কদিন যে রকম বৃষ্টি হয়েছে তা এ-মরসুমে আর হয়নি। বৃষ্টির প্রাবল্য কোথাও কোথাও বন্যার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যেমন আরামবাগ ও খানাকুল থানা; দ্বারকেশ্বর নদের জলস্ফীতির ফলে এ দুটি থানায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমাতেও বন্যা। বীরভূম জেলায় অজয়ের বাঁধ ভেঙে আউস ও আমন ফসলের ক্ষতি হয়েছে মারাত্মক। ওই এলাকায় চাষীদের দুর্দশা নাকি সবচেয়ে বেশী। এছাড়া, এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবার খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

বৃষ্টির ওপর কোনো হাত নেই ঠিকই, তবু দেখা যাচ্ছে—আমাদের এখানে অনাবৃষ্টির মতন অল্প সময়ে অতিবৃষ্টি বরাবরই এক সমস্যা, জলস্ফীতি, বাঁধ-ভাঙা এবং অন্যান্য উপদ্রব এসে ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। এ ধরনের ক্ষতির একমাত্র সমাধান দেখি সরকারী সাহায্য। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন—ক্ষতি যা হয় সরকারী সাহায্যে তা পূরণ হবার নয়। অথচ আজকের দিনে জলস্ফীতি বা বন্যা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব একটা কর্ম নয়। সেচ ও পূর্ত দপ্তর সামগ্রিক একটা পরিকল্পনা নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত দিলে সুফল অনেকটাই ফলতে পারে। কিছুটা উদ্যোগ নিশ্চয় প্রয়োজন। যেমন এবারে অজয় নদের বাঁধ সম্পর্কে শোনা যাচ্ছে এই বাঁধের অন্তত চল্লিশ মাইলের মেরামতি একান্ত প্রয়োজন—অথচ মাত্র চার মাইলের মতন মেরামতির কাজ হয়েছে।

যাই হোক, এবারের মরসুমের অতিবৃষ্টির প্রথম চোটেই সরকার যদি সতর্ক ও সাবধান হতে পারেন তবে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতি খানিকটা কম হবে, আর যদি গয়ংগচ্ছ করে দিন কাটে তবে বলা যায় না ভাদ্র-আশ্বিন মাসের দু এক পশলা অতিবৃষ্টিতে অবস্থা কী দাঁড়াবে।

গ্রামের অবস্থার সঙ্গে শহরের অবস্থার নিশ্চয় তুলনা হয় না, তবু, সাম্প্রতিক এই বৃষ্টিতে কলকাতা শহরের হাল কেমন দাঁড়িয়েছে তা একবার বলা দরকার।

গত সপ্তাহের বৃষ্টির আগেই অল্পস্বল্প জলেই কলকাতার পথঘাট তার জীর্ণ দশা উন্মোচন করে ফেলেছিল। রাস্তাঘাটের গহ্বরগুলি যে চাঁদের গহ্বর এমন বিভ্রমও হতে পারত। তারপর বার দুই প্রবল বৃষ্টির পর সেই পুরাতন দশা : পথঘাটে এক বুক জল, নালা নর্দমা থই থই, রাস্তাঘাটের পিচ-পাথর উঠে গিয়ে হাড় পাঁজরা দেখা যাচ্ছে, নিম্ন এলাকায় জল জমে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কলকাতা শহরের বর্ষার রূপ শহরবাসীর অজানা নয়। দীর্ঘদিন এই দুর্ভোগ সহ্য করে এসে মনে হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের আমলে কর্পোরেশনের তৎপরতা কিছু বাড়বে। মনে হয় না, তৎপরতা কোথাও বেড়েছে। এখনও রাস্তার বিরাট গর্ত-গুলি দিনের পর দিন যথা অবস্থায় পড়ে থাকে, রাস্তার বহু আলো আর চোখ মেলে চায় না, আবর্জনার কুণ্ড যত্রতত্র জড় হয়ে থাকে দিনের পর দিন। জানতে ইচ্ছে হয়, কংগ্রেসী অক্ষমতার সঙ্গে ফ্রন্টের পৌরপিতাদের সক্ষমতার পার্থক্য কোথায়।

শোনা যাচ্ছে, কলকাতা পৌরসংস্থা শহরের জঞ্জাল অপসারণের জন্যে পঁচিশটি নতুন লরি কিনেছেন, আরও পঁচিশটি পুজোর আগেই কিনে ফেলবেন। সেই সঙ্গে জঞ্জাল বিভাগের কর্মীদের একটি করে বর্ষাতিও দিচ্ছেন। এই বাড়তি ব্যবস্থার পর নিশ্চয় শহরের আবর্জনা মুক্ত হতে সময় লাগবে না।

প্রসঙ্গত কলকাতার ট্রাম কোমপানীর বিষয়ে কিছু বলার থাকে। প্রতিবার বর্ষার সময় ট্রাম কর্মচারীদের "রেনি ডে" বেশ মোটা হারেই হয়ে থাকে। জলে ট্রাম চলে না এ যেমন সত্য কথা, সে-রকম এটাও অনেক সময় সত্য যে, জল সরে যাবার পর—মোটামুটি ট্রাম চলার যোগ্য হয়ে উঠলেও ট্রাম তার বিপুল শরীর নিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, খারাপ ট্রাম-লাইন এবং লাইনের পাশে বিরাট গর্তগুলির জন্যে এই সতর্কতা। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বোধ হয় একটা ব্যাপার সরকার ভেবে দেখতে পারেন, এই অবস্থায় পথ আটকানোর চেয়ে পথে না নামাই ট্রামের পক্ষে সুবিধের। আর ট্রামের লাইন মেরামত বা তার দুপাশের গর্ত মেরামতের কথা তো উঠতেই পারে না—কেননা সরকারের হাতে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার, কাজেই সেটা সরকারের মরজি মাত্র, বাধ্য কর্তব্যের অঙ্গীভূত নয়।

দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে
নূতন পালা
"মেরী মসনদ লেংগী তুম্‌হী"
প্রম্পটারের ভূমিকায় সিদ্ধার্থশঙ্কর
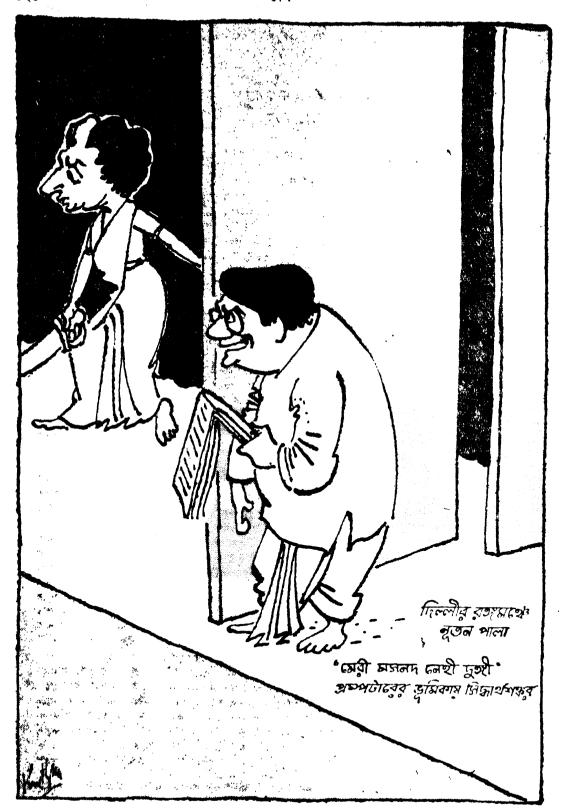
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নতুনদা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে দিল্লি থেকে ফিরে এসেই ডামাডোলে বিভ্রান্ত ও বিবাদগ্রস্ত দলের লোকদের ডেকে বললেন, ওহে, এই সংকটকালে মোহগ্রস্ত হওয়া কাজের কথা নয়। তোমরা ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ কর।

জনৈক অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহস্থানীয় গুরুজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহৃদ্‌গণ রয়েছেন। দাদা, এই যুদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকোচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে ভোটপত্র পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে। স্বজন বধ করে, পারটি ভেঙে দিয়ে আমাদের কোন সুখ হবে?

অতঃপর শালপ্রাংশু মহাভুজ প্রিয়দর্শী সেই নতুনদা উৎসাহব্যঞ্জক নানা বাক্যে অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ-কে কথঞ্চিৎ ধাতস্থ করে বললেন, ভাই, ক্লীবের ন্যায় আচরণ করো না। যা অশোচ্য তার জন্য তুমি শোক করছ, আবার দার্শনিকসুলভ নানা বুলিও কপচাচ্ছ।

অনুগত কংগ্রেসী : এক দিকে দলীয় শৃঙ্খলার শাসানি—পারটির প্রার্থীকেই ভোট দিতে হবে, অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর ডাসানি—বিবেকের নির্দেশ মানতে হবে অর্থাৎ গিরিকে ভোট দিতে হবে। এই দোটানায় পড়ে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি: ধর্মাধর্ম বুঝতে পারছি না। মহাত্মন্, আপনি অতিশয় কারিৎকর্মা, কূটশাস্ত্রে বিশারদ এবং আপনার বিবরবুদ্ধি তুলনীয়। পিতামহ স্বেচ্ছায় শরশয্যায় শায়িত হবার পর তাই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকেই সৈনাপত্যে বরণ করেছি। অধিকন্তু অতি সম্প্রতি আপনি প্রধানমন্ত্রীর গোহালের খাস-খবরও রাখতে শুরু করেছেন। আপনি সদ্য দিল্লি-প্রত্যাগত। আমাকে যথাবিহিত উপদেশ দিন। আমি আপনার শরণাপন্ন।

নতুনদা : মৃত বা মৃতপ্রায় কারও জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না। কংগ্রেস পারটি সম্পর্কে তুমি বৃথাই আসক্তিযুক্ত হয়ে আছ। এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট নজির হিসাবে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপ সংকটে অর্জুনকে যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। শ্রবণ কর। ভগবান স্পষ্টই বলেছেন :

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং
যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র
ন মুহ্যতি॥

অনুগত এম এল এ : হে প্রাজ্ঞ, অপরাধ নেবেন না, কথাটা যদি বাংলায় বলেন। বিদ্যের উপর যদি অত দখলই থাকবে,

তা হলে কি আর ভোট কুড়িয়ে এম এল এ হয়ে আসি? পারটি করার ওইটেই তো মস্ত সুবিধে, পারটির টিকিট কোনমতে একটা বাগাতে পারলে গদিতে বসার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই তো এত দিন চোখ বুজে পারটি ধরে পড়েছিলাম। আজ আপনারা বলছেন, পারটি নয়, দেশ। কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশের চাইতে বিবেকের নির্দেশ বড়। এই পারটির নির্দেশ মেনে মেনেই তো চার চারটে ইলেকশন পার করে দিলাম। কই, এই বাইশ বছরে একদিনও তো বিবেকবাবুর মুখ দেখিনি। উনি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর খুব ন্যাওটো হয়ে উঠেছেন বুঝি?

নতুনদা : অবিদ্যার কী অতুলনীয় নেতৃত্ব! হায়, এইভাবে কংগ্রেস এতদিন চলেছে বলেই না আজ তার এই হাল! (দীর্ঘশ্বাস পতন)। ভাই, আগে ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণীটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। দিব্যজ্ঞান অন্তরে প্রজ্বলিত হলে তামসিকতার বিনাশ ঘটে, মোহ দূরীভূত হয় এবং জীব এইভাবেই ভ্রান্তবুদ্ধির কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। ভগবান যা বলেছেন তার অর্থ এইরূপ : দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। এই দিব্যজ্ঞানটি প্রধানমন্ত্রীর শুদ্ধ চিন্তায় দেদীপ্যমান আলোকে স্নাত করালে যে রূপ পরিগ্রহ করে তা বলছি। কংগ্রেস দেহ, দেশ হচ্ছে আত্মা। জৈব নিয়ম অনুসারেই কংগ্রেস কৌমার যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে বর্তমানে জরাগ্রস্ত। তার কাল পূর্ণ হয়েছে তাই আত্মারূপী দেশের এখন নবকলেবর প্রয়োজন। ত্রিকালদর্শী কবিগুরুও উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক। শান্তিনিকেতনের এই প্রাক্তন আশ্রমিকা তাই তাঁর গুরুর বাণীকেই সমরসংগীত করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন যৌবনেরই দূতী।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : হে সিদ্ধ-অর্থ, আপনি ধন্য। আপনাকে নেতারূপে পেয়ে আমরাও ধন্য। অনুগ্রহ করে আপনি আরও বলুন।

নতুনদা : অতএব, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি",

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আমাদেরও সেইরূপ প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে জীর্ণ পারটিকে পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হবার সময় এসেছে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেসী-দের বিবেকের নির্দেশে চলতে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতিকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : হে মহা-ভাগ, আপনার সুচিন্তিত বিচারে যার দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মস্তকের বিন্দেপের মত শরীরটি হালকা বোধ হচ্ছে।

নতুনদা : তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর হাতেই দেশের চাবিকাঠি।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : বিলক্ষণ।

নতুনদা : তা ছাড়া তাঁর হাত শক্ত রাখার কিছু সুবিধাও আছে।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : তা আর বলতে।

নতুনদা : কর্তব্য সম্পর্কে তা হলে আর কোনও সংশয়ই রইল না।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : বিলক্ষণ না। কিন্তু দাদা—

নতুনদা : আবার কিন্তু!

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : পারটিতে শৃঙ্খলারূপী কোনও বস্তুটিই আর রইল না তো।

নতুনদা : নুন্যঃ।

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : কোনও ব্যাপারেই না তো?

নতুনদা : নুন্যঃ। মানে?

অনুগত কংগ্রেসী এম এল এ : এই মানে, পরিষদ দলে কোনও নেতা বা কারও বিরুদ্ধে অনাস্থা-টনাস্থা যদি ওঠে, তখনও বিবেকের নির্দেশ মানব তো?

নতুনদা : আরে না না, খবরদার না। জন-গণের রায়ে নির্বাচনে জিতে আমরা যারা পরিষদ দল গড়েছি, তাদের বিবেক জনগণের কাছে বাঁধা। সেখানে তো যা-তা একটা করা চলে না। বিবেকের নির্দেশ কাজে লাগাতে হবে যারা পারটিতে কায়েমী স্বার্থের শিকড় গেড়ে জাম হয়ে বসে আছে শুধু তাদেরই বিরুদ্ধে। অন্য ব্যাপারে অন্য নীতি আছে। যথা

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

অর্থাৎ শ্রী ভগবান স্পষ্ট বলেছেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ (অর্থাৎ পরিষদ দলের নেতা বা নেত্রী) যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইরূপ করে; তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তারই অনুবর্তী হয়।

অনুগত কংগ্রেসী : সত্যি দাদা, ভগবান এতও জানেন!

দেবরাজ

হারে জিত

ভাগ্যিহালের চাকা কখন যে ঘোরে আর কোন্ দিকে যে ঘোরে আগে থেকে তা আন্দাজ করাও যায় না টেরও পাওয়া যয় না। সে যে ঘ্রেছে তা বোঝা যায় যখন তার ছাপ পড়ে একটা দেশ কিংবা জাতের বুকের ওপর। গেল নভেম্বরে ফরাসী মুদ্রার টালমাটাল অবস্থা। তাকে সামলাতে গিয়ে দ্য গলের মত দ'দে লোককেও হিমসিম খেতে হচ্ছে। চার দিক থেকে তাঁর ওপর চাপ আসছে ফ্রাঁর বাট্টার হার কমাতে, নইলে নাকি প্রতিকূল আর্থিক বাতাসে তাঁর সাধের নৌকো তো ডুববেই হয়তো বা ব্রিটেনেরও, পশ্চিম জার্মানিরও, এমন কী আমেরিকারও। সপ্তরথী যেমন ঘিরে ধরেছিল অভিমন্যুকে তেমনই এ কালের পশ্চিমী নবগ্রহ '—' আমেরিকা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইডেন, ইটালি, ক্যানাডা আর জাপান—জোট বেঁধে চাপ দিয়েছিল ক্রমাগত তাঁর ওপরে যাতে তাদের দাবি মেনে নিয়ে ফ্রাঁর বাট্টার হার তিনি কমিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ কথাও উঠেছিল জার্মান মার্কের বাজার দরও বড় কম, সেটাও সামঞ্জস্যের খাতিরে বাড়ানো দরকার।

তবে এ ভৈরবচক্রের আসল উদ্দেশ্য ছিল দ্য গলের নাককাটা। তাঁকে শায়েস্তা করাই ছিল ওই চক্রের প্রধান লক্ষ্য, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানির। বন ছুরিতে শান দিয়ে তৈরি ছিল কখন প্যারিসের প্রাণপুরুষের নাকটা কেটে ফ্রান্সকে তার মর্যাদার উঁচু আসন থেকে নীচে নামিয়ে আনবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—দ্য গলকে বাগ মানানো গেলো না। তিনি ফ্রাঁর দামের হেরফের তো করলেনই না, উলটে বিধান দিলেন মার্কের দর বাড়াবার। বনের ধারালো ছুরি দ্য গলের নাকে লেগে হয়ে গেল ভোঁতা। সেই যে রাগ করে জার্মানি তার ভোঁতা ছুরি খাপে ভরে তুলে রেখেছিল তা আর বের করেনি—দ্য গল বিদায় নিলেও নয়। নতুন প্রেসিডেন্ট পঁপিদু তো দ্য গলেরই হাতে গড়া, তাঁরই মন্ত্রশিষ্য। কাজেই তাঁকে ঘাঁটাতে কারুর সাহস হয়নি—না বনের, না লন্ডনের, না ওয়াশিংটনের। সবাই ধরে নিয়েছিল আপাতত দ্য গলপন্থী পঁপিদু গুরুর পথ ধরেই চলবেন, কিছুই তিনি বদলাবেন না, অমন মর্যাদার লড়াইয়ে জেতা ফরাসী মুদ্রার মান তো নয়ই।

দেখা গেলো এবারও তাদের হিসেবে ভুল। জাক পম্পীটিও টের পেলো না—পঁপিদু রাতারাতি কমিয়ে দিলেন ফ্রাঁর বাট্টার হার যা মরে গেলেও কমাতে চাননি জেনারেল দ্য গল। এমন একটা ব্যাপারের জন্যে কেউ তৈরি ছিল না—না ব্রিটেন, না জার্মানি, না আমেরিকা। এটা গোটা ইউরোপে ছুটির মাস। বিলেতের চ্যান্সেলর অব এক্‌স্‌চেকার জেঙ্কিন্স গিয়েছিলেন ফ্রান্সে হাওয়া বদলাতে, জার্মান অর্থমন্ত্রী স্ট্রাউসও সেখানেই ছুটি ভোগ করছিলেন। ৯ আগস্ট তাঁরা ঘুম ভেঙে কাগজে দেখলেন আগের দিন রাত্রে ফ্রাঁর দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তো অবাক, সারা দুনিয়াও। গেল বছর এই অবশ্য তাঁরা চেয়েছিলেন। কিন্তু সে চাওয়ার মধ্যে কতটা যে অর্থনীতি ছিল আর কতটা যে রাজনীতি তা বলা শক্ত। মেঘ না চাইতে জলের মত যা চেয়েছিলেন তা অভাবিত উপায়ে পেয়েও তাঁরা খুশী নন। তাঁদের চাপে পড়ে নিরুপায় হয়ে তো আর ফ্রান্স তার টাকার দাম কমায়নি দুনিয়ার বাজারে। সে কাজ সে করেছে ধীরে সুস্থে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সবাইকে কেমন যেন বোকা বানিয়ে। এ তো ফ্রান্সের জিত, তাদের হার।

কী হলো ফ্রান্সে? ফ্রাঁর বাট্টার হার যে কমে গেলো তাতে কী হলো তার সুবিধে? কীই বা হলো অসুবিধে যদি কিছু হয়ে থাকে? প্রথম লাভ হলো ফ্রান্সের দুনিয়ার হাটে। সেখানে ফরাসী জিনিসের দাম গেলো কমে, কাজেই তার কাটতি বাড়ার কথা। আর বিদেশী জিনিসের দাম ফ্রান্সে গেল বেড়ে। তার ফলশ্রুতি আমদানি কমবে। তাতে ফ্রান্সের আপত্তি নেই, কেননা খাওয়ার (কিংবা পানের) জিনিস সে রপ্তানিই করে, আমদানি করে না। বিদেশী জিনিসের আমদানি বন্ধ হলে ফরাসী শিল্পের হবে বাড়বাড়ন্ত। তাতে আখেরে তার ভালই হবে। বিদেশে ফরাসী জিনিসের দাম কমে যাওয়াতে মুশকিল হয়েছে কমন মার্কেটে তার অংশীদারদের, ফ্রান্সের সঙ্গে তারা আর পাল্লা দিতে পারছে না। তাই কমন মার্কেট জোটের দেশগুলো মিলে ফ্রান্সের সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটা চুক্তি করেছে যাতে বিদেশের বাজারে শস্তা দামের সুবিধে ফরাসী চাষীরা আপাতত পায়, কিন্তু আখেরে জোটের অন্য সব দেশেরও তেমন কোনও অসুবিধে না হয়। পয়লা চালে জিত দেখা যাচ্ছে ফ্রান্সেরই।

যে কোনও দেশেই টাকার বাট্টার হার কমালে অভ্যন্তরীণ বাজার তেজী হয়ে ওঠে, জিনিসপত্রের দাম চড়ে যায়। তখন দাবি ওঠে মজুরি বাড়াবার। সে দাবি যদি মেনে নেওয়া যায় তা হলে খরচ বাড়ে, দাম চড়ে আর এক দফা। চড়া দামের জিনিস নিয়ে তো আর বিদেশের বাজারে টক্কর দেওয়া যায় না। কাজেই ডিভ্যালুয়েশনের লাভের গুড় তখন চড়া দামের পিঁপড়েয় খেয়ে যাবার উপক্রম হয়। পঁপিদু কেবল মানু রাজনীতিক নন, তিনি ব্যাঙ্কারও। অর্থনীতির সূত্র তাঁর ভালই জানা আছে। তিনি আটঘাট বেঁধে তবে আসরে নেমেছেন। এক তো এমন চুপিসাড়ে তিনি ফ্রাঁর দাম কমিয়েছেন যে, ফাটকাবাজেরা ফরাসী মুদ্রা নিয়ে জুয়া খেলার সুযোগই পায়নি। তার ওপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি জিনিস-পত্রের দাম বেঁধে দিয়েছেন। মজুরি বাড়াবার দাবি অবশ্য শ্রমিকেরা তুলবেই। কিন্তু এই ছুটির সময় দল বাঁধতেও তো তাদের সময় লাগবে। ততদিনে ঘর সামলাবার আরও একটু সময় পাবেন পঁপিদু। এটা মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থা না করলে নিঃশ্বাস পাবার ফুরসুতও তিনি পেতেন না—কী ঘরে, কী বাইরে।

মুখপাত নতুন ফরাসী প্রেসিডেন্টের ভালই হয়েছে বলতে হবে—হারকে তিনি জিতের রূপ দিয়েছেন। পয়লা দানে তিনি অপরকে মাত করেছেন, নিজে মাত হননি। কিন্তু শেষ রক্ষা তাঁর হবে তো? প্রায়ই দেখা যায় টাকার দামের হেরফের একটা যেন সংক্রামক রোগ, একটা দেশের হলে আরও পাঁচটাও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে। ফ্রাঁর বাট্টার হার বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার চোদ্দটা দেশের মুদ্রার দরও পড়ে গেছে। তার কারণ তারা ফ্রাঁর সঙ্গে এক গাটছড়ায় বাঁধা। ফরাসী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ওই চোদ্দটা দেশ ছাড়া আর কারুর মুদ্রার বাট্টার হারের হেরফের হয়নি। সেটাও ফাটকাবাজরা কিছু করতে পারার সুযোগ না পাওয়ার ফল। ভয় পেয়েছিল ব্রিটেন কী জানি পাউন্ডের কী হয়। চমকে উঠেছিল আমেরিকাও ডলারের ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু কী পাউন্ড, কী ডলার, কী মার্ক অনিশ্চয়তার ঘূর্ণিপাকে পড়ে কেউ তলিয়ে যায়নি। আপাতত দুনিয়ার টাকার বাজার দিব্যি শান্ত। অশান্তির ঘূর্ণী যদি আর না দেখা দেয়, অনিশ্চয়তার তুফান যদি সেখানে না ওঠে তা হলে বুঝতে হবে পঁপিদু চালটা ভালই দিয়েছেন—কারুর পাকা ঘুঁটি না কাঁচিয়ে নিজের ঘুঁটি তিনি ঘরে তুলেছেন।

আমাদের রাজনীতির নৈতিক মান

আমাদের দেশের রাজনীতির নৈতিক মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে সেটা খুব খোলাখুলি-ভাবেই ধরা পড়েছে। এখানের রাজনীতিতে আদর্শনিষ্ঠা, সততা, ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতি বস্তুগুলি যে সম্পূর্ণ উবে গিয়েছে এবার তা খুব পরিষ্কারই সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়েছেন।

এমন নয় যে, আমাদের রাজনীতির নৈতিক অধঃপতনের দিকটা এর আগে জনসাধারণের জানা ছিল না। জানা ঠিকই ছিল। কিন্তু এত খোলাখুলি বোধহয় এই অধঃপতনটা আর কোনও দিনই ধরা পড়েনি। স্বাধীনতার কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের রাজনীতিতে যে অধঃপতন ঘটেছে, গত বাইশ বছরে যেটা সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে, এখন সেটা একেবারে প্রকাশ্যে তার গলিত নখদন্ত প্রকাশ করে ফেলেছে।

এতদিন অনেক জিনিসই দেখা গিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতিকে মিথ্যাবাদী বলছেন, এ দৃশ্য কে কবে দেখেছেন! অথবা কংগ্রেস সভাপতিই বা কবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীকে দলবিরোধী চক্রান্তকারী বলেছেন? বহু দিন আগে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যানডনের সঙ্গে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর একবার লড়াই হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী বনাম কংগ্রেস সভাপতির লড়াইয়ে প্রকাশ্যে যে নৈতিক অধঃপতনের ছাপ দেখা যাচ্ছে তেমনটি তখন কেউ দেখেননি। কল্পনাও করতে পারেননি।

সর্বোচ্চ পর্যায়ে মিথ্যা বলায় যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে! প্রধানমন্ত্রী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে গিরিকে জেতাবার জন্য কমিউনিস্ট থেকে আরম্ভ করে আকালি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সব রকমের দলের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে গিয়েছেন তিনিই মুসলমানদের ভোট ভাঙাবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে জনসংঘের সঙ্গে গোপন চুক্তি করার অভিযোগ এনেছেন! যিনি এস এস পি নেতা জর্জ ফারনানডেজের ভাষায় ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, যিনি একের পর এক রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতিকে ডেকে ভয় ও লোভ দেখিয়ে সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছেন তিনিই কিনা প্রকাশ্যে 'বিবেকের নির্দেশে' ভোট দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

আবার যে কংগ্রেস সভাপতি ও তাঁর

সাংগোপাংগোরা জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির লোকেদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে আলোচনা চালাচ্ছেন, সমঝোতা করছেন তিনিই প্রকাশ্যে বলেছেন : কিছু কংগ্রেসী কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে গিরিকে জেতাবার চেষ্টা করেছেন!

অধঃপতনের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন কিছু কংগ্রেসী এম পি। তাঁরা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী দুই আবেদনপত্রেই এক সঙ্গে সই করে বসে আছেন! একটা আবেদনের বক্তব্য : রেড্ডি নয়, ফ্রি ভোট; তাতেও এরা সই দিয়েছেন! আর একটার দাবি : পার্টির নির্দেশ অনুসারে শুধুই রেড্ডি; তাতেও সই করেছেন! মিথ্যাচারের, মেরুদণ্ডহীনতার এ এক বিচিত্র নিদর্শন!

*

ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে যার বাংলা অর্থ, প্রেমে আর যুদ্ধে কিছুই অন্যায় নয়। এই সঙ্গে ইংরেজরা এখন রাজনীতি শব্দটাও জুড়ে দিয়েছেন এবং বলছেন : প্রেমে, যুদ্ধে এবং রাজনীতিতে কিছুই অন্যায় নয়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই অন্যায় কোনও দিনই মানতে রাজি হননি। যা অন্যায় তা সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়—এইটাই এদেশের সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। আমাদের সমাজ, আমাদের রাজনীতি কখনও সম্পূর্ণভাবে মিথ্যাচার বা অন্যায় মুক্ত ছিল, তেমন নয়। কিন্তু আমাদের দেশে চিরকালই মিথ্যাচার এবং অন্যায় নিন্দিত। গান্ধীবাদ, জিন্নাবাদ এবং মারকসবাদ ব্যাপকভাবে এদেশে ছড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের রাজনীতি মিথ্যাচার, শঠতা এবং গোপনে যা হলে হুরি আরা নামক বস্তু থেকে সাধারণভাবে মুক্তই ছিল।

বাংলা দেশে যাঁরা টেররিস্ট মুভমেনট করতেন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও যাঁরা সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, ন্যায়-অন্যায়বোধের তুলনা বিরল। আজকের রাজনীতিবিদরা তা কল্পনাও করতে পারেন না। আজকের সাধারণ মানুষের কাছেও তা অন্য জগতের কাহিনী মনে হতে পারে। তারপরও বেশ কিছুদিন আমাদের রাজনীতি বহু কলুষমুক্ত ছিল।

বর্তমান সমাজের যখন অনেক ধাপ অধঃপতন হয়েছে তখন বর্তমানের রাজনীতিবিদদের কাছেও খুব বিরাট বিশাল একটা কিছু আশা করা অন্যায়। রাজনৈতিক নেতারাও তো এই সমাজেরই প্রোডাকট! কিন্তু আমার ধারণা, সাধারণভাবে আমাদের সমাজের যতটা নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশি অধঃপতন হয়েছে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের।

এদেশের মানুষ কিন্তু বরাবরই মনে করে এসেছে, যে দেশ সেবা করবে, যে দশের ভালর জন্য চেষ্টা করবে সে নিজে না ভাল হলে স্বার্থত্যাগী না হলে তাঁকে দিয়ে দেশসেবা বা মানুষের হিতসাধন সম্ভব নয়। এটা আমাদের দেশের মানুষের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আমার মনে হয়, এই বিশ্বাসটা যুক্তিসঙ্গত। স্বার্থান্বেষী, চরিত্রহীন বা মিথ্যাচারী যে সে সব সময়ই নিজের কথা ভাবতে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, সে দেশের সেবা বা ভাল করবে কখন!

রাষ্ট্রযন্ত্র আজ এত ব্যাপক এবং বিশালরূপ ধারণ করেছে বলেই রাজনীতিবিদদের আরও সৎ আরও স্বার্থত্যাগী হওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রলোভন ও সুযোগ আজ অনেক বেশি: রাষ্ট্র চালকরা ক্ষমতা অপব্যবহার করলে সাধারণ মানুষকে আজ তা অনেক বেশি স্পর্শ করে। তাই আগের তুলনায় আজকের রাজনীতিবিদদের রাষ্ট্রপরিচালকদের ন্যায় অন্যায়বোধ অনেক বেশি প্রবল হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় হয়েছে ঠিক উল্টোটা।

আর শুধু যে এরা মিথ্যা বলেন, অন্যায়কারী, অসৎ, স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন তাই নয়। অনেক সময় ওইসব বিষয়ে নিজ নিজ কর্তৃত্ব নিয়েও গর্ব অনুভব করেন। কেমন টাকাটা মেরে, কেমন ব্যাংক মারলুম, কেমন জাল চালালুম— এসব কথা রাজনীতিতেই শোনা যায় নেতাদের মুখে। যেন ওসব খুব মহৎ কাজ!

আজকের নেতাদের অনেকের সাধারণ লজ্জাবোধ, আত্মসম্মানটুকু পর্যন্ত নেই। যাঁদের উপার্জনের কোনও সৎ পথ নেই, যাঁরা শুধুই রাজনীতি করেন অর্থাৎ হোলটাইমার তাঁদেরও প্রায়ই দেখা যায় রাজা-বাদশার মত চলতে। এবং সেজন্য তাঁরা মোটেই লজ্জিত নন! অনেক বামপন্থী নেতাকে পর্যন্ত দেখি পার্কার পেন বুকে ঝুলিয়ে ঘুরছেন, ক্যাপসটন বা ইন্ডিয়া কিং সিগারেট খাচ্ছেন! আমি বলি না ওগুলি ওরা চুরি করে সংগ্রহ করেন। হয়ত কোনও অনুগত ভক্ত দেন। কিন্তু এই প্রশ্নটা কি ওই নেতাদের মনে জাগে না, যখন তাঁদের হাতে রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্য বিতরণের বা নিদেনপক্ষে ইলেকশনে টিকিট দেওয়ার বা অপরকে কিছুটা সুবিধা সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তখন তাঁদের পার্কার পেন বা দামী সিগারেট দেওয়ার কজন ভক্ত জুটত? এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে এই 'ভালমানুষ ভক্তরা' আসলে স্বার্থান্বেষী, অন্যায় সুযোগপ্রার্থী?

*

একটা সময় এসেছিল এদেশে যখন গান্ধীজী বা গান্ধীবাদের নামে সকল বজ্জাতিকেই বিশুদ্ধিকরণের চেষ্টা হত। যখন রাজনীতিতে সর্বপ্রকারের পাপ গান্ধীজী বা গান্ধীবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে সতত্র বলে দেখাবার প্রয়াস চলত। সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়ণের যে বিরাট জঘন্য ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেটাকেও ওইভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে একান্ত প্রয়োজনীয় নিষ্পাপ সৎ প্রচেষ্টা বলে বোঝাবার বিরাট প্রচার অভিযান চলেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন এইটা চলতে চলতে গান্ধীজীর মৃত্যুর একুশ বছরের মধ্যেই গান্ধী টুপি আর গান্ধীবাদ আজ দেশের বহু মানুষের দৃষ্টিতে জুয়াচ্চুরির প্রতীকচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আজ সেখানে একটা নতুন জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে। সেটা হল প্রগতিবাদ এবং সমাজতন্ত্র। আজকের রাজনীতিতে প্রগতিবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে সর্বপ্রকারের অসততাকে ন্যায় বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আজ যদি কমিউনিস্ট পার্টি বা ইন্দিরা গান্ধী জনসংঘ বা মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলান বা একত্রে সরকার গঠন করেন তাহলে সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু যদি নিজলিঙ্গাপ্পা ওদের কারুর সঙ্গে কথাও বলেন তাহলেই ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতা হয়ে দাঁড়ায়। যদি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কোথাও বাড়ি ভাড়ায় টাকাও সম্পত্তি কেনেন তখন হইচই পড়ে যাবে 'এত টাকা লোকটা পেল কোথা থেকে', কিন্তু যখন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী পেট্রিয়ট কাগজে ষাট লক্ষ টাকার শেয়ার কেনেন তখন সেটা নিয়ে কেউ কিছুই বলেন না। সঞ্জীব রেড্ডির নামে চরিত্রহীনতার অভিযোগ উঠতে পারে, কিন্তু প্রগতিশীল কংগ্রেসী বাবু জগজীবনরামের নামে অতশতর পরও একটি কথাও বলা যাবে না! জিপ কেলেঙ্কারির কৃষ্ণ মেনন এবং সিরাজুদ্দিন ঘটিত ব্যাপারে জড়িত মালব্য এখনও এদেশে মাথা তুলে চলতে সাহস পান শুধু প্রগতির আগ মার্ক বুকে ঝুলিয়ে!

আমার আপত্তি খারাপকে খারাপ বলায় নয়, আমার আপত্তি 'ডবল স্ট্যানডার্ডে'। খারাপ যেটা সেটা সর্বক্ষেত্রেই খারাপ। মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার যে পারটি, যে রাজনৈতিক নেতাই করুন না সেটা নিন্দনীয়। কোনও ব্যক্তির নামের আগে কোনও পারটি নিজের স্বার্থে 'প্রগতিশীল' শব্দটি জুড়ে দিলেই খারাপ লোক ভাল হতে পারে না।

আমাদের রাজনীতি থেকে যদি মিথ্যার বেসাতি, ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি দূর না করা যায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। বহুদিন গান্ধীবাদের নামে বহু ভ্রষ্টাচারকে আমরা সহ্য করেছি। তাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আজ যদি প্রগতিশীলতার ভেক ধরে আসছে বলেই আরও বহু দুর্নীতিকে আমরা সমর্থন ও সহ্য করি তাহলে আমাদের দুর্দশা আরও বাড়তে বাধ্য।

মূল কথা, কে কে স্বার্থত্যাগে রাজি, কারা কারা সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ। যদি কেউ স্বার্থত্যাগে রাজি না হন, যদি ভ্রষ্টাচারী হন তাহলে পকেটে কমিউনিসট পারটির কারড থাকলেও তিনি কমিউনিসট হয়ে যান না! এবং কমিউনিসট ছাপ আছে বলেই তিনি গরীবের বন্ধু হতে পারেন না। প্রগতিবাদী বলে কেউ মুখে জাহির করলেই তিনি প্রগতির ধ্বজাধারী হতে পারেন না। সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগের জন্য যিনি প্রস্তুত নন তিনি সাধারণ মানুষের ভাল করবেন কি করে? গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই—সৎ মানুষ হলেই যথেষ্ট।

আমি মনে করি মতাদর্শ যাঁর যাই হোক তিনি যদি আদর্শনিষ্ঠ হন, সৎ হন, স্বার্থত্যাগী হন তাহলে তিনি সাময়িকভাবে ভুল করলেও শেষ পর্যন্ত মানুষের কিছু না কিছু কল্যাণ করবেনই।

নবারুণ গুপ্ত।

ইম্পোর্টের জাল সম্ভার

একটুকরো পাঁপর ভাজার কমনীয়তার একেবারে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

হবেই, আমার জানা উচিত ছিল। তিন টাকার কলম দোকান থেকে সোজা কিনে আনলে এত বক্তৃতা শুনতে হত না, আর সেটা হোঁচট-টোচট খেয়েও এক বছর-দু বছর গড়িয়ে চলতে পারত। কিন্তু পনেরো টাকার কমে পরে পাওয়া যাবে না ভেবে আমি বারো টাকা লাভ করতে চেয়েছিলুম এবং যেহেতু দেড় শো টাকার কলমের গুণাবলী তিন টাকাতেই বিরাজিত—সেই জন্যে অবচেতন হিসেবের খাতায় একশো সাতচল্লিশ টাকা জমা হয়ে যাচ্ছিল আমার। আপাত-দৃষ্টিতে আমি একটি উদীয়মান বাঙালী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা করছিলুম, কিন্তু আমার প্রলোভন বলছিল—এ সুযোগ হাত-ছাড়া কোরো না, পরে পনেরো টাকার নীচে—

যা আমি স্বাভাবিকভাবে পেতে পারি না, যা পনেরো টাকা না দিয়ে আমার পাওয়া উচিত নয়, তা পেতে চাওয়ার অর্থই আমি আর একজনকে বারো টাকা ঠকাতে চেয়েছি। আমি তো বলতে পারতুম, 'আপনি লোকসান দিয়ে কেন দেবেন, আমিই বা নেব কেন—' কিন্তু এই সৎসাহসটুকু তো আমার ছিল না।

আসলে পরস্বের দিকে কিঞ্চিৎ তির্যক দৃষ্টি না থাকলে জীবনের আকর্ষণটাই ফুরিয়ে যায় বোধ হয়। তা না হলে পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়েও চোখের সতর্ক চাউনি ইতস্ততঃ পরিক্রমা কেন করে! স্ত্রীর প্রতি অনুরাগে কার্পণ্য আছে তা নয়, কিন্তু বাড়তি পাওনা, চুরি করে পাওয়াটুকুর আকর্ষণটাই যে ঠেকানো যায় না।

আমার এক শিল্পী বন্ধু—নাম করব না—ছবি ভালোই আঁকেন। কল্পনা আছে, উদ্ভাবনী আছে, দেখবার চোখও আছে। নিজের জোরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু বাড়তি পাওনার দিকেই তাঁর লোভ বেশি। [illegible] থেকে শুরু করেছিলেন, এখন নীল মজুমদার পিকাসো ব্রাক-দালি যাকে পান একটু এদিক-ওদিক করে [illegible] করে দেন। পুরোনো আমলের [illegible] নগণ্য, উপরিউক্ত [illegible]। বন্ধুর গল্প [illegible] পড়তে গিয়ে চমকে উঠি এক-এক সময় ভাবি, এ যে একটা মার্কিনী গল্পের বেমালুম বঙ্গজ রূপ! অথচ তিনি লিখছেন, এর চাইতে ঢের ভালো তিনি নিজেই লিখতে পারতেন। বাংলা গান শুনতে গিয়ে অকস্মাৎ খটকা লাগে—ঠিক এই সুরটাই কি বিলিতী 'মিউজিকের কোনো রেকর্ডে' শুনিনি? এবং কী আশ্চর্য, এই সুরকার তো নিজেই উঁচুদরের গুণী!

সিলকরা খামে ঘোড়ার খবর

সুতরাং অবস্থাটা বুঝতে পারছি। যুগ বদলাবে, জীবন বদলাবে, কিন্তু চাপা পড়া এবং প্রসারিত মুঠোর কলমের ক্রেতার কখনো অভাব ঘটবে না। এমন কি, 'মোহ-মুদ্গর'ও যদি এক টুকরো কাগজের মোড়কে জুড়ে এঁটে বিক্রী করা যায়, লেখা থাকে—'ক্রেতা ভিন্ন খুলিবেন না—' তা হলে একটি চুপি চুপি সংখ্যায় হাজারখানেক বিক্রী হয়ে যাবে বোধ হয়! ক্রেতারা তারপরে নিশ্চয় পস্তাবেন, কিন্তু তাই-ই নিয়ম, আমার এক বন্ধুও তো বাইশ টাকায় রোলেক্স ঘড়ি কিনে মাথার অর্ধেক চুল উপড়ে ফেলেছে!

বাহুকের স্বগতোক্তি

এই হ'লো আরম্ভ আমার।
আমি কে, তা এখনো জানি না।
তবু এই বাধিত আঁধার
আর তার বর্বর মন্ত্রণা —
আরণ্যক ঊর্ণার বিস্তার :
সব মনে হয় যথাযথ।

মাঝে-মাঝে, জোনাকির মতো,
কোনো-এক নক্ষত্রের কণা
জ্বলে উঠে, মিলায় চকিতে
পথহীন অনিশ্চয়তায়।

[illegible] আছে এই বিশ্ব জুড়ে
কাকে বলে ভাবনা, বেদনা,
ক্রন্দনের উৎস কোথায়।
আর [illegible] চোখের [illegible] —
[illegible] —
[illegible]
সৃষ্টি — সে কি রয়েছে এখনো?

কোনোদিন ছিলো এক নারী।
[illegible]
[illegible] সে আলো,
[illegible] বেগে উচ্ছলিত।
তাই হ'লো স্বয়ং স্খলিত
অনিপুণ আলিঙ্গনকারী।

মাঝে-মাঝে পাতার মর্মরে
জেগে ওঠে ক্ষণিক চেতনা :
যেন এই প্রাণীর কুহক,
যার মধ্যে আমি আছি প'ড়ে —
[illegible], ভালোবাসার ছক —
এও নয় অবোধ্য বঞ্চনা,
এও তার পক্ষে আবশ্যক।

সব যেন তারই আয়োজন,
স্বাদ, শাঁস, ঘনত্বও তার।
কিন্তু চাই পর্যাপ্ত আঁধার।
আমি তার পক্ষে প্রয়োজন।

সে-ই কর্ত্রী, আমি শুধু হেতু।
আমি দত্ত, সে-ই প্রতিশ্রুত।
তারই স্থির অপেক্ষার তলে
ক্রমান্বয়ে আমি জায়মান —
যেখানে সে, পরিশ্রমে ম্লান,
তবু হার্দ্য আবেশে দুর্বার,
অদৃষ্টকে সৃষ্টি ক'রে চলে।

মনে হয়, আমাকে এবার
মেনে নিয়ে সত্তার বিরতি,
সব ইচ্ছা থেকে অপসৃত,
হ'তে হবে তার দক্ষ হাতে
বিচূর্ণিত, রূপান্তরিত,
যাতে অমাবৃক্ষের শাখায়
রক্তবর্ণ বর্তুল রেখায়
দীপ্ত ফল পারে সে ফলাতে —
তারই শেষ, পূর্ণ পরিণতি।

---

* বাহুক : শাপগ্রস্ত, বিকৃতরূপ নলের ছদ্মনাম।

POND'S
VANISHING CREAM
V

আলো অন্ধকারে

প্রলয় সেন

বৃষ্টি ধরে আকাশ পরিষ্কার হতে বিকেল নেমে এল। সুরেশ্বর বেরুবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। সকালের দিকেও বেশ গুমোট ছিল। দুপুরে এক পশলা টিপটিপ ঝরেছে। তারপর, ইচ্ছে থাকলেও বৃষ্টি থামতেই সুরেশ্বর বেরুতে পারেন নি। পথঘাট পিচ্ছল। শিরদাঁড়ার গোড়ার একখণ্ড হাড় ভাঙা। একটু বেচাল হলেই বিপদ ঘটতে পারে।

পুঁটি খাট জুড়ে শুয়ে। রেণু দরজার মুখে। আর এক পাশে খোকন। সুরেশ্বর ঘন ঘন বিড়ি খান। খাটে উঠতে ভয়। পুঁটির তন্দ্রা কাটলে রেণু মারমুখী হয়ে উঠবে। ফলে, তিনি খাটের এক প্রান্তে বাক্স তোরঙ্গের আড়ালে মুলী বাঁশের বেড়ায় পিঠ রেখে জলচৌকিতে বসে নিরুপায় দুপুরটাকে কাটাছেঁড়া করেছেন।

দিন পাঁচেক হল পুঁটির জ্বর। কাঁথার নিচে ওর অপুষ্ট শরীরটা নিঃসাড় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে চটকা ভাঙতে সুরেশ্বর উঠে দাঁড়িয়েছেন। পুঁটির বুকের ওঠাপড়া লক্ষ করেছেন। মুখখানা শুকনো বাঁশপাতার মত বিবর্ণ। যেন কেউ উপরের সবুজ পাতলা চামড়াটা খসিয়ে রক্তহীন করে রেখেছে। রেণু সাধ্যমত টোটকা চালাচ্ছে। সকাল সন্ধে বাবর তুলসীর রস, আরো কত কি। শরীরটা জুড়োচ্ছে না কিছুতেই। সুরেশ্বরের ধারণা, স্যাঁতসেঁতে মেটে ভিত, টালিচালের ফুটোফাটা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট নামছে অনবরত ঘরের চার পাশের কাঁচানালিতে—মারী মড়কের মৌরসীপাট্টা,—জ্বরটা নির্ঘাৎ টাইফয়েডে দাঁড়িয়ে গেছে।

সুরেশ্বর খুব সতর্ক, ঘামে জবজবে পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপালেন। শরীরটা হেজেমজে এলেও নুনের অংশে ঘাটতি পড়েনি এখনো। পুঁটির অসুখ সম্পর্কে নিজের অস্বস্তির কথাটা আপাতত রেণুকে জানানো যাচ্ছে না। কলোনীতে দু একজন কোয়াক বদ্যি যে নেই এমন নয়। এবং সুরেশ্বর তৎপর হলে বিনা প্রণামীতে ওদের একজনকে ধরে নিয়ে আসাও যেতে পারে। কিন্তু এককাঁড়ি ওষুধ, তৎসহ পথ্যের ফর্দ—পয়সা তো আর রোগবীজাণুর মত কাঁচানালিতে ছোটাছুটি করছে না। মাঝখান থেকে রেণুর মগজে কিন্তু বাড়তি চিন্তা চাগিয়ে তোলা সার হবে। এমনিতেই ও মস্ত

সুখে আছে। সেই কবে সুরেশ্বর অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাক ঘুরে মালাবদল করে রেণুকে ঘরে তুলেছিলেন। তা প্রায় সতের আঠার বছর আগেকার কথা। তারপর ক্রমশ, সময় লাট খেয়ে গোঁত্তা মেরে তাদের অভাবের অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকন্তু পুঁটি আর খোকন। তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। খোকন হবার পর জরায়ুর গণ্ডগোল দেখা গেল রেণুর। নইলে ফের আঁতুড় ঘরে আর ফিরতে হত না। এখন ওর গর্ব করার মত বস্তু দুটি। রক্তাল্পতা আর হার্টের অসুখ। এ দুটো যেন ওর গেট পাস। ইচ্ছে করলেই সংসারের চৌকাঠ ডিঙোতে পারে। ক্ষেপে গেলে প্রায়ই রেণু বলে, আমার আর কি! কজ্জের মধ্যে কখন চোখ উল্টাবো, জলটুকু গড়াবার সময় পাবে না।—রেণুর এ অসুখপ্রসাদে সুরেশ্বরের ভয় যতটা দুশ্চিন্তা তার চেয়ে অনেক বেশি। নিয়মিত আয় বলতে বাজারে দুটো মুদী দোকানে হিসেব লেখার কাজ। এ ছাড়া টুকিটাকি কিছু ধান্দা আছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে এতে করে সম্বল যা আসে তাতে মাসের সব কটা রাশন তোলাই দুষ্কর। রেণু যে কেমন করে টেনেটুনে সব চালিয়ে নেয়, সুরেশ্বর অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারেন না।

সুরেশ্বর [illegible] আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। বুক পকেট থেকে চিরকুটটা বের করলেন। দিন কয়েক আগে প্রতিবেশী যতীন সিকদার এটা দিয়েছিল। কসবার ওর চেনাজানা এক ভদ্রলোক আমলা তেলের ফ্যাক্টরী খুলেছে। কিছু সেলসম্যান দরকার। এ কদিন বিকেলের দিকে ফুরসুৎ হয়নি। ভেবেছিলেন আজ দুপুরের দিকেই রওনা দেবেন। বৃষ্টি নেমে গণ্ডগোল বাধল। এ লাইনে সুরেশ্বর যে একেবারে আনাড়ী এমন নয়। জীবন ধারণের বড় দায়। অনেক পথেই ঘোরাফেরা করতে হয়েছে তাঁকে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, এই যা।

সজোরে চিরুনি চালাতে গিয়ে হাতে একদলা চুল উঠে এল। পুঁটি ফের বকবক শুরু করেছে। এমনিতে মেয়েটা চুপচাপ, শান্ত সরল। রেণুর ধাত পেয়েছে পুঁটি। শুধু ওই এক দোষ। ঘুমের ভেতর কথা বলা। তা অসুখ বলে নয়। সুরেশ্বরের মনে হয়, রেণুর মত পুঁটিও সংসারের ভবিষ্যৎটা ধরে ফেলেছে। বয়স তো কম হল না। পুঁটির বয়সে এক সময়ে মেয়েরা মা হত। সবকিছু বুঝতে পেরেছে বলেই হয়ত পুঁটি স্বপ্নের ভেতর দিয়ে নিজের সুখ আহ্লাদ মিটিয়ে নিচ্ছে।

খোকন ঘরের এক কোণে বসে। নিজের রাজ্যপাট নিয়ে তন্ময়। ওর চার পাশে খালি সিগারেটের প্যাকেট আর কিছু পলকা কাঠের টুকরো ছড়ানো। কলোনীর পশ্চিমে বড়ঝিলের গা ঘেঁষে প্লাই-উডের কারখানা। পাড়ার দঙ্গলের সঙ্গে সেখান থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনে খোকন। সিগারেটের প্যাকেট সুরেশ্বর যোগান। আয়োজন সামান্য। কিন্তু বাতিকটা মারাত্মক। কাঁচি দিয়ে কাঠের টুকরোগুলি কেটেছেঁটে রাঙতায় মুড়ে খোকন ঢাল তলোয়ার বানায়। রাজা-সাজায় ওর মস্ত শখ। সুরেশ্বর চিরুনি চালানো থামিয়ে বললেন, আমার স্যাণ্ডেল জোড়া বের করো তো খোকন। খোকন উঠে খাটের কাছে এল। ওর দুই ভ্রূর মাঝ বরাবর লম্বালম্বি একটা সাদা দাগ। ইদানীং, এ পাগলামি খোকনকেও পেয়ে বসেছে। শুকনো গামছা আঙুলে জড়িয়ে ঘসে ঘসে কপালে রাজতিলক তুলছে। খোকনের দুহাত ভরে মাদুলি। গলাতেও একগোছা, বুকের কাঠি কাঠি হাড়গুলোকে সামাল দিচ্ছে। ওদিকে চোখ পড়তে সুরেশ্বর নিজের শরীরের চোরাগোপ্তা কাটাপোড়া দাগগুলি সম্পর্কে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে ওঠেন। দুটোই তার ফালতু বলে মনে হয়। মাদুলিগুলো রেণুর কীর্তি। আর, সুরেশ্বরের শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলি অতীত দিনের কিছু অর্থহীন স্মৃতি বহন করছে। সুরেশ্বর এখন আর সেসব খোঁড়ো হাওয়ার দিনগুলির কথা ভাবেন না। কোনও উৎসাহ বোধ করেন না ভাবতে। কিন্তু রেণু, যেহেতু পুঁটি খোকনের মা, তারই রক্তমাংসে ভাগ বসিয়ে ওরা পৃথিবীর আলো-হাওয়া নিচ্ছে, তাই সন্তানের প্রতি রেণুর ভালবাসা আজো অম্লান। তফাৎ মাত্র এইটুকু।

জন্মের পর থেকেই খোকন ভুগছে। সুরেশ্বরের অনুমান, তারও আগে থেকে। রেণুর পেটে থাকতে পোস্টাই কিছু পায়নি ছেলেটা। তখন সুরেশ্বরের অবস্থা টলো-মলো। খোকন হবার বছর দেড়েক আগে সওদাগরী অফিসের অমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিলেন সুরেশ্বর। তুচ্ছ কারণে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাকড়াশীর সঙ্গে বচসা হল। রক্ত থিতিয়ে এলেও সুরেশ্বরের পুরোন তেজটা তখনো মরেনি। এক কথায় চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। স্বাধীন ব্যবসা ধরলেন। জাঁকজমক করে বড় রাস্তার ধারে লণ্ড্রী খুললেন। বছর না গড়াতেই ব্যবসা লাটে উঠল। ওঠারই কথা। দেশের মানুষ সম্পর্কে তার ধারণাটা যে সেকেলে হয়ে পড়েছিল,—এতটা বুঝে উঠবার মত বুদ্ধি তখনো সুরেশ্বরের পাকেনি। ধার-বাকিতে লাভের গুড় পিঁপড়েয় ঠোকরাচ্ছিল। অবশিষ্ট নিয়ে সরে পড়ল দোকানের ছোকরা কর্মচারী নারায়ণ। তারপর অথৈ জলে। সব ধকল রেণু সইল। কিন্তু রেণু তো জানতো না, নিজের শরীর দিয়ে অভাবকে রুখতে গিয়ে সে পেটের ভ্রূণটাকেই জখম করছে। এক সময় পুঁটি-খোকনকে ঘিরে

রেণু কিছু স্বপ্ন দেখত। এখন আর দেখে না। দেখার কথাও নয়। এক একটা দিন পার করতেই রেণু এখন প্রাণান্ত। অথচ রেণু এক সময় আর দশজন মায়ের মতই ভাবত, দুটি খোকন ভাতেমদে দুবেলা দুটি পেট ভরে খাক, খেলুক ছুটুক বেড়াক। খোকনটা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। যেমন চারপাশের ছেলেরা হচ্ছে। রেণুর উদ্যমেত সুরেশ্বর খোকনকে ভর্তিও করিয়ে দিয়েছিলেন। কলোনীর ফ্রি প্রাইমারী ইস্কুলে। কিছুই হল না। দুর্বল মস্তিষ্ক বিদ্যার ভার বইতে পারল না। এক ক্লাসে দু'বার ফেল করায় ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়া হল।

সুরেশ্বর স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে গলাতে দরজার মুখ থেকে রেণু অর্ধমনস্ক বলল, বেরুচ্ছ? সম্প্রতি নতুন রোগে ধরেছে রেণুকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মালকাতে কয়েক মুঠো চাল নিয়ে কাঁকর বাছতে বসে। সুরেশ্বর বোঝেন, রেণু ভেতরে ভেতরে যতই ভেঙে পড়ছে ততই একটানা একটা কাজের ছুতোয় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছে।

সুরেশ্বর বুকপকেটে হাত রেখে ঠিক-ঠাক স্পর্শ করে জবাব দিলেন, হাঁ।—ছ' সাত বছর আগেও রেণুর প্রশ্ন এত সংক্ষিপ্ত হত না। বেরুবার মুখে কাছে এসে দাঁড়াত। সিঁথির মুখ অবধি ঘোমটা টেনে নিচু গলায় শুধোত, কোথায় যাচ্ছ? ফিরতে রাত হবে?—সে বলায় অনুরাগ না থাকলেও প্রত্যাশা থাকত। উত্তরে সুরেশ্বরও খানিকটা সময় [illegible]। তখনো রেণুকে দেখে মনে ওর সান্নিধ্যের উষ্ণতা সুরেশ্বর টের পেতেন। আর এখন, মাঝখানে [illegible] সংসার, দু'টি খোকন মাথা তুলছে. তারা দাঁড়ান যেন সাঁকোর দুই পারে, ক্রমশ বিচ্ছিন্ন।

ঘর ছেড়ে পথে নেমে সুরেশ্বর বিড়ি ধরালেন। আকাশ তেমন পরিষ্কার হয়নি। উত্তর-পশ্চিমে একখণ্ড মেঘ ষড়যন্ত্র-সংকুল হয়ে উঠেছে। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে সুরেশ্বর বড় বড় পা ফেলে এগুতে লাগলেন। নালি উপচে নোংরা জলে রাস্তা উপদ্রুত হয়ে রয়েছে। দু' পাশে ঝুঁকেপড়া দরমার ঘর। মাঝে মধ্যে এক-একটা কোঠা-বাড়ি। চারপাশের শ্রীহীনতায় বেমানান। সামান্য আড়াই কাঠা জমি রক্ষা করার জন্য সুরেশ্বরকে কম যুঝতে হয়নি। রাতের পর রাত দল বেঁধে জমিদারের ভাড়াটে লেঠেলদের রুখতে হয়েছে। অথচ এক সময়, সেসব দিনের কথা মনে পড়লে সুরেশ্বরের বুকের ভেতর একটা ব্যথা পাশ ফেরে, গোটা দেশটাকেই তিনি কত অনায়াসে নিজের বলে ভাবতেন।

বাঁকের মুখে এসে সুরেশ্বর থমকে দাঁড়ালেন। মিত্তিরদের ওদিকের শুঁড়িপথ ধরে রতিকান্ত হনহনিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। চোখের পাওয়ার বাড়লেও পাওনাদারকে চিনতে সুরেশ্বর ভুল করেন না। রতিকান্তর মদ চোলাইয়ের ব্যবসা। দুদশ টাকা করে সুরেশ্বর ওর কাছ থেকে কম কর্জ করেননি। অনেককাল এ নিয়ে রতিকান্ত গাইগুঁই করেনি। শেষে যখন জানল ধার মেটাবার মুরোদ সুরেশ্বরের নেই, তখন আসল মূর্তিটা ধরা পড়ল। এখন তাকে দেখতে পেলেই, তা যেখানেই হোক, রতিকান্তর মুখের লাগাম থাকে না। যাচ্ছেতাই বলে বকেয়া পাওনা সুদে আসলে উসুল করে নেয়।

সুরেশ্বর পিছু হটে দত্তবাড়ির শিরীষ গাছটার আড়াল হলেন। নাহ্, রতিকান্ত তাকে দেখতে পায়নি। সুরেশ্বর বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন। রতিকান্ত কালীতলার পথ ধরেছে।

কিছুটা এগুতে সুরেশ্বর চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছুলেন। আধপোড়া বিড়িটা ধরিয়ে কসে দুটো টান দিয়ে কুটিল ফুসফুস দুটো থেকে উদ্বেগ তাড়ালেন। ডাইনে ইস্কুলের রাস্তা। বাঁদিকে কিছুটা এগুলে বাজার। সামনে কোনাকুনি কয়েক পা হাঁটলেই বাস রাস্তা। সামনের পথের বাঁ পাশে সারসার দালানবাড়ি। দশ বছর আগেও এদিকটা অন্যরকম ছিল। উঁচুনিচু পোড়ো জমি। ইতস্তত কিছু ন্যাড়া নিস্ফলা নারকেল গাছ। [illegible] আঁশ-ফলের বাগান। এদিক সেদিকে ছোট ছোট পুকুর, কলকলমীর ঝোপে আড়াল করা। পথ চলতি সুরেশ্বর, শীতের দুপুরে, কতদিন দেখেছেন, কালকাসুন্দের ঝোপ থেকে শেয়াল-মা তার বাচ্চাদের নিয়ে ফাঁকায় এসে রোদ পোহাচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যেই সব সুনসান। ভোজবাজির মত পাল্টে গেল সব কিছু। গাছগাছালি খানাখন্দ লোপাট। মাটি ফুঁড়ে একের পর এক দালানবাড়ি মাথা তুলল। তাদের কত বাহার। বারান্দায় কেয়ারী করা লোহার জাফরি। সামনের জমিতে মরসুমী ফুলের মেলা। জানলায় জানলায় রঙচঙে পর্দা। রেডিও'র মিঠে সুরে বাতাস ম'ম' করছে। আনাচ কানাচ থেকে নিত্য নতুন রাস্তা বেরুল। হুস করে খানিকটা নীলচে ধোঁয়া শূন্যে ছিটিয়ে বেরিয়ে আসছে ঝকঝকে মোটরগাড়ি। সুরেশ্বর সবটা বুঝে উঠতে না পারলেও এটুকু অনুমান করতে পারেন, দেশের স্বাধীনতা কিছু লোককে অন্তত সুখের পথটা বাতলে দিয়েছে।

কোন কোনদিন বায়না ধরলে খোকনকে নিয়ে সুরেশ্বর বাজারে আসেন। চৌরাস্তার মোড়ে এসে এদিকে চোখ পড়তে খোকনের চলার গতি থেমে যায়। কেবলই পিছু ফিরে

তাকায় ছেলেটা। আর হোঁচট খায়। ওর চোখের তারা সুদূর হয়ে ওঠে। সুরেশ্বর বোঝেন, খোকন মনে মনে কিছু একটা রচনা করছে। কে জানে, রাতে রেণুর মুখে শোনা রূপকথার গল্প হয়ত ওর মনে পড়ে। সুরেশ্বর ওর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, তোমায় নিয়ে রাস্তায় বেরুনো যায় না খোকন। পথ দেখে চলবে তো!

রেল ব্রিজের মুখে আসতে জগার চায়ের দোকানের কাছে হাতকাটা জীবন ধরল। রাস্তায় বাঁশের মাচায় বসে ওরা চাক বেঁধে গুলতানি করছিল। এ তল্লাটের সকলেই ওদের সমঝে চলে। সরু প্যাণ্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, চোখের নিচে ঘন কালির ছোপ, এক মাথা চুল পায়ে হাওয়াই চটি। অনর্গল দাঁতে হিন্দী গানের কলি কাটছে। একবার ওরা রতিকান্তকে বেদম পিটিয়েছিল। ইচ্ছেমত ওরা কলোনীতে হানা দেয়, হল্লা-গুল্লা করে, ডবকা ছুঁড়িদের পেছনে হোঁক হোঁক করে। সুরেশ্বর একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত। ঈশ্বরের কৃপা বলতে হবে। পুঁটির বয়স হলেও শরীরটা তেমন ফোটেনি বলে এতদিনেও ওর দিকে ছেলেগুলোর নজর পড়েনি।

জীবন হাঁক পাড়ল, বেশ কড়া করে এক কাপ চা করতো জগু।—ছাঁকনিতে গুঁড়ো চা ঢালবার ফাঁকে জগু আড়চোখে একবার সুরেশ্বরের দিকে বিরক্ত তাকাল। সুরেশ্বর বোঝেন, ইদানীং জগুও তাকে তাচ্ছিল্য করতে শিখে গেছে। কিছু বাকি পড়ে আছে অনেককাল। ইচ্ছে থাকলেও কিছুতেই সুরেশ্বর মিটোতে পারছেন না। কোনদিন হয়ত রতিকান্তর মত ও-ও একহাট লোকের সামনে অপমান করে বসবে। উত্তরে কিছুই বলা যাবে না। জগু এখন এ মহল্লার একজন কেস্টবিস্টু ব্যক্তি। জীবনের দল ওর হাতে।

জীবন কাটা হাতটা দিয়ে সুরেশ্বরের পাঁজরায় খোঁচা মেরে বলল, আসুন, বসা যাক ভট্‌চাযদা। গত বছর কালীপুজোর সময় বোমা তৈরি করতে গিয়ে ওর হাতের অর্ধেকটা উড়ে যায়। সুরেশ্বর হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে জীবনের পাশে বসলেন। এক চুমুক গরম পানীয় জিভে ধরতে বেশ আরাম বোধ হল। সকালের পুঁই চচ্চড়ি তখনো হজম হয়নি। থেকে থেকে টক-ঢেঁকুর উঠছিল। মাচার ওধার থেকে এক ছোকরা বলে উঠল, একটা খুনখারাবির গপ্প হোক না ভট্‌চাযদা।—এ পাশ থেকে এক ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, চলুক গুরু!—সুরেশ্বর হামলে চায়ের কাপ শূন্য করে উঠে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। কসবা অনেকটা পথ। শিরদাঁড়ার ভাঙা হাড়ের ব্যথাটা একবার মোচড় খেয়ে উঠলে ঠিকমত পৌঁছনো যাবে না। বাজারে কিছু চেনা-জানা দোকান আছে, যাদের কাছে মাল ফেললে দুপাঁচটা শিশি নেবেই, অন্তত সুরেশ্বরের মুখ চেয়ে। তখন পুঁটির একটা হিল্লে করা যাবে।

সুরেশ্বর জীবনের দিকে তাকিয়ে মিন-মিনিয়ে বললেন, আজ আর বসতে পারছি না জীবন। একটু কসবা যেতে হচ্ছে, বিশেষ কাজে—। সুরেশ্বরের কথা শেষ না হতেই এক ছোকরা তড়িৎ উঠে তার হাত ধরে টানল, মাইরী আর কি! নগদা-নগদ চা খাওয়ালুম। কেটে পড়বেন, সেকি হয় দাদা!—আর একজন সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর দুটো আঙুল পুরে দিয়ে চুঁই চুঁই করে সিটি মেরে উঠল। শেষটায় জীবনই বাঁচাল, বলল, ছেড়ে দে হাবুল। ঝুটমুট ঝামেলা বাড়াস না। আর একদিন শুনবি—

ব্রিজ পেরুতে সুরেশ্বরের হাঁপ ধরে গেল। শরীরটা ভেতরে ভেতরে যে ক্ষয়ে আসছে এ পথে এলেই তিনি তা টের পান। জীবনের দলের হাতে এই হেনেস্থার জন্যে এখন আর তিনি অপমানিত বোধ করেন না। কত লাঞ্ছনাই তো দিনে দিনে গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। এক সময় ওদের তিনি আসকারা দিয়েছেন সরল মনে। এখন ছোবল মারছে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, তার সব কথা ওরা কেনই বা বিশ্বাস করবে। কেউ বা করে। এমন কি রেণুও করে না। পুরোন প্রসঙ্গ তুললে বলে, থামো, তোমার ওসব গালভরা কথা আর ভাল লাগে না।—একটু খতিয়ে ভাবতে গেলে সুরেশ্বরের নিজের কাছেই নিজের অতীতটা হেঁয়ালি বলে মনে হয়। স্মৃতি খুঁড়ে ফয়দা নেই কিছু, শুধু দুঃখটাই বাড়ে। উপরন্তু সব কথা এখন আর ঠিকঠিক মনেও পড়ে না। কেমন ক্লান্তি আসে, সব তালগোল পাকিয়ে ছাই ছাই হয়ে যায়। লাভের মধ্যে হতাশা বাড়ে, আপসোস হয়। যে সময়টায় আর দশজনের মত গা বাঁচিয়ে ছিমছাম থাকলে এখন সুখের মুখ দেখতে পারতেন, সেই বয়সে জীবনটাকে নিয়ে তিনি অর্থহীন ছিনিমিনি খেলেছেন। এ নিয়ে রেণু এখনও উঠতে বসতে খোঁটা দেয়, পরিহাস করে। ম্যাচিসন মার্ডার কেসে চৌদ্দ বছর জেল হল। স্বাধীনতার দৌলতে ছাড়া পেলেন আট বছর বাদে। তারপর মার পীড়াপীড়িতে চরম আহাম্মুকিটা করে বসলেন। রেণুকে ঘরে তুললেন। তখনো দেশে পুরোন হাওয়াটা বইছে। তাদের জন্যে দেশের মানুষের মনে শ্রদ্ধাভক্তির কিছু অবশিষ্ট ছিল। সেইটুকু পেয়েই সংসারটাকে উপেক্ষা করলেন সুরেশ্বর। বিয়ের কয়েকটা বছর ভালই কেটেছিল। সওদাগরী আপিসের চাকরিটা যতদিন ছিল। তারপর শুরু হল কষ্টের লাঙল। একটানা। প্রথমটায় সুরেশ্বর বুঝে উঠতে পারেননি। তখনো তার দুচোখে ঘোর। মানুষকে দেশের ব্যাপকতায় মিলিয়ে গুলিয়ে ভাবছেন। কিন্তু সময় দ্রুত পাল্টাচ্ছিল। হাওয়া উল্টো মুখে বইতে শুরু করেছে। বেঁচে থাকাটা দেশের জন্যে নয়, নিজের জন্যে—স্ত্রীপুত্র—পরিবারের জন্যেই, এ রূঢ় সত্যটা যখন ধরতে পারলেন তখন দেরি হয়ে গেছে।

আমলা তেলের কাজটা যে পাওয়া যাবে না এমন আশংকা সুরেশ্বরের ছিল। হলও তাই। যতীন সিকদারের চিঠিতে ফ্যাক্টরীর মালিক প্রথমটায় বেশ নরমও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালো মুখ করে বেরিয়ে আসতে হলো সুরেশ্বরকে। শুধু একটুকরো চিঠির ওপর ভরসা করে, তা সুরেশ্বর ইনিয়ে বিনিয়ে নিজেকে যতই যোগ্য এবং বিশ্বস্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন, পারো এক পেটি মাল হাত ছাড়া করতে ফ্যাক্টরীর মালিক রাজী হল না।

পথে নেমে সুরেশ্বরের পা চলছিল না। এলোমেলো এগুতে বারবার ধমক খাচ্ছিলেন, 'আচ্ছা মানুষ! দেখে হাঁটবেন তো!' কি ব্যাপার, কানা নাকি!' সুরেশ্বর ভিড়ের ভেতর সেঁধিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন। একটেরে হলেই পুঁটি বিষয়ক অস্বস্তিটা উত্যক্ত করতে পারে, এমনি এক ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল। রেললাইন ছাড়িয়ে ট্রামগুমটি পেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে গিয়ে পার্কের রেলিঙ ঘেঁষে একবার তিনি কিছুক্ষণ একলাও হেঁটে ছিলেন। তাতে বিপত্তি বেড়েছে বই কমেনি। বৃষ্টিতে জনবিরল অন্ধকার পার্কের দিকে চোখ রাখতে বাড়ি ফেরার উৎসাহ ক্রমশ নিবে এসেছে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে আসতে নাটকীয়-ভাবে দ্বিজপদর সঙ্গে দেখা। প্রায় দুই যুগের ব্যবধানে। সুরেশ্বর প্রথমটায় চিনতে পারেননি। দ্বিজপদর সন্ধানী চোখ কিন্তু সুরেশ্বরকে চিনতে ভুল করেনি। পেট্রল পাম্পের মুখে দাঁড়িয়ে দ্বিজপদ ফুল কিনছিল। সুরেশ্বর মুখোমুখি হতে প্রায় চিৎকার করে উঠল, আরে, সুরেশ্বর না! ঠিকমত চিনে নেবার আগেই, দ্বিজ-পদর কণ্ঠস্বর ধারালো অস্ত্রের মত কানের পর্দায় বিঁধতে, ঘুমের ভেতর পুঁটি যেমন ভুল বকে—তেমনি অন্যমনস্ক সুরেশ্বর বলে উঠেছিলেন, দ্বিজপদ!

দ্বিজপদ এগিয়ে সুরেশ্বরের ডান হাত-খানা নিজের উষ্ণ মুঠোয় চেপে ধরে বলল, হ্যাঁ, আমি! উফ, কতদিন বাদে দেখা!—তারপর মুঠো আলগা করে পাশ ফিরে বলল, বাণী, এই যে সুরেশ্বর ভট্টাচার্য। আমার

অনেককালের বধ্‌।—ফুলের তোড়া বুকে চেপে ভদ্রমহিলা সালঙ্কারা হাত দুখানি অনেক কষ্টে জোড় করে স্মিত হাসলেন, আপনার কথা ওর কাছে কত শুনেছি—

দ্বিজপদর তর সইছিল না। ওর কথায় ভাগ বসিয়ে বলল, তুই এদিকে—

সুরেশ্বর একপলকে দ্বিজপদকে যথাসাধ্য চোখে তুলে নিলেন। আগাপাশতলা পাল্টে গেছে দ্বিজপদ। শরীরের অতিরিক্ত মেদ সিল্কের পাঞ্জাবিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। গাল তার চিবুকের ডাণ্ডচুর ভরে গিয়ে মুখখানা ভারিক্কি হয়ে গেছে। পুরু কাচের চশমার ভেতর দুচোখে স্বচ্ছন্দ তৃপ্তি টলটল করছে।

সুরেশ্বর কেলেঙ্কা টেনে বললেন, কসবার দিকে গিয়েছিলাম।

দ্বিজপদ বাঁ হাতটা এগিয়ে ফুলওয়ালার দিকে একখানা নোট ছুড়ে দিয়ে বলল, তুই এখন কোথায় আছিস?

সুরেশ্বর ডান পায়ে দেহের শরীরের ভারসাম্য রেখে বললেন, এই তো, রেল ব্রিজের ওধারে।

দ্বিজপদ কপালে চোখ তুলল, সেকি! এত কাছাকাছি থাকিস, অথচ দেখা হয় না।

সুরেশ্বর মলিন হাসলেন। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তার জানা নেই। কাছাকাছি থাকলেও এখন আর কেউ পাশাপাশি নেই। আগে ছিল। এখন সবাই কাছে থেকেও দূরে।

দ্বিজপদ ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রাণী, তুমি চলে যাও। আমি খানিক পরে যাচ্ছি। ভদ্রমহিলা হাসলেন, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। যা দুর্যোগ—তারপর ফুলের তোড়া সমেত মোটরে উঠবার আগে সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি। এই তো কাছেই—

রাস্তা পেরিয়ে কিছুটা হেঁটে রেস্টুরান্টে পৌঁছনো পর্যন্ত দ্বিজপদ সুরেশ্বরকে অনেক খুচরো প্রশ্ন করেছে। সুরেশ্বর সব প্রশ্নের দায়সারা জবাব দিয়েছেন। কেননা, পুরোন প্রসঙ্গে আদৌ তার উৎসাহ ছিল না। উপরন্তু, দ্বিজপদর সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়ার সার্থকতার কথা ভাবতেই তিনি তন্ময় ছিলেন। রাণীর হাত ভর্তি গয়না, মোটরগাড়ি, পাঁচ টাকার নোটটা ফুলওয়ালাকে দিয়ে পয়সা ফেরৎ নেবার ব্যাপারে দ্বিজপদর উদাসীনতা, ইত্যাদি সূত্র ধরে সুরেশ্বর মনে মনে একটা ফন্দি আঁটছিলেন।

দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসেই দ্বিজপদ বলল, কি খাবি বল? অন্যমনা সুরেশ্বর উত্তর করলেন, যাহোক একটা কিছু—। সুরেশ্বর ভাবছিলেন: ধার হিসেবে ওর কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পরমুহূর্তেই পরিকল্পনাটা বাতিল করলেন। ধার করলেই টাকাটা ফিরিয়ে দেবার একটা নৈতিক দায় থেকে যায়।

বেয়ারা আসতে দ্বিজপদ কাটলেটের অর্ডার দিল। সুরেশ্বর পরিষ্কার লক্ষ করলেন, ওর বাঁ হাতের সুগোল মধ্যমায় একটা হীরের আংটি চকচক করছে। সুরেশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন: রেণুর রুগ্ন-স্বাস্থ্যের কথা বলে তিনি দ্বিজপদকে বিগলিত করবেন। এবং আপাতত, রেণু মুমূর্ষু না হলেও ওর শরীর যে ভাল নেই, যে কোনদিন ও টেঁসে যেতে পারে সেটা তো আর মিথ্যে নয়।

বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল। নুনের কৌটো নাড়াতে নাড়াতে দ্বিজপদ বলল, এখন কি করছিস রে সুরেশ্বর?

অস্পষ্ট হাতে কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে সুরেশ্বর বললেন, তেমন কিছু না।

দ্বিজপদ হাঁ করতে ওর মুখের ভেতর ফুলকো লুচির মত মস্ত মাংসপিণ্ড দেখা গেল। কাটলেটের অর্ধেকটা মুখে তুলে দ্বিজপদ জিজ্ঞেস করল, ছেলেপুলে ক'টি?

পুঁটির অসুখের কথা বলে ওর কাছে হাত পাততে সুরেশ্বরের মন সায় দিচ্ছিল না। যদিও একথা বলা সবচেয়ে যথার্থ হবে, তবু বুকের নরম জায়গায় হাত রাখতে, সন্তানকে কবুল করে পয়সা চাইতে বাধছিল সুরেশ্বরের।

তিনি সংক্ষেপে উত্তর করলেন, দুটি।

প্লেট খালি করে দ্বিজপদ শব্দ করে

গোটাকয় ঢেঁকুর তোলার পর বলল, আমি ভাই নানা ঝঞ্ঝাটে আছি। দুনুটো কার খানার দেখাশোনা, বড় ছেলেটার রিসেনটাল ইনস্যানিটি গ্রো করেছে, বউ প্রেসারের রুগী। তার ওপর বাড়ির তেতলাটা কমপ্লিট করায় কাজে হাত দিয়ে নতুন ঝামেলায় পড়ে গেছি। সুরেশ্বর হাত দিয়ে কাটলেট ভেঙে একটুকরো মুখে পুরলেন। তারপর দ্বিজপদকে উসকে দিলেন, আচ্ছা, তাই নাকি!—সুরেশ্বর ভাবলেন : বাসে পকেটমার হয়ে গেছে, এ গল্পটা ফাঁদলে মন্দ হয় না। যেটা, খুব বিপদে পড়ে, এর আগেও দুচারবার করেছেন তিনি।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। দ্বিজপদ বলল, তোর বিদ্যুৎকে মনে পড়ে?

সুরেশ্বর মুখ তুললেন, বিদ্যুৎ! কে—

চায়ের কাপ কোলের কাছে টেনে দ্বিজপদ বলল, আরে আমাদের বিদ্যুৎ সরকার, সেই ছেলেটা, কুমিল্লায় বাড়ি, প্রেসিডেন্সীতে পড়ত।

জলের গ্লাস নামিয়ে রেখে সুরেশ্বর মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে।

দ্বিজপদ বলল, ওর কাছে এখন আমাকে প্রায়ই যেতে হচ্ছে। মস্ত এক বিদেশী কোম্পানীর ডাক সাইটে অফিসার। তোর কথা প্রায়ই বলে।

নীরব হেসে উঠতে সুরেশ্বরের মাথার খুলির ভিতর টং করে একটা শিরা ছিঁড়ে গেল যেন।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে দ্বিজপদ বলল, কিরে, কাটলেটটা শেষ কর।

সুরেশ্বর দ্বিজপদর চোখে চোখ রেখে বললেন, নাঃ, আর খাব না, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। ওর চশমার পুরু কাচে নিজের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সুরেশ্বর। কপালের তুলনায় দুচোখ ছোট। চোয়াল দুটো অস্বাভাবিক ছড়ানো। বাঁ গালের ক্ষত চিহ্নটা প্রকট হয়ে গোটা মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে। সুরেশ্বরের বুকের ভেতর কেউ যেন দ্রুত লাটাইয়ে সুতো গোটাচ্ছিল। নারায়ণতলা ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটা তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। অপারেশনে ওরা চারজন ছিলেন। সুরেশ্বর নিজে অবনী সামন্ত বিদ্যুৎ আর দ্বিজপদ। দ্বিজপদ ব্যাঙ্কের মুখে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আসল কাজ সমাধা হতে তেমন দেরি হয়নি। পালাবার সময় গণ্ডগোল বাধল। পুলিস আগ থেকেই সতর্ক ছিল। বিদ্যুৎ টাকা ভর্তি সুটকেসটা কোনমতে দ্বিজপদকে পৌঁছে দিয়েছিল। অবনী সামন্ত আর সুরেশ্বর গাড়িতে ওঠার সুযোগ পাননি। অবনী সামন্ত নদীপথে পালাতে গিয়ে পুলিসের মুখোমুখি হন। উপায়ন্তর না দেখে দারোগাকে গুলি চালিয়ে খতম করেও নিস্তার পেল না। ঘুরপথে সুরেশ্বর বাজারের ভেতর লুকিয়েছিলেন। ধরা পড়লেন পরের দিন, পাশের গ্রামে। পুলিস বিদ্যুতের হদিস পেল দিনকয়েক পরে, কলকাতায়। দ্বিজপদর পাত্তা মিলল না। বিচারে অবনী সামন্তর ফাঁসী হল। সুরেশ্বরের আট বছরের জেল। বিদ্যুতের বয়স কম, বছর চারেকের সাজা হল। এতটাও হত না। যদি না দ্বিজপদ রাজসাক্ষী হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে সব তথ্য ফাঁস করে দিত।

বিল চুকিয়ে উঠবার মুখে দ্বিজপদ বলল, একবার আসিস না আমাদের বাড়িতে। কাছেই, বারোর এক..

বাস রাস্তা থেকে খোওয়া ওঠা পথে নেমে আসতে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। গুরু গুরু মেঘ ডাকছিল। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠতে বুকের ভেতরটা নাড়াচাড়া উঠছিল। পুটির মলিন মুখ, রেণু, খোকন, ছন্নছাড়া সংসার, ঘরে ফিরে নালিশের সুরেশ্বরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। নিজেকে অস্বচ্ছন্দ করার জন্যে তিনি একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই বের করলেন। পর পর কয়েকটা কাঠি জ্বালিয়েও বিড়িটা ধরাতে পারলেন না। অন্ধকারে গভীর করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন। এত কথার ফাঁকেও শেষ পর্যন্ত দ্বিজপদর কাছে হাত পাততে পারলেন না! ভেতর থেকে কেউ যেন তাকে বাধা দিচ্ছিল।

কিছুটা এগোতে ডাইনে আলোর রোশনাই পাওয়া গেল। এধারে অন্য দৃশ্য। সুন্দর বাড়ি। বারান্দায় কেয়ারী করা লোহার জাফরি জানলায় রঙীন পর্দা। ভেতর থেকে সুর হাসি গল্প কলরব। সুরেশ্বর নির্বিকার এগিয়ে চৌমাথার মোড়ে এলেন। রাস্তার বাতিগুলো নেবানো। সুরেশ্বর বুঝলেন, এসব জীবনের দলের কাজ। নির্ঘাৎ। সন্ধ্যার সময় ওরা এ তল্লাটে হামলা করে গেছে।

শিরদাঁড়ার ভাঙা হাড়টায় কেউ যেন ছুরি চলাচ্ছে। শরীরের চোরা গোপ্তা কাটাছেঁড়া দাগগুলোয় দৃষ্টিবিন্দু নিবদ্ধ। চোখের সামনে পুরোন দিনের নানা ছবি একের পর এক ফুটে উঠছে। গাঁজা-আফিমের দোকানের মুখে পিকেটিং, বিদেশী কাপড় পোড়ানো, পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে আসা, গুপ্ত সমিতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, নোনাপুকুরে বোমা তৈরির মহড়া, ম্যাডিসন মার্ডার কেস...

সামনে বাড়ির পথ, অন্ধকার। বাতাস শরীর আঁচড়াচ্ছে। মাথার ওপারে মেঘের বজ্রযন্ত্র। বৃষ্টির জলধারা ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীর। পিছল পথ। তবু সুরেশ্বর, অন্ধকারে বড় বড় পা ফেলে দ্রুত এগোতে লাগলেন। যেমন তিনি ছুটতেন বহু বছর আগে, রাতের অন্ধকারে, রণপা পরে গ্রামের পর গ্রাম।

শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

বর্তমান বাংলায় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্যদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। কি অধ্যাপনায়, কি পরিচালনায়, কি প্রয়োগ-বিদ্যায় তাঁর মত প্রতিভা দুর্লভ। এই প্রতিভা যে শুধু নৈপুণ্যের দিক থেকে বিস্ময়কর তাই নয়, পরিকল্পনার দিক থেকেও আশ্চর্য। সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে যে প্রয়োগেই তিনি হাত দিয়েছেন সেটিই সফল্য লাভ করেছে। যন্ত্রী হিসাবে তিনি অদ্বিতীয়, বহু যন্ত্রে তাঁর দখল আবার গায়ন-শিল্পেও তাঁর দক্ষতা অসামান্য। বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে সাফল্য অর্জন করেছেন, বহু অনুষ্ঠান—চিত্রে বা মঞ্চে তাঁর পরিচালনায় গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জ্ঞানপ্রকাশকে আজ সঙ্গীতে বাংলার অন্যতম প্রতিভূ বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলার বাইরেও সর্বত্র দেখেছি সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতে সর্বত্রই তিনি সম্মানিত ব্যক্তি।

জ্ঞানবাবুর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন তিনি অত্যন্ত সহৃদয় এবং বিনয়ী ব্যক্তি। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তিনি খুবই সংকোচ বোধ করেন। আকাশবাণীতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার অনুরোধ করাতে তিনি যেন খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং নিতান্ত পীড়াপীড়িতেই অবশেষে কয়েকটি মতামত প্রদান করলেন। এই প্রচারবিমুখ লোকটি বোধ করি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে তাঁর বন্ধুদের কারুর মনেই আঘাত দিতে চান না।

জ্ঞানপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১০ সালে। বাল্যকাল থেকে তাঁর দুটি বিষয়ে আগ্রহ ছিল—একটি পাখোয়াজ বাজানো, অপরটি হকি এবং ক্রিকেট খেলা। খেলতে গিয়েই তাঁর চোখ খারাপ হয় যার জন্য তিনি বরাবর কষ্ট পেয়ে এসেছেন। এটি ঘটে যখন তিনি পালি ভাষা নিয়ে এম-এ পড়ছিলেন, বোধ হয় ১৯৩১-৩২ সালে। তরুণ তিনি প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আজিম খাঁর কাছে: পরে শিক্ষাগ্রহণ করেন মসিদ খাঁর কাছে। পাঞ্জাবের ফিরোজ খাঁর কাছেও তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। গানে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি এর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু এ পর্যন্ত বহু গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে প্রয়োজনমত বহু বস্তুই তিনি সংগ্রহ করেছেন যা তাঁর আহরণকে প্রচুর সমৃদ্ধি প্রদান করেছে। সঙ্গীতবিষয়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন তাঁরাই জানেন কথাপ্রসঙ্গে তিনি কত বিষয়ের অবতারণা করেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন।

শাঙ্গর্দেব

সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হচ্ছে, সঙ্গীত কখনও ইস্কুল-কলেজে শেখা যায় না, গুরুর কাছে শিখতে হয়। গুরুর সঙ্গে নিত্য সহবাসে নানা অবস্থায় বহু বস্তু পাওয়া যায়, ইস্কুল-কলেজের নিয়মমাফিক শিক্ষায় সে সব বস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এটি খুবই সত্য কথা, যদিও বর্তমান পরিবেশে ইস্কুল-কলেজে সঙ্গীত শিক্ষাই একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানবাবুর আর একটি ধারণা, সঙ্গীতকে একটি দর্শন হিসাবে দেখতে হবে। সঙ্গীতকে সেভাবে দেখা হয় না বলেই বর্তমানে সঙ্গীতের প্রয়োগ বা উপভোগ বিষয়ে একটা অধোগতি দেখা দিয়েছে। বস্তুতিকই সঙ্গীত সম্মেলনগুলিতে গুণিজনের কয়েকটি রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করলে এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতি সুবিচার করে এগুলি আরোপ করা হচ্ছে না এবং শ্রোতাদের করতালি থেকে মনে হয়, খেলার মাঠের দর্শকরাই যেন গানের আসরে ভীড় জমিয়েছেন, কেবল দৃশ্যান্তর মাত্র। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃত দার্শনিক অনুভূতি থাকলে রুচির এই বিকৃতি কখনও ঘটতে পারত না। যাঁরা সঙ্গীত বিচার করেন, তাঁরা জানুন যে, সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রকে দর্শনের একটি

ব্যাখ্যা বলা যায়। আরবীয় এবং ইরাণীয়গণও সংগীতকে এইভাবেই দেখতেন। গ্রীকদের মনোভাবও এইরকমই ছিল। মুসলমানরা "এলমে মৌসিকী" বলতে সংগীতের বৃহত্তর তত্ত্বকে বুঝতেন। বাস্তবিক গভীরতর দার্শনিক অনুভূতি না থাকলে সংগীতকে উপলব্ধি করা যায় না।

জ্ঞানবাবু খুব শীঘ্রই আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার জন্য রওনা হচ্ছেন। বিদেশে ভারতীয় সংগীত বিদ্যায় অধ্যাপনার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে। তাঁর বহু বন্ধুবান্ধবের সংগে আমরাও বিদেশে তাঁর গৌরব কামনা করি। জ্ঞানবাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী ললিতা ঘোষ সংগীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁর মাধ্যমেও তাঁর স্বামীর বহু বিশিষ্ট রচনা প্রচারিত হয়ে থাকে।

বাংলা গানের একটি গ্রন্থ—
"বাংলা সংগীতের রূপ"

সাম্প্রতিক বাংলা গানকে সর্বাঙ্গীনভাবে অধিকার করে কিছু কিছু বই বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার অনেকগুলিই সার্থক নয়, এমন কি সমালোচনার পর্যায়েও পড়ে না। অথচ এই ধরনের গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে ইতিহাসের দিক থেকে। এই অভাবটি পূরণ করেছেন শ্রীসুকুমার রায় তাঁর "বাংলা সংগীতের রূপ" নামক গ্রন্থে।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

সুকুমারবাবু কৃতবিদ্য এবং সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের মার্গ এবং কাব্যসংগীত শোনবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। বহু শিল্পীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শেও তিনি এসেছেন। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় তিনি যা বলতে পেরেছেন, তা উপলব্ধিগত সত্য এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য। ভবিষ্যতে যাঁরা এ যুগের সংগীত নিয়ে আলোচনা করবেন, এ গ্রন্থের সহায়তা তাঁদের নিতেই হবে। আর এ যুগে যাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করবেন, তাঁরা এই গ্রন্থের সাহায্যে আত্মসমীক্ষণ করতে পারবেন। বাংলা গানের কোনও ধারাই তিনি বাদ রাখেননি এবং সংগীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের মতামতগুলি বিশেষ বিশেষ আলোচনায় সযত্নে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিজস্ব চিন্তা এবং বিশ্লেষণও বিশেষ মূল্যবান।

গ্রন্থকারকে অনেক সময় অবাঙালীদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীত কি একটি সংগীতশ্রেণী? যদি তাই হয়, তাহলে তার কারণ কি? এ প্রশ্ন বাঙালীর কাছ থেকেও আমি পেয়েছি। একটি গোটা পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন এবং চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন রবীন্দ্রসংগীতকে একটি শ্রেণী বলে গণ্য করা হয়। রবীন্দ্রসংগীতের এই দিকটির আলোচনা এর পূর্বে এমনভাবে হয়েছে বলে জানি না। এ ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার পল্লীগীতি, প্রাচীন ধর্মীয় গীতি, বাংলা গানে রাগসংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুরকারদের এবং শিল্পীদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। সকলেই যে সব ক্ষেত্রে তাঁর সংগে একমত হবেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং চিন্তাধারাকে তিনি যথেষ্ট যুক্তির সংগে তুলে ধরেছেন। আধুনিক বাংলা গানের ব্যাপ্তি যে কতখানি এই ধরনের বই না পড়লে তা হৃদয়ংগম করা যায় না।

আমাদের মধ্যে অনেক উন্নাসিক ব্যক্তি আছেন, যাঁদের ধারণা সংগীতের ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলায় বিশেষ কিছু করা হয়নি। তাঁরা হাল আমলের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে চান না। অগভীর ধারণা থেকেই এই মনোভাবের উৎপত্তি। শ্রীসুকুমার রায়ের গ্রন্থটি পাঠ করলে তাঁরা প্রাচীন এবং আধুনিক গানের যে মনোজ্ঞ তুলনামূলক আলোচনা দেখতে পাবেন, তাতে তাঁদের ধারণার পরিবর্তন হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিবর্তন চিরকালই ইতিহাসে একটা স্বাক্ষর রেখে যায়; সেটা আমাদের বিচার করে উপলব্ধি করতে হয়। সুকুমারবাবু বিবর্তনের এই মূল্যায়নটিই করেছেন সার্থকভাবে। একটি যুগের ইতিহাসের বহু প্রচ্ছন্ন দিক তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন এবং বহু চিন্তার প্রেরণা দিয়েছেন। সংগীত সাহিত্যে তাঁর গ্রন্থটি অতি মূল্যবান সংযোজন।

প্রকাশক—এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আট টাকা।

হাসনরাজা (২)

হাসন রাজার সঙ্গে আমার একদিন এক-বারের তরে পরিচয় হয়। তবে তাঁর বয়স তখন ষাট, এবং আমার সাত! অতএব খুব বেশী যে "আলাপচারী" হয়েছিল তা নয়। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলের একচ্ছত্রাধিপতি জমিদার কিন্তু বিরাট এক কাঁসার থালা থেকে আপন হাতে তুলে তুলে আমার মুখে রসগোল্লা, কাঁচা-গোল্লা, চমচম পুরে দিয়েছিলেন। সে কথা না হয় সবিস্তার আরেকদিন হবে। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আপনাদের কিছু পরিচয় হোক।

আমি কিন্তু তখনই লক্ষ করেছিলুম যে তাঁর টাঙঘরটিতে কোনো বাহারই ছিল না, এবং বলতে কি, আমাদের মত মধ্য-শ্রেণীর বৈঠকখানার চেয়েও অযত্নে রক্ষিত।

তাঁর ইয়ার-বখশীর কেউ কেউ হয়তো তখন এ-দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। কারণ এর বহু বৎসর, হাসন রাজার মৃত্যুর অনেক পরে আমি নিচের গানটি সিলেটের এক মাঝির মুখে শুনতে পাই। তারও বহু বৎসর পরে শ্রীযুক্ত নির্মল চৌধুরী এ গানটি কলকাতা বেতারে প্রবর্তন করে বিস্তর সাবাশী পান। কবি মরহুম আব্বাস উদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র মিয়া আব্বাসী এটি প্রায়ই ঢাকা বেতার ও টেলি-ভিশনে গেয়ে থাকেন।

"লোকে বলে ঘরবাড়ি ভালা নয় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার?
ভালা করি' ঘর বানাইয়া রইমু
কত আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা
চুল আমার।
আগে যদি জানতো হাসন বাঁচবে কতদিন
ঘরবাড়ি বানিয়ে নিত করিয়া রঙীন।
এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘর-দুয়ার
না বান্ধে
কোথায় নিয়ে রাখবে আল্লায় সেই
ভাবিয়া কান্দে॥"

আসলে হাসন রাজা ডাঙায় বড় একটা থাকতেন না। তিনি বাস করতেন তাঁর বিরাট ভাওয়ালি নৌকায়। আমাদের বাসার সামনের সুরমা নদী দিয়ে সে-নৌকা উজান-ভাটি করতো। সে-নৌকো আলোকজ্জ্বল, এবং তার থেকে পাড় পর্যন্ত ভেসে আসতো সুমধুর সঙ্গীত।

একদা আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল নদীর ও-পারে। আমরা ডিঙি নৌকো করে নদী পার হবার সময় আমাদের সামনে দিয়ে ধীরে-মন্থরে ভেসে গেল সেই ভাওয়ালি। ভাওয়ালির খোলা জানলা দিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে দেখি, হাসান রাজা বেগনী রঙের মখমলের পাজামা, লাল রঙের কোট আর সবুজ রঙের পাগড়ী পরে নৌকোর মধ্যখানে থেই থেই করে চক্রাকারে নৃত্য করতে করতে গান গাইছেন, আর তাঁর চতুর্দিকে মণ্ডলা-কারে বসে গণ্ডা আস্টেক খাব্সুরত যুবতী মৃদঙ্গ মন্দিরা, হারমনিয়াম ক্ল্যারিওনেট, ব্যাজো সারেঙ্গী বাজাচ্ছে (তখন অবশ্য এ-যন্ত্রগুলো চিনিনি—পরবর্তী যুগে, ইন্‌ট্রিস্পেক্ট্, এঁদেরকে সনাক্ত করেছিলুম) আর মাঝে মাঝে দোহার দিচ্ছে। হাসন রাজার অবস্থা তখন অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছিল—উন্মত্তপ্রায়। কারণ প্রকাশ্যে এরকম দৃশ্য সে-যুগে ছিল অসম্ভব, কল্পনাতীত। পরবর্তী যুগে শুনেছিলুম, এ-রকম 'বেলেল্লাপনা' সে-যুগে করবার মত হিম্মৎ ধরতেন একমাত্র হাসন রাজাই, এবং আরো শুনেছিলুম, তিনি তখন নতুন নতুন গীত রচনা করতে করতে, সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়ে গান করতে করতে, নৃত্যের পদক্ষেপের মারফতে তবলচীকে কি তাল সেটা বোঝাতে বোঝাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটাতেন।

ভাওয়ালি পেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলুম, আমার পিতা অন্যদিকে মুখ করে বসে আছেন। তিনি ছিলেন কট্টর কৃচ্ছ্র-সাধনপন্থী। ধর্মের নামে (কারণ হাসন রাজা রচনা করতেন, গাইতেন ধর্মসঙ্গীত, মিস্টিক গান—রাঢ়ের বাউলরা যে-রকম একতারা হাতে, লেচেকুঁদে, কেঁদুলির মেলাতে মরমিয়া গীত রচনা করেন) এ-সব 'ঢলাঢলি' 'বেলেল্লাপনা' একদম সইতে পারতেন না। কিন্তু এটাও তখন লক্ষ করেছিলুম, বাবা আমাকে ভাওয়ালির পানে তাকাতে ধমকসহ বারণ করেননি।...তারপর একাধিক ঘটনা থেকে আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগে, বাবা যেন হাসন রাজাকে একটা এক্সেপ্শন্ বা ব্যতিক্রম রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি বাবার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে কেমন যেন একটি প্রীতিভাব ছিল, ইংরিজিতে বলতে গেলে মরমিয়া কবি হাসন রাজার প্রতি তাঁর একটা সফ্ট্ কর্নার ছিল। তা সে-কথা যাকগে। আমি উপস্থিত হাসন রাজার সঙ্গে শ্রীযুক্ত সনাতন পাঠক এবং তাঁর মত অন্যান্য কৌতূহলী

পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু হায়, সেই পঞ্চাশাধিক পূর্বকালের অসহিষ্ণু ধর্ম এবং কট্টর সমাজ ব্যবস্থার মাঝখানের ব্যত্যয় হাসন রাজার কাব্যরস জীবনরস অদ্যাকার সর্ববাধেদ সংস্কারমুক্ত পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার মত লেখনী তো বাগ্দেবী আমাকে দেননি।

হাসন রাজা অত্যুত্তম বিলক্ষণ জানতেন, যুবতী রমণীমণ্ডলীর মধ্যভাগে তাঁর নৃত্য-গীত মৌলবী মৌলানা, কট্টর মোল্লা-সম্প্রদায়ের দু' চোখের দুশমন। তাই দেখতে পাই, যাঁরা হাসন রাজার গীত চয়ন করে সেগুলো ছাপাতে চাইলেন, তখন হাসন রাজা যে গীত রচলেন সেটি এই। এ-গীত তাঁর সঞ্চয়িতার সর্বপ্রথম :

"আমি করি রে মানা, অপ্রেমিকে গান
আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কসম দেই আমার বই হাতে
নিবে না॥
বারে বারে করি মানা বই আমার
পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যেই জনা, এ সংসারে
হবে না॥
অপ্রেমিকে গান শুনিলে কিছুমাত্র
বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল
ধলা চিনবে না॥
হাসন রাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা।
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই
জানা॥

*

শাস্ত্রাধিকার না থাকলে বেদ পাঠের অনুমতি নেই। ক্যাথলিকদের ভিতরও এই রীতি আছে। ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হলে পর সাধারণ ক্যাথলিক জন পাদ্রি সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি পায় বাইবেল পড়ার জন্য। এ-স্থলে হাসন রাজা তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রসাদাৎ—যুক্তিতর্কের পরোয়া করতেন তিনি কমই—হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম'-এর মত লাঞ্ছনা ইহলোকে তিক্ততম অভিজ্ঞতা। তাই তিনি বার বার 'কিরে' 'কসম' কেটে দোহাই দিয়েছেন, 'মানা' করেছেন তাঁর গীতের আসরে যেন 'অপ্রেমিক' অর্থাৎ অরসিক যেন না আসে।

*

অন্যান্য সাধু-সন্তদের কথা সঠিক বলা কঠিন, কিন্তু হাসন রাজা জানতেন তাঁর সামাজিক আচরণ মোল্লামুনশী অর্থাৎ 'অপ্রেমিকের' নিন্দা ভাজন হয়েছে। তিনি খাবসুরৎ চাষী ছুঁড়ি বিয়ে করে তাঁর তাওয়ালিতে নিয়ে আসতেন। এ-বিষয়ে আমি কোনো গবেষণা করিনি। তবে শুনেছি, যৌবন গত হলে, চাষী মেয়ে ফিরে চাইতো, তবে তাকে তিনি টাকাকড়ি জমি-জমা দিয়ে আপন গাঁয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

কিন্তু এহ বাহ্য।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, তিনি যে শুধু 'দেশে দেশে' বিয়ে করতেন তাই নয়, তাওয়ালি থেকে নেমে নদী-পারে 'ঘোরা-ঘুরি' করতেন—আমার মনে সন্দ আছে, খুব সম্ভব 'জলকে চল্'-এর খাবসুরতীদের সন্ধানে।

সুদীর্ঘ অবতরণিকা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর একটি গীত শুনুন :

"একদিন তোর হইবে মরণ রে, হাসন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ।
মায়াজালে বেড়িয়া মরণ, না হইল স্মরণ
একদিন তোর হইবে মরণ॥
যমের দূত আসিয়া তোমার হাতে
দিবে দড়ি।
টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে, যমের
ও-পুরী॥"

এ পর্যন্ত তো গতানুগতিক। কিন্তু এরপর শুনুন, কবি নিজের জীবন, নিজের চরিত্র নিয়ে কী ব্যঙ্গ, কী ঠাট্টা মস্করা করছেন,

"সে-সময় কোথায় রইব (তোমার)
সুন্দর সুন্দর স্ত্রী?
কোথায় রইব রামপাশা, কোথায়
লক্ষ্মণশ্রী?
(রামপাশা আর লক্ষ্মণশ্রীতে হাসন রাজার বিরাট বিরাট জমিদারী ছিল।)
করবে নি রে, হাসন রাজা, রামপাশার
জমিদারী?
করবে নাকি কাপনা নদীর পাড়ে
ঘোরাঘুরি?
আর যাবে নাকি, হাসন রাজা,
রাজাগঞ্জ দিয়া?
করবে নি রে, হাসন রাজা, দেশে
দেশে বিয়া?"

কী প্রয়োজন ছিল নিজের জীবন, নিজের চরিত্র উদ্ঘাটিত করার? আর, এই একটিমাত্র গীত না, আরো বহু বহু জায়গায় তিনি নিজের দুর্বলতা নিয়ে মস্করা করে গান রচেছেন। এগুলো চেপে গেলেই পারতেন।

কিন্তু না, এই মাটির মানুষটি ছিল সত্যকাম, সত্যাশ্রয়ী॥

অদূরের দিল্লী

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না।

'স্ত্রীর পত্র' : রবীন্দ্রনাথ

মঙ্গলবার, ১২ই অগাস্ট। সুন্দর চেহারার বাঙালী একটি মহিলা নয়াদিল্লী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে—"ইন ক্যামেরা"—দু' লাইনের একটি লিখিত স্টেটমেন্ট দিলেন : '১৩ই জুন ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছায় আমি চলে গিয়েছিলাম। আর কিছুই আমার বলবার নেই।"

এই তো, শেষ পর্যন্ত সত্যই দেখা গেল ঘটনাটা এমন কিছুই কেলেঙ্কার নয়। অথচ এ নিয়ে বিগত প্রায় দেড় মাস ধরে দিল্লীর ঘরে ঘরে কি সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব গুলতানি-গুজবের রঙবেরঙ তুবড়িই না বইছিল! এখন দিব্যি সব মিটমাট। কে বলে দিল্লীতে ভালো খবর নেই?

গুজব নামক অশরীরী জনকাব্যের নাকি মাকড়সার মতন দশটা ঠ্যাং। আর সেই দশটা লিকলিকে ঠ্যাং-এ ভর করে কি অসম্ভব কাণ্ডটাই না বাধায় গুজব। গুজবে গুজবে এমনিতেই রাজধানী বারো মাস গুলজার। তার এখন তো সোনায় সোহাগা টইটই। ফুর ফুর করে, ভুর ভুর করে, ভক ভক করে গুজবের গুঞ্জন। অনুশো যাদুবলে গুজব মাত করে রেখেছে আসর। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে লেপ্টে দিচ্ছে গুজব। কেউ কেউ বলছেন—মায় ইন্দিরা গান্ধী, নিজ-লিঙ্গাপ্পা,—দিল্লীতে গুজবের জ্বালায় টিকে থাকবার জো নেই। তো কেউ বলছেন, যেমন সদ্য বিদেশ ফেরত অশোক মেহতা,—দিল্লীতে গুজবের এখন মরশুম পিরিয়ড। সাংঘাতিক সাংঘাতিক গুজব, যেমন, এই শুনলাম, 'আপনি নাকি কার চাকরি খেয়ে দিয়েছেন।' সত্যমিথ্যা, অভিসন্ধিহীন, অভিসন্ধিপূর্ণ কালো-সাদা যাবতীয় গুজবের হেডকোয়ার্টার্স আপাতত নিঃসন্দেহ নয়াদিল্লী। গুজব কোনো প্রকারে একটিবার চালু করে ছিটিয়ে দিলেই হলো। অতঃপর, ব্যস, দেখো মজা। অমনি গুজবে সওয়ার হবে ইন্দ্রপ্রস্থ। ডালপালা সমেত শেষ পর্যন্ত কোন কলেবরে কোন রঙ ধরে সেই গুজব যে কোন মুখে কিভাবে আবির্ভাব হবে তা দেবা ন জানন্তি। গুজব যে শুধু গুলবাজদের মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়ে তা কিন্তু নয়। নেহাত গোবেচারা ভালো মানুষের মুখেও। মন্ত্রী-দের নিয়ে ঢালাও গুজব। রাজনৈতিক দলের মাতব্বরদের নিয়ে চমৎকার গুজব। নেতাব্যক্তিদের নিয়ে হই হই গুজব। বিদেশী দূতাবাসগুলিকে নিয়ে গা রী-রী করা গুজব। শিল্পপতিদের নামে চোখে চড়ক-গাছ গুজব। সিনেমাওয়ালাদের নিয়ে চটকদার গুজব। সংবাদপত্র মালিকদের এবং সাংবাদিকদের নিয়ে মশলাদার গুজব। সত্যি বলতে কি, গুজবে গুজবে ছেয়ে ছেয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে গুলজার রাজধানী। এমন কি সাধারণ নগরবাসীকে নিয়েও সমবেত কণ্ঠে অন্তহীন চলছে গুজব। আর

দঃশে

এই মজার মজার গুজবগুলিও বুঝি অমর। এমন কি গুজবের ভেজালও নেই। বান্দু লোকও সেক্ষেত্রে ভৌতিক লোচন। একে নির্ভেজাল, তায় অমর।

তবে অন্তত অ-রাজনৈতিক একটি গুজবের কাছারিতে হঠাৎ করে মৃত্যু ঘটে গেল। "ইন ক্যামেরা" যে বঙ্গ ললনাটি ১২ই আগস্ট দুই লাইনের সব মিটমাট স্টেটমেন্টটি দিলেন তাঁকে ঘিরে দিল্লী গবেষণাক্ষেত্রে মাথামুণ্ডুহীন যে গুজবটি হিল্লীহিল্লী করে প্রায় দেড় মাস ধরে জীবিত ছিল সে গুজবের মৃত্যু এতদিনে অনিবার্য-ভাবে ঘটল।

এই মহিলা এবং ওঁর পরিবারটিকে নিয়েও গুজবটি যথানিয়মে মুখে মুখে রঙ পাচ্ছিল, সে গুজব পরিকল্পনানুযায়ী কলেবর ধারণ করছিল যখন যেমনটি মর্জি। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিত্য নতুন নতুন গবেষকদের দিক্‌নির্দেশ ছেপে বেরোচ্ছিল। এমন সময়, হায়, সবার সব থিওরিগুলোই ভণ্ডুল হয়ে গেল। দিল্লী পুলিশের কিন্তু বদনাম। কিন্তু এই গুজবটিকে হত্যা করার সম্পূর্ণ সাফল্য একমাত্র দিল্লী পুলিশেরই প্রাপ্য। যদিও এতে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। গুজবের এই মৃত্যুতে। কেন না গুজবের গন্ধ নাকি মিষ্টি মিষ্টি। মিষ্টি জিনিসের মৃত্যু অসহ্য।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

গত ১৩ই জুন দেখতে মিষ্টি মতন বাঙালী একটি বিবাহিতা মহিলাকে হঠাৎ আর কোথাও দেখা গেল না। তাঁর বাড়িতে না। রাস্তাঘাটে না। বাজারে সিনেমায় না। কোথাও না। বাঙালী মহিলাটির অবাঙালী স্বামী চাণক্যপুরী থানায় ডায়রী করলেন, তাঁর স্ত্রীকে সম্ভবত কেউ কিড্-ন্যাপ করেছে। হ্যাঁ, উনি সম্ভবত সমস্ত বন্ধুবান্ধবের বাসায় বাসায় খোঁজ নিয়ে দেখেছেন। হাসপাতালে খোঁজ করেছেন। কী হবে? তাঁর স্ত্রী কোথায়? কে বা কারা তাঁকে নিয়ে গায়েব হয়েছে?

সংগে সঙ্গে দিল্লী পুলিশ এলার্ট হয়ে গেল। বর্ডারে বর্ডারে এলার্ম চলে গেল। শহরময় তন্ন তন্ন করে মাল-হান্ট যাকে বলে তাই লাগিয়ে দিল। কেউ কেউ সন্দেহ করে বসল, ভদ্রমহিলা কিড্‌ন্যাপড হননি, খুন হয়েছেন। কিন্তু লাশ কই? লাশ?

অমনি পুলিশের কনফারেন্স বসল জরুরি। লাশ খোঁজাখুঁজি চলল। অন্তহীনভাবে।

না লাশ কোথাও পাওয়া গেল না।

তা হলে অবশ্য কেউ ভদ্রমহিলাকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গুম করেছে। কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই-কানপুর চতুর্দিকে ডজন-ডজন টেলিগ্রাম গেল। পুলিশ গেল। সি আই ডি গেল। হন্যে হয়ে তোলপাড় করে অনুসন্ধান কর্ম চালিয়ে গেল বহু-

নিন্দিত দিল্লী পুলিশ। যেন এই অনুসন্ধান ফলাফলের উপর নির্ভর করছে দিল্লী পুলিশের জান-মান-প্রাণ এবং সমস্ত প্রেসটীজ।

শহরময় নিত্য খুন-জখম চলছে। লাখপতি মরছে তো ডিপ্লোম্যাটও বেঘোরে মরছে, ভিখিরি মরছে তো কেরানী-বধূও মরছে। প্রায় কোনোটারই কোনো কুল-কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। এবার এই ভদ্রমহিলার বিষয়ে ও'রা একটা হেস্তনেস্ত করবেনই করবেন এমনই দৃঢ় সংকল্প দিল্লী পুলিশ ইনেসপেক্টর-জেনারেলের।

বাঙালী ভদ্রমহিলার নাম কল্পনা। ও'র স্বামী ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রন লীডার ভি আর নায়ডু।

পুলিশ ধরেফিরে স্কোয়াড্রন লীডার নায়ডুর কাছেই বার-বার আসে। ধওলা কুঁয়ায় তাঁর ফ্ল্যাট। ডিপ্লোম্যাটিক কলোনি চাণক্যপুরীর পাশে। পশ্ এলাকা ধওলা কুঁয়াতে থাকেন এয়ারফোর্সের অফিসাররা। এয়ার-ফোর্স অফিসার ভি আর নায়ডুর ফ্ল্যাটবাড়িটা ভারি সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো। তার প্রতিটি অংগে স্ত্রী কল্পনা নায়ডুর পরিচ্ছন্ন শ্রীময়তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। আঠারো বছর আগে বৈমানিক নায়ডু বাঙলাদেশের ব্যারাকপুরে পোস্টেড ছিলেন। সেই সুবর্ণ সময়ে কল্পনাকে উনি গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করেন। কল্পনার মা বাবা বর্তমানে বর্ধমানে থাকেন।

নায়ডুদের প্রথম সন্তান মেয়ে। মেয়েটির বয়স এখন প্রায় সতের। মেয়ের পরে ছেলে। সে পড়ে পাবলিক ইস্কুলে। সবচেয়ে বে ছোট তার নাম শেখর। বয়স দশ। মায়ের আঁচল-ধরা শেখর কেঁদে ভাসিয়ে দিল বাড়ি। মাকে না দেখে সে জলস্পর্শ নাকি করবে না।

অমন সুন্দর একটি পরিবারে কি না এই দুর্যোগ! এই ছন্নছাড়া অবস্থা? বাড়ি অন্ধকার। পাড়ার সবার মুখে এক কথা। দিল্লীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কল্পনা নায়ডুকে কেউ গায়েব করেছে। কেউ ও'কে খুন করেছে। কেউ ও'কে নিয়ে পালিয়েছে। কেউ ও'কে হত্যা করে লাশ গায়েব করেছে। কেউ...

স্কোয়াড্রন লীডার নায়ডু আপিস থেকে ছুটি নিয়ে, পাগল হয়ে যাবার যো। কী হলো, কী হবে, কে তাঁর সর্বনাশ করল, কে করল ও'দের সন্তানদের মাতৃহীন?

'আচ্ছা, আপনাদের কোনো অবনিবনা তো ছিল না?'

'না।'

'খুব ভেবে জবাব দিন, প্লীজ।'

'না, তেমন অবনি-বনা তো কই আমাদের ছিল না।'

'কোনো ফ্যামিলি কোয়ারল?'

'তেমন কিছুই বিশেষ ছিল না।'

আর দশজন পরিবারের মতনই সুখী-অসুখী নায়ডু পরিবার। পরিবারের সমস্ত ডিটেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করল দিল্লী পুলিস।

এদিকে শহরে কোথাও গুজবের হাত থেকে নগরবাসী কেউ নিস্কৃতি পেলেন না। কেউ বললেন, নির্ঘাত এ খুনের কেস। কেউ বললেন, না উনি কারোর সংগে পালিয়েছেন। কেউ বললেন, মেয়েদের আর বিশ্বাস কী।

আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারা দেশময় দিল্লী পুলিস অফিসররা খোঁজ নিলেন। কোনো গুজবকেই ও'রা এতটুকু অবহেলা করলেন না। করজোড়ে এ'কে-ও'কে-যাকে-তাকে-সবাইকে প্রশ্নাদি করে চললেন। কল্পনার সংগী-সাথী-স্বজন কেউ কোথাও বাদ পড়লেন না। আজ পর্যন্ত স্কোয়াড্রন লীডার নায়ডু যেখানে যেখানে পোস্টেড হয়েছেন সেখানে সেখানে এয়ার ফোর্স অফিসর মহলে মহলে তালাশ চলল। গুপ্ত অনুসন্ধান চলল। কেউ বাদ পড়ল না। দিল্লীর পুলিস তখন দশখান হয়ে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লেগেছে কল্পনাকে খুঁজে বের করবেই বলে। বর্ধমানে গেল পুলিস। না। কল্পনার মা বাবা ও'দের মেয়ের কোনো খবর পানান।

নায়ডুদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউই কোনোপ্রকার আলোকপাত করতে পারলেন না। ক্রমশ এই ধারণাই দৃঢ় হলো যে কল্পনাকে তাহলে কেউ হত্যা করে ও'র লাশকে সত্যিই গুম করে দিয়েছে। কিন্তু কল্পনাকে হত্যা? কেন হত্যা? উনি তো কারো সাতে-পাঁচে থাকবার মেয়ে ছিলেন না।

ওদিকে শেখর ছেলেটি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেঁদেকেটে অস্থির। ওর কাছেও ওর মায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিলেন পুলিস কর্তাব্যক্তিরা। যেদিন মা হারিয়ে যান সেদিন তখন শেখর বাড়িতে ছিল। দিদির সংগে খেলছিল বসবার ঘরে বসে। মা অন্য দিনকার মতন সেদিনও সকালে বাইরে গেলেন কেমিস্টের দোকানে। তাঁর পেট-ব্যথার ওষুধ কিনতে। মা যখন বাইরে যান তখন তাঁর যাওয়ার শব্দ পেয়েছিল শেখর। মেইন গেটটা মা বাইরে যাবার সময় বন্ধ করলেন সেই শব্দ। বাবা তখন অফিসে ডিউটিতে।

গুজবে গুজবে যখন শুধু ধওলা কুঁয়া-ই নয়, গোটা দিল্লীধাম অস্থির তখন একদিন খোঁজ পাওয়া গেল এয়ার ফোর্সের এক ভদ্রলোক কল্পনাকে সেই হারিয়ে যাওয়ার দিন গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন। পিচ-গলা রাস্তায় মিসেস কল্পনা নায়ডু সুটকেস হাতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। লিফট দিয়েছিলেন প্যাটেল চৌক অবধি। কল্পনা সেখানে নেমে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাবেন এই বলে—উনি তাঁকে চিনতেন না। আগে কখনো দেখেনও নি। তবে অফিসরটি এই লিফট দেবার পর স্থির করেছিলেন কোনো না কোনো সময় ক্লাবে কিংবা কোনো পার্টিতে ও'র সংগে পরিচিত হবেন।

এইভাবে গেল কেটে কয়েকটি সপ্তাহ। কোথাও কোনপ্রকার চিহ্ন নেই কল্পনার। নায়ডু মশাই যাকে বলে শুকিয়ে আধমরা হয়ে গেলেন দুশ্চিন্তায়। জানতে পর্যন্ত পারছেন না ও'র স্ত্রী জীবিতা না মৃতা। সর্বক্ষণ কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ কল্পনাকে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলেছে। খুন করে লাশটা যমুনার জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। শেখর শুধু ভেউ ভেউ করে কাঁদে আর শুধোয়,—বাপি, বাম্বল্-বী কখন ফিরবে?—কখন?

মাকে ও "বাম্বল-বী" বলে আদর করে ডাকত। মাকে সর্বক্ষণ ও দেখত মৌমাছির মতন গুন গুন করে কাজ করতে। মৌমাছি! দুটো ম অক্ষর দিয়ে মাকে মৌমাছি বলতে ওর খুউব ভালো লাগত। ছেলেটি দেখতে ভারী স্মার্ট এবং সুশ্রী, গোলগাল মুখ। তেমনি মেধাবী। না: আর তেমন বাংলা ভাষাটা জানে কই? দিদিও তেমন জানে না।

দিল্লীর প্রতিটি কাগজের সম্পাদককে একদিন শেখর একটি চিঠি লিখল মায়ের উদ্দেশে। মা কাগজ পড়েন। মা শেখরের সেই চিঠি পড়বেন। শেখর খুব ধরে ধরে লিখল,—আমার সোনা মা, বাম্বল-বী, লক্ষ্মীটি, তুমি এসো...

কাগজে কাগজে তখুনি শেখরের চিঠি

ছেপে বেরুল প্রথম পৃষ্ঠায়। শেখরের মায়ের ছবিও বেরিয়ে গেছে প্রথম পাতায়। মায়ের ছবি কাগজে। মা এখুনি ফিরবেন।

স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী কল্পনা নায়ডু। ভরাট যৌবন। কমনীয়তা মাখা হাসি হাসি ঠোঁটের মুখ। একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। চোখে গগল্স।

কল্পনার পেটে কিরকম একটা ব্যথা ছিল। তাই ওষুধ খেতেন তিনি নিয়ম করে। আসফ আলী রোডে সেই কেমিস্টের দোকান। যেখান থেকে কল্পনা ওষুধ কিনতেন। দওলা কুঁয়া থেকে বেশ খানিক দূরে পুরোনো দিল্লীর গা লাগা। কেমিস্ট বললেন, সেদিন মিসেস নায়ডু ওঁদের দোকানে আসেন নি। তাহলে প্যাটেল চৌকের পর কি হলো? তারপর?

এদিকে দিল্লীময় গুজব। কেউ বলেন [illegible] কোনো অফিসারই কল্পনাকে [illegible] লুকিয়ে রেখেছেন। কেউ বলেন [illegible] অন্য কত কিছু, যা ছাপালে [illegible] না। পুলিসের কর্তারা তো [illegible] দিল্লীতে [illegible] একটি [illegible] তারপর তাকে [illegible] সমস্ত সাধ [illegible]

[illegible] নায়ডুর তো পাগল [illegible] শেখরকে [illegible] স্কুলে পাঠাতে লাগলেন। ইস্কুলের [illegible] শেখরকে কেমন যেন এড়িয়ে চলে [illegible] দেখে।

[illegible] প্রতিদিন, একটি [illegible] রাজধানীর প্রতিটি সংবাদপত্র, ইংরেজী হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবি সিন্ধী [illegible] সমানে খবর ছেপে গেল,—মিসেস কল্পনা নায়ডুর এখনো খোঁজ নেই। সংবাদপত্রের এই সমবেদনা, এই সহযোগিতা সরকারী আকাশবাণীকে কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো দিন স্পর্শ করেনি। ওঁদের ব্যাপার বুঝি আলাদা।

চল্লিশ দিন পরেও সংবাদপত্রের খবর : মিসেস কল্পনা নায়ডুর খোঁজখবর এখনো পাওয়া যায়নি।

এরপর, ঘটনার চল্লিশ দিনের পর, দিল্লী-বাসী ক্রমশ কল্পনা নায়ডুকে ভুলে যেতে লাগল। একটি তো মাত্র নাম। তা আর কদ্দিন মনে রাখা যায়!

কিন্তু পুলিস কর্মচারীরা সেই নামের মহিলাটিকে সমানে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। প্রতিটি থানায় চলে গেছে কল্পনার ছবি। ছবি গেছে এলাহাবাদে। কলকাতায়। ব্যারাকপুরে। বর্ধমানে। ছবি গেছে মাদরাজে। বাঙালোরে।

পাঁচই অগাস্টের সংবাদ : মিসেস কল্পনা নায়ডুকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকারী রেডিওর সংবাদ নয়। সংবাদপত্রের সংবাদ।

পুলিসের তো লজ্জা নেই। নইলে মাথা নীচু করে চলত ওরা। দিল্লীর কফি হাউস-গুলোয়, পশ্ রেস্তরাঁগুলিতে চুটিয়ে খুব আড্ডা জমল।

তারপরের দিনটা ছিল বুধবার। ৬ই অগাস্ট। দুপুর না ফুরোতে সমস্ত শহরের সহসা গম গম করে একটি সংবাদ ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল,—কল্পনা জীবিত। তাঁকে এলাহাবাদে পুলিস দেখেছে। দেখে তাঁর পিছু পিছু গিয়ে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করেছে।

দিল্লী পুলিস সেদিনও এলাহাবাদে কল্পনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এলাহাবাদে এয়ারফোর্সের জনৈক অফিসারের স্ত্রী কল্পনাকে একদিন রাস্তায় দেখে হতভম্ব। এগিয়ে এসে নমস্কার করে তিনি বলে-ছিলেন, 'হ্যালো মিসেস নায়ডু। ভাল তো?'

এয়ারফোর্সের মারফত আগেভাগে তিনি জানতেন মিসেস কল্পনা নায়ডু নিখোঁজ।

'আমি মিসেস নায়ডু নই।' এই বলে সেদিন অশান্তচিত্ত কল্পনা পিছু ফিরে সোজা ভিন্ন পথে চলে যান। এয়ারফোর্স অফিসারের স্ত্রী তো বেকুব বনবার মহিলা নন। নায়ডুরা তো এই এলাহাবাদে বছর দুয়েক ওঁদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। অথচ এখন কল্পনা বলছেন উনি নন তিনি। তা উনি শুনবেন কেন! খবরটা তখুনি তিনি ওঁর বৈমানিক স্বামীকে দিলেন। তিনি দিল্লীকে করলেন কনট্যাক্ট।

তখন পত্রপাঠ ছুটেছিল দিল্লী পুলিস এলাহাবাদে। সাক্ষাতও ঘটে গেল কল্পনার সঙ্গে রাস্তায়। কল্পনা যাচ্ছিলেন কেমিস্টের দোকানে। বাজারে। পুলিস অফিসার সবিনয়ে পথ রুখে দাঁড়ালেন।

পুলিসকে কল্পনা বলেছেন, একেবারে সে-শহর ঘুরেটুরে দু-সপ্তাহ আগে তিনি এলাহাবাদে এসেছেন।

ছিলেন একজন বৃদ্ধার পেয়িং গেস্ট হয়ে।

অতঃপর এলাহাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। ম্যাজিস্ট্রেট যথা-রীতি ওঁকে প্রশ্নাদি করলেন। কল্পনা বললেন, ওঁর স্বামী এলাহাবাদে এসে ওঁর যা বলবার তা বলবেন। এবং ওঁর স্বামীকে যেন অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেওয়া হয় তিনি যেন ওঁদের কোনো ছেলেমেয়েকে না নিয়ে এলাহাবাদে আসেন।

সেই দিনই স্কোয়াড্রন লীডার নায়ডু এলাহাবাদে এলেন। একা।

স্বামী-স্ত্রী, নায়ডু দম্পতি, এখন স্বগৃহে দিল্লীতে। ঘরে ঘরে আবার আলো বাতাস। বাম্বল-বীকে সব সময় ঘিরে রয়েছে ওঁদের দশ বছরের শিশু-সন্তান শেখর—'বাম্বল-বী, আর কিন্তু তুমি কোথাও যাবে না মা...'

সব মিটলে বৈমানিক নায়ডু বলেছেন, চলে যাবার আগে মিসেস কল্পনা নায়ডু একটি পত্র লিখে রেখে গিয়েছিলেন ওঁর উদ্দেশে। বাড়ির এই লণ্ডভণ্ড শোকাকুল অবস্থায় পত্রটি এতদিন ওঁর নজরে কেন যে পড়েনি!

অথচ গুজবে গুজবে ব্যাপারটা কোথায় যে-জায়গায়, কোন্ তুঙ্গে গিয়ে এক অসম্ভব স্তরে পৌঁছেছিল। নায়ডুমশাইকে কল্পনা দেবী চিঠিতে কি লিখে বিদায় নিতে চাচ্ছিলেন তা নিশ্চয়ই কোনো দাম্পত্য-কাহিনী। এবং তাতে আড়িপাতা নিষ্প্রয়োজন। তবে একদিন না একদিন কল্পনাকে আমি বলবোই বলব, 'রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'স্ত্রীর পত্র' কাহিনী লিখেছিলেন, সে দিন তো আর এখন একদম নেই। কারো আড়ালের অন্ধকারে কাউকে আর কেউ আজ-কাল ঢেকে রাখতে পারেন না। [illegible] বাস্তবিকই পুরোনো একটি ঠাট্টা। [illegible] আশ্রমে আশ্রয় নিতে যাওয়াটাও অতি প্রাচীন একটা পথ।'

এই কৌটোতে কী আছে?

সৌন্দর্যসুষমাময় ত্বকের রহস্য!

ত্বক সাধারণত দুরকমের হয়। এক হ'ল স্বভাবজাত সৌন্দর্যময় ত্বক, একটানা অম্লান থাকে যার সুষমা। অন্যটি ঠিক-তত-সুন্দর-নয় শ্রেণীর এবং এই ত্বকের সৌন্দর্যসুষমা ক্রমশ আরো বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। নিভিয়া ক্রীম বিশেষ করে উভয় শ্রেণীর উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। নিভিয়াতে রয়েছে আশ্চর্য ইউসেরাইট, একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা আপনার দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ জোগায় এবং তাকে কোমল ও লাবণ্যময় করে তোলে। আপনি যদি রূপবতী হন, তাহলে নিভিয়া আপনার ত্বককে মসৃণ ও তারুণ্যমণ্ডিত রাখবে। যদি আপনার ত্বক হয় শুষ্ক ও রুক্ষ, নিভিয়া সেই শুষ্কতাকে দূর করে আপনার দেহত্বককে আরো সুস্থ, কোমল ও লাবণ্যময় করে তুলবে। আপনার দেহত্বক যেমনই হোক না কেন, নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করুন।

নিভিয়া –তারুণ্যমণ্ডিত লাবণ্যময় দেহত্বকের গোপনকথা!

স্মিথ ও নেফিউ-র তৈরী

JLM 151 BN

কুড়ি

লোকটা বলেছিল—'জানি'। কী জানে লোকটা? রাত আটটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে নেমে বিভু ভিড়ের মধ্যে লোকটার পিছু নেয়। লোকটার ডান হাতে সুটকেস, বাঁ বগলে শতরঞ্চিতে বাঁধা ছোট বিছানা—মফস্বলীর মতো হাবভাব। কিন্তু ও কিছু একটা জানে। নিশ্চিত। গত কাল থেকেই বিভুর মন ভাল নেই। মানুষ কত সহজেই টুক করে মরে যায়! এই তো একটু আগে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল একটা লোক—এই লম্বা লোকটা গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল, কয়েক পলক এই লোকটার দিকে চেয়ে কাটা-পড়া মানুষটা মরে গেল। কী সহজ ব্যাপার! গতকাল আর একটা লোক ঠিক ওরকমই সহজভাবে মারা গেছে দুর্গাপুরে। ইউনিয়নের সেই লোকটা কীরকম ছিল কে জানে। বিভু তাকে চেনেও না। লোকটা সকালের শিফটে ডিউটিতে যাচ্ছিল—অল্প কুয়াশায় আবছা মাঠের ভিতর দিয়ে, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার আর একটা থলে হাতে চলে আসছিল সে—সদ্য ঘুমভাঙা চোখে তখনো বোধ হয় বউ কি বাচ্চার মুখখানা ভাসছিল তার। অতশত জানে না বিভু, সে কেবল লোকটিকে আসতে দেখেছিল। লোকটা থেমে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল—বিভু হাতে-বাঁধা বোমাটা টপকে দিয়ে দৌড় দিল। রেল লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল জীপ, গাড়িটা তাকে তুলে নিল। জীপ গাড়িতেই টাকার লেন দেন হয়ে গেছে। এখন পকেট গরম, বিভু ফিরছে কলকাতায়। কিন্তু তবু গতকাল থেকেই তার মন ভাল নেই। দুনিয়াভর এত মানুষ, তার মধ্যে দু' একজন মরে গেলে কী হয়। কিছুই না, তেমন কিছুই হয় না। এই যে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল লোকটা তার জন্য কী হয়েছে। ট্রেনটা আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট দেরীতে এসেছে—তার বেশী কিছুই হয়নি। কামরার মধ্যে মানুষেরা 'আহা, উহু' করছিল বটে, কিন্তু দুঃখের চেয়েও তারা বিরক্তই হচ্ছিল বেশী ট্রেনটা লেট হচ্ছে বলে। কেবল ওই লম্বা লোকটা—যার হাতে টিনের সুটকেস, বগলে বিছানা—কেবল ঐ লোকটাকেই অন্যরকম দেখেছিল বিভু। কাটা ছেঁড়া থাঁতলানো হয়ে যাওয়া মানুষটাকে বুকে জাপটে ধরেছিল। বিভুর মনে ভাল লাগেনি। অত আদরের কী আছে? পৃথিবীর দু'চারজন লোক কমে গেলে ক্ষতি কী? কালকের ইউনিয়নের সেই লোকটাই বিভুর প্রথম 'কেস' নয়। এর আগে আর একজন তার হাতে গেছে কলকাতায়। দুবারই দুই ঘটনার সময়ে বিভুর একটা অদ্ভুত দৃশ্য মনে পড়েছিল। অনেকদিন আগে দেশের বাড়িতে বাবা ক্ষেতের কাজ করতে যেত। বেলাশেষে তার জন্য ভাত বয়ে নিয়ে যেত বিভু। একদিন ভাত দিয়ে ফেরার সময়ে আলপথে খেলতে খেলতে অন্যমনে ফিরছিল বিভু। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ভীষণ চিৎকার করে ডাকল—ভাই রে-এ। পিছন ফিরে সে দেখল একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে বলছে—ভাই রে, তুই এঁকেবেঁকে ছোট, এঁকে বেঁকে ছোট... আর তখন বিভু দেখতে পেয়েছিল চষা জমির ওপর দিয়ে তার পিছু নিয়েছে কাল-কেউটে... বিভু ছুটেছিল। আর তার ছায়ায় ছোবল মারতে মারতে পিছু পিছু সাপটা। 'ভয় নাই রে, এসে গেছি...' বলতে বলতে মাঠটা কোণাকুণি পার হয়ে এল সেই মুসলমান লোকটা, লম্বা লাঠির এক ঘায়ে সাপটাকে নিশ্চল করে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সাপটাকে বলল—আর একটু হলিই আমার ভাইটারে খেয়েছিলি শালা...। অনেকদিন আগের সেই ঘটনা। তবু দুবারই বিভুর সেই দৃশ্যটা মনে পড়েছে। চষা, নিষ্ফলা জমির ওপারে উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ বেলার ম্লান আলোয় ছায়ার মতো একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে ধরে তাকে চেঁচিয়ে বলছে—ভাই রে, তুই এঁকে বেঁকে ছোট, এঁকেবেঁকে ছোট... বিভুর মন ভাল লাগে না। গতকাল সকাল বেলা লোকটাকে বোমা মেরে যখন জীপগাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে বিভু তখনও হুবহু সেই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল—নিস্তেজ বিকেল তার পিছু নেওয়া সেই সাপ, দূরে আলের ওপর দাঁড়ানো সেই লাঠিহাতে মুসলমান লোকটা চেঁচিয়ে বলছে, ভাই—রে-এ-এ—

এই লম্বা চেহারার লোকটা বলেছিল—'জানি'। কী জানে ও? কেমন করে জানে?

হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড হলঘর আর চাতাল পার হয়ে সিঁড়িতে পা দেওয়ার

রমেন সে সিগারেট থেকে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে স্পর্শ করল।

রমেন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা।

—কোনদিকে যাবেন? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

রমেন মৃদু স্বরে বলে—আনোয়ার শা রোড।

—আমিও ঐ দিকেই। ট্যাক্সি নেবো, আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

না, বিভু আনোয়ার শা রোডের দিকে যাবে না, সে যাবে বেহালা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে বরং ঘুরপথে লোকটাকে আনোয়ার শা রোডে নামিয়ে দিয়েই যাবে। জানা দরকার এ লোকটা কী জানে! কতটুকু জানে!

রমেন হাসল, তারপর মাথা নেড়ে জানাল—যাবে।

ট্যাক্সিতে ছেলেটা রমেনকে সিগারেট দিল। দু একটা মামুলী কথা বার্তা বলল। তারপর চুপ করে রইল।

বাইরে কলকাতা। আরো পুরোনো আরো ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। যেন প্রাণপণে রুজ-পাউডার মেখে আছে এক বুড়ী টাঁশ মেম। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে মুড়িকরে নিয়েছে বাজার করার চটের থলে। মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে ট্রাফিকের সুন্দর হলদে বাতিটি। বিধাতার মতো আত্মবিশ্বাসে হাত বাড়ায় মোড়ের পুলিস। মতলববাজ মানুষের চোখ জোনাকিপোকার মতো জ্বলে উঠেই ভিড়ের মধ্যে নিবে যায়।

রমেন বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

ছেলেটা তার দিকে একটু ঝুঁকে বলল—আমার চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায়?

রমেন একটু নড়ল। তারপর তার স্বচ্ছ সুন্দর মুখখানা ফেরাল ছেলেটির দিকে, নরম গলায় বলল—চেহারায় মানুষের কর্মের কিছু কিছু ছাপ থাকে।

—আমার আছে?

রমেন মাথা নাড়ল—আছে।

আছে। তবে আছে। অধৈর্য বিভু সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে দেয়। তার চেহারায় ছাপ পড়ে গেছে। আসলে এ সবের জন্য দায়ী একটি মেয়ে। মৃদুলা। দেখতে এমন কিছু সুন্দর ছিল না। রঙ ময়লা, গালে এক আধটা ব্রণ, নাক ভোঁতা। তবু কী যে টান ছিল তার। বিভু কথা বলতে পারেনি কোনোদিন, তার বুক কাঁপতো। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মৃদুলার বাপ জাত দেখাল। তারপর সরিয়ে নিয়ে গেল মৃদুলাকে কোথায়! তার হাতের বাইরে। আক্রোশে বিভুর সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে, মাথায় রক্ত উঠে আসে ছল ছল করে। তার কাছে মানুষের মূল্য কমে যায়। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে, তার মধ্যে সে একজন সামান্য মৃদুলাকে চেয়েছিল—যার নাক ভোঁতা, গালে ব্রণ, রঙ ময়লা। সে ঐ ব্রণগুলিতে আদরের হাত বুলিয়ে দিত, ঠোঁট ছোঁয়াতো চাপা নাকটিতে, নিজের গায়ে মেখে নিত ওর ময়লা রঙ। কত কথা মৃদুলাকে বলবার জন্য মনে মনে তৈরী করেছিল সে! যখন একমাত্র মৃদুলাকেই চায় সে, তখন একমাত্র সেই মৃদুলাকেই পাচার করে দেওয়া হল অন্য জায়গায়। সে জানে মাস দেড়েক আগে মৃদুলার বিয়ে হয়ে গেছে। তাকে পাত্তা দিল না মেয়েটা। ঠিক আছে। তবে এবার পাত্তা দাও বিভুকে, পৃথিবীর মানুষ। বুটের লাথি খেয়ে পাত্তা দাও, ছোরা খেয়ে ঢলে পড়তে পড়তে, আচমকা বোমা খেয়ে উড়ে যেতে যেতে...। দেখ হে, আমি বিভু—বিভু মাস্তান। বাপের সুপুত্র। কোথায় যাবে মৃদুলা? একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে। বিভু জানে।

খ্যাপাটে চোখে বিভু তার দিকে তাকাল—কিসের ছাপ পড়েছে আমার চেহারায়?

হাত বাড়িয়ে রমেন তার হাতখানা ধরল। ম্লান মুখে বলল—আপনি তো জানেন।

বিভু হাত টেনে নেয়—কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? ওস্তাদের মতো বললেন—জানি। কী জানেন আপনি? আপনি কি জ্যোতিষ?

রমেন মাথা নাড়ল—না।

—তবে? বিভু বিহ্বলভাবে চারদিকে চায়, বলে—আপনি তবে কোথাও আমাকে দেখেছেন! কোথায়?

একটি কিংবা দুটি খুন করার পর মানুষের চোখ স্থির হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখায় শান্ত, কিন্তু আসলে তা শান্ত নয়। তখন চোখের পাতায় একটা গাঢ় ছায়া পড়ে চোখের মণিতে। রমেন তা জানে। কিন্তু কী করে তা বলবে রমেন, অত আন্দাজী কিছু বলা যায়!

রমেন একটু কাশল, তারপর মুঠিতের [illegible] কথাটা—না, আপনাকে এর আগে কোথাও দেখিনি। তবে আপনার চেহারা দেখে মনে হয় সম্প্রতি আপনার কোনো আপনজন মারা গেছেন।

মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় বিচ্চু, হঠকারীর মতো বলে ফেলে—না, না, তারা কেউ আমার আপনজন ছিল না। আমি তাদের চিনতামই না—

রমেন বুঝতে পারে ছেলেটা প্রকৃতিস্থ নেই। সে ধরিতে ওর হাত নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলে—ঠিক আছে, আমি বুঝেছি। ইঙ্গিতে ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলে—ও শুনতে পাবে; চুপ করুন...

বিচ্চু হকচকিয়ে চুপ করে যায়। তারপর চুপ করে থাকে।
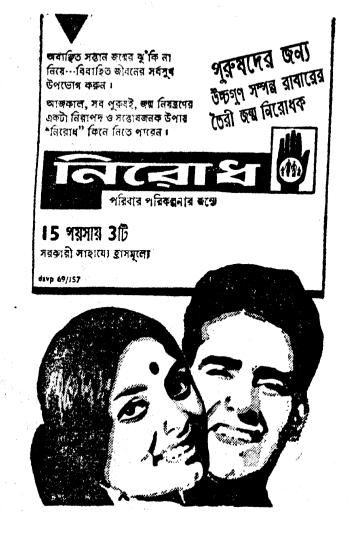
রমেন ওর হাতে হাত বুলিয়ে দেয় তারপর খুব মৃদু গলায় বলে—কে বলল যে, তারা আপনার আপনজন ছিল না?

আর কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। বিচ্চু সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আর ওর হাতখানা কোলে নিয়ে বসে রইল রমেন।

অনেক দিন আগে, রমেনের বয়স যখন দশ-এগারো, তখন যুদ্ধ চলছে। তাদের তিনটে বন্দুক তখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তাই সেই বয়সেই তাড়াতাড়ি বন্দুক শেখানোর জন্য তাদের পুরোনো চাকর উদ্ধব আর ড্রাইভার আশু তাকে নিয়ে গেল কেওটখালির মাঠে। দূরে রাখল তিনপায়া একটা ব্ল্যাক বোর্ড, তাতে দুটো বৃত্ত আঁকল, তারপর তার হাতে তুলে দিল কারুকার্যকরা ভারী বন্দুকখানা। বলল—মারো, মাঝখানের গোল্লাটায় মারো। রমেন মেরেছিল, ভীষণ শব্দে প্রথমবার হাত থেকে প্রায় ছিটকে গেল বন্দুকখানা, গুলিটা কোথাও লাগেনি—উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কয়েকবারের চেষ্টাতেই সে ঠিক মাঝখানের বৃত্তটাকে ফুটো করে দিল। উদ্ধব বলল—আর জন্মে তুমি অর্জুন ছিলে। তারপর বন্দুক চালানো নেশার মতো পেয়ে বসল তাকে। উদ্ধব দ্রোণাচার্যের মতো বোর্ডে পাখি এঁকে চোখ বসিয়ে বলত—চোখে মারো তো। রমেন মারত। যখন এই ভীষণ নেশা তাকে প্রতিদিন বিকেল বেলা ঘর ছেড়ে বন্দুক হাতে বেরোনোর জন্য অস্থির করে তুলত, সেই সময়ে একদিন বন্দুকগুলো জমা পড়ে গেল। সন্ধেবেলা ভীষণ দুঃখে দাদুর ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল রমেন, দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—এ তো ভালই হল। এর পরে একদিন তোমাকে দেখলে অবোধ জন্তুরা ভয় পেতো। রমেন

চেয়েছো। [illegible] পর এক সময়ে হাসল, মৃদু স্বরে [illegible] বলল—তুমিই আমার আপন।

সে কথাটার অর্থ রমেন এখন খানিকটা বোঝে। এই যে অচেনা ছেলেটা তার পাশে বসে আছে এর কোলাহলে ব্যাগের মধ্যে হয়তো রয়েছে হাতে বাঁধা বোমা, ভাসপেটের কাছে লুকোনো ছোরা—তবু কত নিরস্ত্র, অসহায় দেখাচ্ছে একে! এ জানে না অস্ত্রের ব্যবহার, কিংবা প্রকৃত অস্ত্র কাকে বলে। একদিন এ নিজের হাতে মারা যাবে।

রমেন বড় মায়ায় ছেলেটির হাতে হাত বুলোয়।

আনোয়ার শা রোডের মুখে ট্যাক্সি থেকে নেমে জানালা দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল রমেন—আবার কোনোদিন দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই...

—আচ্ছা...ছেলেটা হাত তুলল।

ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিল ট্যাক্সিওয়ালা।

ললিতের শরীর ভাল ছিল না। তার চেয়েও খারাপ ছিল তার মন। সারা বিকেল ঘরে কী যে সব হয়ে গেল।

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল ললিত।

শম্ভু এসে দরজার মুখ বাড়িয়ে বলল—ললিতদা, আপনাকে একজন খুঁজছে।

বিরক্তির সঙ্গে উঠল ললিত।

গলির মুখে এসে দেখল আবছায়ায় একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সুটকেস আর বিছানা।

—কে?

—ললিত, আমি রে, আমি রমেন। তোর কাছে এলাম।

হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল ললিতের বুক। কতকাল...কতকাল দূরে থেকে তার কাছে কেউ আসেনি।

—রমেন! দু' হাত বাড়িয়ে ললিত বলল—আয়।

(ক্রমশ)

॥ ৭ ॥

মণীশের মা

রবিবারের নিঝ্‌ঝুম, নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ। পাশের বাড়ি থেকে সরু গলির গুমোট হাওয়ায় আমার কানে ভেসে আসছে মণীশের মা-র কণ্ঠস্বর :

"ভুলে যেও না যেন...শিয়ালদার ট্রাম ধ'রে গোমেস লেনের স্টপে নেমে ওই ডান দিকের যে বড় বাড়ি আছে—যেটাকে তোমাকে কাল দেখিয়েছিলাম—ঐ বাড়িরই দোতলায়।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মণীশের মা মণীশের চুল আঁচড়াচ্ছিলেন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। আয়নার মধ্যে দেখছিল মণীশ মণীশের মা-র প্রতিচ্ছবি—তাঁর অবসন্ন দেহকান্তি, চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা।

ভাবতে লাগল মণীশ। ভাবতে লাগল, তবু বুঝতে পারল না। মণীশের সেই মা কোথায়? রোজই শোনাতেন দেশ-বিদেশের গল্প, রোজই শেখাতেন দেশ-বিদেশের গান, কোথায়...কোথায় গেছেন মণীশের সেই মা? সিঁথিতে ফ্যাকাশে সিঁদুরের দাগ, রুগ্ন কব্জিতে ঝুলে-পড়া লোহার বালা, আর... কবে থেকে পরেছেন মা এই বজ্রকাঠিন্যের মুখোশ? মাকে আর চেনা যাচ্ছে না, মা-র আর কিছুই চেনা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, সেই শাড়ি, সেই ডিজাইন-কাটা সবুজ শাড়িটাই শুধু—মায়ের জন্মদিনে বাবার উপহার।

দু'মাস তিনদিন

আগে ওরকম ছিল না কিন্তু; আগে ওরকম কোনোদিনই হয়নি...হ্যাঁ, বাবা চলে না যাওয়া পর্যন্ত। বাবা চলে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও বোঝেনি মণীশ ওই সর্বদা-ব্যস্ত, সব-সময়-খাতা-ফাইলে-নিমগ্ন বাবার উপস্থিতির মূল্য।

মণীশের বুলবুল যেদিন মারা গিয়েছিল, হ্যাঁ সেই দিনের মতো বাড়ি এখন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নতুন বুলবুল এসেছে মণীশের পড়ার ঘরটিকে মুখরিত করতে, কিন্তু কই...বাবাকে কি আর আনা যায়?

মণীশের মা মণীশের চুল আঁচড়াচ্ছিলেন

আজ হল দু'মাস তিন দিন...আর ঠিক সেই সময় থেকে মণীশের মা...

"একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও না...এত কি ছটফট করে..." মণীশের মা-র গলা কর্কশ, অনাবশ্যক কর্কশ শোনাচ্ছে কাঁচা মণীশের কানে। ছেলেটি বলতে চাইল কিছু, যা-হোক কিছু, মিষ্টি কিছু, শুধু মায়ের মুখের কোণে বিগত দিনের সেই স্মিত হাসি ফোটাবার আশায়। বৃথা চেষ্টা... আর মণীশ যখন হাত বাড়াল মায়ের হাতের স্পর্শের খোঁজে, মা তখনই হাত সরিয়ে, প্রসাধন-বাক্‌সে চিরুনি রেখে শুধু বললেন, "আচ্ছা, সময় হয়েছে, যাও এখন...। আর ভুলে যেও না : শিয়ালদার ট্রাম ধরে..."

"আমার সঙ্গে যাবে না?...তোমার হয়ে বাবাকে কি বলব, মা?"

"যাও, বলছি...সন্ধ্যাবেলা ওদের ঝি তোমাকে আবার এখানে নিয়ে আসবে 'খন।"

শিয়ালদার ট্রামে

ওদের ঝি...বাবাদের ঝি...গোমেস লেনের ডান দিকের বড় বাড়ির দোতলার ঝি। কলচালিতের মতো মণীশ উঠল শিয়ালদার ট্রামে, বসল লেডিজ সীটে—বসত যেমন বসতেন যখন মা তার কাছে। আজ কিন্তু মণীশ একা...একাই যাচ্ছে মায়ের বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে।

কিন্তু কেন?...কেন?...মণীশ ভেবেছে খুব, ভেবেছে ক্লাসরুমে, ভেবেছে শোবার ঘরে। বোঝে নি মোটেই। বোঝে নি কেন এত দিন পর, এত সুখের এত দিনের পর...। প্রশ্ন করতে চেয়েছিল হারু চাকরকে; পারল না। মাকেই তো প্রশ্ন করেছিল সেদিন; উত্তর পায় নি। আজ বাবাকে জিজ্ঞেস করবে।

স্কুলের বড় বড় ছেলেরা ওকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে কি সব কথা বলে। আর মা সেদিন মিসেস দাসকে চুপিচুপি কি বলেছিলেন..."ওরা আমার স্বামীর ওখানে ছেলেটিকে পাঠাতে বলেছে প্রতি রোববার বিকেল বেলা।" ওরা কে?...আর কেনই বা পাঠাতে বলেছে? কেন বলে নি বাবাকে ফিরিয়ে আনতে? কেন বলে নি বাবাকে মায়ের সঙ্গে আবার ভাব করতে?

ঝগড়া হয়েছে, রাগ হয়েছে দুজনের মধ্যে ...হলেই বা! মণীশও তো ঢের করেছে আড়ি, ঢের করেছে কথা-বন্ধ স্কুলের কত ছেলে, পাড়ার কত ছেলের সঙ্গে। টিকেছে কত দিন? আড়ি তো ভাবেরই পূর্বাভাষ। কিন্তু বাবা-মা?...আজকে নিয়ে হল দু'মাস তিনদিন।

প্রতি রোববার বিকেলে

কালকে ওদের চাকর বাবার কাপড়-চোপড় আর সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে; শুধু নিয়ে যায় নি চটিজুতো। একদিন আবার আসবে বোধ হয় লোকটি বাবার চটিজুতোর জন্যে। মণীশ দেখেছে, স্বচক্ষে দেখেছে বাবা-মায়ের শোবার ঘরের আলমারির এক পুরো ড্রয়ার খালি।

বাবার আরাম-কেদারায় এই দু মাস তিন দিনই. কেউই বসে নি—পুসি বেড়াল ছাড়া; রেডিও কেউ বাজায় নি। খাওয়ার ঘরের এক কোণে এক গাদা স্টেট্‌সম্যান, কেউ খোলে নি এই দু মাস তিনদিন। বাবা কি সত্যি সত্যি আর আসবেন না? বসবেন না আর সেই আরাম-কেদারায়, বাজাবেন না রেডিও, পড়বেন না স্টেট্‌সম্যান মণীশদের বাড়িতে? মণীশের বাবা কি আর কোনো দিন আসবেন না মণীশের মা-র কাছে?

লেডিজ সীট ছেড়ে উঠে নামল মণীশ ঐ গোমেস লেনের মোড়ে, পা বাড়াল—মায়ের আদেশ মতো—বাবার বাড়ির অভিমুখে।

এমন যাবে প্রতি রোববার; আর জানবে না—কেন।

এ বড় অভাবনীয় আকাশ। মেঘ নেই। রোদ মনে করিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ ভারতের বসন্তোত্তর উষ্ণতাকে। লংকাজবার মতো মাথা উঁচিয়ে আছে সামনের বাড়ির ছাদে মুড়ে রাখা লাল টুকটুকে ছাতা। আলতা-রঙা, কমলা বা ফিকে গোলাপীর সমারোহ। এ বড় বিরল দৃশ্য। পথে-ঘাটে ছ'শ ছত্রিশ জাতের টুরিস্ট : সুপুরি গাছের মতো ঝাড়ালো, পাম্পাদপের মতো সজীব, শরতের কাশফুলের মতো কেশ-ভারাক্রান্ত উত্তুরে মেয়েরা; পিকাসোর ছবির মতো স্ফূর্ত, স্বচ্ছ নয়না, প্রাণোচ্ছল দক্ষিণী কন্যারা; স্নিগ্ধশ্যাম অবয়বে অকুণ্ঠ ক্লিওপেত্রার মহিমামণ্ডিত কৃষ্ণ মহাদেশের দুহিতারা; একপুরে, ধুলো-পড়া সর্ষে ফুলের ক্ষেতভরা অথবা সামান্য নিষ্প্রভ গজদন্ত-বরণা মালয়েশীয় জনপদ-বধূরা; চকিতচরণা নিপ্পন-বালারা; অতি-প্রসাধনে উগ্র মার্কিন মহিলারা সকলেই এই পণ্য-তীর্থে সমবেত হয়েছেন; কেন, জানিনে; কে ডেকেছে, জানিনে। জানি শুধু—এ বড় মন্দা শোভা।

রবি ঠাকুরের মতে, পুরাকালে রাজারা দিগ্বিজয়ে বার হতেন শরৎকালে। আকাশের এই শারদ প্রসন্ন চেহারা দেখে দিগ্বীক্ষণে মুগ্ধ মন আমার কি করি কি করি ভাবছে, এমন সময় জাতীয় শিক্ষা-দপ্তর পরিচালিত সংস্থার নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম—লোয়ার নদীর বাঁকে বাঁকে ফরাসী রাজতন্ত্রের সভ্যতার যে স্বাক্ষর মাথা উঁচিয়ে আছে বেশ কিছু দুর্গের রূপ নিয়ে, আমাদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ অপনোদন করতে পারে তারা। ইস্টারের সাত সপ্তাহ পরে পাঁৎকোত উৎসব; যার দরুন তিন দিনের একটানা ছুটি পাচ্ছে শ্রীমান টোগো; দুজনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সুযোগে বড় একটা চক্কর মেরে আসা যাবে ইতিহাসের অন্দর-মহলে। ইতিপূর্বে আমি দু'বার ওই অঞ্চলে ঘুরে এলেও টোগোর কপালে এই প্রথম শারদ অভিযান।

ফলত মাতৃনাম স্মরণ করে নির্দিষ্ট শনিবার সকাল পৌনে আটটায় আমরা চেপে বসলাম ভাড়া করা টুরিস্ট ডি-লাক্স বাসে। আমাদের দেখ-ভালের কর্ত্রী মাদাম ফ্লাস মাইকে প্রত্যেক যাত্রীর নাম, দেশ প্রভৃতি পরিচয় দিচ্ছিলেন: Les freres Mukherjee de l'Inde (ভারতের মুখুজ্যে ব্রাদার্স)-এর উল্লেখের মধ্যে কতকটা আন্তরিকতার সুর বেজে উঠল তাঁর গলায়। চেক, যুগোস্লাভ, কানাডিয়ান, পোল, জার্মান, স্পেনিশ, ইতালীয়, ব্রিটিশ, মার্কিন, লাতিন-মার্কিন, অস্ট্রেলিয়ান, ভিয়েৎনামী, জাপানী—সব মিলিয়ে ষাট-পয়ষট্টি জন বিদেশী শিক্ষার্থী আমরা ছায়া-সুনিবিড় মফস্বলের পথ বাসের চাকায় মুখর করে রওনা হলাম।

সুবিদিত রাবুইয়ে উপবনে কিঞ্চিৎ প্রাত-রাশের পর প্যারীর দক্ষিণ দিক ত্যাগ করে অগ্রসর হল বাস। বেলা দশটা নাগাদ আমরা শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তরের বুক চিরে পারিপার্শ্বিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে যখন ভাবছি ভান্ গগের 'সাইপ্রেস ঘেরা গমের ক্ষেত' ছবিটির উদ্দাম প্রাণ তরঙ্গের কথা, ধু ধু সমতল পটের দিগন্তে বলা নেই কওয়া নেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এক গীর্জের চূড়া : শার্ৎর। পুরাকালে এখানে ছিল কেল্টিক আমলের প্রধান একটি তীর্থস্থান। রোমান ও গোলোয়া সভ্যতার সংমিশ্রণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি 'মাতৃমন্দির' : শিশুক্রোড়ে জননীর প্রতি-মূর্তি। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই দারু-মূর্তিটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। 'ভূগর্ভের মেরী জননী' মূর্তিটিই এখন প্রতিষ্ঠিত আছে এই ক্যাথিড্রালের নিচে, খৃস্টধর্মে মাতৃপূজার একমাত্র সম্ভাব্য প্রতীকরূপে। বর্তমান ক্যাথিড্রালটির আগে চতুর্থ শতকের একটি খৃস্টান বাসিলিক (গীর্জা) এখানে ছিল : অষ্টম, নবম এবং দ্বাদশ শতকের অগ্নিকাণ্ডে বারে বারে গীর্জাটি ভস্মীভূত হলেও তার কিছু স্মৃতিচিহ্ন আজো বাকি আছে এখানের মিউজিয়ামে। দ্বাদশ শতকের সূচনায় যে বিপুলকায় ক্যাথিড্রাল নির্মিত হয় যাজক ফুলবের-এর পরিচালনায়, তাকে ঘিরে বিশিষ্ট এক শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে; কিন্তু ১১৯৪ সালের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে সে-ক্যাথি-ড্রালের সামান্য অংশই রক্ষা পেয়েছিল; ভূগর্ভের প্রার্থনা-বেদী, দক্ষিণের 'নহবৎ-খানা' ও মিনার দুটি, পশ্চিমের রাজদ্বার তার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। এর পরবর্তী ছাব্বিশ বছরে যে শিল্পকীর্তি গড়ে ওঠে শার্ৎর-এর ক্যাথিড্রাল রূপে, তার প্রেরণার অদ্বিতীয় ও স্বকীয় উৎকর্ষের সঙ্গে শিল্পীমনের যে মূল্যবোধ ও আঙ্গিকের যে সামগ্রিকতার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে, সত্যিই তা দুচোখ ভরে দেখতে হয়। এর পরে অবশ্য আঠারো শতক পর্যন্ত শার্ৎর ক্যাথিড্রালের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন কম সাধিত হয়নি।

'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?—মহাদেবের জটা হইতে।' অবচেতন মনের অন্ধকার থেকে হঠাৎ হেসে উঠল এই অবিস্মরণীয় সংলাপ, আমরা লোয়ার নদীর গতিপথ ধরে দক্ষিণে নেমে চলেছি যখন হুঁস হল। "দাদা, পালিয়ে আয়, ফাঁক পেয়ে অংক শেখাতে চাইছে" মনোভাব নিয়ে যাঁরা আতকে ওঠেন, তাঁদের কাছে আগে থেকে নিবেদন : ইতিহাস-ভূগোলে জ্ঞান আমার নিজের খুবই কম; কাজেই কোন-রকম শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তি দূরে থাক, পথ-চলতি যখন যা আমার মন টানে, আনন্দ

দের, তার প্রতি অনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমি ক্ষান্ত। কিন্তু যাঁদের মনে খটকা লাগবে, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে শাং'র থেকে দক্ষিণে নামতে নামতে যে লোয়ার নদী (প্‌্‌ং) চোখে পড়ে সেটির দৈর্ঘ্য মাত্র তিনশ এগারো কিলোমিটার। মেইন্ এবং আজ্‌ নামের জেলা দুটি অধিকার ক'রে এই নদীর বিস্তার। আর লোয়ার নদ (স্ত্রী) হচ্ছে এক হাজার বারো কিলোমিটার দীর্ঘ, অর্থাৎ ফ্রান্সের দীর্ঘতম নদ। নদের বেলায় স্ত্রী আর নদীর বেলায় পুং দেখে যাঁরা আমার মস্তিষ্ক বস্তুটির স্বাস্থ্য অথবা প্রুফ-সংশোধকের দৃষ্টি-ক্ষমতা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছেন, তাঁদের স্মরণ করাই ফরাসী ব্যাকরণে পর্নোগ্রাফির প্রাচুর্য: মুস্তাশ্ (গোঁপ) এবং বার্ব (দাড়ি) দুটিই যেক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ, কালিদাসের বর্ণনার অ্যানাটমির অংশ বেশ খানিকটা আবার পুং-লিঙ্গে অনূদিত হতে বাধ্য ফরাসী ভাষায়।

মারী-ক্লসের ঘোষণা কানে এল, "আমরা এখন শাতোদ্যা দুর্গ দেখতে নামছি। সওয়া দু' ঘন্টার মধ্যে দুর্গ দেখে, যে যার রুচিমতো খাওয়া সেরে ফিরে আসুন। বেলা

রোয়া দুর্গ থেকে

শাঁবর দুর্গ : দূরে থেকে

দুর্গোয় আমরা রওনা হব।" বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে; হাওয়ার জোর কম নয়। মধ্য যুগের স্মৃতি বুকে নিয়ে এই যে দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে, তার আহ্বান তুচ্ছ করে বাসের নিরাপদ আশ্রয়ে নিরপেক্ষ বসে থাকতে পারলাম না। ইতিহাস বলে অর্লেয়াঁ, আঁজ্যু, তুরেন ও রোয়া, এই চারটি প্রধান কেন্দ্র নিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছিল লোয়ার উপত্যকার বৈশিষ্ট্য; এবং এই চাঁদের হাটে শাতোদ্যাঁ ফেলনা নয়। অর্লেয়াঁর কাউন্ট জ্যাঁ দ্যুনোয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, জান দার্ক (জোন্ অব্ আর্ক)-এর পাশে; ডাইনী অপবাদে জান দার্ককে পুড়িয়ে মারলেও দ্যুনোয়া ক্ষান্ত হননি। বীর এই দেশ প্রেমিকের প্রতিমূর্তি শাতোদ্যাঁ দুর্গের ঠাকুর-ঘরে (শাপেল্) দেখতে দেখতে আমাদের দেশের অনুল্লিখিত সেই বীর যোদ্ধাদের কথা পড়ছিল মনে, যাঁরা জান দর্কের মতো অথবা দ্যুনোয়ার মতো— ঈশ্বরের সেবার অঙ্গ ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের মুক্তিযজ্ঞে, সাম্রাজ্য-বাদের উচ্ছেদ করতে প্রাণ দিয়েছিলেন ফাঁসীকাঠে, দ্বীপান্তরে নয়তো বা সশস্ত্র সংগ্রামে। ক্যানাডিয়ান সহযাত্রিনী গায়েল্ ইতিহাসে এম্ এ পাশ ক'রে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; তার সঙ্গে ভারতের বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্রের পটভূমিকায় পলাশী যুদ্ধ থেকে রামমোহন, ডিরোজিও থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-অরবিন্দ, বিপ্লবের বাণীমূর্তি যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আলোচনা কম করিনি। দ্যুনোয়ার প্রতি আমার মনোভাব ওর পক্ষে অনুমান করা সহজ হল। ওর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে দানা বাঁধতে দেখে মন আমার যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করল। সাম্রাজ্যবাদের মা মনসা যে ঔপনিবেশিক ধুনোর গন্ধে দুর্বিষহ করে তুলেছিল জগতের কতক অঞ্চলের গণ জীবন, তার অভিজ্ঞতা গায়েল-এর চেতনাগ্রাহ্য বলেই ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস ওকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের ডানদিকে পড়ে রইল ভাঁদোম নগর। ফরাসী সাহিত্যের প্রসঙ্গে কবি রঁসার বা কবি দ্যু বেলের নাম কে না জানে? 'সপ্তর্ষি' (প্লেইয়াদ) কবি-গোষ্ঠীর উজ্জ্বলতম এই দুই বন্ধুই বাস করতেন ভাঁদোম্-এ; এখানকার পুরনো গীর্জাটিতে 'নহবৎখানা' অংশটির নিচের দিক চতুষ্কোণ, কিন্তু শীর্ষভাগ আট কোণা এক অনন্য শিল্পকীর্তি! বেলডাঙার যেমন মনোহরা, কৃষ্ণনগরের যেমন সরভাজা-সরপুরিয়া, তেমনি ভাঁদোমের বিখ্যাত একটি মিষ্টি আমার জানা ছিল। এক্স-আঁ-প্রোভাঁস অঞ্চলের বাদাম-বর্ফি র (কালিসঁ) মতো এই বস্তুটির স্বাদও ফরাসী রসিকমহলে আদৃত। চৌগোপ্পা বাঙালী রসনা বেশ খুশীই হল, দেখলাম।

লোয়ার নদ পার হয়ে পৌঁছনো গেল শাঁবর দুর্গে। রানেসাঁস যুগের শিল্প-জিজ্ঞাসায় মহৎ ও সুন্দরের যে সমন্বয় ঘটেছিল, তার প্রমাণ এই দুর্গটি। কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত এই জঙ্গলে মৃগয়া করতে আসতেন ফ্রান্সের রাজা-রাজড়া কোটাল-মন্ত্রী সমেত। সঙ্গে থাকত খাট-পালং, কেদারা, আসবাবপত্র। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাঁধানো সড়ক ধরে দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ হয় শাঁবর দুর্গের স্থাপত্য-সমূহে, মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠির সঙ্গে নিদ্রিতা রাজকন্যার সাক্ষাৎও বুঝি মিলবে ওখানে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' আমার খুব অপরিচিত জগৎ নয়; শৈশবে দেখা সেই জগতের কতক বিস্ময় আমায় নতুন করে মুগ্ধ করল। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া মাত্র একুশ বছর বয়সে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৫৪৭ সালে যখন বত্রিশ বছরের রাজত্বের শেষে মারা যান, তখন ইতালিতে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ, অষ্টম হেনরির সঙ্গে জোট পাকিয়ে স্পেন আক্রমণ প্রভৃতি কাহিনীর চেয়েও জনপ্রিয়

হয়ে গিয়েছে শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-রূপে তাঁর বহুমুখী কীর্তির কথাও; এই প্রথম-ফ্রাঁসোয়াই তাঁর খ্যাতির উপযুক্ত একটি দুর্গ গড়তে চেয়েছিলেন—শাঁবর তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় অনেক কীর্তির মধ্যে প্রধান। পরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় আঁরি থেকে, চতুর্দশ লুই (সূর্য রাজা) পর্যন্ত অনেকেই নিয়মিত শাঁবর দুর্গে আসতেন মৃগয়ার জন্য। শেষোক্ত রাজার সভাসদ মোলিয়্যার এখানে তাঁর 'বুর্জোয়া জাঁতিঅম' নাটকটি অভিনয় করান ১৬৭০ সালে। আমাদের সঙ্গে যুগোস্লাভ স্তেফানোভিচ আর পোলিশ তরুণী অজিলেগ্রী মারীয়া ছিল; তাকে বললাম, "ফ্রান্সে তো পোল্যাণ্ডের জয়-জয়কার। এমন-কি শাঁবর দুর্গেও তোমাদের রাজা স্তানিস্লাস তাঁর যশ রেখে গিয়েছেন; শুধু কি তাই? রাজা পঞ্চদশ লুইকে জামাই ক'রে ছেড়েছেন। ধন্যি রে!" স্তেফান ফোড়ন দিল, "তাই তো মারীয়াকে আমি কোন ফরাসী ছোকরার ত্রিসীমানায় আর ঘেঁষতে দিচ্ছিনে।..." দুর্গের বহু-বিদিত সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা ঠেলে ওপরে যখন হাজির হলাম, অবাক হয়ে গেলাম, এতক্ষণের সাধাসিধে স্থাপত্যের উপরে—নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশ যেন—ছোট বড় এন্তার কত যে কারুকার্যে ভরা মিনার আর হাওয়া-মহল আর তোরণ, কোনটার ঝাড়-লণ্ঠনের আকার, কোনটা বা শিব-মন্দিরের ধ্বজার মতো। অবিশ্বাস্য।...পড়ন্ত রোদে বনভূমি সুন্দর হয়ে উঠেছে, অস্পষ্ট ভেসে আসছে হঠাৎ বাসার কথা মনে পড়া পাখিদের কূজন, বন-মোরগের চিত্র-বিচিত্র পাখা ঘাসের আড়ালে আচমকা মিলিয়ে যাচ্ছে: আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর থেকে সমবেত হয়েছি শাঁবর দুর্গের প্রশস্ত ছাদে। মন আমাদের দ্রবীভূত হয়ে উঠল ঘরমুখো পাখির আকুল ডাকে। টোগো ডাকল, "নামা যাক?" "নামা যাক," সায় দিল গায়েল আর তার বান্ধবী জো-অ্যান, আর মারীয়া, আর স্তেফান।

"আশা করি আজ আর দুর্গ দেখা বাকি নেই?" ক্লান্ত সাশা প্রায় স্বগতোক্তি করল আমার দিকে হেসে। শান্ত শিষ্ট মেয়েটি,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে ওর বাবা রাশিয়া ছেড়ে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে আস্তানা গাড়লেও, সাশার মন রাশ্যান থেকে গিয়েছে ওর মায়ের প্রভাবে; রুশ ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য ওর নখদর্পণে। মার্কিন সঙ্গীতের ছাত্রী ক্যাথারিনের সুরেলা গলায় অপেরার গৎ যেমন অনায়াসে আলোর ফুলকির ঝর্না হয়ে ছোটে, তেমনি বাঁকা-তোড় : "বাঃ, এর মধ্যেই থকে গেলে? এখনো তো শ্যাভের্নি দুর্গ দেখিনি আমরা।" অন্যান্য দুর্গের জাঁকালো চেহারার পাশে শ্যাভের্নি নিতান্ত আটপৌরে মনে হলেও ওর বাগানটি এবং অন্তঃপুরের সাজ-সজ্জাই খানদানিদের তালিকায় অক্ষয় রেখেছে ওর নাম। ত্রয়োদশ লুইয়ের আমল সম্যক চিহ্নিত করে রেখেছে এই দুর্গটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সামগ্রিক শৈলীকেও।

নদীর ধারে ব্লোয়ার ক্রোয়া ব্লাঁশ (হোয়াইট ক্রস্) হোটেলে আমাদের রাত কাটানোর এবং নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা ছিল। যে যার ঘরে গিয়ে ডিনারের জন্য প্রস্তুত হয়ে খাবার ঘরে যখন নামলাম, একটি টেবিল থেকে সুদর্শন এক ছোকরা উঠে এসে বলল, "যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের সঙ্গে বসবেন?" "আমার ভাই এর ঠাঁইও যদি থাকে, নিশ্চয় আপনাদের সান্নিধ্য উপভোগের সুযোগ ছাড়ব না।"

ছেলেটির নাম জেরাল্ড্। অস্ট্রেলিয়ান। সুরস্রষ্টা। অলিভিয়ে মেসিয়াঁর ক্লাসে কম্পোজিশন অধ্যয়ন করেছে। ওর বান্ধবীর নাম মাইরা; স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি; মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। টোগোও এসে পড়ল। ভারি জমে গেলাম চারজনে। ভারতীয় সঙ্গীতের রত্ন-ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু ঐশ্বর্য আজ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য, জেরাল্ডের এই অনুমান যথেষ্ট আশ্বস্ত হতে হতে বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত আজ, অলিভিয়ে মেসিয়াঁ সাহেবের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আওতায়। সেই আলোচনায় ছেদ পড়ল, গায়েল যখন জানতে চাইল, আমরা 'স' এ ল্যুমিয়েরে' (Son et lumiere) দেখতে ব্লোয়া দুর্গে যাচ্ছি কিনা। পরদিন শানসো দুর্গে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন আছে ব'লে আমরা ওদের সঙ্গে গেলাম না, কারণ শানসো দুর্গের 'স' এ ল্যুমিয়েরে' অনুষ্ঠানটি জগদ্বিখ্যাত। আমরা চারজন গল্প করতে করতে নদীর পুলের মাঝামাঝি পৌঁছলাম। প্যারী তার নাগরিক জীবনের গতি-বৈচিত্র্যে আমাদের এতদূর অভ্যস্ত করে তুলেছে যে মাঝে মাঝে এই অলস বহমান মফস্বলের কোলে এসে মনে হয় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

ব্লোয়া আমার পরিচিত। আমার বন্ধু জর্জ গাব্ল' এখানে থাকেন। তাঁর কল্যাণে এর অন্ধিসন্ধি আমি যেমন চিনেছি, তেমনি ওঁকে চিনিয়েছি ওঁর না-জানা একটা জগৎ। ব্লোয়া দুর্গের পাশেই প্রসিদ্ধ যাদুকর রুদাঁ (Houdin)-র স্মৃতি-বিজড়িত একটি সংরক্ষণ-শালা আছে। রুদাঁর বংশধরেরা তার দেখাশোনা করেন। এখানে এই যাদুকরের উদ্ভাবনী শক্তির অসামান্য পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জেরাল্ডের আগ্রহ দেখে ওকে বললাম যে 'স' এ ল্যুমিয়েরে' (ধ্বনি ও আলো) পদ্ধতি

শোম' দুর্গের প্রবেশ-পথ

শ্যাঁনসো দুর্গ : দূর থেকে
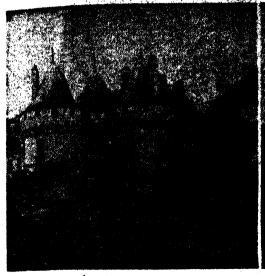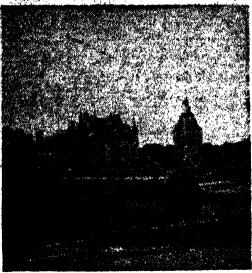
আবিষ্কার করেন রুদ্যারই নাতি পল রোবের-রুদ্যা, ১৯৫২ সালে; ইনি শাবির দুর্গের এবং ব্লোয়া দুর্গের সংরক্ষক। এঁর এই পদ্ধতি নয়াদিল্লীতে কেন, পাকিস্তান আফগানিস্তান, লেবানন, স্পেন, পর্তুগাল থেকে শুরু করে জগতের বহু স্থানে জনপ্রিয় হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানে আলো ও ধ্বনির সুষ্ঠু মিলন ঘটিয়ে অতীতকে মুখর করে তুলে দৃশ্যের ওপারের ঐতিহাসিক কুশীলব, ঐতিহাসিক ঘটনা স্বপ্নের মতো মনের পটে জাগিয়ে তুলতে অদ্বিতীয় এই পদ্ধতি।

পরদিন রবিবার আমাদের যাত্রা শুরু হল ব্লোয়া দুর্গ দর্শন দিয়ে। জেনারেল য়্যুগো, কবি ভিক্তর য়্যুগোর বাবা বাস করতেন ব্লোয়ায়। কবির কৈশোরের স্মৃতি-কথায় একদিনের উল্লেখ আছে: নদীর ধার থেকে দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত কিশোরকে জাগিয়ে দিল গাড়োয়ান। কবি লিখেছেন, "চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেলাম একসঙ্গে এক হাজার জানলা, সারি সারি ঘরবাড়ি, ঘণ্টা-মিনার, দুর্গটা, আর পাহাড়ের চূড়ায় ঝাড়ালো বড় বড় গাছের মুকুট, জলের ধারে চোখা চোখা পাথরে তৈরি সৌধশ্রেণী, নাটমন্দিরের মতো প্রাচীন এই শহর, ঢালু জমির ওপর ঢিপি খুঁজে খুঁজে গড়ে উঠেছে আপন খামখেয়ালে।..." ১৯৪০ সালের জুন মাসে পুরনো সেই শহর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে নদী আর দুর্গের মধ্যবর্তী অংশে। সাবেকি ধাঁচের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন শহর গড়ে উঠলেও পুরনো শহরের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারেনি আধুনিক স্থাপত্য। মনে পড়ল, নতুন শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার চিলেকোঠা থেকে (ওই বাড়িরই একটি ফ্ল্যাটে মঁসিয়া গাঁবলো থাকেন) ব্লোয়ার অবিস্মরণীয় দৃশ্য যা দেখে-ছিলাম। নিরিবিলি পরিচ্ছন্ন আদিগন্ত সমতল উর্বর খেত-খামারের বুক চিরে বয়ে চলেছে নদী; নদীর দু ধারে ঢালু জমি উঠে গিয়েছে জলপথ পর্যন্ত। ওই ঢালু অংশে থরে থরে আঙুরের চাষ, থেকে থেকে নরম পাথরের গায়ে খোপ খোপ বাসস্থান—রোদ উঠলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় পাথরের চাপা জেল্লায়। উজ্জ্বল স্বচ্ছ আকাশ, সবুজের সমারোহ, নদীর জল আর এই শুভ্রতা—সব মিলিয়ে সুখের সমৃদ্ধির এই নিটোল ছবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুহূর্তে জার্মানীর খ্যাপা নায়কের মনে সাধ জাগিয়েছিল, এই-খানে তাঁর সাম্রাজ্যের নন্দনকানন গড়তে হবে। কিন্তু এই সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল জার্মান অধিকারের সময়—মিত্রশক্তির বোমার বিষে : বিষে বিষক্ষয় হল মানব সভ্যতার এক অনবদ্য কীর্তির বেশ খানিকটা খেসারৎ দিয়ে।

ফ্রান্সের ইতিহাসে নবম শতাব্দীর থেকেই প্রবল আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে ব্লোয়ার ডিউক-বংশ পরিচিত। শাঁপাই পর্যন্ত এঁদের রমরমা ছড়িয়ে পড়ে বারো শতকে। ১৩৯৭ সালে, আর্লেয়াঁর ডিউক লুই, ব্লোয়া মহকুমার প্রভুত্ব অর্জন করলেন। ১৪১৫ সালে ডিউক লুইয়ের ছেলে শার্ল বন্দী হল ইংরেজদের হাতে: পঁচিশ বছর লণ্ডনের দুর্গে পচে অবশেষে শার্ল যেদিন ঘরে ফিরল, তখন তার কবি হিসেবে বেশ কিছু নাম হয়েছে: সেই কবিখ্যাতির স্বীকৃতি দিতে পল এলুয়ারের মতো কবি ইতস্তত করেননি। ১৪৪০ সালে কাব্য-সাহিত্যের দুনিয়া থেকে শার্ল যখন প্রবেশ করলেন দুর্গাধিপতির ভূমিকায়, তাঁর খেয়াল চাপল, পুরনো দুর্গ ভেঙে নতুন এক মনোহর দুর্গ নির্মাণের। পুরনো দুর্গের পশ্চিম মহল ভেঙে নতুন দুর্গের পত্তন হল। শার্লের পুত্র দ্বাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও ভুললেন না প্রিয় ব্লোয়া দুর্গের কথা। ১৪৯৮ থেকে ১৫০৩ সাল পর্যন্ত দুর্গের পূর্ব-মহল নির্মাণের কাজ চলল সেরা স্থপতিদের পরিচালনায় : গথিক প্রেরণার সঙ্গে ইতালীয় প্রভাব মিশে দ্বাদশ লুই ও তাঁর স্ত্রী ব্রতাঞ্জ'র আনুকে চিরদিনের জন্য অমর করে রাখল। এঁদের উত্তরাধিকারী প্রথম ফ্রাঁসোয়া, রানী ক্লদ, কাথারিন দ্য মেদিসিস, তৃতীয় আঁরি প্রভৃতি একে একে নতুন নতুন শিল্প-কীর্তির সংযোজনা করেছেন পুরাতনের পাশাপাশি। কিন্তু সতেরো শতকে অর্লেয়াঁর গাস্ত' পুরনো দুর্গের আগাগোড়া ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন দুর্গ বানাতে উদ্যত হলেও সৌভাগ্যের কথা, ও অপকর্ম বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি: মাত্র পশ্চিম মহলটিই তাঁর নির্দেশ-মতো নির্মিত হয়েছিল। অর্থাভাব যে কত বড় সুকৃতির হেতু হতে পারে এই ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই পশ্চিম মহলটির শিল্প-দৈন্য দেখে স্বতঃ মনে হয় যে, আর-একটুর জন্য বিলুপ্ত হত সাবেকি দুর্গের অন্য অংশ-গুলোও। তেরো থেকে সতেরো শতকের ফরাসী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে যেমন, ব্লোয়ার দুর্গে তেমনি ইতিহাসের কুখ্যাত বহু অংকও অভিনীত হয়েছে। ১৫৮৮ সালে ধর্মযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তৃতীয় আঁরি এইখানেই জঘন্য চক্রান্ত করে অপসারণ করেন তাঁর পথের কাঁটা গীজের ডিউককে।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা দীর্ঘ ঢালু বনপথ দিয়ে উঠলাম শোম' (শো=গরম+ম'=পাহাড় : এই দুর্গের প্রতীক হল

পাহাড়ের চূড়ার আগুনের শিখা) দুর্গে; এক পশলা বৃষ্টির পরে শেওলাঢাকা খড়ি-মাটির পথ বেশ পিছল লাগছিল। পথশ্রম সার্থক মনে হল দুর্গের প্রবেশ-পথে ড্র-ব্রিজ পার হতে হতে। ক'দিনের গরমের পরে স্নিগ্ধতার এই মুহূর্তে হাওয়া খুশী হয়ে উঠেছে দুর্গের বাগানে ফোটা ফুলের গন্ধে। পাথর সাদা, স্লেটের ছাদ নীলচে কালো, দুর্গের বাগানে সবুজের বিভিন্ন বর্ণালি—সব পেরিয়ে উঁকি দিচ্ছে উদার প্রসন্ন লোয়ার নদীর কাগা-ডিম রং যা মনে পড়িয়ে দেয় অবন ঠাকুরের আঁকা একটি ছবির কথা। শিবের জটার থেকে নদীর জন্ম নয় এদেশে; তবু নদীর ওই দিনান্তের রং আমার শিবাভিমুখী ধ্যানের আনন্দ দিল। ১৫৬০ সালে রাজা দ্বিতীয় আঁরি-র বিধবা রানী কাথরিন দা মেদিসিস এই শোমা' দুর্গটির পরিবর্তে কুক্ষিগত করেন পরলোকগত রাজার প্রেয়সী দিয়ান দা পোয়াতিয়ে'র বাসস্থান (রাজারই উপহার) শ্যন'সো দুর্গটি। রানী জানতেন, নানা কারণে দিয়ান কতদূর আকৃষ্ট ছিলেন রাজার স্মৃতিবিজড়িত শেষোক্ত দুর্গটির প্রতি। নাপোলের সম্রাট হয়ে বিদুষী লেখিকা মাদাম দা স্তাল্'কে এই দুর্গে নজরবন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করেন।

আবার বাস-যাত্রা, আবার দুর্গ-দর্শন। এবারে সুপ্রসিদ্ধ আঁবোয়াজ দুর্গের পালা। এই দুর্গটির নাম জগতের শিল্পীদের কাছে সমাদৃত। ১৫১৬ সালে রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া ইতালি থেকে আমন্ত্রণ করে আনলেন শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'কে; এই দুর্গের পাশেই ক্লো ল্যুসে নামে বাগানবাড়িতে জীবনের শেষ তিন বছর কাটিয়ে দা ভিঞ্চি এখানে সাতষট্টি বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন, ১৫১৯ সালে। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার এই আমন্ত্রণ লিওনার্দোর শিল্পী-জীবনে কম সান্ত্বনার কারণ হয়নি। ১৫১৩ সালে লিওনার্দো রোমে গিয়েছিলেন, সান-পিয়েত্রো (সেন্ট পিটার) গীর্জাটির নির্মাণ উপলক্ষে; তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর খ্যাতির সম্মান দিয়ে খৃীষ্ট-ধর্মের হর্তাকর্তারা নিশ্চয় তাঁর উপরে ন্যস্ত করবেন এই গীর্জা নির্মাণের দায়িত্ব। কিন্তু ইতিপূর্বেই ব্রামান্ত এবং তরুণ মাইকেল-এঞ্জেলো ও রাফায়েল অর্জন করেছিলেন পোপের সমাদর। অগত্যা আরো দু-বছর রোমের ব্যর্থতার মধ্যে কাটিয়ে লিওনার্দো চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ইতালির উপর অভিমান করে চলে এলেন ফ্রান্সে। তিনি অকৃতদার ছিলেন। মনন, অনুভূতি ও সৃজনের ত্রিবিধ মার্গে লিওনার্দো যে অদ্বিতীয় প্রগতির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন তার সম্যক মূল্য উপলব্ধি করতে মানবতাকে পাঁচ শ' বছর অপেক্ষমান থাকতে হল।

আজকের বিশেষজ্ঞ প্রধান শিক্ষার যুগে 'জ্যাক অব অল ট্রেডস, মাস্টার অব নান' কথাটি যখন বড়রকম সত্যে পরিণত, তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না অতিকায় এই প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে : শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ, উদ্ভাবক, ইঞ্জিনীয়র, কিনা ছিলেন তিনি? জ্যামিতি, যন্ত্রপাতি, আলোকবিদ্যা (অপটিকস), উদ্ভিদ বিজ্ঞান, শারীর স্থান, ঔদক (হাইড্রোলিকস), প্রাণবিদ্যা থেকে শুরু করে জ্ঞানের কোনও ভূমিতেই দুঃসাহসে অধিকার অর্জনে ইতস্তত করেননি লিওনার্দো। তাঁর অসংখ্য নোট ও রেখাচিত্রের ভিত্তিতে আই বি এম সংস্থা যেসব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছেন, তার প্রদর্শনী বারো মাসই দেখা যায় ক্লো ল্যুই-এর ভূতল-কক্ষে : রেফ্রিজারেশন, উড়ন-যন্ত্র (বিমানের প্রথম সংস্করণ), ঘূরন্ত সাঁকো, নোবহরের বিভিন্ন উন্নয়ন, সাঁজোয়ার উন্নয়ন প্রভৃতি কত রকম ফন্দী-ফিকির যে ঘুরত ওই মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে, তার বাস্তবরূপ দেখাতে দেখাতে দা ভিঞ্চির গুণমুগ্ধ বৃদ্ধ ফরাসী গাইড প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর, "আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে এই ছিল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অবদান", বলে স্মরণ করাতে লাগলেন "আই কাম টু ব্যেরি সীজার, নট টু প্রেইজ হিম" উক্তিটি!

লোয়ার উপত্যকার প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি বিষয়ে আগেই লিখেছি। এদিন সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এ অঞ্চলের সুবিদিত একটি সুরাকুণ্ডির কারখানায়। বারো কিলোমিটার ধরে মাটির তলায় সুড়ঙ্গে যে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যম নিয়ে দিনের পর দিন কবিরাজের ধৈর্য, পাচকের দক্ষতা, জননীর মমতা, শিল্পীর প্রেরণা, বৈজ্ঞানিকের নৈপুণ্য, বিশ্বকর্মার ক্ষমতা, তান্ত্রিকের

লিওনার্দোর খাতা থেকে নেওয়া নক্শা অবলম্বনে নির্মিত কয়েকটি যন্ত্র : উড়ন-যন্ত্র দেখা যাচ্ছে ছাদে

নিষ্ঠা নিযুক্ত হয় সুবর্ণপুষ্ট দ্রাক্ষারসকে মাটির জারক-রসে পরিপক্ক ক'রে সুমিষ্ট পানীয়ে রূপান্তরিত করতে, তা প্রত্যক্ষ করলাম এই প্রথম। স্বয়ং কারখানার মালিক আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর পদ্ধতি। এবং আপ্যায়ন করলেন সুদৃশ্য পাত্রে ক'রে প্রত্যেকের জন্য স্বাদু এই পানীয় দিয়ে। শাঁপাই (বা শ্যাম্পেন) কেন এদের উৎসবে-অনুষ্ঠানে সঞ্জীবনীর প্রতীক, বুঝতে পারা যায় এমনি কারখানা দেখলে। বোঝা যায় কীট্স্ কেন লিখে-ছিলেন,

O for a draught of vintage, that
  hath been cool'd a long age in
  the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the
  country green, Dance and
  Provencal song, and sun-
  burnt mirth!
O for a beaker full of the
  warm South,
  Full of the true, the blushful
  Hippocrene,
  With beaded bubbles winking
  at the brim,
  And purple-stained mouth;
That I might drink and leave
  the world unseen,
And with thee Fade away into
  the forest dim:

এই কারখানা থেকে আমরা উপস্থিত হলাম ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল যে রেস্তোরাঁয় : ব্রতাঁঞে অঞ্চলের নানাবিধ সুখাদ্যে তৃপ্ত রসনা আমাদের ভুলিয়ে দিল যে আমরা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দূরদেশে এসেছি কৃচ্ছ্রসাধনার নামান্তরে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করতে।

"না জানি কি এক অতুলনীয় লাবণ্য আর বর্নোদ্দ প্রসন্নতা ঘিরে আছে শাঁসোঁ দুর্গটিতে", লিখেছিলেন গুস্তাভ্ ফ্লোবের। "দীর্ঘ এক তরুবীথির পথ চলবার শেষে, প্রতিবেশী পল্লীর সম্ভ্রম্ভ ব্যবধান পার হয়ে, জলের বুকে নির্মিত এই দুর্গটি দাঁড়িয়ে আছে দেখি, প্রশস্ত এক সুন্দর ঘেসো বাগানের মধ্যে।...খিলানের তলা দিয়ে কুলকুল ক'রে বয়ে যেতে যেতে শের নদীর স্রোত ব্যাহত হচ্ছে ছুঁচলো থামের কোণাগুলোয়। আভিজাত্যে কি যেন এক দার্ঢ্য ও মাধুর্য, প্রশান্ত তন্দ্র বেদনাময় পরিবেশে নেই কোন তিক্ততা, নেই কোন অবসাদ।"—আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় এবং শেষদিনে নতুন ক'রে শাঁসো দুর্গটি দেখবার সময়ে গায়েল স্মরণ করাল ফ্লোবের-এর উক্তিটি। ভল্ত্যার, বাযুঁ, জাঁ-জাক রুসো প্রভৃতি বহু নামী লেখক এই দুর্গে কাটিয়ে গিয়েছেন এই দুর্গের কর্ত্রী ছিলেন যখন মাদাম দুপ্যাঁ। ওপরে বলেছি আঁরি রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর রক্ষিতা, দিয়ান্ দ্য পোয়াতিয়ে'র হাত থেকে কিভাবে রানী কাথরিন এই দুর্গটি কেড়ে নিয়েছিলেন। দিয়ান ছিলেন অভ্রান্ত সৌন্দর্যবোধের অধিকারী : শাঁসো দুর্গের শ্রী তিনি যেভাবে বর্ধন করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী যুগেও—আজ অবধি, অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার গৌরব। লোয়ার নদীর দুর্গগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় এক মহিমার স্থানে এই দুর্গটি অধিষ্ঠিত।

সর্বশেষ দুর্গ আজে-ল্য-রিদো পরিক্রমা সেরে যাব হচ্ছি, গায়েল বলল, "দাঁড়াও। একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক।" ছোট একটা সেতু, পরিখার ওপরে। মধ্যযুগের ইওরোপের প্রাচীন গরিমা পিছনে রেখে আমরা ফিরে যাব বিশ শতকের রাজপথ ধ'রে চিরযৌবনের প্রতীক মহানগরী প্যারী অভিমুখে। শরীরে আমাদের তিনদিনের পথশ্রম যতটা না সঞ্চিত হয়েছে, মনের কোণে তার চেয়ে বহু গুণে উৎশিখ দেখলাম, একদিকে ওই অতীতকে প্রত্যক্ষ করবার আনন্দ, অন্যদিকে আমাদের আজকের ভবিষ্যত ধ্বজাধারী অজানা এই যে তরুণ তরুণীকে জানলাম, এই জানবার পরশমণি প্রাণে ছুঁয়ে নিয়ে যে বাস্র পরিমণ্ডলে ফিরে যাবার ব্যথা, যে-ব্যথার মধ্যে নেই কোন তিক্ততা, নেই কোন অবসাদ। এত কথা মনে হচ্ছিল আমার : গায়েলের ওই ছোট ক্যামেরায় কি তার সবটুকু ধরা পড়বে?

বাস ছুটে চলেছে। মেক্সিকোর বন্ধুরা—লেতিসিয়া, খুয়ান-কার্লোস মারিয়া প্রভৃতি ভজনখানেক—গীটার বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে। লাতিন আমেরিকার স্পেনিশ-ভাষী গানগুলোয় লক্ষ করলাম দুটি শব্দের প্রাধান্য : 'পরকে' (কেন?) এবং 'কোরাথন' (হৃদয়)। একটি জিজ্ঞাসা। একটি অনুভব। আমাদের পুরো তিনদিনের যাত্রা, আমাদের জীবনও চিহ্নিত মনে হল এই দুটির আলোয়, এই দুটির ছায়ায়। ছুটে চলেছে লোয়ার নদী। প্রশ্ন জাগল মনে : "(ওরে) তোরা কি জানিস কেউ/ (জলে) ওঠে কেন এত ঢেউ?"—মেলেনি উত্তর।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখের শোভায় আনে মুক্তো-আভা
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম ফুটিয়ে তোলে মুক্তোর মত অপরূপ এক মায়াবী আভা। এই মুক্তো-আভা ছড়াবার আগে মুখের চকচকে ভাব আর অবাঞ্ছিত সব দাগ একেবারে সাফ ক'রে দেয়। অপরূপ এক দীপ্ত সৌন্দর্যে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে বিভূষিত রাখে।
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীমের মুক্তো-আভায় আপনার সারা মুখ মধুরতর ক'রে তুলুন। পরে, তার ওপর অল্প একটু ল্যাকমে ফেস-পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে দিন। দেখুন, এক অনন্য সৌন্দর্যে আপনাকে কেমন অপরূপা দেখাচ্ছে। আজই ব্যবহার করে দেখুন।
Lakmé
VANISHING CREAM
ল্যাকমে
ভ্যানিশিং ক্রীম

জনক

জঙ্গলের নরখাদক বাঘের মতো ভয়ংকর আর হিংস্র—টেরিফিক এবং ফেরোসাস-চরিত্র চাষী ইনসানের। গায়ে অসুরের মতো বল। চোখ দুটো ছাঁসা। গোঁফ দাড়ি তামাক-পোড়া কটা রঙের, কোঁকড়া কোঁকড়া। গায়ের রঙ পাকা গমের মতো। অসংখ্য তিল তার গায়ে। মাথার চুলগুলোও লালচে। তাকে দেখতে অনেকটা তাতারদের মতো। মুলোর মতো মোটা মোটা আঙুলের মুঠি পাকিয়ে যখন সে কথায়-না-ফেরা বেয়াড়া গরু, ছেলে অথবা স্ত্রীর পাঁজরে ঘুঁষি সাঁটায়, এক-ঘার বেশি দু-ঘা মারবার আগেই জিব বেরিয়ে পড়ে তাদের। পানের মেট বাসে তোলার ব্যাপারে শিখ কণ্ডাক্টরদের সংগে বচসা-মারামারি বেধে গেলে ইনসান তাদের তিনজনকে ছ-খানা ঘুঁষির আটম ছেড়ে শুইয়ে দিয়েছিল কিন্তু দুর্বল-হৃদয় বাঙালীরা তখনি তাদের মাথায় জল চাপড়ে ঠাণ্ডা করে দিতে মাথায় পক্কড় বেঁধে সরে পড়েছিল তারা।

ইনসানকে সবাই ভয় করে। খুনী দুরন্ত বেহুঁশ লোক। ভীষণ বগচটা। পরীবানু, তার বউ, হুর পরীর মতোই যে সুন্দরী, মেমদের মতন ফরসা, শুনো দাঁড়ির চাবুকের বাড়ি তাকে যখন মারে তার সর্বাংগ পাঁকাল মাছের মতো ফালা ফালা হয়ে লাল হয়ে যায়। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। কিন্তু তার বছর ষোল বয়েসের ছেলে আজাদ তার অবাধ্য। তাকে কতবার মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলেছে তবু সে স্কুলে যাবে না। ক্লাস সেভনে উঠল, কত টাকার বইপত্র কিনে দিলে, 'পেরাইপিট' 'বাঙাল' মাস্টার রেখেছে, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেণ্টের ফাঁকির কাজ আর খাতাপত্র সেরে পড়াতে এসে দেখেন আজাদের পাত্তা নেই। তাকে ধরবার জন্যে একদিন পিছনে পিছনে ছুটল তার বাপ। গ্রামকে গ্রাম পার হয়ে গেল। তিনটে গ্রামের বড় বড় মাঠ পার হবার পর এক পল্লীতে এসে ইনসান পেট টিপে ধরে শুয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল সে। সেই গ্রামের লোকজন তার মাথায় জল চাপড়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বকাঝকা করলে। তাদের আশংকা, ছেলেকে ধরতে পারলে দুজনের যে হোক একজন মরত। অথবা দুজনে দুজনকে ধরে আধ-ঘণ্টা ধরে শুধু হাঁপাত। ছেলেকে মারবার শক্তি পর্যন্ত থাকত না ইনসানের—আর রাগে ক্লান্তিতে সে 'নটকা' মারা হয়ে গিয়ে হার্টফেলও করতে পারত। ছেলেটা ভয়ে আছাড় খেয়ে পড়লে মারা যেত।

আজাদ তখন একটা ভেড়ির কোলে শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে গাল হাঁ করে।

কেন এমন অবাধ্য হল ছেলেটা ভেবে পায় না ইনসান। দিন দুতিন পরে হঠাৎ তাকে ধরে ফেললে ইনসান যখন সে লুকিয়ে ধানের গোলার মধ্যে কাঁদিভরা পাকা কলা খাচ্ছিল আরামসে পেট ভরে। 'যাকুলে' সেঁধতেই মা পরীবানু ইসারা করলে, তোর বাপ ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ছে রে 'অভাগা।' কোথা আর লুকোবে, সটু করে গোলার মধ্যে উঠে গেল আজাদ।

কিন্তু 'সেজদা' থেকে উঠে ইনসান দৃশ্যটা দেখতে পেলে। নামাজ শেষ করে একটা শিকল আর তালাচাবি নিয়ে নেমে এসে গোলার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক মারলে, 'নেবে আয় হারামজাদা! যদি এক কথায় নেবে আসিস, তোকে মারবুনি আর যদি'...

নেমে এল আজাদ। দাঁড়াল এসে বাপের সামনে। ইনসান তার অবয়বটা চকিতে একবার দেখে নিলে, ধুলোয় সর্বাংগ আচ্ছন্ন। ছেলের কোমরে শিকল জড়ালে। বালার মধ্যে দিয়ে শিকল গলিয়ে এনে একটা গেরো দিলে। টানতে টানতে নিয়ে এল বাইরের দালিজে। একটা মণখানেক ভারী বাবলা কাঠের 'গোড়েং'-র সংগে শিকলের অনাপ্রান্তটা বেঁধে চাবি দিলে।

বন্দী করলে আজাদকে। মাস্টারমশায় সেই অবস্থাতেই সন্ধ্যায় পড়িয়ে গেলেন। পাড়ার লোকজন সবাই দেখে গেল। রাত্রে পরীবানু তাকে ভাত আর আধসেরটাক গরম দুধ খাইয়ে একটা বিছানা পেতে মশারী খাটিয়ে দিয়ে চোখের জলে অনেক কেঁদে অনুনয় করে বোঝালে। বাবা, তুই মানুষ হ, লেখাপড়া শেখ। তোর জন্যে তো মোর গতর খেঁতো হয়ে গেল। কেন, তোর লেখাপড়া শিখতে ভাল লাগে নে কেন?'

আজাদ গাড় গম্ভীর গলায় বললে, 'কি হবে লেখাপড়া শিখে?'

'মানুষ হবি।'

'লেখাপড়া শিখলেই সবাই মানুষ হয় না।'

'তবে তোর মতন গাছ-গরু হয়ে থাকলে কি মানুষ হয়?'

'হজরত মোহম্মদ, বাদশা আকবর, শিবাজী, এঁরা কি লেখাপড়া জানতেন?'

'সেইটাই বা তুই জানলি কি করে? তাঁরা কি লেখাপড়া শিখতে বারণ করেছে?'

কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পরে আজাদ যা বললে তার মানে দাঁড়ায়, শিক্ষিত লোককে দেখলে তার রাগ হয়। তারা লোককে ঠকায়। মিথ্যে কথা বলে। চালবাজ। তাদের ফন্দি, ছুরি আর বদমায়েসিতেই দেশের এত দুঃখ। আর ঐ 'বাঙাল' মাস্টার, বসে বসে মাইনে মারে, আর আমাকে এমন কোশ্চেন করে যাতে আমি জব্দ হই। সেদিন বললে, ৮০ হাত লম্বা আর ৮০ হাত চওড়া জায়গা যদি এক বিঘা হয়, তবে ৪০ হাত চওড়া ৪০ হাত লম্বা জায়গা কতখানি হবে? আমি বললুম, দশ কাঠা। সে চড় মারলে। বাপ তখন এখেনে বসে। মাস্টার বললে,

৮০-কে ৮০ দিয়ে গুণ করলে হয় ৬৪০০ আর ৪০-কে ৪০ দিয়ে গুণ করলে হয় ১৬০০। কাজেই এক বিঘের সিকি ভাগ। পাঁচ কাঠা!—এই অংকটা যত শিক্ষিত লোককে জিজ্ঞেস করেছি সবাই বলেছে, দশ কাঠা। তবে? বাপ তার জন্যেও মারলে আমার!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরীবানু উঠে চলে এল।

পরদিন সকালে দেখা গেল আজাদ তার শিকল বাঁধা মণখানেক ভারী কাঠ কাঁধে তুলে নিয়ে কোথায় সটকান দিয়েছে। কাছাকাছি বন জঙ্গল সব খোঁজাখুঁজি করলে। কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

গরু নিয়ে মাঠে হাল করতে চলে গেল ইনসান।

কাঠ কাঁধে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে আজাদ মাকে বললে, 'দে, খুলে দে।'

মা বললে, 'আমার কাছে চাবি নেই।'

অগত্যা কুড়ুল দিয়ে গায়ের জোরে ঘা কতক মেরে শিকলটা কেটে ফেলে নিজের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে আজাদ। কিন্তু কোমরের শিকলের গিঁটটা এমন এঁটে গেছে যে তা কিছুতেই খোলা গেল না। শিকলটা কোমরে জড়িয়ে রেখে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার পালাল সে। ইনসান দুপুরে ফিরে ছেলের খোঁজ পেলে না কিন্তু কাঠটা পড়ে থাকতে দেখে পরীবানুকে ধমকাতে লাগল। তখনো রান্না হয় নাই, গরুর গামলায় 'জাব' দেওয়া বাকি—এইসব অপরাধে পরীবানুকে খড়মের বাড়ি ঘা কতক দিলে বেশ করে। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। মারের চোট সে ছুটে পালিয়ে গেল খিড়কীর দিকে। ইনসান টগবগ করে ফোটা হাঁড়ির ভাতগুলো এনে গরুর 'ম্যাচলা'য় ঢেলে দিয়ে এসে উনুনে জল ঢেলে নিবিয়ে দিয়ে কোদাল এনে উনোন কুপিয়ে দিলে। তারপর স্নান করে এসে 'জোহরের' নামাজ পড়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল দালিজে।

পরীবানু তার হাতের সমস্ত চুড়িগুলো ভেঙে ফেলে ঘরের পিছনে বসে কাঁদতে

উনুনের আগুনের আভায় পরীবানুর সাদা ফরসা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে

কাঁদতে পাড়ার জায়েদের বলতে লাগল : আমি 'রাঁড়' (বিধবা) হইচি। আমার ভাতার মরেছে। সে মরুক। গোলার সব ধান "পুর্তি' পোকা হয়ে উড়ে যাক। মেরে মেরে মোর 'খেলে' 'লোউ' (রক্ত) ফেলে দিলে 'বাঁ-পায়ের' মিনসে। ও মরুক।'...

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই খিড়কির বাঁশবাগানে যখন উদাস ভুতুড়ে হাওয়া আড়মোড়া মেরে ছুটে গেল—শাঁকচুন্নি বা ভূতের ভয়ে বাড়িতে আসে পরীবানু। শিয়াল বা কটাশে নিয়ে পালাবার ভয়ে হাঁস মুরগিগুলো 'খোলুলা'য় (খোঁয়াড়ে) তোলে। ঝাঁটপাট দেয়। সাঁজবাতি জ্বালে। আবার অন্য উনোনে রান্না বসায়।

ইনসান মাদুর পেতে 'মগরেবে'র নামাজ পড়ে পবিত্র কোরআনখানি খুলে পড়তে বসে। সুর করে সে পড়তে থাকে। উনুনের আগুনের আভায় পরীবানুর সাদা ফরসা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠছে আর নীরবে দু-চোখের জলের ধারা নামছে তাতে, দেখতে পায় ইনসান।

রান্না হলে এক থালা ভাত, ডিম ভাজা, ডাল আর একটা মাছের তরকারী এনে সামনে দিলে ইনসান বিনা বাক্যব্যয়ে সমস্ত উদরসাৎ করে নিয়ে টর্চ হাতে করে পাড়ায় বের হয় ছেলের অন্বেষণে। আসলে সে যায় না—লুকিয়ে থাকে। ছেলে মায়ের কাছে আসে কিনা লুকিয়ে থেকে পরীক্ষা করে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়। আজাদ তখন বাগানের বিরাট একটি নারকেল গাছের মাথায় 'মাঝ পাতা'র মধ্যে নিজেকে শিকল দিয়ে জড়িয়ে বসে আছে। দাঁত দিয়ে ছোবড়া ছাড়িয়ে সারা বিকেল ভরে সে দুটো নারকেল খেয়েছে। কচি ডাবের জল খেয়েছে করেকটা। দিব্যি আরামের আজাদী জীবন! উপরে মুক্ত নীল আকাশে অসংখ্য তারা ঝিলমিল করছে প্রাণের সপন্দনে।

হঠাৎ সংকল্প পালটালে আজাদ। সে গাছের মাথা থেকে দেখতে পেলে তার মা সারারাত দাওয়ায় বসে আছে লম্প জ্বালিয়ে। তার জন্যেই এই কষ্টভোগ মায়ের।

ভোরবেলা গাছ থেকে নেমে এল সে। তার মামা মানে সাঁ করে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া! গাছের গলার কাছে নেমে হাত আলগা করে পায়ের পাতার ভর রাখা মাত্র। নিমিষেই মাটিতে। তবে পায়ের তলা একেবারে জ্বলে যায়!

ভোরবেলা বাড়িতে ঢুকে আস্তে আস্তে এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে দাঁড়াল দাওয়ার নিচে। পরীবানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল নীরবে। ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

কয়েকদিন জ্বরভোগের পর উঠে আজাদ নিজেই কোদাল কাটারি কাস্তে নিয়ে কাজকাম আরম্ভ করলে। ইনসান আর কিছু বলে না তাকে। দেখা যাক স্বাধীন-ভাবে ও কি করে। ও আর পড়াশোনা করবে না সেটা বোঝা গেছে। তবে ইনসান লক্ষ করেছে, ও অনেক সময় খাতা কলম নিয়ে কি যেন সব লেখে। একদিন দেখলে, যত সব গাছপালার নাম, ধানের নাম, কলা, আম, মাছ, বাঁশ, আখ, কলাই, মাটি, ফুল, মানুষের উপাধি লেখা। খাতা ভরতি।

মাথা খারাপ নাকি!

একদিন দেখলে, বাঁশি বাজাচ্ছে আজাদ ঘাটের চাতালে বসে। আর একদিন দেখলে বেগুন বাড়িতে একটা মড়ার মাথা শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে লাঠির মাথায় দিয়ে রেখেছে যাতে রাত্রে বেগুন চুরি করতে এসে চোরেরা ভয় পায়।

একদিন সকালে আজাদ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছড়া কেটে খেলা করছিল। সে বলছিল :

অ্যাকোড় বাঁকোড় ত্যাকোড় সলা
ধনুক ধানুক বাঁশের নলা,
চামচিকে চটার ডিম
বত্রিশ আঙুলের তেত্রিশ সিং।

ইনসান বললে, 'পড়াশোনার নামে অণ্টরম্ভা! ছড়া কাটছে! আর হাল জুড়বি আয়। চাষার বেটা। চাষ করবি চল।

আজাদ এল। লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে গরু তেড়ে মাঠে আনলে। দু-বিঘেতে বীজতলা ফেলাতে হবে। তার জন্যে 'ওলা-পোড়ে' চষতে হবে।

হাল জুড়তে বললে ইনসান।

আজাদ গরু জোড়াকে 'হাও বাবা—হাও বাবা' বলে দাঁড় করাতে চেয়ে গরুকে বাবা

বলার পর বাগের মুখটা কেমন হয় একবার দেখলে। ইনসান অন্যমনস্ক ছিল। দইখাই গাছগুলো উপড়ে ফেলে দিচ্ছিল। তারপর কাটারি দিয়ে বেড়ার জীবদণ্ড গাছ ছিয়োতে আরম্ভ করে সে। বললে, 'ক্ষেতের জন্যে বেড়া দিলাম, বেড়া ক্ষেত খায়।'

আজাদ গরুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে জোয়ালের মুখের দড়ি এনে তার লোহার ফলকে বেঁধে দিলে। 'আঁজ' দড়ি জোয়ালের মাঝখানের খাঁজে রেখে তার মধ্যে লাঙলের 'ঈশ' গলিয়ে দিয়ে আঁজের মধ্যে 'আঁকড়া' আটকে দিলে। এইবার আঁকড়ার তলায় বাঁধা ডবল গরুর-দড়িটা এনে লাঙলের 'মুঠের' নিচে একটা ফের দিয়ে নিয়ে জড়িয়ে বাঁধলে। তার লাঙল জোড়া হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখছিল ইনসান। ঠিক হয়নি দেখে কাছে এল। কান ধরে ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে লাঙল জুড়তে জুড়তে বললে, 'চাষার বেটা চাষা! নাকের তলায় কালো 'রোঁ' (পশম) গজিয়ে গেল—বে দিলে সাত ছেলের বাপ হয়ে যেতিস—এখনো তুমি হাল জোড়া শেখনি। এই—এই রকম ক'রে জুড়তে হয়। খালি আধসের তিনপো চালের ভাত মারা নয়! আচোট মাটিতে লাঙল 'ঝরো' করে জুড়লে গরুর কাঁধে 'বাকা' লাগবে। গরু টানতে পারবে নে। 'ঝরো' জুড়ীব 'একচাষ' ধরা হয়ে গেলে। এখন 'দাবায়' চলবে। লে চালা। 'আতড়' বাড়। লাঙল চলে গেলে চষা মাটির যে দাগ পড়বে তার নাম 'সিরুলি' আর হাত ছয়েক জায়গা একবার ভেতরে যাবে আবার বাইরে আসবে। ভেতর পুরে গেলে আবার 'আতড়' বাড়াতে হবে। এমনি করে সবটা জায়গা হয়ে গেলে আড়আড়ি ভাবে একে বলব 'এক-চাষ'। ফের লম্বা দিকে শেষ হলে বলবে 'দু-চাষ'। তারপর ঘাস উপড়ে ফেলতে হবে। কোদাল দিয়ে আগাছার গোড়া কেটে 'পাসতে' করতে হবে। তারপর আবার চাষ দিয়ে মই দিয়ে ধান ফেলতে হবে। এক বিঘেতে আট সের ধান লাগে। বীজ তলা ঠিক হলে আষাঢ় মাসে 'আগো' ভেঙে 'বোড়নী' দিয়ে, 'কাদা' করে বীজতলা উপরে, তার মানে, 'বেঙোন' ভেঙে জমি রুইতে হবে। ভাদ্দর মাসে ধান জমিতে নিড়েন দিতে হয়। শ্যাওলা, ভটকা, কালেয়া ঘাস, পাতি, চেঁচকো, শ্যামা ঘাস, কুলপো গাছ, ওকড়া গাছ এসব উপড়ে ফেলতে হবে—জড়ো করে 'ভাঁটি' দিতে হবে। চাষার ছেলে কাজ শেখ। জনের পয়সা নেই। তিন টাকা জন। আমরা দু-বেলা ভাত মুড়ি দুধ কলা মাছ আণ্ডা ঘি নারকোল খাই—পাড়ার লোক কি খায় র‍্যা? গমের আটাও পাচ্ছে না তারা। সন্ধ্যায় একদিন ভাতের মুখ দেখতে পায় না। দশ বিঘে জমি আছে, তার পেছনে খাটলে আমাদের ভাতের অভাব হবে না। মন দিয়ে কাজ করো।'

কিন্তু ডাইনের গরুটা আজাদের হাতে চলতে চাইছে না। মার দিলেও না। খোঁড়াচ্ছে যেন। খানিকটা চলে আবার দাঁড়িয়ে যায়। ব্যাপার দেখে ইনসান এসে হালের মুঠে ধরলে। ঘা কতেক চাবুক সাটালে কালো গরুটার পিঠে। বয়েস-ভারি গরু। পেট ঝোলা হয়ে গেছে। ঝাঁঝের ভরায় পড়েছে। গরুটা বদলাতে হবে এ সনে চাষটা তুলে নিয়ে। কিন্তু দাঁড়ায় কেন গরু? বেশ করে মার দিতে ঢুস করে সে শুলো! ইনসানের মেজাজ জ্বলে গেল। অন্য চাষী কেউ দেখলে, অপমান। তার গরু শোয়? ভাল গরু কিনতে পারে না? কৃপণ লোক! তাই চাবুক ভাঙলে, ঘুঁষি। তারপর গরুটা উঠল।

ব্যাপার দেখে ইনসান হালের মুটে ধরলে

আজাদ বললে, 'ওর পায়ে বোধহয় লেগে আছে। কবে বোধ হয় কাঁকড়ার গর্তে পা ঢুকিয়ে পায়ের কল সরিয়ে রেখেছে। পায়ে হাত দিতে আমাকে একবার লাথি মেরেছে।'

'হাঁ, তোর মাথা! ফাঁকিবাজের মতলব কত রকম হয়।'

কিন্তু গরুটা আবার শুয়ে পড়ল। তখন মই এনে শুন্যে তুলে সজোরে তার পিঠে ফেললে ইনসান। 'শালা মরে মরুক—আজ না হাল করলে 'জবাই' করে দেব।'

গরুটা আণ্ডা আণ্ডা চোখ বার করে গলগল করে গোবর বার করতে লাগল শুয়ে শুয়ে।

আজাদ বিরক্ত করুণ স্বরে বললে, 'গরুর 'অসুখ' করেছে যে।'

তখন তাকে তেড়ে গেল ইনসান চড় হাঁকিয়ে। গরু খুলে দিলে সে। ছেড়ে দিতেই উঠে বাড়ির দিকে টং টং করে চলল গরু দুটি।

হাল লাঙল আনতে বলে ইনসান গোঁ ভরে গরুর পিছনে পিছনে বাড়িতে চলে এল। এসেই ভাল গরুটাকে 'গড়ায়' বেঁধে রেখে অসুস্থ অকেজো গরুটাকে শিং ধরে ঘাড় মুচড়ে মুখটা শূন্যে তুলে ধরতে গরুটা মাটিতে পড়ে গেল ধমাস করে। তার চার পায়ে বেশ করে বেঁধে রেখে ঘর থেকে 'ছোরা' বার করে আনলে। তারপর 'ওজু' করে এল। আর বেটাকে বললে, 'ধর শালার গলার নালীটা বেশ করে চেপে!...'

অগত্যা আজাদকে ধরতেই হল। ছোরা চলল। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে ইনসানের বুক হাত ভিজিয়ে দিলে।...দু-টাকা কেজি দরে পাড়ার মুসলমানদের মধ্যে বিক্রি করে দিলে ইনসান মাংসগুলো।

কিন্তু চাষের মরশুম নেমেছে। গরু চাই। একটা গরুর দাম সাড়ে তিনশো চারশো টাকা। একশো বাঁশ বেচলে ইনসান একশো টাকায়, নারকোল বেচলে দু-শো টাকায় চারশো। এবার? স্ত্রীর গলার হারটা বেচে আরো দু-শো টাকা হল। তারপর দিন সাতেক পরে বহু দূরে দূরে গ্রামে ঘোরাঘুরি করে একটা গরু কিনে আনলে সাড়ে তিনশো টাকা 'গোচ্চা' দিয়ে। গরুটা পছন্দসই।

পরীবানু স্বামীর খোঁজ মেজাজ দেখে খাবার পর বললে, 'মেরে মেরে বউকে ছেলেকে বিগড়েছ, এবার নতুন গরুটাকে কালই হালে জুড়ে মার দিয়ে ভয়-'তরাসে' করে বিগড়ে দিও! আল্লা তোমাকে বনের বাঘ করে দিত যদি তাহলে ভাল হত। সদাই মার-হোক না-মার হোক ঘাড় মটকে রক্ত চুষে সুখ পেতে।'

ইনসান হেসে বললে, 'পরীবানু—বিবি

আমার—কত ধানে কত চাল হয়, তুমি কি বুঝবে!'

খবে আমার দরকার নেই। সাতটা ছেলের ছ-টা মরেছে, একটা আছে তাকেও তুমি খাবে। বাস্তুতে 'জীন' আছে, তাই ছেলে হলেই 'পেঁচোয়' পেয়ে মরে যায় শুনে হাসপাতালের মেম ডাক্তার বললে, 'ওসব বাজে কথা। মাদুলি কবচে—বাড়ি 'বন্ধ' করে 'নিশান' পুঁতে—'সরা' পড়া 'মালসা' পড়া দিয়ে কিছু হবে না—তোমার স্বামীর 'ট্রিটমেন্ট' করাও। রক্তে 'সিফিলিসে'র রোগ আছে। ছেলে পেলে বাঁচলেও পাগলাটে, বোবা, কানা, খোঁড়া, নিরেট বোকা হবে। তোমার স্বামী খুব গরম মেজাজের, না? আমি বলেছিনু, 'হাঁ!'

ইনসান বলে, 'ঐসব মেয়ে ডাক্তাররা মন্দ! ওদের কাছে বেশিদিন গেলে তোর ছেলেপুলে হওয়ার 'ফুলঘর' কেটে নেবে নাকের গোড়ায় 'ভিমুরি'-লাগা ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে!'

পরীবানু কিন্তু বিশ্বাস করে না। সে একদিন হাসপাতালে গিয়েছিল পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে—মেম ডাক্তারদের ব্যবহার, কথাবার্তা অত্যন্ত মধুর, মোলায়েম। তবে তারা বলেছিল বটে 'সুঁই' নেবার কথা!...

সে যাহোক ইনসানের নতুন গরুটা ভাল পিঠ দিল কিন্তু! হালে মইয়ে সমান। ইনসানের খুব আনন্দ। ছেলেও এখন তার বেশ বাধ্য হয়েছে। কাজকাম করছে। সে হাজার রকমের গাছ চেনে, একশো রকম ধান চেনে, মাটি চেনে। দুর্বার—দুঃসাহসিক। তবে, বড় একরোখা। কিছুদিন পরেই জোয়ান হয়ে উঠলে বোধ হয় বাপের সঙ্গেই মারামারি লেগে যাবে। আর তার শার্দুলের মতো বাপকেও সে হার মানিয়ে দেবে। একটা বড় মোরগ, আর কাগজের মতন পাতলা চালের আটার ৮০খানা রুটি খেতে পারে ইনসান। আজাদও তা পারবে। কেন না সে গোটা একটা ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে হজম করে ফেলেছে গতকাল। একসের গুড়, এক সের দুধ আর একটা ঝুনো নারকোল হজম করতে পারে সে। পেট ফাঁপে না তার। এক পণ 'বীজতলা' ভাঙতে পারে। রুয়েও দিতে পারে সবটা।

কিন্তু ইনসান হঠাৎ একরাত্রে স্বপ্ন দেখলে তার ঘর পড়ে যাচ্ছে হুড়মুড় শব্দে। ঘুম ভেঙে উঠে ছেলে, বউকে দেখলে, তারা ঘুমোচ্ছে, ঘরও ঠিক আছে। গোয়ালে গেল আলো নিয়ে। গিয়ে দেখলে নতুন সাদা গরুটা দাঁড়িয়ে আছে, 'পাঁজ' করছে না, পেট ফুলে দম্‌সম্‌। গরুটা ড্যাবডেবে চোখে হুঁ-ম্‌-ম্‌ শব্দে তার ব্যথা-কাতর অবস্থা জানালে। দু-চোখ বেয়ে তার জল ঝরছে। ছুটে গেল ইনসান গো-বদ্যির কাছে। গোবদ্যি এল। বললে, 'গরু বিষ খেয়েছে! বাঁচানো যাবে না।'

গো-বদ্যির পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল ইনসান। 'এমন গরু মারা গেলে আমি মারা যাব লক্ষণবাবু। আপনার পায়ে ধরি, ওষুধ দাও, ২৫ টাকা দেব আপনাকে।'

ওষুধ বেটে খাওয়ানো হল। হাতীশুঁড়ের গাছ, আড়াইটা গোলমরিচ, তুলসীপাতা, হলুদ, গঙ্গাজল। কিন্তু ভোর রাতে গরুটা মারা গেল গোঁ-গোঁ করে গোঙাতে গোঙাতে জিব বার করে। দেখলে কষ্ট হয়। ইনসান আজাদ, পরীবানু সবাই কাঁদতে লাগল হাউ হাউ করে। একটা ছেলে মরার শোক লেগেছে যেন ইনসান আর পরীবানুকে। গোয়ালের দেয়ালে ইনসান মাথা কুটতে লাগল গরুটাকে জড়িয়ে ধরে বসে।

গলার সোনা-বেচা সোনার গরু ছিল পরীবানুর। কতদিন সে খড় খইল ভুঁষি ভাত খাইয়েছে! এমন লক্ষ্মী গরুটাকে কে বিষ খাইয়ে মেরে দিলে! তারও যেন এমনি পুত্রশোক হয়। অভিশাপ করে পরীবানু।

গরুটাকে সকালে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে সকলে চলে এলেও আজাদ লুকিয়ে বসে রইল একটা বাঁশ বনের মধ্যে। শকুন নামার আগেই একটা কালো মতো লোক তখনি কোথা থেকে যেন উড়ে এসে গরুটার 'ছাল' ছাড়াতে শুরু করে দিলে। আজাদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে দাঁড়ালে। পাঁচ মিনিটও লাগল না মুচিটার, চামড়া ছাড়াতে।

আজাদ শুধোলে, 'চামড়াটা কত দিয়ে বেচবে?'

'পনেরো টাকা।'

'গরুটার দাম কত?'

'তা আমি কি জানি! তিন চারশো টাকা হবে।'

'তাহলে?'

মুচি দ্রুত হাতে চামড়াটা মুড়ে নিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিল। আজাদ হঠাৎ তার ছুরিটা নিয়ে গরুর পেটটা ফেড়ে ফেললে, পাকস্থলী চিরে বার করে আনলে কাঁচা কলা পাতায় মোড়া সেঁকো বিষ এতখানা। বললে, 'কিরে শালা, এ কার কাজ? কাল সন্ধ্যার আগে রাস্তার ধারে গরু বাঁধা ছিল, তুই শালা না বিষ খাইয়ে গেলে গরু মরার সন্ধান শকুনির আগেই-বা পেলি কি করে?'

মুচির হাত চেপে ধরে গোটা দুই ঘুঁষি মারতেই সেও আক্রমণ করলে। তার ইচ্ছা ছোট ছেলেটাকে মেরে দিয়ে চোখের আড়ালে মাঠ পার হয়ে সরে পড়বে। কিন্তু আজাদ তাকে শুইয়ে ফেলে চেঁচাতে লাগল। মুচি কামড়ে ধরলে আজাদের গলার নালীতে। তখন আজাদ বাধ্য হয়ে মুচির ছুরিটা হাত দিয়ে হাতড়ে নিয়ে তার পেটে আমূল বসিয়ে দিলে!

মুচি মারা গেল। গরুর বিদীর্ণ লাস পড়ে আছে।

লোকজন জুটল চারদিক থেকে। ইনসান ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে। 'বাহঃ—শেরের বাচ্চা শের! সাবাস্‌!'

কিন্তু পুলিস ধরে নিয়ে গেল আজাদকে। তার জামিন দিলে না। কমাস পরে বিচারের রায় বেরুল 'একের অপরাধে অন্যকে হত্যা এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাণ বাঁচানোর দায়ের লঘু অপরাধে আজাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড!'

তা হোক, ইনসান খুশী। তার ছেলে, প্রতিশোধ নিয়েছে, বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়েছে।

আবার কায়ক্লেশে টাকা জোগাড় করে গরু কিনলে ইনসান। আবার তেমনি একটা গরু।

তবু বাপের প্রাণ। ছেলেটার জন্যে হু হু করে। কবে ছ-মাস কাটবে? শক্ত কঠিন মাটি বিদীর্ণ করে চলে বাপ—তার চোখের জল পড়তে থাকে পৃথিবীর মাটিতে। দিন গুনছে সে কবে ছেলে ফিরে এসে ধামাভরা বীজ বুনবে সেই বাপের চষা মাটিতে।

আবদুল জব্বার

॥ ৩ ॥
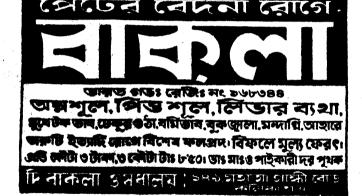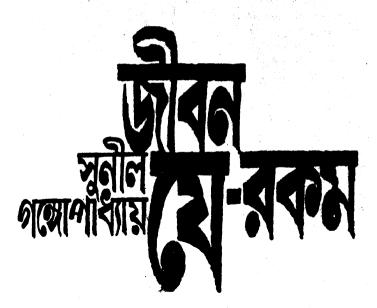
এ তো জানা কথাই যে আজ সব ট্রেন লেট হবে। আজ দীপুর বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে যে! স্টেশন ভীড়ে ভীড়াক্কার। কোথায় যেন একটা ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, পাঁচ ঘণ্টা ধরে কোনো ট্রেন আসেনি জামসেদপুরে। অরূপই বেশী উদ্বিগ্ন, সে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে খবর নিয়ে আসছে। দীপু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোহার থামে ঠেসান দিয়ে।

অরূপ তার বন্ধুর জন্য যতখানি সাহায্য করা সম্ভব তা করছে ঠিকই। কিন্তু তার মুখটা গম্ভীর। সে দীপুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলছে না। অরূপ বেশীক্ষণ তার পাশে দাঁড়াচ্ছে না, কখনো সে চলে যাচ্ছে জলের কল খুঁজতে, ফিরে এসেই তার সিগারেট কেনার কথা মনে পড়ে, আবার সে ট্রেনের খবর জানতে যায়। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোকদের মুখে একটা অপ্রসন্নভাব, অপেক্ষা করতে করতে সবাই অধৈর্য হয়ে গেছে। কেউ কেউ এ কথাও বললো, বর্ধমানের কাছে নাকি লাইনের ওপর সব লোকজন বসে পড়েছে, সুতরাং এদিক থেকে ট্রেন এলেও বর্ধমান পার হতে পারবে না। দীপু কান খাড়া করে শুনছিল লোকজনের কথাবার্তা, এক সময় সে লোকজনের মাথা পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরের দিকের গোল ধরনের অন্ধকারের দিকে তাকালো। সিগন্যালের লাল আলোর চার পাশে একটা জ্যোতি দেখা দিয়েছে না? আমার বাবা কি এতক্ষণে মারা গেছেন? আমি কি গিয়ে সত্যিই তাঁকে দেখতে পাবো না? না, তা হয় না। মরার আগে বাবাকে জেনে যেতে হবে, আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। আমি সত্যি ক্ষমা করেছি। বাবা মারা গেলে মুখাগ্নি করবে কে? দাদা কি আসবে? মেজদি বোধহয় অসহায়ের মতন হাঁসফাঁস করছে সারাক্ষণ।

—হ্যাঁ রে অরূপ, জামসেদপুর টু ক্যাল-কাটা কোনো বাস যায় না? আজকাল যে-রকম শিলিগুড়ি কিংবা দীঘা পর্যন্ত বাস চলে।

—জানি না।

—একটু খোঁজ নে না।

—বাস চললে কি আর এত লোক এখানে বসে থাকে?

—এদের বোধ হয় সবারই টিকিট কাটা হয়ে গেছে! বাইরে বেরিয়ে একবার দ্যাখ না।

—তুই যেতে পারছিস না?

এতক্ষণে দীপু বুঝতে পারলো, অরূপ তার ওপর রেগে গেছে। কেন? একটু এদিক-ওদিক ভাবতেই বুঝতে পারলো। বাসে মেয়ে দুটির জন্য জায়গা ছেড়ে দেবার পর, তারা ওদের একজনকে আবার বসতে বলেছিল। অরূপকে কোনো সুযোগ না দিয়ে বসে পড়েছিল দীপু। সত্যিই তো অনেক তফাৎ, সে এসেছে দুটি মেয়ের সঙ্গে পা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, আর অরূপ সারা রাস্তা এসেছে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে তাল সামলাতে সামলাতে। অথচ টিকিট অরূপই কেটেছিল। ইরার মনটা খুব ভালো লেগেছিল দীপুর, আর লোপামুদ্রাকে তার পছন্দ হয়নি কিন্তু তার শরীরের আঁচ নিয়েছে।

—কিন্তু তুই তো বিয়ে করছিস দু'মাসের মধ্যে!

হঠাৎ এ কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল অরূপ। বললো, তার মানে? বিয়ে করে অন্যায় করছি নাকি?' সেই জন্য আমাকে বাসের খোঁজে যেতে হবে?

—তা হলে তুই রাগ করছিস কেন? মেয়ে দুটোর পাশে বসতে পারিস নি বলে?

—কে বললো, রাগ করেছি?

—নিশ্চয়ই রাগ করেছিস! শুধু আমার ওপর না, মেয়ে দুটো যখন নামবার সময় তোকে নমস্কার করলো, তুই ভালো করে চেয়ে দেখলিই না!

—মোটেই না। তোর মতন যখন তখন কোনো মেয়ে দেখলেই আমি অমনি হ্যাংলার মতন—

সত্যি কথাটা শুনে অরূপ চটে গেছে, দীপু হা-হা করে হাসলো। হাসিটা শুনে অরূপ একটু কুঁকড়ে গেল। দীপুর মুখে হাসি শুনলেই তার বুকের মধ্যে আজ শিরশির করছে। যার বাবা এখন মৃত্যু শয্যায় কিংবা অলরেডি মারা গেছে, সে ওরকম ভাবে হাসে কি করে? সত্যি সত্যি গুরুতর কিছু না ঘটলে কি আর ও রকম টেলিগ্রাম পাঠায়?

দীপু বললো, এখন দু' একটা মেয়েটেয়ে দেখে নিতে পারতিস! স্বপ্নার সঙ্গে বিয়ে হলে সে আর কারুর দিকে তাকাতে দেবে না!

—স্বপ্না মোটেই ও ধরনের গোঁড়া মেয়ে নয়! এই তো একদিন স্বপ্নার বন্ধু নুপুরকে দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এলগিন রোডের মোড়ে—ট্রাম-বাসে উঠতে পারছে না, ট্যাক্সি পাচ্ছে না—আমি একটা ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলাম, ওকে লিফ্‌ট দিলাম। স্বপ্না তাই শুনে বললো—

—নুপুর নামটা খুব সুন্দর তো!

—তুই দেখিস নি নুপুরকে? আর্ট কলেজে পড়ে, দারুণ সুন্দর দেখতে—ফিগারখানা যা না

—আচ্ছা, নুপুর আর ঘুঙুর কথা দুটোর মানে কি এক! তা হলে আজকাল আর নুপুর না বলে ঘুঙুর বলে কেন সবাই?

—কে জানে! শোন্ না, নুপুরকে দেখে স্বপ্নার দাদা তো একেবারে ফ্ল্যাট। আমাকে একদিন বললো, নুপুরকে দেখলে মনেই হয় না বাঙালী, ঠিক যেন কাশ্মীরী মেয়েদের মতন বড় বড় চোখের পাতা।

—শোন অরূপ, তোকে অনেকদিন থেকে

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলুম... তুই কবে স্বপ্নাকে প্রথম বিয়ের কথা বললি? তার আগে কি বলেছিলি, আমি তোমায় ভালোবাসি?

—ধ্যাৎ!

—বল্ না, লজ্জা কি! আমি মাইরি ঠিক বুঝতে পারি না, ঠিক কোন্ মোমেণ্টে ঐ কথাটা বলতে হয়!

—তুই শান্তাকে কোনোদিন বলিস্ নি?

—শান্তাকে? না! আর একজনকে বলবো বলবো ভেবেছিলুম অনেকবার, কিন্তু মুখে কি রকম আটকে গেছে! তুই কি করে বলেছিলি, বল্ না? শিখে নি।

যেন সত্যি সত্যি গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছে, এইভাবে অরূপ গলার আওয়াজ খানিকটা ভারিক্কী করে বললো, ও কথাটা ঠিক মুখে বলার দরকার হয় না সব সময়, মনে মনেই জানাজানি হয়ে যায়! অনেক মেয়ের সঙ্গেই তো অনেক ছেলের চেনা হয়, কিন্তু তার মধ্যে ঠিক একজন আরেক-জনকে চুম্বকের মতন টানে—কেন যে টানে তা কেউ বলতে পারে না—দ্যাট ইজ লাভ

—তা তো বুঝলুম! কিন্তু বিয়ের কথাটা তো আর মনে মনে থাকলে চলে না—সেটার জন্যে তো মুখ ফুটে একদিন প্রস্তাব করতেই হবে। সেইটা ঠিক কখন

অরূপ এবার সুযোগ পেয়েছে, সে দীপুর উদ্দেশ্যে পিঠ চাপড়ানি হাসি-হাসলো। গর্বিত মুখভঙ্গি করে বললো, জেনুইন ভালোবাসা হলে সেই মুহূর্তটা ঠিক বোঝা যায়। তুই যাকে ও-কথাটা বলবি ভেবেছিলি, তাকে বলতে না পারার জন্য সে নিশ্চয়ই ফস্কে গেছে? ঠিক সময়টায় বলতে না পারলে—

—আমি তাকে বিয়ে করতে চাই নি। আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম, 'আমি তোমায় ভালোবাসি'। কিন্তু সে-কথাটা বলতেই এমন লজ্জা করলো! যাক্ গে, তুই স্বপ্নাকে কি করে বললি?

—তুই যার কথা বলছিস, তাকে আমি চিনি। কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে তাও আমি জানি! তুই খুব আঘাত পেয়েছিলি নারে?

—মোটেই না। স্নিগ্ধা বিয়ে করতে চাইলেও আমি বিয়ে করতুম না। তোর মতন এমন চব্বিশ বছর বয়েসে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার একটুও নেই!

—আজকাল ফরেনে অনেক ছেলেমেয়ে সতেরো আঠেরো বছর বয়েসে বিয়ে করে।

—তুই ফরেনে জন্মালেই পারতি! অতদূরে কেন, বিহার-উত্তর প্রদেশেও তো এখনো অনেকের আট ন বছর বয়েসে বিয়ে হয়!

—তুই আমার বিয়ে করাটা পছন্দ করছিস না?

—না, না, কেন করবো না। আচ্ছা, তুই যখন স্বপ্নাকে প্রথম বিয়ের কথাটা বললি, তখন স্বপ্নার মুখখানা কি রকম হলো? প্রথমটা খুব লজ্জা পেয়েছিল?

—তানসেন মিউজিক কনফারেন্সে, লাস্ট নভেম্বরে স্বপ্নারা বাড়ি সুদ্ধু সবাই গিয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম একা—

দীপুর বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না যে অরূপ বানাচ্ছে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল তা হুবহু বলবে না। কেউই বোধ হয় বলে না। তবু দুটো টান টান করে আছে অরূপ, যেন স্বপ্নাকে বিয়ে করলে সে অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যাকে পেয়ে যাবে।

অরূপ বলে চলেছে, আমি বসেছিলাম স্বপ্নাদের রো-এর ঠিক পেছনেই। রাত চারটের সময় আলি আকবর খাঁ স্বরোদে ধরেছেন কালেংড়া, স্বপ্নার বাড়ির সবাই তখন হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে—স্বপ্না বাইরে এলো চা খেতে, আমিও উঠে এলাম। স্বপ্না আমাকে আগেই দেখেছিল, আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওর দাদার সঙ্গে—স্বপ্না আর আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম—মহাজাতি সদনের উল্টো দিকে একটা ছোট্ট পার্ক আছে দেখেছিস তো? সেটায় ঢুকতে গিয়ে দেখি এক গাদা ভিখিরি-টিখিরি শুয়ে আছে। তখন আমাদের গাড়িটার মধ্যে এসে বসলাম! এত অপূর্ব লাগছিল না! ভালো করে ভোর হয়নি তখনো, একটু একটু আলো ফুটেছে, রাস্তায় একটাও মানুষ নেই—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া, ওদিকে ভেসে আসছে কালাংড়ার সুর। আমি স্বপ্নার একটা হাত তুলে নিয়ে খেলা করতে লাগলাম—

দীপু একটা ছোট্ট কাশি দিল, খক্ কো।

আরক্তিম মুখে অরূপ বললো, তুই যা ভাবছিস মোটেই তা নয়! আর কিচ্ছু করিনি, এই তোকে ছুঁয়ে বলছি। সত্যিকারের ভালোবাসা হলে অসভ্যতা করার দিকে মন যায় না। স্বপ্না সে রকম মেয়েও নয়। আমার তখন খুব ভালো লাগছিল, আবার কি রকম কষ্টও হচ্ছিল বুকের মধ্যে। আমি স্বপ্নাকে বললাম, আমার ভেতরে বসে শুনতে একদম ভালো লাগছিল না। ও জিজ্ঞেস করলো, কেন? আমি বললাম, তুমি বুঝতে পারো না? আমি যদি তোমার পাশে বসতে পারতাম...স্বপ্না দুষ্টুমি করে হেসে বললো, কেন তোমার ডান পাশেও তো একটা খুব সুন্দর দেখতে বসেছিল—একটা দারুণ স্টোল পড়েছে যে মেয়েটা...আমি বললাম, অন্য কোনো মেয়েটেয়ে আমি গ্রাহ্য করি না—আমি শুধু তোমার জন্য...স্বপ্নাই তখন ফট করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো? আমি বললুম...

হাসি লুকোবার জন্য দীপু একটা সিগারেট ধরালো, নয়তো এমনিতে সে বেশী সিগারেট খায় না। হাসার কোনো মানে হয়

মা যদিও, কিন্তু পাচ্ছে তার কি করা যাবে! একটা ছেলে আর মেয়ের কাছে এটা হয়তো জীবন মরণের ব্যাপার, কিন্তু অন্য কেউ যখন সেটা মুখে শোনে তখন হাসি পাবেই। সেও তো যেদিন প্রথম স্নিগ্ধার হাত ছোঁয় —সেদিন তার সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপেছিল। কিন্তু, আমার কি বাবা মারা গেছে এর মধ্যে? আমি কি পিতৃহীন? আমার শরীরটা হঠাৎ এত হাল্কা লাগছে কেন? যেদিকে কলকাতা, দীপু সেই অন্ধকারের দিকে খর চোখে তাকালো। কলকাতা পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না, দীপু তার মনের মধ্যেও কলকাতার কোনো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে না।

অরূপ বলে চলেছে: যখন ভেতরে ফিরে এলাম, স্বপ্নার বাড়ির লোক তখনও ঘুমোচ্ছে, আলি আকবরের সঙ্গে তখন কেরামতুল্লার লড়াই চলছে, তবু ঘুম ভাঙে নি—

—মটকা মেরে ছিল বোধ হয়। কিংবা তোদের ফিরতে দেখেই আবার চোখ বুজেছে

—তার মানে? কেন!

—তোদের চান্স দিচ্ছিল! দ্যাখ অরূপ, এক হিসেবে তোকে আমার খুব হিংসে করার কথা।

অরূপ আবার গর্বিত ভাবে বললো, আমাকে? কেন, স্বপ্নার জন্য?

—না, না, স্বপ্নাকে আমি ভালো করে চিনিই না! হিংসে হওয়া উচিত এই জন্য যে তোর বাবা মা দুজনেই বেঁচে আছে—তারা তোকে কত ভালোবাসে। তুই একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলি, অমনি তোর বাবা-মা আর সেই মেয়েটার বাবা-মা হইহই করে আনন্দে রাজী হয়ে গেল! তোর কোনো কিছুরই অভাব নেই, যখন যা চাইছিস বাড়ি থেকে পেয়ে যাচ্ছিস—বি কম্ পরীক্ষার আগে তোর জন্য দুজন প্রফেসার রাখা হয়েছিল।—আমার দ্যাখ এর সবই উল্টো! তবুও, আমি কিন্তু তোকে কখনো হিংসে করি না! কেন করি না জানিস? আমি জানি, চিরকাল তো আর এ রকম চলবে না, গরীবরা কষ্ট পাবে আর বড়লোকরা শুধু আনন্দ করবে। দেখিস, তোদের টাকা পয়সা একদিন সব বিলিয়ে দিতে হবে।

—দিতে হয় দেবো! আমার অত টাকার ফাকার ওপর মায়া নেই! কিন্তু এসব কথা তোর মুখে মানায় না! তুই নিজে একদিন টাকা চুরি করেছিলি।

—আমি তো টাকা চুরি করিনি! আমি দেখতে গিয়েছিলুম, টাকা চুরি করতে কি রকম লাগে।

—ও তাই বুঝি? তুই আমার টর্চটা কি করেছিস? সেটাও বুঝি দেখতে গিয়েছিলি, অপরের টর্চ হারিয়ে ফেলতে কেমন লাগে?

—তুই দেখছি টর্চটা হারানোর দুঃখ এখনো ভুলতে পারিস নি?

—টর্চটা বাবা আমার জন্য এনেছিলেন নেপাল থেকে।

—তোর বাবা ইচ্ছে করলে ও রকম একশোটা টর্চ এক্ষুনি আবার আনিয়ে দিতে পারেন।

—তা বলে তুই আমারটা হারাবি? তোকে বলে দিচ্ছি একটা কথা, তুই আমার বাবা সম্পর্কে ও রকম খোঁচা মেরে কথা বলবি না।

—খোঁচা মেরে কথা বললুম কখন?

—নিশ্চয়ই বলিস্! আমি আজ দুপুর থেকেই লক্ষ্য করছি। সোজা কথা বল্ না, ইউ আর জেলাস! তোর বাবা সব বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে বলে তোদের এখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তাই তোর রাগ। আমার বাবা নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন।

—সত্যি অরূপ, বিশ্বাস কর, আমার বাবার ওপরে আমার কোনো রাগ নেই। বিষয়-সম্পত্তি আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোর বাবার ওপরেও

ফল হলো এই, বাকি সময়টা ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। দুজনে দুটো সুটকেসের ওপর আড় হয়ে বসে রইলো, অরূপের ফর্সা মুখখানা উত্তেজনায় লালচে, দীপু চেয়ে আছে অন্ধকারে—যেদিকে কলকাতা। অরূপ তক্ষুনি ঠিক করে ফেলেছে, আর কোনোদিন এ রকম বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে আসবে না। বিয়ের পর স্বপ্নাকে নিয়ে সে ডালহৌসি পাহাড়ে যাবে। চাইবাসাটা অতি বাজে জায়গা, কিছুই দেখার নেই—এত নোংরা চারদিকে! দীপুর খালি বড় বড় কথা, অমুক জায়গায় যাবো, তমুক জায়গায় যাবো, আসলে কিছুই চেনে না। এর চেয়ে, সেবার পুরীতে—

দীপু অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পেয়ে, চোখ সরিয়ে আর একটা কোনো বস্তু খুঁজতে লাগলো—যার ওপর চোখ ফেলে সে তন্ময় হতে পারে। একটা কলাওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, এই ব্যাপারটা তার মনোযোগ কেড়ে নেয়। একটি ফর্সা হিন্দুস্থানী বউ কয়েকটা বাচ্চা ও বাঁচি সমেত বসে আছে মাটির ওপর, মাঝে মাঝে হাওয়ায় আঁচল সরে গেলে দেখা যায় তার পুরুষ্টু বুকের ভাঁজ—সেদিকে তাকাবে না ঠিক করলেও বারবার চোখ চলে যায়। অথচ দীপু দেখতে চাইছে কলকাতায় তার বাবা এখন ঠিক কি অবস্থায় আছে। মৃত্যুর আগে বাবার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া যে বিশেষ দরকার! মেজদি কি বুঝতে পারছে যে, টেলিগ্রাম পেয়েও আমি ইচ্ছে করে দেরী করছি না?

রাত প্রায় তিনটে আন্দাজ একটা ট্রেন এলো ঝনঝনিয়ে। অরূপ আর দীপু দুজনেরই অবশ্য এসেছিল, ধড়মড়িয়ে উঠেই ছুটলো। দুজনে একই কামরায় উঠলো বটে, কিন্তু পাশাপাশি রইলো না। বসবার জায়গা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ধাক্কাধাক্কিতে দুজনে ছিট্‌কে গেল। বাথরুমের পাশে মালপত্রের পাহাড়ে ঠেস দিয়ে রইলো অরূপ, দীপু চলে গেল ভেতরের দিকে, দুটো সিংগল্ সীটের মাঝখানে বেকায়দায় দাঁড়ালো। অরূপ কখনো থার্ডক্লাসে চাপে না, তারই কষ্ট হচ্ছে খুব। গালুডিতে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে দীপু একটা সিট পেয়ে গেল, সুটকেস রেখে তাড়াতাড়ি সেটা দখল করে সে চেঁচিয়ে ডাকলো, এই অরূপ এখানে জায়গা পেয়েছি, বসবি আয়! অরূপ কোনো সাড়া দিল না।

ক্রমশঃ

বিদেশের চোখে পথের পাঁচালি

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রকাশের দিন থেকেই বাংলা দেশের জনচিত্তে 'পথের পাঁচালী' সমাদরের স্থান পেয়েছিল। কিন্তু বিদেশে এ বইয়ের নাম কেউ জানত না। সত্যজিৎ রায় যখন আমাদের এই ঘরের কথাকে বিশ্বের দরবারে হাজির করলেন, তখন অনেক মুগ্ধ দর্শকের উপন্যাসটি পড়ার আগ্রহ হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে তাঁরা হতাশ হন : অনুবাদ-সমৃদ্ধ ইংরেজীতে পথের পাঁচালীর কোনো ভাষান্তর নেই। তবে তাঁরা একটু আশ্বস্তও হয়েছিলেন অন্য একটি খবরে : সম্মিলিত জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা পথের পাঁচালীর ইংরেজী অনুবাদের ব্যবস্থা করাচ্ছেন।

সেই বহু-প্রত্যাশিত অনুবাদ-গ্রন্থটি সম্প্রতি বিলেত ও আমেরিকায় এক সংগে প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্যোগে ইউনেসকোর সহযোগী হয়েছেন ভারতবর্ষের সাহিত্য অ্যাকাডেমি। বইটি প্রকাশ করেছেন অ্যালেন্ অ্যান্ড আনুইন্।

পরিচ্ছন্ন প্রকাশগুণে পঁয়ত্রিশ শিলিং দামকে বিদেশী মানে বেশী মনে হয় না। দেশী মানে একটু বেশী নিশ্চয়ই। পেপার-ব্যাক্ বা ঐ জাতীয় কোনো সুলভ সংস্করণ বেরোলে ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে সুবিধে হয়।

নিজের ছায়াছবি থেকে নিয়ে প্রচ্ছদ করেছেন সত্যজিৎ রায়। সামনের প্রচ্ছদে অপু ও পেছনের প্রচ্ছদে দুর্গা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে মাঠে বাংলা দেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়।

বাংলার জল-হাওয়া-গাছ-পাখি-মাটিতে পথের পাঁচালী এত বেশী নিষিক্ত যে, এর ভাষান্তর অত্যন্ত দুরূহ। এই দুরূহ কাজটির দায়িত্ব ছিল টি ডব্লু ক্লার্ক এবং তারাপদ মুখার্জির ওপর। উভয়েরই ইংরেজী ও বাংলায় বিশেষ অধিকার আছে, উভয়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল্ অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ্-এ অধ্যাপনা করেন। অনুবাদটিতে নিষ্ঠা আছে, আছে অনুরাগ।

ইংরেজীতে উপন্যাসটির নাম দেওয়া —'সং অব্ দ্য রোড'। মিঃ ক্লার্ক ভূমিকায় বলেছেন, যেহেতু পাঁচালীর কোনো প্রতিশব্দ নেই, তাই বাঙালীদের পরামর্শে নিকটতম অর্থের এই 'সং' শব্দটি তিনি বেছেছেন। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে হয়তো তিনি বইয়ের নাম দিতেন 'Bend of the Road'। এ কথাটা মূলে বইতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। আর এতে স্তর্কবিভক্ত পথ ও বাঁকের অন্তরালের অজ্ঞাত অনিশ্চয়তার অর্থটি ভালো আসে। একজন সমালোচক অ্যান্টনি বেক্সিন্স্ মনে করেন, 'Ballad of the Road' হলে নামটি সঠিক হতো।

বইটির দুটি ভাগ। 'The Old Aunt' এবং 'Children make their own toys' —'বল্লালী বালাই' ও 'আম-আঁটির ভেঁপু'-র রূপান্তর। 'অক্রূর সংবাদ' বাদ। ফিল্মের মতই বই শেষ করা হয়েছে অপুর নিশ্চিন্দি-পুর ত্যাগের আখ্যানে।

ভূমিকায় বিভূতিভূষণের জীবনী ও সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশে অপরিচিত একান্ত বাঙালী প্রসঙ্গগুলির স্বতন্ত্র টীকা আছে।

বিলেতে একাধিক পত্রিকায় 'সং অব্ দ্য রোড'-এর সমালোচনা বেরিয়েছে। নানা দৃষ্টির কাগজে সমালোচনারও বিভিন্নতা আছে।

তবে সকলেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বইটির আলোচনা করেছেন। অনেক কাগজে হয়তো 'পথের পাঁচালী' সহ একাধিক বইয়ের সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সব বইয়ের শীর্ষে প্রথমেই রাখা হয়েছে 'পথের পাঁচালী'কে এবং গোটা সমালোচনার নাম দেওয়া হয়েছে পথের পাঁচালীর নামে। যেমন,

সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ

অক্‌স্‌ফোর্ড মেল্‌-এ (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮) পথের পাঁচালী ও আরো দু'টি বইয়ের সমালোচনার শিরোনাম : RIPE BENGALI VERITIES, লণ্ডনের দ্য লিস্‌নার পথের পাঁচালী সহ চারখানি বইয়ের আলোচনার নাম দিয়েছেন : The World of Opu. উভয় ক্ষেত্রেই নামের ক্রমে শীর্ষে রয়েছে সং অব্‌ দ্য রোড্‌।
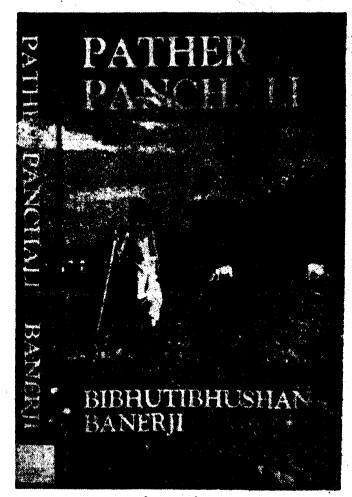
অক্‌স্‌ফোর্ড মেল্‌-এর সমালোচক এম জি ম্যাক্‌নে তাঁরা লেখা আরম্ভ করেছেন এই লাইনটি দিয়ে : 'Pather Panchali is a marvelous book'। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করেছেন যে, পথের পাঁচালীর জগৎ শিল্পোন্নত পশ্চিমী দুনিয়া থেকে ভয়ংকর-রকমের আলাদা এবং তাই এই দুনিয়ার কাছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক।

মিঃ ম্যাকনে অনুবাদকের নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেও একটি মত-পার্থক্যের কথা বলেছেন। সং অব দ্য রোডের পরিসমাপ্তি পথের পাঁচালীর থেকে আলাদা হওয়ার কারণ—অনুবাদকদের মতে : '......লেখক ছিলেন এত সরল যে, তিনি জানতেন না কোথায় থামাটা সবচেয়ে ভাল।' মিঃ ম্যাকনে লেখককে এতটা সরল বলে ভাবতে প্রস্তুত নন : '...বইটি এত সুলিখিত যে, সাধারণ পাঠক লেখককে এতটা সরল ভাবতে পারেন না। লেখক নিজেই হয়তো অত পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি চাননি। তিনি হয়তো জানতেন যে, জীবন উপন্যাসের মত অত মাপা নয়। উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্তকে হয়তো তিনি অত বেশী শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধতে চাননি।'

বই তো শুরুই হচ্ছে একটি 'সমাপ্তি' দিয়ে—ইন্দির ঠাকরুনের সমাপ্তি। ইন্দিরের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও সর্বজয়া একজন সাধারণ মানুষ—সদয়, মা হিসেবে ভাল, এ জীবন যতটা অনুমোদন করে ততটা সংবেদনশীল। তারপরে কাহিনী চলে গিয়েছে সর্বজয়ার স্বামী, পুত্র ও কন্যার মধ্য দিয়ে। প্রতিটি পরিচ্ছেদ 'আলগা এলোমেলোভাবে বলা, জীবনের খুঁটিনাটির দিকে খুবই নজর, কিন্তু বিশ্বাসের স্বাক্ষর সর্বত্র—যা পশ্চিমী সাহিত্য থেকে বর্তমানে নির্বাসিত। এ বইতে পুরোনো চিরন্তন মৌলিক সত্য উদ্‌ভাসিত।

পরিত্যক্তা বৃদ্ধা ও অবোধ শিশুর কাহিনী এটি, কিন্তু এ কাহিনী জীবনকেই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে, তার মুখ্য কারণ, এ জীবন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ ম্যাকনে তার পর আরো অগ্রসর হয়ে বলছেন যে, এখনকার পাশ্চাত্যের লেখকেরা জানেন বিচ্ছিন্নতা, যৌনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা ও স্নায়বিক বিপর্যয়, কিন্তু এই বাঙ্গালী লেখকের কাছ থেকে পাশ্চাত্যের লেখকদের দু'-একটি মূলগত বিষয় শেখবার আছে।

লণ্ডনের দ্য লিসনার কাগজের সমালোচক রিচার্ড জোনস। পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে তাঁর মার্ক টোয়েনের হাকলবেরী ফিন-এর কথা মনে পড়েছে : হাকলবেরী ফিন-এর মতই এ বই শিশুদের নিয়ে লেখা কিন্তু শিশু ও বয়স্ক উভয়ের জন্যে লেখা।

প্লট বলে তেমন কিছু নেই। বইয়ের অগ্রগতি ধীরে এক আখ্যান থেকে আর এক আখ্যানে এবং সব পরিচ্ছেদই যেন মুখে মুখে বলা গল্পের মত। বইয়ের পটভূমির জন্য ব্যানার্জি তাঁর নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছেন, এবং খুব খুঁটিয়ে যখন ডিটেল-এর পর ডিটেল তিনি যোগ করে যান, তখন 'a general impression of fruits, flowers, clouds, water and children is created, so that the visual effect is rather like that of a Douanier Rousseau picture.'

একটি গুণ—যা উপন্যাস-সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ—পথের পাঁচালীতে তার প্রাচুর্য আছে। গুণটি হচ্ছে, 'জীবনের ছোটখাট জিনিসের প্রতি মমতা। বইতে আছে সাধারণের একটি ছন্দ : ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পাশ্চাত্যে অপরিচিত বঙ্গীয় গ্রামীণ জীবনযাত্রা, এবং প্রতিকূলের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম।'

বইতে কোথাও ভাবাতিশয্য নেই। চরিত্র-গুলিকে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণ অবজেক-টিভিটি দিয়ে।'

রিচার্ড জোনসের শেষ মন্তব্যটি উপন্যাসকে ছাপিয়ে আমাদের সমাজের ঘাটে ঢেউ তোলবার মত : ছোট মেয়েটির প্রতি তার মা-বাবার, বিশেষত মা-র ব্যবহারে একটা বোধহীন অসাড়তার চিহ্ন বর্তমান, যে অসাড়তা পাশ্চাত্য উপন্যাসে শিশু অপরাধের উৎস অনুসন্ধানেই মাত্র লিখিত হয়, কিন্তু এখানে তা সেরকম বিশেষ কোনো দৃষ্টি বা মন্তব্য ছাড়াই লিখিত।'

১৯৬৮-র ৭ই ডিসেম্বর এডিনবরার দ্য স্কটসম্যান পত্রিকায় মার্টিন সেমুর-স্মিথ পথের পাঁচালীর যে সমালোচনাটি লেখেন, তার নাম দেন—'দ্য বেস্ট অব ব্যানার্জি''।

এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় একটা উপন্যাস ইংরেজীতে এত দিন অনূদিত হয়নি বলে প্রথমেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, অনুবাদে কোনো আড়ষ্টতা নেই। বইটি 'পড়তে একদম বাধে না।' 'পড়তে সুন্দর।' এর পরে বিভূতিভূষণের দীর্ঘ পরিচয়, পথের পাঁচালীকে বলেছেন চার চরিত্রের একটি 'haunting story'। এ বই 'একটি সুন্দর কিন্তু কঠিন শৈশবের কাহিনী।' এবং এ শৈশব, সবটুকু না হলেও অনেকটাই ব্যানার্জি'র নিজের। পথের পাঁচালী সেই জাতের একটি সুন্দর বই, যার লেখক ও বিষয়ের শুধু পরিচয় দেওয়া ছাড়া সমালোচকরা আর বেশী কিছুই বলতে পারে না। পরিশেষে সমালোচক আশা করেছেন যে,

বাংলা ভাষার এই ক্লাসিক গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষাতেও ক্লাসিকের মর্যাদা পাবে।

বার্মিংহাম পোস্ট, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮। চারখানি উপন্যাস সমালোচনা করেছেন আর সি চার্চিল। বই চারটির মধ্যে সবচেয়ে ওপরের নাম—পথের পাঁচালী। কিন্তু প্রবন্ধের শিরোনামে কোনো উপন্যাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। নিরপেক্ষ শিরোনাম—নিউ ফিকশন। গোড়াতেই সমালোচকের মনে পড়েছে হাকলবেরী ফিন এবং ডেভিড কপারফিল্ডের কথা :

'To this small group of peculiarly "native" masterpieces belongs Banerji's famous novel PATHER PANCHALI'. টোয়েন ও ডিকেনসের মত ব্যানার্জির নায়ক অপুও লেখকের আত্মছায়ায় রচিত।

উপসংহারে সমালোচক অপুর মতই পল্লী-ভারতের—কালহীন ভারতের—অংশভাক হয়েছেন, যেমন দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় পাঠকরা কালহীন মিসিসিপির ও ডোভার রোডের অংশভাক হয়েছে। আর তখনই বোঝা যাচ্ছে 'বড় হয়ে উঠলেই টের পাওয়া যায় যে, এটি একটি ছোট্ট পৃথিবী।' এই উক্তিটি দিয়েই আলোচনা শুরু করেছিলেন সমালোচক, সেটি প্রতিপন্ন করে আলোচনা শেষ।

পয়লা ডিসেম্বর, ১৯৬৮, লিভারপুল ডেইলি পোস্ট-এ বেরিয়েছে আনটনি বেভিনস-এর আলোচনা : Bengal tapestry। এ বইয়ের বদলে উ অব দা রোড, নাম তিনি সঠিক মনে করেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

প্রথমে বাংলা দেশের দারিদ্র্যবেদনাই বেভিনসের চোখে পড়েছে বেশী। বইয়ের গুণের কথা এসেছে একটু পরে। এ বইকে ক্লাসিক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। শিশুর বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখা এ কাহিনীতে হের বেনি ও ডেভিড কপারফিল্ডের কিছু সূক্ষ্ম গুণ বর্তমান বলে তিনি মনে করেন।

পথের পাঁচালী বাংলা দেশে বহু দিন ধরেই বেস্ট সেলার, এবং তা বিনা কারণে নয়। এ বইয়ের প্রধান গুণ সুস্পষ্ট সজীব পরিবেশ অঙ্কন—যে পরিবেশ রহস্যময় সৌন্দর্য ও ভীতিতে পূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে দুটি শিশু, যারা স্বপ্নের ওপর বেঁচে আছে। নিষ্পাপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু দুটি এক অসীম পথে হাঁটতে পেয়ে খুশী। বাবা-মা একটি কোন সীমা পাওয়ার জন্যে হাতড়াচ্ছে। এই পরিবেশ 'So overful of a mystical beauty and terror, gives the boy his simplicity and takes his sister's life. It just wears the parents out.'

ব্যানার্জির বিশেষ সাফল্য চরিত্রগুলির চার দিকে রীতিনীতি ও আচার-সংস্কারের বয়নে। এর ফলে এ বই 'নিছক গল্পের চেয়ে কিছু বেশী, এ জন-মানসের কাহিনী।'

সানডে টাইমস-এ সমালোচনা প্রসঙ্গে জুলিয়ান সাইমনস বলেছেন যে, সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের কল্যাণে পথের পাঁচালী পশ্চিমে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্র-নিরপেক্ষভাবেই এ বই পাঠযোগ্য। বইটিতে দরদ ও মাধুর্য দিয়ে বিশেষ দশকের ভারতীয় গ্রামজীবনকে আঁকা হয়েছে। ব্যানার্জি একজন 'unsophisticated' লেখক। ইংরেজী পাঠকের কাছে তাঁর লেখার আকর্ষণ হচ্ছে, 'সরল প্রত্যক্ষতা... সহানুভূতি...'

পরিবারটি দারুণ রকমের দরিদ্র, এবং অনেকটা এই দারিদ্র্যের দিক থেকেই বইটির একটি বিশ্লেষিত সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। পরে সমালোচক বলছেন যে, এই কাহিনীসার থেকে বইটিকে একটা 'sob story' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যানার্জির 'সারল্য খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে ভাবালুতাকে বাদ দিয়েছে।'

সমালোচনা শেষ করছেন ব্যানার্জির চেষ্টাহীন বাস্তবতার প্রশংসায় :

'this unforced realism gives his fiction the quality of an artless, unembittered, gently imaginative stretch of autobiography.'

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, ইনকোয়ারার কাগজে পথের পাঁচালীর সমালোচনা করেছেন আইফান হোসগুড। সমালোচকের মতে এটি ঠিক উপন্যাস নয়, এটি 'উপন্যাসের আধারে আত্মজীবনী'। সেই-জন্যে প্লট বা চরিত্রের বিবর্তন এখানে সামান্যই আছে।

চরিত্রগুলি একটা রাস্তাকে অতিক্রম করছে—যে রাস্তা বাংলার পল্লীর মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে, চলেছে ছোট গ্রাম, সমতল ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। এই পথের ওপরকার ঘটনা দেখানো হচ্ছে একটি কল্পনা-প্রবণ শিশুর চোখ দিয়ে। শিশুটি দরিদ্র ও প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকলেও দৈনন্দিন জীবন-ঘটনায় সে আনন্দ পায়, এতে ঔৎসুক্য আছে তার। লেখক কথায় ও ইঙ্গিতে পল্লীর মহৎ সৌন্দর্যকে সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু এ পল্লীপ্রকৃতি অনেক সময় নিষ্ঠুরও। বর্ষার জলধারায় দরিদ্র কুটিরটির বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্য এত জীবন্ত যে, পাঠক সর্বজয়ার আতঙ্ক ও অসহায়তাকে নিজের বলে উপলব্ধি করে। যাত্রাদলের আবির্ভাবে অপুর উল্লাস ও শিহরণে পাঠকও হয় অংশীদার। অপুর আকস্মিক বন্ধুলাভে আনন্দ, অপ্রত্যাশিত কোনো খুশি এবং দিদির মৃত্যুতে মর্মান্তিক শোক—এ সব অপুর মতই পাঠকেরও জীবনাংশে পরিণত হয়।

এই সব মন্তব্যের পরে সমালোচক লেখা শেষ করেছেন এইভাবে : 'দুঃখ ও সুখ জীবনের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে, বলাই অসম্ভব কোনটা প্রধান, এবং এর অনিবার্যতাই এ বইয়ের ভাববস্তু। ঘটনা-গুলি আমরা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু বাংলা দেশের সেই গ্রামে বাস করবার স্মৃতি মন থেকে যাচ্ছে না।'

লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফে আলোচনা করতে গিয়ে মাইকেল ম্যাকসওয়েল স্কট বলেছেন, 'আমাদের রাস্তা এখন মোটর-

মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। উপন্যাসটি অন্তত অংশত আত্মজীবনীমূলক, এবং ঘটনা নির্বাচনে অপটু।'

তিনি তাঁর লেখার উপসংহারে পৌঁচেছেন এইভাবে : 'স্থানীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান—এইসব অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে, কিন্তু দুঃখ বা তুচ্ছতা নির্বিশেষে প্রতিটি ঘটনাই সমান বল ও জোর দিয়ে বলা। রবীন্দ্রনাথ থেকে যেসব ইংরেজ পাঠক আনন্দ পেতে পারে, তাদের কাছে এ বইয়ের আবেদন জোরালো হবে বলে অনুমান করি'।

তবে এই সমালোচকের কাছে এ বই 'pretty, exotic, and rather boring.'

পথের পাঁচালী এত বেশী 'বাঙালী' যে, এ বই—যা আমাদের খুব প্রিয়—তা দুনিয়ার হাটে কার কেমন লাগবে, এ সম্পর্কে বাঙালীদের আশংকা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সুখের বিষয়, বিদেশের সাহিত্যের রসগ্রহণের জন্য মনের যে বিস্তার প্রয়োজন তা এখন সব দেশেই বেড়েছে। এখানে যে সমালোচকদের আমরা দেখলাম, তাঁদের প্রায় সবারই—একজন বাদে—এ বই মোটের ওপর ভালই লেগেছে বলা যায়।

তবে যে-কোনো ভাল বই সম্পর্কে যা ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। নানা লোকের নানা দিকে চোখ পড়েছে। কেউ এ বইয়ে মৌলিক সত্যের উপস্থাপন লক্ষ করেছেন। কেউ বলেছেন, রীতি-সংস্কার-বিশ্বাসের আবেষ্টনে এ বই উপন্যাসের চেয়ে কিছু বেশী। অনেকেই উপন্যাসটিতে আত্মজীবনীর ছায়া দেখতে পেয়েছেন। সমগ্র পশ্চিমী জগতের সমালোচকদের প্রায় সকলেরই চোখে পড়েছে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের প্রসংগটি। বাংলা দেশের জীবনের খুঁটিনাটি ও সেই খুঁটিনাটির প্রতি লেখকের প্রীতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, নিবিড় প্রকৃতিপ্রীতির প্রসংগটি অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ডেইলি টেলিগ্রাফেই মাত্র প্রসংগটি যথাযোগ্য গুরুত্ব পেয়েছে। লিভারপুল ডেইলি পোস্ট পরিবেশের 'mystical beauty'-র উল্লেখ করেছেন। আর ইনকোয়ারার পল্লীবাংলার 'beauty and grandeur'-এর কথা বলেছেন। আর উল্লেখ্য, শেষের দুটি কাগজেই এই সৌন্দর্যের সংগে নিষ্ঠুরতাকেও লক্ষ করেছেন সমালোচকেরা। একটিতে 'terror', অন্যটিতে 'cruel' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালী সমালোচকদের এই নিষ্ঠুর দিকটা বিশেষ চোখে পড়েনি। হয়তো গা-সওয়া বলে।

একজন সমালোচক এ বই পড়তে খুবই ক্লান্তি বোধ করেছেন 'unselective,... pretty, exotic, and rather boring'—এই বিশেষণগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের বই থেকে যারা আনন্দ পেতে পারে তাদের কাছে পথের পাঁচালীর যথেষ্ট আবেদন থাকবে।'—এই উক্তির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপতা আছে। তবে এতে বাঙালী পাঠকের ক্ষোভের বা বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। একে তো ভিন্ন রুচি থাকে লোকের; দ্বিতীয়ত, দ্রুতগতিময় পাশ্চাত্য সমাজের পাঠকদের কারো কারো কাছে এ বই একটু মন্থর লাগতে পারে। আমাদের সমাজেই কি এমন পাঠক একেবারে নেই? সত্যজিৎ রায়ের ছবি না হলে এই পাঠকের দল কি আরো একটু ভারী হতো না?

তুলনা প্রসংগে বইয়ের নাম এসেছে—হাকলবেরি ফিন, ডেভিড কপারফিল্ড। আত্মজীবনীমূলক এ বই দুটি। ডেভিডেরও কঠিন বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু পথের পাঁচালীর সংগে দুটি বইয়েরই মূল সুরের তারতম্য আছে।

পথের পাঁচালী প্রসংগে বাঙালী সমালোচকদের কারো কারো মুখে জাঁ ক্রিস্তফের নাম শোনা গিয়েছিল। বিদেশী সমালোচকদের কারো মনেই এ সাদৃশ্য জাগেনি।

প্রকৃতির সংস্পর্শে একটি আত্মার ক্রমবিকাশ—এই বিষয়-সাদৃশ্যে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের 'দ্য প্রেলুড'-এর নাম মনে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। আমরা আগেই দেখেছি, প্রকৃতি প্রসংগটি বিদেশের সমালোচকদের কাছে একটু কম গুরুত্ব পেয়েছে। তা ছাড়া দ্য প্রেলুড উপন্যাস নয়—সেজন্যেও বাদ পড়তে পারে। আর পথের পাঁচালী ও অপরাজিত সম্পূর্ণটা মিলিয়ে এ তাৎপর্য যতটা পরিস্ফুট, খণ্ডিত পথের পাঁচালীতে তা নয়।

তুলনার ক্ষেত্রে একজন চিত্রশিল্পীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। দোয়ানিয়েরের রুশোর (১৮৪৪-১৯১০) আসল নাম আঁরি রুশো। তিনি তাঁর জীবনের পনের বছর প্যারিস সীমান্তে শুল্ক আদায়ের কাজ করেছিলেন। এই থেকে 'দোয়ানিয়ের' (অর্থাৎ কাস্টমস অফিসার) কথাটা তাঁর নামের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। গাছ, পাতা, ফুল, মাটির গন্ধ তাঁর ভাল লাগত। তখনকার প্যারিসের সবুজ শহরতলিতে তিনি নিত্যগামী ছিলেন। সেখানে 'তাঁর সামনের ফুল, মন অবগাহন করত। স্যাঁতসেঁতে মাটির উষ্ণ গন্ধ ফুলের আশ্চর্য গন্ধের সংগে মিশে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করত।' কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন। (আঁরি রুশো : জাঁ বুরেত। ওলডবোর্ন পকেট আর্ট সিরিজ। পৃঃ ৩)

এই ধৈর্য ও যত্নের ফলে যে ছবিগুলি সৃষ্ট, তার মধ্যে এইগুলি বিখ্যাত :—দ্য জাংগল : মাংকিজ উইথ অরেঞ্জেস, লোটাস ফ্লাওয়ার্স, দ্য ড্রিম, একসোটিক ল্যান্ডস্কেপ প্রভৃতি। এই ছবিগুলির গাছ, ফুল, পাতা ও মাটির গন্ধে বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়তে পারে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, বিভূতিভূষণের মত রুশোর প্রতিভা সম্পর্কেও দুটি বিপরীত মত আছে। অনেকে মনে করেন, টেকনিক ও কম্পোজিশনের রীতিতে রুশো অত্যন্ত সরল, অশিক্ষিত, 'naive', তাঁর সব ছবিই এসেছে তাঁর সহজাত বোধ বা ইনস্টিংক্ট থেকে। আবার অনেকে বলেন যে, তাঁর আর্ট 'অত্যন্ত সুচিন্তিত'। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃঃ ৭)

বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও ঠিক এই দুটি বিপরীত মত প্রচলিত—যার উদাহরণ বর্তমান প্রবন্ধের বিদেশী সমালোচকদের উদ্ধৃতির মধ্যেও রয়েছে।

যাই হোক, বিদেশীদের এইসব সমালোচনা দেখলে আর একবার একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে পথের পাঁচালীকে দেখবার সাধ বাঙালী পাঠকের মনে জাগাতে পারে। এত দিন ঘরের চোখে ঘরকে দেখেছি, এখন একবার বাইরের চোখেও ঘরকে দেখা যেতে পারে।

স্টেট ব্যাংকের ঋণদান নীতির নতুন ধারা

সম্প্রতি ব্যাংকের ঋণদান নীতির একটি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। স্টেট ব্যাংক ঘোষণা করেছে যে সারা ভারতে তার যে সকল শাখা আছে সেগুলির মাধ্যমে ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যকর মূলধন যোগান এবং অন্যান্য প্রকার ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প তৈরী হচ্ছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল, শিল্প ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তৎপরতার সুসংহত উন্নয়ন। প্রকল্পটি শীঘ্রই কার্যকর হবে। এই প্রকল্প কার্যকর হলে খাদ্যশস্যের দোকানদার, মুদি-খানার মালিক, ডাক্তারখানা, বড় বড় দোকানদার, কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রয়কারী প্রভৃতি সবাই স্টেট ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করার অধিকারী হবে। ডাক্তার, শল্য চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, স্থপতি, কারিগরি উপদেষ্টা, প্রভৃতি বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া সরকারী সংজ্ঞায় পড়ে না এমন সব ক্ষুদ্র শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও এই প্রকল্প অনুযায়ী ঋণ ও আর্থিক সাহায্য পাবেন।

গত কয়েক বছরের হিসাব যদি আমরা পরীক্ষা করি তবে দেখা যাবে ব্যাংকগুলি কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পে খুব কমই ঋণ প্রদান করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মোট যে পরিমাণ ঋণ দিয়ে থাকে তার মাত্র শতকরা চার ভাগ কৃষি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। অন্তত গত আর্থিক বছর পর্যন্ত তাই ছিল। একমাত্র স্টেট ব্যাংকই কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তার ঋণদান নীতি কার্যকর করেছে। সম্প্রতি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংক যে নতুন প্রকল্প তৈরী করেছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, সারা দেশে শিল্প ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা সহ দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সঠিক পদক্ষেপ করা। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ লাভে সর্বদাই বঞ্চিত হয়। এমন কি স্বল্প-মেয়াদী ঋণ লাভের জন্যও যে জাতীয় সিকিউরিটি ক্ষুদ্র শিল্পগুলির রাখা দরকার, তা রাখাও সর্বদা সম্ভব হয় না। স্টেট ব্যাংকের নতুন ঋণদান নীতিতে বলা হয়েছে, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কার্যকরী মূলধনের জন্যই প্রধানত অর্থের প্রয়োজন।। যেসব ক্ষেত্রে দোকানে মোট মজুত পণ্যদ্রব্য সিকিউরিটি হিসাবে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে না, সেক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংক বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বহির্ভূত ঋণগ্রহীতাদের কাছে বন্ধক রাখার প্রস্তাবও বিবেচনা করতে পারে। আবশ্যক ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে জামিন অথবা উপযুক্ত গ্যারান্টি চাওয়া যেতে পারে। এই নতুন ঋণদান নীতিতে সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা রয়েছে; যেমন, কোন ওষুধের দোকান যদি রেফ্রিজারেটার কিনতে চায় তার সেই দোকানকে ধার দেওয়া হবে। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে ওভারড্রাফট দেওয়ার সুবিধাও নতুন ঋণদান নীতিতে আছে।

স্টেট ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে নতুন নীতি প্রবর্তন করেছে, দেশের সুষম অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য তার গুরুত্ব খুবই বেশি। অন্যান্য ব্যাংকগুলিও যাতে স্টেট ব্যাংকের অনুরূপ ঋণদান নীতি গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানে যখন দেশের চৌদ্দটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক জাতীয়-করণ করা হয়েছে, তখন সরকারের পক্ষে স্টেট ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত ঋণদান নীতির উপর নির্ভর করেই এই চৌদ্দটি ব্যাংকের ঋণদান নীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ব্যাংক ক্রেডিট এখন থেকে প্রয়োজন-ভিত্তিক হবে। ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ঋণ-গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষা ঋণের উদ্দেশ্যের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ব্যাংক জাতীয়করণ করার অর্থ এই নয় যে, সকল শিল্প কোন ব্যাংকের নিকট হতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে সেগুলি বরবাদ করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির উদ্দেশ্য হবে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করার জন্য যতদূর সম্ভব জন-সাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধির হার বাড়ানো। ব্যাংকগুলি এই অর্থের অধিকাংশ খরচ করবে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য। এক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংকই অন্য চৌদ্দটি ব্যাংককে পথের নির্দেশ দিতে পারে।

ফ্রান্স কর্তৃক মুদ্রামূল্য হ্রাস

সম্প্রতি ফ্রান্স যে তার মুদ্রার (ফ্রাঁ) বহির্মূল্য হ্রাস করেছে তাতে পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্স মুদ্রামূল্য হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন এবং লন্ডন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে ডলার এবং পাউন্ডের মূল্য হ্রাস করা হবে না। অনেকের ধারণা, ফ্রাঁ-এর মূল্য কমে যাওয়ায় জার্মান মার্কের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়তো বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পশ্চিম জার্মান সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এজন্য মার্কের মূল্য পুনরায় বাড়াবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়নি। এমনিতে মার্কের মূল্য ফ্রাঁ-এর মূল্য অথবা ডলার এবং পাউন্ডের অনুপাতে একটু কম বলেই অনেকের ধারণা। তাই জার্মানী যদি এখন মার্কের মূল্য বাড়িয়ে দেয় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীতে যে সাধারণ নির্বাচন হবে তার আগে জার্মানী এই ঝুঁকি নিতে যাবে কিনা তা-ই প্রশ্ন। অনুমিত হয়েছে ফ্রান্সের বর্তমান মুদ্রার বহির্মূল্য ডলারের অনুপাতে শতকরা ১২.৫ ভাগ কমে গেছে। যদিও সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, মুদ্রার মূল্য হ্রাসের অনুপাত হচ্ছে শতকরা ১১.১১ ভাগ। এখন ফ্রাঁ-এর মূল্য হচ্ছে প্রতি ডলারে ৫.৫৫৪১৯ ফ্রাঁ। ফ্রান্সে মুদ্রামূল্য হ্রাস ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিস-পত্রের দাম যাতে না বাড়ে সেজন্য মূল্য সংকোচনমূলক ব্যবস্থা (Price Freeze) অবলম্বিত হয়েছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি বাড়ানো এবং আমদানি কমানো; তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে দেশের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু রপ্তানি কতটা বাড়বে —অথবা আমদানি কতটা কমবে তা অনেক-গুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় মাত্র। ফ্রান্সের মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ায় ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য হ্রাস করা হয়নি। তবে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ইউরোপের সাধারণ বাজারে (European Common Market) ব্রিটেনের প্রবেশ সম্পর্কে আবার বিতর্কের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও রয়ে গেছে। তবে ভারতের এজন্য বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। কারণ ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্যিক লেনদেন খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত এবং ফ্রান্সের মধ্যে মাত্র ১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন হয়েছে।

গত দু বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক বাজারে যে মুদ্রা সংকট হয়েছে, ফ্রান্সের মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে তা তীব্রতর হবে বলে মনে হয় না।

সুব্রত গুপ্ত

ফ্যাসনে ফ্যাসাদ

ভারতবর্ষের সীমানা পার হ'লেই প্রথম নজরে আসে মেয়েদের সাজসজ্জার নিত্য পরিবর্তনশীল চটক। লেবাননের খাস শহর বেরুট। রাজনৈতিকভাবে আরব দুনিয়া। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই প্রথমে পেলাম মহিলা ফ্যাসনের এ মৌসুমের সংবাদ। চাকাপানা হীল দেওয়া জুতো, বিরাট গোল গোল রোদ-চশমা, অর্ধ নগ্ন মিনিস্কার্ট, পরচুলার পরম জনপ্রিয়তা—আরও কত কি। টুরিস্ট ব্যবসায়ে বেরুট ফেঁপে উঠেছে। তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে মধ্যবয়স্ক মহিলা কোমরে হাত দিয়ে অপর পারের আর এক মধ্যবয়স্কার সঙ্গে চেঁচিয়ে ঝগড়া করেন তিনিও পরেন বাহারের বেশ। যদি পথে ঘাটে অন্য রকম বেশবাস দেখেন বুঝবেন সে বাইরে থেকে এসেছে। প্যালেস্টাইনের বাস্তুহারাদের বস্তিতেও মিনির মানা নেই।

তা বলে বলবো না লেবানন ফ্যাশানের রচনা স্থান। রচনা হয় আরও পশ্চিমে। হয়তো ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছোবেন একেবারে রৌপ্য মর্যাদার দেশ মার্কিন মুলুকে। এখন নাকি ইউরোপের মেয়েরাও হাঁ করে চেয়ে থাকে সেদিকে। জ্যাকেলিন কেনেডি ওনেসিস ফ্যাশনের রাণী। পয়সা নিয়ে নাকি স্বর্গত স্বামীর সঙ্গে বাদানুবাদ বেশ হতো। সাজ-পোশাকে বা কেশচর্চায় চড় চড় করে হাজার পয়সা চলে যেতো। এখন সে ভাবনা নেই। জগতের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন ওনেসিস সাহেব। তবে আমাদের পক্ষে সুসংবাদ হচ্ছে জ্যাকেলিন হঠাৎ ভারতীয় সজ্জায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফরাসী কোন সজ্জাশিল্পী নাকি আগেই সে দিকে ঝুঁকেছিলেন। ঢিলা পাজামার মত Bell Bottom প্যান্ট, শাড়ির আঁচলের মত বাহার দেওয়া সান্ধ্যনাচের সাজ সব আগেই চালু হয়েছিল। জ্যাকেলিন জমিয়েছেন সেই ভিত্ত-এর উপর। গল্প শুনেছি—সত্যতা সম্বন্ধে জোর করতে পারি না—যে, একদিন নিউ ইয়র্কের এক ভারতীয় দোকানে জ্যাকেলিন ওনেসিস বেছে নিলেন তোতাপাখির মত সবুজ রং-এর কুর্তা আর পাজামা। আর যায় কোথায়? মার্কিন সমাজের শৌখীন সব ভেঙ্গে পড়লেন দোকানে। তোতা আর কই? যা আছে তাই দাও। 'আরে এ যে মাপে বেমানান' বললেন ভারতীয় দোকানী। তা হক, আজই চাই কুর্তা পাজামা। এখনই যেমন করে হক টেক্কার টক্করে জিৎ-এর ব্যবস্থা করতে হবে। দোকানী তো এমন এক মহোৎসবের আন্দাজে আয়োজন করেননি। মহা বিপদ।

এই যে ভারতীয় ছোঁওয়ার জন্য পাগলামি তা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। কত দিন টিকবে তা জানি না। এই মওকায় যদি আমাদের কেনাবেচায় বেশ ভাল একটা দাঁও হতো বড্ড ভাল হতো। আমাদের দোষ সব ব্যাপারে দেরি হওয়া। হয়তো বা আয়োজন হতে হতে হুহু করে ফ্যাশনের ঘূর্ণি হাওয়া কোথায় চলে যাবে। লন্ডনের বড় বড় দোকানে ছোট ছোট "Indian Boutique" হয়েছে। দারুণ কামাচ্ছেন কর্তারা। অথচ আমাদের প্রচেষ্টা আর একটু বাড়লে হতো। আন্তর্জাতিক সব খবরের কাগজেই কি কম চর্চা হচ্ছে। ফ্যাশন লেখিকারা সবাই বলছেন "In look is Indian" এখন ভারতীয় ধারার কদর হয়েছে সজ্জায়। গৃহসজ্জা থেকে দেহসজ্জা সব। প্যারিস থেকে International Herald Tribune-এর মহিলা প্রতিনিধি বলছেন, It's going to be an Indian Summer." তবে তাঁর মতে হিপিরা (hippies)-এর জন্য দায়ী। হতে পারে। চাদর, ধুতি, জপের মালা সবই তো তারা নিয়েছে। আমাদের এক বন্ধু বলছিলেন, লস এঞ্জেলেসের পথে হঠাৎ এক দিন যেতে যেতে শুনলেন কে বলে যাচ্ছে নারায়ণ নারায়ণ। ফিরে চেয়ে দেখলেন গেরুয়াবসন এক হিপি সাহেবের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে নারায়ণ নারায়ণ। অবাক হবার অবশ্য কিছু নেই। প্রাচুর্যভরা দেশগুলিতে অতিরিক্ত ঐশ্বর্যের প্রতি আর ঐশ্বর্যযোগের উপায়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় যুবসমাজ হাত পেতে ভিক্ষা চাচ্ছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কাছে। কিছু দাও, কিছু দাও, না হলে অশান্তিতে আমরা অস্থির হচ্ছি। তাদের জীবনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাবনা হতে পারে কিন্তু তাদের এই দৈন্য না বুঝবার মত নয়।

যাক, এ তো অন্য কথা। ভারতীয় হাবভাব নকল করতে গিয়ে হিপিরা সত্যই ভারতীয় সজ্জার ধারা পশ্চিমকে পরিবেশন করেছে। প্রথম সজ্জারসিক গুণীজ্ঞানী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। রং-বেরং-এর বাহারে তাঁদের বিষম আপত্তি। আপত্তি টিকলো কই? এই তো সেদিন বিদেশী কাগজে ছবি দেখলাম নিউ ইয়র্কের এক স্বনামধন্যা গৃহসজ্জা 'ডিজাইন' শিল্পী হাতির হাত-পার অনুকরণে আসবাবের নমুনা দিয়েছেন। সাদা রং করা হাত-পা। তার উপর উজ্জ্বল রং-এর কুশন দিয়ে বসবার ব্যবস্থা। ধনীগৃহের হলঘরে ঢুকেই প্রথম থাকবে এই বাহার। বাহারে বসবার ব্যবস্থায় পা মুড়ে বসে নিভৃত কূজন বেশ চলবে। নামও তাই তার Love seat। শোবার ঘরে ভারতীয়

দোলনায় বিছানা পেতে আরাম করাও ফ্যাশন হয়েছে। আমাদের দিকে ততটা না হলেও বোম্বাই-এর দিকে সম্পন্ন সংসারে সাজানো দোলনা বিশেষ আদরণীয়। ঘরে, বারান্দায় বা বাগানে বিছানা পাতা দোলনায় দোল খেয়ে আরাম করা বিদেশী rocking chair-এর দোলের চেয়ে মজাদার।

মার্কিন দেশের বিখ্যাত মহিলা পত্রিকা House and Garden। Mary Jane Pool তার সম্পাদিকা। সম্প্রতি এক চমক লাগানো আয়োজনে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। এই যে সব সস্তা হাতের ছাপা বিছানা চাদর আজকাল আমরা কিনে থাকি তারই এক গাদা নিয়ে ঘরের দেওয়ালে সযত্নে সেঁটেছেন। পশ্চিমের সমাজ তা দেখে মুগ্ধ। বলছেন এ যেন এক মমতাজ মহলের বাসের যোগ্য ব্যবস্থা। হায় আমাদের মমতাজ কি আর এ যুগের মার্কিন মহিলা ছিলেন?

আমরা যে একেবারে চোখ বন্ধ করে পশ্চিমের খেয়ালীপনা দেখছি তাও নয়। মার্কিন দেশে ভারতীয় ভাব আগে চলেছে বটে কিন্তু আমরা ডেকেছি ফরাসী রসিক Pierre eardin আর Jeanne Perabকে আমাদের ডিজাইন সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য। সরকার যেসব দোকান 'সোনা' নাম দিয়ে বাইরে খুলেছেন তাতে লন্ডন নেই কিন্তু প্যারিস আছে। ওড়িশার বিরাট ছাতাখানা মেজে প্যারিসের 'সোনা' পলকও ফেলতে পারে না। ঝট করে বিক্রী হয়ে যায়। দাম ১,০০২ ফ্র্যাঙ্ক বা ২০০ ডলার মানে ১৫০০ টাকা।

ভারতীয় এম্ব্রয়ডারি করা আসবাবের জন্য কাপড় বিক্রী হয় নিউ ইয়র্কে ২৭ ডলার গজ হিসাবে। কাশ্মীরের ডাল হ্রদের কমল বনে যে হাউসবোট অবসর বিনোদনের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে তার আসবাবের সব নমুনা নকশাও কম যায় না। একটু হেরফের একটু অদলবদল করে পশ্চিমের রসিকের ঘর আলো করছে। তাই তো East 55th Street-এ নিউ ইয়র্কের 'সোনা' খদ্দের সামলে উঠতে পারছে না। দ্বিগুণ বড় দোকানের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাল আরও চাই। এমনকি নাইরোবির দোকানও কেনা বেচা কম করছে না। প্যারিসের সোনাও ঠাসাঠাসি ব্যাপার। তবু চোখ ঝলসানো ভারতীয় পসরা খুঁজে বের করতে কম উৎসাহ নেই রূপরসিকের।

এক সময় ভারতীয় শাল ইউরোপে চালিয়েছিলেন সুন্দরী প্রধানা জোসেফিন। তাঁর বিজয়ী স্বামী কোথা থেকে যেন এক উপহার পেয়েছিলেন কাশ্মীরের অপূর্ব শিল্প রচনা। এনে দিয়েছিলেন প্রেয়সীর পেলব করে। তার পরের ঘটনা সবার জানা। পেইজলী শাল সেই কাশ্মীরকে নকল করেছিল কিন্তু সার্থক হয়নি। অনুকরণ অঙ্গে উঠেছিল সাধারণের কিন্তু ধনীর ঘরে ছিল কাশ্মীরের কাজ। আজও যেন সেই ইতিহাসের এক নূতন রূপ দেখছি। তফাৎ আছে। ফরাসী বিপ্লবের আগের ইউরোপ ছিল আর এক রকম। ফ্যাশন ছিল না আমসাধারণের নিত্যকার শখ। এখন ফ্যাশনের পর্যায় থাকতে পারে কিন্তু অধিকার অল্প বিস্তর সবার আছে। আমাদের কাঠের খড়মের অনুকরণে কাঠের জুতো চালু করলেন এক জার্মান রূপকার। আর যায় কোথা। পথেঘাটে শুনবেন খট্ খট্ খট খড়ম পায়ে যুবক যুবতী চলেছে। ডাক্তারখানায় বিক্রী হচ্ছে খড়ম! পায়ের পরম উপকার করে এ ভারতীয় নমুনার পাদুকা এই ধারণায় সবাই স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ছুটে যায় ডাক্তারখানায়। জুতোর দোকানেও গাদা গাদা খড়ম। আমাদের দেশে তো কখনও শুনিনি খড়ম পায়ের পক্ষে ভাল। হয়তো এমন বহু সাধারণ জিনিস আছে আমরা বুঝি না তার মর্যাদা।

ফ্যাসনের ফ্যাসাদ এই যে তা ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরে যায়। বর্তমান পশ্চিমের সমাজে তো তার বেগ সামলানো দায়। ভারতীয় পোশাকের এই "I U" অবস্থা থাকতে থাকতে ভারতীয় গৃহসজ্জার কদর কমবার আগে যদি কিছু পণ্য বেশ জমিয়ে বসতো তবে দরিদ্র ভারতের বড় একটা উপকার হতো। জমিয়ে বসার ব্যবসায়ী দিক একটা আছে, আর একটা দিকও উপেক্ষা করার মত নয়। ভারতীয়রা যদি নিজেরা নিজেদের জিনিসের যথেষ্ট মর্যাদা দেন তবেই স্থায়ী গৌরব সম্ভব। বিদেশে কেন, ভারতের পথেঘাটে মেমসাহেব সাজবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে এ কথাই বার বার মনে হয়। এক কালে দেখেছি শাড়িকে খাটো ক'রে স্কার্টের অনুকরণ করতেন তথাকথিত বাঙ্গালি মেয়ের দল। স্বাধীন আমরা হয়েছি। সাহেবরা সরে গেছে কিন্তু মনের স্বাধীনতা কতটা পেয়েছি কে জানে? সময় সময় ভাবনা হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাহানায় বুঝিবা আত্মিক স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে। হিপিদের মতই হতাশায় আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি, হদিশ পাচ্ছি না কি আমাদের নিজস্ব, কোথায় আমাদের কৃষ্টি। সেও এক ফ্যাসাদ বই কি।

শ্রীমতী

অনেকে মনে করেন যে শান্তিনিকেতন কলাভবনে যাঁরা শিল্প শিক্ষালাভ করেন তাঁরা এখনও বেংগল স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি, অর্থাৎ তাঁরা এখনও একান্তভাবে অন্তর্মুখী, বহির্জগতের চিত্রকলাধারার তাঁরা কোনও সংবাদ রাখেন না। এই ধারণা যে ভুল তা তাঁরাই স্বীকার করবেন যাঁরা সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ আয়োজিত শিল্পীদের প্রদর্শনী দেখেছেন। প্রদর্শনীতে নয়জন শিল্পীর পেন্টিং, গ্রাফিক ও ভাস্কর্যের ৪৭টি নিদর্শন দেখা যায়। এঁদের প্রত্যেকেই শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষালাভ করেছেন।

ইতিপূর্বেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত দু'একজন শিল্পীর নতুন মনোভঙ্গের পরিচয় পেয়েছি। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন প্রদর্শনীতে পদার্পণ করে অনেকদিন পরে কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদিনকর কৌশিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম রঙ, উপাদান মনোনয়ন, চিন্তাধারা ও অংকনরীতি বিষয়ে শিল্প শিক্ষার্থীদের আজকাল স্বাধীনতা দেওয়া হয়—ফলে সকলেই আপন বক্তব্যটুকু বিভিন্ন রীতিতে প্রকাশ করার সুযোগ পান।

প্রদর্শনীর যে সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা হল শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তাধারা ও সমসাময়িক শিল্পধারার ওপর তাঁদের প্রাধান্যদান। শিল্পীরা সকলেই তরুণ। তেল ও জলরঙ তথা টেম্পারা মাধ্যমে তাঁরা কাজ করেছেন, উপাদান হিসাবে একজন ভাঙা কাচ, কড়ি ও ঝিনুকও ব্যবহার করেছেন। প্রায় প্রত্যেকের কাজেই পরীক্ষা করার একটি স্বাভাবিক স্পৃহা দেখা যায়। আবার কয়েকজনের রচনা দেখে মনে হয় সমকালীন শিল্পধারার বিষয়ে সচেতন হলেও তাঁরা যেন বিদেশী প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীতে বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত শ্রেণীর কাজও দেখা যায়।

অরুণ পাল বিমূর্ত রচনার পক্ষপাতী। শিল্পী বিশ্বভারতীর স্নাতক, ১৯৫৮ সালে তিনি কলাভবনের ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং এখন সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচনায় চ্যাডউইকের প্রভাব দেখা যায়, যেমন পেন্টিং—২। বিশিষ্ট আকারের সরলীকরণের জন্য পেন্টিং—৩ অনেকের চোখে পড়ে। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত ১৯৬১ সালে কলাভবনে শিক্ষা শেষ করেন, এখন কোনও স্কুলে শিল্প শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। শিল্পীর রচনা সমকালীন। প্রাচীন লোক ও তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিচিত চিহ্ন ও প্রতীককে অবলম্বন করে তাঁর রচনা মূলত গড়ে উঠেছে ও ভাঙা কাচ, ঝিনুক ও কড়ি সহযোগে রচনাক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে কম্পোজিশন ৫ ও ৬-এর নাম করা যায়। অতি সরল ও সার্থক রচনা হিসাবে কম্পোজিশন-২ অনেকের চোখে পড়ে। শিল্পীর রচনায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক শিল্পরীতির সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়।

ইন দি গার্ডেন —অজিত রায়

শুচিব্রত দেব ১৯৬৩ সালে কলাভবনে শিক্ষা শেষ করেন। শিল্পীর জলরঙ ও টেম্পারার কাজ দেখে মনে হয় তিনিও প্রাচীন লোকচিত্র থেকে উৎপ্রেরণা লাভ

কুকিং —শান্তনু ভট্টাচার্য
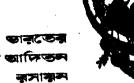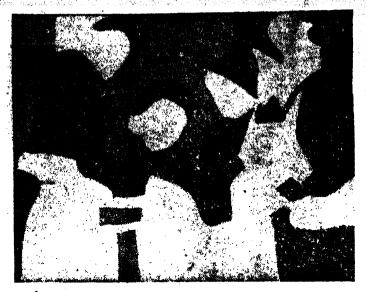
করেছেন। ছবির মধ্যে স্নেক গডেস উল্লেখযোগ্য। রেখা প্রধান ব্লুবার্ড ছবিতে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কন প্রথার প্রভাব দেখা যায়। অমিত রায়ের রচনায় বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৬৬ সালে কলাভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৬৮ সালে বরোদা শিল্পসংস্থা থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করেন। শিল্পীর রচনা প্রাচীর চিত্র জাতীয়, রঙ মিশ্রণ ও ব্যবহার প্রণালী লক্ষণীয়। নীল কালো ও গেরুয়া রঙের সুকৌশল ব্যবহার গুণে তাঁর রচনায় কোলাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন আউটিং ও ইন দি গার্ডেন—২। পার্থপ্রতিম দেব ১৯৬৬ সালে কলাভবন ছেড়ে ১৯৬৮ সালে বরোদা থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করেন। শিল্পী সোচ্চার, উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করেন এবং অঙ্কনরীতির দিক থেকে বিচার করলে দু একটি কাজে আমেরিকার শিল্প প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে 'ন্যাচারাল' ছবিখানির গাঢ় নীল রঙ ব্যবহার অনেকের ভাল লাগবে। শান্তনু ভট্টাচার্য ও চিন্ময় রায়—দুজনেই গ্রাফিক শিল্পী। প্রথম জন ১৯৬১ সালে কলাভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করে গ্রাফিক শিল্পে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬৮ সালে বরোদা থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করার পর থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে গ্রাফিক শিল্প বিষয়ে গবেষণা করছেন। এঁর লিথোগ্রাফ প্রিন্টের বৈশিষ্ট্য হল সরলতা ও রঙসুষমা—যেমন কুকিং। কোলাজ নিদর্শন হিসাবে শিল্পীর ল্যান্ডস্কেপ উল্লেখযোগ্য। কালো পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ছোট ছোট লাল রঙের আকারের মধ্য দিয়ে গ্রাম প্রান্তে কয়েকটি কুটির দেখান হয়েছে। পরিকল্পনার দিক থেকে, বিশেষ করে পৃষ্ঠের কয়েক অংশ ছোট ছোট লাল রঙের আঁচড়ে প্রকাশ করার জন্য পিকক অনেকের ভাল লাগে। দ্বিতীয় জন ১৯৬৮ সালে কলাভবন থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করার পরে গ্রাফিক শিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। শিল্পীর প্রিন্টগুলিতে প্রধানত নানা জাতীয় খেলনা ও পুতুলের আভাস পাওয়া যায়—যেমন ৩৬ ও ৩৭নং প্রিন্ট। শিল্পীর খোদাই কার্য সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল, এই প্রসঙ্গে ফিলসফার-এর নাম করা যায়।

ভাস্কর্য বিভাগে অবশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি। বিপুলকান্তি সাহা ও অতুল বড়ুয়া দুজনেই

শর্মিলা (প্লাস্টার) —বিপুলকান্তি সাহা

ভাস্কর ও দুজনেই কলাভবনে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জন পরে বরোদায় শিক্ষা শেষ করেন। বিপুলকান্তি প্লাস্টার মাধ্যমে প্রধানত প্রতিকৃতি তৈরী করেছেন। খ্যাতনামা শিল্পী সোমনাথ হোড়ের প্রতিকৃতি অনেকেরই চোখে পড়ে। গঠনরীতির দিক থেকে এটি উল্লেখযোগ্য। 'শর্মিলা'-র মুখমণ্ডলেও বালিকাসুলভ সরলতা লক্ষণীয়। অতুল বড়ুয়ার কয়েকটি কাজে সমকালীন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কাঠ খোদাই করে ও সিমেন্ট জমিয়ে তিনি বিমূর্ত ও সমকালীন কয়েকটি নিদর্শন দেখিয়েছেন। সমষ্টিগত আকার গঠন প্রণালী ও আয়তনিক সৌন্দর্যের দিক থেকে পৃথক পৃথকভাবে গঠিত ও একত্রে রক্ষিত কম্পোজিশন উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সাইলেন্স ইন কেয়স-এর নাম করা চলে, যদিও কয়েক স্থানের গঠন পদ্ধতি দেখে ধনরাজ ভগতের ভাস্কর্যের কথা মনে পড়ে যায়।

*

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ অ্যাকাডেমির পূর্বাঞ্চলী গ্যালারীতে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রসম্ভারের মধ্য থেকে সুনির্বাচিত কয়েকটি ছবি জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দান করেন। কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে পাণ্ডুলিপি সংস্কার করতেন। সেই নিজস্ব সংস্কার প্রণালীর মধ্য দিয়ে কবির অজ্ঞাতে পাণ্ডুলিপির ওপর যে নানা বিচিত্র আকার ফুটে উঠত সে কথা সকলেই জানেন। বলিষ্ঠ রেখা, মৌলিক, ভঙ্গি ও অনেক ক্ষেত্রে বিমূর্ত আকারের দিক থেকে শিল্পজগতে এগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পরিণত বয়সে কবি কালিকলম, রঙ ও তুলি সহযোগে নানা ছবি আপনার মনে এঁকে যান। নরনারীর যে বিভিন্ন প্রতিকৃতি তিনি সৃষ্টি করেন তাদের মধ্যে কয়েকটিতে অতীন্দ্রিয় রূপও ফুটে ওঠে। কয়েকটির মধ্যে তাঁর সাহিত্য সম্ভারের কোনও বিশেষ চরিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া নিসর্গ দৃশ্যও আছেই—সেগুলির মধ্যেও স্থলে স্থলে কবির আত্মসমাহিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনীতে কয়েকটি প্রতিকৃতি ও নিসর্গ দৃশ্য সকলেই উপভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হলেও মনে হয় এক্ষেত্রে গভীর গবেষণার এখনও অবকাশ রয়েছে। কবি রচিত চিত্রসম্ভার সকলকে দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ দান করে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

চিত্রপ্রিয়

কুত্ থেকে ক্যানসারের ওষুধ

প্রাণেশ চক্রবর্তী

দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসার। পৃথিবীর শত-শত মানুষ যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কত কঠিন কঠিন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ক্যানসারের কোন ওষুধ আবিষ্কার হল না।

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ, ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডাঃ সল স্পাইজেলম্যান রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা করার সময় এমন এক জৈবিক [illegible] আবিষ্কার করেছেন, যা নাকি দুরারোগ্য ক্যানসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হবে। অবশ্য এখনও এ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

গবেষণা নাকি চলছে আমাদের হিমালয়ে উৎপন্ন ভেষজ কুত্ নিয়েও। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের ভাষায় তারই নাম সসিউরিয়া ল্যাপা SAUSSUREA LAPPA। কাশ্মীর হিমালয়ে উৎপন্ন এই কুত্-এর মধ্যে ক্যানসারের প্রতিষেধক ওষুধ পাওয়ারও নাকি যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইদানীং ইউরোপ-আমেরিকাতেও এই দুর্লভ বস্তুটির ব্যাপক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। [illegible] গবেষণাগারে কুত্ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ভারত এর [illegible] বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

কাশ্মীরী পাঠকের ধারণা, আমাদের হিমালয়ে উৎপাদিত এই কুত্ থেকেই শেষ পর্যন্ত ক্যানসারের প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে। [illegible] প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হিমালয়ে সর্বরোগহর ওষুধগুলো নিছক মানুষের অবজ্ঞা ও অবহেলার জন্যই পড়ে রয়েছে। অন্যরা বলেন এই সমস্ত বনৌষধিগুলির পরিচয়ের অভাবে আমরা তাকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে পারছি না।

কাশ্মীরী পাঠক জানালেন, কয়েক বছর আগেও কুত্-এর এত সমাদর ছিল না এ অঞ্চলে। প্রকৃতির উন্মুক্ত ভাণ্ডারে আপন খেয়ালখুশিতেই তখন কুত্ জন্মাত। আপনা-আপনি বেড়ে উঠত এখানে-সেখানে। আর মেষশাবকের দল তার পাতা খেয়ে পুষ্ট হত। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদেশীরা হিমালয়ের আঙিনা থেকে কুত্ তুলে নিয়ে গেল নিজেদের গবেষণাগারে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে যখন ক্যানসারের সম্ভাব্য ওষুধের আভাস পেল, তখনই স্বদেশে কুত্-এর মহিমা গেল বেড়ে। তাই আজ গোটা লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় পরম যত্ন সহকারে এর চাষ হয়ে থাকে। আগাছা কুত্ আজ অনেক চাষীর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।

লম্বায় এক-দেড় ফুটের বেশী হয় না কুত্ গাছ। কাণ্ডের চেয়ে পাতার আকৃতি বেশ বড় ও গোলাকৃতি। দেখতে অনেকটা কুমড়োর পাতার মত। গাঢ় সবুজ এর পাতায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা আছে। মূল কাণ্ডের গোড়া থেকে ধানের শীষের মত একগোছা ফুল বেরোয়। এই ফুল যখন ০·৪৫ থেকে ০·৬ মিটার লম্বা হয়, তখন তা কেটে নেওয়া হয় বীজের জন্য। এক-একটি গাছ থেকে গড়ে প্রায় আড়াইশো বীজ পাওয়া যায়। দেখা গেছে, পঁচিশ

কুত ক্ষেতে কুত গাছ

হাজার বীজের ওজন সামান্য কম-বেশী এক কিলোগ্রাম হয়ে থাকে।

কুত্-এর শিকড়ই সবচেয়ে দামী, শিকড়েই রয়েছে ক্যানসারের প্রতিষেধক। ঈষৎ সবুজ তার রং। এক-একটি গাছে প্রায় দেড়-দুই কিলোগ্রাম শিকড় জন্মায়। ছ' থেকে দশ-এগারো হাজার ফুট উঁচুতে নুড়িপাথর-মুক্ত নরম জমিতে কুত্ জন্মে। চা-এর মত কুত্ গাছের জমির উপরে অল্প-বিস্তর ছায়া থাকা প্রয়োজন। তা নাহলে কুত্ জন্মে না। বার্চ ও ফার গাছের স্নেহচ্ছায়ায় কুত্

কুত্-এর শিকড়

সবচেয়ে ভাল জন্মে। শুধু তাই নয়, যে জমিতে বছরে কমপক্ষে তিন ফুট তুষার জমে, একমাত্র সে সকল জমিতেই কুত্ জন্মে থাকে।

বীজ লাগানো ছাড়াও শিকড় পুঁতে কিংবা কাণ্ড কেটে বসিয়েও কুত্ উৎপাদন করা যায়। তবে লাহুল-স্পিতির অনেক চাষীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা শিকড় কিংবা কাণ্ড কেটে লাগানোর চেয়ে বীজ বপন করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত মনে করে। কারণ, এতে নাকি হাঙ্গামা কম, খরচও খুব-একটা বেশী হয়না। এক কুইন্টাল কুত্-এর শিকড় উৎপন্ন করতে খরচ পড়ে প্রায় একশ' টাকা। এক হেক্টর জমি চাষ করতে পারলে প্রায় ষাট কুইন্টাল শিকড় অনায়াসে উঠে আসে।

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অর্থাৎ বরফ পড়া শুরু হওয়ার আগে বীজ লাগানো হয়। সাধারণত পনেরো সেন্টিমিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে ত্রিশ সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর কয়েকটি কয়েকটি করে বীজ পুঁতে দেওয়া হয়।

তারপর ধীরে ধীরে কুত্ গাছ বড় হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে মাটির নিচের শিকড়ও। এইভাবে তিনটি শীতের ঋতুতে বরফের মধ্যে থাকার ফলে কুত্ পরিণত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, বরফের নিচে থাকার সময় কুত্-এর পাতা মরে গেলেও আসলে গাছের কোন ক্ষতি হয়না।

তিন বৎসর পরে অক্টোবর শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে গর্ত খুঁড়ে শিকড় তুলে নেওয়া হয়। তারপর সেই সমস্ত শিকড় ধুয়ে-মুছে রোদে শুকিয়ে

সরকার অনুমোদিত এজেণ্টদের কাছে বিক্রি করে চাষীরা।

সাধারণত কুত্ গাছের পাতা চাষীরা ঘরে জমা করে রাখে শীতের প্রাক্কালে। তুষার-পাতের ফলে যখন চারিদিক তুষারে আচ্ছন্ন থাকে, কোথাও কোন ঘাসপাতার চিহ্ন থাকে না, তখন এই জমানো কুত্ পাতা ভেড়া-বকরীকে খেতে দেওয়া হয়।

হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার অন্তর্গত লাহুলীদের গেঁউ, জউ, মটর আলু ইত্যাদি চাষ করার পরিবর্তে কুত্ চাষ করতে দেখেছি। তারা জানে না এতশত কুত্ কেন কাজে লাগে। তারা শুধু জানে কুত্ বিক্রি করে দুটো পয়সা পাওয়া যায়। ন' হাজার পাঁচশ' চুরানব্বই ফুট উঁচুতে চামবাড়ি গ্রামে এক চাষী কুত্ ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছিল। গম, আলু ইত্যাদি চাষের পরিবর্তে কেন কুত্ চাষ করে জানতে চাইলে চাষীটি জবাব দেয়—আজকালকার দুর্দিনের বাজারে নগদ পয়সা না হলে জীবনধারণ করায় দায়। তাই গম আলুর চাষ কমিয়ে দিয়ে আজকাল কুত্ চাষ করছি। তা ছাড়া কুত্ চাষে খরচও কম পড়ে, খাটুনিও কম।

সে যাই হোক, বর্তমান নিবন্ধের অবতারণার উদ্দেশ্য চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ মানুষকে কুত্ সম্পর্কে অবহিত করা। আমি উদ্ভিদ বা ভেষজ-বিজ্ঞানী নই। বনৌষধি সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানও নেই। তবে কৌতূহল আছে। শুনেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। কুত্ নিয়ে সে সমস্ত গবেষণাগারে কোন গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। বিদেশে যে জিনিসের এত কদর, স্বদেশে সেই বস্তুটি যথার্থ মর্যাদা পাচ্ছে কিনা, তা জানতে আগ্রহ হয়। বিশেষ করে বাংলা দেশে বহু প্রখ্যাত ভেষজবিজ্ঞানী রয়েছেন। এই কুত্ নামক বনৌষধিটি থেকে ক্যানসারের প্রতিরোধকারী ওষুধ পাওয়া যাবে কিনা তাঁরা দেখেছেন কি?

তবে কর্নেল পাঠকের মত আমারও দৃঢ় বিশ্বাস কুত্ থেকে ক্যানসারের ওষুধ পাওয়া যাবে। আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হওয়ার পেছনে খানিকটা যুক্তিও আছে তা হল—কারপাট নামে হিমালয়ের একটি গ্রামের একজন বৃদ্ধ লামার কাছে শুনেছি যে, দেহের পচে যাওয়া অংশে বা দগদগে ঘা, যা বহুদিনেও সারে না, তাতে কুত্-এর শিকড় বেটে লাগালে নাকি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ উপকার পাওয়া গেছে।

ক্যানসারের সঙ্গে এ জাতীয় ঘটনার কোন সাদৃশ্য আছে কিনা জানি না, তবে আপাত-দৃষ্টিতে একেবারে মূল্যহীন বলেও উড়িয়ে দিতে মন চায় না। তাই কুত্ থেকে যদি ক্যানসারের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয় তা হলে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হব না।

শহর-ইয়ার

॥ ১ ॥

শ্রদ্ধেয় পাঠক শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, গত সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকা মারফত সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের রচনাপ্রসঙ্গে আপনি কিছু অভিযোগ এনেছেন।

অভিযোগের উত্তর দেবার পূর্বে আপনার রসবোধ ও স্পষ্টকথনের ক্ষমতার প্রশংসা করা প্রয়োজন। হাঁ, অতিশয় সত্য কথা, হক্ কথা যে, 'শহর্-ইয়ারে'র গায়ে গয়নার প্রাচুর্যের অভাব বর্তমান। বা আপনার ভাষায়, "'শহর্-ইয়ারে'র স্টাইল 'চাচা কাহিনী' ও 'দেশে-বিদেশে'র অসামান্য গদ্য-শিল্পের শোচনীয় ট্র্যাজেডি"। কিন্তু কেন এই অভাব? অর্থাৎ, কেন এই ভাষার পরিবর্তন?

এর কারণ বোঝাতে গেলে সবিনয়ে বলতে হয় যে, শুধু আলী সাহেব কেন, তাঁর গুরুদেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ অসম্ভব সাধন করতে অক্ষম। প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের চারটি রচনার কথা বলছি : ব্যঙ্গকৌতুক, তোতাকাহিনী, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আর পঞ্চভূত। এ চারটি লেখায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের আসর জমজমাট। কিন্তু ভাষা?—সে বেলায় কখনও কখনও সন্দেহ জাগে যে, এ চারটি কি একই লোকের লেখা! যদিচ প্রথমটিতে মোটা দাগের হাস্যরস, দ্বিতীয়টিতে হাস্য ও ব্যঙ্গ, তৃতীয়ে ব্যঙ্গ ও জনচেতনার আহ্বান এবং চতুর্থটিতে হাস্য ও দার্শনিক জ্ঞানই মূল উপজীব্য। তবেই বুঝুন, ওস্তাদের ওস্তাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ভাষা বাবদে হিন্দীওয়ালাদের মতো সরলীকরণ করতে চাননি। তিনি ইচ্ছে করলে চারটে রচনাই এক ধরনের গদ্যে লিখতে পারতেন। কিন্তু এটাও তিনি জানতেন যে, তা হলে চারটেই আলাদা আলাদাভাবে পাঠকমনে এরকম ছাপ ফেলতে পারত না, এবং তাদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হত। রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথা স্মরণ করুন। আশমানী ও গজপতি বিদ্যাদিগ্গজের কথোপকথনের ভাষায়, বা আপনি যার ওপর জোর দিয়েছেন, অর্থাৎ স্টাইলে, বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষা ও ওসমানের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেন নি। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই মাত্র দু'টি নারী-পুরুষের কথোপকথন বিবৃত করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়বস্তু অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষায় ভঙ্গিমা, গুরুত্ব ও গতিবেগ দিয়েছেন। (এ প্রসঙ্গে পরে আরও বলছি)

এই সব ওস্তাদের ওস্তাদ, তস্য ওস্তাদেরা যখন পিছু হটেন, তখন মুজতবা আলী সাহেব আর কি করেন? ওস্তাদের ওস্তাদ তো দূরস্থান, অনুচিতভাবে নিজেকে ওস্তাদ বলে জাহির করতেও তিনি নারাজ।

একটা বিষয় কিন্তু লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের যে চারটি লেখার কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে হাস্যরস রয়েছে। তবু তাদের ভাষার পার্থক্য বিপুল। আর যেখানে দু'টি লেখার বিষয়বস্তুর আসমান-জমিন ফারাক, সেখানে ভাষাগত বিরোধ ততোধিক। 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' বা 'গোড়ায় গলদ'-এর ভাষার সঙ্গে 'ছুটি', 'একরাত্রি' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' ইত্যাদি গল্পের ভাষার তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

এতক্ষণ যা বলা হল সেটা একটা ফর্মুলা খাড়া করার জন্য। ফর্মুলাটি সর্বলোকে জানে, এবং স্বীকৃত। এই ফর্মুলাতে বলে যে রূপ (form) নির্ভর করে বিষয়-বস্তুর ওপর, এবং বিষয়বস্তু যতই জোরালো হোক না কেন, ঠিক রূপ না দেওয়া হলে তার আবেদন সার্থক হয় না। এজন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো রথী-মহারথীরাও তাঁদের সব লেখা একভাবে লেখেন নি, যদিও পূর্বেই বলেছি যে, তাঁদের সে ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাঁরা বস্তু ও রূপ বাবদে অতিমাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং তাঁদের মাত্রাবোধও ছিল অতি নাজুক। পাঠক, আপনিই কল্পনা করুন না হুতোমী ভাষায় 'কাব্যে উপেক্ষিতা'দের নিয়ে লেখা হয়েছে, অথবা 'হরিদাসের গুপ্তকথা' সবাই জেনে ফেলল 'পরিচয়' প্রবন্ধের ভাষায়।

সত্যি কথা বলতে কি ভাষার ওপর বেশী নজর পড়ে তখনই, যখন ভাবের ভাণ্ডারে ভবানী মাতা বিরাজ করেন। ভাষাটা আসলে অলংকারবিশেষ। যে রমণী সেটার যত মানানসই ব্যাবহারে পটু, সে নারীর সৌন্দর্য ততই প্রকাশ পায়। আপনি যে উদাহরণটি আলী সাহেবের 'চিল্কা' রচনাটির থেকে দিয়েছেন, তার ভাষার চিত্রকল্পগুণে অত্যন্ত প্রবল। ফলে 'চিল্কা'র রাত্রি তার সমগ্র রূপটি নিয়ে আমাদের কাছে ধরা

দিয়েছে। তাই যদি কেবল ভাষার মারপ্যাঁচের জন্য সবাই সেটাকে মনে রাখতেন, তবে বলতে হত যে, লেখাটি রসের পরীক্ষায় ফেল মেরেছে। পরম সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি সে অভিযোগ আনেন নি। আর এ যদি সম্ভব হত, তা হলে সহজ, সরল, অলংকারবর্জিত অনেক বাউলগান ও বৈষ্ণবকাব্য মধ্যযুগ থেকে আজও কালের দরবারে নিত্য হাজিরা দিত না; এবং তাদের চেয়ে ভাষাসম্পদে অনেক গরীয়ান কিন্তু অন্তঃসারশূন্য, অনেক কবিতাই পরবর্তীযুগে রচিত হয়েও এমন নিঃশেষে লোপ পেত না।

মহারথ-অতিরথদের ছেড়ে এবার আলী সাহেবের লেখার কথায় আসা যাক। আপনি বারম্বার 'চাচা-কাহিনী'—শবনমের কথা তুলেছেন, ব্যল-ল্যাত্রের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সীরিয়স লেখায় ব্যল-ল্যাত্রের ভাষার অনুকরণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোথাও বলেন নি। 'চাচা-কাহিনী' ব্যল-ল্যাত্র গোত্রের। তাতে ভাষার অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ আছে। 'শবনম' দুটি তরুণ হৃদয়ের প্রেমোপাখ্যান। বিষয়বস্তু রঙীন, কল্পনার দ্বারও অবারিত, ফলে ভাষাও বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম। 'শহর্-ইয়ার' বানু গৃহস্থ-রমণী, তার ওপর কিছুকাল হল তাঁর আবার ধর্মে মতি হয়েছে। তাঁর কথা লিখতে বসে তো রঙীন ভাষায় ততোধিক রঙীন চিত্র অঙ্কন করা যায় না। এ-লেখার বেলায় তাই সার্কাসে দড়ির ওপর অতি সাবধানে সাইকেল চালানোর মতো লেখক কলম চালাচ্ছেন—ভাষার সামান্যতম মারপ্যাঁচও যেন চিত্রে ঢুকে না পড়ে। একবার ঢুকলেই সর্বনাশ! তা হলেই ভাষার যে কারিকুরী লেখক সারা জীবন করে এসেছেন, ফের তার দায়ে মজে যাবেন। শহর্-ইয়ার হয়ত শবনম্ বনে যাবেন, কিংবা আরও অকল্পনীয় কিছু।

আরও একটা কথা এ-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। আপনি আলী সাহেবের যে ভাষার, অর্থাৎ চাচা-কাহিনী-শবনমের ভাষার জন্য প্রশংসা করেছেন, যার অভাবে আক্ষেপ করেছেন, আলী সাহেব তো সে ভাষার জন্যে সারা লেখক-জীবন ধরে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর ভাষার সম্বন্ধে স্থানে-অস্থানে বহুবার খ্যাত-অখ্যাত বহু জন বলেছেন, 'হাঁ, ভাষাটি মনোরম, কিন্তু প্রচুর গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট'। তৎসম-তদ্ভব, দেশী-বিদেশী ইত্যাদির অবাধ মিশ্রণ তাঁরা সইতে পারেন নি, তা সে ভাষা যতই প্রাণবন্ত, প্রকাশক্ষম হোক না কেন। এবার মুজতবা শুদ্ধতর বাংলা লিখেছেন। আরও দু'-চারটে লেখা বেরোক, দেখা যাক, শুদ্ধ বাংলায় লেখাতে আগের মতোই তিনি জেল্লা দিতে পারেন কিনা, অথবা ফের আগের ভাষাতে ফিরে যান নাকি। যাই করুন না কেন, ইতোমধ্যে লেখকের ভাষায় শুদ্ধতা আনার প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়।

আপনি সর্বশেষে দুঃখ ও ক্ষোভ করেছেন আলী সাহেবের বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তিতে। আপনি দুঃখ ও ক্ষোভ না করলেও এটা অবশ্যম্ভাবী—বয়সের ক্ষেত্রে। তবে লেখার ক্ষেত্রে বৃদ্ধত্বের অভিযোগ হয়ত এখনও আনা যায় না। প্রমাণস্বরূপ আমি আপনাকে সম্প্রতি-প্রকাশিত আলী সাহেবের 'রাজা-উজীর' বইটি একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। (আপনার চিঠিতে উদ্ধৃত আলী সাহেবের বই বা প্রবন্ধের বাইরে রেফারেন্স দিতে চাইছিলাম না; কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায়)

সত্যকাম সেনগুপ্ত

কলিকাতা-২৯

॥ ২ ॥

ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় আপনার লেখা 'শহর্-ইয়ার'-এর চব্বিশ পরিচ্ছেদ-এর শেষ অংশে আপনাকে আমি যে চিঠিটি ইতিপূর্বে লিখে একটি সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়েছিলাম, তার এক দীর্ঘ ও বিশদ উত্তর পেয়েছি বলে; অবশ্য, যদি ধরেই নিই আমার চিঠিরই উত্তর এটা।

আমি আপনাকে বলতে চাইনি যে আপনি রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকারক; বরং, রবীন্দ্রনাথ যেখানে হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই যেন অতি সন্তর্পণে আলাগোছে এড়িয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ, নিরপেক্ষ এক অনা উদার সমাজ বা সেইরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের কাছে দিয়েছেন, সেখানে আপনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আপনার সুন্দর লেখার মাধ্যমে যে একটি মিলন সেতু বা ঐক্য আনতে সক্ষম, এখানেই আপনার রচনার বৈশিষ্ট্য; আমি যে আপনাকে একটি চিঠি লিখতে উৎসাহিত বোধ করেছিলাম, সে তো এই কারণেই যে আমার মনে হয়েছিল আমি ধরতে পেরেছি আপনার লেখার সঙ্গে অন্যদের লেখার পার্থক্য কোথায়। অবশ্য, আমি আপনার লেখার মূল সুরটা হৃদয়ঙ্গম করতে, কিছুটা বিশ্লেষণ করে পৌঁছতে চেয়েছি আমার সিদ্ধান্তে; এবং একটু তুলিয়ে দেখে মনে হয়েছে, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন, ঐক্য বন্ধনের প্রচেষ্টায়। একটি বিশেষ কারণেও এটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়; রাজনৈতিক ও ধার্মিক নানা সম্প্রদায়িক সংগঠন ও শক্তির বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের এই প্রয়াস বীরত্বপূর্ণ ও অনেক বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে তোলার এক মহৎ ব্রত। আমি আনন্দিত যে, আপনি এ বিষয় সফলতা লাভ করেছেন। এ জন্য আপনার সত্যিই উচ্চ পুরস্কার প্রাপ্য। আপনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাবার যোগ্য। দেখলাম, আপনি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাই লিখেছেন "লোকে ভাবে, হয়তো ঠিকই ভাবে, আমার নিজস্ব কোনো ভাব ভাষা নেই" ইত্যাদি। কিন্তু কোনো কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করলেই কি তার মূল্য বাড়ে? বরং কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করার পর সঠিক দাম ঠিক করা যায়। তাই আমি পরীক্ষা করে দেখলাম আপনার লেখার মূল্য আসলে কোথায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। আমি তো হৃদয় খুলেই বলতে চাই আপনার কৃতিত্ব অনন্য। বিশেষ করে রূপকথার মতো সামান্য হাতিয়ার সম্বল করে, যেখানে বহু বিরুদ্ধ শক্তি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। মহৎ সাহিত্যের ভিতর একটি কল্যাণকারী উদ্দেশ্য থাকে, তা মার্কসিস্ট না হয়েও বোধ হয় বলা চলে; সেটি হল মানুষের

ভালো কিসে হয় তার অনুসন্ধান করা এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও মহৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য একই।

আমি আরো একটা কারণে আপনাকে আগের ওই চিঠিটি লিখেছিলাম। কিছুকাল আগে আমার মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির যুগে শিল্পের যাদু স্তিমিত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে। একটি বইতে এই magical qualityর অভাবজনিত আধুনিক সাহিত্যের নিষ্ফলতা বন্ধ্যত্বের বিষয়ে একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম; বইটি হাতের কাছে নেই, তাহলে তার সঠিক উল্লেখ করতাম। তাই, আপনার লেখায় সেই যাদুর স্পর্শ পেয়ে, আমি হৃষ্টচিত্ত হয়ে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম। আপনি যে অনেকেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন, তা আপনার নিজস্ব গুণেই। আমার সেলাম নেবেন।

বলা বোধ হয় বাহুল্য যে, আপনার উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই যে শুধু আমার প্রিয় তা নয়, আমি ভাগ্যবান, যে, আমি সেগুলি গাইতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে ঋণী, তবু ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথকে নতুন আলোতে আবার দেখতে। আপনার লেখার মধ্যে যে একটি পরিহাসের সুর আছে, লেখকে উইট-এর মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল শাণিত করে তুলতে সে চেষ্টা, তা বার্নার্ড শ-এর লেখার মধ্যে পাই। সম্ভবত, সেই সুপারম্যানই আপনার লক্ষ্য।

দিলীপ রায়
কলকাতা-২৯।

জীবিকার সন্ধানে জননী

ওরা শ্রাবণের দেশ পত্রিকায় 'ঘরে-বাইরে' প্রসঙ্গে 'জীবিকার সন্ধানে জননী—দেশে ও বিদেশে' প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরতা জননীর সংসারে সন্তানের অবহেলার নজির নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে খানিকটা একমুখী সমালোচনা করে বসেছেন।

গত দু' বছর আমি আমেরিকায় ছিলাম, সেই সময় মোট ৬টি বিভিন্ন মার্কিন পরিবারের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

যে সমস্ত মা ওদেশে চাকুরী করেন, পক্ষান্তরে বাড়িতে কেউ দেখাশুনার না থাকে বা তখনও সেই সমস্ত শিশুর স্কুলে যাবার বয়স না হয়ে থাকে, তা হলে সাধারণত তাকে পাড়ার 'ক্রেসে' অথবা কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে রেখে যান। ক্রেসগুলিতে শিশুরা দেখেছি সদা আনন্দ-উৎফুল্ল ও ক্রীড়াচঞ্চল। প্রতিবেশীর বাড়িতেও শিশুরা মোটেই বিমাতৃসুলভ ব্যবহার পায় না। অনাথ অথবা জারজ শিশুকে মানুষ করার জন্য ওদেশে ত কাড়াকাড়ি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী একটি অনাথ শিশুর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত দশটি পরিবার উন্মুখ। আমি এমন একটি পরিবারে একবার ছিলাম, যাঁরা তাঁদের ৩টি আপন সন্তান থাকা সত্ত্বেও একটি শিশু-কন্যাকে দত্তক নিয়েছেন। তাঁরা যদি আমাকে না জানাতেন তবে আমি কোন দিনই জানতাম না যে শিশুটি তাঁদের আপন সন্তান নয়, এমনই ছিল তাঁদের আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা।

নেহাৎ ধনী না হলে ওদেশে সারা দিনের জন্য বড়-একটা 'বেবী সিটার' কেউই রাখেন না। 'বেবী সিটার' শুধু নিগ্রোরা নয়, সাদা-কালো নির্বিশেষে ওদেশে বেবী সিটার হয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় আমি প্রথমে যে পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেই পরিবারের কর্তা ছিলেন একটি বিখ্যাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানির 'বোর্ড অব ডিরেক্টরের' চেয়ারম্যান। ধনী এবং অভিজাত পরিবার। তাঁর মেয়ে হাই স্কুলে পড়ত, অথচ প্রায়ই সে 'বেবী সিটার' হত; যে পয়সা পেত তা দিয়ে সে নিজের জিনিসপত্রই কিনত। স্বাবলম্বন ওদেশে একটা বড় কথা, আর তার অনুশীলন হয় ছোট থেকেই।

জননী উৎকণ্ঠিতা হয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্যে শুধুমাত্র দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেই কি স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়? আমাদের আশপাশের বাড়িতে প্রায় ত দেখি, ছেলের কলেজ অথবা কারখানা থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, মা উৎকণ্ঠিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলে ভীত পায়ে, হন্তদন্ত হয়ে চোরের মত বাড়িতে ঢুকতেই মায় স্নেহ-চুম্বনের (সেটা ওদেশে প্রায়ই চোখে পড়ে) বদলে বর্ষিত হতে থাকে অজস্র কটু গালিগালাজ, যেগুলি শুধু অশ্রাব্য নয়, উপরন্তু ছেলের পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাসকেও সারা জীবনের মত নষ্ট করে দেয়। মাতৃস্নেহ তুলনা করার জিনিস নয়; দেশ, কাল ও পাত্রের ওপরে তা চিরদিনই অকৃত্রিম; কিন্তু আমাদের অন্ধ-স্নেহ আমাদের সন্তানদের 'রেখেছে বাঙালী করে, মানুষ করেনি'।

লেখিকা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কিশোর ছেলেমেয়ের হিপি হয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে 'কর্মরতা জননী' এবং তাঁদের স্নেহহীনতা। লেখিকার এই বিশ্বাস মোটেই ঠিক নয়। ওদের হিপি হওয়ার পিছনে রয়েছে মোটামুটি তিনটি বৃহৎ কারণ : (১) প্রবল প্রাচুর্যের মধ্যে একটা ছন্নছাড়া বৈচিত্র্য খোঁজা; (২) ছেলেমেয়েদের অপর্যাপ্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও (৩) চলতি সমাজ ও সরকারের প্রতি একটা বামপন্থী মনোভাব। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো-সমাজের মধ্যে সমস্যা সব-চেয়ে প্রখর। দারিদ্র্য, বিচ্ছেদ, জারজ সন্তানের জন্ম, মদ্যপান ইত্যাদির সংখ্যা সাদা চামড়াদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী; কিন্তু আশ্চর্য যে, নিগ্রো-হিপি কদাচিৎ-কদাচিৎ চোখে পড়ে; অধিকাংশ হিপিই আসে সঙ্গতিসম্পন্ন, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত সাদা পরিবার থেকে।

লেখিকা আমাদের দেশের মায়েদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, 'পাশ্চাত্য সমাজের টীন-এজার প্রবলেম যেন তাঁরা খাল কেটে ঘরে না ঢোকান'। আমার মনে হয়,

লেখিকা হয় বহুদিন ভারতবর্ষ ছাড়া আর নয়ত সমস্যাটিকে এড়িয়ে গিয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছেন।

আমাদের দেশে 'টীন-এজার' সমস্যা আজ একটি নিঃসন্দেহে 'জ্বলন্ত সমস্যা'। আমি নিজে একটা স্টাডি প্রোগ্রামে কাজ করছি: দেখছি, স্কুল পালান, স্কুলের ও জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, দলবেঁধে গুণ্ডামী করা, মেয়েদের বিরক্ত করা, চুরি করা, ধূম ও মদ্যপান করা, অভদ্র আচরণ প্রভৃতি কাণ্ড আজকের ভারতীয় টীন-এজারদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখিকা শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে, এদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ পকেটমারই টীন-এজার! 'ডেলিংকোয়েন্সি প্রবলেম'কে আমরা এত দিন অবজ্ঞা করে এসেছি, কিন্তু আজও যদি আমরা চোখ বুজে থাকি তবে তার ফল আমাদের শীঘ্রই কড়ায়-গণ্ডায় পেতে হবে।

ওদেশে আমি সোস্যাল ওয়ার্কে একটা 'ফিল্ড ট্রেনিং' নিতে গিয়েছিলাম। অজস্র প্রতিষ্ঠান, হোম, জুভেনাইল কোর্ট প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কেন্দ্রে আমাদের হাতে-কলমে কাজ করতে হয়েছে। আমি যা দেখেছি তা থেকে যদি নিরপেক্ষভাবে সত্যকে স্বীকার করতে হয়, তবে বলব, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সামাজিক সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশও ওই সমস্ত সমস্যা থেকে তাদের থেকে খুব একটা বেশী দূরে নয়। তফাত শুধু এইটাই, ওরা আশ্চর্য সাহস আর সততার সঙ্গে ওই সমস্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করছে, আর আমরা শুধু এড়িয়েই যাচ্ছি।

তপনকুমার ধর
কলিকাতা-১৯

আইন অমান্যের বিপদ

আপনাদের ২৪ শ্রাবণের সংখ্যা 'দেশ'এর সম্পাদকীয়টি খুবই সুচিন্তিত। আপনারা লিখিয়াছেন, "আইন ও নীতিকে স্বীকার করে না নিলে স্বৈরাচারের প্রবৃত্তি আসে। যুক্তফ্রণ্টই হোক আর কংগ্রেসেই হোক—কোন রাজনৈতিক দলই আজ অস্বীকার করতে পারবেন না, আইন ভাঙা বহু ক্ষেত্রে একটা সংকর্ম, বিপ্লবের কর্ম বলে স্বীকৃত হয়।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন ঠিক করেন তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরে লিখেছিলেন—

Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself, it can be used against it as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes a temptation

ভারতীয় মুসলমানরা এখানে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রেখে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বসবাস করুক! তাই আমার বক্তব্য হল, স্বাধীনতার আজ বাইশ বছর পরেও ভারতীয় মুসলমানদের উপর ওইরূপ একটা সন্দেহমূলক আচরণ করে তাঁদের মনে সন্দেহ, সংশয় না রেখে ভারতের সর্ববিষয়ে, সর্ব-সম্প্রদায়ের মত, সব সুখ-দুঃখের সমান অধিকার দিয়ে দেশকে সত্যিকারের ভালবেসে দেশের সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

সেখ আসাদ আলী
নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান

১৯শে জুলাইয়ের দেশে প্রকাশিত শ্রীমোহিতকুমার মজুমদারের পত্রের কিছু মন্তব্যের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ সাহিত্যের সত্যের কোনো নির্দিষ্ট সর্বজনীন মানদণ্ড নেই। তার কয়েক লাইন পরেই যোগ করেছেন "কবিতার ব্যাখ্যা কবিতাকে ছাড়িয়ে যতদূরে খুশী যাক....শুধু খেয়াল রাখা চাই এমন কিছু না এসে পড়ে যা সেই কবিতার মূলভাবের বিরোধী।" বক্তব্যটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না। এক্ষেত্রে কবিতার "মূলভাব" কোনটা? মোহিতবাবু যা বুঝেছেন তাই? না কি, শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব যা বুঝেছেন? তাহলে মোহিত-বাবুর "এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সব সমালোচকই কাব্যের অর্থ তাঁর নিজের কাছে যে রকম প্রতিভাত সেইরকম ব্যাখ্যা করে থাকেন"—এই উক্তির অর্থ কী? কাব্যের যদি একটাই মাত্র "মূলভাব" থাকে, তাহলে ব্যাখ্যার বিভিন্নতা আসে কোথা থেকে?

আসলে মোহিতবাবু ঐ Encounter with Nouhingness কথাটাকেই সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর সমালোচনার মূলভাব এই অসহনীয়তা। না হলে তিনি বুঝতে পারতেন শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুবের ঐ ব্যাখ্যায় খুব একটা ভুল নেই। রোগ শয্যার যে ৭নং কবিতার তিনি উল্লেখ করেছেন, তার শেষ চার পংক্তি হচ্ছে ঃ

> তারপরে জানি যবে
> তুমি চলে যাবে,
> আতংক জাগায় অকস্মাৎ
> উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

এখানে ঐ ছোট্ট "জানি" শব্দটা লক্ষ্যণীয়; যার জাগ্রত আবির্ভাব এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে "আকাশে অগণ্য গ্রহতারা/অন্তহীন কালে/আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার/' কবি যদি এ কথা জেনেই থাকেন যে সে চলে যাবে, তখন কি উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতাটাই বাকি থাকে না? আর সেটা কি Encounter with Nothingness নয়? এ কবিতাকেও যে কী করে সেবামাধুর্যের প্রতি অকুণ্ঠ বন্দনা ভাবা যেতে পারে বুঝলাম না। সম্ভবত, রবীন্দ্র জীবনের ঐ সাংসারিক দিকটাকেই একমাত্র মাপকাঠি করে রবীন্দ্র-মনের দিকে তাকালেই এ রকম হতে পারে।

অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে এটা। রোগ শয্যার ১৮নং কবিতায় "বিশ্ব" "দয়াময়" কিন্তু ৭নং কবিতায় জগত "উদাসীন"। তার "ভীষণ স্তব্ধতা" আতংকজনক। ১৮ নম্বরে বিশ্বের দয়াকে যদিও "নিদ্রাবিহীন ব্যাকুল আঁখি পাতে" সংহত দেখা যাচ্ছে তবু বোঝা যায় তার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, তার স্বতন্ত্র অবস্থিতিতে কবি বিশ্বাসী যদিও কারো মাঝে তাকে "সংহত" হতেই হয়; কিন্তু ৭নং কবিতায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্ব যে দয়াময়, তার যে প্রাণের দায় স্বীকারের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় বর্তমান, এটা শুধুমাত্র কোনো মানবীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব হচ্ছে; তার নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে, মানবীর অন্তর্ধানের সম্ভাবনায় জগত তার ভীষণ স্তব্ধতা নিয়ে "আতংক জাগায় অকস্মাৎ।"

আমার তো মনে হয়, এই দুই প্রান্তীয় অনুভূতির মধ্যবর্তী হচ্ছে ঐ শেষ কবিতাটি। এখানেও "সৃষ্টির অমোঘ শান্তি"র কথা বলেছেন কবি, কিন্তু ওটা কথাই,—নিজে বিশ্বাস করতে পারেন নি। না হলে, যে কবির মধ্যে একদা জগত এসে কোলাকুলি করত, তিনি শুধু এক সেবিকার অনুপস্থিতিতে একেবারে আর্ত কল্পনায় উদভ্রান্ত হয়ে উঠলেন কি করে? যদি অমোঘ শান্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসই থাকবে, তাহলে সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্রতম কণিকার অনুপস্থিতি এতবড়ো বিপর্যয় ঘটাবে কেন? হয় বলুন, কবিতাটি কারণে সেন্টিমেন্টাল—গুরুত্ব দেবার দরকার নেই কিছু; না হয় তো স্বীকার করতে হয় যে ঐ "সমর্থন" শব্দটা না থাকলে বিশ্বের অমোঘ শান্তির কোনো অর্থ হয় না। অমোঘ শান্তি থাকুক বা না-থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না, যদি না দেখা যায় যে ঐ "তুমি"টি পাশে বসে আছে। তাই শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব যদি বলেন এখানে "রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছেন তাঁর মাথার উপর আকাশ শূন্য, তার মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই শূন্য।" তাহলে কোন কারণে তা তথাকথিত 'মূলভাব'কে সমর্থন করবে না? এই সূত্রেই বলে রাখা ভালো যে, অস্তিত্ব-বাদী সার্ত্র যখন বলেন 'আমরা সবাই খুনী' তখন যে নৈতিক সত্যে তিনি দাঁড়ান সেটা একান্তই মানবিক, অ্যাবসার্ড তত্ত্বে বিশ্বাসী কামু জগতকে অর্থহীন জেনেও, মানুষের প্রতি আস্থা রেখে যান; অর্থাৎ, 'তুমি'তে বিশ্বাস Encounter with Nothingness-এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে অসংগত নয়। কারণ 'শূন্যতা' কথাটাই আপেক্ষিক, কোনো একটা পূর্ণতার সন্ধান জানা না থাকলে ওর কোনো অর্থ হয় না।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী
কলকাতা ৩৬।

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬

গত কয়েক বৎসর ধরে দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ "দেশ সাহিত্য সংখ্যা" নামে যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছেন, আমার ধারণা, তাঁরা অগণিত পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অনেক দূরে থেকেও সম্পাদকমণ্ডলীকে এই মহৎ প্রয়াসের জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। আমার এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন পত্র যখন আপনাদের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছাবে, বোধ হয়, তখন এর কোন মূল্য থাকবে না। কিন্তু কি আর করা যায়; জাহাজ ডাকে পত্রিকা পেতে প্রায় তিন মাসের মত সময় লাগে।

এই সংখ্যায়, (১৩৭৬ সালের বিশেষ সংখ্যা) "বিবর মুক্ত" আলোচনা অংশে আমার অন্যতম প্রিয় লেখক শ্রীসমরেশ বসু সম্পর্কে শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য যে সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে মন্তব্য করেছেন তার জন্য তাঁকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সেই জন্যই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছি আপনাদের এই পত্রিকাকে। এ কথা আজ সর্বাংশে সত্য শ্রীসমরেশ বসুর দর্শন, বিবর থেকে মুক্তি পাবার দর্শন।

আজ সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্ন উঠেছে এবং যার জন্য আদালতের দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে লেখককে, এ যে বিচারের কত বড় প্রহসন, সে কথা আজ প্রতিটি সত্যিকারের সাহিত্যপ্রেমীই জানে। কিন্তু এ কথা সত্য কালের বিচারে মানুষের আদালতে শ্রীসমরেশ বসু বেকসুর খালাস—নিষ্পাপ।

সব থেক বড় কথা, আমার সেই ক্ষুদ্র জীবন থেকে সমরেশ বসু আমার হৃদয় অধিকার করে থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা ছিল না, লেখক সোমনাথবাবু মানুষ সমরেশকে মানুষের সামনে নতুন করে তুলে ধরে সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

গোবিন্দলাল ঠাকুর
খার্তুম, সুদান

সাহিত্যিকের প্রতি সরকারী কর্তব্য

৩রা শ্রাবণের দেশে শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'নক্সীকাঁথার মাঠের কবির সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ' লেখাটি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। বিশেষ করিয়া কবি জসিমউদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও সেখানকার সাহিত্যিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে সরকারের অবদানের ব্যাপারে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-অনুরাগী মাত্রই এই সব সংবাদে আনন্দিত হইবেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের সাহিত্যিক-কবি ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে দুঃসময়ে রক্ষার জন্য আমাদের সরকার কী যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহারা সরকারী বা বেসরকারী কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যাঁহারা চাকুরী তাঁহাদের সাহিত্য কার্যে ব্যাঘাতস্বরূপ হওয়ার আশঙ্কায় সম্পূর্ণ সময় সাহিত্যের কাজে ব্যয় করেন, তাঁহাদের আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, তাঁহাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সংকট হইতে রক্ষা করার জন্য কি সরকারের পক্ষ হইতে যথাযথ ব্যবস্থা আছে? যাঁহারা দিনের পর দিন শরীরের রক্ত জল করিয়া আমাদের মনের খোরাক মিটাইতেছেন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিবার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই রহিয়াছে। সরকার যেহেতু আমাদের প্রতিভূ, সেইজন্য সরকারের কাছে নিম্নলিখিত আবেদন জানাই:

১। সাহিত্যিক ও কবিদের পুত্র কন্যার বিনা বেতনে স্কুল-কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা।

২। রোগে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৩। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা রোগে পঙ্গু হইলে বা মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহাদের পরিবারবর্গকে মাসিক পেন্সনের ব্যবস্থা।

যেহেতু, সাহিত্য কার্যে সম্পূর্ণ সময় ব্যয়কারী লেখক বা কবিদের সংখ্যা খুব বেশী নহে, এইরূপ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা আমার ধারণায় খুব কষ্টকর হইবে না। ইঁহাদের আর কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, সরকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গুণীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের সাহায্যে এই ব্যাপার আলোচনা করিতে পারেন। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমাজ ও তথাকার সাহিত্যিকদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই বক্তব্যের অবতারণা, কথা উঠিতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাঠক সমাজ তৈয়ার হয় নাই বলিয়া সেখানকার সরকার সাহিত্যিকদের জন্য এইরূপ সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও তাহার বাহিরে একটি বড় পাঠক সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিলেও, চলচ্চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে গুটি কয়েকের 'দু পয়সা' করা ব্যতিরেকে, কতজন সাহিত্যিককে ধনী বলা যাইতে পারে? ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাঁহাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারি না।

চিত্তরঞ্জন নাগ
বেহালা, কলিকাতা-৬০

বাংলার চালচিত্র

গাঁয়ে গঞ্জে, শহরে শহরতলিতে অসংখ্য মানুষের মুখের ছবি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসেব নিকেশের খাতায় আঁচড় কেটে দিয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা আমাদের কাছে অচেনা রয়ে গেছেন। সেই অচেনা মানুষগুলিকে চিনে নেবার প্রয়োজন আছে। সাপের খোলসের মত জামা কাপড় পরে থাকা লোকগুলির বিস্তর বর্ণনা বিস্তর সাহিত্যিক দিয়েছেন। তাই কালি ও কলমের টানে গ্রাম বাংলার হরেক কিসিমের সাধারণ মুখ ও মনের বর্ণনা পড়ে আনন্দিত হবারই কথা।

আব্দুল জব্বার সাহেব 'বাংলার চালচিত্র' শীর্ষক রচনার প্রারম্ভিক 'গরুহাটা'র চিত্র নিপুণ হাতে এঁকেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয় সমগ্র ব্যাপারটা যেন বিবিহাট আর উলুবেড়িয়ার উপর থেকেই লক্ষ্য করছি। গরু ব্যাপারীরা দু পয়সা লাভ করলে ট্যাঁকের কড়ি খসিয়ে 'লালপানি' গিলে পাড়া মাত করে ফিরে—এ চিত্র হরবখতই আমরা যারা গাঁয়ে থাকি, লক্ষ্য করি। তড়াপি গড়ন, চলবনে কাজলচোখো গরু না হলে জমি চাষ সুবিধের হয় না। ফসল ভাল হয় না। না হলে বাল বাচ্চাদের কষ্ট হবে। তাই আবাদের মরশুমে গরু কেনাবেচার ব্যাপারটা চিরকালই জমজমাট।

বুঝতে অসুবিধা হয় না নগেন কোরোংয়া আর জলিল মোল্লার মত লোকদের সংগে আব্দুল জব্বার [illegible] দীর্ঘ [illegible] মেলেই তাঁর [illegible] এতখানি [illegible] পেরেছে।

'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্র' পড়ে ভাবছি হয়ত প্রামের মানুষ এতদিনে পায়ের তলায় আকাঙ্ক্ষিত মাটি পেতে চলেছেন।

মাজিম-উদ-দীন-আহমেদ
কলকাতা-১

রূপ ও রূপয়ার রূপকথা

শিশির রায় চৌধুরী

নর্তকীর নাচ ভাল হলেই যথেষ্ট। তার ওপর যদি নর্তকীর রূপ-যৌবনের জৌলুসও থাকে, তা হলে তো আর কথাই নেই। শোনা যায়, এমনি নাকি এক রূপবতী নর্তকী ছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোন এক মোকামে। তার খুব-সুরতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলেই মোকামটির নাম হয়েছিল সুরাট।

রক্ষণশীল তথা নীতিবাগীশরা বলেন, ছাঃ, ছাঃ, তা কী করে হয়! অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের নামকরণ হবে একটা নর্তকীর রূপকে ভিত্তি করে? বিশ্বাসযোগ্য তো নয়ই, বরং হাস্যকর। আসলে, সুরাট শব্দটির উৎপত্তি সূর্যপুর শব্দ থেকে। সূর্যের পুত্র হল এই সূর্যপুর ওরফে সুরাট, আর কন্যা হল তাপী অর্থাৎ তাপ্তি নদী, যা সুরাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

ইয়োরোপীয় ভাষ্যকারগণ অবশ্যই বলেছেন, ভারতের এই গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত-গুলি একেবারেই নন-সেনস। সব কিছুই ধর্মীয় পুরাণের রূপক দিয়ে ব্যাখ্যা করে। এই কূপমণ্ডূকের দল জানে না যে, কন-স্টাণ্টিনোপল-এর সুলতানের হারেমে সুরথা নামে এক নর্তকী ছিলেন। কোন কারণে সুলতান ক্রমশ নর্তকীর উপরে নির্দয় হয়ে উঠলেন। একদিন তাঁকে হারেমের বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরে রাজ্যের অন্যতম সওদাগর রুমি অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সুরথাকে আশ্রয় দিলেন। খবর পেয়ে সুলতান দুজনকেই রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে রুমি তল্পিতল্পা বেঁধে সুরথাকে নিয়ে হিন্দুস্তানে যাত্রা করলেন। তাপ্তির তীরে বন্দরে এসে ভিড়ল তাঁর জলযান। কিন্তু ডাকাতের ভয়। রুমি এক দুর্গনগরী তৈরি করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিলেন। রুমির ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হল। ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বণিকদল ক্রমেই সংখ্যায় বেড়ে উঠল। আমেদাবাদের শাসক ব্যাপারটা জেনে সন্তুষ্ট হয়ে রুমিকে যথেষ্ট ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। রুমি এক নতুন শহরের পত্তন করলেন। প্রিয়তমা সুরথার স্মৃতিকে জাগরূক রাখবার জন্যে নগরের নাম রাখলেন সুরাট।

যদি এ-ও বিশ্বাস না করেন, তা হলে শুনুন আরেক ইতিহাস। এক বিধবার গোপী নামে এক পুত্র ছিল। তাব সেই পুত্রের ফার্সী ভাষায় অসামান্য বুৎপত্তি ছিল। কোথাও চাকুরি জোটাতে না পেরে অতঃপর গোপী দিল্লীতে সুলতানের দরবারে চাকুরির জন্যে হত্যা দেয়। এমনি সময় এক-দিন যখন সব রাজকর্মচারী বাড়ি চলে যায় তখন রাজদরবারে ফার্সীতে লেখা একখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আসে। সুলতান পত্র-পাঠককে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু দপ্তর তখন শূন্য। কিন্তু কী উপায়—এক্ষুনি চিঠির মর্মোদ্ধার আবশ্যক। দরোয়ানের হঠাৎ গোপীর কথা মনে পড়ে। গোপী তখন গেটের বাইরে ঘুমোচ্ছিলেন। গোপীকে ডেকে আনা হল। মাত্র একবার পড়েই গোপী এক নিশ্বাসে সব মানে বলে দিল। গোপীর পাণ্ডিত্যে সুলতান তখন অত্যন্ত খুশী হলেন। গোপীর বরাত ফিরল। গোপী "মালিক গোপী" হয়ে সুরাট শাসন করতে এলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর দুই শতক অবধি সুরাটে মালিক গোপীর নাকি খুব প্রতি-পত্তি ছিল। গোপীর চেষ্টায় অনেক বণিক সুরাটে এসে বসতি স্থাপন করে। প্রমাণ-স্বরূপ গোপীবাড়ী বা গোপীপুরার পাথর দিয়ে বাঁধান বিরাট পুষ্করিণী "গোপী তালাও"এর কথা অনেকেই বলেন। মালিক গোপীর স্ত্রীর ভাগ্যে রানী খেতাবও জুটে-

ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সূতিকাগার হল সুরাট। ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিন্‌স্‌-এর আগমনের পর থেকে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বম্বের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সুরাটই ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ছবিতে ঐতিহাসিক ইংরেজ কুঠির একাংশ দেখা যাচ্ছে

সুরাটের জরি-শিল্প বিশ্ববিখ্যাত এবং অতি প্রাচীন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে আজ এই কুটীর শিল্প বিশেষ অগ্রসর হতে পারছে না। চিত্রে একজন মহিলা কর্মীকে নিজের ঘরে বসে জরি তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে

সুরাটের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের ঐতিহাসিক "উধনা দরওয়াজা"। ১৬৬৯ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী এই দরজা দিয়েই সুরাটে প্রবেশ করেন। তারপরে আরো দু'বার এই দরজা দিয়েই নাকি মারাঠারা সুরাটে প্রবেশ করে লুটপাট করেছিল। এই গেটের পাশেই রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় কো-অপারেটিভ শিল্পকেন্দ্র—উধনা উদ্যোগনগর

ছিল। স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রানীতালাও নামে এক পুষ্করিণীও খনন করা হয়। কিন্তু গোপীর তৈরী শহরের কোন নাম ছিল না। লোকে বলত "নয়ী জাগা" অর্থাৎ নতুন জায়গা। যাই হোক, জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই 'নয়ী জাগা'র নাম স্থির হল সূর্যপুর।

তবে সূর্যপুর কেন স্থির হল, তার পেছনেও আরেক রূপকথা আছে। রান্দেরের এক ধনাঢ্য সওদাগরের মাশুকী অর্থাৎ রক্ষিতা কর্তার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় নিরাশ হয়ে মক্কা চলে যাচ্ছিলেন। মাত্র মাইল খানেক পথ অতিক্রম করার পরে ক্লান্ত হয়ে যখন তাপ্তি নদীতে মাছ ধরার দৃশ্য দেখছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের বিধবা পত্নীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরে এই বিধবাকে সেবিকা হিসাবে নিযুক্ত করেন। বিধবার সততায় ও খেদমতে খুশী হয়ে মুসলিম মালকিন তাঁর সব গহনাপত্তর বিধবার কাছে গচ্ছিত রাখেন। হজ সেরে ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ নোকরাণী নেমকহারামী করেনি। তাই গহনাগুলো একেবারে নিখুঁত পেয়ে গেলেন। তা ছাড়া, সওদাগরের সঙ্গে পুনর্মিলনের আনন্দে মেহেরবান মালকিন সব দৌলত বিধবা ও তার পুত্র গোপীকে দিয়ে দিলেন। স্থির হল, এই ধনদৌলতের একাংশ দিয়ে দাত্রীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা গোপী করবেন। সেই জন্যেই মহিলার সূরথ নামকে অমর রাখতে নতুন শহরের নাম রাখা হয়েছিল সুরথপুর। কিন্তু সুরথপুর শব্দে হিন্দু গন্ধ থাকায় গুজরাটের সুলতান সামান্য পরিবর্তন করে কোরাণের পরিচ্ছেদের সঙ্গে মিল রেখে নামকরণ করলেন সুরাট।

এখন কার কথা বিশ্বাস করবেন বলুন? আরেক দল সব উড়িয়ে দিয়ে বলে, ও সব বাজে কথা। গোপী নামে এমন কোন লোকই ছিল না। তবে হ্যাঁ, নবাবের দুজন রক্ষিতার একজনের নাম ছিল গোপী। আর অন্য রক্ষিতা ছিল, গোপীর জানে-দুশমন। যাই হোক, নবাবের কিন্তু বেশী আকর্ষণ ছিল গোপীরই ওপর। একবার নবাব গোপীকে একজোড়া স্বর্ণকংকন উপহার দেন। এতে অপর রক্ষিতার গোপীর প্রতি বিদ্বেষবহ্নি জ্বলে ওঠে। সে প্রতিজ্ঞা করে বসল, গোপীর কাছ থেকে ঐ কংকন যেভাবেই হোক, সে হস্তগত করবেই। সহ-মাশুকার উদ্দেশ্য জানতে পেয়ে গোপী একখানা কংকন বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে গোপী-তালাও নামে এক গভীর পুষ্করিণী খনন করিয়ে বাকী কংকনখানি ঐ পুষ্করিণীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অর্থাৎ কোন রকমেই যাতে অন্য রক্ষিতার হাতে কংকনখানি না পড়তে পারে। রক্ষিতা গোপীর খেয়াল চরিতার্থের জন্যে এই পুষ্করিণী খনন করা হলেও, সওয়া শ' বছর ধরে এখান থেকেই সুরাটে পানীয় জল

সরবরাহ হত। এমন কি, বাদশাহ আকবরও নাকি এই তালাও-এর জল ব্যবহার করেছেন।

নামের রূপকথায় মতভেদ থাকলেও, ধন-দৌলতের রূপকথায় মতভেদ তেমন একটা দেখা যায় না। আর সবাই প্রায় একরকম শ্লোগান দিয়েই বলে, "সুরৎ সোনানী মুরৎ" —অর্থাৎ সুরাট সোনার মূর্তি। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, সুরাট যদি সোনার মূর্তি না হয়, তবে নওয়াল শা'নু কোঠো"—মানে নওয়াল শা'র কোঠা কস্তুরীর মতো মূল্যবান কেশরের মশলাতে কী করে তৈরী হল? তা হলে ঘটনাটা শুনুন।

সুরাটের ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের কথা শুনে একবার এক বনজারা উট বোঝাই করে প্রচুর কেশর নিয়ে হাজির হল সুরাটে। কিন্তু এই দামী কেশর কেনবার জন্যে কোন শেঠের আগ্রহ দেখা গেল না। অতঃপর ক্রুদ্ধ হয়ে সুরাটের শেঠদের প্রকাশ্যে নিন্দা শুরু করে দিল বনজারা। ঘরের দাওয়ায় বসে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলেন নওয়াল শা। বনজারার নিন্দা তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মুনীমজীকে ডেকে তক্ষুনি হুকুম দিলেন বনজারার সব মাল কিনে নিতে,—তা যে দামেই হোক না কেন। তারপর সব কেশর কিনে বনজারার সামনেই তা মিশিয়ে দেওয়া হল বাড়ি তৈরীর মাল-মশলার সঙ্গে। হাতে বনজারাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হল সুরাটী শেঠদের টাকা পয়সার জোর কত! বনজারার লক্ষ টাকার কেশর নওয়াল শা-র দালানের এক অংশের গাঁথনিও নয়।

তারপরে রহিয়া সোনীর জাদু। রহিয়া সোনী নামে এক স্বর্ণকার ছিল। সে নাকি যে কোন ধাতুকেই সোনায় পরিণত করতে পারত। কিন্তু অফসোসের কথা হল ১৮৯৩ সালের বৈশ্বানরের তান্ডবলীলায় সে ধ্বংস হয়ে যায়। নইলে সুরাটকে মুড়ে দিত সোনায়।

দোহাই পাঠক, হাসবেন না, এ সব গল্প [illegible] যাঁরা এ সব কাহিনী বলেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত গাঁজা বা চরস খান, কিন্তু সব ঐতিহাসিকই এসব খান না।

সুরাটে অবস্থিত এই জৈন মন্দিরের কাষ্ঠের উপর খোদাই করা কারুকার্য দর্শকের প্রশংসা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। ছবিতে মন্দিরের ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে

গুজরাটের গর্বা নাচ ভারতবিখ্যাত। আর সুরাটের ডাংগি আদিবাসীদের নাচ গুজরাটে বিখ্যাত। উপরের ছবিতে ডাংগি আদিবাসীদের নাচতে দেখা যাচ্ছে

তাঁরা বলেন, এখানে উড়ত চৌরাশি বন্দরনু বাউটো, অর্থাৎ চৌরাশি বন্দরের পতাকা। আর তার নীচে জমা হয়েছিল ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সব জাতি। ১৬৬৬ সালে একমাত্র ইংরেজ ও ডাচদের কাছ থেকেই শতকরা ৩ টাকা হারে ১২ লাখ টাকা শুল্ক আদায় হয়েছিল। যে কোন বেনেই সিন্ধুক খুলে পাঁচ-ছ' লাখ টাকা দিতে পারত। আর বহির্বাণিজ্যের জন্যে এই বন্দরের ৫০ খানি জাহাজ ছিল। দূরদর্শী আকবর বাদশাও মসনদে বসেই এই "বাবুল-মক্কা" (মক্কার দ্বার) দখল করে নিয়েছিলেন।

তাপ্তি নদীর তীরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুরাট ক্যাসলের দৃশ্য। ১৫৪০ সালে পর্তুগীজদের দমন করবার জন্যে এই দুর্গ তৈরি করা হয়। তুর্কী কামান দ্বারা এই দুর্গ সুরক্ষিত ছিল। ১৫৭৩ সালে আকবর দখল করেন। কিন্তু আশ্চর্য, দুবার সুরাট আক্রমণ করলেও, শিবাজী এই দুর্গের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। তারপরে ১৭৫৯ সাল থেকে আসে ইংরেজের অধীনে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের প্রায় দুডজন দপ্তর এতে নিয়মিতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে

তবে তা নিশ্চয়ই হজের রাস্তা সুগম করবার জন্যে নয়। পশ্চিম দুনিয়ার সাথে বাণিজ্যের রাস্তা প্রশস্ত করতেই তিনি সুরাট দখল করে নিয়েছিলেন। আর শিবাজী ও তাঁর পরবর্তী মারাঠী শাসকরা অন্তত তিনবার এই "মক্কা-ডাগোর" অর্থাৎ মক্কার জানালা লুঠ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মুসলমান হজযাত্রীদের জব্দ করা ছিল না। লুঠের তিনবারই লক্ষ্য ছিল নানাভট নমে ধনদৌলতের আসল বাজারটি।

রুমির মেহবুবা সুরথার আকর্ষণই হোক, আর মালিক গোপীর পুরুষকারই হোক, মধ্য প্রাচ্য ও ইয়োরোপ থেকে যথেষ্ট বণিক সমাগম হয়েছিল সুরাটে। সন্দেহ নেই তাদের কিছু সংখ্যক নরনারীর মেলামেশা হয়েছিল স্থানীয় লোকদের সংগে। সেই মিশ্রণের ফলেই বোরা, খোজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে এত বেশী রূপবান ও রূপবতী দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পার্শীদের কথা স্বতন্ত্র। কারণ পার্শীরা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এতই সজাগ যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো স্বধর্ম প্রচার তো দূরের কথা, কোনও অ-পার্শীকে তাঁদের ধর্মগ্রহণ করতে তাঁরা দেন না। তথাপি খাটী ভারতীয় হয়ে পার্শীরা আজো বেঁচে রয়েছে। এর মূলে হচ্ছে পার্শীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী তথা নির্ভেজাল ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। রূপকথায় বলে, ইরান থেকে পালিয়ে এসে পার্শীরা যখন সুরাটে প্রথম আশ্রয় ভিক্ষা করেন, তখন সুরাটের শাসন-কর্তা তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেন। দ্বিতীয়বার যখন আবেদন আসে তখন সুরাট শাসক সুরাটে স্থানাভাবের কথা জানাবার প্রতীক হিসাবে একেবারে কানায় কানায় ভর্তি এক গ্লাস দুধ পার্শী নেতাকে পাঠিয়ে দেন। উত্তরে পার্শী নেতা ঐ দুধে একটু খুশবু ছেড়ে দিয়ে দুধ পুনরায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এবার সুরাট শাসক বুঝলেন যে পার্শীরা জনসমস্যা জটিল না করে সুরাটকে বরং খুশবুর মতো আনন্দময় করে তুলবে। অতএব সুরাটে পার্শীদের আশ্রয় দেওয়া হল।

আজ হয়ত এখানে সুরথার নাচ দেখতে কেউ আসে না। এই 'বন্দর-মোবারক'এ কেউ কাউকে মোবারকবাদ জানাতে হাজির হয় না। আজ এই "গেট-ওয়ে-টু-মেক্কা" দিয়ে হাজীরা যাতায়াত করেন না। জরি শিল্প ক্রমে গুটিয়ে আসছে, ঘাড়ি মেঠাই বিশেষ বিক্রি হচ্ছে না। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত শিল্প-সংস্থা ও বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ যেমন দ্রুত গতিতে এই দক্ষিণ গুজরাটের ঐতিহাসিক শহরে ঘটছে, তাতে মনে হয়, এই রূপ ও রূপরায় রূপকথার শহর আবার সকলকে টেনে আনবে।

সীমান্তের এই শৈল শহরে

কিরণশঙ্কর মৈত্র

নাগাভূমিতে প্রায় বারোমাসই বৃষ্টি হয় অল্পবিস্তর। শুরু হয় সেই মার্চ-এপ্রিল থেকে, স্তিমিত হয়ে আসে সেপ্টেম্বরে। এখানে এখন ভরা বর্ষা। শৈলরাজ্যের মন ভোলায় অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমারোহ। সকালে ঝকঝকে রোদ্দুর, আপিসে বেরুতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে ক্ষান্তি, অপরাহ্ণ বেলায় পথঘাট 'ফগে' ঢাকা—যেন বাংলাদেশের শীতভোরের ঘনকুয়াশা, কাছের জনমানব অদৃশ্য। কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি হলেও—'ফগ' আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি মেশানো আবহাওয়া কখনো কখনো লণ্ডনকে মনে করিয়ে দেয়। এ-স্থলে স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ কেউ গর্বভরে যে-কথা বলেন—তার উল্লেখ করা যেতে পারে : আমাদের নাগাল্যাণ্ডকে তুচ্ছ ভেবো না। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড—আর তারপরেই নাগাল্যাণ্ড। কোহিমার বহিরূপে আস্তে আস্তে শহরের রূপ ফুটে উঠেছে। যদিও এখানে শিলংয়ের মতো সেই অজস্র পাইনের সারি, তবু এখানেও দিনের সৌন্দর্য স্থির পাইন-চেরি-বাউয়ের [illegible]। পাহাড়ের মাথায়, বুকে, কোলে সবুজ রঙের আস্তরণ, আর পাহাড়ের খোলা গায়ে একটু নীচেই সবুজ অথবা লাল-নীল রং মেশানো কাঠের বাড়িগুলি ছবির সৌন্দর্য এনেছে।

কোহিমায় আঙ্গামী নাগাদেরই প্রাধান্য বেশী যেমন মোককচাঙে আও-নাগাদের। কোহিমা মোককচাঙ-টুয়েনসাং—এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত নাগাভূমির প্রাগ্রসর মোককচাঙের কথা বারান্তরে বলবার ইচ্ছে রইলো। লোথা, রেঙ্গমা, চাকেসাঙ, সেমা প্রভৃতি উপজাতিরাও কোহিমার আশেপাশে বাস করেন। আঙ্গামীরা শিক্ষা-দীক্ষায় এই রাজ্যে অন্যতম অগ্রসর উপজাতি। শ্রী টি এন আঙ্গামী ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান মন্ত্রিসভারও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার বহন করছেন।

শিক্ষিত নাগারা প্রায় সবাই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে, নাগাভূমির অধিকাংশই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। এই রাজ্যের অনেক লোক এখনও প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। কেউ কেউ নিজেদের হিন্দু বলেও পরিচয় দেন শুনেছি।

কোহিমার উপকণ্ঠে পাহাড়ের উপরে সায়েন্স কলেজ, শহরের মধ্যে নৈশ আর্টস্ কলেজেও ক্লাস চলছে। সরকারী হাই-স্কুল ছাড়াও আরো কয়েকটি স্কুল রয়েছে—এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদেশী সন্ন্যাসিনী-দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার'—শহরের একটু দূরে ছোট্ট একটি পাহাড়ের চূড়োয়। কিছুদিন আগে স্কুলের কাছে স্থাপিত হয়েছে মাতা মেরীর শুভ্র-মর্মর মূর্তি, রাতে দূর থেকেও দেখা যায় তার বেদীর আলোকমালা।

যদিও অফিস-কলেজগামী নাগাপুরুষ য়ুরোপীয় পরিধান গ্রহণ করেছেন—মেয়েদের নিম্নাঙ্গে সাধারণ নাগাচাদর এবং উর্ধাঙ্গে ব্লাউজ, কারো কারো গায়ে বাড়তি নাগা-স্কার্ফ। (পরিধেয় চাদর এবং স্কার্ফ অধিকাংশ সময়ই নাগাদের নিজস্ব উপ-জাতির নির্দেশক। যাঁরা নাগাল্যাণ্ডে রয়েছেন তাঁরা পরিধেয় বস্ত্র দেখেই বলতে পারেন—কে আঙ্গামী, সেমা বা কুকী সম্প্রদায়ভুক্ত।) অনেক আধুনিকা পুরো য়ুরোপীয় পোশাক গ্রহণ করেছেন। তাঁদের স্কার্টের হ্রস্বতা এবং ববড্ চুলের বিচিত্র

আধুনিক আঙ্গামী যুবতী

শ্রী টি এন আঙ্গামী

বিন্যাস আপনার বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। অতি-আধুনিক তরুণদের পরনে ড্রেনপাইপ ইত্যাদি বস্ত্রও দেখতে পাবেন।

নাগাল্যাণ্ড স্টেট ট্রান্সপোর্ট রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যদিও কোহিমা শহরে কখনো কখনো 'টাউন বাস' শিরোনামাঙ্কিত একটি বাহনকে চলতে দেখা যায়—সেটি নির্দিষ্ট সময় সীমার বন্ধনে এমনি বাঁধা যে শহরবাসীদের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সবাইকে সেই আদি ও অকৃত্রিম পদযুগলকে সম্বল করতে হয় যাতায়াতের জন্য।

শুনে আশ্চর্য হবেন না—শহরবাসীরা (যারা বাইরে থেকে কার্যোপলক্ষে এখানে এসেছেন তাদের মধ্যে প্রায় সব প্রদেশের মানুষই আছেন, তবে বেশীর ভাগ বাঙালী এবং অসমীয়া) সাধারণত সন্ধ্যা ছটার পরে বাইরে থাকেন না। কোহিমা শহরে মাস-ছয়েক আগেও সন্ধ্যার পর দু'একটা মারা-মারির ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কিন্তু বর্তমান ডেপুটি কমিশনার শ্রী এম এল কম্পানির কার্যভার গ্রহণ করবার পরে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছে। মিলিটারীদের নিয়মিত টহলও ফলপ্রদ। তবে বিশেষ 'পানীয়' গ্রহণের ফলে নিশাসমাগমে কারো কারো যে হঠাৎ বীরত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছে জাগবে না—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন : যদি কোনো মহিলা আপনার সঙ্গে থাকেন—রাতে রাস্তায় বার হলে সাধারণত কোনো নাগাই আপনাকে কিছু বলবে না, অনেকটা

উপজাতি পোশাকে অঙ্গামী যুবক

নিরাপদেই আপনি সান্ধ্যভ্রমণ করতে পারবেন। পর্বতের অধিবাসী সহজ সরল নাগাদের অন্যতম গুণ—তারা মহিলাদের সম্মান করেন।

এই পার্বত্য প্রদেশে সারা বছরই শীত। মে-জুন মাসে দুপুরের রোদে কখনও কখনও আপনি ঈষৎ গরম অনুভব করতে পারেন এবং শুধু সার্ট পরে বাইরে বেরোতে পারেন সোয়েটার ছাড়াও, কিন্তু সারা বছর ধরেই রাতে আপনার নিত্যসঙ্গী লেপ অথবা ব্ল্যাংকেট জাতীয় একটা-কিছু। তাই কলকাতার লোকেরা যখন গরমে হাঁস-ফাঁস করছেন—তখন অনেক অপ্রতিহত অসুবিধে সত্ত্বেও কোহিমার মনোরম আব-হাওয়ায় আরামে দিন কাটাবেন। হয়ত শীত-প্রধানের জন্যেই 'মধু' (মাদক জাতীয় স্থানীয় পানীয়) ও মাংস নাগাদের অবশ্য এবং নিয়মিত আহার্য: এবং এই-সঙ্গে উল্লেখ্য—প্রায় কোনো প্রাণীকেই এঁরা অখাদ্য মনে করেন না।

নাগাভূমির মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে মেঘমুক্তির আভাস। অবিশ্যি 'মেঘমুক্তি'র এই বিলম্বিত লয়কে দ্রুততর করা যেত কিনা এবং এতৎসঙ্গে আমাদের জাতীয় সরকারের অনুসৃত নীতি কতটা নির্ভুল—সেকথা তর্কসাপেক্ষ। তবু বর্তমানের শুভ-সূচনাকে স্বাগত জানানোই উচিত। এ-প্রসঙ্গে নাগাভূমির সাম্প্রতিক নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্বাচনের ফলাফলকে অনেকে সীমান্তের এই পার্বত্য রাজ্যের তথাকথিত 'রাজনৈতিক সমস্যা'র সমাধানের সূচক বলে মনে করেন।

ভারতের দুই প্রত্যন্তের দুটি শহর কাশ্মীর ও কোহিমার মধ্যে অনুসন্ধিৎসুরা কোনো কোনো দিক দিয়ে মিল খুঁজে পেতে পারেন। সীমান্তের এই দুটি প্রদেশই ভারতের নিরাপত্তার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকার সম্ভবত, কারো কারো মতে, অর্থব্যয়ে অকৃপণ। শুনে বিস্ময়বোধ করতে পারেন, কিন্তু এটা সত্যি যে, কোহিমায় ভিখারি নেই, বেকারের অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য এবং দারিদ্র্য অনুপস্থিত। আশ্চর্য নয় যে, নাগারা পরিবার পরিকল্পনায় নন তেমন উৎসাহী। তবে এই সঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য: নাগারা সাধারণত পরিশ্রমী এবং কৃষিকর্মে তৎপর।

নাগাভূমির প্রধান উপজাতি আও, আঙ্গামী, লোথা, সেমা, সাংটাম, য়িমচুংগের, কনিয়াক, ফোম, চাং, জেলিয়াং, কুকি, রেঙমা, চাখেসাং প্রভৃতি প্রত্যেকের আলাদা ভাষা আছে। এর মধ্যে চাখেসাঙের আবার তিনটি উপভাষা। তবে রাজ্যের সরকারী ভাষা ইংরেজী, সেই সঙ্গে সাধারণ লোকের মধ্যে দেখছি নাগামীজ ভাষার প্রচলন—নাগাল্যান্ড বিধান-সভায়ও মাননীয় সদস্যগণ অনেক সময় এ-ভাষায় প্রশ্ন-প্রত্যুত্তর-বিতর্ক করেন। (নাগামীজ আসলে নাগা অসমীয়া, বাংলা ও কিছুটা হিন্দীর সংমিশ্রণ। বাঙালীরা অল্প-আয়াসেই এ ভাষা বুঝতে পারেন।) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: রাজ্যের একমাত্র বেতার স্টেশন কোহিমা বেতার কেন্দ্র উপর্যুক্ত প্রধান প্রধান উপজাতীয় ভাষা ছাড়াও ইংরেজী ও নাগামীজেই প্রধানত অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন।

ভারতের পূর্ব-প্রান্তে নাগাভূমির রাজধানী এই কোহিমার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। (Kohima War cemetery) অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান এই শহরের।) কলকাতা থেকে আপনি ট্রেনে আসতে পারেন (ডিমাপুর-মণিপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে বাসে সোজা এই শহরে), অথবা প্লেনে ইম্ফল, ইম্ফল থেকে বাসে। ভারতের এই অঙ্গরাজ্যে আসতে হলে, মনে রাখবেন, আপনাকে Inner line permit নিতে হবে। কিন্তু যদি কখনো আসেন—সীমান্তের এই শৈলশহরের মেঘ-বৃষ্টি-রোদ আলোছায়াময় মায়াভরা প্রাকৃতিক দৃশ্য নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে আপনাকে।

'প্ল্যানেট নিউজ', অ্যালেন গীন্‌সবার্গের নতুন কবিতা

অ্যালেন গীন্‌সবার্গের নতুন কবিতার বইটি সম্প্রতি হাতে এলো। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে কবিতাগুলি এতে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক কবিতাতেই বাংলা দেশের পরিচিত অনুষঙ্গ আছে।

১৯৬৩ সালে অ্যালেন গীন্‌সবার্গ অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে পায়ে হেঁটে কলকাতায় এসে পৌঁছে ছিলেন, তারপর বেশ কয়েক মাসের জন্য আস্তানা গাড়েন। (এর কিছুকাল আগে তিনি বুদ্ধদেব বসুকে বলেছিলেন, একদিন ভারতবর্ষে যাবোই—আর কিছু ভাবব না পায়ে পায়ে হেঁটে যাবো।) এই ভারত প্রবাস তাঁর এই বইটির কবিতাবলীতে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। তার ফল খুব ভালো হয়েছে কিনা বলতে পারি না।

গীন্‌সবার্গ একজন খাঁটি আমেরিকান কবি, গোটা আমেরিকা তাঁর নিজস্ব কনভার্টিবলের মতন আপন, এবং এই আমেরিকা কোনো ভাব মূর্তি নয়, এর বিশালত্ব, শক্তির দাপট ও অন্তঃসারশূন্যতা—সবই তাঁর কাছে পরিচিত এবং একমাত্র আমেরিকার মৌলিক ভাষাই তাঁর কবিতার সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার একমাত্র উপকরণ। তাঁর চিন্তাও আমেরিকাকে কেন্দ্র করেই, তিনি চান একটি বিপ্লব আনতে—যে বিপ্লবে বর্তমান আমেরিকা ধ্বংস হবে এবং নতুন আমেরিকার জন্ম হবে। এবং একজন কবির বিপ্লব স্লোগান এই ভাষায়, গীন্‌সবার্গের কবিতায় এই বিপ্লবের বাণী বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

এই রকম কবিতার মধ্যে কালীমাতা ও গঙ্গা নদীর বন্দনা, দশাশ্বমেধ ঘাটের বর্ণনা, বিবেকানন্দ স্বামীর উপদেশ, ধ্যান, যোগ, কর্ম প্রভৃতির উল্লেখ খুব মিশ খেতে পারে কী? অবশ্য, এই ধরনের কবিতা কতখানি সার্থক, তা এখন বোঝার উপায় নেই, তাঁর হাজার হাজার অনুকারক জন্মে গেছে এখন, প্রচার পাল্টা প্রচারের ঢাক ঢোলে কান ঝালাপালা। ইংরেজি কবিতায় এ রকম দু' একটা আমাদের চেনা শব্দ দেখলে হয়তো আমাদের আহ্লাদ হতে পারে, কিন্তু বাংলা কবিতায় অনাবশ্যক ল্যাটিন বা তামিল শব্দের মতন এগুলোও তো ইংরেজ পাঠকদের কাছে বিরক্তিকর লাগার কথা।

এক সময় অ্যালেন গীন্‌সবার্গের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের অনেকের সংগেই পরিচয় হয়েছিল। এই বইয়ের বেশ কয়েকটি

কবিতা রচনার সময় (যখন তখন ডায়েরিতে কবিতা লেখা তাঁর স্বভাব) কিংবা রচনার উপলক্ষ্যের সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। যেমন, Last Night in Calcutta—কবিতাটি, কলকাতায় ওঁর শেষ রাত্রি—কেটে ছিল তরুণ কবি উৎপলকুমার বসুর বাড়িতে, আমরা কয়েকজন সেখানে কিছু সময় উপস্থিত ছিলাম—আশ্চর্য, কবিতাটি কিন্তু আমার এখন পড়তে ভালো লাগলো না। এর অনেক কবিতা তাঁর মুখে বারবার আবৃত্তি শুনেছি, এখনও কানে ভাসে তাঁর ভরাট সুরেলা গলায় The Change কবিতার আরম্ভ : ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান্‌স, কাম হোম! অনেক কবিতা তখন সত্যি ভালো লেগেছিল, এখন সম্পূর্ণ বইটি পড়ে তেমন তৃপ্তি হলো না।

চিৎকার ধর্মী লাইনের মধ্যে ধ্বনি সামঞ্জস্য রেখে শব্দের ব্যবহারই গীন্‌সবার্গের কবিতার প্রধান পরীক্ষা। এখন তাতে চিৎকারটাই একটু বেশী প্রচলন মনে হচ্ছে। পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগে। তাঁর পূর্ববর্তী নতুন কবিতার বইটির বিশেষ উত্তাপ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে বিখ্যাত হয়েছে, তাঁর এমন কয়েকটি কবিতা এতে আছে। যেমন, 'হু উইল টেক ওভার দ্য ইউনিভার্স', 'ডেথ নিউজ', দি চেঞ্জ—কিওটো-টোকিও এক্সপ্রেস, 'উইচিটা ভর্টেক্স সূত্র' ইত্যাদি। কয়েকটি কবিতা একদম বুঝতে পারা যায় না, কয়েকটি কবিতা আগাগোড়া সুবোধ্য। আমার পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসাই সুবিধা-জনক—এই কবির কোনো কবিতা যদি বুঝতে পারি এবং কোনো কবিতা পারি না—তা হলে না বোঝা কবিতাগুলো বাজে। যেমন স্তোত্রজ টু কালী ডেস্ট্রয়ার অব ইলিউজানস্ : এর লাইনগুলি এ রকম :

O Republic female mouth from
which two politics trickle they
who recite
the name they thy 28th star
OMAHA subjugate hungers
a creech under Gold Reserve
host hordes

আমার কাছে বিরক্তিকর ও অসহ্য মনে হলো। "দা চেঞ্জ : কিওটো-টোকিও এক্সপ্রেস" কবিতাটির কিছু কিছু অংশ অবশ্য বিদ্যুৎ ঝলকের মতন সুন্দর। যেমন :

In this dream I am the Dreamer
and the Dreamed I am
that I am Ah but I have
always known—
Oooh for the hate I have spent
in donying my image & cursing the breasts of illusion—
Screaming at murderers,
trembling between their legs
in fear of the steel pistols of
my mortality—
Come, Sweet lovely Spirit, back
to your bodies, come great
God back to your only image,
Come to your many eyes
and breasts,

অপর পক্ষে তাঁর বহু ঘোষিত কবিতা

"উহাচটা তরুণের সত্র" চেঁচামেচিতে ভর্তি'।

বস্তুত, আমার এখনও মনে হয়, নিরিবিলি আবেগের কবিতাতেই গীনস্বার্গের প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে ফোটে, চেঁচামেচির কবিতা তাঁর নিজস্ব চায়ের কাপ নয়। দেখেছি তো লোকটিকে, ভিখারী দেখলে যার নিজেরও ভিখারী হতে ইচ্ছে হয়, নদী দেখলেই ইচ্ছে হয় অবগাহন করতে, যাঁর ধ্যানের মন্ত্র "আমি ধন মান চাইনে মা, চাই শ্রদ্ধা ভক্তি"—সেই মানুষের পক্ষে বীট বা হিপিদের নেতৃত্ব, যৌন স্বাধীনতা বা মাদক দ্রব্য সেবনের স্বাধীনতা আন্দোলনের হোতা হওয়া ঠিক যেন মানায় না। একজন মানুষ কি দিয়ে নেশা করবে কিংবা কাকে যৌন সঙ্গী নির্বাচন করবে, সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, এ নিয়ে কোনো আন্দোলন করা বা এর প্রচার করাই একমাত্র ছেলেমানুষি ব্যাপার অথচ গীনসবার্গ এর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন।

সে রকম নিরুপম আবেগ সম্পন্ন কবিতাও এই বইতে কয়েকটি আছে। "পুত্রেশ নিউক" কবিতাটি। কলম্বিয়া এর গাছতলায় তিনি হঠাৎ খবর পেলেন, বিখ্যাত কবি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস্ মারা গেছেন। কবিতা জগতে উইলিয়ামস্-ই গীনসবার্গের গুরু। প্যাটারসনে কিশোর গীনসবার্গ যেতেন তাঁর কাছে, লাজুক গলায় কথা বলতেন (উইলিয়ামস্-এর চিঠিপত্রের সংকলনে এর উল্লেখ আছে)। এতদূরে বিদেশে সেই গুরুপ্রতিম কবির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর আঘাত ও বিমূঢ়তা চমৎকার ফুটেছে। তাঁর একটি সুন্দর ছোট কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে আলোচনা শেষ করছি। কবিতাটির নাম 'গুরু'।

It is the moon that disappears
It is the stars that hide not I
It is the City that vanishes, I
stay with my forgotten shoes
my invisible stocking
It is the call of a bell

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

পূর্ব পাকিস্তান। অমিতাভ গুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ষোলো টাকা।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন সবাইকে এক করার শপথ নিয়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলন সজীব হয়েছিল একদিন তারই সমাপ্তিতে আমরা পেলাম খণ্ডিত বাংলা। বাংলার জল, মাটি ও মানুষের অখণ্ডতাকে বিসর্জন দিয়ে '৪৭ সালের স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাতে হল আমাদের। স্মরণীয় কালের মধ্যে ইতিহাসের এই নির্মম পরিহাসের কোন তুলনা নেই। কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, জার্মানীর কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় এই অপ্রত্যাশিত কৃত্রিম দেশ বিভাগ—বাংলা ও পাঞ্জাবের বুকের ওপর দিয়ে যথেচ্ছ এই রাজনৈতিক সীমানা টানা, আমাদের শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন পর্বেই আশঙ্কা করা যায়নি। আশঙ্কা করা যায়নি যে, এই বিচ্ছেদ বহিরাগত কোন সামরিক আক্রমণের ফল হিসেবে নয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে আমাদের স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হবে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এই কৃত্রিম দেশ বিভাগকে আজও মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি তা রাজনৈতিক শাসন বা নির্দেশ যেমনই হোক না কেন। তাই দেশ ছেড়ে দলে দলে তারা এপার বা ওপার বাংলার আশ্রয় নিলেও মনে মনে তারা তাদের পরিত্যক্ত বাসভূমি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনের বিচ্ছেদে সদাকাতর। শৈশব বা যৌবনের স্মৃতি মমতার নস্টালজিয়ার আকারে আজ পূর্ব বা পশ্চিম বাংলার মূর্তি পরিগ্রহ করে। বলা বাহুল্য, এই স্মৃতিরোমন্থন বিলাসিতা নয়, বাস্তুচ্যুত মানুষের অনিবার্য বিধিলিপি।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাই সাধারণ মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। দুটি দেশের খবরাখবর, অবাধ যাতায়াতের সুযোগ বাঙালী মাত্রেরই কাম্য। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে মানুষেরা এই সামান্য সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে যদিও এই ভাব ও হৃদয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন কঠিন বাধানিষেধ অর্পিত হয়নি, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যে কঠিন লোহ যবনিকার অন্তরাল গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে তার বেদনাদায়ক ফলভোগ করতে হচ্ছে উভয় বাংলার মানুষকেই। ভৌগোলিক বিচ্ছেদকে ক্রমশ চূড়ান্ত ভাববিচ্ছেদের রূপ দিতেই এখন ব্রতী হয়েছেন পাক সরকার। এমন কি যে ভাষা ও সংস্কৃতি উভয় বাংলার নিবিড় সাযুজ্যের ভিত্তিভূমি তাকেও আঘাত করে খণ্ডিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন ঐসলামিক রাষ্ট্রের সামরিক প্রভুবৃন্দ। কিন্তু সংস্কৃতিপ্রেমী যুবকের কোনদিনই অভাব হয়নি পূর্ববঙ্গে। পাক সরকারের কূটচক্রের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছেন, ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় হাসিমুখে আত্মবলি দিয়েছেন।

শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত তাঁর বিশাল গ্রন্থে পূর্ব পাকিস্তানের সেই অসমসাহসিক যুবকদের ভাষা ও দেশীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন। এগুলো তিনি প্রধানত সংগ্রহ করেছেন পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট নেতা ও সংবাদপত্রের মন্তব্য এবং রিপোর্ট থেকে। আয়ুবশাহী আমলের বিভিন্ন তোলপাড়, বিরোধ প্রতিরোধের যে চাপা স্রোত বয়ে গেছে দেশ জুড়ে তারও যথেষ্ট প্রামাণিক বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের সম্পদ। শ্রীগুপ্ত দেখিয়েছেন গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি কী শোচনীয়ভাবে নির্মম একনায়কত্বের রূপ ধরে পূর্ব বাংলার কণ্ঠরোধ করে আছে। বিশুদ্ধ ঐসলামিক রাষ্ট্র নির্মাণের অজুহাতে কীভাবে পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্তের শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। এবং এই স্বাধীনতা হরণ কীভাবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবী মানুষকে জাগিয়ে তুলে নতুন এক বিদ্রোহের সূচনা করেছে। লেখকের আলোচনা সর্বত্রই যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক। এ ধরনের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই শক্ত। তিনি নানা সূত্রের সাহায্যে সেই শক্ত দায়িত্বটি পালন করেছেন। লেখকের এই পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ব্যর্থ হবে না, পূর্ববঙ্গ প্রেমিক বাঙালীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেও কিছু অপ্রতুল নয়; তারা সবাই এই গ্রন্থকে স্বাগত জানাবেন।

১৫৭/৬৯

সঙ্গীত শাস্ত্র

গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব। একাল ও সেকাল। প্রদ্যোত ঘোষ। চক্র এণ্ড কোং। ৬৪বি, প্রতাপাদিত্য রোড। কলকাতা ২৬। পাঁচ টাকা।

গম্ভীরা গানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অল্প স্বল্প পরিচয় থাকলেও এর সঙ্গে যুক্ত উৎসব ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া আচার, আচরণ আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। বাংলা গানের দেশ। জলবায়ু, ঐতিহ্য, ধর্ম এবং মানসিকতার প্রবর্তনায় এদেশে সৃষ্টি হয়েছে—কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালি; সারি, জারি, টপ্পা, কবি, তরজা, আখড়াই, পাঁচালি, গম্ভীরা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও বাকবদলের সঙ্গেও এদের সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ আঞ্চলিকতা ও লোক সংস্কৃতির শাসনও এদের ওপর দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবু মূলত দুটি মৌলিক স্তরভেদ আমাদের লোকগীতিকে বিশিষ্ট করেছে। স্তরভেদ না বলে হয়ত আবেদন ও ফলপ্রাপ্তির তারতম্য বলাই অধিক সঙ্গত। কারণ সাধারণভাবে ধর্মাশ্রিত গীতাত্মক এই লোকসাহিত্যের একটিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি ভাবের জগৎ। সেই জগতে বিশেষভাবে পূর্ব ভারতের ভক্তি ধর্ম ও দার্শনিকতার ভাবরূপটি প্রধান। এবং এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ধর্মীয় মনীষার যোগ অদৃশ্য নয়। কীর্তন, বাউল বা দেহতত্ত্বের গান বিশ্লেষণ করতে গেলে সেই মরমীয়া ভাবসাধনার ধারাটি আমাদের এক বৃহৎ ভাবের জগতেই নিয়ে যায়। অপরদিকে অন্য এক শ্রেণীর গানের মধ্যে বিশেষভাবে মূর্ত দেখি আমাদের ঘরের কথা। বাঙালীর ঘর, সমাজ, পরিবার তার সহস্র খুঁটিনাটি, কলহ-ঈর্ষা, প্রেম-প্রীতি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই লোকগীতির প্রবাহ জুড়ে। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুরের মান, পাঁচালি, সারি, ভাটিয়ালি সবই সেই ঘরোয়া কথারই রকমফের। গম্ভীরা গান ও নৃত্য এই ধারার ঐতিহ্যবাহী।

গম্ভীরা শব্দটির মূল অর্থ দেবালয়। কিন্তু গম্ভীরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের

গাজনোৎসবেরই একটি রূপ। অন্য অঞ্চলে বা শিবের গাজন গৌড়বঙ্গের মালদহে তারই নাম গম্ভীরা। শিবোৎসবের লোক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এই গান যে-শিবকে নিয়ে মত্ত তিনি দেবাদিদেব যোগক্ষেম মহেশ্বর নন। তিনি বাংলাদেশেরই খাউন্ডুলে মানুষ, চাষবাসের দেবতা। ধর্ম-ঠাকুর বা মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এর যোগ থাকলেও গম্ভীরা মূলত চাষবাস, সমাজ এবং আধুনিককালে রাজনীতিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। নাচ, গান উক্তি প্রত্যুক্তির সমাহারে গঠিত গম্ভীরার মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এর নাটগীতের আদলও পাওয়া যায়। ফলে প্রাচীনতমকাল থেকে যে মৌলিক সংস্কৃতির ধারাটি আমাদের সমাজ ও ঘরের কথা অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়ে চলেছে গম্ভীরা তারই একটি উল্লেখযোগ্য রূপ।

লেখক তাঁর এই গবেষণামূলক গ্রন্থটিকে গম্ভীরা ও তার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় লোক সংস্কৃতিপ্রেমী পাঠকের কাছে বিশেষ উপভোগ্য করে তুলেছেন। এর মধ্যে গম্ভীরার গান, তার উৎসব মণ্ডপ, দিনলিপি, বিভিন্ন নৃত্য এবং গম্ভীরার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তথ্য ও তত্ত্ব সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি গানের সংকলন, বিশেষ কয়েকজন শিল্পী পরিচিতি ও বিভিন্ন ধরনের মুখোশের পরিচয়ের দ্বারা রচনাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখকের ভাষা অহেতুক ভাবাবেগে দু একটি স্থানে কিছু তরল। গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনার ভাষা আবেগবর্জিত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি লেখক ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি রাখবেন। ৪৬/৬৯

একটি চিঠি

বিগত ১৭ই শ্রাবণ 'দেশ'-এর 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে শ্রীঅসীম সোম সম্পাদিত "চলচ্চিত্রকথা" গ্রন্থটির আলোচনায় আমার এক রচনার উল্লেখকালে আমাকে চিত্রপরিচালক বলে পরিচিত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে অতীতে অথবা বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিচালনার সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমার নেই।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৩

প্রাপ্তি স্বীকার

প্রতিবিম্ব। তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রমা ভট্টাচার্য : ৩৯, পি সি ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-৫৭। মূল্য : ০·৫০।

সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অধুনা : ১৭/১ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৩·০০।

গভীরে মরণগান। জুল ভের্ন। অনুবাদ : জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী : ৭, যুগলকিশোর দাশ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য : ৫·০০।

এই আলো হাওয়া রোদ্রে। সম্পাদক : বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী : ৬৬এ, সাউথ এন্ড পার্ক, কলিকাতা-২৯। মূল্য : ৩·০০।

কুষ্ঠসেবা। শ্রীপার্বতী সেন। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি : ১৬এ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধীজী। রেজাউল করীম। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি : ১৬এ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য : ০·৫০।

নীল পাথরের আকাশ। মণীন্দ্র গুপ্ত। বিচিত্রা : ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·০০।

লেনিন ও ভারতবর্ষ। চিন্মোহন সেহানবীশ। কালান্তর প্রকাশনী : ১৯, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯।

সাটলকক

৪। ব্যাডমিণ্টন খেলার সাটল-এর ওজন হবে ৭৩ থেকে ৮৫ গ্রেনের মধ্যে (৪·৭৩ থেকে ৫·৫০ গ্রাম)। পাতলা চামড়ায় মোড়া ১ থেকে ১⅛ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কর্কে আঁটা থাকবে ১৪ থেকে ১৬টি পালক। কর্কের বেস থেকে পালক থাকবে লম্বায় ২½ থেকে ২¾ ইঞ্চি। শিমুল ফুল বা কলকে ফুলের আকারে তৈরী উপরের দিকে পালক বৃত্তাকারে এমনভাবে ছড়ানো থাকবে যে পালক-বৃত্তের ব্যাস ২⅛ ইঞ্চি থেকে ২½ ইঞ্চি থাকে। পালকের দণ্ডগুলি চেন সুতো বা সমগোত্রীয় পদার্থের দ্বারা পরস্পর শক্তভাবে বাঁধা থাকে।

ওজনের কোনরকম ব্যতিক্রম না করে এবং গতি, ওজন ও চলনশীলতা ঠিক রেখে জাতীয় সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ নিয়মের সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে।

(এ) যেমন আবহাওয়া বা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে স্থানের উচ্চতার কারণে যদি সাটলের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

(বি) কিংবা বিশেষ কোন কারণে এবং খেলার জরুরী প্রয়োজনে যদি সামান্য পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে।

সাটল-এর গতিবেগের যথার্থতা বোঝার উপায় একটি ব্যাক বাউন্ডারি লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে আণ্ডার-হ্যাণ্ডে অপর ব্যাক বাউণ্ডারি লাইনের দিকে স্ট্রোক করা। সাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কোন খেলোয়াড় সজোরে আণ্ডারহ্যাণ্ডে উঁচু করে স্ট্রোক করলে যদি সাটল অপরদিকের ব্যাক বাউণ্ডারি লাইনের ভিতরের দিকে এক ফুট থেকে ২ ফুট ৬ ইঞ্চির মধ্যে পড়ে তবে বুঝতে হবে সাটলের গতিবেগ ঠিক আছে। ব্যাক বাউণ্ডারি লাইনের এক ফুটের কম বা ২ ফুট ৬ ইঞ্চির বেশী দূরে সাটল পড়ে তবে বুঝতে হবে গতিবেগ ঠিক নেই।

জ্ঞাতব্য

ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেটের চেয়ে সাটল আরও পলকা। সুতরাং সাটল ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সার্ভ করার জন্য একজন খেলোয়াড়ের কাছে সাটল দেবার সময় কখনোই ফ্লোর বা প্যাটার্নের উপর দিয়ে মেরে সার্ভারের কাছে সাটল পাঠানো উচিত নয়। সাটল-এর আয়ু ক্ষণস্থায়ী। সাটল-এর পালক একবার ভেঙে গেলে বা দুমড়ে গেলে সাটল-এর গতি নষ্ট হয়ে সাটল অকেজো হয়ে যায়। আজকাল প্ল্যাস্টিকস-এর সাটল তৈরী হচ্ছে। খেলার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

প্ল্যাস্টিকস-এর সাটল অনুমোদন করলেও প্রতিযোগিতার খেলা বা গুরুত্বপূর্ণ খেলা পালকের সাটলেই অনুষ্ঠিত হয়।

খেলোয়াড়

৫। (এ) খেলোয়াড় শব্দের অর্থে তাঁদেরই বোঝাবে যাঁরা খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন।

(বি) ডাবলস-এর খেলা হবে দুইজন

ব্যাডমিণ্টনের সাটলকক ও তার মাপ জোক
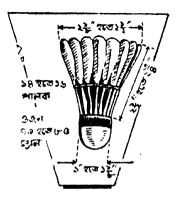
করে খেলোয়াড় থাকবেন এক এক পক্ষে। সিঙ্গলস-এর খেলা হলে এক এক পক্ষে থাকবেন একজন করে খেলোয়াড়।

(সি) যে দল বা খেলোয়াড় সার্ভিস করবে তাঁকে বলা হবে 'ইন সাইড' আর প্রতিপক্ষ দল বা খেলোয়াড়কে বলা হবে 'আউট' সাইড।

টস

৬। খেলা আরম্ভের আগে দু' পক্ষের দুজন টস করবে এবং টসে যাঁরা জিতবেন তাঁরা নীচেয় লেখা তিনটি সিদ্ধান্তের যে-কোন সিদ্ধান্ত বেছে নিতে পারবেন।

(এ) প্রথমে সার্ভিস করবেন কিনা, অথবা

(বি) প্রথমে সার্ভিস না করে সার্ভিস রিসিভ করবেন কিনা, অথবা

(সি) কোর্টের কোন পাশে দাঁড়াবেন।

যাঁরা টসে হেরে যাবেন তাঁরা টসে জয়ী পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

জ্ঞাতব্য—তিনটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ভাল করে অনুধাবন করলে বিভ্রান্তির কিছু থাকে না। যেমন টসে জয়ী পক্ষ যদি কোর্টের একটি পাশ বেছে নেয় তবে অপর পক্ষ প্রথমে সার্ভিস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আবার প্রথমে রিসিভ করার সিদ্ধান্তও নিতে পারে। সমভাবে টসে বিজয়ী পক্ষ যদি প্রথমে সার্ভিস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে অপর পক্ষ কোর্টের পাশ বেছে নেবে, তাঁদের প্রথমে রিসিভ তো করতে হবেই, যখন অপর পক্ষ প্রথম সার্ভিস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি টসে বিজয়ী হয়ে কেউ প্রথমে রিসিভ করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে অপর পক্ষকে একইভাবে প্রথম সার্ভিস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরাজিত পক্ষের কোর্টের পাশ বেছে নেবারও অধিকার থাকবে।

টস করার নিয়ম

ব্যাডমিণ্টনের টস মুদ্রানিক্ষেপের দ্বারা হয় না। সাধারণত এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় র‍্যাকেটের মাথা মাটিতে রেখে র‍্যাকেটের হ্যাণ্ডেলে আঙুল দিয়ে পাক দেন তখন অপর পক্ষের একজনকে 'রাফ' অথবা 'স্মুথ' বলতে হয়। র‍্যাকেটের গলার কাছে স্ট্রিং-এর বুনন অনুযায়ী র‍্যাকেটের কোন দিক রাফ এবং কোন দিক স্মুথ বোঝা যায় এবং সেই অনুসারেই টসের জয়পরাজয় মীমাংসা হয়।

মুকুল

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অরণ্যের দিন রাত্রি" : আউটডোরে দৃশ্য নেওয়ার আগে কাবেরী বসু ও শর্মিলা ঠাকুর — ফটো-দেশ

কুরোসাওয়ার "ইকির়ু"

সম্প্রতি জাপানের যে কয়টি ছবি দেখানো হয়েছে এই উদ্যোগের জন্য সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তার সব কয়টি সম্পর্কে আলোচনা না করলেও ইকিরুর কথা বলতেই হবে। কুরোসাওয়ার ছবি বলেই নয়, বলবার মতই ছবি বলে। কুরোসাওয়ার যে কয়টি ছবি আগে দেখেছি, "ইকিরু" সেগুলির চেয়ে আলাদা। আঙ্গিকে তো বটেই, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও। ব্যাধিগ্রস্ত মন দেখানোর চেয়েও ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো বুঝি আরও কঠিন—বিশেষ করে এমন মানুষের ক্ষেত্রে, যে অফিসের কাজ-কর্ম ও চলাফেরা সবই করতে পারে অথচ জানে তার আয়ু মাত্র আর কয়েক মাস। এই নির্মম সত্য প্রাণে ও বাসনায় জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর মানুষ কী করে? এই প্রতিক্রিয়া খুবই জটিল, তাকে সহজে অনুসরণ করা যায় না। কুরোসাওয়া জটিলতার অনেকখানি আমাদের দেখাতে, বোঝাতে পেরেছেন। তাঁর প্রৌঢ় নায়ক (পৌরসভার বড় অফিসর) যখন বুঝলেন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং তাঁর জীবনের মেয়াদ মাত্র আর কয়েকটি মাস, তখন তাঁর জীবনবাসনা উদ্বেল হয়ে ওঠে, জীবনকে পুরোপুরি

উপভোগ করতে চান তিনি। তারও আগে সংসারের প্রতি, ছেলের প্রতি তাঁর তীব্র অভিমান—তাদের কাছে যেন তিনি বাতিল বস্তুর মতই অবহেলিত। এই চরিত্রের যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও অসহায়তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা সম্ভব হয়েছে কুরোসাওয়ার অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার জন্য। শেষে পরিচালক জীবনমৃত নায়ককে মানবিক মূল্যবোধের শক্ত মাটিতে এনে দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ এই প্রত্যয় নায়কের মনে জন্মেছে, মরতেই যখন হবে তখন কিছু করে মরি। মরবার আগে সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেলেন তিনি (একটা পার্ক তৈরির কাজে)।

অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ছবিতে আছে ঠিকই, ছবিটিও দীর্ঘ। কিন্তু মূল বিষয়বস্তু কুরোসাওয়া চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং অবাক হতে হয় নায়ক চরিত্রে তাকাশি শিমুরার অভিনয় দেখে।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইন্দো-ফ্রেঞ্চ সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত "ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব" গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ এবং বোম্বাইয়ের পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো গত ১৫ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত লাইটহাউস চিত্রগৃহে। ১৫ আগস্ট সকালে উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য আধুনিক সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রথম দিন দেখানো হয় পিয়ের এতে পরিচালিত "লা গ্রান্দামুর"। পরবর্তী দিনগুলিতে প্রদর্শিত হয় "লা পিসিন" (পরিচালক : জাক দেরে), "লা ভিলাম এ লা'ফো" (ক্লোদ বেরি), "মুশেত" (রোবের ব্রেস'), "আলেকজাঁদ্র লা বিয়েঁ আ্যারে" (ইউ রোবের), "জেতেম, জেতেম" (আলাঁ রেনে), "লে রিস্ক দু মেতিয়ে" (আঁদ্রে কাইয়াত) ইত্যাদি চিত্রগুলি।

বলা বাহুল্য, ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব চিত্রামোদী মহলে খুবই সাড়া জাগিয়েছে। ছবিগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

বনজ্যোৎস্না

প্রথম ছবি "নতুন পাতা"-র পর "বন-জ্যোৎস্না"-তেও (সপ্তর্ষিতা ফিল্মস) দীনেন গুপ্ত তারকা-প্রথা বর্জনের সাহস

দেখালেন। তা ছাড়া, ছবির যেটা বহিরঙ্গ দিক—যেখানে চাক্ষুষ সৌন্দর্য ও শট কম্পোজিশন বা দৃশ্যগঠন—সে ক্ষেত্রেও "বনজ্যোৎস্না"-র বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নেই এবং মনে রাখার মত কিছু খণ্ডমুহূর্ত রচনায়ও শ্রীগুপ্ত আগের মতই কল্পনাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। লোকেশান নির্বাচন সুন্দর, ক্যামেরার কাজও (পরিচালক-কৃত) প্রশংসনীয় কিন্তু সব মিলিয়ে "বনজ্যোৎস্না" কেমন হয়েছে কিংবা দর্শককে রসের দিক থেকে কতখানি দিতে পেরেছে সে অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন।

গল্প পড়ে আনন্দ পাওয়া এক, গল্পের চিত্ররূপ দেখে আনন্দ পাওয়া অন্য জিনিস। "বনজ্যোৎস্না"-র গল্প (মূল রচনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) বাংলার অগ্নিযুগের পটভূমিতে লেখা। জ্যোৎস্নাবনে দুটি প্রাণ কতই স্বপ্ন দেখতে পারত। কিন্তু না, তারা গুলিতে মারা গেছে। বনজ্যোৎস্নায় দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি, একটি বিপ্লবী মহীতোষের, অপরটি শিউকুমারীর।

ছবির শুরু বিপ্লবীদের নিয়ে। বনের মধ্যে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চলেছে কয়েকজন বিপ্লবী, মাঝে-মাঝে গুলিবিনিময়। তাদেরই একজনকে (মহীতোষ) আহত অবস্থায় ঘরে নিয়ে আসে শিউকুমারী। শিউকুমারী ও তার বাবা পরম সমাদরে তাকে ঘরে স্থান দিল। মেয়েটির সেবা-যত্ন ও মমতার তো শেষ নেই। বিপ্লবী ধ্যান জ্ঞান তপস্যার ফল শিউকুমারীর পায়ে উজাড় করে দিতে পারত কি? এতটা ভাবতে হয়ত আমরা রাজী নই। তবে মহীতোষের মনে সাময়িক দুর্বলতা ও মায়া-মোহের ইঙ্গিত ছবিতে পাওয়া গেছে। শিউকুমারীর পরিবর্তন ও অন্তরের প্রেমের কথাও দর্শকের জানতে বাকি নেই। ওই পর্যন্তই। তা নিয়ে না কোন জটিলতা, না আবেগের নাটকীয়তা। অর্থাৎ ওই বাড়িতে থাকাকালীন মহীতোষ ও শিউকুমারীকে কেন্দ্র করে গল্পের স্বাদ কিছুই পাওয়া গেল না।

অপর দিকে, এক অসচ্চরিত্রের (যার সঙ্গে পুলিশের যোগ) সদা লোলদৃষ্টি শিউকুমারীর উপর। স্বামীর কোন কুকর্মই তার শিক্ষিতা স্ত্রীর অজানা নয়। ওই মহিলার পাশে কিছুক্ষণের জন্য তার পূর্বতন বন্ধুকে দেখা গেছে। ওই চরিত্র চিত্রনাট্যে কী উদ্দেশ্য সাধন করেছে বলা দুষ্কর। এক কথায়, গল্প কোথাও দানা বাঁধেনি, না ওই অসচ্চরিত্রের ঘরে (তার স্ত্রী অবশ্য স্বামীর চরিত্রহীনতার জন্যই হয়ত একবার ফুঁপিয়ে কেঁদেছে), না মহীতোষের জীবনে। গল্পের দিক থেকে বিচার করলে শিউকুমারীর বাড়িতে মহীতোষের কয়েকটি দিন কাটানো যেন বৃথা। অন্য বিপ্লবীরাও জঙ্গলে এক ঘরে শুধুই আত্মগোপন করে রইল। ক্রেডিট টাইটেলের আগে এবং ছবির শেষে পুলিশের সঙ্গে তাদের এনকাউন্টার দেখানো হয়েছে। রোমাঞ্চের উপকরণ তাতে আছে। কিন্তু বিপ্লবী যুগের পটভূমিতে এই ছবি দর্শকের মনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা কিন্তু তেমন করে জাগিয়ে তোলে না। দেশভক্তির কথা ভেবেই হয়ত "ও আমার দেশের মাটি" গানটির ব্যবহার। তাও কৃত্রিম লাগে গুলিতে নিহত বিপ্লবীকে কবর দেওয়া দেখে—জঙ্গলের পাশে যতখানি সময় বিপ্লবীরা নিয়েছে তাতে চিতা জেলে মৃতের দাহের ব্যবস্থাও সম্ভব ছিল (বনে কাঠ কি পাওয়া যেত না?)। অবশ্য "দেশের মাটি" কথাটির সঙ্গে মিলিয়ে যদি কবরের ব্যবস্থা হয়ে থাকে সে অন্য কথা। তা বাদে বিপ্লবীদের পিছু নিয়েছে যে গুপ্তচররা তাদের পক্ষে পুলিশকে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার সন্ধানটুকু দিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক, নিজের হাতে গুলি করা নয়।

এই ধরনের ত্রুটি ছবির সামগ্রিক দুর্বলতার বিচারে হয়ত তুচ্ছ। আসলে চিত্রনাট্যটি (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত) কেমন যেন খাপছাড়া। সব ঘটনা কেমন আলতোভাবে সাজানো। তবে পরিচালকের কৃতিত্ব, পরিমিতিবোধ তিনি প্রায় সব দৃশ্যেই বজায় রেখেছেন। সব ক্ষেত্রে অবার ত মেটেই সুফল দেয়নি। অর্থাৎ রসের সৃষ্টি বা নাট্যমুহূর্ত গড়ে ওঠার আগেই দৃশ্যের অন্তর্ধান ঘটেছে। ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলি পরিচালক সুন্দরভাবে, সংযমের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন। তবে অবশ্য একটা গল্পসূত্র পাওয়া যায়।

ছবিটি যেমন সর্বাঙ্গীণভাবে মনে দাগ কাটে না, তেমনি অভিনয়ও নয়। তবে মধ্যে কোন কোন শিল্পী অভিনয়ের ক্ষমতা দেখিয়েছেন, কিন্তু তা কাজে লাগেনি। কমল মুখোপাধ্যায়ের (লক্ষ্মীবিহ ঘোষের ভূমিকায়) অভিনয়ই ছবিতে সকলের উপরে। তাঁর চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। বিপ্লবীর বেশে শমিত ভঞ্জ (মহীতোষ), ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, নির্মল ঘোষ প্রমুখ বিশ্বাসযোগ্য। শিউকুমারীর বেশে মীনাক্ষী দত্তকে মানিয়েছে ভাল, তাঁর অভিনয়ও সপ্রতিভ। যদিও কোন কোন মুহূর্তে, বিশেষত প্রেমের অভিব্যক্তিতে তাঁর অভিনয় 'সফিস্টিকেটেড'। কল্যাণ গুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, সবিতা বসু প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন।

ছবিতে গানও আছে কয়েকটি। সব কয়টির প্রয়োগ সুচিন্তিত নয়। খুবই ভাল লাগে ঘোষজায়ার বন্ধুর মুখে গান। তা গানের সুর ভাল। সংগীত পরিচালনা করেছেন নীহার রায়।

এ সন্ধ্যা রাও পরিচালিত "মন কা মীত" হিন্দীচিত্র এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির একটি দৃশ্যে লীনা ও সোম দত্ত

প্রদীপের রাজা

লোকায়ন প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপের রাজা' আবার মঞ্চস্থ হচ্ছে আগামী ২৫ অগাস্ট সোমবার সন্ধ্যা ৭টায়। নির্দেশনায় আছেন অরুণ রায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় রূপেন হাজারিকা।

ল সেন পরিচালিত "মন নিয়ে" ছবি পূজায় মুক্তি পাবে—একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

ভালো না চললে প্রযোজকদের হতে পাড়ে। ভুক্তভোগী জনৈক ক সেদিন মন্তব্য করলেন, "পরি-অমায় ডুবিয়েছে। কত করে নাম এটা করবেন না, কিছুতেই কি " শুনে আশ্চর্য হবেন, এই একই ক মহোদয় কিছুকাল আগে তাঁর হিট ছবির সময় গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "কেমন ভেবেছিলাম নইলে কি আর এমনটি হত?" সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, "পরি-ও নিশ্চয় কৃতিত্ব আছে।" বত্রিশ ত বার করে প্রযোজক সেদিন জবাব লেন, "আরে সেও তো আমার শন'।"

যখন হিট্ করে, তার কৃতিত্বের র হয়ে অনেকেই এগিয়ে আসেন। ক বলেন, "আমি আগেই ভেবে-।" নায়ক-নায়িকা মন্তব্য করেন, অ্যাক্টিং-এর দৌলতেই না এমনটি কাহিনীকার মনে ভাবেন, "যে যা লুক, গল্পের জোরেই ছবি হিট ।" ক্যামেরাম্যান বলেন, "অমন সুন্দর ফ না করলে দেখতাম...।" দু'একজন আর্টিস্টকেও বলতে শুনি, "লাকি ট, এক সিনে নামলেও ছবি হিট্ জানি না কেন পরিচালক তখন

সেই বহুপঠিত কবিতাটি মনে মনে আওড়ান কিনা, "রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী"।

অন্তর্যামী হাসবার মত নানা ঘটনা এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায়শই ঘটে থাকে। সৃষ্টির রক্তাম্বে গোড়াতেই সংহারপর্ব শুরু হয়। মনে করুন, গল্পের শর্তমত আপনি ছবির একটি ভালো নাম ভাবলেন, "পায়ে পায়ে পথ"। মুহূর্তে নামটি নাকচ হয়ে যেতে পারে প্রযোজক কিংবা পরিবেশকের একটি মন্ত্র কথায়, "না, না, অত বড় নাম ছবিতে অচল।" সচল নাম খুঁজতে গিয়ে আপনি দেখবেন, গল্পের মূল সুর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটি নাম ঠিক করতে হচ্ছে। দরকার হলে 'পায়ে পায়ে পথ'এর নাম দিতে হবে 'বিপথগামী'। ছবির নাম নিয়ে বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রযোজকের মনেই নানা সংস্কার। নামের আদ্য অক্ষর 'অমুক বর্ণ' আনলাকি, সুতরাং ঐ বর্ণ দিয়ে নামকরণ চলবে না। পাঁচ অক্ষরের নামের ছবি হালে ফ্লপ করেছে, অতএব পাঁচ অক্ষরের নামও নয়। শাপমুক্তি, সাড়ে চুয়াত্তর হিট করেছে, সুতরাং নামের আদ্য অক্ষর 'শ' ও 'স' লাকি, শুরু হয়ে গেল ছবির নামের আদ্য অক্ষরে ঐ দুই বর্ণের ব্যবহার। পর পর ছবি হয়ে গেল সমাপিকা, সবার উপরে, শাপমোচন, সাঁঝের প্রদীপ, সূর্যতোরণ এবং আরো অনেক। আবার কোন আদ্যাক্ষর ফ্লপ করার পর তা অনলাকি। উদারপন্থী প্রযোজকও অবশ্য কেউ কেউ আছেন। ছবি হিট্ করলে পরে যাঁরা বলে থাকেন, "নামে কি আসে যায়! গোলাপকে যে নামেই ডাকো, গোলাপ—গোলাপ।"

নামকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজকদের মধ্যে অনেকে আবার বিলিতী মতে চলেন। বাংলায় যাই হোক, নামটি ইংরেজীতে বানান করলে যেন সাত অক্ষরের হয়। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, একাধিক সফল ছবির প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহের সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি নাকি তাই। 'মণিহার', 'বাঘিনী' ইংরেজীতে বানান করুন, সাত অক্ষরই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে শ্রীসিংহ এবারেও এমনই একটি নাম পছন্দ করেছেন —Mon Niye। 'মন নিয়ে'র শুটিং শেষ।

*

কিছু কাল আগে আমি একটি আনন্দ-সংবাদ শুনিয়েছিলাম। উত্তমকুমার শীঘ্রই একটি ছবি পরিচালনা করবেন, যার প্রযোজিকা ও নায়িকা হবেন শ্রীমতী সুপ্রিয়া। সম্প্রতি বিষয়টি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। টলস্টয়ের বিখ্যাত 'রেসারেকসান' অবলম্বনে চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ। ডিস্ট্রিবিউটারও প্রায় ঠিকঠাক। শীঘ্রই শুটিং শুরু হতে পারে। এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে উত্তমকুমারের 'ডেট' নিয়ে। পরিচালক নিজেই তাঁর নিজের ছবির 'ডেট' দিতে পারছেন না। ফলে প্রযোজিকা সুপ্রিয়া দেবী বেশ সমস্যায় পড়েছেন।

—বিচক্ষ

হীরের প্রজাপতি

ছোটদের জন্য ছবি বড় একটা হয় না। দেশ জোড়া এত বড় সিনেমাযজ্ঞের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কি শিশুরা পেতে পারে না? শিশুচিত্রের অভাব পূর্ণ করার জনাই চলচ্চিত্রকার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী "হীরের প্রজাপতি" (মূল কাহিনী : লীলা মজুমদার) তৈরি করেছেন। হীরের প্রজাপতিও কি উড়ে বেড়ায়? গল্পটা সে রকমেরই। বুড়ো পিসিমার সেই হীরের প্রজাপতি ফুলের টবের ভেতর থেকে বেরিয়ে যে কত জায়গায় উড়ে বেড়াল তা নিয়েই মজার গল্প। হীরের প্রজাপতি খুঁজে বের করার জনা আবার ডিটেকটিভ রবি ঘোষ উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এদিকে অনুপকুমারের নেতৃত্বে ছেলেদের আর সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে মেয়েদের নানা অ্যাডভেঞ্চার। গান-বাজনা-নাচ তো আছেই। সব মিলিয়ে অনেক শিল্পী নিয়ে বেশ মজার ছবি "হীরের প্রজাপতি"। ছোটদের ভাল লাগবে এই ছবি, ভাল লাগবে পিসিমাবেশিনী রাজলক্ষ্মী দেবীকে এবং সবাইকে। গানের সুর দিয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী।

গত ৪ আগস্ট রক্সি মিনিয়েচারে এক বিশেষ প্রদর্শনীতে "হীরের প্রজাপতি" এবং

"হীরের প্রজাপতি" ছবিতে অনুপ কুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও ...

আরও দুটি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র "অজন্তার শিল্পী" (শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী কৃত) এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত "এনকোয়ারি" সাংবাদিকদের দেখানো হয়। "অজন্তার শিল্পী" নামে কয়েকটি চিত্রের একটি সিরিজ তৈরির ইচ্ছা চিত্রনির্মাতার। প্রথম ছবিটি অংকনশিল্পী পরিতোষ সেনের শিল্পকর্ম ও তাঁর শিল্পচিন্তার ক্রমবিবর্তনের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বহু প্রশংসিত "এনকোয়ারি"-তে পাথরের মূর্তির উপর সংগীত ও রেখার (অ্যানি-মেশন-এ) প্রলেপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

কিন্নরদলের "মেঘের পরে মেঘ"

গত ১০ আগস্ট সকালে রঙমহল রঙ্গ-মঞ্চে কিন্নরদলের প্রযোজনায় "মেঘের পরে মেঘ" নৃত্যগীতিবিচিত্রা পরিবেশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডঃ সুদীপ্ত সেন। গান এবং নাচ উভয় ক্ষেত্রেই ওই অনুষ্ঠানটি ছিল উপভোগ্য। গানগুলি গেয়েছেন মিতা চ্যাটার্জী, বন্দনা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাণী সরকার, নিবেদিতা দাশগুপ্তা, অঞ্জলি ভার্মা, তপন সিংহ, তপন ভট্টাচার্য, পার্থ তরফদার এবং সুদীপ্ত সেন। নৃত্যাংশে ছিলেন রবি সিংহ, উৎস ভার্মা, কুংকুম গুহ, মায়া চ্যাটার্জী, মীনাক্ষী সিংহ ও দীপিকা দেব।

বেহালা হাসপাতালের সাহায্যার্থে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগামী ৩১ আগস্ট রবীন্দ্র সদনে বেহালা হাসপাতালের গৃহনির্মাণে সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এন বি এন্টারপ্রাইজের "অজাতক" নাটকটি অভি-নীত হবে। সঙ্গে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ রচিত "অজাতক" নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : মনোজ চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র ও নিমু ভৌমিক। বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেবেন : সুচিত্রা মিত্র, চিত্তপ্রিয় মুখো-পাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

শীশমহলে "বিরাজ বৌ"

হাওড়ার শীশমহল রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বউ" নাটকটি নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা বিমান ভট্টাচার্যের। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন তৃপ্তি মিত্র এবং নীলাম্বরের ভূমিকায় তরুণকুমার। তরুণকুমার এ নাটকে গান গেয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : ... ভট্টাচার্য, কালিদাস গাঙ্গুলী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, রঞ্জু সরকার, প্রহ্লাদ গাঙ্গুলী, দেবী মুখার্জী, ... চ্যাটার্জী, সেবা দাস, রত্না দত্ত এবং আরো অনেকে।

"ত্রিনয়ণী মা"

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে রূপঋষি চিত্রের প্রথম ছবি "ত্রিনয়ণী মা"-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে সম্প্রতি ... স্টুডিওতে। পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী এর পরিচালক। প্রথম দিনের শিল্পী ... আনন্দ মুখার্জী ও সীমা ...।

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বের ফিল্ম-জগতে দু'জন ইউসুফ ভাই আছেন। দুজনেই নিজের নিজের জায়গায় এখনো অপরিহার্যরূপে বিরাজমান। একজন ইউসুফ ভাইকে আপনারা সবাই চেনেন, আপনাদের কাছে তিনি দিলীপকুমার নামে পরিচিত। আরেকজন ইউসুফ ভাইকে বম্বেতে যাঁরা ছবি তৈরি করেন তাঁরা সবাই চেনেন। এই দ্বিতীয় ইউসুফ ভাইয়ের আর অন্য কোন নাম নেই। কারণ, ইনি যে কাজ করেন সেখানে নামের চেয়ে কাজের বেশী দাম। তাই এই ইউসুফ ভাইকে পরিবেশের চাপে নাম পাল্টাতে হয়নি। ইউসুফ ভাইয়ের সঠিক বয়স বলা শক্ত। পরিশ্রমের পরিচর্যায় শক্ত শরীর। কাজের সময় ছাড়া ইউসুফ ভাইকে কখনো দেখিনি; সুতরাং গায়ের রঙটা ঠিক কিরকম সেটাও বলা শক্ত। চুল সাদা, না কাঁচা, বা সাদাকালোয় মেশানো কিনা সেটাও বলা কঠিন। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইউসুফ ভাই, আপনার বয়েস কত? খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলেন, 'ঠিক বলতে পারব না!' আজ থেকে কত দিন আগে, মানে কোন সালে, কত তারিখে, বা কি করে তাঁর জন্ম সেটাও ঠিক খেয়াল নেই। ইউসুফ ভাইয়ের হাতে সর্বদাই সময় এত কম যে, বয়ে যেতে যেতেও বয়ে যায় না। তাই ইউসুফ ভাই রয়ে গেছেন। প্রায় তেমনটিই রয়ে গেছেন। আমিই তো আজ প্রায় তের বছর দেখছি ইউসুফ ভাইকে। সেই একই রকম সব কিছু। এতক্ষণে আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে যে, যে ইউসুফ ভাইকে নিয়ে এত ধানাইপানাই সে ব্যক্তিটি আসলে কে, কি, কেন, কবে, কোথায়? চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের ভাষায় ইউসুফ ভাই একজন ব্যাক গ্রাউণ্ড পেণ্টার, যাঁর নাম চলচ্চিত্রের লক্ষ লক্ষ দর্শকরা কোনদিন দেখেন না রূপালী পর্দায়, যদিও বা দেখেন তা হলে তা মনে রাখবার প্রয়োজন হয় না—এমন একটা নগণ্য নাম ঐ ব্যাক গ্রাউণ্ড পেণ্টারের। কিন্তু অনেক বাঘা বাঘা শিল্প-নির্দেশককে পাগলের মত খুঁজতে দেখি ঐ ইউসুফ ভাইকে। সবই হয়ে গেছে। সেট রেডি। কাল সকালে সুটিং। রাত আটটা বাজে অথচ সেই ব্যাক গ্রাউণ্ড পেণ্টার ইউসুফ ভাইয়ের এখনো দেখা নেই। প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। স্টুডিও ফ্লোর

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত আর ডি বনসালের "চৈতালি" ছবিতে বসন্ত চৌধুরী ও তনুজা। —ফটো: দেশ

এক শো কুড়ি ফুট বাই এক শো আশি ফুট, তাতে আদিগন্ত সাহারা মরুভূমির সেট লাগিয়েছেন শিল্পনির্দেশক। এক শো দশ লরি বালি এসেছে। প্ল্যাটফরম হয়েছে বাইশ শো তক্তা এঁটে, কিন্তু এত সব সত্ত্বেও স্টুডিওর সাহারা ছেলেখেলা বলে মনে হচ্ছে।

বাঘা শিল্পনির্দেশকের উপযুক্ত সহকারী বহু দূরের কোন এক স্টুডিওর কোন এক অন্ধকার কোণ থেকে ঘুমন্ত

"সতী সাবিত্রী-সত্যবান" (গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে) ছবিতে জয়শ্রী

ইউসুফ ভাইকে ধরে নিয়ে এলো। আজ থেকে দিন ছয়েক আগে ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম ইউসুফ ভাইকে তখনো ঠিক সেইরকমই দেখলাম। শুধু চেহারা নয়, এমন কি পোশাক পরিচ্ছদও। এখানে নেপথ্যে বলে রাখি, ইউসুফ ভাই মাসে এক দিন স্নান করার সময় পান, কখনো কখনো সেটাও হয় না। যেদিন স্নান করেন সেই দিনই জামাকাপড় চেঞ্জ করেন ইউসুফ ভাই। আর চেঞ্জ করা মানে একেবারে ত্যাগ করা। ইউসুফ ভাই জামাকাপড় কাচান না। নতুন কেনেন। এবং একবার ত্যাগ করলে আর শরীরে ওঠান না। যাই হোক, ইউসুফ ভাই আসতেই বাঘা শিল্পনির্দেশকে সযত্নে ইউসুফ ভাইকে বোঝালেন ব্যাক গ্রাউণ্ড তাঁর কিরকম চাই। কালার স্কীম। পারসপেকটিভ। ডাইমেনসন। হাঁ করলেই হাওয়া বোঝেন ইউসুফ ভাই, সুতরাং বাঘা শিল্পনির্দেশকের ভাষাও টেলিগ্রাফিক।

ইউসুফ ভাই অনেক টাকা রোজগার করেন দিনে। কিন্তু তাঁর গাড়ি নেই নিজের বাড়ি নেই। কিছু দিন হল দুটি ট্যাক্সি কিনেছেন। ইউসুফ ভাইয়ের দুই বউ। ন'টি বাচ্চা। বাচ্চারা ওঁকে চেনে কিনা উনি জানেন না। তবে জনা তিনেক ছাড়া বাকি সব বাচ্চাকে উনি দেখলেই চিনবেন এমন কথা বুক ঠুকে বলতে পারেন না ইউসুফ ভাই। ইউসুফ ভাইয়ের একপাল তাসুড়ে বন্ধু আছে; তারা ইউসুফ ভাইয়ের খোঁজে পকেটে তাস নিয়ে স্টুডিওয় স্টুডিওয় ঘুরে বেড়ায়। চান্স পেলেই মাদুর বিছিয়ে বসে পড়ে। তাস, দিশীমদ এবং সংসার। ইউসুফ ভাই ফতুর। ইউসুফ ভাইয়ের আজকাল

কোন সহকারী নেই। উনি বলেন, সহকারী মানেই নিমকহারাম। 'কোন শালা ভাল করে কাজ শেখে না, অথচ—যেতে দিন ওসব কথা, কাজ জানে না অথচ শালাদের কাটের ঠেলায় অন্ধকার—ওসব আপনারা শিক্ষিত লোক, আপনারা সহ্য করতে পারেন, আমরা পারি না।"

কথা বলতেও ইউসুফ ভাই'য়ের ভীষণ আপত্তি। "কথা বলা মানেই সময় নষ্ট।" কথা শুনতে আপত্তি নেই। "কারণ, কথা শোনা মানেই শিক্ষা।" "আপনার কিছু বলার থাকে বলুন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, আমার কিছু বলার নেই।" "কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই—সুতরাং আপনাকেই তো বলতে হবে নিজের কথা।" "আপনি দেখছি নেহাত-ই বাজে লোক, আপনার নিশ্চয়ই কোন কাজ নেই।" বললাম, "হ্যাঁ, তা সত্যি। আমরা সত্যিই বাজে লোক, কিন্তু আপনাদের মত লোকের কথা লোককে জানাতে চাই—তাই—" "আমাদের মত লোকের কথা জেনে লোকের কি হবে?' "এক কথায় জবাবটা দেওয়া শক্ত।" "এক কথায় যে কথা বোঝানো যায় না সে কথা বাজে কথা, হাজাররকমভাবে বলেও সে কথা বোঝানো যাবে না। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে, আমার জীবন যদি অন্য কারোর উপকারে আসার মত জীবন হয়, তা হলে সে সম্বন্ধে আমাকে নিজেকে কোন দিনই বক্তৃতা দিতে হবে না। ঐ তো প্রডিউসার, ডিরেক্টর, হিরো সব আছে, ওদের কাছে যান না, লম্বা লম্বা জীবনী পাবেন লেখবার মত। ফুল ফুটলেই তার সুগন্ধ বেরোয়। ফুলকে ঢাক পেটাতে হয় না।" এই দু' নম্বর ইউসুফ ভাই। বম্বের এক নম্বর ব্যাক গ্রাউন্ড পেন্টার।

সরল শর্মা

গান্ধর্বীর সমাবর্তন উৎসব

গত ৩ আগস্ট গান্ধর্বীর সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসব ও সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসরোবর প্রেক্ষাগৃহে। পৌরোহিত্য করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। স্নাতকদের গন্ধর্ব উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের বর্ষীয়সী শিল্পী শ্রীমতী কনক বিশ্বাসকে গান্ধর্বীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে এক পরিচ্ছন্ন সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন গান্ধর্বীর শতাধিক শিল্পী। এদিনকার সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীত অবলম্বনে নৃত্যানুষ্ঠান "কৃষ্ণকলি"।

গান্ধর্বীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কনক বিশ্বাস সংবর্ধিত

রকর্ড সমালোচনা

শিশুদের জন্য

এইচ-এম-ভি রেকর্ডে সম্প্রতি শিশুদের
ন্য ছড়ার গান পরিবেশন করা হয়েছে।
রিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে সাধুবাদের
গ্য। এই সিরিজে গান যেমন আছে,
মনি বন্দসংগীতও—হিমাংশু বিশ্বাসের
ুরের ঝর্না"। "সুরের ঝর্না" কি কবি-
ুর "বীর পুরুষ" কবিতার সাংগীতিক
প? কিছুকাল আগে শ্রীবিশ্বাস ও
র সহশিল্পীরা "বীরপুরুষ"-এর সংগীত-
প উপস্থিত করে রসিকজনের অকুণ্ঠ
শংসা অর্জন করেছিলেন। আলোচ্য
কর্ড "বীরপুরুষ" কবিতার উল্লেখ
ই, রেকর্ডের কভারের ছবি অবশ্য ওই
হিনীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। সে যাই
ক, এই অর্কেস্ট্রা শুধু শিশুদের
ল্পনাকেই রাঙিয়ে তুলবে তা নয়, বড়দেরও
নন্দ দেবে। মুখ্যত বাঁশি সহযোগে যে
সংগীত পরিবেশিত তার অনুসরণে
টি অখ্যানের স্বাদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ
বিশ্বাস রীতিমত একটি গল্প বলেছেন—
তে নাটকীয় চমক ও রোমাঞ্চ রয়েছে।
ন্ট বোঝা যায়, পাল্কি চলছে, গ্রাম ছাড়িয়ে
চ্ছ ("গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ"—
নের সুর), কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল,
ভর খুরের শব্দ ইত্যাদি। শ্রীবিশ্বাসের
শব সুরও রাগাশ্রয়ী। এক কথায়,
টি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা "সুরের
"।

সিরিজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড
হজ গানের পাঠ" (পরিচালনা : শৈলেন
খাপাধ্যায়)। শিশুরা এই রেকর্ড শুনে
শোনার আনন্দ তো পাবেই; তার
ও বড় কথা, তারা গান শিখতেও পারবে।
গীতের পাঠ চিত্তাকর্ষক করে তোলা
ছে রেকর্ডটিতে—স্কুল ছুটির পর
দের গান শেখায় পালার মধ্য দিয়ে
দর গানের আনন্দ দেওয়া এবং গানের
দের ভিতর দিয়ে তাদের কিছু
নো। চমৎকার আইডিয়া—যদিও
উন্ড অব মিউজিক" প্রভাবিত তবু এর
রিতা অস্বীকার করবার নয়। সংগীত
চালনা খুবই প্রশংসনীয়। শৈলেন
খাপাধ্যায় জানেন, কী করে শিশুদের মন
করতে হয়। গানও সুন্দর গেয়েছেন
ীরা মুখোপাধ্যায়, অতসী ঘোষাল,
ণী সেন প্রমুখ শিল্পীরা।

একক গান পরিবেশন করেছেন পূরবী
াপাধ্যায় ও মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। পূরবী
াপাধ্যায়ের গান—একটি হল "ফড়িংবাবুর
র" (যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনা)—
বই আদরণীয় হবে ছোটদের কাছে।
ল্পীর গলায় দরদ, মেজাজ ও সুর
সবই আছে। গানের সুরও সুন্দর দিয়েছেন
সুধীন দাশগুপ্ত। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের
সুর দেওয়া মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া
মন আকর্ষণ করে। মঞ্জু বন্দ্যো-
পাধ্যায় কণ্ঠশিল্পী হিসাবে অনেক উন্নতি
করবেন তাঁর এই দুটি গানই সে প্রমাণ।
তাঁর গাওয়া "শুভ জন্মদিন" শিশুদের
খুবই ভাল লাগবে।

অন্য একটি রেকর্ড "চলন্ত পথে"
(রচনা : সমর চট্টোপাধ্যায়) শিশুদের কাছে
খুবই উপভোগ্য মনে হবে। গানের ভিতর
দিয়ে তাদের চোখের সামনে অনেক চরিত্র
এসে দাঁড়াবে, তাদের কৌতূহলও উঠবে
চরমে। সব মিলিয়ে পথ চলার আনন্দ বা
একটি অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবে ওরা।
এই আখ্যানের রূপ দিয়েছেন শিশু
রংমহলের শিল্পীরা—চন্দ্রকান্ত শীল,
অতসী ঘোষাল, সুপ্রিয়া সেন প্রমুখ।
গাওয়ার গুণে রেকর্ডটি বেশী মনোগ্রাহী।

চিত্রতারকা বিশ্বজিৎ গত ১৫ আগস্ট দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ১০,০০১ টাকার একটি চেক রাজ্যপাল শ্রীদীপনারায়ণ সিংহের হাতে অর্পণ করেন; রাজ্যপাল সম্প্রতি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য এ কটি তহবিল খুলেছেন

হেমন্তকুমারের সুরে তাঁর কন্যা রানু মুখোপাধ্যায় এবার পূজায় এইচ-এম-ভি রেকর্ডে 'পপ মড' জাতীয় বাংলা গান গেয়েছেন

রবীন্দ্রসংগীত

বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে গ্রামোফোন
কোম্পানি রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি রেকর্ড
বের করেছেন। দুটি রেকর্ড আমাদের
হস্তগত। একটিতে গেয়েছেন চিত্তপ্রিয়
মুখোপাধ্যায়, অপরটিতে রয়েছে বীথীন
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী
হিসাবে চিত্তপ্রিয় সুপরিচিত। তিনি এবার
গেয়েছেন "মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে
বাজি" এবং "বাদল ধারা হল সারা"। দুটি
গানেই পাই প্রাণের স্পর্শ, দরদও আছে।
"মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি" গাইতে
হলে যে বিশেষ সপ্রাণ ভঙ্গির দরকার, তা
শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গানে রয়েছে। গান দুটি
জনপ্রিয় হবে নিঃসন্দেহে।

বীথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড এই
প্রথম। কিন্তু তাঁর নিখুঁত ঢঙের গান শুনে
মনে হয় না তিনি নবাগত। দুটি গানই
তিনি চমৎকার গেয়েছেন। শিল্পী হিসাবে যে
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অচিরেই জনপ্রিয় হবেন তাতে
সন্দেহ নেই। তাঁর গলায় মাধুর্যও যথেষ্ট।

নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে তাসের দেশ

পাশ্চাত্ত্য সংগীতে হেড্ন, মোৎসার্ট,
বিথোভেন প্রমুখ দিক্‌পাল সুরকারদের
রচিত সংগীত দ্বিশতাধিক বর্ষব্যাপী অজস্র-
বার ধ্বনিত হয়ে আজও এক-একজন
কনডাক্টরের নিপুণ নির্দেশনায় কত যে
নব নব রূপে অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে, তার

ইত্যাদি নেই। রবীন্দ্রনাথের গানের, তাঁর নৃত্যনাট্যের বৈচিত্র্যহীন অসংখ্য প্রযোজনা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠিক অনুরূপভাবে তাঁর রচনাগুলিকেও সজীব এবং সুন্দর করে উপস্থাপনা করবার মতন ক্ষমতা কি এরই মধ্যে নিঃশেষিত হল? এই জিজ্ঞাসার আশাব্যঞ্জক উত্তর মেলে যে কয়েকটি অনুষ্ঠানে, সাম্প্রতিক কালে দেখাগুলির মধ্যে 'রবিতীর্থ'র 'তাসের দেশ' তার মধ্যে একটি।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনার আগে অবশ্য একটা কথা বলে নেবার আছে যে, রবীন্দ্র-রচিত 'তাসের দেশ'-এর অবিকল উপস্থাপনা এটি নয়। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে' সংলাপ এবং সংগীতের সমান ভূমিকা। আলোচ্য প্রযোজনায় সংলাপ সামান্য, প্রধান আশ্রয় সংগীত। সংগীত বলতে শুধু গান নয়। তার সংগে আছে সুপরিকল্পিত নৃত্য এবং আবহসংগীতের ব্যঞ্জনাময় ভূমিকা। 'তাসের দেশ'-এর সূক্ষ্ম ব্যঙ্গপ্রবণ বিদ্রূপ-রসাত্মক সংলাপসমূহ বর্জন করেও তার বিশেষ তত্ত্বটিকে মর্মগোচর করানোর প্রয়াস এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই। এবং এই দুরূহ কাজে রবিতীর্থ সফল।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও গতিবেগসম্পন্ন এই প্রযোজনায় কয়েকটি মুহূর্ত অবিস্মরণীয়। সুগভীর ব্যঞ্জনাবহ শিল্পশোভন মঞ্চে যেন চিত্রার্পিত নিশ্চল কয়েকটি মূর্তি—এইভাবে তাসদ্বীপের প্রথম অবতারণা, কিংবা 'ওগো শান্ত পাষাণ মুরতি'—গানের পর তাসদ্বীপবাসীদের অন্তরের নবঅঙ্কুরিত চাঞ্চল্য—এই সব কিছু মিলিয়ে 'তাসের দেশ'-এর নিগূঢ় তত্ত্ব এক রূপময়তার রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই পরিকল্পনাটি যে-সব শিল্পীর সহযোগিতায় সার্থক হয়ে উঠেছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে আবহ-সংগীত রচয়িতা দীনেশ চন্দের নাম। প্রতিটি মুহূর্তকে এমন কি মনের ভিতরের ফাঁক-ফাঁকিকেও সুর ও ছন্দে এমন সুন্দরভাবে জাগিয়ে করে দেবার দৃষ্টান্ত এর আগে আর কোনো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ কোথাও মাত্রাবোধের অভাব নেই। একটুকু অতিশয্য নেই। আর এই সংগীতের সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ আর অঙ্গভঙ্গিমায় সমতারক্ষায় নৃত্যশিল্পীদের কৃতিত্বই কি কিছু কম! রাজপুত্রের ভূমিকায় শিবশঙ্করন, শান্তা বসু রায়ের পত্রলেখা এবং জয়শ্রী কাঁইহড়ীর হরতনী তো নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এঁদের পাশে প্রতিটি ভূমিকাই যে সুনিপুণভাবে অভিনীত, 'তাসের দেশ'-এর সামগ্রিক সাফল্যই তার প্রমাণ। একান্ত বলা যেতে পারে, এই উচ্চ মানের প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে বাদ্যের দিকটিকে আর একটু বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে। মাইক্রোফোনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারও অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

পরিশেষে, 'তাসের দেশ' নাটকে নৃত্য-নাট্যের আঙ্গিক প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এর অন্তর্নিহিত নৃত্যনাট্যের বিপুল সম্ভাবনাই বাস্তবে রূপায়িত। ঠিক যেমনভাবে 'একটি আষাঢ়ে গল্প'র নাট্যসম্ভাবনা রূপায়িত হয়েছিল 'তাসের দেশ'-এ, স্বয়ং স্রষ্টার হাতেই এই নৃত্যনাট্যে মূল নাটকের অনেক কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জন ঘটেছে, এমন কি দু' একটি নতুন গানও সংযোজিত হয়েছে, অথচ সেই বস্তুটি, যাকে হয়ত বলতে পারি রবীন্দ্ররস, তার বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই সমগ্র প্রযোজনায়।

আনন্দ বর্ধন

অরণ্যদেব লী ফক

ডুবোজাহাজটা হঠাৎ জলের উপর ভেসে উঠল যেন!
কিন্তু-একটা অঘটন নিশ্চয়ই ঘটেছে।

বলছি---ডুবো-
সাহায্য
পাঠাও!

সাহায্য চটপট এল। প্রথমে প্লেন---পরে একটা জাহাজ -----
ডুবোজাহাজে জলদস্যু-সাহায্য পাঠাও-
তোমার খেল এখনও মরেনি দেখছি!
ডায়ানা, তুমি ওদিকটা দ্যাখো, আমি এদিকে সামলাচ্ছি!
এর ফল তোমাকে পেতে হবে!

পড়ল।

নারীর হাতে দস্যুদল শায়েস্তা!
অলিম্পিকের মেয়ে-সাঁতারু ডায়ানা পামার এই দস্যুদলকে গ্রেফতার করেছেন-
'তেল-লুটেরার' দল গ্রেফতার!
মাঝ-দরিয়ায় নাটকীয় ঘটনা!
টিভির খবর

আদালতে এই ছবিগুলি প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে!
এবারে সবাই তা জানবে!

তুমিও কিছু কম সাহস দেখাওনি। ধন্যবাদ তোমারও।
ধরেছ।

বন্দরে-বন্দরে-জাহাজে-জাহাজে কানাকানি-----
এ নিশ্চয়ই অরণ্যদেবের কাজ।
কিন্তু অরণ্যদেব ততক্ষণে আবার গভীর অরণ্যে ফিরে গিয়েছেন!
আগামী সপ্তাহে নতুন কাহিনী।
১০

আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্বিধা-বিভক্ত কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড ও তাঁদের পরস্পরের ভূমিকা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেডাড ও নির্দল-প্রার্থী শ্রী ভি ভি গিরির মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতি, কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরেডাডর অনুকূলে ভোট দেওয়ার জন্য এম পি ও এম এল এ-দের প্রতি হুইপ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিবেকের নির্দেশমত স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং হুইপ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে কংগ্রেস শিবির দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং শ্রীমতী গান্ধীকে অপসারণের জন্য বিরোধী শিবির কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির কাছে দাবি জানায়। এই সংকট এড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন : কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের কোনরকম চেষ্টা চালানো হবে না এবং একদিকে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ এবং অন্য দিকে কমিউনিসটদের সঙ্গে কংগ্রেস কখনো কোয়ালিশন করবেন না—তা হলে এই সংকটের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। অবশ্য এ ব্যাপারের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায়ও কোন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৬ আগসট যথেষ্ট উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়। ২০ আগসট ভোট গণনা হবে।

দেশী সংবাদ

১১ আগসট—প্রেসিডেনট নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে শ্রীসঞ্জীব রেডাডকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য কংগ্রেস পারলামেনটারি পার্টির ভিতরে বিরোধিতা চলছে। মনে হচ্ছে এখন তা প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। বিরোধিতা থেকে বিদ্রোহ—এই রূপান্তর আগামী দু'দিনের মধ্যে ঘটতে পারে।

টালিগঞ্জ পাইলট স্কিম অফিসের গাফিলতিতে ওই অঞ্চলে অনায়াসে আদায়-যোগ্য প্রায় দেড় কোটি টাকার পৌর কর দীর্ঘকাল ধরে নাকি অনাদায়ী আছে। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পাইলট স্কীমের ভারপ্রাপ্ত সাব এসেসরকে বদলি করার কথা বলেছেন কমিশনারকে।

১২ আগসট—সমগ্র ভারতে পাঁচ লক্ষ বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকার আয়কর বাকি রয়েছে এমন আয়কর দাতার সংখ্যা ১১০০-রের বেশী। ওঁদের কাছে মোট পাওনা ১৬৭ কোটি টাকা। ওঁদের ছাড়া ১ কোটি টাকার বেশী আয়কর পাওনা আছে, এমন আয়কর দাতার সংখ্যা সতের।

১৩ আগসট—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতির পর পর দু'খানি চিঠির জবাবে আজ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরেড্ডির অনুকূলে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি কংগ্রেস এম পি এবং এম এল এ-দের প্রতি হুইপ দিতে রাজি হতে পারছেন না। ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসের নীতির পুরোপুরি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি হাত মেলাচ্ছেন।

১৭ আগসট—পশ্চিমবঙ্গ পুলিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডি-এস পি শ্রীসুবোধ দত্তকে বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রকাশ, ৩১ জুলাই বিধানসভায় একদল পুলিসের তাণ্ডব সম্পর্কেই এই বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে এই প্রথম ডি-এস-পি [illegible] একজন পুলিস অফিসারকে সাজা হল। ওই ঘটনা সম্পর্কে ১৮ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এদের পাঁচজনকে।

রেডাড না অবাধ ভোট—পশ্চিমবঙ্গের

কংগ্রেস পরিষদ দল আজ এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তিনঘণ্টা উত্তপ্ত আলোচনার পর যখন কংগ্রেসী এম এল এ-দের ভোটাভুটি হতে যাচ্ছে ঠিক তখন 'কংগ্রেস সংগ্রাম পরিষদের' জ্ঞানাপণ্ডাশুক [illegible] রেডাডকেই ভোট দিতে হবে—কমিউনিসট দালাল সিদ্ধার্থ রায়ের চালাকি চলবে না বলে চিৎকার করতে করতে দরজা ঠেলে সভাকক্ষে ঢুকে পড়েন। বৈঠক সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়।

১৫ আগসট—গান্ধীঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবেদীমূলে প্রার্থনা সভা ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশাত্মবোধক সংগীতের আসর এবং উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসভার মাধ্যমে আজ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

১৬ আগসট—শ্রীরেডাড বা শ্রীগিরি যিনিই জিতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস দল যে ধাক্কা খেয়েছে তা সামলে ওঠা কঠিন। উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনের শেষে দলের নির্দেশ অমান্য করে যেসব প্রবীণ নেতা গিরির জয়ে প্রচার চালিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

প্রায় ৩০ জন সংসদ সদস্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের নির্দেশ অমান্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করার আগে শ্রী এস কে পাতিলের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হয়। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাও টেলিফোনে শ্রীমোরারজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

১৭ আগসট—আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের তিন শ চা-বাগিচায় প্রায় দু' লক্ষ শ্রমিকের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হচ্ছে। ইতিপূর্বে বিরোধ মীমাংসার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হয়। চা-শ্রমিকদের প্রধান দা[illegible] জমি ও শ্রমিকদের বর্তমান আনুপাতিক [illegible] কমানো চলবে না—অর্থাৎ যত সংখ্যক শ্র[illegible] বছরে অবসর নেবেন, তত সংখ্যক শ্রমি[illegible] কাজে নিয়োগ করতে হবে।

কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজের প্র[illegible] অডিট রিপোরটে ওই সংস্থার নানাপ্রকার [illegible] বিচ্যুতি এবং গুরুতর আর্থিক গলদ [illegible] পড়েছে। এ ছাড়া নানা প্রশাসনিক অব্যবস্থা[illegible] কথাও রিপোরটে উল্লেখ করা হয়েছে। উ[illegible] থাকে যে ১৯৬৭ সালের ৭ জুন ওই হা[illegible] পাতালটির পরিচালনভার রাজ্য সরকার গ্র[illegible] করেছেন।

বিদেশী সংবাদ

১১ আগসট—কোয়ারেনটাইনের [illegible] থেকে মুক্ত হয়ে আমেরিকার তিন চন্দ্র[illegible] আজ নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। একুশ [illegible] আগে তাঁদের কোয়ারেনটাইন শুরু হয়। চাঁ[illegible] অজানা পরিবেশ থেকে কোন জীবাণু বহন ক[illegible] আনেন নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জ[illegible] তাঁদের সম্পর্কে এই সতর্কতা অবলম্বন ক[illegible] হয়েছিল।

১২ আগসট—কাঠমান্ডুর উত্তর [illegible] থেকে ভারতীয়দের এবং এখানকার ভার[illegible] সামরিক যোগাযোগকারী গোষ্ঠীকে স[illegible] নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের স[illegible] আলোচনার জন্য নেপাল থেকে একটি উ[illegible] পর্যায়ের প্রতিনিধি দল শীঘ্রই নয়াদি[illegible] আসছেন।

১৩ আগসট—আজ সিংকিয়াং সীমা[illegible] রুশ ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে জোর লড়াই [illegible] গিয়েছে। আর এই ব্যাপারে দু'পক্ষ দো[illegible] করেছে পরস্পরকে। চীনের অভিযোগ : দু[illegible] হেলিকপটারের ছত্রছায়ায় ট্যাংক ও সাঁজো[illegible] গাড়ি নিয়ে শত শত রুশ-সৈন্য অভিয়া[illegible] চালায়। ফলে বহু চীনা [illegible] রাশিয়ার নালিশ : কয়েক দল সশস্ত্র [illegible] সিংকিয়াং থেকে কাশিয়ার পার্ক [illegible] ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুশ সৈন্যরা তাদের [illegible] দেয়। সংঘর্ষে কয়েকজন হতাহত হয়।

১৪ আগসট—চেক ও সোভিয়েট সৈন্[illegible] সংঘর্ষে একজন চেক অফিসার ও পাঁচজন [illegible] নিহত হয়েছেন। খবরটি প্রচার করেছেন [illegible] চায়না এজেন্সি। খবরে আরও বলা হয়েছে [illegible] দখলকার রুশ সৈন্যরাই প্রথম গুলি [illegible] চেকদের হতাহত করে। বন-এর এক খ[illegible] প্রকাশ : চেকোস্লোভাকিয়ায় ও তার [illegible] বিপুল সংখ্যক সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েন ক[illegible] হয়েছে। এ কাজ শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে।

১৬ আগসট—নয়াদিল্লিতে পাওয়া এ[illegible] সংবাদে জানা যায়—তিব্বতী বৌদ্ধদের নে[illegible] পানচেন লামা চীন থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। তিন সপ্তাহ আগে পাওয়া ওই খবরের স[illegible] পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছে ব[illegible] প্রকাশ।

১৭ আগসট—তানজানিয়া থেকে [illegible] ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাড়ে সাতের লক্ষ ব[illegible] আগেকার এক মানুষের মাথার খুলি উত্ত[illegible] তানজানিয়ার আলডুভাই গিরি সংকটে [illegible] পাওয়া গিয়েছে। মানুষের হাতে এখন এ[illegible] প্রাচীনতম মানব কঙ্কাল। বিশ লক্ষ বছর আ[illegible] এরা পূর্ব আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াত বলে ধ[illegible] নেওয়া যেতে পারে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ৪২৯
ব্যঙ্গচিত্র— ৪৩০
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য— ৪৩১
বৈদেশিকী—দেবরাজ ৪৩২
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত ৪৩৩
সুনন্দর জার্নাল— ৪৩৫
ভ্রান্তিবিলাস (কবিতা)—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ... ৪৩৭
না আমি তোমাকে (কবিতা)—শ্রীহেনা হালদার ... ৪৩৭
ঘণ্টা ধ্বনি থেমে গেলে (কবিতা)—শ্রীপলাশ মিত্র ... ৪৩৭
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ৪৩৮
অলকাপুরী—শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য ৪৩৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অপু ও বিভূতিভূষণ—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৪৪৫
বন্ধু হুমায়ুন কবির—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত ৪৪৯
অদূরের দিল্লি—দরবেশ ৪৫১
জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৫৩
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর ৪৫৭
মস্কোর চিঠি—শ্রীননী ভৌমিক ৪৬১
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৬৫
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন ৪৬৯
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী ৪৭৩
বাংলার চালচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার ৪৭৫
ভিডিচিত্রে নব অধ্যায়—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ... ৪৭৯
শান্তিনিকেতনে কবি অমিয় চক্রবর্তীর সংগে কিছুক্ষণ
—শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৮৩
রবীন্দ্রসংগীত প্রসংগে—শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ ... ৪৮৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আর্থিক ভারত—শ্রীসুরেশ গুপ্ত	... ...	৪৯২
চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	... ...	৪৯৩
আলোচনা—	... ...	৪৯৪
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	... ...	৪৯৯
পুস্তক-পরিচয়—	... ...	৫০১
খেলার মাঠে—একলব্য	... ...	৫০৪
ব্যাডমিন্টনের আইনকানুন—মুকুল	... ...	৫০৮
রঙ্গজগৎ—	... ...	৫০৯
অরণ্যদেব—	... ...	৫১৯
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	৫২০

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল দীপ্তির তরল মেক আপ। এনে দেবে চন্দ্রালোকের মধুর আভা।

আপনার মুখখানি সাটিন গ্লোতে কেমন সজীব মাধুর্যে ভ'রে ওঠে দেখুন। স্বচ্ছ মধুর হাল্কা এই ফাউণ্ডেশনে আপনার ত্বক সদ্য ফোটা ফুলের মত কমনীয় লাবণ্যে ভ'রে উঠবে। রেশমী-পেলব এই প্রসাধনীর মায়াবী পরশে সব খুঁত ঢাকা পড়বে নিমেষে।

সাটিন গ্লোর ৭টি উজ্জ্বল শেডে আপনার রূপশ্রী আরও অপরূপ হ'য়ে উঠবে। চন্দ্র কিরণের শেডে স্বচ্ছ মধুর মুক্তো-আভা। সূর্য-চুম্বিত রঙের বাহার এনে দেবে পিঙ্গল দীপ্তি।

স্নিগ্ধ মধুর আভায় মুখশ্রীকে অপরূপ ক'রে তুলতে সর্বদা ব্যবহার করুন ল্যাকমে সাটিন গ্লো।

ল্যাকমে সাটিন গ্লো
তরল ফাউণ্ডেশন

Lakmé
SATIN GLOW
LIQUID
FOUNDATION

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৪
শনিবার ১৩ ভাদ্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৪১৭১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক „	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 30 Aug., 1969

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি

নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরিকে আমরা স্বাগত জানাই। ভারত রাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, ডঃ জাকির হোসেন যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন শ্রী গিরি সেই ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হলেন। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, ভারতের যে রাজনৈতিক অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিরা তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করে গেছেন সেই রাজনৈতিক অবস্থা আর নেই। বলা বাহুল্য, নেহরুজীর আমলে তিনি একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। একদিকে তাঁর সমর্থনে ছিল শক্তিশালী কংগ্রেস দল, আর অন্যদিকে তাঁরই সহ-কর্মীরা ছিলেন রাষ্ট্রপতি। সেদিন আর নেই। একদিকে বিরোধী দল, অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় কংগ্রেস দল—এরই মধ্যে বসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে যেমন দেশের দায়িত্ব পালনে ক্রমশই এগিয়ে যেতে হবে, সেই রকম রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরিকেও নানা দায়ভার বহন করতে হবে। স্বভাবতই শ্রীগিরির সঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের একটা বড় পার্থক্য প্রথম থেকেই থেকে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও আমরা আশা করি, শ্রীগিরি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ন্যায়-বোধ নিয়ে এই দুরূহ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই পালন করে যাবেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে এবারে যে আলোড়ন ও উত্তেজনা সারা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ইতিপূর্বে তা আর দেখা যায়নি। বাস্তবিক পক্ষে, এই প্রথম—যথার্থ অর্থে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। এবং সে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আমরা সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতাও বলতে পারি, নির্বাচনের ফলাফলেই তার প্রমাণ। এই নির্বাচনের তাৎপর্য ও গুরুত্বও যেমন নানারকম, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চমৎকারিত্বও সেরকম রয়ে গেছে। তবু যা প্রধান তা হল, শ্রীগিরির কাছে বিজয়মালা পরাতে কিছু বিরোধী দলের সঙ্গে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলেরও অনেকের বিবেকের অসহযোগিতা ছিল না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় শৃঙ্খলা বিসর্জন দিতে অনেকের আটকায় নি। এটা ভাল না মন্দ সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর, তবে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কত কি চমৎকারিত্ব থেকে গেল! ঠিক এই মুহূর্তে না দেশের, না রাজনৈতিক দলগুলির সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। আমাদের পক্ষে আপাতত অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যাই হোক শ্রীগিরি এই রাষ্ট্রের শীর্ষাসনে বসেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর একমাত্র কর্তব্য স্বদেশের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ। আমরা শ্রীগিরির মতন অভিজ্ঞ ও উদ্যোগী মানুষের কাছে যে আশা অবশ্যই করতে পারি। মনে রাখতে হবে শ্রীগিরির কর্মজীবন নানা অভিজ্ঞতায় ভরা। তিনি আইনজ্ঞ, তিনি আইনসভার কাজে অভিজ্ঞ, তাঁর প্রেরণায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সারা ভারত রেলকর্মী ফেডারেশনেরও তিনি গঠনকর্তা ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিসভায় সদস্য হিসেবে থেকেছেন, বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সরকারী কর্মী হিসেবে; উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, এবং মহীশূরে রাজ্যপাল হিসেবেও দীর্ঘকাল নিযুক্ত থেকেছেন। গত ১৯৬৭ সালে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডঃ জাকির হোসেনের পরলোকগমনের পর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবেও সাময়িকভাবে ওই পদে ছিলেন।

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়ে শ্রীগিরি দেশের অধিকাংশ মানুষের সান্ত্বনা ও আনন্দের কারণ হয়েছেন। আশা করা যায়—বিজয়ী রাষ্ট্রপতি অতঃপর স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল ও কল্যাণের কর্মে নিরন্তর সহযোগিতা করবেন। আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই।

খেল খালাস
ব্যাণ্ড বাজাও!
কংগ্রেস
MAKUL

রূপদর্শীর সংবাদ-ভাষ্য

বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়া কাকে বলে আমাদের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মহামান্য শ্রী ভি ভি গিরি তা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল তিনি ভোট পেয়েছেন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, বি কে ডি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, বাম কমিউনিস্ট পার্টি, ডান কমিউনিস্ট পার্টি, আর এস পি, এস ইউ সি, ডি এম কে, ফরওয়ার্ড ব্লক, আকালি দল, বাংলা কংগ্রেস, লোক সেবক সঙ্ঘ, মারকসবাদী, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই, প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ, ঝাড়খণ্ড পার্টি এবং নিশ্চয়ই আরও সব ইত্যাদি ইত্যাদি পার্টির ভোটদাতাদের কাছ থেকে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে আসা যায় যে, শ্রীগিরিই ভারতের প্রথম সর্বস্নেহধন্য রাষ্ট্রপতি। শ্রীগিরির জয় হোক। এবং পশ্চাৎ কীভাবে ভগবান ভূত হন, সেটা সকলাঙ্গ-কড়ভাবে দেখিয়ে প্রস্থান করার জন্য কংগ্রেস নামক একটি রাজনৈতিক সংস্থার সরকারি প্রার্থী শ্রীনিলম সঞ্জীব রেড্ডি ও তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

শ্রীগিরির জয় নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার জয় এবং প্রগতিশীলতার জয় অনিবার্যভাবে যুক্তফ্রন্টের আগমনী। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের পরাক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় হৃষ্টচিত্তে আশা করছেন, শ্রীমতী গান্ধীও অচিরেই কেন্দ্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে ফেলবেন। শ্রীমতী গান্ধীর কথাবার্তা শুনে ভারতের জনগণও সেই আশা করে বসে আছে। এবং শ্রীমতী গান্ধীও জনগণের দরজায় দরজায় ঘুরে এইরূপ একটি মাভৈঃ বাণী তাঁদের শুনিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল জনগণের পক্ষ থেকে অনায়াসেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় যে, এই ধরনের ব্যাপারে আমাদের বরাবরই উৎসাহ আছে।

বিশেষ করে কমরেড সুন্দরায়া যখন সবুজ বাতি দেখিয়ে দিয়েছেন, তখন আর আমাদের দ্বিধা বা সংকোচ কিছুই থাকতে পারে না। কমরেড সুন্দরায়া মারকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত ঘোষণাকালে অতি সুন্দরভাবে বলেছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি কংগ্রেসের 'গণতান্ত্রিক' গোষ্ঠীকে নিয়ে সরকার গঠন করেন, তবে মারকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে সমর্থন জানাবে। শ্রী ভি ভি গিরির জয় চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও গণতান্ত্রিক শক্তির জয়।

আবার এই বক্তব্যটাও এই সঙ্গে শুনে নেওয়া যাক : "শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দেশকে সেবা করবার এবং একান্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে তাঁর দলকে ঢেলে সাজানোর এক চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন। এরকম একটি সুযোগ আর না আসতেও পারে।" না, এটা পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত নয়, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সব থেকে প্রভাবশালী পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের মন্তব্য।

সুযোগ যখন সম্মুখে তখন আর তা নিতে বাধা কি? ডান কমিউনিস্ট পার্টির সেনট্রাল সেক্রেটারিয়েট দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্রী' কংগ্রেসীদের জোট বাঁধার আবেদন জানিয়েছেন।

অবিশ্যি বর্তমান লোকসভায় দলগত শক্তির যা অবস্থা তাতে শুধুমাত্র 'গণতন্ত্রী' কংগ্রেসীরা জোট বাঁধলেই যে কেল্লা ফতে হবে তা নয়, ওই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে আরও গোটাকতক প্রগতিশীল দলের সঙ্গে জোট বেঁধে যে কজ হাসিল করতে হবে, একথা না বললেও চলে। কথা হচ্ছে, কে বা কারা এমন প্রগতিশীল?

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে যে দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার আপাতত বহাল আছেন তাদের অবস্থা ক্রমশই তো স্টেট বাসের মত হয়ে আসছে—ঘন ঘন ব্রেক ডাউনের আশঙ্কা।

কেরলে বিধানসভা মুলতুবি করে দিতে মাননীয় স্পিকার মহোদয় বাধ্য হয়েছেন। কারণ, কমরেড এ কে গোপালনের মতে কেরলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে পড়েছে। কেরল কংগ্রেসের একটি বেসরকারি প্রস্তাব সি পি আই, আর এস পি, মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টি (এস এস পি'র ভগ্নাংশ) সমর্থন করায় এই সংকট দেখা দিয়েছে। পলিটব্যুরো যে-সব দল সি পি আই-এর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কমরেড গোপালন আশঙ্কা করছেন, সি পি আই ও অন্যান্যরা রাজ্যপালকে সরকার ভেঙে দিতে বলতে পারেন। কমরেড সুন্দরায়া বলেছেন, সরকার ভেঙে গেলে 'আমরা জনগণকে সংগঠিত করব।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বাম কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী চক্রান্ত প্রতিরোধ করবার জন্য পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলছেন। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যে শপথ নিয়েছেন তার মূল বয়ান : "যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী চক্রান্ত কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না—তা সে যে-রূপেই আসুক না কেন"—

এতগুলি বয়ানের যোগফলে সি পি আই-এর অবস্থা কী দাঁড়ায়, তা দেখেই কি প্রধানমন্ত্রী তাঁর নতুন সবকারের পার্টনার নিয়োগের কথা ভাববেন?

শূন্য পুরাণ?

মারকসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, (বিভিন্ন প্রগতিশীল দল নিয়ে গঠিত) এই যুক্ত মোর্চা গঠিত হবে একটি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে।—যুগান্তর, ২৩ আগস্ট, পৃষ্ঠা ১

দেবরাজ

যে নদী মরুপথে

বাইরে থেকে দেখতে গেলে চেকোস্লোভাকিয়াতে ১৯৬৮-র একুশে আগস্টে আর ১৯৬৯-র একুশে আগস্টে এমন কী তফাৎ? গেল বছরেও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্ববোদা, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চার্নিক এ বছরেও তাই: তফাতের মধ্যে শুধু এই আলেকজাণ্ডার ডুবচেক ছিলেন কম্যুনিস্ট দলের সেক্রেটারি, এখন তাঁর জায়গায় এসেছেন দলের কর্তা হয়ে গুস্তাভ হুসাক, জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ সেবার ছিলেন স্মরকোভস্কি, এবার ডুবচেক। আরও কিছু রদবদলও, অবশ্য হয়েছে, যেমন পার্টির প্রেসিডিয়ামে অর্থাৎ সভাপতিমণ্ডলীতে আর মন্ত্রিসভায়। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা একুশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে এগারো, পুরোনোরা কেউ বা আছেন, কেউ বা গেছেন। নতুনও কেউ কেউ এসেছেন। বলা যেতে পারে এ সব হেরফেরে অবাক হবারই বা কী আছে? আপত্তিরই বা কী আছে? অন্য দেশেও তো এমনই হয়, যে সব দেশে কম্যুনিজম্ নেই সে সব দেশেও। বিলেতে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, জাপানে—কোথায় না মাঝে মাঝে মন্ত্রিসভায় অদলবদল হচ্ছে?

কিন্তু কেবল বাইরেটা দেখে বিচার করলে রাজনীতি-কূটনীতিতে ঠকতে হয়, কম্যুনিস্ট দেশে তো বটেই, অনেক অকম্যুনিস্ট দেশেও। কম্যুনিস্ট দেশে ক্ষমতার সিন্দুক যার হাতেই থাকুক না কেন চাবিকাঠিটি পার্টির হাতে। সে কাঠি তাঁর হাতে গেল বছর ছিল বলেই ডুবচেক তাঁর নতুন উদার নীতির সার্থক রূপ দিতে পেরেছিলেন সরকারী কর্মক্রম আর আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে। একুশে আগস্ট পর্যন্ত চেকোস্লোভাকিয়াতে কম্যুনিজমের যে রূপান্তর ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল পার্টির পয়লা নম্বর সচিবই তার মূলাধার ছিলেন বলে। রুশীরা সে দেশের বুকের ওপর সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাঁর হাত থেকে চাবিকাঠিটি কেড়ে নেয়নি, তাঁর ওপর লোকের অসাধারণ টান দেখে। তাঁর আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের মাথার ওপর কামান-বন্দুক উঁচিয়ে তারা কাজ হাসিল করার ব্যবস্থা করেছিল। তবে তারা সুযোগ খুঁজছিল ডুবচেকের হাত থেকে চাবিকাঠিটি কেড়ে নেবার। সতেরোই এপ্রিল সে সুযোগ এলো। দলের নতুন পয়লা নম্বর সচিব হলেন হুসাক, ক্ষমতার চাবিকাঠি হলো ডুবচেকের হাতছাড়া।

কাজেই বাইরে থেকে দেখে যদিও মনে হচ্ছে এমন কী আর বদল হয়েছে এই এক বছরে চেকোস্লোভাকিয়ায় আসলে কিন্তু হয়েছে অনেক কিছু। হঠাৎ যদি দুকূল-ভাঙা আপন বেগে পাগলপারা ছুটে-চলা নদী শুকিয়ে যায়, তা হলে সবুজ জমি যেমন দেখতে দেখতে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করে তেমনই হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার। বাইরের ঠাট তার হয়তো বজায় আছে, কিন্তু ভেতরটা জ্বলে গিয়েছে। গিয়েছে বলা বোধ হয় ভুল হলো—এখনও জ্বলছে। স্ববোদা চার্নিক নিজের নিজের জায়গায় আজও আছেন, ডুবচেকও তো জেলে কিংবা বন্দি-শিবিরে নেই। তবুও কিন্তু তাঁরা না থাকার মধ্যেই। ঠিক হোক, ভুল হোক নিজের পথে চলতে তাঁরা আর পাচ্ছেন না, তাঁদের চলতে হচ্ছে রুশিয়া তাঁদের জন্যে যে সড়ক তৈরি করে দিচ্ছে তাই বেয়ে। তারা যে ছক এঁকে দিয়েছে তাই ধরে। যাঁদের হাতে আজ ক্ষমতা তাঁরা উগ্রপন্থী সকলে নন, কিন্তু মুরুব্বিয়ানা করছেন মস্কোভক্ত উগ্রপন্থীরাই। হুসাক ঠিক সে দলে পড়েন না, তবে মানবিক কম্যুনিজমের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস নেই। শোনা যাচ্ছে তাঁকেও সরিয়ে দিয়ে কট্টর মস্কোপন্থী স্ট্রুগালকে বসানো হবে তাঁর জায়গায়।

রুশীদের মুশকিল ডুবচেক-স্ববোদা-চার্নিক-হুসাককে নিয়ে নয়, তারা ফাঁপরে পড়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার সাধারণ মানুষদের নিয়ে। কিছুতেই তাদের বশে আনা যাচ্ছে না। একুশ বছর কম্যুনিস্ট রাজত্বের পর সে দেশে তো আর প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী বলতে কিছু নেই যে তাদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া যাবে, আজ সেখানে যা হচ্ছে তার জন্যে। বেঁকে দাঁড়িয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা, তরুণ-তরুণীরা কারখানার মজুরেরা। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে লেখকেরা, সাংবাদিকেরা, রেডিওর ভাষ্যকারেরা। এরা সবাই উদারতার নদীতে উজান বেয়ে চলেছিল পরমানন্দে। রুশীদের কড়া অনুশাসনের বাঁধ যখন সে নদীকে বেঁধে ফেললো—তার বুকে জেগে উঠলো চড়া—তখন তারা গোড়ায় হলো হতভম্ব, তারপর হলো ক্রুদ্ধ। কিন্তু রাগ করে তারা করবে কী? একালের মারণাস্ত্রের সঙ্গে তো আর দু-চারটে বোমা-বন্দুক নিয়ে পেরে ওঠা যাবে না। ভেতরে ভেতরে তার গুমরে মরতে লাগলো। রুশীদের ওপর তাদের হলো বিজাতীয় ঘৃণা। মাঝে মাঝে তুচ্ছ কারণে তারা তাই ফেটে পড়ছে তীব্র বিক্ষোভে—খেলার মাঠে, নাচের আসরে, সিনেমা-থিয়েটারের হলে।

সারা চেকোস্লোভাকিয়াতে আজ চলেছে নীরব প্রতিরোধ। অক্ষম আক্রোশে লোকে আত্মপীড়ন করে প্রতিশোধ নিচ্ছে নিজেদের ওপর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি বলে। পূর্ব ইউরোপে শিল্পে তারাই ছিল সব চেয়ে এগিয়ে। এই এক বছরে গোটা দেশটা দেউলে হতে চলেছে। কলে কারখানায় কাজ হচ্ছে বটে, কিন্তু লোকের কাজে মন নেই, কাজেই উৎপাদনের কোনও লক্ষ্যেই পৌঁছনো যাচ্ছে না। জিনিসপত্র সব দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও কারখানায় নাকি উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ কমে গেছে। দোকান সব খালি। পোল্যাণ্ড থেকে আমদানি করতে হচ্ছে মাখন, অস্ট্রিয়া থেকে দেশলাই। অথচ এই সেদিনও এই দুটো জিনিসই চেকোস্লোভাকিয়া রপ্তানি করতো উৎপাদন এত বেশী হতো। খাবার জিনিসেরও অভাব দেখা দিয়েছে। মাংস আর ডিমের যোগান দারুণ কমে গিয়েছে। তবে কারখানার যতটা অশান্তি দেখা যাচ্ছে মজুরদের মধ্যে ততটা ক্ষেতখামারে নেই। না থাকলে কী হয়, সেখানেও সরকারী কড়াকড়ি আর বিধিনিষেধ নিয়ে গোল বেধেছে। রাশ টেনে ধরার ফলে চাষীদের উৎসাহ কমে যাচ্ছে যা বাড়ছিল ডুবচেকের উদার অর্থনীতির আমলে।

একুশে আগস্ট গেছে চেকোস্লোভাকিয়াতে রুশিয়া আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের অভিযানের বার্ষিকী। মস্কোর আশংকা আর পশ্চিমীদের আশা ছিল সেদিন একটা সাংঘাতিক কিছু হয়তো হবে। সে আশংকাও সত্যি হয়নি, সে আশাও পোরেনি। বোঝা গেল রুশীদের দাপটে মাথা তোলবার শক্তি চেক আর স্লোভাকরা হারিয়েছে। তাই বলে তারা হাল একেবারে ছেড়ে দেয়নি, প্রতিরোধের আগুনও একেবারে নিভে যায়নি। সেদিন তারা রুশীদের ধিক্কার দিয়েছে শহরে শহরে, অহিংস উপায়ে জানিয়েছে তাদের অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সকাল থেকে লোকে গাড়িতে না চড়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছে যে যার কাজে, স্কুলে, কলেজে ও কারখানায়, থিয়েটারে, সিনেমায়, রেস্তোরাঁয় কেউ যায়নি, কারখানায় কারখানায় হয়েছে প্রতীক ধর্মঘট। কড়া হুকুম ছিল সরকারের সেদিন বিক্ষোভ না দেখাবার। বেশীর ভাগ লোকেই তা মানেনি। একদিন নয় তিনদিন ধরে চলেছে শহরে শহরে বিক্ষোভ, গুলিও চলেছে, লোকও মারা গেছে। নতুন করে কড়া আইন জারি করা হয়েছে অবাধ্য রুশবিরোধীদের "শায়েস্তা" করার জন্যে। আর এমনই অদৃষ্টের পরিহাস তাতে সই আছে স্ববোদা, চার্নিক আর ডুবচেকের, হুসাকের নয়, স্ট্রুগালেরও নয়।

বিদেশী লীলা খেলা

বিদেশীরা আমাদের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছেন, পয়সা ঢালছেন—এ অভিযোগ বহুদিনের। হালফিল অবশ্য এইরকম অভিযোগের মাত্রা কিছুটা বেড়েছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরই পারলামেন্টে একবার এ নিয়ে জোর হইচই হয়েছিল; বহু সদস্য বলেছিলেন, নির্বাচনে বিদেশী টাকার খেলা চলেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কয়েকদিন আগে দিল্লিতে কয়েকজন বামপন্থী নেতা বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের রাজনীতিতে বিদেশী চাপ বাড়ছে। এবং এই সেদিন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে লোকসভায় আবার বিদেশী টাকার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ নিয়ে জোর বাকবিতণ্ডা হয়ে গেল।

আমাদের রাজনীতিতে টাকা ঢালার বা নাক গলাবার অভিযোগ যে বিশেষ কোনও একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেমন নয়। অভিযোগ অনেকেরই নামে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি অনেকেরই নাম শোনা গিয়াছে এই প্রসঙ্গে। খুব হালকা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সব রকমেরই অভিযোগ উঠেছে এদের বিরুদ্ধে।

যাঁরা এই সব অভিযোগ তোলেন তাঁদের মধ্যে অবশ্য মোটামুটি একটা ভাগ ছিল এর আগে। কমিউনিস্ট এবং তাঁদের অনুগামীরা অভিযোগ তুলতেন শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আর, অকমিউনিস্টরা বলতেন কেবলমাত্র রাশিয়া এবং চীনের নামে। সম্প্রতি অবশ্য এর কিছুটা হেরফের ঘটেছে। যেমন, সি পি আই (এম)-এর নেতারা এখন আর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম বলেন না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে চীনের নাম খোলাখুলিই উচ্চারণ করেন এবং রাশিয়া সম্পর্কেও প্রায় প্রকাশ্যেই অভিযোগ আনেন। হপ্তা পাঁচেক আগে সি পি আই (এম)-এর শ্রীরামমূর্তি এবং এস এস পির শ্রীমধু লিমায়ে একটা যুক্ত বিবৃতিতে দেশবাসীকে বর্ধমান

বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রামমূর্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কোন্ কোন্ বিদেশী শক্তির কথা বলেছেন? সি পি এম নেতা জবাব দিয়েছিলেন: ইয়াংকি, রুশী, অ্যাংলো সব। ফরওয়ার্ড ব্লক সম্প্রতি খোলাখুলিই মার্কিন এবং রুশী হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন।

সি পি আই-র অভিযোগ অবশ্য শুধু পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে। তাঁরা চীনের যোগাযোগও বলেন। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে তাঁরা আজ পর্যন্ত একটিও 'খারাপ' কথা উচ্চারণ করেছেন বলে কেউ কখনও শোনেন নি। তেমনি সি পি আই (এম-এল) চীনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন না। তাঁদের অভিযোগ শুধু "অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং রুশী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।"

স্বতন্ত্র এবং জনসংঘের অভিযোগ প্রায় সব সময়ই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে। জনসংঘ অবশ্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও কড়া কড়া কথা বলেন এবং মাঝে মধ্যে পশ্চিমা মিশনারীদের সম্পর্কেও অভিযোগ তোলেন। আর কংগ্রেস নামক বিচিত্র রাজনৈতিক দলটিতে যেহেতু এস কে পাতিল থেকে অর্জুন অরোরা পর্যন্ত সবাই আছেন, সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুই দিকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আসে!

আমাদের সরকার কি বলেন এ প্রসঙ্গে? তাঁরা সর্বদাই না স্বীকৃতি না অস্বীকৃতির মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেন এবং প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দেন: বিদেশী প্রভাব খর্ব করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে, বিদেশী অর্থ আগমনের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবছি।

★

বিদেশী অর্থ এবং নির্দেশের খেলা যে এদেশে চলে তাতে আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই। এবং, আমি এ সম্পর্কেও নিশ্চিত যে পশ্চিমা এবং কমিউনিস্ট দুই পক্ষই আমাদের রাজনীতিতে বেশি করে নাক গলাতে উদ্যোগী হয়েছেন। ভারত সরকারের গোয়েন্দা দফতরের কর্তাব্যক্তিরাও এই ক্রমবর্ধমান বিদেশী হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেন না।

কোনও বিদেশী দূতাবাস যদি আইন-সিদ্ধ উপায়ে এদেশ সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তাতে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। এ কাজ তাঁদের এক্তিয়ারেরই ভেতরে। কিন্তু যখন তাঁরা গোপনে খবর নেওয়ার বা গোপন সরকারী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তখন আইনের সীমা ছাড়িয়ে যান—সম্পূর্ণ বে-আইনী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হন।

শুধু এইটুকু বে-আইনী কাজ করেও আবার অনেকে সন্তুষ্ট নন। তাঁরা নানা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী হন। এ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুকেই প্রভাবিত করতে চান এবং সেই জন্যই নানাভাবে আমাদের ব্যাপারে নাক গলান, টাকার খেলা খেলেন। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে আপত্তিজনক। এবং এই খেলা যে দেশেই বিদেশীরা চালাতে পারবেন সেই দেশেরই সর্বনাশ হতে বাধ্য।

যে দেশ আভ্যন্তরীণভাবে যত দুর্বল, যার রাজনীতি যত অস্থির এবং রাষ্ট্র-পরিচালকরা যত বেশি স্বার্থান্বেষী বিদেশী-দের লীলাখেলার সুযোগ সেই দেশে তত

বেশি। ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে বিভিন্ন বিদেশী স্বার্থ এই সব সুযোগ নিয়ে নানা দেশের সর্বনাশ করেছে। ভারতেও যে আজ বিদেশীদের লীলাখেলা বাড়ছে সেটা ভারতের এই সব দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই।
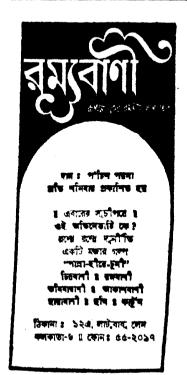
আমরা যদি এই বিদেশী লীলাখেলা বন্ধ করতে না পারি তাহলে আমাদের সর্বনাশ হতে বাধ্য। আমেরিকাই হোক, রাশিয়াই হোক—নিজের দেশের স্বার্থ সকলের কাছেই প্রথম। যেখানেই ওদের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে বা হওয়ার আশংকা আছে বলে ওরা মনে করবেন সেইখানেই নিজেদের স্বার্থে আমাদের ক্ষতি করতে এগিয়ে যাবেন।

ভারত যদি আফরিকার কোনও প্রান্তে একটা ছোট্ট দেশ হত তাহলে অবশ্য এদেশকে নিয়ে বড় রাষ্ট্রগুলি মাথা না ঘামিয়েও পারতেন। কিন্তু যেহেতু ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান, যেহেতু ভারত বহু কোটি মানুষের একটা বিরাট দেশ এবং যেহেতু শক্তিশালী দেশ হিসাবে দাঁড়াবার মত সুযোগ ও সম্ভবনা ভারতের যথেষ্ট রয়েছে সেই জন্যই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাঁদের নিজেদের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থে ভারত সম্পর্কে এত আগ্রহী—নিজ নিজ স্বার্থেই ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরি-চালিত করতে ব্যগ্র। ভারত যদি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ায়, ভারত যদি দশ বিশ বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদেশী বাজারে নামে, ভারত যদি শুধু নিজ স্বার্থেই তার বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করতে পারে তাহলে যে বহু বড় রাষ্ট্রেরই তাতে কম-বেশি ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এই সব বড় রাষ্ট্র নিশ্চয়ই চাইবেন না ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজের নীতি সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থে নির্ধারিত করুক এবং বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এগিয়ে যাক।

এই জন্যই, যে যত আমাদের সাহায্যই করুন না নিজ স্বার্থের কথা সব সময় তাঁরা ভাবেন এবং সেইভাবেই কাজ করেন। তবে খোলাখুলি বললে বলতে হয়, আমেরিকা হোন, রাশিয়া হোন আমাদের সাহায্য করার পেছনেও তাঁদের স্বার্থবুদ্ধিই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে এবং করছে। তাঁরা সাহায্য করছেন, আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব; কিন্তু কৃতজ্ঞতাবশত আমরা যেন একবারও মনে না করি যে তাঁরা নিছক পরহিতে প্রাণ দান করতে এগিয়ে এসেছেন!

*

সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হয়, বিদেশীরা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন জানতে পারলেও তাঁদের ধরা কঠিন। সত্যি কথা; বহু ক্ষেত্রে বিদেশী লীলাখেলা জানতে পারলেও ধরা কঠিন। কারণ তাঁরা যে সব খেলা খেলেন বহু ক্ষেত্রেই তার কোনও প্রমাণ রাখেন না। ধরুন, মার্কিন সি আই এ ডি এম কে বা মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে টাকা দিল অথবা রুশ কে জি বি সি পি আই-কে টাকা দিল—এগুলি আভাসে ইঙ্গিতে জানা গেলেও ধরা অসম্ভব। কিন্তু সদিচ্ছা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকলে সরকার নিশ্চয়ই বিদেশীদের লীলা-খেলার সুযোগ অনেক কমিয়ে আনতে পারেন।

প্রথম কথা, এত বিদেশীকে এদেশে থাকতে দেওয়ার প্রয়োজনটা কি? ওরা সাহায্য দিচ্ছেন বলে? হো চি মিন কি রাশিয়া এবং চীনের কাছ থেকে কম সাহায্য নিয়েছেন? কিন্তু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কখনও রুশ বা চীনকে তিনি উত্তর ভিয়েতনামে ঘাঁটি গেড়ে বসতে দিয়েছেন? এত বড় মার্কিন যুদ্ধযন্ত্রের সঙ্গে এত দীর্ঘ সাফল্যজনক যুদ্ধ চালাচ্ছেন; কিন্তু কখনও রুশ বা চীন সৈন্যের সাহায্য নিয়েছেন তিনি? প্রায়-ডুবন্ত স্তালিন যখন আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্রভিক্ষা নিয়ে-ছিলেন, তখন তিনি কজন মার্কিন সৈন্য রাশিয়ায় ঢুকতে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গে? এমন যে আধা-স্বাধীন (রাজনৈতিকভাবে) পশ্চিম জার্মানী সেও কি তার সব কলকারখানায় ইংরেজ বা মার্কিনীদের ঢুকতে দেয়?

আর আমাদের দেশে? হিসেব নিলে হয়ত দেখা যাবে প্রতি লক্ষ ডলার বা রুবল ঋণ নেওয়ার সঙ্গে আমরা একজন মার্কিনী বা রুশকে অন্তত একমাস এদেশে বসবাস করতে দিয়েছি। পাঁচ বছরেও আমাদের দেশের ছেলেরা কলকারখানার কাজ শিখতে পারে না? পাঁচ-দশ বছর পরেও সব কলকারখানায় বিদেশী বিশেষজ্ঞ অত্যাবশ্যক? কেউ বলবেন না বিদেশী মাত্রই গুপ্তচর বা চক্রান্তকারী; তবে, এটাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন যে, দশজন ভালো বিদেশী বসবাসের অধিকার পেলেই মা তার মধ্যে একজন খেলোয়াড় পাঠাবার সুযোগ মেলে।

দ্বিতীয়ত, যে সব প্রতিষ্ঠান বা পত্র-পত্রিকা কোনও বিদেশী শক্তির হয়ে ওকালতি করে বা তাঁদের স্বার্থে বিকৃত বা অসত্য সংবাদ সরবরাহ করে তাদের অর্থাগমের সূত্র ধরা যায় না? রাজনৈতিক দলের আয়ব্যয়ের হিসাব চাওয়া না হয় সম্ভব নয়; কিন্তু অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা পত্রপত্রিকার হিসাব নিশ্চয়ই আইনমতই সরকার পরীক্ষা করতে পারেন। আমেরিকান বা রুশ অর্থানুকূল্যে যে সব প্রতিষ্ঠান বা পত্রপত্রিকা চলে সেগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব যদি সরকার প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহলেই জনসাধারণ তাদের স্বরূপ চিনতে পারেন।

এমনি আরও কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যার ফলে বিদেশী লীলাখেলা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলেও কমতে বাধ্য।

চূড়ান্ত বিচারে অবশ্য একথা ঠিক যে যতদিন না দেশের মানুষ জাতীয় স্বার্থ বুঝবেন, যতক্ষণ না বিদেশী সাহায্যপুষ্ট রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সম্পর্কে সতর্ক হবেন, ততদিন বিদেশীদের লীলাখেলা কেউই সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারবেন না।

নবারুণ গুপ্ত

দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা পরস্পরকে কাজ দিতে আর কাজ বাড়িয়ে দিতে ন্যায়ত বাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেদিন পথে আর একটি দৃশ্য দেখে, সত্যটা আরো বেশি উপলব্ধি করলুম আমি।

ছোট একটি শোভাযাত্রার পুরোভাগে জনৈক অসাবধান পকেটমার। মাথায় মুখে তার রক্ত এক গালে চুন আর এক গালে কালি, চুল অর্ধেক কামানো পরনে সংক্ষিপ্ততম একটি লজ্জাবাস। লোকটিকে এইভাবে সাজাতে অনেক অধ্যবসায় দরকার হয়েছে সন্দেহ নেই. একটা গাধা বোধ হয় পাওয়া যায়নি, তা হলেই আয়োজনটা কমপ্লীট হত। পেছন থেকে, দু' পাশ থেকে কিল-চড় চলছে সমানে, পকেটমার রক্তের স্রোতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নির্বিকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে বলতে পারলুম না, হয়তো থানায়, হয়তো বা এক বালতি গোবর-জলে তার অবগাহন বাকী আছে এখনো।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যাবে, এর মধ্যেও সেই সামাজিক দায়িত্ববোধ কাজ করছে। কারো অকারণে বসে থাকবার রাইট নেই, তা হলে খাওয়া বন্ধ, সুতরাং উক্ত লোকটিকে পকেট মারতে হচ্ছে; যাঁর পকেট লুণ্ঠিত হল তাঁর যদি কিছু বেশি টাকা ব্যাগ থেকে থাকে, তা হলে এই ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্যে তাঁকে প্রাণপণ প্রয়াস বাড়াতে হবে এরপর, অর্থাৎ তাঁর কর্মশক্তি নতুন প্রেরণা পাচ্ছে; যারা পকেটমারকে ধরে ফেলেছে তাদের অনেকেরই হাতে কাজ ছিল না, এই ফাঁকে তারা দুর্জন দমন করে একটা মহৎ কর্তব্যে সিদ্ধ হয়েছে এবং চুন-কালি, মাথা কামানো—নির্দিষ্ট প্রহার আর

থানার রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে 'ফলস্ কেস' ধরতে হয়

উদ্দিষ্ট এই লোকগুলোর [illegible] হচ্ছে। [illegible]

[illegible]

তাদের সবাইকে এমন কাজ করা দরকার যাতে তাদের কর্মশক্তি অনিবার্যভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। অতএব—

এই অধিকারদের [illegible] খেয়ালটাই ছিল না যে আমার [illegible] সকালেও এবং গাড়ি থামবে [illegible] সেকেণ্ড! হুড়মুড় করে নামতে গিয়েই পড়লাম কবে সেই [illegible] খোয়ায় একটি দুর্ধর্ষ আছাড়!

ফলে, আমার সুপ্ত কর্মশক্তি [illegible] উদ্বোধিত হয়েছে। আমার দু' হাঁটুতে প্রবল বেগে [illegible] মালিশ করছেন তিনি।

ভ্রান্তিবিলাস

গৌরকিশোর ঘোষ

দেখুন, একটা কথা বলি
আমরা বিভ্রান্ত
কিন্তু আমরা খাচ্ছি দাচ্ছি নির্ভুল
নিরিখে নারীর শরীরে ডিম পেড়ে যাচ্ছি
যার কাছে
কিছু ধারি সময়মত তাকে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকাচ্ছি যার
কাছে কিছু পাই প্রাপ্তিযোগ
দেখে নিয়ে তার দ্বারস্থও হচ্ছি ঠিকঠাক
ঠিকানা আদৌ ভুলছিনে

যাকে ঘৃণা করি তাকে ছাড়া
আর কাউকে করছিনে ঘৃণা
যে কাজ ফাঁকি দেবার তাতে ঠিকে
ভুল হচ্ছে না একবারও

পাওনা গণ্ডা ফেলছি না
কড়াক্রান্তিতে
উশুল করে নিচ্ছি
একবারও বাতাস ফস্কাচ্ছে না শুধু

আমাদের দেবার পালা
যখন আসছে সেই তখনই
আমরা বলছি শুনছি দেখছি
আমরা কী নিদারুণ বিভ্রান্ত

না আমি তোমাকে

হেনা হালদার

না আমি তোমাকে যথাসর্বস্ব দেব না তুমি আর
পারবে না দস্যুতা করতে স্বেচ্ছাচারী অত্যুগ্র পৌরুষে
তোমার ফোয়ারা যদি পাথরের মূর্তি হয়ে থাকে
তাই থাক। আমি তাকে জলের জীবন্ত মন্ত্রে আর
দীক্ষিত করব না। আমি হাড়ের পাহাড় খুঁড়ে খুঁড়ে
রক্ত জাগাব না। আমি রাশি রাশি হলুদ পাতায়
আগুন লাগাবো কিন্তু কোন বৃন্তে কুঁড়ি ধরাব না।

না তুমি আমাকে আর তোমার চক্রান্তে পুনর্বার
চালিত করবে না যাদুদণ্ডের অমোঘ নিয়ন্ত্রণে
যত ভাঙো গড়ো কর পারাপার চাতুর্যের সাঁকো
আমি আর নীলপদ্ম আনতে গিয়ে বিভ্রান্ত হব না।

কেননা জেনেছি এই মন্ত্রপূত জল : মরীচিকা
তোমার ভৃঙ্গারে শুধু অকুণ্ঠিত আকণ্ঠ ছলনা
এখন এখানে আর কোনো দৃশ্যে বিস্ময় খুঁজব না—
খুঁজব না পাথরে জল, কিংবা হাড়ে রক্তের বিদ্যুৎ।

ঘন্টাধ্বনি থেমে গেলে

পলাশ মিত্র

ভোরবেলা ঘণ্টাধ্বনি থামার পর
কে যেন বলেছিলেন,
　'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়া ভবতি'
　　আত্মাই পরম প্রিয়তম। বলেছিলেন,
　　　আত্মাই তোমার আত্মীয়।

ধূপের মধ্য থেকে
একটি কালো হাত ইশারা করছিল। সাবাক্ষণ
ধূপের ধোঁয়া
চন্দন
　রজনীগন্ধার গন্ধকে
　　কালো হাতের ইশারা।

আবার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গিয়েছিল।
শোনা গিয়েছিল
　　সেই সমুদ্রকণ্ঠ :
　　আত্মাই পরম প্রিয়তম।

হাসন রাজা (৩)
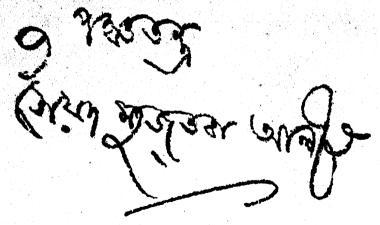
মহরমের পরবে যে-ইমাম হাসন, ইমাম হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হয় তাঁদের নির্মম হন্তারূপে ধরা হয় খলীফা বাদশা এজিদকে। এই এজিদটি কবি হিসেবে উত্তম না হলেও ছিলেন মধ্যমের চেয়ে সরেস এবং মদ্যপ। তাঁর একটি কবিতার ভাবার্থ :

"এক পাত্র মদিরা পান করলেই
আমার হয়ে যায় অপ্রচুর ফূর্তি।
তবু খাই দ্বিতীয় পাত্র—
কেন?
কারণ মোল্লারা আমার সুরাপান পছন্দ করে না।
নিছক তাদের চটাবার জন্য খাই তখন
দ্বিতীয় পাত্র।"

হাসন রাজার সংগে অন্য বাবদে খলীফা এজিদের তুলনা হয় না। শুধু একটি বিষয়ে দুজনাই সমগোত্রীয়। মোল্লাদের নিয়ে নিত্যদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাতে দুজনাই ছিলেন বিদগ্ধ পরিপক্ক খিলি ফে।

হাসন রাজা যে "দেশে দেশে কান্তা" করে ঘুরে বেড়াতেন সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একদা তাঁর হৃদয়মনের কিঞ্চিৎ লেনদেন হমদ-দরদী হয় এক মোল্লার কন্যার সংগে। সেই সূত্রে হাসন-রাজা একটি গীত রচনা করেন :

"কারে বন্ধু করিবে পার, মোল্লার ঝি,
কারে বন্ধু করিবে পার?
তোর বাপ করে নামাজ রোজা,
আমি গুনাহগার॥" ১
তোর বাপে দিনেরাতে নামাজরোজা করে,
লোকসমাজে বসে কেন নিন্দা করে
মোরে? ২॥
তোর বাপে সর্বদাই করে এবাদৎ৩
মুই গুনাহগার লইনা কট্ মোল্লার৪ মত॥
চোখ থাকিতে দিনের কানার মত নাহি লই।
সাক্ষাতে যে বন্ধু খাড়া, মোল্লায় বলে কই?
হাসন রাজার বন্ধুকে মোল্লায় নাহি দেখে।
আজলের৫ আন্ধি লাগছে কট্ মোল্লার
আঁখে॥

(১) গুনাহগার=পাপিষ্ঠ। ধর্মের বিধান অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম করে না। (২) যে-লোক ধার্মিক অনুষ্ঠান করে তার তো উচিত নয় পরনিন্দা করা! (৩) এবাদৎ= নামাজরোজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম। (৪) কট্= কট্টর, কঠোর। কট্ মোল্লা বললে বোঝায় যে-লোক ধর্মের শুদ্ধমাত্র বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকে, অন্তরে প্রবেশ করে না। অন্য এক কবি এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে গেয়েছেন :

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকুন তাঁরা॥

হাসন রাজা বলছেন, ধর্ম বাবদে আমি এসব "কট মোল্লার মত" (অনুশাসন, ডক্‌ট্রিন, শিবলেথ) গ্রহণ করি না। চোখ থাকা সত্ত্বেও যারা "দিনের কানা" একমাত্র তারাই এ মত গ্রহণ করে। আমি তো দিবান্ধ নই। আমি তো আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার বন্ধুকে (আল্লাকে), আর কট্ মোল্লা তাঁকে না দেখতে পেয়ে শুধোয়, তিনি কই?" (৫) আজল=শেষ বিচারের দিন=কিয়ামৎ=ডে অব্ রিসারেকশন। কট্ মোল্লা ঐদিনের ভয়ে এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সেই ভয়ে তার চোখে এমনই আঁধি লেগেছে যে তার সম্মুখে উপস্থিত আল্লাকে সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু হাসন রাজা তো আল্লাকে বন্ধুরূপে বরণ করেছে, শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে তার কোনো ভয় নেই—বন্ধু কি কখনো বন্ধুকে সাজা দেয়!

✻

হাসন রাজা তাঁর তথাকথিত পাপাচারের জন্য তাঁর গীতে সর্বদাই নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বা পরে জন্মকৃত পাপের ফলভোগের দোহাই দেননি।

"আমি ধরিতে না পারি গো তারে
আমি চিনিতে না পারি গো তারে।
কে রে সামাইল১ আমার ঘরে॥
ধরতে গিয়া পাই না তারে
নড়ে আর চড়ে।২
আন্ধাইর গুন্ধাইর৩ ঘরের মাঝে
হুড়হুড় গুড়গুড় করে॥
কত রংগে ভংগে সে যে
রঙের খেলা করে।
বাজিকরের বাজির মত
খেলে তরে তরে৪॥
জাত্যা জুত্যা৫ ধরলাম আমি
যখন ভুজ্যারে
দেখতে দেখতে দেখি ধরছি
হা স ন রা জা রে!!
হাসন জানে বলে আমি
থাকিতাম হুজুরে।
যেইখানে যাও তুমি সংগে
নাও আমারে॥

(১) সামাইল=ঢুকলো। (২) নড়েচড়ে করে। (৩) আন্ধাইর গুন্ধাইর ঘোরতর অন্ধকারে। (৪) তরে তরে=নানা বেতরো কায়দায়=নানাপ্রকার। (৫) জাত্যাজুত্যা= জোড়েজুড়ে=জাবড়ে ধরে।

✻

হায় হাসন রাজা, তুমি ভেবেছিলে, তোমার জীবনে তোমার সংসারে যেসব পাপাচার অনাচার হচ্ছে তার জন্য দায়ী তোমার কোনো এক দুশমন, বাইরের কোনো লোক। অশেষ কসরৎ করে যখন তুমি তাকে জাবড়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকালে তখন দেখতে পেলে সে তুমি নিজে।

তখন কু হাসন রাজা সু হাসন জানের আশ্রয় নিল॥

সুনির্মল বলত, আচ্ছা, আমরা ত মানুষ, না?

আমি তাকাতাম। সুনির্মল ভুরু কোঁচকাত। একটু থেমে বলত, মাধুরীর জন্যে বড় ভয় হয়, ভারী দুঃখ হয় আমাকে ভালবাসে বলে।

সুনির্মল তাকাত বাইরে। কলমিলতার ফুলের ওপর থেকে দিনের আলো অনেক আগে মুছে গেছে। শিমুলের ডালে শঙ্খচিলের ছায়া নেই। বহুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে সুনির্মল বলত, কাল আমরা ওই নদীর চরে গিয়েছিলাম।

হুঁ।

সূর্যাস্ত দেখলাম।

হুঁ।

আমি ওর হাত ধরে হাঁটছিলাম।

ও।

ও বাড়িতে খাবার ঘণ্টা শোনা গেল। এবং এক সময় ঘণ্টার আওয়াজ সুনির্মলের এই কাহিনীকে ভেঙে দিয়ে থেমে গেলে সুনির্মল আর নতুন করে ঘটনার জের টানছিল না। আর কিছু বলছিল না।

সুনির্মল নিজের ঘরে চলে গেলে আমি সুনির্মলের কথা, মাধুরীর কথা ভাবতাম। আর ভাবলেই মনে হত মিঞাজানের নৌকো অজ নদীর ওপারে নিয়ে গিয়েছিল দিদিমণিকে। কুষ্ঠাশ্রমে। তখন মনে পড়ে যেত দিদিমণির কর্তব্যগুলো। ঈশ্বর, নরক, কাম, মানবিকতা এসবের ব্যাখ্যা শেষ করে নদীর তীরে খানিক দাঁড়াতেন। পায়-ঘাটার পাশে, যেখানে বিভিন্ন বয়সের ছাটা মুখের একটা গণিকা পরিবার দেহের পসরা সাজিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা, জরাগ্রস্ত মুখটার কাছে গিয়ে থমকাতেন—"তুমিও"?

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত বৃদ্ধার, আঁচলে মুখ ঢাকত। চর্মসার পেটটা আঙুল তুলে দেখাত।

খপ করে হাতটা টেনে নিয়ে একটা টাকা হাতে গুঁজে দিতেন মুখ্য সেবাদিদিমণি।

বৃদ্ধার সর্বাঙ্গ কাঁপত থরথর করে। মিঞাজানের নৌকায় এসে বসতেন হেড দিদিমণি।

মিঞাজান হাল লাগাত জলে। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ উঠত। মিঞাজান অন্ধকারে জলের দিকে তাকিয়ে গুন গুন করে গাইত —"মনের চাবি হারাইছি যে কোথায় খুঁজি মিঞা, মাঝদরিয়ায় খুঁজি চাবি বৃথাই যে ডুব দিয়া"।

ঠিক। সেবাপ্রধানার চোখ জলে ভরে উঠত। আরো জোরে হাল মারত মিঞাজান। আরো জোরে গলা তুলত—"মিঞা, বৃথাই যে ডুব দিয়া"।

ছুটেত ছুটতে ঘরে ফিরে প্রতিটি ঘর তাই তদারক করতে। মনের চাবি খুঁজতে কেন কোনদিন হয়ত এ ঘরে এসে দাঁড়াতেন, যে ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে মাধুরী শুয়ে আছে।

কোন কথা বলতেন না সেবাপ্রধানা। পাশের ঘরে চলে যেতেন, যে ঘরে দরবার বসত অলকা, সুনন্দা আর চিত্রা সেবাদিদি-মণিদের। অলকা বাসবদাসির শহরে গিয়ে নিয়মিত সিনেমা পত্রিকা কিনে আনত। দামী এসেন্স। প্রিয় নায়কের ছবি কেটে অ্যালবামে ভরে রাখত। কখনো কখনো এসেন্স ছিটিয়ে দিত। সুনন্দা বলত, নিশ্চয়ই তুই আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে ছবিতে চুমু খাস।

অলকা হাসত। বলত, কাগজের ফুলে গন্ধ নেই। গলা ছেড়ে হাসত অলকা। হেসে হেসে অলকা জড়িয়ে ধরে সুনন্দাকে। বুকের ওপর মুখ রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকত। কেমন একটা খুশীতে অলকা গান ধরত।

চন্দন কাঠের খড়মে খটাখট শব্দ আর সুন্দর গন্ধ তুলে হেড দিদিমণি তক্ষুণে এগিয়ে আসতেন। ধমকাতেন, কী, কতদিন না বলেছি, ওইসব গানের সুর ভাঁজবে না? কেন ভজন গাও, শাস্ত্রসঙ্গীত গাও, কই তা তো গাও না? সেবাপ্রধানা এবার নিজের ঘরে ফিরে যেতেন। সুনন্দা উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে বলত, আচ্ছা অলকা, তোর প্রিয় নায়ককে তোর দেখতে ইচ্ছে করে না?

করে। অলকা বলে, অশোকদা একবার বলেছিল, ওই নদীর চরে নাকি সুটিং হবে। লাভ সিন। স্রেফ গাঁজা।

তোর খালি ওই অশোকদা। এদিকে ত বলিস, তোর অশোকদা মদ খায়, বলিস

না তো কলকাতায় কি হপ্তায় একবার করে কেন ঘুরে আসে? সুনন্দা একটু থামে। বলে, না হয় একটা সিনেমার ম্যানেজার। হুঁ, ভারী তো সিনেমা।

এই, অশোকদা না মাইরী রেস খেলে। অলকা বলে, অথচ দেখ, সুন্দর একটা মন আছে। গল্প লিখে লিখে কাগজে দেয়। আমাকে কবিতা শোনায়। পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতনে যায়। বাউল গান কত ভালবাসে।

হেড দিদিমণি হাঁকে, শুয়ে পড় তিন নম্বর ঘর।

আলো নেবাতে নেবাতে অলকা বলে, খালি শুয়ে পড় আর শুয়ে পড়। তিন সকালে কাকে নিয়ে শোবো। একটা দীর্ঘশ্বাস তুলে অন্ধকারেই বালিশে মাথা রাখে অলকা। শোবো ত শুধু যন্ত্রণা নিয়ে।

সুনন্দা বলে, মাধুরীটা তবু যা হোক করেছে। অন্তত একটা প্রেম ত করেছে জীবনে।

তা ঠিক। অলকা অন্ধকারের ভেতর চোখ বুজিয়ে বলে।

সুনন্দা বলে, ওরা গতকাল নদীর চর গিয়েছিল। মাধুরী বলছিল।

অন্ধকারের ভেতর চোখ খুলে ড্যাবড্যাব করে তাকায় অলকা। ফিসফিসিয়ে বলে, আর কি বলল রে? পেট পর্যন্ত বিছানায় রেখে দুই হাতের ওপর চিবুক রেখে অলকা উঁচু হয়।

গলার স্বর নিচু করে সুনন্দা বলে, সুনির্মল নাকি হাত ধরেছিল।

হা—ত? লম্বা করে উচ্চারণ করে অলকা।

শব্দ না করে অন্ধকারে সুনন্দা হাসে। হাত।

সব কথা মেয়েরা বলে নাকি? অলকা হাতের ওপর থেকে চিবুক সরিয়ে নিয়ে বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শোয়। কোমরের কাপড় আলগা করে দিতে দিতে বলে, নে শুয়ে পড়।

সুনন্দা শোয়। বাইরে জোৎস্না আরো সাদা। হাওয়ায় কেমন শীত শীত ভাব। বাইরে জোৎস্নার ওপর সূক্ষ্ম কুয়াশার রেণু মিশে গেছে। অন্ধকারের ভেতর দুটি প্রাণী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। এক সময় সুনন্দা বলে, তুই ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখিস না অলকা?

দেখি। অলকা বলে, এক এক সময় এত ভাল লাগে। কালই দেখলাম যেন একটা ছবিতে আমি নায়িকার অভিনয় করছি। আমি ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলেছি নায়ককে। জোৎস্নার ভেতর ছুটতে যাব কি, ব্যাস, ডিরেক্টর বলল, 'কাট'। ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি ভোর এসে আমার জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। হেড দিদিমণির প্রভাত বন্দনার স্তোত্র কানে এল।

আমিও দেখি। সুনন্দা একটা নিঃশ্বাস তুলে বলে। কাল ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম। দেখলাম বীভৎস একটা মুখ। যেন রাক্ষসীর মুখ। আমাকে ছুটে আসছে। ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। ওমা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি হেড দিদি-মণি উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছে।

সুনন্দা চুপচাপ শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বলে, আচ্ছা, এই অলকাপুরী তোর ভাল লাগে? অলকা এই অলকা—

না জেগে নেই। একটা নিঃশ্বাস তুলে সুনন্দা পাশ ফিরল। পাশের ঘরেই মাধুরী। মাঝে শুধু পর্দা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে হাওয়া এসে আঁধকারে পর্দাটা দোলাচ্ছিল। এক সময় সুনন্দাও ঘুমিয়ে পড়ল।

এই দিনরাত্রির খেলার ভেতর একদিন নতুন দিন সঙ্গে নিয়ে বৈশাখ এল। রোদের প্রচণ্ড তেজ ছড়িয়ে পড়ল মাঠে, জঙ্গলে। নদীর চরে শিমুলের ডাল থেকে ধুলো উড়িয়ে বাতাস খেলা করতে করতে উড়ে গেল নদী পেরিয়ে। রোদের তেজে বালুকণা তেতে গেলে ঝিঁঝির দল ঝোপের আড়ালে লুকোল। একদিন বৈশাখের এই ভোরে সেবাপ্রধানা আর জাগল না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করল।

সেইদিন ভোরে সুনির্মলের মুখও আর দেখতে পেল না কেউ। এই ঘটনা নিয়ে সেবায়তনের চার দেয়ালের ভেতর আবার ধুলো উড়ল। কেউ বলল, আহা, কত ভাল ছিল হেড দিদিমণি। কেউ বলল, ভালই হল, নিজের লজ্জা নিয়ে নিজে চলে গেল। ও বাড়ির কেউ কেউ কাঁদল। কেউ মুখ লুকিয়ে সমালোচনা করল। শুধু ব্রজদা ধর্মপাল পদাধিকারের লোভে নদী পার হয়ে কুষ্ঠাশ্রমে সেবা করতে যেত।

কিছু ঘটনা, কিছু কল্পনা এক সঙ্গে জড় হয়ে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কেউ বলল, দিদিমণি কত পাপী ছিল, কেউ বলল, সুনির্মল কত অসৎ ছিল। শুধু মাধুরী কিছু বলল না। কোনদিন মুখ খুলে কারো কাছে কিছু বলল না মাধুরী

সেই থেকে দেখতাম, এই অলকাপুরী ছেড়ে, এই সেবাব্রত এবং সভ্য ছেড়ে এক একে সবাই কেমন পালাতে চাইছে। তারপর চোখের ওপর এক সময় পাপপুণ্য, বিদ্রূপ, করুণা কেমন ভিজে ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সব কেমন ভুলে গেল সবাই। শুধু দেখতাম, এক একদিন সাঁকোর ওপর মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন পেছনে ফেলে এসে আজ বয়সের ভারে ঈষৎ নুব্জ। একটু মোটা হয়েছে। কোমরের ওপর গোটা তিনেক ভাঁজ পড়েছে। আমার চোখের ওপর শুধু স্মৃতিগুলো জ্বলত। মাধুরীর স্মৃতি। সুনির্মলের স্মৃতি। দেখতাম সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে মাধুরী সূর্যাস্ত দেখছে। এক একা কোনদিন নদীর চরের দিকে হেঁটে চলেছে। চরে সেই শিমুল আজ নেই। শিমুলের শীর্ণ ডাল বাবুই-এর ঝুলন্ত বাসা টুপ করে খসে পড়ে ভেসে ভেসে ডুবে গেছে একদিন। তবু মরা নদীটা বেঁচে আছে আজও। পুরনো দুঃখের ভেতর তুমি। ধর্মপাল হয়ে ব্রজদা। মাধুরী।

কালিন্দীকূলের সৌরভের ভেতর জোনাকিগুলো জ্বলছে দেখলে ব্রজদা বলত, অনাদি অনন্তকাল ধরে ওই জোনাকিগুলো পিঠে করে বয়ে বেড়াচ্ছে প্রেম। আলোর ভেতর লেখা আছে শুধু কত প্রেমের গল্প, যদি তোমায় পড়াতে পারতুম অনিমেষ?

চোখ দিয়ে জল গড়াত ব্রজদার। অথচ যা হবার কথা নয়। হতে পারে ব্রজদা বৈষ্ণববংশের মানুষ কিন্তু অলকাপুরীর এই আশ্রমের ভেতর পদাধিকারে না ধর্মপাল?

মানুষ সম্বন্ধে তখন অদ্ভুত ধারণা হত আমার। তখন একটা বোধ এই আশ্রম থেকে টেনে যেন রাস্তায় এসে দাঁড় করাত। এই আশ্রম আর পৃথিবীর সঙ্গে তখন কোন প্রভেদ থাকত না। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন এই অলকাপুরী বলে মনে হত। মানুষের ওপর তখন অদ্ভুত ধারণা হত আমার। পৃথিবীর ওপর। নিষ্ঠা, ভালবাসা এ সংসারে কিছু নয়। সেবা, ধর্ম, সংযত ভুরুপের তাস। তসরুফের সাধুভাষা ওগুলো।

তখনো চোখের জল মোছা শেষ হত না ব্রজদার। ডাকতাম, ধর্মপাল—

উঁ।

কেন জানি মনে হয় ব্রজদা, এই সাজানো জগৎ সংসার সব পুরুষগুলো এক একটা মৌচাকের রাজা মাকড়শা, সব নারীই লোভী রানী মৌমাছি।

অপু ও বিভূতিভূষণ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৩২ সালের ১০ই মার্চ অপরাজিত-র শেষ ফর্মা প্রুফ দেখে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'সত্যিই স্মরণীয় দিনটা।...... ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসার এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুনে দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের তিন-ফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েছি।......আজ সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল।...আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করছি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমন দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে ভেবেছেন।—তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা বক্ষে চিন্তা করেছেন।'

বিস্তৃত করে না জানলেও প্রায় সবাই জানে পথের পাঁচালি-অপরাজিত-র নায়ক অপু বিভূতিভূষণেরই ছায়ামূর্তি। যেমন ছায়ামূর্তি শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের, ডেভিড কপারফিল্ড ডিকেন্সের, ফিলিপ সমারসেট মমের। শুধু এরা কেন, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে প্রায় সর্বত্র নায়ক চরিত্রই রচয়িতার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। অন্যান্য চরিত্রের তিনি যদি হন ব্যাখ্যাতা, নায়ক চরিত্রের তিনি রচয়িতা। রচনা নিজের মনের মাধুরী দিয়ে। তাই নায়ক সর্বাধিক তাঁরই। কথাটা ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, তিনি সর্বাধিক নায়কেরই বা নায়কেই। বিভূতিভূষণও সর্বাধিক অপুতেই। পথের পাঁচালি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বিভূতিভূষণ সজনীকান্ত দাসকে যে কপিখানি উপহার দেন তাতে তিনি স্বাক্ষর করেন 'অপু' নামে।

একজন গুণগ্রাহী তাঁকে একদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, অপুর কাহিনী কি সত্যি সত্যি আপনার জীবনী?' তিনি বলেছিলেন, 'কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যে। যেমন শ্রীকান্ত আর শরৎচন্দ্র।' বিভূতিভূষণ নিজেও এক জায়গায় স্বীকার করেছেন, 'সে ছিল অনেকখানিই আমার সঙ্গে জড়ানো।'

কিন্তু কতখানি? বিভূতিভূষণ এক দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 'নভেলে......শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র।' পথের পাঁচালিতে বিভূতিভূষণের শৈশবের সম্ভবত আদিতম স্মৃতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে সরস্বতী পুজোর বিকেলে কুঠির মাঠে হরিহরের সঙ্গে অপুর নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাবার ঘটনায়। সরস্বতী পুজোর দিন বিভূতিভূষণ জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে গিয়েছিলেন। গ্রামের পরিচিত গণ্ডির বাইরে পা দিয়ে বালক বিভূতিভূষণের মনে যে ভাব হয়েছিল তার কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। উত্তর-তিরিশের এক দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, 'কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তর মাঠে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দৌড়ুয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল।'

ছেলেবয়সে বিভূতিভূষণও, অপুর মত, বাবার সঙ্গে কথকতা ও শিষ্যবাড়ি যাত্রা উপলক্ষে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর এই ভ্রাম্যমাণ জীবনে আড়ংঘাটা ঠাকুরবাড়ির স্মৃতি বড়ো গভীর। 'বাবার কণ্ঠে স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো? বাবা আড়ংঘাটা থেকে দেশে জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কই, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেননি।' পথের পাঁচালি-অপরাজিততে এই আড়ংঘাটা ঠাকুরবাড়ির উল্লেখ আছে। বিভূতিভূষণের জীবনের এই প্রথম শোকের ছায়া অবলম্বনে অপুর পিতৃশোকের কাহিনী রচিত। কথকতা উপলক্ষে বিভূতিভূষণ যখন বাবার সঙ্গে হুগলি জেলায় শাগঞ্জ-কেওটায় আসেন তখন সেখানে থাকাকালে তিনি পড়তেন প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায়। বিভূতিভূষণ এই পাঠশালাটিকে পথের পাঁচালিতে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। এটি ব্যতীত আর যে-সমস্ত পাঠশালায় তিনি পড়েছিলেন সেগুলির মধ্যে বনগাঁর কাছে তাঁর স্বগ্রাম বারাকপুরে রাজু গুরুমশায়ের পাঠশালা অন্যতম। এই পাঠশালাটির পরিবেশের প্রভাব যে পথের পাঁচালির প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালার ওপর পড়েছে তা তাঁর দিনলিপি পড়লে অনুমান করা যায়। 'সেই ছেলেবেলায় রাজু গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তে যাবার সময় চারিধারের বনবনে কেমন অজানা দেশ লুকিয়ে থাকত—গুপ্তধনের দেশ যেমনি ঠিক।'

ছেলেবয়স থেকে বিভূতিভূষণের কথক হবার খুব বাসনা ছিল। কিন্তু কথকতা যে করবেন তার শ্রোতা কোথায়? শ্রোতার অভাবে হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে তিনি ইছামতীর নির্জন তীর, ঝোপঝাড় প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করে গল্প শুনিয়ে যেতেন। কোন কোন গল্প আবার এক দিনে শেষ হত না, দিনের পর দিন চলত। বিভূতিভূষণের এই নির্জনে কথকতার কাহিনী অবলম্বনে অপুর কথকতার গল্প রচিত হয়েছে।

অপুর মত বিভূতিভূষণের কাছে বাঁকা কঞ্চি ছিল অত্যন্ত শখের জিনিস। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'বাঁশের কঞ্চির জন্যে আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে।'

ছেলেবয়সে গ্রামে থাকতে বিভূতিভূষণ কখনো একা, কখনো তাঁর বাল্যবন্ধু ভরতের (নামান্তরে ভারতের) সংগে ইছামতীতে ঘুরে বেড়াতেন, সমুদ্র ভ্রমণের বই পড়ে তার স্বপ্ন দেখতেন, স্থানীয় কোন খাল বা বাঁক বইয়ে-পড়া কোন বিশেষ জায়গা বলে কল্পনা করতেন। 'বাল্যে ওইসব বাদলার দিনে কেমন নৌকা বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতেপোতার বাঁক, চট্‌কাতলার খালের নাম রেখেছিলুম Oysterbrook (অস্টার-ব্রুক)—তখন সমুদ্র ভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম। সেই সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো জল।' পথের পাঁচালিতে পটুর সঙ্গে অপুর ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণের কাহিনী বিভূতিভূষণের নিজেরই বাল্যকালের কাহিনী।

পথের পাঁচালিতে অপু যেসব গ্রন্থের সংগে পরিচিত হয়েছে তার একাধিক উল্লেখ বিভূতিভূষণ তাঁর বাল্যজীবন প্রসংগে করেছেন। ছেলেবয়সে অপুকে যে বইটি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে সে বই মায়ের মুখে শোনা মহাভারত। বিভূতিভূষণও বাল্যকালেই এই বইটির সংগে পরিচিত হন। 'ছেলেবেলায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত একবার পড়েছিলুম।' অপু দুপুর বেলায় সতুদের পুকুর পাহারা দেবার পরিবর্তে যেসব বই পড়তে পেত তার মধ্যে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' অন্যতম। এই বইটির একাধিক উল্লেখ বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে পাওয়া যায়। 'মনে পড়ে বহু কাল পূর্বে এই সময়েই শৈশবের সেই 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'জীবন-প্রভাত'।' 'সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখ দুটি ও শিবাজির হাতের কম্পায়মান বর্শা মনে পড়ে।'

পথের পাঁচালিতে অপুর যাত্রা দেখার কাহিনী বিভূতিভূষণের বাল্যকালের গ্রামে যাত্রা দেখার কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

যাত্রাদলে যে ছেলেটি রাজপুত্র সেজেছিল সেই সমবয়সী অজয়কে অপু বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। এই কাহিনীটির উল্লেখ বিভূতিভূষণ তাঁর এক দিনলিপিতে করেছেন। 'যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতে খেতে এল।'

পথের পাঁচালির অপু যেমন বিভূতি-ভূষণের বাল্যকালের, তেমনি অপরাজিত-র অপু তাঁর কৈশোর ও যৌবনকালের ছায়ামূর্তি।

অপরাজিত-তে বিভূতিভূষণের কৈশোরের সম্ভবত আদিতম স্মৃতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে অপুর দৈনিক চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটে আড়বোয়ালের স্কুল করার কাহিনীতে। গ্রামে পড়া শেষ করে বিভূতিভূষণ চোদ্দ বছর বয়সে বনগাঁ হাই স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হন। প্রথম প্রথম তিনি প্রতিদিন ছ' মাইল পথ হেঁটে স্কুল করতেন। তারপর এই বছরেই তিনি অপুর মত স্কুল বোর্ডিং-এ চলে আসেন। অপু যেদিন মনসাপোতা থেকে দেওয়ানপুর স্কুল বোর্ডিং-এ চলে আসে তার আগের সন্ধ্যায় সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনতে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণের জীবনেও ঠিক এমনটি ঘটেছিল। 'সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ি মানিকের গান হল—পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিং-এ এলাম।' থার্ড ক্লাসে পড়ার সময় বিভূতি-ভূষণের পিতৃবিয়োগ হয় এবং বোর্ডিং-এর খরচ চালানো তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেই সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বনগাঁর তদানীন্তন সরকারী ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি গার্জেন টিউটরের চাকরি পান। এই সহৃদয় পরিবারে বিভূতিভূষণ বাড়ির ছেলের মত ব্যবহার পেতেন এবং ভদ্রলোকের কন্যা প্রীতিলতা (ডাকনাম খিনু) তাঁকে খুব সেবা-যত্ন করত। এই সব অংশে অপরাজিত-র পাঠকদের বুঝতে অসুবিধে হয় না অপুর স্কুল-জীবনের কাহিনী বিভূতিভূষণের স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে লেখা। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে খিনু-ই অপরাজিত-র নির্মলা চরিত্রের উৎস।

অপুর কলেজজীবনের গল্পও বিভূতি-ভূষণের কলেজ-জীবনের কত অনুরূপ।

বনগাঁ স্কুল থেকে ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করে বিভূতিভূষণ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (আগে রিপন কলেজ) আই এ ক্লাসে ভর্তি হন। কলকাতার গোড়ার দিকে তিনি মদনমোহন সেন লেনের এক মেস বাড়িতে থাকতেন, পরে মির্জাপুর স্ট্রীটের কলেজ হস্টেলে উঠে আসেন। অপুও কলকাতায় এসে প্রথমে ওঠে পঞ্চানন দাস লেনের এক মেসে, পরে ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র মিলে যে আধা-হস্টেল করেছিল সেখানে সে উঠে যায়। অপরাজিত-তে সুন্দর ঠাকুর নামে এক উড়িষ্যাবাসীর হোটেলে খেয়ে দাম না দিতে পারায় অপুর লাঞ্ছনার যে উল্লেখ আছে তা বিভূতিভূষণের জীবনের ঘটনা। '১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি মির্জাপুর স্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে দিন কতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম—কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।' কলেজে পড়ার সময় সাহিত্য ছাড়া আর যে বিষয়ে বিভূতিভূষণের খুব উৎসাহ ছিল তা ডিবেটিং। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় কলেজের এক বিতর্ক সভায় তিনি 'নূতনের আহ্বান' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিতর্কে অনুরূপ উৎসাহ ছিল অপুর। সেও কলেজের বিতর্ক সভায় যে প্রবন্ধটি পড়েছিল তার নাম 'নূতনের আহ্বান'।

ক্রান্তিত্বের সংগে আই এ পাস করার পর অর্থাভাবে অপুর আর বি-এ পড়া হয়নি। সত্তর টাকা মাইনেতে সে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি নেয়। বিভূতিভূষণও লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে কিছু দিনের জন্যে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। কলেজের লেখাপড়া বন্ধ হলেও বিভূতি-ভূষণের মত অপুরও পড়াশুনোর সংগে সম্পর্ক কোন দিন ছিন্ন হয়নি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি) তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অপুর বিশেষ আগ্রহ ছিল ইতিহাসের ওপর। সাধারণ মানুষের ইতিহাস সে জানতে চায়। এ একেবারে বিভূতিভূষণের মনের কথা। তিনি বলেন, 'গ্রীসের, রোমের যব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই।' ইতিহাসের আর যে রূপে অপু কৌতূহলাক্রান্ত সে রূপ মহাকালের বিরাট মিছিলের। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের

শিক্ষাবিদ্ হুমায়ুন কবিরের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবেও তার খ্যাতি সুবিদিত। তবে মন্ত্রী হিসাবে তার পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ক্যাবিনেট প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দুয়েকটি সার্থক প্রচেষ্টার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সে যখন অসামরিক বিমান বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হয় তখন জেট্-যুগের সূচনা। তার নিয়মই দেখে, জেট্ বিমান চলাচলের জন্য বোম্বাই ও নয়াদিল্লী এয়ারোড্রোম দুটির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ; দমদম বাদ পড়ে গেছে। অজুহাত : টাকা নেই। হুমায়ুনের তুমুল আন্দোলন ও অখণ্ডনীয় যুক্তির চাপে টাকার সংস্থান হয়ে গেল। নইলে জেট্ মানচিত্র থেকে কলকাতা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে মালদহের আম ব্যবসা বন্ধ হবার যোগাড়। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায় তাই সেখানে একটি ল্যানডিং গ্রাউণ্ড চাইলেন। পরবর্তী আমের মরসুমের আগেই তা তৈরি হয়ে গেল। সে যখন বিজ্ঞান গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী তখন ক্যাবিনেটের নীতি ছিল কেবলমাত্র জেলা শহরেই পলিটেকনিক স্কুল হতে পারবে। সেই নীতি পাল্টিয়ে হুমায়ুন ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মফস্বলে, বেড়াচাঁপা ও বিষ্ণুপুরে, পলিটেকনিক খোলায়। তার পেট্রো-কেমিক্যালস মন্ত্রীত্বের সময় ক্যাবিনেট ও কংগ্রেসে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রবল প্রতিপত্তি। তাদের দাবি : দাক্ষিণাত্যে আরেকটি তৈল শোধনাগার চাই। হুমায়ুন চায় হলদিয়াতে। অনেক বাকবিতণ্ডার পরে তার ইচ্ছারই জয় হলো।

হুমায়ুনের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল তার বিরাট হৃদয় ও উদার মানবিকতা। এই প্রসঙ্গে তার কৈশোর জীবনের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। কথাগুলি ঠিক মনে নেই তবে প্রথম পংক্তির মর্মার্থ ছিল : ধুলোয় লুণ্ঠিত সর্বহারা যারা তারাই তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছাত্রজীবনে সে নানা বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। আজকের শ্রমিক নেতাদের অনেকেই যখন ছাত্রাবস্থায় সে তখন ভারতের তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (কলকাতা বন্দর, বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ব্যাংক ও বীমা কর্মী) এর সভাপতি ছিল। দুর্গতদের প্রয়োজন মত সাহায্য করা ছিল তার দৈনিক রুটিনের একটি অঙ্গ। তবে ভিক্ষাদানে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল।

কোনোরকম সংকীর্ণতা হুমায়ুনের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, তা ব্যক্তি বা জাতিগতই হোক বা ধর্মীয়ই হোক। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃষ্টান, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই তার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এই জন্যই ফরিদপুরে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে) তাদের নিবাস হওয়া সত্ত্বেও দেশ বিভাগের সময়ে হুমায়ুন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক না হয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতকেই তার জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তার বন্ধুবর্গ শুধু প্রদেশে নয়, সারা বিশ্বে আজও ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গা ও সমাজে সে নিজেকে স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে নিতে পারতো। হুমায়ুন কবির মানুষকে মানুষ বলেই চিনেছিল, সে-মানুষ কোন্ দেশীয় বা কোন্ দেশবাসী সেটা তার চোখে ছিল একান্তই গৌণ। তাই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি [illegible] ডঃ রাধা-কৃষ্ণন তার সম্বন্ধে বলেছেন...'[illegible] তার উদার মানবিকতাবোধ এবং যেখানে তিনি বাস করেন তার সামগ্রিক উন্নতির সমস্ত চিন্তার কারণ দেখা যায়।' হুমায়ুনের অন্যতম বিদেশী বন্ধু ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল রেনে মাহো, বলেছেন— 'আমার চোখে হুমায়ুন কবির মানবিকতার (হিউম্যানিজম-এর) পূর্ণ প্রতীক। তিনি যেমন প্রাচীন তেমনি আধুনিক; যেমন প্রাচ্যদেশীয় তেমনই পাশ্চাত্যের।...... মানবিকতাবোধের উপর এই গভীর বিশ্বাসই তাঁর ও আমার বন্ধুত্বের মূল সূত্র...... তিনি যা এবং যেমন তার জন্য আমি নিজেকেই ধন্য মনে করি।'

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তার কাছ থেকে নানা সময়ে নানারকমে সাহায্য ও আন্তরিক বন্ধুত্বের নিদর্শন পেয়েছি। যেমন অন্যের কাছে, তেমনি আমার কাছেও প্রতিদানে সে কিছু চায়নি। সে শুধু সকলকে দিয়েই গেছে। আগস্টের প্রথমে একদিনের জন্য কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহে বার বার টেলিফোনে আমার খোঁজ করে। দুর্ভাগ্য যে, তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। আমার স্ত্রী টেলিফোন ধরে কিছু বিশেষ জরুরী কাজ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ও বলেছিল 'না, শুধু দেখা করতাম।' তারপর ১৩ই আগস্ট-এর লেখা চিঠি তার মৃত্যুর পর আমার হাতে এল। তাতে সে লিখেছিল ৩০শে সে আসছে ও তখন আমার সঙ্গে দেখা হবে। চোখে সামান্য একটু অপারেশনের জন্য আনুমানিক ঐ সময়ে আমার হাসপাতালে থাকার কথা। তাই হুমায়ুন লিখেছে সেখানে গিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার দুর্ভাগ্য যে, ইহলোকে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না।

অন্দরের দিল্লী

অনেক খড় পুড়ল। পুড়তে পুড়তে বাঁশ অনেক কিছু ছাই হয়ে গেল। যমুনার ঘোলাটে ময়ূরমেড়ে জল যেখানে ছিল তা সেখানে আর নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্বটাও চুকেবুকে গেছে। ঢাকের বাদ্যি থামলেই নাকি মিষ্টি। অবশ্য ধর্মের ঢাক আপনি বাজল কি না তা বলবেন আগামি কালের যদুনাথ সরকাররা: বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলিকে তাঁরা যখন জুড়ে জুড়ে, একত্র করে দেখবেন তখন ২০শে অগাস্টের

দর্শক

পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখবেন। কি-না বালিটা চোখে পড়ছে আমাদের। রগড়াতে গেলে তাই বাজছে বেশি। তাছাড়া বর্তমানে আমরা শুধু ষড়চক্রেতে মত্ত হয়ে রয়েছি এবং সে-কারণে প্রীতি-অপ্রীতি। সাধারণ লোকেদের হিসেবটাই ক্ষণিকের। গতানুগতিক চেতনা। চতুর্দিকের অবমাননায় আমরা আচ্ছন্ন রয়েছি কি না।

"জ্যাঠামশাই" নাটক দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ থেকে একাংশ। তাতে চরিত্র শচীনের মুখে শুনলাম, 'যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলেই করে। সত্য ভালোবাসে বলে নয়।'

শুনে কোথায় যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠলাম। রবীন্দ্রনাথ যেন পাশে, এই আমার নিকটে বসে ছিলেন। জ্যাঠামশাই। শচীশের জ্যাঠামশাই। অমন জ্যাঠামশাই কেন হতে পারেন না আমাদের সব বড়-রা!

নাটকটি মঞ্চস্থ করছিলেন রাজধানীর শনিচক্র। স্বচ্ছ সুন্দর সাবলীল অভিনয়ের এমন স্বাভাবিক নাটক বহুকাল আমি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি। শনিচক্র কোনো বাইরে থেকে আসা নাটকগোষ্ঠী নয়। এরা এই দিল্লীরই। 'চোখে বালি পড়লে রগড়াতে গেলে বাজে বেশি,' বললেন জ্যাঠামশাই।

কথাটা মনে রাখবার মতন।

*

বড়মাপের ঝকমকানিগুলিকে দেখতে দেখতে অনেক সময় আমরা ছোটমাপের স্নিগ্ধতাকে দেখতে ভুলে যাই। অথচ ছোটমাপের স্নিগ্ধতাগুলিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্থায়ী সম্পদ। তাদের দেখতে দেখতে মনে হয়,—কই এত যে ছিল তা তো আগে জানতাম না।

এখন এই রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পর চোখে পড়ল, আ-রে। এটা যে ভাদ্র মাস। রোদের রঙ গেছে পাল্টে; আকাশটা হয়ে গেছে আগের চাইতে আরো বড়। আর এই বিরাট আকাশটা তো দাম দিয়ে কিনতে হয় না।

বৃষ্টির পর দিল্লীর রাস্তাঘাটে, এভিনু-তে, স্কোয়ারে, এমন কি শ্মশানেও গাছগাছালিগুলিতে রঙবেরঙে কত যে নানাকৃতির তরতাজা টুকটুকে ফুল ধরেছে। বাড়ির উঠোনে টবে ফুলগাছ। তাতে ফুল। ফ্ল্যাটের, অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির ব্যালকনিতে গুচ্ছগুচ্ছ টাটকা ফুল। সড়কের ডাস্টবীনের গা ঘেঁষে ফুল উঁকি মারছে অবহেলিত কোনো চারাগাছ থেকে। খেলার মাঠে লতানে ফুলগাছের বেড়া। বাংলোগুলোয় ফুলের বাহার। পাড়ায় পাড়ায় পার্কগুলোয় তো ফুলের মোচ্ছব। মরসুমী ফুল। সকালে [illegible] শুকিয়ে যায় সন্ধ্যায়। কোনো কোনো ফুল সন্ধ্যাবেলার [illegible] নীল সাদা বেগুনে কালো হলদে। আবার হলদে বাসন্তী সবুজ। [illegible] অন্ত নেই। চোখ জুড়িয়ে যায়। দূর হয়ে যায় সমস্ত রকমের হীনতাভাববোধ।

গাছ থেকে থোকা থোকা পটাপট ফুল ছেঁড়ার বাতিক এখানে বড় একটা চোখে পড়ে না। এমন কি দিল্লীর বাঙালীরাও যখন তখন ফুল তুলে নেয় না গাছ থেকে। তা হোক না কেন রাস্তার বেওয়ারিশ গাছ। কিংবা পাবলিক পার্কের ফুলগাছ। এমন কি সঙ্গে স্ত্রী অথবা বান্ধবী থাকলেও না।

অথচ দিল্লীতে তেমন কোনো ফুলের দোকান নেই। কেমন অবাক লাগে।

রাজধানীতে যা দু-একটি ফুলের দোকান তা শুধু দেবদেবীর মন্দিরের সামনে। পুজোর ফুল। আর আছে দক্ষিণীদের সোজন্যে। ফুল ছাড়া ওদের জীবন কল্পনাতীত। দক্ষিণী বউ-ঝিরা বিকেল হ'ল কি অমনি খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াল। সাদা। কালোর উপর। এই দিল্লীতেও। ওদের দেখে বঙ্গললনারাও খোঁপায় ফুল পরে। তবে বেশ স্টাইল করে। তাতে মানানসই রঙের শাড়ি-ব্লাউজ-চপ্পল। ফুলের রঙে রঙ মিলিয়ে।

যাদের বাড়িতে বসবার ঘর আছে তাদের বসবার ঘরেও ফুলদানিতে ফুলের গুচ্ছ।

(সি ৭৩৪৯)

এমন কি শোবার ঘরেও ফুল। বিছানার শিয়রে ফুল। অবশ্য ফুলের সবচেয়ে কদর আর আভিজাত্য জামা মসজিদ অঞ্চলে। সেই বাদশাহী আমল থেকে। রুটি কিনতে বাজারে এসে তা না কিনে সেখানে অনেকে ফুল কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। ফল আর আতর। আর ধূপবাতি।

ওই অঞ্চলে কারো কারো খানদানি 'পরিবখানায়' এখনো আছে ইরানী গোলাপগাছের ঝাড়। দু'চোখ মেলে চেয়ে দেখবার মতন সব গোলাপ। নীল গোলাপ। সাদা গোলাপ। কালো গোলাপ। এমন কি জাফরান রঙের পর্যন্ত গোলাপ, তরুণীদের বুকের মতন। দেখলে গা সির-সির করে।

তবে সবচেয়ে অপূর্ব গোলাপবাগান রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনে। ওখানে আম-আদমির অবাধ গতি তো নেই হরবক্ত। নইলে দেখতে পেত সবাই হ্যাঁ গোলাপ কাকে বলে। শিরাজি গোলাপ। বাসরাই গোলাপ। ডামাস্কাস গোলাপ। এমন কি তাব্রিজি গোলাপও। সব যেন আগ্রহে অধীর হয়ে রয়েছে। সে এক এলাহি ব্যাপার। প্রতিটি পাপড়িতে যেন ঝরছে কোনো বিগলিত স্মৃতিমন্থরতা। কবিতার মতন।

মন্দিরের দোরগোড়ায় খালি সস্তা দোপাটি আর রাশি রাশি গাঁদাফুল। আর কাঠগোলাপের অনাদৃত পাপড়ি। ওদের দেখে মায়া লাগে। কেউ পোছে না।

ফুলের দিকে বুঝি পাঞ্জাবীদের তেমন নজর নয়। ওদের ভিড় চাটওআলাদের দোকানে, সকাল বিকেল। মেয়েরা কেউ কেউ নাইলনের ফুল খোঁপায় পরে। খোঁপাগুলো যেন কুতুবমিনার। ওদের শাড়ি ব্লাউজে ফুলের ছাপছোপ তেমন নজরে পড়ে না। ফুলের ছাপ সবচেয়ে বেশি দিল্লীতে রাজস্থানী বউ-ঝিদের ঘাঘরায়। বুকের কাঁচুলিতে।

রাস্তার ধারে ধারে, শহরতলির মাঠে মাঠে, যমুনা নদীর তীরে তীরে, এমন কি অলিগলিতেও জামগাছগুলোর ডালে ডালে শক্ত দড়ির মস্ত মস্ত দোলনা ঝুলছে। আর সেই দোলনায় দোল খাচ্ছে রাজস্থানী বউ-ঝিরা। ওদের সর্বাঙ্গে গ্রামীণ পোশাক যা নিত্য ওরা পরে থাকে রাজধানীতেও। পোশাকের রঙগুলি মেটেমেটে এমন উজ্জ্বল যে তা পথচারীর চোখে পড়বেই পড়বে। গান গেয়ে গেয়ে ওরা অনবরত দুলছে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। কোনো কোনো দোলনায় হয়ত একটিই যুবতী মেয়ে। কোনো কোনো দোলনায় দুটি। তো কোনো কোনো দোলনায় একসঙ্গে তিনটি কি সংখ্যায় তারও অধিক। একদল দোলনা ছাড়ে কি অন্য দল তখুনি তাতে এসে জুড়ে বসে। এমনো দোলনা দেখা যায় যার তলাটায় একটি দড়ির খাটিয়া বাঁধা। আর সেই খাটিয়ায় দোলেযে শাড়ির মা মেয়ে বউ সকলে। একসঙ্গে। গান গাইতে গাইতে। সিনেমার গান নয়। গ্রাম ছেড়ে এসেছে, সেই গ্রামজীবনের সুখদুঃখের গান। রাজস্থানে বছরের এইসময় তীজ পর্ব। ওদের সেরা উৎসব। সমস্ত বছরটা ধুধু ধূসরতার মধ্যে ওরা অপেক্ষা করে থাকে কখন একটু বর্ষা নামবে। বর্ষার পর একটু-একটু সবুজ। তাই এখন সবুজের মেলা তীজ রাজস্থানের সর্বত্র। এবং রাজস্থানীরা যে যেখানে থাকে সেখানেও। তাই পুজোআর্চা। তাই অবাধ নাচগান। তাই আনন্দ। মিষ্টিমুখ। ছেলেমেয়েদের জন্য মাটির খেলনা, যেমন আমাদের রথতলায়।

বছরের এই সময় রাজস্থানীরা একরকম মিষ্টি বানায় তার নাম ফিরনি। দেখতে গোল গোল থালার মতন, তবে ঝাঁঝরা। আর রঙটা ঘিয়ে। এই মিষ্টান্ন ওরা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তীজপর্ব উপলক্ষে বিতরণ করে। নিজেরা তো যখন তখন ঘুরেছে-ফিরছে খাচ্ছেই ফিরনি। সমস্ত দেশের সমস্ত মিষ্টান্নের চাইতে এই মিষ্টি তাদের কাছে সুস্বাদু আর তেমনি দামেও সস্তা। ওজনে ফুলের মতন ফিনফিনে হাল্কা। দুধে ফোঁটিয়ে ফোঁটিয়ে খিরে ভাজা। এখন অবশ্য দালদায়।

রাজধানীতে প্রায় এক লক্ষ প্রবাসী রাজস্থানী। ওরা কারো সাতেপাঁচে থাকে না। নিজেদের জীবনে ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওদের নারীপুরুষ সবাই উদয়াস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। ... ওরা গায়ে মাখে না, তাই ... ওদের দেহসৌষ্ঠব চেয়ে দেখবার মত। শরীরের কোনোখানে বাড়তি মেদ নেই। মেয়েপুরুষ সবারই ছিপছিপে গড়ন। ... ওদের কোমরটা এত সরু, যে ... বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ... চলার ভঙ্গীও লঘু।

রাজধানীতে নিত্য নিত্য হাজার হাজার বাড়ি তৈরি হচ্ছে নানাধরনের। সেই সব বাড়ি বানানোর যাবতীয় কাজে এরা নিজেদের আত্মনিয়োগ করে রাখে। কেউ রাজমিস্ত্রি তো কেউ আরো কিছু। আবালবৃদ্ধবনিতা এই গৃহনির্মাণকর্মে সকাল সন্ধ্যা খেটে তো খাচ্ছেই। মেয়েদের কেউ কেউ মাথায় করে ইট বইছে, কেউ ইট গাড়িতে দিচ্ছে, কেউ সিমেন্টের বোরা খালি করছে, কেউ সেই সিমেন্টের সঙ্গে চুন মিশিয়ে মশলা তৈরি করছে। তো কেউ কেউ নম্বরী ইটগুলোকে এক এক করে নিচু থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে উঁচুতে ঠিক একদম রাজমিস্ত্রীর সজাগ হাতের মুঠোয়। ওদের কোলের কাঁখের বাচ্চাকাচ্চারা কর্মস্থলের এদিকে সেদিকে শুয়ে বসে থাকে। শুয়ে বসে চেয়ে দেখে কর্মরত মজুরদের। কিংবা পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

রাজস্থানীরা বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে অন্য সকলে তাতে থাকবে বলে। অথচ ওদের ঘর যেখানে সেখানে বস্তিতে। কোনোরকমে মাথা গোঁজবার ঠাঁই। তবু মুখে ঠোঁটে হাসিটি অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। হাসতে হাসতে হাড়ভাঙা খাটুনিতে কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিতে পারলে তারপর মজা। কষ্ট করে, কিন্তু হাসিমুখে থেকে, টাকা জমিয়ে জমিয়ে শেষপর্যন্ত ওরা যে যার গ্রামে ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে নতুনভাবে ফের সংসার গড়ে তোলে। খেতখামার করে। নগরজীবনের গ্লানি ভুলে যায়। বিকশিত মন যেন তখন ভরপুর। ওদের বাড়ির উঠোনে ফুলগাছ মরুময় গ্রামে ওদের জীবনযাত্রা যেমন সহজ এবং সরল তেমনি আর্টিস্টিক। জামাকাপড়ে যেমন ওদের রঙের বাহার, কি পুরুষ কি নারী, তেমনি বাহার ওদের রাজস্থানী পর্ণকুটিরে। সর্বত্র ওরিজিনাল ছবি নিজহাতে আঁকা। আর্টিস্ট ডাকিয়ে নয়। যারা বাহাদুরি করে বলে বেড়ায়, আমি ছবি বুঝি না, কাব্য বুঝি না তারা বুঝি রাজস্থানীদের চক্ষে সদাই একটি ... অট্টহাস।

মরুময় রাজস্থানীরা যেন খাঁটি ক্যাকটাস-এর মতন কমনীয়।

॥ ৪ ॥

হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছোলো সকাল সাড়ে নটায়। অফিসের সময়, চারদিকে তখন একটা হুড়োহুড়ি কাণ্ড। এক একটা লোকাল ট্রেন এসে থামছে আর বন্যা থেকে গড়ানো জলের মতন লোকজন ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক—চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ—বাস্তু মানুষ, ক্ষেপা মানুষ—দূর পাল্লার ট্রেন থেকে যারা নামছে, তাদের এই সময়টায় দিশে হারা লাগে। লোকাল ট্রেনের অফিসবাবুরা ছুটছে হন হন করে, একে তাকে ধাক্কা মেরে, দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে, এমন কি মেয়েরাও ছুটবো না ছুটবো না মুখ করে আধা-দৌড়োচ্ছে।

অরূপ আর দীপুর সঙ্গে কথা বলছে না, কিন্তু হাঁটছে পাশাপাশিই, ভিড়ে হারিয়ে যায় নি, তার কাছেই টিকিট। এ সময় ট্যাক্সি পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ট্যাক্সির জায়গাটায় বিরাট লাইন ও কটু স্বার্থপরতা। দাঁড়িয়ে থাকা বাস-গুলোর পর পর তিন চারটে পর্যন্ত মানুষে ঠাসাঠাসি, কয়েকটা বাস গজরাচ্ছে ছাড়ার জন্য, কয়েকটা সদ্য ছেড়েছে, ফিরে আসছে অনেকগুলো, এ গলি ও গলি দিয়ে বাস, ডাইনে বাস বাঁয়ে বাস, সটাসট রিকশা, পিলপিল মানুষ, ফেরিওয়ালা, কুলি, ফুরুৎ ফুরুৎ ট্যাক্সি, মাঝখানে অকিঞ্চিৎকর ট্রাফিক কনস্টেবল—সবাই বেঁচে থাকার জন্য পাগল! এরই মধ্যে একটা সামান্য টেম্পো রাস্তার মাঝখানে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে বারোটা দশ বাজোটা ডবল ডেকারকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে ট্রাফিক জ্যাম। বাসের ভদ্র-পোশাকপরা যাত্রীরা টেম্পোওয়ালার উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে, এই শালা হারামীর বাচ্চা...মাইরি নটা চল্লিশ হয়ে গেল...এই কেকাটো—, পরপর দুদিন লাল দাগ পড়ে গেছে...এই সময়টাতে রোজ যত ঝামেলা, ও ড্রাইভার দাদা, মারুন না বাম-তের পেছনে এক ধাক্কা...। চাইবাসা-হলুদপুখরি থেকে এই সময়টার কলকাতায় পৌঁছোলে একটা কর্কশ কঠিন ধাক্কা লাগে। মনে হয় সত্যিই কলকাতা থেকে চাইবাসা অনেক অনেক দূর—সেখানে পৌনে সাতশো টাকায় একটা গোটা পাহাড় বিক্রি হয়।

কর্কশ, আবার একটু আড়চোখে দেখলে কলকাতার এই সব কিছু জড়ানো-মড়ানো গোটা দৃশ্যটা এক হিসেবে মজারও বটে। হাতে সময় থাকলে, এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে—এতগুলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য হুটোপুটির দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ মজা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীপুর এখন মজা দেখার সময় নেই।

কলকাতায় পা দিয়েই সে দারুন অস্থির হয়ে উঠেছে। এখন বাবার কথা ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না। বাবা, মেজদি, দাদা—বাড়িতে ফিরে কি দেখবে দীপু? স্টেশনের বাইরে এসে দীপু অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। অরূপও উদ্বিগ্ন ফেরার জন্য, কিন্তু এক্ষুনি ফেরার কোনো উপায়ই তো নেই। গম্ভীরভাবে সে দীপুকে বললো, বাসে না উঠে তো উপায় নেই...। দুজনেই বাসের চেহারা দেখে নিয়েছে অবশ্য, প্রত্যেক রুটের বাস পর পর চারখানা অন্তত একেবারে গাদাগাদি হয়ে আছে, পঞ্চম বাসে উঠে কি কেউ প্রতীক্ষা করতে পারে—যার বাবা যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে?

যেসব ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে ঢুকছে, আগে থেকে তাদের একটাকে বুক করার জন্য ছুটোছুটি করে ধরতে গিয়ে অরূপ পুলিসের কাছে বকুনি খেল। একজনমাত্র যাত্রীকে নিয়ে বেরুচ্ছে একটা ট্যাক্সি, দীপু প্রায় সেটার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে থামিয়ে যাত্রীটিকে বললো, আপনি কি নর্থে যাবেন? আমার বিশেষ দরকার, আমাকে একটু আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছাকাছি পৌঁছে দেবেন? আমার বিশেষ দরকার

লোকটি কাঁচাটা কায়দা করে ঘুরিয়ে চোখের সামনে এনে ঘড়ি দেখে বললো, না, সরি, আমি সাউথে যাবো।

সান গ্লাস পরা লোকটার চোখ দেখতে পাচ্ছে না দীপু, তবু তার কোনো সন্দেহ নেই, লোকটা মিথ্যে কথা বললো। দীপু আবার কাতরভাবে অনুরোধ করলো, দয়া

করে যদি একটু...আমার বাড়িতে খুব বিপদ...

লোকটি বললো, পঞ্চাশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পেয়েছি—দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার—আপনারাও লাইনে দাঁড়ান না—

দীপু গাড়ির হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিল। এক এক সময় মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেক মানুষের শত্রু।

অরূপ বললো, এখানে ইমপসিবল্—হাওড়া ব্রীজের ওপাশে বরং পাওয়া যেতে পারে! দীপু আর দ্বিরুক্তি না করে সুটকেসটা তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলো। হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে দৌড়োচ্ছে দু'জনে, মাঝামাঝি এসেই হাঁপিয়ে পড়লো অরূপ, কিন্তু দীপুর কোনো হুঁশ নেই। ব্রিজ শেষ হয়ে যাবার পরও সে ছোটা থামায়নি, যেন সে এইরকম-ভাবে ছুটতে ছুটতেই আমহার্স্ট স্ট্রীট পৌঁছে যাবে।

দৈবাৎ বড়বাজারের মোড়টার কাছেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। তিনটি স্থূলাঙ্গী রমণী ট্যাক্সি থেকে নামবার আগেই ওরা দু'জনে দু'দিকের দরজা আঁকড়ে ধরেছে। উঠেই দীপু বললো,

শিয়ালদার চলুন, আমহার্স্ট স্ট্রীট! জোরে চালান! ট্যাক্সিওয়ালা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, ওরা কোনো পলাতক আসামী কিনা!

অরূপ থাকে পদ্মপুকুরে, সে দীপুকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। গত রাত্রের ঝগড়ার জন্য তার মুখ এখনও আড়ষ্ট, তবু এ সময় ওসব মনে রাখার কোনো মানে হয় না, তাই সে এতক্ষণ বাদে একটু সহজভাবে বললো, দীপু, আমিও নামবো তোদের বাড়িতে? থাকবো তোর সঙ্গে?

—না, না, আর দরকার নেই। তুই বাড়ি যা

—আমার এক্ষুনি বাড়িতে না গেলেও চলবে। আমি খানিকক্ষণ

—কোনো দরকার নেই

—তোর কিছু টাকা লাগবে? আমার কাছে এখনও বোধ হয় শ' দুয়েক

—টাকা? কেন?

—এমনিই কাছে রাখা, যদি হঠাৎ লাগে টাগে

—না, টাকা নিলে আমি আর শোধ দিতে পারবো না

বাড়ির গলির মোড়েই দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, মেজদি!

হাতে একটা কফির টিন নিয়ে দীপুর মেজদি একজন ছাতা মাথায় মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। দীপুর দিকে তাকিয়ে বললো, এসেছিস? কোন ট্রেনে এলি?

দীপু ততক্ষণে দরজা খুলে নেমে পড়েছে। মেজদি আবার জিজ্ঞেস করলো, টেলিগ্রামটা পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ। বাবা—

—বাবা বলছিল, টেলিগ্রাম পেলেও তুই আসবি না! আমি ঠিক বলেছিলাম

—বাবা এখন...

মেজদি মুখ ফিরিয়ে ছাতা-মাথার মহিলাকে বললেন, আচ্ছা অনুভাদি, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে দেখা করবো পরে! তারপর দীপুর দিকে ফিরে, ভালো আছে এখন। তোর সুটকেস কোথায়?—মেজদির ঠোঁটের কোণে কি একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল?

অরূপ ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ি ঘোরাবার নির্দেশ দিয়ে জানলা দিয়ে বললো, আমি তা হলে চলি রে, দীপু! দীপুর মেজদি যেন কি রকম, বাবার অসুখের ব্যাপারটার গুরুত্বই দিচ্ছে না। কি রকম অদ্ভুত ধরনের বাড়ি ওদের? ওরকম টেলিগ্রাম পেলেও দীপু আসবে না, দীপুর বাবা ভেবেছিল?

অরূপ বাড়ির সামনে নামতেই বেশ একটা ধরঝরে ভাব বোধ করলো। যেখানেই বেড়াতে যাও না কেন, নিজের বাড়িতে ফিরলে যেরকম আরাম লাগে—! একজন চাকর খুব জল দিয়ে বাড়ির সামনের রকটা মুছছে, অরূপ তাকে একটা আদর-করা ধমক দিয়ে বললো, এই সিধু, ওটা রাখ এখন, সুটকেসটা ধরতে পারছিস না?

বাইরের ঘরে বাবা কথা বলছেন কয়েকজন লোকের সঙ্গে। কয়েক বছর আগেও অরূপ কোথাও বাইরে আলাদা বেড়াতে গেলে, যাবার সময় এবং ফিরে এসে বাবাকে আর মাকে প্রণাম করতো। আজকাল লজ্জা করে। তবু ফেরা মাত্রই বাবার সঙ্গে দেখা করার রীতি এখনও মানে, তাই পাশের দরজা দিয়ে না ঢুকে এলো বসবার ঘরে। রত্নেশ্বর ঘোষাল ছেলেকে দেখেই অন্যদের সঙ্গে কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে তুই এর মধ্যেই ফিরে এলি? দু' সপ্তাহ থাকবি বলেছিলি না?

—আমার যে বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, হঠাৎ তার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে

—ভালোই করেছিস। আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না কয়েকদিন ধরে...

—কি হয়েছে তোমার?

—বিশেষ কিছু না—কোমরের সেই ব্যথাটা, দু'দিন বেরুচ্ছি না বাড়ি থেকে। যা ভেতরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। কোন্ ট্রেনে এলি?

শুধু বাবার কর্মচারী নয়, বাবার বন্ধু-স্থানীয়রাও অরূপের সঙ্গে খানিকটা খাতির করে কথা বলেন। উপস্থিতদের মধ্যে একজন সেই প্রফেসার দাশগুপ্ত, দীপু যার কথা বলেছিল। প্রফেসার দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, ওখানকার ওয়েদার কেমন? গরম পড়ে গেছে, না এখনও ঠান্ডা আছে একটু? সামনের সপ্তাহে আমাকেও একবার জামসেদপুর যেতে হবে!

—না, তেমন গরম পড়েনি। আমি যে বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলুম, তাকে আপনি চেনেন। ডাক নাম দীপু, ভালো নাম দীপাঞ্জন সরকার।

—দীপাঞ্জন সরকার? কে বলো তো?

—আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকে। আপনাদের ফার্মে কিছুদিন কাজ করেছিল—কোথায় একবার স্কুল অডিট করতে গিয়েছিল আপনার সঙ্গে—কাল রাত্রেই ও গল্প করছিল।

প্রফেসার দাশগুপ্তর মুখের একটা রেখাও বদলালো না। বললেন, ওঃ হো, রামমোহনবাবুর ছেলে? রামমোহনবাবুর অসুখ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা ভদ্রলোকের বয়েসও তো হয়েছে। স্বাস্থ্যটি কিন্তু ভালো, এককালে খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। এ ডিভিশানেও খেলেছিলেন মোহনবাগানে

অরূপের হঠাৎ ইচ্ছে হলো, দীপু যে টাকা চুরির গল্প বলেছিল, সেই গল্পটা ভালো করে প্রফেসার দাশগুপ্তর কাছে শুনে নেয়। দীপু নিশ্চয়ই অনেক কিছু লুকিয়েছে।

প্রফেসর দাশগুপ্ত নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, দীপু তোমার কতদিনের বন্ধু?

—চার পাঁচ বছরের।

—ছেলেটি বেশ ভালো। তবে বড্ড ছটফটে। কোনো জিনিসে মন বসাতে চায় না। আমার কাছে আর্টিকলড্ ছিল কিছুদিন, হঠাৎ ছেড়ে দিল। লেগে থাকলে উন্নতি করতে পারতো। তাহলে তোমাদের বেড়ানোটা এবার ইনকমপ্লিট রয়ে গেল?

অরূপ খানিকটা অবাক হয়ে রইলো। দীপু যে বলেছিল অন্য কথা, সেই টাকা চুরি টুরি, প্রফেসার দাশগুপ্ত সেদিক দিয়ে তো গেলেনই না, বরং দীপুর প্রশংসা করলেন! দীপুই মিথ্যে কথা বলেছিল, না উনি বলছেন? অরূপ ঠিক করে ফেললো, পরে এক সময় বাবার সঙ্গে প্রফেসার দাশগুপ্ত বিষয়ে আলোচনা করবে। যে লোক ঘুষ নেয়, তার ওপর তাদের কম্পানির অডিটের ভার দেওয়া কি ঠিক?

অরূপদের বাড়ির সিঁড়িগুলো সাদা রঙের। সারা বাড়িতেই সাদা টালি বসানো। দোতলায় উঠে এলো অরূপ, মা একমুখ হেসে বললেন, ফিরে এসেছিস? ইস্ চোখ দুটো বসে গেছে, রাত্তিরে ঘুমোসনি বুঝি?

অরূপ বললো, রাত্তিরে ট্রেনে ঘুমোতে ইচ্ছে করে না আমার!—বলার সময় অরূপ ভাবলো, মা যদি শুনতো সারারাত্ত ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছে সে, তাহলে মায়ের মুখের অবস্থা কি রকম হতো! মা তো ভাবতেই পারে না—

—যা, তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে নে। তারপর শুয়ে থাকবি। আজ আর বেরোস না কোথাও!

—খাবার দাও, আমি চান করে আসছি।

নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছাড়লো, কিন্তু চান করতে গেল না। নিজের টেবিলে কোনো চিঠিপত্র এসেছে কিনা উঁকি দিয়েই চঞ্চল পায়ে আবার নিচে নেমে এলো। দোতলার এক্সটেনশান টেলিফোনটা তুলেই শুনতে পেল নিচের টেলিফোনে বাবা কাকে

যেন ধমকাচ্ছেন। বাবা বলছেন, মাথা তো কাঁধের ওপর সব মানুষেরই থাকে, কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, তোমার মাথার মধ্যে একটু আধটু ঘিলুও থাকবে!

—না স্যার, আমি তো ভেবেছিলুম বাজাজ সাহেব

—তোমাকে ভাবতে কে বলেছে? তোমাকে আমি যা বলে দিয়েছিলাম...অরূপ টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলো। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার রিসিভার তুললো। বাবা তখনও কথা বলছেন, তোমার ছেলে-মেয়েরা যদি খেতে না পায়, আমি তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করবো, তবু তোমাকে জেলে পাঠাবো আমি

—না, স্যার, এবারকার মতন দয়া করে

—অন্যায় করলেই বুঝি দয়ার প্রশ্ন ওঠে? অত দয়া করতে গেলে আর এত বড় কারবার চালানো সম্ভব নয়।

বাবা খুবই রেগে গেছেন মনে হচ্ছে। এখন বাবা সহজে টেলিফোন ছাড়বেন না। অরূপ তবু টেলিফোনের আশেপাশেই ঘুর-ঘুর করতে লাগলো। স্বপ্নাকে একবার টেলিফোন করতেই হবে।
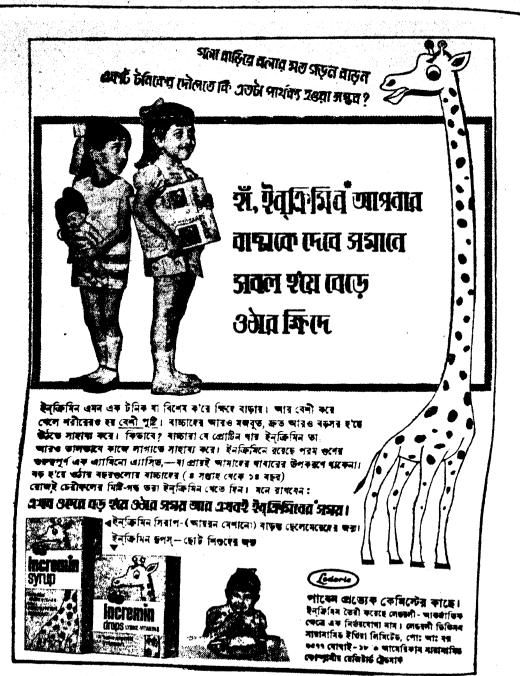
ক্রমশ

মেরিনার—৬ থেকে তোলা মঙ্গলগ্রহের ৩৮ কিলোমিটার ব্যাসের একটি পার্বত্য গহ্বর। গত ৩১ জুলাই মেরিনার—৬ মঙ্গলগ্রহের ৩,৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে কক্ষপথ অতিক্রম করেছিল।

সেই লোহিত জ্যোতিষ্ক

বহুবিতর্কিত সেই লোহিত জ্যোতিষ্ক, সাধারণের কাছে যার পরিচয় লাল তারা বা মঙ্গল গ্রহ, চাঁদের মত হয়ত সেও আমাদের নিরাশ করবে। সম্প্রতি মার্কিন দেশের মানব-আরোহীহীন মহাকাশযান মেরিনার ৬ এবং ৭ মঙ্গলের অনেক কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যে সংবাদ পাঠিয়েছে তার সারকথা : মঙ্গলে চাঁদেরই মত কতকগুলি গহ্বরে ভরা। তার বুকে কোন খালের অস্তিত্ব সে খুঁজে পায়নি। সেখানে অক্সিজেন নেই। সম্ভবত নাইট্রোজেনও। যাদের এতদিন সাগর বলে আমরা চিহ্নিত করে এসেছি তার মাঝখানে এক বিন্দুও জল ধরা পড়েনি। এমন কি, মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের শুভ্র মেঘের মত যে ছায়াকে বিজ্ঞানীরা এতকাল জলকণার সমাবেশ বলে বিশ্বাস করে এসেছেন তারও মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে মেরিনার-৭। মঙ্গলবারের ৫ আগস্টে সে মঙ্গলের দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল থেকে যে মেঘের ছবি পাঠিয়েছে তার প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ শেষ করে বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট লাইটন মন্তব্য করেছেন, এ মেঘ অসংখ্য সূক্ষ্ম বরফের কুচি দিয়ে তৈরি। তবে সে বরফ জলের নয়, কার্বন ডাই-অকসাইডের। যাকে আমরা ড্রাই আইস বলি, তাই।' অতএব মঙ্গলের বুকে আমাদের মত কোন জৈবিক সভ্যতা এখন অলীক কল্পনা।

দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী স্পেনসার-জোনস তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ ইন আদার ওয়ালডস'-এ মন্তব্য করেছিলেন : 'মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিদ-জগৎ যে আছেই সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস, যখন মঙ্গলে গিয়ে আমরা উপস্থিত হব তখন দেখব, সেখানকার জৈবিক সভ্যতা ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রীতিমত বিপরীত পরিবেশের মধ্যে পড়ে যেন খাবি খাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে তার এতটুকু চিহ্নও আর থাকবে না।' শেষোক্ত মন্তব্যটি পড়ে মনে হয়, যখন পৃথিবীতে সবে জীবন-স্পন্দনের শুরু, সেই আদিকাল, অর্থাৎ প্রায় তিন শ' কোটি বছর আগেই সে দেশে উন্নত ধরনের জীব-সভ্যতা বিরাজ করেছে। কালের মন্দিরার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধিকিধিকি সেই প্রাণিজগৎ অন্তিম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে এসেছে। মঙ্গলে যদি এতটুকু জীবনের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে তা হলে এখন তা শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মত। যবনিকার আর দেরি নেই।

বস্তুত মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে সবচাইতে চমকপ্রদ সংবাদ সর্বপ্রথম পরিবেশন করেন ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওভানি সিয়াপেরেলি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ২১ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মিলান শহরের স্বচ্ছ আকাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, মঙ্গলের বুকে তিনি কতকগুলি সরল রেখা দেখতে পেয়েছেন যা সেখানকার লালচে মরুভূমির উপর দিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুটি সাগরের মত অঞ্চলকে যুক্ত করেছে। তাদের সূক্ষ্ম গড়ন দেখে তাঁর মনে হয় ওগুলি খাল, যা মঙ্গলের কোন উন্নত ধরনের প্রাণী কেটে থাকবে। কিন্তু এই ঘটনার পরবর্তী নয় বছর বহু চেষ্টা করেও এবং আরও উন্নত ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়েও ঐ খাল আর কেউ দেখতে পেলেন না।

কিন্তু ১৮৮৬-তে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এস উইলিয়ামস সিয়াপেরেলিকে সমর্থন করে জানালেন, মঙ্গলের বুকে তিনিও নাকি 'খাল' দেখতে পেয়েছেন। ঐ সময়ে লাপলাসের 'কসমোজেনিক ল' বা ব্রহ্মাণ্ডের গঠনতত্ত্বটিকে সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। এতে বলা হয়, গ্রহ হিসেবে মঙ্গল পৃথিবী থেকে পুরনো এবং সেখানে মানুষের চেয়েও উন্নত কোন সভ্যতা বিরাজ করছে। ফলে, তথাকথিত ঐ খাল **সাধারণের মনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি**

করে। এর পরই পি লোওয়েল নামে জনৈক মার্কিন কূটনীতিবিদ সিয়াপেরেলির সঙ্গে পত্রালাপ করেন এবং অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফ মানমন্দির থেকে ৬০ সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে বেশ কয়েকটি খাল পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। ১৯০৯ সাল থেকে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি টিকভ পালকুভো মানমন্দির থেকে একনাগাড়ে অনেক বছর মঙ্গলের প্রতিপ্রকৃতির ওপর গবেষণা চালান। এই সময়ে তিনি সেখানে পৃথিবীর মত ঋতু-চক্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। লক্ষ্য করেন, মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের শুভ্রতা যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন তার চার পাশে ক্রমেই একটি অন্ধকার বেষ্টনী ঘিরে ফেলে। অবশেষে এই অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে আসে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে এবং কখনও কখনও নিরক্ষীয় অঞ্চলও অতিক্রম করে যায়। এ থেকে ধারণা করা হয়, সম্ভবত মেরু-দেশের ঐ শুভ্র অংশ মেঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত বা বরফের আস্তরণ। গরমের দিনে ঐ বরফ গলে জল হয়। সেই জলকেই দূর থেকে অন্ধকারের মত মনে হয়। আর অন্ধকারের বিস্তৃতি মানে, বরফ-গলা জলের বিস্তৃতি। তবে কারোর মতে, ঋতুচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত মঙ্গলের বুকে নতুন গাছপালা গজাতে থাকে এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে। ঐ গাছপালার দরুনই তখন বেশ কিছুটা স্থান অন্ধকারের মত মনে হয়।

বামদিকের ছবিতে মঙ্গলের মেরু অঞ্চল শুভ্র বরফে ঢাকা রয়েছে। ডান পাশে সেই বরফ গলছে, আর তার চারপাশ থেকে একটি কালো বা অন্ধকার অঞ্চল এগিয়ে যাচ্ছে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে। এই ছবি দুটি তুলেছিলেন হেস।

ইতিমধ্যে বি লয়েট নামে জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করলেন। মাত্র কয়েক বছর আগে আলপস-এর তিন হাজার মিটার উপরে অবস্থিত পিক দ্য মিদি থেকে গবেষণা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, মঙ্গলের সেই 'খাল' মোটেই সরল নয়। বরং এবড়ো-খেবড়ো। হেস প্রমাণ করলেন, মঙ্গলে প্রতি কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড করে। এ ছাড়া উত্তর মেরু অঞ্চলে কতকগুলি মালভূমির তিনি ছবি তোলেন, যাদের গড় উচ্চতা প্রায় এক কিলোমিটার।

তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মঙ্গলের বুকে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়ে ১৯৬০ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মঙ্গল সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার : মঙ্গলের বুকে পাঁচ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত যে বেগুনী রঙের বায়ুমণ্ডল দেখা গেছে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জমাট কার্বন ডাই-অকসাইড ভর কেলাস বা ক্রিস্টাল। সেখানে জলের বরফ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। মাঝে মাঝে সেখানে পিঙ্গল বর্ণের যে মেঘ দেখা যায়, অনেকের মতে সেটা হয়ত বালির ঝড়ে তৈরি হয়ে থাকে। এই বালির উপাদান লাইমোনাইট। যা পৃথিবীর খনিজ পদার্থ আকরিক লৌহ ব্রাউন হিমেটাইট বা লোহার অক্সাইডেরই অনুরূপ। কারোর মতে, এই মেঘ নাইট্রোজেনের অক্সাইডও হতে পারে। আর এই নাইট্রোজেন আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব নয়। উল্লেখ্য, মঙ্গলে জীবিত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন জাপানের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টি সাহেক ১৯৫০—৫২ সালে গবেষণা চালিয়ে। এ'র বক্তব্য, ঐ সময় মঙ্গলের বুকে *ইনি নাকি ধূসর রঙের কিছু কিছু মেঘ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। মাঝে মাঝে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। মনে হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ই তারা সৃষ্ট হয়েছিল।*

গত চল্লিশ বছর ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মঙ্গলের আবহাওয়া সম্পর্কে মোটামুটি যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল : মঙ্গলের মাটির বুকের বায়ুচাপ মাত্র ৬৫ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের সমান। অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুচাপের দশ ভাগেরও কম। এর আবহাওয়ার মূল উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড। তারও পরিমাণ পৃথিবীর দ্বিগুণ। সেখানে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম বা নিয়নের মত কোন হাল্কা গ্যাস ধরা পড়ে নি। বলাবাহুল্য আর্গন থাকতে পারে। কিছুটা নাইট্রোজেন থাকাও অসম্ভব নয়।

এ ছাড়া পৃথিবীর থেকে মঙ্গলের তাপমাত্রা গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কম। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা শূন্যের দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি নীচে। সেখানে দিন এবং রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি। উত্তর মেরু অঞ্চলে এই পার্থক্য এক শ' ডিগ্রি, দক্ষিণ মেরুতে এক শ' কুড়ি ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর এক হাজার ভাগের এক ভাগ। অতএব এত শুকনো পরিবেশে জীবনের পক্ষে কি বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব? মঙ্গলের মাটির নীচেও জলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি।

জীবনের মূল উপাদান প্রোটিন। তাদের তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন এবং নাইট্রোজেন। এ ছাড়াও ফসফরাস, গন্ধক এবং আরও কিছু মৌলিক পদার্থ। এই সমস্ত পদার্থের সমন্বয়ে জটিল প্রোটিন অণু তৈরির জন্য জল অবশ্যই চাই। সেই জলই যদি মঙ্গলে না থাকে তা হলে প্রোটিন অণু তৈরির প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ এল লোজিনা-লোজিনস্কির অভিমত : মঙ্গলে প্রোটিন বা নিউক্লেয়িক অ্যাসিড তৈরির মত পরিবেশ নেই। অতএব পৃথিবীর মত প্রাণী সেখানে থাকতে পারে না। তবে পৃথিবীতেই গবেষণাগারে মঙ্গলের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখা গেছে, কোন কোন ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদ ঐ পরিবেশে জীবিত থাকতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণ, নাইট্রিক ব্যাকটেরিয়াম। এরা নাইট্রোজেন আবহাওয়ায় জীবনধারণ করতে পারে। এমনও দেখা গেছে, কোন কোন ব্যাকটেরিয়া লোহার অক্সাইড থেকেও অক্সিজেন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে। আবার 'ইনফিউসোরিয়াল কোলপোডা' নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া তিরিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড থেকে শূন্যের নীচে এক শ' ছিয়ানব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তন হলেও বেঁচে থাকতে পারে। যেহেতু মঙ্গলে দিন-রাত অথবা ঋতুপার্থক্যে তাপমাত্রার ব্যবধান অনেক বেশী, বলা যেতে পারে, সেখানে ঐ ধরনের জীবকোষ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী বা উদ্ভিদ?

বিশেষজ্ঞদের উত্তর : না। অন্তত পৃথিবীর অনুরূপ প্রাণী বা উদ্ভিদের পক্ষে মঙ্গলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ডি এন এ বা আর এন এ উচ্চ পর্যায়ের জীবন সৃষ্টির মূল উপাদান। মঙ্গলের পরিবেশে এরা সৃষ্টি হতে পারে না।

১৯৬৩র ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত দেশ মঙ্গল দর্শনে পাঠালেন 'মারস' মহাকাশযান। ওদিকে মার্কিন দেশ ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৪তে মেরিনার-৪কে পাঠালেন মঙ্গল সন্ধানে। আর মঙ্গল সম্পর্কে যাঁরা আশাবাদী তাঁদেরকে যেন প্রচণ্ড এক আঘাত হেনে বসল এই মেরিনার-৪।

সেই প্রথম মঙ্গলের অনেক কাছ থেকে ছবি তুলে পাঠাল মেরিনার-৪। মেরিনার -এর পর গবেষকদের কাছেও সেই ছবি যেন -ড এক ধাক্কা। কারণ, তাতে মঙ্গলের পিঠে এমন কিছু কিছু অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গেল যেখানে বিগত দু' শ থেকে পাঁচ শ' কোটি বছর পর্যন্ত কেবল প্রাকৃতিক পরিবর্তনই ঘটেনি, পৃথিবীতে জল, বাতাস বা ভূকম্পন যেমন ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তেমন কিছুই ঘটে নি সেখানে।

মেরিনার-৪ এটাও আবিষ্কার করে বসল, পৃথিবীর মত মঙ্গলের উর্ধ্বাকাশে 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'-এর অনুরূপ কোন আচ্ছাদন নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অভ্যন্তরে লোহা, নিকেল প্রভৃতি যে-সমস্ত পদার্থ উত্তপ্ত তরল অবস্থায় রয়েছে, পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে তারা দারুণভাবে আবর্তিত হচ্ছে, ঠিক যেন 'ডাইনামো'র মত। ফলে, নিয়ত সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ। এই প্রবাহ তৈরি করছে চুম্বকক্ষেত্র। সম্ভবত এই কারণেই পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এই চুম্বকের প্রভাব উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীকে যেন একটা আবরণের মত ঘিরে রেখেছে। সূর্য বা সুদূর নক্ষত্র থেকে যে শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি, যার মূল উপাদান শক্তিশালী প্রোটন কণা, নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, তার বেশির ভাগ অংশই বন্দী করে নেয় উর্ধ্বাকাশের এই চুম্বকক্ষেত্র বা 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'। ফলে, তারা প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর বুকে কোন আঘাত করতে পারে না। মঙ্গলে এ ধরনের আচ্ছাদন না থাকায় সেখানে মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ অবারিত। এই রশ্মি প্রাণী-কোষকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব মঙ্গলের বুকে মানুষ বা অনুরূপ কোন প্রাণী বাস করতে পারে না।

আবার পৃথিবীর মত মঙ্গলের আকাশে কোন 'ওজন' গ্যাসের স্তরও ধরা পড়ে নি। ফলে, সূর্য থেকে আগত প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি অবাধে মঙ্গলের বুকে আঘাত হেনে চলেছে। এই পরিবেশে অন্তত পৃথিবীর মত কোন গাছপালার পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কারণ এই রশ্মি উদ্ভিদকোষের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর অর্থাৎ এই মুহূর্তে মঙ্গলে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা মোটেই আশাবাদী হতে পারছি না।

প্রশ্ন উঠেছে : তা হলে সেই খালের কি হল? মঙ্গলের বুকে সাদা থেকে অন্ধকার বা পিঙ্গল বর্ণের মেঘ, এ-সমস্ত তা হলে কি? বিশেষজ্ঞদের উত্তর : 'খাল' আসলে দৃষ্টি-ভ্রম। মঙ্গলের ছবি পৃথিবীর বায়ুস্তরে এসে কেঁপে ওঠার ছবিতে অমন 'দাগ' এর মত রেখার সৃষ্টি হয়েছে। আর তার বুকে বর্ণের পরিবর্তন সম্ভবত কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারই ফল।

তবু অপেক্ষা করতে হবে ১৯৭১ এবং ১৯৭৩ পর্যন্ত। ১৯৭১এ মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বের মধ্যে আসছে। ঐ বছর অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়ে নতুন করে পর্যবেক্ষণ চালানর জন্যে মঙ্গলের আরও কাছে একটি মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন মার্কিন দেশ। আর ১৯৭৩এ তাঁরা পাঠাবেন 'অবজারভার' নামে আরও একটি মহাকাশযান। এটিকে একেবারে মঙ্গলের বুকে নামিয়ে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হবে আমাদের দীর্ঘ কল্পনার বাস্তব রূপটি কি। প্রখ্যাত কল্পকাহিনীকার আর্থার ক্লার্ক ১৯৪৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৬৯এ মানুষ চাঁদে গিয়ে নামবে। আর ১৯৮০র মধ্যে সে অবতরণ করবে অন্য গ্রহে। ক্লার্কের প্রথম ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে। এবার প্রতীক্ষা দ্বিতীয়টির সাফল্যের জন্যে। হয়ত তার মধ্যেই মঙ্গলের প্রকৃত রূপটি আমাদের জানা হয়ে যাবে।

সমরজিৎ কর

সারা ভারতে তারিফ পেয়েছে পানামা

সত্যিই কী চমৎকার সিগারেট! কী অপূর্ব স্বাদ আর সোনালীবর্ণের ভার্জিনিয়া তামাকের কী অপূর্ব গন্ধ! তাই ত' পানামা সারা ভারতের এত প্রিয়। আপনিও একে আপনার একান্ত প্রিয় করে তুলুন।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোঃ, প্রাইভেট লিঃ
বোম্বাই—৫৭

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT (P)-672 Ben.

গোর্কির রাস্তায় ৫৩ নম্বর বাড়ি। বাইরে থেকে একটু রাশভারিই মনে হবে। ভারি পাল্লার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখা যাবে সামনে গোর্কির একটা ছবি, সেই সঙ্গে ক্ষুদ্রলিপি ঃ 'আমি সব কিছুর জন্যই বইয়ের কাছে ঋণী।' বাঁ দিকে ন্যাড়া মাথা মায়াকভস্কির একটা প্রকাণ্ড ফটোগ্রাফ—কিছুটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। ডান দিকে লেনিনের আবক্ষ মূর্তি, শ্বেত পাথরের এক ছুট সিঁড়ি, যেটা উঠে গেছে ওপর তলার প্রেক্ষাগৃহে অথবা সভা কক্ষ। সেটা বড়ো হল ঘর। নিচের তলায় আরেকটি অধিবেশন ঘর, যেটা ছোটো। আরো নিচের তলায় নির্জন নিভৃত কাফে, বিলিয়ার্ড বলের ঘর। মাঝখানের বড়ো হলটায় একটা বড়ো-সড়ো রঙীন টেলিভিশনের সামনে বসে কয়েকজন ফুটবল খেলা দেখছেন। ওদিকে কয়েকজন জমে গেছেন দাবায়। সারি সারি র‍্যাকে অজস্র বই সাজানো। সাধারণত সোভিয়েত লেখকদের হাতে প্রকাশিত বই এখানে থাকার কথা। এবার কিন্তু সাজানো দেখলাম কেবল অনুবাদ, বিশ্বের নানান ভাষায় সোভিয়েত সাহিত্যের যা তর্জমা হয়েছে, তার কিছু নমুনা। একটা র‍্যাক পুরোপুরি ভারতবর্ষের জন্য। তবে ওই হলটায় পৌঁছবার আগে একটি স্তম্ভ পেরিয়ে যেতে হবে, যার নিরাভরণ মসৃণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে গ্রসম্যান, গাইডার, কাপিন, নেমচেঙ্কো প্রভৃতি মস্কোর ৮৩ জন কৃতী লেখকের নাম, গত মহাযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন।

না বললেও চলে যে বাড়িটা এ দেশের কেন্দ্রীয় লেখক ভবন। লেখকেরা নিশ্চয় সর্বত্র, এবং অবশ্যই কলকাতা, প্যারিস বা মস্কোয় আড্ডার ভক্ত। আর আড্ডার জন্যে কোনো অভিজাত রেস্তোরাঁ, কোনো নুকনো কাফে বা অতিথিবৎসল বৈঠকখানা কারো কারো কাছে বেশি বাঞ্ছনীয় ঠেকলেও লেখক ভবনের নিজস্ব রেস্তোরাঁটি নিশ্চয় ভোটে দাঁড়ালে জামানৎ বাজেয়াপ্তির বিপদ ঘটবে না।

এইখানেই কী একটা সাহিত্য সভা উপলক্ষে এসে আলাপ হয়েছিল তরুণ স্থপতি-কবি ভজনিসেনস্কির সঙ্গে। কীতিমটা 'দেশ' পত্রিকায় 'মস্কোর চিঠির' প্রথম প্রবর্তক শুভময় ঘোষের। কবে কোন একটা পত্রিকায় ফোটোগ্রাফ দেখে কোনো জীবন্ত মানুষকে সঙ্গে সঙ্গেই সনাক্ত করার নৈপুণ্য আমার আদপেই নেই। কিন্তু যে কোনো সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সদাই-কৌতূহলী শুভময় আমার দ্বিধা অগ্রাহ্য করেই নিঃসংশয় প্রশ্ন করে বসলেন ঃ 'আপনি নিশ্চয় কবি ভজনেসেনস্কি?'

সবিস্ময়ে দেখলাম যে, আমার চেয়ে অনেক অল্পবয়সী, একটু যেন-বা ঠোঁট চাপা ছেলেটা বললে 'হ্যাঁ,' এবং শুভময়ের সঙ্গে আলাপে মেতে উঠল।

আমার কাছে কিছু সাদা কাগজ ছিল। আলাপ শেষে তারই একটা শিটে ভজনেসেনস্কি লম্বা করে একটা প্যারাবোলা আঁকলেন এবং তার তলে যে দু' ছত্র কবিতা লিখে নাম সই করেছিলেন তার বক্তব্যটা এই রকম ঃ

আমি রকেট, যত দূরেই যাই,
প্যারাবোলার পথে ফিরি পৃথিবীতেই।

ভজনেসেনস্কি হয়ত তখনো ভাবেননি যে দিন কয়েক পরেই তাঁর দেশেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ জয় করা একটা গতিশক্তির রকেট তৈরি হবে যা কোনো প্যারাবোলাতেই পৃথিবীতে ফিরতে বাধ্য নয়।

*

ছত্র দুটো ফের মনে পড়ল লেখক ভবনের রেস্তোরাঁর চার দেয়ালে চোখ বুলোতে গিয়ে। এ এক আশ্চর্য দেয়াল, আড্ডার দেয়াল, তার সর্বাঙ্গ জুড়ে কেবল সরস ও সহৃদয় ব্যঙ্গচিত্র ও শ্লেষোক্তি বা এপিগ্রাম। কনিয়্যাকের পাত্র নিয়ে তর্কে বিতর্কে আলোচনায় উত্তেজনায় লেখকেরা যেসব ছড়া কাটেন, পছন্দসই হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই তুলি দিয়ে এঁকে দেওয়া হয় দেয়ালে। আগে যেসব ছড়া দেখেছিলাম, এবার দেখলাম তার কিছুই নেই, কেননা, কে না জানে, আড্ডার তখুনি শেষ, যখন তা একঘেয়ে।

লোভ হচ্ছে, এই ধরনের দু'একটা চুটকির নমুনা দিই, যদিও জানি অনুবাদে তার আসল মজাটা অনেকটাই মারা যাবে।

যেমন, মায়াকভস্কির এই চার ছত্র উদ্ধৃত করেছেন মিঃ ক্রেভিয়াকভ ঃ

একটা কথা মনে রেখে দিও,
ক্লাবে গেলে বৌকে সঙ্গে নিও—
বুর্জোয়ার নকল করো না—
পরের নয়, নিজের জেনানা!

এস স্মিরনভের একটু সদুপদেশ ঃ

যদি তুমি এ ভবনে এসে থাকো লিখবে বলে, তার মানে এই নয় যে তুমি লেখক।

কবি রবার্ট রজদেস্তভেনস্কির নাম আশা করি আমাদের দেশে তত অজানা নয়। নবীনতর কবিদের মধ্যে ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সুপ্রতিষ্ঠ। ভারতবর্ষেও গিয়েছিলেন কিছু-কাল আগে। তাঁর একটা চিমটি ঃ

'লেখক ভবনে যদি তোমার বিরক্তি ধরে গিয়ে থাকে, তবে জেনো লেখক ভবনেরও বিরক্তি ধরে গেছে তোমার ওপর।'

আর নবীনদের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার কবি ই য়েভতুশেঙ্কো, যাঁর কবিতা তত না হলেও নাম অন্তত বাঙলা দেশের জানা, তাঁর বক্তব্য ঃ

লেখক ভবনে হোক সকলের ঠাঁই,
যে রাজাই, যে রাজাই না, আমরা সবাই,
কারো মুখ চেয়ে কোনো খোশামোদ নাই,
তেমনি হব না কেউ হিংসের কাঁই,
এখানে চলুক গুলজার, রোশনাই,
মনের ভোজনে তৃপ্তি হোক যত চাই,
শুধু—ভুঁড়িটা না যেন বাড়ে ভাই।

বিদেশী অভ্যাগতরাও সম্ভবত এখানে তাঁদের স্বাক্ষর রেখে যেতে গররাজী নন। দা সুরেজা (নাম দেখে মনে হচ্ছে এদেশী নন) লিখেছেন ঃ

পান করা যায় সব কিছু,
শুধু জেনে রেখো যেন,
কোথায়, কখন, কার পিছু,
কতটা এবং কেন।

অন্যান্য বিদেশী এবং চুটকিগুলো অগ্রহী দেখে রেস্তোরাঁর পরিচারিকা অথবা আমাদের পরিচালিকা ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কিছু লিখবেন? লিখুন না।'

অভদ্রের মতো আঁতকে উঠে বললাম, পাগল নাকি! মনে হচ্ছিল সুকান্তর কথা, সুকান্ত ভট্টাচার্য, যে একদা বেলেঘাটার বস্তিতে খড়ি নিয়ে লিখেছিল: দেয়ালে

সেখানে মনের খেয়ালে লিখি কথা। আমি যে যেখানে, পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।'

আমাদের দেশে এখনো কি একটা লেখক ক্লাব গড়ে উঠতে পারল না, যেখানে কলিন্নাক না থাকলেও (থাকবেই বা না কেন?) বর্তমান ও ভবিষ্যত সংকান্তরা সেখানে সেখানে তাদের আড্ডার মেজাজ রাখবে?

*

এবার অবশ্য লেখক ভবনে থেকে হয়েছিল অন্য উপলক্ষে। গত বছর থেকে মস্কোয় সোভিয়েত সাহিত্যের অনুবাদকদের একটি আন্তর্জাতিক সাক্ষাৎকার চালু হয়েছে। এবার হল দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। প্রতিনিধি এসেছিলেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ত্রিশটি দেশ থেকে। আলোচনাগুলো চিত্তাকর্ষক ; যেমন সাম্প্রতিক রুশ সাহিত্যিক ভাষার কী কী বদল ও স্টাইলের দিক থেকে কী কী বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছে, যা হয়ত অনেক সময় বিদেশী অনুবাদকদের চোখ এড়িয়ে যায়। অথবা কবিতা অনুবাদের সমস্যা যা সব ভাষাতেই এখনো একটা অসাধ্য সমস্যা। শেষ দিন পয়লা জুলাইয়ে হল আন্তর্জাতিক সাহিত্য সন্ধ্যা। সভাপতির আসনে সুরকভ,

বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। আর কবিতার খোঁজ পেলেই যারা যে কোনো প্রকারে আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহে জোটে, সেই ধরনের রুশী শ্রোতায় গোটা হল ঘরটা ভরা। তবে আন্তর্জাতিক এই মুশায়েরাকে একটু বিচিত্রই বলতে হয়। জার্মান, যুগোস্লাভ, আর্মানি, ইতালীয় এমন কি আমাদের মালয়ালম ভাষাতেও দুয়েক ছত্র করে কবিতা বা অন্য কিছু শুনতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আসরটা যে শেষ পর্যন্ত একটা বেবেলীয় মিনারের আকার নিল না, তার কারণ সকলেই রুশ ভাষার রসিক। তরুণ মিশরীয় কবি শোনালেন রুশ ভাষায় তাঁর নিজের কবিতা। মায়াকভস্কির সবচেয়ে সার্থক অনুবাদক অ স্ত্রৈ লি য়া ন হুগো-হুগো শোনালেন তাঁর স্বরচিত কয়েকটি ছত্র। আর সাদাচুলো বুড়ো ইংরেজ ওয়াল্টারহেড পছন্দ করলেন কিনা তরুণ কবি ভজনেসেনস্কির কবিতা অনুবাদে আবৃত্তি করতে।

বলাই বাহুল্য, এই ধরনের সভায় কেউ কারো চেয়ে কম করতালি পান না। তাহলেও গী ট্রা গো ট্রা, টিপ-কপালে রোজদেস্তভেনস্কির পর পর কয়েকটা কবিতায় শ্রোতারা যেভাবে সাড়া দিয়েছিল সেটা দেখবার মতো।

আসলে শুধু কবিযশপ্রার্থীদের মধ্যেই নয়, সাধারণভাবেই কবিতা তথা সাহিত্যের প্রতি এদের এমন একটা মর্মস্পর্শী মমতা আছে যাতে মাঝে মাঝে আমার অবাক হতে হয়েছে। এই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে কবির মুখে কবিতা শোনার জন্য স্টেডিয়াম লোকে ভরে যায়। বইয়ের দোকানে কবিতা বা সাহিত্যের বইয়ে ধুলো জমবার সুযোগই হয় না। প্রতি সেকেণ্ডে ৪০টি করে পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশের এই দেশে, গত বছর যার মোট কপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ, বইয়ের এই অভাবিত বন্যার দেশেও নিজের প্রিয় লেখকের হালের বইটি কিনতে যে দুদণ্ডও দেরি করবে, তাকে বঞ্চিতই থাকতে হবে। তাই বই কেনার নিশ্চিত একটা উপায় এখানে হল বই বেরুবার আগেই বই কেনা, ছ' মাস, বছর, দু বছর আগে থেকে প্রকাশভবনে নাম লিখিয়ে, টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করা। লণ্ডনের টিউব ট্রেনগুলোর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই বলছেন: আপিসগামী বা ফেরতা যাত্রীদের সেখানে দেখা যাবে গাড়িতে উঠেই ডাকাতি বা স্নায়ুবিক্ষেপকারী ঘটনার খবরে ভরা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকতে। এখানকার বাস, ট্রলিবাস বা মেট্রোর ওয়াগনে 'প্রাভদা' বা 'সান্ধ্য মস্কো'-পড়িয়ে অনেক দেখা যাবে সন্দেহ নেই, তবু সেই সঙ্গে এমন জন চার পাঁচ ছেলেমেয়ে দেখা যাবে (বলাই বাহুল্য ছাত্র) যারা উন্মত্ত হয়ে কোনো একটা বিজ্ঞান বা টেকনলজির বই পড়ছে, অন্তত দুজনের কোলে উপন্যাস বা সাহিত্যপত্র, আর নিশ্চয় একজন তার পকেট থেকে বার করে প্রিয় কবির পকেট বই সংস্করণটিতে আচ্ছন্ন। কতবারই তো দল বেঁধে মস্কোর উপকণ্ঠে চার আর বার্চ বনে চড়ুইভাতি করতে গেছি আমরা। তার রসদপত্র হিসেবে খাদ্য, পানীয়, সাঁতারের পোশাক, ভলি বল ছাড়াও ইসেনিন কি ইয়েভতুশেঙ্কো, চাঞ্চল্যকর একটা স্মৃতিকথা বা নিতান্তই রুশী লোকসঙ্গীতের একটা বই, কই বাদ পড়তে তো দেখি নি। খুব লম্বা করে টেনে যদি কেউ বলেন যে দলটা হাজার হলেও বুদ্ধিজীবী, তা হলে বলব কি সেই রোগা, বুড়ো, গেঁয়ো পেনসন-ভোগীর কথা, রিয়াজানের এক গণ্ডগ্রামে যিনি আমায় ভারতবাসী জেনে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, ভারতবর্ষের চা-কুলীরা কি সত্যিই অতটা দুঃস্থ?'

মুল্করাজের দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তিনি পড়েছেন।

কিংবা পার্ক কুলতুরির কাছে নতুন খোলা কাফেটার সেই পোশাক-জমাদার। শব্দটা বাংলায় নেই, কেননা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কোনো কাফে, রেস্তোরা, থিয়েটার বা সভাগৃহে ঢুকতে হলে টুপি ছাতা ওভারকোট রেনকোট কোনো একটা আলাদা ঘরে জমা দিয়ে তবে ঢোকার রীতিটা এত অপরিহার্য নয়। বেঁটে, চৌকো, সুচারু শাদা দাড়ি, নীলাভ চোখ, চেহারাটা গত শতকের বুদ্ধিজীবীর মতো হলেও বৃদ্ধের যে কাজ সেটা ওই ওভারকোট নেওয়া আর ফেরত দেওয়া, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যাবে আন-স্কিল্ড্ লেবর। অনেকটা "আমাদের দরোয়ান"। আমার কোটটা নিয়ে চোখ কুঁচকে বললেন, 'আরব?'

'না ভারতীয়।'

'ভারতীয়?' বলে যা বললেন তাতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীও একটু চমকাতে পারে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। জহরলাল নেহরু সম্পর্কে লেখা আমি পড়েছি। বিপ্লবী। মস্ত বড়ো লোক। আমি জানি।'

তিনি যে জানেন সেটা তাঁর সঙ্গে পরবর্তী আধ ঘণ্টা আলাপে নিঃসন্দেহ না হয়ে আমি পারি নি।

অথবা আমাদের সেই ছুতোর, প্রায়ই যে আসে বাড়ির এটা ওটা মেরামত করতে। নাম তার ভোলদ্যা, কোদালের মতো চ্যাপটা চৌকো মুখ, দড়কচা মারা চেহারা, যে কোনো লোকের সঙ্গে যে কোনো ছুতোর মুখোমুখি করতে এতটুকু আপত্তি নেই বলে মনে হবে। একবার কাজের সম্পর্ক শেষ হয়ে সৌহার্দ্য সম্পর্ক শুরু হতেই দেখলাম একেবারে অন্য লোক। কী একটা কথায় যখন হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমিও কবিতা লিখি'। দেখলাম তার ভয়াবহ মুখখানা হয়ে উঠেছে বালকের মতো লাজুক।

"শুনবেন?"

কবিতা সে লিখেছে আমাদের সামনেকার সবুজ অ্যাভেনিউটার গাছগুলো নিয়ে।

শুনলাম তার কবিতা, তবে ঘরে নয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওই গাছগুলোরই তলে বসে। সে কবিতা কোনো কাগজে কখনো ছাপা না হলেও মানুষটাকে কবি বলে মানতে আমি আপত্তি করতে পারি কি?

কাব্য প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা বলি। আমেরিকা থেকে ইউরোপ ঘুরে দেশে যাবার পথে ঢুকে করে একটু মস্কোও দেখে গেলেন। এটা তাঁর তৃতীয়বার মস্কো আসা, অথচ ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় তলস্তয়ের ভবন মিউজিয়মটি তাঁর দেখা হয় নি। সে অভিলাষ এবার মিটিয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে একদিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে একা চলে গেলেন পেরেদেলকিনো গ্রামে। তিনি রুশী জানেন না, ড্রাইভার বা ও জায়গাটার লোকজনেরাও কেউ ইংরেজী জানে না। তা হলেও কিছু ইশারা এবং 'পাস্তেরনাক' এই নামটি করা মাত্র লোকে তাঁকে সমাধিক্ষেত্রটা

দেখিয়ে দিলেন। বড়ো সমাধিক্ষেত্র, তার ঠিক কোন জায়গাটিতে কবির সমাধি, তা খুঁজে পেতেও মুশকিল হল না। অল্প জার্মান জানা একটি লোক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। ওটা কোনো বিশেষ দিন নয়, তা হলেও অমিয় চক্রবর্তীর মতো তিনিও এসেছিলেন কবির সমাধির কাছে দু'দণ্ড দাঁড়াতে।

অমিয় চক্রবর্তী আমার কাছে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। পাস্তেরনাকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ ও পত্রবিনিময় ছিল। তাই তাঁর আসার তাগিদটা বোঝা যায়। কিন্তু, বললেন,

'এই নিরাভরণ একটু সমাধি, অথচ টাটকা ফুলও রয়েছে দেখলাম, কেউ দিয়ে গেছে নিশ্চয়, তার মানে লোকে আসে এখানে, ওঁকে ভোলে নি।'

কবি ও কবিতাকে এরা সত্যিই ভালোবাসে।

*

খুব একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্ম এসে গেল মস্কোয়। প্রতিটি মোড় আর মেট্রোর কাছে মিনারেল ওয়াটার আর সিরাপ জলের যে স্লট মেশিনগুলো এতদিন পর্যন্ত হলদে চোখে মন-মরার মতো দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ ভিড় জমে উঠেছে সেখানে। চাকায় বসানো মস্ত মস্ত লোহার পিপেগুলোর কাছেও লম্বা লাইনঃ রাশিয়ার একটা প্রাচীন, জাতীয় পানীয় 'কোয়াস' ভক্তদের দেখা যাবে এখানে। রুটি এবং নানাবিধ লতাপাতা জারিয়ে তৈরি এই জিনিসটাকে রুশীরা তাদের কালো রুটি, শুঁটকি মাছ আর শক্ত সসেজের মতই ভারি ভালোবাসে। মস্কো নদীর জল এতদিন পর্যন্তও ঝাঁপিয়ে পড়ার মত গরম হচ্ছিল না। আর অবিরাম স্টিমার যাতায়াতের ফলে সে জলে একবার ডুব দিয়ে উঠলে সাদা গায়ে পেট্রলের কালো প্রলেপ ধারণের বিপদ যথেষ্ট থাকলেও এই উদ্দাম খোলা নদীটায় বছরে মাত্র দিন তিনেকের মতো ঝাঁপাঝাঁপি করে নেওয়ার সুখ কি আর কোনো কৃত্রিম সুইমিংপুলে মেলে? তা ছাড়া কাছেই যে লেনিন পাহাড়, রৌদ্রলোভীদের শ্রীক্ষেত্র। গোটা পাহাড়টা একেবারে নদীর তট পর্যন্ত ভরে উঠেছে নরনারীর সাদা দেহে। যথাসম্ভব খালি গায়ে রোদ পোয়াচ্ছে সবাই। বছরের এই ক'টা *দিন যে যত রোদে পুড়ে যত বেশি তামাটে হতে পারবে, ততই তার কাছে সার্থক মনে হবে গ্রীষ্মটা। গ্রীষ্ম মানেই ঘর ছাড়ো, ছোটো, এসো বনে, পাহাড়ে, নদীতে।*

অন্য রকম ডাকাডাকিরও অভাব নেই। গ্রীষ্ম মানেই যত রকম প্রদর্শনী আর প্রতিনিধি। এই মুহূর্তে দেখার মতো তিনটে ঘটনা চলছে একই সঙ্গে; জনগণের পোল্যাণ্ডের ২৫ বছর প্রদর্শনী, আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, প্রাচীন রুশ শিল্পের প্রদর্শনী। নিজেকে অনধিকারী বলে যদি নিশ্চিত না জানতাম, তা হলে আশ্চর্য সব রুশ আইকন ও অন্যান্য শিল্পের এই শেষোক্ত প্রদর্শনীটি নিয়ে কিছু অর্বাচীন উক্তির দুঃসাহস করা যেত। তাই বরং এ গ্রীষ্মের সবচেয়ে ঝলমলে ঘটনা মস্কো ফিল্ম উৎসবটার কথা একটু বলি। রোসিয়া হোটেলটার লাউঞ্জে এ কয় দিন যেন পরীর হাট বসেছিল। ঢুকবার মুখে পেখমের মতো ঝলমল করেছে ৭০টি দেশের পতাকা আর অটোগ্রাফলোভী গোটা কিশোর মস্কোর জুলজুলে মুখ। তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য হাতে লাল ব্যাণ্ড বাঁধা স্বেচ্ছাসেবকদের হয়রান হতে হয়েছে কম নয়। মূল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের ছবি দাঁড়াতে না পারলেও অরুন্ধতী দেবীকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হয় নি। সোভিয়েট নারী কমিটির কাছ থেকে তিনি সম্মানপত্র পেয়েছেন। এখানকার খবরের কাগজগুলোয় তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছিল ভারতের প্রথম নারী চিত্রপরিচালক হিসেবে। দেখা হতে বললেন, 'ওদের এ ভুলটা আমি বার বার শুধরে দিয়েছি। আমি প্রথম হতে যাব কেন?'

এই প্রসঙ্গে আলাপ হল ঢাকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। সালাহউদ্দিন, হাসান ইমাম, আনোয়ার সাহেব পুরস্কার না পেলেও তারি খুশি যে পূর্ব বাংলার ছবি দেখিয়ে যেতে পারলেন। নিজেদের সমস্যার কথা বললেন। বছরে ৩০টা করে ছবি তোলা হয়, কিন্তু শহরে সিনেমা হল কম। উর্দু ছবির প্রতিযোগিতা কাটিয়ে উঠেছেন ও'রা, কিন্তু দর্শকের সমস্যা মেটে নি। সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় গাঁয়ের মানুষ। তাই গাঁয়ের মানুষের প্রিয় রূপকথাগুলোকেই ও'রা চিত্ররূপ দিচ্ছেন। প্রদর্শন সময়ের ৭৬% ভাগই লোককাহিনী।

কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে এর একটা ভালো ফলই ফলবে।

আগেই বলেছি, কিশোর মস্কোর কাছে ফিল্ম উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল তারকারা। তবে চাঁদের কাছে তারকার দ্যুতি আর কতটুকু? আর উৎসবের ঠিক মধ্য জোয়ারেই যখন সেই চাঁদের বুকে মানুষের পদপাত আসন্ন হল, তখন সারা দুনিয়ার মতো গোটা মস্কোও সব ছেড়ে ছুড়ে দুরুদুরু বুকে বসে থেকেছে *টেলিভিসনের সামনে। আশ্চর্য সেই দৃশ্যটা দেখলাম আমরাও। চাঁদের ওপর মানুষ, মনে হল যেন হাঁটছে না, প্রায় ভাসছে।* পোঁতা হল আমেরিকার পতাকা......তবে ভারতের পাঠকদের কাছে তো তা সবই জানা। তা সত্ত্বেও পুনরুক্তি করার প্রয়োজন বোধ করলাম এই জন্য যে কাগজে দেখলাম, প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন যে, দৃশ্যটা সারা দুনিয়া দেখলেও রাশিয়া দেখে নি। খোঁচা দিতে হলে কি মিথ্যেই বলতে হবে?

জয় হোক জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের! প্রাভদায়, ইজভেস্তিয়ায়, রেডিওতে টেলিভিসনে ভারতের ইদানীং কালের আর কোনো আভ্যন্তরীণ ঘটনাকে এত বড়ো করে এত বেশি কলম আর মিনিটে এত নিনাদিত হতে আর কখনো দেখি নি।

ননী ভৌমিক

(একুশ)

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট কথা বলে পাশ ফিরল শাশ্বতী। মৃদু একটু হাসল স্বপ্নের ভিতরে।

হৈমন্তীর গায়ের ওপর তার পা। হৈমন্তী ঠেলা দিয়ে বলল—এই, ঠিক হয়ে শো, আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিচ্ছিস।

শাশ্বতী ঘুমের মধ্যেই তাকায়, তারপর বিড় বিড় করে অস্পষ্ট কথা বলে একটু। বোধ হয় বলে, তোমরা সবাই শাশ্বতীকে ক্ষমা কোরো। আমি কি ছাই বুঝি আমার মন! তোমাদের কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি—ক্ষমা কোরো।

পরদিন সকালে শাশ্বতী ভাবল, খুব শীগগীরই সে একদিন ললিতের সঙ্গে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করবে—এতে আপনার কী স্বার্থ ছিল? কেন আপনি এমন কাজ করলেন?

ললিতের সঙ্গে ঝগড়া করার মতো অনেক কথা শাশ্বতীর মনে পড়ে। কেন আমাকে কেউ মন বোঝার সময় দিল না! ধরে বেঁধে নিয়ে গেল ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে! কী স্বার্থ তোমার, ললিত! না, অত পুরুষ মানুষ নিজে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে যেও না শাশ্বতীকে। বরং তাকে আর একটু সময় দিও। আর একটু মায়া করো শাশ্বতীকে। শাশ্বতী কি ছাই বোঝে তার মন! আর তুমি! শুনেছি, কাল টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাতে তোমার হাত কেঁপেছিল, তুমি দু আঙুলে সিগারেট ধরে রাখতে পারছিলে না। তুমিও তো জানতে না, ললিত, তুমি কী করে ফেলছ! তবু তুমি জোর করে কেন ঘটাতে চাইছিলে ঘটনাটা! তোমার মায়া দয়া নেই।

শাশ্বতী কলেজে যাবে কিনা তা ভেবে একটু ইতস্তত করল। আজ তার কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না। শিবানী এসে বলল—আজ কলেজে যাবি না? এস বির ক্লাসে আজ পলিটিকসের নোট দেবে।

—তাহলে যাই চল।

অনিচ্ছায় তৈরী হয়ে নিল শাশ্বতী।

বাসে বসে শিবানী জিজ্ঞেস করল—তুই তো কলেজ থেকে রোজ কাটিস—কাল কেটেছিলি?

—হুঁ—উ।

—কোথায় গিয়েছিলি? সিনেমায়?

শাশ্বতী উত্তর দিল না।

—খুব উড়ছিস! শিবানী দুঃখ করল, নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আর দ্যাখ, অলক যে সেই চাকরি করতে গৌহাটি গেল, একটা চিঠি পর্যন্ত দিল না। পুরুষ মানুষদের বিশ্বাস নেই।

শাশ্বতী চুপ করে রইল।

কলেজের স্টপেজ এসে গেল। নামবার জন্য বাসের পা-দানিতে নেমে একটু মুখ বাড়াতেই শাশ্বতী দেখতে পেল কলেজের লনের মোড়ে বকুল গাছটার তলায় লম্বা রোগামতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে গতকাল ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে অদিতি অপেক্ষা করছিল।

ঐ লম্বা লোকটা কি অদিতি? দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না। তবে অদিতি হওয়া অসম্ভব নয়।

শাশ্বতী পিছিয়ে এল, বলল—আমি নামবো না।

—সে কী?

—না। শাশ্বতী মাথা নাড়ল—আমি একটু অন্য জায়গায় যাবো। কাজ আছে।

—কোথায়?

কোথায় তা শাশ্বতী তাড়াতাড়িতে ঠিক করতে পারল না, বলল—আছে।...তুই পলিটিকসের নোটটা আমাকে দিস, আমি টুকে নেবো।

আবার বাসের মধ্যে ফিরে এসে বসল শাশ্বতী। পয়সা বের করে কণ্ডাকটরকে বলল—আমি রাসবিহারীর মোড়ে নামব।

মনে মনে ঠিক করল শাশ্বতী যে রাস-বিহারীর মোড় থেকে ফিরতি বাস ধরে বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু রাসবিহারীর মোড়ে এসে তার খেয়াল হল, এখান থেকে দক্ষিণ মুখো কিছুটা গেলেই ললিতের বাসা। ঠিকানা জানে না শাশ্বতী, কিন্তু বাড়িটা তার মনে আছে। তার মনে গতকালের রাগটা থাকতে থাকতেই বোঝাপড়াটা মিটিয়ে আনা ভাল। বেশী দেরী করার দরকার কী? বেশীক্ষণ রাগ থাকে না শাশ্বতীর, সহজেই গলে জল হয়ে যায়।

দক্ষিণদিকে উনত্রিশ নম্বর ট্রাম যাচ্ছে ফাঁকা। শাশ্বতী উঠে পড়ল।

কাল রাত থেকেই ললিতের মায়ের মনে একটা সন্দেহ ঢুকেছে। এই যে রমেন নামে ছেলেটা এসেছে ললিতের কাছে, এ ছেলেটার রকমটা কী? কাল রাতে যখন এল তখন ধুতিতে রক্তের দাগ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা ফতুয়ার মতো হাতকাটা পাঞ্জাবি। সাজে পোজে দীন-দরিদ্র। কিন্তু মুখখানা দেখে মনে হয় বড় ঘরের ছেলে। বড় সুন্দর মুখখানা। চেনা-চেনা লাগছিল, কিন্তু চিনতে পারেননি তিনি। ললিত বলছিল বটে—রমেন এ বাসাতে অনেক এসেছে মা, ওকে তুমি কতবার দেখেছো। কিন্তু আজকাল চোখে একটা ঘোলা-ঘোলা ভাব—কোনো কিছুই ঠিকমতো নজরে আসে না। তা ছাড়া কতদিন আগে দেখা—অত কি মনে থাকে।

সে যাই হোক, কিন্তু ললিত বলছিল ছেলেটা নাকি সন্ন্যাসী ধরনের, আশ্রমে থাকে! এটা শোনার পর থেকেই মনটা কেমন খচ খচ করছে। এই সন্ন্যাসী ছেলেটা ললিতের কাছে কেন এসেছে! কী দরকার! বড় ভয় করে ললিতের মায়ের। এ ছেলেটা আবার তুক করে যাবে না তো ললিতকে!

একেই তো ললিত উদাসী ছেলে, আধা-সন্ন্যাসী হয়েই আছে।

কাল রাতে এক বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওরা দুজন কথা বলছিল। কী যে অত কথা ওদের! ললিতের মা অনেক চেষ্টা করেছে শুনতে। কিন্তু গুন গুন শব্দ, হাসি, দেশলাই জ্বালাবার শব্দ ছাড়া কিছু কানে আসেনি। সারা রাত জেগে ঐ ছেলেটা যেন কী সব বুঝিয়েছে ললিতকে।

ললিতের জন্য বড় ভয় করে মায়ের। সেই কবে একটা মাস্টারীর চাকরি জুটিয়েছিল ললিত, এখনো তাতেই রয়ে গেল। উন্নতির কোনো চেষ্টা নেই। শুয়ে বসে সময় কাটায়, ডাক্তারের দোকানে গিয়ে আধেক দিন কাটিয়ে আসে। এই বয়স—এখন ছোটাছুটি করে, উদ্যোগী হয়ে কত কিছু করে ফেলত মানুষে। তা করবে না, কিছু বললেই বলে—আমরা তো দুজন, ঠিক চলে যাবে। বাপের স্বভাব। ওর বাপ সারাটা জীবন খেলা-খেলা করে পাগল ছিল, বাড়ির মানুষকে চিনতেই পারত না। সে লোকটা সারাটা জীবন কেবল আপ্তবাক্য বলে গেল—পয়সাকড়ি দিয়ে কী হয়। ছুঁচের ফুটো দিয়ে বরং হাতি গলে যাবে, তবু কোনো বড়লোক স্বর্গে যায় না। বাপ ছেলের দুজনেরই ধারণা যে বড়লোক হওয়াটার মধ্যে কিছু নেই। তার চেয়ে এই ভাল, যেভাবে চলছে চলুক। ললিতের বন্ধুরা ওর মতো বোকা নয়, তারা সময় থাকতে যে যারটা গুছিয়ে নিচ্ছে। ললিতটাই মুখ-চোরা। কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে পারে না, কেড়েকুড়ে আনতে পারে না নিজের ভাগেরটা। অথচ খুব অহংকারী। দেশের বাড়িতে যখন হরির লুট পড়ত, তখন ললিত দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। ওর চোখের সামনে অন্য সব ছেলেমেয়ে মাটিতে পড়ে কাড়াকাড়ি করে বাতাসা কুড়োতো। ও পারত না। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে এমন ভাবখানা করত যেন ওসব ছোটোলোকির মধ্যে ও নেই।

ললিতের এ বন্ধুটা একটু অন্য রকমের। বিবাগী ছেলেদের বড় ভয় ললিতের মায়ের। কী কথা হয়েছিল ওদের কাল রাতে? একেই বুড়ি নাচুনী, তার ওপর আবার ঢাকের বাদ্যি।

সকালে ললিত বাথরুমে গিয়েছিল, সে সময়ে রমেনকে একা পেয়ে ললিতের মা এসে বলল—বুঝলে বাবা, ললিতের তো সংসারে মতি নেই, তুমি ওকে একটু বুঝিও তো! দেখো যেন ওর আর একটু লোভ-টোভ হয়, টাকাকড়ির দিকে ঝোঁক আসে। আর দেখ ও মেয়েছেলে দেখলে চোখ তুলে তাকায় না—কিন্তু এ বয়সে ওরকম স্বভাব কি ভাল? তরতাজা বয়স—এ বয়সে বয়সের গুণ থাকবে না? তুমি দেখো তো বাবা—

—দেখবো মাসীমা। ছেলেটা ঘাড় নেড়ে বলল।

—হ্যাঁ দেখো, ওর যেন সংসারে মন হয়। আমি ওর জন্য মেয়ে খ্‌ুজছি।

চা-টা খেয়ে ওরা দ্‌ুজন বেরিয়ে যাচ্ছিল, ললিতের মা জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছিস?

—এই কাছেই। গণেশের দোকান, বিমানের বাড়ি—কাছাকাছিই থাকবো।

আড্ডা! আড্ডা! কতকাল পরে এসেছে রমেন! আজ কেবল আড্ডার দিন। চায়ের দোকানে, রকে, মাঠে। সঞ্জয়কে খবর দেবে ললিত, তুলসীকে ডাকিয়ে আনবে—তারপর গোল হয়ে বসবে সবাই...প্‌ুরোনো দিনের কথা হবে কত, গা শিউরে উঠবে রোমাঞ্চে...

কিন্তু মাঝে মাঝে ব্‌ুকের ভিতরে কী একটা ধাক্কা ওঠে। আর কত দিন! কতদিন আর! সে মরে যাওয়ার পরও আড্ডা চলবে এখানে। ঐ গণেশের দোকানে, রায়বাব্‌ুদের রকে, মাঠে, ঘাটে। হ্যাঁ, তখনো অবিকল একরকম থাকবে কলকাতা। তুলসী হাঁট্‌ুর ওপর ধ্‌ুতি তুলে স্কুলে যাবে, সঞ্জয় গাড়ি চালিয়ে ফিরবে তার রিনি আর পিকল্‌ুর কাছে, আর উত্তদিনে হয়তো আবার ভাবসাব হয়ে যাবে আদিত্য আর শাশ্বতীর—ওরা দোকানের আলোর ফ্‌ুটপাথ ধরে অনির্দিষ্টভাবে অনেক দ্‌ুরে হেঁটে যাবে.

প্‌ৃথিবীর বড় মায়া। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।

কাল রাতে এক বালিশে ম্‌ুখোম্‌ুখি শ্‌ুয়ে রমেনকে সব কথা বলে দিয়েছে ললিত। শ্‌ুনে রমেন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে—তব্‌ু তো তোর এখনো ছ মাস কি এক বছর সময় হাতে আছে! এর মধ্যেই তোর সব সাধ প্‌ুর্ণ হতে পারে... এইরকম সব কথা।

দ্‌ুর। ললিত জানে, ধর্মে অনেক আজগ্‌ুবি আশ্বাস থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শেষেও লেখা আছে একশবার চণ্ডীপাঠ করলে দ্‌ুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সেরে যায়। আসলে ওসব গ্‌ুল, চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য লোককে লোভ দেখানো। আসলে ওসব কিছ্‌ুই হয় না। তব্‌ু কেমন যেন লোভ হয়। একশবার চণ্ডী পাঠ করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

কাল রাতে রমেনের কথা শ্‌ুনতে শ্‌ুনতে কেমন একটা আশা ভরসা নিশ্চিন্তির ভাব এসেছিল তার মনে। রমেন বলছিল—এই যে এতকাল ধরে তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর তুই প্‌ৃথিবীতে বেঁচে আছিস এর কোনো দাম আছে? এতকাল ধরে কী করেছিস তুই? চা খেয়েছিস, আড্ডা মেরেছিস, অনিচ্ছায় করেছিস দায়সারা এক চাকরি—এরপর হয়তো একদিন বিয়ে করতি, ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে অভাবের সংসারে টেনেট্‌ুনে চলতি আরো কিছ্‌ুদিন—তারপর অজান্তে একদিন দ্‌ুম করে মরে যেতি। দ্‌ুর! ঐ কি জীবন? তার চেয়ে এই তো ভাল—এখন তোর জানা আছে ম্‌ৃত্যুর সময়, হাতে আছে হিসেব করা দিন। বেঁচে থাকার এই তো ঠিক সময়—। ললিত উত্তর দিয়েছে দ্‌ুর! তুই ধর্মকর্মের কথা বলছিস—ওতে কিছ্‌ু আছে নাকি! কেমন কথা! শ্‌ুনে রমেন তার গায়ে হাত রেখে বলেছে—ললিত, আমি যে কথা বলতে চাই, সেটা একমাত্র তুইই ব্‌ুঝবি। কেননা তোরই একমাত্র আছে ভয়াবহ এক দ্‌ুঃখ। আয়্‌ু ফ্‌ুরিয়ে এলে মান্‌ুষ খ্‌ুব স্পর্শকাতর হয়, সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে সাতদিনে একশ বছরের জ্ঞান লাভ করে চলে যায়।

নিতান্তই মাম্‌ুলী কথা। তব্‌ু কেমন ব্‌ুক ভরে ওঠে। কাল রাতে রমেনের কোল-ঘেঁষে শ্‌ুয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘ্‌ুমিয়েছে ললিত। মাঝে মাঝে ঘ্‌ুম ভেঙে গেছে, অন্ধকারে পাশ ফেরার সময়ে সে অস্ফ্‌ুট গলায় ডেকেছে—রমেন! সংগে সংগে উত্তর পেয়েছে—জেগে আছি। বল। না কিছ্‌ুই বলেনি ললিত। সে কেবল সারারাত ধরে মাঝে মাঝে জেগে উঠে নিজের অজান্তে রমেনকে খ্‌ুঁজেছে। রমেন কাছে আছে, জেগে আছে জেনে আবার নিশ্চিন্তে ঘ্‌ুমিয়েছে।

ললিত সকালবেলা রমেনকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুই কাল রাতে ঘ্‌ুমোসনি?

—না।

কেন?

রমেন একট্‌ু মিষ্টি হাসি হেসে বলল—কেমন যেন মনে হয়েছিল রাত্রিবেলা ঘ্‌ুম ভেঙে গেলে তুই আমাকে খ্‌ুঁজবি।

লজ্জা পেয়ে ললিত বলে—তার জন্য ঘ্‌ুমোসনি? তুই কী রে শালা, অতদ্‌ুর ট্রেন জার্নি করে এলি—তোর টায়ার্ড লাগছিল না?

রমেন মাথা নেড়েছে—না রে। এমনিতেই আমি কম ঘ্‌ুমোই। আমার দিন তোদের দিনের চাইতে অনেক বড়।

যে রমেন চলে গিয়েছিল—ললিত জানে—সে রমেন ফিরে আসেনি। এ যেন অনেক দ্‌ুরের একটা মান্‌ুষ। কোন রহস্যময় অচেনা জগৎ থেকে এসেছে। এ হয়তো এমন কিছ্‌ু জানে যা ললিতের এতকাল জানা ছিল না। যে রমেন গাড়ি চালাতো, সাঁতার দিত, ফ্‌ুটবল খেলত কিংবা পিয়ানো বাজিয়ে গাইত গান, আর যে রমেন ললিত খ্‌ুজবে বলে সারা রাত জেগে থাকে তারা কত আলাদা!

রমেন কাল সারা রাত তাকে ব্‌ুকের মধ্যে নিয়ে শ্‌ুয়ে ছিল। সে কথা ভেবে সকাল-বেলা আবেগে ললিতের একট্‌ু ঠোঁট কাঁপে। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে রমেনকে। হ্যাঁ, একে বলা যায়। এ বোঝে।

তার ব্‌ুকের মধ্যে গ্‌ুরগ্‌ুর করে ওঠে একটা কথা। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—লাখ রমেন, আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে না। বল তো যদি যেতেই হয় তবে ফিরে আসার কোনো রাস্তা আছে কিনা! যদি আর একবার ললিত হয়ে আসি তবে শৈশব, আমি খ্‌ুব সাবধানে থাকবো। অসময়ে কা খবো না, খালি পেটে সিগারেট টেনে নষ্ট করব না শরীর, সময় এবং আয়্‌ুর সঞ্চয় রেখে চলব। বল তো আবার আসা যাবে?

কিন্তু জিজ্ঞেস করে না ললিত। তার লজ্জা করে।

ললিতের মা শোওয়ার ঘরে চাল্‌ুনের গ্‌ুঁড়ো খ্‌ুজতে এসেছিল। এমন সময়ে খ্‌ুটখ্‌ুট করে খ্‌ুব ভয়ে ভয়ে কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খ্‌ুলতেই দেখা গেল, ভীতু জড়োসড়ো এক মেয়ে। হাতে বইখাতা, পরনে চমৎকার একখানা জয়প্‌ুরী ছাপা শাড়ি। শ্যামলা রঙ, স্‌ুন্দর ম্‌ুখখানা। প্রায় ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করল—ললিত...ললিত-বাব্‌ু এইখানে থাকেন?

আহা, ললিতের সঙ্গে বড় মানায়।

—তুমি কোত্থেকে আসছো?

মেয়েটি লাজুক মুখে বলল—বাবপুর। ললিতবাবু নেই?

—এই বেরোলো। তুমি ঘরে এসে একটু বোসো। ডেকে পাঠাচ্ছি। বেশী দূরে যায়নি।

চপ্পল জোড়া বাইরে ছেড়ে ঘরে এল শাশ্বতী। ললিতের মায়ের ছোট্টো চৌকিটার একধারে এতটুকু হয়ে বসল। বাস স্টপ থেকে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে রোদে, শাশ্বতী ছোট্ট দলা পাকানো রুমালে কপালের ঘাম মুছছিল।

ললিতের মা আদরের গলায় জিজ্ঞেস করল—গরম লাগছে?

লজ্জায় মাথা নাড়ল শাশ্বতী—না।

ললিতের মা একটু হেসে পাখাটা খুলে দেয়।

ললিতের মা দেখল, এখন যেখানে মেয়েটি বসে আছে ঠিক সেইখানে অনেকদিন আগে একদিন দুপুরে মিতু বসেছিল। ললিতের বড় পছন্দ ছিল তাকে। কিন্তু ঐখানে বসে মিতু কেঁদে কেটে অস্বীকার করে গেল। ললিতকে বিয়ে করতে রাজি হল না। ঐ চৌকিটা যেখানে মেয়েটি এখন বসে আছে—ওটা অলক্ষুণে চৌকি।

ললিতের মা বলল—তুমি ওখনটায় ললিতের চৌকিতে এসে বোসো। এখানে বেশী হাওয়া লাগবে।

শাশ্বতী বাধ্য মেয়ের মতো উঠে ললিতে চৌকিতে গিয়ে বসল।

ললিতের মা মনে মনে বলল—ঠাকুর, ঠাকুর, দেখো এ যেন সেই হয় যাকে ললিত বিয়ে করবে। আহা, বড় লক্ষ্মীমন্ত মুখখানি। ললিতটা বড় মুখচোরা। কই, এতদিন বলেনি তো এমন একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাবসাব, চেনা জানা হয়েছে! বোকা ছেলে, তুই কাউকে পছন্দ করলে আমি কি রাগ করব? তোর পছন্দ জেনেই তো মিতুকে আমি ডেকে এনেছিলাম। মিতু রাজি হল না, আমাকে কত অপমান করে গেল! কিন্তু তাতে আমি দুঃখ পাইনি। তোর বুকের ভিতরটা যে পুড়ে গিয়েছিল—তার চেয়ে কি ওইটুকু অপমান বেশী? আহা, ললিত, এবার বেশ পছন্দ করেছিস। মিতু সুন্দর ছিল কিন্তু এর মতো লক্ষ্মীমন্ত ছিল না। বেশ রে ললিত, বেশ!

—একটু চা খাও মা, সঙ্গে আর কী খাবে—দুটো চিঁড়ে ভেজে দিই!

—না, না। লজ্জায় মাথা নাড়ে শাশ্বতী। কানের মাকড়ি ঝিকিয়ে ওঠে, কপালের ওপর এক থোকা চুল দোল খায়।

ছেলেমানুষ! কচি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ললিতের মা।

শাশ্বতী এই ছোট্ট ঘরখানা দেখছিল। নির্জন সুন্দর ঘরখানা, বাইরের কোনো শব্দ আসে না। জানালার ওপর ঝুঁকে আছে সবুজ, সতেজ একটা পেয়ারার ডাল। পাখী ডাকছে। ভিতরে ছোট্ট একটু উঠোন, এক পাশে তুলসীমঞ্চ। ঘরে আসবাবপত্র বেশী নেই। যা আছে তাতে বোঝা যায় এদের অবস্থা অনেকটা শাশ্বতীদের মতোই। তাই এই ঘরে বসতে খুব একটা অস্বস্তি হয় না। সমান অবস্থার মানুষের সঙ্গে মিশতেই স্বস্তি বোধ করে সে। একথা ঠিক, শাশ্বতী কোনোদিন খুব বড়লোকের ঘরে বউ হয়ে যেতে চায়নি। বিশাল ঘরদোর, অনেক অদেখা আসবাব, বেশী চাকর বাকর—এসব কোনোদিন ভাবতে ভাল লাগে না তার। মন খারাপ হয়ে যায়। কোনোদিন বড়লোকের ঘরে গেলে শাশ্বতী হাঁফিয়ে উঠবে। সেখানে অনেক চকচকে জিনিসপত্রে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মানুষগুলোকে পুতুলের মতো লাগে। যে ঘরে আসবাবপত্র কম সেইখানে মানুষগুলোর ওপর বেশী করে চোখ পড়ে, সহজ লাগে।

ওপর দিকে চেয়ে শাশ্বতী দেখল বুড়োর মাথার মতো নড়বড়ে ফ্যানটা দুলছে। ওটার নড়া দেখে একটু হাসল শাশ্বতী। ভুলে গেল যে সে ঝগড়া করতে এসেছে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে গণেশের দোকানের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল—ললিতদা, মাসীমা ডাকছে, একজন বসে আছে আপনার জন্য।

রমেনকে বসিয়ে রেখে ললিত উঠল, বলল—তুলসী ফুলসী কেউ এসেছে। দাঁড়া, দেখে আসি।

ঘরের দরজায় পা দিয়েই শাশ্বতীকে দেখতে পেল ললিত। লাফিয়ে মোচড দিয়ে উঠল বুক। ধড়াস শব্দ হল শরীরের মধ্যে। হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। পায়ের নীচে দুরদুর করে কেঁপে উঠল মাটি।

—আপনি!

শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। ললিতের ধারালো উজ্জ্বল মুখখানা একপলক দেখেই চোখ নামিয়ে নিল শাশ্বতী। কোনরকমে বলল—আমি.. আমি একটু এলাম।

তারপরেই সে অবাক হয়ে টের পেল তার আর কোনো কথা বলার নেই। কথা শেষ।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ললিত। ঘরে এসে সন্তর্পণে মায়ের চৌকিটাতে বসল।

শাশ্বতীর মুখে ঝগড়া করার কথা। সে বলতে এসেছিল—কেন আপনি ঐ কাণ্ড করতে গেলেন? তাতে আপনার কী স্বার্থ ছিল?

কিন্তু সে কথা না বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল শাশ্বতী, বলল—কাল আমি ওখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আপনি তাতে রাগ করেননি তো!

উত্তরে ললিতের বলার কথা—কেন আপনি ওরকম করলেন? ছিঃ ছিঃ আদিত্য খেপে গিয়ে সঞ্জয়ের পেটে লাথি মেরেছে, আমার গলা টিপে ধরেছে। কেন আপনি আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে বে-ইজ্জত করলেন?

কিন্তু সে কথা বলল না ললিত, বরং অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে বলল—না, আপনি ঠিকই করেছিলেন।...বিমানের সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয়নি, দেখা হলে ওকে বলব—সাবাস!

শাশ্বতী হাসল। তার সাদা ছোটো ছোটো দাঁতে সকালের সতেজ রোদ আর পেয়ারা পাতার সবুজ রঙের একটা আভা ঝিকমিক করে গেল।

চায়ের কাপ আর চিঁড়ে ভাজার প্লেট হাতে মা ঘরে ঢুকল। মায়ের মুখে চেরা হাসি। বলল—ললিত, তুই একটু চা খাবি? করে দেবো?

—না। ললিত বলল—রমেন দোকানে বসে আছে।

মা শাশ্বতীকে চা-টা দেয়। বলে—একটু খাও। এ বাড়িতে প্রথম এলে। খাও।

চা রেখেই ললিতের মা তাড়াতাড়ি চলে যায়। মনে মনে বলে—ঠাকুর, ঠাকুর...

মুখ নীচু করে বসে ছিল শাশ্বতী। হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—দেখবেন, আপনার অসুখ সেরে যাবে। আমার মেসোমশাইয়ের একদম সেরে গেছে...

যাবে! সেরে যাবে! হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে জল ছলছলিয়ে ওঠে ললিতের। আহা, যদি সত্যিই সেরে যায়! সেরে গেলে সে একদিন টোপর মাথায় বাদ্যি-বাজনা বাজিয়ে গিয়ে শাশ্বতীকে বিয়ে করে আনবে...

শাশ্বতীর ছেলেমানুষের মতো সতেজ মুখখানা আত্মবিশ্বাসে কঠিন হয়ে যায়, সে বলে—দেখবেন...

ওরকমভাবে যদি কেউ চায়, ওরকমভাবে যদি কেউ বলে তাহলে কীভাবে মরবে ললিত? কী ভাবে?

ঠোঁট কেঁপে ওঠে ললিতের। চোখে জল এসে যায়। দুর্বলতা! কই, এতকাল তো এরকম দুর্বল লাগেনি নিজেকে?

(ক্রমশ)

অনিবারণীয় মান্তা

কালীকৃষ্ণ কিংবা ঐ ধরনের গালভরা একটা নাম ওর ছিল অবশ্য; আজ অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে হায়ার সেকেণ্ডারি সার্টিফিকেটে, কলেজের রোল-কলের খাতায়, আর হয়তো বা বাবা-মার স্মৃতিতে। পাড়ায়, ক্লাবে, বসন্তে প্রস পার্কের জলসায়, কফি হাউসের বন্ধু-বান্ধবী আর অসংখ্য পরিচিত অর্ধ-পরিচিতের কাছে—সে মান্তা। অনিবার্য, অপরিহার্য, অপ্রতিরোধনীয় মান্তা।

বন্ধু সে আমার, বহু দিনের বন্ধু, আমার স্নেহের পাত্র—এবং চুপি চুপি বলি, কথঞ্চিৎ শঙ্কার কারণও বটে। বিনা নোটিসে, সময়ে অসময়ে, দুমদাম করে তার ধূমকেতুর আবির্ভাব দরজা ঠেলে, পৌঁছিয়ে দেবার একটুও ফুরসত না দিয়ে, আমার ঘরে তার উন্মাদ ঝটিকা-প্রবেশ; এবং অভিবাদন কিংবা প্রসঙ্গ-পাড়ার সাধারণ রীতিনীতি সোপানগুলো বেমালুম টপকে সোজা মাঝখান থেকে তার কথাবার্তার আরম্ভ, দরজার তোড়ে। নিত্য-নতুন প্ল্যান তার মাথায়, নানা বিষয়ের নানান রকমের বই লেখার পরিকল্পনা : অদ্য 'আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা'—কাল 'আধুনিক শিল্পের ইতিহাস ও তাৎপর্য', পরশু 'বাংলা কবিতায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব।'

প্রৌঢ় বয়সের বার্তাপত্র নিয়ে আমি পেরে উঠি না ওর আগ্রহের সঙ্গে : শুধু সমর্থন করলে যে চলবে না, আমার সক্রিয় সহ-যোগিতা চাই প্রতিটি ব্যাপারে। তবে রক্ষে এই, মান্তার কোনো উৎসাহই তে-রাত্তির পেরোয় না, এক প্রকল্প থেকে আরেক প্রকল্পে তার হরিণশিশুর মতো অবাধ বিচরণ, একটু বেশি দ্রুতগতিতে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ।

অন্যদের চোখে

একারের শিরোনামা : 'অন্যদের চোখে আমরা' (নেহাৎই অন্তবর্তীকালীন নামকরণ, ফাইনাল নামায়ন এখনো বিবেচনাধীন : 'বোলবালাও একটা টাইটেল দিতে হবে, ফাদার; দেখবেন মার-মার কাটতি')। বইটইও যোগাড় হয়ে গিয়েছে তার—কলেজ স্ট্রীটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে সস্তা দরে কেনা সব বই। সম্ভাব্য সূচীপত্রও তৈরি। প্রথম অধ্যায়টাই মান্তার বর্তমান আগমনের হেতু : 'ফরাসীদের চোখে বাঙালীরা'। অন্যান্য অধ্যায়গুলোর নাম দেখিনি, তবে আন্দাজ করতে পারি : 'জুলুদের চোখে শিখ-সম্প্রদায়', 'এস্কিমোদের চোখে ওড়িয়া সমাজ'...

মান্তা সটান একটা বই নিয়ে হাজির : ডঃ প্রিভা-রচিত 'গান্ধীর সঙ্গে ভারতে' নামক ফরাসী গ্রন্থ। চমকে উঠলাম—বইটা আমারই; আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১৯৬৫ সালের ২৫শে জুলাই নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল, নোটবইয়ে আজও তারিখটা লেখা রয়েছে। অধমর্ণ ছিলেন প্রফেসার...[না, সজ্জনবাবু, আপনাকে আমি 'বিট্রে' করব না]। শুধু ভাবছি কি করে যে—কত হাত ঘুরে—শৃঙ্খল-যাত্রার উপসংহারে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙের ধারে তার গতি হল! এই গোয়েন্দাগিরিই হবে বোধ হয় মান্তার পরবর্তী গবেষণার বিষয়। বর্তমানে অবশ্য সে চায় আর কিছু নয়, শুধু তার উদ্দিষ্ট গ্রন্থখানির এক বাংলা সারসংক্ষেপ—এবং লেখকের মতামতের উত্তরে আমার প্রতিক্রিয়া।

ভারত-পরিক্রমা

ডঃ ও মিসেস প্রিভা ১৯৩১ সালের শেষের দিকে, গোলটেবিল বৈঠক-ফেরতা গান্ধীজীর সহযাত্রী হয়ে ভারতে আসেন। বোম্বাইয়ে নামার অল্প দিনের মধ্যে গান্ধীজীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হয় : পুলিস এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় মহাত্মাকে। প্রিভা-দম্পতি তখন কিছু দিনের জন্য আমেদাবাদে চলে আসেন; সেখানে এঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেন অ্যাডমিরাল স্লেডের কন্যা গান্ধী-শিষ্যা মীরাবেনের। তারপর তাঁরা একে একে পরিদর্শন করেন আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি, বেনারস ও সারনাথ। তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে, ব্যারাকপুরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সিংহল যাবার পথে [সিংহল থেকেই তাঁরা ফের জাহাজে ওঠেন] মহাবলীপুরম্ ও মাদুরাই এর মন্দিরগুলি তাঁরা দেখে যান। সব মিলিয়ে এক মাসের কাছাকাছি তাঁদের ভারতে অবস্থান এবং কাল-পরিমাণ এত কম বলেই এই ২৪০ পৃষ্ঠার ভ্রমণকাহিনী রচনার প্রলোভন জয় করা বোধ হয় তাঁদের পক্ষে দুরূহ ছিল। এক পুরো বছর থাকলে তাঁরা হয়তো ২৪ পাতার বেশি লিখতেন না; আর ভারতে দশ বছর বসবাসের পর ভারতের বিষয়ে কোনো বই লেখার কল্পনাও তাঁদের মাথায় আসত না। নিজের কথা যদি বলতে হয়, বলব, দেড় যুগেরও বেশি হতে চলল আমি বাংলা দেশের বাসিন্দা, তবু 'বাঙালীরা মাছ খেতে ভালোবাসে' কিংবা 'বাঙালীরা আড্ডাপ্রিয় জাতি' গোছের সাধারণ একটা মন্তব্যও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখে উঠতে পারি না।

গান্ধী-চরিত্র

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বপ্রভাবে প্রিভা মুগ্ধ। পুলিসের যে লোকগুলি ওঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল তাদের আচরণে তিনি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমভাব লক্ষ্য করেছেন; জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন যিনি, তিনি তো গান্ধীজীকে খুশি করার জন্য কত-না করতে প্রস্তুত ছিলেন, অথচ তাঁকে কোনো কিছু করতে দিতে গান্ধীজী ছিলেন তেমনই

মারাজ—ঘুমোতেন জাহাজের ডেকেই, চতুর্থ শ্রেণীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত না হতে দৃঢ়সংকল্প; আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ঐ দু'জন ব্যক্তি, ইতালীর ব্রিন্দিসিতে সমুদ্রতট থেকে যারা তাঁকে রুমাল নেড়ে বিদায় জানিয়েছিলেন, "তিন মাস ধরে একবারও তারা তাঁকে চোখের আড়াল করেনি, পারেনি তাঁকে ভালো না বেসে; ওদের একজন মায়ের মতো সেবা করেছিল তাঁর, বয়ে বেড়াত তাঁর বালিশ আর চাদর, পথে পথে তার চওড়া বুক তাঁকে আগলে রাখত।"

জাহাজের উপরেও জীবনযাত্রা চলত আশ্রমের ধরনে : ভোর চারটেয় আর সন্ধে সাতটায় প্রার্থনা, প্রতিদিনই এক থেকে দু' কিলোমিটার পরিমাণ সুতো কাটা, ফি-সোমবার মৌনব্রত—প্রিভা যার আখ্যা দিয়েছেন 'রসনা ধর্মঘট'। "কোনো রকম গোলমালেই তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যেত না," প্রিভা জানাচ্ছেন "আর নিদ্রাও তাঁর ইচ্ছাধীন : নির্ধারিত সময়ের আগে কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙবে না। যখন লেখেন, কাঁধ থেকে মাছি তাড়াবার ফুরসৎটুকুও নেন না, ডান হাত ক্লান্ত হয়ে গেলে বাঁ হাতেই কলম

ধরেন। আর ডেকের উপর দিয়ে হাঁটেন এত দ্রুত যে সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে-কেউ দু-দণ্ডেই হাঁপিয়ে ওঠে।"
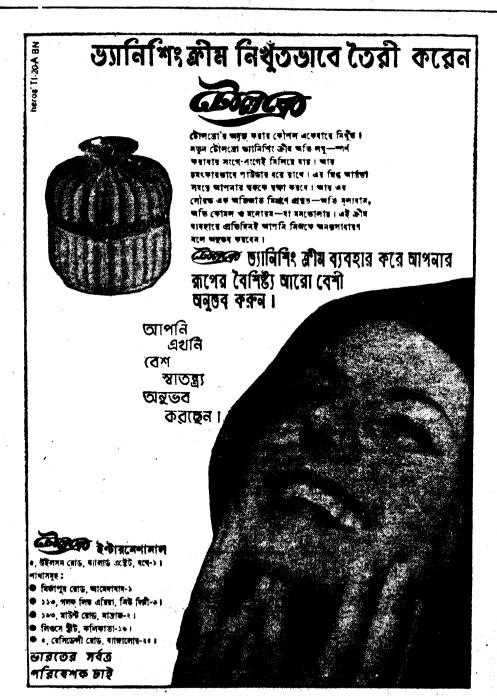
প্রিভা বিস্মিত হয়েছেন গান্ধীজীর অফুরন্ত স্মরণশক্তি আর লিখন-দক্ষতা দেখে। রোমাঁ রোলাঁর মতোই তাঁরও অভিমত : "গান্ধী মতান্তরের সম্মুখীন হতে ভালোবাসেন : যত বেশি তাঁর সঙ্গে আপনি দ্বিমত হবেন, তত বেশি বাড়বে তাঁর বন্ধুতা।"

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উদারতাও প্রিভাকে আকর্ষণ করেছে খুব : "স্বাধীন ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান যাতে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিতদের সাহায্য করতে পারে। স্বদেশের স্বাধীনতা তাঁর কাছে অপরাপর দেশের শৃঙ্খলামুক্তির উদ্দেশে পদক্ষেপ।"

প্রিভা যেখানে যেখানে গিয়েছেন, সর্বত্র তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান পাসপোর্টের কাজ করেছে ছ'-লাইন ইংরেজী আর তিন লাইন হিন্দীতে গান্ধীজীর লিখে দেওয়া এক পরিচয়পত্রের চিরকুট—ঠিক জাদুর মতোই অমোঘ ও ফলপ্রসূ।

গান্ধীজীর কি-অসীম প্রভাব সেই সব মেয়ের উপর যারা তাঁর নাম নিয়ে মদের বারগুলিতে ঘুরে ঘুরে সুরাসক্তদের চেতনা-সঞ্চারের প্রয়াস করে অনুরোধে উপদেশে : 'ভাই, এভাবে ধ্বংস করবেন না নিজেকে, নিজের দেশ ও জাতিকে, স্বয়ং মহাত্মাজীর এই আবেদন আপনাদের কাছে।' আপন মুনাফার শত্রু হলেও এই নারীদের সম্মান জানাতে অপারগ হন না বার-এর মালিক, কখনো কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁদের জন্যে চেয়ার পেতে দেন ছায়ায়। বিদেশীরা অনুমানই করতে পারবে না, এইভাবে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা কোনো ভারতীয় রমণীর পক্ষে কতখানি সামাজিক ঝুঁকি। সপ্রশংসভাবে এঁদের মনোভাব লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন গুণমুগ্ধ অতিথি : 'এ শুধু দেশপ্রেম নয়; শুধু তা-ই হলে আন্দোলনে আমরা এতখানি ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় অংশ নিতে পারতাম না। আমাদের মূল প্রেরণা—আমাদের নেতার আন্তরিক শুচিতা। গান্ধীজী আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন পরিপূর্ণ আস্থা। আমাদের এত কাছের মানুষ তিনি, এত আশ্চর্যভাবে বোঝেন মেয়েদের মন 'একাধারে তিনি পুরুষ ও নারী।'

সকল দেশের রাণী সে যে...

এ গ্রন্থের প্রথম পাঠেই একটা সত্য স্পষ্ট ধরা পড়ে : ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি ফরাসী ভারত-পথিকের আবেগমণ্ডিত পক্ষপাত। গান্ধীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ গান্ধীর দেশের উপরেও সমান-ভাবেই বর্তেছে। সহানুভূতির ও সম্প্রীতির রঙিন চশমায় তাঁর দ্রুতসাধিত দেশ-দর্শন :

"এ-ও কি সম্ভব, এমন নম্রার্দ্র ও অনুকম্পী জাতির অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর বুকে? যে-কেউ যে-কোনোখানে নিরাপদ, এমন কি রাত্রেও। মেয়েরা পর্যন্ত। পাশ্চাত্ত্যের প্রধান নগরগুলিতে যেসব আশঙ্কা আছে, তার কণামাত্রও এখানে নেই। নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত এক ইংরেজ ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম, 'তিরিশ বছর চাকরিতে আছি, এমন সুন্দর জনসমাজ আর কোথাও দেখিনি। মেয়েরা একা একা যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে, কোনো বিপদের ভয় নেই। পথে পথে পাহারাদার খাড়া নেই হয়তো, কিন্তু লোকের হৃদয়ে আছে সদা-জাগ্রত প্রহরা—আর সেটাই অনেক নিরাপদ।'

সংবেদনের এক সূক্ষ্ম আবরণ ঘিরে রাখে যা কিছু অতীব ব্যক্তিগত। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এখানে গলা চড়ে কম, অপমান করার দৃষ্টান্তও বিরল। খুব বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লে একজন তামিলভাষী তার আপন ভাষায় সবচেয়ে তীব্রভাবে যা বলতে পারে, তা হল : 'দেখুন, দেখুন, এবার কিন্তু আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।' বস্তুত, ভারতবর্ষের পাশাপাশি য়ুরোপকে মনে হয় অমার্জিত। আর তা তো হবেই—যে সময়ে ভারতবর্ষ ষড়্দর্শনে নিমজ্জিত, আমরা ছিলাম তখনো পর্যন্ত বর্বর : ভদ্র ও শোভন আচার-আচরণের দিক দিয়ে আমরা যে দু' হাজার বছর পিছিয়ে আছি, সেটা আমাদের দোষ নয়।"

কলকাতা সম্বন্ধে প্রিভার অভিমত : মিছিলে একটা ঘুষিরও বদলা দেওয়া হয় না, একটা লোষ্ট্রও নিক্ষিপ্ত হয় না, শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা বিরাজিত এখানে এবং জনগণ সাহসিক।

প্রায় সব কিছুর জন্যেই তাঁর আছে ঔদার্যসিঞ্চিত ভাষ্য : হিন্দু আর মুসলমান-দের পারস্পরিক সম্পর্কে যে তিক্ততার আভাস মেলে, তা তাঁর মতে ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক, 'বিলেতী দ্রব্য বর্জন' আন্দোলনের একটি শোভাযাত্রার সম্মুখীন হয়ে তিনি মন্তব্য করেন : "যে উদ্দীপনা মানুষের বিরুদ্ধে ভয়াবহ হয়ে দেখা দিতে পারত, এই বয়কট তাকে বস্তুর বিরুদ্ধে চালান করে দিয়েছে।"

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার...

তবু দাক্ষিণাত্যে গান্ধীজী কথঞ্চিৎ ব্যর্থ হয়েছেন বলে প্রিভার ধারণা। এক তামিল-ভাষী ভদ্রলোকের উক্তি তিনি স্মরণ করেছেন : 'গান্ধীজী নিজে খ্রীষ্টের শুদ্ধতা অর্জন করেছেন, সে শুদ্ধতা এমন পরিপূর্ণ যে কোনো মালিন্যই তাঁকে ছুঁতে পারে না। কিন্তু আমরা তো আর এত উঁচুতে উঠতে পারিনি : সেক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করে কিভাবে শুচিতা হারাবার ঝুঁকি নেব আমরা?

একমাত্র যে জায়গাটি তাঁকে আনন্দিত করতে পারেনি, তা কালীঘাট। গান্ধীজী তাঁকে বলে গিয়েছিলেন, 'ভারতবর্ষকে তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে দর্শন করবেন, বাদ দেবেন না তার অন্ধকার দিকগুলি। কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট দেখুন—তা যদি আপনাকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে, তবুও। সৌভাগ্যত তা ছাড়াও অন্য কিছু আছে।' মন্দিরের চেয়ে মেলা বলেই বেশি মনে হয় কালীঘাটের মন্দিরকে;

ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালা, কাঁধের ঝুলিতে যাদের সর্বরোগহর বটিকা

বেরিয়ে এসে কি স্বস্তি! যেন পলকমাত্র প্রিভা বুঝতে পারেন, কেন খ্রীষ্ট চাবুক হাতে মুনাফাখোরদের উপাসনাগৃহ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

দেখাশোনা উঁকিঝুঁকি

উৎসুকভাবে প্রিভা কুড়িয়ে নিয়েছেন রেল পথের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার টুকরো : ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালা, কাঁধের ঝুলিতে যাদের সর্বরোগহর বটিকা, পেন্সিল কাটা ছুরি কিংবা সাবান, আর সঙ্গে দ্বিভাষী প্রসপেক্টাস: বাগ্মিতায় সুপটু, নিজ নিজ পণ্যের শ্রেষ্ঠতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সুন্দর বক্তৃতা দেয় সপ্রতিভভাবে। অর্ধেক লোক শোনে, আর বাকিরা ঘুমোয়, বুকের উপর দু-হাঁটু তুলে ভ্রূণভঙ্গিমায়। আর তারপরই উঠে এল অন্ধ গায়ক। এখানে-ওখানে ধরা পড়ে জনকয়েক ডব্লু টি। বিনা টিকিটের যাত্রী। গার্ড এসে খেদিয়ে নামিয়ে দেয় যাদের, আর তবু যারা শেষ মুহূর্তে ঠিক উঠে পড়ে একই ট্রেনে, অন্য দিক দিয়ে...। কামরার সহযাত্রীদের কথা-বার্তা কান পেতে শোনেন প্রিভা, কথাবার্তার বিষয়বস্তু যেটুকু বোঝেন তাতে অবাক হয়ে যান : সত্য, প্রকৃতি, সংসার মৃত্যু, বিবেক। য়ুরোপে এসব নিয়ে আলোচনা শুরু করলে আপনাকে অবধারিত পাগল ভাবত সবাই।

পথে যেতে যেতে প্রিভা লিপিবদ্ধ করেন, ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা কত টুকরো ছবি : গরুর পিঠে বসে থাকা কাক, দেওয়ালে

কলসী মাথায় জল-ভরে-ঘরে-ফিরে-চলা মেয়ে

ঘুঁটের বাহিনী, কলসী মাথায় জল-ভরে-ঘরে-ফিরে-চলা মেয়েদের ছন্দসুষমা-ভরা চলন...

তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভারতে দিবারাত্রির চক্রে কোনো বিরতি নেই, দিন ফুরোবার পরেই নক্ষত্র-ফোটা আকাশ, মাঝখানে কোনো যতিচ্ছেদ চোখে পড়ে না। আরেকটি পার্থক্য অবশ্য হল ভারতের খণ্ডচাঁদ, শিং দুটো যার উপর দিকে বাঁকা, চন্দ্রবিন্দুর ধরনে, য়ুরোপে চাঁদের বক্রতা শুধু ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে।

ভারতীয় ক্যালেন্ডারের ছবির বৈশিষ্ট্যও প্রিভা উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন : কোনোটিতে সিংহবাহিনী দুর্গা, কোনোটিতে কারারুদ্ধ গান্ধী, আবার কোনোটিতে জাতীয় পতাকা হাতে জহরলাল।

অন্দরমহলে সামান্য উঁকিঝুঁকি দেবার অবকাশ পেয়েছেন প্রিভা, টুকটাক যা দেখেছেন গেঁথে রেখেছেন মনে : ঘরের দোরগোড়ায়, দরজার দু' পাশে ছেড়ে রাখা পাদুকা ও চটির সারি, রান্না করার চুলো [যাকে তিনি বলেছেন প্যারিসের কাফে-গুলিতে, বীথিকার ধারে, শীতকালে জ্বালানো ব্রাসেরো-চুল্লির এক ক্ষুদ্র প্রকরণ], সারা দিনব্যাপী মেয়েদের কাচা-কাচি, ঘষামাজা, ঝাড় পোঁছের পরিশ্রম—যত জঞ্জাল সবই আশ্রয় নেয় পথের উপর।

মেঝেতে কিংবা পিঁড়িতে উপবেশন তত কঠিন লাগেনি প্রিভার, কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকেছে উপবিষ্ট অবস্থা থেকে শোভন ও সুভদ্র ভাবে গাত্রোত্থান। এই বঙ্গীয় ধরনে বাবু হয়ে বসা এবং অবলীলাক্রমে উঠে পড়া এই হতভাগাকেও ঈর্ষান্বিত করেছে কম নয়। মাঝে মাঝে ভাবি এই অক্ষমতার মূলে আছে এই তথ্যটা যে আমাদের দেশে আমরা কোলেকাঁখে ভারতীয় কায়দায় বাহিত হই না, বাহিত হই মায়ের বাহু ও বক্ষের বন্ধনীতে।

সাধারণ মন্তব্য

সময় অল্প কিন্তু ঔৎসুক্য অধিক—ফলে সাধারণীকরণের দিকে ঝোঁক স্বাভাবিক। প্রিভার মতে এ দেশের রাজনীতির কেন্দ্র বোম্বাই, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতা আর মাদ্রাজে সবার উপর ধর্মকর্মের আসন; ভারতীয়দের সময়জ্ঞান আমাদের থেকে আলাদা—"গান্ধীকে বাদ দিলে, হিন্দুমাত্রই সময় ব্যাপারে সম্পূর্ণ অচেতন...; ঠিকানা-গুলোও অস্পষ্ট, সংখ্যাকে যেন তাদের ভীষণ ভয়, তবে বাড়ির নাম তাদের কণ্ঠস্থ...; পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বালাই তাদের নেই...

আর সত্যি, মাঝে মাঝে বাড়ির নম্বরে যা জটিলতা দেখি...১।৩৬।বি-২ গোছের মাথা-গুলিয়ে-দেওয়া ঠিকানার থেকে অনেক বেশি স্মৃতিসহ ও সুবিধাজনক বটতলার মিনুদের বাড়ি' কিংবা 'মাধবী-নিকুঞ্জ' বলে উল্লেখ। আর ধরুন, সেই বাড়িতে আপনি ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে এলেন, গল্প করলেন সবাই মিলে, গান গাইলেন বাচ্চাদের সঙ্গে, একত্রে বসে বহুপদ নৈশভোজ সমাধা করলেন, তারপর পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে এসে, বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে চললেন, ঐ যে বড় ঘরের কোণে বসে ছিলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি, উনি কি গৃহকর্তার মেজো শালা না কি গৃহিণীর মামাশ্বশুর...

"তাহলে", মান্তা শুধোয়, "তাহলে আমি লিখে দিই, কাদার, ও'র মতামতের সঙ্গে আপনি মোটামুটি একমত ?"

"লিখে দাও", উঠতে উঠতে আমি বলি, "দেশ পত্রিকায় 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' পড়তে—আর কলেজে ঠিক মতো পৌঁছোতে চাও যদি, এক্ষুনি কেটে পড়।"

ওরা আর আমরা

সেদিন সৌভাগ্যক্রমে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্বামীজীকে ভারতবর্ষে অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন। রঙ্গনাথানন্দ আর শিকাগোর বিবেকানন্দ মন্দিরের ভাষ্যানন্দ সবে মিশিগান প্রদেশের Ganges Township থেকে ফিরেছেন। Ganges Township আমাদের জাহ্নবীর নামের ছোট শহর। মিশিগানের কোনও গভর্নর নাকি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আরও দু'চারটি ভারতীয় নাম তিনি দিয়েছেন দেশকে। যাই হক, আপাতত Ganges Township আমাদের মহাতীর্থ। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের নামে মঠ স্থাপনার ভিত্তি হয়েছে। তারই মহোৎসবে পৌরোহিত্য করে ফিরেছেন স্বামীজীরা। হাজার হাজার মানুষ একত্র হয়ে ভারতের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করেছে। শান্তি দাও, আত্মাকে সার্থক কর। এ প্রার্থনা আজকের নয়। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন শিকাগো শহরের ধর্ম সম্মেলনে সুধীজনকে সম্মোহিত করেছিলেন সেদিন থেকে কেমন করে যেন এ প্রার্থনা ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে।

স্বামীজীর সেদিনের কথাও সবাই জানেন। World Parliament of Religion-এর বৈঠক বসবে শিকাগোতে। স্বামীজীর নিমন্ত্রণ ছিল না। ভক্তরা ধরে বসলেন তাঁকে এ সভাতে যোগ দেবার জন্য। রাজা মহারাজারা অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবু মহাপুরুষের মনে সাড়া আসছিল না। এমন সময় ঠাকুর দর্শন দিলেন—নরেন তুই আয়। যেন ঠাকুর সাগর পাড়ি দিচ্ছেন আর ডাকছেন 'নরেন তুই আয়।' নরেনের আর দ্বিধা রইল না। শিকাগো পৌঁছে স্বামীজী দেখলেন বৈঠকের মাস দুই দেরী। হাতে পয়সা কম। বস্টনের এক সহৃদয় মহিলা স্বামীজিকে অতিথি করে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক রাইট সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। দিন পনেরো আলাপ আলোচনার পর স্বামীজি বললেন ধর্ম সম্মেলনে তো তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, অথচ তিনি কিছু বলতে চান। রাইট সাহেবের তখন তাঁর উপর অগাধ ভক্তি জন্মেছে। বললেন, "সূর্যকে কি কেউ আলো দিতে নিমন্ত্রণ জানায়?—তোমাকে ধর্ম সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করা তো "asking the Sun to shine!" আবার শিকাগো, আবার পথে পথে ঘোরা। এবার থাকবার মধ্যে ছিল রাইট সাহেবের একখানা চিঠি বা পরিচিতি পত্র আর বা

কিছু স্বামীজি বলতে চান তার একটা খসড়া। কোন রেস্টুরেন্টে বা হোটেলে তখন কালো মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্লান্ত, অভুক্ত সন্ন্যাসী চলে চলে সাগরের মত অথৈ পারাবার লেক মিশিগানের কাছে পৌঁছে একটি গাছের তলায় অবসন্ন দেহে বসে পড়লেন। কাছেই Dearborn Street-এ থাকতেন শ্রী ও শ্রীমতী হেল। কেমন যেন তাঁদের মনে হলো স্বামীজিকে দেখে। তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। স্বামীজির পকেট থেকে ততক্ষণে মুসাবিদাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। তা হক। পার্লামেন্টের বৈঠকে আহুত স্বামী বিবেকানন্দ সমবেত হাজার হাজার মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন। সেই সম্মেলনের সভাপতি বারোজ সাহেব তাঁর বইতে লিখেছেন যে, দিনের পর দিন সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে। এতগুলি মানুষ সমান আগ্রহ নিয়ে এতো সময় বক্তৃতা শুনতে পারে না। কখনও বা কোন অধিবেশনে সমবেত মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে এদিক ওদিক উঠে যাবার চেষ্টা করছেন, বারোজ সাহেব বুদ্ধি করে ঘোষণা করলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সবার শেষে বলবেন। অমনি সবাই চুপচাপ বসে গেলেন। কথাটি নেই কারও মুখে।

সেদিনও নিগ্রো মেয়ে সিসিলিয়া স্মিথ দরজা খুলে যখন আমাকে বিবেকানন্দ মন্দিরে নিয়ে গেলেন, চারদিকে দেখলাম মার্কিন মানুষ। কে কোথা থেকে এসেছে জানি না। তবে এসেছে সত্যের সন্ধানে, শান্তির আহ্বানে। ঋগ্বেদের মহামন্ত্র মন্দিরের বাইরে লেখা—Truth is one. Men call it by various names.

বসবার ঘরে স্বামী ভাষ্যানন্দ এসে বসলেন। দক্ষিণ ভারতবাসী কিন্তু পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলা বলেন। বললেন, আরে আপনি যে বাঙ্গালী। স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে ডাকি। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এখন বেলুড় মঠে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশনের Institute of Culture-এ এক সময় নিত্য ওঁর দর্শন পেতাম। বহুদিন পর এখন বিদেশে এসে ওঁর দেখা নেহাৎ ভাগ্য বলতে হবে। কেরালাতে জন্ম স্বামীজির। বাংলা বলেন আপনার আমার মত। কত আপনজনের কুশল প্রশ্ন করে কথা আরম্ভ করলেন। রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৬টি কেন্দ্র আছে উত্তর আমেরিকায়। কাজ চলেছে আশানুরূপ। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বললেন ওদের দেহ আছে কিন্তু আত্মার সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। বিত্ত, সম্পদ, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিকাশ সব সত্ত্বেও দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে অঞ্জলি পেতে চায় আর কিছু। আমরা শত দুঃখেও সেই আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করে আজও মরি নি। যদি সে আত্মাকে উজ্জীবিত রাখতে পারি তবে লৌকিক জগতের যান্ত্রিক উন্নতি হয়তো একদিন পাবো। যদি আত্মার অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যময় সত্তার শেষ হয়ে যায়, যদি পশ্চিমের মত বিক্ষিপ্ত মন সভ্যতায় আমরা গড়ে উঠি তবে আমরাও হাহাকারের মধ্যে রইলাম।

খুব ভাল লাগছিল স্বামীজির কথা শুনতে। সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামীজিদের অন্য কাজ আছে। উঠে আসতে আসতে ভাবছিলাম সমস্ত আমেরিকা কেন, ইউরোপেও এই সমস্যা। সমগুণের অভাবে

সমাজ উপেক্ষাপূর্ণ। উজ্জ্বল সভ্যতার অন্তরালে বিকাশে কোথায় যেন দারুণ শূন্যতা। আমি ভারতীয় মেয়ে। মোটামুটি রক্ষণশীল আবহাওয়াকে জানি। এই শূন্যতা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয়নি। সবার মুখে ঐ এক কথা। বিরাট এক ফাঁকি তারা নিজেকে দিচ্ছে প্রগতির নাম ধরে। আর প্রগতির খেলায় ইউরোপ আমেরিকার মেয়েরা ভেসেছে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী।

এককালে তাদের ঘর ছিল, এখন কোন বন্ধন সকলকে বাঁধে না। সমাজে কোন আচরণই নিন্দনীয় নয়। সবই সবাই মেনে নেয় অথবা অন্যের চাল-চলন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফলে উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মিত, বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী মেয়েরা সংসারের চিরাচরিত প্রথাকে পিছনে ফেলে আসতে চায়। সবাই এমন একথা বলছি না। সবাই যেদিন হবে সেদিন প্রলয় ঘনিয়ে আসবে। মার্কিন দোকানে কেনাকাটা করতে গেলে, মার্কিন পোস্ট অফিসে চিঠি ডাকে দিতে গেলে আলাপী মেয়েরা এগিয়ে আছে। আহা গো, তোমাদের ভারতে কি দৈন্য, কি দুঃখ। চক চক করে চেটে ডাক টিকিটের আঠা ভিজিয়ে খামে আটতে আটতে বলে, লোকসংখ্যা নাকি এখন ৫০৫ মিলিয়ন! এ ধরনের গায়ে পড়া সহানুভূতি সহ্য করা শক্ত। কোমর বেঁধে কোন্দল করতে ইচ্ছা করে। ডেকে বলতে ইচ্ছা করে আমাদের এত দারিদ্র্যে যা সম্বল আছে তা তোমাদের কল্পনা শক্তির বাইরে। আমাদের নিরন্ন পরিবারের জননী যে কি তা' তোমরা বুঝবে কি করে।

এই তো সেদিন মার্কিন খবরের কাগজে দেখলাম বাপ মায়ের বিচ্ছেদের পর ছ'বছরের টোনিকে হিপিদের আবাসে আশ্রয় নিতে হয়। পুলিসে সে বাপ-মায়ের পাত্তা করতে পারেনি। হয়তো বা হিপিদের হেফাজতে শিশুকে গছিয়ে তারা ফেরার হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। কি একটা শিশুসুলভ অপরাধ করে ফেলেছিল সে। তাই তাকে ময়লা, আবর্জনাপূর্ণ একটি কাঠের বাক্সে বন্ধ করে দুমাস রাখা হয়েছিল। স্থানটি কলোরেডো নদীর কয়েক মাইল দূরে, মোজেভ মরুভূমিতে। ১১০ তাপমাত্রায় ৫৬ দিন শিশুকে ঐভাবে যাঁরা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি মহিলাকেও পুলিস ধরেছে। মায়ের জাত বটে!

মুশংসেতার এমন সব খবর আমরা দেশে বসেই যথেষ্ট পাই। অন্য এক চমকপ্রদ ব্যাপারের আভাস দেশে থাকতেই জেনেছিলাম। ইউরোপ পেরিয়ে আসতে আসতে কিছু কিছু নজরে না এসেছে তা' নয়। মার্কিন দেশে তো রকম-সকম দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। অবিবাহিত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী স্বামী-স্ত্রীর মত দিব্যি একত্র বাস করে। এদের ভাষায় ব্যবস্থাটির নাম living together। আধুনিক পরিভাষায় বিশেষ অর্থবোধক শব্দ! দায়-দায়িত্ব নেই, আছে আগলভাঙ্গা অসংযত স্বৈরাচার। বাবা-মারা মুখ বুজে থাকেন। মুখ খুলেও লাভ নেই। কৈশোরের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা বাপ-মায়ের স্নেহের নীড় থেকে উড়ে পালিয়ে যাওয়া। বাপমায়ের সেকেলেপনা, বুদ্ধিবিবেচনাহীনতা থেকে দূরে না গেলে যদি পুরোপুরি অগ্রগতি না হয় তবে কিশোর-কিশোরী তাদের নিজেদের সমাজে মুখ দেখাবে কি করে? কিশোরী কৈশোর পার করেও নবলব্ধ স্বাধীনতা সব সময় ছেড়ে দেয় না। পত্রপত্রিকায় living together নিয়ে বেশ সরাসরি লেখাও হয়। এক পত্রিকায় পড়লাম living together-এর আনন্দে বিভোর এক যুবতীর শেষ পরিণাম। পুরুষটি বেশ কিছুদিন তার অর্থে আমিরী করে, বাকী পয়সাটুকু চেয়ে নিয়ে ইউরোপ বেড়াতে গেলেন। বলে গেলেন, Business. এর সম্বন্ধে [illegible] [illegible] পরে প্রিয় বান্ধবী তারযোগে সংবাদ পেলেন তাঁর boy friend এক কাঙালী মেয়েকে বিবাহ করেছেন। সখেদে খণ্ডিত নায়িকা বলছেন, নায়ক দয়াই তার করে অভিনন্দন জানাবার পয়সাটুকু পর্যন্ত তাঁর কাছে বাকী রেখে যাননি। Business ভালই হলো।

পথেঘাটে বুড়ো মানুষের দুর্গতি দেখলে আমার মত দুঃখী দেশের মেয়েরও দুঃখ হয়। জরায় জর্জরিত মানুষের কোন দাম নেই এখানে। পয়সাওয়ালা বুড়ো-বুড়ী অর্থের জোরে কিছু আরামে কাটাবার ব্যবস্থা করেন, আর যার তা' নেই তার জন্য আছে সরকারী ব্যবস্থা। খেতে পরতে পারে, মাথার উপর ছাদ আছে, অসুখ করলে ওষুধপত্র আছে। নেই শুধু আপনজনের মমতা। যেখানে আছি তার কাছাকাছি একটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আবাস আছে। ধনী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বীমা কোম্পানীর মারফতে বিরাট বাড়িকে ছোট ছোট ফ্ল্যাট করে একগাদা বুড়ো মানুষ একত্র থাকেন, যেন এক বিশেষ সম্প্রদায়। তার মধ্যে আবার লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধের চেয়ে বৃদ্ধার সংখ্যা অনেক বেশী। মেয়েরা নাকি বাঁচে বেশীদিন। লোলচর্মে রাঙ্গানো প্রসাধনী, ওষ্ঠে রঞ্জনী, নয়নে অঞ্জন বৃদ্ধারা দামীদামী সাজে বসে ঐ গৃহের অংশীকদের রেস্তুরেন্টে খান। সামনে রাখা মহার্ঘ মদ্য আর খাদ্য, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উদাস। ছেলেমেয়েরা কখনও খোঁজ নেয় না। একদিন এক বৃদ্ধা আমায় দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের দেশে শুনি মা-বাবাকে খুব শ্রদ্ধা কর। এখানে কিন্তু বুড়ো মানুষের বড় অন্তর বেদনা। রোজ শুনি সব sex murder-এর কথা। কিন্তু তাই খবরের কাগজে ফলাও করে খুব সমাজকে চমকাবে। যত অল্প বয়সের ঘটনা ততই নাকি চমক বেশী। খদ্দের তো যুব সমাজ। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। তাদের সুড়সুড়ি দিলে তবেই তো বেচাকেনা চলবে। কাগজের বেচাকেনা, কাগজের বিজ্ঞাপনের পণ্যের বেচাকেনা সবই। পণ্যসর্বস্ব দেশে সমাজের তাই এই ঘূর্ণিপাক।

আমাদের সমাজে পশ্চিমের প্রলেপ লাগবার আগে আমরা যেন সাবধান হই। তাদের যে দারুণ শূন্যগর্ভ সাংসারিক জীবন তার ফলে যে সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা' থেকে বাঁচতে হবে তো। এদেশে পাগল হয় ছেলের চেয়ে মেয়ে বেশী। প্রায় দলে দলে। অল্প বিস্তর প্রলাপ তো মাথা-ঘামাবার ব্যাপারই নয়। প্লেনে যাওয়া-আসা করে কাজকর্ম চালান। আমাদের তো রান্না-ঘরভরা গ্যাজেট নেই। প্লেনে যাতায়াতের সময় কই?

শ্রীমতী

দর্জিপাড়া মেটিয়াবুরুজ

ঘরঘর শব্দে সেলাই কল চলছে। ঘরে-ঘরে 'কামকাজ' হচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির দলিজে দলিজে। কারো একটা মেশিন, কারো বা দুটো—কারো আবার দশ বিশখানা। যাঁরা বড় 'ওস্তাগার' তাঁদের পুরনো ঢেঁকিকল উইলসন মেশিন বাতিল হয়ে গেছে। এসেছে সিংগার বা উষা মেশিন। যারা দরিদ্র, বাজারের চালানী 'রেডিমেড' মাল সাপ্লাই দেয় তাদের সেই মান্ধাতাকালের মেশিন চলছে। তাদের যে কাটার সেই মেশিনম্যান, সেই আবার 'খিলে' 'টেঁকে' নেয় জামা-ব্লাউজ। বড় বড় ওস্তাগার দর্জিদের পাকা বাড়ি। বাইরে দলিজভরা 'কামকাজ'-এর লোক। চকচকে কাঁচি (দর্জিদের ভাষায় 'কেঁচি') চালিয়ে বুড়ো পাকা 'মাট' অর্থাৎ কাটার থান কাপড় কাটছে কাচ্‌কাচ্ শব্দে। মিটার বা গজ ধরে মাপ নিয়ে পেন্সিল অথবা গিরিমাটি দিয়ে দাগিয়ে নিচ্ছে। কানে আতরগোঁজা, পাকা দাড়িওয়ালা, এলো গা, ভোঁড়ের উপর চওড়া চামড়ার বেল্ট দেওয়া পাট করে সিংগাপুরী লুঙ্গিপরা ওস্তাগার চা খেতে খেতে মাটকে সতর্ক করছেন যাতে হিসেবের ভুলে কাপড় বাজে খরচ না হয়। 'ফচুড়ো' (কাটা কুচো ছাঁট কাপড়গুলো) রেখছেন। যারা হাতের কাজ করছে অর্থাৎ হাতা খিলছে, 'পাঞ্জা' জুড়ছে, পটি জুড়ছে, বোতামের ঘর তৈরি করছে—তাদের তাড়া লাগায়। বড় বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়িয়ে আছে অথবা ঘোড়ার গাড়ি। কর্তা যাবেন কলকাতার দোকানে। অথবা কোনো সমাজ-কল্যাণের মিটিংয়ে।

পাড়ায় পাড়ায় সুতোর দোকান। মনিহারি আর মিষ্টি দোকান। গোস্তের দোকান। খড়ম পায়ে দর্জিরা চলেছে এ দলিজ থেকে ও দলিজে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফিরছে মাদ্রাসা থেকে। দর্জিদের বাড়িঘরদোর ঘেরা। পুকুরঘাট ঘেরা ঝোপঝাড় দিয়ে। নারীরা এখানে 'অসূর্যম্পশ্যা'।

কলকাতার পশ্চিমে নুঙ্গি, জগতলা, চন্দন নগর, চটা বাঁশতলা, রায়পুর, বাঁড়ুজ্জে হাট, আখড়া, সন্তোষপুর, কানখুলি, বটতলা, পাচুড়, কাটালবেড়িয়া, রাজাবাগান, ধোপাপাড়া, হালদারপাড়া, খানদারপাড়া, মালিপাড়া, মোল্লাপাড়া, কাঁলখানা, পাক-পাড়া, বাঙালী বাজার, মুদিয়ালী—কলকাতা-১৮ আর কলকাতা-২৪—কয়েকটি থানার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষেরা শতকরা ৯০ জন দর্জি। দর্জিশিল্প তাঁদের একমাত্র জীবিকা। লক্ষ লক্ষ মানুষ। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মুসলমান।

মেটিয়াবুরুজ, বড়তলা, আখড়া, মহেশতলা, জগতলা থানার এই বিশাল ভূভাগ সারা ভারতে একমাত্র দর্জিশিল্পের আদি পীঠস্থান।

পাইওনিয়ার, হরলালকা, ওয়াছেল মোল্লা,

ঘর ঘর শব্দে ঘরে ঘরে সেলাইকল চলেছে

সুবিদ আলী, কমলালয়, এল মল্লিক সম্ভ্রান্ত যে দোকানেই আপনি দামী সুট কিনুন তার পিছনে মেটিয়াবুরুজের পাকা বুড়ো দর্জির হাত আছে। তাদের অনেকের শিক্ষা আবার সুদূর রেঙ্গুনে। এ দেশে যখন লালমুখো সাহেব মেমরা রাজত্ব করত তাদের ছিল বাঁধা দর্জি। সেই দর্জি সেলাই করত মেমেদের গাউন—সাহেবদের কোট-প্যান্ট। কোনো কোনো দর্জি বা ওস্তাগার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্ভ্রান্ত বাড়িতে কাজ করত। এক বাড়িতে কাজ করলেই সংসার চলে যেত তাদের। জামা পছন্দ হলে দাম তো দাম—উপরি বকসিস! দেশবন্ধুর পাঞ্জাবির সার্জের কাপড়ের গজ ছিল নাকি তখনকার বাজারে এক শো টাকা। আর সেলাইয়ের দাম দিতেন তিনি আড়াই শো টাকা। তাঁর কাছে যদি একবার সাহস করে জোড়হাতে বলা যেত, 'হুজুর, আমার ডাগর মেয়েটা বিদায় করতে পারছি না—বড় টাকার অভাব...একটা ছেলে জুটেছে...'

ব্যাস—কাজ ফতে।

সে দিনকাল আর নেই। বড় বড় মিল-মালিক বা ব্যবসাদাররা এখন বিলেত, প্যারিস, নিউইয়র্ক থেকে পেট্রো-কেমিকেলের কোর্ট প্যান্ট আনছেন। বাঙালী বাবুরা কেমব্রিক বা আদ্দির পাঞ্জাবি দুখানা আর ধুতি চারখানাতেই সন্তুষ্ট। শীতে বড়জোর একটা সার্জ আর শাল লাগে। কিন্তু টেরিলিন টেরিকট আমদানির সঙ্গে সঙ্গেই হিপিদের চুস্ত প্যান্ট আর হাওয়াই দ্বীপের খাটো কোর্তা-জাতীয় বুশ সার্ট আমদানি হওয়াতে দর্জিদের ফ্যাশন সম্বন্ধে পুরাতন মাট বা কাটার পাল্টাচ্ছে। পুরাতন দর্জি-দের জাত গেল জাত গেল। তাদের মধ্যে তাচ্ছিল্যভাব। অশ্লীল পোশাকের যতই বাহাদুরী থাক ইংলিশ কাটিং কোটপ্যান্টের কাছে এসব অতি হীন। জঘন্য। এসব কাজ শিখতে ছ' দিন লাগে না—কিন্তু ইংলিশ কোটের কাজ শিখতে দশ বছর লাগে। হাতির কাছে ছাগলছানা!

বুড়ো দর্জি রশীদ মিয়া ছেলে বেলায় রেঙ্গুনে গিয়ে বর্মী মেয়েদের সঙ্গে ঘরকন্না করে বিশ বছর পরে দেশে ফিরে বড় বড় বাড়িতে কাজ করেছে। হাড় পাকা বুড়ো। 'কেঁচি' ধরে ধরে আঙুলে 'ঘাঁটা' পড়ে গেছে। সে কলকাতার বড় বড় নামজাদা সাহেববাড়িতে কাজ করত। মেম প্যারিসের একটা 'অ্যালবাম' খুলে নতুন ডিজাইন দেখিয়ে দিত। অনেক দামের সিল্ক কাপড় দিত। শুধু রোসিয়ার গায়ে সবুজ-আলো-

জ্বালা-ঘরে দাঁড়াত পরীর মতন। রশীদ মিয়া ফোকলা গায়ে স্তিমিত চোখে হাসতে হাসতে বলে, 'হাত আমার কাঁপত। মেমের মাথাভরা সোনালী চুল। যেন আঙুরের থলো। আর চাল্লিশেও 'যৈবন' যেন একটু টসকায় নি 'করো!' বুকের ওপর দিয়ে ফিতে ধরে মাপ নিতাম। নিটোল পাছার মাপ নিতাম। শুধু 'নিক্‌সেস' পরে থাকত। সাদা গোলাপী উরু দুটো যেন চাঁদের জোছ্‌না ধোয়া। এখানের মেয়েদের সে পাছাও নেই, সে রূপও নেই। থাকলেও সে দু' দিনের জন্যে। আজকের গাউন তার কালকে হবে না। মেম মাপ দিয়ে আবার পোশাক পরে কাপড় কম পড়বে কিনা জিজ্ঞেস করত। আমি কাপড় দেখে বলতাম—'বেশিই আছে।' মেম হেসে বলত, 'তোমার লেড়কির ফ্রক বানিয়ে দিও ওস্তাগার মিয়া।' সেই মেমের একখানা গাউন তৈরি করতে লাগত পনেরো দিন। স্টোমে চড়িয়ে ৯ নম্বর সূঁই দিয়ে তিল তিল করে খিল্‌তে হত। টেকেন দিতে হত। একটু গোলমাল হলে আড়াই শো টাকার কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। 'গ্র্যান্ড হোটেলে' কিংবা লাটের বাড়ির কোনো ভোজসভায় গিয়ে মেম যদি দেখে হুবহু তারই মতো ডিজাইনের গাউন পরে এসেছে অন্য একটি মেম—তখনি সে ফিরে এসে দর্জিকে ডেকে তার সামনে পড়পড় করে গাউন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। লেডিজ কাজে কারু সঙ্গে কারু মিল 'হতি পারবে নি 'করো।' সেইখানেই ওস্তাদী। এ তোমাদের ছুঁচলো পাতলুনের 'ছুঁচোবাজী' নয়। মেমের গায়ে পরিয়ে হাতে-খেলা গাউন পরিয়ে ট্রায়াল দিয়ে আসতে হত। গাউন পরিয়ে দিলে সাহেব পাইপ টানতে টানতে নীল চোখে যেন 'দুরমী' কষে দেখত। একটু 'ভিরুটি' হলে দেখাত আঙুল দিয়ে। বুক আর পাছা ঠিক করা—একেবারে 'সেম সেম খেলানো' কঠিন কাজ! কোথায় 'ভিরুটি'—মদ খেলেও সাহেব ঠিক ধরতে পারত। হেসে শুধোত, 'তোমার কেমন লাগছে?'

বলতাম, 'পাছা, কোমর, পেট, পিঠ ঠিক আছে 'পেরায়'। বুকটা খুলতে হবে।'

'কোথায় দেখাও—হয়ার, ফিক্সড বাই দা ফিংগার।' দেখাতেই হত। তারপর মেম জামা

হাতে-খেলা গাউন পরিয়ে ট্রায়াল দিয়ে আনতে হত

খুলতে পারত না—কোথায় বোতাম? আমি খুলে দিতাম। সেই জামাতে মজুরী পেতাম দু' শো টাকা। সাহেব দিত, উপরি পঁচিশ টাকা বখ্‌সিস।...সে যুগ চলে গেছে। নটে শাক পুঁই ডাঁটা চিবোনো বাঙালী সাহেব বাবুরা তাদের মেমেদের বিবিদের বগলকাটা 'ছেলেধরা' ব্লাউজ আর হ্যামিলটনের সায়ার ওপরে বড় জোর বেনারসি কিংবা তাঁতের শাড়ি পরায়। এখন আমাকে সাত টাকা রোজ দিয়ে বড় বড় ওস্তাগাররা মিলিটারী, পুলিস বা নেভির পোশাক কাটতে ডাকে! আরে বাবা, এসব তো ট্যাংরার মেশিনে যেমন গরু কাটে একসঙ্গে পাঁচ সাত শো শুইয়ে দিয়ে, তেমনি কয়েক হাজার থান পাট করে কেটে নিলেই হয়! আর 'মোকে' ডাকে হাওড়া মঙ্গলা হাটের রেডিমেট চালানী 'কাম' কাটতে। আমি এসব করতে পারব না 'করো'। পেটে ভাত নেই তো নেই। অনেকে পাকিস্তানে চলে গেল। বড় বড় ওস্তাগাররা সেখানে দোকান করেছে—নামজাদা দর্জিদের নিয়ে চলে গেছে কত।

আমি মাটি কামড়ে পড়ে আছি এখনো। এখানে বাপ দাদার কবর। এসব ফেলে যাব কোথা?'

রশীদ মিয়ার বাড়ির ফাটা ছাদের ফাঁক দিয়ে পানি পড়ে। ঘরে তিরিশ বছরের অনূঢ়া মেয়ে ফুলের মেশিন চালায়। ছেলে চারজন পরের দলিজে কাম-কাজে যায়। তারা অসৎ—ভাল করে কেউ কাজ শেখেনি। সবাই ঝড়ের বেগে মিলিটারী পোশাকের মেশিন চালায়। পাঁচ টাকা রোজ। বহু লোকের কাছে দেনা, টাকা নেয় আর ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাজে চলে যায়।

মেয়ে সফিয়ার ওপরেই রশিদ মিয়ার একমাত্র বাঁচা মরা নির্ভর করছে। তাকে বিদায় দিলে বুড়ো খাবে কি?

সারা মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল দুঃস্থ অসুস্থ আবহাওয়ায় ভরা। শতকরা ৯০ জন মানুষ দরিদ্র। ১০ জন যাঁরা ধনী ওস্তাগার তাঁদের কাজকাম করে দরিদ্ররা। মাঝারী স্তরের দর্জিরা বড় বড় সরকারী অর্ডার ধরতে পারে না। সেসব করতে গেলে পুঁজি চাই, বড় বড় নেতা বা মন্ত্রী হাতে থাকা চাই।

তাই যারা দিন আনে দিন খায় তাদের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। তারা দারিদ্র্যের চাপে বস্তি অঞ্চলের খুপরি খুপরি ঘরে থেকে মশা, ছারপোকা, ধোঁয়া, ধুলো, কাদা, নর্দমার মধ্যে সুখ শান্তির খোঁজ না পেয়ে 'কমিউনিস্ট' হয়ে গেছে। কথায় কথায় তাদের ক্ষোভ মালিক বা বড়লোকদের বিরুদ্ধে। তারা তিন মাথা হয়ে গেছে বুড়ো শকুনের মতো ঘাড় মুড়ে বসে বসে সদি টেনে সারা জীবন বুভুক্ষু থেকে কাজ করে করে।

মেটিয়াবুরুজ, বটতলা, আখড়া, কানখুলি, চটাতে হাইস্কুল আছে। আখড়ায়, বটতলায় মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষার পঠনপাঠনের রীতি আজো চলছে ঢিমে তালে। এখানের মানুষজন মুসলিম পোশাক-আশাকে অভ্যস্ত। তবে সুট প্যান্টও আধুনিকদের মধ্যে চালু হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে এখানের মানুষদের শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। শতকরা দু' জনও হবে না। কেননা অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার তাদের সবে 'মাইছাড়া' বাচ্চাদের হাতে 'সুই' তুলে দেয়। পরের দলিজে বোতামের ঘর সেলাই করতে নিয়ে যায়—যা চার আনা পয়সা পায় তাতে দু'খানা চাপাটি রুটি অথবা দুটো শিক কাবাব হবে।

এখানের রাস্তাঘাটের অবস্থা চিরকালই জঘন্যতম। কসাইখানার পচা রক্ত যখন গাড়ি বোঝাই হয়ে চলে যায় তখন লক্ষাধিক লোক দুর্গন্ধে কয়েক মিনিট প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে থাকে দম বন্ধ করে।

রশীদ মিয়া বলে, 'মেটিয়াবুরুজের অবস্থা ফেরানো কঠিন। এখানে যে ইতিহাসের কলঙ্ক 'লাট কেলাইভ' সাহেব 'পেরথম' 'জাহাজ' থেকে মাটিতে পা দেয়! এখানে হাসপাতাল নেই। নানান রোগের ডিপো।

এটা শৃঙ্খল গারদখানা। মেয়েরা তাদের আব্রু নিয়ে আজীবন ঘরের কোণে বন্দী। এখানে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ আছে, নামাজ পড়া হয়, মোল্লা মুসল্লী অনেক কিন্তু কিছুতেই মানুষের দুঃখ ঘুচছে না। সংখ্যা হচ্ছে না হাতেই শয়তান 'নমরুদ' বাদশাকে জব্দ করার জন্যে যেমন খোদা মশার ঝাঁক ছেড়ে ছিল সেদিন মশা নামে এখানে।'

আধুনিক শিক্ষিত ছেলে যারা দু' চার জন বি-এ, এম-এ পাশ করেছে তারা বলে, 'আমরা 'মুসলমান' বলে কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। (?) নিজেদের ব্যবসাপাতিও উঠে উঠছে। হাওড়া মঙ্গলা হাটে যারা ব্যবসা করত তারা প্রতিযোগিতায় পুরুষপোষ শিক্ষিত বিচক্ষণ লোকদের কাছে দাঁড়াতে পারছে না। সেখানেও নাকি নানান 'সাম্প্রদায়িক'-'রাজনৈতিক' চক্রান্ত। তারপর সবই বাকিতে [illegible] সব ছাড়তে হয় পাইকারি। পাশের হাটে [illegible], [illegible], [illegible], নৈহাটী, তমলুক, বর্ধমান, [illegible]—এসব জায়গা থেকে পাইকের [illegible] এক, অন্য বড় টাকা আটকে [illegible] 'অনেকদূর' দেখে না। তাদের [illegible] উঠবে না। স্টলের ভাড়া বাকি পড়লে মঙ্গলা হাটের মালিক তালা লাগিয়ে দেবেন। প্রতিযোগিতার দিকে চার চোখ না [illegible] না থাকলে নতুন আগন্তুক-দের [illegible] পারে দিয়ে পারবে কেন? [illegible] ছেলে দম কাঁচের মতো চোখ, মুখ তেতো পড়া দাগ—দেখলেই বুঝতে পারবেন এ ছেলে মেটিয়াবুরুজের দর্জিদের —অনেকে লেখাপড়া জানে না। তারাই পৈতৃক অভ্যাসে দর্জির কাজ আর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে চাঁদ যাবার এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক কান্ড ঘটে গেল এখানের [illegible] মুসলমানেরা আদৌ বিশ্বাস করতে পারছে না। চাঁদ গেলে নাকি আল্লা ফেলে দেবে! কোন্ যুগে কোন্ মেজাজে তারা বাস করছে বুঝুন। সিনেমা দেখাকেও তারা 'পাপ কাজ' মনে করে।'

অথচ 'হাওড়া মঙ্গলা হাটের' মালিক মুরলীধর সরাব কিংবা কেবল চাঁদ মিনানীর কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, শতকরা কত হারে মুসলিম দর্জি তার ব্যবসায় ফেল মেরে হাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিজ গিয়ে সাধারণ দর্জি হয়ে কোনোক্রমে জীবিকা চালাতে বাধ্য হচ্ছে। আর কত বাড়ছে উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের হিন্দু ব্যবসায়ী।' হাওড়া গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের গায়ে যে পুরাতন হাটটি আছে তার বয়স এখন দেড়-শো বছর। বর্তমান মালিক মুরলীধর সরাব। এই হাজার হাজার স্টলওয়ালা লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ীদের রুজি-রোজগারের পীঠস্থান-টিতে স্থান সংকুলান হয় না বলে হাওড়া এক নম্বর স্ট্রান্ড রোডে আর একটি হাট তৈরি হয়েছে। এর বয়সও আধ শতাব্দীর উপর। মালিক কেবলচাঁদ মিনানী। কংক্রীটের গাঁথুনি দোতালা আর একটি হাট তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। আড়াই হাত স্টলের সালামী তিন হাজার টাকা। ভাড়া বছরে এক শো আশি টাকা। কিন্তু হাওড়া মঙ্গলা হাট —যেটি মেজো—তার ভাড়া বত্রিশ—আগে ছিল চব্বিশ টাকা।

এই তিন হাটেও কুলোয় না। হাসপাতালের সামনে আরো একটি হাট, বসেছে ছোট মতন। তার সঙ্গে হাট অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। তবুও স্টল পায় নাই বহু লোক। পথের পাশেই দোকান ফেঁদেছে প্রকৃতি আর পুলিসের হাতে নিজেদের মান ইজ্জত বা দায়-দায়িত্ব সমর্পণ করে।

দর্জিদের কী ভীষণ কষ্ট এই তিনটি হাটে তা দেখতে গেলেই টের পাবেন যদি আপনার পায়খানা বা পিপাসা লাগে। পাঁচ মিনিট স্টলগুলো দেখতে দেখতে বেরিয়ে আসুন, ঘামে আপনি নেয়ে যাবেন। মনে হবে এ এক 'হাবিয়া দোজখ।'

এখানে খুচরো বিক্রি নেই। ডজন ডজন, গাঁটকে গাঁট মাল পাইকিরি হয়। ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় এইসব জিনিস : ফ্রক, শার্ট, কোট, পেনি, ব্লাউজ, রুমাল গেঞ্জি, গামছা, মশারী, তোয়ালে—নিত্য

ব্যবহার্য হাজার রকমের জিনিস।

যার পাইকের এল না তার একগাল মাছি। আবার নতুন পাইকের ধরো। বিশ্বাস করে মাল ছাড়তেই হবে। সেও বার দুই দেওয়া-নেওয়া করার পর হঠাৎ হাওয়া! অন্যখানে মাল নিচ্ছে দেখলে—'ধরো শালাকে!' তারপর হাতাহাতি—মারামারি। বিচার-আচার। মালিকপক্ষ সুযোগ পেলেই দিলেন দোকানে ঝাঁপ ফেলে। নতুন সালামী বিলিতে অনেক টাকা।

খ্যাতিমান দর্জিরা পাকিস্তানে চলে যাবার পর বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু কারো জন্যে সময় কাল বা ফ্যাশানের গতিরুদ্ধ হয় না। শিক্ষিত দর্জির চাহিদা এখন বাড়ছে, যেমন কাটিংয়ের স্মার্টনেসের দিক থেকে তেমনি ব্যবসায় বুদ্ধিতে।

মেটিয়াবুরুজের হাড়পাকা বুড়ো দর্জি রশীদ মিয়া, তোমাদের মেম সাহেবরা আর ফিরবে না—কালের জটিল প্রতিদ্বন্দ্বী গতিপথে যেখানে মোটর ছুটেছে সেখানে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটলে ভিখারীই বলতে হবে—অতএব সাবধান॥

আবদুল জব্বার

ভিত্তিচিত্রে নব-অধ্যায়

অজিতকুমার দত্ত

জয়পুর থেকে সড়ক গেছে টঁকের দিকে। দু ধারে বেশির ভাগই ধূসর রুক্ষ চেহারা। গরমের দিনে সকাল গড়িয়ে দুপুর শুরু হওয়ার আগেই সব যেন আরও শুকনো আর খাঁ-খাঁ চেহারা নিয়েছে। কিন্তু তাতে পরোয়া নেই। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাঁটা-গুল্ম-সমাকীর্ণ ঝালিঝাড়িতে চরে বেড়াচ্ছে ছাগল আর ভেড়ার পাল। সাইকেলে চলেছে লোক। পেছনে ক্যারিয়ারে হয়ত একটি ছাগল-ছানা আর সঙ্গে বাঁধা সংগৃহীত কিছু ডাল-পালা। কিন্তু বাঁচার এই তাগিদ শুধু ছাগল আর বাচ্চার নয়, নজরে আসে অন্যত্রও। ঊষর মরুময়তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কিছু সবুজের ছোপ। মাথা তুলেছে কটি বড় গাছ। ইঁদারা আর পাম্পের সহায়তায় সেচাই আর চাষ হচ্ছে। পাশেপাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গড়ে উঠেছে বসতি জনপদ।

কত গ্রাম, কত বিচিত্র নাম—সাঙ্গানীর, দীবা, গনের, বেলবা, চাকসু, নিয়ানী। অদূরে এককালের রাজবন্দীদের ক্যাম্প দেউলী। জয়পুর থেকে মাইল চল্লিশের পথ পেরিয়ে—বনস্থলী। নামেই নয়, পরিচয়েও ভিন্নতর। ধূলিধূসরতা আর ন্যাড়া চেহারায় হয়ত আশেপাশের গাঁয়ের সঙ্গে তেমন পার্থক্য কিছু নেই, কিন্তু বনস্থলীর আজ অন্যতম পরিচয় এক বৃহৎ বিদ্যায়তনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে। বছর পঁয়ত্রিশ আগে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে ছোটদের যে শিক্ষায়তনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তা সম্পূর্ণাঙ্গ এক মহিলা বিদ্যাপীঠের আকার গ্রহণ করেছে। এখানকার পঞ্চমুখী শিক্ষার মানসিক তথা শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ্লাইডিং বা ফ্লাইং-এর আয়োজনেও কর্তৃপক্ষের সমান উৎসাহ। নার্সারী থেকে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ব্যবস্থা যেখানে, শিল্পশিক্ষা সেখানে থাকবেই, সেটা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

আর এই শিল্প ব্যাপারেই বনস্থলীর আজ স্বকীয় এক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভিত্তি বা দেওয়াল-চিত্র, বিশেষত রাজস্থানী-জয়পুরী রীতি-প্রকরণ ও তার প্রয়োগে উৎসাহ প্রদানের ফলেই বিদ্যাপীঠ আজ এক নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে পেরেছে।

ভারতশিল্পে ভিত্তি-চিত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহাকাব্য, পুরাণ বা প্রাচীন সাহিত্যে ছবি আঁকার উল্লেখ মিললেও পুরানো কোনও ছবির নিদর্শন অমিল। হয়ত কোনও স্থায়ী মাধ্যমে সে শিল্পের চর্চা হত না। গুহা-গাত্রে আঁকা চিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটে তাতে বেশ বোঝা যায় যে, রাজশক্তির মহিমা বা ধর্মমত প্রচারের আকাঙ্ক্ষা যে কারণেই হোক, শিল্পীদের সে যুগে কাজের সুযোগ মিলেছিল। গুপ্ত আমলে অজন্তার এবং প্রায় সমকালীন বা কিছু পরের বাঘগুহার, বলা যেতে পারে, ভারতীয় ভিত্তি-চিত্র উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে-ছিল। সন্দেহ নেই এ ধারা ক্রমে ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। হয়ত মন্দির পরিকল্পনায় ভাস্কর্যে-রূপ-প্রাধান্য এর অন্যতম কারণ। তবে যেভাবেই হোক, একেবারে কিন্তু এর বিলুপ্তি ঘটেনি। ইলোরা, শীত্তনাভাসল্, এমন কি আরও পরের অনেক মন্দির ও প্রাসাদ-গাত্রে, সুদূর কেরল পর্যন্ত ভিত্তি-চিত্রের বহু সন্ধান মিলেছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে রাজস্থানে এ ধারা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, যদিও মিনিয়েচার বা ছোট আকারের ছবিই সেখানে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল।

উদয়পুর, বিকানীর ইত্যাদি স্থানে রাজপুতানার প্রাসাদ-সজ্জার অঙ্গ হিসেবে ভিত্তি-চিত্রের দেখা মেলে। ভিত্তি-চিত্রের রেওয়াজ ক্রমে জোরালো ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অষ্টাদশ শতক নাগাদ জয়পুরে

ভুবন হান্দুই কৃত দেওয়াল-চিত্র

বিকাশ ভট্টাচার্যের করা ভিত্তি চিত্র

এ কাজের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। মুঘল আমলেই জয়পুরী কাজ সুপরিচিত ছিল। মুঘল-মহিমা লুপ্ত হওয়ার পরেও কুলু কাংড়ার নানা পাহাড়ী রাজ্যে কাজের জন্য জয়পুরী শিল্পী কারিগরদের ডাক পড়ত বলে জানা যায়। সন্দেহ নেই, শ্বেত পাথরের গুঁড়ো, চুন, নানা ধরনের পাথুরে ও মেটে রঙের সহজলভ্যতা ও সর্বোপরি পরম্পরা জয়পুরী ধারাকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল।

প্রধানত চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভিত্তি-চিত্রের জয়পুরী ধারাটি অবলুপ্তির পথে চলেছিল। এ শতকের গোড়ার দিকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের এ ধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটানোর কথা চিন্তা করেন। পরে আচার্য নন্দলালও ছাত্রদের এ বিষয়ে শিক্ষাদানে সচেষ্ট হন। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কিত এক আলোচনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জয়পুরী এক শিল্পী-কারিগর শ্রীনরসিং লাল বিশেষ আমন্ত্রণে কলাভবনে এসেছিলেন এবং শিল্প-প্রকরণ ও প্রয়োগ-বিদ্যায় ছাত্রদের সহায়তা করতেন। কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যেমন পাথরগুঁড়ো ও চুনের মিশ্রণে রকমফের বা রঙের বাঁধুনি হিসেবে কখনও গঁদ, কখনও বা শিরীষের ব্যবহারের কথা, কিংবা দই মেশালে নাকি চুনের ময়লা থিতিয়ে পড়ে ও ব্যবহৃত রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে ইত্যাদি বিষয়ও উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়।

জয়পুরী রীতি শিক্ষণ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কিছু লোককে ভাবিত ও উৎসাহিত করেছিল। জয়পুরের শিল্পী শ্রীদেবকী-নন্দন শর্মা এঁদের একজন। বছর কুড়ি আগে শান্তিনিকেতনে একবার গিয়ে বিষয়টা তিনি জানতে পারেন এবং নিজেও এ সম্পর্কে কিছু করতে বদ্ধপরিকর হন। কর্মসূত্রে বনস্থলীতে থাকায় নিজেরও কাজের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি ভিত্তি-চিত্রে উৎসাহ দানের এক প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে গ্রীষ্মকালীন অবকাশে সংক্ষিপ্ত এক দ্বি-মাসিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কথা তিনি বলেন। কাছাকাছি শিল্পী-কারিগর পাবার অসুবিধাও ছিল না। সব মিলিয়ে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে তাই বিলম্ব হয়নি। গত বছর পনেরো যাবৎ এ কার্যক্রম কেবল চলছেই তা নয়, যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনেও সেটা সক্ষম হয়েছে।

বহু শিল্পী, বহু গুণীর পদার্পণ ঘটেছে বনস্থলীতে বিগত কয়েক বছরে। অনেকে গেছেন নিছকই ঔৎসুক্য নিয়ে দেখতে। তাঁদের ভেতর অসিতকুমার হালদার, মুলকরাজ আনন্দ ও কে জি সুব্রহ্মণ্যমের নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বহুজন সেখানে গিয়ে থেকেছেন, নিজেরা কাজ করেছেন। আর প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী কেবল ঔপপত্তিক দিক জানা বা একটু পরীক্ষা চালানো নয়, হাতেকলমেও কাজ করতে হয় সবাইকে। ফলে, বিদ্যা-পীঠের একটির পর একটি ভবনের দেওয়াল, প্যানেলের প্যানেলে আজ শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সেসব শিল্পীদের মধ্যে শৈলেন দে, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, এস এন বেন্দ্রে, কৃপাল সিং শেখোয়াত, জ্যোতি ভট, শান্তি দভে, দীনেশ শা, সুখময় মিত্র, আজমত শা, আদিমূলম্ এবং পি এন

বনস্থলীর লোকশিল্পের নমুনা

ছাত্রদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বহিরাগত নেপাল ও সিংহলের শিল্পী এবং বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের কাজ তো আছেই। নানা রকমারি স্টাইলে করা সব ছবি। মূর্ত, প্রায় বিমূর্ত ও মণ্ডনধর্মী নানা বাহারের সব কাজ। সব মিলিয়ে বনস্থলীতে গড়ে উঠেছে এক বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য গ্যালারী। একই জায়গায় সাম্প্রতিক ভিত্তি-চিত্রের এত বিপুলকর ও বৈচিত্র্যময় সমাবেশ আর কোথাও মেলে না। বনস্থলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানেই।

ভিত্তি চিত্রের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টায় বনস্থলী কর্মসূচীর পরোক্ষ ফলও কিছু দেখা যাচ্ছে। আজ বরোদায় শিল্প-শিক্ষাক্রমেও ভিত্তি-চিত্র একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য বহু বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের তরফেও প্রতি বছর শিক্ষার্থী দল প্রেরিত হচ্ছে বনস্থলীতে। হয়ত বা তাঁরা ফিরে গিয়ে সুযোগমতো নিজেরা দেওয়াল-সজ্জায় সচেষ্ট হবেন। কেন্দ্রীয় ললিতকলা আকাদমীও কার্যসূচীর গুরুত্ব অনুধাবন করে বনস্থলীতে একটি পেন্টার্স ক্যাম্প বা শিল্পী-শিবির বসিয়েছেন এ বছরে।

ক্যাম্পে আমন্ত্রিত অংশ গ্রহণকারী ছ'জন হলেন : কলকাতা থেকে গণেশ হালুই ও বিকাশ ভট্টাচার্য, মাদ্রাজ-এর (বর্তমানে দিল্লীর বাসিন্দা) কে ভি হরিদাসন, চণ্ডীগড়ের রূপচাঁদ, বম্বের পি এম কলাটে এবং হায়দ্রাবাদের কে শেষগিরি রাও। গ্রীষ্মের খর তাপ বা অন্য কোনও কিছুই এঁদের প্রাণোচ্ছলতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। হাসি-গল্পে-গানে এবং সর্বোপরি কাজের আন্তরিক উৎসাহে হপ্তা দুয়েক যেন কোথা দিয়ে ফুরিয়ে গেছে। কেবল শেখা বা কাজ করা নয়, এঁরা ঘুরেছেন ও দেখেছেন আশে-পাশের সব। কি সন্নিকটস্থ হনুমানজীর মন্দির, কি গ্রাম্য ও লোকায়ত শিল্প সৃষ্টি, সবই তাঁরা সমান উৎসাহে নিরীক্ষণ করেছেন। তাই আশেপাশের গাঁয়ের দেওয়াল-দরজার উপরে করা ছবি নকশাও তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছে অনেককে। নিজস্ব স্টাইল তো ছিলই। ফলে শিবির-অন্তে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ক'টি ভিত্তি-চিত্র। বনস্থলীতে নতুন এক সংযোজন। কিংবা বলা যেতে পারে, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের অভিনব এক সম্পর্ক স্থাপনা।

বনস্থলীই তো আজ অগ্রগমনের নতুন এক কাহিনী।

শান্তিনিকেতনে কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণ সকালে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের তিরোধান-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান শেষে দেখা কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। অবশ্য কয়েকজন পরিচিত আশ্রমবাসীর সঙ্গে আলাপরত তিনি। পরনে খদ্দরের পাজামা, পাঞ্জাবি—গলায় ঝুলছে শান্তিনিকেতনের বৈদিক উত্তরীয়। সেদিন অনুষ্ঠানে আর কেউ-ই ঐ উত্তরীয় ধারণ করেননি—অথচ প্রবাসী কবি এখনও শান্তিনিকেতনের উৎসবের সজ্জাটি ভুলে যাননি! প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন—"তোমাকে আমার প্রয়োজন। খবরের কাগজের সঙ্গে যোগ আছে তোমার—কিছু খবর দেব তোমাকে। বাড়িতে এলে খুশি হব।" সানন্দে রাজি হলাম। বাইশে শ্রাবণ—এই পুণ্যদিনে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়াটা লোভনীয় মনে হল আমার কাছে।

শান্তিনিকেতন থেকে যে-পথ গেছে গোয়ালপাড়া গ্রাম ছাড়িয়ে কোপাই নদীর দিকে—তারই বাঁ পাশে উত্তরায়ণ আর ডান পাশে বাসা বেঁধেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। বাড়ির নাম রাসুকা। সুপরিচ্ছন্ন বাড়ি—সুসজ্জিত বাগান। সেখানে পৌঁছতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন কবির বিদেশিনী পত্নী—রবীন্দ্রনাথ যাঁর নাম রেখেছিলেন—হৈমন্তী দেবী। তিনি তখন বাগান-পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত। জানালেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ডঃ চক্রবর্তী উত্তরায়ণ থেকে ফিরে আসবেন—অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। বসার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন—"আজ আশ্রমে বৃক্ষরোপণ হবে—বাড়িতেও আমি সেই বৃক্ষরোপণই করছি। পাঁচটি দেবদারুর চারা রোপণ করলো আজ।" শান্তিনিকেতনী-শিল্প-রীতিতে সাজানো বসার ঘরে অপেক্ষা করছি এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন কবি। দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিলেন নিজেকে। বিষাদের সুরে থেমে থেমে বললেন—"উত্তরায়ণ ঘুরে এলাম। গত ডিসেম্বরেও প্রতিমা দেবীকে দেখে গেছি। এবারে মনে হল উত্তরায়ণ যেন ভাঙা হাট। ওখানকার সব আলো নিবে গেছে। প্রাণহীন হয়ে আছে বাড়িগুলো। আমার জীবনের অনেকগুলি স্তরের সঙ্গে উত্তরায়ণের যোগ। তাই মনে হয় উত্তরায়ণকে শুধু স্মৃতির পিঞ্জর করে রাখলে চলবে না। বাড়িগুলিতে অফিস বসানোও শোভন নয়। সমগ্র উত্তরায়ণকে ক্রিয়াশীল প্রাণচঞ্চল কেন্দ্র করে তুললে সবচেয়ে ভালো হয়। পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন সেখানে থাকবে ঠিকই—কিন্তু সেখানে যেন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। যদি পড়াশুনো-গবেষণা ইত্যাদি কাজ সেখানে চলে—ছাত্র-অধ্যাপক-গবেষকের দল সেখানে যদি ভিড় করে থাকেন—তবেই উত্তরায়ণ আবার প্রাণবন্ত সজীব হয়ে উঠবে।"

একটানা কথা বলার পর থামলেন কবি। জানি—শ্রীচক্রবর্তীর কাছে আমার মতো লোকের কিছু বলার থাকে না। তিনিই শুধু কথা বলেন—আমাদের তো তাঁর কাছে নিরুত্তর থাকতে হয়। এর আগেও দেখেছি কথা বলতে তাঁর ক্লান্তি নেই—শ্রোতা থাকলেই হল। অসংখ্য বিচিত্র বিষয়ে তাঁর ভাবনা তিনি প্রকাশ করেন এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে—যা আমার কাছে দর্শন ও কাব্যের সমন্বয় মনে হয়। নানা বিষয়ের অবতারণা করেন তিনি—সে আলোচনায় গান্ধী-শতবার্ষিকী, পাস্তেরনাক, লুথার কিং, বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে আরব-ইজরায়েল প্রসঙ্গ পর্যন্ত ওঠে। আমরা জানি তিনি পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর জীবনে। এই দুই মহাদেশের 'পথে পথে বিস্ময়কর চলমান পথিক' তিনি। বর্তমানে নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভারসিটি কলেজে ডঃ চক্রবর্তী অধ্যাপনা করেন। মাস দেড়েকের জন্যে এসেছেন ভারতবর্ষে। পাতিয়ালার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপরে বক্তৃতা দেবেন। তাছাড়া আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে গুরু নানকের পঞ্চম জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে আলোচনা-চক্র বসবে তাতে যোগ দেবার জন্যে শ্রীচক্রবর্তী আমন্ত্রিত হয়েছেন।

এ-সব কথার ফাঁকে কাগজের জন্যে যে-খবর দেবেন বলেছিলেন সে-সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। উত্তরে বললেন,—"এবার দেশে

ফেরার পথে মস্কো ঘুরে এলাম। গিয়েছিলাম টলস্টয়ের বাসভবন ও কৃষি ভবন ইয়াসনায়া পলিয়ানায়। টলস্টয়-সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ এন পুজিন মহৎ স্রষ্টা ও মানবপ্রেমিকের স্মৃতিবিজড়িত ঘর-বাড়ি, পুকুর, বাগান, খামারবাড়ি—সব কিছুই তন্ন তন্ন করে আমাকে দেখালেন। ইয়াসনায়া পলিয়ানা থেকে বিদায় নেবার আগে অধ্যক্ষ পুজিন টলস্টয়ের বাগান থেকে একটি জুঁই ফুলের চারা উপহার দিলেন আমাকে। অনুরোধ করলেন ঐ চারা যদি আমি দিল্লীতে মহাত্মাজীর স্মৃতিপূত রাজঘাটে রোপণ করি তাহলে তিনি ধন্য বোধ করবেন। দিল্লীতে নেমেই রাজঘাটে গিয়ে বিদেশী বন্ধুর বাসনা আমি পূর্ণ করেছি। রুশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে অনেক খবরই তো কাগজে বেরয়। যে-রুশ মনীষীর প্রতি আমাদের মহাত্মাজির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা—তাঁরই স্মৃতিপূত বাগানের চারা রোপিত হয়েছে মহাত্মাজীর সমাধিউদ্যানে—এ-খবরটাও দেশের লোকের জানা দরকার। রুশ-ভারতের আত্মিক মিলন ঘটেছিল এই দুই তপস্বীর জীবনে। টলস্টয়-সংগ্রহশালায় দেখে এসেছি ১৯০৪ সালে মহাত্মাজীর যে-রচনা টলস্টয় সাগ্রহে পড়েছিলেন তা সেখানে সমাদরে সুরক্ষিত।

মহাত্মাজী-প্রসঙ্গে আরেকটি খবর তুমি দিতে পারো। টলস্টয়-সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ পুজিন আমাকে অনুরোধ করেছেন শত-বার্ষিকী বছরে টলস্টয়ের ঐ ইয়াসনায়া পলিয়ানায় গান্ধীজী সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী আয়োজন সম্ভব কি না জানাতে। তাঁর এই প্রস্তাব সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরার কাছে আমি বলেছি। এ-বিষয়ে তাঁর তো খুবই উৎসাহ দেখলাম। ইন্দিরা বলেছেন—তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব তা করবেন।"

খবরের কাগজের সংবাদ প্রসঙ্গটা শেষ হলে জানতে চাইলাম এবার রাশিয়া-ভ্রমণে তাঁর কাছে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কি মনে হয়েছে। একটু থেমে বললেন—"এই নিয়ে পাঁচবার আমার রাশিয়া-ভ্রমণ হল। প্রথম-বার গেছি গুরুদেবের সঙ্গে। তাঁর মতোই রাশিয়া-ভ্রমণ আমার কাছে তীর্থ-ভ্রমণ তুল্য সন্দেহ নেই। শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল রাশিয়ানদের আমার ভালো লাগে। তাঁদের সামগ্রিক উন্নতিতে চিরকালই বিস্ময়বোধ করেছি। এবারেও মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের সৌজন্যে, আন্তরিকতায় ও সহৃদয়তায়। তবে একটা ব্যাপারে সোভিয়েট-দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে আমার কাছে। এবারে শুধু টলস্টয়ের বাসভবন দেখে আসিনি— মহান্ স্রষ্টা পাস্তেরনাকের বাড়িও দেখে এসেছি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের অবহেলিত বাড়ির জীর্ণদশা দেখে বেদনা অনুভব করেছি। সোভিয়েট সরকার পাস্তেরনাকের বাসভবনটিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে খুশি হতাম। অথচ রুশ-জনগণের কাছে পাস্তেরনাক যে-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পান—তার পরিচয়ও এবার পেয়েছি। গিয়েছিলাম পাস্তেরনাকের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করতে। ভাবনা ছিল সমাধি প্রাঙ্গণে অসংখ্য সমাধির মধ্যে কোনটি পাস্তেরনাকের তা চিনবো কি করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেখানে গিয়ে খোঁজ করতেই উপস্থিত রুশীরা সশ্রদ্ধভাবে আমাকে চিনিয়ে দিলেন পাস্তের-নাকের সমাধিবেদী। বড়ো ভালো লাগলো—ভাবলাম, সত্যিই—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাবার কোনো কারণ ঘটে নি।"—

এবার প্রসঙ্গান্তরে এলেন কবি। তাঁর সামনের টেবিলের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজ ও চিঠিপত্রের পাশে রয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'—আর কবি 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'। দুটি বই-ই মনে হল নতুন পাওয়া। জানালেন আইয়ুবের বইটি তিনি এখনও সম্পূর্ণ পড়ে উঠতে পারেন নি—তবে অদূর ভবিষ্যতে বইটি সম্বন্ধে একটি সমালোচনা লেখার ইচ্ছা তাঁর আছে। বললেন—"অসাধারণ সজ্জন, অমায়িক ও বৈদগ্ধের অধিকারী আইয়ুব সাহেব আমার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহখানা হাতে তুলে নিয়ে শ্রীচক্রবর্তী প্রথমেই বইটির সুপ্রকাশনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বাংলা বইয়ের এমন সুন্দর প্রচ্ছদ, বাঁধাই ও মুদ্রণ তিনি নাকি বেশি দেখেন নি। তারপর সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে বললেন,—"বৈদান্তিক পিতার পণ্ডিত ও মনস্বী পুত্র ছিলেন সুধীনবাবু। অন্য পাঁচজন সহৃদয় পাঠকের মত আমিও তাঁর বৈদগ্ধ্য ও মনীষিতা সব সময়ে অনুভব করেছি। অনেকের মতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুরূহ—হয়ত তাই। তবে তাঁর কবিতার রসাস্বাদনের জন্যে পাঠককেও সনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করতে হবে। দুঃখ এই যে, সুধীনবাবু অকালে বিদায় নিলেন, তাঁর কাছে আমাদের আরো বেশি প্রত্যাশা ছিল—সে প্রত্যাশা পূর্ণ করার সময় পেলেন কই?"—

কথায় কথায় অমিয়বাবু বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গ তুললেন। জানতাম তিনি তা তুলবেন—আগেও দেখেছি বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলেই তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বুদ্ধ-দেবের তিনি বিশেষ ভক্ত। এবারেও বললেন, —"বুদ্ধদেববাবুর একান্ত অনুরাগী আমি। তাঁর গদ্যরচনা আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করে। তিনি আমাদের গদ্যসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারতেন। তাই আপসোস হয়—তিনি আরো গদ্যরচনা করেন না কেন? তাঁর 'সবপেয়েছির দেশ'-এর এখনো কি সমাদর হয়? শুধু বাংলা নয়—বুদ্ধদেব-বাবুর ইংরেজী রচনারও বড়ো ভক্ত আমি, হয়ত অনেকে জানেন না তাঁর ইংরেজী 'যথার্থই আধুনিক'।

তবে ভালো লেগেছে এইজন্যে যে, বুদ্ধদেববাবু নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' অতি চমৎকার হয়েছে—মুগ্ধ হয়েছি আমি—অসাধারণ উৎকৃষ্ট রচনা মনে হয়েছে আমার। এভাবে তিনি যদি নাটকের একটা ধারা ধরেন তবে তাহলে বাংলা নাট্যসাহিত্য অবশ্যই উপকৃত হবে বলে আমার ধারণা।"

ঘণ্টাখানেকের জন্যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তার মধ্যে টুকরো টুকরো যে-সব আলোচনা হয়েছিল—তারই কিছু কিছু উল্লেখ করলাম। তাঁর আলোচনায় রাজনীতির ছোঁয়াও ছিল। বলেছিলেন আরব-ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা লেগেই রয়েছে—সামান্য ভুল পদক্ষেপ হলে মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। মানবদরদী কবি সখেদে জানালেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকা যা ব্যয় করেছে—তার এক শতাংশও যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হত—তবে এশিয়াতে কোনো সমস্যা থাকত না। মানুষের প্রতি কবি অমিয়চন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধা, অপরিমেয় ভালোবাসা ও অগাধ বিশ্বাস। বিশ্ব-ভাবনাও তাঁর হৃদয়ে সর্বদা বিধৃত। শান্তি-নিকেতনে বসে এ-ধরনের মানুষের সাহচর্য পাওয়া আজকের যুগে আর সুলভ নয়।

অথচ বিশ্বপথিক এই মানবসন্ধানী তাঁর জীবনের ঘট পূর্ণ করেছিলেন শান্তি-নিকেতনেই—বিশ্বভারতীর স্রষ্টার আদর্শ তাঁর জীবনের প্রতি পাপড়িতে পাপড়িতে প্রতিফলিত—প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় প্রতিভাত! রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর প্রতিভূরূপে বিশ্বভারতীর আদর্শকে বহন করে যিনি পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশে পাড়ি দিয়েছেন—তিনি রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরঙ্গ সহচর কবি অমিয় চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে

সুবোধ পুরোকায়স্থ

এ কথা প্রথমেই স্বীকার্য যে, সকল উপভোগের ক্ষেত্রে বস্তুত সহজাত রুচি ও সামর্থ্যই বিচারকের আসন গ্রহণ করে থাকে। এই কারণেই একজনের বিচারে যা অনবদ্য অপর আরেকজনের বিচারে তা-ই অপাংক্তেয়। একজনের পক্ষে যা নিতান্ত সহজ অপর ব্যক্তির পক্ষে তা-ই একান্ত দুঃসাধ্য। সংগীত উপভোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃশ্যই চোখে পড়ে।

যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের উৎকর্ষ উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা তা স্বভাবতই পারেন, চর্বিত খাদ্য গলাধঃকরণের মতই কোন সচেতন চেষ্টা ব্যতিরেকেই পারেন। আর যাঁরা তা পারেন না তাঁরা কিছুতেই পারেন না, সম্ভবত কোথাও একটা অনতিক্রম্য বাধা আছে বলেই পারেন না। এই কারণেই, একই আসরে পাশাপাশি উপবিষ্ট দুইজন শ্রোতা একই গান শুনে যে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করতে পারেন সে-সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায় না। এবিষয়ে গভীরের অনুসন্ধান অনাবশ্যক। অনুরূপ একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতি-ভাণ্ডারেই সঞ্চিত আছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ৩০।৩৫ বছর আগে, এক সংগীতের আসরে। এক-একজন উচ্চাঙ্গসংগীত গায়কের ঘণ্টাব্যাপী তান-বিস্তার শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য এদের ধ্বনিকে বশে আনার সাধনা! কেউ কেউ আবার বেশ সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। এরা যদি এতটা উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীর শান্তভাবে দক্ষশিল্পীর মত রাগরাগিণীর কেবল সেই অংশগুলিই প্রয়োগ করে দেখাতেন যেগুলো গানের কথার পক্ষে সর্বোত্তম, তবে কী সুন্দরই না হত! কথাকে স্রেফ বাদ দিয়ে সুরটিকে নিয়ে এমন দলাইমলাই-ই বা করছেন কেন! সুরের যতই ঐশ্বর্য থাক, শুধু সুর শুধুই ধ্বনির সংগীত বৈ তো নয়। তেমনি শুধু বাক্য যতই রসাত্মক হোক, আলংকারিক ভাষায় তাকে বড়জোর কথার সংগীত বলা যেতে পারে। এ দুয়ের সার্থক মিলনকেই তো কণ্ঠসংগীত বলবো!

অবশ্য এ বিষয়ে যে মতান্তর থাকতে পারে সেটা জানা ছিল। 'দুর্দান্ত জমে উঠেছে' ধরনের মন্তব্য মাঝে মাঝে কানে আসছিল। সে কথা থাক একজন গায়ক সবে মাত্র গান শেষ করেছেন, মাঝে কিছুক্ষণ বিরতির পর একজন অনামী শিল্পীর গান শোনা যাবে, সকলেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন—সেই স্বল্প অবসরটুকুর মধ্যেই অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব। আসরে বসে শান্ত সমাহিত কণ্ঠে যিনি গান ধরলেন তাঁর নামটি জানা হয়নি কিন্তু সেই অখ্যাত গায়কের অপূর্ব কণ্ঠে গীত একটি রবীন্দ্র সংগীতের আবেদন সুদীর্ঘকাল পরে আজও যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারি।

মনে হল, যেন গানের দুটি মাত্র পংক্তি শুনেই উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এক সহজ সৌন্দর্যের মহিমায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমনও অনুভব হল, যেন এতক্ষণ চোখধাঁধানো ঐশ্বর্য পরিবেষ্টিত হয়ে রুদ্ধদ্বার ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম, সহসা নিজেদের মধ্যে যদৃচ্ছ কোন নৈসর্গিক সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছি। একটি মৃদু হাওয়া যেমন করে সমস্ত বদ্ধ কোণকে নিঃশেষে মুক্ত করে থাকে, মনে হল, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিটি কথা সুর, মীড়, গমক স্পর্শ তেমনি সহজভাবে প্রবাহিত।

শ্রোতাদের চোখে-মুখে মুগ্ধ ভাবলক্ষ্য করে মনের মধ্যে নানা কথাই দুর্দমবেগে জেগে উঠছিল। ভাবছিলাম, স্বরসাধনার বাড়াবাড়ির স্থান কোথায় কে জানে! যেখানেই হোক, সে সংগীতকে বাঙালী কখনও তার অন্তরের অন্তঃপুরে স্থান দেয়নি যে-সংগীতে কথা ও সুরের মালাবিনিময় হয়নি। বাঙালী যুগল দেবতার উপাসক, সে রাধার সঙ্গে শ্যাম এবং হরের সঙ্গে গৌরীকে মিলিয়েছে।

গান শেষ হলে নিজের অনুভূতিটা যাচাই করবার কেমন ইচ্ছে হল। কাছেই বসেছিলেন জনৈক স্বল্প পরিচিত ব্যক্তি—উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুরাগক সমঝদার। দুঃসাহসে ভর করে শেষে কিনা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, 'তাহলে রবীন্দ্রসংগীতটা আপনাদের কাছেও ভালই লাগলো, কী বলেন?"

একটু বিস্ময়, অতঃপর চিন্তনে একটা কুণ্ঠিত জবাব এলো, "তা... আপনাদের... রবীন্দ্র সংগীতে তো কাব্যেরই জয়জয়কার, মশাই!"

শুনে মনটা খুবই দমে গিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে এই ভেবেই সান্ত্বনা নিলাম, 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'। বিচার ভঙ্গির পার্থক্যহেতু উত্তরটা অনারূপ হবার উপায় ছিল না।

আমাদের বহুস্তর বিশিষ্ট সমাজের সর্বদাই যে রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগীগণ সংখ্যায় অধিক হবেন সেরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক ভিন্ন ভিন্ন সংগীতের অনুরাগী হয়ে থাকে। তেমনি গীতিকারগণও সকলেই-কিছু একই শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন না।

মাঝি দাঁড় টানতে টানতে, চাষী ফসল কাটতে কাটতে যে-শ্রেণীর গানগুলি সুউচ্চ কণ্ঠে গেয়ে থাকে, সেইগুলোই যে পল্লীকবি বিরচিত খাঁটি পল্লীসংগীত এবিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই। এবং কৃত্রিমতালেশহীন, ছন্দবদ্ধ বাক্যে ও সুরে গ্রথিত ওই সকল গানের যে একটি স্বতন্ত্র রস আছে সেকথাও অনস্বীকার্য। আর এক ধাপ উঠে এসে দেখি, সংগীত ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ছন্দের সঙ্গে উচ্চতর ভাব ও রুচির সংমিশ্রণ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই ধরনের গানগুলি শুনে শ্রোতার মনে স্বভাবতই এরূপ অনুভূতি জাগে যেন ওরই অভিজ্ঞতা, ওরই কথা; কেবল গীতিকার তা সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন মাত্র। ফলে আত্ম-আবিষ্কারজনিত একপ্রকার সুখ অনুভূত হয়। তেমনি, অন্য এক শ্রেণীর গান আছে যা মহত্তর ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে থাকে। ফলে শ্রোতা যা লাভ করেন তা সুখ অপেক্ষা উচ্চতর অনুভূতি। সাহিত্যের পরিভাষায় তাকে লোকোত্তর আনন্দ (Transcendental joy) বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টিতে এই লোকোত্তর শ্রেণীর গানের দৃষ্টান্তের অভাব হবে না:

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে।
আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে॥
সে-সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে-সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ,
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম—
রঙীন ছায়ার আচ্ছাদনে॥
তোমার অরূপ মূর্তিখানি—
ফাল্গুনের আলোকে বসাই আনি।
বাঁশরী বাজাই ললিত-বসন্তে,—
সুদূর দিগন্তে—
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে-উন্মাদনে॥

এ গানের ভাষা ও সুর মন ও মননকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করে। এ গানে তত্ত্ব আছে কিন্তু সে-তত্ত্ব সৌন্দর্যের অনুগামী।

'বৈরাগ্য সাধন' তো নয়, সৌন্দর্যসাধনই হচ্ছে কবির সাধনা। এ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যে কবি তাঁর নাম রূপ পরিচয়হীন 'অন্তরতম' জনের আভাস পেয়ে থাকেন,

অন্তরের মধ্যেই তাকে লাভ করেন। আবার মাঝে মাঝে এমনও তাঁর মনে হয়, এমনতর পাওয়ায় বাস্তবতার আলোক কোথায়, এ শুধুই কল্পনার রঙীন ছায়া মাত্র। উদ্ধৃত গানটি এই মূলে ভাবটিরই গীতিরূপ। কবি তাতে বলেছেন তোমার সঙ্গে আমার এ প্রাণ এক গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে আছে, সে-বাঁধনটি সুরের। তোমাকে পেয়েছি এক অজানা সাধনায়, সে-সাধনার সঙ্গে বকুল-গন্ধ আর কবির ছন্দের কোন অমিল ঘটেনা। তবু মনে হয়, আমি যেন তোমাকে এক রঙীন ছায়ার আচ্ছাদনে ঢেকে রেখেছি। নব বসন্তের শোভার মধ্যে তোমার অরূপ মূর্ত্তিটি আমি মনে জাগাই। পরিবেশের চিত্রকল্পটি সত্যই অপরূপ। সেখানে দেখি, কবির বাঁশিতে বাজছে ললিতবসন্তরাগ; কখন সুদূরে দিগন্তে জেগে উঠেছে সোনার ঝলকানি। কবির মনে হয়েছে, বুঝি তারই সেই বাঁশির তানের প্রতিভাষণে দিগন্তে সোনার আভার কাঁপছে তার 'অন্তরতরের' চঞ্চল উত্তরীয়খানি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল শুধরে নিয়ে কবি বলছেন: 'না, তুমি আমার কথা জানও না। 'তুমি জাননা' এই কথা দুটি যেন সমস্ত গানটিকে এক অপার্থিব অভিমানের সুধায় পূর্ণ করে তোলে।

এ এক অতিসূক্ষ্ম অনুভূতির জগৎ। এখানে তত্ত্ব ও সৌন্দর্য একীভূত হয়ে এক অতীন্দ্রিয়, আনন্দময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। সত্যত শ্রোতা এখানে নবাগত। অথচ আশ্চর্য এই যে কেমন ভ্রম জন্মে, এ যেন তার আপন অনুভূতির রাজ্য, এ রাজ্যের তিনিই অধীশ্বর এবং এর সকল সৌন্দর্য, সকল রসের তিনিই প্রকৃত ভোক্তা।

আসলে শ্রোতার এই সক্ষমানুভূতিটি রবীন্দ্র মানসেরই দান। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে এই পরশমণিটি আমরা লাভ করেছি। এ উক্তির সমর্থন পাই যখন দেখি, সচরাচর রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগীরাই রবীন্দ্রসংগীত থেকে সর্বাধিক আনন্দরস আহরণ করে থাকেন।

রচয়িতাকে রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেও যেসকল গান উপভোগ করা সম্ভব রবীন্দ্র-সংগীত সে-গুলোর সগোত্র নয়। নিশ্চয় করে বলা কঠিন, রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতা ঠিক কতক্ষণ একাগ্রমনে গানটিকেই লক্ষ্য করে চলেন আর কতক্ষণই বা কবির চিন্ময় সান্নিধ্য অনুভব করে থাকেন। আমাদের তো মনে হয়, এই উভয়ক্রিয়া কখনও পরপর, কখনও বা যুগপৎ চলতে থাকে। মনের এই বিমিশ্র অবস্থাকে বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করতে গেলে ময়ূরকণ্ঠী রঙটির কথাই মনে আসে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের মত একজন একান্ত আত্মগত কবির গান উপভোগ করা সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে কতদূর সম্ভব। রবীন্দ্রসংগীতকে মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গান বললে ভুল হবে কি?

আমাদের উত্তরটা এই যে, রবীন্দ্র-সংগীতকে 'জনতা'সংগীত বলে কল্পনা করাই ভুল। অপর পক্ষে, জনগণের কান-লাগা মনলাগা গানের অর্থবোধের ধার ধারে এমন প্রমাণও পওয়া যায় না। সংগীত সকলেই ভালবাসেন, কিন্তু সকলেই একই কারণে ভালবাসবেন এমন যুক্তি নেই। বেশিরভাগ লোকে সুরের মিষ্টতাটুকুই আস্বাদন করে থাকেন এবং তাদের শতকরা ৯০ জনই আবার প্রথম পংক্তির গায়ক। প্রথম পংক্তির এই অর্থে যে, এরা গানটির প্রথম দুচারটি কথাই মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে কতকটা নিজস্ব সুরেই গেয়ে থাকেন। নানা দিক থেকে গানটিকে বিচার করে তার সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ করে থাকেন অল্প লোকেই। তথাপি একথা সত্য, মানবশিল্পের ভেষজাগারগুলিতে আজ পর্যন্ত যে-কটি মনভুলানো ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, অমোঘতায় তার কোনটিই সুরের সমকক্ষ নয়।

বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে একটুকরো মিষ্টি সুর বাজিয়ে রাজপথ দিয়ে চলেছে: হয়ত ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! যেমনি সুরটি কানে এলো তৎমুহূর্তেই উৎকর্ণ হলাম। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে, স্বচ্ছ-শুভ্র মেঘের দল ভেসে চলেছে সেই সঙ্গে সুরটি বড়ই মধুর বোধ হচ্ছে। কিছু যে স্পষ্ট করে বলছে, এমন নয়। তবু শিশুর স্নেহউচ্ছলকল কাকলির মতই কী তার আকর্ষণ! পালিত হরিণ শিশুটি যেমন করে পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার বসন-প্রান্ত ধরে টেনেছিল সুরটিও যেন তেমনি করে আমার প্রাণমন ধরে টানছে! পড়ে রইল হাতের কাজ, ভুলে গেলাম আপন পরিবেশ। আমি যে সওদাগরী আপিসের একজন ছা-পোষা কেরাণী মাত্র এই নিষ্ঠুর সত্যটি মুহূর্তেই বিস্মৃত হলাম। এক অনির্দেশ্য অপার্থিব জগতে আপন মনে কত-কী ভেবে কতক্ষণ যে ঘুরে বেড়াই, চৈতন্যই থাকে না।

এমন কেন হয়? উত্তরটা কঠিন নয়। চুম্বক যেমন আয়ত্তে পাওয়া মাত্রই লোহ-খণ্ডকে আকর্ষণ করে থাকে, সৌন্দর্য যেমন যুক্তির অবতারণা মাত্র না করেই মুগ্ধ করে, এও ঠিক তাই।

কিন্তু প্রচলিত ভাষায় যাদের ওস্তাদ বলা হয় তারা বোধ হয় এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কারণ সুরের সম্মোহিনী মন্ত্রে তারা যেন অতটা কাবু হয়ে পড়েন না। ওস্তাদিই তাদের সংগীতসাধনার পরমা সংসিদ্ধি এবং ওস্তাদিতেই তারা মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সংগীতের যে এরও চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য থাকা উচিত একথা তারা যেন বুঝতে প্রস্তুত নন। এদের সংগীতানুরাগী না বলে সংগীতাসক্ত বললে ভুল পরিচয় দেওয়া হয় কিনা জানিনা।

রাগবিশেষ ব্যবহৃত সুরগুলি নিয়ে হেরফের করার খেলার মধ্যে আছে এক ধরণের আনন্দ। আর সেই সূত্রেই মিলে যায় কণ্ঠক্রীড়াগুলো দেখাবার উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ। কাজেই রাগটীকে খুশিমত আছড়ে দুমড়ে, কমিয়ে বাড়িয়ে এরা এমন সব কাণ্ড করতে থাকেন যার ফলে তার আবেদন সার্কাসের মেয়ে খেলোয়াড়ের চাইতে অধিক রমণীয় মনে হয় না। শিল্প-সম্মতিহীন, স্তূপাকৃতি স্বর সমষ্টির ছড়-ছড়ির মধ্যেই এই জাতীয় সংগীতের চরম উৎকর্ষ স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের মত সংগীতের এরা স্বপতি নন। রাশি রাশি ইট চুনসুরকি আর বিভিন্ন আকারের পাথরকুচিই এদের কণ্ঠ-কামান থেকে সগর্জনে উদ্গীর্ণ হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কজন সুগায়ক আছেন তারা নৈতাকুলে প্রহ্লাদ। তাদের সংগীতে সংযম ও পরিমিতি রক্ষার প্রয়াস স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, সহজাত শিল্পবোধগুণেই তারা উৎরে গিয়েছেন। কিন্তু সাধারণত ওস্তাদী গান মাধুর্যলেশহীন এমন কি বিরক্তিকর। অনেক আচার্যকল্প সংগীত সমালোচক এ সম্বন্ধে সখেদ উক্তি উচ্চারণ করেছেন। সত্য বলতে কি, ওস্তাদগণ 'গা' ধাতুর একটি মাত্র রূপই স্বীকার করেন, সে রূপটি অসমাপিকা রূপ। অথচ, সুমিত সার্থক প্রয়োগ ব্যাপকতা, সুবিহিত সমাপ্তি অর্থাৎ একটি সৌন্দর্যময় পরিণাম এ গুলোই হল মহৎ শিল্পের অন্যতম আবশ্যিক লক্ষণ। কৈ, সাহিত্যের বেলাতে তো পাঠকগণ এমন দাবি করে বসেন না যে, লেখককে তার গোটা উপকরণ ভাণ্ডারটি খুলে, ছড়িয়ে দেখাতে হবে। যিনি বক্তব্যকে সহজেই সুন্দর এবং সুন্দরভাবে সহজ করে তুলতে পারেন তাকেই বলা হয় প্রকৃত বাক্‌শিল্পী। সুর-শিল্পীর কাছে শ্রোতাদের দাবিটা বিপরীত কিছু হবে তেমন মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে আমাদের ভাষাহীন পরিচয়টা অগত্যা আমরা স্বীকার করেই নিয়েছি। কিন্তু কণ্ঠসংগীতকে তো বাঙ্ময়ী বলেই জানি। তার কাছ থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করি যা আভাস কিম্বা অনুমান দ্বারা খণ্ডিত নয়। সংগীত বলতে শুধু সুরই বোঝায়, এবং কথার মূল্য দেওয়া তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর একথা

অংশগুলোই পরিবেশন করা হয়, মিষ্টান্নের মিষ্টান্ন বিতরণ আর কি!

টপ্পার সংগঠন-কল্পনায় বিশেষ করে দানাদার তানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুরটিকে আবেগময় করে তোলার বেশ ফলপ্রদ পদ্ধতি।

তান ও গানকে সমার্থবোধক করে তোলার বেপরোয়া খেয়ালই বোধ করি খেয়াল সংগীতের বৈশিষ্ট্য।

সংযম, শান্তরস, সুগাম্ভীর্য এবং সর্বোপরি সংহত সংগঠন পরিকল্পনার জন্য ধ্রুপদই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। অনেকের মতে, নীতিগত বিচারে এটি রবীন্দ্র-সংগীতের সগোত্র।

অতীতের ভ্রান্তিগুলি পরিবর্জন-পূর্বক তার কল্যাণ ও সৌন্দর্য বিধায়ক সূত্রগুলোকে বর্তমানের মধ্যে ধারণ করার নামই বোধ করি সংস্কৃতি। সব গতিমান শিল্পই এই পথটি অবলম্বন করে থাকে। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে প্রাগ্‌রবীন্দ্রিক সংগীতের সংস্কৃতরূপ বলা যেতে পারে। বিবর্তিত রূপ বলতেও বাধা নেই।

অতি তরুণ বয়সেই কবি হিন্দী টপ্পা, খেয়াল এবং বিশেষভাবে ধ্রুপদগান ভেঙে কিছু সংখ্যক সংগীত রচনা করেন। কিন্তু সেইসব গানের মধ্যেও রবীন্দ্ররসটিই প্রধান ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ওই সকল গানের রূপায়ণে কবি স্বীয় অভিরুচি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সংগীতের অংশবিশেষই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন; বাকী অংশ সম্ভবত স্বীয় আদর্শের পরিপন্থী ভেবেই বর্জন করে থাকবেন।

কবির পরিণত বয়সের গানগুলির মধ্যে ধ্রুপদের সংযম, রাগসংগীতের আবেগ এবং বাউলসংগীতের সহজ মর্মস্পর্শিতার সামগ্রীকরণ অনুভব করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র সুরগুলির বৈশিষ্ট্য বোধ করি এই যে, সেগুলো কস্তুরী ধূপের গন্ধের মত শ্রোতার চিত্তকে মুহূর্তেই এক উচ্চতর ভাবভূমিতে আকর্ষণ করে নেয়। কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন, কোন গুণে সে এমন গুণী? অর্থাৎ রবীন্দ্র সুরের এ হেন অনন্য সাধারণ গুণের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা কী। আলোচ্য বিষয়টাও তাই। এর কারণ হিসাবে, স্বভাবত কবির স্বকীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সুরযোজনার পদ্ধতিটিই উল্লেখ্য। কিন্তু তৎপূর্বে ভেবে দেখা প্রয়োজন,— অন্যান্য সংগীতের পদাঙ্ক অনুসরণ কেনই বা তার মনঃপূত হয়নি।

উচ্চাঙ্গ-সংগীতের কথাই ধরা যাক। আকারে প্রকারে এটা সমুদ্রগামী জাহাজের তুল্য। মিলন-বিরহ প্রভৃতি মানব মনের অতি পরিচিত বন্দরগুলিতেই তার যাতায়াত। তার কৃত্য-কৃতিত্বে রবীন্দ্র সংগীতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। প্রচলিত সুরযোজনার রাজপথটিও বহুদূরগামী নয়। রবীন্দ্রসংগীতের লক্ষ্যস্থল মর্মপুর,— আলোছায়াময় মনের রহস্যঘন সকল অলিতে-গলিতে।

ভাব-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রসংগীতের তুলনা কোথায়? এখানে উচ্চস্তরের কাব্যের কথায় কথায় সুর মেলাতে হয়েছে; কাজটি নিঃসন্দেহে দুরূহ। হয়তো পাশাপাশিই রয়েছে দুটি বিরোধী শব্দ, শব্দ দুটির স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করেই সে দুটিকে মিলিয়ে দিতে হয়েছে সমগ্রের সঙ্গে। কাজেই, এখানে বিশেষ একটি রাগের ধরা বাঁধা গতিবিধি আর সীমিত প্রকাশ ক্ষমতার উপর সব সময়ে ভরসা রাখা চলে না। সূক্ষ্ম কাজের জন্য চিত্রশিল্পীকে সূক্ষ্ম তুলি আর সূক্ষ্মতর হিসাবে নিবদ্ধ দৃষ্টির ব্যবহার করতে হয়, রবীন্দ্রসুরের শিল্পরূপে অনুরূপ নীতিই অনুসৃত হতে দেখি।

অতিদ্রুত বা অতি বিলম্বিত লয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিরাগ লক্ষ্য করা যায়। কারণটা অনুমানের বাইরে নয়। অতি দ্রুত লয় দ্রুতভাষী ব্যক্তির মতই স্বভাব চঞ্চল। অনুক্তি তার অস্পষ্টতা তার চারিত্রলক্ষণ। প্রতিটি কথা ও সুরের যথাযথ স্বীকৃতিদানের মত ধৈর্য তার হাতে নেই। ফল—গীতরসের ভাঙন। অতি-বিলম্বিত লয় বাকভারী। তবু রস সে পরিবেশন করে না সত্য, কিন্তু সুরে সুরে, কথায় কথায় বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দূরত্বের সাধন তার স্বভাবগত ত্রুটি। মনে হয়, এই সকল কারণেই কবি সাধারণত মধ্যলয়কেই তাঁর সংগীতের উপযোগী মনে করতেন।

রবীন্দ্রসংগীত তাল বর্জিত এই প্রচলিত ধারণাটি সত্য নয়। বিশেষ করে তাঁর উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর গানগুলি লক্ষ্য করলে পরিচয় মেলে যায়, তালের সংযত ব্যবহারের প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সমর্থন করতে পারেন নি তালের অনুপ্রাসবৃত্তি আর সীমা ছাড়ানো বিস্তার। রাজকীয় [illegible] প্রকার। কবি কর্তৃক ব্যবহৃত [illegible] সুরের [illegible] রবীন্দ্রনাথের সুরগুলো একাধারে সহজ ও দুরূহ, [illegible]।

রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলী আর তাঁর সূক্ষ্ম কারুকাজের অনুসন্ধান করতে হবে তাঁর অগণিত সংখ্যক সুরের [illegible] বিন্যাসে, একটি দুটি সুরের আশ্চর্য তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগে, তালের সংযত ও সার্থক ব্যবহারে, কখনও ছোট্ট একটি মীড়ে বা গমকে, কখনও বা অভাবিত একটি স্পর্শে।

এ থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে, আমি রবীন্দ্রসুরের একটি [illegible] ফেরকরলুম। অভিযোগের চেষ্টায় [illegible] এ কথা কেন না বলতে সক্ষম যে, কোন নকল কারখানা রবীন্দ্রকাব্য থেকে [illegible] গোটা কয় শব্দ আর অলংকারের সস্তা সমাবেশ ঘটাতে পারলেই তা রবীন্দ্রকাব্য হয়ে উঠবে না। শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ অংশটি সর্বদাই শিল্পীর অবচেতন মনের এক অনির্বচনীয় প্রক্রিয়াতেই যেন সাধিত হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয় স্বাতন্ত্র্য। সুতরাং বিশ্লেষণের পথটি ছেড়ে দিয়ে অবশেষে এ কথাই বলতে হবে, সুরবিন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই [illegible] সুতরাং তাঁর [illegible] আশাপ্রদ নয়।

নিতান্ত বালক বয়সেই সংগীতের সঙ্গে কবির যে-একটি যোগ [illegible] তাঁর প্রথম [illegible] পরিণত হয়েছিল। [illegible] ভাষাহীন [illegible] অলৌকিক [illegible] ছিলেন না, [illegible] ক্ষেত্রে তিনি [illegible] সেই কারণে [illegible] সুরগুলি—[illegible] রবীন্দ্রসংগীত মিলবে না।

রবীন্দ্র সুরগুলি শান্তরসে [illegible] সার্বজনীন, সংযত অথচ আবেগপূর্ণ, [illegible] অন্তরঙ্গ। রচয়িতা [illegible] গানের প্রতিটি কথাকেই [illegible] মত সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে [illegible] আলো করে সেগুলো ফুটে উঠেছে তা ছাড়া [illegible] অতি সূক্ষ্ম রসপর্দা পর্যন্ত তিনি শ্রোতার অনুভবগম্য করে তুলেছেন।

কিন্তু বিপরীত মতবাদও [illegible] এমন লোক আছেন যাঁদের মতে রবীন্দ্রসংগীতের সুরাংশ দুর্বল। এ বিষয়ে তাঁদের অকাট্য যুক্তিটা এই যে, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি হতে পারেন, ওস্তাদ তো নন; সংগীতের কতখানিই বা তিনি জানতেন? কণ্ঠ সাধনাই বা কত [illegible] করেছিলেন? আমাদের বিশ্বাস সুরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার [illegible] হয়েই তাঁরা এমন কথা বলে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় মনে করে থাকেন, [illegible] লোকার আদর্শে সুরটিকে যিনি যত বেশী

কথাকে বোঝাই করতে পারেন তিনিই তত বড় সুরকার। ধারণাটা কতখানি যুক্তি-ভিত্তিক ভেবে দেখা দরকার।

প্রতীকতাহীন ধ্বনির সমন্বয়েই সুরের সৃষ্টি: তাই সুরের ভাষা বহুলাংশেই অনুমান সাপেক্ষ অথচ কথা ও সুরের ঐকতান ঘটিত আবেদনই হল গীতিরস। সুতরাং গানের কথার পরিপ্রেক্ষিতেই সুরের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার্য। অর্থাৎ ভাষার সঙ্গে ভাষাহীন সুরের আকুতির একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করাই সুরকারের চিন্তা-নীয় বিষয় এবং একমাত্র কর্তব্য। ভাষা-নিরপেক্ষ কাজ হয়তো সুর আর বক্তব্যের সঙ্গে সংস্রবলেশহীন অলংকৃত বাক্য সৃষ্টির মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলনটি তাৎপর্যে সহজ অথচ আবেগে সুন্দর। মনে হয় অন্তর প্রকাশের স্বাভাবিক ক্রমেই কথাগুলি যেন স্বতঃই সুর হয়ে উঠতো। কবি এই সুরের কাজটি বিনা সমারোহে এবং অবলীলাক্রমেই সম্পন্ন করেছেন।

সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষা পেল কি পেল না, রবীন্দ্রনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। কোনোকালে বিচারপদ্ধতিক রাগাদির ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর যে কোন সংস্কার ছিল তেমন লক্ষণ দেখা যায় না। তাঁর বহুসংখ্যক গানে কাব্যোচিত সুর দেখতে পাই। আবার কাব্যবিরোধ দোষ ঘটেছে এমন গানের সংখ্যাও বিস্তর। পারম্পর্যিকতা রক্ষার মধ্যে কবিকে কখনও দেখতে হয়নি। বরং দেখি, সর্বত্রই তিনি স্বকীয়-রীতির কার্যকারিতা প্রমাণে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুরের বাদশা। ভৈরবীতেও তিনি বেহাগের বেদনা জাগিয়ে তুলতে পারতেন, তাতে গভীর রাত্রের ছন্দ-কল্পটি এতটুকু অনুজ্জ্বল প্রতীয়মান হত না। বসন্তরাগে না শুনলেও 'রোদন ভরা এ বসন্ত' গানের প্রাণের বেদনাটি বোঝো আনাই আমরা অনুভব করতে পারি, কোথাও এতটুকু অস্পষ্ট মনে হয় না। রাগপ্রকৃতি যে পরিবর্তনসাধ্য—অর্থাৎ সুরকার তার 'ব্যক্তিত্বের' আরোপ দ্বারা রাগবিশেষের স্ব-ভাবের যে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত কাব্য-বিরোধদুষ্ট সুরগুলি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা গানের সুরগত বিভাগ ছিল দুইটি,—'অস্থায়ী' (স্থায়ী) আর অন্তরা। দুটির অধিক কলিযুক্ত গানের বাকী অংশটি সাধারণতঃ অন্তরার সুরেই গাওয়া হত। সঞ্চারী নামক যে-অংশটি অধুনাতম বাংলা গানে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটি রবীন্দ্র প্রভাবেরই শুভফল। সংগীতজ্ঞগণ এই অংশটিকে পূর্বাঙ্গের সুর বলে চিহ্নিত করতে পারেন, কিন্তু কাব্যগত ও সুরগত বৈচিত্র্যসঞ্চারের পক্ষে এই যোজনাটির মূল্য অনস্বীকার্য। সঞ্চারি কথাটার তাৎপর্য ঠিক তাই কিনা আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নই। স্বর্গীয় বন্ধুবর সুরসাগর (হিমাংশুকুমার দত্ত) রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী অংশের অপূর্বতা স্বীকার করে বলতেন, 'সত্যই অপূর্ব'। বিশিষ্ট সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ও বলেন, 'অতুলনীয়'। আমরা কিন্তু এতদুভয়ের একত্র ব্যবহারেরই পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরগুলির মধ্যে একটি নৈসর্গিক সরলতা ও প্রবহমানতা আছে, সম্ভবতঃ এই কারণেই ওস্তাদ-পন্থিগণ রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি এক ধরনের অনুকম্পার ভাব পোষণ করে থাকেন। তাদের ধারণাটা যেন এই যে, বিশেষক্ষেত্রে

সহজ হওয়াটাই জগতে সব চেয়ে সহজ ব্যাপার। 'উচ্চাঙ্গসংগীতের' লক্ষণগুলি খুঁজে না পেয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে কেউ কেউ লঘুসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করার ঝোঁক প্রদর্শন করে থাকেন। জগতে গুরুত্ব আরোপের একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকাতে এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়। যার রূপ সহজ তার রূপায়ণ একান্ত দুরূহ হতে পারে। শিউলি ফুলের গঠনও সরল কিন্তু রূপরসিকের চক্ষুদুটি ওই একরত্তির অকূল পাথারেই দিক হারিয়ে বসে আছে! এমন যে পদ্ম ফুল, তার শিল্পায়নে তো প্রকৃতির কোন পালোয়ানীর চিহ্ন দেখা যায় না। ওই তো কয়েকটি রেখার সৌন্দর্য! কিন্তু ওইটুকুর জন্যই এত তার সমাদর। একবর্ণ হয়েও সে বিচিত্র।

এমন মত প্রচলিত আছে, কাব্যাংশের গুণেই নাকি রবীন্দ্রসংগীতকে এমন গুণান্বিত মনে হয়। অদ্ভুত কথা! বর্ণহীন জল যেমন রঙীন কাচপাত্রটির রঙেই রঙীন দেখায়, যেন সেইরকম একটা বস্তুধর্মগত ব্যাপার! গানের ক্ষেত্রে কাব্যাংশের এতটা মাহাত্ম্য কি সত্যই লক্ষ্য করা যায়? আমাদের কিন্তু বিপরীত অভিজ্ঞতাই আছে। এমন বহুসংখ্যক 'জনপ্রিয়' গানের কথা আমাদের জানা আছে যেগুলো সম্বন্ধে ভাবলে সুরে অবমতারণ মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সুরগুলির সম্বন্ধে হীনতাসূচক উক্তির অসারতা বিনাতর্কে তৎক্ষণাৎ খণ্ডিত হয়ে যায়, যদি কোন সুরকার যে কোন একটি রবীন্দ্রসংগীতে নিজস্ব সুরযোজনা করতে সম্মত হন। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে, সুরটি কাব্যাংশের গৌরব লাভ করেনি, উল্টো কাব্যাংশের গৌরবহানিরই কারণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁর সুরের উপর সামান্যতম হস্তক্ষেপেও বিরত বোধ করতেন তার হেতুটা তো এই।

কারো কারো মুখে এমন কথা শোনা গেছে, রবীন্দ্রসংগীতে সংগীত পদবাচ্য যদি কিছু থেকে থাকে তবে সে তার ওই খান-কতক উচ্চাঙ্গ ধাঁচের গানেই আছে।

সম্ভবতঃ কবির 'মম কাজে মনোমোহন আইল' শ্রেণীর ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলির কথা স্মরণ করেই এরূপ মন্তব্য করা হয়। ওই অপূর্ব গানগুলি আমাদেরও একান্ত প্রিয়, কিন্তু উচ্চাঙ্গ ধাঁচের বলেই নয়।

নিপুণ[illegible] রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা সর্বত্রই যে অভিজ্ঞ, এমন নয়। কবির কোন কোন প্রবন্ধের ভাষা রীতিমত গাম্ভীর্য-পূর্ণ। বিস্তর সংস্কৃত শব্দ ও দীর্ঘ-সমাসবদ্ধ পদ ওই সকল রচনার মধ্যে সঠিক স্থানটি অধিকার করে আছে, এমন দেখা যায়। সে সব রচনাপাঠে সাহিত্যরসিকগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু সমাসের ঘটা দেখেই যে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যান তেমন মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। প্রত্যুত, রবীন্দ্রসুলভ চিন্তার সূক্ষ্মতা ও ব্যঞ্জনার মোহনীয়তা সেই সব রচনাগুলোর মধ্যেও যে পূর্ণ প্রকাশিত, আনন্দের কারণ সেইখানে।

খাটো সংলাপ 'বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে' শিশুকে ভোলায় যে-রূপে তার মূলে আছে চঞ্চলতা; আবার রুক্ষ নিশীথে নিরন্তর অরণ্যশিরে জেগে ওঠে যে-সুগম্ভীর সৌন্দর্য তারও কারণ তাই। কল্পনা, মধুর জানু, গম্ভীর সকল ধরনের রবীন্দ্রসংগীতের উপভোগ্যতার মূলে রয়েছে একই সত্য—অর্থাৎ রবীন্দ্রিক সুরবিন্যাস। আলোচনার সুরগুলির প্রসঙ্গে কবি তার সাঙ্গীতিক শক্তির খর্ব করেন নি। অথচ এই বাক্যের ফলশ্রুতিতেই আমরা রবীন্দ্ররস বলে অভিহিত করেছি।

রবীন্দ্রসংগীতের কেমন একটা একঘেয়ে ভাব, সব গানেরই যেন এক সুর—এই ধরনের একটা কথা কোন কোন মহলে প্রচলিত আছে। হঠাৎ শুনলে মনে হতে পারে, হয়ত কথাটাতে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? রবীন্দ্রসুরের বৈশিষ্ট্যগুলো এতই তীক্ষ্ণ যে, রবীন্দ্র সুর বলে চিনতে বিশেষ বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাকে একঘেয়ে বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

প্রতিভাবান স্রষ্টামাত্রেরই একটা সুস্পষ্ট স্বকীয় ছাঁদ বা style থাকে। অভিনেতা শিশিরকুমারেরও অবশ্যই সেটা ছিল। তবু, তিনি যে-বেশে, যে-ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন, তিনি যে শিশিরকুমার ভিন্ন অপর কেউ নন সে কথা জানতে দর্শককে নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। এ থেকে বলা চলে না যে তাঁর রামের ভূমিকা, মাইকেলের ভূমিকা, আলমগীরের ভূমিকা, চাণক্যের ভূমিকা—নিবিশেষে সব-গুলোতেই একই ভাব অথবা সব ভূমিকারই কেমন একঘেয়ে অভিনয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা হঠাৎ মনে উদয় হল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে হয়। তাই, কথাটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলতে হচ্ছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে পারা [illegible] না। দ্বিতীয়বার [illegible] [illegible] সেই একই কথা শোনা গেল। [illegible] কিছুক্ষণ তো উত্তরদাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল। [illegible] [illegible] তাকে নাকি দুখানা রবীন্দ্রসংগীত [illegible] দিতে হবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গানগুলিই হল রবীন্দ্রসংগীত। তিনি বরং এ বিষয়ে [illegible] (শ্রী[illegible] [illegible]) সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক সংজ্ঞা গায়ক সাধারণ সকলেই অবগত আছেন, উক্ত গায়ক একক ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এও মনে হয়, রবীন্দ্রসুরের সংশোধনীয়তা সম্বন্ধে ভেবে থাকেন এমন কিছুসংখ্যক গায়ক নিশ্চয়ই আছেন। নইলে, এই যে একটা অভিযোগ—রবীন্দ্রসংগীতে গায়কের স্বকীয়তা প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়নি—এটা তারা ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারেন?

সাহিত্যিকদের রচনার উন্নতিসাধনের অধিকার কেউই বা পাঠকের থাকবে না—এ মর্মে আজ পর্যন্ত কোন দাবি পাঠক সাধারণের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়েছে কিনা জানা যায় না। সম্ভবতঃ তা করা হয়নি।

কারণ পাঠকগণ জানেন, একজনের শিল্প-কৃতির উপর অপরের আত্মপ্রক্ষেপ অযাচিত এবং একান্ত অশোভন। এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে শুধু এ আশাই করবো, উক্ত অভিযোগের অন্তরালে কতখানি অবিনয় আর আত্মম্ভরিতা যে আত্মগোপন করে আছে একটু ভাবলেই অভিযোগকারিগণ নিজেরাই তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যগুলির সুরগ্রন্থন সম্বন্ধে অনুক্তি অসমর্থনীয়। সেগুলোও এক ধরণের রবীন্দ্রসংগীত বটে।

নৃত্যনাট্যে যদিচ নৃত্যকলারই প্রাধান্য স্বীকৃত, সংগীতকে বাদ দিলে সে অচল হয়ে পড়ে। গীতিহীন নৃত্যনাট্য সর্বজন সুবিদিত বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলীতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। নবসৃষ্ট মৌলিক চরিত্রগুলোর অভিনয় গানের সাহায্য ব্যতিরেকে একক নৃত্যের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়।

উল্লিখিত নৃত্যনাট্যগুলির সুর মোটামুটি দুটী ভাগে চিহ্নিত করা চলে। একটি আবেগাভিত্তিক। যেমন রোদনভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে। এ ধরণের গানের প্রত্যক্ষ আবেদন শ্রোতার হৃদয়ে। নাটকে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর প্রতি সুরগুলি শ্রোতাকে পরোক্ষভাবেই সহানুভূতিশীল করে তোলে। দর্পণের উপরে পড়ে আলোক যেমন প্রথমে দর্পণকে এবং পরে—সে-আলোক যার উপরে প্রতিফলিত হয় তাকেও গোচরীভূত করে থাকে, কতকটা সেইরকম। কিন্তু অপরভাগের সুরগুলির ভিত্তি গতিশীলতা। নাট্যোক্ত বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ের কাজ এই ধরণের সুর-গুলোকেই সম্পন্ন করতে হয়। এমন কি, নাটকের আখ্যানভাগকে, ভারসাম্যরক্ষাপূর্বক চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেবার ভারও ওই সুরগুলোর উপরেই ন্যস্ত। কবি নৃত্যনাট্য রচনার এই দুরূহ অংশটিতে সৌকর্য এনেছেন দ্বিবিধ উপায়ে। একদিকে সুরাংশে যেমন অভিনয়ধর্মিতা আরোপ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নৃত্যছন্দেও আনা হয়েছে ভাবানুযায়ী ঘন ঘন পরিবর্তন। দুটী সম্পূর্ণ ভিন্ন যাতীয় চরিত্রের মধ্যে সংলাপ সম্ভব করে তোলার কাজে 'তালফেরতা' যে কত নিপুণভাবে প্রযুক্ত হতে পারে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য দর্শকের সে বিষয়ে একটি পরিষ্কৃত ধারণা জন্মে।

দেশী-বিদেশী সুরচর্চার অবকাশে অতি বালক বয়সেই কবি এই শেষোক্ত ধরণের সুরসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন এবং পরে গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' সেটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগও করেন।

সুরহীন গানের সঙ্গে ছিন্নপক্ষ প্রজাপতির উপমাটি খুবই সার্থক মনে হয়। গানের সঙ্গে প্রজাপতির একটি আদ্যন্ত মিল লক্ষ্য করা যায়। ডিম্বরূপে প্রসূত হয়ে যথাকালে পত্রভোজী শূককে পরিণতি লাভ, তৃতীয় অবস্থায় স্বীয় লালাজাত তন্তুজালে আবদ্ধ হয়ে গুটিকরূপ ধারণ এবং পরিশেষে পতঙ্গভুক কুরূপ কীটের মধুপায়ী সুরূপ পতঙ্গে রূপান্তর প্রাপ্তি—এই হল প্রজাপতির সংক্ষিপ্ত বিবর্তন ইতিহাস। গানের জন্ম-বৃত্তান্তটাও হুবহু অনুরূপ। প্রথমে গীতিকার যে-প্রেরণাটি লাভ করেন সেটি আকারহীন ভ্রূণতুল্য। ক্রমে রচয়িতার পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার পরি-পোষণে তার একটি প্রাথমিক রূপ জেগে ওঠে। পরবর্তী স্তরে সে সৌন্দর্যের শাসন মেনে নেয়—নিজেই বরণ করে নেয় ছন্দের গুটিকা-বন্ধন। এবং সেই স্বরচিত বন্ধন নিজেই ছিন্ন করে ফেলে যখন সে বেরিয়ে আসে তখন সে সুরের পাখামেলা পূর্ণাঙ্গ গানের প্রজাপতি। মোট কথা, প্রজাপতির দেহের সঙ্গে যেমন পাখার, তেমনি গানের কথার সঙ্গে সুরের একটা অঙ্গাঙ্গী, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবেই সে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারায় সুরে ও কথায় একটি পূর্ণ পরিণত গান হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বর্তমান বাণিজ্য যুগে শ্রমবিভাগ-নীতির অনুসরণে ভূরি পরিমাণ সংগীত উৎপাদনও সম্ভব হয়েছে। গানের কথা কী হবে সে-নির্দেশ দিচ্ছেন একজন:—তিনি রেডিও, গ্রামোফোন অথবা চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্থানীয় যে কোন ব্যক্তি হতে পারেন। যে-দ্বিতীয় ব্যক্তি লিখে দিচ্ছেন, অধুনাতনকালে 'গীতিকার' শব্দটি তাকেই বুঝিয়ে থাকে। সুর দিচ্ছেন অপর এক তৃতীয় ব্যক্তি। এ হেন ব্যবস্থায় সুফল কতখানি প্রত্যাশা করা যায়, সহজেই অনুমেয়।

বৃন্তচ্ছিন্ন গানের কুঁড়িটীকে সুরকারের ফুলদানীতে স্থাপন করলে তার বিকাশে কখনও প্রাণবন্ত হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় না। রবীন্দ্রসংগীত সেরূপ প্রয়োজনের তাগিদে কৃত্রিম উপায়ে ফুটিয়ে তোলা ফুল নয়। এ ফুলটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার সতেজ-সরস বৃন্তে মুকুলিত এবং পূর্ণ-প্রস্ফুটিত।

ঢাকা ঘুরাবে একজন আর পাজি থেকে হুস্‌গীনের সুতো বেরিয়ে আসবে অপর এক ব্যক্তির আঙুলের টিপের গুণে, কলার ক্ষেত্রে এহেন শ্রমবিভাগের দ্বারা গুণফল কখনো প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। গীতিকার ও সুরকার হবেন এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, তবেই না সম্ভব হবে মহৎ সংগীতসৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ এবং সর্বশেষ স্বয়ংপূর্ণ সংগীতকার কাজী নজরুল রচিত গানগুলির মধ্যে আশা করি এ উক্তির জোরালো সমর্থন মিলবে।

পরিশেষে পুনরুক্তি বরণ করেও এই কথাটাই বলতে হবে যে, সংগীতরস হচ্ছে কথা ও সুরের মিলনরস। যেখানে এর যে কোন একটি একাই আসর ব্যস্ত করতে ব্যস্ত সেখানে, আর যাই হোক, 'মিলন ঘটলো' বলবো না।

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্বনি ও বাণীর যে-মিলন ঘটেছে তা প্রকৃত অর্থেই অপূর্ব এবং অতুলনীয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ কথা ও সুরের এক দুরধিগম্য মিলন লোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, একথা বললে বোধ হয় অতিকথনের অপরাধ ঘটে না।

চা শিল্পে সংকট

কিছু দিন আগে পাটশিল্পে শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় ধর্মঘটের মীমাংসা হয়েছে এবং ভারতীয় জুট মিল মালিক অ্যাসোসিয়েশন শ্রমিকদের অন্তর্বর্তী বর্ধিত মজুরি দিতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁদের ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। সম্প্রতি আবার চা শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়েছে। গত ১৮ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি চা-বাগিচার প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। ভারত সরকার যে-সকল শিল্প থেকে বেশী পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন তার মধ্যে পাট শিল্প এবং চা শিল্পের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। চা রপ্তানি করে ভারত সরকার প্রতি বছর প্রায় ১৪০ কোটি টাকা উপার্জন করেন। যে দশ দফা দাবির ভিত্তিতে চা শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন তার মধ্যে আছে মজুরি হার পুনর্বিন্যাস করার দাবি, চা-বাগিচায় স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ করার দাবি এবং স্বল্প হারে খাদ্যশস্যের রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবি। শ্রমিকদের আরেকটি দাবি হচ্ছে জমি শ্রম অনুপাতের (Land-Labour Ratio) পরিবর্তন করা সম্পর্কিত। ১৯৬৬ সালে কাদের নওয়াজ কমিটির (Quader Nawaj Committee) সুপারিশ ছিল দার্জিলিং অঞ্চলে প্রতি একর জমিতে ০·৮ থেকে ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ করা; তেরাই অঞ্চল এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের জন্য এই অনুপাত ধরা হয়েছিল যথাক্রমে একর প্রতি ১ থেকে ১·১ জন শ্রমিক এবং ১·১ থেকে ১·৩ জন শ্রমিক। চা-বাগিচার মালিকগণ শ্রমিকদের দাবিগুলি মেনে নিতে না চাওয়ায় ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং ধর্মঘট শুরু হয়েছে দেশের চারটি প্রধান শ্রমিক-সংঘের সমর্থনে।

চা শিল্পে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তার কারণ কিন্তু শ্রমিক অশান্তি নয়। বরং বলা যেতে পারে, সংকটের পরিণতি হচ্ছে শ্রমিক অশান্তি। কেননা, চা শিল্প যদি তার সংকটের মূল কারণগুলি এড়াতে পারত তবে হয়ত শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করার পথে অনেক বাধা অপসৃত হত। অবশ্য শ্রমিকদের অনেকগুলি দাবি চা শিল্পের বর্তমান সংকট থাকা সত্ত্বেও মিটিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। যা হোক, চা শিল্পের সংকটের মূল কারণ অনুসন্ধান করা যাক।

চা শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে হারে উৎপাদন বাড়ছে, সেই হারে দেশে চায়ের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না। মরিসাস সম্মেলনে (Mauritius Conference) চা রপ্তানিকারী দেশগুলি কতটা চা রপ্তানি করতে পারবে তার পরিমাণ বা কোটা স্থির হয়ে যাওয়ায় ভারতের পক্ষে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার চায়ের উৎপাদন যদিও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, দেশের ভিতর চা ক্রয়ের পরিমাণ ততটা বাড়ছে না। তার ফলে চায়ের যোগান বেড়ে যাচ্ছে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে চা-এর ইউনিট দাম কমে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালে রপ্তানিকৃত চা-এর ইউনিট দাম ছিল কিলো প্রতি ৮·১০ পয়সা; ১৯৬৮ সালে তা কমে ৭·৭০ পয়সায় দাঁড়ায়; ১৯৬৯ সালে তা হয়েছে কিলো প্রতি ৭·১০ পয়সা। যদি চা-এর আভ্যন্তরীণ বাজার সুসংহত এবং বিবর্ধিত হয়, তবে চা-এর ইউনিট দাম কমে যাওয়া প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদি চা-এর ইউনিট দাম বাড়ানো যায়, তবে রপ্তানির পরিমাণ কিছু কম হলেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ততটা কমবে না। বর্তমানে চা শিল্পের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার থেকে দেখা যায় প্রতি বছরের জানুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ের ভিত্তিতে ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫·৮৫ কোটি টাকা, ৫৭·৭৩ কোটি টাকা এবং ৫০·৫৯ কোটি টাকা। যেহেতু চা-এর উৎপাদন গত কয়েক বছর ধরে ক্রমেই বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত না হবার দরুন ও চা-এর ইউনিট দাম কমে যাওয়ার দরুন সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য চা-বাগিচার মালিকদেরও অসুবিধা হচ্ছে এবং অপর দিকে শ্রমিক অশান্তিও ক্রমশ বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, এমন এক নীতি অনুসরণ করা যাতে চা-এর ইউনিট দাম (Unit Price) না কমে এবং জনসাধারণের মধ্যেও চা-পানের অভ্যাস সম্প্রসারিত হয়। এ ব্যাপারে Tea Board-এর দায়িত্ব হচ্ছে উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে চা-এর চাহিদা যাতে বাড়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ কথা সত্য, চা-এর বিকল্প পানীয়ের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। কফি-পানের জনপ্রিয়তা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট বেড়েছে। চা-এর জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে হলে উৎপাদনের মান আরও উন্নত করতে হবে।

যে শিল্প আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিল্পে শ্রমিক অশান্তি বাঞ্ছনীয় নয়। যত দ্রুত এই অশান্তির নিষ্পত্তি হয় ততই মঙ্গল। সরকারের দিক থেকে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করার নীতি সাধারণভাবে গৃহীত হলেও সব ক্ষেত্রে এখনও অনুসৃত হয়নি। চা-বাগিচার শ্রমিকগোষ্ঠী অতীতে যথেষ্ট শোষিত হয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এখন একদিকে যেমন শ্রমিক অশান্তির মূল কারণগুলি দূর করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানি অব্যাহত রাখা দরকার, অপর দিকে তেমনি সরকারের দিক থেকে চা-এর দাম গ্যারান্টিকৃত হওয়া দরকার দেশে চা-এর ক্রয়ের পরিমাণ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য ব্যাপক প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

যদিও চা শিল্প বর্তমানে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং যদিও বহু ক্ষেত্রে আমরা সিংহলের মত ছোট দেশের কাছেও প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছি, তবুও চা শিল্পের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত নয়। চা-এর উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে। যে যে অসুবিধা বর্তমানে চা শিল্পকে বিব্রত করেছে সেগুলি উৎপাদন সম্পর্কিত অসুবিধা নয়—অসুবিধাগুলি প্রধানত দাম, আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং রপ্তানি বাজার সম্পর্কিত। যে-কোন অসুবিধাই দূর করা সম্ভব হবে যদি সরকার চা-শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন।

সুব্রত গুপ্ত

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী নিতাই বসু, শ্রীমতী স্বপ্না রায় চৌধুরী, তপন অধিকারী, যজ্ঞেশ্বর ভুঁইয়া ও প্রতীপ মান্না এক যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এঁদের মধ্যে কেউই ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন নি এবং পেশাতেও এঁদের কেউ শিল্পী নন। শিল্পীদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনীয়ার কেউ এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী, কেউ বা আবার শিক্ষক। অথচ শিল্পচর্চার প্রতি এঁদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে, তাই এঁরা সকলেই শিল্পী নিখিলেশ দাসের অধীনে, এবং তাঁরই স্টুডিওতে অবসর সময়ে শিল্পকলা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রদর্শনীতে এঁদের আঁকা মোট ২৫টি রচনা দেখা যায়। ছবি-গুলি জল ও তেলরঙে আঁকা, বিষয়বস্তু সাধারণ, অর্থাৎ প্রতিকৃতি ও নিসর্গদৃশ্য ও প্রতীকধর্মিক।

বলা বাহুল্য, সব শিল্পীই শিক্ষার্থী-সুলভ। তবে দেখে মনে হয়, প্রত্যেকেরই নিষ্ঠা আছে এবং অবসরকালে নিয়মিতভাবে শিল্পকলা চর্চা করে থাকেন। সকলেই আপন আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী ছবি এঁকেছেন, কয়েকজনের ছবিতে আধুনিক ধারার বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। তা হলেও অনেকেই এখনও প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যায় পটুত্বলাভ করতে পারেন নি, ফলে কয়েক স্থলে রঙ ব্যবহার-বৈচিত্র্য দেখা গেলেও ঠিক রসসৃষ্টির পরিচয় কোথাও পাওয়া যায়নি—অবশ্য সে আশা করাও ঠিক নয়।

বেলপাহাড়ী ল্যান্ডস্কেপ—২ —নিতাই বসু

শিল্পীদের মধ্যে প্রতীপ মান্না ও নিতাই বসুর রচনা প্রথমে চোখে পড়ে। প্রতীপ মান্না যে নিয়মিতভাবে তেলরঙে ছবি আঁকেন সেটা তাঁর অঙ্কনরীতি দেখে বোঝা যায়। রচনাক্ষেত্রটি কয়েক ভাগে বিভক্ত করে, সেগুলির ওপর অন্য রঙের সাহায্যে শিল্পী কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন স্টেপস। রচনাকারুকার্যের সঙ্গে নিজ বক্তব্যটুকু প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে তাঁর কাজ অনেকের চোখে পড়ত। 'ডিজাস্টার' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। নিতাই বসু জলরঙে আঁকেন, যদিও তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি মিশ্র। কয়েক স্থলে বিন্দু-প্রধান রীতি (pointillistic) চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'এসকেপ'-এর নাম করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রেও শিল্পীর ড্রয়িং নির্ভুল নয়, ফলে ছবিটি সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। মনে হয় নিসর্গদৃশ্য রচনায় শিল্পী অধিক আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন—যেমন বেলপাহাড়ী ল্যান্ডস্কেপ। শ্রীমতী স্বপ্না রায় চৌধুরী প্রতিকৃতি ও স্টিল লাইফ রচনার পক্ষপাতী। শিক্ষার্থীসুলভ হলেও তাঁর আঁকা প্রতিকৃতির মধ্যে একটি সহজাত ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায়, অন্তত 'লাইফ' দেখে তাই মনে হয়। স্টিল লাইফ-গুলি মন্দ লাগে না। তপন অধিকারীর রচনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। যজ্ঞেশ্বর ভুঁইয়া চাপা রঙ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর রচনার ম্রিয়মাণ রূপ অনেকের চোখে পড়ে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, চাপা রঙ ব্যবহার করে শিল্পী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। ড্রয়িং বা রঙ ব্যবহারের দিক থেকে এগুলিকে ঠিক রসোত্তীর্ণ বলা চলে না, তবে দু'একটি মন্দ লাগে না। এই প্রসঙ্গে পারাপাড়ুরাস-এর নাম করা উচিত। অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অঙ্কনপদ্ধতিটুকু যথাযথভাবে আয়ত্ত করে যদি এই উৎসাহী শিল্পিবৃন্দ নিয়ম ও নিষ্ঠা সহকারে শিল্পচর্চা করে যান তা হলে তাঁরা যে একদিন লাভবান হবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে বাৎসরিক মধ্যগ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনী শুরু হয়েছে—চলবে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

সংবাদভাষ্য

সাগ্রহ নিবেদন, সাবাস দুপদর্শী। এই দুর্দিনের বক্তব্য হন্তা সংবাদভাষ্য পড়ে তারিফ করতে চাই।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
পুনা—৩০

সংবাদভাষ্য ও দৃশ্যপট

'বরুণের' (৫ই শ্রাবণ) আলোচনা হিসাবে 'সংবাদভাষ্য' ও 'দৃশ্যপট' শীর্ষক আলোচনায় শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু প্রতি-বক্তব্য আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে ৩রা শ্রাবণ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত দুপদর্শীর সংবাদভাষ্য ও শ্রীনবারুণ গুপ্তের দৃশ্যপট' নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'অনেক আজেবাজে কথার মধ্য থেকে যেটুকু সারবস্তু পাওয়া যায় এ দুটি রচনা থেকে তার মূলে বক্তব্য দুটি।' এখানে 'আজেবাজে' বলতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কী বলতে চেয়েছেন ঠিক বোঝা গেল না। আমি তো দুপদর্শীর ঐ সংবাদভাষ্যে ও ঐ সংখ্যার 'দৃশ্যপটে' একেবারেই কিছু আজেবাজে কথা দেখতে পাইনি, পুনরায় পড়েও পেলুম না। দুটিতেই বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য একজনের বক্তব্য সুতীক্ষ্ম শ্লেষাশ্রিত, অপরজনের যুক্তি বিচারপূর্ণ, কিন্তু অস্পষ্টতা বা ধান ভানতে শিবের গীত দুটিতেই কিছুই নেই।

যাহোক, শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, যে-দুটি সার বক্তব্য তিনি ৩রা শ্রাবণের 'সংবাদভাষ্য' ও 'দৃশ্যপট' থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তা হোল: (১) 'বুর্জোয়া সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হয় তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত', এবং (২) বুর্জোয়া-বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশন্য আরও অসৎ, ত্রুটিপূর্ণ ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত'। এবং তিনি ঐ প্রথম বক্তব্যের বিরুদ্ধেই তাঁর সর্বপ্রধান ও প্রবলতম আপত্তি উপস্থাপিত করেছেন সবিস্তারে। আমিও তাঁর পত্রের এই অংশ সম্বন্ধেই আমার আলোচনা নিবদ্ধ রাখবো।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন যে বুর্জোয়া প্রেস মিথ্যা সংবাদই দিয়ে থাকে, না দিয়ে পারেও না; কারণ এর দ্বারাই তার স্বার্থ রক্ষা হতে পারে, সত্য দ্বারা নয়। এবং এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় সাক্ষ্য হিসাবে তিনি হাজির করেছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি উক্তি, রোম্যাঁ রোলাঁর প্রতি ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রের ব্যবহার ও রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠির' বিরুদ্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া প্রেসের আচরণ এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের তিরোধান সম্বন্ধে লিখিত একটি চিঠি নিউ

ইয়র্ক' টাইমস পত্রিকায় যথাযথ প্রকাশিত না হওয়ার ঘটনাকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই সবগুলি লক্ষ্যই এক জাতের নয়, এবং সবগুলিই বুর্জোয়া প্রেসকে মিথ্যার বাহক প্রমাণ করছে না। তবু এরই উপর ভিত্তি করে শ্রীচট্টোপাধ্যায় একটি অতি মারাত্মক generalisation-এ পৌঁছেছেন: 'মূলকথা, স্বাধীন বা মুক্ত প্রেস বলে যে কথাটা শোনা যায়, সেটা একটা বিশুদ্ধ ধাপ্পা। পৃথিবীতে কোথাও কখনও মুক্ত প্রেস ছিল না, আজও নেই—কি ধনতান্ত্রিক দেশে, কি সমাজতান্ত্রিক দেশে।'

আমি প্রথমে মুক্ত প্রেস সম্বন্ধে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি বিচার করে তারপরে তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করবো। সংবাদপত্রের মালিকরা যে সংবাদকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করেন না তা অনেকেই অস্বীকার করবে না, কিন্তু এও স্বীকার্য যে 'মুক্ত প্রেস' থাকলেই এবং আছে বলেই কোনো-নাকোনো সংবাদপত্র থেকে প্রকৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। ধনিক ছাড়া আজকাল সংবাদপত্র চালানো অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সব ধনিকের স্বার্থ তো এক নয়। যেমন বৃটিশ ধনিকের স্বার্থ ও ভারতীয় ধনিকের স্বার্থ এক নয়। অবাঙালী ধনিকের স্বার্থ ও বাঙালী ধনিকের স্বার্থ এক না হতে পারে, বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধনিকদের স্বার্থের বিরোধও থাকতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। ১৯৫০ সালে যখন বরিশালে হিন্দুনিধন যজ্ঞ চলেছিল ও হাজারে হাজারে হিন্দুরা সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসতে থাকেন, তখন আমি একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলাম। সেই সংবাদপত্রে—নিশ্চয়ই তাদের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে—তখন এই সব মর্মান্তিক সংবাদগুলো কিছু দিন একেবারেই বেরোয়নি, এবং এজন্য এ বিষয়ে আমি কিছুকাল অজ্ঞই ছিলাম। পরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই বীভৎস সংবাদের কথা জানতে পেরে এবং অন্যান্য সব ভারতীয় সংবাদপত্রেই এ সংবাদ বিস্তারিত প্রকাশিত হচ্ছে তা-ও জানতে পেরে সেই সংবাদপত্রটির গ্রাহকত্ব অবিলম্বে ছেড়ে দিই এবং অন্য একটি পত্রিকা রাখতে শুরু করি। তাতে বরিশালের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রতিদিনই পেতাম। 'মুক্ত প্রেস' একেই বলে। কোনো কোনো সংবাদপত্র যা গোপন বা বিকৃত করবে, অন্য সংবাদপত্রে তারই সঠিক স্বরূপ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েও থাকে। তাই যেখানে প্রেসের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ একাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সেই সেখানে সত্যের প্রকাশ অপ্রতিরোধ্য। এবং কম্যুনিস্ট চীনের সংবাদপত্র (এবং রেডিওতেও) যে রকম অ্যাপোলো ১১'র অদ্ভুত সাফল্য ও চন্দ্রে মনুষ্য অবতরণের সংবাদ সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া হয়েছিল—তা আমেরিকার কৃতিত্ব বলে—এর নজির কোনো মুক্ত প্রেসের দেশে মিলবে না। সংবাদকে গোপন ও ইতিহাসকে বিকৃত করার সরকারী ও একচেটিয়া অধিকার শুধু কম্যুনিস্ট দেশগুলির। স্টালিনের সময়ে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস একভাবে লেখা হয়েছিল, স্টালিনের হুকুমে; স্টালিনের মৃত্যু ও অবমূল্যায়নের পরে আরেকভাবে, ক্রুশ্চভের হুকুমে। এমনই চলেছে ও চলবে ওই সব রাষ্ট্রে।

কিন্তু 'মুক্ত প্রেস' বলতে এ বোঝায় না যে সব সংবাদপত্রেই সব খবর সমান ফলাও করে বা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে যেমন ভিন্নতা দেখা যায়, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি—রুচি ও স্বার্থের প্রশ্নেই এটা হয়। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদ নির্ভরযোগ্য নয়, এ দুর্নাম রটে গেলে সেই সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা কমতে থাকে। তাই তাদের এ-বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান হতেই হয়। দলীয় পত্রগুলি অবশ্য এ-বিষয়ে নিরঙ্কুশ। কারণ তারা জানে যে তাদের পাঠকরা দলীয় উত্তেজনার খোরাকের জন্যই তাদের পত্রপত্রিকা পড়ে, অবিকৃত সত্য, সংবাদ পরিবেশনের জন্য নয়। যেখানে রাষ্ট্রই একমাত্র সংবাদ পরিবেশক, যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যেটুকু সংবাদ দেওয়া বা যতখানি অবিকৃতভাবে তা পরিবেশন করা যুক্তি ও স্বার্থসম্মত মনে করেন, জনসাধারণ তাই পেয়ে থাকে। সেখানে ধরেই নেওয়া হয় যে, সব সত্যই জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল নয় এবং রাষ্ট্রের কর্ণধাররাই বিচার করতে সমর্থ কোন সত্য, কতখানি ও কীভাবে দিলে তাদের ক্ষতি হবে না।

একবার শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করা যাক। আইনস্টাইন কখন ঐ 'Why Socialism' লিখেছিলেন, সে কি রুশোভিক বিপ্লবের আগে অথবা পরে; এবং তখন কম্যুনিস্ট শাসনে সত্য সংবাদ পাওয়ার মানুষের মৌলিক অধিকার যে রাষ্ট্র কর্তৃক অপহৃত এ তথ্য তিনি জানতেন কি না বোঝা গেল না। বইটির ও লেখাটির তারিখ দেওয়া থাকলে এটা বুঝতে সহায়তা হোত। আইনস্টাইন বলছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিক স্বার্থে নিয়োজিত

সংবাদপত্র সংবাদ গোপন ও বিকৃত করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ও জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ফলে স্বাধীনভাবে সব সত্য সংবাদ ও তথ্য জেনে ও বিচার করে জনগণের পক্ষে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে ("extremely difficult.... to make intelligent use of his political rights")

সমাজতন্ত্রবাদের ইউটোপিয়ান রূপ ছাড়া বাস্তব কম্যুনিস্ট রূপ সম্বন্ধে আইনস্টাইনের মনে সঠিক ধারণা থাকলে কখনই তিনি এমন কথা লিখতে পারতেন না। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে ধনিকগোষ্ঠী পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিভিন্ন রূপ থেকে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা চেষ্টা করলে সত্যের কাছাকাছি আসা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, কিন্তু কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সত্য সংবাদ পাওয়ার উপায় ও অধিকার জনগণের হাতে না থাকায় তাদের পক্ষে এই সত্যে পৌঁছানো কোনো কালেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া একদলীয় শাসনে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের প্রশ্নও সেখানে নাই। এরপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় রোমাঁ রোলাঁর বলশেভিক বিপ্লব সমর্থনের বিরুদ্ধে ফরাসী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির আচরণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কী সে আচরণ, কে কি বিনিন্দ্য সমালোচনা, নিন্দা, কুৎসা বা অন্য কিছু, তা জানাননি। সব মত সকলের পক্ষে—যে-কোনো কারণেই হোক—সমান রোচনীয় নয়, তাই মতামতের প্রতিকূল সমালোচনা হতেই পারে। প্রতিকূল সমালোচনা স্বাভাবিক, কিন্তু মতের প্রচারও হয়। কম্যুনিস্ট দেশে তাই প্রতিকূল মতের সমালোচনা করা হয় না, একেবারে 'ব্ল্যাক আউট' করা হয় অর্থাৎ চেপে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' সম্বন্ধেও বৃটিশ বুর্জোয়া প্রেস যদি নিন্দাই করে থাকে তাতেই বা কী ক্ষতি হয়েছে? সে-বইয়ের প্রচার তো কমেনি তার দ্বারা?

আর বুর্জোয়া প্রেসের মধ্যেও স্বাধীনতা আছে বলেই অনেক পত্রপত্রিকা 'রাশিয়ার চিঠি'র মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাও করেছিল—বিশেষ ভারতীয় 'বুর্জোয়া প্রেস' তো বটেই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভিয়েৎনামবিষয়ক চিঠি অবিকৃতভাবে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ার ঘটনাটা সত্যিই দুঃখের। কিন্তু হয়তো আমেরিকারই অন্য আরেকটি কাগজ—যেমন Washington Post—ঐ চিঠি অবিকৃতভাবেই ছাপাতে পারতো—যদি রাসেল ঐ চিঠি তাদের পাঠাতেন। অন্তত কোনো কোনো কাগজ নিশ্চয়ই ছাপতো। সত্য যতই গোপন করার চেষ্টা হোক 'মুক্ত প্রেসের' ক্ষেত্রে তা কিছুটা প্রকাশ হবেই হবে; কিন্তু কম্যুনিস্ট দেশে তার যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই তা বার্ট্রাণ্ড রাসেলেরই লেখা—

Why I am not a Communist, Symptoms of Orwell's 1984, From Logic to Politics তিনটি রচনাই রাসেলের)

Portraits from Memory and other Essays,

১৯৫৬ সালে জর্জ অ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত) এই তিনটি রচনাতেই পাওয়া যাবে। রাসেলের আত্মজীবনীতেও এ-বিশ্বাস দৃঢ়কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে।

Symptoms of Orwell's 1984 নিবন্ধে রাসেল কি বলেছেন শুনুন:

"Russians are kept as far as possible in ignorance about Western countries to the degree that people in Moscow imagine theirs to be the only subway in the world."

(অর্থাৎ, রাশিয়ানদের পশ্চিমী দেশগুলি সম্বন্ধে যথাসম্ভব অজ্ঞ করে রাখা হয়, এমন কি মস্কোবাসীরা মনে করে পৃথিবীতে তাদেরই একমাত্র ভূগর্ভস্থ রেলপথ।) এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে রবার্ট হাচিনস্ কমিশনের উক্তি তুলে ধরেছেন নিজের সপক্ষে। এই কমিশন বলেছেন যে, ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যাপারে, শুধু সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, সংবাদপত্রের মালিক ও প্রকাশকরাও যে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের সুযোগ নিয়ন্ত্রিত করে, কোন্ ব্যক্তির কথা, কোন তথ্য, কোন আইডিয়া কী হারে জনসাধারণের কাছে পৌঁছুবে তাও নির্ধারিত করে দেয় এরও বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। খুবই ঠিক কথা। হয়তো এই কমিশনের সুপারিশ মতো সংবাদপত্রের এই প্রকার ক্ষমতার আতিশয্য ও অপব্যবহার বন্ধ করা বা সঙ্কুচিত করার নিশ্চয়ই চেষ্টা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এই হাচিনস্ কমিশন কবে বসেছিল এবং পরে এই ব্যাপারে আরও কমিশন বসেছিল কিনা তা আমি জানি না। তবে যে-দেশে সত্য জানা ও সত্য প্রকাশের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত, সে-দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার যে কোনো প্রকার খর্ব বা সংকোচ রোধের জন্য এ জাতীয় কমিশন ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম। বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই এটা হয়ে থাকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে নয়। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির অত্যধিক ক্ষমতা যেখানেই সীমিত করার চেষ্টা করা হয় এবং ছোট ছোট পত্র-পত্রিকাগুলিকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর করার জন্য বিবিধ সরকারী সাহায্যও দেওয়া হয়।

আর একটা কথা, কমিশন কিন্তু বলেছে না যে বৃহৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদমাত্রেই মিথ্যা। এ সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও মতামতের প্রকৃতি ও পরিমাণ তাদেরই ইচ্ছায় অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় একথা স্বীকার্য; যেমন স্বীকার্য যে, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিই জনসাধারণের সংবাদ প্রাপ্তির অনেকখানি জায়গাই জুড়ে আছে।

কিন্তু এও অস্বীকার করা যায় না যে, এসব সংবাদপত্রের মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে, একজনের মিথ্যা আরেকজন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সব সময়েই করে থাকে; তা ছাড়া, ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনভাবে সত্য সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা অবিরাম করে চলে, কারণ তারা জানে যে সাধারণের কাছে তাদের আদর এই জন্যই; তারপর, ব্যক্তি বিশেষ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেও এ কাজ অনেক সময় করে থাকেন, যেমন ফ্রান্সের Dreyfus Case-এ এমিল জোলার ভূমিকা, কিম্বা বর্তমান আমেরিকাতেও ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে সরকারী নীতি সমালোচনা করে এবং সরকারী অনেক অন্যায় প্রকাশ করে, বহু বই বেরোনোর তো বিরাম নেই; এবং পরিশেষে রাষ্ট্রের বেতার টেলিভিসন প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও নানা প্রকাশনের মধ্য দিয়েও সত্য সংবাদ বিতরণের চেষ্টা যে না হয় তা নয়। কাজেই সত্য গোপন ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারে কোনো বৃহৎ বুর্জোয়া সংবাদপত্রই নিরঙ্কুশ হতে পারে না। কিন্তু অন্য সমাজে, যেখানে সংবাদ বিতরণের একমাত্র সূত্র রাষ্ট্রের হাতে এবং সে রাষ্ট্র জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সত্য সংবাদ জানার অধিকার স্বীকার করে না, সেখানে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল
কলকাতা-৩২

ফ্রী প্রেস

ফ্রী প্রেস নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে—'দেশের' পাতায় (৩১ শ্রাবণ) সেখানে অসঙ্গত যুক্তি ও প্রমাণ উদ্ধার করা হচ্ছে। সমাজের সব ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়—একথা জেনে নিয়েও কিছু বলতে উৎসাহিত হচ্ছি।

প্রথমত, দর্শন বোঝার জন্য মার্কসের কাছে পাঠ নিতে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমনি মার্কস বোঝার জন্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার কাছে যাওয়াটা অসমীচীন।

টি এস এলিয়টকে মূল্যায়ন করতে ক্রুশ্চভ বা কেনেডির কোনো বক্তব্য বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে না। নকশালপন্থার ভাল মন্দ বিচারে আমাদের কোনো কবির ঐ বিষয়ে কোনো বক্তব্য থাকলেও তা গ্রাহ্য হতে পারে না।

একথা অবশ্যই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, মানব সভ্যতা এঁদের চিন্তার নানা বৈচিত্র্যে নিয়ত সম্পদশালী হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এদের আপন বক্তব্যের যে ঐশ্বর্য তার সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের ফারাক থেকেই যায়। তাই আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যত্রতত্র

প্রাণের ব্যবহার বা উদ্ধার জ্ঞানমার্গে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে।

মুক্ত প্রেস কোথাও কোনো দিন ছিল না বলে যারা ভাবেন সর্বাগ্রে তাদের একথাই বোধ হয় মনে রাখার দরকার যে ব্যাপারটার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ মুক্তকচ্ছ হয়ে বক্তব্য রাখতে সচেষ্ট হবেন।

মুক্ত প্রেস বলতে মোটামুটি যা বুঝি তা বোধ হয় চিন্তার স্বাধীনতা; বিরোধী বক্তব্যের প্রতি সহনশীলতা। ব্যক্তিমানসের অনির্বচনীয় গুণাবলী প্রকাশের সর্বাধিক সুযোগ—যার দ্বারা সমাজ পরিপুষ্ট ও ঐশ্বর্যবান হবে। বিশেষভাবে—"বক্তব্য রাখার নিরাপত্তা।" এ সবই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত মূল উপাদান।

বঙ্কিমচন্দ্র আজ দায়রাসোপর্দ। শঙ্করাচার্য নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বক্তব্য রাখছেন। কেন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করে যাচ্ছেন এ রাজ্য ও-রাজ্যের শাসককুল, সব বক্তব্যই প্রকাশিত হচ্ছে। দেশ আনন্দবাজার স্টেটসম্যান সর্বত্রই প্রচুর স্বপক্ষ-বিপক্ষ বক্তব্য রাখা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত "dangereous thought" বা "againt people" এসব হুকুমনামা জারি করে নির্বিচার গ্রেপ্তার বা রাতারাতি লোপাট করা হচ্ছে কি এঁদের? কিন্তু দক্ষিণ প্রেসের ওপর হামলা কারা কারা চালালো! আরো কথা হচ্ছে মুক্ত প্রেস বলতে গুটিকয়েক সংবাদসেবী বা সংবাদপত্র গোষ্ঠী নয়, এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরো ব্যাপক।

এখন গণতন্ত্রের প্রতি আমরা কতটা অকৃত্রিম মনোভাব পোষণ করি সেটাই কথা। এ সম্পর্কে বাঙালী চিন্তাবিদ, যিনি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত, তিনি গ্রন্থের অম্লান দত্ত। তিনি For Democracy-র ১৭ পৃঃ বলেছেন :
Democracy is not just a political system; it is a way of life.
লক্ষণীয় "it is a way of life, গণতান্ত্রিক জীবন ধারায়"
"The greatest enemy of the democratic way of life is **fanaticism.**
Fanatics are rarely guilty of lack of idealism: কিন্তু
What they lack is tolerance.

সহনশীলতার অভাবে কি হয় :
"Through his intolerance he extents the boundaries of that field in which, self-righteously, he acts in open disregard of morality. Thus, the fanatical idealist, in the very persuit of his ideal, builds a world in which contempt of all ideals **'is law'**.

পুঁজিবাদের পক্ষে কেউই ওকালতি করছেন না; কিন্তু পুঁজিবাদের দাসত্ব ধ্বংস করতে যদি Socialism প্রয়োজন হয় তবে Socialist Slavery বরণ করতে হবে কেন?

এ সম্পর্কে চেকোস্লোভাকিয়া উজ্জ্বল এবং সদ্য দৃষ্টান্ত।

আর যারা স্বাধীন চিন্তায় ও তার নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু বলেন, তাঁদের শেষ কথা ভলটেয়ারের অম্লান ঘোষণায় :
"I disagree utterly what you say and will defend to the death your right to say it."

এই right-এ তথাকথিত বর্তমান জনগণ-মন-অধিনায়কেরা বিশ্বাস করেন কিনা প্রশ্ন সেখানে।

"কোথায় আছি"র আশঙ্কা ও উদ্বেগ হয়ত সে জন্যই।

দেবপ্রসাদ ঘোষ
সাউথ রামনগর
২৪ পরগনা।

"শহর-ইয়ার"

"দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "শহর-ইয়ার" পড়তে অত্যন্ত ভাল লেগেছে কেবলমাত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা বলে নয়। রচনাটির একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মাধুর্য আছে বলে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন এই রচনাটিতে সৈয়দ সাহেবের আগের রচনাগুলির বিদগ্ধ ভাষা বিন্যাস খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এটি কিছুটা নিম্নমানের রচনা হয়েছে। লেখকের সহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা হ্রাস পেয়েছে এমন আশংকাও করেছেন কোন পাঠক। কিন্তু এই ধারণা সবার নিশ্চয়ই নয়। সত্য বটে, "শহর-ইয়ার"-এর ভাষা একটু অন্য ধরনের। কিন্তু তাই বলে, নিকৃষ্টতর বলে রায় দেওয়ার মত কোন কারণই ঘটেনি। বাংলাদেশের অভিজাত মুসলিম ঘরের একটি বধূ—শালীনতায়, সম্ভ্রমে, তেজস্বীতায় যে অতুলনীয়া, রবীন্দ্রনাথের গানের অমৃত ধারায় যার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ, সংস্কারের বন্ধন ও ঐশ্বর্যে যে একান্ত বিমুখ সেই "শহর-ইয়ার" সৈয়দ সাহেবের "শবনমের" চাইতে কোন অংশে কম নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিকায় এই দুটি দীপ্তিময়ী নারীর আনাগোনা। তাই পাঠক মনের প্রতিক্রিয়াও অন্য রকম হবে। লেখকের অন্যান্য বহু রচনা পড়ে এই কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আলী সাহেবের প্রত্যেকটি রচনা প্রত্যেকটি থেকে আলাদা। তাঁর প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, হিন্দু মুসলিম-খ্রীষ্টীয় ভাবের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর রচনাতে প্রতিফলিত। নানা ভাষার ভাণ্ডার থেকে নানা শব্দের মণিমানিক্য চয়ন করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলির ভিতর দিয়ে। "শহর-ইয়ার" তাঁর অন্য ধরনের সৃষ্টি। এতে নূতন নূতন শব্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। হয়েছে একটি নূতন ভাবধারার। প্রচুর বিলাসবৈভবে পালিতা এবং প্রাচীন আদব কায়দার বেড়াজালে আবদ্ধ একটি নারী—যার মুক্ত মন চায় সংসারসীমার বাহিরে কোন আশ্রয়। "শহর-ইয়ারের" ভিতর পাই একটি বৈরাগ্যময় হৃদয়—সূর্যমুখীর মত যে চেয়ে আছে পরম শান্তিময় ঈশ্বরের পদপ্রান্তে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত তাই সে অনন্যা।

এমন একটি অনবদ্য কাহিনী বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেবার জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ জানাচ্ছি।

মাধুরী চৌধুরী
কলিকাতা—৩০

"ভারতীয় গণতন্ত্রে সমতা"

গত ২রা আগস্টের "দেশ" আমার এই জুলাইয়ের প্রকাশিত "ভারতের গণতন্ত্রে আরো সমতার প্রয়োজন" আলোচনার উপরে শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্তীর "ভারতীয় গণতন্ত্রে সমতা" শীর্ষক আলোচনাটি পড়লাম। শ্রীচক্রবর্তীর বক্তব্যের জের ধরেই আমি এই আলোচনার অবতারণা করছি।

সুনীলবাবু আমার পুরো আলোচনার বক্তব্যগুলির উপরে কোন বক্তব্য রাখেননি, উনি কেবল একটি পয়েন্টের প্রতি কটাক্ষ করে কয়েকটি উক্তি করেছেন। আমার আলোচনার ভেতরে সাম্প্রদায়িকতার কোন গন্ধ ছিল না। যদিও আলোচনাটি একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে গেছে তবুও বলবো আমার আলোচনার লক্ষ্য ছিল মানুষ এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা। আমি কেবল ঐ একটি পয়েন্ট দিয়েই আমার আলোচনা শেষ করিনি, আমি গণতন্ত্রের অবহেলিত দিক, যেগুলি একেবারে অপ্রিয় সেগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমালোচনা করেছি।

সুনীলবাবু লিখেছেন—"আপাতদৃষ্টিতে একটু তলিয়ে দেখলে দাবিগুলি ছাড়াও কতটা অন্যায় বলে মনে হবে না" এবং "গণতন্ত্রের শান্তির জন্য সহ্য করা হবে না"। উপরের উক্তিগুলি পড়ে আমি কেন যে কোন চিন্তাশীল ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মনে করতে পারেন—সুনীলবাবু, গায়ের জোরে গণতান্ত্রিক দেশের কিছু নাগরিকদের, তাদের সংবিধানগত অধিকার হতে বঞ্চিত করতে চাইছেন।

যেখানে গণতান্ত্রিক মর্যাদায় প্রতিটি নাগরিক সমানভাবেই ভূষিত, যাদের ভোটের মর্যাদা সমান এবং যে দেশে যোগ্যতা থাকলে যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রপতি হতে পারেন সে দেশের কিছু শ্রেণীর নাগরিকদের উপর এই এক তরফা

লিখেছেন আবারও তার প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

তরুণবাবু নিজে কি লিখেছিলেন সুবিধামত তা ভুলে যান। তিনি লিখেছিলেন 'জিতেনবাবু বলতে পারেন ইংরেজীতে ultrasound ও supersound দুটি শব্দ কেন ব্যবহার হয়?' এর অর্থ কি 'পরিশব্দ জিজ্ঞেস' করা? বিশ্ববিজ্ঞানী তরুণবাবু যে শব্দের শুদ্ধ রূপটি পর্যন্ত জানেন না, তার প্রয়োগ নিয়ে কোঁদল করেন! পরিভাষা চাইলে আগেই দিতাম। এখন জ্ঞাতার্থে নিবেদন, supersonic—শব্দোত্তর বা শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী, ultrasonic—অতিশাব্দিক। তরুণবাবু আবারও শুনে নিন শব্দ দুটি সমার্থক নয়।

আতসকাচ অর্থাৎ লেনস সম্বন্ধে এবারে তিনি যা লিখছেন, পরীক্ষার খাতায় ছাত্রেরা ঐরকম লিখলে শূন্য পেত। কোন লেনসকে convex বা concave বলা হবে তা 'কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে বা কোন যন্ত্রে কোন দিকে কোন কাজ করছে' তা দিয়ে বিচার করা হয় না। concavo-convex লেনস বলতে বুঝায় সেই লেনস যার একটা দিক concave অপরটি convex, কিন্তু লেনসটি অভিসারী বা convex—ধর্মীয়: পক্ষান্তরে অনুরূপ লেনসকেই বলা হবে convexo-concave যদি উহা অপসারী অর্থাৎ concave-ধর্মীয় হয়। বাংলাতে অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হবে পরিভাষা অবতলোত্তল বা উত্তলাবতল। তরুণবাবু লেনস সম্বন্ধে এই মূল তত্ত্বটা জানেন না যে লেনসকে কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে সেই অনুযায়ী তার অপসারী ও অভিসারী ধর্ম বা নামকরণ বদলায় না।

শুক্রের সূর্য পরিক্রমণ সম্পর্কে সুদীর্ঘ যে আলোচনা তরুণবাবু করেছেন তার প্রায় সবটুকুই অবান্তর—হয়েলের অক্টের তৈল সাগর, রাসেলের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব বা জীনসের সৃষ্টিতত্ত্ব এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল কি? তরুণবাবুর কাছে origin of the earth-এর তত্ত্বও আমি শিখতে চাইনি বা শেখবার দরকার হবে না। 'পাশ থেকে না হয়ে সামনাসামনি শুক্র ও মহাকাশযানের দেখা হওয়া বা ভেনেরার শুক্রে পৌঁছানর সময় সংক্ষেপ হওয়া এই তথ্যগুলো থেকে শুক্রের বিপরীত গতি হয়ে সূর্য পরিক্রমণের ব্যাপার সরাসরি প্রমাণিত হয় না, তাই খটকা দূর হচ্ছে না। উল্লিখিত তথ্য থেকে শুক্রের সূর্যপরিক্রমা অর্থাৎ বার্ষিকগতির বিপরীত রীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তটি তরুণবাবুর নিজস্ব না হলে এতৎ সম্পর্কিত সরাসরি প্রামাণিক উদ্ধৃতি দিলে ভাল হত। তরুণবাবু আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্য বঙ্গানুবাদে (ইংরেজী হলেই ভাল বুঝতাম কারণ তরুণবাবুর ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ সব আমার জানা নেই) যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার ভেতরে শুক্রের 'বার্ষিকগতির দিকও সূর্যের ও অন্য সমস্ত গ্রহের উল্টা' এর সমর্থক কোন কথা নেই বরং উল্টোটাই আছে মনে হচ্ছে। 'ঘূর্ণনে ১১৭ দিন লাগে, সে আবর্তন করে সূর্যের বিপরীত দিকে'—এই উদ্ধৃতিতে ঘূর্ণন ও আবর্তন, কোনটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বুঝছি না। দুটো একার্থবোধক নয় ধরে নিচ্ছি, তা হলে ঘূর্ণন ও আবর্তন দুটোই বিপরীতমুখী একথা কিন্তু উদ্ধৃতিতে নেই। উপরন্তু 'সূর্যের বিপরীত দিকে আবর্তন করে' এর সহজ অর্থ সূর্য স্বীয় অক্ষের উপরে যে দিকে ঘোরে শুক্রের অনুরূপ আবর্তন তার বিপরীত দিকে। শুক্র সূর্যকে পরিক্রমা করে কিভাবে সে সম্বন্ধে কোন কথা এতে নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিরও অনুরূপ অর্থ হতে পারে।

রাশিচক্রের নক্ষত্রের সাপেক্ষে দৃশ্যত শুক্রের সূর্য পরিক্রমার গতি পশ্চিম থেকে পূবে হলে লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে তা পূব থেকে পশ্চিমে হবে এটাও বড় বিচিত্র মনে হচ্ছে। মোটকথা আমি যা জানাতে চেয়েছিলাম তরুণবাবু এত কথা লিখেও সে বিষয়ে আমাকে নিঃসন্দেহ করতে পারেননি।

'বার্ষিকগতির দিক সূর্যের এবং অন্য সব গ্রহের উল্টা' একথা লেখবার সময়ে তরুণবাবু সূর্যের galactic year-এর কথা ভেবেছিলেন, একথা কল্পনায় আসেনি বা এখনও তা বিশ্বাস করি না।

তরুণবাবু আমার কোন্ বই পড়া উচিত বা কি জানা উচিত সে বিষয়ে বেশ মুরুব্বির চালে উপদেশ দিয়েছেন। মহাজনের অনুসরণে আমিও তাঁকে সবিনয়ে পরামর্শ দিচ্ছি পদার্থ বিজ্ঞানের স্কুলপাঠ্য বই যোগাড় করে শিক্ষকের কাছে পড়তে আরম্ভ করুন। কেননা তা হলে গতির একক 'সেকেন্ড/কিলোমিটার' এমন ভুলগুলি শোধরাবে। শব্দের বানান অভিধান দেখে শিখে নিন কারণ DOZE, MARCHENT এগুলো মুদ্রাকর প্রমাদ বললে সকলে বিশ্বাস নাও করতে পারে।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

বাংলার চালচিত্র

"বাংলার চালচিত্র" পর্যায়ে আবদুল জব্বারের ফিচারগুলি আমাকে চমৎকৃত করেছে। বাংলা সাহিত্যে এই নবাগত সাহিত্যসাধককে স্বাগত জানাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গ্রাম বাংলার সমাজ-চিত্রের বাস্তব বিশ্লেষণে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাতে মুগ্ধ হতে হয়। তাঁর লেখা "চাষী বাড়ির সাঁদিয়া"-র তুলনা হয় না। অতি অল্প কথায় গ্রাম্য গৃহস্থ মুসলমান চাষী পরিবারের যে নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন তা অনায়াসে একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের পটভূমি হতে পারে। পূর্ববঙ্গে আমার বাড়ি। দেশের গ্রামে এবং শহরের বাড়িতে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার ঘটেছিলো। মুসলমান পরিবার সাধারণত পর্দানসীন হয়। সেখানকার অন্দর মহলে হিন্দুদের প্রবেশের অধিকার লাভ সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে এক পাড়ায় এক সঙ্গে মেশার ফলে কোন কোন পরিবারে ঘরের ছেলের মর্যাদা পেয়েছিলাম। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ১৯৫৭ সালের কথা। মুসলমান বন্ধুর বিয়েতে কনের বাড়ির মেহমানদের আদর আপ্যায়ন করার ভার পেয়েছিলাম। দুলহার বাড়ির অন্যান্য পরিচিত মিঞা সাহেবদের মধ্যে একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক "মশাই"কে ছুটোছুটি এবং খবরদারি করতে দেখে এবং ফারুৎ ফারুৎ পর্দা ঠেলে বাড়ির অন্দরে ঢুকতে দেখে মেয়ের তরফের মেহমানরা-ত তাজ্জব। অবশেষে যখন জানালেন যে এ হচ্ছে দুলহামিঞার সবচেয়ে পেয়ারা দোস্ত তখন ওঁদের চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো এবং টুপি ঘুরিয়ে ঘন ঘন হাওয়া খাওয়াও বন্ধ হয়েছিলো।

পূর্ববঙ্গের কবি জসীমউদ্দীন কলকাতায় এসে সম্বর্ধনা সভায় দুঃখ করে গেছেন এই বলে যে, হিন্দু বড় সাহিত্যিকেরা, যেমন শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর মুসলমানের ঘরের কথা নিয়ে কিছু লিখলেন না। আমাদেরও খুব দুঃখ হয় যখন দেখি যে, এই বিরাট জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা এবং সাফল্য-নৈরাশ্যের কথা, সর্বোপরি ধর্মাশ্রয়ী এই সমাজের কথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু কে লিখবেন ওঁদের অন্দর মহলের খবর? হিন্দুরা কি ওঁদের ঘরে আপন হয়ে ঢুকতে পারে? আর ভালোভাবে না জেনে তারাশঙ্করেরা তেমন উপন্যাস লিখতে রাজী হবেনই বা কেন? তাই নিজেদের কথা প্রথমে নিজেদেরই লিখতে হবে। ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর মত পণ্ডিত লেখক থেকে শুরু করে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ আবদুল আজিজ আল-আমান এবং আবদুল জব্বারদেরই এই ভার নিতে হবে। কেবল তাহলেই আমরা বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরের আপন খবরটি পাবো। জব্বার সাহেবের লেখায় তারই প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

মনোজকুমার সাহা
মধ্যমগ্রাম

তবলার ঘরানা

৩১ শ্রাবণ ১৩৭৬, ৪র্থ সংখ্যা দেশে 'তবলা ঐতিহ্য ও কণ্ঠে মহারাজ' শিরোনামায় সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রচনাটি পাঠ করলাম। সুধীরবাবুর তথ্যের মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ল, সেটা এখানে তুলে দিলাম :

১মঃ তবলার যে চারটি ঘরানার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ফরক্কাবাদ ও বারাণসীকে পূর্বী ঘরানার অন্তর্গত ধরা হয় ও এই দুটিই লক্ষ্ণৌ ঘরানার ভিন্ন শাখা। 'অজরাড়া' কথাটি ঠিক নয়। আসল নাম হল 'অজরালা'। এটা দিল্লী ঘরানার একমাত্র শাখা। তোতাক্ষ দিকে মদু ও বকসু (সিতোদের ভাই) যাঁকে লক্ষ্ণৌ ঘরানার স্রষ্টা হিসেবে পাওয়া যায়। এঁরা প্রত্যেকেই দিল্লী ঘরানার ছাত্র ও সুধার খাঁ সাহেবের পৌত্র।

সুতরাং দেখা যায় যে শুধু দিল্লীই তবলার একমাত্র মূল ঘরানা। 'পাঞ্জাব' ঘরানার পাখোয়াজ-এর বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। সুতরাং তবলার দিক দিয়ে এই ঘরানা সম্পর্কে ভিন্ন মতের অবকাশ রয়েছে। (তালপ্রকাশ : লেখক ভগবত শরণ শর্মা 'সঙ্গীতালঙ্কার' পৃষ্ঠা ২ ও ৩) তবলা তরঙ্গ : বি এস নিগম পৃষ্ঠা ৮৪)

২য় : ফরক্কাবাদ ঘরানার আবিষ্কর্তা হাজী বিলায়েত আলী খাঁ। ইনি লক্ষ্ণৌ ঘরানার ছাত্র ও ফরক্কাবাদের বাসিন্দে ছিলেন। লক্ষ্ণৌ বাজের এক বিশিষ্ট রূপে দেওয়াতে এই ঘরানার সৃষ্টি হয়। বকসু খাঁ হাজী সাহেবের শ্বশুর। (তালপ্রকাশঃ পৃষ্ঠা ৩)

৩য় : কিষাণ মহারাজ কণ্ঠে মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র। এনার পিতা পণ্ডিত হরি-মহারাজ একজন খ্যাতনামা তবলা ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ছিলেন।

কেদারনাথ ভৌমিক
বারাণসী

দুটি দুর্দান্ত নতুন কবিতার বই

বেশ কিছুদিন পর দুখানি সাক্ষাকারের নতুন, সাহসী, সাবলীল ও জোরালো বাংলা কবিতার বই হাতে এলো। বাংলা কবিতা বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা নিশ্চিত এই বই দুখানি পড়ে আমারই মতন খুশী হবেন। আমি অবশ্য, যাঁরা সমাজ-তত্ত্ববিদ, তাঁদেরও এই সব কবিতার বই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

দুখানি বইয়ের কবিতাই তরুণ কবিদের রচনা, যে সব কবিদের বয়েস তিরিশের এপারে বা সবে ওপারে।

প্রথম বইটির নাম **"এই আলো হাওয়া রৌদ্র"**। কাছাকাছি বারোজন তরুণ তরুণীর কবিতা আছে এ বইতে। সম্পাদক, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। কবিতাগুলি সম্পর্কে আমার প্রথম সম্ভাষণ : বিস্ময়কর! কাছাকাছি এই যে নবীন কবির দল কবিতা রচনায় মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন, এঁরা অচিরকালের মধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখেন।

এই সংকলনে কবিতা লিখেছেন, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, রাজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, জিতেন নাগ, উমা ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, রণজিৎ দাস, মনোতোষ চক্রবর্তী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কবিতা আছে শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর। এঁর জন্ম ১৯৩৭-এ, এবং এই বত্রিশ বছর বয়স্ক যুবা ভাষার সংক্ষিপ্ততায় এবং বুদ্ধির তাৎপর্যে বাংলা কবিতার স্থায়ী আসনের অধিকারী। তাঁর লেখা "আমার অন্তিম মুদ্রা" কবিতার আরম্ভ এই রকম :

"একটি হাত তোমার হাতে নির্দ্বিধায়
রেখেছিলাম
কিন্তু তুমি তার
একনিষ্ঠতার মূল্য প্রতীক্ষা করেছ।
অন্য হাত অবহেলায় অস্বর্গ—সংসার
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চক্র ঘুরিয়েছি—
একেই আসক্তি ভেবে নিন্দুকের ভূমিকা
নিয়েছো।

কিংবা "যখন বাক্তিগত কারণে চিন্তাগ্রস্ত" কবিতার কয়েকটি লাইন :

তোমাতে নই, আমাতে নই, বিষয়ে আমি
লিপ্ত
লাগাম-ছেঁড়া তিনটে ঘোড়া ভীষণ রকম
ক্ষিপ্ত

বিজন মাঠ বধ্যভূমি
ধরতে গেলাম, তখন তুমি
সরে দাঁড়াও অশ্ববাহন, এবং বলদৃপ্ত
বাক্য-লাগাও মাতাল ঘোড়া তিনটে সমান
ক্ষিপ্ত।

উদ্ধৃতি দিতে গেলে প্রায় সবার লেখা থেকেই দেওয়া যেতে পারে। তাহলে কম্পোজিটার মহোদয় আমার ওপর ক্ষিপ্ত হবেন। কিন্তু এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, সবার কবিতার মধ্যেই একটা মিনিমাম কৃতিত্ব তো আছেই, প্রায় সবারই কোনো না কোনো কবিতা মন স্পর্শ করে যায়। মাঝে মাঝে দু' একটা লাইন চেনা-চেনা মনে হয়, মনে হয়, অপর কোনো কবির রচনায় পড়েছি—কিন্তু এটাও আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্বতা অনস্বীকার্য। কয়েকজনের কয়েকটি লাইনের উদাহরণ দিচ্ছি : "শীতের সব শুভ্র কণা, আমি যাদের ভালোবাসি না।/লিঙ্ক চাদরের এই শয্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকি" (জন্ম থেকেই অহংকারী : বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য)। "অতল জলে ডোবা ব্যাপক রাজবাড়ি/হাজার অধিবাসী—হৃদয় কি সেয়ানা/নিজেই সেজেছিলে, দু' এক অচেনা/মুখের পরিচয়!" (রহস্যময় আগন্তুক : উদয়ন ঘোষ)।

রুচিরা শ্যামের কয়েকটি কবিতার মধ্যে "শোক" কবিতাটি নিটোল বিষণ্ণতাময়, তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত না করে পারা যায় না :

"এমন অপেক্ষা করা ঘর ফিরে নিশ্চিত
আষাঢ়
পদ্মনালে জড়াজড়ি জট খুলতে মাথা নাড়ে
ফুল,

জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের পঞ্চম জিমন্যাস্টিক্স ও ক্রীড়া উৎসবে লিপজিগে মহিলাদের জিমন্যাস্টিক্স প্রদর্শনী

এই স্বপ্ন সফল করা ছিল আমার জীবনের এক বড় সাধ।

যে কোন বড় সাফল্যের মূলে শক্তি ও নৈপুণ্যের অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রয়োজন মনের জোর, সেই কথাই প্রমাণ করেছেন রন হিল।

পরাজিত করার প্রতিজ্ঞা

রন হিলের জয়ের স্বপ্নের মত বৃটিশ লং জাম্পার লীন ডেভিসও মেক্সিকো অলিম্পিক আসরে পরাজয়ের পর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পৃথিবীর বড় লং জাম্পারকে তিনি একদিন পরাজিত করবেন।

কে পৃথিবীর বড় লং জাম্পার? নিশ্চয়ই আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট বব বীমন। মেক্সিকোতে লং জাম্প তার অলৌকিক কীর্তি—যে কীর্তিকে অ্যাথলীট বিশারদরা বিংশ শতাব্দীর অ্যাথলেটিকস জগতের সবচেয়ে বড় কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। চিহ্নিত করার কারণও ছিল। কেননা কোন বিষয়ে শক্তির প্রায় শেষ সময়ে পৌঁছে গেলে তারপর সামান্যতম উন্নতিও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ বা গজ-ফুট-ইঞ্চি কিংবা মিটার সেন্টিমিটারে সামান্য অংশের উন্নতি তখন অলৌকিক কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত হয়। আর বব বীমন বিশ্ব রেকর্ড থেকে এক লাফে প্রায় ২ ফুট এগিয়ে গিয়েছিলেন। লাফিয়েছিলেন ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি।

টোকিও অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং তখনকার বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী পরাজিত লীন ডেভিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীমনের লাফ দেখে বলেছিলেন—'অলৌকিক কীর্তির অধিকারী হলেও আমি মনে করি না বব বীমন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লং জাম্পার। বীমনের চেয়ে রালফ বোস্টনকেই আমি বড় লাফিয়ে বলে মনে করি। বীমনকে আমি পরাজিত করবই'।

ডেভিসের সেই প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে স্টুটগার্টে ইউরোপ ও আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকস লড়াইয়ে। স্টুটগার্টে ডেভিস ২৬ ফুট ৭½ ইঞ্চি লাফিয়ে প্রথম হয়েছেন। বব বীমন ২৫ ফুট ৫½ ইঞ্চির বেশী লাফাতে পারেননি।

স্বীকার করি, সব প্রতিযোগিতা সবার পক্ষে অনুকূল থাকে না। শরীর এবং মনের উপরও নানা কারণে সাময়িক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। স্টুটগার্টের পরিবেশ হয়তো বীমনের অনুকূল ছিল না, কিংবা শরীর ছিল না পুরোপুরি পটু। তাই পরাজয় হয়তো অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে প্রতিযোগী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং যার লাফ রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব সেই প্রতিযোগীকে পরাজিত করার প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে মানসিক দৃঢ়তা সেটাও প্রায় কল্পনার বাইরে।

গোল্ডেন গার্ল

আমেরিকা ও ইউরোপের মানের সঙ্গে তুলনায় অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে এশিয়া অনেক পিছিয়ে আছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে অন্ধকার আফ্রিকার সাম্প্রতিক কৃতিত্বও স্মরণ করবার মত। তাই এশিয়ার কোন ছেলে বা মেয়ে যদি অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় সম্মান পায় সেটা অবশ্যই সংবাদ হয়ে ওঠে।

তাইওয়ানের 'গোল্ডেন গার্ল' চি চেঙ্গ অনেকদিন ধরেই অ্যাথলেটিক জগতের সংবাদ। মেক্সিকোতে ৮০ মিটার হার্ডল রেসে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ পদক। সম্প্রতি ডাবলিনে আয়োজিত ক্লনলিফ হ্যারিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় চি চেঙ্গ ১০০ গজ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এই রেকর্ডে তিনি একক কৃতিত্বের অধিকারিণী নন। অস্ট্রেলিয়ার এম উইলাড এবং আমেরিকার নিগ্রো মেয়ে উওসিরা টাইউসের সঙ্গে র‍্যাকেটে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড।

চি চেঙ্গের ডাবলিনের সময় ১০·৩ সেকেন্ড আরও উন্নত হতে পারত যদি ফাইনালের পাল্লা হত তীব্রতম। হিটে তাঁর

মিউনিকে ১৯৭২ সালের বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসছে। তার প্রস্তুতি চলছে জোর-কদমে। অলিম্পিকের বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও আনুসঙ্গিক কাজের জন্য যে কনস্ট্রাকশন বোর্ড গঠিত হয়েছে সেই বোর্ডের ৪ বিভাগের ৪ জন কর্মী অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গত ১৪ জুলাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে

সময় হয়েছিল ১০·৫ সেকেন্ড এবং অতি সহজ ও অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি দৌড়েছিলেন। আশা ছিল ফাইনালে ১০ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করবেন। কিন্তু দৌড় শেষে বলেছেন কোন প্রতিযোগিনী আমার পিছু তাড়া না করায় সময়টা ভাল হয়নি।

শুধু ডাবলিনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নয়, তার তিনদিন আগে কার্ডিফের এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এশিয়ার এই মেয়ে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় এবং ১০০ মিটার হার্ডল রেসেও বিজয়িনী হন। তার কিছু আগে লণ্ডনের হোয়াইট সিটিতে মহিলাদের অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার হার্ডল রেসে করেন যুক্তরাজ্যের নতুন রেকর্ড। ডাবলিনে ১০০ গজে বিশ্ব রেকর্ড করার পরের দিন ২২০ গজ দৌড় এবং ২০০ মিটার হার্ডলসে বিজয়িনী হয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান পান।

পঙ্গুদের পরাক্রম

পঙ্গুদের পরাক্রম বললে হয়তো কথাটা ঠিক বলা হবে না, পঙ্গুদের প্রচেষ্টাই বলা উচিত। তবে শক্ত সমর্থ জোয়ানদের চেয়েও যদি পঙ্গুদের কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য নজির সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরাক্রম বলতেই বা বাধা কোথায়?

সপ্তাহ দুই আগের একটি খবর: বোম্বের নৌবাহিনীর হাসপাতালের রোগী মুরলিকান্ত পেতকার প্যারাপ্লেজিক অলিম্পিক থেকে একটি সোনার মেডেল লাভ করে আবার হাসপাতালে ফিরে এসেছেন। ইংলণ্ডের স্টোক ম্যাণ্ডেভিলের প্যারাপ্লেজিক অলিম্পিকে মুরলিকান্ত বিজয়ী হয়েছেন ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে। ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী যিনি স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

মুরলিকান্ত পেতকার ছিলেন কোর অফ ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারসের সাঁজোয়া বাহিনীর একজন সৈনিক। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষে তার মেরুদণ্ডে আঘাতের ফলে নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। তারপর তাকে ভর্তি করা হয় বোম্বের ন্যাভাল হাসপাতাল অশ্বিনীতে। সাইকোথেরাপি চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে তিনি একটু একটু করে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে হুইল চেয়ারে বসে নানা রকমের খেলাধুলারও রেওয়াজ আরম্ভ হয়। খেলাধুলার প্রতি আগেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং সামরিক বাহিনীতে নিয়মিত খেলাধুলাও করেছেন। পঙ্গু হয়ে পড়ার পর এই খেলাধুলাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নেন। ফলে প্যারাপ্লেজিক স্পোর্টসের নানা বিষয়ে পান প্রচুর পদক ও কাপ। তবে আন্তর্জাতিক আসর থেকে স্বর্ণপদক লাভ নিশ্চয়ই বড় কৃতিত্ব। মুরলিকান্ত এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর আশা খেলাধুলার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন।

স্টোক ম্যাণ্ডেভিলের এই প্যারাপ্লেজিক অলিম্পিকে উপর্যুপরি দুবারের (রোম ও টোকিও) অলিম্পিক ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলাও যোগ দিয়েছিলেন পঙ্গু অবস্থায়। মাস পাঁচেক আগে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হবার পর বিকিলা এখন স্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

পঙ্গুদের অলিম্পিক পৃথিবীর সব পঙ্গুর অংশ গ্রহণের উৎসাহ দেখে বিকিলার প্রতিযোগিতা করার ইচ্ছা জাগে। তবে দৌড়ে নয়। দৌড়ের জন্য পা তাঁর এখনো পটু হয়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করারও ক্ষমতা নেই। তাই বিকিলা ঠিক করলেন হুইল চেয়ারে বসেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন ধনুর্বিদ্যা। মাত্র ৭ দিনের অনুশীলনে ধনুর্বিদ্যায় বিকিলা নবম স্থান পেয়েছেন। প্রতিযোগিতার পর বলেছেন, 'কোন স্থান বা কত পয়েন্ট পেয়েছি সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা আমি আবার স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমার মত এমন দুর্ঘটনা অনেকেরই ঘটতে পারে। কিন্তু ভেঙে বা মুষড়ে না পড়ে তাঁরা যদি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে তবে নৈরাশ্য অনেকাংশে কেটে যায়'।

সত্যিই নৈরাশ্যকে জয় করার ক্ষেত্রে খেলাধুলার এক সম্মোহিনী শক্তি আছে। পঙ্গু ও অশক্তদের সাফল্য থেকেই তার প্রমাণ মেলে। তাছাড়া যাঁরা জন্মান্ধ তাঁরাও তো দেখছি অসাধ্য সাধন করছেন। কিছুদিন আগের আর একটি সংবাদ: ইংলণ্ডের ৪ জন জন্মান্ধ সাঁতারু রিলে প্রথায় সাঁতার কেটে ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন।

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

র‍্যাকেট ঘুরিয়ে টস না করে মুদ্রা ক্ষেপণের দ্বারাও টস হতে পারে। বহু ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মুদ্রা ক্ষেপণের দ্বারাও টস হয়ে থাকে। আবার র‍্যাকেট ঘুরিয়ে টস করার সময় 'রাফ' বা 'স্মুথ' না বলে অনেকে হেড অথবা টেলও বলে থাকেন। র‍্যাকেটের যে পাশে ছাপ দেওয়া থাকে সেই পাশকে হেড বলে ধরা হয়।

স্কোরিং

৭। (এ) **ডাবলস এবং পুরুষদের** সিংগলসএর খেলায় একটি গেম হয় ১৫ পয়েণ্ট বা ২১ পয়েণ্টে। ১৫ পয়েণ্টের গেম হবে, না ২১ পয়েণ্টে গেম হবে তা প্রতিযোগিতা কমিটি ঠিক করে দিতে পারেন। (সাধারণত সব জায়গায় ১৫ পয়েণ্টে গেম হয়ে থাকে) ১৫ পয়েণ্টে গেম হলে যখন পয়েণ্ট হবে ১৩ 'অল', অর্থাৎ দু' পক্ষেরই ১৩ করে পয়েণ্ট হবে তখন যে পক্ষ প্রথম ১৩ পয়েণ্ট করবেন সেই পক্ষ ৫ পয়েণ্টে গেম 'সেট' করে নিতে পারবেন, একই ভাবে যখন ১৪ 'অল' হবে তখন যে পক্ষ প্রথম ১৪ পয়েণ্টে পৌঁছাবেন সেই পক্ষ ৩ পয়েণ্টে গেম 'সেট' করতে পারবেন। গেম 'সেট' করা হলে 'লাভ-অল' থেকে স্কোর গোনা আরম্ভ হবে এবং ১৩ 'অলে' যদি গেম সেট করা হয় যে পক্ষ প্রথম ৫ পয়েণ্টে পৌঁছাবেন সে পক্ষ জয়ী হবেন। সমভাবে ১৪ 'অলে' যদি গেম সেট করা হয় যে পক্ষ প্রথম ৩ পয়েণ্টে পৌঁছাবেন সে পক্ষ গেম জয় করবেন। ১৩—১৩ পয়েণ্টেই হক কিংবা ১৪—১৪ পয়েণ্টেই হক, গেম 'সেট' করতে হলে সেটিং পয়েণ্টে পৌঁছবার পর সার্ভিস করার আগে অবশ্যই 'সেট' করার দাবী জানাতে হবে।

২১ পয়েণ্টে গেম হলে একইভাবে ১৩—১৩ এবং ১৪—১৪-র বদলে ১৯-১৯ বা ২০-২০ পয়েণ্টে গেম 'সেট' করতে হবে।

(বি)। মহিলাদের সিংগলস গেম হয় ১১ পয়েণ্টে। এখানেও ৯ অল অর্থাৎ ৯-৯ পয়েণ্টের সময় যে মহিলা প্রথম ৯ পয়েণ্টে পৌঁছবেন তিনি ৩ পয়েণ্টে গেম 'সেট' করতে পারবেন এবং যখন পয়েণ্ট হবে ১০-১০ তখন যিনি প্রথম ১০ পয়েণ্টে পৌঁছবেন তিনি ২ পয়েণ্টে গেম সেট করতে পারবেন।

SCORE CARD

EVENTS Mens' Singles ROUND Final

NAME abc vs xyz

abc			xyz		
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18

MATCH WON BY 15-9, 9-15, 15-9

CHIEF REFEREE UMPIRE

ব্যাডমিণ্টন খেলার স্কোর কার্ড। তিনটি গেমের জন্য তৈরী এই স্কোর কার্ডে শুধু ১৫-৯, ৯-১৫ ও ১৫-৯ পয়েণ্টে খেলা নিষ্পত্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু যেমন যেমন পয়েণ্ট হবে আম্পায়াররা সেইভাবে পয়েণ্ট কেটে যাবেন

(সি)। যদি কোন পক্ষ 'সেট' করার প্রথম সুযোগ গ্রহণ নাও করেন তবে দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। প্রথমবারের প্রত্যাখ্যানে দ্বিতীয়বারের অধিকার নষ্ট হয় না।

(ডি)। হ্যাণ্ডিক্যাপ গেমে সেটিং-এর নিয়ম নেই।

৮। যদি অন্য কোন রকমের ব্যবস্থা না হয়ে থাকে তবে দুই পক্ষের মধ্যে তিনটি গেম খেলা হবে। তার মধ্যে যে পক্ষ দুটি গেম জিতবে সে পক্ষ জয়ী হবে। প্রথম গেমের পর দ্বিতীয় গেমের আগে দুই পক্ষ কোর্টের পাশ পরিবর্তন করবেন। দ্বিতীয় গেমের পর যদি তৃতীয় গেমের প্রয়োজন হয় আবার পাশ বদল হবে এবং তৃতীয় গেমের মাঝে নীচের লেখা পয়েণ্ট অনুযায়ী কোর্টের পাশ বদল করতে হবে।

(এ)। ১৫ পয়েণ্টের গেমে যখন কোনো পক্ষ ৮ পয়েণ্টে পৌঁছবে;

(বি)। ১১ পয়েণ্টের গেমে যখন কেউ ৬ পয়েণ্টে পৌঁছবে;

(সি)। ২১ পয়েণ্টের গেমে যখন কোন পক্ষ ১১ পয়েণ্টে পৌঁছবে;

হ্যাণ্ডি ক্যাপ ম্যাচের তৃতীয় গেমে গেম পয়েণ্টের অর্ধেকে পৌঁছলে কোর্ট পরিবর্তন করতে হবে। (বিজোড় পয়েণ্টের গেম হলে ভগ্নাংশের জায়গায় এক ধরে নিয়ে অর্ধেক ঠিক করতে হবে। যেমন ১৫ পয়েণ্টে গেম হলে ৮ পয়েণ্টে কোর্ট বদল করতে হয়)।

যদি তিনটি গেমের বদলে একটি গেম খেলার ব্যবস্থা থাকে তবে তৃতীয় গেমের মাঝে যে ভাবে কোর্ট পরিবর্তন করা হয় সেই ভাবেই কোর্ট বদল করতে হবে।

যদি অমনোযোগিতা বা ভুলবশত আইনে লেখা পয়েণ্ট অনুযায়ী কোর্টের পাশ বদল না হয়ে থাকে তবে যখনই ভুল ধরা পড়বে তখনই পাশ বদল করতে হবে। তবে স্কোরের কোন অদল বদল হবে না। ভুল ধরা পড়ার সময় যে স্কোর থাকবে সেই স্কোরেই খেলা চলবে।

মুকুল

ফরাসী

চিত্রকথা

আলাঁ রেনে

[illegible]

রোবের ব্রেস'

সদস্য বলতে হবে। তালিকা থেকে রেনে ও অ্যালাঁ রেনে বাদ যাননি। অসীম কৃপাপরবশ হয়ে ফরাসী সরকার এই দুটি ছবি অন্তত পাঠিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজের উদ্যোগে এবারের চেয়ে অনেক বেশী ভাল ফরাসী ছবি দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। এই উৎসবের তালিকা থেকে গদার, ত্রুফো ও মাল বাদ যাননি। এবারের প্রদর্শনীতে আর কিছু না হোক লুই মালের একটি ছবি অন্তত স্থান পাবে ভেবেছিলাম—সেটি তিনি সবে কলকাতার উপর তুলেছেন। না, সেদিক থেকেও আমরা বঞ্চিত।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ এত ভাল ছবি যোগাড় করেছিলেন কেমন করে? শুনতে পাই চিত্র নির্বাচনে ফেডারেশনের কিছুটা হাত ছিল। এই সুযোগ ফরাসী সরকারও কি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রককেও দিয়েছিলেন? যদি দিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা চিত্র নির্বাচনে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, আগের বার উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল অনেক সুন্দর। কিন্তু অ্যাপ্র-

মুশেত

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বের সব কিছুই বিচিত্র। যা কিছু স্বাভাবিক এবং উচিত তা কখনই এখানে স্বাভাবিক এবং উচিত পরিস্থিতিতে ঘটে না। যেসব চিত্রনির্মাতা অনায়াসে চলচ্চিত্রের মাধ্যম নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন, কম পয়সায় কম সময়ে অনায়াসে ছবি বানাতে পারেন তাঁরা তা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই করতে চান না। প্রপোজিশনের জটিলতা যখন জটিলতর হয়ে পড়ে তখন এঁরা হঠাৎ এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবেন। এবং তাই নিয়ে ব্যবসা-বিহঙ্গে চিত্রজগতে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হই হই পড়ে যায়। বম্বের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রনির্মাতাদের একজন বি আর চোপরা—যিনি চিত্রজগতে প্রবেশের পূর্বে একজন সাংবাদিক ছিলেন। চোপরা পরিবারে একমাত্র নায়ক-নায়িকা ছাড়া সবাই আছেন, এক ভাই প্রযোজক, আরেক ভাই ক্যামেরাম্যান, অন্য ভাই পরিচালক। গল্প লেখার জন্য আছে স্টোরি ডিপার্টমেন্ট। শ্রীচোপরার ছবি 'আদমি আউর ইনসান'

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকশন্স-এর "অভিনেত্রী" হিন্দী চিত্রে হেমা মালিনী ও শশী কাপুর

শেষ হবার পর, সেন্সর নাকি সে ছবিকে কেটেকুটে তছনছ করে দিয়েছে। সুতরাং সেই ছেঁড়াখোঁড়া ছবিকে রিপেয়ার করতে সময় এবং চিন্তার দরকার; সুতরাং ইউনিটকে বসিয়ে না রেখে চট করে একটা 'বোল্ড এক্সপেরিমেন্ট' করে ফেলার কথা ভাবলেন শ্রীচোপরা। সঙ্গে সঙ্গে একটি ইংরেজী থেকে নেওয়া সফল গুজরাতী নাটকের স্বত্ব কিনে ফেলা হল। তারপর এলেন নায়ক নায়িকা রাজেশ খান্না এবং নন্দা। শ্রীচোপরার এই বোল্ড এক্সপেরিমেন্টের জন্য নায়ক নায়িকা দুজনকেই একনাগাড়ে এক মাস ডেট দিতে হল। তাঁরা দিলেনও। তার ফলে অন্য যেসব নির্মাতা বিপদে পড়লেন, তাঁদের কথা নেপথ্য-নাটক। এক মাসে একটানা সুটিং করে একটি রঙীন ছবি শেষ হবে, তাও আবার এক্সপেরিমেন্টাল, অত্যন্ত আনন্দের কথা, এবং ছবিতে নাকি গান-টানও থাকছে না। সুতরাং হয়ত এ ছবির সঙ্গীত নির্দেশনা যোগ্য সঙ্গীতনির্দেশক সলিল চৌধুরীই করবেন। সবই ভাল। সবই আনন্দের। কিন্তু এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রীচোপরারা কেন করেন না সেইটেই আমরা বুঝতে পারি না। যখন গড্ডলিকাপ্রবাহে হঠাৎ গিট বেধে যায় তখন স্টপ গ্যাপ প্রডাকশন হিসেবে অন্যদের বিপদে ফেলে, আপাতত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে কেন এই "বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট" করা সেইটেই বুঝতে একটু কষ্ট হয়।

★

বম্বের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফরাসী ছবির উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবের ছবি নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। কিন্তু ফরাসী ছবির উৎসব উপলক্ষে বম্বে যতখানি যেরকমভাবে চঞ্চল হয়েছিল, তার কিছু ইতিবৃত্ত পাঠকদের না শোনাতে পারলে আমার মনের চাঞ্চল্য কমবে না। ফরাসী ছবিগুলি বম্বেতে পৌঁছনোর আগেই কেমন করে যেন রটে গেল যে, এই ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি ছবি নাকি বেশ রোমাঞ্চকর-ভাবে উষ্ণ (হট্)। বাস অমনি বম্বে গরম গেল। ফিল্মস ডিভিসনের কর্তারা নাজেহাল। ফরাসী কনসুলেটের কর্ণধারদের কান ছেঁড়ে যায় আর কি। যে প্রেক্ষাগৃহে ছবিগুলি দেখানো হবে সেখানে কতকে ঘিরে মাছির মত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের নরনারীর ভিড়। বম্বের একজন বিখ্যাত চিত্রপরিবেশক নাকি একটি ফরাসী ছবি দেখবার জন্য এক শ' পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি পাঁচ টাকার টিকেট কিনেছেন। সাংবাদিকরা সব কিছু ছেড়ে ফরাসী ছবি দেখার জন্য অধীর। সুতরাং ফিল্ম ডিভিসনে প্রতিদিন দুটি করে একই ছবির শো। বম্বেতে যে এত সাংবাদিক আছেন এবং তাঁরা সবাই যে এত চলচ্চিত্রানুরাগী তা এর আগে অনুভব করিনি। একে ফরাসী ছবি তাতে [illegible], সুতরাং বুঝতেই পারছেন। প্রথম শো স্বামী তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে দেখছেন তো দ্বিতীয় শো স্ত্রী তাঁর ভক্তদের সঙ্গে দেখছেন। প্রথম শো-তে প্রায় বৃদ্ধ সম্পাদক পিতাকে দেখা যাচ্ছে ও দ্বিতীয় শো-তে তাঁর সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করতে। ফরাসী ছবির দৌলতে কিছু বিরল নাটক দেখবার সুযোগ পেলাম আমরা। যে নাটক লোকলজ্জা এবং সেন্সরের ভয়ে কোনদিনই দেখা যাবে না। সত্যিই কি ভারতবর্ষের

কে আসিফের "লভ অ্যান্ড গড" চিত্রে

"এখানে পিঞ্জর" (পরিচালনা : স্বাত্ত্বিক) ছবির শ্যুটিং আরম্ভ হয়েছে : একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে উত্তমকুমার ও দিলীপ মুখার্জি ফটো—দেশ

অধিকাংশ লোক হিপোক্রিট। গত কয়েক বছরে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কৃপায় আমাদের দেশে নাকি একদল সচেতন চিত্র-দর্শকের আবির্ভাব হয়েছে। যাঁরা ফরাসী, চেক, সুইডিশ বা পোলিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস গুলে খেয়েছেন। ফলে, তাঁদের মনে, পেটে বা মাথায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য আর একদম কোন স্থান নেই। আজকাল তাঁদের কাছে সত্যজিৎ রায়ও 'ট্র্যাশ' হয়ে গেছে। তাদের মুখে আজকাল নিউওয়েভও একটি পুরনো ব্যাপার। তাঁরা আজকাল আনডার গ্রাউন্ড মুভি মুভমেন্টের কথা বলছেন এবং আনডার গ্রাউন্ড মুভি মুভমেন্টের আচার ব্যবহারকে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে টেনে এনে অপূর্ব এক একটি সং সেজে আমাদের দেশী সংসারে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

*

পরিচালক অসিত সেন কয়েকজন সহযাত্রীর হাতে হাত মিলিয়ে একটি তারকা-বহুল হিন্দী ছবি শুরু করতে চলেছেন। ছবিটির হিন্দী নাম 'সফর'। এটি ও'র প্রথম ছবি 'চলাচলে'র (বাংলা) হিন্দীরূপ। এ ছবিতে অভিনয় করছেন, অশোক কুমার, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, ফিরোজ খান, আই এস জোহর প্রভৃতি। বম্বেতে এসে অবধি অসিতবাবু চলাচলের হিন্দী করার জন্যে বহুজনের কাছে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু গল্পের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্যে এখানকার প্রযোজকরাও ছবিতে হাত দিতে সাহস করেন নি। সবাই নাকি একই কথা বলতেন, "ছবির শেষে যদি মৃতকে বাঁচিয়ে দিই, তাহলে প্রযোজকের মৃত্যু অনিবার্য।" এ কথায় উত্তরে হাসি হোত। সেই হাসি নিয়ে হাসাহাসি হোত কিন্তু ছবি হোত না। এখন হচ্ছে। সুতরাং সুখবর।

সরল শর্মা

শুভারম্ভ

গত ২০ আগস্ট প্রযোজক আশিস রায় তাঁর নতুন ছবির কাজ শুরু করলেন সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। পার্থপ্রতিম চৌধুরী এ ছবির পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালক। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে সেদিন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি অতুলপ্রসাদের গান এবং অনুপকুমার ঘোষালের একখানি রবীন্দ্রসংগীত গৃহীত হয়। ছবির শ্যুটিং অবিলম্বেই শুরু হবে। অপর্ণা সেন সম্ভবত ছবির নায়িকা।

২১ আগস্ট ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে মন্ময় মিত্রের পরিচালনায় তরুণ পিকচার্সে'র প্রথম ছবির মহরত সম্পন্ন হয়েছে। মহরতের শিল্পী ছিলেন বিকাশ রায় ও রত্না ঘোষাল।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সংবর্ধনা

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় মার্গ সংগীতের সাময়িক অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আমেরিকা যাত্রা করবেন। গত ১৬ আগস্ট সেই উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করেছিলেন সুরেশ সংগীত সংসদ। শ্রী ঘোষ উক্ত সংসদের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

ওই একই উদ্দেশ্যে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন গত ২২ আগস্ট বিড়লা অ্যাকাডেমী ভবনে।

বালক গদাধর

তীর্থভারতী নিবেদিত "বালক গদাধর" ছবিটির মুক্তি আসন্ন। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবনকে কেন্দ্র করে এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীহিরন্ময় সেন। সঙ্গীত পরিচালক : শ্রীঅহীন ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে শিল্পী : শ্রীমান সৌমিত্র, কুমারী চুমকী, ছায়া দেবী, গীতা দে, স্বপনকুমার, অমরেশ দাস, নৃপতি চ্যাটার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

তাপস মুখার্জি পরিচালিত বরদা চিত্রের "নববধূ"-তে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও নবাগতা স্বপ্না ঘোষ

মেঘ ও রৌদ্র' ছবির একটি বিশেষ দৃশ্যগ্রহণ পর্ব : মাটিতে হাঁটু গেড়ে দেখছেন পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী ফটো-দেশ

সৃজনের 'ঋতুপত্র'

সপ্তাহ রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্রনাথের গের অনুসরণে 'ঋতুপত্র' শীর্ষক একটি ষ্ঠান সম্পন্ন হল। 'সৃজন' নামক গঠনের পক্ষ থেকে প্রযোজিত এই ষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে নির্দেশক পাদ্ রায় প্রারম্ভেই জানিয়ে [illegible] ছেন যে এর মধ্যে নৃত্যনাট্য সৃষ্টির নো প্রয়াস নেই। কিন্তু তাহলেও পরি-ল্পনা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা থেকে । রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গে ১৮৮৬ কে প্রায় দশ বছর অবস্থান করেন া তীরবর্তী অঞ্চলে প্রকৃতির নিবিড় মধ্যে, তখন জীবন সম্পর্কিত তাঁর ত্র উপলব্ধিকে প্রকাশ করে প্রায় শত চিঠি লেখেন, যেগুলি পরবর্তী-ল 'ছিন্নপত্র' সংকলিত। এই সময়কার র্কিদ্যোতক গানগুলি নিয়ে একটি ন-রচনার অভিপ্রায়ই যদি থাকে, তাহলে ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্যেই বিষয়কে সীমায়িত করা । কেন? 'ছিন্নপত্রে' ঋতু-বৈচিত্র্যের বিধান যত না চোখে পড়ে তার চেয়েও শি অনুভূত হয় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বির সুনিবিড় উপলব্ধি আর তার সঙ্গে কটা অনির্দেশ্য সৌন্দর্যব্যাকুলতা। আর ই উপলব্ধি শুধু তো সেই সময়কার, সেই বের খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ব্যাপার নয়; এ ড়িয়ে আছে বিভিন্ন রূপে আর রঙে কবির সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনায় ও সৃজনকর্মে। আর তাই যদি হয় তাহলে অনুষ্ঠানটিকে 'ছিন্নপত্রের সঙ্গে যুক্ত করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবার সার্থকতা কি? এর মধ্যে নতুনত্ব তো কিছু নেই-ই বরং ওই বিজ্ঞাপনটুকু না থাকলে রসোপভোগ হয়ত সহজতর হত কেননা সেখানে অকারণ 'ছিন্নপত্র' খুঁজে বেড়ানোর দায় থাকত না। কেননা অনুষ্ঠানের গানগুলি সুনির্বাচিত এবং একক গানগুলি সুগীতও। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, স্বপন গুপ্ত এবং অর্ঘ্য সেন—প্রত্যেকেই দরদ দিয়ে গেয়েছেন। অবশ্য বনানী ঘোষের দ্বিতীয় গানটিতে শিল্পীকে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। নাচ, শাল গুহের সুনিপুণ বাজনাময় নৃত্যভঙ্গিমার কথা বাদ দিলে, রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। লোক-নৃত্য-গুলি পৃথকভাবে ভালোই, কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়নি। আর বাউল-নৃত্যের পুনঃ-পৌনিকতা এই অনুষ্ঠানের রসসৃষ্টির পরিপন্থী-ই শুধু নয়, এই নাচের সঙ্গে নির্বাচিত গানের সুর ও ছন্দের (যেমন, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়) কোনো মিলও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনুষ্ঠানের পশ্চাদপটের আলোর কাজ রসাস্বাদনে আর একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। অগ্নিপাত কিংবা বজ্রপাত—বাস্তবের বিভ্রান্তি রচনা অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি, কোনো দিক থেকেই সার্থক না হওয়ায় রীতিমত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। এ সম্পর্কে 'দীপচিত্রকার' কণিষ্ক সেনের আর একটু যত্নশীল হবার প্রয়োজন আছে।'

—আনন্দবর্ধন।

সারা বাংলা নাট্যসংগ্রাম সমিতি

অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলির আভ্যন্তরীণ চিত্রটি কী মর্মন্তুদ, তা জানতে পারা গেল "সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতি" আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে।

গত ২৫ জুলাইয়ের ঐ সম্মেলনে সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হল, অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীর নিকট থেকে সরকার যে কর আদায় করেন তা অন্যায়, অযৌক্তিক। এই কর মকুবের জন্যই সমিতি আন্দোলন শুরু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে শহর ও গ্রামে এ পর্যন্ত তাঁরা ৭টি আঞ্চলিক অধিবেশনে ৮৪২টি সংস্থার সঙ্গে জড়িত প্রায় বারো হাজার নাট্যকর্মীর কাছে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছেন। এইভাবে ও'রা আরও ৪৭টি অধিবেশনের মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের বৃহত্তর অংশকে এ বিষয়ে সচেতন করবেন এবং সমর্থন কামনা করবেন।

প্রসঙ্গত ও'রা জানালেন সারা বছরে গড়ে মোট অভিনয় হয় শহর ও শহরতলীতে ২৯

নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক পরিচালিত "দিবারাত্রির কাব্য" ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও স্বপন রায়

হাজারের মত এবং মফঃস্বল অঞ্চলে ৩৬ হাজারের মত। সর্বমোট ৬৫ হাজারের মত। এই সমগ্র অভিনয়ের উপর সরকার প্রমোদকর আদায় করে পান মাত্র ৪০ হাজার টাকার মত।

সুতরাং, সারা বাংলা নাট্য সংগ্রাম সমিতির এই প্রমোদকর মকুবের প্রস্তাবটি যদি সরকার মেনে নেন তাহলে তাঁদের ক্ষতি হবে মাত্র ৪০ হাজার টাকার মত, কিন্তু সারা বাংলার মুমূর্ষু নাট্যসংস্থাগুলি তার বিনিময়ে টিকে থাকার ভরসা পাবেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হলো যে, সারা বাংলায় প্রায় ২২ হাজার নাট্য সংস্থা আছে। এর সঙ্গে জড়িত নাট্যকর্মী, শিল্পী ও নাট্যকারের মোট সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের মত। তাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে বেঁচে আছে প্রায় ৮৩ হাজার মানুষ। এছাড়া মুদ্রণ, কাগজ, লোহা, কাঠ ও বাঁশ, বস্ত্র, সীবন, ডেকরেটের, প্রসাধন, স্টেশনারী, টিন, পাট, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র—এতগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই সব নাট্যাভিনয়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

আবার "এণ্টনী কবিয়াল"

কাশী বিশ্বনাথ রঙ্গমঞ্চে আবার বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত "এণ্টনী কবিয়াল" নাটকটির নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। ভূমিকালিপিতে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। স্বর্গত জহর গাঙ্গুলি রূপায়িত 'ভোলা ময়রা'র চরিত্রে এবারে রূপ দিচ্ছেন অসিতবরণ (চলচ্চিত্রে এই চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেছেন)। 'মামাবাবু'র চরিত্রে এই প্রথম অবতীর্ণ হচ্ছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। এণ্টনী এবং সোদামিনীর চরিত্রে পুরোনো জুটি সবিতাব্রত দত্ত ও কেতকী দত্তই থাকছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জীবেন বসু, কালিপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, কল্যাণী ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী, সীতা মুখার্জি প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিল বাগচি এবং আলোকসম্পাতে তাপস সেন।

সিনে মেক-আপ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা

গত ৭ জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সিনে মেক-আপ আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণ রূপসজ্জাকর শ্রীমদন পাঠক এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। চলচ্চিত্রের রূপসজ্জা-শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং এই শিল্পের মান উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনার পর ১৯৬৯-৭০ সালের কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—শ্রীশান্তি সেন; সহ-সভাপতি—শ্রীত্রিলোচন পাল; সম্পাদক—শ্রীঅনন্ত দাস; সহ-সম্পাদক—শ্রীদুর্গা চট্টোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমদন পাঠক এই সমিতির উপদেষ্টা।

রঙ্গরাজমের "তটিনীর বিচার"

রংগরাজমের শিল্পীরা উপহার দিলেন 'তটিনীর বিচার'। স্থান মারবেল প্যালেস। মঞ্চ ক্ষুদ্র, অভিনয় পরিসরও সীমাবদ্ধ। তথাপি আলোচ্য সংস্থার শিল্পীরা তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বহু-অভিনীত এ নাটকটির যে মঞ্চরূপ পরিবেশন করলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার। এঁদের দলগত অভিনয় যেমন সুন্দর, ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণও তেমনি উপভোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ মানেরও। বিশেষ করে ডাঃ ভোস, বসন্ত, সমর ও তটিনীর চরিত্রাভিনয়ে যথাক্রমে বীরেন্দ্র মল্লিক, সলিল সরকার, সুজিত ব্যানার্জি ও কৃষ্ণা রায় এক কথায় অপূর্ব। চরিত্রানুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন শ্যামলী দত্তগুপ্ত (ললিতা), শিখা মিত্র (কৃষ্ণভামিনী)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন স্বপন দত্ত, তরুণ ঘোষ, নীরেন্দ্র মল্লিক, সমীর শেঠ, বিমল শীল, অবর্ণা ভৌমিক, মিতা কর প্রভৃতি। কণ্ঠসংগীতে শিখা মিত্র ও স্তুতি সান্যাল-এর কাজ সুন্দর। নাট্য-নির্দেশনায় কৃতিত্ব বীরেন্দ্র মল্লিকের।

দেহপট সনে নট...

শিলিগুড়ি থেকে শ্রীখোকন সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন যে 'দেশ' পত্রিকার ২৭ আষাঢ় সংখ্যায় "দেহপট সনে নট..." নিবন্ধে কাশীপুর শ্মশানঘাটে শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যুবার্ষিকীতে একজনও অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী উপস্থিত ছিলেন না—এ কথাটি ঠিক নয়। জনৈক শৌখিন অভিনেতাকে তিনি ঐ অনুষ্ঠানে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি শ্রীঠাকুরদাস মিত্র।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য : শ্রীঠাকুরদাস মিত্র ঐদিনকার অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা। সুতরাং তাঁর উপস্থিতি শিল্পী-সমাজের অন্যান্য সকলের অনুপস্থিতির পরিপূরক হিসেবে গণ্য হতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বন্যা : মালদহ, মুর্শিদাবাদ—		... ৫৩৩
ব্যঙ্গচিত্র—		... ৫৩৪
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত		... ৫৩৫
বৈদেশিকী—দেবরাজ		... ৫৩৭
সুনন্দর জার্নাল—		... ৫৩৯
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		... ৫৪১
রাজার টুপি—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়		... ৫৪৩
অদূরের দিল্লি—দরবেশ		৫৫৩

হাতে-গড়া
প্রতিমার মত
অপরূপ
সৌন্দর্য...
ফুটিয়ে তুলেছে
হাতে-বোনা
বিনটেক্স
শাড়ী
বিনটেক্স শাড়ী আরও নানারকমের পাবেন।
BINNY

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৬০১
আলোচনা—	...	৬০৩
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৬১০
পুস্তক পরিচয়—	...	৬১১
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৬১৩
ব্যাডমিণ্টনের আইন কানুন—মুকুল	...	৬১৬
রঙ্গজগৎ—	...	৬১৭
অরণ্যদেব—	...	৬২৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৬২৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজয় দাশ

নেস্‌কাফে
স্বাদেই বোঝা যায়:

১ দক্ষিণ ভারতের সেরা কফিদানা থেকে তৈরী—১০০% ভাগই খাঁটি কফি

২ পৃথিবীর সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্যান্ট কফি প্রস্তুতকারকের দ্বারা এই কফি তৈরী

৩ রুচিমত যেমন কফি চাই তেমনি তৈরী করা চলে—হালকা বা কড়া—

চামচে অল্প পরিমাণ | সাধারণভাবে পূর্ণ চামচ | খুব ভর্তি চামচ

আর এতে খরচারও সাশ্রয়
প্রয়োজনমত নেস্‌কাফে নিন—
কিছুই ফেলা যাবে না।

NESCAFÉ* নেস্‌কাফে—স্বাদে অতুলনীয় কফি
নেস্‌লের তৈরী

[illegible]

মুখের শোভায় আনে মুক্তো-আভা
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম ফুটিয়ে তোলে মুক্তোর মত অপরূপ এক মায়াবী আভা। এই মুক্তো-আভা চেহারার আগে মুখের চকচকে ভাব আর অবাঞ্ছিত সব দাগ একেবারে সাফ ক'রে দেয়। অপরূপ এক দীপ্ত সৌন্দর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনাকে বিকশিত রাখে।
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীমের মুক্তো-আভায় আপনার সারা মুখ মধুরতর ক'রে তুলুন। পরে, তার ওপর অল্প একটু ল্যাকমে ফেস-পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে দিন। দেখুন, এক অনন্য সৌন্দর্যে আপনাকে কেমন অপরূপা দেখাচ্ছে। আজই ব্যবহার করে দেখুন।
Lakmé
VANISHING CREAM
ল্যাকমে
ভ্যানিশিং ক্রীম

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৫
শনিবার ২০ ভাদ্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীঅংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৩৯১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	—	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	—	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 6 September, 1969

বন্যা ঃ মালদহ, মুর্শিদাবাদ

আমাদের এখানে বর্ষা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী ঋতু: শ্রাবণে তার বিদায়পর্বের সূচনা হয় যে তাও নয়, ভরা ভাদ্র রয়েছে, তার পরও খেপা আশ্বিন। মোটামুটি বর্ষার মেঘ কাটতে আশ্বিন শেষ হয়ে যায়। এর ওপর প্রকৃতির খাম-খেয়ালীপনা তো আছেই। পশ্চিমবঙ্গে এবার বর্ষা আসতে কিছু বিলম্ব ঘটেছে। এই বিলম্বের জন্যে কিনা কে জানে নিয়মিত বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বর্ষণ। ফলে আজ, ভাদ্রের মাঝামাঝি এসে আমরা দেখছি, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক এলাকা এখন বন্যার কবলে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণার একাংশ ও নদীয়া থেকে নিত্য বন্যার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে মালদহের অবস্থা বোধ হয় সবচেয়ে গুরুতর। মুর্শিদাবাদেরও অবস্থা সেই রকম। মালদহ জেলার দশটি থানার মধ্যে নয়টি থানাই বন্যার কবলে, বন্যায় মৃতের সংখ্যাও তেইশ জন। স্থানীয় লোকদের মতে, গত পঁচিশ বছরে এমন বন্যা এখানে দেখা যায় নি। মুর্শিদাবাদ জেলারও ব্যাপক এলাকা বন্যার কবলে। গঙ্গা ও ভাগীরথীর জল বেড়ে চলেছে, জেলা সদর বহরমপুরের সঙ্গে জঙ্গীপুর লালবাগের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জাতীয় সড়কও জলে ডুবে আছে। মালদহের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যা শোনা যাচ্ছে তা ভয়াবহ, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের মতন ব্যক্তি আজ বন্যার ফলে দুর্গতি ভোগ করছেন; আনুমানিক দেড় কোটি টাকার মতন ফসল নষ্ট হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বন্যায়ও ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম নয়, এক লক্ষ লোক বন্যায় বিপন্ন, আশ্রয়হারা হয়েছেন শত শত পরিবার, জঙ্গীপুর মহকুমাতেই ধানের জমি নষ্ট হয়েছে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ একর। সমগ্র জেলাতে নয় লক্ষ একর মতন ধানের জমি জলমগ্ন। ঘরবাড়ি উভয় জেলাতেই নষ্ট হয়েছে প্রচুর।

এই সংক্ষিপ্ত ও আনুমানিক হিসেব থেকেই বোঝা যায়—মালদহ ও মুর্শিদাবাদে বন্যার অবস্থা কতটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই ব্যাপারটি আমাদের উদ্বেগের বিষয়।

বন্যার ফলে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে সরকারের পক্ষে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। রাজ্য সরকার সে ব্যবস্থা করেছেন, এবং সামরিক বাহিনীর সাহায্যও নিয়েছেন। তবু শোনা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। বিধানসভার অধিবেশনে জনৈক যুক্তফ্রন্ট সদস্য মুর্শিদাবাদের বন্যার উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেছেন তা মারাত্মক। বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধারের কাজে অকেজো সামরিক নৌকো পাঠানোকে তিনি 'প্রহসন' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য দিকে মালদহে বন্যা-দুর্গতদের মধ্যে যাঁরা রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁদের দাবি খাদ্য। অভিযোগ উঠেছে, ওঁরা ক্যাম্পে তিন চারদিনের মধ্যেও ভাতের মুখ দেখেন নি।

সৌভাগ্যের কথা, বন্যার জল ক্রমশ সরে যাচ্ছে বলে খবর আসছে। বন্যার জল নেমে গেলে ত্রাণ-কার্যের সুবিধা হবে বলেই আশা করা যায়। তখন অবশ্য সমস্যা আরও জটিল হয়ে দেখা দেবে : যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, খাদ্যের ব্যবস্থা করা। পীড়িতদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার প্রশ্নটিও বড় করে দেখতে হবে। উপরন্তু বন্যার পর মহামারীরও আশঙ্কা থাকে, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত হবে এমন আশা আমরা করি না। এই ব্যবস্থার সঙ্গে বেসরকারী ব্যবস্থাও থাকা দরকার। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুনেছি এ-বিষয়ে সজাগ হয়েছেন। বন্যার্তদের রক্ষায়, বিপন্নদের দুর্গতি মোচনে ত্রাণ এবং সেবার কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠু হোক—আমরা এইমাত্র কামনা করি।

প্রসংগত মনে রাখতে হবে, মাঝ বর্ষার এই বন্যাই এবারের মরসুমের শেষ বন্যা না হতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতের জন্যেও সরকারের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, আজকের দিনে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই নিবারণ করা যায়—যদি আগে থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া যায়। সেচ এবং পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব ওটা, ত্রাণ বিভাগের নয়।

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি সম্প্রতি উত্তর বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দিল্লিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। জানা গেল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প কার্যকর করার জন্যে ১৮৫ কোটি টাকার দাবি তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে দিল্লি কী করেন দেখা যাক। এ বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে ৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করার অনুরোধও তিনি জানিয়েছেন। আশা করা যায় এই অর্থ পাওয়া যাবে।

ভোট দিয়েছেন। ধরে নিলাম কথাটা সত্য। কিন্তু যদি তাই হবে তা হলে (১) পরে প্রধানমন্ত্রীরা জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি ঘটিত সব অভিযোগ 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে তুলে নিলেন কেন? এবং (২) সেই অভিযোগে কংগ্রেস সভাপতি এবং তাঁর বন্ধুদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার দাবি জানালেন না কেন? প্রধানমন্ত্রী যদি সেই পথ ধরতেন, যদি তিনি ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভুলে এবং গদির মোহে এ'টে না থেকে মূল অভিযোগে ও দাবিতে অটল থাকতেন তা হলে মানুষ বুঝত, না তাঁরা সত্যিই আদর্শের জন্য লড়ছেন। সে লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রীরা যদি হারতেন, যদি কংগ্রেস থেকে তাঁদের বেরিয়ে আসতে হত, তাহলেও মানুষের সমর্থন তাঁরাই পেতেন।

কিন্তু বদলে ও'রা করলেন কি? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বসে বললেন : না, ভুল খবর শুনে কি ভুল বোঝাবুঝিই না হয়ে গিয়েছিল! আহা, কচি খোকাখুকুর দল! একেবারে পরিষ্কার ধরা পড়ে গিয়েছে এবার, স্রেফ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে ওই অভিযোগ তোলা হয়েছিল; আবার যখন দেখা গেল সরকার পড়ু পড়ু মন্ত্রিত্ব যায় যায়, তখন সেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থেই ভুল বোঝাবুঝির অজুহাত আবিষ্কৃত হল!

আর, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং তাঁর বন্ধুদের রেকর্ড কি? হুমকি দিলেন, ডিসিপ্লিন রাখতেই হবে। কংগ্রেস দলের শৃঙ্খলা রক্ষার ঐতিহ্যমণ্ডিত নীতির প্রশ্ন এটা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল যখন বেরুলো যখন দেখলেন জিতেছেন প্রধানমন্ত্রীর দল এবং হলে পাল্লার ওদিকটা ক্রমেই ভারী হচ্ছে, তখন কিন্তু ক্রমেই সুর নরম হল এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ বাড়ল। শেষ পর্যন্ত, ওয়ার্কিং কমিটি বলার মুখে যখন বুঝলেন, এখন ডিসিপ্লিনের চাপ দেওয়া মানেই বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন, তখন তাঁদের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ভাই ভাই প্রস্তাব অনুমোদিত হল। নিজলিঙ্গাপ্পা এবং তাঁর বন্ধুরা যদি সত্যিই লড়াইয়ে নামতেন এবং শেষ পর্যন্ত হেরেও যেতেন তা হলেও মানুষ বুঝত

ওরা একটা কিছু নীতির জন্য লড়ে হেরেছেন—ও'রা ক্ষমতালোভী বাকাবাগিশ অথর্বের দল নন!

এইভাবে কেরলের যুক্তফ্রন্টের বিরোধ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, লড়াইটা ঠিক নীতির জন্য বা জনহিতের পন্থা নিয়ে নয়। লড়াইটা প্রধানত দলগত এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থের।

সি পি আই (এম) বার বার বলছেন, সি পি আই ও তাঁর বন্ধুরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছেন। ধরলাম অভিযোগটা সত্যি। কিন্তু যদি এ অভিযোগ সত্যই হয় তা হলে প্রশ্ন উঠবে সি পি এম সেই সব কংগ্রেস বন্ধুদের সঙ্গে এক হয়ে চলছেন কেন? কেন সি পি এম এদের মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণের কাছে আবার রায় চাইছেন না? বার বার অভিযোগ তুলে আবার সব ধামাচাপা দিচ্ছেন কেন?

সি পি আই আর এস পি এবং মুসলিম লীগের অভিযোগ সি পি এম যুক্তফ্রন্টের নামে অন্যদের পার্টিতন্ত্রে চালাতে চাইছেন। তাঁরা এই পথে এতদূর এগিয়েছেন যে, (১) সকল সরকারী যন্ত্রকে পার্টির কাজে লাগাচ্ছেন; এবং (২) নিজেদের পার্টির ও 'নিজেদের পার্টির' দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের পর্যন্ত প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অন্য দলের মন্ত্রীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি তদন্তের যে পন্থা গ্রহণ করেছেন সি পি এম নিজ দলের মন্ত্রীর ক্ষেত্রে তা করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।

এ অভিযোগ দুটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্ন। সত্যিই যদি এত মারাত্মক অভিযোগ থাকবে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে তা হলে সেই সব অভিযোগের ফয়সালা না করে তাঁরা মন্ত্রিসভায় থাকছেন কি করে একসঙ্গে? সি পি এম-এর বিরুদ্ধে তাঁরা তো এ সব অভিযোগ তুলছেন বহু দিন থেকেই।

✲

কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার এবং কেরলের যুক্তফ্রন্ট যে 'গেল গেল' করেও টিকে যাচ্ছে আমার মনে হয় তার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, যে যতই ঝগড়া করুন ক্ষমতা কেউই ছাড়তে চান না। যে কোনও ভাবে সরকারী ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অদম্য বাসনাই শত ঝগড়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ও'দের ঐক্য অটুট রাখছে।

সিণ্ডিকেট "ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন" করে চেঁচিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা পরিষ্কার বুঝলেন আর এগোলে কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটবে। কয়েকটি রাজ্যের পরিণতি দেখে তাঁরা এতদিনে বুঝে গিয়েছেন, একবার কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটলে আপাতত বেশ কিছুদিনের জন্য দলও ডুবে যাবে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার তাঁদের হাতে নেই বটে; কিন্তু কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আছে বলেই দল এখনও বেঁচে আছে। এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে দল না বাঁচলে রাজনৈতিকভাবে তাঁদেরও আর খুব বেশী দিন বেঁচে থাকতে হবে না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকার যে ছিটেফোঁটা ভাগ সকল কংগ্রেস নেতাই পান তাও চলে যাবে।

এই জন্যই চরম সঙ্কটের মুহূর্তে ছোট বড় সব কংগ্রেস নেতা আবেদন জানিয়েছেন : ইউনিটি, ইউনিটি!

প্রধানমন্ত্রীরও সেই দশা। ইন্দিরা দেবী মুখে যতই বলুন, "আমি গদির পরোয়া করি না", তিনিও খুব ভাল করে জানেন ভারতের বর্তমান রাজনীতিতে গদির মূল্য কত। আজ যে তিনি এতটা এগোতে পেরেছেন সেটাও প্রধানমন্ত্রীর গদি এবং দল পেয়েছিলেন বলেই। না পেলে এতদিন তিনি কোথায় থাকতেন তা অনুমান করাও কঠিন!

প্রধানমন্ত্রী এ কথাও জানেন, এবার কংগ্রেস ভেঙে গেলে আর তাঁর পক্ষে এক দলের এত ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না। বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট করে কোনরকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া যাবে কিনা তারও ঠিক নেই। প্রধানমন্ত্রী এসব ভেবে বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার তাগিদে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সব অভিযোগ তুলে নিলেন।

এমনি বিচার করলে দেখা যাবে কেরল যুক্তফ্রন্টেরও আজ একমাত্র "ঐক্যসূত্র" ক্ষমতার মোহ। কমিউনিস্ট দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ তুলছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদি কেউই ছাড়ছেন না!

কংগ্রেস ও কেরলের এই বিরোধ প্রমাণ করে গদি আঁকড়ে থাকার বাসনাই ভারতের রাজনীতির সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে। ভারতের রাজনীতি ক্রমেই নীতির পরিবর্তে গদিভিত্তিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গদি নীতির জন্য না হয়ে নীতিই গদির জন্য হচ্ছে। রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে দলাদলি এবং দুর্নীতির আসল মূলেও এই অন্ধ গদির মোহ।

আগে মনে হয়েছিল, এই ব্যাধিতে শুধু কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীরাই আক্রান্ত। ১৯৬৭ সনের পরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, না অ-কংগ্রেসীদের মধ্যেও এ ব্যাধি ব্যাপকভাবে সংক্রামিত।

এ ব্যাধি থেকে যদি অবিলম্বে ভারতের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলি মুক্ত না হতে পারেন তা হলে এদেশে আর যাই থাকুক গণতন্ত্র থাকবে না।

নবারুণ গুপ্ত

'মৌলিক অধিকার'

সন্ধ্যের পর, রাত আটটা নাগাদ, উত্তর কলকাতার কোনো বিশিষ্ট পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা চেহারার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

বাইরে তাঁর মোটর গাড়ীটি ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে উক্ত গাড়ীটির বনেটের ওপরে আসীন হয়ে, কিংবা তার গায়ে ঠেসান দিয়ে সান্ধ্য-সংলাপে মগ্ন ছিল জন কয়েক স্থানীয় তরুণ। পরনে যথানিয়মে সরু

দেওয়ালটা চুনকাম করিয়ে দিন পোস্টার লাগিয়ে সুখ হচ্ছে না

ট্রাউজার, বুশ শার্ট, আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে বয়েস।

ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দেওয়াতে উক্ত তরুণদের খুব খারাপ লাগল, তাদের আড্ডা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ীটা ওখানে অবশ্যই রাখা উচিত ছিল। অতএব কোনো মৌলিক অধিকারে ঘা পড়ল নিশ্চয়। তাদের মনে হল, এই ভদ্রলোককে নিদারুণ দাহ-জনক, অতীব মর্মঘাতী গোটা কয়েক সংলাপ শুনিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কী বলা যায়? 'শ্লা' দিয়েও আরম্ভ করা যেত, কিন্তু এরা আর একটু সাংস্কৃতিক পথ ধরল। পাশেই যখন পত্রিকার অফিস, তখন, তারই প্রভাবে বোধ হয়, সোজা চলে এল সাহিত্য। এদের উচ্চারণে আঞ্চলিক ইংরিজি 'এস'-এর

প্রভাব স্মরণে রাখলে সংলাপের মাধুর্য আরো ভালো করে হৃদয়ঙ্গম হবে।

পত্রিকার অফিস থেকে যখন বেরিয়েছেন, তখন লোকটি সাহিত্যিক এটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তিনি যে বিজ্ঞাপনদাতা হতে পারেন, অন্য কোনো কাজে আসতে পারেন, কোনো পরিচিতের সন্ধানেও তাঁর আসা অসম্ভব নয়— এসব প্রশ্ন এদের মনে এল না। অতএব বেশ গলা চড়িয়ে:

'আগেকার সাহিত্যিকরা— [illegible] আগেকার সাহিত্যিকরা—পায়ে হেঁটে যেত। ট্রামে চাপত। এখনকার সাহিত্যিকেরা মোটরে চড়ে।'

'এখনকার সাহিত্যিকরা—সব ব্যাটা মদ খায়।'

'অথচ দ্যাখ—শরৎচন্দ্র—শরৎচন্দ্র, অত বড়ো সাহিত্যিক, মদ খেতেন, খেতেন কখনো?'

'এখনকার সাহিত্যিকরা কেবল মদ খায়'—একটা বে-পাড়ার নাম করে বললে, 'সেখানে যায়—'

যাঁর উদ্দেশে এই সব শব্দভেদী বাণ ছোড়া হচ্ছিল তিনি সাহিত্যিক হোন বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা যা খুশি হোন, নির্বিকারভাবে গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। তিনিই যে এদের টার্গেট তা বুঝতেও পারলেন কিনা সন্দেহ। আমি অদূরবর্তী একটা সিগারেটের দোকানের

সামনে দাঁড়িয়ে এই সংলাপ শ্রবণ করলুম। গাড়ীর রাজাসন থেকে এই তরুণদের অপসৃত করবার প্রতিক্রিয়ায় গাড়ীওয়ালার কী ঘটল জানি না, কিন্তু মাঝখান থেকে বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা কিছু গালা-গাল খেলেন, একটা অপ্রাপ্য কমপ্লিমেন্ট পেলেন শরৎচন্দ্র, বাঙালী লেখকদের উদ্দেশ্যে এর পর 'শ্লা'র পর্যায় শুরু হল বোধ হয়, কিন্তু আর শুনতে পাইনি, আমার সময় ছিল না।

এরা কি বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের বিলাসিতায় মর্মাহত? এই তরুণরা কি বাঙালী সাহিত্যিকদের চরিত্ররক্ষায় অতীব উৎসাহী? সে রকম ভাবতে পারলে আমি

ফ্রি লিফ্ট

যথোচিত খুশি হতুম। কিন্তু লোক-চরিত্রে আমার যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাতে করে—এদের চেহারা এবং মুখভঙ্গীর নৈতিক রক্ষকতায় আমি সে-ভাবে আশান্বিত হতে পারলুম না।

আসলে, অসময়ে গাড়ীটা সরিয়ে নিয়ে, এদের সিনেমা, খেলা এবং অনাবিল মুখ-রোচক আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হল। ফলে বাঙালী সাহিত্যিকেরা—যাঁরা বেওয়ারিশ ফুটবলের মতো মাঠে পড়ে থাকেন এবং যে-কেউ যখন খুশি কিক্ করতে পারেন তাঁদের, সেই সাহিত্যিকদের ওপর দিয়ে গাত্রদাহ খানিকটা শান্ত করা গেল বোধ হয়।

তা হলে কথাটা দাঁড়ালো মৌলিক অধিকার। ওইটেই—যাকে বলে অ্যাপল অব ডিসকর্ড, বোন অব কনটেনশন। এই অধিকারে না জেনে হস্তক্ষেপ করলেই জীবনে আর শান্তি থাকে না।

সম্প্রতি আমাদের পাড়ায় একটি তাসা পার্টির উদয় ঘটেছে। রোজ বিকেলে, সাড়ে তিনটে থেকে ছটার মধ্যে অন্তত ঘণ্টা দুই দুটি ধেড়ে ঢাক, একটি বেঁড়ে ঢাক, এবং

আরও কিছু বেকার আলক, জাতুগুরু, ভাগিনের, ভাগিনীপতি পরিবৃত্ত হইয়া তিনি অবস্থিত করিতেছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম, নীতি উপদেশ দিতেছিলেন। কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়, নির্ণয়, ছল প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে বিবর্তবাদ, কাহাকে ব্যাংক জাতীয়করণের সুপরিণাম বুঝাইয়া দিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইল। গীতধ্বনি প্রিয়দর্শিনীর কানেও গেল। তিনি যোগবলে জানিলেন ঋতুগণ আসিয়াছেন।

দ্বিতীয় শৃঙ্খলাপন্থী নিজলিঙ্গাপ্পা। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর উস্কানিতে কংগ্রেস দলের বিস্তর এম পি, এম এল এ দলীয় প্রার্থীকে ভোট না দিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট দেওয়ায় তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের উপর মহাখাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রিয়দর্শিনী মাঝে মধ্যে ভীমা ভৈরবী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে তর্জন গর্জন করিতেছেন, তাই কংগ্রেস সভাপতি শৃঙ্খলার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। নিজলিঙ্গাপ্পা কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত শৃঙ্খলাপন্থী কংগ্রেস নেতা, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির তামাশাযজ্ঞে যোগ দিতে যাইবার আগে কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া সৈন্য-চালনার পরামর্শ করিবার জন্য তিনি নিভৃতে আসিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই অপার্থিব গীতধ্বনি সকলের কানে গেল। সভা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যদল যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, মুগ্ধ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নিজলিঙ্গাপ্পা গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে নিজ উদ্যানে মধ্যে নির্মিত এক টিব্যার উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার উত্থানে যে ঋতুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয় ঐক্যপন্থী চবন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিয়া দলে শৃঙ্খলা রক্ষার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, আশা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের বিস্তর সদস্য ও এম পি-গণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন। কিন্তু হায়, সে হিসাব মিলিল না। তাঁহার উত্তাভিলাষের চৌবাচ্চার দুইটি নালি দিয়া যত জল ঢুকিবার কথা, তিনি দেখিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জল একটি নালি দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছে এবং সে প্রবাহের গতি আপাতত প্রিয়দর্শিনীরই দিকে। তিনি সেই প্রবাহ রোধ করিবার জন্য ক্রমাগত সংকেতময় শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময় আলোক ও গীতধ্বনি হইল। চবন গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। আজি ঋতুগণ গায়ক। জন্মভূমির অন্তিম আশঙ্কার বিষাদে পূরিত হইয়া গাহিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তামাশা-যজ্ঞ। অর্বাচীনদের হানাহানিতে দেশ বুঝি যায়। তাই ঋতুগণ হায় হায় করিতেছেন। দুই শ্রীমান ও এক শ্রীমতী সেই গানের শ্রোতা।

॥ ৫ ॥

আজি ইন্দ্রপ্রস্থে মহাপ্রলয় উপস্থিত। আজি যদি রক্ষা হয় তবে ভারতে কংগ্রেস বলিয়া বস্তু থাকিবে। আজি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তামাশা-যজ্ঞ। কংগ্রেসের ভূচর, খেচর, উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞস্থলে আসিবার পূর্বে ঋতুগণের গানে প্রিয়দর্শিনীর হৃদয় কিঞ্চিৎ দ্রবীভূত হইয়াছিল, সে ভাব আর তাঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার সমর্থকবৃন্দ রণং দেহি, রণং দেহি হুংকারে যজ্ঞমণ্ডপ সরণি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ প্রহরী মোতায়েন করিতে হইয়াছে। নিজলিঙ্গাপ্পার শিবির হইতেও যোরনাদ ধ্বনিত হইতেছে। জানি কি হয়, কি হয় ভাব।

এমন সময় হঠাৎ আবার যজ্ঞস্থলেই নিজলিঙ্গাপ্পার আকস্মিক [illegible]। দেখিলেন তিনি শূন্য হইতে [illegible] ঘুরিতে [illegible]। [illegible] তিনি [illegible]

লাগিলেন? আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। একবার ভাবিলেন, আমি কোথায়? চক্ষু মেলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন তিনি শূন্যে। পুনর্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল। আবার অজ্ঞান। আর একবার ভাবিলেন, আমার সঙ্গে কে আছে? কামরাজ কোথায়? মোরারজি? পাতিল? সঞ্জীব অতুল্য? আবার চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন, কেহ নাই। একবার ভাবিলেন, কোথায় যাইতেছি? একবার মনে করিলেন, বুঝি রসাতল নিকটে। একবার তাঁহার বিভ্রম ঘটিল। দেখিলেন, কামরাজ ঘোড়ার উপর চাপিয়া বসিয়া শীতল পাটি চিবাইতেছেন, পাতিল দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বক দেখাইতেছেন এবং পরম সুহৃদ অতুল্য ঘোষ প্রিয়দর্শিনীর আঁচলের আড়াল হইতে ভেংচি কাটিতেছেন। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন, আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন, তাহা তো গিয়াছে। আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, কেন বাধ হইতে গিয়াছিলাম, কেন দলের শৃঙ্খলারক্ষার দায় একা ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছিলাম, কেন ধাষ্টামো করিতে গিয়াছিলাম, কেন সব হারাইলাম। এখন কোথায় যাইতেছি, জানি না। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। আবার অজ্ঞান।

চবন অলৌকিক শক্তিবলে নিজলিঙ্গাপ্পার দুর্দশা বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শান্তি-প্রস্তাবরূপী বীণা বাজাইয়া গান ধরিলেন, দেখ্‌ দেখি রে একবার এই বিশাল বীর, এই প্রকাণ্ড তপস্বী, এই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। অতএব আর নয়, এবার সব ভাই ভাই হও। অমনি সেই তামাশা-যজ্ঞস্থলীস্থ সকল মনুষ্যের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। এবং চতুর্দিক হইতে ভাই ভাই বোন বোন শব্দ উঠিতে লাগিল। সেই রণস্থলে চবনের ঐকামন্ত্রে মুহূর্তমধ্যে যেন রাখি-বন্ধনের ধুম পড়িয়া গেল।

॥ ৬ ॥

পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রসমূহে

কংগ্রেসের গোলমাল মিটে গেল

এই শিরোনামা পড়িয়া কংগ্রেসীরা [illegible] [illegible]

ডুমুরের মত রঙ ছিল সেদিন আকাশের। সুরমা বিছানায় শুয়ে ছিল। সুরমা রুগ্ন। বাবলু বারান্দায় রেলগাড়ী চালাচ্ছিল। সতীশ রথের মেলা থেকে বাবলুকে রথ কিনে না দিয়ে রেলগাড়ী কিনে দিয়েছিল। রেলগাড়ীর চাকায় সামান্য শব্দ হচ্ছিল; পাখী ডাকছিল আকাশে। ভোরের সূর্য উঠে আসছে। জানালায় পাতাবাহারের গাছ। গাছে লাল, নীল, হলুদ পাতা। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পাতার উপরে পরিচ্ছন্ন ভাবঃ সতেজ এবং স্নিগ্ধ। বাবলু গাড়ী চালাতে চালাতে ডাকল, বাবা আমার গাড়ীটা চলছে না।

সতীশ গাড়ীটাতে দড়ি বাঁধা দেখল। গাড়ীর চাকা ঘুরছে না বলে বাবলু দড়ি ধরে টানছে এবং চালাবার চেষ্টা করছে। সতীশ নুয়ে গাড়ীটা উল্টে দিল। আর পিন লাগালে গাড়ীর চাকা আবার ঘুরতে থাকল। বাবলু রেলগাড়ীটা টানতে টানতে দেয়ালে বোধ হয় পাখী দেখল, বোধ হয় পাখী উড়ে গেলে দেয়ালে সে নিজের ছায়া দেখে থেমে গেল এবং কেমন ভয় পেয়ে বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে।

বুঝতে না পেরে সতীশ বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বড় চোখ বাবলুর। হাসলে গালে টোল পড়ে। কালো রঙ। মুখের ভিতর চোখ দুটোই সার। ছোট করে ছাঁটা চুল এবং মুখশ্রীতে কেমন যেন যাদু আছে। যেন দূরের কোন মাঠে বৃষ্টিপাতের পর সামান্য জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ছোট্ট শিশু দু' হাত তুলে ছুটছে। সতীশ মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কি বললে?

বাবলু এবার গাড়ীটা বগলে নিয়ে সতীশের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, এখনে তুমি আমি বসব। বলে সে এনজিনের দিকটাতে স্থান নির্দিষ্ট করলে সতীশ বলল, মা কোথায় বসবে? কথা শুনে বাবলু একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। মা পাশে না বাবা পাশে? কে পাশে বসবে সে এ-মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারল না। ওর চোখে-মুখে ক্লিষ্ট এক ভাব ফুটে উঠেছে। সুতরাং সতীশ বলল, তুমি যেখানে বসাবে আমরা সেখানেই বসব। তোমার গাড়ীতে কে কোথায় যাবে তুমিই ঠিক করবে। বাবলু এবার গাড়ীটা ফেলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। সুরমা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ওর দেরী করে ওঠার অভ্যাস। ঝি আসবে। এসে সব হাতের কাছে এনে দিলে সে রান্না করবে। ওর পেটে কী যেন কষ্ট সব সময়। সামান্য অপারেশনের দরকার। এবং অপারেশন, হয়তো সুরমা মরে যাবে এমন একটা ভয় তার। বাবলু বিছানার পাশে আসতেই সুরমা মাথায় হাত রাখল। বলল, ভোর-বেলা গাড়ী নিয়ে খেলতে নেই। এখন পড়তে বোস। এমন কথায় বাবলু বিমর্ষ হয়ে গেল। সতীশের দিকে না তাকিয়েই বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে। মা দিদি পিছনে বসবে। ভোর হলে সূর্য অপার মহিমায় যেমন আকাশে উঠে আসে, এই বাবলু, ছোট্ট বাবলু সেইরকম দাপাদাপি করে এই সংসার জুড়ে ফুটছিল। মায়ের কথায় সে বিমর্ষ হয়ে গেল।

—তার পিছনে কে বসবে? কারণ বাবলুর গাড়ী চার কামরার। সে এবার কি ভাবল। জানালার পাতাবাহারের গাছ।

তারপর পথ। এই প্রাসাদের মত বাড়ীর ভিতর এক ফালি ঘর নিয়ে সতীশ রয়েছে। স্ত্রী সুরমা আছে। এই বড় বাড়ীর দু' পাশে ফুলের বাগান। বাগানে কত বিচিত্র ফুল। এবং বাগান পার হলে পুকুর, পাড়ে পাড়ে আমলকি গাছ। এখন কি আর সতীশের যেন মনে আসছিল না। এই আমলকি গাছের ছায়া এবং বন তার পরে

মাঠ, মাঠ পার হলে রেল কলোনীর লাল ইটের বাড়ী এসব তার মনে আসছিল।

বাবুল তখন বলল, তার পেছনে দিদিমা।

—আর কেউ নয়?

—না।

—তোমার ঠাকুমা ঠাকুর্দা।

এবারেও সে দ্বিধায় পড়ে গেল। সে কিছু না বলে গাড়ীটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসে ইতিহাসের পাতা খুলে পড়তে বসল। রাম-রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি। বড় লম্বা টুপি দেখলে বাবুলের মনে হয় এই বুঝি রাজার টুপি। সে বাবাকে কতবার এমন একটা টুপি কিনে দিতে বলেছিল, সতীশ বলেছিল, রথের মেলা থেকে কিনে দেবে। কিন্তু রথের মেলা থেকে না রথ, না টুপি। সে লম্বা এক রেলগাড়ী কিনে এনেছে।

বাবুল কি ভেবে ফের নিবিষ্ট হল ছবিতে। সতীশ কি ভেবে জানালাতে পাতাবাহারের গাছ দেখল। আর সুরমা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল ঝি মঙ্গলা এসেছে কিনা। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ চোখ সুরমার। দুই সন্তানের জননী সুরমা। চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ শুধু। সে উঠতেই বাবুল বলল, আমি আর পড়ব না মা।

—কেন পড়বে না?

—বাবা বলেছিল টুপি কিনে দেবে, রাজার টুপি। টুপি না দিলে আমি পড়ব না। বলে সে একটা খাতা টেনে ছবি আঁকতে বসে গেল।

সুরমা ধমক দিল এবার।—বাবুল তুমি পাকা পাকা কথা বলবে না। এখন পড়াশোনা কর। কেবল ছবি এঁকে খাতা নষ্ট করা। সতীশ এলে বলল, তোমার ছেলেমেয়েকে বলে যাবে দুপুরে বাইরে বের না হতে।

এই এক ভয় সুরমার। সুরমার কেন, সতীশেরও। বাড়ীর বাইরে ফুলবাগান, বাগান পার হলে বড় জলাশয়। জলে কালো রঙের শ্যাওলা। এবং বড় গভীর। এত বড় বাড়ীর এক কোণায় সতীশের তিন-কামরার ঘর। প্রাসাদের মত এই বাড়ীর কোন ভগ্নাংশে যেন সতীশ এবং সুরমা তাদের দুই সন্তানের প্রতি স্নেহ নিয়ে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিচ্ছে। সতীশের ভয়, বাবুল একা একা—যখন সুরমা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বে, যখন নির্জন দুপুরে পাতাবাহারের গায়ে কিছু পাখী ডাকবে—তখন এই বাবুল তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে কাঁধে খেলনার বন্দুক নিয়ে দৈত্য শিকারে বের হয়ে পড়বে। আর সঙ্গে থাকবে মিন্টু। দুই ভাইবোনে চুপি চুপি বের হয়ে ফুল ফল পাখীর জন্য দারোয়ানদের খুপরি ঘরগুলো অতিক্রম করে আমলকির বনে হারিয়ে মার অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজবে।

এই বড় শহরে এসে সুরমার স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙে গেল। সতীশ সেই পাতা-বাহারের পাতা দেখতে দেখতে কথাটা ভাবল। এই বড় শহরে বড় নিঃসঙ্গ সে। ক্রমে সে অস্থির হয়ে উঠছে। কারখানার কিছু কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে এ সময়। সতীশ একদা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। সুরমা শিক্ষয়িত্রী ছিল। বড় মাঠ ছিল সামনে। মাঠ পার হলে স্টেশন। স্টেশনে রেলগাড়ী এসে থামত। বাবুল আর মিন্টু রেলগাড়ী এলে জীবন দপ্তরীর কাঁধে মাঠ পার হয়ে স্টেশনে উঠে যেত। বারান্দায় ইজিচেয়ারে থাকত। সুরমা এবং সতীশ বসে বসে ওদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখত। এখন কেন জানি সে সব ছবি স্বপ্নের মত মনে হয়। এখন শুধু কানে কারখানার ঘণ্টা পেটানোর শব্দ ভেসে আসে। কে যেন অন্ধকারে লাল বলের মত এক অগ্নিগোলক ঝুলিয়ে রেখেছে এবং কারা যেন মাথায় রাজার টুপি পরার বদলে ক্রমান্বয় ঘণ্টা পিটিয়ে যাচ্ছে। এই ঘণ্টা পেটানোর শব্দ কানে এলেই সতীশের হাত-পা কাঁপতে থাকে। কেবল মনে হয় কারা যেন সব সময় হল্লা করে ওর পেছনে ছুটে আসছে। আজ সোমবার। বোনাস সম্পর্কে শ্রমিক পক্ষ থেকে কথা বলতে আসছে। কথায় কথায় বচসা হবে। ...নানারকমের ভয় ভীতিতে ওর গলা শুকিয়ে আসছিল। সে ঝি মঙ্গলাকে ডাকল; জল, এক গ্লাস জল দিতে বলল মঙ্গলাকে। তার পর জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল এবং সুরমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ ফিরতে দেরী হতে পারে। অযথা আমার জন্য ভাববে না।

সুরমা মুখ ফেরাল না। বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি কথা?

—বাবার চিঠি এসেছে। অফিস ফেরত চিঠি পড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না বলে দিই নি।

সতীশ সামান্য হাসল।—কই দেখি চিঠিটা। সুরমা বালিশের নীচ থেকে চিঠি বের করল এবং সতীশের হাতে দেবার সময় বলল, এ নিয়ে তুমি মাথা গরম করবে না। সুরমা সতীশকে শপথ করাতে চাইল। সতীশ জবাব দিল না। চিঠির ভাঁজ খুলে সেই বৃদ্ধ মানুষটির হস্তাক্ষর দেখল। হস্তাক্ষরে সতেজ সবল ভাবটা ক্রমে কেটে যাচ্ছে। পরম কল্যাণবর—এখন এই শব্দ এবং অর্থ ক্রমে অস্পষ্ট

হয়ে আসছে। সতীশ গত মাসে বাড়ীতে নিয়মিত যে টাকা দেয় তা দিতে পারে নি। তার কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হবার দরুণ রোজগার কমে গেছে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি। বাবা নিশ্চয়ই চিঠিটা খুব রেগে গিয়ে লিখেছেন। সে পড়ল—তুমি অবিবেচক হয়ে পড়েছ। শুনেছি তোমার আয় পাঁচশত টাকার মত। আমাকে প্রতি মাসে একশত টাকা দাও। আমরাও চারজন, তোমরাও চারজন।...এ মাসে সেই সামান্য দান তুমি আরও সংক্ষিপ্ত করেছ। এই বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে দিন যাপন করতে হবে ভাবতে কষ্ট লাগে। কল্যাণীর সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্রপক্ষ কলকাতায় তোমার বাসার কাছেই থাকে।...সতীশ কেমন অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা পড়ছে। পাত্রপক্ষের খোঁজ-খবর নেবে। নিম্নে ঠিকানা দেওয়া থাকল। শেষে আরও অস্পষ্ট কয়েকটি শব্দ। সতীশ চোখের কাছে এনে উদ্ধার করতে পারল। যতীনের আবার একটি মেয়ে হয়েছে। বাবা কি ক্ষেপে গেলেন। সতীশ কেমন অস্বস্তিবোধ না করে পারল না। এবার পত্রের শেষ নীচে 'পুনঃ' এই শব্দ ব্যবহার করে চিঠি শেষ করেছেন। তুমি লিখেছ একা তোমার পক্ষে সংসারের দায়দায়িত্ব বহন করা ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছে। তুমি বলতে চাইছ, যতীন সংসারে সামান্য সাহায্য করুক। যতীন রেলে চাকুরী করে। সামান্য তিনশত টাকা মাহিনা। ছয়টি কন্যাসন্তান এবং ওরা দুজন। তাও বড় মেয়েটিকে আমি এ-মাসে নিয়ে এসেছি বলে রক্ষা। তিনি যেন দয়া করে পত্র শেষ করেছেন। চিঠিটা সতীশ ভাঁজ করে সুরমাকে দিয়ে দেবার সময় কথাটা না ভেবে পারল না।

বাবার এই এক অজুহাত। সংসারে সতীশ সামান্য বেশী আয়ের চাকুরী করে বলে এবং বিদ্বান বলে সব চাপ ওর উপর। সুরমা সংসারে বড় ঘর থেকে আসায় এবং মা-বাবার অমতে বিবাহের দরুন সকলেই সুরমার প্রতি যেন সংগোপনে আক্রোশ বহন করে বেড়াচ্ছে। কারণ বিয়ের আগে সতীশ শেষ কপর্দক মায়ের হাতে দিয়ে দিয়েছে এবং সংসারে সেই প্রায় সব নিত। কোথাকার এক উটকো যুবতী এসে সতীশকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সতীশ চিঠিটা সুরমার হাতে দিয়ে বলল, ভেবেছি বাবুলকে দাদার কাছে দত্তক দিয়ে দেব।

সুরমা বলল, তার মানে?

সতীশ হাসতে হাসতে বলল, দাদার পুত্রসন্তানের বড় শখ।

—শখ না বলে বল স্বার্থপর মানুষ। সুরমা ক্ষেপে গেল। এই মানুষ সতীশ যেন উৎসর্গকৃত প্রাণ। সব দায় দায়িত্ব তার। কেন বাপু—সুরমার মুখে হাত-পা কাঁপতে থাকল, অন্য দুই ভাই আছে তোমার, ওরা কাজ করছে। লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টার ত্রুটি ত তুমি কর নি। শুনেছি তুমি টিউশান করে, পত্রিকা হকারী করে তোমার পড়ার খরচ চালিয়েছ। আর তুমি ছোট ভাইদের পড়ার জন্য কি না করেছ—ওরা মানুষ না হলে কার দায়। সামান্য একটানা কথা বললেই সুরমা বড় বেশী কাতর হয়ে পড়ে। সে বিছানায় উঠে বসল।—ওরাও কিছু কিছু করে বাবাকে সাহায্য করতে পারে।

সতীশ তেমনি সরল সহজ মুখে বলল, দেখলে ত মাথা খারাপ কে করছে।

সুরমা বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, আমার বাবুলকে আমি দিতে যাব কেন?

—না দিলে দাদা রেস চালিয়ে যাবে। সতীশ ঠাট্টা করে বলল।

—রেস চালালে দারিদ্র্য বাড়বে। তাতে আমার কি। সুরমা ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সতীশের ভাল লাগছিল সুরমাকে রাগিয়ে দিতে। বলল, দাদার কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তাই। সতীশ বারান্দায় নেমে গিয়ে সুরমার মুখ দেখতে চাইল।

—বাবুল আমার। সংসারে তুমি তোমার মা-বাবা দাদার জন্য সব করতে পার। আমি পারি না। তোমার যা চাকরি—কবে কোনদিন সব যাবে আমাদের। আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াব। কি সঞ্চয় তোমার বল? এতদিন চাকুরি করে কি করেছ তুমি? মিন্টু বড় হচ্ছে। ওদের দিকে তুমি একবার ভাল করে তাকাও। তোমার কারখানা, শ্রমিক, মা-বাবা দাদা ওরাই সব। তারপর আরও কি বলতে গিয়ে সুরমা থেমে গেল। এই এক অভ্যাস সুরমার। রেগে গেলে সকলকে টেনে আনবে। কোথায় যেন সুরমা অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সতীশ নিজেও মাঝে মাঝে জীবনযাপনের নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগছে। কারখানার ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ঋণ বাড়ছে এবং কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে। সে যেন কোনদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পুরানো যন্ত্রপাতি এবং প্রাচীন সব পদ্ধতির জন্য প্রতিযোগিতায় ক্রমে তারা হটে যাচ্ছে। ফলে কারখানার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠলেই মনে হয়, এক বড় অগ্নিগোলক, অতিক্রম করতে পারলেই রাজার মাথার টুপি। সতীশ বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই অগ্নিগোলক অতিক্রম করতে পারছে না। সতীশ জামা-কাপড় পরার সময় ভাবল, বাবুলকে আজ হোক কাল হোক সে একটা টুপি কিনে দেবে। সে রাজার টুপি পরে রাম অথবা রাবণ সেজে বাবাকে ভয় দেখাবে। সে ডাকল, বাবুল তোমার পড়া হয়েছে?

কোথায় বাবুল! তখন বাবুল টেবিলের

নিচে বসে মার অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজছে। হাতে বন্দুক, কোমরে বেল্ট এবং তাতে আঁটা চকচকে লোহার পাত। সব রাংতা দিয়ে মোড়া। মনে হয়, বাবুল যথার্থই সৈনিক সেজে এই সংসার থেকে সব অমঙ্গল দূর করে দিতে চাইছে। বের হবার মুখে সুরমা ফের সতীশকে বলল, ওদের তুমি বারণ করে যেও।

সতীশ বলল, মিন্টু তুমি বাবুলকে নিয়ে দুপুরে বের হয়ে যাবে না।

বাবুল টেবিলের নিচে থেকে বলল, না বাবা, আমি বের হব না। দিদি আমাকে কেবল যেতে বলে।

মিন্টু বলল, হ্যাঁ আমি তোমাকে কেবল যেতে বলি। নিজে যেন যেতে জানে না। ওদের ঝগড়া দেখে সতীশ বলল, তুমি যাবে না। তুমি সাঁতার জান না। জলে পড়ে গেলে কেউ টের পাবে না। তারপর ভয় দেখানোর জন্য বলল, পুকুরটাতে বড় একটা অজগর সাপ আছে। যাবে না। গেলেই খেয়ে ফেলবে। এক জলাশয়ের দৃশ্য সতীশকে কেমন ভীত বিহ্বল করে রাখে। অথবা অফিসে সময় সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে মনে হয়, বাবুল এবং

দিতে হবে। সে অজুহাত বের করার তালে চারিদিকে কি খুঁজে দেখল, কিছু ভাঙা-চুরির অংশ নিচে এবং নিচের দিকে চোখ রেখেই বলল, এখানে এসব কেন? নিশ্চয়ই খেতে খেতে পাঞ্চিং চালাচ্ছিল তেওয়ারী। সে জুতোবোগাটকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিতে পারলে কোনো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন থাকবে না। দায় দায়িত্ব সব শ্রমিকের। ইউনিয়নের দুজন পান্ডা লোককে ডেকে জায়গাটা দেখাল—এখানে এসব কি হয়! সে সুপারভাইজারকে পর্যন্ত শাসাল। ঘটনাটিকে এবার হুস করে কাক তাড়ানোর মতন ফুস মন্তরে মুছে দিতে চাইল।

সে রিপোর্টে লিখল, কাজে অমনোযোগিতা এবং দুর্ঘটনা। দুজন শ্রমিককে সাক্ষী নিয়ে রিপোর্ট লিখে দিতেই প্রাণের ভিতরে কেমন যেন এক রক্তশোষা জীব উঁকি দিয়ে ফের রক্তের ভিতরে ডুবে গেল। মনে হয়, প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশি. দুই মুখ তখন উঁকি দেয়—মিণ্টু, বাবুলের মুখ। রক্তশোষা জীব যেন এবার ওদের তেড়ে যাচ্ছে। বাবুল একবার ছবিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছিল। যুদ্ধ দেখে বলেছিল, বাবা আমি রাম সাজব। আমাকে রাজার টুপি কিনে দেবে বাবা। রিপোর্টে সই করার পরই সতীশের মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে গেল। রথের মেলা থেকে রাজার টুপি কিনতে হবে সেকথা সে ভুলে গেল।

সে অফিসে বসে, অন্যমনস্কভাবে কতগুলি বিল সই করল। চিঠি সই করল। চিঠি অথবা বিল সই করার সময় অন্যান্যদিনের মত সে সবটা পড়ে সই করল না। এমন কি একবার চোখও বোলাল না। এই এক বিশ্রী অভ্যাস তার, ভিতরে কোন পাপবোধ কাজ করতে থাকলে সে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সংসারের বিবিধ কারণ শিয়রে তার সোনার কাঠি রাখতে দিচ্ছে না। সে অসহায় অন্ধ এক মানুষ। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না তেওয়ারীর রিপোর্ট এমন হোক। শুধু কার জন্য, বুঝি দুই শিশু-সন্তান এবং যুবতী সুন্দরী স্ত্রী আর মা বাবা ভাইবোনের কথা ভেবে সোনার কাঠি সে শিয়রে রাখল না। সব ফেলে দিয়ে সে কেমন অমানুষ এবং ক্রীতদাস হয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় তেওয়ারীর বউটা কাঁদছিল। জানালা দিয়ে সতীশ সেই দৃশ্য দেখল। সতীশ ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছে। এই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না সে সহ্য করতে পারছে না। ক্রমে সে অসহায় হয়ে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়াল এবং অফিসের ভিতর পায়চারি করতে থাকল—যেন সে সাহস সঞ্চয় করছে। সে অবিনাশকে ডেকে বলল, ওদের এবার যেতে বলুন। এখানে কান্নাকাটি করে আর কি হবে। বস্তুত সতীশ এখন নিরালম্ব মানুষের মত। সংসারের অন্ধকারে এক কালো ঘোড়া আছে, তাতে চড়ে নিরন্তর ভাইনি-বুড়িটা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেমন হয়—কোন দুঃখের ছবি, আর্তের কণ্ঠ আর—নিরাপত্তাবিহীন জীবিকা দেখলে যেমন হয়, সংসারে পাখী ওড়ে না। মরুভূমির মত মাঠ শুধু সামনে, আর এক উট—দীর্ঘ পথ-বাহী নদী নালা বিহীন মাঠে অনবরত উট ছুটছে। সতীশ তেমনি নিজেকে কিসের আশায় ছুটতে দেখল। কারা যেন পেছনে তাড়া করছে; ফুটপাথের বাসিন্দা, অনাহারে মৃত বালকের ছবি এবং সেই কুষ্ঠরুগী। সে এবার চীৎকার করে উঠল, অবিনাশবাবু!

—আজ্ঞে আমাকে ডাকছেন স্যার!

—দেখুন ত তেওয়ারীর বউটা এখনও কাঁদছে কিনা।

—না স্যার কাঁদছে না। কখন ওরা চলে গেছে!

সতীশ কেমন নিশ্চিন্ত মনে এবার বসে পড়ল। সে দুই হাতলে হাত রেখে শরীর সোজা করে দিল। কোনও দিকে তাকাল না। বোনাস সম্পর্কে কথা বলতে হবে আজ, সম্ভবত ঘেরাও করবে শ্রমিকেরা এবং ওদের দাবিদাওয়া নিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি হবে। সে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কোম্পানীর যে কী ভয়ঙ্কর দুরবস্থা চলছে, আর এ-ভাবে চললে বেশীদিন কাজ চালানো যাবে না, উৎপাদন না বাড়ালে প্রতিযোগিতায় হটে যেতে হবে—এ সব নিয়ে নিজের মনেই যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করতে করতে কখন দেখল সতীশ আর সতীশ নেই—সে এক ভাঙ্গা রেলগাড়ি হয়ে গেছে। ওর সাইডিংএ ফেলে ঝকঝকে নীল রঙের ট্রেন ওর সামনে ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। সে এবার সোজা হয়ে বসল এবং বলল, হবে না। শ্রমিকেরা বলল, তা কি করে হয়। সে বলল, গত বছরে আমি তোমাদের

বেতন ডাবল করেছি, তোমরা উৎপাদন এক বিন্দু বাড়াও নি। কোম্পানী সেই অনুপাতে মালের দাম বাড়াতে পারে নি। আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি—কোম্পানীর ক্রমশ ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলা নিরর্থক, ওরা কিছুই শুনবে না। উৎপাদন বাড়াবে না। সে এবার বলল, সরকার তোমাদের বোনাসের যে রেট বেঁধে দিয়েছেন তাই পাবে। মানে কোম্ব অর কর্ট...বলে সতীশ শেষ করতে পারল না। সমস্বরে চীৎকার শোনা গেল—আমাদের দাবী মানতে হবে। সতীশ এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল। অবিনাশবাবু বিনোদবাবুর দিকে তাকাল—ওরা সকলে ঘের ও হয়ে গেল—ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কথা বলতে পারছিল না। ক্রমে এ-অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসছে শুধু এইটুকু ওরা টের পাচ্ছে। তোমরা দরজা ছেড়ে দাও—আমরা যাব। সতীশের বলার ইচ্ছা হল। কিন্তু দরজায় মানুষগুলো আরও জট পাকিয়ে বসল। এবার ওরা তেওয়ারীর কথা তুলবে। জুলুমের কথা তুলবে। সতীশ ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকল। বাবুলাটা এখন কি করছে কে জানে! যা ছেলে! মায়ের অসুখ বাড়লে ছেলের ফুল ফলের জন্য যেন আকর্ষণ বেড়ে যায়। সে এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন তবে উঠি। কিন্তু যারা দরজা আগলে বসে ছিল তারা বসেই থাকল। উঠল না কেউ। সতীশ অথবা অবিনাশকে দরজা ছেড়ে দিল না। ওদের দাবী না মেনে নিলে সতীশ এবং অবিনাশ যেতে পারবে না। ওদের পাংশু এবং ভয়ঙ্কর চোখ কেমন বিব্রত করছে সতীশকে। সতীশ ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। এমন মুখ ওদের দেখলে মনেই হয় না সামান্য কথায় এমন দঙ্গা বেধে যেতে পারে। সে বলল, দরজা ছেড়ে বস। আমরা যাব। ওরা আরও ঘন হয়ে বসল, দরজা পুরোপুরি আটকে দিল। আমাদের দাবী মানতে হবে—দরজা আটকে দিয়ে এমন কথা বলতে চাইল।

—তবে তোমরা আমাদের আটকে রাখতে চাও।

—সে আমরা পারি স্যার!

—কি আমার বিনয়ের অবতার—সতীশ যথার্থই ক্ষেপে দুঃখে বলে ফেলল। সে অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল—কি করবেন এখন, এমন বলার ইচ্ছা। অবিনাশবাবু একটা কাগজ দলা পাকাচ্ছিল। কাগজের সেই খণ্ড বিনোদবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিল—যেন এক ধরনের খেলা। অবিনাশবাবু কাগজের গুলতি তৈরি করে পাখী শিকার করবেন এমন এক মুখ করে উঠে দাঁড়ালেন। একমাত্র পুলিসের সাহায্য এই সময় দরকার। এইসব মানুষ বিনয়ের অবতার অথচ ফোনে

হাত রাখলে হা হা করে ছুটে আসবে। সুতরাং অবিনাশ ঘরের ভিতর উঠে মত মুখটি তুলে পায়চারি করার সময় বিনোদবাবুকে সংকেতে কি সব বলে দিতেই তিনি বের হয়ে গেলেন। প্রায় একশত মুখ এখন দরজায় জানলায়, কিছু কিছু মানুষ সামনের মাঠের অন্ধকারে উঁকি দিয়ে আছে।

সাহস সঞ্চারের জন্য ওরা মাঝে মাঝে ধ্বনি দিচ্ছিল—আমাদের দাবী মানতে হবে। ওরা বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে বসে আছে, অবিনাশ অথবা সতীশ বের হলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন বিনোদবাবু সদর রাস্তায় হাঁটছিল—হাতে আবেদনপত্র—উই আর রুফুলি কনফাইন্ড। কে রাস্তায় নেমে

ঝকঝকে সাদা

নতুন

টাটা স্পেশ্যাল সাবান

SPECIAL

—খেয়েছি সব। এখন তুই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়। কিছু জরুরী কথা আছে।

হাত মুখ ধুলে জরুরী কথা। সেই এক কথা—সম্বন্ধটার কি করলি। পাত্রপক্ষ পাত্র চাইছে। দাবী দাওয়া অনেক। এমন পাত্র হাতছাড়াও যাবে না। ওদের কল্যাণীকে খুব পছন্দ হয়েছে। সতীশ দাদার কথা বোধ হয় ভালভাবে শুনতে পাচ্ছিল না। সে বাবুলকে দেখছে। বাবুল তাক থেকে কিসব নামাচ্ছে। কাচের পাত্র হলে ভেঙে যাবার ভয়। দাদার সামনে খুব জোরে সে ধমকও দিতে পারছে না। দাদা আহত হতে পারেন। সে খুব নরম গলায় বলল, বাবুল তুমি নীচে নেমে এস। পড়ে যাবে। পড়ে গেলে হাত পা ভাঙবে। বাবুল কথা শুনছে না। জ্যাঠামশাইকে দেখে ওর ভেতর সাহস বেড়ে গেছে। রাগে সতীশের মাথায় রক্ত উঠে আসছে। তখন দাদা বললেন, কলে তোমার আশায় আছে। যদি তুমি ... না দাও তবে এ পাত্রটিও হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

সতীশের দু হাত তুলে চীৎকার করতে ইচ্ছা হল, আমাকে তোমরা কি ভাব! আমি ... চুরি করব! আমাকে তোমরা চুরি করতে বলছ। আমার কি আর! আমি কোথা থেকে এত টাকা পাব। সতীশ অথচ ক্ষোভে ... দুঃখে জবাব দিতে পারল না। সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। এবং ধীরে ধীরে বলল, দেখি কি করতে পারি। দাদা চলে গেলে হতাশ মুখে ঘরে ঢুকল সতীশ। ওর চোখ মুখ টানছে। ক্লান্তিকর জীবন এবং সারাদিনের খণ্ড খণ্ড হঠকারী ঘটনা ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বাবুলের উপর রাগটা কিছুতেই মরছে না। বাবুলের কাছে সতীশ বুঝি ধরা পড়ে গেছে। কাপুরুষের মত চোখ যার, যার মাথা উঁচু নয়—সে মেলা থেকে কি করে রাজার টুপি কিনবে। সে চেষ্টা করছিল ভেতরের রাগটা দমন করতে। ভেতরের রাগ দমন হলে বাবুলকে পড়তে বলবে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই সুরমা সতীশকে অভিযোগ করল, তুমি বারণ করে গেছিলে ছেলে-মেয়েকে বাইরে বের হতে। দেখবে কোন-দিন ওরা জলে ডুবে মরে থাকবে। দুপুরে কোন ফাঁকে বের হয়ে গেছে।

সতীশ এবার দু-হাত উপরে তুলে ছুটে গেল। যেন সে মেরে ফেলবে বাবুলকে। সে বলল, বাবুল তুমি বাইরে গিয়েছিলে, পুকুরে গিয়েছিলে। সতীশের এক ভয়, নিরন্তর এক ভয়। বাবা আজ তাকে মারবে বুঝে বাবলু ছুটে বারান্দায় চলে গেল। সতীশ বারান্দায় গেলে বাবলু ঘরে। ঘর বারান্দা, দুই দরজা দিয়ে সামান্য এক বাবুল সতীশকে ঘর আর বারান্দায় ঘুরিয়ে মারছে। বাবা কেমন এক দৈত্য হয়ে গেছে। সে ছুটছিল আর বলছিল, বাবা আর যাব না। তোমার পায়ে পড়ছি বাবা আমি আর যাব না। সে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। সতীশ চীৎকার করছিল, বাবুল তুমি ছুটবে না। বাবুল তত বলছিল, তুমি আমাকে মেরো না বাবা, আমি আর যাব না। কিন্তু হায় কে কাকে রক্ষা করে—সতীশ ছুটতে ছুটতে সত্যি অমানুষ হয়ে গেল অথবা এক দৈত্য, সে বাবুলের চুলে ধরে ফেলল, তারপর দু-হাতে উপরে তুলে, দোলাতে থাকল আর নির্মম আঘাতে আঘাতে ওকে জর্জরিত করল। সুরমা ছুটে এসে ধরে ফেলল, তুমি কি পশু হয়ে গেছ, তুমি কি ছেলেটাকে মেরে ফেলবে?

মিণ্টু তখন খাটের নীচে চলে গেছে। কারণ বাবুলের হয়ে গেলেই বাবার মিণ্টুর কথা মনে পড়তে পারে।

খেতে বসে সতীশ বলল, ওদের দিলে না?

—তোমার দেরী দেখে ওদের খাইয়ে দিয়েছি।

সতীশ থালায় বড় পুঁটি মাছ ভাজা দেখে বলল, বাঃ! কে মাছ দিল! কারণ সতীশের মাছ সপ্তাহে দু দিন, একদিন তিন এবং রবিবারে খাসি। বাবুলের মাছ না হলে হয় না। কিন্তু সতীশকে বাজেট রক্ষা করতে সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ খেতেই হয়। নিরামিষ খাবার কথা! বড় পুঁটি মাছ দেখে সতীশ তাজ্জব বনে গেল।

সুরমা বলল, তোমার ছেলের কাণ্ড! পুকুর থেকে দারোয়ানদের কেউ বোধ হয় মাছ ধরছিল। ওকে তিনটে মাছ দিয়েছে।

—ওকে দিয়েছে, না, ও চেয়ে এনেছে।

—সে আমি জানি না। মাছ দিয়ে বলল, একটা বাবা খাবে। একটা আমি খাব।

সতীশের গলায় মনে হল ভাত আটকে যাচ্ছে। সুরমা মাছ প্রসঙ্গে এত বলছিল যে সতীশের গলায় ভাত আটকে যাচ্ছে। জানো! সুরমা বড় বড় চোখ করে বলল, বড় মাছটা বাবা খাবে। জানো! সুরমা

এবার তাদের বাটি এগিয়ে দেবার পালা এলো, বিকেলে সারাক্ষণ ছুটে এসে দেখে গেছে মাছ ঠিকমত রেখেছি কিনা—না বেড়ালে বাদুড়ে খেয়ে নিল—ওর কি উদ্যম এই মাছের জন্য, কোথায় রেখেছি, কিভাবে রেখেছি—কি উৎসাহ ছেলের—বড় মাছটা ওকে খেতে দিলে খেল না, তোমার জন্য তুলে রেখে দিল—বাবা খাবে।

সতীশের কি যেন কষ্ট ভিতরে। এবার যথার্থই গলায় ভাত আটকে গেল। সে জল খেল ঢক ঢক করে। সে ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকল। কোথায় যেন এই বর্ষার রাতে একটা ব্যাঙ ডাকছে। সতীশের ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কে এই শিশু, কি তার পরিচয়—সারা সংসার জুড়ে সে যেন কেবল দাপাদাপি করে বেড়ায়। এখন মনে হল সে নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর-ভাবে অসহায়। যত অসহায় বোধ করছে তত এই সংসারের সব কিছু অপ্রীতিকর ঠেকছে। সুরমার রুগ্ন মুখ, বাবুলের অসহায় চোখ এবং দাবদাহের মত এই সংসার নিয়ত ওকে ভীত বিহ্বল করে দিচ্ছে। সে ভয়ে খেতে পারল না। বাবুলের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ওর ভিতরে ভিতরে জলের স্রোতের মত এক কান্না এল। সে আবেগে কেমন অস্থির হয়ে উঠল এবং যেখানে বাবুল কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে বুকে তুলে যেমন অন্যদিন নিজের বিছানায় নিয়ে আসে, বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে এবং দু'হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তেমন—এখন সেই ভালবাসার সন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে মনে হল, পিঠে বড় বড় দাগ, ফুলে কেটে গেছে। অন্ধকারে রক্তপাত হচ্ছিল। সতীশ সেই মানুষের মত, হায় এক মানুষ—ক্রীতদাস-প্রায় মানুষ। সতীশ পাগলের মত ওর পিঠে মুখে ভালবাসার হাত ছড়িয়ে দিতেই চাপ চাপ রক্ত। সে তার দুই নরকপ্রায় হাত নিয়ে ছুটে গেল, দ্যাখো সুরমা আমি কি করেছি। ক্ষত স্থানে হাত পড়তেই বাবুল ককিয়ে উঠল। এক অমানুষ, ভিতরে এক অমানুষ কেবল খেলা করে বেড়ায়। সতীশ দু-হাত সুরমার মুখের সামনে ধরে চীৎকার করে উঠল, আমি কি করেছি দ্যাখো।

তারপর বাবুলের পাশে বসে আহত স্থানগুলোতে নরম নরম চাপ দিলে দেখতে পেল টেবিলে নীল আলো জ্বলছে। রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। কোথাও আর যেন রাতের কীট পতঙ্গ ডাকছে না। ধরণী শান্ত এবং স্থির। সে দেখতে পেল তখন নীল আলোর ভিতর দুই ছবি। রাম রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি, রাবণের মাথায় কাক। নীচে বাবুল ভাল করে লিখে রেখেছে—দুষ্ট লোক। রাত ক্রমে আরও গভীর হয়ে আসছে। সতীশের এখন ফ্যামিলিমেনের বাক্সটা এক দুই করে মনে হচ্ছে ডাকছে। ঘেঁজরাশির বউটা বোধ হয় বসে বসে এখনও কাঁদছে। সংসারে কি যে ঘটে কি যে ঘটছে এ সময় সে কিছুই স্থির করতে পারল না। কেবল দেখল বাইরে বাবুলের রেলগাড়ীটা সাদা জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টি —এই আসে এই যায়, এই সাদা জ্যোৎস্না এই অন্ধকার। বাবুলের রেলগাড়ীতে সে যেন এখন একা বসে আছে। কেউ নেই। সকলে ওকে এক বড় মাঠে ফেলে কোন এক অজ্ঞাত স্টেশনে নেমে গেছে। সে শুধু এনজিনটা নিয়ে মাঠের ভিতর ভূতের মত রেলগাড়ী হয়ে গেছে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সে আর রেল-গাড়ী থাকল না। বাবুলের জন্য রাজার টুপি কিনে আনতে হবে, সুতরাং সতীশ ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিল। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতা-বাহারের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে দেখতে বলল, সামনের দিকটাকে আমরা পূব দিক বলি, ডানদিক দক্ষিণ, পেছনের দিকে সূর্য অস্ত যায় বলে পশ্চিম এবং বাঁদিকে—তুমি যত দূরেই চলে যাও না উত্তর দিক হবে। সতীশ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ভোরবেলায় আজ কি ভেবে দিকনির্ণয় শেখাতে থাকল।

অদূরের দিল্লী

তথ্যের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই।
তথ্যের উপর মতামত? যত মানুষ তত মত।
—সম্রাট এবং কবি ইখনাটেন
যাকে শেষপর্যন্ত হত্যা করেছিলেন
রাজপুরোহিতকুল। খৃঃ পূঃ ১৩৬২

জো-রালো বুঝি হঠাৎ করে অনেকের কাছে অর্থময় হয়ে উঠল।

তাই হোক।

ছাব্বিশে অগাস্ট মঙ্গলবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাজধানী দিল্লী। মুখ্যবাসন

দংশ

কার কোনো রুদ্রমূর্তি তেড়ে আসছিল ঝড়ের বেগে, ছাব্বিশে অগাস্ট মঙ্গলবারে মাঝপথ থেকে তা ফিরে চলে গেল।

আগের কদিন বোধ করি যুক্তাত্মা হয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসী মন্ত্রই প্রার্থনা করছিল,—হিতাহিতজ্ঞান ফিরে আসুক।

মনের বোঝা নেমে গেলে যে আনন্দ সেই আনন্দ আমি দিল্লীবাসীর চোখেমুখে পড়লাম ছাব্বিশে অগাস্ট মঙ্গলবারে। রুদ্ধ লজ্জায় যে অসম্ভাব্য সামঞ্জস্যবিহীন ভয়ানক পরিস্থিতির অভিমুখে ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার প্রতিক্রিয়ায় ভাবিত হয়ে নবসংযোগ হয়ে আসছিল চিন্তাশীল মানুষের। সেই মানুষ এখন দম নিতে লেগেছে স্বস্তিতে।

যেন হঠাৎ করে জীবনের অসহ্য দিকটা চোখে পড়ে গেল: সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ক্ষমতার উপরে উঠতে কংগ্রেসী অধিনায়করা পারলেন তাহলে শেষ পর্যন্ত।

এ তো গেল ২৬শে অগাস্টের ছবি। চাঞ্চল্যকর ২০শে অগাস্ট তারিখটাও দিল্লীবাসী আজীবন মনে রাখবে। সাধারণত দিল্লী-নগরবাসীর রাজনৈতিক চেতনা কলকাতাবাসীর শতাংশও কি না সন্দেহ। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ফলাফল ঘোষণার দিন রাজধানীবাসীর যে ঔৎসুক্য যে উৎকণ্ঠা যে তন্ময়তা যে শুভাশুভ চেতনা জেগে উঠতে দেখেছি তা দেখেছিলাম মাত্র আরেকদিন। বাইশ বছর আগে স্বাধীনতার সজাগ সচল সজীব প্রথম দিনে। বাস; অতঃপর সুদীর্ঘকালে বাদে ফের আবার।

সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই যেন নির্ভর করছিল নির্বাচন ফলাফলের উপর।

কি পুরুষ কি নারী সকলের সমান উৎকণ্ঠা সেদিন দেখেছিলাম। ব্যতিক্রম নজরে পড়েছে। তা নগণ্য। এবং তাতে করে দিনটার আরো জমজমাট।

২০শে অগাস্ট সকাল এগারোটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ঘরের বাইরে বাইরে কাটল। কফি হাউসে জমজমাট ভিড়। রেস্টুরেন্টগুলোর তিলধারণের স্থানাভাব। কোকাকোলা স্টলগুলোর সামনে জটলা। তরুণেরা অফিসে হাজিরা দিয়ে চলে এসেছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পালিয়ে এসেছে কলেজ থেকে। ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে কেউ কেউ এসেছে। নিতান্ত নির্বিবাদী মানুষও আজ রাস্তায়, কফি হাউসে, রেস্তোরাঁতে। সমস্ত মনটা ওদের পড়ে রয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুহুর্মুহু আগত লেটেস্ট খবর শোনার দিকে। যত্রতত্র ট্রানজিস্টার।

স্পষ্টতই বোঝা যায় কেউ অস্থিরচিত্ত, কেউ ভেতরে ভেতরে শান্ত।

সড়কে রাস্তায় চৌমাথায় খবরের কাগজগুলোর অফিসে-অফিসে স্পট নিউজ-এর সামনে আগ্রহী পাঁচমিশেলি জনতার ভিড়ভড়াক্কা সমস্ত দিন জমাটভাবে লেগে রয়েছে তো রয়েছেই। দণ্ডায়মান নরনারীর একেবারে চিন্তা, কি—হলো কি—হলো—কি চাই তা হবে তো?

গলিঘুঁজিতে চায়ের দোকানগুলোতেও সমবন্ধ করা ঠাসা ভিড়। সেখানে মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলগুলোর মাস্টার, দোকানদার, অজানা লেখক, কবি, মুহুরীর শিল্পী, ভিস্তি; টাঙ্গা-অলা বাসের কনডাক্টার সিনেমার গেটকীপার। সকলের বুকটা করছে দুর-দুর। কথাবার্তায় ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে দিনটার আসামান্যতা।—কী হবে। কী হবে।

যে সব প্রশস্ত এভিনিউগুলো সচরাচর অন্যদিন অনন্য সৌন্দর্যে সর্বদা ফাঁকা হয়ে থাকে, যে সব রাজপথের জনবিরলতা রাজধানীর উচ্চতর শিখরে বড়সাহেবদের স্মরণ করায় তাতে আজ পথ ভর্তি চলাচল। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এই তল্লাটের বাসিন্দেরা কেউ-ই বড় একটা কারো বাড়িতে যাওয়া আসা করে না, কেউ কাউকে দু চক্ষে দেখতে পারে না, উন্নাসিকতায় যারা কেউই কারোর কাছে হার মানতে রাজী নয়, যাদের প্রত্যেকের গ্যারেজে আছে দুটি-একটি-তিনটি, মোটর গাড়ি, বসবার ঘরে টেলিভিশন, বাগানে কিংবা ব্যালকনিতে ফুলের গাছ, বিছানার তলায় অথবা বার্ডাত কোটগুলোর পকেটে-পকেটে বুঝি একশো টাকা নোটের মোটা মোটা বাণ্ডিল,—আজ ২০শে অগাস্ট তারাও সবার প্রয়োজনে সবার কাছে। সকলেই যাওয়া-আসা করছে পরস্পরের কাছে। সংগ্রহ করছে এর-ওর সংবাদ। মিলিয়ে দেখছে নিজের চেতনার চিত্র অন্যদের মধ্যে। যার মানে এদেরও শরীর রক্ত মাংসের।

এই সমষ্টিগত সামগ্রিক উৎকণ্ঠা দেখতে দেখতে আসছিলাম কনট প্লেসে, দেখলাম

একজন আধাবয়েসী সর্দারজী সাইকেল থেকে হঠাৎ নামতে গিয়ে পড়লেন পথে—ভ্রূক্ষেপও নেই সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসা ওঁর স্ত্রী পপাত ধরণীতলে হয়েছেন—নেমে পড়ে সর্দারজী একজন পথচারীকে আগ্রহ ভরে জিগ্যেস করলেন, 'লেটেস্ট খবর শুনেছেন, লেটেস্ট খবর?—দিল্লি-কী হালত? মোরারজী ভোটে এখন জিতছেন?' পথচারী অন্যমনস্কতার বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি।'

'কী? আপনি এতে খুশী হন নি?' রেগে গেলেন সর্দারজী। ওঁর স্ত্রী এখন মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

পথচারী বললেন, 'আমার ওয়াইফ এখন হাসপাতালে কি না, তাই দিল্‌টা খুব খাট্টা আছে।'

'ওঃ—আচ্ছা।' এই বলে মাথার পাগড়িটাকে ঠিক করে নিয়ে স্ত্রীকে এবার সুমুখের রডে তুলে নিলেন। নিয়ে বাই-বাই করে প্যাডেল চালিয়ে মথুরা রোডের দিকে চলে গেলেন। মুখে গান।

এমনই সব অশেষ চিত্র। সারা দিনভোর দেখলাম। সকলকে যেন এক নতুন চেতনার অধিকার করে রয়েছে।

কেউই আজ যত্রতত্র দোকানের শো-কেসগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছে না। চাট-এর দোকানের সুমুখে, দই-ভল্লার স্টলের সামনে আজ তেমন মশগুল খদ্দের দেখছি না। নিত্যনৈমিত্তিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বসছে সবাই। স্বেচ্ছ অন্ধরাও আজ বুঝি অন্য মানুষ। আর এই সবেতে একের প্রতি অন্যের যে শুভেচ্ছা তাও লোক দেখানো নয়। অদৃশ্য একটা সুতোর গ্রন্থিতে যেন মালা হয়ে গেঁথে গেছে দিল্লির মানুষ। সব মানুষ।

এমন কি তরুণীরাও তাদের রূপসজ্জা আজ ভুলে গেছে। গৃহস্থালীর কাজ ছেড়ে গৃহিণীরা রেডিওর পাশে বসে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন হার-জিতের খবরে।

পথে কেউ অপেক্ষা করছে কখন বেরুবে সান্ধ্য পত্রিকা। কেউ সমস্তক্ষণ ছুটোছুটি করছে একে-ওকে-তাকে খবর দিতে। খবর নিতে। কফি হাউসে দম ফাটা ভিড় দেখে সেখানেই কোনোরকম কায়াখোলা অবস্থায় ঢুকে পড়ছে। যেন এমন তো আর দেখেনি, শোনেনি, ভাবেনি। কিছু যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসছে।

কফি হাউসে সমস্ত দিন আজ অবিশ্বাস্য ভিড়। কেউ বসে তো কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ এক কাপ কফি সকালে আসামাত্র খেয়েছে আর খেতে সময় পাইনি বিকেল পর্যন্ত, তো কেউ পঁচিশ কাপ কফি পর পর গিলেছে। টেবিলে টেবিলে ট্রানজিস্টার। কেউ উচ্চৈস্বরে ছেড়ে দিচ্ছে সদ্যপ্রাপ্ত খবর অন্য টেবিলে অপরিচিত কার আছে, কেউ বা দূরে থেকে চিৎকার করে জানতে চাইছে,—কী? লেটেস্ট?

কেউ উঠছে। কেউ বসছে। অচেনা অজানা এ ওকে আলিঙ্গন করছে। কেউ খবরের কাগজের সাদা অংশে বলপয়েন্ট দিয়ে লিখে লিখে ভোটের মূল্যের হিসেবনিকেশ করছে। কেউ কেউ আবার তা নিয়ে আলোচনা করছে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে। কেউ একা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজের লেটেস্ট সিটিজেনের সন্ধানে, তো কেউ চলে যাচ্ছে পার্লামেন্ট হাউসের দিকে। সেখানেও অপূর্ব সব দৃশ্য। যা ভুলবার নয়।

বেশির ভাগ লোকই চাইছে তথ্য, নয় কোনো মতামত। সঠিক সংবাদ।—কত ভোটে কে জিতেছে একুনি, একুনি আমাকে বলো। ওদের স্বপ্ন বুঝি এবার বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। কেন কেউ জানে না অথচ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ওরা অনুভব করছে এক নতুন তারুণ্য। সেই তারুণ্যকে অনুভব করে নিঃসংশয়ে বুঝি-বা অনুভব করছে নিজেদের ভবিষ্যৎ। ইন্দিরাকে বুঝিবা ওরা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেয়েছে। মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড অপমান দেখেছে ওরা। সেই অপমান বুঝি অতীতের ইতিহাস হবে। মুষ্টিমেয়ের অরাজক শক্তিমত্ততা থেকে এবার আসছে বুঝি মুক্তি। এতদিন কায়েমী স্বার্থের শিকার থেকেছে ওরা। বাঞ্ছিত মন স্বপ্ন দেখছে। তারই বুঝি সংকেত ধ্বনি আজ বাজছে সর্বত্র।

বিমূঢ় জনতার চোখে আগামী দিনের রঙীন ছবি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন তা তুলে ধরা হয়েছিল আজ থেকে বাইশ বছর আগে ১৫ই অগাস্ট। জনতা ধরে নিয়েছে ভি ভি গিরির নির্বাচনে দেশের সামগ্রিক অবনতির এবার অবসান ঘটবে। ধরে নিয়েছে ওদের ভবিষ্যৎ এখন থেকে উজ্জ্বল হবে। ধরে নিয়েছে, এবার, এই এত বছর পরে, স্বাধীনতার সত্যিকারের স্বাদ পাবে। প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবার ওদের তরফে। তাই তাঁর জিত মানে জনগণের জয়।

বঞ্চিত ওদের মনে না জানি কেমন করে এই ছবিটাই জমে গেড়ে বসেছে। ব্যস্‌! আর কোনো দুশ্চিন্তা নয়। যে করে হোক ইন্দিরাজীর হোক জয়। তাহলে খতম হবে কালোবাজারিদের সর্বগ্রাসী দৌরাত্ম্য। খতম হবে ব্যুরোক্রেসির জুলুম। খতম হবে ঘুষখোরদের লালসা। ঘুচবে রাজ্যের সব অরাজকতা, নেতৃস্থানীয়দের ভ্রষ্টাচার। তার্তবিরত জনতার সম্মুখে বিরাট একটি প্রলোভন। বলতেই হয় ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে জাগিয়েছেন দেশবাসীর চিত্তে এই প্রলোভন। ঘুমন্ত মানুষকেও উনি জাগাতে সমর্থ হয়েছেন, এটা মস্ত বড় একটি তথ্য। এবং তথ্যমাত্রই পবিত্র।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস্‌ পত্রিকা আপিসে যাচ্ছিলাম। বাবরা আর শুধু কাঁচুলি পরা রাজস্থানী দিনমজুর একটি যুবতী এগিয়ে এসে আমার উজ্জ্বল মুখে শুধলো, 'সাহব অভি কৌন জিত রহা হ্যায়?'

আমার পাশের স্যুটেড-বুটেড লোকটা

॥ ৩ ॥

দরজা খুলে ঢুকে সিঁড়ির কাছে সুটকেসটা নমুনু করে নামিয়ে রেখে দীপু রাগে ফেটে পড়লো। এর মানে কি? আমাকে একটা ফলস টেলিগ্রাম দিয়ে ডেকে পাঠানো—

মেজদি বললো, মিথ্যে হবে কেন? সত্যিই তো বাবার অসুখ হয়েছিল।

—এমন কিছু অসুখ হয়নি, যে জন্য আমাকে ডেকে পাঠাতে হবে!

—আমি একা মানুষ—পরশুদিন মেসো-মশাই এসে বললেন—

—আমি এসেই বা কি হাতি ঘোড়া করবো? মেসোমশাই যখন এসেছিলেন

সিঁড়ির ঠিক বাঁকটায় দীপুর বাবা বাসতে হন দাঁড়িয়ে। চাইবাসা যাবার আগে দীপু তার বাবার চেহারা যে-রকম দেখে গিয়েছিল, এখনও ঠিক সেই রকম। অসুখের চিহ্নমাত্র নেই। লম্বা বিশাল পুরুষটি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন ঋজু হয়ে।

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, যদি দেখতিস আমার দারুন অসুখ, তা হলেই বুঝি খুশী হতিস?

দীপু বললো, সে কথা হচ্ছে না! কিন্তু আমি চাইবাসায় একটা জরুরী কাজে গিয়েছিলাম

—জরুরী কাজটা কি শুনি?

—সেটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার! কিন্তু এ রকম মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শুধু শুধু

—তুই চাইবাসায় না কোথায় গিয়েছিলি, যাবার আগে আমাকে বলে গিয়েছিলি?

—মেজদিকে তো বলে গিয়েছিলাম

বাবা হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন, এ বাড়ির মালিক কে? মেজদি? আমি কি মরে গেছি! ওসব এখানে চলবে না! ইচ্ছে হয় তুমিও তোমার দাদার মতন যে-খানে খুশী গিয়ে থাকতে পারো! আমি যতদিন আছি—

দীপু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মেজদি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টেনে বললো, না, বাবা, ও যাবার আগে তোমাকে খুঁজেছিল বলার জন্য। তুমি সেদিন ভবানীপুরে গিয়েছিলে

—তার আগের দিন বলতে পারে নি! নাকি বাক্স বিছানা গুছিয়ে তারপর বলতে হবে? ওরকম বলার মানে কি? একটা অনুমতি নেবারও দরকার নেই?

উত্তেজনায় দীপুর মুখখানা জ্বলে জ্বলে করছে। সে জানে, সে একটা কথা বললেই বাবার সমস্ত রাগ চুপসে যাবে। বাবাও বোধ হয় জানেন সে কথা। তবু প্রাণপণে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন রাগ দেখিয়ে। দীপু নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললো, আমার হঠাৎ যাওয়া ঠিক হয়েছিল।

—গত মাসে যে আসাম না কোথায় গেলি, সেবারও বলেছিলি?

মেজদি আবার বললো, বাবা, দীপু তা হলে এখন চান টান করে তৈরি হয়ে নিক। ওকে তো দুটোর মধ্যে বেরুতে হবে—

দীপু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো. কোথায়?

—তোর একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে আজ

—ইন্টারভিউ? আমি তো কোথাও দরখাস্ত করিনি

—সেকেণ্ডারি বোর্ডের সুহাসবাবু বাবাকে বলেছেন, আজ ওখানে ইন্টারভিউ আছে, ছজন লোক নেবে—তোকে একেবারে

প্রশান্ত নিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন!

সেই এক ব্যাপার! বাবা নিজে কোনোদিন চাকরি করেন নি, সারা জীবনে। এখন ছেলের জন্য একটা কেরানিগিরি যোগাড় করার জন্য পাগল একেবারে! ইস, কথাটা যে কেন একবারও দীপুর মাথায় আসে নি। কাল সকালবেলা এই সময়টায় ইসলামপুর বটতলায় একটা চায়ের দোকানে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল। একটা ট্রাক ড্রাইভারের কাছ থেকে শুনে নিচ্ছিল সারাণ্ডা ফরেস্টের পথঘাটের খবর।

দীপু ক্ষোভের সঙ্গে বললো, তা হলে অসুখ টসুখ কথা সব বাজে?

মেজদি শশব্যস্তে বলে উঠলো, না, না, শোন—

বাবার মুখে পড়লো একটা কালো ছায়া। ভেজা গলায় বললেন, দাখ পুঁনি দাখ, আমি অসুখে পড়ে গেলেই আমার ছেলে খুশী হয়

মেজদি তখনও বলার চেষ্টা করছে: শোন, দীপু, পরশুদিন বাবা বাথরুমে—

দীপু শুনলো না। স্রেফ জানিয়ে দিল, আমি ইণ্টারভিউ-ফিণ্টারভিউ দিতে যাবো না।

বাবার গলায় আবার তেজ ফিরে এলো, চেঁচিয়ে বললেন, যাবি না মানে? যাবি না! আমি সন্তোষকে কথা দিয়েছি

—কেন কথা দিয়েছেন কেন? এ রকম অন্যায়ভাবে চাকরি নিতে চাই না আমি। হাজার হাজার ছেলে দরখাস্ত করেছে, আর আমি ভেতর থেকে চেনাশুনো লোক ধরে

—যে-দেশে সবার চাকরি জোটে না, সেখানে এ রকমভাবেই চাকরি যোগাড় করতে হয়। তুই আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—কি বললি?

দু জন সোজাসুজি তাকিয়ে আছে দুজনের চোখের দিকে। উত্তেজনায় এমন কাঁপছেন বাবা, যেন মনে হয় সিঁড়ির ওপর থেকে তিনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বেন দীপুর ওপরে। দীপু তবু চোখ সরালো না, খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে বললো, আমার কাছে এটা অন্যায়।

তারপর বাড়িতে একটা তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মেজদি এতক্ষণ মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছিল, এবার সে সরাসরি চলে গেল বাবার পক্ষে। মেজদি যদিও জানে, তার ধমকে কোনো কাজ হবে না, তবু বললো, বাহ দীপু, তোর খুব বাড় বেড়েছে আজকাল! তুই ভেবেছিস কি?

বাবা বললেন, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। এক্ষুনি বেরিয়ে যা।

দীপু অপমান থেকে বললো, তা হলে আমাকে চাইবাসা থেকে ডেকে আনলে কেন?

—যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই যা তাহলে! আর কোনোদিন যেন মুখ দেখতে না হয়। বড়টা যেদিকে গেছে, ছোটটাও তো সেইদিকে যাবে। যা, নিজের পথ দ্যাখ।

—না, যাবো না! আমি দাদার মতন অত ভালোমানুষ নই।

—যাবি না মানে? দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। কাজ সেই কর্ম নেই, আবার মুখের ওপর কথা

দীপু স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো বাবার দিকে। ইচ্ছে করলে এক কথায় সে বাবাকে এক্ষুনি চুপসে দিতে পারে। তার হাতে আছে একাঘ্নী বাণ, এক্ষুনি অনুকে ডেকে সেই বাণ সে সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো বাবার বুকে বিঁধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একবার ছাড়লে সে অস্ত্র আর ফেরানো যাবে না। দীপু নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না সহজে। বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে সে তো ছুটে এসেছিল বাবাকে দেখা করতেই। কিন্তু এখন বাবার অসুখ নেই দেখেই কি তার রাগ এত বেড়ে যাচ্ছে? দীপুর ইচ্ছে হলো, আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। কাল রাত থেকে ধকল কম যায় নি। কিন্তু ওপরে উঠতে পারছে না, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির ওপর, যেতে হলে বাবার পাশ দিয়ে যেতে হয়।

দীপু ঠাণ্ডা ভাবে বললো, না, আমি বাড়িতেই থাকবো।

চেঁচামেচি চললো আরও কিছুক্ষণ। দীপু আর একটাও কথা না বলে, সিঁড়ির ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়েই রইলো। শেষ পর্যন্ত বাবা সেই পুরোনো কথাটাই আবার বললেন। মেজদির উদ্দেশ্যে বললেন, পুনি, তোর মেসোকে একটা খবর পাঠাস্—বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার পাট তুলে দেবো আমি! আজই খবর পাঠাস্' তারপর বাবা চটি ফটফটিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

দীপু নিজের ঘরে এসে জুতোটা খুললো শুধু, রেলের প্যান্ট শার্ট পরেই শুয়ে পড়লো বিছানায়। খিদের পেট জ্বলছে। কাল রাত থেকেই ভালো করে খাওয়া হয়নি। অসুখের সঙ্গে ঝগড়া হবার ফলে খাওয়ার কথাই তোলেনি কেউ। খুব বেশী খিদে পেলে আরও বেশী মন খারাপ হয়ে যায়।

আশ্চর্য, দীপুর প্রথমেই মনে পড়লো, হাওড়া স্টেশনের সেই শালওয়ার পরা লোকটার কথা। যে লোকটা একা টাক্সি নিয়ে যাচ্ছিল, দীপু যাকে অনুরোধ করেছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছে দিতে। লোকটা বোধ হয় সত্যিই বালিগঞ্জে যাচ্ছিল, সত্যিই জরুরি কাজ ছিল—দীপু তো আর মুখ শব্দে পড়া লোকটার চোখ দেখতে পায় নি, বুঝলো কি করে যে সে মিথ্যে কথা বলছে? কোনো মানুষই অন্য মানুষের দুঃখ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না! তার বাবার অসুখের দুঃখ কতখানি, তা লোকটা বুঝবে কি করে? অনেক লোক তো মিথ্যে মিথ্যেই বাবার অসুখ, মায়ের অসুখ বলে টাক্সিতে লিফ্‌ট চায়। এক হিসেবে দীপুও তো মিথ্যে কথা বলেছিল, সে তখন না জানলেও, তার বাবার তো সত্যিই অসুখ করে নি! দীপু সেই লোকটার কাছে মনে মনে ক্ষমা চাইলো।

এখন ইচ্ছে করছে, কারুর সঙ্গে কথা বলে ভুলে থাকতে। এমন কেউ নেই যার কাছে ছুটে যেতে পারে। যত খিদে বাড়ছে, তত দুঃখের সঙ্গে রাগ মিশছে। এ রকম জানলে, হাওড়া স্টেশন থেকেই কিছু খেয়ে আসতো। ইন্টারভিউয়ের জন্য টেলিগ্রাম! ইন্টারভিউ দেবে না ছাই দেবে। বউদির

কাছে গেলে এখন কিছু খেতে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর সেই পাইকপাড়া পর্যন্ত যেতেও ইচ্ছে করছে না। আগে দাদা আর সে এই একই ঘরে থাকতো। জানলার পাশে ঐখানে ছিল মায়ের ছবি, ছবিখানা দাদাই নিয়ে গেছে। দাদা চলে যাওয়ার দিন দীপু কেঁদেছিল। তার মনে হয়েছিল, এত বড় পৃথিবীতে দাদা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তখন অবশ্য দাদার বিয়ের কথা দীপুও জানতো না। নিজের জিনিসপত্র দাদা কোনোদিন গুছিয়ে রাখতে জানে না। কতদিন এমন হয়েছে, কোথাও কোনো বিশেষ দরকারী কাজে দাদাকে যেতে হবে—মোজা কিংবা আণ্ডারওয়ার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়িতে কি হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসতো দাদা তখন। দাদার কিন্তু ধৈর্যও অনেক বেশী দীপুর চেয়ে; বাবা কি বিচ্ছিরি ভাষায় অপমান করেছিল বউদির নাম করে, দাদা একটা কথাও বলে নি, শুধু বলেছিল, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি!

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো দীপু। তার ছিপছিপে লম্বা শরীরটা বিছানার ওপর এলানো, একটা হাতের ওপর মুখখানা সামান্য কাত করে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। সারা রাত ট্রেনের জানলায় হাওয়া লেগে চুলগুলো এলোমেলো জট পাকানো। প্যান্টের পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো পয়সা ছড়িয়ে পড়েছে বিছানায়—প্রলম্বিত বাঁ হাতখানা সামান্য মুঠো করা। নাকের নিচে ফুটে উঠেছে কয়েক বিন্দু ঘাম, ঘুমোলেই তার এই রকম ঘাম হয়। মুখের ভঙ্গিটি সামান্য কাতর। কে জানে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কোনো স্বপ্ন দেখছে কিনা।

সাড়ে বারোটা আন্দাজ মেজদি এসে তার ঘরে ঢুকলো। প্রথমে দূর থেকে ডাকলো, এই দীপু, দীপু ওঠ্! দীপুর সাড়া পাওয়া গেল না। কাছে এসে দীপুর পিঠে হাত দিয়ে আবার ডাকলো, দীপু, ওঠ্, খাবি না?

দীপু চোখ না মেলেই বললো, না খাবো না।

—কেন? খাবি না কেন?

—খিদে নেই!

—তা বলে অসময়ে এ রকম ঘুমোবি? উঠে চান টান করে কিছু খেয়ে নে, তারপর না হয় আবার ঘুমোতে হয়।

—বলছি তো খিদে নেই!

—তুই আজকাল এ রকম খিটখিটে হয়ে গেছিস কেন রে?

—মেজদি আমাকে জ্বালিও না এখন!

মেজদি খাটের উঁচু দিকটায় শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছলো একবার। স্পষ্ট বোঝা যায়, একটু আগে সে কাঁদছিল, চোখ দুটো এখনও লাল্‌চে।

গলা পরিষ্কার করে মেজদি আবার বললো, তুই শুধু শুধু আজ এত রাগারাগি করলি। বাবা তো তোর ভালোর জন্যই।

—আমার ভালোর জন্য কারুকে ভাবতে হবে না।

—তুই ভাবছিস্, তোকে মিথ্যেমিথ্যি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। তা কখনো কেউ পাঠায়? ইণ্টারভিউয়ের কথাটা তো সুহাসবাবু কাল বিকেলে বলে গেলেন। পরশুদিন মাঝ রাত্তিরে বাবা ঘুমের ঘোরে বাথরুমে যেতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান

—সামান্য একটা আছাড় খেলেই বুঝি টেলিগ্রাম পাঠাতে হয়? ওরকম একটা আধটা আছাড় খেলে মানুষের কিছু হয় না!

—দীপু, তুই অমন বিচ্ছিরি ভাবে কথা বলিস না! বাবা আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হননি। এমনিই শুধু শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন—স্ট্রোকের মতন, কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না—সেই রাতেই আমি পাশের বাড়ি থেকে টেলিফোন করে মেসোমশাইকে ডাকিয়ে এনে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়েই বাবা বলেছিলেন, দীপুকে এক্ষুনি টেলিগ্রাম কর সে ফিরে আসবার জন্য! আমি একটা বড় বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি! আমি স্বপ্ন দেখলাম—দীপুর একটা সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে। সেই থেকে আমার বুকটা অস্থির অস্থির করছিল। একটা ডাক বাংলোর সামনে—

অন্য রকম কৌতূহলে দীপু ধড়মড় করে উঠে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, কোথায়? কোথায় আমাকে স্বপ্ন দেখেছেন বাবা?

—বাবা তো আজ সকালেও সেই স্বপ্নটার কথা বলছিলেন। কি একটা ডাক বাংলো, চার পাশে জঙ্গল—সেই মাঠের মধ্যে তুই পড়ে আছিস্—বাবার ধারণা কেউ তোর মাথায় মেরেছে—এই স্বপ্ন দেখার পরই বাথরুমে যেতে গিয়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে যান।

দীপু অস্ফুট ভাবে বললো, হেসাডি! চাইবাসা থেকে তার আর অরূপের হেসাডি বাংলোয় যাবার কথা ছিল। সেখানে গেলে কি তার কোনো বিপদ হতো? স্বপ্নের আবার কোনো মানে আছে নাকি? কিন্তু দীপুও টেলিগ্রামটা পাবার পর একবার চোখ বুজে দেখেছিল, হেসাডি বাংলোর পাশে বাবা পায়চারি করছেন। বাবা তাকে পাহারা দিচ্ছিলেন সেখানে? স্বপ্নের মধ্যে? কি মানে হয় এর? দীপু বিমূঢ়ভাবে দেখতে লাগলো বেড কভারের ডিজাইন।

—নে ওঠ্। চান করে নে। কত বেলা হয়ে গেল, খাবি না?

—একটু পরে।

—দীপু, তোকে একটা কথা বলবো, রাখবি?

—কি?

—বাবা যখন খুশী হন, ইণ্টারভিউটা দিয়ে আয় না! এখনো তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে নিলে পৌঁছতে পারিস্। চাকরি না হয় না হবে, কিন্তু একবার গিয়ে দেখতে ক্ষতি কি?

—না। (ক্রমশ)

জীবনের 'আদি-অন্তের' হিসেব

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে কয়েকটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেছিলেন। সম্প্রতি অনুরূপ আরও কয়েকটি মডেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। ওঁদের বক্তব্য, এবার রীতিমত অঙ্ক কষে হিসেব করে বলে দেওয়া সম্ভব হবে প্রতিভবিষ্যতে কোন একটি বিশেষ জীবের জীবনধারা বা প্রকৃতি কেমন হতে পারে অথবা সুদূর অতীতেই বা তার চাল-চলন কেমন ছিল। কতকটা ঠিকুজি-কোষ্ঠীর মত। এই মডেলগুলির সাহায্যে জীব-বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন অতীত পৃথিবীতে কোন কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ কখন এবং কোথায় কিভাবে জন্মলাভ করেছিল। প্রকৃতির কোন নিয়মে তাদের ওপর বিবর্তনের ছায়া নেমে এসেছিল, কেন তাদের মধ্যে পরিবর্তন এল, এমনই যদি কিভাবে এল, সৃষ্টিতত্ত্বের সেই আদি প্রশ্নের সমাধান এবার তাঁরা বের করতে পারবেন। এমন কি নানারকম সমীকরণের সমাধান করে তাঁরা বলে দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত জীবজগতের পরিণতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় ব্যাপারটি যেমন চমকপ্রদ তেমনি বেশ কিছুটা রহস্যজনকও বটে।

আনন্দোপলহি ক্লুরাস নামে জনৈক বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার ব্যাপারটা এইভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মনে করুন কোন কিছু তৈরি করার জন্যে বিরাট একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি-বিদরা কি করে থাকেন? প্রথমে তাঁরা ঐ বিরাট যন্ত্রের একটি ছোট মডেল তৈরি করে নেন। তারপর সেই মডেলটির কার্যকারিতা লক্ষ করে মূল যন্ত্রের কার্যকারিতা কতটা উন্নত হতে পারে অথবা তা দিয়ে কিভাবে কাজ চালাতে হবে তা স্থির করা হয়। সেই সঙ্গে কতকগুলি গাণিতিক হিসেব বা সমীকরণও। ঐ সমীকরণের কোনটিকে সমাধান করে বলা যাবে কত তাপমাত্রায় যন্ত্রটি ভালভাবে কাজ করতে পারবে। অথবা দিনে কত ঘণ্টা চালু থাকলে তার একটি বিশেষ অংশ দশ বছরের মধ্যে ক্ষয় হবে না, ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তাই।

একথা ঠিক, বিজ্ঞান জগতে গাণিতিক মডেল এমন কোন নতুন সংবাদ নয়। নিউটনের বল সমান ভর এবং ত্বরণের গুণ-ফল, আইনস্টাইনের শক্তি সমান বস্তুর ভর এবং আলোকের গতির বর্গের গুণফল, ম্যাক্সওয়েলের বৈদ্যুৎ-চৌম্বক বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের সমীকরণ অথবা শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ প্রভৃতির প্রত্যেকেই এক একটি যুগান্তকারী গাণিতিক মডেল। এদের দেখলে মনে হয় ছোট্ট একটি অঙ্কের ফরমুলা বা যেমন কিছু। কিন্তু ঐ ফর-মুলার মধ্যেই নিহিত আছে সাংকেতিক বার্তা যা দিয়ে এই পৃথিবী বা ব্রহ্মাণ্ডের বহু কার্যকারণকেই বোঝান হয়ে থাকে। অনেকেই হয়ত জানেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করার অনেক আগেই নেপচুন বা প্লুটো গ্রহের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন শুধু অঙ্ক কষেই। যাকে বলা হয় গাণিতিক মডেল। রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তার অনেক আগেই শুধু কতকগুলি সমীকরণের সমাধান করে বিজ্ঞানীরা তাদের অস্তিত্ব এবং গুণাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।

কিন্তু প্রশ্ন হল জীবজগতের ক্ষেত্রেও কি তেমন কোন গাণিতিক মডেল তৈরি করা সম্ভব? বছর তিনেক আগে আইগর পোলোভেইযেভ নামে জনৈক গণিতজ্ঞ কতক-গুলি বিশেষ অঞ্চলের গাছপালা এবং জীবজন্তুর জীবন প্রকৃতির উপর ধারা-বাহিক গবেষণা চালান। এদের জন্ম-মৃত্যু লক্ষ করেন তিনি। একদল প্রাণী অন্য একদল প্রাণীকে কখন ভক্ষণ করে, কিভাবে করে, কেনই বা বিশেষ বিশেষ প্রাণীকে তারা নিজেদের খাদ্যরূপে নির্বাচিত করে, একই গোষ্ঠীর মধ্যে চালচলনের পরিবর্তন প্রভৃতি লক্ষ্য করে পোলোভেইযেভ কতক-গুলি 'ডিফারেনশিয়াল' বা অবকলন সমীকরণ তৈরি করেছেন। ওঁর বক্তব্য, এই সমীকরণের এক একটি বিশেষ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বংশের মডেল। এই সমীকরণের সমাধান করলেই ঐ প্রাণী বা উদ্ভিদের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবনধারা সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পারব।

গ্রেগরি পাউজ এবং ভ্যালিমির আল-পেটভ নামে আরও দুজন বিজ্ঞানী বিশেষ ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কতক-গুলি এক-কোষী প্রাণীর বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা লক্ষ করেন। পৃথিবীর বুকে কখন কি ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে তার মধ্যে যেমনটি পরিবর্তন থাকা সম্ভব কৃত্রিম উপায়ে তা সৃষ্টি করে পরীক্ষা চালান হয়েছিল। আর সেই পরীক্ষার ফল-গুলিকেই রূপ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণে। এঁদেরও বিশ্বাস, এই সমীকরণগুলির সমাধান বের করে ভবিষ্যৎ প্রাণী বা উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা হয়ত তেমন কঠিন ব্যাপার হবে না।

একথা ঠিক, পরিবেশের সঙ্গে নিরত সংঘাতের মধ্য দিয়েই জীবজগতে আসে বিবর্তন। কিন্তু কিভাবে তা ঘটে, সে সম্পর্কে ডারউইন, লামার্ক, মেনডেল থেকে শুরু করে বর্তমানের বহু জীব-বিজ্ঞানী নানারকম তত্ত্ব প্রকাশ করলেও মূল প্রশ্ন অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে তা সম্পন্ন হয় সেটা কিন্তু আজও রহস্যের তিমিরেই থেকে গেছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আজও জৈবিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার

যথাযথ প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। কোন বিশেষ কারণে বিবর্তন জীব-জগৎকে উন্নততর করে অথবা উন্নততর কোন অবস্থা থেকে মোড় ঘুরিয়ে কেন দুর্বল অবস্থায় ফিরিয়ে দেয় বা ধ্বংস করে তারও উত্তর এখনও সহস্র কিন্তুতে ভরা। অথচ গবেষণাগারে বসে শুধু তত্ত্ব খাড়া করে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তার সঠিক উত্তর সংগ্রহ করাও সব সময় সম্ভব নয়।

মানুষের কথাই ধরা যাক। মানব-দেহের ক্রমবিবর্তনের আদিমতম সূত্রটির ব্যাপারে এখনও 'জিজ্ঞাসা'র সমাপ্তি ঘটে নি। বানর বা সিম্পাঞ্জি, যে ধরনের প্রাণী থেকেই মানব দেহের উদ্ভব হোক না কেন ঠিক কোন সময়ে পৃথিবীর কোন পরি-বেশে এবং কি ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা ঘটেছিল তার যথাযথ নজির বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি। এমন কোন জীবাশ্মও পাওয়া যায় নি, যার দ্বারা সঠিক বলা চলে মানুষের জৈবিক পরিবর্তনটি কিভাবে দানা বাঁধতে থাকে। অথচ তার এই অতীত অধ্যায়টিকে জানতে পারলে হয়ত ভবিষ্যতেরও অনেক কিছু কথা এই মুহূর্তেই আমরা জেনে ফেলতে পারতাম।

শুধু প্রাণী নয়। উদ্ভিদেরও বংশ-পঞ্জী সম্পর্কে আজকের বিজ্ঞানীরা কম আগ্রহী নন। ধান, যব, গম বা অনুরূপ শস্যের কথাই ধরুন। এদের বংশগতির ধারাবাহিকতা, বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিবেশ কিভাবে এদের সেই ধারাকে প্রভাবিত করে, কোন পদ্ধতিতে কি ধরনের সংকর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব, এ সমস্ত তথ্য যদি আগে থেকে জানা সম্ভব হয় তাহলে সেই-ভাবে কাজ করে প্রয়োজনমত কৃষি উৎপাদনও আমরা বাড়িয়ে তুলতে পারি। এখন সেটা সম্ভব হবে ঐ এক একটি সমীকরণের সাহায্যে। এই সমীকরণই এক একটি গাণিতিক মডেল। আলেকসিস লিয়েপুনেভ নামে জনৈক গণিতজ্ঞ মনে করেন, বর্তমানে বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে যে সমস্ত গাণিতিক উপাত্ত বা ডিডাকসন অথবা সমীকরণ তৈরি করা হয়েছে বা হবে তাদের সাহায্যে সুদূর ভবিষ্যতেরও জীব প্রভৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য ঠিক এই মুহূর্তেই আমরা জেনে ফেলতে পারব।

ভৌগোলিক পরিবর্তন এবং জৈবিক বিবর্তন এক সূত্রে গাঁথা। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভূ-প্রকৃতি, আর আবহাওয়ামণ্ডল প্রভৃতি সম্পর্কে নতুন তথ্য বেশ কিছু আগে থেকে জেনে ফেলা তেমন কোন শক্ত ব্যাপার হবে না। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যে হয়ত আমরা সুদূর ভবিষ্যতেরও আবহাওয়া সংবাদ, দূরাকাশ থেকে আগত অতিবেগনি রশ্মি,

মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি, তখন পৃথিবীর বুকে তাপসঞ্চারণ কিভাবে চলেছে তার ওপর অনেক তথ্য জেনে নিতে পারব। প্রসংগত বলে রাখি; জৈবিক বিবর্তনে এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর তাদের প্রভাব এবং অন্যান্য আরও কিছু কিছু কারণের কথা স্মরণ রেখে তখন তৈরি করা হবে এক একটি গাণিতিক মডেল। তার কোনটি ধানের, কোনটি গমের বা মানুষের প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, একই গাছের আপেলে প্রতি দশ বছর অন্তর গুণগত পার্থক্য ধরা পড়েছে। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে, এক ধরনের বার্লি, গম এবং গৃহপালিত পশু কয়েক পুরুষ পর পরই তাদের অনেক মৌলিক গুণ হারিয়ে ফেলে। এদের কয়েক পুরুষের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ করে তার গাণিতিক রূপ দেওয়া তেমন কোন জটিল সমস্যা নয়। আর সেই সমস্ত সমীকরণ থেকে এটাও জানা সম্ভব, পাঁচ বছরে যদি তাদের এই হাল হয়, পাঁচ শ বছরে কি দশায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এই সমস্ত গাণিতিক মডেলের সাহায্যে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পশু বা উদ্ভিদের উৎপাদন অনন্ত বাড়িয়ে নিতে পারব।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মানুষের মস্তিষ্কের কার্যধারা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যেতে পারে, এই সমস্ত মডেলের সমাধান বের করে, এবং শুধু অংক কষেই বলে দেওয়া যাবে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্নায়ুতন্ত্রের জটিল কার্যধারা। আজকের পৃথিবীতে মানুষ নিজেই তার কাছে যত বড় সমস্যা তার চেয়ে বড় সমস্যা হয়ত আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, এমন নানা ধরনের চাপে মানুষের চিন্তাধারা তথা মনের মধ্যে আজ প্রতি দিন হাজার লক্ষ ধরনের বিবর্তন চলছে। এই মানসিক বিবর্তনের সংগে তার কার্যপ্রণালী এবং বাইরের সম্পর্ক যে কত নিকটের আজকের দিনে সে কথা সকলেরই জানা। মনের সংগে আসে দেহের পরিবর্তন। তারপর পুরুষানুক্রমে তারই ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ। দেহে এবং মনে। অবশেষে কার্যেও, এটাই বিবর্তনের স্বীকৃত ধারাবাহিকতা। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা, একটি মাত্র গাণিতিক সূত্র—একটি ডিফারেনসিয়েল ইকুয়েশনের মধ্যে তাকে ধরে রাখা। যেন আরব্য-উপন্যাসের 'ম্যাজিক আয়না'। তার দিকে চাইলেই সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ দেখা যাবে। বলে দেওয়া যাবে এ জীব কোথায় ছিল, কেমন করে এল। এ জীব আরও, আরও হাজার বছর পর কেমনতর হবে। শুধু সমীকরণটির যথাযথ সমাধান করতে পারলেই হল। আর তাহলে হয়ত বহু অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিজেদের আমরা রক্ষা করতে পারব।

মানুষের কারদাকানুনে কারুর অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকে এ ধরনের উঁকি মারাটা হয়ত 'এথিকস'এ বাধবে। কিন্তু 'ইন দি স্ট্রাগল অব একজিসটেন্স দি সারভাইবেল অব দি ফিটেস্ট'-এর কানুনে সেটা চালালে তেমন কোন ক্ষতি হয়ত হবে না। কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দেখবেন ঐ সমস্ত সমীকরণের একটি সংকলন হয়ত চড়া দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তখন কৃষক তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধররা কি ধরনের শস্য খেয়ে বেঁচে থাকবেন জেনে ফেলবেন। বর্তমানের গরু অথবা ছাগল এক হাজার বছর পর কেমন দেখতে হবে, কতটা দুধ দেবে অথবা আদৌ দেবে কিনা এমন অনেক তথ্যই আমরা জেনে ফেলব। তেমন কুশলী গণিতজ্ঞের হাতে পড়লে আপনি নিজেও হয়ত একটি 'ডিফারেনসিয়েল ইকুয়েশন' বনে যেতে পারেন। আর তার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে জানা হয়ে যাবে আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি এবং অধঃপাতের যাবতীয় সংবাদ। জীবন রহস্যের [illegible] তখন সাফ!

সমরজিৎ কর

বিজ্ঞান-গ্রন্থ

সায়েন্স ইন ইনডিয়াজ ফিউচর : বিকাশ পাবলিকেশনস, ৫ দরিয়াগঞ্জ, আনসারি রোড, দিল্লি-৬। দাম ১৫ টাকা।

স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ বাইশ বছর পর এখনও পর্যন্ত ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষই অজ্ঞ রয়ে গেছে। অথচ এরই মধ্যে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। প্রচুর বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে তাদের ভূমিকার কথা, সেই সংগে তাদের সাফল্যের খবর আমরা খুব কমই রাখি। এই অজ্ঞতাই আমাদের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সাধারণ মানুষের অনাস্থার একটি বড় কারণ।

আলোচ্য গ্রন্থটি এই ত্রুটি অপনোদনের একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ। বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট আঠারোটি প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং গবেষক। আত্মারাম এবং এম এল ধর দুটি প্রবন্ধে দেশের বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তরুণ গবেষকদের কাছে প্রবন্ধ দুটি যথেষ্ট সমাদর পাবে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা এইচ এ বি পারপিয়ার 'খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি', পুষ্টি সমস্যার উপর সি গোপালনের এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর বি এল রাইনা'র আলোচনা। বি কে নায়ার এবং কমলেশ রায়কে ধন্যবাদ। বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিকতার ত্রুটি এবং পরিসংখ্যান এবং যুক্তির মাধ্যমে ভারতের কোন কোন সংবাদপত্র কতটা বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ প্রচারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন তার যে করুণ চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছেন নিঃসন্দেহে তা একান্ত ক্ষোভের। বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রসংগে তাঁদের বক্তব্য মূল্যবান।

'এভারেডী' টর্চ থাকলেই নিরাপদ
অন্ধকারে আপদ-বিপদ থেকে
বাঁচতে 'এভারেডী' টর্চের চেয়ে
বিশ্বস্ত বন্ধু দুটি হয় না।
'এভারেডী' টর্চের মডেল ও রঙের
এত রকমারিত্ব আর কোনো
টর্চে পাবেন না। প্রত্যেকটি
মডেলের গড়ন আলাদা।
EVEREADY
UNION CARBIDE
সবার চাইতে ভালো—'এভারেডী'

বৃহন্নলা সংবাদ

মহাশূন্যচারী আকাশের শকুনদল যেমন তাদের দূরবীন-চোখে পৃথিবীর মাটিতে পরিত্যক্ত, মৃত জীবজন্তুদের দেখে ঝড়ের বেগে নেমে আসে তেমনি গাঁ-ঘরে কোনো গেরস্থ-বাড়িতে সন্তান হলে কলকাতার টালীগঞ্জ, খিদিরপুর, ধর্মতলা, ট্যাংরা, তালতলার বস্তি বা ফুটপাতবাসী হিজড়েরা কেমন করে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে তা খোদা জানেন!

কোনো 'অ্যাসোসিয়েশন' না থাকলেও হিজড়েদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া আছে কে কোন্ কোন্ থানায় যাবে। আসলে তারা পাড়ায় নাচ-গান করতে এলে যখন সব মেয়ে বউরা রঙ্গ তামাশা দেখতে এসে ভিড় করে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে কার কার সন্তান হবার আশু সম্ভাবনা আছে তা লক্ষ করে আসে।

একে এ বছর চাষবাসের অবস্থা খারাপ, 'চাঁদে মানুষ নামার পাপে' জল বৃষ্টি হচ্ছে না, ভাদ্র মাসের অর্ধেক হয়ে গেল, খাল বিল থেকে জোয়ারের জল তুলে ধান রোয়া হচ্ছে, এমন দুর্দিনে হিজড়ের একটা দল এল গাঁয়! ফুই ফুই ইলশে গুঁড়ি ঝরছিল। চাষীদের শিক্ষিত ছেলেটা গামবুট পায়ে, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে আলের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পাশেই একটা মানপাতা চাপা ট্রানজিসটর সেট রেডিও থেকে রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছে—দশ বারোজন জনমজুর জমিতে কাজ করছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হঠাৎ হিজড়েদের আসতে দেখে তারা হই হই করে চিৎকার করতে থাকে—যেমন পাগল বা মাতালকে দেখে মানুষজন আমোদ পায়।

রূপো, বাঁশি আর ময়না তিনজন হিজড়ে পথ দিয়ে আসছিল কাওয়ালী গাইতে গাইতে। রূপো গাইছিল মূল গানটা—ধুয়া ধরছিল ময়না আর বাঁশি। ঢোলকে তাল দিচ্ছিল ময়না আর হাতের তালুতে কড়া কিন্তু সুডৌল আওয়াজ তুলছিল বাঁশি।

রূপো পুরুষ-জাতের হিজড়ে। সে আয়না ক্ষুর ধরে রোজ সকালে চচ্চড় করে কড়া দাড়ি গোঁফ চাঁচে। বাঁশি আর ময়নার দাড়ি গোঁফ হয় না। তারা দুজন মেয়ে জাতের। তিনজনেই শাড়িপরা, হাত ভরা তাদের কাঁচের চুড়ি। ময়নার কোমরে রূপোর চন্দ্রহার। রূপোর কোমরে বিছে হারের গোছা। তাতে লকেট ঝুলছে। রূপো তাদের সরদার। গলার স্বর মোটা। বয়েস পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। গায়ে ব্লাউজ। কৃত্রিম স্তন। ঠোঁটে রঙ দেওয়া।

ময়নার গায়ের রঙ ফরসা। তার বয়েস বছর পঁচিশ ছাব্বিশ। মুখটার আদল কাঁচাকচি-নারীসুলভ। চোখ দুটি মায়াময়। দেখলেই মনে হয় কোনো সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে

এসেছে। তার চলনভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরও কিছু রমণীয়।

রূপোর কথায়, 'ময়না আমার চন্দনা আর বাঁশি হল কালনাগিনী কঙ্কাবতী কালিন্দী!

পথে একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যজমান বাড়ি বেরিয়েছিলেন

চাষীদের শিক্ষিত ছেলেটা গামবুট পায়ে, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে

পুজোয়, হঠাৎ সামনে হিজড়েদের দেখে 'রাম রাম' করে উঠলেন।

রূপো হেসে শুধোলে, 'যাত্রানাস্তি! ও ঠাকুরমশায়, হরি ঘোষালের বাড়ি যাব—এই পথ তো?'

ঠাকুরমশায় কোনো উত্তর না দিয়ে, তাদের খানিকটা দূর দিয়ে, মাঠে নেমে তাদের একেবারে ছায়া এড়িয়ে, দ্রুত সরে গেলেন। ময়না তার সায়া চাগিয়ে ধরে ঠাকুর মশায়ের পিছু পিছু ধাওয়া করলে: 'হেই মরদ, শুনে যাও'...

কিন্তু ময়না জানে না ঐ ব্রাহ্মণটি কে?

রূপোও চিনলে না হরি ঘোষালকে। অনেক বছর এদিক আসে নি। সে ঐ ময়নার জন্যেই। এই মন্মথপুর গাঁয়েই যে তার জন্ম।

অবশেষে হরি ঘোষালের বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে রূপো হাঁক মারলে: 'ওগো দিদিরা, আয় লো তোরা! হাসি হাসি বিদায় দে লো, হাসি হাসি বিদায় দে!'

তারপর তারা ঢোলক বাজিয়ে গান জুড়ে দিলে। পাড়ার যত ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। ঘোষাল বাড়ির সামনেটা মানুষজনে ভরে গেল।

ঘোষালগিন্নী এসে দাঁড়ালেন তাঁদের পাকাবাড়ির দোর গোড়ায়। তাঁর ছোট মেয়ের একটা খোকা হয়েছে মাস তিনেক হল। কচি খোকাটাকে নিয়ে আসতেই রূপো ছুটে গিয়ে রমলার কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে তুলে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে রমলাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটা কেঁদে ককিয়ে উঠতেই।

নাচ জুড়লে তিনজনে। গান গাইতে লাগল:

'মাটির ধরায় আজ এল চাঁদ
সে চাঁদ সোনারখনি
কত রাতের গোপন চুমায়
তৈরি সে ধনমনি!'

তাদের গান শুনে মেয়েরা হেসে গড়াগড়ি খায়। মাঝে মাঝে হিজড়েরা তাদের সম্পূর্ণ আব্রু উন্মোচন করে। ব্যাটাছেলেদের সরিয়ে দিয়ে মেয়েরা ঘিরে ধরে ময়নাকে। রূপো বউগুলোর চিবুক ধরে অশ্লীল কথা বলে তামাশা করে। তাদের পেটে হাত দিয়ে দেখে। কাতুকুতু দেয়।

তারপর তারা ঢোলক আর ঝনঝনি বাজিয়ে কাওয়ালী জোড়ে।

ময়নার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে। অবিকল যেন ঘোষাল-বাড়ির ছোট মেয়ে রমলার মতোই দেখতে, একই রকম মুখের আদল। সে কথা দু-একজন মেয়েও বলাবলি করে।

অস্বাভাবিক জীব! [illegible] মা। ওরা অভিশাপ! [illegible] ...কেমন করে...'

রমলা রূপোকে [illegible] ডেকে আনলে। পৈঠায় [illegible] রূপো। মা [illegible] যেতে দেখার সময় [illegible] 'হাঁরে বাবা রূপো, তুই যে আমার [illegible] নিয়ে গিয়েছিলি, সে কি এই ময়না?'

মা হয় না, সে 'ময়না মেয়ে। বস্তিতে একবার কলেরা লাগল...'

'সত্যি কথা বল্ বাবা, আমি মা, আমি চিনতে পেরেছি। ঐ তো ওর বোন রমলার মুখের আদল।'

রূপো দেখলে মহা মুশকিল! এ হল অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধন! তার আসা উচিত হয়নি এখানে। বললে, 'হাঁ মা। সেই কমলা।'

মা এবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

রমলা বেরিয়ে এসে ময়নার হাত ধরে টেনে আনলে বাড়ির মধ্যে। সে কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল। বাঁশি বাইরে বসে বিড়ি টানতে লাগল। হঠাৎ ঘোষালগিন্নী ছুটে এসে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তার মাথায় মুখে চুমো খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, 'আমার কমলা! আমার ময়না! তুই আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন! ওরে তুই কোথায় থাকিস! কত কষ্ট পাস্!...'

রূপো মাথা হেঁট করে বসে আছে। তারও চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে সিমেণ্টের ওপর।

রমলাও কাঁদছে।

কিন্তু ময়না তখনো ভাল করে বোঝেনি। ঝড়ের বেগে সে যেন কচু গাছের মতো দলিতমথিত হচ্ছে পরম প্রকৃত এক স্নেহে।

ঘোষাল গিন্নী যখন বলে উঠলেন, 'আমি যে তোর মা—ওই রূপো তোকে কুড়ি বছর আগে আমার কোল শূন্য করে নিয়ে গিয়েছিল'—তখন ডুকরে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে এক সময় হঠাৎ বসে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ময়না।

রমলা আর মা তার মাথায় মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে তবে জ্ঞান ফিরল।

মা বললেন, 'রূপো, বিকালে যাস বাবা, তোরা স্নান করে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবি। যা এখন বাইরে যা।'

রূপো চলে এসে বাঁশিকে সব ঘটনা বললে। বাঁশি বললে, 'শালা! তোর মাথায় বাজ পড়বে। কেন এলি এখানে? ময়নার মনে আগুন জ্বলবে চিরকাল। তোর শালো বুকবাক কাঁহা-কা!'

'মাইরি বাঁশি, খোদার কসম, আমি মনে করেছিনু, ওরা চিনবে না।'

'না দাদা, মা আমায় চিনতে না! এ কি তোমার কিস্‌সা [illegible]?'

রূপো [illegible] হতে [illegible] পালিয়ে [illegible] টাকি থেকে সদ্য [illegible] করে [illegible]। বাঁশি আর [illegible] লাগল। [illegible] কাছে এসে রূপো বললে, 'আর একটিন?'

রমলা তার ছিনতে [illegible] ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। [illegible] ময়না। রমলার ছেলেটাকে কোলে নিলে ময়না। সে যদি মেয়ে হত এমনি তারও সন্তানাদি হত। স্বামী হত। ঘর হত। ভাগ্যের দোষে কোথায় টালীগঞ্জের বস্তিতে আজ তার বাস। মশা আর ছারপোকার জ্বালায় কোনো রাত্রেই ঘুমোতে পারে না। নোংরা পরিবেশ। রূপো মারে। নোংরা প্রকৃতির লোকজনদের কাছে তাকে ভিড়িয়ে দিয়ে পয়সা নেয়।...

মা তাকে অনেক কথা [illegible]। আর কাঁদেন। মুখে [illegible] পান। [illegible] ফুল [illegible]। রমলা [illegible] খোঁপা বেঁধে দেয়। পাঁচ [illegible] প্রাউজ দেয় তাকে।

ইতি [illegible] রূপো [illegible] দেখেন, সেই ছিনতেন্না। [illegible] বাবাকে সব ঘটনা বলে [illegible] আনেন তাঁর সামনে। [illegible] সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক—যাঁর [illegible] সে [illegible] করেছিল আলাদা ঘরে, 'হুই [illegible] যাও' বলে।

লজ্জায় সে মাথা নামালে।

বাবার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। বললেন, 'তোমার কপাল মা! ভগবান'......

আর কিছু বলতে না পেরে চোখে হাত চাপা দিয়ে তিনি আড়ালে সরে গেলেন।

দুপুরে তিনজনকে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়ালেন মোড়ল গিন্নী।

বেলা গড়িয়ে গেল ক্রমে।

এবার বিদায়ের পালা।

বাবা, মা, বোন সবাই কাঁদতে লাগলেন।

অবশেষে ময়নার হাত ধরে রুপো জোর করে টেনে নিয়ে এল। সে কিছুতেই আসতে চায় না। 'মা মা'—বলে কেবলই কাঁদে। আবার দৌড়ে পালাতে চায়। হাতে কামড়ায় রুপোর।

রুপো মার দেয়। গালাগালি করে। 'শালা হারামজাদা মাগী! চল্। তোর বাপ-মা তোকে নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তোর কি ছেলে হবে—ডাক্তার হবে—আছে সে সব তোর? থাকলে মানুষ তোকে আদর করত। মেয়েমানুষ যতই রূপসী হোক তার যদি দেহটা বেকার হয়—পুরুষমানুষ দেবতা হলেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বেশ্যা হলেও মানুষের সমাজে তার তবু দাম আছে। আমাদের কি দাম আছে? কেন দাম দেবে তারা? আমরা হলাম জগতের অভিশাপ!'

কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ লাল করে এক সময় শান্ত হয় ময়না। রুপো বলে যায়: 'আমিও তো এক ধনী মুসলমান বাড়িতে জন্মেছিলাম। মুর্শিদাবাদে তাদের এখনো পাকা দালান কোঠা আছে। আমার বড় ভাই এখন একটা থানার বড় দারোগা। তাই বলে কি আমি সেখানে যাব? আমরা গেলে তাদের মান যাবে। ঐ একবেলার আদর দেখালো মা—দু মাস কই রাখুক তো? আমাদের কথা কেউ ভাবে না। ধর্ম পর্যন্ত আমাদের কথা ভাবে নি। আমরা মরলে স্বর্গে যাব না নরকে যাব তা কোনো ধর্মের বইয়েও লেখা নেই। আমাদের সামনে কেউ খুন হলেও আমরা সাক্ষী হতে পারব না। আদালতও আমাদের 'মানুষ' বলে গণ্য করে নি। তবে বড় মজা, কেউ মারতে পারবে না... আমাদের মন্ত্রী নেই, দল নেই, সমাজ নেই, সংসার নেই, বাপ নেই, মা নেই, স্বামী নেই, বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই,—আমরা হিজড়ে। নপুংসক। কিন্তু আমাদের পেট আছে, খিদে আছে, রোগ আছে, তাপ আছে, বাসনা-কামনা আছে।...আমি রোজা করতাম, নামাজ পড়তাম, খোদার কাছে কত কাঁদতাম—কিন্তু সে সব ছেড়েছি। কি হবে ওসব করে? হিজড়ের আবার ধর্ম! এই যেমন নকল মেয়েমানুষ সেজে আছি। দুধের স্বাদ কী ঘোলে মেটে? যা হোক, তোকে মা-বাপের মুখটা দেখিয়ে গেলাম আমার একটা ঋণ শোধ হল!'

বাঁশি বললে, 'আমাকে তো দেখাস নি স্যাঙাত?'

'তুই বাগদির ঘরে পয়দা হয়েছিলি। তোর বাপ-মা পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে মরে গেছিল।'

ওরা তিনজনে গাঁয়ের মোড়ে একটা দোকানে চা খেতে বসল। ছেলেছোকরারা মস্‌করা করতে লাগল। ময়নার দিকেই তাদের লক্ষ। মানুষ কামনায় কতখানি অন্ধ রুপো তা বেশ বুঝতে পারে।

গ্রামের মোড়ে কোলাহল। ভিড়। লাল পতাকাবাহী যুবকরা চিৎকার করছে। একজন বলছে, 'চাঁদে নামল যে সব বীর-পুরুষরা তারা এক একজন ৯৯বার করে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করে কোরিয়ার মানুষদের ধ্বংস করে এসেছিল—কোরিয়াবাসীদের হাত পা চুল চোখ খসে খসে পড়েছে বছরের পর বছর ধরে। মনে আছে হিরোশিমার কথা! এই সব আর্মস্টং কলিন্সরা সেই যুদ্ধে বোমারু জেট পাইলট ছিল। চমৎকার ইতিহাসের বিচার!'...

রুপো কথাটা শুনে মাথা নাড়তে লাগল। ঠিকই তো। হঠাৎ বলে উঠল, 'ইন কিলাব জিন্দাবাদ!'

সবাই হেসে উঠল। রুপো থতকে গেল। তার ধ্বনির কোনো মূল্য নেই? তারা যে হিজড়ে! কেউ তাদের চায় না।

সাঁঝ নামতেই তারা তিনজনে উঠে পড়ল।

ময়না ফেলে আসা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। তার জন্ম-স্থান, বাপ-মার দেশ-গাঁ ফেলে রেখে চলে
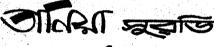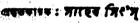
যাচ্ছে—আবার কখনো আসতে পারবে কিনা কে জানে! তার এক ভাই আছে নাকি—কলকাতার সদাগরী অফিসে বাবুগিরী কাজ করে। তাকে কখনো দেখেনি—দেখলেও চিনতে পারবে না। ময়নাকে দেখলে হঠাৎ ঘৃণায় হয়তো সরে যাবে!

বাসায় ফিরে মুসলিম হোটেল থেকে খান কতেক চাপাটি আর শিক-কাবাব আনলে রূপো। ময়না কিছু খেল না। শুয়ে পড়ল আপাদমস্তক বোনের-দেওয়া-একটা-শাড়ি পাট করে মুড়ি দিয়ে। মাথার চুলে তার মা আর বোনের হাতের মধুর গন্ধ পাচ্ছে যেন এখনো।

বস্তিবাড়ির পাশে শূকর চরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঘোৎঘোৎ শব্দ আসে মাঝে মাঝে। পাশের ঘরে থাকে বেশ্যারা। তাদের নিত্যকার মতো মুখখিস্তি শোনা যায় আজও। ময়নার চোখে ঘুম আসে না। ছিটে বেড়ার একটা ছোট্ট ঘর। বারো টাকা ভাড়া। বাঁশি আর রূপো ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে তাদের।

ময়না উঠল। সে পালাবে বলে আস্তে আস্তে টিনের দোর ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। মা আর বোন কটা টাকা দিয়েছিলেন আলাদা করে সেগুলো তার নাইকোঁচড়ের খুঁটে বাঁধা আছে। ময়না এসে ট্রেনে উঠল। তারপর লাস্ট বাস ধরে কলকাতা থেকে আবার এল সে গ্রামে!

রাত তখন বারোটা বাজে প্রায়।

কেউ লোকজন নেই পথে। অন্ধকারে বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে গেল সে ঘোষাল বাড়ির দোরগোড়ায়। কয়েকবার পড়ে গেছে খন্দ-ডোবায়। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত বার হচ্ছে বোধ হয়। তা হোক। তবু তো এসেছে।

কিন্তু ডাকবে কাকে? এখন রাত বোধ হয় দেড়টা হবে। নিশ্চুপ নিশুতি গ্রাম। মাকে ডাকতে গিয়ে গলার স্বর ফুটল না ময়নার। কে যেন কণ্ঠ রোধ করে আছে তার। দোরগোড়ায় বসে রইল সে। বসে বসে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কার যেন কাশির শব্দ পেয়ে।। তার বাবা কাশছেন। রমলার ছেলেটা কাঁদছে।

ভোর হয়ে এল। হঠাৎ ময়না উঠে পড়ল। তার মধ্যে ভাবান্তর এসেছে। মা বাপ তাকে রাখতে পারলে কি বিদায় দিতে পারতেন? রাখতে পারবেন না। দুদিন বাদেই চলে যেতে বলবেন। নইলে সমাজ একঘরে করবে। তার বাপকে আর কেউ পুজো করতে ডাকবে না।

চোখের জল শুকিয়ে গেছে ময়নার। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে চলতে নদীর ধারে এসে গেল। নদীতে তখন পূর্ণ জোয়ার। হুড়হুড় খলখল শব্দে করাল আঁধার গর্ভে জল ভীমগর্জনে আবর্তিত হচ্ছে। নদীতে ঝাঁপ দেবে বলে মনস্থির করলে ময়না। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না। বেঁচে থেকে লাভ কী?

কিন্তু বড় ভয়—বড় প্রাণের মায়া হয়! মরতে এত ভয় হয় কেন? আবার সে কাঁদতে লাগল। শেষবেলা যখন সকাল হয়ে গেল, লোকজন দেখতে পেয়ে তার যেন খানিকটা ঘোর কেটে গেল।

আবার সে চলতে চলতে এসে এক সময় বাসে উঠে বসল। বাস এসপ্ল্যানেডে এসে থামল। তারপর আবার সে ফিরে গেল টালীগঞ্জে রূপোর বাসায়।

রূপো তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। ময়নাকে আসতে দেখে আপাদমস্তক একবার দেখলে। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতন। কপালে হাত দিয়ে দেখলে ভীষণ জ্বর এসেছে ময়নার। কাঁপছে সে।

তাকে শুইয়ে চাপা দিয়ে রূপো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "ভাবিস না, পাগল হয়ে যাবি! আমরা অদ্ভুত এক জীব। আমাদের কথা ভগবানও ভাবে না!...আমিই তোর মা বাপ স্বামী ভাই—সব কিছু! —যাই তোর ওষুধ আনি।"

ময়না কিন্তু রূপোকে ছাড়লে না। তার গলা জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল।

জলভরা চোখ দুটো চকচক করতে লাগল রূপোর।

আবদুর জব্বার

এই কৌটোতে কী আছে?

সৌন্দর্যসুষমাময় ত্বকের রহস্য !

ত্বক সাধারণত দুরকমের হয়। এক হ'ল স্বভাবজাত সৌন্দর্যময় ত্বক, একটানা অম্লান থাকে যার সুষমা। অন্যটি ঠিক-তত-সুন্দর-নয় শ্রেণীর এবং এই ত্বকের সৌন্দর্যসুষমা ক্রমশ আরো বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। নিভিয়া ক্রীম বিশেষ করে উভয় শ্রেণীর উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। নিভিয়াতে রয়েছে আশ্চর্য ইউসেরাইট, একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা আপনার দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ জোগায় এবং তাকে কোমল ও লাবণ্যময় করে তোলে। আপনি যদি রূপবতী হন, তাহলে নিভিয়া আপনার ত্বককে মসৃণ ও তারুণ্যমণ্ডিত রাখবে। যদি আপনার ত্বক হয় শুষ্ক ও রুক্ষ, নিভিয়া সেই শুষ্কতাকে দূর করে আপনার দেহত্বককে আরো সুস্থ, কোমল ও লাবণ্যময় করে তুলবে। আপনার দেহত্বক যেমনই হোক না কেন, নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করুন।

নিভিয়া –তারুণ্যমণ্ডিত লাবণ্যময় দেহত্বকের গোপনকথা !

স্মিথ ও নেফিয়ু-র তৈরী

JLM 151 BN

রবীন্দ্র-সরোবরে

গিয়েছিলাম রবীন্দ্র-সরোবরে, কোথায় টপিকের জন্য অনুপ্রেরণার খোঁজে। বসেছিলাম এক বেঞ্চিতে, শুক্লা দেবীর দৈবাগমনের প্রতীক্ষায়। বীণাপাণি অভিসারে এলেন না, এলেন চশমা-পরা টাক-পড়া এক ভারিক্কি ভদ্রলোক। বসলেন আমার পাশে বিনা বাক্যব্যয়ে; বেঞ্চিটার কাঠ অশান্তি-জ্ঞাপক এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লোকটি নমস্কার জানালেন, আমি জানলাম প্রতি নমস্কার। তিনি বললেন, বেশ রোদ পড়েছে; আমি বললাম, পড়েছে বটে। তিনি বললেন, কালকে কিন্তু বৃষ্টি আসতে পারে; আমি বললাম, কথাটা সম্পূর্ণ সম্ভাবনাবিরহিত নয়। আর এখানেই বোধ হয় আমাদের ওই মূল্যবান কথাবার্তায় ইতি পড়ত যদি না চশমা-পরা টাক-পড়া ভারিক্কি ভদ্রলোকটির নজরে আসত আমার ঝোলা থেকে কিছুটা বেরিয়ে-আসা রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' [কবিগুরুর গদ্য কবিতার ফরাসী অনুবাদে আমি সম্প্রতি রত]।

তিনকড়িবাবু—তিনকড়িই তাঁর নাম—আমাকে রবীন্দ্রভক্ত দেখে, কিংবা ভেবে, হঠাৎ আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "রবীন্দ্রনাথ সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি।" আমি অবশ্য সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নই; তুলনাত্মক বিচার করতে সাহসী কিংবা হঠকারী—হব না।

"তাঁর মতো আর কজন এ—ত লিখেছেন, বলুন? রবীন্দ্র রচনাবলীতে কত খণ্ড আছে, জানেন? চব্বিশটা, অপ্রচলিত রচনাগুলি বাদ দিয়ে!" আমি নম্রভাবে ইঙ্গিত দিলাম যে, ওজনেই যদি লেখকের প্রতিভা মাপতে হয়, তাহলে দু'শ' সস্তা উপন্যাসের লেখক আলেকসাঁদ্র্ দ্যুমা রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই হারাতে পারেন।

রাবীন্দ্রিক কলকাতা

তিনকড়িবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "রবীন্দ্র-সরোবর কথাটা কিন্তু মন্দ নয়...আর রবীন্দ্রসরণি, রবীন্দ্রসদন,

রবীন্দ্রভারতী কানে কত মধুর শোনায়, বলুন তো। আসলে কি জানেন, আমরা এখনও এত পিছিয়ে আছি কেন, বলতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভুলেই গিয়েছি বলে। দেশ উদ্ধার করতে গেলে আমাদের কলকাতার আবহাওয়াকে রাবীন্দ্রিক করে তুলতে হবে।

"ইস্টার্ন" রেলওয়েকে আমরা যদি 'পূরবী'-তে নামান্তরিত করতাম, তবে যাত্রীরা কি রাবীন্দ্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত না, বিনা টিকিটে ট্রেন চাপত আর?...হগ মার্কেট 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-এ নামান্তরিত হলে দোকানদারেরা কি পারত খদ্দেরদের ঠকাতে? চায়না টাউনকে 'হিং টিং ছট' নাম দিলে কলকাতা-নিবাসী চীনাদের আমরা কি পর বলে মনে করতে পারতাম?..."

তাই তো...আর যদি ট্রাম-বাসকে 'ঝুলন' বলতাম, আর ট্রাম-বাস যাত্রীদের বলতাম 'বীরপুরুষ'? ডাকঘরকে যদি বলতাম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', পাসপোর্ট-অফিসকে যদি বলতাম 'যেতে নাহি দিব' আর জেল-কোর্টের-অফিসকে যদি বলতাম 'এবার ফিরাও মোরে', আমাদের দেশে কত-না নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতি হয়ে যেত!...

অথ আমাদের পাশের বাড়ির অসংখ্য বাচ্চাটা, সে একটা অতি সামান্য যোগ এখনও পারে না কেন, জানেন? রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে শেখে নি বলে। স্থির করলাম, এবার থেকে আমি ওর সংখ্যাপরিচয়ের ভার নেব: একজন লোক, দুই বোন, তিন কন্যা, চার অধ্যায়, পঞ্চভূত...

তিনকড়িবাবু আমাকে থামিয়ে স্মরণ করালেন যে অংকশিক্ষণে কড়ি-পদ্ধতিরও মূল্য আছে: "এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি..." এই কথা বলে তিনি গাত্রোত্থান করলেন, বেঞ্চিটার কাঠ এবার মুক্তিনিশ্বাস ফেলল।

একচ্ছত্র সম্রাট

ভাবতে লাগলাম রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কথা। আর কোন্ দেশে এমন কবি জন্মেছেন, তিরোধানের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও প্রতিটি অনুষ্ঠানে যাঁর কবিতার আবৃত্তি অপরিহার্যভাবে অব্যাহত, দিদিমা থেকে নাতনী পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে যাঁর গানের অপ্রতিহত সমাদর, আকাশবাণীতে একেকদিন ন-ঘণ্টা অব্দি [প্রায় দু ঘণ্টা] যে গান, শ্রোতৃবৃন্দের সাগ্রহ অনুরোধেই গাওয়া হয়ে থাকে।

অন্যান্য দেশের সাহিত্যেতিহাসেও এরকম একচ্ছত্র আধিপত্য বিরল নয়—প্রমাণ ইংলণ্ড, ইতালী, জার্মানী। আর স্পেনেও তো আছেন সের্ভান্তেস, পর্তুগালে কামোয়াঁস, হল্যাণ্ডের ভন্দেল—তিনজনেই আপন আপন দেশে এভারেস্টের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফরাসী [কিংবা রুশ] সাহিত্যিক ভূগোল কিন্তু অলাদা জাতের।

কাদের মেয়েরা একারোন্টে নেই, আছে কাঞ্চন-জঙ্ঘাদ্বয়ের একাধিক অঙ্কিন্‌দ্যো—ম্যোলিয়েরের, রাসিন, শ্যানম্যান...আর সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপিত্ব ফরাসীদের কাছে সর্বদা বোধগম্য হয় না।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ফরাসী পাঠক রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। আঁদ্রে জিদ, সিলভ্যাঁ লেভি, রোম্যাঁ রোলাঁ এবং 'ভারতের পত্রপুঞ্জ' সিরিজের সম্পাদিকা আঁদ্রেই কার্পলেস-এর প্রচেষ্টায় 'ঠাকুরের' নাম ফ্রান্সে অনেকেই শুনেছেন। রোলাঁর তো ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখবেন; তার জন্য তিনি ভারতে গিয়ে কয়েকমাস কিংবা অন্তত কয়েক সপ্তাহ কবিগুরুর ওখানে থাকার কথাও ভেবেছিলেন।

ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ

ঠাগর বলতে ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথকে বোঝায়; এমন কি অনেকের ধারণা 'ক্ষীরের পুতুল'-ও [যার ফরাসী অনুবাদ আছে] তাঁরই রচনা। মহর্ষিকে কেউ চেনে না, তবে 'প্র্যাঁস ঠাগর' [প্রিন্স দ্বারকানাথ] তাঁর দ্বিতীয় য়ুরোপ-যাত্রায়, ১৮৪৪ সালে, ফ্রান্সে যান এবং প্যারিসের অভিজাত মহলে উচ্ছল অভ্যর্থনা লাভ করেন, তাঁর বিদেশীয় জাঁকজমক ও দানশীলতার জন্য; সেখানে অনেকেই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, কিন্তু মানকর্মে ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে রাষ্ট্র-সমিতির প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাত।

১৯২০ সালে ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পণ এবং সিলভ্যাঁ লেভি ও বের্গসোঁ-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। ১৯২১ সালে তিনি আবার আসেন—বিমানে [আর এটাই কবিগুরুর প্রথম বিমান-যাত্রা], রোলাঁর সঙ্গে দেখা করেন, প্যারিসে দুটি ভাষণ দেন [বিষয় : প্রাচী-প্রতীচীর মিলন আর বাউল]; স্ট্রাসবার্গে, যেখানে সিলভ্যাঁ লেভি অধ্যাপনা করতেন, তিনি 'বনবানী'-শীর্ষক একটি ভাষণ দেন। কিছুদিন পর জার্মানীতে তাঁর উচ্চারিত উক্তির জন্য ফ্রান্সে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৯২৪-এ দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার পথে এবং ১৯২৬-এ ইতালী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আবার তাঁর ফ্রান্সে আগমন। শেষবারের মতো আসেন ১৯৩০ সালে, তাঁর ছবির প্রদর্শনীর জন্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ

রাশিয়ায় ও জাপানে না কি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী অনূদিত হয়েছে। ফরাসীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তির কাল থেকে শতবার্ষিকী বছর পর্যন্ত পঁচিশটি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিও আবার প্রায় সর্বদাই ইংরেজী অনুবাদের পুনরনুবাদ, সরাসরি মূল বাংলা থেকে নয়।

ইংরেজীতে তর্জমা বেরিয়েছে প্রায় পনেরোটি নাটকের; ফরাসীতে মাত্র পাঁচটির; ডাকঘর [ফরাসী নাম 'অমল ও রাজার চিঠি'; অনুবাদক জিদ; প্রকাশকাল ১৯২২], ফাল্গুনী [১৯২৬], মুক্তধারা [১৯২৯-এ প্রকাশিত এই নাটকটির অনুবাদ 'যন্ত্র' নামে মূল বাংলা থেকে করেছেন একদা-শান্তিনিকেতনবাসী কেম্প বয়োনো এবং অমিয় চক্রবর্তী], চিত্রাঙ্গদা [দুটি অনুবাদ, ১৯৪৫ ও ১৯৬০] এবং বিদায়-অভিশাপ [অনুবাদক নাম দিয়েছেন 'কচ ও দেবযানী'; ১৯৫০]

নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। 'ডাকঘর' ও 'চিত্রাঙ্গদা' ইংলণ্ডে ১৯১৩ সালেই অভিনীত হয়েছে, ফ্রান্সে প্রথম হল ১৯২২-এ—তাও সার্বজনীন প্রদর্শনী নয়, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায়। ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনাতেই 'ডাকঘর'-এর আরেকটি প্রদর্শনী হয় ১৯২৮ সালে। ১৯৩৭-এ সর্বসাধারণের উদ্দেশে 'ডাকঘর'-এর প্রথম অভিনয়—আদ্রেই-এর 'মালপত্রহীন যাত্রী' নাট্যাভিনয়ের আগে জুড়ে-দেওয়া একটি নাটিকা-সংযোজন হিসেবে; উল্লেখযোগ্য ছিল সংগীত, দারিয়ুস মিলো তার রচয়িতা, কলেৎ প্রশংসা করেছিলেন সেই

সম্পাদিতের। ১৯৬১ সনের রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে, রিনের 'শারুআর্যা' পত্রের প্রত্যাবর্তন'-এর সঙ্গে, আমাদের সংযোজন হিসেবেই 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হয়। এ ছাড়া ১৯৪১-এ দুদিন এবং ১৯৬১-তেই আরেকদিন অভিনীত হয়েছে ঐ নাটকটি।

'চিত্রাঙ্গদার' অভিনয় '৪৫-এ ও '৫৮-এ একদিন ক'রে, '৬০-এ ও '৬১-এ দুদিন করে। ১৯১১-এ একাভিনয়ের জন্য 'বিসর্জন'-এর অভিনয় হয় জেনেভায়; ১৯২৩-এ প্যারিস নগরীতে 'রাজা'—তাও একদিন।

উপন্যাস অনূদিত হয়েছে মোট চারটি : ঘরে-বাইরে [১৯২২] চতুরঙ্গ [১৯২৪] নৌকাডুবি [১৯২৯] এবং গোরা [১৯৬১]। চতুরঙ্গের অনুবাদিকা রোম্যাঁ রোলাঁর বোন. 'গোরা' অনুবাদের ইচ্ছেও তাঁর ছিল ভেবেছিলেন বাংলা শিখে কালিদাস নাগের সাহায্যে মূল থেকে অনুবাদ করবেন—তা আর ঘটে ওঠেনি।

ছোট গল্প—রাবীন্দ্রিক ছোট গল্পের তর্কাতীত অন্তলীন ঐশ্বর্য সত্ত্বেও—খুব বেশী অনুবাদ হয়েছে বলা যাবে না। ইংরেজী 'মাসি' সংকলনের চোদ্দটি গল্প ইংরেজী থেকে ফরাসীতে ভাষান্তরিত হয়েছে যদিও 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পের ইংলানুবাদ থাকলেও অজ পর্যন্ত কোনো ফরাসী অনুবাদ বেরোয় নি। একেবারে সোজাসুজি বাংলা থেকে ফরাসী অনুবাদও আছে নটি গল্পের, যুগ্ম অনুবাদক শ্রীমতী ক্রিস্তিন্ বসনেত [ইনিও এককালে শান্তি-নিকেতনে ছিলেন] এবং শ্রীকমলেশ্বর ভট্টাচার্য; গল্পগুলির নাম অতিথি. গুপ্তধন. মেঘ ও রৌদ্র, দুরাশা, বিচারক, মহামায়া. অনধিকার প্রবেশ, সমাপ্তি, চোরাই ধন—সংকলনের নাম 'ভবঘুরে' [এই নামেই 'অতিথি' গল্পটি অনূদিত হয়েছে]। ১৯৩৪ সালে 'তোতা-কাহিনী'রও একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

কবিতা গ্রন্থের মধ্যে গীতাঞ্জলি ১৯১৩ সালেই অনূদিত হয়েছে; উল্লেখযোগ্য যে সেই সকল সুইডিশ ও ডাচ্ অনুবাদ ছাড়া আর অন্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি; ইতালীয়ান ও জার্মান অনুবাদ বেরিয়েছে ১৯১৪ সালে. স্প্যানিশ অনুবাদ ১৯১৫ সালে। তারপর ১৯২০-তে 'প্রেমের মালী' আর 'ফলের ঝুড়ি' এবং ১৯২২-এ 'কবীরের কবিতা গুচ্ছ'। ১৯২২ সালেই প্রকাশিত হয় আরেকটি কাব্য সংকলন 'লা ফুজিতিভ'—যার অনুবাদিকা ইংরেজী সংকলনের কিছুটা বাদ দিয়েছেন এবং যোগ দিয়েছেন কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা. যেগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে বেরোয় 'উদীয়মান চন্দ্র', ১৯৩০-এ কণিকা। ১৯২৩ সালে মূল থেকে 'বলাকা'র অনুবাদ করে প্রকাশ করেন কালিদাস নাগ ও কবি পিয়ের জাঁ জুভ [ফরাসী নাম 'রাজহংস']—ইংরেজী অনুবাদের ৩২ বছর পূর্বে। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের কোনো "উত্তর কাব্যের" ফরাসী অনুবাদ হয়নি।

আর আছে জীবনস্মৃতি [১৯২৪] এবং ছেলেবেলা [১৯৬০], কবিধর্ম [১৯২৪] অর্থাৎ 'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি' এবং মানবধর্ম [১৯৩৩] আর 'বন্ধুর কাছে পত্রগুচ্ছ' [১৯৩১]।

যে তিনটি গ্রন্থ মূল থেকে অনূদিত হয়েছে [একটি কাব্য. একটি নাটক একটি গল্প সংকলন] সেগুলি একজন বাঙ্গালী আর একজন ফরাসীর যুগ্ম প্রচেষ্টা। আজ পর্যন্ত কি বাঙ্গালী কি ফরাসী কোনো অনুবাদকই একা মূল ভাষা থেকে প্রত্যক্ষ অনুবাদে হাত দেন নি। তবে 'সিলভাঁ লেভি' ১৯৩৮ সালে পাঁচটি অপ্রকাশিত কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য সিলভাঁ লেভি নয়. লেসনি-ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিদেশী অনুবাদক। এদিকে লেভি সাহেব শান্তিনিকেতনের প্রথম বিদেশী অধ্যাপক; তিনি শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সালে আসেন. তাঁর পরে আসেন চেক-দেশীয় M winternits ও V lesny. নরওয়ে-দেশীয় S konov, হাঙ্গারিয়ান Germanus এবং C formichi ও G Tucci.

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত "লা প্রাঁস শার্মা" প্রভৃতি কোনটি গল্পকে মৌলিক ফরাসী রচনা বলা যেতে পারে। মৌলিক এই অর্থে যে ১৯২০ সালে ফ্রান্সে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলিকে অনুবাদিকা আন্দ্রেই কার্পেলেস্-এর কাছে ইংরেজীতে ডিক্টেট্ করেছিলেন।

পুনশ্চ

গতকাল তিনকড়িবাবুর সঙ্গে পড়িয়াহাট বাজারের কাছে দেখা: আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। লক্ষ করলাম তাঁর বাড়িটির নাম কিন্তু রবীন্দ্রানুসরণে 'মালঞ্চ' কিংবা 'চৈতালি' রাখেন নি, রেখেছেন 'সুইট হোম'; আর তাঁর তিন-তিনটি কন্যার নাম—না, 'চিত্রা' নয়, 'মানসী' নয়, 'বলাকা' নয়, রুবি, পলি আর ডলি। দু বছরের ডলির সঙ্গে ভাব করে বললাম, 'বলো তো খুকুমণি ঐ ছড়াটা—কান্তবুড়ির দিদি শাশুড়ির পাঁচ বোন...

হি হি করে হেসে উঠে বড় মুজন বলল, 'ও আবার কি ছড়া, ফাদার?...বল্ তো ডলি. শুনিয়ে দে ফাদারকে তোদের বইয়ের কবিতাটা : হাম্পটি ডাম্পটি স্যাট্ অন্ এ ওআল্...।

প্রেস্টিজ
নিশ্চিতরূপে
সারা জীবন
টিকবে

সুঘরনীর ঘরকন্নায় প্রথমেই চাই প্রেস্টিজ

Prestige

সবচেয়ে নিরাপদ : নিরাপত্তার সবচেয়ে বেশী ব্যবস্থা আছে ব'লেই।

অনেকটা জায়গা : আপনার নিজের রান্নার পাত্র বা স্টীম-ইট-এর জন্য।

সার্ভিস : বিক্রীর পর সারাভারতে সার্ভিসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সঠিক সাইজ

সময় বাঁচায়

ইন্ধন বাঁচায়

দেশের ক্রেতাদের জন্য   বিদেশে রপ্তানীর জন্য

বিনামূল্যে আপনার সুবিধার জন্য, একটি বাড়তি রাগ ও পিস্টন এবং রন্ধন প্রণালীর একটি বই কার্টনের ভেতরে ক'রে দেওয়া আছে।

তৈরী করেছেন :
টি টি (প্রাইভেট) লিমিটেড
বাঙ্গালোর—১৬

ইস্ট জোন ডিস্ট্রিবিউটর্স—মেসার্স বালুভাই অ্যাণ্ড রাবার্স, ৮৭ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

(বাইশ)

শাশ্বতীকে বাস-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে বলে ললিত তার সঙ্গে বেরিয়েছিল। গলির মুখটায় এসে রমেনের কথা মনে পড়ল। রমেনকে চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছিল, ততক্ষণ সে একা বসে আছে। শাশ্বতীকে বলল—দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আমার এক বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই। খুব অদ্ভুত বন্ধু—সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী?

—হ্যাঁ, ওর বউ পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই—

—আহা রে! বউ পালাল কেন?

—কি জানি! ওর বউ ইরা ভাল মেয়ে ছিল না।

শাশ্বতী তার ঝকঝকে ছোটো ছোটো দাঁতে নীচের নরম ঠোঁট কামড়ে ধরল। ও জানে না ঐ ভঙ্গীতে ওকে কত সুন্দর দেখায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—পালানো কি খারাপ? আমিও তো গতকাল পালিয়ে এসেছি।

কথাটায় ললিত একটু বিচলিত হল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আপনি ঠিকই করেছিলেন। আদিত্য তো আপনার ইয়ে ছিল না—

—ছিল না ঠিক। কিন্তু আর একটু হলেই কালকের ব্যাপারটা হয়ে যেত। আর তারপর যদি আমি পালাতাম তাহলে লোকে আমার নিন্দে করত না? ও হয়ত সন্ন্যাসীও হয়ে যেত আর তখন আপনিও হয়ত বলতেন—ঐ বাজে মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। এ রকমই তো হয় সব ব্যাপার, লোকে ভিতরের কথা না জেনে নিন্দে করে—

ললিত এ কথার উত্তর দিল না। জিজ্ঞেস করল—আর একটু হলেই কালকের ব্যাপারটা হয়ে যেত কেন? আপনি কি সই করতেন?

একটুও দ্বিধা না করে ঘাড় হেলিয়ে শাশ্বতী বলল—করতাম। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, সই না করলে আপনারা ভয়ংকর কিছু একটা করবেন। ঐ বিশ্রী ঘরটায় আমার দম আটকে আসছিল। আপনাদের হাত থেকে ছুটি পাওয়ার জন্য তখন আপনারা যা বলতেন তাই করতাম। তারপর বাড়িতে ফিরে এসে কী করেছি বুঝতে পেরে কাঁদতে বসতাম। তখন আমার একদম জ্ঞান ছিল না। আপনাদের সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বন্ধু—কী যেন নাম!

—বিমান।

—হ্যাঁ। উনি বের করে আনার পরও আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি সত্যিই সই করেছি কিনা।

ললিত কেঠো হাসি হেসে শুকনো মুখে বলল—আমরা বলেছি বলেই আপনি সই করতেন? কেন আপনার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই? পছন্দ না হলে কেন সই করবেন আপনি?

—বাঃ, আপনিই তো তখন সবচেয়ে বেশী জোর করছিলেন! কেমন পাগলাটে দেখাচ্ছিল আপনাকে। মাথার চুল উড়ছে, জল টকটক করছে মুখ, চোখ জ্বলছে—আপনাকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিলাম। আদিত্যকে আমি চিনি, ও খুবই ভালমানুষ। কখনো খুন জখম কিছু করতে পারে না। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আপনি রেগে গেলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতে পারেন।

—কী কাণ্ড?

—হয়তো—হয়তো—খুন করতে পারেন আমাকে।

লাজুক মুখে একটু হাসল ললিত। বলল—মানুষ তো নিজের মুখ দেখতে পায় না, কাল আমাকে কী রকম দেখাচ্ছিল কে জানে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি মনে মনে বোধ হয় কখনো চাইনি যে, আপনি সইটা করুন।

—চাননি? শাশ্বতী অবাক হয়।

ললিত মাথা নাড়ল—না। আমি মনে মনে চাইছিলাম, যেমন করে হোক আপনি ঐ ঘটনাটা থেকে বেঁচে যান। আমার ঐ চাওয়াটা এত খাঁটি ছিল, এত তীব্র যে, ভগবান আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমি অবশ্য ভগবান মানি না, কিন্তু দৈব বলে একটা কিছু আছেই। নইলে হঠাৎ উটকো বিমানকে কেন আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম? ও যদি সঙ্গে না থাকত তাহলে—আপনি যেমন কমজোরী মেয়ে—ঠিক সই করে ফেলতেন! কেউ বাঁচাতে পারত না। আমি তো নয়ই। কারণ, বিয়ের প্ল্যানটা আদিত্যকে দিয়েছিলাম আমিই। ও প্রথমে বিয়ের কথা শুনে বলেছিল যে, আপনি রাজী হবেন না। তখন আমি আপনাকে রাজী করানোর ভার নিয়েছিলাম, আমিই পছন্দ করে ওর জামা-কাপড়, ফুল আর আপনার জন্য শাড়ি কিনলাম, আপনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ট্যাক্সিতে তুললাম, সঞ্জয়কে সাক্ষী যোগাড় করে—এত সব করেছি আমি—কিন্তু সারাক্ষণ আমার মন চাইছিল— যাক্ গে, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন?

শাশ্বতী হাসছিল। মৃদু চিকমিকে হাসি। মাথা নেড়ে বলল—বিশ্বাস করেছি।

—আর, কন্যা?

শাশ্বতী হাসিমুখে অনেকখানি ঘাড় হেলিয়ে বলল—করেছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—আপনি কেন আমাদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন জানি।

—কেন?

—আদিত্য আপনাকে কোনো গোলমেলে কথা বলেছিল আমাকে নিয়ে। না?

ললিত মাথা নাড়ল।

শাশ্বতী গলা নীচু করে বলল—কিন্তু আমাকে বাঁচাতেও চেয়েছিলেন কেন?

প্রশ্নটার জন্য একদম তৈরী ছিল না ললিত। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

এখন তার সামনে জীবন্ত, তরতাজা এক দৃশ্য। ঘন চুলের ভিতর থেকে ঝিকমিক করছে কানের রিং, পরনে কালো হলুদের সুন্দর কটকী শাড়ি, নিকোনো উঠোনের মতো পরিষ্কার ব্রণহীন মুখখানা। যদি এখন ললিত ওকে ভালবাসার কথা বলে তাহলে লাজুক মুখ নামিয়ে সম্মতির হাসি হাসবে। এতক্ষণের হাসি খুশী আর আনন্দের ভাবটা হঠাৎ মুছে নিল শোষা-কাগজের মতো এক বিষাদ। সত্যিই তো! সে কেন চেয়েছিল শাশ্বতীর বেঁচে যাওয়া? তার তাতে কী লাভ? আদিত্যকে ছেলেবেলা থেকে চেনে ললিত। ফূর্তিবাজ আমুদে ছেলে, দরাজ সরল মন—তার সঙ্গে শাশ্বতীর বিয়ে হলে ক্ষতি কি ছিল? তবু তার মন চায়নি বিয়েটা হোক, বিশেষত ঐভাবে ঐ খুপোটে ঘরে সরকারী ভাষায় আধুনিক মন্ত্রপাঠ করে। সে চায়নি এই কাটা কাটা মুখের শ্যামলা রঙের মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাক। কিন্তু কেন? কী লাভ তার?

ললিত চোখ ফিরিয়ে নিতেই শাশ্বতী বলল—আমি কিন্তু জানি।

বড় সরল, বোকা মেয়েটা। কী জানো তুমি? যদি জানো, তবে বলো না কোনোদিন।

—কই, আপনার বন্ধু—সেই সন্ন্যাসী?

ললিত গিয়ে দেখল দোকানে একা বসে আছে রমেন, আর দোকানের মালিক গণেশ তার জগুবাজারের তুলোর কারবার কী করে বিলেৎ-বাকি পড়ে ফেঁসে গেল সেই গল্প রমেনকে শোনাচ্ছে। খুব মন দিয়ে শুনছে। রমেন। ললিত রমেনকে ডেকে আনল।

—এই আমার বন্ধু রমেন, আর ইনি শাশ্বতী ব্যানার্জি।

ললিতের লজ্জা করছিল। রমেনটা কী ভাববে কে জানে! কিন্তু শাশ্বতীর এর বেশী পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। আর কিছুদিন আগে হলে সে বলতে পারত—ইনি শাশ্বতী যার সঙ্গে আদিত্যর বিয়ে হবে। কিংবা সে যদি সুস্থ স্বাভাবিক হত তাহলে হয়ত এমন কথাও বলা সম্ভব ছিল—এই শাশ্বতী যাকে আমি বিয়ে করব।

রমেনকে সরল একটা প্রশ্ন করল শাশ্বতী—আপনি সন্ন্যাসী?

রমেনকে ম্লান একটু হসল, বলল—না তো।

—নন?

রমেন মাথা নাড়ল—না।

—তবে?

রমেন এইসব প্রশ্নের সামনে বরাবর মুশকিলে পড়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

শাশ্বতী বলল—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ এসেছি। এবার যাই।

—তাহলে চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।

তিনজন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। আনোয়ার শা রোডের মুখ পর্যন্ত এসে হাঁপিয়ে গেল ললিত। লক্ষ করে শাশ্বতী বলল—আপনারা ফিরে যান। আমি তো রাস্তা চিনি, যেতে পারবো।

রমেন বলল—তুই যা, আমি এগিয়ে দিয়ে আসছি।

ক্লিষ্ট একটু হেসে ললিত দাঁড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে এল আস্তে আস্তে।

শাশ্বতী শুনেছে, ক্যান্সার হলেও কেউ কেউ বেঁচে যায়, যেমন তার মেসোমশাই বেঁচে আছেন। ও কি বেঁচে যাবে! মৃত্যুর মুখোমুখি ও এখন বড্ড একা। একা বলেই মাঝে মাঝে নিজের ওপর রেগে যায়। গত-কাল ওকে লক্ষ করেছে শাশ্বতী। একদম পাগলের মতো দেখাচ্ছিল—ওর মন চাইছিল না, তবু জোর করে শাশ্বতীকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। জানে মরে যাবে—তাই ওর খুব অহংকার, শাশ্বতীকে অবহেলা করেছিল। কিন্তু শাশ্বতীর একটুও রাগ

নেই। পুরুষমানুষকে বুঝতে এক মিনিটও সময় লাগে না। গতকাল অত সব পাগলগুলোর মধ্যেও ললিতকে বুঝে গিয়েছিল শাশ্বতী। এ কি মরে যাবে! কেন মরে যাবে? ক্যান্সারের তো অষুধ বেরিয়েছে, শাশ্বতী পড়েছে কাগজে।

রমেন হাত ধরে শাশ্বতীকে রাস্তার ধারে সরিয়ে আনল। পিছনে অনেকক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছিল একটা গাড়ি, শাশ্বতী শুনতে পায়নি। সে একটু লাজুক হাসল। যতক্ষণ ললিত সামনে ছিল ততক্ষণ লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করেনি শাশ্বতী। এখন লক্ষ করে দেখল লোকটা একটা থামের মত বড়। গায়ের ফর্সা রঙ থেকে রোদ ঠিকরে আসছে। সুন্দর চেহারা, কিন্তু পোশাকের কোনো যত্ন নেই। পরনে একটা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। লোকটা বোধ হয় কখনো খেয়াল করে না যে সে কতখানি সুন্দর। শাশ্বতীর ভাল লাগল যে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে অসাবধানে হাঁটছিল বলে লোকটা তাকে একটুও ধমক দিল না, উপদেশও দিল না। শুধু হাত ধরে সরিয়ে এনে আবার নির্বিকারভাবে হাঁটছে। যেন দরকার হলে আবার হাত ধরে সরিয়ে আনবে, ধমক বা উপদেশ দেবে না।

শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল—বললেন না তো আপনি সন্ন্যাসী কিনা!

রমেন শান্তভাবে বলল—না।

শাশ্বতী তার দাঁতে ঠোঁট টেপা সুন্দর হাসিটা হাসল, বলল—কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী হলে খুব ভাল হত।

—কেন?

—সন্ন্যাসীদের তো অনেক তুকতাক তন্ত্র-মন্ত্র জানা থাকে। আমি আপনার কাছ থেকে ক্যান্সারের অষুধ জেনে নিতাম।

রমেন একটু হাসল।

শাশ্বতী চিন্তিত মুখে বলল—কিন্তু যতদূর মনে হয় আমি কাগজে দেখেছি ক্যান্সারের অষুধ বেরিয়েছে। তাই না?

রমেন মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, বেরিয়েছে।

শাশ্বতীর মুখ সামান্য উজ্জ্বল দেখাল। বলল, আপনিও দেখেছেন না?

রমেন একটু চিন্তা করে বলল—দেখেছি বোধ হয়।

—বেরিয়েছে। শাশ্বতী হঠাৎ নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল—আমি জানি।

রমেন একটুও হাসল না। খুব গম্ভীর-ভাবে বললল—আমি অবশ্য একটা টোটকা অষুধের কথা জানি।

—কী সেটা?

হাঁটতে হাঁটতে বাস-রাস্তায় এসে গিয়েছিল তারা। রমেন বলল—আর একদিন বলা যাবে। ঐ আপনার বাস-স্টপ্।

—না, আপনি বলুন। অধৈর্যের স্বরে বলল শাশ্বতী। এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে বলল—ঐখানে একটা রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছে। চলুন, একটু বসি।

রমেন একটু ইতস্তত করে বলল—আমি রেস্টুরেন্টে কিছু খাই না।

—আচ্ছা, আমি চা খাবো। আপনি বসবেন। চলুন।

সকাল সাড়ে দশটার রেস্টুরেন্টটা খুব ফাঁকা ছিল না। কয়েকজন ইতর ধরনের ছেলে ছোকরা এদিক ওদিক বসে আছে। কেউ জোরালো শিস্ দিচ্ছে, তার সঙ্গে টেবিলে আঙুল ঠুকে তবলা বাজানোর শব্দ। দেখেশুনে মুখ শুকোলো শাশ্বতীর। বলল—এখানে হবে না। বড় বাজে জায়গা।

—সব জায়গাই এরকম। আসুন, কোনো ভয় নেই।

ভিতরটা নোংরা অন্ধকার। ছেলে-ছোকরারা লম্বা একটা টেবিল দখল করে রেখেছে, বাদবাকী রেস্টুরেন্টটা ফাঁকা। এরা আড্ডা দেয় বলেই বোধ হয় এখানে তেমন খদ্দের আসে না। যে দোকানে একবার এ ধরনের আড্ডা বসে সে দোকান আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়, টিম্ টিম্ ক'রে চলে।

—ইস্, কী অসভ্যের মতো তাকাচ্ছে! ফিস ফিস করে শাশ্বতী বলল।

—আপনিও তাকান। ভয় পাবেন না।

—যাঃ।

রমেন তার সরল সুন্দর চোখে তাকিয়ে ছিল ছেলেগুলোর দিকে। প্রায় নিষ্পলক-ভাবে।

শাশ্বতী ফিস্ ফিস্ করে বলল—কী করছেন! ওরা ভীষণ বাজে।

সে কথায় কান দিল না রমেন। তাকিয়েই রইল। ব্যাপারটা খুব আস্তে আস্তে ঘটতে লাগল। কালো কোলো, রঙচঙে জামা প্যান্ট পরা ছেলেগুলো ঘন ঘন তাকাচ্ছিল তাদের দিকে। হাসছিল, গা টেপাটেপি করে নীচু স্বরে কথা বলছিল। তারা কিছুক্ষণ রমেনকে লক্ষ করল, তার চোখের দৃষ্টি ফেরত দিল সমানে সমানে। একজন বলল—মাইরি, আমাদের ভস্‌্মো করে ফেলবে। তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা লড়াইটা তারা হারতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আর কেউ তাকাচ্ছিল না, নিজেদের আড্ডায় ডুবে গেল।

রমেন শাশ্বতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল—চোখের একটা কোনো শক্তি আছে। আপনি যদি কখনো ঐ সব ছেলের চোখে সাহস করে চোখ রাখেন তবে দেখবেন এরা সেটা সহ্য করতে পারে না। তবে খুব সরলভাবে তাকাতে হয়, রেগে গিয়েও নয় আবার ভয়ে ভয়েও নয়—

—কিন্তু, অষুধের কথাটা!

রমেন মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। সেটাও চোখের অসুখ ছিল। আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন প্রায় অন্ধ মানুষ। দাদু সেই অসুখটা

জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তাঁকে চশমার সংগে আতসকাচ কিংবা দূরবীন ব্যবহার করতে হত। আবার দাদুর দুই ছেলে, আমার বাবা আর জ্যাঠামশাই, আর এক মেয়ে, আমার পিসীমা—এদেরও বয়স তিরিশ পেরোনোর আগেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করল। আর চল্লিশের আগেই সকলের অন্ধ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেই সময়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল আমাদের বিরাট বিষয় সম্পত্তি, বাড়ি, বাগান, খাজনার হিসেব এ সবের দেখাশোনা নিয়ে। কে এসব দেখে? আমার ঠাকুমা বরাবর ভিতর বাড়িতে থাকতেন, বাইরে বেরোতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বাবার চোখ খারাপ হতে শুরু করল তখন ঠাকুমাকে বেরোতে হল। আর, আশ্চর্যের বিষয় যে ঠাকুমা খুব অল্প দিনেই সব বুঝে সুঝে নিলেন। খুব নিখুঁত ভাবে—এমন কি দাদুর চেয়েও ভালভাবে তিনি জমিদারি চালাতেন। আমাদের বিরাট বাড়ি, বাগান-সম্পত্তি, সব কিছুর ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ছিল। সকলের দেখা তিনি একা দেখতেন। তাই এত তীক্ষ্ণ হয়েছিল তাঁর চোখ যে বাগানের একটা ফুল কেউ তুললে তিনি টের পেতেন, গাছের একটা পাতা পড়ে গেলেও তাঁর চোখ এড়াত না। প্রতিটি প্রজার মুখ তাঁর মনে থাকত। আমাদের বাড়ীর অজস্র সিন্দুক, আলমারি আর বাক্স প্যাঁটরা ছিল—ঠাকুমা সেগুলোর তালা একবার চাবি ঢুকিয়ে খুলতেন, কখনো কোন তালার কোন চাবি তা ভুল করতেন না। এইভাবে সারাদিন চোখ ব্যবহার করতে করতে তাঁর চোখ ভয়ংকর তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, আর বিষয়সম্পত্তির ওপর তাঁর ভয়ংকর একটা ভালবাসা চলে আসে। এর পর ঠাকুমা যখন মারা যান তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। তাঁর উদুরি হয়েছিল। তার ওপর গায়ে জল এসেছিল, একটা পা গ্যাংগ্রীন হয়ে পচে গোড়ালির হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুমা মরছিলেন না। একদিন দুদিন করে একমাস দুমাস বেঁচে রইলেন। ঐ ফোলা পচা গলা শরীরের মধ্যে একমাত্র তাঁর চোখ দুটোই ছিল দেখবার মতো। সেই বড় বড় চোখ, সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একইরকম ছিল, রোগের যন্ত্রণা সেগুলিকে একটুও ছোঁয়নি। কেবল বলতেন—আমি মরে গেলে এত সব কে দেখবে? বোধ হয় সেই কারণেই ভীষণ ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি বেঁচে রইলেন আরো সাত আট মাস। সেই বেঁচে থাকটা দেখার মতো ছিল। তারপর একদিন দুপুরবেলা আমার জেঠীমা ঠাকুমার শিয়রের দিকের আলমারী খুলে কী যেন বের করতে গেছেন, ঠাকুমা ঘাড় উল্টে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বড়বউ, কী নিচ্ছ? ব্যাস, ঐ অবস্থায় তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমরা চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। ঘাড় উল্টে

ঠাকুমা এত বড় বড় চোখে আলমারিটার দিকে চেয়ে আছেন—একেবারে জীবন্ত মানুষের মতো খোলা চোখ, কেবল হাঁ-করা মুখের মধ্যে এলিয়ে থাকা জিবটা দেখে বোঝা যায়, ঠাকুমা বেঁচে নেই। সেই খোলা চোখ বন্ধ করতে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। যতবার বুজিয়ে দেওয়া হয় ততবারই আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে যায়, আর ঠাকুমা তাকিয়ে থাকেন।

—আহা। স্বভাবত কোমল মন শাশ্বতীর। তার চোখ ছলছল করে।

—অসুখের কথাটা কী জানেন? ঠাকুমা মরে যাওয়ার পর আমি অনেক ভেবে দেখেছি ঠাকুমার যে মরতে অত সময় লেগেছিল তার একটা কারণ হচ্ছে ঐ বিষয় সম্পত্তির প্রতি ভালবাসা। বিষয় সম্পত্তির প্রতি বেশী টান ভালবাসা আমরা ভারতীয়রা পছন্দ করি না,—কিন্তু তবু বিষয়সম্পত্তির মতো খারাপ জিনিসের প্রতি ঐ ভালবাসাও ঠাকুমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাহলে দেখুন, ভাল কিছু সৎ কিছুর প্রতি যদি মানুষের ওরকম তীব্র ভালবাসা হয়, আর তাকে রক্ষা করার জন্য যদি মানুষ সজাগ হয়ে ওঠে তাহলে তার আয়ু বেড়ে যাবে না? শুধু আয়ু নয়, তার চোখের দৃষ্টি বেড়ে যাবে, বাড়বে শ্রবণ-ক্ষমতা, বেড়ে যাবে স্মৃতি শক্তি কিংবা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। তখন আর পাঁচজন যা দেখে না, যা শোনে না তার সব সে দেখতে বা শুনতে পাবে। তাই না?

অনেকখানি ঘাড় হেলাল শাশ্বতী, বলল—ঠিক।

তারপর একটু ইতস্তত করে বলল—তাহলে আপনি বলছেন, আপনার বন্ধুর অসুখটা সেরে যাবে?

মিটমিট করে একটু হাসল রমেন, বলল—আপনার কী মনে হয়?

গূঢ় প্রশ্ন। শাশ্বতী এর উত্তর জানে না। ললিতের উজ্জ্বল চোখ। মুখখানা সে নিশ্চক্ষে দেখতে পায়। মৃত্যুর মুখোমুখী একা একটা লোক। রাগী। শাশ্বতীকে জোর করে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায় ও। দুর্বল—শাশ্বতীকে ভালবাসে—কিন্তু সেটাকে স্বীকার করতে চাইবে না, এমন অহংকারী! রমেনের সুন্দর সরল মুখখানার দিকে চেয়ে শাশ্বতীর ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। রমেনের প্রশ্নটার কোনো উত্তর দেয় না শাশ্বতী, কিন্তু হঠাৎ স্খলিত গলায় বলে—আপনি ওকে বাঁচিয়ে দিন।

এই থামের মতো প্রকাণ্ড লোকটার সামনে কথাটা বলতে একটুও লজ্জা করে না শাশ্বতীর।

রমেন একটা নিশ্বাস ফেলল। এক কাপ চা সামনে জুড়িয়ে যাচ্ছিল। শাশ্বতী তাড়াতাড়ি দু একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে উঠে পড়ল, বলল—অনেক বেলা হয়ে গেছে—

রাস্তায় এসে শাশ্বতী বলল—আপনি একটা কথা কাউকে বলবেন না।

—কী কথা।

—আমি ওকে ভালবাসি।

রমেন মাথা নাড়ল—বলব না।

বাস স্টপের ভীড় থেকে একটু আলগা দাঁড়াল দুজন। শাশ্বতী হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে মাথা উঁচু করে রমেনকে দেখল। তারপর বলল—আপনি বরং ওকে বলবেন।

—কী?

শাশ্বতী লাজুক মুখ নামিয়ে বলল—বলবেন যে আমি ওকে ভালবাসি।

তারপর একটু ইতস্তত করে শাশ্বতী বিরক্ত মুখে বলল—আমাকে যদি ও ভালবাসে তাহলে হয়ত—আপনি যা বললেন সেরকম—ওর আয়ু বেড়ে যেতে পারে—

রমেন একটু হেসে মাথা নাড়ল—না। মেয়েদের ভালবাসা তো সোজা। সে ভালবাসায় লাভ নেই। বরং মেয়েদের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মধ্যে মৃত্যুপ্রেম জাগিয়ে দেয়।

—সে কী?

রমেন শান্তভাবে বলল—আপনি যে কোনো প্রেমের কবিতা পড়ে দেখবেন, কিংবা প্রেমের গল্প উপন্যাস, তাতে দেখবেন মৃত্যুর কথা কিছু না কিছু থাকবেই। যারা প্রেম-প্রেম করে তাদের কথাবার্তা শুনে দেখবেন, তারা দু দশটা কথার পরেই একে অন্যকে বলছে—আমি যদি মরে যাই তাহলে তুমি কী করবে? মৃত্যুর চেতনা ছাড়া কিছুতেই প্রেমকে মহৎ করা যায় না। ওরকম প্রেমে কি আয়ু বাড়ে?

—তবে? কাকে?

রমেনের মুখে উত্তরটা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে উচ্চারণ করল না। 'ঈশ্বর' শব্দটা উচ্চারণ করার একটা বিশেষ সময় আছে, নইলে তা মানুষের মনে তরঙ্গ তোলে না। বরং শুনে মানুষ হেসে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কখনো কখনো এক একটা বিশেষ সময় যখন মানুষ রেললাইনের ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে থাকে রেলগাড়ির প্রতীক্ষায়, যখন জলপ্লাবনে ছেলে কোলে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, কিংবা যখন—। তাই রমেন কথা বলে না। একটু হাসে মাত্র।

শাশ্বতী মুখ তুলে রমেনের উজ্জ্বল চোখ দুখানা দেখল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—আপনার কখনো চোখের অসুখ হয়নি?

—না। বলে মাথা নাড়ল রমেন, তারপর একটু চুপ করে থেকে দুষ্টু ছেলের মতো হেসে বলল—কিন্তু একবার আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য... কিন্তু ঐ আপনার বাস এসে গেল।

ক্রমশ

শ্যামদেব

ইতিহাস আমাদের একটা অনেক বড় শিক্ষা দেয় সে শিক্ষা হচ্ছে কোনও কিছুকেই অবহেলা না করা। এ যুগে কোনটা অতি সাধারণ পরের যুগে সেটার কতটা মূল্য স্থির হল;— এসবও বটে— এক যুগে যেটা অবহেলা, অনাদর ছাড়া কিছুই পায়নি, পরের যুগে তা গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে বসেছে। অতএব কোনটার কি মূল্য তা কে স্থির করবে? আমার মনে হয় মূল্যায়ণের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক যুগে যে বিবর্তন ঘটছে তার বিবিধ লিখিত পরিচয় থাকা দরকার। এ যুগের কাব্যসঙ্গীত, এ যুগের মার্গ সঙ্গীত, এ যুগের লোকসঙ্গীত— এ সব বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি রচিত হচ্ছে ভবিষ্যতে সেইগুলিই হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান। এসব গ্রন্থের আমরা তেমন মূল্য দিই না, ভাবি এসব লেখা আনাড়িদের জন্য —পড়ে যদি লোকে কিছু দেখে শিখুক। এসব বই-এর তেমন সমালোচনা বা আলোচনা কোনটাই হয় না—ভুল ভ্রান্তি সবই থেকে যায়। এই কারণে সঙ্গীতের টেক্‌স্‌ট্‌ বই আমাদের দেশে উঁচুদরের নয়। ঠিক তেমনি, সমসাময়িক সঙ্গীতশিল্পী বা গীতকারদের জীবন কাহিনী, যা পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তার বিশেষ গুরুত্ব আমরা দিই না, বোধ হয় এই সব পরিচিতির মূল্য বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশী নয়। অথচ এমন একটা সময় আসতে পারে যখন এঁদের মধ্যে কারুর জীবনী বা প্রচেষ্টার কথা জানবার প্রয়োজন খুব বেশী হতে পারে। যা আমরা নিত্য চোখের ওপর দেখছি তা এত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ যে তা নিয়ে লেখবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি না, আর লেখা হলেও তাকে অতি সাধারণ বলে অবজ্ঞা করি। এই দৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ দৃষ্টি কিন্তু আমার মনে হয় যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁদের আরও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

বিবর্তন বস্তুটা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে কিন্তু তাকে আমরা তেমন করে বোধ করতে পারি না। হঠাৎ এক সময় ঘটনাক্রমে অনুভব করি নিত্যকারের প্রত্যক্ষ বিষয়ে কখন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সে পরিবর্তন বড় কম নয়। তখনই আমাদের মনে ঔৎসুক্য জাগে, অনুসন্ধিৎসা জাগে কেমন করে এই পরিবর্তন ঘটল। তখনই আমরা এই আবশ্যকতা বোধ করি যে একটা ধারাবাহিক বিবরণ বা ইতিহাস থাকলে ভাল হত যা আমাদের অনুমানের পরিপূরক হতে পারত। গত কয়েক বৎসরে সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে আত্মকাহিনী, স্মৃতিকথা বা তাঁদের সমসাময়িক বিবিধ বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এই সব রচনার মূল্য অসামান্য কারণ সাহিত্যের বিবর্তন সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করবেন তাঁদের এই সব লেখা দেখতেই হবে এবং তাই থেকেই অগ্রগতির মূল্যায়ণ করতে হবে। এই ধরনের রচনাকে মূল্য রচনা বলে লঘু জ্ঞান করলেও বহু দিক থেকে এর গুরুত্ব আছে। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক যখন তাঁর কাহিনী লিখতে বসেন তখন তাঁর লেখায় সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ বা চলমান জীবনধারার বহু চিত্রও তো প্রতিফলিত হয়। বর্তমানে অভিনয় জগতের কেউ কেউ আত্মকাহিনী রচনা করেছেন। সেগুলিতে যে কেবল অভিনয়ের কথাই বিবৃত হয়েছে এমন নয় সমগ্র নাট্য সমাজের কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। এইভাবেই সাঙ্গীতিক বিবরণ বড় একটা লেখা হয়নি, কিন্তু লেখা হলেই ভাল হত, সঙ্গীত জগতের বহু বিষয় সেই সব লেখা থেকে পাওয়া যেত।

গত যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের সঙ্গীত সম্মেলনের পার্থক্যের কথাই ধরা যাক। এ পার্থক্য বড় কম নয়। মাত্র দু-এক দশকের ব্যবধান অথচ গায়ন ও বাদন পদ্ধতিতে কী বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এস্থেটিক্সের বিচার আলাদা কিন্তু পরিবর্তন যে হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না এবং এটাও সত্য যে এই পরিবর্তন বিবর্তনগত। এই বিবর্তনটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি বলে বহু প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় না কিন্তু যদি কেউ তিরিশ বছরের ব্যবধানে নতুন করে একটা সম্মেলনে হঠাৎ এসে পড়তেন তাহলে প্রথম শ্রেণীর কোনও অনুষ্ঠানে তিনি বিস্ময়কর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতেন এটা ঠিকই। এই দুটি যুগের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা যখন আরও অনেক ব্যাপ্তি লাভ করবে তখন এই ধারাবাহিক রচনা পাওয়া যায় না বলে অনেককে আফসোস করতে হবে। সম্মেলনের ইতিহাস মানেই সাঙ্গীতিক বিবর্তনের ইতিহাস।

প্রচলিত কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এইরকমই একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এইখানেও আমি এস্থেটিক্সের প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু কাব্যসঙ্গীতে যে নানাদিক দিয়ে নানা আন্দোলন ঘটেছে—এটা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্যবসায়ীদের প্ররোচনা যতই থাকুক না কেন, গান রচিত হয়ে চলেছে এবং লোকে তা শুনছে তো বটে। এর মধ্যে অনেক গান রসোত্তীর্ণও হচ্ছে। সঙ্গীতের ইতিহাসে এই শিল্পকৃতের মূল্য কতখানি সে বিচারও নিশ্চয়ই হবে। অতএব নিরতিশয় অবজ্ঞা সহকারে "কিস্‌সু হচ্ছে না" কথাটা ঠুংরি সুরে চলতে পারে, কিন্তু কালের মানদণ্ডকে যাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তাঁরা নিরাসক্তি নিয়েই এ যুগের সঙ্গীতের বিচার করবেন। এ যুগের গায়ক, গায়িকা, গীতিকার সুরকার—এঁরা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেন এবং তার যথাযথ মূল্যায়ণ হয় তাহলে দেখা যাবে এঁদের অনেকেই কয়েকটি বিশেষ আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নিয়েই কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন। —হয়তো এর মধ্যে অনেক [illegible] আছে, কিন্তু একটা প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হবে না। ভবিষ্যতে এ যুগের কাব্যসঙ্গীত নিয়েও আলোচনা হবে এবং তখনকার জন্যও নির্ভরযোগ্য বিবরণী থাকা দরকার।

সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা আলোচনাই শুনি— সেই একই ভাললাগা আর মন্দ লাগার কথা, সেই কয়েকজন প্রখ্যাত সুরকারকে নিয়েই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা। কিন্তু সমগ্রভাবে সঙ্গীতকে বিচার, তাকে ব্যক্তিগত রুচির ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা খুব কমই দেখতে পাই। আমার মনে হয় আজ সেই সময় এসেছে যখন এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে পরিহার করতে হবে, একটা বিরাট শ্রদ্ধা নিয়ে কাজ করতে হবে যা সব প্রচেষ্টার মূল্যায়নে তৎপর হয় নতুবা সঙ্গীত সাহিত্যে কেবল স্তুতি, নিন্দা এই দুটি বস্তু থাকবে, নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ নিয়ে সঙ্গীতের ইতিহাস সংগঠিত হবে না।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী
সঙ্গীতাচার্য

তারাপদ চক্রবর্তী

"পিয়া মিলন কী আশ"—যোগিয়া রাগের বেদনা বিধুর সুরের মূর্ছনা মাঘের শেষ রাতের জনহীন রাজপথে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। রূক্ষ কঠোর পাহারাওয়ালা ভুলে গেছিল সদ্যলব্ধ শিকারকে থানায় নিয়ে যাবার সংকল্প। রাজপথে শুয়ে থাকার অপরাধে ধৃত কিশোরকে মুক্তি দিয়ে গেল সে গানে মুগ্ধ হয়ে। বিহারের কোন অখ্যাত গ্রামের সেপাইটি বোধ হয় সেদিন প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল আগামী যুগের এক অসাধারণ সংগীত প্রতিভাকে।

ফরিদপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের ছেলেটি ঘর ছেড়ে উধাও হয়েছিল কিসের এক তীব্র আকর্ষণে। সংগীত আর কাব্য-ব্যাকরণে ছিল তার জন্মগত উত্তরাধিকার। কিন্তু তবু গ্রামের সেই ছোট পরিবেশে তার মন ভরল না, সে পেতে চাইল সমুদ্রের স্বাদ।

অকূলে ভেসে পড়া সেই ছেলেটির প্রকৃত সংগীত জীবন শুরু হল কলকাতায় আসবার পর। নিঃসহায় কপর্দকহীন হয়ে মহানগরীর পথে পথে ঘুরে কেটেছে কতকাল; চরম হতাশা আর দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু দেখা দিয়েছে ক্ষণিকের সৌভাগ্য। মিলেছে আশ্রয়, —মিলেছে শিক্ষক। এরই মাঝে কিছুদিন সে যুগের বিখ্যাত সংগীতবিদ সাতকড়ি মালাকারের কাছে তালিম পেল তারপর পড়ল ছেদ, এলো আবার সেই অন্ধকার। কিন্তু তবু এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও উৎসাহে ভাটা পড়ল না তার। নতুন করে চলল আশ্রয় সন্ধান আর সেই সংগে সুর সাধনা। বিচিত্র সে সাধনা আর বিচিত্র সে সাধক। তাঁর কাছে একটি তানপুরা পর্যন্ত সে সময় স্বপ্নের ছিল। অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ শক্তি আর অপূর্ব কণ্ঠ, এই ছিল তার সে জীবনের পাথেয়। অবশেষে একদিন কাজ জুটল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে, তবলাবাদকের। গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটল, এবার তাই নতুন উদ্যমে শুরু হল সংগীত সাধনা সবার অলক্ষ্যে। বিধাতার কৃপায় এরই মধ্যে ঘটল এক অদ্ভুত যোগাযোগ। বেতারে সেদিন অনুষ্ঠান ছিল স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় দেখা গেল শিল্পী অনুপস্থিত। বিব্রত বেতার অধিকর্তা নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে ডাকলেন তবলা বাজিয়ে ছেলেটিকে। শোনা ছিল ছেলেটি নাকি একটু আধটু গাইতেও পারে। জিজ্ঞাসা করলেন তাকে যে একটু কিছু গেয়ে নির্ধারিত সময়টুকু ভরে দিতে পারে কিনা। গাইল সে আর তার ফল হল অভাবিত। সারা বাংলার রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে অভিনন্দন জানালেন এই নবাগতকে। বাংলা তথা ভারতের সংগীত ইতিহাসে সংযোজিত একটি নতুন নাম—'তারাপদ চক্রবর্তী।'

এর পর চলে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন আর সেই সংগে কঠোর সাধনা। কমলা বিমুখ রইলেন কিন্তু কৃপা করলেন বাগ্‌দেবী। বহু আকাঙ্ক্ষার পর প্রকৃত গুরুর সন্ধান মিলল এতদিনে। নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে প্রিয় শিষ্যকে দিলেন গুরু গিরিজাশংকর চক্রবর্তী। সে যুগে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা বললেই মনে আসত উত্তর ভারতের কথা। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস ছিল সংগীতের কেন্দ্র। বাংলার নিজস্ব যে ঘরাণা ছিল তা প্রধানত ধ্রুপদের। যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে তখন খেয়াল, ঠুংরীর প্রাধান্য এসেছে হিন্দুস্থানী সংগীতে। ধ্রুপদের গাম্ভীর্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে খেয়াল ঠংরীর সুললিত মাধুর্য। হিন্দুস্থানী গায়কেরা তখন সংগীত জগতের শিরোমণি, বাংলার ভূমিকা সেখানে গৌণ। তাই স্বভাবতই সংগীতের ছাড়পত্র পাবার জন্য বাঙ্গালী শিল্পীকে যেতে হত লক্ষ্ণৌ বেনারস, যেতে হত প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনে। হয়ত এই অবস্থা ব্যথিত করেছিল আচার্য গিরিজাশংকরকে। ব্যাকুল হয়ে তাই তিনি খুঁজছিলেন এমন একটি প্রতিভাকে যে সর্বভারতীয় সংগীতের দরবারে বাংলাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে

পারবে। গুরুর সে আশা বৃথা হয়নি। বাংলার বাইরে সারা ভারতে আজ তারাপদ চক্রবর্তী একটি নাম। আর প্রচার, প্রসার মান এবং বিচারে সঙ্গীতের পীঠস্থান বলে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা দেশ।

শিল্প সৃষ্টির মূল কথা হল সীমার মাঝে অসীমের আবাহন। ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ আর তালের বন্ধনের মধ্যে থেকেও শিল্পী আরাধনা করেন এই অসীমের, উপলব্ধি করেন তাকে। ধ্যানের মগ্নতার মধ্যে দিয়েই আসে এই ভাবরূপের উপলব্ধি।

সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর গানের মূল উপজীব্য হল এই ভাব। সুরের বিস্তার তাঁর কাছে এক আশ্চর্য সাধনা। সাতটি স্বর তাঁর কণ্ঠে যেন সাতটি দীপ হয়ে জ্বলে ওঠে আর সেই দীপের আলোয় ভাস্বর হয়ে ওঠে সুন্দরের শাশ্বত রূপ। শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতাও স্পর্শ পায় সেই অতিন্দ্রিয়ের, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, যে শুধু অনুভবের।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে এই সুরের ইন্দ্রজাল। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সংগীতপিপাসুরা তৃপ্ত হয়েছেন সঙ্গীতাচার্যের গানে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে বাংলার নবীন শিল্পীরা প্রেরণা পেয়েছে সাধনার। নিজের সঞ্চয় থেকে অকৃপণ হাতে বিদ্যাদান করেছেন তিনি। আচার্যের কাছে শিষ্যের সবার বড় যোগ্যতা তার একাগ্রতায়, তাই আর্থিক লাভ ক্ষতির প্রশ্ন কখনও বড় হয়ে ওঠে নি তাঁর কাছে।

ভারতজোড়া খ্যাতির এই শিল্পীর সংস্পর্শে এলে সম্ভ্রমের সঙ্গে মনে উদ্রেক হয় কিছুটা বিস্ময়ের। নিজের যশ এবং প্রতিভা বিশ্লেষণে নিস্পৃহ শান্ত এই মানুষটির চোখের কোণে মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় আগুনের কণা।

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কেন হবে না? বাঙালী শিল্পী কেন যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে না বাংলারই সঙ্গীতের আসরে —এমন করে নিজেদের আর কত অপমান করব আমরা? এই একটি প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে ওঠে স্বল্পভাষী মানুষটির কণ্ঠে।

—প্রতিবাদ, তাই ত' করে চলেছি, বাকী জীবন ধরে। যেখানে কেবলমাত্র বাঙালী হবার অপরাধে মর্যাদা খোয়াতে হবে, সেখানে যাবার দুর্ভাগ্য আমার যেন কখনও না হয়।—এই হল শিল্পীর সংকল্প।

শিল্পী হিসাবে জন্মভূমির সেবা তিনি করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। বাংলার সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন তিনি যৌবনকাল থেকে। তাঁর বাংলা গানে রাগ-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে লঘু সঙ্গীতের রসমাধুর্যের আর তা রূপ পেয়েছে তাঁরই রচিত বাংলা গীতি কবিতার মাধ্যমে। এখানে তিনি সফল সুরস্রষ্টা, গায়ক ও গীতিকার।

পরিণত তাঁর জীবনের সার্থকতার দিকটা। স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। কিন্তু সফলতার শিখরে পৌঁছতে কি অপরিসীম মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে সেটুকু না জানলে সঙ্গীতাচার্যকে সম্পূর্ণ জানা হবে না। যে কঠিন সংগ্রাম আর সুকঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে এই পরিপূর্ণতা এসেছে তা হয়ত সমসাময়িক সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। কিন্তু আশা করতে দোষ নেই যে, ভবিষ্যতে কালের সঙ্গীত-ইতিহাসকার সেই সমস্ত কাহিনী সযত্নে আহরণ করে তুলে রেখে দেবেন উত্তর কালের সংগ্রামী শিল্পীদের প্রেরণার জন্য।

রেখা বড়ুয়া
কলিকাতা-৪৫

ঘরে বাইরে

রাঙগা ইণ্ডিয়ানদের মেয়ে

এলেনা ওরফে ঝলমলে পালক বা Shining feather

ওর নাম হীন। আমাদের উচ্চারণে হীন যেরকম সেরকম নয়। হীন—অ। মানে বড় খুকী। ছেলেমেয়েকে বড়, মেজ, সেজ এইভাবে ডাকা বোধ হয় পৃথিবীর বহু জায়গায় আছে। নেপালীদের মধ্যে শুনে থাকবেন জেঠী, মাইলী ইত্যাদি নাম। কাঞ্ছী তো প্রায়ই শোনেন। মানে কনিষ্ঠা। হীন-দের তিন ভাইবোনের সঙ্গে দেখা হ'লো। হীন, হাগা, নাগে। হাগা ও নাগের মানেও ঐ রকম সেজ মেজ কিছু হবে। আমি গুলিয়ে ফেলেছি। ওরা অনেক ক'টি ভাই-বোন। এসেছে আসরে নাচতে। ওদের বাবা বেশী কিছু করেন না। ভাইবোনেরা নেচে গেয়ে গ্রীষ্মের সময় বেশ ভাল পয়সা কামায়। মা ঠাকুমা খেটে খুটে সংসার চালান মোটামুটি।

হীনরা রেড ইণ্ডিয়ান। এখন সম্ভবত 'রেড' নিয়ে মার্কিন মানুষ আতঙ্কে অস্থির! আদিম আমেরিকাবাসীকেও আর বড় রেড আখ্যা দিতে শোনা যায় না। তারা এখন আমেরিকান ইণ্ডিয়ান অথবা সংক্ষেপে আমেরিণ্ডিয়ান।

সারা দুনিয়া এখন মার্কিন দেশের কালো মানুষের জন্য কেঁদে অস্থির অথচ বেচারা আদি আমেরিকাবাসীর দল হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে নতুন মার্কিনের মাঝে, নয় তারা দূরে দুঃখে দারিদ্র্যে মুখ বুজে দিন কাটাচ্ছে। তারা প্রায় পর্যটকের দ্রষ্টব্যের পর্যায়ে পড়ে আছে। আশ্চর্য! এদেশ এককালে ওদের ছিল। উত্তরে এসকিমো থেকে নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় একই জাতীয় লোক কলম্বাস আমেরিকা আসবার আগে আধিপত্য করেছে। আধিপত্যে সংযোগ ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না, ছিল না আধুনিক সভ্যতার অনেক কিছু, তবু ওরা ছিল এদেশের রাজা। তাই তো শুনি ঠাট্টা করে বলা হয় কালো মানুষকে যদি মার্কিন মর্যাদার সবটা না দেওয়া হয় তবে সাদারও তা প্রাপ্য নয়। সাদাও তো আগন্তুক এবং অতি অল্পদিন আগের আগন্তুক। এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে ছিল রেড ইণ্ডিয়ান চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারী মার্কিন সাহেব স্বাগত জানিয়ে বলছেন Welcome to the studios, রেড ইণ্ডিয়ান বৈদ্য মশাই হেসে উঠলেন—"Welcome to my country." এরকম বহু গল্প আছে। 'কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন এ কথায় আমেরিণ্ডিয়ান বলেন সে কি? একটা দেশ আছে। সেখানে মানুষজন বসবাস করে। যেহেতু এক শ্বেতকায় ইউরোপীয় একদিন প্রথম সেখানে পৌঁছেছেলেন তাতেই তিনি সে দেশ আবিষ্কারক? সেই যে এক ইণ্ডিয়ান কুমারী নাম পোকো হাণ্টাস, এক ইংরেজ সাহেবকে রেড সর্দারের কোপ থেকে বাঁচায় আর ইংরেজ তাকে বিয়ে করে ইংলণ্ড নিয়ে যায়, সে মেয়ে কি তবে ইংলণ্ড আবিষ্কার করে? সেই তো প্রথম রেড ইণ্ডিয়ান ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছিল!

রেড ইণ্ডিয়ানরা কবে কিভাবে এদেশে বসবাস আরম্ভ করে তা নিয়ে অনেক মত আছে। কেউ বা বলেন দশ এমন কি বিশ হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার মালভূমি ভেঙে শুকিয়ে উঠেছিল। যাযাবর মরুভূমির মানুষ তাই এগিয়ে চললো। চলতে চলতে বরফে জমা আলাস্কার সঙ্গে সংযুক্ত সাইবেরিয়ার যে ভূখণ্ডটুকু ছিল তাই ধরে পৌঁছেছিল তারা আমেরিকায়। কেউ বা বলেন এঁরা এখানেই চিরদিন ছিলেন। কেউ বলেন নৌকা ডুবিয়ে নিয়ে এসেছিল একদল মানুষকে। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন আদিবাসীদের সঙ্গে নাকি মিশরের পুরাতন যুগের মিল পাওয়া গেছে। আমাদের সঙ্গে মেকসিকো ও তার কাছাকাছি আজটেক, মায়া ইত্যাদি সভ্যতার সাদৃশ্য আছে বলে চমনলাল নামে এক লেখক চমক লাগানো একখানা বই লিখে প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে কোনকালে ভারত-বর্ষের সঙ্গে এদেশের যোগ হয়েছিল। সে কথা অবশ্য ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় নাকচ করে দিয়েছেন।

আদি আমেরিকান যেখান থেকেই এসে

হীনরা নাচছে—মেয়ের দলের নৃত্য

থাকুন, একটা অদ্ভুত মিল আমাদের ভুটিয়া, লেপচা এমন কি তিব্বতীয়দের সঙ্গে আছে। অন্তত আমার মনে হলো। নাচ দেখছিলাম। হীনরা আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে মিলে নেচে চলেছে। নাচের সুর, পায়ের কাজ সব ভুটিয়াদের মত। নাচের আসল তাল, ছন্দ সব ছেলেদের আর মেয়েরা নাচে তাদের পিছনে। নৃত্যপটু নর্তক যা রচনা করবে তারই শেষের রেশ মেয়েদের হাতে। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু মেয়েদের পোশাকে বেশ বাহার! হীন যে পোশাক পরেছে তা দেখতে অনেকটা আমাদের পাহাড়ী এলাকা, লাদাখ, তিব্বত বা সিকিমের মেয়েদের পোশাকের মত। পোশাকের গায়ে রকমারি পুঁতির নক্‌শা। নক্‌শা কিন্তু পোশাকের গায়ে ফুল তোলা নয়। কাঁচের ছোট্ট গুঁড়ি পুঁতি দিয়ে নানাভাবে গাঁথা নক্‌শা আলাদা তৈরি করা। তারপর পোশাকের গায়ে ঝোলানো। হীনর ঠাকুমা নাকি এ কাজে অসাধারণ শিল্পী।

হীনরা যেখানে নাচছিল তার পাশেই রেড ইণ্ডিয়ান এক Trading Post. এককালে তাদের সাদা মানুষের সঙ্গে বেচা কেনার একটি করে ঘাঁটি থাকতো। ওরা আনতো জীবজন্তুর fur, তামাক, বাঁশের ঝুড়ি, বেতের চুপড়ি। বিনিময়ে নিয়ে যেতো লোহার হাতিয়ার, মদের বোতল আর বন্দুক। Sir Walter Raleigh প্রথম এদের কাছ থেকে তামাক নিয়ে যান। এরাও প্রথম চুমুক সুরার পেয়ালায় দিয়ে তার নাম দিয়েছিল fire water। এ trading post পর্যটকের পকেট হাতড়াবার ব্যবস্থা বই আর কিছু নয়। টুকিটাকি, তীর ধনুক, পুঁতির মালা, পালকের শিরোভূষণ পাথর খোয়ালে ধনী মানুষ নিয়ে যায়। Trading post দেখাশুনো করছিল একটি মেয়ে। নাম তার এথেল। এথেল, ইংরাজী নাম। মেয়ে পুরুষ সকলেরই একটি করে ইংরাজী নাম আর একটি করে স্বজাতীয় নাম রাখার চলন। এথেলের স্বজাতীয় নামের মানে Shining feather। আশ্চর্য, এরা স্বজাতীয় নামটিও ইংরেজী অনুবাদে বলে! আমেরিকার Wisconsin প্রদেশের যে শহরে আমরা এই উৎসব দেখছিলাম সেই শহরে আমেরিণ্ডিয়ানদের এক মুখপাত্র থাকেন তাঁকে সবাই জানে Little Eagle নামে! তাঁর নিজের নামের মানে তাই। Little Eagle শিক্ষিত মানুষ। আইন ব্যবসায়ী। আমেরিণ্ডিয়ানদের এককালে যা অধিকার ছিল তাই নিয়ে

একটি আমেরিণ্ডিয়ান টিপি—তাঁবু

মামলা চালান। কিন্তু নিজের নামটি ইংরাজী তর্জমা করে বলেন।

এথেলের পোশাকও হীনর মত বাহারের। পুঁতির বদলে কড়ি দিয়ে সাজানো তার সজ্জা। হীনদের নাচে দেখুন মাথায় ওদের একটি করে Boud বা গোল পটি। এথেলের সে ব্যাপারে একটু আধুনিকতা এসেছে। রিবনের বদলে মোটা কর্ড দিয়ে খোলা চুল সামলানো। কর্ডের এক অংশ ঝুলে আছে। মুখে সামান্য প্রসাধনের চিহ্ন লক্ষ করলাম। ওষ্ঠরঞ্জনী নেই। ওষ্ঠ স্বভাবতঃ সুন্দর গোলাপী। নয়নে কৃত্রিম প্রসাধনীর নীলাঞ্জন ছায়া। এথেল নাকি কিছুদিন বড় শহরে প্রসাধনীর দোকানে কাজ করেছিল, তাই এ সতর্কতা। প্রসাধনীতে বিশ্বাস কম, তার স্বজাতীয় মেয়েরা অনেকেই বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রস্ফুটিত গোলাপের মত কমনীয় কান্তি অনেক মেয়ের। এথেল বললো Trading post-এ প্রথম সে যখন কাজে আসে তখন ভেবেছিল আর পাঁচটা উপার্জনের পথের মত এও এক পথ। তার শ্বশুরের পারিবারিক ব্যবসা এটা। এখন আদিম আমেরিকান অর্থাৎ তার স্বজাতি সম্বন্ধে তার এক অদ্ভুত সচেতনতা এসেছে। এমন করে দলিত হয়ে কেন তারা কাল কাটাবে? কেনই বা এমন করে সহ্য করবে? তাদের কৃষ্টির প্রতিটি চিহ্ন এখন তাকে মমতায় ভরে তুলেছে। এথেলের স্বামী ভিয়েৎনাম যুদ্ধে গিয়েছিল। এখন সে ছাড়া পেয়েছে। মুক্তির আনন্দে দুজনের নিজ ঘরে ফিরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। তার পর দুজনে লেগে যাবে তাদের চিরন্তন সভ্যতার সম্যক সাধনায়। জানি না কতটা তার কল্পনাবিলাস কিন্তু কথায় ছিল যথেষ্ট দরদ। অ্যাজটেক, মায়া ইত্যাদি বাদেও নর্থ আমেরিণ্ডিয়ান সভ্যতা বেশ উন্নত ছিল একদিন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যে চেরোকী ইণ্ডিয়ানদের বিভীষিকাময় death March এ টেনে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে এক শ্বেতকায় লেখক লিখেছেন,

The cherokees were civilized Indians; perhaps more civilized than their White pioneer neighbours—চেরোকীরা ছিল সুসভ্য ইণ্ডিয়ান, সম্ভবত তারা তাদের শ্বেতকায় প্রথম আমেরিকার আগন্তুকের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল।

রাঙা ইণ্ডিয়ানরাও কিন্তু নারীর স্থান গৃহ এই চিরকাল মনে করেছে। এদের উপকথায় প্রথম নারীর বিশ্বসঘাতকতার গল্প আছে। সৃষ্টির আদিতে এক পুরুষ ও এক নারী ছিল। নারী কেঁদে বললেন সন্তান না হলে তাদের সংসারে সাহায্য করবে কে? পুরুষ বললেন তবে দুটি ছেলে হবে। মেয়ের চেয়ে তারা কাজে লাগবে বেশী তাই হলো। দুই ছেলে আর মা মাঠে কাজ

করেন আর বাবা করেন বন্য জন্তু শিকার। ছেলে দুটি লক্ষ করে যা রোজ রোজ কোথায় চলে যান কিছুক্ষণের জন্য। একদিন তারা মার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলো প্রকাণ্ড গাছ। তাদের মা সেখানে গেলে গাছ থেকে বেড়িয়ে আসে বিশাল সাপ। ক্রমে সেই সাপ হয়ে যায় একটি শ্বেতকায় পুরুষ। তাদের মায়ের পরম অন্তরঙ্গতা এই লোকটির সঙ্গে। তারা তাদের বাবাকে বলে দেয়। এখান থেকেই অবিশ্বাসের শুরু। রাজপুত সর্দারেরাও নাকি বলতেন নারীকে বিশ্বাস—নৈব নৈব চ। উদাহরণ কি একটা? আর সৃষ্টির আদিতেই কি এমন ঘটেছিল? সর্দার Pontiac তো সেদিনের কথা। দারুন সাহসী বীর সর্দার পন্টিয়াক। তবু ব্রিটিশ তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করলো। তার নিজের নাতনী এই অপমানের পর ভালবেসে ফেললো এক ইংরেজ যুবককে, নাম তার উইলিয়ামসন। পন্টিয়াকের ঘোরতর আপত্তি এ মিলনে। উইলিয়ামসন তখন আর এক রেড ইন্ডিয়ান ছোকরাকে ঘুষ দিয়ে খুন করল সর্দারকে। খুনও কি সাংঘাতিক। যে টোমাহক (কুঠার বা পরশু) পন্টিয়াকের আপন শৌর্যের সাক্ষী তারই ঘায়ে ঘায়েল হলেন তিনি। তবে সর্দারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করায় প্রতিশোধ নিতে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার দলের প্রতিটি মানুষ। তখন সেই নাতনী এসে লুটিয়ে পড়েছিল উইলিয়ামসন আর ক্রুদ্ধ দলের মাঝে। থমকে থেমেছিল আদিম মানুষের একদল। নারী যদি কোন পুরুষের প্রেমে এমন পাগল হয় আর এমন করে প্রাণ ভিক্ষা চায় তবে রেড-দের শাস্ত্রে সে পুরুষকে ছেড়ে দেবার বিধি আছে। উইলিয়ামসন রক্ষা পেল, আর পেল রেড কুমারীর পাণি কিন্তু রটে গেল নারীর নিন্দা। বেচারা পন্টিয়াক কি আর সাধে মেয়েদের বিশ্বাস করতেন না?

নারী কুহকিনী। তাই তাদের গানে, গাথায় কত কথা আছে। কুহকিনী কন্যা আপন কুহকে আপনাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার গানে আছে, "মুখ মাটিতে রেখে শুয়ে আছি। নাগর নাই বা এল। দুষ্ট মাকড়ের পরোয়া কে করে?" গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছে তবু আবার বলছে এক কথা।—"আমি কি হিংসা পাই?"

গৃহের লক্ষ্মী কিন্তু আবার সেই নারী। বর বেঁধে রেড সম্পতি গৃহপ্রবেশ করে। কাঠ ঠুকে আগুন জ্বালায় পুরুষ আর নারী তাতে ছড়িয়ে দেয় ভুট্টার আটা। প্রার্থনা করে—"হে অগ্নি, হে পরম শক্তি স্বরূপ, তুমি আমার সংসারে তাপ আন, আমার সন্তানের সুখ আন।" আশ্চর্য, যে কুহকিনী, সেই আবার কল্যাণী।

শ্রীমতী

সেদিন এখানকার মিউজিয়মে পুরোনো পুঁথি ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ঘাটতে ঘাটতে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় চোখে পড়ল। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল—এ খবরটা এখনকার অনেক নিউজিল্যাণ্ডাররাই জানেন না। অবশ্য সম্প্রতি এ বিষয় নিয়ে একটা বই প্রকাশিত হয়েছে।*

এ দেশে ইংরেজ আগমনের প্রথম দিকের অর্থাৎ ১৮৪০-৫০ সালের ঘটনা। বলেছি তখন ইংলণ্ডের আর্থনীতিক জীবনে একটা সংকট চলছিল, যার ফলে অনেকেই সে সময় এ দেশে চলে আসেন নিশ্চিত জীবিকা ও নিরাপত্তার খোঁজে। ডিকেন্সের কাছেও সেদিনের ইংলণ্ডের সমাজ আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ডিকেন্সও নিউজিল্যাণ্ডে পাড়ি দেবার কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন, এ দেশে এসে একটা সাহিত্যপত্র প্রকাশের মাধ্যমে নিজের সাহিত্যপিপাসা দূর করবেন। সেদিন ইংলণ্ডের সামাজিক-আর্থনীতিক জীবন অনেকের মনেই হতাশা সৃষ্টি করেছিল। তাই অনেকেই নতুন দেখা দেশ নিউজিল্যাণ্ডকে নতুন আশার দেশ (the Land of Hope), সুখী দেশ (the Happy Colony) বলে মনে করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, ক্ষয়িষ্ণু য়ুরোপের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও মহাসাগরের অপর পারের দেশে (নিউজিল্যাণ্ড) তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন করে বেঁচে থাকবে। এইরকম সময় অর্থাৎ ১৮৪৭-এর এক শীতের সকালে পুঞ্জীভূত হতাশা নিয়ে চার্লস ডিকেন্স তাঁর বন্ধু জন ফর্সটারকে লিখেছিলেন, 'এখানে কোন কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না, কিছু করতেও পারছি না। ভাবছি, নিউজিল্যাণ্ডে যাই এবং সেখানে একটা সাহিত্যপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করি।'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তিনি আসেন নি। লণ্ডন থেকেই "Household Words" নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। এই সাপ্তাহিকে সে সময়কার নিউজিল্যাণ্ডের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হত।

এ প্রসঙ্গে ডিকেন্সের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের সম্পর্কগত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করি। সেদিন উচ্চশিক্ষিত অনেক ইংরেজ যুবক ইংলণ্ড ত্যাগ করে জীবিকার জন্যে নিউজিল্যাণ্ডে আসবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ডিকেন্সের ছোট ভাই আলবার্ট ডিকেন্স এঁদের মধ্যে অন্যতম। আলবার্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী ছিল এবং তখন তিনি বার্মিংহাম অ্যাণ্ড ডারবি রেলওয়ে কোম্পানীতে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে কাজ করছিলেন। আলবার্ট নিউজিল্যাণ্ডে চাকরির জন্য যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের একটা সুপারিশপত্রও দিয়ে দিয়েছিলেন। চার্লস লিখেছিলেন পত্রটি তাঁর এক বন্ধু টমাস ফর্সটারকে।

"A younger brother of mine, Mr. Albert Dickens being desirous to try his fortune in your new colony and being a District Surveyor and Civil Engineer of the First Class, I take the liberty of recommending him to you as a young man who is in every respect qualified to serve in that capacity."

"He has been educated for his profession under the very best and has been practically employed for the last four years without cessation on great public works. He is extremely intelligent, active and enterprising and I trust I need hardly say that unless I were well assured as to his fitness for the office I could in no circumstances whatever countenance his application."

কিন্তু বয়স অল্প হওয়ায় আলবার্টের কাজটি হয়নি। তবে তাঁকে সহকারীর পদের জন্যে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ জানান হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, ঐ কাজটিও আলবার্টের হয়নি। যোগ্য দরখাস্তকারীর সংখ্যা অনেক ছিল বলে।

*

এখানে আসবার কিছুদিন পরে এখানকার একজন বয়স্কা বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভদ্রমহিলার বয়স ৫২, তিন মেয়ে ও এক ছেলে। বড় দুই মেয়ে বিবাহিতা, ছোট মেয়ে ও ছেলে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ে। ভদ্রমহিলা সরকার থেকে বিধবা ভাতা বাবত মাসে ৫০০ টাকা মত পান এবং বিরাট বাড়ির কিছু অংশে পেয়িং গেস্ট রেখে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে সংসার চালান। অবশ্য অবিবাহিত ছেলেমেয়ে দুটির প্রত্যেকের জন্যে ৫০ টাকা

*Charles Dickens and Newzealand —I. S. Ryan and A. H. Reed. Reed Publishers, N.Z.

মত সরকার থেকে যে ভাতা পান, তাও সংসারের সাহায্যে আসে। এ দেশে বাবা-মা প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সরকার থেকে মাসে ৫০ টাকা করে ভাতা পান। এ ছাড়াও, ছেলেমেয়েরা ১২।১৪ বছরের পর থেকে কিছু না কিছু উপার্জন করার সুযোগ পেয়ে থাকে, তা দিয়ে তাদের পকেট খরচ, সিনেমা দেখা, বন্ধু বা বান্ধবী বাবদ খরচ চলে যায়। এই উপার্জনের একটা অন্যতম সূত্র হল—রাতে পরের বাড়ির শিশুপুত্রদের পাহারা দেওয়ার কাজ। একটু খুলেই বলি। এ দেশে পরিবার শুধুমাত্র বাবা-মা ও তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। বিয়ের পর ছেলেমেয়ে তাদের ভাই দূরের কথা, বাবা ও মার সঙ্গেও থাকে না। আধুনিক সভ্যতার এদিকটা আমাদের জানা। আমাদের দেশেও এ রীতি ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে বড় বড় শহরে। সে যাই হোক, এর ফলে, বাবা-মার যদি রাতে কোথাও নেমন্তন্ন থাকে বা সিনেমা থিয়েটারে যেতে হয় তা হলে শিশুপুত্র বা কন্যাদের রাত ১১।১২টা পর্যন্ত দায়িত্ব নেয় প্রতিবেশী বা জানাশোনা পরিবারের তরুণ-তরুণীরা। এটা নিঃস্বার্থ নয়, এর বিনিময়ে রাত প্রতি ৫।১০ টাকা মত উপার্জন হয়। ফলে, এদের অন্য দিন সিনেমা-থিয়েটার, কাফে-রেস্তরাঁ; বয় ফ্রেন্ড-গার্ল ফ্রেন্ড বাবত খরচ করার সুযোগ ঘটে। বলে রাখা দরকার, এ দেশে ১২।১৪ বছর থেকেই প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের বয় বা গার্ল-ফ্রেন্ড থাকে। পশ্চিমের সব দেশেই এটা রীতি। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার এইটে একটা রূপ। বাবা-মায়ের সমর্থনও থাকে—থাকবেই বা না কেন, তাঁদের বেলাতেও তো ঐ নিয়মই ছিল।

তা সে যাই হোক, ভদ্রমহিলার সংসারে কোন অভাব দেখিনি। জীবনমানেও, ভদ্রমহিলার মতে, স্বামীর অবর্তমানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য ভদ্রমহিলাকে দেখতাম সারা দিন পরিশ্রম করতে। সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে দেখা যেত কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা, আজও প্রতি দিন পড়াশোনায় বেশ কিছু সময় দেন, রেডিওতে বলে থাকেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে। একদিন কথায় কথায় আমরা বলেছিলাম ভদ্রমহিলাকে, "এই বয়সেও আপনার কর্মক্ষমতা দেখে আমরা সত্যিই বিস্মিত হয়েছি।" ভদ্রমহিলা উত্তরে যা বলেছিলেন তা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা অসংকোচে বলেছিলেন, "দেখ, আমি নিজের ক্ষমতার বোধ হয় অপচয় করছি—আমার মনে হয়, আমি যদি আবার বিয়ে করতাম তা হলে স্ত্রী বা গৃহকর্ত্রী হিসেবে আগের মতই সার্থক হতে পারতাম। মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও বিয়ে করি। তোমরা কি বল?"

আমরা কি বলব? আমরা ভদ্রমহিলার কথা শুনে হতবাক। ভদ্রমহিলা আমাদের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগলেন, "জান, আমি এ নিয়ে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথাও বলেছি। মেয়ের কোন আপত্তি নেই—তবু ছেলের কথাটা ভাববার। ও বলছিল, মা, তুমি বিষয়টা যত সহজ ভাবছ—ততটা সহজ নয়। কেনন, তুমি যাকে বিয়ে করবে তিনি তোমার বয়সী বা তোমার চেয়ে বড় হবেন। আর ঐ বয়সের পুরুষদের তোমার খুব dull মনে হবে। তোমার মত সজীবতা তাঁদের না থাকাই সম্ভব। আমিও কথাটা ভাবছি, জান।"

আমরাও কথাটা ভেবেছি অনেকবার নানাভাবে—আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও। এই বয়সেও জীবনকে নতুন করে ব্যবহার করবার, উপলব্ধি করবার মানবিক (humanistic), ইহলৌকিক প্রত্যয় দেখে সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল। তবে সংকুচিত বোধ করেছিলাম এই ভেবে, এদের নতুন করে ব্যবহার করবার ধারণাটাও গতানুগতিক ছকে বাঁধা।

উন্নত অর্থনীতির ফলে জীবিকার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার দরুন এ দেশের মানুষের অল্প বয়সে অর্থাৎ ১৮।২০ বছরে বিয়ের রীতি প্রচলিত। তার ফলে এবং বিয়ের পর ছেলেমেয়েরা ভিন্ন হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র পরিবার হিসেবে বসবাস করে বলে বাবা-মার প্রায় ৪২।৪৫ বছর বয়সেই পারিবারিক (ভারতীয় অর্থে) সকল কাজ শেষ হয়ে যায়। এই বয়সেরও প্রায় ৫।৭ বছর পর আমাদের দেশের বাবা-মারা প্রথমে ছেলে-বউ, তারপর নাতি-নাতনী নিয়ে জমজমাট সংসারযাত্রা শুরু করেন। অবশ্য অবস্থাই ক্রমশই পাল্টাচ্ছে।

ঐ দেশের বাবা-মার পক্ষে বিরাট সমস্যা

৪৫ বছরের পর অন্তত ৩০ বছর (এ দেশের মানুষের গড়আয়ু ৭৫ বছর) আবার শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একাকী কাটাতে হয়।

এ দেশে সামাজিক নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবরকম অসহায় অবস্থার জন্য সামাজিক প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তাব ব্যবস্থা রয়েছে। জন্মাবার পর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত Children বা Family benefit অর্থাৎ পরিবারকল্যাণ ভাতার ব্যবস্থা, যৌবনে বেকার জীবনের অসহায় অবস্থায় সরকারী ভাতা, বিধবা ভাতা (Widow Pension) এবং বৃদ্ধ বয়সে Old age ভাতা এবং সরকারী বাসগৃহে থাকা ও দেখাশোনার ব্যবস্থা প্রচলিত। এ ছাড়া চিকিৎসা, হাসপাতালে থাকা ও ওষুধপত্রের খরচও কারও দিতে হয় না।

বিকলাঙ্গ ও অক্ষমদের জন্য মাসিক ভাতার (Invalid's Pension) ব্যবস্থা প্রচলিত।

অনাথদের ভরণপোষণের ভাতাও (Orphan's benefit) সরকার দিয়ে থাকেন।

এ দেশে দাঁতের রোগ খুব বেশী। আর এই কারণেই এ দেশে দাঁতের হাসপাতাল ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় একশ' বছর আগে। সম্ভবত জলের জন্য অথবা এ দেশে সুলভ ও মুখরোচক নানা রকমের চকোলেট, কেক ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপক অভ্যাসের ফলে দাঁত খারাপ হয় খুব বেশী বলে অনেকের ধারণা। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত দাঁতের চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করেন। এমন কি, বাঁধান দাঁতের খরচও সরকার দেন। ফলে, এ দেশের মানুষের এক বড় অংশেরই অল্প বয়স থেকেই বাঁধান দাঁত। দাঁত বাঁধাবার খরচ খুব বেশী তাই অনেক ক্ষেত্রেই ১৮ বছরের আগে দাঁত একটু খারাপ হলেই বাবা-মা ছেলেমেয়েদের সব দাঁত তুলিয়ে বাঁধান দাঁত লাগিয়ে নেন সরকারী খরচে। বলেছি, এঁদের ধমনীতে স্বচ্ছ রক্তের প্রাবল্য বেশী। অবশ্য এঁদের পক্ষেও যুক্তি আছে—এঁরা বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকা থেকেই তো সরকার খরচ করে—কাজেই সুযোগ আমরা ছাড়ব কেন?

কিন্তু বাঁধান দাঁত বলে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনে কোন সংকোচ বা লজ্জা নেই। বিয়ের বাজারেও দাম কমে না, কারও, বরং ওটা একটা সুবিধে বা গুণ বলেই গণ্য হয়। কেননা, দাঁত বাবত বিবাহিত জীবনে কোন খরচ রইল না, দৈবাৎ যদি না বাঁধান দাঁত ভেঙে বা হারিয়ে যায়।

ম্যাটার্নিটি বেনিফিটের ব্যবস্থা খুব ভাল। বিনা খরচে হাসপাতালে পথ্যাদি, চিকিৎসা, দেখাশোনা, সবরকম ব্যবস্থা করা হয়—জাতি ও আয় নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও ব্যবস্থা। শিশুর জন্মের পর বেশ কিছুদিন প্লাঙ্কেট সোসাইটির (Plunket Society) তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়। শিশুকল্যাণ ব্যবস্থার নিউজিল্যান্ডের প্লাঙ্কেট সোসাইটির অবদান অতুলনীয়। নিউজিল্যান্ডে শিশু-মৃত্যুর হার পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে কম। এবং এই কৃতিত্বের সবটাই প্লাঙ্কেট সোসাইটির প্রাপ্য। নিউজিল্যান্ডের ডাক্তার স্যার ট্রুবি কিং (Sir Truby King) ১৯০৭ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎকালীন গভর্নরের স্ত্রীর নামানুসারে সোসাইটির নাম প্লাঙ্কেট সোসাইটি। সোসাইটির নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষিত নার্স আছে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে শিশুকে প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে দেখে যান এ নার্সরা এবং প্রয়োজনমত নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন নিজেদের হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্র। বলা বাহুল্য, এর জন্যে এক কাঁড় খরচা নেই গৃহস্থের। অবশ্য কোন মা যদি এঁদের উপদেশ নির্দেশ অবহেলা করেন, তাহলে এঁরা মাকে কঠোর ভাষায় শাসন করতেও দ্বিধা করেন না এবং অনেক সময় শিশুর কল্যাণের কথা ভেবে শিশুকে মার কাছ থেকে সরিয়ে সোসাইটির হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রাখেন। এই নার্সরা আমাদের দেশের ঠাকুরমা, দিদিমার কর্তব্য করে থাকেন অবশ্য অনেক আধুনিক পদ্ধতিতে। এঁরা কারিটানে (Karitane) নার্স বলে খ্যাত। ডুনইডনের কাছে কারিটানে গ্রামে এই সোসাইটির কাজ প্রথম শুরু হয়, সেই থেকেই এই নামকরণ। নিউজিল্যান্ডের প্রায় সব শহর ও গ্রামে এই সোসাইটির কর্মকেন্দ্র রয়েছে। আজ-কাল উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে এই সোসাইটির অনুকরণে শিশু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে।

এদেশের সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরেকটি দিক হল, এখানকার সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে দুধ ও আপেল খেতে দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে জর্জ বার্নাড শ' যখন তাঁর 'সোস্যাল লেবরেটরি' নিউজিল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিলেন তখন তিনি প্রথম এই ব্যবস্থা করবার জন্য পরামর্শ দেন। ১৯৩৫ সালে যখন এদেশে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে, তখন থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়।

এর আগে লিখেছি, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে এদেশে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড থেকে দলে দলে লোক আসতে থাকে। এদের অধিকাংশ নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। স্বদেশের শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মর্যাদা ও নিরাপত্তাহীনতার হাত থেকে

বাঁচবার জন্যই বেশির ভাগ লোক প্রধানত এদেশে এসেছিলেন। তাই নতুন দেশে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল সকলের জন্য সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাই পৃথিবীর সকল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নিউজিল্যান্ডে সর্বাধিক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় স্বল্প অথচ সুদক্ষ ও শিক্ষিত জনসংখ্যা—কাজেই প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমায়িত জীবিকা সত্ত্বেও বিপুল আয় ও সেই আয়ের বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নত জীবনমানের উপযোগী উপকরণের অধিকারী এদেশের অধিবাসী। তাই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের সাহায্যে এদেশে নানান ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) ব্যবস্থা প্রচলিত হল। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা, জীবিকা নিয়ে ভাবনা, সব কিছু ভাবনার দায় রাষ্ট্রের। বাস্তব জীবনের প্রায় সবরকম আঁচড় থেকে মানুষকে আড়াল করে রেখেছে এদেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক বিধিব্যবস্থা। কিন্তু এর ফলে এদেশের মানুষ ক্রমশই উদ্যমহীন হয়ে পড়ছে এবং আজকাল তাই এ নিয়ে অভিযোগ, আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এদেশের Social Security ব্যবস্থার প্রশংসার কথা বলতে গেলেই প্রতিবাদ শুনতে হয় আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই। প্রতিবাদের মূল যুক্তি হল, জীবনসংগ্রামের সব কিছু থেকে আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা মানুষকে উদ্যমহীন করে তুলেছে—মানুষের নতুন কিছু করবার, ভাববার প্রেরণা নেই কোথাও। তাই নিউজিল্যান্ডে থেকে নিউজিল্যান্ডাররা নতুন কিছু করতে পারেন না—অথচ এখান থেকে যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন তাঁদের অনেকেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন অবদানের সম্মান লাভ করিয়াছেন।

এই প্রতিবন্দের মনোভাব আজকের নিউজিল্যান্ডের বাস্তব অবস্থাপ্রসূত। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। আজকাল অনেক দেশের অর্থনীতির পক্ষেই তা সংকটের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক পণ্যরপ্তানিকারী দেশ নিউজিল্যান্ডও স্বভাবতই তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

এই অবস্থার মূলে রয়েছে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির অনেকেই যেমন আমেরিকা, ইংলন্ড, জার্মানীর প্রাথমিক পণ্যের যোগানের দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার মনোভাব। তবে এর চেয়েও বড় কারণও রয়েছে। তা হল, যুদ্ধোত্তরকালে অতি উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন ও তার ব্যবহারের সাহায্যে একদিকে যেমন কৃত্রিম কাঁচামাল তৈরি করছে এসব দেশ, তেমনি উৎপাদনের সময় কাঁচামালের অপচয়

যাঁরা স্নো মাখেন তাঁদের কাছে খুশির খবর !
ব্লু সীল স্নো
মুখশ্রী ফরসা ও কমনীয় রাখে।

Blue Seal SNOW
Blue Seal SNOW
প্রতিদিন ব্লু সীল স্নো ব্যবহার করুন···মাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই অনুভব করবেন, কী আশ্চর্য কোমলতা এসেছে, মুখশ্রী হয়ে উঠেছে ফুটফুটে সুন্দর ও আভাময়। ননীর মত নরম ব্লু সীল স্নোতে আপনি রূপলাবণ্যে পরম রমণীয় হয়ে উঠবেন। মুখশ্রীতে লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে চান তো নিয়মিত ব্যবহার করুন ব্লু সীল স্নো।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আবার অবিচার

বহুপ্রতীক্ষিত পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। বিগত চারটি ফিনান্স কমিশন আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের যে শতকরা অংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন এবং যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করেছিলেন তার সঙ্গে পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ তুলনা করলে দেখা যাবে, এবার পশ্চিমবঙ্গের কপালে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের আরও শতকরা কম অংশ জুটেছে এবং অবিচারের ধারাও অক্ষুণ্ণ আছে। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ছিল শতকরা ১২·০৯ ভাগ। চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশেও রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ বণ্টিত হয়েছিল, (আদায় খরচ বাদ দিয়ে) এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ছিল শতকরা ১০·৯১ ভাগ। তৃতীয় এবং চতুর্থ উভয় ফিনান্স কমিশনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনের সূত্র ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং আয়কর সংগ্রহের ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ। কিন্তু পঞ্চম ফিনান্স কমিশন আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার সুপারিশ করলেও বণ্টন ব্যবস্থার যে সূত্র উদ্ভাবন করেছেন তা পূর্ববর্তী কমিশনগুলির সূত্র থেকে পৃথক। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনের সূত্র হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ১০ ভাগ আয়কর সংগ্রহের ভিত্তিতে। এই সুপারিশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯·১১ ভাগ। এই নতুন ব্যবস্থার সপক্ষে পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের যুক্তি হচ্ছে এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যগুলি উপকৃত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য কি আলাদা অর্থ বরাদ্দ করা যেত না? পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ আয়কর সংগৃহীত হয় তা যে ভারতের যে-কোন রাজ্যের সংগ্রহের পরিমাণের চেয়ে বেশী, শুধু তা-ই নয়, ভারতে আয়কর থেকে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তার এক-পঞ্চমাংশের বেশী সংগৃহীত হয় পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ২·৬ ভাগ (আদায় খরচ বাদ দিয়ে) বরাদ্দ করা হয়েছে।

পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের প্রতিবেদনে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের সুপারিশ হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে : অন্ধ্র ৮·০১ শতাংশ, আসাম ২·৬৭ শতাংশ, বিহার ৯·৯৯ শতাংশ, গুজরাট ৫·১০ শতাংশ, হরিয়ানা ১·৭০ শতাংশ, জম্মু ও কাশ্মীর ০·৭৯ শতাংশ, কেরালা ৩·৮৩ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ৭·০৯ শতাংশ মহারাষ্ট্র ১১·৩৪ শতাংশ, মহীশূর ৫·৪০ শতাংশ, নাগাল্যান্ড ০·০৮ শতাংশ, উড়িষ্যা ৩·৭৫ শতাংশ, পাঞ্জাব ২·৫৫ শতাংশ, রাজস্থান ৪·৩৩ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৮·১৮ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ১৬·৩১ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ৯·১১ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র, এই দুই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কম পরিমাণে আয়কর সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও অর্থের বরাদ্দ বেশী করা হয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যে অতিরিক্ত আয়কর আদায় করা হয়েছিল তার থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ২·৬ ভাগ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় মোট ৩৭১·১২ কোটি টাকা বণ্টিত হবে।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Union Excises) থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগ বণ্টনে (আদায় খরচ বাদ দিয়ে) পূর্ববর্তী কমিশনের নীতি, অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ কর আদায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা, অনুসরণ করা হবে বলে কমিশন সুপারিশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের যে শতকরা ২০ ভাগ বণ্টিত হবে তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বণ্টিত হবে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে যেগুলির গড় জনপ্রতি আয় সর্বভারতীয় গড় জনপ্রতি আয় অপেক্ষা কম। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বণ্টিত হবে কোন অঞ্চলের অনগ্রসরতা কত তার ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থায় অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৯·৮৪ শতাংশ; অথচ অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে যথাক্রমে ৭·১৫ শতাংশ, ৮·৪৮ শতাংশ, ৭·৯৩ শতাংশ এবং ১৪·৮২ শতাংশ। বলা বাহুল্য, এই রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তঃশুল্ক আদায়ের পরিমাণ বেশী। কতিপয় নির্বাচিত সামগ্রীর উপর যে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হবে তার থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ২·০৫ ভাগ বণ্টিত হবে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে, ০·৮৩ শতাংশ দেওয়া হবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে এবং ০·১ শতাংশ দেওয়া হবে নাগাল্যাণ্ডকে। অবশিষ্ট ৯৭·০৩ শতাংশ বণ্টিত হবে রাজ্যগুলির মধ্যে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাওনা হবে ২৮০·৪১ লক্ষ টাকা; তবে গুজরাটের পাওনা হবে ৩২৩·৪৫ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্রের পাওনা হবে ৬৩৭·৭৭ লক্ষ টাকা, উত্তর-প্রদেশের পাওনা হবে ৬৭৫·৯১ লক্ষ টাকা, এবং তামিলনাড়ুর পাওনা হবে ২৮৫·৩৪ লক্ষ টাকা। এই বণ্টন ছাড়াও অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের যে অবশিষ্ট অংশ থাকবে তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হবে শতকরা ৮·৭৫ ভাগ; কিন্তু মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের পাওনা হবে যথাক্রমে শতকরা ১৩·৮৯ শতাংশ এবং ১২·৯৯ শতাংশ। অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

সাহায্য-অনুদান (Grants-in-aid) বণ্টনে আবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু বরাদ্দ করা হয়েছে; চতুর্থ ফিনান্স কমিশন অবশ্য এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেছিলেন। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য-অনুদান পাবে ৮২·৬২ কোটি টাকা; কিন্তু আসাম ও উড়িষ্যা অনগ্রসরতার দাবিতে সাহায্য-অনুদান পাবে যথাক্রমে ১০১·৯৭ কোটি টাকা এবং ১০৪·৫৭ কোটি টাকা। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের উৎপাদিত চা রপ্তানি করে যে ভারত সরকার প্রতি বছর ১৪০ কোটি টাকার উপর উপার্জন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের তৈরী চট রপ্তানি-ই যে ভারত সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং এজন্য যে পশ্চিমবঙ্গ কোন বিশেষ আর্থিক সুযোগ অথবা আর্থিক বরাদ্দ পাচ্ছে না, কমিশন সে কথা চিন্তা করেন নি। আমরা আশা করেছিলাম, মহাবীর ত্যাগীর সভাপতিত্বে গঠিত পঞ্চম ফিনান্স কমিশন কলকাতা মহানগরীর দুরবস্থা, বিশেষ করে এই মহানগরীর পরিবহণ ও জল নিষ্কাশনের দুরবস্থা দূর করার জন্য, বন্যাবিধ্বস্ত উত্তর-বঙ্গের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য, এবং সর্বোপরি পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য-অনুদানের পরিমাণ আরও বাড়াবেন।

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি মধ্য-গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। গত চার বছর যাবৎ অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন। উদ্দেশ্য—জনসাধারণের সঙ্গে বাংলা দেশের সমকালীন শিল্পীদের চিত্রকলাচর্চার পরিচয় সাধন করা। তাঁদের উদ্দেশ্য কিয়দংশে সফল হয়েছে। কারণ, অধিকাংশ শিল্পীই প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন, যদিও কয়েকজন সুপরিচিত তরুণ শিল্পীর সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়নি। কলকাতা ও বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭৪ জন শিল্পীর ভাস্কর্যনিদর্শন সহ মোট ১১২টি রচনা প্রদর্শনীতে দেখা যায়। নির্বাচন ব্যাপারে ঠিক সুবিচার করা হয়নি। ছবির সংখ্যা অপেক্ষা কর্তৃপক্ষ যদি উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ দিতেন তা হলে প্রদর্শনীর মান আরও উন্নত হতে পারত। গ্রাফিক ও ভাস্কর্যনিদর্শনের সংখ্যা অল্প। প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, বাংলা দেশের অধিকাংশ শিল্পীই প্রগতিবাদী—অর্থাৎ যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমকালীন রীতিতে কাজ করেছেন। প্রদর্শনীতে বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, সুররিয়ালিস্টিক ও আধুনিক নানা পদ্ধতিতে রচিত অনেক নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কয়েকজন প্রতিভাশালী তরুণ শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের রচনা সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়—অনেক স্থলে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের পাশে তাঁদের দুর্বল বলে মনে হয়। বহু তরুণ শিল্পী আজকাল নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছেন, সুতরাং সমকালীন এহেন শিল্পীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের একদা-অর্জিত নামের মোহ ত্যাগ করে নিয়মিতরূপে কাজ করতে হবে। সমকালীন তরুণ শিল্পীদল সক্রিয় ও সচেতন। কেবলমাত্র অতীতলব্ধ সুনামকে সম্বল করে তাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া জনসাধারণেরও রুচি বদলেছে ও বিচারবোধ বেড়েছে—চর্বিত চর্বণ তাঁরাও আর সহ্য না করতে পারেন।

তিনটি গ্যালারীতে রক্ষিত ছবির মধ্যে পূর্ব গ্যালারীটিই শ্রেষ্ঠ—এখানে কয়েকজন তরুণ পরিচিত ও অল্প পরিচিত শিল্পীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে সমর ভৌমিক, গণেশ হালুই, মহিম রুদ্র, অমরেন্দ্র চৌধুরী ও নির্মল দত্তের রচনা। রিয়ালিস্টিক হলেও সমর ভৌমিকের কমপোজিশন ১-এর মধ্যে পুরানো ও নতুনের সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। প্রধানত উজ্জ্বল লালরঙে মধ্যস্থিত মূর্তিখানি এঁকে শিল্পী চাপা রঙে ইম্পাস্টো রীতিতে রচনা ক্ষেত্রে নানা কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়টির পৃষ্ঠভূমিতে কাচের কারুকার্য সৃষ্টি করে তিনি চাপা রঙ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বস্তুত দুটি রচনাতেই শিল্পীর ভারতীয় ভাবধারা ও আধুনিক রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জলরঙ ও রেখা মাধ্যমে আঁকা গণেশ হালুইয়ের গোলডেন ফিশ-এ প্রাচীন চিত্রকলার আভাস পাওয়া যায়। ছবিখানি বাহুল্যবর্জিত, কেবলমাত্র পাতলা জলরঙ ও রেখার সরলতার মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন। মহিম রুদ্র বিমূর্ত শিল্পী হিসাবে পরিচিত, যদিও প্রদর্শনীতে এবারে অন্যজাতীয় ছবি দেখা যায়। এ ফ্যানটাসি টী মনে হয়, রূপকথার ভিত্তিতে রচিত—রিচার্ড ডয়েল-এর একদাখ্যাত ফেয়ারী ড্রয়িং-এর সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য অনেকের চোখে পড়ে। ন্যুড ইন এ সানি গার্ডেন ড্রয়িং হিসাবে মন্দ নয়। লাল, নীল ও হলুদ রঙের ছোট ছোট চতুর্ভুজ সহকারে অমরেন্দ্র চৌধুরী তাঁর রচনায় প্রাচীন চিত্রজাতীয় সরলতা আনার চেষ্টা করেছেন—এই প্রসঙ্গে ইডেনস ঈভ অ্যান্ড

ইডেনস, ঈভ অ্যান্ড অ্যাই —অমরেন্দ্র চৌধুরী

আই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্মল দত্তর দুটি ছবির মধ্যে বারাণসী ঘাট উল্লেখযোগ্য। ইমপ্রেসানিস্টিক রীতিতে হলুদ রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করে শিল্পী বারাণসী ঘাটের বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। বিমূর্ত রচনার মধ্যে বরেন বসুর কমপোজিশনের নাম করা যায়। ক্রুস জাতীয় আকারের চওড়া প্যানেলের ওপর সাদা রঙের বহির্রেখামূলক নানা বিমূর্ত আকার এটিকে রিলিফের বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রথীন মৈত্রের আই ক্যানট ডাই-এর আবেদনে কয়েকজন যে সাড়া দেবেন সন্দেহ নেই। আর একখানি ছবি অনেকের চোখে পড়বে—বি আর পানেসার-এর সেলভা সেল-ভাগিয়া। হলুদ রঙের পৃষ্ঠভূমির ওপর নীল রঙের লম্বমান ও সাবলীল তুলির টান দেখে শিল্পীর জলরঙে বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা বোঝা যায়। কাতায়ুন লাকলাতের সুররিয়ালিস্টিক রচনা অপেক্ষা পার্ট অব মাই হাউস বেশী ভাল লাগে, যদিও এতে কিছু আমেরিকান প্রভাব আছে। কার্তিক পাইন দুটি ছবিতেই নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। দুটিই সুররিয়ালিস্টিক, যদিও হলুদ রঙপ্রধান মিডডে ইন মিডসামার সকলের ভাল লাগে। নিসর্গদৃশ্য হিসাবে শ্যামল বোসের মনসুন ওয়াশ-এর ভিন্ন স্বাদ। ছবিটি এক্সপ্রেশানিস্টিক, ভ্যান গ'র প্রভাব লক্ষিত হলেও শিল্পী তাঁর মত সমুজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করেন নি। এক্স-প্রেশানিস্টিক রীতিতে চাপা রঙে আঁকা দুটি ছবিতেই অনীতা রায়চৌধুরী তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। পরিতোষ সেনের দুটি ড্রয়িং-এই তাঁর অঙ্কনরীতির বিশেষত্ব বোঝা যায়।

উত্তর দিকের গ্যালারীতে থাকে জলরঙে আঁকা নানা ছবি ও নিসর্গদৃশ্য। অধিকাংশই ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত, অল্প কয়েকটি ছাড়া অন্য কোনও ছবিতে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে মণীন্দ্র-ভূষণ গুপ্তের প্যাডি ফিল্ডস। প্রধানত একটি রঙের স্তরভেদের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ ও শ্যামলকোমল ধানক্ষেতের এমন অনবদ্য রূপ আর কেউ প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ল্যান্ডস্কেপও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ এন চাকলাদার-এর গোল্ডেনফিশ অনেকের মনে রেখাপাত করে। জলের মধ্যে বিচিত্র ও রঙীন নানা শ্যাওলা ও লতাপাতার মধ্যে কিভাবে কয়েকটি মাছ আপনার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রঙ ও রেখার নানা কারুকার্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী সেটি প্রকাশ করেছেন। গোপাল ঘোষের দুটি মিনিয়েচার নিসর্গদৃশ্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি অনেকের ভাল লাগে। মৌলিক রচনারীতির ও বিশেষ করে আকাশের বুকে ঘনায়মান নীল রঙ তথা মেঘবৈচিত্র্য দেখা গেলেও তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু আশা করেছিলাম। অন্যান্য ছবির মধ্যে হনিকুম (রাখাল দাস), ল্যান্ডস্কেপ (প্রেম-তোষ মুখার্জী), ও অ্যাপ্রোচিং নাইট (অনিল পাল)-এর নাম করা চলে।

পশ্চিম গ্যালারীতেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সংখ্যা অল্প। তা ছাড়া সম্প্রতি প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্পীর অনেক রচনা এখানে দেখা যায়—সেগুলি অবশ্য বিচারের মধ্যে ধরিনি; কারণ, সেগুলির আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে—যেমন ১২, ১৩, ৭৯, ৮০ ৩৯, ৪০, ৮৯ ১০১ ও ১০২ নং নিদর্শন। এই গ্যালারীর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সরিৎ নন্দীর সেন্টিনেল-এর নাম করা উচিত বলে মনে করি। পেরেক, স্ক্রু ও রিভেট জাতীয় নানা উপাদান সহকারে শিল্পী স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনা ও বিভিন্ন উপাদান সুসংস্থাপন করার ফলে পরস্পরনির্ভর কমপোজিশনটি আধুনিক হলেও সকলের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। এর পরে নজরে পড়ে বারিদ গোস্বামীর 'ডাক'। সম্ভবত ইন্ডিয়ান কালো কালি ও ক্যালিগ্রাফিক রেখা দ্বারা রচিত এই সাধারণ অথচ আধুনিক ছবিটিতে শিল্পী যেন তুলি ও রঙ মাধ্যমে প্রাণসঞ্চার করেছেন। শূন্যস্থানের প্রয়োজনীয় ও পরিমিত স্থানটুকুতে চাপা রঙের নানা লম্বমান টানের মধ্য দিয়ে সুবল পাল তাঁর দুটি রচনাতেই (পেন্টিং) ইমেজারীর সৃষ্টি করেছেন। এ গ্যালারীতে আর একখানি ছবিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সুরাজ টিকু-র অটাম রিফ্লেকশন। প্রদর্শনীর অপরাপর ছবির মধ্যে ছবি—রাগ দেশ (অনিমেষ সেনগুপ্ত), কৈলাসপুরী (ইন্দু দুগার), ইনোসেন্স (জীবেন সেন), কম্পো-জিশন-১ (ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত), রিক্লাইনিং ফিগার (যশোবন্ত সিং বোথরা), দি মুন (নিসার আজিজ) ও কমপোজিশন (নিখিলেশ দাশ)-এর নাম করা উচিত।

গ্রাফিক ও ভাস্কর্য বিভাগ দুর্বল। গ্রাফিকের মধ্যে স্প্রিং (হরেন দাশ) ও কমপোজিশন-১১ (নিরাময় রায়) প্রিণ্ট উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যেও অনেকগুলির ইতিপূর্বে অন্যান্য প্রদর্শনী-কালে আলোচনা হয়েছে। অবশিষ্ট নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ভাস্কর্যশিল্প নজরে পড়েনি—তবে তরুণ ভাস্কর সত্যেন মজুমদারের কমপোজিশন (সিমেন্ট)-এ আধুনিক গঠনরীতি ও আয়তনিক সমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমরেশ চৌধুরীর কমপোজিশন (প্লাস্টার)-এ কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়ল না—তাঁর কাছে উৎকৃষ্টতর নিদর্শন আশা করেছিলাম।

চিত্রপ্রিয়

হাসন রাজা (৪)

শ্রীহট্টাঞ্চলে চাষা ভূষোদের ভিতর একটি বড় সুন্দর প্রথা আছে।

কোন চাষা যদি বিয়ে করার পর কয়েক মাসের ভিতরেই দেখতে পায় যে, তার স্ত্রী বড়ই দুশ্চরিত্রা তখন সে আপ্রাণ চেষ্টা দেয় মেয়েটার স্বভাবচরিত্র সংশোধন করার। কিন্তু আখেরে যখন দেখে যে, মেয়েটা জাত-বজ্জাত-বজ্জর তখন সে তার শাশুড়ীর কাছে যায়, কারণ, শাশুড়ী এ মেয়েকে গর্ভে ধরেছে তাকে বড় করেছে, মা মেয়ের স্বভাব ভাল করেই জানে। একমাত্র সেই বুঝতে পারবে যে চাষীর দাম্পত্য জীবন যে সুখকর হ'ল না তার জন্য দায়ী তার মেয়েই।

চাষী তখন শাশুড়ীকে বলে "আম্মা, তুমি তো সব জান, আমি আর পেরে উঠছি না, তুমি আমাদের একটা তালাকের ব্যবস্থা করে দাও এবং তুমিই বেছে নিয়ে আমাকে অন্য একটা বউ দাও।"

এস্থলে বলা প্রয়োজন, শাশুড়ী যদি স্বেচ্ছায় তালাকের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে প্রকুন জামাতার জন্য বধূর সন্ধানে বেরোয় তাহলে সবাই অক্লেশে বুঝে যায় যে, এই তালাকের জন্যে চাষা দায়ী নয়, দায়ী তার বউ।

হাসন রাজা এই প্রথার সুযোগ নিয়ে একটি গীত রচনা করেছেন। যে গীতটি টীকাটিপ্পনী সহ একটু বুঝিয়ে বলতে হয়।

'ভব' শব্দের অর্থ পৃথিবী। 'ভবজান' যে পৃথিবীকে আমরা 'জান' প্রাণ দিয়ে মহব্বত করি। অথচ এই পৃথিবী কারুরেই প্রতি নিত্যদিন সুপ্রসন্ন থাকে না। - আজ একে রাজা বানায়, কাল তাকেই ফের ফকির করে দেয়। এই পৃথিবী অর্থাৎ 'ভবজান' সৃষ্টি করেছেন আল্লাতালা; যে রকম চাষার স্ত্রী ভবজানের জন্ম দিয়েছে তার মা।

তাই হাসন রাজা আল্লাকে উদ্দেশ করে গাইছেন,

"তুই মোরে কলঙ্কী করিলা গো,
ভবজানের মা।
তুই মোরে কলঙ্কী করিলা
তোর মাইয়া ভবজানকে
কেন বিয়া দিলে গো।
ভবজানের মা! তুই মোরে কলঙ্কী করিলা।
ভবজানকে দেখিয়া তার রূপেতে মজিয়া,
সব ছাড়িয়া রইলাম আমি,
তার দিকে চাইয়া॥"

এরপর সেই ভবজানকে অভিসম্পাত দিতে তার উদ্দেশে হাসন রাজা গাইছেন,

"তোমার যত রীতি নীতি,
জানিয়াছি আমি।
দিন কতেক পর ধর
নতুন নতুন সোয়ামী॥
কত কত রাজা বাদশা,
লাইলায় তুমি বর।
তাদেরে ছাড়িয়া কর,
তুমি অন্যের ঘর॥"

এরপর হাসন রাজা তার শাশুড়ী ভবজানের মা অর্থাৎ আল্লাতালাকে কাতর ক্রন্দনে নিবেদন জানাচ্ছেন,

হাসন রাজায় ভক্তি করে
ভবজানের মায় পাও (পায়ে)
শীঘ্র করি শাশুড়ী মাই,
ভবজানরে ছাড়াও॥
(তালাকের ব্যবস্থা কর)

এবং সর্বশেষে হাসন রাজা সেই দুশ্চরিত্রা ভবজানকে শাসাচ্ছেন,

হাসন রাজায় বলে পিরীতি,
করবো না সে তোর।
এমন পিরীতি করবো, যে হয়
জন্মে জন্মে মোর॥

হাসন রাজা সম্বন্ধে আমার দু'তিনটি লেখা বেরোনোর পর একাধিক প্রাক্তন শ্রীহট্টবাসী আমি হাসন রাজার যে সব গান উদ্ধৃত করেছি তার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ উল্লেখ করে কোন্‌টা প্রকৃত পাঠ কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত জানতে চেয়েছেন। জনৈক সুহৃদ তো দলিল দস্তাবেজ নিয়ে দীনের কুটিরে উপস্থিত।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও—আর শেক্‌সপীয়রের তো কথাই নাই—কোন্ পাঠ যে শুদ্ধ কোন্‌টা অশুদ্ধ তাই নিয়ে তর্কাতর্কির অবসান নেই। হাসন রাজা তো এঁদের কাছে কিছুই নন।

আমার নিবেদন, হাসান রাজার জীবিতাবস্থাতেই 'হাসন উদাস' নাম দিয়ে তাঁর একটি গীতি-সংকলন প্রকাশিত হয়। আমার তাবৎ উদ্ধৃতি তার থেকেই বর্ণে বর্ণে, অক্ষরে অক্ষরে।

আ[illegible]

বিশ্ববিজ্ঞান

বিদেশে থাকার জন্যে [illegible] 'দেশ' পাই অনেক দেরীতে। একজনের থেকে কোন আলোচনাতে যোগ দিতে গেলে [illegible] সপ্তাহের ব্যবধান এসে যায়। কিন্তু গত ২০শে আষাঢ়ের 'দেশে' 'বিশ্ববিজ্ঞান' পর্যায় সম্পর্কে 'আলোচনা' [illegible] শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায়-এর চিঠি ও লেখক শ্রীতরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর পড়ে মনে হলো, দেরি হলেও কিছু লেখা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যাঁরা আমার চাইতে আগে 'দেশ' পড়েন তাঁরা কেউ এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিছু বলে থাকতে পারেন।

ব্যাপারটা পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কিত। লেখক লিখছেন, 'কোন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় করে বলতে পারবেন কিনা জানি না।' নিজেকে বিজ্ঞানী বলে প্রচার করবার ধৃষ্টতা নেই। তবে গত বিশ বাইশ বছর ধরে বিশ্বদরবারে স্বীকৃত বিজ্ঞানীদের কারও কারও কাছাকাছি আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। তাতে করে, অথবা নেহাত জীবিকানির্বাহের জন্য অন্তরীক্ষ বিজ্ঞান (Space science—পরিভাষা ঠিক হলো কিনা জানি না) পর্যায়ের সামান্য কিছু চর্চা করতে হয় বলে, মনে হলো হয়তো কিছু মন্তব্য করতে পারি। যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তার জন্য খুব বড় বিজ্ঞানীর প্রয়োজন নেই।

পত্রলেখক শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায় যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সাধারণ লোকের মনে পৃথিবীর আকৃতির মোটামুটি একটা ধারণা দেবার জন্য কোন কোন বিজ্ঞানী ঐ রকম বিবরণ দিয়ে থাকেন। পৃথিবীকে তাঁরা আজকাল কমলালেবুর বদলে পেয়ার (Pear নাসপাতি নয়) এর সাথে তুলনা করছেন। তার মানে কিন্তু এ নয় যে, পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণ কিছুটা চাপা, এ ধারণাটা ভুল। বিষুবরেখার কাছে পৃথিবীর ব্যাস, উত্তর, দক্ষিণ দুই মেরুর দূরত্বের চাইতে বেশী। মেরুর দিকের ব্যাস প্রায় ২৯৮ ভাগের একভাগ কম। এই উত্তর-দক্ষিণে চাপা গোলকের (Ellipsoid) উপর আবার নানা জায়গায় স্ফীতি বা অবনতি (depression) আছে। উত্তর মেরুর কাছে সামান্য ১০ মিটারের মত উঁচু এবং দক্ষিণ মেরুর কাছে প্রায় ৩০ মিটার নীচু। এ ছাড়াও অনেক জায়গায় সামান্য বিকৃতি আছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনির কাছে ৫০ মিটার বড় স্ফীতি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সামান্য উঁচু নীচু হলো কিন্তু ঐ উত্তর-দক্ষিণে চাপা গোলকের উপর, [illegible] [illegible] ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭০ কিলোমিটার। আবার এই সব [illegible] সমুদ্রতলের (Sea level) ব্যাপারে। পাহাড় পর্বতের উচ্চতা বা সমুদ্রতলের গভীরতা এর মধ্যে পড়ে না।

বিজ্ঞানীরা এইসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, পুরোনো যে সব তথ্য জানা ছিল তার উপর কৃত্রিম উপগ্রহদের থেকে পাওয়া নূতন উপাদান থেকে—তাদের কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তনের বিষদ গাণিতিক বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে। এই জাতীয় উপাদান প্রথম আসতে শুরু করে vanguard 1 উপগ্রহের কক্ষপথের পর্যবেক্ষণ থেকে। এগুলো অনুমানের ব্যাপার নয় এবং গাণিতিক যুক্তিতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশও নেই।

লেখক শ্রীতরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় রুশ বিজ্ঞানীদের যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা কবেকার বা কি পরিপ্রেক্ষিতে বলা তা আমার জানা নেই। কোন বিজ্ঞানী যখন বিদগ্ধ সমাজের কাছে নিজের চিন্তাধারা পেশ করেন, তখন তা থেকে কিছু অংশ তুলে নিলে, সব সময়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা পুরোপুরি বোঝা যায় না। যতদূর জানি, পৃথিবীর এই আকৃতি সম্বন্ধে রুশ বিজ্ঞানীরাও দ্বিমত নন।

দ্বিমতের কথা যদি বলেন, তবে পৃথিবীর নানা দেশে এখনও কিছু লোক রয়েছেন যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবী সমতল (flat)। তাঁদের কল্পনার বিপরীত কোন যুক্তি নিতে তাঁরা নারাজ। বেশী দিন নয়, গত ১৯৬৮ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে পদার্থ বিজ্ঞান শাখায় এই গোষ্ঠীর এক-জনকে বক্তৃতা দিতে দেখেছি।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংবাদ সাধারণের উপযুক্ত ভাষায় বলা বেশ কঠিন কাজ। প্রায় ২০ বছর আগে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় এবং পরে অন্যত্র ইংরেজীতে লিখবার চেষ্টায় এবং নিজের কাজকর্ম উপলক্ষে ইংরেজীতে এবং হিন্দীতে সহজভাবে বৈজ্ঞানিক কথা বলবার প্রয়োজনে এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু ধারণা যা হয়েছে, তা থেকে বুঝি যে লেখক তরুণবাবু বেশ দুরূহ কাজের ভার নিয়েছেন। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির যুগে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা প্রশাখায় বিশেষজ্ঞের মত জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়। কাজেই লেখকের কোন কোন

অবশ্যই ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি কোন পাঠক তা তাঁর গোচরে আনবার চেষ্টা করেন, তবে তা সহজভাবে মেনে নেওয়াই শোভন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচায়ক। তাই ২০শে আষাঢ়ের সংখ্যায় আলোচনা এবং কিছুদিন আগেকার শ্রীযুক্ত মেঘেন সাহা মহাশয়ের চিঠি সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের কাছে কিছুটা পীড়াদায়ক।

এই সব আলোচনা দেখে, আর একটা কথা ভেবে একটু দুঃখ হয়। কোন প্রশ্নের উপর সন্দেহ এলে আমরা রুশ বা আমেরিকান কোন প্রবক্তার নজির দিই। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই, উপযুক্ত ও ওয়াকিবহাল লোক আমাদের দেশে, এবং কলকাতাতেই, যথেষ্ট রয়েছেন, যাঁরা এই সমস্ত প্রশ্নের সন্দেহের মীমাংসা করে দিতে পারেন। অনেকেই আছেন যাঁরা এক একটি বিশেষ শাখায় বিজ্ঞানচর্চা করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। তাঁদের নিজেদের চর্চার বিষয়ে বিদেশীদের চাইতে তাঁরা কম ওয়াকিবহাল নন।

অরুণকুমার সাহা
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া

অদূরের দিল্লী

প্রবাসী দিল্লীর বাঙালী বলে স্বভাবত 'দেশ' পত্রিকায় দরবেশ লিখিত 'অদূরের দিল্লী' পড়তে উৎসুক হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বোঝা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এতে শুধু রাজধানীর কুৎসা ও ব্যাভিচারের কথা প্রকাশ করাই কি লক্ষ্য? দিল্লীতে জন্ম থেকে থেকেও যে সমস্ত সংবাদ ও পরিবেশের পরিচয় লাভ করবার প্রয়োজন বোধ করিনি 'অদূরের দিল্লী' মারফৎ সে সব Scandals প্রচারিত হতে দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। আমার নিজের বিশ্বাস এ ধরনের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রাজধানীর তৎকালীন পরিস্থিতির ছবি ফুটিয়ে তোলা —কুৎসা রটানো নয়। শুধু শুধু দু তিন পাতা বোঝাই করে দিল্লী সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা পরিবেশন করে দরবেশ কি সস্তা বাহবা পেতে চান?

গত সংখ্যায় (সংখ্যা ৪২, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৬) দরবেশ 'চরন' নিয়ে দেখলাম বেশ একখানা কল্পিত প্রবন্ধ লিখেছেন এবং ভালভাবে নিজের গতিবিধির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সূত্রে দিল্লীর কয়েকটি কলেজের কথাও উল্লেখ করেছেন। দরবেশের ভাগ্য ভাল যে দিল্লীর কলেজের বেশীর ভাগ অধ্যাপক অধ্যাপিকাই অবাঙালী এবং বাঙালী অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দরবেশের লেখা পড়বার মত সময় নেই। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন যে, দিল্লীতে এমন লোকও আছেন যাঁরা এসব কলেজের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। স্বভাবতই এই সব অজ্ঞাত খবর সম্পর্কে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে। দরবেশ এক জায়গায় লিখছেন—

'মিরাণ্ডা কলেজের রাস্তায় ও যখন গাড়িতে তেড় নিল তখন আমি বললাম 'আচ্ছা আমি যে শুনি এখানে মহিলাদের হস্টেলও মস্টম নাকি একটু আধটু চলে?'

'চলাচল খবরটা কি?'

'না আমি এমনি বলছিলাম আর কি! খবরের কাগজে পড়েছি নামকরা একটি মেয়ে-হস্টেলের মেন গেটে নাকি প্রত্যেক সোমবার সোমবার ভোর বেলায় কবাড়িঅলাদের ভিড় জমে যায়। খালি শিশি বোতল কিনবার জন্য। রবিবার-রবিবার সন্ধ্যায় নাকি খুব জমে এই বড়লোকী হস্টেলে।'

রাজধানীর কোন্ খবরের কাগজে এরকম রসাল খবর পরিবেশন করা হয় আমরা জানতে পারি কি? কারণ দিনের পর দিন কলেজের ভেতরে থেকেও যে জিনিস চোখে পড়েনি সে খবর দরবেশ এত সহজে কোথা থেকে পেলেন? দরবেশের জন্য কি একটি বিশেষ কোন গুপ্ত

খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় ? কারণ দেশের বর্তমান সংখ্যায় (সংখ্যা ৪২, ৬ ভাদ্র ১৩৭৬) দরবেশ একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী রাঁধুনী গিয়ে উল্লেখ করেছেন—'কাগজে কাগজে তখনি শেখরের চিঠি ছেপে বেরুল প্রথম পৃষ্ঠায়। শেখরের মায়ের ছবিও বেরিয়ে গেছে প্রথম পাতায়। মায়ের ছবি - কাগজে।'—অন্ততঃ আমাদের এ ধরনের, অভূতপূর্ব ঘটনা চোখে পড়েনি। জানি না দরবেশের দিব্যদৃষ্টি কতদূরে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। কারণ 'ইন ক্যামেরার সংবাদও তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয় দেখছি, দেড় মাস ধরে দিল্লীর ঘরে ঘরের গুজতানি গুজবের খবরও তিনি পেয়ে যান। এই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি যে প্রবন্ধগুলি লিখছেন তার উদ্দেশ্যটা জানাই আমার প্রশ্ন। কারণ একটা অন্তঃপুরের দাম্পত্য কাহিনী লোক চক্ষের সামনে রেখে তিনি যে কার উপকার সাধন করছেন তা তিনিই জানেন। এ বোঝা আমার সাধ্য নয়। দিল্লীতে রোজ বহু আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন দিল্লীকে গরম করে রেখেছে। সে সব বাদ দিয়ে বাঙালী পাঠক কি সত্যই প্রবাসী বাঙালীর আস্তাকুঁড়ের খবর জানতে চান?

জনৈক অধ্যাপিকা
মিরান্ডা হাউস,
দিল্লী

জীবিকার সন্ধানে জননী

২৩শে আগস্টের 'দেশে' তপনকুমার দত্ত লিখিত চিঠিটিতে তিনি 'জীবিকার সন্ধানে জননী—দেশে ও বিদেশে' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যেসব মত প্রকাশ করেছেন তার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। তিনি যা বলেছেন তা প্রধানতঃ এই যে আমেরিকার সমাজে স্নেহ ভালবাসার অভাব ত নেইই বরং বেশীই আছে। পশ্চিমী সমাজ সম্বন্ধে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছু আছে কারণ আমারও ওদেশে কিছুদিন কাটানর সৌভাগ্য হয়েছিল; আমার অভিজ্ঞতা থেকে বোধ যে তাঁর বক্তব্য ঠিক নয়। পশ্চিমী সমাজে মানুষ চূড়ান্তরূপে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার ফলে, সেখানকার পরিবারের অবস্থা এইরকম দাঁড়িয়েছে যে, একটি পরিবারের ভিতরেই প্রত্যেকে কেবল তার নিজের কথাই ভাবে, পিতা বা মাতা কেবল তাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত সন্তানের প্রতি নজর দেন না। আবার সন্তানও সেইরূপ প্রতিদানই দেয়। সেখানে বিবাহ কেবল একটি দৈহিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে, তাই কয়েক বছর পর পরই ওরা স্ত্রী বা স্বামী বদল করে কারণ, একজনকে নিয়ে ওরা bored হয়ে যায়। 'bored' শব্দটি শুনে অবাক হবেন না, ওদের অনেককে এই বিশেষ শব্দটিই ব্যবহার করতে শুনেছি। ওরা দাম্পত্য জীবনকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখে, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, তাঁরা 'bored' হয়ে পৃথক হয়ে গেলেন, ইতিমধ্যে সন্তান যা জন্মেছে তাদের 'হোমে' দেওয়া হল। 'হোমে' দেবার পর কিছু বাবা-মা তাদের

খবর রাখেন, বাকীরা তাও রাখেন না। একটি মেয়েকে দেখেছিলাম,—তার ২৬ বছর বয়সেই সে তৃতীয় 'বন্ধু'র সাথে ঘর করছে এবং পূর্বের বিবাহজাত সন্তানটিকে জন্মের পরই 'হোম' বিদায় করে ও তারপর কয়েক বছর সে সন্তানের নিয়মিত খবর রাখা দূরে থাক, একবার দেখাও করেনি। তার ভাব দেখে মনে হল, সন্তানের জন্ম দিয়েই খালাস তারপর আর দায়িত্ব নেই।

যেসব ক্ষেত্রে 'বন্ধন হয় না, সেখানেও অনেক জায়গায় সন্ত নেয়। কিশোর বয়স্ক হলে, স্কুল ছাড়ার আগেই বাবা-মার থেকে আলাদা থাকে, হোস্টেল প্রভৃতিতে 'বেড-সিটার' খোঁজে কারণ, বাবা-মার সঙ্গে থাকলে তাদের 'স্বাধীনতা' ক্ষুণ্ণ হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলের গণ্ডী পেরোলে অনেকক্ষেত্রেই দেখেছি বাবা-মা আর তাদের দায়িত্ব নেয় না; তখন যদি তারা কোন আর্থিক কষ্ট বা বিপদে পড়ে তখনও বাবা-মার বিশেষ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। এমনও ঘটে অনেক মেয়ে আর্থিক কষ্ট ও বাবা-মার অবহেলার জন্য নাইট ক্লাবের নর্তকী বা কল-গার্লের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমী সমাজে স্নেহ-প্রেম-আন্তরিকতা প্রভৃতি উবে গেছে, সবই হয়ে গেছে অফিসিয়াল-ফর্মাল; সেখানে মা যদি ছেলের বাড়ী আসে তাহলেও আগে থেকে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করতে হয়। তিনি যে 'স্নেহ-চুম্বনের' কথা লিখেছেন তাও হয়ে গেছে ফর্মাল, তাতে স্নেহ কতটুকু আছে সন্দেহ, তাদের সম্পর্কে কোন প্রাণের স্পর্শ নেই। সন্তানও সেই প্রতিদানই দেয়, বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন, সন্তান কোন নজরই দেয় না। তিনি লিখেছেন, ভারতে অন্ধস্নেহ সন্তানকে "রেখেছে বাঙালী করে, মানুষ করেনি।" তিনি কি দেখেননি, কত ছেলে তেলেভাজা, ঠোঙা বিক্রী করে, ট্রেনে ফেরি করে, গাদা গাদা টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ চালায়, সংসার পালন করে। এদেশের মা-রা কি খালি গালিগালাজই বর্ষণ করেন,—পরের বাড়ী ঝি-এর কাজ করে সন্তানদের মানুষ করেন এমন মাও অনেক আছেন। পাশাপাশি দেখি, পশ্চিমী সমাজে সন্তানের অসুখ করলেও মা সেদিকে দৃকপাতও না করে পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে নাইট ক্লাবে ফূর্তি করতে যান। সেখানে স্বামী ঘোরেন অন্য মেয়েদের সাথে, স্ত্রী ঘোরেন অন্য পুরুষদের সাথে—তাদের মধ্যে কি প্রেমের সম্পর্ক থাকতে পারে, বাইরের 'show' টুকু ছাড়া। এর প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে এবং মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়। পশ্চিমী সমাজ সম্বন্ধে যা বললাম এর

ব্যতিক্রমও আছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ঘরেই এই অবস্থা।

ওদেশের 'টীন-এজার'-দের উচ্ছৃংখলতা ও গুণ্ডামির একটি প্রধান কারণ, স্নেহ-ভালবাসার অভাব। পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ হত্যা ও ধর্ষণ হয় তা পৃথিবীর আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। এছাড়া, আমেরিকায় রিভলবার দেখিয়ে ছিনতাই, বাস ট্রেন "hold-up" করে লুঠ, নিগ্রো মেয়েদের যথেচ্ছ অপমান করা, মেয়েদের "panti-raid" করা, এসব হামেশাই ঘটে—শিকাগোর গুণ্ডারা ত বিশ্ববিখ্যাত। দুতিন বছর আগে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্র ছাদের ওপর উঠে বেপরোয়া গুলী চালিয়ে তেরজনকে হত্যা করে; তার এই মানসিক বিকৃতির কারণ স্বরূপ বলা হয়েছিল তার পিতামাতার অসুখী দাম্পত্য জীবন। ভারতবর্ষে এই ধরনের ঘটনা একটিও ঘটেছে নাকি যে তিনি আমেরিকার সাথে ভারতের টীন-এজার' সমস্যাকে এক করে দিয়েছেন। আজকাল ভারতে ঐ সমস্যা বাড়ছে ঠিকই এবং তার কারণ ঐ পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব।

তিনি 'হিপি' হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছেন—'বামপন্থী মনোভাব'। বাংলাদেশের ছেলেরা ত অনেক বেশী বামপন্থী, তারা হিপি হচ্ছে না কেন? আর যেগুলি পুরোপুরি 'বামপন্থী দেশ' সেখানকার ছেলেরা ত হিপি হয় না বা তাদের সরকারও হিপিগিরি সমর্থন করে না। হিপি হওয়ার কারণ হচ্ছে—মানসিক অশান্তি, extreme frustration। L. S. D-র নেশায় বুঁদ হয়ে তারা নতুন জীবনের খোঁজ করে নাকি, অশান্তি, হতাশাকে সাময়িকভাবে ভুলতে চায় তা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। পত্রলেখক বলেছেন, সেখানকার সমাজসেবামূলক কেন্দ্রগুলি এর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে। বাস্তব অবস্থা থেকে ত মনে হয় না যে তারা ঠিক পথে ঠিকভাবে কাজ করে, কারণ ঐ সমস্যা ত বেড়েই চলেছে।

প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখিকা আলোনা কথা ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতে নারী স্বাধীনতা, কর্মব্যস্ততা [illegible] একথা ঠিক নয়। কারণ কর্মব্যস্ততা সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক বেশী কিন্তু সেখানকার সমাজের অবস্থা [illegible] আসল কারণ হচ্ছে তাদের [illegible] জীবনদর্শন।

ডঃ পশুপতি মণ্ডল

কাঁথি

কাওয়াবাতার ইন্দ্রধনু

দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কাওয়াবাতার 'ইন্দ্রধনু' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ সাগ্রহে পাঠ করেছি। জাপানী ভাষা থেকে সরাসরি উপন্যাসের অনুবাদ বাঙলায় সম্ভবত এই প্রথম। অনুবাদক-দ্বয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, ইন্দ্রধনু-উপন্যাসে বাঙলায় জাপানী শব্দের লিপ্যন্তরে যে নীতি অনুসৃত হয়েছে সে সম্পর্কে দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

প্রথমেই উপন্যাসের ভূমিকায় 'বুংগেই জিডাই' এই বানানে একটি জাপানী পত্রিকার নামোল্লেখ করা হয়েছে। পত্র-লেখকের মতে বাঙলায় এই পত্রিকাটির নামের বানান হওয়া উচিত 'বুংগেই

বিষ্ণু দে'র ষাট বছর

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান প্রবীণ পঞ্চজনের মধ্যে বিষ্ণু দে কনিষ্ঠতম। তাঁরও ষাট বছর পূর্ণ হয়ে গেল গত সপ্তাহে। অবশ্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুর মতনই বিষ্ণু দে'-র শরীরেও বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই, চিন্তার তারুণ্যও বিস্ময়কর। সম্প্রতি তাঁর নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে, "সব সংবাদই কবিতা"।

গত রবিবার গ্রুপ থিয়েটারের উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয় বিড়লা আকাডেমী অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচার মণ্ডপালয়ে। শঙ্খধ্বনি দিয়ে, চন্দনের তিলক পরিয়ে কবিকে মঞ্চে বসিয়ে সামনে সমবেত হয়েছিলেন কবির অনুরাগীরা। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছেন হিরণকুমার সান্যাল। বিষ্ণু দে-কে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে, তিনি স্বভাবসিদ্ধ চাপা হাস্যে জানালেন, ষাট বছর বয়েস হওয়া মোটেই আনন্দের নয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়

সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সাহিত্য বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন। "রম্ভা" নামে একটি মারাঠী সাহিত্য পত্রের এক সংখ্যা অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল বোম্বাই হাইকোর্টে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গল্পের জন্য অভিযোগ; গল্পটির নাম শ্যামা, লেখক চন্দ্রকান্ত কল্যাণদাস কাকোড়কর। গল্পটির সংক্ষেপে সার যা জানা গেছে, এর নায়ক একজন কবি, তিনটি নায়িকার প্রেমে আসক্ত, যাদের বয়েস সতেরো থেকে পঁচিশ। কবি তাঁদের সঙ্গে হৃদয় রহস্য আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন।

নিম্ন আদালতে রচনাটি অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও, বোম্বাই হাইকোর্ট পত্রিকাটিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করেন ও লেখক ও প্রকাশকের জরিমানা হয়। তাঁরা আপিল করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। মাননীয় বিচারপতি মন্তব্য করেছেন, যৌন প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্রই যদি অশ্লীল হয়, তাহলে তো ধর্ম পুস্তক ছাড়া আর কিছু পড়াই উচিত নয়!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে সভা

গত শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে 'আধুনিক সাহিত্য ও নিঃসঙ্গতা-বোধ' বিষয়ে তরুণ সাহিত্যিকদের একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল। আলোচনার উদ্বোধন করলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি সোমেন্দ্র চন্দ্র, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এমন একটি সভার উদ্যোগ। ইদানীংকার সৃষ্টিমূলক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সার্কুলার রোড ও সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়িটির অভ্যন্তরে কোনো প্রাণের চিহ্ন আছে কিনা—সেটাই ছিল সন্দেহের ব্যাপার। অন্তত বহুকাল যাবৎ সাহিত্য পরিষদ বাংলা সাহিত্যে কোনো ভূমিকা নেয়নি। আকাদেমী ক্লাসের কথা বাদই দিলাম, এমনকি ঢাকার বাংলা আকাদেমি যতখানি কাজ করছেন, তার কণা মাত্র ভাগ উদ্দীপনাও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিল না। বাংলা কবিতা সম্পর্কে সাহিত্য পরিষদ বহুকাল যাবৎ কোনোরকম আগ্রহ দেখায়নি (যদিও বছরের শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার দেবার কথা এর সংবিধানে আছে), গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যোগ্য গ্রন্থের সন্ধান বা দেশবাসীর কাছে তার পরিচয় করিয়ে দেবার ভার সাহিত্য পরিষদ নেন নি। এমন কি, প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়েও সাহিত্য পরিষদ সাম্প্রতিক কালে কোন্ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়।

সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে মনে হয়। এখন এর সভাপতি হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে তরুণ সম্পাদক। এবং গত শনিবারের সভাটি, বহুকাল পরে, একটি আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে সভা।

শনিবারের সভার আলোচনার মুখবন্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখ করলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবিত সমকালের সাহিত্যিকদের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা। সম্পাদকও সেই মত ব্যক্ত করলেন। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আবার প্রাণের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে, এ রকম আশা করা যায়।

আলোচনা সভায় দুটি বিষয় প্রধান হয়েছিল। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য-হীনতাই নিঃসঙ্গতা বোধ জাগিয়ে তুলেছে। আশা ভঙ্গ, উদ্দেশ্যহীনতা, সামাজিক অসামঞ্জস্য লেখকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর একটি ব্যাপার এই বাংলা সাহিত্য এখন বড় বেশী নগর কেন্দ্রিক। গ্রাম বা শহরের বাইরের বৃহত্তর দেশ সাহিত্যে এখন অনুপস্থিত। সাহিত্য ও সাহিত্যিক এখন নগর-বন্দী। এবং নিঃসঙ্গতা মূলত শহুরে অসুখ।

সনাতন পাঠক

ইতিহাস ও রাজনীতি

দি এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ (ইণ্ডিয়া বিটুইন ১৮৯০ অ্যাণ্ড ১৯১০)। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি। ওরিয়েণ্ট লংম্যানস। ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-১৩। দাম—১৮ টাকা। পৃঃ ২৩১।

ভারতে বর্তমানে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দুই ধরনের চরম পন্থার আবির্ভাব অনেকের ভীতির কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই দুই গোষ্ঠীর শক্তিশালী হওয়ার জন্য অনেকে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে অনেক আগে থেকে, পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি উত্থাপনের অনেক আগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে চরমপন্থী মনোভাব কিভাবে শক্তিসঞ্চয় করেছিল, লেখক বর্তমান গ্রন্থে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ভারতীয়দের উপর পশ্চিমী জীবনযাত্রা, খৃষ্টধর্ম ও ইউটিলিটেরিয়ান মতবাদের নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ হিন্দুধর্মের নিকট একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। সাহেবী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতীয়দের তুলনায় নিজেদের হীনমন্য বোধ থেকে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান গড়ে ওঠে। লেখক এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র, টিলক, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের বক্তব্য বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। অন্যান্যদের তুলনায় পশ্চিমী সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে দয়ানন্দ একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন এবং অন্য ধর্মের প্রতি দয়া-

..., ...প্রথার মনোভাব পোষণ করতেন। সৈয়দ আহমদ খাঁকে তিনি বেদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়ার জন্যও একবার অনুরোধ করেছিলেন। বেদের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য তিনি আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, হিন্দুদের মধ্যে দলাদলি, বাল্য বিবাহ, অসত্যবাদিতা, স্বার্থপরতা ও বেদকে অবহেলার জন্য ভারত বিদেশীর পরাধীন হয়েছিল এবং এ দোষগুলো দূর করতে না পারলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। দয়ানন্দের চিন্তাধারা প্রসারই উত্তর ভারতে গো-রক্ষা সমিতি এবং বর্তমানে জনসংঘের জনপ্রিয়তার একটি কারণ মনে হয়।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে মডারেটরাই সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন ইংরেজরা সত্যি সত্যিই ভারতের উন্নতি চায়। বিভিন্ন কারণে মোহভঙ্গের ফলে অরবিন্দের মত একদল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে উত্তর খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তরুণদের গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি, কোসথ, ওয়াশিংটনকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখতে আরম্ভ করালেন। ইংলণ্ডের প্রজা-বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব জনমানসকে নতুনভাবে

[illegible]বিত করতে থাকেন, অন্যদিকে [illegible]জীর অভিমত যা ১৯০৫ সালের [illegible] বিভক্তের অনেক আগে ১৮৯৭ সালে [illegible] মহারাষ্ট্রে গাজনা বন্ধের আন্দোলন [illegible] করে দেন। মহারাষ্ট্রে রাজনীতির [illegible] চরমপন্থা রাজনীতি এবং মুসলিম [illegible]দায়িকতা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে [illegible]প্রকাশ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের [illegible] দিয়ে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা [illegible] যে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী পণ্য [illegible]টের আন্দোলন আরম্ভ হল, বর্তমান [illegible] সেই আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [illegible]নতার আন্দোলনকে পঙ্গু করার জন্য [illegible]র বঙ্গকে দুই ভাগ করে একদিকে পূর্ববঙ্গে ঢাকার নবাবকে দিয়ে পূর্ববঙ্গে মুসলিম আধিপত্য এবং অপরদিকে বিহার ও উড়িশার সঙ্গে অবশিষ্ট বঙ্গকে যুক্ত রেখে কলিকাতার বাঙালীদের প্রাধান্য নষ্টের চেষ্টা হয়। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান [illegible]র সূত্রপাত ১৯০৫ সাল থেকে। ঐ [illegible] অনেক জমিদার যে চরমপন্থীদের সমর্থন করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা বিভক্ত পূর্ববঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের আশংকা করেছিলেন। আবদুল রসুল, [illegible]কত হোসেনের মত মুসলীম নেতারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আবুল কালাম আজাদও এক বিপ্লবী দলে যোগ দেন। [illegible] সময়ে আলিগড়ের ছাত্রদের কংগ্রেস থেকে দূরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডোর মরিসন প্রথমে এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করে দেন। পরবর্তী অধ্যক্ষ আর্চবল্ড ভাইসরয়ের সেক্রেটারী ডানলপ স্মিথকে চিঠি লিখে সরকার থেকে ঢাকার নবাবকে দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হন। এদেশের মার্কসবাদীরা মুসলীম লীগ স্থাপনের ব্যাপারে অর্থনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় পড়লে তাঁদের সে ধারণা একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক দিক কখনও দেখার চেষ্টা হয়নি। তাই কোন্ ঘটনা কি জন্য ঘটছে, তা জেনে কারণগুলি দূর করার চেষ্টা হয়নি। সমাজকে আধুনিকীকরণ করতে গেলে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তাও জানা প্রয়োজন। ডঃ ত্রিপাঠি সমসাময়িক সমস্যার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ৪০৪/৬৭

রবীন্দ্রনাথের পত্র

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ—বীণা মুখোপাধ্যায়—৪৭ গণেশ এভিনিউ, কলকাতা-১৩। দাম-দশ টাকা। পৃষ্ঠা-৩৩১।

কবিকে তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যায় না, রচিত গ্রন্থগুলিতেও আসল মানুষের সন্ধান মেলে না। প্রধানত প্রিয়জন ও পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট লিখিত চিঠিপত্রে লেখকের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমস্যা তাঁর মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, কেমন করে তিনি সে-সব সমস্যার সমাধান খুঁজছেন, প্রিয় জনদের নিজের কথা জানাবার সময় তা অনেক সময় আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্যও লেখিকা ডঃ বীণা মুখোপাধ্যায় কবির চিঠিপত্রের মধ্যে আসল মানুষটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে অজস্র পত্র লিখেছেন। অনেকগুলি আসলে পত্রই নয়, পত্রের গণ্ডি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার বক্তব্য বলতে চেয়েছেন। চিঠিপত্র তাঁকে অনেক সময়েই গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ রচনার ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি যে-সব চিঠি লিখেছি, যাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্রভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে, এমন আর কোন লেখায় হয়নি।" (পৃঃ ১০)

লেখিকা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, (২) পত্রাত্মক প্রবন্ধমালা: রাশিয়ার চিঠি, 'পারস্যে' প্রভৃতি। (৩) আত্মগত ডায়েরি। চিঠিপত্রগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখিকা যেমন অনেক কবিতার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি অনেক কবিতার প্রথম খসড়ার সন্ধানও চিঠিপত্রের মধ্যে মিলেছে। বইটির দ্বাদশ অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বইটির চতুর্দশ অধ্যায়ে এদেশের ও বিদেশের পত্র সাহিত্য রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা জানার ব্যাপারে বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে। বাংলা বইতে দুর্লভ 'নির্দেশিকা' এই গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

(২২৮/৬৯)

হারাতে না পারতাম তবে আমার অ্যাথলেটিক জীবন হয়তো ওখানেই শেষ হয়ে যেত। তাই বিশ্ব রেকর্ড করার চেয়েও তামারা প্রেসকে পরাজিত করা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।'

তামারা প্রেস অ্যাথলেটিক থেকে অবসর নেবার পর নাদেজদা যখন ১৮·৬৭ মিটার দূরে লোহার গোলা ছুঁড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করলেন তখন অ্যাথলীট বিশারদরা তাঁর কৃতিত্বকে অতুলনীয় কৃতিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও মেক্সিকো অলিম্পিকের কিছু আগে মার্গেরিটা গামেল ১৮·৮৭ মিটার দূরে গোলা ছুঁড়ে নাদেজদার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন তবু মেক্সিকোয় নাদেজদাই ছিলেন সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী মেয়ে। কিন্তু মেক্সিকোয় গামেলের নিক্ষিপ্ত গোলা বিশ্ব রেকর্ড ছাড়িয়ে আরও ৭৪ সেণ্টিমিটার এগিয়ে যাওয়ায় নাদেজদার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যায়। মেক্সিকো থেকে লেনিনগ্রাদে ফিরে এসে আবার সাধনা আরম্ভ করেন কোচ ভিক্টর এলেক্সেভের অধীনে। ফলে, তাঁর সাম্প্রতিক কীর্তির নজির সাধনাই সিদ্ধির সোপান সে কথাই আর একবার প্রমাণ করলেন নাদেজদা চিজোভা।

দীপ্তিহীন দ্বৈত সফর

'ওভালে' নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুমের উপর প্রায় যবনিকা নেমে এসেছে। দুই একটি মামুলি খেলা শুধু বাকি।

প্রথমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ৩টি, পরে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ৩টি—দ্বৈত সফরের ৬টি টেস্টে ইংলণ্ড ৪টিতে বিজয়ী হয়েছে। দুটি টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। টেস্টে অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব সমেত দুই দেশের বিরুদ্ধে 'রাবার' লাভ করার ইংলণ্ডের নতুন অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থের অবশ্যই কৃতিত্ব আছে। নির্ভরযোগ্য কয়েকজন খেলোয়াড়ের চোট আঘাতের ফলে ইংলণ্ড কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়কেও দুই সিরিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয়, এই দ্বৈত সফর হয়েছে দীপ্তিহীন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজে যদিও বা কিছুটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে, নিউজিল্যাণ্ডের সিরিজ হয়েছে একেবারেই আকর্ষণহীন।

লর্ডসের প্রথম টেস্ট ইংলণ্ড অতি সহজে ২৩০ রানে জয়ের পর ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্ট বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ওভাল টেস্টেও ইংলণ্ড অতি সহজে নিউজিল্যাণ্ডকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে।

ইংলণ্ডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমে আসছে। এবারের দ্বৈত সফর সেই নিরুৎসাহে একটুও উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেনি। কিভাবে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করা যায়, এখন আরম্ভ হয়েছে সেই গবেষণা। ক্রিকেটের জন্মভূমিতেই ক্রিকেটের এই হাল, ক্রিকেটের উন্নতির পথে নিশ্চয়ই শুভ ইঙ্গিত নয়।

পূর্ব জার্মানীর যুবক যুবতীর মেডিসিনাল বলে স্বাস্থ্য চর্চার ছবি

যাই হোক, ওভালের তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের সহজ পরাজয় তাদের ব্যাটিং ব্যর্থতারই পরিচয়। প্রথম দিন দিনের শেষে তারা করে ৭ উইকেটে ১২৩ রান।

দ্বিতীয় দিন ১৫০ রানে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ১৭৪। তৃতীয় দিনে ২৪২ রানে ইংলণ্ড ইনিংস শেষ। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৭১। চতুর্থ দিন নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং-এ কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয়। ফলে, দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ২২৯ রান। জয়ের জন্য ইংলণ্ডের ১৩৮ রানের প্রয়োজনের মধ্যে ওই দিনই ১ উইকেটে ৩২ রান সংগ্রহ। শেষ দিন ৯টি উইকেট হাতে নিয়ে বাকি ১০৬ রান করা প্রায় নিয়মরক্ষার ব্যাপার।

ইংলণ্ড থেকে নিউজিল্যাণ্ড দল আসছে ভারত সফরে। ভারতে তাদের তিনটি টেস্টের প্রথম টেস্ট আরম্ভ হচ্ছে ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে। দেখা যাক নিউজিল্যাণ্ড ভারতেই বা কেমন খেলে।

নীচে ওভাল টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল।

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ১৫০ (জি টার্নার ৫৩, বি কংডন ২৪, বি হেস্টিংস ২১; ডেরেক আণ্ডারউড ৪১ রানে ৬ উইকেট, রে ইলিংওয়ার্থ ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৪২ (জন এডরিচ ৬৮, ফিল শার্প ৪৮, জিওফ বয়কট ৪৬, টেলর ৪৭ রানে ৪ উইকেট, কানিস ৪১ রানে ৩ উইকেট, হাওয়ার্থ ৬৬ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২২৯ (বি হেস্টিংস ৬১, বি কংডন ৩০, জি ডাউলিং ৩০, জি টার্নার ২৫; ডেরেক আণ্ডারউড ৬০ রানে ৬ উইকেট, অ্যালান ওয়ার্ড ২৮ রানে ২ উইকেট, স্নো ৫২ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইকেটে) ১৩৮ (মাইক ডেনেস নট আউট ৫৫, ফিল শার্প ৪৫; কানিস ৩৬ রানে ২ উইকেট)

(ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী)

একলব্য

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

ডাবলস-এর খেলা আরম্ভ ও কোর্ট বদলের নক্সা। ১ নম্বর চিত্রে 'অ' খেলা আরম্ভ করছেন সার্ভিস করে। ২ নম্বর চিত্রে পয়েন্ট পেয়ে বাঁ দিক থেকে সার্ভিস করছেন। ৩নং চিত্রে পয়েন্ট পেয়ে আবার ডান দিক থেকে সার্ভিস। ৪ নম্বরে সার্ভিস নষ্টের পর অপর দলের 'ক'-এর সার্ভিস আরম্ভ ডান কোর্ট থেকে। পয়েন্ট পেয়ে ৫ নম্বরে বাঁ দিক থেকে সার্ভিস। ৬ নম্বরে 'ক'-এর সার্ভিস নষ্টের পর 'খ'-এর সার্ভিস ডান কোর্ট থেকে

গত সপ্তাহে গেম সেটিং সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ১৩—১৩ পয়েন্ট বা ১৪—১৪ পয়েন্টে (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯—৯ এবং ১০—১০ পয়েন্ট) গেম সেট করার ব্যাপারে আমপায়ারেরই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত তিনি গেম সেট করবেন, না সরাসরি খেলে যাবেন। তবে আম্পায়ারের ভুল হলে খেলোয়াড়ও সেটিং-এর দাবী জানাতে পারেন।

ডাবলসের খেলা

৯। (এ) কোন্ দল প্রথম সার্ভিস করবে তা নিষ্পত্তি হবার পর ডানদিকের সার্ভিস কোর্টে অবস্থানকারী খেলোয়াড় কোনাকুনি বিপরীত সার্ভিস কোর্টে সাটল সার্ভ করে খেলা আরম্ভ করবে। যদি সাটল পাটাতনে বা মাটিতে পড়বার আগে শেষোক্ত খেলোয়াড় (বিপরীত পক্ষের ডান কোর্টের খেলোয়াড়) সাটল মেরে ফিরিয়ে দেন তবে 'ইন' সাইড-এর যে কোন খেলোয়াড়কে আবার সাটল মেরে অপর কোর্টে ফিরিয়ে দিতে হবে, আবার 'আউট' সাইড-এর একজন সাটল 'ইন' সাইডে ফিরিয়ে দেবেন। এইভাবেই খেলা চলবে যতক্ষণ না কেউ আইনগত ভুলত্রুটি করবে বা যতক্ষণ না সাটল খেলার বাইরে বলে গণ্য হবে (বি অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যদি 'ইন' সাইড-এর কারো মারে আইনগত ভুল বা ত্রুটি হয় তবে তাদের সার্ভিস করার অধিকার চলে যাবে। কারণ যারা খেলা আরম্ভ করবে প্রথমবার তাদের একজনই সার্ভিস করার সুযোগ পাবে (১১ নম্বর আইন দ্রষ্টব্য)। এইবার বিপরীত পক্ষের ডানদিকের কোর্টে অবস্থানকারী খেলোয়াড় সার্ভিস করবে। যদি এই সার্ভিস মেরে ফিরিয়ে দেওয়া না হয় কিংবা 'আউট' সাইড খেলোয়াড় মারে, আইনগত ভুল ত্রুটি করে তবে 'ইন' সাইড একটি পয়েন্ট পাবে। এই পয়েন্ট পাবার পর ইন সাইড-এর যে খেলোয়াড় সার্ভিস করছিলেন তিনি ডানদিকের কোর্ট থেকে বাঁ দিকের কোর্টে যেয়ে আবার সার্ভিস করবেন কোনাকুনি বিপরীত কোর্টে (লেফট কোর্ট থেকে লেফট কোর্টে)। যতক্ষণ তাদের সার্ভিস নষ্ট না হবে অর্থাৎ তারা 'ইন' সাইড হিসাবে থাকবে ততক্ষণ পর্যায়ক্রমে সার্ভিস কোর্ট বদল করে কোনাকুনি বিপরীত সার্ভিস কোর্টে সার্ভিস করতে হবে। অবশ্য তখনই এবং কেবল মাত্র তখনই সার্ভিস কোর্ট বদল করতে হবে যখন একটি পয়েন্ট সংগৃহীত হবে।

(বি)। যে কোন দলের বা পক্ষের প্রথম বারের সার্ভিস ডান সার্ভিস কোর্ট থেকে আরম্ভ হবে। যিনি সার্ভিস করবেন তিনি র‍্যাকেট দিয়ে সাটল মারবার সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিস করা হয়েছে বলে ধরা হবে। তারপর যতক্ষণ না সাটল মাটিতে পড়ছে কিংবা কারো মারে আইনগত ভুলত্রুটি না হচ্ছে, অথবা 'লেট'-এর (আইনগত কারণে আবার সার্ভিস করা বিধানকে 'লেট' বলে) ঘটনা না ঘটছে, যা ১৯ নম্বর আইন অনুযায়ী সাটল খেলার বাইরে বলে গণ্য না হচ্ছে ততক্ষণ সাটলকে খেলার মধ্যে বলে ধরতে হবে। সার্ভিস হয়ে যাবার পর যিনি সার্ভিস করছেন এবং যার কাছে সার্ভিস করা হচ্ছে তারা ইচ্ছে মত নিজেদের পাশের কোর্টের যে কোন জায়গায় দাঁড়াতে পারেন। এমন কি নিজেদের পাশের কোর্টের বাউন্ডারি লাইনের বাইরে দাঁড়ানোতেও বাধা নেই।

১০। যে খেলোয়াড়কে সার্ভিস করা হবে কেবল মাত্র তিনিই সার্ভিস মেরে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি তার সহ খেলোয়াড় সাটল স্পর্শ করেন বা মারেন তবে 'ইন' সাইড একটি পয়েন্ট পাবে। একই গেমে কোন খেলোয়াড় পর পর দুটি সার্ভিস রিসিভ করতে পারে না। ১২ নম্বর আইন অবশ্য ব্যতিক্রম (১২ নম্বর আইনে সহ খেলোয়াড়দের সার্ভিস কোর্ট বদলের ভুলের কথা বলা হয়েছে)

১১। যে দল প্রথম খেলা আরম্ভ করবে প্রথমবার তাদের একজনই সার্ভিস করার সুযোগ পাবে। তারপর সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রতি বারে প্রতি দলের দুইজন পর পর সার্ভিস করবে। যে দল একটি গেম জিতবে পরের গেমে তারাই প্রথম সার্ভিস করার সুযোগ পাবে। তবে বিজয়ী দলের যে কোন খেলোয়াড় পরের গেমে প্রথম সার্ভিস করতে পারে এবং প্রতি পক্ষের যে কোন খেলোয়াড় প্রথম সার্ভিস রিসিভ করতে পারে।

মুকুল

চিত্রমুক্তির সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, 'পূর্ব চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত বায়োস্কোপের কমিটির ("গুপী গাইন... এর মুক্তি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত) অনুরোধ উপেক্ষা করে মিনার-বিজলী-ছবিঘরের কর্তৃপক্ষ যদি "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবির পর "আরোগ্য নিকেতন" প্রদর্শনের জন্য রাজী না হন তবে সমিতি আবার আন্দোলন শুরু করবেন।

সমিতির আন্দোলনের পাঁচ-দফা কর্মসূচী এইরূপ : (ক) পোস্টার, লিফলেট ও জনসভা করে আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ, (খ) সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিল্পী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও চলচ্চিত্রলোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে 'কনভেনশন', (গ) মিনার-বিজলী-ছবিঘরের সামনে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) প্রতীক বিক্ষোভ প্রদর্শন, (ঘ) উক্ত চেনের সামনে প্রতীক অনশন, (ঙ) উপরোক্ত কর্মসূচী ব্যর্থ হলে সত্যাগ্রহ।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীঅজিত বসু, শ্রীসুবোধ মিত্র, শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপারিজাত বসু বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

মিনার-বিজলী-ছবিঘরে অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত কে এল কাপুর প্রোডাকশনের "মেঘ ও রৌদ্র" মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই রিলিজ চেন-এ চিত্রমুক্তি নিয়ে নতুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বায়োস্কোপের কমিটির আহ্বায়ক শ্রীএম এ মঈন এক বিবৃতিতে (১৫।৭।৬৯) এই অভিযোগ করেন যে, মিনার-বিজলী-ছবিঘরের কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের দরুণ উক্ত চেন-এ "আরোগ্য নিকেতন" মুক্তির ব্যবস্থা সম্ভব হল না। তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, ৫ মে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই অনুসারে "গুপী গাইন..."-এর পর মিনার-বিজলী-ছবিঘরে সংরক্ষণ সমিতি নির্বাচিত দুটি ছবি দেখাবার কথা, তারপর "মেঘ ও রৌদ্র"।

এই প্রসঙ্গে মিনার-বিজলী-ছবিঘরের মালিক পক্ষের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ৫ মে তারিখের চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারী ও লঙ্ঘনকারী পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি, মিনার-বিজলী-ছবিঘরের কর্তৃপক্ষ নন। ৬ মে উক্ত সমিতি বায়োস্কোপের কমিটির অনুরোধ ও প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ করে ৫ মে তারিখের চুক্তি লঙ্ঘন করেন এবং "গুপী গাইন..."-এর মুক্তির বাধাত সৃষ্টি করে সিনেমাগৃহ ও মালিকের গৃহের সম্মুখে সত্যাগ্রহ ও অনশন আন্দোলন শুরু করেন। অতঃপর ৫ মে তারিখের চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। উক্ত চেনের কর্তৃপক্ষ আরও জানান, "গুপী গাইন..." এর পর উক্ত চেন ১ মার্চ, ১৯৬৮ তারিখের পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী "মেঘ ও রৌদ্র" দেখাতে বাধ্য। তবে "মেঘ ও রৌদ্র"-র প্রযোজকের সম্মতি সাপেক্ষে সম্মতি আদায়ের দায়িত্ব বায়োস্কোপের কমিটির) "গুপী গাইন..."-এর পর "আরোগ্য নিকেতন" দেখাতে তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন।

"প্যার কা সপনা" (পরিচালক : হৃষীকেশ মুখার্জি) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

ইয়াকীন

খোসলা কমিটির সুপারিশের কয়েক দিন পরই "ইয়াকীন" (ব্রিজ পরিচালিত) হিন্দী চিত্রে দেখা গেল শর্মিলা ঠাকুর 'শর্ট' (তাও আবার বেশ ছোট) পরে বেশ স্বচ্ছন্দে ছুটে চলেছেন, তারপরেই নায়ক ধর্মেন্দ্রর উৎপাতে (গান সহ) শর্মিলার কপট বিরক্তি এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যাবার নকল চেষ্টা। এটা অবশ্য নায়িকার গোঁসা, মিটমাট, তা একটু পরেই।

প্রেম ছবির বড় কথা নয়। আসল বস্তু ক্রাইম। এবং এ ছবিতেও আবার সেই প্রতিবেশী শত্রুরাজ্যের ব্যাপার—যারা ভারতের একটি ল্যাবরেটরির গোপন গবেষণার বস্তু (কী তা পরিচালকই জানেন) জেনে নিয়ে ল্যাবরেটরিটি উড়িয়ে দিতে চায়। নায়ক ধর্মেন্দ্র ওই ল্যাবরেটরির একজন বিজ্ঞানী, রিসার্চ ওয়ার্কার। তারই মত হুবহু দেখতে এক ব্যক্তি (ডুয়াল রোল-এর এই পাঁচটি হিন্দী ছবিতে নতুন আমদানি) রয়েছে শত্রুরাজ্যে। আগেও হিন্দী ছবিতে দেখেছি, আবারও দেখলাম নায়কের 'ডাবল' সেই ব্যক্তি অবলীলায় তার নীল চোখ কালো করে ফেলেছে। এবং বেশভূষায় নায়ক ধর্মেন্দ্রর মত সেজে ভারতে এসেছে নাশকতামূলক কর্মসূচী সম্পাদনের জন্য। তবে গলার স্বর তো আর এক রকম হয়

না, তাই নকল নায়ক হয়েছে বোবা। এদিকে নায়ক-প্রেমিকা রিটা (নায়িকার এই নাম যে কতবার আর হিন্দী ছবিতে শুনব) ধরেই নিয়েছে তার বলন্ত বাকশক্তি হারিয়ে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। রিটার (শর্মিলা) বিপদ অনেক বেশী, সে সন্তানসম্ভবা। অতএব নায়ক ফিরে না এলে এবং পূর্ব কথা অনুযায়ী বিয়ে না হলে তার সর্বনাশ। রিটার অন্তঃসত্ত্বা হবার কী দরকার ছিল? এই কারণেই নায়কের ছদ্মবেশধারী ভিলেন রিটাকে খুন করতে পারেনি। তার উপর কর্তাদের ওইরকমই আদেশ ছিল। পরে অবশ্য তাকে বলা হয়েছে, এই ধরনের কাজে জজবাত (আবেগ) শোভা পায় না।

সে যাই হোক, বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী নায়ক যথাসময়ে শত্রুর জোর কারাগার থেকে পালিয়ে যথাসময়ে (অর্থাৎ ল্যাবরেটরি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার এক মুহূর্ত আগে) এসে গেছে। ভিলেন ল্যাবরেটারিতেই পুড়ে মারা গেছে। গোয়েন্দা পুলিসের হাতে অন্য দুর্বৃত্তও ধরা পড়েছে—তাদের মধ্যে একজন আবার পুলিস অফিসার (এটা একটা সাসপেনস), যে শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছিল ইত্যাদি যে-সব ব্যাপার ঘটেছে—যা দর্শককে কৌতূহলাক্রান্ত ও রোমাঞ্চিত রেখেছে—তারই ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত গান। এবং ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত অনেক সুন্দর দৃশ্য।

রেকর্ড-সমালোচনা

গত ২৯ আগস্টের দেশ-এ রেকর্ড সমালোচনায় "সহজ গানের পাঠ" রেকর্ডটির সুরকার-রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ওই রেকর্ডের গানের সুর রচনায় কৃতিত্ব শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তীর।

টলি-টিপ্পনী

অরবিন্দ মুখার্জি'র পরিচালনায় "নিশিপদ্ম"-র কাজ এগিয়ে চলেছে—ছবির একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও উত্তমকুমার

ফটো—দেশ

অবশেষে বাংলা ছবিতেও "চুম্বন" সেন্সর কমিটির ছাড়পত্র পেল। একটা নয়, দুটো চুম্বনের দৃশ্য ছিল "মন নিয়ে" ছবিতে। পরিচালক সলিল সেন বেশ একটু চিন্তিত ছিলেন দৃশ্য দুটি নিয়ে। টেক্ করার পর একবার ভেবেছিলেন এডিটিংয়ে বাদ দিয়ে দেবেন। কিন্তু খোসলা কমিটির রিপোর্ট বেরুনোর পর ভরসা করে আর বাদ দেননি। গত শুক্রবার ছবিটির সেন্সর হয়ে গেল। "আনকাট-ইউ" চিত্রে 'মন নিয়ে' চিহ্নিত হল। ছবির চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে সেন্সর কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্নই তুললেন না। সলিলবাবুকে বললাম, "বেঁচে গেলেন।" উত্তরে উনি বললেন, "বেঁচে গেলাম কারণ আমার ছবিতে চুম্বনের দৃশ্য সম্পূর্ণ শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত।"

[illegible] কিসিং [illegible] নেওয়া যাক্। ছবিতে উত্তমকুমারের রোলটি সাহিত্যিকের। সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে ভালোবেসে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে শহরতলিতে বেড়াতে এসেছেন সাহিত্যিক। [illegible] খাটে বসে লিখছেন। স্ত্রী পাশে শুয়ে। লিখতে লিখতে হঠাৎ সাহিত্যিকের মন রোমান্টিক হয়ে উঠল। স্ত্রীর গালে, কানে ও ঠোঁটে চুমু খেলেন।

মনে পড়ে, দৃশ্যটি টেক্ করার দিন স্টুডিওতে আমি হাজির ছিলাম। পরিচালক শ্রীসেন উত্তমবাবুর কানে কানে বলে দিলেন, 'টেক করে রাখি, তারপর সেন্সর আপত্তি করলে ফেলে দেব।' দৃশ্যটি যে শেষ পর্যন্ত কেটে দিতে হয়নি তার জন্য পরিচালক এখন খুব খুশী।

✽

ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর ক্যান্টিনে সেদিন তরুণকুমারের সঙ্গে দেখা। একলা চুপ চাপ বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "শ্যুটিং নেই বুঝি?" তরুণ জানালেন, "গত মাসে মাত্র দুদিন শ্যুটিং করেছি।" শুনে এতটুকু অবাক হলাম না। বাংলা ছবির অধিকাংশ শিল্পীর হাতেই এখন কাজ নেই। নতুন ছবি খুব বেশী হচ্ছেও না। কারণ, অনেক ছবি শেষ হয়ে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। হাউসের অভাবে রিলিজ হতে পারছে না। এমনিতর শেষ হয়ে থাকা "আনরিলিজড্" ছবির সংখ্যা নাকি প্রায় একশ, তথ্যটি জানালেন তরুণকুমার। সেই সব ছবির প্রযোজকরা স্বভাবতই নতুন ছবিতে হাত দিতে পারছেন না। তরুণকুমারের হাতে এখন নতুন ছবি মাত্র তিনটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওঁর মতে ইন্দর সেনের "প্রথম কদম ফুল"-এ। তরুণ সংরক্ষণ সমিতির একজন স্ট্রং সাপোর্টার। ইন্দর সেনের ছবি নাকি অসংরক্ষণ গ্রুপের। ইন্দরবাবু যে তরুণকুমারকে তার ছবি থেকে বাদ দেননি এটাই প্রমাণ করছে বাংলা ছবির জগতে এখন আর কোন দলাদলি নেই। [illegible] সে কথা। মুচকি হেসে তরুণকুমার মন্তব্য করলেন, "তা, ইন্ডাস্ট্রির [illegible] মধ্যে এইটুকু যা আশার দিক।"

—বিচক্র

"আত্মপ্রকাশ" ছবি হচ্ছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুপঠিত উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ" ছবি হচ্ছে। দেশ-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসটি পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। জানা গেল, প্রযোজক বিজয় চট্টোপাধ্যায় কাহিনীটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন।

স্ত্রীর পত্র

"স্বপ্ন নিয়ে"-র পর পূর্ণেন্দু পত্রী রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র"-র চিত্ররূপ তৈরি করছেন। রূপদর্শীর প্রযোজনায় এই ছবিতে নতুন শিল্পীদের দেখা যাবে। চিত্রপরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার যুগ্ম দায়িত্ব শ্রীপত্রীর। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে এক সম্ভ্রান্ত গৃহবধূর নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই "স্ত্রীর পত্র"।

"রূপসী" আউটডোরে

গত সপ্তাহে আউটডোরে এ আর সি প্রোডাকশন্সের "রূপসী"র শ্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন অজিত গাঙ্গুলি। সন্ধ্যা রায়, শমিত ভঞ্জ, স্বাতী ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, অনুভা ঘোষ, [illegible] ব্যানার্জি, তপেন চ্যাটার্জি, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, সুলতা চৌধুরী প্রমুখ ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। অনিল বাগচী সংগীতপরিচালক।

"দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু

গত সপ্তাহে এস এস ফিল্মসের "দুটি মন" ছবির শ্যুটিং পীযূষ বসুর পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে। বিনয় চ্যাটার্জির কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। সুপর্ণা সেন ছবির প্রযোজিকা এবং নায়িকা। উত্তমকুমারকে দেখা যাবে দ্বৈত ভূমিকায়। প্রথম দিনের শ্যুটিংয়ে এই দুই শিল্পী সহ ছায়া দেবীও ছিলেন।

"আমি মন্ত্রী হব"
রঙমহলের নতুন নাটক

রঙমহলে আবার হাসির নাটক "আমি মন্ত্রী হব"। শুধু হাসির নাটকই নয়, ব্যঙ্গাত্মকও। রচয়িতা : সুনীল চক্রবর্তী। গত ৩ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন নাটক অভিনয় শুরু হয়েছে। সরযূ দেবী, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, বাসবী নন্দী, নন্দিতা দে, রত্না ঘোষাল প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করবেন।

পরলোকে এস এস ভাসান

দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালক এবং জেমিনি স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী এস এস ভাসান অল্পকাল রোগভোগের পর গত ২৬ আগস্ট পরলোক-গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬। শ্রী ভাসান রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। "আনন্দ বিকাতন" নামে একটি তামিল সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। তিনি দুই বছরের জন্য ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি ছিলেন।

এস এস ভাসান

তা ছাড়া, তিনি চলচ্চিত্রজগতের আরও একাধিক সংগঠনের নেতৃত্ব করেছেন। ভারতের চলচ্চিত্রনির্মাতাদের অন্যতম নেতা শ্রীভাসানের মৃত্যুসংবাদে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্রশিল্পে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধাররা শোকবাণী প্রেরণ করেন।

শ্রীভাসান ১৯৪১ সনে জেমিনি স্টুডিও স্থাপন করেন। জেমিনি চিত্র সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করে "চন্দ্রলেখা" ছবির মাধ্যমে। তারপর অনেক হিন্দী চিত্র তিনি উপহার দেন। তার মধ্যে "সংসার", "মিঃ সম্পত", "নিশান", "আজাদ", "ইনসানিয়াৎ", "বহুত দিন হুয়ে", "শতরনজ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান।

বাল্মীকি প্রতিভা

অবাক করে দিয়েছে দক্ষিণীর শিশু শিল্পীরা। গত ২৪ আগস্ট সকালে কলামন্দিরে তারা কবিগুরুর "বাল্মীকি-প্রতিভা" নৃত্য-গীতিনাট্যটি যেরূপ দক্ষতার সাথে পরিবেশন করলো তার তুলনা হয় না। শিল্পীদের বয়স খুব বেশী নয়। পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। কিন্তু কি নাচে আর কি গানে তারা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে। শেষ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত করতালি আদায় করে তবে ছেড়েছে। কচি কচি মুখ, ছোট ছোট হাত-পা, কিন্তু কি অ্যাকশনে আর কি এক্সপ্রেশনে বড়দের চেয়ে কোন অংশেই ছোট নয় তারা। গানগুলি শিল্পীরা নিজেরাই গেয়েছে। এমন কি রাগাশ্রয়ী গানগুলিও। এটা বড় সহজ কথা নয়।

মঞ্চের উপরে যাদের দেখা গেল তাদের কে ভাল আর কে মন্দ আলাদা করা দুষ্কর। তবে নিখুঁত ওজনে বাল্মীকি (রাজর্ষি চ্যাটার্জী) আর পেটমোটা দস্যুটি (কুণাল ঘোষ) বেশী প্রশংসা পাবে।

ছোটদের এই অসাধারণ সাফল্যের পশ্চাদপটে বড় যাঁরা আছেন তাঁরাও ধন্যবাদের পাত্র। অমল নাগের সংগীত পরিচালনা এবং আলো রায়ের নৃত্য পরিচালনা প্রশংসনীয়।

এই উপহারটির জন্য দক্ষিণী গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশিস মুখার্জি, মঞ্জুলা গুহ-ঠাকুরতা এবং শুভ গুহঠাকুরতাকে। তাঁদের এই নিবেদনটি ভোলবার নয়।

তরুণ অপেরার "রাজা রামমোহন" ও "লেনিন"

তরুণ অপেরার "হিটলার" যাত্রাভিনয় ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সংস্থার পরবর্তী দুটি নিবেদন "রাজা রামমোহন" (রচনা : সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়) এবং "লেনিন" (রচনা : শম্ভু বাগ)। দুটি নাটকেরই নামভূমিকার শিল্পী শান্তি-গোপাল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর ঘোষ দুটি নাটক পরিচালনা করবেন। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে "রাজা রামমোহন" অভিনয় হবে। তার আগে শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। তরুণ অপেরা জানিয়েছেন, গত ৩ [illegible] "হিটলার" অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ শিল্পীদের কল্যাণে দান করা হবে।

জামসেদপুরে "অজাতক"

জামসেদপুরের "মৌসুমী" নাট্যসংস্থা দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় মিলনী মঞ্চে (বিষ্টুপুর) দুই দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিন সংস্থার সভাসভ্যদের কর্তৃক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "কণ্ঠনালীতে সূর্য" অভিনীত হবে। দ্বিতীয় দিনে এটা কলকাতার এল টি জি এন্টারপ্রাইজ-এর প্রযোজনা সন্তোষকুমার ঘোষ রচিত "অজাতক" মঞ্চস্থ করবেন। এই নাটকের নির্দেশনায় আছেন অশোক মিত্র। আলো, মঞ্চ ও সংগীতের দায়িত্ব রয়েছেন যথাক্রমে স্বরূপ মুখার্জি, সুরেশ দত্ত ও [illegible] মিত্র। তিনটি মাত্র চরিত্রের এই নাটকের শিল্পী হলেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র ও নিমু ভৌমিক।

যদুবংশ

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার গিল্ড আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে বিমল করের "যদুবংশ" মঞ্চস্থ করবেন। সমীর লাহিড়ী উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন। অভিনয়ে যোগ দেবেন গিল্ডের শিল্পীগোষ্ঠি।

বোম্বাই বিচিত্রা

গত ছাব্বিশে আগস্ট সকালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি বহু ঘোষিত নাম এ জগৎ ছেড়ে চলে গেল। শ্রী এস এস ভাসান জীবনে প্রায় সব কিছুই বৃহৎভাবে এবং জাঁকজমকের সঙ্গে করেছেন। সাংবাদিকসুলভ প্রচারপ্রিয়তা তাঁর সহজাত ছিল। এ ছাড়া শ্রীভাসান ছিলেন প্রচণ্ডভাবে প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী। সব কিছুই তিনি সব সময়ে নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী [illegible] এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে করাতে বাধ্য করতেন। কবে ছবির কাজ আরম্ভ করবেন, কবে সে ছবি শেষ হবে, এমন কি কবে সে ছবি মুক্তি পাবে এ সমস্ত কিছুই আগে থেকে ঠিক করে ফেলতেন এবং সেই অনুযায়ী ছবির ভারত [illegible] সংস্থা প্রচার [illegible] লেগে যেত। শ্রীভাসান একাধারে সাংবাদিক, প্রযোজক, পরিচালক, স্টুডিও মালিক এবং চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের অন্যতম [illegible] ভূমিকায় অনায়াসে কাজ করে গেছেন [illegible]। মধ্যে মধ্যে রাজনীতির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন [illegible]। আজ থেকে তিরিশ বছরেরও [illegible] আগে শ্রীভাসান সহযোগী প্রযোজক হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ [illegible]। এ সময়ে শ্রীভাসানের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা প্রায় বারো বছরের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে বছর শুরু হয় সেই বছরে চিত্র জগতে শ্রীভাসান প্রবেশ করেন এবং মহাযুদ্ধ যখন মধ্যপথে, অর্থাৎ উনিশ 'শ [illegible] সালে তিনি ভারতের অন্যতম [illegible] স্টুডিও "জেমিনী"র পত্তন করেন। [illegible] প্রথম ছবি (সহযোগী) [illegible] স্বদেশিকতার অপরাধে [illegible] ব্রিটিশ সরকারের কোপানলে [illegible] আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এই [illegible] শ্রীভাসান সম্ভবত সারা জীবন মনে [illegible]। তাই প্রমোদ জগৎকে মুখ্য করে [illegible] এবং জৌলুষের প্রাচুর্য ছড়িয়ে [illegible] পর একটা সার্থক ছবি করে গেছেন। [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে [illegible] ছবি 'চন্দ্রলেখা' এক নতুন [illegible] সৃষ্টি করেছে। স্টার ভ্যালু ছিল, [illegible]। কিন্তু প্রডাকশন ভ্যালুও [illegible] গ্রাহ্য হতে পারে এটা শ্রীভাসানই [illegible] এদিকের চিত্রনির্মাতাদের বোঝান। [illegible] জাতীয় দু-একটি ইনটারেস্টিং [illegible] করেছেন শ্রীভাসান। কিন্তু মৃত্যুর [illegible] শ্রীভাসান কি করে 'শতরঞ্জ'-এর মত [illegible] করলেন এটা আমাদের অনেকেরই [illegible] নয়। তবুও শ্রীভাসানের মৃত্যুতে ভারতীয় চলচ্চিত্র এমন একজনকে হারালো যিনি নেতা হয়েও শ্রদ্ধেয় ছিলেন, চিত্র-ব্যবসায়ী হয়েও বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, স্পেকুলেটর হয়েও যিনি [illegible] ছিলেন, অভিভাবক হয়েও যিনি অভিনন্দনীয় ছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায় শ্রীভাসানকে অনায়াসে স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

"সোনাই দীঘি" ফিল্ম হচ্ছে এবং তাতে বোম্বাইয়ের প্রাণ ও জয় মুখার্জি অভিনয় করবেন—প্রাণকে (ভাবনা কাজীর ভূমিকায়) স্ক্রিপ্ট পড়াচ্ছেন পরিচালক অসীম ব্যানার্জি

*

হিন্দী চলচ্চিত্রের আকাশ নানা রঙের রঙীন মেঘে সর্বদা মেঘলা। রাজকাপুর, শান্তারাম, চোপড়া, রাজহান প্রভৃতি প্রদর্শিত চকচকে চমকদার মেঘে আকাশের অনেকখানি আচ্ছন্ন। তারই ফাঁকে সাদা কালো মেঘের উঁকিঝুঁকি বেশ আকর্ষণীয়ভাবে চোখে পড়েছে আজকাল। কয়েকজন ব্যবসায়ীও আজকাল ঐ সাদা কালো মেঘের মুখ চেয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে এক আধটি ঐ সাদা কালো মেঘ থেকে অপ্রত্যাশিত সাফল্য বর্ষিত হচ্ছে। অধুনা মুক্ত 'বালক' নামক একটি ছবি বম্বেতে বক্স অফিস-রেকর্ড করেছে। মৃণাল সেনের "ভুবন সোম" ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সম্মানিত হয়েছে। এই সব খবরের সূত্র ধরে বম্বের ব্যবসাবিধ্বস্ত জগতেও বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়েছে। এই চাঞ্চল্য নতুন পথকে কতখানি সুগম করবে তা বলা শক্ত। কারণ "কজ" অনুপ্রাণিত পথ এবং "এফেক্ট" অনুপ্রাণিত পথ এক হয়েও ঠিক এক নয়। কারণ 'কজ' অনুপ্রাণিত পথে প্রতিভার পদচারণা আর এফেক্ট অনুপ্রাণিত পথে লোভ এবং আশঙ্কার ঠগের বাস। তাই যখনই "কজ" অনুপ্রাণিত প্রডাক্ট ব্যবসা ক্ষেত্রেও সার্থক হয় তখনই ভয় হয়। "কজ" ব্যবসা সার্থক হলেও তার ফলে কী সব ছবির জন্ম হতে পারে সে ধারণা আমাদের আছে। একজন সার্থক সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের পর কতজন অসার্থক অসমর্থ, সত্যজিতের জন্ম বাংলা দেশের চলচ্চিত্র জগতেই হয়েছে তার হিসেব আমার পাঠকদের কাছেও খুব পরিষ্কার। সেই জন্যই বলছি পরিবর্তন আসছে বলেই উৎফুল্ল হতে পারছি না, পরিবর্তনকে যতক্ষণ পরিবেশ হজম করতে না পারছে ততক্ষণ স্বস্তির শ্বাস ফেলা অসম্ভব। কমার্শিয়ালিজমের ফরমুলা আছে, আটঘাট আছে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, ভাগ্যে বিশ্বাস আছে। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল বা আর্ট ফিল্ম-এর ক্ষেত্রে নির্মাতার প্রত্যয় এবং যোগ্যতা ছাড়া আর কি আছে? আর এই প্রত্যয় এবং যোগ্যতা যে উপযুক্ত এর বিচার ছবি তৈরির আগেই কে করবে? এটা একটা প্রশ্ন!

সরল শর্মা

"জল বিন মছলী, নৃত্য বিন বিজলী"

অগস্ট মাসে ভি শান্তারামের "জল বিন মছলী নৃত্য বিন বিজলী"-র অনেক দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুররচনায় একটি গানের দৃশ্য তার মধ্যে একটি। গানটি নায়িকা সন্ধ্যার মুখে, গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। ছবির শুটিং প্রায় শেষ।

'পাঞ্চজন্য'র 'কুমারসম্ভবম্' : একটি নৃত্যনাট্য

গত শ্রাবণী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় কলামন্দিরে "পাঞ্চজন্য"র উদ্যোগে কালিদাসের কুমারসম্ভব অবলম্বনে রচিত নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানটি ধ্রুপদী কাব্যের সঙ্গে ধ্রুপদী নৃত্যকলার সার্থক সমন্বয়সাধনার একটি রসোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সপ্তদশসর্গ সম্বলিত কুমারসম্ভবের প্রথম সাতটি সর্গই মাত্র কালিদাসের রচনা আর, অনেকেরই অনুমান পরবর্তী যে অংশে কার্তিকেয়ের জন্ম থেকে আরম্ভ করে তারকাসুর-নিধন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা বিবৃত, তা উত্তরকালের প্রক্ষিপ্ত অংশ। সেদিনকার নৃত্যনাট্যও কালিদাসের মূল অংশকে ভিত্তি করে হরপার্বতীর মিলনেই সমাপ্ত। কাব্যটির নৃত্যনাট্যরূপারোপ, সুর-সংযোজনায় ও নৃত্যপরিকল্পনায় এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটির নির্দেশনায় নাট্যাচার্য শ্রীআনন্দমের সুগভীর

লাইট হাউসে বর্তমান আকর্ষণ "জ্যাংগো" চিত্রে ফ্রাঙ্কো নিরো

রসবোধ এবং প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল।

মূলত ভরত-নাট্যমের আঙ্গিকে উপস্থাপিত এই নৃত্যনাট্যে উন্নত নৃত্য-নৈপুণ্যের আকর্ষণই ছিল বেশী। তবে কথাকলির ঢঙে ক্রোধোদ্দীপ্ত শিবের তাণ্ডব নৃত্যের দুরন্ত ছন্দ নরেশকুমারের প্রতিটি পদক্ষেপে আর সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-সঞ্চালনে যে তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল কিংবা মদনের ভূমিকায় কেলু নায়ারের আশ্চর্য পায়ের কাজ এবং কথাকলির নাট্যরসাশ্রিত ভাবাভিব্যক্তি যে রস সৃষ্টি করেছে, তা উপস্থিত রসজ্ঞ দর্শকমণ্ডলী অনেকদিন মনে রাখবেন। রতির ভূমিকাটিও সৌন্দর্য-মণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন মঞ্জু গুহ। অবশ্য কেলু নায়ারের সঙ্গে যুগ্ম-নৃত্যে তাঁকে যেন কিছুটা পরিশ্রান্ত মনে হয়েছে। পার্বতীরূপিণী ইন্দ্রাণী রায়-চৌধুরী দর্শকদের নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং পঞ্চমুখীতে পাঁচটি বিভিন্ন ছন্দে ও ছন্দে তাঁর নৃত্যপরিবেশনায় একটি নতুন ছন্দোস্পন্দের সুষ্ঠু ও সুদক্ষ প্রয়োগের পরিচয় ছিল। এই অংশের প্রারম্ভিক শ্লোকটি যদিও সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছিল কিন্তু ক্ষিতি, অপ্‌ প্রভৃতি পঞ্চভৌতিক প্রকৃতির দ্যোতনাটি নৃত্য-পরিবেশনায় খুব স্পষ্ট আকার নিয়েছে বলে মনে হল না।

কুমারসম্ভব-এর নৃত্যরসকে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে আবহসঙ্গীতের ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিকে যেমন শিবরঞ্জনী, ভূপালী, বাহার, মালকোষ হেমন্ত প্রভৃতি রাগাশ্রয়ী সুরের স্পর্শে একটি মনোজ্ঞ পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, আর একদিকে আবহ যন্ত্রের সুন্দর সঙ্গতে প্রতিটি মুহূর্ত স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে দাক্ষিণী নৃত্যকলায় উত্তর-ভারতীয় রাগ-প্রয়োগে যে অভিনবত্ব ছিল, তাও প্রশংসা উল্লেখের দাবি রাখে।

পশ্চাৎপট এবং মূল মঞ্চে আলোর কাজ ভাল হয়ে শিবের আসনটি একটু সুসজ্জিত হতে পারত।

আনন্দবর্ধন

আলেয়ার আলো

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত "আলেয়ার আলো"-র শুটিং প্রায় শেষ। সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনুপকুমার সন্ধ্যারানী, কালী ব্যানার্জি, মঞ্জু দে, ভানু ব্যানার্জি, শেখর চ্যাটার্জি, জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গোপেন মল্লিকের।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

সবাই বলে 'ভুতুড়ে টিপি'; আসলে সেটিও অরণ্যদেবের একটি গোপন আস্তানা।
কাছে যাসনে, বিপদ ঘটবে।

ওই সেই টিপি, ডায়না। এইখানে প্লেন নামাই, বাকী পথ খানিকটা গাড়িতে আর খানিকটা হেঁটে পাড়ি দেব।

বালতি করে উপরে উঠতে হবে, আমি জানি।

ভুতুড়ে টিপির কাছে---অরণ্যদেব ও ডায়না
ওভারকোটটা এবারে খুলে রাখা যাক। এ-সব শহুরে পোষাক আমার ভাল লাগে না।
তাই নাকি?

ভুতুড়ে টিপির নীচে খানিকটা জংলা জায়গা। তার আড়ালে গুহা।
অনেক দিন পর এখানে এলাম। আশা করি কিছু পালটায়নি।
এবারে গিয়ে বালতিতে উঠব। লিফটের চাইতে এই কলকব্জা কিছু খারাপ নয়।

আশ্চর্য, টিপি খুঁড়ে কী চমৎকার কলকব্জা বসানো হয়েছে।
এ সব অনেক দিন আগেকার ব্যাপার। বাইরের জগৎ এর খোঁজও রাখে না।
1/12

অরণ্যদেবের তাজ্জব কলকব্জা।
দড়ি টেনে উপরে উঠে যাব।

টিপিটা প্রায় হাজার ফুট উঁচু!
আমার মাথা ঘুরছে!
নীচের দিকে তাকিয়ো না। প্রায় উঠে এসেছি।

দ্যাখো, নীচের পৃথিবী এখান থেকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে।
সত্যিই চমৎকার। যেন পৃথিবীর ছাদের উপরে উঠে এলাম।

তোমার এক পূর্ব পুরুষ সবপ্রথম এই টিপিটার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই না?
সে এক অদ্ভুত কাহিনী। বসো, সব বলছি।
২

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীগোপালস্বরূপ পাঠক ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীপাঠক তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীজে শিব সম্মুখম পিল্লাইকে ২৩১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। শ্রীপিল্লাইকে সমর্থন করেন ডি এম কে, কমিউনিসট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি। নির্বাচনে মোট ৭২৫টি বৈধ-ভোট পড়ে। তার মধ্যে শ্রীপাঠক পেয়েছেন ৪০০ ভোট। পিল্লাই পেয়েছেন ১৬৯ ভোট। পি এস পি এবং বি কে ডি সমর্থিত তৃতীয় প্রার্থী এইচ ভি কামাথ পেয়েছেন ১৫৬ ভোট। অন্য তিনজন প্রার্থী কোন ভোট পান নি। রিটারনিং অফিসার ভোটপর্ব শেষ হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন। শ্রীপাঠক সবচেয়ে বেশী বয়সে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এখন তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর। শ্রীগিরি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ৭২ বছর বয়সে। শ্রীজি এস পাঠক আজ উপরাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি শ্রীপাঠককে মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠ করান।

দেশী সংবাদ

২৫ আগসট—বাঙ্গালোরে কংগ্রেসের যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তা কেটে গিয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটিতে মিটমাট হয়েছে:—প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দুই সহকর্মীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ফলে দলত্যাগ বা পদত্যাগ কিছুই ঘটছে না। এই ব্যাপারে সর্বসম্মত এক প্রস্তাবে দলের সংহতির জন্য, দলের নীতি রূপায়ণের জন্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দলকে নতুন বলে বলীয়ান করে তোলার জন্য কংগ্রেসকর্মীদের ডাক দেওয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার আলোচনা সম্পর্কেও কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২৬ আগসট—কংগ্রেস সংসদীয় দলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য কট্টরপন্থীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওই গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রস্তাব প্রবীণ নেতাদের মনঃপূত হয়নি। অথচ উদ্যোক্তারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ সোমবার হঠাৎ ভোটের দাবি জানালে সরকারের পতন ঘটতে পারে—এ আশঙ্কায় স্পীকার নাকি সে-দাবি নাকচ করে দেন। তারই জের হিসাবে আজ বিধানসভায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। বিরোধী সদস্যরা সভার কাজ চালানো অসম্ভব করে তুললে শতাধিক এম এল এ-কে অপসারণের জন্য পুলিস ও সশস্ত্র কনসটেবল বাহিনীর লোক ডাকতে হয়।

২৭ আগসট—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইন্দিরাজী তাঁর বাসভবনের সম্মুখে এক বিরাট জনসমাবেশে আজ বলেন, "যাঁরা ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিকে ওঁরা যে মেনে নিয়েছেন সেটা নেহাতই একটা চাল মাত্র। এখন ওঁরা আছেন সুযোগের প্রতীক্ষায়, সুবিধা পেলেই সব কিছু বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।"

একদিনে মালদহের আরও ২৫ বর্গমাইল এলাকায় বন্যার জল প্রবলবেগে ঢুকে পড়ে। বহু গ্রাম জলমগ্ন। কালিয়াচক থেকে খেজুরিয়াঘাট জাতীয় সড়কের উপর মাথা সমান জল। রাস্তায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

২৮ আগসট—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ বিড়লাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দত্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত। জানা গেল প্রস্তাবিত কমিশন হবে ভিভিয়ান বোস কমিশনের অনুরূপ। ভিভিয়ান বোস কমিশন তদন্ত করেছিলেন ডালমিয়া-জৈন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি সম্পর্কে। দু'মাসের মধ্যেই কমিশন রিপোর্ট পেশ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু তিন একর পর্যন্ত জমি খাজনা-মুক্ত করার ব্যবস্থা পাকা হল। এর ফলে প্রায় ষাট লক্ষ পরিবারকে কোন খাজনা দিতে হবে না। আজ বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৯ আগসট—বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীর ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনুচিত কাজ এবং ভুলভ্রান্তি তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২ সালের তদন্ত আইন অনুযায়ী একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন বলে শিল্প উন্নয়ন ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলী আমেদ আজ রাজ্যসভায় ঘোষণা করেন।

জেরুজালেমের আল্ আকসা মসজিদে অগ্নি-সংযোগের প্রতিবাদে আজ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় হরতাল পালন করেন। বিকালে কলকাতায় শহীদ মিনারের নিচে লক্ষাধিক মুসলমান এক প্রতিবাদ-সভায় মিলিত হয়ে মসজিদ অপবিত্র করার ঘটনার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানান।

৩০ আগসট—কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি কলকাতা ডকের ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮ হাজারের কিছু বেশী ডক শ্রমিক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুযোগ পাবেন। ওই ৮ হাজার নিয়ে কলকাতা ডকের শ্রমিক সংখ্যা ১৮ হাজার। কোন শ্রমিককে অবশ্য ছাটাই করা হবে না।

আজ পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিদের জানান, বঙ্গীয় পৌর (সংশোধিত) আইন অনুযায়ী বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা মূল্যের শিল্প সম্পদের উপর যে বর্ধিত কর চালু হয়েছে তা পরিবর্তন করা হবে না।

৩১ আগসট—গত ৩১ জুলাই বিধানসভা ভবনে পুলিসী হামলা সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত আর গুপ্ত কমিটি তার দীর্ঘ রিপোর্ট-এ পুলিসের আই জি এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের ডি আই জির কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন। এ ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি কাজের ত্রুটিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চা শিল্পে ধর্মঘট নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আজ সকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মালিকপক্ষ এক-পা এগিয়ে না এসে এক-পা পিছিয়ে গেলেন। তবে মীমাংসার জন্য তিনি তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫ আগসট—ওয়াশিংটন থেকে পরিবেশিত বলা হচ্ছে, মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে যে সকল পাথরকুচি কুড়িয়ে এনেছেন রাসায়নিক বিশ্লেষণে সেগুলির বয়স ৪৫০ কোটি বছরের কাছাকাছি বলে ধরা পড়েছে।

২৭ আগসট—সোভিয়েট লেখক ইউনিয়নের মুখপত্র লিটারেটারনায়া গেজেটিয়ার এক প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চীনে আড়াই কোটিরও বেশী লোককে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা তাস এই নিবন্ধটির উল্লেখ করেছেন।

২৮ আগসট—চেক কমিউনিসট পার্টির নেতা গুস্তাভ হুসাক আজ সর্বোচ্চ সোভিয়েট ও চেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি ওয়ারস চুক্তিভুক্ত দেশগুলির চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের বার্ষিকীতে দাঙ্গা দমন করেছেন।

২৯ আগসট—হংকং-এ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় চীন জনসাধারণকে সংহত করছে। সম্ভাব্য বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কারখানাগুলিকে স্থানান্তরিত করছে, খাদ্য মজুদ করছে এবং সীমান্ত অঞ্চলে প্রচুর সেনা পাঠাচ্ছে।

৩০ আগসট—জাপানের ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার ¼ শতাংশ বাড়িয়ে ৬¼% করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সুদের হার বাড়ানো হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

৩১ আগসট—সিরিয়া সরকার জানাচ্ছেন, আরব কমানডোরা গত শুক্রবার যাত্রীবাহী যে বিমানটি জোর করে এখানে এনেছিলেন তার যাত্রীদের মধ্যে ৪ জন ইজরায়েলী মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

নতুন উপরাষ্ট্রপতি— - ৬৩৭
ব্যঙ্গচিত্র— - ৬৩৮
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত - ৬৩৯
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য— - ৬৪১
বৈদেশিকী—দেবরাজ - ৬৪২
সুনন্দর জার্নাল— - ৬৪৩
মত্তুর ঘোড়া—শ্রীসৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - ৬৪৫
অদূরের দিল্লি—দরবেশ - ৬৫৫
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী - ৬৫৯

Amulspray

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৬৬১
বাংলার চালচিত্র—শ্রীআব্দুল জব্বার	৬৬৯
রেঙ্গুনের চিঠি—বিক্রমাদিত্য	৬৭৫
জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৭৯
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর	৬৮৩
আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	৬৮৯
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	৬৯৩
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	৬৯৫
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী	৭০১

প্রতি বছরের জ্বালা

এবং কেমন ক'রে তা জুড়োতে হয়

ঘামাচি। এক বিশ্রী গোটা গোটা মতন, চুলকোতে চুলকোতে যন্ত্রণা। জনসনস্ প্রিকলি হীট সাবান এবং প্রিকলি হীট পাউডার তাড়াতাড়ি ঘামাচি সারিয়ে দেয়। প্রথমে, ঔষধিযুক্ত জনসনস্ প্রিকলি হীট সাবান দিয়ে স্নান করুন। এতে রোমকূপের জ্বালায় আরাম দেয়, সংক্রামণ রোধ করে।

তারপরে গা শুকিয়ে নিয়ে তাতে জনসনস্ প্রিকলি হীট পাউডার মেখে আরাম এনে দিন। এতে এক বিশেষ ঘামাচি জীবাণুনাশক পদার্থ আছে। সঙ্গে-সঙ্গে আরাম দেয়। এইভাবে ঘামাচি সারাতে হয়।

জনসনস্ প্রিকলি হীট প্রোডাক্ট্স

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

আলোচনা—		-	৭০৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		-	৭১৩
পুস্তক পরিচয়—		-	৭১৫
খেলার মাঠে—একলব্য		-	৭১৭
ব্যাডমিণ্টনের আইনকানুন—মুকুল		-	৭২০
অরণ্যদেব—		-	৭২২
রঙ্গজগৎ—		-	৭২৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—		-	৭২৮

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

দাম ৫·০০

কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁদের গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠক কখন যেন একসময় সময় এবং আত্মবিস্মৃতে এক মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতায় পরিণত হয়ে যান; আর লেখক হয়ে ওঠেন এক মায়াবী কথক, যিনি তাঁর অমোঘ এবং লক্ষ্যভেদী কথার মায়াজালে পাঠকদের শুধু মায়ামুগ্ধই করে তোলেন না, তাদের নিশ্বাস ফেলার স্বাধীনতাটুকুও যেন হরণ করে বসেন। এমন লেখক খুবই কম; তবুও আছেন : প্রবীণ শৈলজানন্দ, মুজতবা আলী, বিমল মিত্র, এবং আরও কেউ কেউ। এঁদের লেখা পাঠককে বশ করে—বন্দী করে ফেলে।

শৈলজানন্দের নতুন বই "লোকরহস্য" এক দক্ষ চিত্রীর সযত্ন-নির্বাচিত চিত্ররাজির এক অমূল্য অ্যালবাম যেন। বর্ণময় পরিপ্রেক্ষিতের ভূমিকাহীন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

বিচিত্র চরিত্রের মিছিল

লোকরহস্য

স্বল্প কিছু রেখার টানে সুপরিস্ফুট এবং দীপ্ত কয়েকটি অনুপম রেখাচিত্রের অ্যালবাম। সামান্য কিন্তু সবল ক'টি রেখা—আড়ম্বরহীন এবং বর্ণাঢ্যতাহীন—অথচ তারই মধ্য দিয়ে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যময় ক'টি ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্র্যের উজ্জ্বল উদ্ভাস। স্বল্প পরিধিতে আবদ্ধ, তৎসত্ত্বেও এতই জীবন্ত যে, মনে হয় এরা আমাদের খুব কাছের মানুষ, খুব চেনা মানুষ, অহরহ যেন এদের দেখছি আমাদের চারপাশে ঘুরতে ফিরতে, কথা বলতে, হাসতে, কাঁদতে। এরা যেন আমাদেরই প্রতিরূপ, কিংবা আমরাই।

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

মনের মানুষ ৩·০০ প্রেমের গল্প ৪·০০ সারারাত ৫·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শহর-ইয়ার
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৮·০০

প্রেম
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

দু'হারা
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৭·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের

জল দাও
দাম ৩·৫০

বিমল করের

কুশীলব
সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৩·৫০

গ্রহণ
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

পরিচয়
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

ঘুণপোকা
দাম ৪·০০

সমরেশ বসুর

এপার ওপার
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

দুই অরণ্য
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

বিবর
নবম মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

জনম জনম হম
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

বিমল মিত্রের

প্রেম পরিণয় ইত্যাদি
সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৭·০০

রং বদলায়
পঞ্চম মুদ্রণ ॥ দাম ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কহেন কবি কালিদাস
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

শংকর-এর

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি
অষ্টম মুদ্রণ ॥ দাম ৪·৫০

বুদ্ধদেব গুহর

নগ্ন নির্জন
দাম ৪·০০

হলুদ বসন্ত
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ১

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৬
শনিবার ২৭ ভাদ্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক „	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৫ পয়সা

DESH

SATURDAY 13 SEPT. 1969

নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-পর্বের প্রবল উত্তেজনা কেটে যাবার পর উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও শেষ হয়ে গেছে। শ্রীগোপালস্বরূপ পাঠক উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীপাঠক ছিলেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি দুটি আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে শ্রীপিল্লাই এবং শ্রীকামাথকে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে দাঁড় করান; অবশ্য তার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে তীব্র হয়েছে তা বলা চলে না। এই নির্বাচনের কিছু আগেই কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্ব মোটামুটি মিটে যাওয়ায় রাজনৈতিক তাপ উত্তাপও সঞ্চার হয়নি। তবু একটি ব্যাপার বিশেষ-ভাবে লক্ষ করা গেছে: কংগ্রেস সদস্যদের পুরো ভোট শ্রীপাঠকের পক্ষে পড়েনি, কিছু ভোট শ্রীকামাথের পক্ষে পড়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, পঞ্চাশ থেকে ষাটজনের মতন কংগ্রেস সংসদ-সদস্য দলীয় নির্দেশ না মেনে শ্রীকামাথের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিবেক-ভোটের যে ধুয়ো উঠেছিল তার সুযোগ যে এখানে নেওয়া হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্ব আগেভাগে মিটমাট করে না নিলে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কী ফলাফল হত, তাও বোধ হয় অনুমান করা যায়।

শ্রীপাঠকের সাফল্যে একটু হয়ত খুঁত থেকে গেল, তবু কংগ্রেসের তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। আমরা নবনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাই। তিনি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতার অভাব নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে কিংবা রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিলেও বলা যায়, আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর অশেষ সুনাম আছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন, এই কামনাই করি।

পরলোকে 'হো'

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন গত ৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেছেন। গুরুতর হৃদরোগে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। প্রায় আশি বছর বয়সের মুখোমুখি হয়ে প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের এই বিদায় অস্বাভাবিক না হলেও নিজের দেশের এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সকল মানুষের কাছে তাঁর মৃত্যু একটি গভীর আঘাত ও বেদনার বিষয়। আজকের জগতে রাজনৈতিক নেতার অভাব বড় নেই, কিন্তু তেমন নেতা দুর্লভ যিনি দেশের সকল মানুষের কাছেই হৃদয়ের ধন, যিনি দেবতাজ্ঞানে পূজিত ও আদরণীয়। হো চি মিন তেমনই একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি। এই রহস্যময় মানুষটির জীবনকাহিনী বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবু মনে রাখতে হবে, স্কুলে বিদ্যালাভ শেষ করার পর যে তরুণ রুজি রোজগারের জন্যে জাহাজের সামান্য তুচ্ছ এক চাকরি নিয়ে জীবন-সংগ্রাম শুরু করেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের কাছে আজ শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী, বিপ্লবী ও দেশসেবকরূপে অভিনন্দিত হয়ে উঠেছেন। হয়ত একথা বলা চলে, দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যে তিনি বহু অভিজ্ঞতা ও সাধনায় নিজেকে এবং নিজের আদর্শকে প্রস্তুত করেছেন, গঠন করেছেন স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীর দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাঁর দলীয় সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিক কৃষকদের সহায়তায় দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফরাসীরা ভেবেছিল, এই স্বাধীনতা তারা অপহরণ করতে পারবে; সে-আশা তাদের সফল হয়নি, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে বরাবরের জন্যে পাততাড়ি গুটোতে হয়, সেটা ১৯৫৪ সালের কথা। এ-সময় হো চি মিনের সাহায্যে ব্রিটেন ও আমেরিকা এগিয়ে আসে। খণ্ডিত ভিয়েতনামের উত্তর অংশ—উত্তর ভিয়েতনাম হো চি মিনের নেতৃত্বে, নব চেতনায় জেগে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের কী অদ্ভুত লিখন, মাত্র দশ বছর পরে সেই আমেরিকাই হো চি মিনের শত্রুরূপে দেখা দিল। মার্কিন বোমার আঘাতে আঘাতে উত্তর ভিয়েতনাম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তবু, না তিনি, না উত্তর ভিয়েতনাম মাথা নত করল প্রবল শক্তির কাছে। অপরাজিত, অনমনীয়, আদর্শপ্রাণ এই প্রশান্তমুখ মানুষটি সমস্ত এশিয়াবাসীর কাছে আজ তাই কীর্তিময় পুরুষ, রহস্যময় পুরুষ। তাঁর মৃত্যু—মানবতার একটি চরম ক্ষতি বলেই মনে হয়।

'আমার'
'না। এটা আমার।'

অন্তঃ শিলা

প্রধানমন্ত্রী এখন কী করবেন?

প্রশ্ন ভারতের রাজনীতিতে আজ এইটেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এবং, এই প্রশ্নের জবাবের উপর শুধু যে কংগ্রেস রাজনীতির প্রায় সব কিছু নির্ভর করছে তেমন নয়, নির্ভর করছে ভারতের দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী রাজনীতিরও ভবিষ্যৎ। খুব খোলাখুলি বলতে গেলে, প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে বর্তমান ভারতের রাজনীতির গতি অনেকটা নির্ধারণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী কী করবেন, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে আমাদের অবশ্য সব কিছুর আগেই ভেবে দেখতে হবে, প্রধানমন্ত্রী কী কী করতে পারেন; বিচার করে দেখতে হবে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সামনে সম্ভাব্য কোন্ কোন্ পথ খোলা আছে। তাই, আসুন আমরা প্রথমেই পর্যালোচনা করে দেখি, প্রধানমন্ত্রী কী কী করতে পারেন।

প্রথম সম্ভাব্য পথ: প্রধানমন্ত্রী এখনই কংগ্রেস সংগঠন দখল করতে এগোতে পারেন। তিনি সেজন্য শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে সরিয়ে মনোমত কাউকে কংগ্রেস সভাপতি করার চেষ্টা করতে পারেন এবং সে কাজে সাফল্য অর্জন করলে নিজের জোহুজুরদের নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ড পুনর্গঠিত করতে পারেন। অক্টোবর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অর্থাৎ এ আই সি সির যে অধিবেশন হওয়ার কথা আছে প্রধানমন্ত্রী সেই সময়েই কংগ্রেস সভাপতিকে সরাবার চেষ্টা করতে পারেন।

দ্বিতীয় পথ: প্রধানমন্ত্রী ঠিক এখনই কিছু না করে সাংগঠনিক নির্বাচনের সুযোগের জন্য আগামী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। সেই সময় তিনি নিজের মনোমত প্রার্থীকে কংগ্রেস সভাপতি করার চেষ্টা করতে পারেন এবং সেই সভাপতির মাধ্যমে নিজস্ব ওয়ার্কিং কমিটি এবং পার্লামেন্টারি বোর্ডও তৈরি করিয়ে নিতে পারেন।

তৃতীয় পথ: প্রধানমন্ত্রী আপাতত, অর্থাৎ অন্তত বছর দেড় দুই সংগঠন পুরো দখলের ব্যাপারে তেমন মাথা না ঘামিয়ে প্রধানত জনসাধারণের মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারেন। এবং, এইভাবে আপন ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে সাংগঠনিক নেতাদের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তারপর অপ্রতিহতভাবে তাঁদের চালাবার চেষ্টা করতে পারেন। এবং,

চতুর্থ পথ: প্রধানমন্ত্রী সামগ্রিকভাবে সাংগঠনিক নেতাদের সঙ্গে কোনও লড়াইয়ে

না গিয়ে একে একে বেছে বেছে ওঁদের খতম করার চেষ্টা করতে পারেন।

আইনশাস্ত্রে একটা কথা আছে, শয়তানও জানে না কার মনে কী আছে। তাই, কারু মনে এটা ছিল, এমন কথা ধরে নিয়ে তার বিচার হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। প্রধানমন্ত্রীর মনে কী আছে এটা সাধারণ মানুষ অন্তত জানেন না। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী এইটেই করবেন বা এই পথেই যাবেন, এমন কথা ধরে নিয়ে পরিস্থিতির বিচার করা অন্যায়। পর্যবেক্ষকরা অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, কিন্তু তাতে যথেষ্ট বিপদ আছে। সে ভবিষ্যৎ বাণী নাও মিলতে পারে—বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যখন সেই দেবা ন জানন্তি গোষ্ঠীভুক্ত!

আরও একটা ব্যাপার আছে। প্রধানমন্ত্রী এই নাটকের নায়ক (নায়িকা নন!); কিন্তু তিনিই একমাত্র চরিত্র নন। এ নাটকে অনেক পার্শ্বচরিত্রও আছেন এবং সেই সব পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকাও নগণ্য নয়। তাঁদের গতিবিধিও প্রধানমন্ত্রীর গতিকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। ধরুন, নিজলিঙ্গাপ্পা একা বা মোরারজী ও কামরাজ সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ আই সি সিতে এক হাত লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীকেও তখন একটা কিছু করতে হবে; তিনিও চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না। অথবা ধরুন, বাবু জগজীবন রামের সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীকে আলটিমেটাম দিলেন "আমাদের নেতাকে উপপ্রধানমন্ত্রী করতেই হবে"। তা হলেও শ্রীমতী গান্ধীকে প্লান প্রোগ্রাম পালটাতে হবে।

আমি বলছি না, ওঁরা এই সব করবেনই; শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ওঁরা এমন কাজ করলে পরিস্থিতি পালটে যাবে এবং তখন প্রধানমন্ত্রীকেও সেই পরিস্থিতির পটভূমিকাতেই চলতে হবে। তাই, প্রধানমন্ত্রী নায়ক হলেও, নাটকের পরিণতি তাঁর ওপর বহুলাংশে নির্ভর করলেও, সর্বময় নিয়ন্তা তিনি নন। শ্রীমতী গান্ধী নিজে যেভাবে এগোতে চাইবেন, ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে ঠিক ঠিক সেই পথে এগোতে নাও দিতে পারে।

সেইজন্যই প্রধানমন্ত্রী ঠিক কী করবেন সেই অনুমানে না গিয়ে বরং বিচার করে দেখা যাক কোন্ পথে এগোলে তাঁর কী কী সুবিধা বা অসুবিধা।

*

প্রথম প্রশ্নেই প্রথম আসা যাক: প্রধানমন্ত্রী যদি এখনই সংগঠন দখল করতে এগোন, যদি আগামী এ আই সি সি অধিবেশনেই শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে সরিয়ে মনোমত কংগ্রেস সভাপতি বসাতে চান তাতে প্রধানমন্ত্রীর কী কী সুবিধা, অসুবিধাই বা কী কী?

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে সরাবার দুটো পথ হতে পারে: (১) সেই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা যায়; এবং (২) তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সমর্থকদের পক্ষে এর যে কোনও পথে সাফল্য অর্জনই খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ, নানাভাবে অপমানিত করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করাতে চাইলেই যে নিজলিঙ্গাপ্পা পদত্যাগ করবেন তার কোনও গ্যারান্টি নেই। ধরুন, এ আই সি সি একটা প্রস্তাব পাশ করে বলল, কংগ্রেস সভাপতিকে এই এই পথে চলতে হবে। যে কোনও কংগ্রেস সভাপতির পক্ষেই এটা অপমানজনক ব্যাপার। কিন্তু তিনি যদি বলেন, "ভাল কথা, এ আই সি সি-র নির্দেশগুলি শিরোধার্য করে আমি এই ওই ভাবেই চলব" তা হলে করুই কিছু করার থাকতে পারে না।

এরকম কিছু বা অনাস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব পাশ করানোও খুব সহজ কাজ নয়। কারণ, কংগ্রেস সভাপতি এবং তাঁর সমর্থকরা কংগ্রেসের ভেতর অত দুর্বল নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড প্রচার যন্ত্র চালিয়েও, মুসলমান এবং তপশিলীদের নানাভাবে সুড়সুড়ি দিয়েও কংগ্রেসী ভোটের শতকরা ২৫।২৬টির বেশী ভাঙাতে পারেন নি। দলের এম এল এ এম পিদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর যত প্রভাব, এ আই সি সির প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁর তার চেয়ে বেশি প্রভাব আছে বলে মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী একটা বড় লড়াইয়ে জিতেছেন, তাই তাঁর সমর্থক সংখ্যা কিছুটা বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমর্থকবৃদ্ধি দলের পার্লামেন্টারি উইংয়ে এখনই যতটা স্পষ্ট, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ততটা পরিষ্কার নয়। তা হওয়াও অবশ্য খুব স্বাভাবিক নয়। কারণ, পার্লামেন্টারি উইংয়ের সদস্যরা, বিশেষ করে এম-পিরা, সুবিধা সুযোগের জন্য কংগ্রেস সভাপতির তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

[illegible] প্রধানমন্ত্রীর [illegible] এখন এ-আই-সি-সি-তে [illegible] হয়েছে? [illegible] নেওয়া [illegible] নির্বাচনের মুখে দলের [illegible] প্রধানমন্ত্রীর একটা [illegible] সাংগঠনিক ব্যবস্থাও। তাছাড়াই [illegible] তাহলেও হলফ করে বলা কঠিন [illegible] ইতিমধ্যে এ-আই-সি-সিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। এ-আই-সি-সিতে তাঁর সমর্থক সংখ্যা যদি ইতিমধ্যে [illegible] হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশ্য কথা আলাদা। তাহলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকরা নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে যে কোন প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতে পারেন।

এখনই কংগ্রেস সভাপতিকে আঘাত করার ব্যাপারে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে। তাঁর সবচেয়ে বড় সুবিধা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের প্রচণ্ডতা এখন দলের উপর একেবারে তাজা। দ্বিতীয় সুবিধা, সিণ্ডিকেট নামক কতৃটি এখন প্রচণ্ড মার খেয়ে বেশ কিছুটা হতভম্ব। যত তিনি দেরি করবেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারটা ততই পুরনো হয়ে যাবে এবং সিণ্ডিকেটও আবার ধাক্কা সামলে নিয়ে এক হওয়ার চেষ্টা করবে।

প্রধানমন্ত্রী যদি এখনই কিছু না করে দলীয় নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন? যদি তখন তাঁর নিজস্ব প্রার্থীকে সভাপতি করার চেষ্টা করেন? নিঃসন্দেহে, এখনই কংগ্রেস সভাপতিকে সরাবার চেয়ে ভবিষ্যতে নিজের লোককে সভাপতি করার ব্যাপারটা কতকগুলি দিক থেকে সহজ। কিন্তু এতেও কতগুলি অসুবিধা আছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ব্যাপারটা। সব দলেরই রীতি, সংগঠন যাঁর হাতে দলীয় নির্বাচনেও তাঁরই সুবিধা। কংগ্রেসে এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট। যিনি অফিস দখল করে আছেন তিনি ভুয়া সদস্য করেই নির্বাচনে জিতে আসতে পারেন। যদি অধিকাংশ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নির্বাচন পর্যন্ত নিজলিঙ্গাপ্পার লোকদের হাতে থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ওই গোষ্ঠীকে হারানো কঠিন।

প্রদেশ কংগ্রেসগুলিকে নিজলিঙ্গাপ্পার পেছন থেকে সরিয়ে নেওয়া যায় দুভাবে : (১) প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান পরিচালকদের দলে টেনে; এবং (২) অ্যাড হক কমিটি বসিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসগুলি নিজের লোকদের দখলে এনে। এই দলে টানাটা কতকগুলি ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও কংগ্রেস সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতি ছাড়া অ্যাড হক কমিটি করা অসম্ভব। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রদেশে অ্যাড হক করতে পারেন একমাত্র সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটি।

দলীয় নির্বাচনে নিজের লোককে সভাপতি করার চেষ্টা [illegible] সভাপতি [illegible] হবেন [illegible]। কারণ, সরকারী ক্ষমতা হাতে থাকায় [illegible] তখন [illegible] বা সাধারণ [illegible] তাঁকে সমর্থন জানাবেন।

এখনই হলফ করে বলা কঠিন পার্টি কর্মীরা সম্মিলিতভাবে কোনও প্রার্থী দিলে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের হারাতে পারবেন কিনা; তবে, আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পরে নিজস্ব কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হবে এখনই কংগ্রেস সভাপতিকে সরানো।

এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন, প্রধানমন্ত্রী হয়ত নিজেই কংগ্রেস সভাপতি হবার চেষ্টা করবেন। যেমন, একদা তাঁর পিতৃদেব প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির দুটি পদই দখল করে ছিলেন। আমার কিন্তু মনে হয় না, ইন্দিরা সেই পথে পা বাড়াবেন। এমন নয় যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দুই পদ অধিকারের প্রশ্নে নীতিগত কোনও আপত্তি আছে। এমনও নয় যে, দুই পদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে তিনি ভয় পান। এর আসল কারণ হল, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, যেখানে বহু রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার, সেখানে প্রধানমন্ত্রীই কংগ্রেস সভাপতি হলে তাঁর জাতীয় নেতা হওয়ার স্বপ্ন ভুলে যেতে হয়। কংগ্রেস পারলামেন্টারি পার্টির নেতা হওয়া এক জিনিস, আর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া আর এক জিনিস। তার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনেক সুবিধা হবে, যদি তিনি একেবারে হাতের লোককে সভাপতি করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী যদি আরও অপেক্ষা করেন? যদি আপাতত বছর দেড় দুই সংগঠনের ব্যাপারে খুব না মাথা ঘামিয়ে শুধুই জনসমক্ষে নিজের ইমেজ বাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন? এবং যদি আপন ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে সাংগঠনিক নেতাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তারপর অঙ্গুলি-হেলনে তাঁদের চালাবার চেষ্টা করেন?

পিতৃদেব নেহরুর অবশ্য এই অবস্থাই ছিল। তিনি সাংগঠনিক নেতাদের পরোয়াই করতেন না। ট্যাণ্ডনজীর পর সকল কংগ্রেস সভাপতিই তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলেছেন। নেহরুর অবশ্য একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। তিনি অনেক দিন থেকেই—কংগ্রেস হাতে পূর্ণ ক্ষমতা পাওয়ার বহু পূর্বেই—জাতীয় নেতা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব দখল করে তাঁকে জাতীয় নেতা হওয়ার চেষ্টা করতে হয় নি। যেমনটি কন্যাকে করতে হচ্ছে।

নেহরুর আরও একটা সুবিধা ছিল। তাঁর [illegible] থাকতেই অনেকটা ঠিক [illegible] ভেঙে না। এখন ঠিক [illegible] চাই। তখন নেহরুর [illegible] কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখেই অনেক লোক [illegible] পর বাহর মনে করেছেন দেশে সমাজতন্ত্র এসে গেল। এখন আর মানুষ [illegible] প্রস্তাবে ভুলতে রাজি নয়। এখন তাঁরা কাজ চান। তাই, নেহরু মুখে সমাজতন্ত্র করে যতটা বাহবা পেয়েছেন ইন্দিরাকে সেই পরিমাণ বাহবা পেতে হলে কাজে অনেকটা এগোতে হবে। ইন্দিরা ততটা এগোতে চাইবেন কি? এবং ততটা এগোনোর চেষ্টা করতে গেলে কি এখনই তাঁকে গ্রামীণ ও শহুরে কায়েমী স্বার্থের [illegible] বিপদে পড়তে হবে না?

একটা জিনিস পরিষ্কার, অন্তত আমার কাছে : ইন্দিরা যতই ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করুন, যতই সমাজতন্ত্রের কথা বলুন, খুব বড় লোকদের সঙ্গে অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে এখনই সম্মুখ সমরে নামতে তিনি প্রস্তুত নন। তিনি গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থকেও খুব বেশি ঘাটাতে চান না। তাঁদের ক্ষমতাকে এখনও ভয় করেন। প্রধানমন্ত্রী যাই করুন, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এখনও অনিচ্ছুক।

প্রধানমন্ত্রী যদি "ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল" নীতিতে চলেন? যদি একে একে সিণ্ডিকেটের নেতাদের খতম করার চেষ্টা করেন?

এই নীতি অবশ্য তিনি প্রথম থেকেই অবলম্বন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই তিনি এইভাবে এগোচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও তিনি খুব বেশি সফল হতে পারেন নি। তাঁকে সকলে এত বেশি বুঝে গিয়েছেন, জেনে ফেলেছেন যে কেউই আর বিশ্বাস করতে পারছেন না!

*

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। কারণ, বেশিদিন অপেক্ষা করলে দলের ভেতরে তাঁর সমর্থকরা হতাশ হয়ে পড়বেন। আর, গোটা দেশে তিনি যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন তেমন কিছু কাজের কাজ না দেখালে সেটাও প্রচণ্ডভাবে আহত হবে।

শ্রীমতী গান্ধীর সামনেও তাই বিরাট প্রশ্ন : তিনি এখন কোন্ পথে এগোবেন? যে পথেই এগোন, বিরাট ঝুঁকি আবার তাঁকে নিতেই হবে। পদক্ষেপ করলেও বিপদের আশংকা, কিছু না করলেও আবার বিপদ ডেকে আনার সম্ভাবনা।

প্রধানমন্ত্রী এবার কী করেন সেইটা দেখার জন্য তাই সকল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

নবারুণ গুপ্ত

কলকাতার পথে-ঘাটে [illegible] ছেলেধরা কিলবিল করছে। [illegible] নাবালক-নাবালিকারা যাকে খুশি যখন তখন পড়ছে। অতএব এইটাই এখন বড় সংবাদ। কেননা ছেলেধরা প্রৌঢ়া, কোনও ছেলেধরা বা বৃদ্ধা। এমন কি, আতঙ্কের কথা এই, মাঝে মাঝে পুরুষ ছেলেধরাও পাবলিকের হাতে ধরা পড়ছে। অন্য ছেলেধরা, খণ্ড ছেলেধরা, বাঙালী ছেলেধরা, অবাঙালী ছেলেধরা—সবই মিলে যাচ্ছে ছেলেধরার সংখ্যা এবং [illegible] তিস্তার বন্যার মত খরবেগে বিস্তার লাভ করছে। নিঃসন্দেহে এটা মহাভয়ের কথা। বিশেষ করে কলকাতার পক্ষে।

কারণ, একমাত্র কলকাতা শহরেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক নাবালক-নাবালিকার বাস। যদিও রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে কলকাতার নাবালক এবং নাবালিকার প্রকৃত সংখ্যা কত তা নিরূপণের জন্য ব্যাপকভাবে আদমসুমারি চালাবার কোনও চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি, তবে বিশেষজ্ঞগণের আন্দাজ (এবং বলা ভাল, এই আন্দাজ স্যাম্পেল সার্ভের ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হয়েছে) কলকাতার নাগরিকদের, বিশেষ করে বঙ্গভাষী নাগরিকদের শতকরা ৯৯·৮ জনই নাবালক।

ছেলেধরারা বেছে বেছে কলকাতার বাঙালী মহল্লাগুলিতেই কেন যে এত হানা মারে, সেই রহস্যের উপর এই স্যাম্পেল সার্ভের রিপোর্টটি যথেষ্ট আলোকপাত করবে বলে মনে হয়। উক্ত রিপোর্টের সূচনাতেই নাবালক কাকে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একুশ বছর বয়েস যার হয়নি সে-ই নাবালক, রিপোর্টের রচয়িতাগণ প্রথমেই এই প্রচলিত সংজ্ঞাটিকে খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, শারীরতত্ত্ব অথবা মনোবিজ্ঞানের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটি সমর্থিত নয়, তাই এই সংজ্ঞা অবৈজ্ঞানিক। তাঁরা বরং বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "যে ব্যবহার-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত নয়"—নাবালকের এই অর্থটির উপরই পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, রিপোর্টের রচয়িতারা কে "ব্যবহারযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত নয়" কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা তাকে চিহ্নিতও করেছেন। যথা: (এক) পরমতনির্ভর, (দুই) বিশ্বাস-প্রবণ অর্থাৎ চিলে কান নিয়ে গেলে এই কথাটি শোনামাত্র যে স্বকর্ণে হাত না ঠেকিয়ে চিলের পিছনে দৌড়ায়, (তিন) বিচারকুণ্ঠ (বয়সের ধর্মই হচ্ছে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করা), (চার) গোলে হরিবোলে যার অত্যধিক আসক্তি, (পাঁচ) অস্থিরমতি, (ছয়) হঠকারী, (সাত) অপরিণামদর্শী, (আট) প্রতিকূল পরিবেশে যে সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক, (নয়) অথবা শঙ্কিত (দশ) দুই কূল রক্ষার গোঁজামিলই যার অভীষ্ট, এবং (এগার) বালুর ভিতরে মাথা গুঁজে যে বিপদ এড়াতে চায়। নাবালকের এই একাদশ লক্ষণ।

এই একাদশ লক্ষণযুক্ত নাবালকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলেই অবাঙালী মহল্লায়

ছেলেধরার উৎপাত আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। অতএব কলকাতার বাঙালী নাবালক মহোদয়গণ সাবধান। পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে পা দেবেন না। সদাসর্বদা স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে থাকুন। আর নিতান্ত অফিস-কাছারিতে বেরুতে হলে স্ত্রীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েই যাত্রা করা শ্রেয়। কে জানে নিকটস্থ ট্রাম অথবা বাস স্টপের ভিড়ের মধ্যে ছেলেধরা হয়ত আপনার জন্যই ঝাঁপটি মেরে অপেক্ষা করে আছে।

দিল্লিওয়ালী ছেলেধরা

দিল্লিওয়ালী ছেলেধরা কলকাতায় আসছে, এ সংবাদ রটে যাওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই ছেলেধরা নাকি বিরাট একটা ঝুলি নিয়ে ভারত সফরে বেরিয়েছেন। [illegible] সেই ঝুলির মধ্যে এমন এক যোগশক্তিসম্পন্ন তুকতাক আছে যা দেখে কিম্বা অথবা যাকে [illegible] নাবালকেরা সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে যায় এবং তারপর এই ছেলেধরা তাকে টপ করে ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে কেটে পড়ে। সম্প্রতি জোর গুজব, এই ছেলেধরা উত্তরপ্রদেশে সফর দিয়ে দিয়ে কংগ্রেস-হাটে নেতাদের তুক করে দিয়েছেন। এই নিয়ে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী বি কে ডি নেতারা তো হইচই শুরু করে দিয়েছেন এবং তাঁদের নাবালকদের যাতে চোখে চোখে রাখা যায় তার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট মহলেও অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বাম কমিউনিস্টরা তো স্পষ্টই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে সি পি আই দিল্লিওয়ালি ছেলেধরার খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কেও তাঁরা মনে মনে যথেষ্ট সন্দিহান।

সম্প্রতি বরানগরে সি পি এম এবং সি পি আই-এর স্থানীয় নেতাদের মধ্যে পাওয়ার লীগের এক রাউন্ড কাউন্টি ম্যাচ খেলা এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যার ফলে স্থানীয় এক সি পি আই নেতা ও অপর একজন সক্রিয় সদস্য গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর ফলে সি পি আই-সি পি এম-এর সম্পর্ক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সি পি আই-এর বরানগর লোকাল কমিটির পক্ষে প্রচারিত এই ইশতাহারের কয়েকটি মন্তব্যই জানিয়ে দিচ্ছে। ইশতাহারে বলা হয়েছে, "জনসাধারণ জানেন যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে সামনে রেখে সমগ্র পশ্চিম বাংলা জুড়ে সমস্তরকম রাজনৈতিক দলের উপর এবং নিরীহ জন-সাধারণের উপর বর্বরতম হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।...আপনারা প্রশ্ন করুন যে, জ্যোতি বসু পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, না মার্কসবাদী গুণ্ডাদের রক্ষাকর্তা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী।" এই ব্যাপারে প্রতিকার দাবি করে সি পি আই যুক্ত ফ্রন্টের বৈঠক পর্যন্ত বর্জন করেছেন।

এর উত্তরে সি পি এম বলেছেন, মারামারি তো নতুন নয়। ও তো চলছেই, চলবেও। হঠাৎ সি পি আই নতুন সুর ধরেছে কেন? এ আর কিছু নয়, দিল্লিওয়ালী ছেলেধরার তুক। প্রোগ্রেসিভিজমের ফুল শুঁকিয়ে সি পি আইকে ঝুলির ভিতর ঢুকিয়ে ফেলেছে, তাই সি পি আই এই ধরনের আওয়াজ ছাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির আসর থেকে অনবরত হাঁক উঠছে: ছেলেধরা আসছে। হুঁ—শি—য়া—র।

দেবব্রত

মৃত্যুহীন প্রাণ

আজকে অনেক জায়গাতে, যে ভিয়েতনামকে নিয়ে আজ এত উত্তেজনা, এত হইচই দুনিয়া জুড়ে আগে তার নামও কেউ জানতো না। বিশ বছর আগেও ভূগোলের কেতাবে এ নাম ওঠেনি। থাইল্যাণ্ডের পূবে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের তীরে যে অঞ্চলটি রয়েছে সেদিন তাকে বলতো ফরাসী ইন্দোচীন। যারা আজ চল্লিশ পেরিয়েছে তারা ইস্কুলে ওই নামই মুখস্থ করে এসেছে, মানচিত্রেও ওই নামই লেখা থাকতো। সে এলাকার ছিল পাঁচটি ভাগ—কোচিন-চীন, আনাম, টংকিং, কাম্বোডিয়া আর লাওস। সেদিনের ফরাসী সাম্রাজ্যের ওই কোচিন-চীন, আনাম আর টংকিং মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আজকের ভিয়েতনাম। এটাই হচ্ছে এ অঞ্চলটির সাবেকী নাম যা লোকে ভুলতে বসেছিল ফরাসী উপনিবেশিকতাবাদের দাপটে।

ওদের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন যিনি তাঁর নাম নোগুয়েন টাট থান যাঁকে তৃতীয় দশকে প্যারিসে লোকে জানতো নোগুয়েন আই কুয়াক, অর্থাৎ দেশভক্ত নোগুয়েন বলে আর দুনিয়ার লোকে জানে হো চি মিন অর্থাৎ আলোকদূত হো বলে। সত্যিই তিনি ছিলেন দেশ-ভক্ত প্রাণ, আলো জেলেছিলেন স্বদেশের আত্মবিস্মৃতির গভীর অন্ধকারে। ইতিহাসের বিস্মরণীর অতল জলে ডুব দিয়ে একটা জাতের মর্যাদা উদ্ধার করে তাকে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার বললেই হয়। সেই অসম্ভব ব্যাপারকেই সম্ভব করেছিলেন হো চি মিন যাঁকে পরম শ্রদ্ধায় আর আদরে ভিয়েতনামীরা ডাকতো চাচা হো বলে। একটা মরা জাতকে পুনর্জন্ম দেওয়া, একটা ভুলে যাওয়া সভ্যতাকে বাঁচিয়ে তোলার অনন্য গৌরব তাঁর।

বেশীর ভাগ দেশেই উপনিবেশিকতাবাদের অসন্তোষ তৈরি করেছে অবিচার আর অনাচার। ভিয়েতনামেও তাই হয়েছে। তাঁর দেশের লোকেদের ওপর যে অবিচার ফরাসীরা করেছিল, যে অকথ্য অত্যাচার তাদের ওপর চালিয়েছিল তাতে তাঁর বুকে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথর খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছিল, তেমনই তিনি দেশে দেশে পাগলের মত ঘুরেছেন স্বাধীনতা জিয়ন কাঠির সন্ধানে যাতে তাঁর মরা দেশ আবার জেগে ওঠে। খাস ফরাসী মুলুকেই তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন মাত্র একুশ বছর বয়সে জাহাজে কেবিন বয় অর্থাৎ কামরার খানসামার চাকরি নিয়ে। কিছুকাল পরে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বিলেতে এসেও দিন কতক চাকরগিরি করেছেন। অবশেষে ফিরে এসেছেন ফ্রান্সে। সেখানেই তিনি দীক্ষা নেন সাম্যবাদী মন্ত্রে। পরিণত বয়সে তিনি যে কম্যুনিস্ট দুনিয়ার একজন দিকপাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তার সূত্রপাত রুশ-বিপ্লবের আগেই ফ্রান্সে। ফরাসী কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ১৯২০ সনে তার পত্তনের সময় থেকেই।

মস্কো তিনি যান ১৯২২ সনে। নতুন

করে কম্যুনিজমে তিনি পাঠ নেন দুনিয়ার প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রে। দু' বছর পরে তাঁকে চীনে পাঠানো হয়েছিল সাম্যবাদ প্রচারের জন্যে। তখন সেখানে জাতীয়তাবাদীদের রাজত্ব। চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। সাম্যবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকলেও সারা দুনিয়াতে রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করতে হো চি মিন ততটা উৎসুক ছিলেন না, যতটা ছিলেন নিজের দেশে স্বাধীনতার ভাগীরথীকে বইয়ে দিতে। চীনে তাঁর প্রধান কাজ ছিল সংগ্রামী ভিয়েতনামী তরুণদের সংগঠন গড়ে তুলে ফরাসী উপনিবেশিকতাবাদের ওপর চরম আঘাত হানা। আন্তর্জাতিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না এমন নয়। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী অনুরাগ ছিল দেশের ওপর। সাম্যবাদের প্রধান শত্রু যে সাম্রাজ্যবাদ, আর তাকে নির্মূল করতে না পারলে যে পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থা বদলে নতুন সমাজ গড়ে তোলা যাবে না এ প্রত্যয় তাঁর ছিল। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি তাই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন আর সে মঙ্গলব্রতকে পূর্ণ করবার জন্যেই দরকার ইন্দোচীন থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ এ ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা।

ত্রিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন যখন নিবু-নিবু হয়ে এসেছে, তখন হলো স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব। যে মুক্তিযুদ্ধ তখন চলছিল ভিয়েতনামে তার অংশীদার ছিল আদর্শ নির্বিশেষে তাবৎ দেশপ্রেমী দল। জাতীয়তাবাদীরা আর কম্যুনিস্টরা তখন হাত মিলিয়েছিল। ইউরোপে ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০ সনে জাপানীরা দখল করেছিল ইন্দোচীন, একটা ভুয়ো স্বাধীন সরকার তারা সেখানে খাড়াও করেছিল। মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্ক যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই দেখা দিল চারদিকে বিশৃংখলা আর অরাজকতা—ইউরোপেও, এশিয়াতেও। মিত্রশক্তিদের কাঁধে ভর দিয়ে ফ্রান্স আবার ফিরে আসতে চাইলো তার পুরোনো জমিদারীতে। অকারণ রক্তক্ষয় এড়াতে রাজী হলেন হো চি মিন ইন্দোচীন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন অংশীদার হিসেবে তাঁর প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামকে গড়ে তুলতে। ফ্রান্স কিন্তু তার কথার খেলাপ করলো। তারপর যা হবার তাই হলো—বাধলো লড়াই। তার প্রথম পর্বের শেষ ডিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়।

ফরাসীর যাবার পর আসরে এলো আমেরিকা। ১৯৫৬ সনে যে ভিয়েতনাম চুক্তি হয়েছিল তার একপক্ষে ছিল ফরাসীরা আর একপক্ষে হো চি মিনের দল ভিয়েতমিন। পেছন থেকে মদত দিয়েছিল ব্রিটেন আর রুশিয়া। কিন্তু এ চুক্তির ফলে হো যা চেয়েছিলেন তা পুরোপুরি পান নি। স্বাধীনতা পেলেন বটে, পেলেন না জাতীয় সংহতি। ভিয়েতনাম হলো দু' ভাগ। উত্তরে তিনি রইলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বেসর্বা। দক্ষিণে হলো জাতীয়তাবাদীদের আধিপত্য। হোর আশা ছিল নির্বাচন হলে ভাঙা ভিয়েতনাম আবার জোড়া লাগবে। কিন্তু না হলো নির্বাচন, না পুরলো তাঁর ইচ্ছে, উলটে বাধলো লড়াই উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের। দক্ষিণের সহায় হলো আমেরিকা। গোড়ায় মার্কিন ফৌজ ছিল আড়ালে আবডালে। তারপর সরাসরি নামলো যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই বিরাট মার্কিন বাহিনীকে যেভাবে হো আর তাঁর সেনাপতি গিয়াপ নাজেহাল করেছেন তার কোনো তুলনা ইতিহাসে নেই। হোর সাধনা ছিল স্বাধীনতা আর ঐক্য। দেশের স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পেরেছেন বটে, কিন্তু সংহতি এখনও অনেক দূরে। তাতে কিন্তু তাঁর মহিমা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। ভিয়েতনামের মুক্তিসাধক এই নির্ভীক যোদ্ধাকে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।

'বুদ্ধি দিয়ে অবোধ্য'

পূর্ব বাংলার একটি বড়ো শহরের কোনো প্রান্তসীমায়, একদা রাত এগারোটা নাগাদ, পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে, আমার পনেরো-কুড়ি হাত সামনে একটি অগ্রগামী ব্যক্তি অকস্মাৎ ইংরিজী মতে 'সূক্ষ্ম বাতাসে' মিলিয়ে গিয়েছিল।

ভৌতিক ব্যাপারে আমার আতঙ্ক ছেলেবেলাতে কখনো ছিল না, আজও নেই।

পোশাক শীত গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য, কিন্তু ব্যবহৃত হয় শীত গ্রীষ্মে কষ্ট পাওয়ার জন্য

অনেক রাত পর্যন্ত একা শ্মশানে বসে থেকেছি, যে জংলা পোড়ো কবরখানায় সাহেব-ভূতের সঙ্গে দিনের বেলাতেই নাকি দেখাশুনো ঘটে—সেখানে নিশিরাত্রে একা ঘুরেছি—শেয়াল ছাড়া আর কেউ-ই দর্শন দেননি। কিন্তু আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, মাথার ভিতরে ফুটন্ত রাজনীতি এবং সাময়িক সাহিত্য, ছুটিতে দেশে ফিরে—অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতে—হঠাৎ এমন কাউকে দেখতে পাব, যে নির্জন পথে অন্তত মিনিট চারেক ধরে আমার আগে আগে যেতে যেতে—বিনা নোটিশে—একটি ছোট মাঠের ভেতরে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে— এ অঘটন আমার কল্পনাতেও ছিল না।

ঘুমের চোখ অবশ্যই নয়, কারণ সে বয়সে রাত একটা-দেড়টা-দুটো পর্যন্ত যা খুশি পড়বার অভ্যেস ছিল আমার; ভুল দেখবার কোনো কারণ নেই—যেহেতু তিন চার মিনিট ধরে আমার আগে আগে যাচ্ছিল সে। লোকটির হঠাৎ লুকিয়ে পড়বার কোনো জায়গা ছিল না—কারণ মাঠের ভেতরে একটা ছোট কাঁটা ঝোপ পর্যন্ত নেই—একেবারে দুপুরের রোদের মতো পরিপাটি জ্যোৎস্না সেখানে। অথচ—

ওই 'অথচ'টা নিয়েই মুশকিল। আজ পর্যন্ত ধাঁধাটার জবাব মেলেনি। সেই লোকটি যদি কোনো জাঁদরেল ম্যাজিশিয়ান হয় এবং সে রাত্রে আমাকে বিনামূল্যে একটা খেলা দেখিয়ে থাকে, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা, আর তা নইলে শেকসপীয়রের ভাষায় বলতে হয় : হে হোরেশিয়ো, স্বর্গে মর্ত্যে এমন আরো অনেক বস্তু আছে, যাদের'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওটা যা-ই হোক, অল্প বয়সে এসব জিনিসকে আদৌ পাত্তা দিইনি আমি। কিন্তু যতই বয়স বাড়ছে—ততই দেখতে পাচ্ছি—বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টাটাই পণ্ডশ্রম। বস্তুতঃ কিছুই বলতে গেলে বোঝা যায় না—এবং যতই অবোধ্যতা বাড়তে থাকে, ততই রোমাঞ্চ জাগে (সে রাত্রে যেমন চকিতে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত কদম্ব-কেশরের মতো পুলকিত হয়েছিল)। বিস্ময়ের রসে মন আপ্লুত হয়, কল্পনার দিগন্ত খুলে যায়, জীবনে মনোটনি আসতে পায় না এবং রোমান্টিকদের ভরসা দিয়ে বলা যায়—কোনো ভাবনা নেই, তোমাদের উৎস অক্ষয় অফুরন্ত।

ট্রামের ভাড়ায় কৌলীন্য আসবার পরে পারতপক্ষে ওটিকে এড়িয়ে চলি, বাসই আমার বাহন। কিন্তু পরশু দায়ে পড়েই চাপতে হয়েছিল। রাজাবাজার থেকে সোজা বাগানের মুখ—দশ পয়সা ভাড়া দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে।

ডাস্টবিন আবর্জনা রক্ষার জন্য, কিন্তু ডাস্টবিন আবর্জনা ছড়ায় বেশী

আজও সেই পথে—সেইখানেই গেছি দশ পয়সা ব্যয়ে। ফেরবার সময় কণ্ডাক্টার বললে, 'তেরো পয়সা।'

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'দশ পয়সাই তো দিই।'

কণ্ডাক্টার সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, ছাপরা কিংবা মজঃফরপুরের 'গাঁও

ফুটপাথ পায়ে হাঁটার জন্য, যেখানে বসে বাজার

সে' দেহাতী মানুষ কলকাতায় প্রথম এলে যে দৃষ্টিতে তাকে দেখতে হয়। বললে, 'উয়ো সেকেন কেলাসমে। ফাস্ট কেলাসমে উঠনে হি তেরো পয়সা।'

তেরো পয়সাই দিতে হল, তিন পয়সার ক্ষতি এমন মর্মভেদী নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধি একটা মারাত্মক হোঁচট খেলো। যাওয়ার সময়, আজো, দশ পয়সাতেই দিব্যি বসে পড়া গেল, আর ফেরার মুখে 'উঠনে হি তেরো পয়সা?' মাত্র আড়াই ঘণ্টাতেই ট্রামের ভাড়া বাড়ল? কিংবা সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় 'চীপ ইভনিং' ছিল, রাত নটায় রেট-মাফিক? অথবা এর আগে আমি সস্তার জনতা ট্রামে চেপেছিলুম, এটা রিয়্যাল ফার্স্ট ক্লাস?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল, নিজের স্টপ ছাড়িয়ে আমি শেয়ালদায় পৌঁছে গেলুম। না—আর ট্রাম নয়, এবার সোজা রিকশ। রিকশ ভাড়ায় কোনো জটিলতা নেই, তার রেট নির্ভর করছে আমার আর রিকশ-ওলার নৈয়ায়িক তর্কের ওপর।

মোটরগাড়ি দ্রুত চলার জন্য কিন্তু মোটরে দেরী হয় বেশী

বাস্তবিক, অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এবং—যতই বোঝা যায় না, জীবন ততই রোমহর্ষক হয়ে ওঠে।

কিছুদিন আগে পথে বেরিয়ে হঠাৎ আকাশভাঙা বৃষ্টি। আমার ছাতা ছিল না, কারণ থাকলেই তা হারায়। ছুটে কাছাকাছি একটা মসজিদেই ঢুকে পড়লুম। ভগবানের আশ্রয়ের চাইতে ভালো জায়গা আর কী আছে।

আমি ছাড়া আরো জন দুই চাষী মানুষ সেখানে আশ্রিত, কোনো কাজে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। চাষবাসের আলোচনাই চলছিল। আচমকা একজন জিজ্ঞেস করলে, 'বাবু স্যায়েব, একটা কথা বলতে পারেন?'

আমি ফিরে চাইতে বললে, 'এই যে সব পোকামারা ওষুধ দিচ্ছে, এতে তো দেখছি পোকা আরো বেড়েই যাচ্ছে ফসলের। বরং আগে যেসব পোকা ছিল না, তারাও এসে যাচ্ছে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?'

আমি কী বুঝি যে বোঝাবো! বোকা-মোকে প্রাজ্ঞের নীরব হাসিতে পরিণত করলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'পোকা মারা ওষুধ খেয়ে আরো তেজী হচ্ছে পোকারা। কিন্তু মানুষের মরবার সুবিধে হয়েছে খুব, কী বলো মিঞা? আগে গলায় দড়ি-টড়ির অনেক ল্যাঠা ছিল, এখন একটুখানি ওষুধ খেয়ে নিলেই—ব্যাস!'

আবার গোলোক-ধাঁধা! বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে কে? ফসল বাঁচিয়ে মানুষ বাঁচানো—পোকামারা ওষুধের এইটেই উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু তাতে করে যে মানুষের মরবার রাস্তাটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে—একথাটা জানলে বকরূপী ধর্ম তাঁর 'অহন্যহনি ভূতানি'র মধ্যে এটাও জুড়ে দিতেন খুব সম্ভব।

না—কিছুই বোঝা যায় না। মোটামুটি পদচালনার পক্ষে কর্পোরেশনের রাস্তাটা মন্দ ছিল না, হঠাৎ একদিন এসে সেটা সারাদিন খোঁড়াখুঁড়ি করে—তাকে দুর্গম করে চিরকালের মতো পরিত্যাগের রহস্য যে কী, তা কেউ জানে না; কেউ বলতে পারে না—কোন্ গূঢ় গভীর কারণে ডাস্টবিনের স্থানিকপুঞ্জিত আবর্জনা পথে পথে বিকীর্ণ করে এমন বিশ্বব্যাপ্তি ঘটিয়ে দেওয়া হল। আমার এক বন্ধু, যিনি দৈনিক একবারও টেলিফোন করেন কিনা সন্দেহ—তিনি সংপ্রতি এক হাজার টাকার ঊর্ধ্বে একটি বিল এবং অবিলম্বে তা জমা দেবার নির্দেশ পেয়ে বিস্ময়ের যে অতলে ডুবেছেন, কে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে? জনৈকের একটি চাকরীগত ইন্টার-ভিউয়ের চিঠি কলকাতার এক প্রান্তে পোস্টেড হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছেছে একমাস সতেরোদিন পরে, অথচ ইন্টার-ভিউয়ের তারিখটি ছিল একমাস আগে। কিন্তু ডাক-বিভাগের রহস্য তো অনন্ত-কালের মহাতামসে ঢাকা, মহাকবি দান্তের কল্পনারও সাধ্য কী যে তাতে সূচীভেদ করে।

আজ যদি পথে বেরিয়ে হঠাৎ জনতার চোখে 'ছেলেধরা' রূপে প্রতিভাত হয়ে, সামগ্রিক প্রহারে আমি পঞ্চত্ব পাই, তা হলেও বুদ্ধি দিয়ে কিছুই বুঝতে চাইব না। দেখছি, ও চেষ্টাই পণ্ডশ্রম!

মৃত্যুর ঘোড়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমার বয়স যখন ন' বছর, একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি ঘরের দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে—মুখটা লাল আর ফুলো ফুলো. চোখ দুটো ভিজে। মা অনবরত ফোঁসফোঁস করে হলুদের ছোপ লাগা আঁচলে নাক মুছছে। বারান্দায়—দরজার পাশেই মোড়ায় বসে আছে একটা লোক। লোকটার পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, গায়ে ভীষণ ময়লা সাদা হাফশার্ট গোছের, যেটার কাঁধের দিকে কোন কলার নেই। তার পায়ে কোন জুতো ছিল না। থ্যাবড়া হলদে আর বাঁকাচোরা পায়ের অঙুলগুলো। ফাটা হাজাধরা বিচ্ছিরি পা দুটো দেখেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা বলে দিল, এই লোকটা নির্ঘাত মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে জলকাদায় দিনের পর দিন ঘুরেছে। আঙুলে আঙুলে আঁকড়ানো হাত দুটোও তেমনি বিচ্ছিরি হলদে, ভীষণ পুরু আর খসখসে। প্রচণ্ড বাধা পার হতে হতে যে জিনিসটিকে এগোতে হয়—সম্ভবত সেই জিনিসটিকে চালিয়ে বা ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে তার হাত দুটোর এ দশা হয়ে থাকবে। কারণ, ওই বয়স থেকেই একরকমের ক্ষমতা আমার ছিল, যা দিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ করতে পারতাম। বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতাম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমার এ চেষ্টা সত্যের কাছে পৌঁছে দিত আমায়। এই যে লোকটির হাত পা দেখছিলাম, তার সঙ্গে সহজেই ইতিহাসের ভোলানাথবাবুর হাত-পায়ের তুলনা করা গেছে। চকের হালকা রঙলাগা আঙুল, বেশ লম্বা আর হালকা, ডিমের মত সাদা চেটো—তাতে শিরাগুলো অর্থাৎ কররেখা খুবই স্পষ্ট আর গোলাপী—বিশেষ করে ওঁর হাতের চাপ সময়ে আমার অনুভব করতেও হয়েছে—যাতে টের পেয়েছি খুবই নরম। ওঁর হাত দুটো এবং সময়ে পা দুটো টেবিলে তুলে দিলেও একই রকম ধারণা করা গেছে। তা ছাড়া লাস্ট পিরিয়ডে সেদিন ইতিহাসের ক্লাস ছিল।

বাদামী কোঁচকানো শিরাবহুল দেহ নিয়ে যে লোকটি মোড়ায় বসে রয়েছে, তার চিবুক-গাল সাদাকালো দাড়িতে ভরা, কেবল গোঁফটা যত্ন করে কামানো। তার

মাথায় জালের মত ঝাঁকরা গোঁজ—কতকটা ওল্টানো বাটির সাইজ, একটা কালো টুপি। পরে ওর সঙ্গে যখন যেতে হচ্ছিল, জেনে নিয়েছিলাম, ওই টুপিটা তালগাছের বাগড়ার নীচে যে জালের মত জটিল শক্ত শিরগুলো থাকে, তাই দিয়ে সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। লোকটি আশ্চর্য কমতায় আমার তাক লেগে গিয়েছিল। যেতে যেতে তারপর আরও যা সব শোনা-ছিল, চারপাশের পাড়াগেঁয়ে সেহ পৃথিবীর খুঁটিনাটি জিনিসে কত সব রহস্য, কি মজার মজার ব্যাপার রয়ে গেছে—আমি তো ওকে মনে মনে আমার মাস্টারমশাইদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহৎ, অনেক শক্তিমান বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম, প্রতিটি পদক্ষেপে লোকটি জানিয়ে দিচ্ছিল যে, পৃথিবীতে মোটামুটি দু জাতেরই মানুষ আছে—এক জাতের মানুষ সে নিজে এবং অন্যজাতের মানুষ হচ্ছেন ইতিহাসের তোলানাথবাবু। আমি কোন জাতের, তা জানতে চাইলে নির্ঘাত সে জবাব দিত, তুমি এখনও খুব ছোট তো—তাই তোমার মানুষ বলা ঠিক হবে না।

খুব গোলমাল করে ফেললাম কি? আগে অনেকগুলো দিন ভাবতে হয়েছে, ঠিকঠাক পূর্বপরম্পরা গোছানোর চেষ্টা করতে হয়েছে; কিন্তু লিখতে গিয়েই সব আমার বড় মুশকিল, এই গল্পটা লিখবার পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও সরলতা আমি হারিয়ে ফেলতে বসেছি।

এর কারণ কিন্তু একটাই। স্মৃতি ভীষণ দুশমন। স্মৃতি বড় ঈর্ষাকাতর। স্মৃতি কলহপ্রিয়। বদমেজাজী খিটখিটে কটুভাষী। তাকে আমি বলব একটা রোগা হাড়িসার রোঁয়াওঠা নেড়িকুত্তা—যে আমার কত কিছু নিয়ে আগলে বসে আছে, এশপের গল্পের দি ডগ ইন দি ম্যানজার—নিজেও খাবে না, আমায়ও খেতে দেবে না।

*

বারান্দায় উঠতে গিয়ে সেদিন আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। সচরাচর এই গড়নের বা চেহারার কোনও লোককে এত থতিয়ে পেতে দেখিনি। ওকে দস্তুরমত একটা মোড়া দেওয়া হয়েছে! একটু খুলে বলতে হয়। আমার দাদু মুসলিম সমাজের এক ধর্মগুরু। ইসলামধর্মে যদিও বা জাতি-বর্ণভেদ নেই, সব মুসলমানই মানুষ হিসেবে সমান, বাদশাহের পাশের আসনে পথের ভিখিরীও বসার অধিকার পায়—অনুশাসনের সঙ্গে প্রথার কিন্তু ফারাক আছে অসামান্য। কালগুণে সব ধর্মের মত ইসলামের একদা হাজার বছর পরে প্রথাকে খুব বড় করে দেখা হচ্ছিল। ফলে অভিজাত নিম্নজাত মানুষরা চিহ্নিত হতে থাকল পৃথক পৃথক চিহ্নে। আমাদের বংশধারা অভিজাত। যার দরুন আমারও পাড়াগেঁয়ে সমাজে লোকেরা খুব সম্মান দেখাত। বিশেষত আমার দাদু ধর্মগুরু মৌলানা। আর ব্যাখ্যার দরকার হবে কি? তা হলে তো গল্পটা আর লেখা হয়ে ওঠে না!

......অথচ আমরা ছিলাম, সত্যি বলতে কী, ভীষণ গরীব পরিবার। যতদূর জানতাম, এই গরীব থাকার প্রকৃত কারণ আমার দাদুর আচরণ। কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি তাঁর ছিল। কিন্তু একে যাযাবর চরিত্র (দাদু বলতেন, আমরা এসেছি পারস্যের খোরাসান থেকে), তায় ভীষণ অমিতব্যয়ী এবং আবেগপ্রবণ। তাঁর বাবা উত্তর বাংলায় এক পিরবাড়ি থেকে মারা যান। দাদুর বয়স তখন পনের। ফলে, নিজের বউ নিজেই খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি। এই বধূটি মেয়েটি কী কারণে আত্মহত্যা করে-ছিল। দাদু তারপর হয়ে উঠলেন আরবা
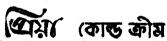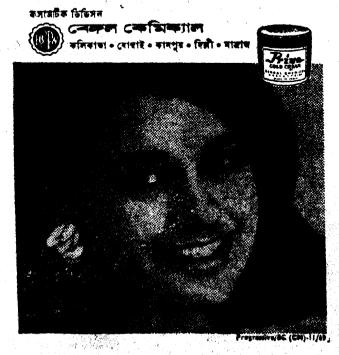
উপন্যাসের সেই বাদশাহ শাহরিয়ারের মত— যে রাতের পর রাত বিয়ে করে আর প্রতি প্রত্যূষে তাকে হত্যা করে ফেলে—নারী-জাতির প্রতি ক্রোধপরবশ হয়ে। না, অতটা সম্ভব ছিল না দাদুর পক্ষে। কারণ, তিনি বাদশাহ নন এবং সেটা ছিল ইংরেজ রাজত্ব। মুসলিম ধর্মমতে একই সঙ্গে চারটে বউ রাখা যায়। দাদু চারটে হিসেবে দুবার, দুটো একবার এবং পরিশেষে মাত্র এক-জনকেই বিয়ে করেছিলেন। এই শেষ বউটি ছাড়া সকলেই বিদঘুটে রোগে মারা গিয়ে-ছিল। সেকালে সামান্য জ্বরজারিরই ওষুধ ছিল না ভালো, অতি সহজে মানুষ গরম গায়ে শুয়ে পড়ত আর ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আমার ঠাকমা দাদুর শেষ বউ। খুব খুঁটি-নাটি লক্ষ না করার মত কমজোর ছেলেবেলায় না থাকলে আমি তো জানতেই পারতাম না যে, আমার এই ঠাকমাটি এক নিম্নবংশীয় হিন্দুর মেয়ে—যাকে যুবতী বয়সেই ডাইনী বলে গাঁয়ের লোকে কোণঠাসা করে রেখে-ছিল! লোকের অপরাধ আমি খুঁজি না। সে যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগা-যোগ যত বেশীই থাক না কেন, তারা প্রকৃতিকে ভীষণ অমঙ্গলে আর রহস্যময় বলে মনে করত। এখন, এই মেয়েটির সঙ্গে নাকি প্রকৃতির যোগাযোগ ছিল একটু ভিন্ন রকমের। সে সাধারণত রাত্রিচারিণী ছিল—গভীর রাত্রে বনেবাদাড়ে তাকে চুপি-চুপি হাঁটতে, গাছপালা-পাখি-জন্তু জানোয়ার-পোকামাকড়ের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লক্ষ করা গেছে। কেউ দেখেছে সে মাথায় বাতি নিয়ে অন্ধকার ফাঁকা মাঠে পিছু হেঁটে অর্থাৎ পিছোতে পিছোতে কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে ছিল বিধবা— তাদের জাতে সাঙা বা পুনর্বিবাহের প্রথা ছিল। কিন্তু সে আর পুরুষ খোঁজেনি। একটা গাইগরু, দুটো ছাগল, কয়েকটা হাঁস-মুরগি (মুরগিও সে-জাতের মানুষ পুষত) আর উঠোনের সবজির মাচা কি দু-চারটে ফলমাকড়ের গাছ নিয়ে ছিল তার সংসার। হ্যাঁ, একটা ডাহুক পাখির বাচ্চা একবার বাঁশবনে কুড়িয়ে পেয়েছিল সে। বড় মায়ায় তাকে পুষেছিল। পাশের গাঁয়ের হাট থেকে খাঁচা কিনে এনেছিল। ডাহুকটা বেশ বড় হল একদিন। গভীর রাতে নিশ্চয় সে ডাকত—কুব্ কুব্...কুব্...কুব্! ...ওঃ, ঠাকমার পাশে শুয়ে এইসব গল্প শুনতে শুনতে আমি সব স্পষ্ট দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম এবং কেন কে জানে, কুব্... কুব্...কুব্...কুব্ ডাকটা অনুমান করলেই মনে হত, কে নিশুতি রাতে আচমকা এসে আমার বুকের ভিতর আঙুল গলিয়ে কলজেয় খোঁচা দিচ্ছে এবং...না না! যন্ত্রণা নয়, ভীষণ কাতুকুতু পেয়ে হিহি করে বেদম হাসছি। ঠাকমা বলতেন, তুই হাসছিস খোকা, কেন রে? ...এখন বুঝি, সে ছিল ঠাকমার দুঃখের গল্প। কারণ, আমার হাসি দেখে ঠাকমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলতেন, ঘুমো। রাত হয়েছে।

তারপর কী যেন একটা ঘটেছিল। সেই গাঁয়ের কোন বড়বাবু, না ছোটবাবুর ছেলের রঙ ছিল দুধের মত সাদা। একটা লাউ বেচতে গিয়ে রহস্যময়ী যুবতীটি আর লোভ সংবরণ করতে পারেনি। উঠোনে ধুলোয় খেলতে বসা খোকাটিকে কোলে তুলে বলে-ছিল, আহা হা, মানিক সোনা, তোর দিকে কারুর মন নেই রে! তুই কি ধুলোয় খেলবার ধন? তুই থাকবি কি না বাবু-মশায়ের খাটপালঙ্কের শোভা...সন্ধ্যার দিকে সাদা খোকাবাবুটি হঠাৎ নীল হয়ে জুড়িয়ে যেতেই ওদের মনে পড়ল কুসুমের কথা! বাংলা দেশের সেই সময়টা অজপাড়াগাঁয়ে যা তখনো না ছিল। ভাগ্যিস দাদু সেদিন সেখানে মুসলমানপাড়ায় বিয়েবাড়ি আসতে গেছেন! অতএব যুবতীটিকে উদ্ধার

মাসে-মাসে যে টাকা আসে, তা দিয়ে আমাদের কোনরকমে চলে যায়।

সেই এক বছরে অনেকবার দাদ, আমায় দেখতে চেয়েছেন—মা পাঠাতে রাজী হননি। আমার খুব ইচ্ছে করত যেতে। বিশেষ করে, দাদ, চলে যাবার পর মাঝেমাঝে পোলাও-কোর্মা খাবার চমৎকার সময়গুলো আর আসছিল না। দাদর ঘরের ছাদ থেকে টাঙানো শিকেগুলোতে শূন্য এনামেলের হাঁড়ি লক্ষ করে রাগে ক্ষেপে ঢিল ছুড়তাম। একসময় হাঁড়িগুলো কোন না কোন সুখাদ্যে পূর্ণ থেকেছে। দাদ, ভীষণ ভোজনবিলাসী ছিলেন কি না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে লোকটাকে দেখে আমার খুব খুশী হওয়া উচিত ছিল —কেন না, এতে করে নিশ্চয় কোন গুড় নারকোল কিংবা সুন্দর উপহার আশা করব। কিন্তু খুশী হওয়াকে চেপে ধরেছিল বিস্ময়। লোকটি মোড়ায় বসার উপযুক্ত নয়—এবং মা কাঁদছে দরজার আড়ালে! কী ঘটেছে?

আমি এগিয়ে যেতেই মা আমায় দু হাতে বুকে ধরল। তারপর চাপা স্বরে বলল, খোকা, তোমার দাদ, মারা গেছেন।

মারা গেছেন! সত্যি বলতে কী, মারা যাওয়া সম্পর্কে তখন এক অদ্ভুত ধারণা তৈরি পোষণ করি। আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল যেহেতু আমরা মৌলানা এবং কুল-গুরুদের ঘর—আমাদের কারুরই মারা যাওয়ার উপায় নেই। তার মানে, আমরা—অর্থাৎ বাবা দাদ, মা ও ঠাকমা ছাড়া দুনিয়ার সবাই তো শিষ্য বা মুরীদ মানুষ। ওরা সাধারণ, আমরা অসাধারণ। তা না হলে কেনই বা লোকে আমার মত ক্ষুদে লোকটিকেও এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে! কাজেই আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব। ঠাকমাকে মরতে দেখেও এ বিশ্বাস ঘোচেনি। কারণ, ঠাকমা তো হিন্দু ছিলেন।

মায়ের কথাটা শুনে তাই আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলে উঠলাম, যাঃ! কে বলেছে?

মা বলল, ওই লোকটি খবর এনেছে।

অস্ফুটে চেঁচিয়ে বলাম, ও মিথ্যেবাদী।

বলার সময় লোকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিলাম। দেখি, সে যেন হাসবার চেষ্টা করল—মাথাটা দোলাল—তারপর আফ-সোসে জিভে চুকচুক শব্দ করল মাত্র।

মা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, চুপ, চুপ। বলতে নেই। খোকা, তোমার দাদ, সত্যি মারা গেছেন। তোমার বাবার এদিকে কোন খবর পাচ্ছিনে—মাসের গোড়ায় মানিঅর্ডার এসেছে—তাতে কুপনে অল্প একটুখানি চিঠি ছিল। কী হল, কিছু বুঝতে পারছিনে—তার ওপর এই বিপদ।...

মাকে চুপ করতে দেখে আমি বললাম,

অদূরের দিল্লী

খাশ দিল্লী মোকামে ইসলামধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা কলকাতার পরেই। মধ্যযুগে দিল্লীর জাঁকজমকপূর্ণ যে তল্লাটকে শাহ্‌জাহানাবাদ বলা হতো, ঘন আবাদী অতিশয় ঘিঞ্জি সেই অংশটুকুতে ওদের বসবাস সর্বাধিক। উত্তরে চাঁদনিচক। পশ্চিমে হৌস কাজী। পূবে লাল কেল্লা। এবং দক্ষিণে তুর্কমান দরওয়াজা। এই আভিজাত্য পশ্চিমমুখী। তার কেন্দ্রস্থল জামা মসজিদ, যা ভারতে হিন্দুস্থানের বৃহত্তম মসজিদ। আঁকাবাঁকা গলি-খুপচি, পচাগলা ইমারত। একটু বৃষ্টিবাদল হলো

দূরাশা

কি শুধু পথেঘাটে নয়, বাড়িগুলোর নিচের তলাতেও একবুক জল। আর সেই জলের সঙ্গে মেশামিশি নর্দমার নোংরা। এখানে এখনো আছে মাদ্রাসা। ইনজেকশনের বদলে জড়িবুটি। উনুনে কয়লার বদলে শুকনো কাঠ। বেশ কিছু বাড়িতে এখনো কেরোসিন ল্যাম্প।

এখানে যে কোনো সময়ে যে কোনোদিন যে কোনো হোটেলে এখনো পুরো একটি পেট-ভরা লাঞ্চ খাওয়া যায় পঞ্চাশ পয়সায়। ব্রেকফাস্টের খাস্তা খুশ [illegible]: তাতে বড়-মাপের [illegible] একটি নানরুটি আর কোফতার ডাল।

পথে পদচারণা করে আপন মনে কেউ আওড়াচ্ছে তার কোনো প্রিয় কবিতা। পাশে কুলোর দোকান। আতরের দোকান। বইয়ের দোকানে পুরনো দোকানে ঝোলানো রয়েছে চটি-চটি কবিতার বই। সর্বত্র গড়গড়ার তামাকের দোকান আর প্রতি বাড়ির সম্মুখে অনেক রক। রকে আড্ডা জমে জমজমাট।

সত্যি বলতে কি, রাজধানীর এই শাহজাহানাবাদ আমার কাছে বড় নিকটের। আমার বন্ধুবান্ধব এবং বড় আড্ডা তার বেশির ভাগই রাজধানীর এই আভিজাত [illegible]।

আজ কদিন ধরে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা [illegible] [illegible] হয়ে রয়েছেন। [illegible] দুশ্চিন্তা সুদূরের জেরুজেলাম শহর নিয়ে। সেই মহাতীর্থের আল অকসা মসজিদ নিয়ে। যে মসজিদ ওদের কাছে মক্কার কাবা-র পরেই পবিত্রতম। আর সেই আল অকসা মসজিদে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ইহুদি এক অস্ট্রেলিয়ান। এদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে ইজরেইল রাষ্ট্রের উপর, জবরদস্তি যে দখল করে নিয়েছে ঐশ্বর্যময় এই আশ্চর্য শহরটিকে। "জেহাদ" শব্দটাও এখানে উচ্চারিত হতে শুনলাম, সেই জেহাদ যা উচ্চারিত হচ্ছে দুনিয়ার মুসলমান মানুষের মুখে মুখে।

মধ্যযুগীয় শাহজাহানাবাদ এলাকার বাইরেও আল অকসা মসজিদ নিয়ে নিদারুণ বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে রাজধানীর সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে। মসজিদে-মসজিদে একমাত্র আলোচনা—আল অকসা।

এদের সঙ্গে আছেন অ-মুসলমানরাও। সকলেই জেরুজেলামের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন : সেখানে নতুন কি ঘটবে আবার এবার? ফের লড়াই?

একটা সময় ছিল বছর-দুই আগেও যখন এই প্রশ্নের জবাব জানতে শুনতে পেতাম কায়রো শহর থেকে, বাগদাদ থেকে, ডামাস্কাস থেকে। কিন্তু আজ ওরাও বিশ্রীভাবে আহত হয়ে রয়েছে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরেইলের দাপটে। সুতরাং আল-অকসার অবস্থিতিকেও ওরা ধিপধিপিয়ে তুলে দেবে এমন বাধ্য হবো, ইউনাইটেড নেশনস-এর অস্তিত্ব সত্ত্বেও।

❋

জামা মসজিদ এলাকায় কেটেছে তিনদিন বছর ধরে প্রতিদিন সৌখিন মানুষেরা পাখি-পাখালি কেনাবেচা করে থাকে,—তিরপাখি ময়না কাকাতুয়া আর নানাপ্রকার,—সেখানে এই বছর দুই আগে বিখ্যাত উর্দু কবি মখদুমকে প্রথম দিল্লীতে দেখেছিলাম। তারও আগে ওঁকে দেখেছিলাম ওঁর জন্মস্থান হায়দ্রাবাদে। চারমিনারের ছাদে বসে উনি আমাদের শুনিয়েছিলেন ওঁর সেই অপূর্ব কবিতা, 'সুর্খ সবেরা'—রক্তবর্ণ প্রভাত। কবিতাটি উনি লিখেছিলেন ১৯৪২-এর অগাস্ট বিপ্লবের এক রক্তিম প্রভাতে।

এই এখন এবার দেখলাম ওঁকে—ওঁকে নয়, ওঁর মৃতদেহকে। কবি একা একা পড়েছিলেন ইরউইন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে। পাশে না, ছিল কোনো বন্ধু, না কোনো আত্মীয় স্বজন। কেউই না। তারপর ওঁর মৃতদেহটা এল হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। মরেও যেন উনি বললেন, 'কেন, এই তো বেশ!'

তারও আগে বছর কয়েক ধরে নিয়মিত ওঁর বুঝি জুটতো না কোনো পুষ্টিকর খাদ্য পর্যন্ত। কবিতা লিখে জীবিকার জো কোনো সুরাহা হয় না। সেইজন্যই লিখছিলেন বুঝি এবার একটি উপন্যাস,

দিল্লীর পটভূমিকায়। সেই দিল্লী বা আজ অস্থির তা আর কোথায় হলো না শেষ। শেষ পর্যন্ত উনি নিজেকে পরাজিত মনে করেছেন।

মখদুম উর্দু কবিতায় ছিলেন কণ্ঠস্বর তিরিশ বছর। অজস্র কবিতা ও'র কলম থেকে অনবরত ঝরত না; তবে যে ক'টি কবিতা লিখেছেন উর্দু সাহিত্যে তা স্থায়ী হয়ে থাকবে। পরাজয় নয়, একেই তো বলে জয়ী।

পাকিস্তানী সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব, সাংবাদিক পরিচিতরা, একাধিকবার ও'কে সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন "ঘরকলের জন্য"। কবিতায় লিখেছেন এর জবাব মখদুম: "এই আমার ঘর, জন্ম আমার হিন্দুস্তানে, এইখানেই আমি থাকব।"

মৃত্যুর পর মৃতদেহটা গেল জন্মস্থান হায়দ্রাবাদে। স্টেশনে খুব সম্ভব ভিড় হবে ও'র মৃতদেহটাকে একটু দেখবার জন্য চেয়ে চেয়ে।

ও'র তাজা কবরের উপর পড়বে গুচ্ছগুচ্ছ যূঁই ফুল।

অথচ জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে জীবনকে ছিনিয়ে নেবার সুন্দর চিত্র তাও দেখলাম এই সপ্তাহে। ইনিও প্রখ্যাত কবি। মালয়ালাম কবি মাধবন নাম্বুদ্রি। বয়স মাত্র ছত্রিশ।

দেখলাম ও'কে কেরালা ক্লাবে। পেশায় মোটরগাড়ির ড্রাইভার। ও'র কবিতার প্রথম সংকলন ছেপে বেরোয় ১৯৬২-তে।

সতের বছর বয়সে কিশোর মাধবন জন্মস্থান ছেড়েছিলেন। ইস্কুলে পড়াশোনা করার তো অর্থসংস্থান ছিল না, সেদিকে সুযোগ সুবিধাও করে উঠতে পারেননি। বাড়ি ছেড়েছিলেন মোটর মেকানিক হবেন এই আশায়। এর চেয়ে বড় স্বপ্নও উনি দেখতে তখনো শেখেননি। কিন্তু মোটর মেকানিকের কাজ শিখতে শিখতে হলেন কবি, ড্রাইভারি শিখলেন মোটর গাড়ির। হলেন শোফার। স্পেয়ার টাইমে পড়তেন কালিদাস। পড়তেন বাল্মীকি। ইংরেজি সাহিত্যের জনৈক অধ্যাপক ও'কে পড়তে দেন স্পেন্ডার, অডেন এবং এজরা পাউণ্ডের কিছু কিছু মালয়ালাম অনুবাদ। ১৯৫৪-তে একজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও'র কবিতা নিয়ে লেখেন 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ। ফের তিনিই এ'র এই নতুন চাকরিটি জুটিয়ে দেন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বোম্বাই শহরে প্যাসেঞ্জার বাস-ড্রাইভার। 'মাইনে ভালো। প্রচুর অবসর।' তাই বেশি করে কবিতা। বেশি করে বেঁচে থাকা।'

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়ালাম সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও'র কবিতা নিয়ে এবার ক্লাসে আলোচনা করবেন। সেখানে কবি নিমন্ত্রিত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে এমন হয়? জ্যোতিরিন্দ্র [illegible] বাঁচিয়ে রাখতে নেই?

*

দিল্লীতে সদ্য অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ যুব সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল [illegible] ছি' [illegible] কাঁচেকের পূর্বলিস্ত [illegible] তরুণ দল। ওদের মধ্যে [illegible] গলে গলে মেয়েই ছিল। সব [illegible] কোঁটা কয়লার মতন টাটকা, তাজা।

অল-মসজিদ-উল-আক্‌সা

আজকের দিনের বিশ্ব মুসলিম প্রধানত তিনটি তীর্থ দর্শনে যান : মক্কাতে আল্লার বরকত্‌ পেতে, মদীনায় পয়গম্বরে কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তৃতীয় জেরুজালেমে—যেখানে ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম তিন ধর্মের সমন্বয় হয়।

প্রকৃত শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে যে-তিনটি পুণ্য ভূমি স্বীকার করতে হয় তার একটি মক্কার কাবা এবং তারপর যে দুইটি পুণ্য স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তার দুটিই জেরুজালেমে। এর প্রথমটি একাধিক নামে পরিচিত। ইংরিজিতে একে ডোম্‌ অব দি রক্‌ (রক=প্রস্তরের উপর নির্মিত ডোম=গম্বুজ), ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশত ওমর মস্‌ক্‌ও বলা হয়; আরবীতে এটিকে কুব্বতু স্‌সখরা (কুব্বৎ=ডোম; সখ্‌রা=প্রস্তর বলা হয়)। এটিকে ইহুদি, খৃষ্টান মুসলমান সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ এই তিন ধর্মেরই সম্মানিত রাজা সুলেমানের প্রসিদ্ধ মন্দির একদা এ-স্থলেই দণ্ডায়মান ছিল। এই সলমনের টেম্‌পল্‌ একাধিক বার বিনষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানদের দ্বারা। ভগ্নস্তূপের উপর তাবৎ শহরের ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ বৎসর ধরে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হজরৎ ওমর খৃষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে জঞ্জাল সরিয়ে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর পঞ্চাশ বৎসর পর আমাদের শাহ জাহানের মত বিত্তশালী ও স্থাপত্যে সুরুচিসম্পন্ন খলিফা আব্দুল মালিক সেখানে যে পৃথিবীর অন্যতম অনবদ্য ইমারৎ নির্মাণ করেন সেইটিই ১২০০ বৎসর ধরে সেখানে অটুট অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজনের সৌন্দর্যস্তুতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছে। আমি যতদিন জেরুজালেমে ছিলুম তার প্রায় প্রতিদিন একবার না একবার একা একা ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর বিরাট আর্কিটেকটনিকাল বৈভব থেকে ক্ষুদ্রতম অলঙ্করণ দেখে মুগ্ধ হতুম।

(১) কাবা, (২) উপরে উল্লিখিত এই মসজিদ—তারপরই আসে (৩) মস্‌জিদ-উল্‌-আক্‌সা, সংক্ষেপে আক্‌সা মসজিদ। এই আক্‌সার উল্লেখ কুরান শরীফে আছে (সুরা ১৭ : ১)।

*

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

আরব ও ইহুদি একই সেমিতি বংশ (রেস্‌) জাত, একই রক্ত ধারণ করে। আরবী ও হীব্রু (ইহুদিদের এই ভাষাতেই তাদের বাইবেল রচিত) ভাষা দুই ভগ্নী, অর্থাৎ কগ্‌নেট্‌। এবং সব চেয়ে বড় কথা, বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী প্রফেটগণ যথা, আব্রাহম, দায়ুদ, সুলেমান ইত্যাদি কুরান শরীফেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হজরৎ নবী তাই যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন তিনি ইহুদি আরবের কেন্দ্রভূমি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু হজরতের মদীনা শহরের বসতি স্থাপনা করার দুই বৎসর পর আল্লার আদেশে মক্কার দিকে মুখ করে নমাজ পড়েন—এবং আজও সেই রীতি প্রচলিত আছে। এরই ফলে জেরুজালেমের সলমন মন্দিরভূমি মুসলিম জগতে দ্বিতীয় স্থান পেল বটে তবু কোনো কোনো জাত্যাভিমানী আরব সেটিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রথম স্থানেই রেখেছিলেন—বিশেষত উম্মাই (ওমাইয়াড্‌) খলিফারা। অধুনাকার দিনে কিন্তু মুসলিম জাহান প্রথম স্থান দেয় মক্কার কাবা শরীফকে এবং দ্বিতীয় স্থান জেরুজালেমের সলমন মন্দিরকে—যার উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মালিক নির্মিত এমারতের বয়ান এই মাত্র দিয়েছি এবং এর পরেই বলেছি, তৃতীয় পুণ্যক্ষেত্র মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

*

কিন্তু তৃতীয় হলে কি হয়, এই আক্‌সার সঙ্গে বিজড়িত আছে বিশ্ব মুসলিমের রোমহর্ষক উত্তেজনাদায়ী ঐতিহ্য, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্মিলিত হবার অবিস্মরণীয় অভিযান এবং তার চরম ফল প্রাপ্তি—সত্যং, মোক্ষ, যথা পরিনির্বাণ, বা-খুশী বলতে পারেন।

কুরান শরীফে এ-অভিযানের যে-বয়ান লেখা আছে, হদীসে তার যে টীকাটিপ্পনী আছে (কুরান হিন্দুদের বেদস্থানীয় শ্রুতি; হদীসকে স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়, আশা করি কোনো মুসলমান এ-তুলনার জন্য অপরাধ নেবেন না) সেগুলোর সিকি সিকি পরিমাণ লিখতে গেলেও এই "দেশ" পত্রিকাকেই গোটা বছর তিনেক ধরে ছাপতে হবে—বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে। বস্তুত ইয়োরোপীয় কাব্যের ইতিহাসে ইসলামের এই অনুচ্ছেদটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দান্তের মহাকাব্য "ডিভাইন কমেডি" এর কাছে ঋণী—অপর্যাপ্ত ইয়োরোপীয় আরবী তথা ইতালিয়ান ভাষা-সাহিত্যের

গুণীজ্ঞানী আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন।*

কুরানে আছে, পয়গম্বর সাহেব মক্কাতে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার কিছু কালের মধ্যেই স্বয়ং আল্লাতালা তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরম সত্য ধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রধান ফেরেশতা ("দেবদূত"-ইংরিজিতে "আর্কেঞ্জেল" জিব্রাঈল=গেব্রিয়েলকে পাঠান মুহম্মদকে (দঃ) তাঁর সমীপে নিয়ে আসতে।* কুরান শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে,

"সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাত্রেই তাঁর অনুচরসহ মসজিদ্-উল-হ্বরাম্ (অর্থাৎ মক্কার কাবা থেকে) একই রাত্রে মসজিদ্-উল্-আক্সা পর্যন্ত (জেরুজালেম) ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।" (কুরান শরীফ; সুরা ১৭ : ১)।

অন্বয় এবং টীকা : "সেই ব্যক্তি" হজরৎ। "একই রাত্রে"—তখনকার দিনে যানবাহন যা ছিল তাতে করে মক্কা থেকে জেরুজালেম পৌঁছতে অন্তত (উটে চড়েও) পনরো দিন লাগার কথা। এটা আমার অনুমান মাত্র। কম তো হতে পারে না; বেশীই হবে।

"আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি"—অর্থাৎ আল্লাতালা স্বয়ং তাঁকে সত্যধর্মের গভীর তত্ত্বে দীক্ষিত করবেন—পূর্বোক্ত নজাৎ, মোক্ষ ইত্যাদি।

এস্থলে প্রশ্ন মসজিদ্-উল্-অক্সা কোন স্থলে অধিষ্ঠিত? মুসলিম অমুসলিম (অমুসলিম এই কারণ বলছি, প্রচলিতার্থে অহিন্দু মাক্সমুলার যে-রকম বেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ঠিক সেই জিনিসই করেছেন একাধিক ইয়োরোপীয় অমুসলিম পণ্ডিত কুরান হদীস নিয়ে) সকলেই তার অধিষ্ঠান জেরুজালেমে ছিল বলে স্থির নিশ্চয়—তাই আমি অনুবাদ এবং টীকাতে একই রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণের কথা বলেছি।

পণ্ডিতদের বক্তব্য, মক্কা শরীফের বাইরে এমন এক জায়গা যেটি আল্লা স্বয়ং পূত পবিত্র করেছেন সে-শুধু জেরুজালেমই হতে পারে। কারণ ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ই হজরৎ নবী ঐ দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতএব সেই জেরুজালেমের সলমনের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিতেই আছে মসজিদ্-উল্-আক্সা।

পূর্বেই বলেছি, খলিফা ওমর সলমন মন্দিরের সেই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং পরবর্তী কালে আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন ডোম অব দি রক্ এবং তারই অতি কাছে আরেকটি বৃহত্তর বিরাট মসজিদ—যার নাম মসজিদ-উল্-আক্সা।

ডোম্ অব্ দি রক্ একটা পাথরের চতুর্দিকে গড়া হয়েছিল বলে স্থপতি সেটাকে হাজার হাজার নমাজার্থী মুসলমানের জন্য বিরাট কলেবর দিতে পারেন নি। তাই তিনি সেটিকে করেছিলেন সুন্দর, মধুর। অবশ্য মসজিদের চতুর্দিকে দিয়েছিলেন প্রশস্ততম অঙ্গন (এদেশের মন্দিরে সংকীর্ণ গর্ভ গৃহের চতুর্দিকে যে-রকম বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাখা হয়), কিন্তু গ্রীষ্মকালে, জেরুজালেমের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানকার অনাচ্ছাদিত মুক্তাঙ্গনে—যেখানে মস্তকোপরি সূর্যের প্রতাপের চেয়ে পদতলের পাষাণ ঢের বেশী পীড়াদায়ক—সেখানে জুম্মা নমাজ পড়া অহেতুক পীড়াদায়ক হবে বলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ যা চায় সেই পরিমাণে বিস্তৃত, মসজিদ-উল্-আক্সা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে মসজিদ্-উল্-আক্সা তাবৎ পুণ্যভূমির মধ্যে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর।

কুরান হদীসের সঙ্গে যে মুসলিমের সামান্যতম পরিচয় আছে, সে-ই আপন মনে কল্পনা করে, সেই সুদূর মক্কা থেকে আল্লা তাঁর প্রিয় নবীকে রাতারাতি নিয়ে এলেন মসজিদ্ উল্-আক্সাতে (শব্দার্থে, মক্কা থেকে "সবচেয়ে দূরে পুণ্যক্ষেত্র") সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'বুরাক্' নামক পক্ষীরাজ অশ্ব, এবং তার মুখ মানবীর ন্যায়—সেই অশ্বের সোয়ার হয়ে নবীজী পৌঁছলেন বেহেশ্‌তের দ্বারপ্রান্তে।

এই নিয়ে সে মনে মনে কত না কল্পনার জাল বোনে। স্বয়ং আল্লার সঙ্গে সশরীর সাক্ষাৎ!

*

অবশ্য এ-কথাও সত্য যে বহু মুসলিম দার্শনিক, সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত-মিস্টিক) এ প্রশ্ন বারবার শুধিয়েছেন, এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ এটা কি বাস্তব না স্বপন; তিনি কি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন না, তাঁর আত্মা মাত্রই আল্লার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিন্তু মোলাকাৎ যে হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

*

যা-ই হোক, যা-ই থাক্,—এই মসজিদ-উল্-আক্সা থেকেই, আল্লাতালা হজরৎকে দিয়ে স্থাপনা করলেন মর্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমিতে যোগ-সেতু।

সেই সেতুর পার্থিব প্রান্ত পুড়িয়ে দিয়ে সে-সেতু বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা অল্প বিস্তর যে-কোনো মুসলমানকেই বিচলিত করার কথা।

---

*কুরান শরীফে জিব্রাঈলের উল্লেখ নেই। একাধিক হদীসে সবিস্তর আছে।

(তেইশ)

বাসটা সামনে এসে দাঁড়াতেই কিন্তু শাশ্বতী পিছিয়ে গেল, বলল—বড্ড ভীড়।

রমেন একটু চিন্তা করে বলল—তাহলে চলুন রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত আপনাকে হেঁটে এগিয়ে দিয়ে আসি।

শাশ্বতীও তাই চায়। এ লোকটার সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা তাকে শুনতেই হবে। সদ্যচেনা একজন লোককে এতদূর খামোখা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কেমন বেমানান তা তার মনেও হল না। বলল—বেশ হবে। চলুন। ওখান থেকে আমি যাদবপুর যাওয়ার বাস ফাঁকা পাবো।

কিছুক্ষণ তারা নিঃশব্দে হাঁটল। ফুটপাথ নেই বলে রাস্তাটা বিপজ্জনক, অবিরল গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার দিকটায় রমেন, রাস্তার ধার ঘেঁষে শাশ্বতী। খানিক দূর হেঁটে শাশ্বতী হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে বলল—এবার সেই গল্পটা বলুন। সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা—

রমেন সামান্য একটু হাসল। বলল—রাস্তা একটু ফাঁকা পাই, তারপর—

রেলব্রীজ পেরিয়ে যাওয়ার পর চওড়া সুন্দর রাস্তার ফুটপাথে উঠে এল দুজন। শাশ্বতী এতক্ষণ কৌতূহল চেপেছিল, এবার শ্বাস ফেলে বলল—এবার—

রমেন মাথা নেড়ে বলল—আমার ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর একদিন সন্ধেবেলা খেলাধুলো সেরে ফিরেছি। আমাদের বাড়ির সামনের দিকটায় বিরাট হলঘরের মতো একটা বৈঠকখানা। সেই বৈঠকখানায় সন্ধের অন্ধকারে দেখি দাদু প্রকাণ্ড পিয়ানোটার পাশে বসে আছেন। হাতের আতসকাচ দিয়ে পিয়ানোর গায়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন নীচু হয়ে। আমি তাঁকে টের পেতে না দিয়ে পা টিপে টিপে বড় ঘরটা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে দাদু খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলেন—কে? আমি দাঁড়িয়ে বললাম—আমি। দাদু একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে—যেন আমাকে কোলে নেবেন—এমনভাবে বললেন—রমেন! কাছে এসো তো। কাছে যেতেই উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—আমার সামনে বোসো। আমি মেঝের হাঁটু গেড়ে বসলাম। দাদু আমার মুখ হাতে তুলে বললেন—দেখি রমেন, তোমার মুখখানা। আমার মুখের ওপর আতসকাচ ধরে দাদু অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখলেন। তখনো ঘরে আলো দিয়ে যায়নি, ঘরটা অন্ধকার। অবশ্য একটু শেষ বেলার আলোয় সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি তাঁর দুটো প্রকাণ্ড চোখ, নাকের উঁচু হাড, ঘন ভ্রূ, আর কপাল দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল সেই চোখ জোড়া আমার ভিতরে অনেকখানি দেখে নিচ্ছে। তখন আমার বয়স দশ কি এগারো, তখন আমি আমার প্রথম বয়ঃসন্ধির খারাপ স্বপ্নটি দেখেছি, আর একদিন দুপুরবেলা অলি নামে একটি মেয়ে চোর-চোর খেলার সময়ে মুকুন্দর ঘানিঘরে অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে একটা চুমু খেয়েছিল, তখন আমার গালে একটি দুটি ব্রণ দেখা দিচ্ছে। তাই দাদুর সেই চোখ জোড়ার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল তিনি আমার সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমার বুক কাঁপছিল। কিন্তু দাদু সেদিন আমাকে অন্যরকমভাবে দেখছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তিনি খুব অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন—রমেন, তুমি কি খুব বেশী কিছু চাও? খুব টাকা পয়সা, বড় জমিদারী, অনেক বাড়ি-গাড়ি? সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো তখন আমার বয়স নয়। দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই বললেন—তুমি কখনো খুব বেশী কিছু চেও না। লোকে যেন একদিন তোমাকে ভিখিরির পোশাকেও ঐশ্বর্যবান বলে চিনতে পারে। এই বলে দাদু আতসকাচ সরিয়ে রাখলেন, জলভরা চোখ দুহাতে মুছে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন—চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পরদিন দাদু দুপুরবেলা একা একা ছাদে উঠে গেলেন। তারপর আতসকাচের ভিতর দিয়ে ভরদুপুরের সূর্যের দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর দুটো চোখই একদম নষ্ট হয়ে গেল। এই ঘটনায় আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন আমি চোখে কীরকম দেখি। আমি ভালই দেখতাম, তবু মার সন্দেহ যেত না, জিজ্ঞেস করতেন—ঐ যে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে নৌকোটা যাচ্ছে—বল তো ওটা কী নৌকো কখনো বা

একা আমাদের বাড়ির পাঁচিলের ওপর দিয়ে চোখ বুজে দ্রুত হাঁটতে পারতাম। উপরন্তু আমাদের বাড়ির বাইরের মাঠে দূরে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে বৃত্ত এঁকে তার পিছনে দাঁড়িয়ে শিস দিত, আমি একমনে শিসের দিকে চোখ বুজে সেইখানে ঠিকঠাক পৌঁছে যেতাম। এইভাবেই আমার যখন চোদ্দ পনেরো বছর বয়স তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আর কোনো ভয় নেই। এবার আমি আমার অন্ধকার দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত। সেই সময়েই একদিন ঘটনাটা ঘটল। আমি রোজ খুব ভোরে উঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়োতে যেতাম মাঠে। বলটা মাটিতে গড়িয়ে দিতাম, তারপর পায়ে পায়ে বল নিয়ে মাঠের চারদিকে চক্কর। অন্ধকার থাকতে আমার দৌড় শুরু হত মাঠটাকে পাঁচ কি ছবার পাক দেওয়ার পর আলো ফুটত। রোজই এরকম হত। একদিন খুব ভোরে উঠে দৌড়োতে গেছি, পায়ে বল—দৌড়োতে দৌড়োতে পাক খাচ্ছি মাঠের চারদিকে। ক্রমে ক্রমে এক দুই করে সাত আট দশ বার মাঠটা ঘুরে এলাম। কিন্তু সেদিন ভোর হচ্ছিল না। অন্ধকার জমাট বেঁধে রইল। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না, আমি বিভোর হয়ে দৌড়োতাম এবং প্রায়ই সে সময়ে আমার চোখ বন্ধ থাকত। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে আমার পা থেকে বলটা একটু জোরে গড়িয়ে গেল আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি থেমে চোখ খুলে বলটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি চারদিকে নিরেট ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাটির দিকে চেয়ে দেখি জমাট অন্ধকার; আকাশের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ তারা কিছু দেখা যাচ্ছে না, চারদিকে চেয়ে দেখি কোনোখানে কোনো আলো নেই, ঝাপসা গাছপালা নেই। কিছু নেই। আমি চোখের কাছে তুলে আমার সাদা হাতটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, দেখলাম কিছু নেই। মনে পড়ল আমি মাঠটাকে অন্তত দশবার পাক দিয়েছি, তবু সেদিন ভোর হয়নি। আমি এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি যে চোখ বুজে হাঁটতে শিখেছিলাম, কিংবা শিখেছিলাম দিকনির্ণয় করার কৌশল সে সব কিছুই তখন আমার মনে পড়ল না। আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ভয়ে। আমি আর এক পাও এগোবার সাহস পেলাম না, দিকনির্ণয় করতে আমার ভয় হল—যদি ভুল পথে চলে যাই? তাই তখন আমি খুব অসহায়ভাবে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসলাম। আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। খুব তুচ্ছ কারণেই তখন আমি কাঁদছিলাম—কখনো হারানো বলটির জন্য, কখনো অলি নামে সেই মেয়েটির জন্য, কখনো বা ঘরে যাওয়ার মেঠো পথটির জন্য। আমি কি আর কখনো কিছুই দেখব না? এতকাল ধরে আমি যা কিছু দেখেছি, কিংবা যা কিছু আমার দেখা হয়নি আমি সেই সব কিছুর জন্য কাঁদছিলাম। এইভাবে অলীক, অসম্ভব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। এর আগে আমি কখনো ভগবানকে ডাকিনি, ডাকার দরকার হয়নি বলে। দুঃখের সময়ে বন্দুক আর গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে বলে দশ-বারো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখেছিলাম, তেরো বছর বয়সে শিখেছি গাড়ি চালাতে, পনেরো ষোলো বছর বয়সে শিখে গেছি কী করে চোখ বুজে চলতে হয়। আমি তো সব কিছুর জন্যই নিজের ওপর নির্ভরশীল—তবে ভগবানকে আমার কী দরকার। যে নিজে নিজে চলতে পারে তার ভগবান দিয়ে কী হবে? তাই সেই অদ্ভুত সময়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে মাঠের মধ্যে বসে থেকে যখন আমি ভগবানের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম তখন তাঁর কোনো চেহারাই আমার মনে এল না। তবু আমি আকুল হয়ে বললাম—রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো—আমার চোখ ফিরিয়ে দাও। সেই আকুলতার মধ্যে বোধ হয় একটা কিছু ছিল, আমার মনশ্চক্ষে ভগবানের একটা চেহারা ভেসে উঠল। কেমন জানেন? সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি দাদুর মুখ যেরকম দেখেছিলাম অনেকটা সেই রকম। সে যেন দাদুর মতোই আমার প্রিয় কেউ, যে আমাকে বড় ভালবাসে, সে যেন একটা আতসকাচের ভিতর দিয়ে নিবিড় ভালবাসায় শেষবারের মতো আমার মুখখানা দেখে নিচ্ছে। যেন বলছে—আহা, তুমি কি আমার রতন! আমার রতন! তোমার মুখখানা। অনেকটা সময় ধরেই তার মুখে। আর আমি দেখছিলাম, তাই মুখে, সেই প্রকাণ্ড চোখ দুটোর ভিতরেই যেন পাহাড় পর্বত সমুদ্র আর গাছপালা রয়েছে, সেখানেই রয়েছে আকাশ। এরকম কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে শীতের উত্তুরে হাওয়া হুহু করে বয়ে গেল—গাছপালার চারদিকে সেই বাতাসের শব্দ হল। সেই বাতাসটাই আমার কোলের কাছে গড়িয়ে আনল আমার হারানো বল। আমি দু হাতে বুকে তুলে চেপে ধরলাম বলটা। চোখ চেয়ে দেখলাম চারদিকে আলোর আলো—আর সূর্য উঠছে।।

শাশ্বতীর পা কখন থেমে গিয়েছিল। সে মুখ তুলে শ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করল—সত্যি?

রমেন ম্লান হাসল আবার, বলল—সত্যি।

—আপনি কাউকে এ গল্প বলবেন না?

—আমি দাদুকে এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। দাদু তখন ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ, তাই আমার বিশ্বাস ছিল দাদু সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস করবেন না। তাই সেদিন সন্ধ্যেবেলা দাদু তার আহ্নিক সেরে এসে যখন বড় ঘরটায় আরাম কেদারায় বসেছেন তখন আমি তাঁর পাশে মেঝেতে বসে সকালের ঘটনার কথা বললাম। শুনে দাদু আমার মাথায় নীরবে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলেন। টের পেলাম তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে। সেজবাতিটা কমিয়ে দেওয়া ছিল, তবু সেই

অল্প আলোতেও দেখলাম তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন—ভগবানের কথা ভাবতে গিয়ে তুমি কেন একজন মানুষের কথাই ভাবলে রমেন? ভগবান কি মানুষ? আমি এর উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলাম—সত্যিই তো. ভগবান যদি মানুষের মতোই দেখতে হয় তবে আর সে ভগবান কিসের? তবু আমি মুখে বললাম—মানুষ হলেও সে খুব প্রকাণ্ড মানুষ? ঐ আকাশ পর্যন্ত তার মাথা, আর তার চোখের মধ্যে যেন পাহাড় সমুদ্র এসব রয়েছে। শুনে দাদু হেসে বললেন—মানুষ প্রকাণ্ড হলেই কি ভগবান হয়? প্রকাণ্ডতাই যদি ভগবানের গুণ তবে তুমি আকাশ, কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র—কিংবা এসব যা কিছু মিলিয়ে যে প্রকাণ্ড চরাচর তাকে ভগবান ভাবলে না কেন? কিংবা তুমি তো ভাবতে পারতে যে তিনি এ সবের অতীত একটা শক্তি। কিন্তু এই কথা শুনে আমি ভেবে দেখলাম যে তা হয় না। পাহাড় আকাশ কিংবা সমুদ্র কী করে ভগবান হবে—তারা কি আমার কথা শুনতে পেয়েছিল? তাদের কি মন আছে যে আমার কথা বুঝবে? তা ছাড়া আমি তাঁর যে মুখ দেখেছিলাম তা অনেকটা মানুষের মতোই—যিনি আমাকে [illegible] [illegible]। আমি সেই কথাই দাদুকে [illegible] [illegible] দাদু আর হাসলেন না. [illegible] চুপ করে রইলেন, তারপর এক সময় [illegible] —রমেন, অনেকদিন আগে ভগবান একবার বলেছিলেন যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসবেন। যদি সে কথা সত্যি হয় [illegible] এটা ঠিক যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসছেন। হয়তো এখন এ মুহূর্তেও তিনি আছেন পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষ সে কথাটা বিশ্বাস করে না বলেই তাঁকে কখনো খুঁজে দেখে না। কিন্তু তুমি খুঁজে দেখো। তুমি তাঁর কথা মানুষকে [illegible] বোলো যে তুমি তাঁর কাছে যাবে। [illegible] কেউ না কেউ একদিন ঠিক তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল—তারপর—আপনি কি তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

রমেন সে কথার উত্তর দিল না, বলল—কিন্তু আমরা কোথায় এসে পড়েছি দেখেছেন?

শাশ্বতী দেখল, রাসবিহারীর মোড়। তার মন খারাপ হয়ে গেল, বলল—আপনার অনেক দেরী করিয়ে দিলাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল—দেরী হয়নি তো?

তারপর শাশ্বতীকে একটা ডবলডেকারে তুলে দিয়ে রমেন ফিরল।

গত রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বিমান গীতা পড়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা তার কাছে। পড়তে পড়তে হুঁশ হল যখন মাথার পিছন দিকে তীব্র একটা যন্ত্রণা দেখা দিল হঠাৎ। চোখের ডিম দুটো টনটন করে উঠল। তখন বই রেখে বাতি নিবিয়ে দিল বিমান। কিন্তু শুতে গিয়ে বুঝল ঘুম আসবে না। ঘুম সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা ব্যাপার এখন। মাথার ব্যাণ্ডেজটার ওপর দিয়ে সে একটা রুমাল শক্ত কটকটে করে বেঁধে গিঁট দিল। তারপর খোলা হাওয়ার খুঁজবে বলে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বট গাছের তলায় কতগুলো ছেলেছোকরা বসে আছে। তাদের পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে রঙচঙে শার্ট, মুখে সিগারেট আর হাতে মাটির ভাঁড়। রাস্তার অস্বচ্ছ আলোয় তাদের দেখা যায়। চা খাওয়ার মতো করে চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ে। একটু চা খেতে বিমানেরও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কাছাকাছি কোনো চায়ের দোকান দেখতে পেল না। অল্প দূরে একটা পানের দোকান খোলা আছে কেবল। সে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল, অমনি একটা ছেলে উঠে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল—কী চাই!

বিমান একটু ইতস্তত করে বলল—একটু চা কোথায় পাওয়া যায়!

ছেলেটা খুব অবাক হয়ে বলল—চা!

পিছন থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল—কে রে?

ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে বলল—চা চাইছে।

আর অমনি একটা হাসির শব্দ হল। আর একজন বলল—নিয়ে আয়, চা খাইয়ে দিচ্ছি।

আর একজন বলল—হ্যাঁ, খাওয়াও আর কি—এমন পয়সার মাল কোথাকার কোন মড়াকে—

—যাঃ, মদ কাউকে বিষিউক্ত করতে নেই, পাপ হয়। শচে, নিয়ে আয় ভদ্রলোককে—

মাথার মধ্যে তখন এমন একটা দপদপ রক্ত বওয়ার শব্দ হচ্ছে, আর এমন টনটন করছে দুটো চোখ যে বিমান ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতে পারল না। এরা তাকে মদ খাওয়াতে চাইছে। সে কখনো খায়নি। কিন্তু মাথা আর চোখের এই অসহ্য যন্ত্রণায় কিছু একটা করা দরকার। যদি খুব নেশা হয় তাহলে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

ছেলেগুলো খুব খারাপ নয়, সে এগোতেই বাঁধানো বেদীর ওপর একটু সরে বসে তার জন্য জায়গা করে দিল। বসার পর বিমান দেখল এদের দলে—কী আশ্চর্য—একটা মেয়েও রয়েছে। মেয়েটার মুখ অন্যদিকে ফেরানো, তবু একপলক দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটা একেবারে রদ্দি। মুখে অতিরিক্ত পাউডার, খুব সস্তা জবজবে একটা শাড়ি। ছেলেগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছেও না, খুব সম্ভবত আসর গরম করার জন্য ওকে নিয়ে এসেছে ভাড়া করে—তারপর সবাই ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বিমান চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভাঁড়ে প্রথম চুমুকটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত শরীর পেট থেকে জিভ পর্যন্ত যেন নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল—না, না, এ জিনিস আমরা নেবো না, এ জিনিস আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বিমান মুখের মধ্যে ঢোকটাকে রেখে বসে রইল; গিলতে পারল না। ফেলতেও না।

তার পাশ ঘেঁষে বসে আছে সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা, যে তাকে ডেকে বসিয়েছে এইখানে। সে ছেলেটা তেমনি আদর করার মতো গলায় জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগছে?

বিমান ঢোকটা গিলে ফেলল। ঝাঁঝের দমকে চোখে জল এসে গেল তার। অস্ফুট-ভাবে বলল—ভীষণ ঝাঁঝ আর তেতো-তেতো—এতে কী আছে?

—কী জানি! শালারা কত কিছু মেশায়। কারবাইড থাকতে পারে কিংবা যে কোনো পয়জন। কিন্তু ওসব সয়ে যায়, ইমিউনিটি ফর্ম করে গেলে কিছুই আর হয় না—আমি তো বিলিতী জিনিস কত খেয়েছি কিন্তু বাংলা মালের তুলনা হয় না—আহা, বাংলার মাটির জিনিস, বাঙালীর হাতে তৈরি—

বলতে বলতে ছেলেটা কথা থামিয়ে গুন-গুন করে গাইতে লাগল—বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার—

—ও আমার সোনার বাংলা—আর একজন অর্ধ-চেতন সুরে গায়, তারপর হেসে ওঠে।

সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে—কোথায় বেরিয়েছিলেন?

—আমার বড্ড মাথা ধরেছিল।

—খেয়ে নিন। মাথা যে আছে টেরই পাবেন না।...কোথায় থাকেন?

—কাছেই।

—একা?

—হুঁ।

ছেলেটা হাসল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল—তা হলে আপনার জন্য আরো ফার্স্ট ক্লাশ বন্দোবস্ত করতে পারি। ঐ যে মেয়েটা—ওকে ঘরে নিয়ে যান। ও আপনার মাথা টিপে দেবে, পদসেবা করবে, ঘুম পাড়াবে—দারুণ এক্সপার্ট মেয়ে—নেবেন সঙ্গে? ভয় নেই, ওকে কিছু দিতে হবে না। টাকা পয়সা যা দেওয়ার আমরা দিয়ে রেখেছি—

মেয়ে! মেয়ে দিয়ে বিমান কী করবে! শুনে সে ভীষণ চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে বলে—না, না, তার দরকার নেই—

শুনে ছেলেটা ভীষণ হতাশ হয়। বলে—নিন না। মেয়েদের যা যা থাকে ওর সব আছে, বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি। কেবল আমাদের কাছে একটু পুরোনো হয়ে গেছে—রোজ আসে তো, তাই—কিন্তু আপনার কাছে বেশ নতুন লাগবে—নিয়ে যান—বলে ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে ডেকে বলে—পারুল, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাবে? যাও না—খুব ভাল লোক—

মেয়েটা ফিরেও দেখে না। আর বিমানের ভীষণ ভয় করে। সেই ছেলেটা বলল—নিন না। আপনার ভালোর জন্যই বলছি—

বেদীটাকে ঘিরে আরো সাত আটজন বসে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে তাদের কারো মুখই ভাল দেখা যায় না। তাদের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল—কে নেবে পারুলকে? কেন শালা! আজ পারুল আমার।

এই কথা বলে ছেলেটা ও পাশ থেকে উঠে পারুলের সামনে দাঁড়ায়। খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে এক হাতে ধরে অন্য হাতে মেয়েটার থুতনি তুলে ধরে মুখ দেখার চেষ্টা করে। বলে—তুমি আমার নও?

মেয়েটা ঝটকা মেরে ছেলেটার হাত সরিয়ে দেয়। ছেলেটা তখন দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দু হাত বাড়িয়ে খিমচে ধরে মেয়েটাকে। 'রে-রে' করে হাসে। মেয়েটা ডানা ঝাপটানোর মতো শব্দ করে।

প্রকাশ্যে, একটু আধো-অন্ধকারে ব্যাপারটা চলতে থাকে। এ পাড়াটায় ভদ্রলোক কেউ থাকে না, বটগাছের উল্টো দিকে একটা পোড়ো মাঠ—তার ওপাশে বস্তি। আশেপাশে দু একটা গরীব-গুর্বোর দীন-দরিদ্র বাসা রয়েছে। কিন্তু কোনোখান থেকেই কোনো প্রতিবাদ আসে না, দূর থেকে ছুটে আসে না লোক। হয়তো ঐ সব বাসায় যারা থাকে তারা অন্ধকারে জানালার খড়খড়ি খুলে দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করছে নিঃশব্দে, হয়তো বউকে ফিসফিস করে বলছে—কী কাণ্ড হচ্ছে দেখ গে—সেই বদ ছেলেগুলো গো—একটা মেয়েকে...। বউ হয়তো চাপা রাগের স্বরে বলছে—তা তোমার ওখানে দরকার কী? দিনকাল ভাল না, জানালা বন্ধ করে চলে এসো...

এবার ভাঁড়ের তরল পদার্থটার কোনো তেতো-কটু স্বাদ পেল না বিমান। ঢক-ঢক করে জলের মতো খেয়ে নিল। কিন্তু সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমকে মেঘ ডেকে উঠল যেন। কান মুখ চোখে ঝমঝম বাজনা বেজে উঠল। মনে পড়ে গেল বিকেলে সে একটা মেয়েকে বাঁচিয়েছে। সরল, শিশুর মতো একটি মেয়েকে। মেয়েটা কাঁদছিল। সব মেয়েই কাঁদে। কেননা, মানুষের জন্মের রহস্য বাঁধা থাকে তারই আঁচলে। সে জানে, তাকেই সন্তানের ভার বহন করতে হবে, বহু কষ্টে জন্ম দিতে হবে। তবে সে কেন বহন করবে যেমন তেমন সন্তান—সে কেন চাইবে যে খুশি সন্তান দিয়ে যাক তার গর্ভে? বরং সে মনে মনে অপেক্ষা করে শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষের—যাকে সে হয় তো কখনো পায়, কখনো পায় না, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে। যদি শত পুরুষেও তার দেহ ছিঁড়ে খায় তবু সে স্বভাবে থাকে একগামী—যাকে সে হয়তো কখনো দেখেনি সেই শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষ তার অন্তরে স্বামী হয়ে থাকে। তাই মেয়েমানুষকে না চিনলে তাকে কখনো ছুঁতে নেই। কিন্তু মূর্খ চাষার মতো বহু-গামী পুরুষ মাটি না চিনে বীজ ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে কত মানুষ তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের বলাৎকার করে যায় নিজের অজান্তে। কখনো ভেবে না একটি প্রতিক্রিয়া কত দূর সর্বনাশ নিয়ে আসে।

বটগাছ ছাড়িয়ে একটু দূরেই অন্ধকারে বাতি নেবানো একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিটা বোধ হয় এদেরই ছেলেটা পারুলকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছায় যাচ্ছে পারুল, তাকে যেতে হবে বলে। সে টাকা নিয়েছে। অন্য ছেলে-গুলো চুপচাপ বসে থাকে।

মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণাটা হঠাৎ কেমন ভোঁতা হয়ে আসে। এক ডেলা মাটির মতো অর্থহীন লাগে মাথাটাকে। বিমানের হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। সে হঠাৎ পাশের ছেলেটাকে ফিস্‌-ফিস করে বলে—আমি ওকে—ঐ পারুলকে নিয়ে যাবো—

ছেলেটা হেসে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে—গদা, পারুলকে ছেড়ে দে, এই ভদ্রলোক রাজী আছেন—

ছেলেটা বলে—ফোট্ শালা। আজ পারুল আমার। আমার হাত কামড়ে দিয়েছে পারুল, খিমচে দিয়েছে গালে, তবু আমি ভালবাসার জ্বলে যাচ্ছি—

—শুনলেন তো, ও ছাড়বে না। আপনি যান না, ওর সঙ্গে লড়ে কেড়ে নিন পারুলকে। যদি পারেন তবে আমরা সবাই ক্ল্যাপ দেবো—যান না—

ছেলেটা তাকে ঠেলে তুলে দেয়।

সবাই হাসে, চাপা গলায় বলে—যান না, মশাই, যান—

বিমান উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। পা অবশ হয়ে আসে। সে আবার পড়তে পড়তে সামলে নেয়। এমন অশালীন, কুৎসিত একটা দৃশ্য সে আর কখনো দেখেনি। বহু পুরুষের মধ্যে একটি মেয়েকে নিয়ে টানাটানি। আজ বিকেলে সে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। যে মেয়েটা বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু হায়, ঈশ্বর, এই নষ্ট মেয়েটা যে জানেও না সময়-মতো কেঁদে উঠতে। একটু পরেই ওর জোর নষ্ট হয়ে যাবে—আর তারপর—

হঠাৎ দু' হাত ওপরে তুলে বিমান চেঁচিয়ে উঠল—বাঁচাও—বাঁচাও—

কিন্তু কিছুই হল না। গলার স্বর ফুটল না তেমন। হতাশভাবে ভীত চোখে বিমান দেখল অন্ধকারে ছেলেগুলো সবাই তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। তাদের সিগারেট জ্বলছে।

কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই বিমান খুব ক্লান্তভাবে মাটিতে পড়ে গেল। চোখ বোজার আগের মুহূর্তে তার মনে হল—সে একা বড় অসহায়। বিপক্ষের শত্রুদল বড় প্রবল। এখন খুব শক্তিমান, খুব প্রকাণ্ড কেউ যদি তার পাশে থাকত।

তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিল বিমান।

খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙল, সূর্যের প্রথম আলোটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দিবগুণ বেগে দপদপ করছে মাথার শিরা। ভাল করে চোখ খুলতে সময় লাগল অনেক। চেয়ে দেখল সে গাছতলায় পড়ে আছে। তার চারদিকে ভাঙা মাটির ভাঁড়, শালপাতা, কয়েকটা দেশী মদের বোতল, ধুলোয় জুতোর ছাপ। দু একজন কৌতূহলী লোক পথ চলতি না-থেমে তাকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সে একটা জিনিস টের পেল। বহুকাল বাদে তার মাথার ভিতরটা আবার ফাঁকা লাগছে। সে মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু স্পষ্ট টের পেল মাথার ভিতরে আকাশের একটা অংশ ঢুকে আছে। বেরোচ্ছে না। আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগল, আর সে টের পেতে লাগল কোন সুদূর থেকে আকাশের শূন্যতা তুষারপাতের মতো নিঃশব্দে তার মাথার ভিতরে খসে পড়ছে।

খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল বিমান। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই সে আবার কিছু দিনের জন্য পাগল হয়ে যাবে। পাগল হয়ে যাওয়ার আগের এই লক্ষণগুলো তার খুব চেনা। এখন পরিচিত সবাইকে এই খবরটা তার জানিয়ে দিতে হবে। তোমরা সবাই সাবধান থেকো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

সবার আগে খবরটা জানানো দরকার অপর্ণাকে। সে হয়তো একদিন না জেনে হুট্ করে চলে আসবে। ভেবে-চিন্তে অপর্ণাকে একটা চিঠি লিখল বিমান—'অপর্ণা, আমি অনেক দিন ভাল ছিলাম। আজ সকাল থেকে টের পাচ্ছি আবার আমার সেই পাগলামিটা আসছে। কয়েক দিন তুমি আর এসো না। আমি ভাল হয়ে গেলে তোমাকে খবর দেবো।'

চিঠিটা ভাঁজ করে সে উঠল। জামা গায়ে দিয়ে ঠিক দুপুরবেলায় সে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশ)

তিয়োর বোনে বাঁশের আটল

পঁচিশ তিরিশ হাত লম্বা এক 'বেগোত' মোটা 'বাঁশনী' বাঁশ পাঁচ সাত মাইল দূর থেকে কাঁধে করে বয়ে আনতে 'হেড়ো সেঁকে' যায়। গাড়ি টানা গরুর কাঁধের মতো কড়া পড়ে যায় কাঁধে। এক হাঁটু কাদা-দোক ঠেলে এগোতে হয় এই বর্ষাকালে। পাঁকাল মাছের মতন পিছল এ'টেল মাটি, হাজার বুড়ো আঙুল টিপে টিপে চললেও—যদি একটু পা 'হড়কায়' তো চিৎপটাং। বাঁশ সমেত পড়লে কোমরের খিল ছেড়ে যাবে।

'ঘুনি', 'আটল', 'ঝুগুরি', ঝাঁকরি, 'পোলা' তৈরির জন্যে দরকার বাঁশনী আর 'তলতা' বাঁশ। একখানা বাছাই বাঁশনী বাঁশের দাম তিন টাকা। 'তলতা' হলে দু-টাকা। কাটারী হাতে 'তিয়োর' বা 'ডোমে'রা বাঁশ কিনতে এসেছে দেখলে চাষীরা কামড় দিয়ে দর ধরবে। নইলে 'চুলি ভেলকো' 'গুঁড়ি ভেলকো' বাঁশের দাম একশো পঁচিশ টাকা শ। প্রমাণ বাছাই বাঁশ। সরু তেড়ঁপ বাঁশ ষাট টাকা। মাঝারি আঁশ। 'ভেলকো' বাঁশ বেশি শক্ত, কাজের বাঁশ। 'জাওয়া' বাঁশের গাঁটে গাঁটে হয় প্রচুর কাঁটা। সেগুলো ছাতার মতো চারদিকে ছড়িয়ে থাকে তির্যক রেখায়। 'জাওয়া' বাঁশের বড় একটা উপকার পাওয়া যায় না, তবে লাউ, সিম, বরবটি, কুমড়ো পাল্লা ঝিঙে করলা ইত্যাদি লতানো গাছের ছাউনির জন্যে এ বাঁশ খুব কাজে লাগে। কঞ্চি বেশি বলে এর 'ভাঁটলাইয়ে' গাছ তার 'শুঁড়' বা আঁকড়ি জড়িয়ে বেশ চারদিকে প্রসারিত হতে পারে।

'বাঁশনী' বাঁশ পাকলে গাড়ে লাল হয়। তিন পো এক হাত ছাড়া 'পাব' হয় এর। কঞ্চি হয় পাতলা। তিন 'সনে' বাঁশ ঘরের কাজে লাগে। কাটারি মেরে মেরে ফাটিয়ে 'ছাঁচা' তৈরি করে 'আগোড়' বা দোর অথবা বেড়া করা হয়। খুঁটির কাজেও লাগে তবে গোড়ার দিকটা। নচেৎ এ বাঁশ ফাঁপা। জেলেরা ইলিশের জালের 'চোঙা' তৈরি করে এ বাঁশ থেকে। 'তলতা' একেবারেই ফাঁপা। চলচলে নরম প্রকৃতি এর। এ বাঁশও চোঙার জন্যে জেলেরা ব্যবহার করে যদি খুব মোটা হয়। এর জটা বা ভুঁইফোড় থেকে ভাল 'ছিপ' হয়। মাছ মারা চৌকির 'ছড়' এবং আড়েবাঁশি তৈরি করা হয় 'তলতা' বাঁশের সরু ভুঁইফোড় থেকে। পূব বাংলার মানুষরা 'তলতা' বাঁশকে 'মুলি' বাঁশ বলে। মুলি বাঁশ থেকে সুন্দর সুন্দর 'ছামাড়' দরমা তৈরি করতে ওস্তাদ পদ্মাপারের মানুষরা।

চাষীবাসীদের কাছে বাঁশের চাইতে উপকারী বস্তু আর দ্বিতীয় কিছু নেই। কথায় বলে 'হলে বাঁশ মলে বাঁশ।' সন্তান জন্মের পর তার নাড়ি কাটার জন্যে চাই বাঁশের

'চ্যাঁরটি' আর মরলে চাই হরিবোল দিয়ে কাঁধে তোলার জন্যে বাঁশের 'খাটুলি'। আর মুসলমানদের পিছনে তো বাঁশ ধাওয়া করে একেবারে কবর পর্যন্ত!

'চুলি ভেলকো' অথবা 'গুঁড়ি ভেলকো' বাঁশের চাহিদাই বেশি সংসারে। তাই গ্রামে গ্রামে প্রতি চাষীরই এ বাঁশের ঝাড় থাকে। 'বাঁশনী' বা 'তলতা' তেমন কোনো কাজে লাগে না বলে ঝাড়ে পড়ে থেকে পেকে যায়। ডোম বা তিয়োরদের দরকার হয় এক সনের বা দু-সনের কাঁচা বাঁশ। কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে—তাই ঘর বাড়ি তৈরির কাজে পাকা বাঁশ চাই। কিন্তু পাকা বাঁশ এখন পাবে কোথা? পানি করেজ আর কলকাতার বড় বড় ইমারত তৈরির কাজে সমস্ত কাঁচা এবং মোটা মোটা এক সুনে দু-সুনে বাঁশ গাড়োয়ান খদেরদের লাভের ব্যবসায় 'মুলে হাবাত' হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কাঁচা বাঁশে ঘর তৈরি করো, খুঁটি দাও, আড়কাঠা, 'জানলা' দাও, সরদাল, পাড়োন, দাঁতুনে, বাঁখারি, বাটাং করো, সব ছ-মাসেই ঘুণ ধরে ভেঙে পড়বে।

শুধু দিনের বেলাই নয় প্রতি রাত্রে—এই বর্ষা কালেও—গাড়ি গাড়ি বাঁশ যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে। পাকা বাঁশ পাবার উপায় নেই। তিন সন পার না হলে বাঁশ পাকে না। পাঁচ সনের পর বাঁশ শুকিয়ে যায়। শহরের ব্যাপারীরা মোটা আর লম্বা বাঁশের বেশি দাম দেয়। তারা ফিতে দিয়ে গোড়া মাপে। কাজেই কাটো কাঁচা বাঁশ। আর কাঁচা বাঁশও বেশিদিন টিকবে না—তাতে ব্যবসার লাভ বেশি। কাঁচা বাঁশ কাটলে ঝাড়ের সর্বনাশ হয়। কেননা এক সনের এবং দু-সনের বাঁশের মূল বা "মুড়ো" থেকে 'তেউড়' বার হয়। তিন সনের হয় না। সেটাই কাটার নিয়ম। এর পর ডোমের ছেলেরা কঞ্চি কিনতে এসে যদি মস্তক শূন্য বৃহৎ কঞ্চি বিশিষ্ট 'কাক মরা' বাঁশের কঞ্চি কেটে নেয় আড়াই টাকা তিন টাকা পণ দরে তবে এক রাতের গুমোনি ঝড় খেলেই ঝাড়ের সমস্ত বাঁশ ছিটকে পড়ে যাবে চারদিকে ছত্রখান হয়ে।

তখনকার বুড়ো বাপ ঠাকুরদারা বলত, 'ওহে কাঁচা বাঁশ কেটো না, পাপ হবে। শনি মংগল বারে বাঁশ কাটতে নেই।' কিন্তু এখন কে সে সব কথা শোনে। কিন্তু মুসলমান গাড়োয়ানরা তাদের আড়াই সের ওজনের ভারি কাটারী মেরে এক কোপে যতই কাঁচা বাঁশ কাটুক ডোম বা তিয়োররা তা করে না। তারা বাঁশ চেনে। তবুও লোকে বলে, 'বাঁশ বাগানে ডোম কানা!' তার মানে একটা বাঁশ দর দিয়ে সে ঝোড়া, চুবড়ি, কুলো, ধুচুনি, চালুনী তৈরি করবার জন্যে কিনেছে, বেছে নিতে হবে তো? কোনটা নেবে না নেবে ঠিক করতে তার সময় লাগবে

কইকি। কিন্তু পাকা বাঁশ সবাই চেনে।

তিয়োর আর ডোম—এ দুটি সম্প্রদায় ভিন্ন। তিয়োর সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের হিন্দু। এরা বাঁশ থেকে বাঁখারি কেটে সরু সরু শলা বা কাঠি দিয়ে মাছ ধরা 'ঘুনি', 'আটল', 'দুয়ারি', 'ঝাঁঝরি', 'পোলো' ইত্যাদি তৈরি করে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। 'বাঁশনী' এবং 'তলতা' বাঁশ থেকে এসব তৈরি হয়।

ডোম সম্প্রদায়ের লোকরাও নিম্নবর্ণ হিন্দু। এরা 'মুলি ভেলকো' বা 'গুঁড়ি ভেলকো' থেকে তৈরি করে 'ঝোড়া', 'কুলো', 'চুবড়ি', 'চাঙারী', 'ধুচুনী', 'ছাকনি' জালের 'কেঁড়ে' ইত্যাদি।

কলতা থানার উত্তর পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সতোল, কলসা, হরিশপুর, গ্রামনেথা, কলাগাছিয়া, হিন্তেবেড়িয়া, শ্বেত-কালনা, ঢোল টুকারী কয়েকটি গ্রামে প্রায় দু' হাজার ঘর তিয়োরের বাস। এদের উপাধি মাল, সরদার, দাস, মণ্ডল, মালিক প্রামানিক ইত্যাদি। পাশের গ্রামগুলিতে বাস করে ডোমেরা। পশ্চিম পাশের গ্রাম রুকে, গোপালপুর, সরার হাট, সোনাড়িয়া, মোহনপুর ইত্যাদি গ্রামে সতেরো শো ঘর মুসলমান জোলার বাস। তারা নিজেরা চরকায় সুতো পাক দিয়ে হাতের তাঁত চালিয়ে গামছা, মশারী, ধুতি, শাড়ি বোনে।

পুরুষেরা কাঁধে বাঁক নিয়ে ভারি মালের পেটি করে নিয়ে আসে

যেখানে তিয়োর সম্প্রদায়ের বাস সেসব জায়গা এখন বর্ষার জলে ডোবা। পথঘাট বিরল। দু-চারটি কাঁচা মাটির কর্দমবহুল আল পথ। পাড়া থেকে পাড়ায় যোগ। তার বর্ষা হলে সেসব পথঘাটও ডুবে যায়। শালতি বা তাল গাছের ডিঙি তখন ভরসা।

চার দিকে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ জুড়ে ধান খেতের ঝিলি-কাটা দিগন্ত। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট গ্রাম—তাল-নারকেল-আম-কলা-খেজুর-বাবলার ঝোপ। তিয়োর লোকদের জীবিকা হল বর্ষায় মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি করা। বাকি সময় বেড়জাল, মহাজাল, খেপলা জাল, ফাঁদি জাল, ছাকনি জাল, পোলো দিয়ে মাছ ধরার কাজ। যারা একটু অবস্থাপন্ন, জমি জিরেত আছে, তাদের আছে বাঁশের ঝাড়। গরিব গেরস্থদের পাঁচ সাত মাইল দূর থেকে বাঁশ কিনে কাঁধে করে বয়ে আনতে হেড্ডো লেগে যায়। কাঁধ ফুলে ওঠে। এ ছাড়া সোনপুর বা মোহনপুরের রবিবারের হাট থেকে বাঁশ কিনতে হয়। চারদিক থেকে প্রচুর বাঁশ আসে পাজাঁত করে অথবা 'জেদ' বেঁধে জলের ওপর দিয়ে টেনে টেনে। মেলা দর। যাদের বড় ব্যবসা, বেশি টাকা তারাই সেসব বাঁশ কিনতে পারে।

পাড়ায় ঢুকলে দেখতে পাবেন ঝোবড়া ঝোবড়া কুঁড়েঘর। খড় বা উলুর ছাউনী। খোলা বা টিনের ঘর যাদের তাদের অবস্থা মাঝারি। পাকা বাড়ি এক-আধ জনের। সতোল গ্রামে আছে একটি হাইস্কুল। শ্বেত-কালনা, ঢোল টুকারী আর সতোল গ্রামে বাস করেন দু-এক ঘর ব্রাহ্মণ। তাঁরাই পুজো-আচ্চা করেন এদের।

ঘুনি, আটল, ঝাঁঝরি, ঘুগরির মাল তৈরি

হলে মেয়েপুরুষে মিলে কাছাকাছি দু' মাইল থেকে পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে মোহনপুরে, সরার হাট, গোপালপুর, হরিণডাঙা, বাথবার হাটে বিক্রি করতে আসে। পুরুষেরা কাঁধে বাঁক নিয়ে গোয়ালাদের মতো জাঁর মালের পেটি বয়ে নিয়ে আসে। বাঁকটা থাপড়ে থাকে চলার তালে তালে। মেয়েরা পাঁচ পো গজ কাপড় বান্ডিল করার মতো 'চিড়িবাঁড়' বা 'প্যাটা'-র বোঝা মাথায় নিয়ে কাদা-দোড় ঠেলে কনুই দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটতে থাকে হুহু করে। শনিবারের হাট ধরবার জন্যে তারা বৃহস্পতি, শুক্রবার ভোর বেলায় দঙ্গল ভরে পথ জুড়ে ছুটতে থাকে। কখনো কখনো হাল্লাক হয়ে গেলে বটতলায় বোঝা নামিয়ে খালের জলে নেমে কোমর পর্যন্ত 'ফোচকে' বা 'ফিচকিরি' মেরে ওঠা কাদা ধুয়ে নিয়ে সকলে জটলা করে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানে। রায়পুরে গিয়ে তবে নৌকো ধরাব। তারপর যাবে দশ মাইল দূরে উলুবেড়ে। সেখানের হাটে বসে মাল বুনবে চাহিদা মতো। একটা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া পাঁচ সাত টাকা দামের ঝাঁঝারি বা আটল হলে তৈরি হল যদি সবাই খান কুড়ি করে রাখে তবে হাটে জায়গা পাবে কোথা? পাঁচ সাত শো তিয়োর আসে যে প্রতি হাটে! চোদ্দ নম্বর হক্টের পাইকেরদেরও কেউ কেউ মাল পাইকিরি দেয় যাদের হাটবাজারে যাবার লোক নেই।

সতোল থেকে পাঁচ মাইল দূরে সরার হাট —এ হাট বসে বৃহস্পতিবার আর রবিবার। দু' মাইল দূরে শুক্কুর সোমের হাট গোপালপুরে। আর নিত্য হাট অর্থাৎ বাজার বসে পাঁচ মাইল দূরের হরিণ ডাঙায়। মোহনপুরের হাট বুধ রবিবারে। বাথবার হাট বৃহস্পতিবারে। আর আমতলার হাট মঙ্গল শনিবারে। কোথায় মাল বেচতে যাবে যাও—প্রতিদিন হাট আছে। সমাজকর্তাদের দ্বারা এসব হিসেব করে দিন ঠিক করা আছে সেই মহাভারতের যুগ থেকে। হরিণ ডাঙায় যাবে? চালের দাম সস্তা। সাড়ে তিন টাকা 'দোন' বা 'পালি।' পালি মানে আড়াই সের। মাল বেচে চাল ডাল নুন তেল আনাজ কিনে আনতে হবে সারা সপ্তাহের মতো হাট থেকে। কিছু ফুরোলে আর পাবে না। গ্রামের খুদে খুদে দু-একটা মুদি দোকানে যাও—সাতকে সতেরো দাম।

পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর হাঁস আর মুরগি চরে বেড়াচ্ছে তিয়োরদের। মৎস্য ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় হল তিয়োর আর মুসলমান হলে তাদের বলা হয় 'নিকিরি।' [ফলতা থানায় 'পাইকান' গ্রামের ঘন ঘন, গায়ে গায়ে লাগোয়া বস্তি হল কয়েক হাজার গোয়ালাদের—তারা গরু মোষ পেলে দুধের কারবার করে শহরের ছানা যোগান দেয় প্রতিদিন শত মণ করে। কাছেই কয়েক মাইল দূরে বজবজ

নিজেই বাঁখারি কাড়ছে মাহিন্দ বুড়ো

থানার রায়পুর গ্রামে সব চাইতে পাঙলো (এক শ' থানায় এক কোঁজ) পাঁপর তৈরির আড়ত বড়বাজারের আগরওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালাদের—চোদ্দটা কারখানা—মাসে কয়েক লক্ষ টাকার মাল উঠে সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়। পাঁপরের বেসম আসে কলকাতা থেকে মাসকলাই মুগ কলাই ভাঙিয়ে, যে কলাই আসে সুদূর রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে। তার পাশে বিরলপুরের চটকল—কোটি কোটি টাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কিছু দূরে বজবজের কেরোসিন তেলের ডিপো। বাটা নগরের জুতোর কারখানা। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে খোঁজ নিলে জানবেন, সব চাইতে ভাল কলসী তৈরি হয় বজবজ থানার ডোঙাড়িয়া গ্রামের কুমোর পাড়ায়—আর নার্সারীগুলোয় কলম বা টবের গাছপালা যোগান দেয় এই থানার মুচিসাহা গ্রামের লোক।]

তিয়োর, ডোম, মুচি, মালি, জোলা গোয়ালা—সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজ পঙ্গপালের মতো পেটের জ্বালায় ছুটেছে জাত-ব্যবসা ছেড়ে কলে-কারখানায়। কুষ্ঠ রোগের মতো তাদের দেহে কাবুলী বা মহাজনের দেনায় কল্পনা—মুখে লাল কাণ্ডার জয়ধ্বনি। বর্ষায় নদী থেকে খালের জলে যেমন কোটি কোটি ব্যাঙাচি (কোকড়ার বাচ্চা) এসে ছেয়ে যায় চারদিক—তেমনি সর্বত্র, সমাজের অলিতে গলিতে রাজনীতি ছেয়ে গেছে আজ। যেখানে অভাব, দারিদ্র্য চোকড সেখানেই রাজনীতি।

বুড়ো মাহিন্দ মাল কাটারী চালিয়ে বাঁখারি কাড়তে কাড়তে গালাগালি করে: "শালা একটা জন পাওয়া যায় না যে বাঁশ ফাঁড়ব। মেয়েটাকে বলি আমি চেরা বাঁশ তুলে ধরছি তুই বেটি কাটারী মার। তা সে কাটারী চালাতে যেয়ে শালীর বেটি দিলে ফাড়া বাঁশের ভিতরে হাত চালিয়ে। কেটে ফাঁক হয়ে গেল দুটো হাত। খাসী কাটার মতন রক্ত দেখে আমার 'ভিমরি' লেগে গেল!... পাড়ার চা দোকানে, কে রাজা হবে কে উজির হবে তাই নিয়ে 'গাড্ডাই' মারছে ছোঁড়ারা 'রেডিও কল' বগলে নিয়ে—কাজে ডাকো, বলবে সাত টাকা রোজ দেবে? আড়াই টাকা রোজ, সাত টাকা চাইবে। কটা ঝাঁঝরি আটলের মাল বুনবি? আর কাজও জানে না কিছু। ফলতু সব। জাতটকে বেকার করে দিলে! ভাল যারা কাজ শিখতে চায় ওদের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে!"

মাহিন্দ বুড়োর বয়েস নাকি চার কুড়ি পাঁচ। তবু এখনো 'কামর ভাঙে নাই, দাঁত পড়ে নাই, মড়মড় করে খেসারি কলাই ভাজা চিবোয়। চোদ্দটা ছেলে আর সাতটা মেয়ে তার। ছেলেরা, ছোট দুটো বাদে সবাই

আলাদা। মেয়েদের ছ' জনের বিয়ে হয়ে গেছে। তার সংসারে এখন বউ 'হিঙ্গুলতা, মেয়ে কালিন্দী আর ছোট ছেলে দুটো আছে। তারা উলুবেড়ের মাজ নিয়ে গেছে। বয়েস তাদের কুড়ি একুশ। 'প্রতি বছরে একটা করে ছেলে বিইয়েছে হিঙ্গুলতা। একুশ ছেলের মা সে। মুরগি যেমন রোজ একটা করে ডিম পাড়ে অমনি। সে তবু তেরো চোদ্দটা ডিম পেড়ে ক্ষান্ত হয়—এ একেবারে পাঁচ গণ্ডা একটা।' আজো তাগড়াই চেহারা হিঙ্গুলতার। ছেলে বা বউদের সাথে বচসা লাগলে মালকোঁচা মেরে ছুটে যেয়ে লড়াই লেগে যায়। তুলে আছাড় দেয় জোয়ান মদ্দ ছেলেদের। সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে হেঁসো চালিয়ে বাখারি থেকে সরু সরু কাঠি তৈরি করে নিয়ে 'জাল চোঁচ' দিয়ে 'পাটা' বুনছে। পাশাপাশি ছোট ছোট খোপ ঘরের ভিতে দাওয়ায় পিঁড়ে বা চট পেতে বসে বারোটা ছেলের বউ আর তাদের ছেলেমেয়েরা 'পাটা', 'চাঁড়বাড়', 'চাল' বুনছে। বাঁখারি ফাড়ছে, কাঠি চাঁচছে তাল ডাটার 'বাগড়া' পিষে থেঁতো করে বোঁচ তৈরি করছে। চকবন্দী বাড়ি। মাঝখানে উঠোন। প্যাচপেচে কাদায় হাঁস মুরগি চরে

বেড়াচ্ছে। হাঁস-গুলো কাদার মুখ ঢুকিয়ে চরচর করে শব্দ তুলছে।

মাহিন্দ মোটা খাটো চেহারার লোক। দুটো কাঁধে কড়া পড়া কালো দাগ। পঁয়ষট্টি-জন লোক তার ছেলেমেয়ে নাতি নাতকুড় নিয়ে। সে এক বিরাট গৃহীদের দল।

মাহিন্দ বলে যায় : 'আমার ঠাকুরদা ছিল সখের 'লোক'। বেতের বাঁধন দিয়ে ফুল বাঁখারি চেঁছে উপুড় দিয়ে ছাউনী করে একটা 'উলুটি' তুরা ভাল আটচালা বেঁধেছিল গাঁয়েগাঁয়ে খোঁড়। জমিদারের নায়েব আর বড় দারোগা এসে সেই আটচালায় বসে নাকি বলেছিল—বাঃ! এ যে সাহেব-পছন্দ বাংলো।' তা সেই বাংলো বাড়ির ফুল বাঁখারি তৈরি করতে এসেছিল নাকি সুন্দরবন অঞ্চলের একটা লোক। ও অঞ্চলের লোক একটু দুর্দান্ত ধরনের হয়। ইংরেজ আমলের প্রথমে যারা খুনী আসামী ছিল তাদের ছাড়ান দেবার লোভ দেখিয়ে সোঁদরবন আবাদের জন্যে পাঠিয়েছিল। তাদের রক্তের রক্ত ওর। লোকটা সবাইকে 'তুই' বলত। জাতে মুসলমান। ভারি কাজের লোক। ফুল বাঁখারি এমন সগোল করে সে চাঁচতে পারত যে দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু সারা বেলায় সে তিনটের বেশি চাঁচতে পারত না। সেই একখানা বাঁখারি নাকি আমার বাপ ভেঙে ফেলে। তা সেই সোঁদরবনের বুড়ো করলে কি জানো? ভাঙা বাঁখারি দিয়ে দিলে ঘা কতক কষিয়ে। ঠাকুরদা লোকটাকে বকা-ঝকি করতে সে চলে গেল। আর এল না। কিন্তু ফুল বাঁখারি চাঁচবে কে? কেউ পারে না তেমন-ধারা করতে। 'একের' 'সোঁগাল'। শেষে লোকটাকে হাতে ধরে 'কসুর' মেনে আনতে হয়। এই যে এক-আধ জন কাজের লোক সংসারে পাওয়া যায় তারা আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

মাহিন্দ কিন্তু ভোট দেয় কমিউনিস্ট দেরই। কারণ তারা নাকি গরিবদেরই বন্ধু। কংগ্রেস বড় লোকদের। যাদের দালানকে ঠা আছে তারা করুক না কংগ্রেসী, তাতে তার আপত্তি নেই।

ছেলেরা সবাই গেছে উলুবেড়ের হাটে মাল নিয়ে। বুড়ো তবু দুটো একটা মাল বেচবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে। নোনাখালীর ঋষি ঠাকুর বলে রেখেছে থান দুই 'মন্তর' করে দেবার জন্যে।

বুড়ো গামছা পরে পাটা, চাল, চিঁড়েবাড়, চোঁচ আর ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ডিঙি বেয়ে বেয়ে লগি ঠেলে ধান বন চিরে এসে ওঠে মোহনপুরে। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে নোনাখালী। ভোলাসাহার কপ্তোল আর মুদিখানার সামনে—যেখানে পাল্কীবওয়া বেহারারা থাকে—সেখানে বাবা পঞ্চা-নন্দের চাতালে বসে গাঁজা টানছিল ঋষি অধিকারী। মাহিন্দ এসে বাবাজীর পায়ের 'কাদা' নিয়ে শিরে ঠেকিয়ে (বর্ষাকালে বাবাজীর পায়ে ধুলো ছিল না)। গাঁজা কলকেটা নিয়ে বার কতেক দম মেরে বল্ বল্ করে কড়া কটুগন্ধ নীলচে ধোঁয়া বার করে নাক মুখ দিয়ে।

ঋষি ঠাকুর বলে, 'তোমার আসতে দেরি হল হে মালের পো! দাও দুটো বড় আটল তৈরি করে। পোলের মুখেতে বসাব।'

'জোড়া জোড়া দর—পাঁউটলে ঘুনি এক টাকা, ঝাঁঝরি পাঁচ টাকা, ঘুনি সাড়ে তিন টাকা, আটল ছোট দেড় টাকা, বড় আড়াই টাকা আর বড় মুগরির দশ টাকা। পাঁচ টাকা করে দশ টাকা দিতে হবে বাবাজী আজই নগদ।'

'হাঁ হাঁ—তুই কর না। এই নে, টাকা নে। এক্ষুনি সাপে কাটা রোগী দেখে উপায় করে আনুন। শালা, ঝাঁঝরিতে বড় 'ভেকটি' (ভেকুট) মাছ পড়েছে মনে করে পদ্মানন্দের ছেলেটা ভেতরে হাত ঢোকাতেই দিয়েছে ছোবল—গেঁড়ি-ভাঙা কেউটে ঢুকেছিল মাছ খাবার জন্যে ঝাঁঝরির মধ্যে। ভাল করে দিয়ে এলাম। 'মনিরাজ' গাছের শিকড় মুখে দিয়ে ফুটিয়ে খাইয়ে দিতেই বিষ নেমে গেল। আর গচাল মন্তর ক্যাপেন্স করে হাসিয়ে হাসিয়ে হুঁড়িগুলোকে একেবারে শুইয়ে ছেড়ে দিয়ে এনু হে মালের পো! আমার নাম হল ঋষি ঠাকুর! হে হে...!'

মাহিন্দ বুড়ো বলে, 'বাবাজী, 'গেঁড়িভাঙা কেউটে' আমাদের ওদিকে বড় বেশি। যেখানে মাছ ও শলা সেখানে আছেই। তবে বেশি আহার করেছিল বলে বোধ হয় বিষ তেমন জোর ধরেনি।'

হাহা করে হাসে ঋষি ঠাকুর। মুখে তার দাড়ি গোঁফ। মাথায় সব চুল। এলো গায়ে মোটা পৈতে। পরনে গেরুয়া কাপড়।

মাহিন্দ মন্তরা দুখানা জুড়ে তৈরি করে দেয় 'এড়ো' চাপনা, তাল, পাটা জুড়ে, তাল চোঁচ দিয়ে বেঁধে। সন্ধ্যায় পাকা বসে থাকে। ছেলেরা তার ফিরবে হাট থেকে এই পথেই। তাদের সঙ্গে যাবে। ততক্ষণ বাবা পঞ্চানন্দের কেদীর চাতালে বসে করতাল বাজিয়ে ঋষি ঠাকুরের সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে হরিনাম করতে বসে।

বড় ছেলে লক্ষণ ফিরল, মাহিন্দ উঠে পড়ে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে। হ্যারিকেন জ্বালে লক্ষণ। অন্য ভাইরা তার আসে। ছোট ছেলে মন্টু আর মন্টু হিসেব দেয়। দেড়শো টাকার মাল বিক্রি হয়েছে। লক্ষণের আলোতে সবাই গেলেও বুড়ো মাহিন্দ তার সঙ্গে কথা বলে না। তার সঙ্গে বুড়োর 'ফৌজদারী' মামলা। বুড়োর খোয়াড় থেকে মুরগি চুরি করে নিয়ে নাকি লক্ষণ তার দোর গোড়ায় পুঁতে রেখেছিল। কুকুরটা টেনে বার করে ফেলে। মুরগি নিয়ে ঝগড়ার পর এই কাণ্ড করে লক্ষণ। তারপর বাপবেটার মারামারি। থানা পুলিস। কোর্ট কাছারী।

আগামীকাল মামলার দিন আছে। বাপ-বেটার তারা যাবে এক নৌকোয়। [illegible] টাকার যোগাড় হয়েছে দু-পক্ষেরই।

আবদুল জব্বার

বিদায় রেংগুন।
বিংশ শতাব্দীর মোহ ও মায়া কাটিয়ে আজ রেংগুন থেকে বিদায় নিলাম।

জাহাজ নোংগর তুললো, তার পর ভেসে চললো মাদ্রাজের পানে। আজ আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু তবু আমার মনে একটু আনন্দ নেই, চঞ্চলতা নেই। কোথায় আমার দেশ? ভারতবর্ষ, না এই বর্মা? ভারতবর্ষকে আমি নিজের চোখে দেখিনি তবু স্বপ্নে কল্পনা করেছি। এই বর্মা দেশের জল, বায়ু, মাটীর সংগে আমার জীবন মিশেছিলো। এই দেশেই আমার জন্ম, এই ছিলো আমার জিটেমাটী, কান্না-হাসির অভিনয়ের রংগমঞ্চ। আমি ছিলাম বর্মার ভারতীয়। কোনদিন এই দেশ ত্যাগ করবো কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম এই দেশ থেকে চিরজন্মের জন্যে বিদায় নেবো যেদিন আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হলো কই?

আজ বর্মার নতুন রাজনীতির স্রোত বইছে। তাই বর্মীজরা বলছেন: আমি ভারতীয়, অতএব আজ আমার এই দেশে ঠাঁই নেই। তাই আজ আমি অতীতের স্মৃতিটুকু বহন করে ভারতবর্ষে রওনা হচ্ছি। বলতে পারেন বিদেশ যাত্রা করছি। আবার আমাকে নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে হবে। সমাজে স্থান করে নিতে হবে, মানুষকে চিনতে হবে। আজ আমি ভারতীয় হলেও আপনাদের কাছে অতিথি, পরদেশী।

প্রায় দুই শতাব্দী আগে এই দেশে এসেছিলাম। আমি আসিনি, আমার বাপ-ঠাকুর্দারা এসেছিলেন। বছরের হিসেব রাখিনি। কারণ কোনদিন যে এই দেশ ত্যাগ করবো কল্পনা করিনি।

সেদিন ছিলো ইংরেজের শাসন, গোরা-পল্টনদের রাজত্ব। টমসন-ডিকিনসন-হিগিনসনের সংগে আমার প্রপিতামহরাও বর্মায় এসেছিলেন। ব্যবসা করতে, বড়ো বড়ো সাহেব কোম্পানীর ঠিকাদার হয়ে। আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরাও একে একে এলেন। আরো কতো ভারতীয় এলেন তার হিসেব কেউ রাখেনি। কেউ বা দোকান-পাট খুললেন, কেউ বা সরকারী কেরানী হলেন। দিনের বেলায় ওরা কালি কলম নিয়ে হিসেব করতেন আর সন্ধ্যে হলেই আসর জমিয়ে বকবকম করতেন। ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন উকীলবাবুরা। আমাদেরই দেশের লোক। আইনকানুন ওদের মুখে লেগেই থাকতো। বড়ো হাকিম ছিলেন সাহেব, লাল মুখ। আমাদের অসুখ হলে ডাক্তারবাবুরা ব্যাগ নিয়ে সারাতে আসতেন। ছেলেরা স্কুলে পড়তো। কেম্ব্রিজ অ্যাকাডেমী বা চেটিয়ার স্কুলে। এন্তার স্কুল ছিলো, কলেজ ছিলো বর্মায়। এমনি করে বর্মা শহরে ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠেছিলো।

দিনের বেলায় ডিকিনসন-হিগিনসন সাহেবরা টাঙ্গায় চড়ে হাওয়া খেতে বেরুতেন। রাত্রিবেলায় ঐ পেগু ক্লাবে নাচের আসর শুরু হতো। বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে সাহেবরা গান করতেন 'গড সেভ দি কিং।' আমাদের মজলিশ বসতো দুর্গাবাড়িতে কিংবা কালীবাড়ি বা শিখ মন্দিরে। সাহেবদের ও আমাদের পানে বর্মীজরা সম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। তখন কী ওদের পরোয়া করেছি। বর্মীজরা মনে মনে বলতো আমরা হলাম বর্মী। ওদের দেশকে লুটে-পুটে খাচ্ছি।

ওদের কল্পনা মিথ্যে নয়। এই বর্মা দেশের সম্পদেই আমরা পরিপুষ্ট হয়েছি। বাড়ি করেছি, ঘর বানিয়েছি, ধনদৌলত সবই ওদের টাকায়। তখন এদেশে কিন্তর সুখ ছিলো। মণিমুক্তা কিনবেন মুগল স্ট্রীটে চলে যান। মাছ আর চাল দুটোই জলের দামে বিক্রী হতো। কলকাতার বাসিন্দারা ধনী কাউকে দেখলেই বলতো: ওরা বর্মায় থাকে।

আজ ভাগ্যের উজান বইছে অন্যদিকে। সেই রামও নেই, রাজত্বও নেই। যুদ্ধের শেষে যেই সাহেবরা এদেশ থেকে চলে গেলেন অমনি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হলো। একদিন যে সমাজ, ঐশ্বর্যের বড়াই করেছিলাম, সবই আমাদের চলে গেলো। সেদিন বুঝতে পারলাম যে ভুলের বালুচরে ঘর বেঁধেছিলাম। আজ আমি রিক্ত, অপরিচিত এক ভারতবাসী। আজ একটা যুগ, একটা সমাজ ধ্বসে গেলো।

কিন্তু আজ কেন এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি? কোনদিনই তো ভাবিনি শূন্য হাতে দেশে ফিরতে হবে? এই দেশের নাগরিক হবার চেষ্টা করেছিলাম। নিজের মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মুখে বর্মীজ ভাষার খই ফুটতো। ধুতি চাদর ছেড়ে লুংগি পরতে শুরু করেছিলাম। আমার স্ত্রী বোনেরাও লুংগি পরতেন। কিন্তু পোশাক আর নাম পাল্টেই বর্মা দেশের নাগরিক হবার অধিকার পেলাম না।

ডিকিনসন-হিগিনসন সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় ওদের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়েছিল। ওরা মনে প্রাণে ছিলেন ইংরেজ। কোনদিনই এই

দেশে বাসা বাঁধবার সংকল্প করেননি। এই দেশে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। যেদিন ও'দের টাকা রোজগারের কথা শেষ হলো সেদিন ও'রা দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমরা বর্মীদের মতো নিজেদের সম্পত্তি আগলে রইলাম।

যুদ্ধ শুরু হলো কিন্তু আমরা বর্মাতেই রয়ে গেলাম। এতো বিপদের মধ্যেও একদিনের জন্যেও বর্মা ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি। যুদ্ধের শেষে ভাইবোনেরা, যাঁরা দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, আবার বর্মাতে ফিরে এলেন। আবার আমরা অতীত জীবনকে ফিরে পেলাম, আমাদের ভাঙ্গা ভারতীয় সমাজ আবার নতুন করে গড়ে উঠলো। আমাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হলো, দোকানপাট বাড়লো। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম যে যুদ্ধোত্তর বর্মাতে আমরা হয়েছি অপরিচিত, অবাঞ্ছনীয়।

এবার বর্মীরা দেশের শাসনতন্ত্রের ভার নিজেদের হাতে নিলো। দেশের সমাজে ও শাসনতন্ত্রে অনেক পরিবর্তন এলো। দেশে নতুন আইন-কানুন গঠন করা হলো। এবার আমরা আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রায় বাধা পেলাম। ব্যবসায় মন্দা পড়লো। আমরা

বর্মীজ নাগরিক নই তাই চাকুরীতে ইস্তফা দিতে হলো। এবার বুঝেছে পারলাম যে বর্মা থেকে আমাদের যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তারপর দেশে সামরিক শাসনতন্ত্র কায়েমী হলো। এবার আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলা হলো : 'কুইট বর্মা'।

তাই আজ আমরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছি। একবার ভাবি গেলাম, ভালোই হলো। সেই অতীতের রেঙ্গুন তো আর নেই। রাস্তাঘাটের নাম পাল্টে গেছে। চালের দাম মাছের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। আর জীবিকা গুজরান করবার জন্যে অন্যান্য জিনিস তো চোখেই দেখতে পাই না। দোকান থেকে জিনিস কিনতে হবে মহল্লা কমিটির কাছে যান। তিনদিন ধর্না দিলে একখানা কাপড় পাবেন। রুটির দোকানের সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়ান। তবে রুটি পাবেন।

ছেলেমেয়েদের কোথায় পড়াবো বলুন?

একদিন এখানে বেঙ্গল অ্যাকাডেমী ছিলো। বর্মা সরকার স্কুলটাকে নিজের হাতে নিলো। ঐ স্কুলে আজকাল আর ইংরেজী পড়ান হয় না। বাংলা হিন্দী তো দূরের কথা। ডাক্তার উকীল বাবুদের পসার কমে গেছে। সবাই এখন দেশে ফিরবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছেন।

আর যাবার কথা ভাবলেই জাহাজে বা প্লেনে চড়া যায় না।

ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন? প্রথমে ভারতীয় দূতাবাসে আর্জি পেশ করুন। বর্মা ভারতীয় কংগ্রেস ও দূতাবাসের কর্তারা আপনাদের আর্জি নিয়ে বিচার করতে বসলো। আপনি ভারতীয় নাগরিক। আপনাদের দেশে ফিরবার অধিকার আছে। কিন্তু আপত্তি, যদি ভারতীয় অথচ বর্মা দেশের নাগরিক হন তাহলে দেশে ফিরতে আপনাকে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হবে।

এবার আপনার আর্জি বর্মা সরকারের কাছে গেলো। ওরা আপনার কাছে ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব চাইলো। পাওনা টাকা আপনি মিটিয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু যেই আপনি দেশে ফিরবার কথা বলেছেন অমনি আপনার কাছে আবার বর্মা সরকার আর এক দফা ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব পাঠালো। পাওনা টাকা শোধ করলেন তো যাবার অনুমতি মিললো।

কিন্তু যাবার আগে আপনার বাড়ি সরকারকে দিয়ে যেতে হবে। হোক না আপনার নিজস্ব বাড়ি। জীবনে তো কোনদিন দান খয়রাত করেননি। আজ বর্মা থেকে যাবার আগে বাড়ি আর বাকী সম্পত্তি দান করে না হয় খানিকটা পুণ্যি করলেন।

এই সব হাঙ্গামা আমাকেও পোয়াতে হয়েছিলো। যাবার অনুমতিপত্র নিয়ে সকাল থেকে জাহাজ ঘাটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মস্তো বড়ো লাইন, প্রায় হাজার দেড়েক যাত্রী হবে। প্রথমে পুলিসের খাতায় গিয়ে নাম লিখতে হলো। পুলিস আমার যাবার অনুমতিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ করে পরীক্ষা করলো।

এবার গেলাম কাস্টমসের দরবারে—কী নিচ্ছো সঙ্গে?

গয়না। অসম্ভব। দেড় ভরির সোনার বেণী নিতে পারব না। ওটা কী? ওয়াল ক্লক। কাস্টমসের কর্মকর্তারা আমার ঘড়িটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। বললেন ওই ঘড়িটা নিয়ে যাবার আমার কোন অধিকার নেই। ...না...না, আমার প্রতিটি জিনিস দেখেই ওরা একই সুরে বলতে লাগলেন...না...না। কাস্টমসের বেড়াজাল কাটিয়ে আমি যখন জাহাজে উঠলাম তখন আমি রিক্ত, দীন। শুধু অতীত বর্মা দেশের স্মৃতিটুকু সম্বল নিয়ে আজ দেশের পানে রওনা দিলাম।

আজ আমাকে বিদায় দিতে কলকাতার জেটীতে কেউ এলো না। বহু বছর আগে আমার বাপ ঠাকুর্দা যখন রেঙ্গুনে এসেছিলেন তখন এই কলকাতা জেটীতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনে গমগম করতো। আজ এই পাড়াটা একেবারেই নিঃঝুম হয়ে গেছে। জাহাজে উঠবার আগে পরিচিত কারুর মুখ দেখতে পেলাম না।

প্রতি বছরই ছটা করে জাহাজ রেঙ্গুনে আসে যাত্রীদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নেবার জন্যে। এই জাহাজ করে আমরা মাদ্রাজে যাই। বর্মা সরকারের কড়া হুকুম যে আমাদের সবাইকে দেশে ফিরতে হবে। আজ না হয় কাল কিংবা পরশু।

জাহাজে উঠে শেষবারের মতো রেঙ্গুনের পানে তাকালাম। জীবনে হয়তো আর কোনদিনই রেঙ্গুনের মুখ দেখতে পাবো না, শুধু আমার জীবনের হিসেব নিকেশের খাতায় লেখা থাকবে—আমি এই দেশে এসেছিলাম, এই দেশের প্রেমে পড়েছিলাম কিন্তু এই দেশবাসীদের হৃদয় জয় করতে পারিনি। এই হলো আমার জীবনের খেদ।

আজ যাবার আগে ভাবলাম : এই দেশের পরিস্থিতির কী কোন পরিবর্তন হবে না? একদিন মনে মনে আশা ছিলো যে হয়তো আবার হারানো দিনগুলোকে ফিরে পাবো। কিন্তু আজ মনে হলো আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছি।

জাহাজ জলের বুক কেটে চলেছে। দূরে থেকে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে—ঝক্-ঝক্-ঝক্। ডেকে চারদিকে ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে। সবাই হিসেব নিকেশ করতে বসেছে, কে এসেছে, কে আসতে পারেনি।

আমি নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলাম এই দেশে কী পেয়েছিলাম কী পাইনি।

ধীরে ধীরে রেঙ্গুন শহর আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে এলো। অতো বড়ো শহর আজ একটি ছোট বিন্দু মতো হয়ে গেলো। একদিন এই শহর আলোয় ঝলমল করতো আজ সেই আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। কোথায় গেলো আমার প্রিয় শোয়ে ড্যাগোন পাগোডা, মুগল স্ট্রীট, কালী বাড়ী, কালো বস্তী। সবই আজ আমার কাছে অতীতের স্মৃতি হয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকার নেমে এলো রেঙ্গুনের বুকে।

এক যুগ পার হয়ে আমি আর এক যুগে এলাম। তাই নিজের মনে মনে বললাম : বিদায় রেঙ্গুন।

বিক্রমাদিত্য

॥ ৬ ॥

দিবানিদ্রা সেরে দুই সখী গল্প করছিল বারান্দায় বসে। হাতে চায়ের কাপ। আজ চা বানিয়েছে মাধুরী। শুভ্রা বললো, তুই কোন্ দোকান থেকে চা কিনিস রে? লাকি স্টোর্স? আমার চায়ে তো এমন ফ্রেভার হয় না!

মাধুরী বললো, প্রত্যেক মাসের চা ও নিজে বড়বাজার থেকে নিয়ে আসে। চা-টা একটু ভালো না হলে ওর আবার পছন্দ হয় না।

—দাম নিশ্চয়ই অনেক বেশী?

—বারো টাকা কিলো

—উরিব্ বাবা! নীলাঞ্জনদার শখ আছে কিন্তু।

—এই শুধু চায়ের বেলাতেই! এদিকে দেখিস না, দু'দিন তিনদিন বাজারেই যায় না—মাছ-মাংস না হলেও কোনো আপত্তি নেই খাওয়ার সময়। আমার আবার একটু মাছ না হলে একদম ভালো লাগে না!

—নীলাঞ্জনদা ব্যস্ত থাকে। তা ও যখন বাজারে যায়, তুই ওকে বলে দিলেই পারিস?

—বলবো বলবো ভাবি, কিন্তু রতনদা এত সকাল সকাল বাজার যায়—খেয়ালই থাকে না!

—ঠিক আছে, বলে দেবো, কাল থেকে তোকে একবার জিজ্ঞেস করে যেতে

কোনো চুক্তি নেই, তবু বিকেল বেলার চা-টা দুজনে পালা করে বানায়। আজ মাধুরী চা তৈরী করেছে, কাল বিকেলে শুভ্রা বলবেই, আমাকে তো দুধ গরম করার জন্য স্টোভ ধরাতেই হবে, আজ চা-টা আমি বানাচ্ছি। মাধুরীর দামী চা, শুভ্রা চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুট আনে। বিকেলবেলা চা নিয়ে বারান্দায় বসা, দুজনের অভ্যেস।

পাশাপাশি দুখানা ঘরে দুজনের সংসার, এক বাথরুম, আর এই বারান্দাটাও দুজনের। কিন্তু রান্না হয় আলাদা। নীলাঞ্জন বাড়ি থেকে ঝগড়া করে চলে আসার পর, রতনই বলেছিল, তুই এসে আমার সঙ্গে থাকতে পারিস। আমার তো দুটো ঘর লাগে না, তা ছাড়া ভাড়াটাও আমার পক্ষে বেশী হয়ে যাচ্ছে। দুজনে হাফ হাফ দিলে ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে! নীলাঞ্জন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গিয়েছিল।

নীলাঞ্জন আর রতন অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যক্রমে দুজনের বউও আগে থেকেই পরস্পরের সখী। মাধুরী আর শুভ্রা পড়তো আশুতোষে, এক ইয়ারে। মাধুরীর বিয়েটা প্রেমের, শুভ্রার বিয়ে হয়েছে সম্বন্ধ করে।

রতন নীলাঞ্জনের চেয়ে অনেক বেশী প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। এরই মধ্যে সে সোনারপুরে চার কাঠা জমি কিনে ফেলেছে। কবে সেখানে বাড়ি বানাবে তার ঠিক নেই অবশ্য, কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার লাইনে লোকাল ট্রেন আরও বাড়ানো উচিত, এ বিষয়ে সে খবরের কাগজে প্রায়ই চিঠি লেখে। রতন নীলাঞ্জনকে বলেছিল, দ্যাখ, মেয়েতে মেয়েতে যতই বন্ধুত্ব থাকুক, পাশা-পাশি সংসার করতে গেলে একদিন না একদিন ঝগড়া লাগবেই! নীলাঞ্জন বলে-ছিল, যাঃ, কি বলছিস, শুভ্রা আর মাধুরী দুজনে দুজনকে এত ভালোবাসে—।

রতন চোখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলেছিল, যা বলছি শুনে রাখ না! তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী চিনি মেয়েছেলেদের—

নীলাঞ্জন তখন সবেমাত্র বিয়ে করেছে, নিজের স্ত্রীকে মেয়েছেলে হিসেবে উল্লেখ করার ব্যাপারটা তার গায়ে লাগে। সে ক্ষুণ্ণ-ভাবে তাকায়। রতন বলেছিল, ঝগড়া একদিন লাগবেই—সে এত সূক্ষ্ম কারণে যে তোর আমার বোঝার সাধ্য নেই! কিন্তু তখন যেন তোতে আমাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়! তখন কিন্তু দুজনে দুটো আলাদা বাড়ি দেখে উঠে গেলেই হবে। যতদিন এক সঙ্গে চলে, বুঝলি না! রান্নাবান্নার ব্যাপারটা এক সঙ্গে করলে কস্ট আরও একটু কম পড়তো, কিন্তু ঐ আর একটা রিস্কি জিনিস! রান্নার ব্যাপার নিয়েই মেয়েছেলেদের…।

নিজের স্ত্রীকে মেয়েছেলে হিসেবে উল্লেখ করলেও, ভালবাসে খুব রতন। মাঝরাত্রে শুভ্রার একটু পেট ব্যথা হলেও রতন ডাক্তার ডাকতে ছোটে!

এই দেড় বছরের মধ্যে ঝগড়া কিন্তু হয়নি একবারও, চারজনের বন্ধুত্বে একটুও ফাটল দেখা দেয়নি। রতন আর নীলাঞ্জন যখন বাড়িতে থাকে না তখন দুই সখীতে টুকিটাকি সংসারের কাজ সারতে সারতে গল্প করে। নীলাঞ্জনের চেয়ে রতনের রোজগার কিছু বেশী, কিন্তু শুভ্রার ব্যবহারে তা কোনোদিন প্রকাশ পায় না।

বারান্দা থেকে ময়দানের সুন্দর ফাঁক [illegible] ও ঐরালপার্ক পর্যন্ত দেখা যায়। দিকে কয়েক রোদ হাওয়া আসে। টাউন টিনফকটাক ওখনের দিকে যখন বিশাল কালো মেঘ জমাট বাঁধে তখন কখনও বা ভ্রম হয়, ওদিকে বুঝি রয়েছে একটা পাহাড়। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাও তো প্রায়ই দেখা যায় না, তবু সেটা আছে; কলকাতার এই অলীক পাহাড়ও কখনো দেখা যায়, কখনো দেখা যায় না। সন্ধে হতেই ব্রিজের আলোগুলো জ্বলে ওঠে মালার মতন।

রাস্তা থেকে ওদের বারান্দাটা সব দেখা যায় বলে, ওরা রেলিংয়ের অনেকখানি কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মোড়া পেতে বসলে এখন শুধু মুখ দেখা যায়। দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর এখনও ওর গা ধোয়নি চুল বাঁধেনি দুজনের শাড়ি ব্লাউজ আলুথালু হয়ে আছে। মাধুরী এখনও তন্বী, কিন্তু দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুভ্রার চেহারা এখন একটু ভারীর দিকে, পেটের কাছে ব্লাউজের ফোকরমতো সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নিয়মিত খোলা থাকে। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই শুভ্রার বগলের কাছটা ভিজে। গায়ের রংটা বেশ ফর্সা হলেও সুন্দরী বলা যায় না শুভ্রাকে, চাপা নাকটার জন্যই তার মুখখানা পুতুল-পুতুল দেখায়, তবু শুভ্রাকে দেখতে ভালো লাগে, তার মুখখানায় একটা ছেলেমানুষী সরলতা মাখানো। সুন্দরী হচ্ছে মাধুরী, শুধু ও সুন্দরী নয়, দেখলেই বোঝা যায়, এই ধরনের মেয়ে অন্তত চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত সুন্দরী থাকবে। মাধুরীর বয়েস এখন মাত্র তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু মাধুরী তার রূপ সম্পর্কে উদাসীন, মাটিতে পা মেলে এখন বসেছে, শাড়ির থেকে অনেকখানি শায়া বেরিয়ে পড়েছে—চওড়া লেস বসানো শায়া—বিয়ের আগেকার।

মাধুরী বললো, ঐ লাল ছাতা মাথায় মেয়েটাকে দেখেছিস? রোজ এই সময় যায়—বোধ হয় কোনো ইস্কুলে কাজ করে।

শুভ্রা বললো, কে জানে কোনো ইস্কুলে কাজ করে কিনা—তবে দেখবি যখন ঐ পার্কের কোণটায় যাবে, একটা ছেলে এগিয়ে আসবে ওর দিকে। রোজ!

—কই, ছেলেটা কই রে?

—আসবে, দেখবি, ঠিক আসবে!

দুজনেই উদগ্রীবভাবে চোখ দিয়ে অনুসরণ করলো মেয়েটিকে। লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি পার্কের কোণায় গিয়ে থেমে পড়লো ঠিকই, কিন্তু কোনো ছেলে এগিয়ে এলো না। মেয়েটি ব্যস্তভাবে তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিক। ছেলেটা [illegible] এখনও এসে পৌঁছোয়নি। [illegible] প্রৌঢ় মেয়েটার খুব কাছ ঘেঁষে [illegible] দাঁড়াতেই মেয়েটি চঞ্চলভাবে একটু সরে গেল, প্রৌঢ়টি তখন কদর্যভঙ্গিতে [illegible] চুলকোতে লাগলো—। মাধুরী আর শুভ্রা পরস্পর চোখাচোখি করে এমন [illegible] করলো, যেন ওরা রীতিমতন [illegible] পেয়েছে!

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে [illegible] বললো, তুই এ সপ্তাহের [illegible] আনিয়েছিস?

—হ্যাঁ ভাই, কি [illegible] কাঁকর

—চাল ছেড়ে দিলেই [illegible] তো প্রায় ঐ দামেই এখন চাল [illegible] আমি তো শুধু তিনটে [illegible]

—ভালো [illegible] রতনদাকে বলতে হবে [illegible] খানিকটা ভালো চাল [illegible] সামনের সপ্তাহে ওর দুদিন [illegible] থাকবে এখানে—রতনদা বেশ [illegible] জিনিসপত্র কিনতে পারে

—ঐ তো, বাজার করাটা [illegible] এক ঘণ্টার আগে বাজার থেকে ফিরতে চায় না! জিনিস কিনুক না কিনুক [illegible]

—তাও ভালো কিন্তু! [illegible] করে বাজারে গিয়ে সামনে যেটা পায়, সেটাই কিনে ফেলে।

—নীলাঞ্জনদা কাল বাঁধা কপি এনেছিল না? এখন তো বাঁধা কপির কেমন দাম

—ঐ যে বললুম, সামনে দেখেছে [illegible]

—শোন, আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি, বাঁধা কপি যদি অল্প একটুখানি সেদ্ধ করে তারপর শুকিয়ে রেখে দিস, তা হলে অনেক দিন পরে খাওয়া যায়। স্বাদও—

মাধুরী হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলো।

শুভ্রা হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হাসছিস কেন?

—বিয়ের পর সত্যিই মেয়েরা অনেক বদলে যায়। আগে আমাদের কতরকম গল্প

ছিল, এখন শুধু বাঁধাকপি আর চালের কাঁকর—

শুভ্রাও হাসতে লাগলো। বললো, সত্যি ভাই, আগে মা-মাসীদের দেখে হাসতুম, এখন আমরা নিজেরাও ঠিক এক-রকম...কি করে যে আপনা-আপনি মনে আসে ঐ সব কথা—

—তোর মনে আছে, একদিন আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে বুদ্ধদেব বসুর নাটক নিয়ে কি তর্ক করেছিলুম, প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে?

—এখন তো বই পড়ারও সময় পাই না! নীলাঞ্জনদা আজ কখন আসবে রে? চল, আজ একটা সিনেমা দেখে আসি, ওর তো ফিরতে ফিরতে রাত দশটা

—ও সাতটার আগে ফিরবে না! নাইট শো'র কি আর যাওয়া হবে?

—দেখ তো, সেই মেয়েটার কাছে সেই ছেলেটা এসেছে কি না?

লাল ছাতা মাথায় সেই মেয়েটি তখনও পার্কের কোণায় দাঁড়িয়ে। তার প্রেমিক এখনও আসেনি, বোঝা যায়, খুবই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন প্রেমিকের পাল্লায় পড়েছে মেয়েটি। কিন্তু চার পাঁচজন লোক ডেয়ো পিঁপড়ের মতন এখন মেয়েটার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। শুভ্রাই প্রথম দেখতে পেল দীপুকে। বললো, ঐ দ্যাখ, তোর দেওর আসছে!

মাধুরী ঝুঁকে পড়ে বললো, কোথায়? ওমা, ও তো কোথায় বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। এর মধ্যেই ফিরে এলো?

—দীপু কিন্তু দিন দিন বেশ লম্বা হচ্ছে। নীলাঞ্জনদার চেয়েও বেশী লম্বা, না রে?

—হাঁ, ও ওর বাবার চেহারা পেয়েছে। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে দীপুর।

অন্যমনস্কভাবেই মাধুরী শাড়ি টেনে পায়া ঢেকে দিল। আঁচলটা ঠিক করে বসলো। শুভ্রাও বুকের আঁচল পরিপাটি করে নিল, কিন্তু পেটের কাছে ব্লাউজের খোলা বোতামটা লাগাতে ভুলে গেল।

সরাসরি বারান্দায় এসে আর একটা মোড়া টেনে বসেই দীপু বললো, বৌদি, চা করো, লুচি বানাও, দোকান থেকে মিষ্টি আনতে দাও, দারুণ খিদে পেয়েছে!

মধুরভাবে ঠোঁট টিপে হেসে মাধুরী বললো, ইস, ওনার জন্য এখন আমি লুচি বানাতে বসবো! কেন, এত খিদে পেয়েছে কেন?

—আজ দুপুরে খাইনি!

—কেন, দুপুরে খাওনি কেন? কখন ফিরলে?

—ফিরেছি সকালে। মেজদির সঙ্গে ঝগড়া করে দুপুরে খেলুম না!

—আজ আবার মেজদির সঙ্গে ঝগড়া করেছো? কি নিয়ে ঝগড়া হলো!

দীপু দু'চোখ কুঁচকে বললো, তোমাকে তা বলবো কেন? আমাদের বাড়ির গোপন ব্যাপার তোমাকে জানাবো কেন? তুমি তো আমাদের বাড়ির কেউ নও!

—আহা-হা, শুধু খাওয়ার বেলায় বুঝি আমার সঙ্গে সম্পর্ক? তুমি মনের আনন্দে মেজদির সঙ্গে ঝগড়া করবে, আর আমি তোমায় খাওয়াবো! মেজদি ভাববেন, আমরাই তোমাকে আস্কারা দিচ্ছি।

—যাঃ, আমি কি তোমার কাছে সে জন্য খেতে চাইছি। আমি খেতে চাইছি, তোমাকে একটা সুখবর দেবো তার বদলে

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলো, কি সুখবর?

মাধুরী বললো, ওর কথা একদম বিশ্বাস করিস না রে! ও রোজই ঐ রকম একটা না একটা কিছু বলে—

দীপু বললো, এই শুভ্রাদি, তোমার মা যে নারকোল নাড়ু পাঠিয়েছিলেন, তা সব ফুরিয়ে গেছে! দুটো দাও না!

—ওমা, সে তো ফুরিয়ে গেছে সে-ই কবে! তুমি তো এসেছিলে সেই দশ বারো দিন আগে

—আমার জন্য দুটো নাড়ু রেখে দিতে পারো নি!

—কেন, তোমার জন্য রেখে দেবো কেন? তুমি কে এমন নাড়ুগোপাল!

দুই সখী হা-হা করে হাসতে লাগলো। দীপু মুখখানা ইচ্ছে করে বোকা বোকা করে রেখে ওদের আরও হাসার সুযোগ দিল।

মাধুরী হাসি থামিয়ে বললো ও বেলার চাট্টি ভাত আছে। গরম করে দেবো, মাছের ঝোল দিয়ে খাবে?

—ধ্যাৎ, এই বিকেলবেলা ভাত কে খাবে? বলছি তো লুচি টুচি বানাও!

—ইস, লুচি বানাতে বয়ে গেছে!

শুভ্রা বললো, এই তো দীপু এসেছে। দীপু, তুমি আমাদের আজ সন্ধেবেলা একটা সিনেমা দেখাও না!

দীপু চোখ গোলগোল করে বললো, আমি সিনেমা দেখাবো? আমার কাছে একটা পয়সা নেই! আমি এসেছি বৌদির কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার চাইতে!

মাধুরী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি! বললো, ধার! ডিকশনারিতে ধার কথাটার মানে দেখে নিতে পারো না? এর আগে আর কতবার নিয়েছো?

—সব শোধ করে দেবো! সব! দ্যাখো কি একটা ভয়ংকর কাণ্ড করছি শিগগিরই

—সে তুমি যা-ই করো, তোমার দাদা তোমাকে টাকা দিতে বারণ করেছে

দীপু একেবারে গর্জন করে উঠলো, মো-টেই না! আমি তা হলে সব্বাইর কাছে বদনাম করে বেড়াবো, বৌদির জন্যই দাদা কিপ্টে হয়ে গেছে! দাদা আর আমি যখন একবারে শুধু ভাই, দাদা প্রায়ই আমাকে একটা দুটো টাকা দিত—এখন আর দিতে পারে—

মাধুরীর মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই! মাধুরী যে কোনো কথার ভেতরেই হাসির খোরাক ধরতে পারে। বললো, সে তুমি যা-ই বলো, তোমার দাদা আমাকে বলেছে, যখন তখন দীপুকে টাকা দিও না! ও কি করে না করে—

—একটা দাড়ি কামাবার ব্লেড পর্যন্ত নেই আমার

—দাঁড়াও, চায়ের জল বসিয়ে আসছি

মাধুরী ভেতরে যেতেই দীপু মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়ালো। আজও টালার ট্যাঙ্কের পেছনে মেঘ-পাহাড় জমেছে, সেই দিকে তাকিয়ে শুভ্রাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রইলো।

শুভ্রা নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলো, তোর ক'টাকা দরকার?

মুখ না ফিরিয়েই দীপু বললো, আমি তোর টাকা নেবো না!

—কেন, আমার টাকা নিতেও দোষ?

—তুই আমাকে কেন জ্বালাতন করছিস বল তো শুভ্রা?

—তুই বড্ড রেগে আছিস দীপু!

—আমি রতনদাকে বলে দেবো বলছি একদিন!

—কি বলবি?

মাধুরী ফিরে আসতেই শুভ্রা কলস্বরে বললো, মাধুরী, আমরা যদি টিকিটের দাম দিই, তা হলে দীপু আমাদের সিনেমায় নিয়ে যেতে পারে না? অনেকদিন বাদে সুচিত্রা সেনের বই এসেছে—

মাধুরী বললো, কি দীপু, যাবে?

শুভ্রা বললো, চলো না ভাই! একদিন না হয় আমাদের জন্য।

দীপু এবার মুখ ফিরিয়ে বললো, না, শুভ্রাদি আজ আমার একদম সিনেমা দেখার মুড নেই। তোমরা নিজেরাই যাও না।

(ক্রমশ)

কুমেরু সন্ধানে

Great God, what a horrible place!

কুমেরুর হিমশীতল পরিবেশে ক্যাপটেন রবার্ট ফ্যালকন স্কটের মৃতদেহের পাশে যে দিনলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তারই এক জায়গায় এই কয়টি মর্মান্তিক শব্দ লিখে রেখে গেছেন স্কট। সেটা জানুয়ারী, ১৯১২র কথা। তারও প্রায় এক মাস আগে, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১১তে নরওয়ের অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমান্ডসেন দক্ষিণ মেরু জয় করেন। তাঁরও দৃষ্টিতে এই অঞ্চলটি একটি ভয়াবহ কঠিন পরিবেশ রূপে ধরা পড়েছিল। মৃত্যু, বিভীষিকা এবং জীবনধারণের এত প্রতিকূল পরিবেশ বুঝি পৃথিবীতে আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার। জুলাই ১, ১৯৫৭ থেকে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৫৮ যে ভূ-পদার্থ বৎসরের সূচনা হয় তাতে সর্বপ্রথম কুমেরু সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানর ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছিল' এই প্রকল্পে প্রথম দিকে দশটি দেশ পারস্পরিক সহযোগিতা রেখে কাজ শুরু করেন। এঁরা হলেন আর্জেণ্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ইউনাইটেড কিংডম, মার্কিন এবং সোভিয়েত দেশ। পরবর্তী এক দশকে জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভেকিয়া, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি আরও বেশ কয়েকটি দেশ সম্মিলিতভাবে কুমেরু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। স্কট এবং আমান্ডসেন-এর দেখা মানবহীন পরিবেশে আজ হাজারো মানুষের ভিড়। এঁদের মধ্যে আছেন প্রাণীবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞ, পদার্থ এবং রসায়নবিদ। এক কথায়

SOUTH ATLANTIC OCEAN
SCOTIA SEA
DRAKE PASSAGE
WEDDELL SEA
INDIAN OCEAN
BELLINGSHAUSEN SEA
AMUNDSEN SEA
ROSS SEA
SOUTH PACIFIC OCEAN
ANTARCTIC CIRCLE
SANAE (So. Africa)
NOVOLAZAREVSKAYA (USSR)
SHUWA (Japan)
MOLODEZHNAYA (USSR)
QUEEN MAUD LAND
HALLEY BAY (U. K.)
GENERAL BELGRANO (Arg.)
PLATEAU (U. S.)
MAWSON (Aust.)
PALMER STATION (U. S.)
ANTARCTIC PENINSULA
SOBRAL (Arg.)
EDITH RONNE ICE SHELF
PENSACOLA MTS.
ELLSWORTH LAND
ELLSWORTH MTS.
TRANSANTARCTIC MOUNTAINS
SOUTH POLE (U. S.)
MIRNYY (USSR)
VOSTOK (USSR)
QUEEN MAUD RANGE
MARIE BYRD LAND
BYRD (U. S.)
WILKES LAND
WILKES (Aust.)
ROSS ICE SHELF
SCOTT (N. Z.)
McMURDO (U. S.)
VICTORIA LAND
DUMONT d'URVILLE (Fr.)

কুমেরু মহাদেশের মানচিত্র। কুমেরু বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মানুষ শুধু একই দিকে চেয়ে থাকতে পারে। সেটা উত্তর দিক। দক্ষিণ তার কাছে লুপ্ত, পূর্ব-পশ্চিম নিশ্চিহ্ন। এখানকার সূর্য একই সমতলে চলাফেরা করে।

আর্জেন্টিনার বিস্তারের অনন্ত আধার কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক কুমেরুর বুকে আজ নানা-রকমের অনুসন্ধানকার্যে ব্যস্ত রয়েছেন। অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্য, আজ মহাকাশ সম্পর্কে মানুষ যত কথা জেনে ফেলেছে, সে তুলনায় চিরতুষারে আবৃত এই শ্বেত-মহাদেশটি সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট কম। কুমেরু-রহস্য হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সন্ধান যোগাবে ঊর্ধ্বাকাশের সঙ্গে আবহাওয়ার প্রকৃত সম্পর্কের কথা, হিমশৈলের সঙ্গে সমুদ্রস্রোতের সম্পর্ক। সেই সঙ্গে শারীরতত্ত্বের উপর হাজারো প্রশ্নের ব্যাখ্যা, জৈব-বিবর্তনবাদের যথাযথ উত্তর অথবা ভূ-প্রকৃতির গঠন সম্পর্কীয় অনেক নতুন তথ্য।

সম্প্রতি আটজন মার্কিন বিজ্ঞানী পোলার স্টেশনে অদ্ভুত প্রাণান্তকর এক গবেষণার কাজে হাত দিয়েছিলেন। বরফের পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই জায়গাটির উচ্চতা তিন হাজার পাঁচ শ' সাতষট্টি মিটার। এটাই নাকি পৃথিবীর শীতলতম মেরু। এখানে দীর্ঘ শীতকাল তাঁরা অতিবাহিত করেন শূন্যেরও নীচে প্রায় উননব্বই সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। মানুষ এর আগে আর কখনও এত নিম্ন তাপমাত্রায় এত বেশী সময় ধরে কখনও বাস করেনি। উঁচু জায়গায় অতিরিক্ত শীত এবং

একটি পুরুষ আডেলাই পেঙ্গুইন তার সঙ্গিনীর ডিমে তা দিচ্ছে

নির্জনতা মানব মনে এবং দেহে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এটা জানাই ছিল এই বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য। সংক্ষিপ্ত সংবাদ : এ ধরনের পরিবেশে তাঁদের মনে হয়েছিল পার্থিব কোন সামগ্রীর প্রতি তাঁদের কোন মোহই যেন নেই। একটা অদ্ভুত আত্ম সংযম এবং মনোবল তখন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। সেই সঙ্গে একটা নির্বিকল্প ভাব।

কুমেরুর ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে আজকের সংবাদ : এখানকার সব কিছুই যেন এক অদ্ভুত চরম অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে। এর সারা অঞ্চল জুড়ে সর্বদা বয়ে চলেছে প্রচণ্ডতম ঝড়ের তাণ্ডব। উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় তিন শ' সাত কিলোমিটার। এখানকার সারা অঞ্চল পুরু বরফের আস্তরণে মোড়া থাকলেও সে বরফ শুষ্কতায় যেন মরুভূমির বালিকেও হার মানিয়ে দেয়। আবহাওয়া এত অনার্দ্র, যার সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র সাহারা বা গোবি মরুভূমির। মানুষের পক্ষে এমন ধরনের জলীয় বাষ্পবিহীন পরিবেশে বাস করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুমেরু পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ। মেরু-অঞ্চলের মাল-ভূমিতে অবস্থিত সোভিয়েত দেশের গবেষণা-কেন্দ্র 'ভোস্তক' থেকে সরকারীভাবে বলা হয়েছে, সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শূন্যের প্রায় ৮৮·৩ ডিগ্রি নীচে। কোন কোন অঞ্চলে বরফস্তূপের গড় উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে দু হাজার মিটারের বেশী। বরফের পাহাড় এলসওয়ার্থের উচ্চতা পাঁচ হাজার এক শ' চল্লিশ ফুট। দেড় কিলো-

মিটারের মত পাহাড়ের সংখ্যা কয়েক শ'। এখানকার শতকরা নিরানব্বই ভাগ ভূ-ভাগই বরফে ঢাকা। আর পৃষ্ঠ-তলের ক্ষেত্রফল এক কোটি কুড়ি লক্ষ বর্গমিটার। আর এই বরফের পরিমাণটি কত? বলা হয়েছে, যদি এখানকার সমস্ত বরফ গলিয়ে শুধু জলে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে সেই জল সারা পৃথিবীর জল ভাগের গভীরতাকে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার বাড়িয়ে দেবে। এতদিন অনেকে ধারণা করে এসেছেন, কুমেরুর বরফের নীচে শুধু বিক্ষিপ্ত কতকগুলি দ্বীপ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, খণ্ড খণ্ড দ্বীপ ছাড়াও সাধারণ মহাদেশের মত এখানেও অবস্থান করছে অখণ্ড বিস্তৃত এক স্থল ভাগ। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর বরফের চাপে এই স্থল ভাগ ক্রমান্বয়ে ধসে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ছ শ' মিটার বসেও গেছে। ধাতু-বিজ্ঞানীদের আজ লক্ষ্য সেই ভূত্বকের নীচে। কারণ, সেখানে সন্ধান পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণ আকরিক পদার্থ। যাদের মধ্যে আছে সোনা, বেরি-লিয়াম, হীরক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, অভ্র, গ্র্যাফাইট এবং নানা রকমের মূল্যবান পাথর।

আর জীববিজ্ঞানীদের কাছে কুমেরু যেন স্বর্গ। এখানকার প্রাণী এবং উদ্ভিদজগৎ আজও আদিমতার প্রথম পর্যায়কে অতিক্রম করে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন এখানে প্রথম বরফ জমতে শুরু করে সেই প্রাচীনতম কালে তারা যেমনটি ছিল, যেভাবে তারা জীবনযাপন করত, তার ধারাবাহিকতা আজও তাদের মধ্যে যেন অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। যেখানে মাটির কঠিন আবরণ প্রোথিত রয়েছে প্রায় চার হাজার আট শ মিটার বরফের নীচে। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় সেখানে আজও এমন কিছু কিছু স্থলজ-উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় যাদের অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়াই খালি চোখে দেখা সম্ভব। মাত্র দু ধরনের সপুষ্পক উদ্ভিদ এখানে পাওয়া গেছে। একটি ডেসকাউইপসিয়া নামে ঘাসের অনুরূপ। অপরটি কলোবাউথাস নামে এক ধরনের লবঙ্গগন্ধী উদ্ভিদ। এদের দুটিকেই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় কুমেরু উপদ্বীপ এবং ব্যানানা বেল্ট অঞ্চলে। অনেকে মনে করেন, এ দুটি উদ্ভিদ অতি সম্প্রতিক কালে কুমেরু অঞ্চলে দক্ষিণ আমেরিকা বা কাছা-কাছি কোন ভূ-ভাগ থেকে এসে থাকবে। এ ছাড়াও সেখানে আছে শেওলা এবং সপুষ্পক ছত্রক। হিমবাহের বয়ে আনা পলির স্তূপ, শুকনো উপত্যকা, পিঠ বের করা পাহাড় বা পর্বতচূড়ায় এদের বাস। কিছু কিছু সপুষ্পক ছত্রক মেরুর চার ডিগ্রি কাছাকাছি অঞ্চলেও দেখা গেছে। তবে পরিমাণে কম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন,

অতিরিক্ত ঠান্ডাই এর কারণ, নয়। আসলে অত্যন্ত অনাবৃষ্টিতাই মেরু অঞ্চলে উদ্ভিদদের পক্ষে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বড় অন্তরায়।

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে আছে সামান্য কীট-পতঙ্গ-প্রাণী টার্ডিগ্রেডা এবং প্রায় ষাট রকমের সন্ধিপদ প্রাণী। এরা হল কোলেমবলা। কিছু গোলাকৃতি প্রাণী এবং পরজীবীও আছে। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের বেশির ভাগই সাধারণত বাস করে সীল অথবা সামুদ্রিক পাখির গায়ের ওপর।

কিন্তু স্থলভাগের অভাব যেন পূর্ণ করেছে জলচর প্রাণী বা উদ্ভিদরা। এখানকার জলে বাস করে প্রচুর পরিমাণ সমুদ্র-শৈবাল। ফলে, বড় বড় প্রাণীদের পক্ষে জলে অথবা প্রয়োজনে আকাশেও ঘুরে বেড়ান শক্ত নয়। তিমি, হাঙরের মত দেখতে ওয়েডডেল সীল, পেরগুইন আডেলাই, পেঙ্গুইন বা কতকটা গাঙচিলের মত বাজ পাখি স্কুয়া। এদের বাস এখানে। আর এদের জীবনের সম্ভবত একটি আইনই যেন চিরন্তনরূপে বিরাজ করে চলেছে। সেটা হল, হয় অপরকে খাও, অথবা নিজেকে কাউকে খেতে দাও। তাই মেরু অঞ্চলে পা দিলেই আপনার চোখে পড়বে কোথাও হিংস্র তিমি আড়ি পেতে অপেক্ষা করছে সীলের দর্শনের জন্যে, নেকড়ে-সীল ঝাঁপিয়ে পড়ছে পেঙ্গুইনের ওপর। আর হতচ্ছাড়া স্কুয়া সতর্কতার সঙ্গে কৌশলে চুরি করে চলেছে পেঙ্গুইনের ডিম বা ছানা।

যে-সমস্ত জীববিজ্ঞানী জীবগতির উপর ধারাবাহিক গবেষণা করতে চান তাদের কাছেও কুমেরু একটি স্বর্গ। বিবর্তনের স্পর্শ এদের আজও অনেক পেছনে ফেলে রেখেছে। জৈবিক পরিবর্তনের বহু পুরনো পৃষ্ঠা হয়তো এদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতে পারব। এখানে এমন কিছু কিছু উদ্ভিদ বা প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের পৃথিবীর অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায়নি। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, দীর্ঘকাল কুমেরু মহাদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট পৃথিবীর কোন যোগাযোগ ছিল না। এ ধরনের প্রায় সাড়ে তিন শ' রকমের সপুষ্পক ছত্রাক এবং বেশ কিছু মাছের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এ'দের ধারণা, এরা পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি এবং তার বিবর্তনের উপর অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হবে।

সম্প্রতি কয়েকটি চমকপ্রদ সংবাদ : মেরু অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা অদ্ভুত সমতা রেখে বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে তার অক্সিজেনের পরিমাণও অনেক বেশী। ফলে, যে-সমস্ত মাছের দেহে রক্ত কম তারা অনায়াসেই এই জলে বেঁচে থাকতে পারে। এমন কি, চ্যানিকথায়রাইডস গোষ্ঠীর কোন কোন মাছ যাদের দেহে এক ফোঁটাও লোহিত কণিকা নেই, তারাও বহাল তবিয়তে এখানে বাস করছে। একটি বিরাট প্রশ্ন, হিমাঙ্কের নীচে অত কম তাপমাত্রায় সেখানকার মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা কি করে সম্ভব? সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এই সমস্ত মাছের দেহে এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা শৈত্যের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। প্রশ্ন : দক্ষিণ মেরুতে স্তন্যপায়ী প্রাণী ওয়েডডেল সীল বাস করে। মেরুদেশের দীর্ঘ রাত্রে তারা খাদ্য শিকারের জন্যে বরফের নীচে ডুব দিয়ে বহু দূরে পর্যন্ত চলে যায়। শিকারের পর একটানা অন্ধকারের মধ্যেও পথ চিনে আবার সেই বরফের ফোকরপথে বাইরে বেরিয়ে আসে, যার ফাঁক দিয়ে সে ডুব দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে এমন
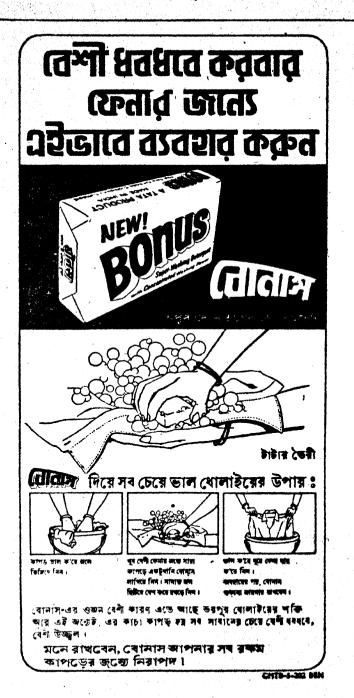
পাখায় ঝটকা তুলে শিকারের দিকে এগিয়ে আসছে কুমেরুর বাজপাখি স্কুয়া

পথ চিনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাদুড়ের মত এই সীলরাও শব্দ অনুসরণ করে চলতে পারে বলেই এটা সম্ভব। কিছু দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক আর একটি অদ্ভুত পরীক্ষা চালান ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে। একটি ড্রামের মধ্যে কিছু উদ্ভিদ পুরে নিয়ে এঁরা ড্রামটিকে ঘোরাতে শুরু করেন পৃথিবী যে দিক-বরাবর আবর্তন করে, ঠিক তার উল্টো দিকে। অর্থাৎ পৃথিবী যেমন তার অক্ষের চার পাশে পশ্চিম থেকে পূব দিকে ঘুরে চলেছে, ড্রামটি ঘুরছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে, পূব থেকে পশ্চিমে। পৃথিবীর আবর্তন উদ্ভিদজগৎকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এই পরীক্ষায় তার উপর বেশ কয়েকটি নতুন তথ্য পাওয়া গেছে।

তবু কুমেরুর বিজ্ঞানীরা আজ চিন্তিত। মেরুর এক কোটি সীল এবং এক কোটি পেংগুইন এতদিনে যেন সত্যিকারের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সে বিপদ বরফ বা স্কুয়া পাখি নয়। তাদের বিপদ আজ মানুষ। সেখানে গবেষণার জন্যে বড় বড় হেলিকপ্টারের আর্তনাদ অথবা বুলডজারের গর্জন তাদের শান্ত পরিবেশে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে গ্যাসের ধোঁয়া বা মানুষের বয়ে নেওয়া আবর্জনা তাদের বাসস্থানকে করছে কলুষিত। কে জানে, মানুষের কৃত্রিম পরিবেশ হয়তো প্রকৃতির চিররক্ষিত এই প্রাণীদের অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেবে না?

কুমেরুর আরও একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল বায়ারড। পশ্চিম কুমেরু অঞ্চলের এখন থেকে বিজ্ঞানীরা চৌম্বকীয় বিপরীত বিন্দুর উপর গবেষণা চালাচ্ছেন। এখানেই পৃথিবীর চৌম্বকীয় বলরেখা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ছেদ করেছে। এ ছাড়াও এখানে গবেষণা চালান হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি, ভূ-চুম্বক ক্ষেত্র, বিভিন্ন কম্পনমাত্রার তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, মেরুদেশের শীতকালের স্থায়িত্ব, অরোরা বা মেরুপ্রভা এবং সেখানকার বাতাসের এক ধরনের প্রভার উপর।

এখানকার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এক ধরনের শিস ধ্বনি। মাঝে মাঝে আমাদের রেডিও গ্রাহক যন্ত্রে যা আমরা শুনে থাকি। যখন নিম্ন কম্পন মাত্রার তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ভূ-চুম্বকের একটি যুগ্ম বিন্দু থেকে অগত চুম্বক বলরেখা বরাবর অগ্রসর হয় তখন শিসের ঐ শব্দ শোনা যায়। এর ওপর গবেষণা চালিয়ে ভূ-চুম্বক, ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরের আবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। এই তথ্য আবহাওয়া বিজ্ঞানীদেরও যথেষ্ট সাহায্য করবে। সেখানে শুরু হয়ে গেছে বরফ খোঁড়ার কাজ। বিভিন্ন স্তরের বরফে কতখানি মহাজাগতিক ভস্ম জমে আছে তা পরীক্ষা করে বলা যাবে, কখন কতটা পরিমাণ ঐ ভস্ম দূরাকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হয়েছে বা হবে। আবহাওয়া এবং মহাকাশ গবেষণায় সে তথ্যও যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পৃথিবীর এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বায়ু সঞ্চালনের ব্যাপারে মহাজাগতিক ভস্ম এবং রশ্মি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

দক্ষিণ মেরুর আসল অবস্থান যে জায়গাটিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে আমাণ্ডসেন-স্কট স্টেশন। উচ্চতা ২৮০৪ মিটার। তার উপর দাঁড়িয়ে ২৬৯৭·৫ মিটার পুরু বরফের আস্তরণ। আর তার চার পাশে কয়েক শ' কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল নিষ্প্রাণ যেন বরফের মরুভূমি। ১৯৫৭তে মানুষ এই মেরুর দিগন্তে সর্বপ্রথম সূর্যাস্তকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। তবে মেরু বিন্দু থেকে কুইন মাউড ল্যাণ্ড-এর তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আজও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। একে জানতে হবে। প্লেটু স্টেশন, যার উচ্চতা ৩৫৬৭ মিটার, এটাকেই বলা হয় পৃথিবীর শীতল-মেরু। এর রহস্যও আজও অজানা। জানতে হবে বিয়ারডমোর হিমবাহের দুর্গম পথ। একসময়ে এটাই ছিল দক্ষিণ মেরু গমনের রাজপথ। বরফের এই নদীটি ছিয়ানব্বুই কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় আটচল্লিশ কিলোমিটার। এর এক প্রান্ত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে রস বরফের ধাপের মুখ বরাবর। সন্ধান নিতে হবে মেরুদেশের সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া কাচের মত স্বচ্ছ মার্বেল পাহাড়ের শ্রেণীর প্রকৃত স্বরূপ। এমন হাজারো তথ্যের সন্ধানে কুমেরুকে মুখরিত করে রেখেছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। কারণ, দক্ষিণ মেরুর সন্ধান আজ শেষ ভৌগোলিক অনুসন্ধান। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অবশিষ্ট পৃথিবীর রিক্ততার পরিপূরকরূপে হয়ত কুমেরু কুমারী আমাদের অনেক নতুন আশার বাণী শোনাতেও পারে।

সমরজিৎ কর

জাতীয় শ্রম কমিশনের প্রতিবেদন

জাতীয় শ্রম কমিশন সম্প্রতি যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তার ফলে ভারতে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের সম্পর্কে গুরুত্বর পরিবর্তন হবে আশা করা যায়। শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, সমাজ বীমা, শ্রমিক সংঘের উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় শ্রম কমিশন একটি প্রতিবেদন দিয়েছেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রী বি পি গজেন্দ্রগড়করের সভাপতিত্বে ১৯৬৬ সালে জাতীয় শ্রম কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন [illegible]জন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরনের একটি জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন অভূতপূর্ব, এবং এই কমিশনের সুপারিশগুলির গুরুত্বও [illegible]। হয়ত কমিশনের সব সুপারিশই গৃহীত হবে না, কিন্তু সুপারিশগুলির মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[illegible] জাতীয় শ্রম কমিশন বিভিন্ন [illegible] "শিল্প সম্পর্ক কমিশন" (Industrial Relations Commission) এবং শ্রম আদালত (Labour Courts) গঠন করার সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্ক কমিশনগুলির মুখ্য কাজ হবে তিনটি: (১) শিল্প বিরোধের বিচার করা (২) আপস মীমাংসার মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং (৩) বিভিন্ন ইউনিয়নকে প্রতিনিধিত্ব-মূলক ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা। জাতীয় শিল্প সম্পর্ক কমিশন গঠন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার, এবং যখন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এ জাতীয় কমিশন গঠন করা দরকার মনে করবেন তখনই সেই কমিশন গঠিত হবে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক কমিশন গঠন করবেন রাজ্য সরকার। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিচার-বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগ বহির্ভূত সদস্য থাকবেন এবং এ-জাতীয় কমিশন সরকারের শাসন বিভাগের আওতা থেকে মুক্ত থাকবে। এই ধরনের কমিশনের বিচার বিভাগীয়

সদস্যগণের হাইকোর্টের বিচারপতি হবার যোগ্যতা থাকবে। শ্রম আদালতগুলির কাজ হবে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডের ব্যাখ্যা প্রদান করা, শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ডের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করা এবং বিভিন্ন আইনে শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত যা যা বিধান আছে সেগুলি যাতে ঠিকভাবে অনুসৃত হয় তার ব্যবস্থা করা। ন্যায়সঙ্গত কারণে এবং বিধিসম্মতভাবে ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিকদের আছে। এটা জাতীয় শ্রম কমিশন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ধর্মঘটের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং যদি আপস-মীমাংসার মাধ্যমে শ্রমিক-বিরোধের নিষ্পত্তি না হয় তবে শিল্প সম্পর্ক কমিশন তার বিচার করার জন্য এগিয়ে আসবেন। বে-আইনী ধর্মঘটের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান কমিশন সমর্থন করেছেন।

শ্রমিক সংঘগুলি যাতে যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে (Collective bargaining) মালিকদের কাছ থেকে নিজেদের দাবি দাওয়া আদায় করতে পারে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য কমিশন শ্রমিক সংঘের বাধ্যতামূলক

করার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় শ্রম কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য শ্রমিক সংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে সর্বনিম্নসংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করা, শ্রমিক সংঘের উপর বাইরের রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব কমানো এবং সদস্যদের দেয় চাঁদার সর্বনিম্ন পরিমাণ আরও বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রমিক সংঘগুলিকে যেমন বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্টার্ড হতে হবে, মালিক সংঘগুলিকেও তেমনি বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্টার্ড করার অনুকূলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় শ্রম কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে একটি জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি (national minimum wage) স্থির করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে বর্তমান অবস্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারিত করা যেতে পারে। সর্বনিম্ন মজুরি এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরির মধ্যে একটি পার্থক্য শ্রম কমিশনের প্রতিবেদনে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মালিকের কতটা মজুরি দেওয়ার ক্ষমতা আছে তা বিচার করার দরকার হয় না। কিন্তু প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরি (need-based wages) দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকদের কতটা মজুরি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, এবং তা শিল্প-সম্পর্ক কমিশনের কাছে অথবা বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা তাও দেখতে হবে। বর্তমানে যে সকল মজুরি-বোর্ড (wage Boards) আছে সেগুলি বজায় রাখার অনুকূলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদি মজুরি-বোর্ডের সদস্যগণ সকলেই একমত হয়ে মজুরি নির্ধারণ করেন তবে তা মালিকদের পক্ষে কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি মজুরি-বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়, তবে বোর্ডের সভাপতির অভিমতই গৃহীত হবে। কমিশন মনে করেন চাকুরির ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করা ভারতে এক নাগরিকতার আদর্শের বিরোধী। তবে কতিপয় স্থানীয় শিল্পে অপটু স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য যে যৌথ পরামর্শদাতা সংস্থা (Joint Consultative Machinery) আছে তার কিছু সংস্কার করার পক্ষেও কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন। কমিশন বলেছেন, শিল্প-বিরোধের নিষ্পত্তি কল্পে বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা উচিত হবে না। যদি বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর হয় তবেই ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা উচিত হবে।

কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্পর্কে স্বীকৃতির সুপারিশ প্রদান করেছেন। যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০জন অথবা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে, তবেই শ্রমিক সংঘকে বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যদি শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় তবেও শ্রমিক সংঘের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যে শিল্পে একাধিক শ্রমিক সংঘ থাকবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের সদস্য সংখ্যা বিচারে অথবা বিকল্পভাবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অধিকাংশ শ্রমিকের সমর্থনে একটি নির্দিষ্ট শ্রমিক সংঘকে প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক সংঘ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং শিল্প-সম্পর্ক কমিশন সেই সার্টিফিকেট দেবেন। শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে আরও জোরদার

জাতীয় শ্রম কমিশন একটি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। কমিশনের মতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দেয় টাকার পরিমাণ আয়ের শতকরা ৬·২৫ অংশ থেকে শতকরা ৮ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো উচিত। আর যেখানে আয়ের ৮ শতাংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে প্রদান করা হয়, সেখানে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ আয়ের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো উচিত। সেক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু অংশ অবসর গ্রহণ ও পরিবার পেন্সন প্রকল্পে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর ভোগ-সামগ্রীর মূল্য সূচী অনুযায়ী দুর্মূল্য ভাতাকে বেতনের সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়ার সুপারিশও কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে একটি পে-কমিশন (Pay Commission) গঠন করা উচিত বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে এটুকু বলা চলে যে, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন এবং শ্রমিক সংঘগুলিকে আরও শক্তিশালী করা প্রভৃতি নিশ্চয়ই জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে। তবে, ধর্মঘটের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা এবং শিল্প-সম্পর্কে কমিশন গঠন ও তার উপর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আরোপ করার সুপারিশ শ্রমিকশ্রেণী হৃষ্টমনে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে মোটের উপর, কমিশনের সুপারিশগুলি যে সন্তোষজনক, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

ঘেরাও সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেছেন যে তার ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিকে আঘাত করা হয়। তাছাড়া, ঘেরাও-এর ফলে শিল্প উৎপাদনের ধারা ব্যাহত হয় বলে কমিশন মনে করেন। এক্ষেত্রে কমিশনের উক্তিগুলি বিশেষভাবে অর্থবহ এবং উল্লেখযোগ্য:

"We..deprecate resort to 'gherao' which invariably tends to inflict physical duress on the person (s) affected and endanger not only industrial harmony but also creates problems of law and order."

"If such means are to be adopted for realization of its claims trade unions may come into disrepute. It is the duty of all union leaders therefore to condemn this form of labour protest as harmful to the interests of the working class itself."

সুব্রত গুপ্ত

বেশ ভাল ক'রে-অনেকটা গভীর পর্যান্ত ত্বক পরিষ্কার করতে হ'লে ক্লেনজিং মিল্কটাও তেমনি গুণের হওয়া চাই। ল্যাকমে ক্লেনজিং মিল্কের প্রতি বিন্দু আরো বেশী ঘনীভূত এবং আরো বেশী গুণে ভরা। অব্যর্থভাবে রোমকূপকে নরম ক'রে—তার মুখ খুলে দেয়। এটি ত্বকে বেশ গভীরে প্রবেশ করে,—চ'লে যায় একেবারে সেই অন্তঃস্থলে যেখান থেকে শুরু হয়—কুৎসিত সব দাগ আর ব্রণের আবির্ভাব! লুকোনো ময়লা পলকে টেনে বার করে,-যা মুখে খুঁত সৃষ্টি করতে পারত। আপনার ত্বকের সযত্ন পরিচর্য্যায় প্রতিদিন ব্যবহার করুন—ল্যাকমে ডিপ পোর ক্লেনজিং মিল্ক। অচিরেই মুখে কোমল এক অপূর্ব্ব বর্ণরূপ ফুটে উঠবে।
ল্যাকমে
ডিপ পোর
ক্লেনজিং
মিল্ক

শিল্পী রাখাল দাস আকাডেমীর গ্যালারীতে সম্প্রতি এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দৈনন্দিন কর্ম-জীবনের পরে অবসর সময়ে ছবি এঁকে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রাখাল দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতা পরিবহন সংস্থায় কাজ করে অবসর-সময়টুকুতে শিল্পী যে নিয়ম ও নিষ্ঠা-

আলোর বন্যা —রাখাল দাস

সহকারে ছবি এঁকে গেছেন, প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখে তা বোঝা যায়।

শিল্পী প্যাস্টেল ব্যবহার করেন এবং তাঁর কাজ দেখে মনে হয় এই মাধ্যমে বক্তব্যটুকু তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেন। শিল্পীর বিষয়বস্তুগুলি আমাদের সকলের পরিচিত—বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম, গাছপালা, ঝোপঝাড়, আঁকাবাঁকা পায়েচলা পথ ও উদার, উন্মুক্ত আকাশ—এবং প্যাস্টেলের মধ্য দিয়ে এইগুলিই তিনি রূপায়িত করেছেন। বৃহৎ পরি-প্রেক্ষিতে রচিত ছবিগুলি দেখলে শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রভাব বোঝা যায়, তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রভাব অতিক্রম করে তিনি নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ, নানা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার ও অংকনরীতির গুণে অনেকস্থলে তিনি গ্রাফিকের সূক্ষ্ম কারুকার্য ফুটিয়ে তুলেছেন—যেমন হলুদ, কালো ও সবুজ রঙ প্রধান ২৯নং ছবি। দু'এক ক্ষেত্রে একটিমাত্র উজ্জ্বল রঙের তারতম্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী স্বীয় রচনা-কৌশল প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে

আলরঙ প্রধান স্টোরিক-এর নাম করা চলে। প্রদর্শনীর দুটি ছবি ভিন্নজাতীয়। দেখে মনে হয় শিল্পী অন্য রীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন। এগুলি রঙীন (লাল) কাগজের ওপর আঁকা। প্রয়োজনীয় স্থানটুকু খালি রেখে শিল্পী রচনাক্ষেত্রের অবশিষ্ট স্থান ছোট ছোট প্যানেলে বিভক্ত করে ভিন্ন রঙে ভরে ফেলেছেন, ফলে রীতির দিক থেকে প্রাচীন দেওয়ালচিত্র জাতীয় হলেও এগুলির কোলাজসম রূপই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণ হিসাবে ২২ ও ২৩নং ছবির নাম উল্লেখ করা যায়। তবে পরিকল্পনার দিক থেকে সমকালীন ও সময়োচিত হলেও ছবি দুটি, বিশেষ করে, দ্বিতীয়টি রসোত্তীর্ণ হয়নি—কারণ দীর্ঘতর আকারে আঁকলে শিল্পীর মনোভাব স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠত। তবে পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা হিসাবে দুটি নিদর্শনেই শিল্পীর সক্রিয় ও সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

✻

আকাডেমি পরিচালিত স্টুডিওতে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়মিত ভাবে শিল্পশিক্ষা করে গত সাত বছর যাবৎ আকাডেমি কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছেন। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ অষ্টম বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে সাড়ে চার বৎসর বয়স থেকে শুরু করে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের ১৩২টি নিদর্শন দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ স্থলেই জলরঙ ও প্যাস্টেল ব্যবহার করেছে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তাদের বিচিত্র কল্পনাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যেমন কয়েক-জনের ছবিতে মিছিল, বন্যা, রথযাত্রা ও উৎসবাদির প্রাধান্য চোখে পড়ে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আবার শিশুসুলভ বিচিত্র মূর্তি বা নিসর্গদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ছবি দেখে মনে হয় সকলেই আপন আপন খুশীমত কাগজের ওপর রঙ ও তুলির মধ্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। যে সব ছেলেমেয়ের ছবি ভাল লেগেছে তাদের মধ্যে নৃপুর ভট্টাচার্য (বয়স ৯), অভিজিৎ চক্রবর্তী (বঃ ১১), সুচিত্রা দেব (বঃ ১২), সঞ্জয় দেব দত্ত (বঃ ১০), আলিনী গুজরাল (বঃ ১১), শিবা হরিরাম (বঃ ৮), চিত্রলেখা মুখার্জি (বঃ ১২), মনোজ মজুমদার (বঃ ১১), গীতা মলহোত্রা (বঃ ১১), তাপস সোম (বঃ ১২), সুনীতা তালুকদার (বঃ ১০), কেয়া রায় (বঃ ৬) ও নন্দনন্দিনী মুখার্জি (বঃ ১২)-র নাম উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর একখানি ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—১২ বছর বয়স্ক অঞ্জু সুরি-র ১০১নং নিসর্গ দৃশ্য। ছবিটিতে তুলির টানের বলিষ্ঠতা ও রঙের তারতম্য দেখে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে—এতে শিক্ষকের কোনও সাহায্য নেই তো? নিছক নিজস্ব হলে ছবিখানির জন্য অঞ্জু সুরি সকলের প্রশংসা লাভ করবেন।

পাপুর ছবি

"পাপুর বই"য়ের শিশু-লেখক এবং শিল্পী পাপু আজ সকলেরই চেনা। ভাল নাম

ছিল তার সুব্রত সরকার। মাত্র সাড়ে আট বছর বেঁচেছিল সে এই পৃথিবীতে। তার আঁকা প্রায় পাঁচ শ' ছবি থেকে ৮০ খানা নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন একাডেমি অব ফাইন আর্টস তাঁদের গ্যালারিতে। প্রদর্শনী শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। চলবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

চিত্রপ্রিয়

নিরাপত্তা
যখন একটি তালা'র
ওপর নির্ভর করে
তার জন্যে একটিমাত্র
তালা আছে—

পক্ষপাতের আলোকে
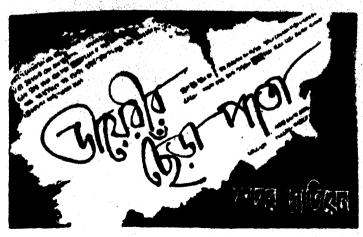
গোপার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। হায় রে কপাল! মেয়েটি এসেছিল এই বুড়োর কাছে জর্নালিজমের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার শুভ সংবাদ জানাতে; আর আমি কি জানি কেন দুর্বাসার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে তাকে অভিনন্দন না জানিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "জর্নালিজম্‌?...মেয়েরা কি তা পারে? ওতে যে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি চাই!"

গোপা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল: "তাহলে আপনি বলতে চান সত্যদৃষ্টিতে একলা পুরুষদেরই মনোপলি?" কিংবা ঐ ধরনের খোঁচা-দেওয়া কোনো কিছু।

এখানে আমার উচিত ছিল [এখন অবশ্য তা অনুতপ্ত চিত্তেই স্বীকার করি] গোপার নতুন কেনা ব্যাগের প্রশংসা করা, কিংবা নিজেরই বেতো পায়ের খবর দেওয়া কিংবা বুক্কফেলের পলিসির কথা পাড়া [গোপা আবার রাইট কম্যুনিস্ট], আর আমি কি না "নারীদের সঙ্গে তর্ক পরিহর্তব্য" চাণক্যের প্রসিদ্ধ শ্লোকটিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গেলাম...

গোসা করে চলে গেল গোপা।

আমার মন্তব্য না শুনে সে কিন্তু মূল্যবান কিছু শেখার সুযোগ মিস্‌ করেছে। মন্তব্যটা এই যে, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সত্য দৃষ্টিভঙ্গি এক জিনিস নয়। সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য অবশ্য হিম ও নির্লিপ্ত তথ্যনিষ্ঠা। সব ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যে পৌঁছোবার পন্থা ওটা নয়। আমি বরং বলি: অনেক ক্ষেত্রে আবেগের উত্তাপেই সত্যের আগুন জ্বলে ওঠে।

ছোটবেলা থেকে আমরা শিখি বটে, যাচাই করতে হবে, বাজিয়ে দেখতে হবে, ওজন করে দেখতে হবে দুদিক, পক্ষ নেবার আগে সতর্কতার প্রয়োজন পদে পদে। আমি কিন্তু বাপু যা-ই বলুন, পক্ষপাতেরই পক্ষপাতী। আজীবন পক্ষ নিয়ে এসেছি—শৈশবে বাবা-মার', বাল্যে সমবয়সী বন্ধুদের, কৈশোরে নিজের কলেজের, আর তারপর, বলব কি, বাংলাভাষা ও বাংলাভাষীদের। পক্ষ নিয়ে লোকে ঠকে বলে শুনেছি। আমি ঠকে ঠকে শিখেছি, মানুষকে আর মানুষের সমাজকে চিনতে হলে পক্ষ নিতে হবে।

আটপৌরে ভারত

পক্ষপাতে অনুরঞ্জিত বলেই এই যে এক ফরাসী তরুণী সাংবাদিকার লেখা ভারত-দর্শনের অনবদ্য বৃত্তান্তটি আমি পড়ে উঠলাম, তাতে বেজেছে সত্যের সুর। সাংবাদিকের লেখা হলেও সাংবাদিকসুলভ যাথার্থ্যপনার বড়াই নেই কোথাও, ভুল করার ভয়ে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা নেই, ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার কণ্ঠরোধ করে নৈর্ব্যক্তিক সাজার চেষ্টা নেই, বরং গোড়াতেই সোজাসুজি ব'লে দেওয়া আছে, "জর্নালিজম মুক্ত ক'রে দেয় বটে বহু দুয়ার, রুদ্ধ ক'রে রাখে তেমনি অনেক দুয়ার। তাই যে পনেরো মাস আমি ভারতে ছিলাম, আগাগোড়া ছিলাম নির্ভেজাল এক ফরাসী তরুণী হয়ে, বিস্ময় যার অফুরন্ত, জানবার ও বুঝবার উৎসাহ যার অসীম।"

শুধু যেটুকু বিনয় ও সতর্কতা প্রয়োজন, সেটুকু উচ্চারিত হয়েছে: "নিশ্চিত তথ্য বলতে গেলে একটিই—অতিরিক্ত জনসংখ্যা; বাকি সবই দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভরশীল। অভ্রান্ত হবার দাবি আমি করি না। ভারতকে যেভাবে দেখেছি, অনুভব করেছি নিজে, সেভাবেই উপস্থাপিত করেছি। ঘুরেছি পর্বতে, মরুভূমিতে, সর্বধর্মের পুণ্যপীঠ-সমূহে: গিয়েছি আধুনিক নগরীতে, হতশ্রী পল্লীগ্রামে; অমিত ধনবান আর রিক্ত হতভাগ্যের দল—উভয়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে; কিন্তু এদেশের পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার গ্রামের একটিতেও তো সত্যি সত্যি কখনো বাস ক'রে দেখিনি,...।"

এমন সূচনা আশা জাগায় নীরস খবরের সমাহার নয়, "ড্রেন-ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট"-ও [মিস মেয়ো-র ভারতনিন্দাকণ্টকিত কুখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে গান্ধীজীর স্মরণীয় মন্তব্য] নয়, সত্যিই ভিন্ন স্বাদের একটা কিছু পাব—অন্তর সংবেদনে ভরা, ভালো লাগার গন্ধে ভরপুর, ভালো না লাগার প্রকাশে অকপট, সহানুভূতির অঞ্জনে আঁকা এক প্রাণবন্ত কাহিনী। বর্তমান লেখিকা সে আশা পূর্ণ করেছে।

আপনি বলতে চান সত্যদৃষ্টিতে একলা পুরুষের মনোপলি?

বইয়ের নাম "আটপৌরে ভারত", লেখিকার নাম মিস ক্লোদিন কানোড [ভারতীয় কানে খটোমটো ব'লে ক্লেনোড নামেই তাকে ডাকত অনেকে]; এদেশে সে এসেছিল চৌ-এন-লাইয়ের ভারত ভ্রমণের কালে, যখন নকা পয়সা প্রথম চালু হয়।

"এদেশ লেগেছে ভালো রকম"

প্রথমেই অবশ্য একটা হোঁচট এসেছিল দিল্লীর কাস্টমস-এর কাছ থেকে; "ঐ বিভাগটাকে আজীবন আমি শাপান্ত ক'রেছি"

এসেছি। ফরাসী কাস্টমসকে নীতিগত-ভাবে; ইংরেজ কাস্টমসকে প্রাতিটি বই ওরা আমাকে অন্তত একটা স্যুটকেস খুলতে বাধ্য করেছে বলে; মার্কিন কাস্টমসকে ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা বসিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত ওরা কিছুই খোলেনি; আর দিনেমার কাস্টমস আমার ছোট গাড়িটার বীমার টাকা আমার কাছ থেকে উসুল করে আদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু দিল্লীর শুল্ক বিভাগের মতো এমন অনন্য পরিচালনার খপ্পরে এমন উত্তেজক আর কোথাও...।"

কিন্তু তারপর, বিমান-বন্দরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, সত্যকার ভারতের মাটিতে পা দিয়েই ভালো লেগে গেল এই দেশ। ভালো লেগে গেল দুই দিল্লী—নতুন আর পুরোনো; ভালো লেগে গেল বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, আগ্রার বুদ্ধিবৃত্তিক তাজ; আর কি সুন্দর নৈনিতালে যাবার সেই পথ, "সারা ভারতের সব-সেরা সরণি", আর রাণীক্ষেত। তার মতে যা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈল-নগরী]। তারপর অনবদ্য-ভাবে, অজ্ঞানুক্রমে-সাজানো মথুরার সেই মৃৎশিল্প—পর্যায় ক'রে রেখে দে। স্থাপিত রয়েছে পা, মাথা-ধড়..."অতুলনীয় বুদ্ধের মস্তক, তরমুজের মতো সার করে রাখা"। আর স্থাপত্যের লীলাক্ষেত্র কোনারক? পার্থেনন ছাড়া আর কে তাকে ছাড়াতে পারে? আর খাজুরাহো—গোটা ভারতে আর কি আছে তার চেয়ে অপরূপ? "যেখানে নিস্তাপ নিখুঁতে সুষমা মনকে স্পর্শ করে, খাজুরাহো স্পর্শ করে হৃদয় ও ইন্দ্রিয়দায়!"

দার্জিলিং

কিন্তু বাংলাদেশ? আছে দার্জিলিং যাবার "সত্যকার আশ্চর্য খেলনা ট্রেনের" কথা, আছে দার্জিলিঙের পটভূমিকায় ভারতীয় মানের তুলনায় কি পরিচ্ছন্ন-পরিচ্ছন্ন: "একদিন সারা সকাল ধরে একটা কাগজের থলি নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম, ঝকঝকে রাস্তার উপর ফেলে দিতে বেধেছে!" ঘুমের সন্ন্যাসীদেরও উল্লেখ আছে, একটা সিগারেট দিলে তারা খুশী হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে রাজি হন।

আর আছে নেপালীদের [illegible] পৃথিবীতে নাকি এমন হাসমুখ জাত আর একটিও নেই: "দুঃখী ক্ষুধার্ত ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর পর এই একটি জাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ—যাদের মনে হয় সুখী, [illegible] সুখী! কি দারিদ্র্য জীর্ণশীর্ণ বেশবাস এদেরও কিন্তু চেহারায় দুঃখের চিহ্ন নেই।" এরপর আরও প্রশংসা [illegible] আর সিকিমের ক্ষেত্রে: [illegible] তিব্বতের সীমান্ত নেই [illegible] ভারতে [illegible] এক দণ্ড স্থির থাকতে [illegible] দেখে দেখে আপনি [illegible]

কলকাতা

কিন্তু খাঁটি বাংলাদেশ আর বাঙালীদের প্রসঙ্গে? আছেন সত্যজিৎ রায়, আছেন রবিশঙ্কর, আরো দুজনাই বাঙালী বলে কথা বলা হয়েছে, দিল্লীতে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। [illegible] সংযোগ [illegible] হাওড়া স্টেশন, [illegible] বিরাট এক বিস্ময় [illegible] খুলে-ফেলা এক দেবালয়ের মতো: "আমাদের পশ্চিমীদের কাছে স্টেশন শুধু এক যাওয়ার পথ, বড়-জোর ঘণ্টাখানেকের কর্মহীন অবকাশ-যাপনের স্থান: এখানে এদের কাছে দেখছি অন্য সব স্থানের মতোই স্টেশনও একটা থাকার জায়গা, যেখানে আহার-নিদ্রা-রমণ সবই চলে..."

আর নজরে পড়ে—না পড়ে পারে না—ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষগুলি, যাদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলতে হয়; সর্বব্যাপী দুঃখ দুর্দশার এরাও যেন প্রতীক। এই দুর্দশা যে কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত তা

বুঝতে পারা যায় যখন আবিষ্কার করতে হয়, "ওটা প্রায় হৃদ্‌পিণ্ডেরই একটা অপরিহার্য অংশ; যে কোনোখানেই ওটার দর্শন মিলবে —এ যেন প্রত্যাশিতই হয়ে দাঁড়ায়, প্রায় স্বাভাবিক লাগে নিজের কাছে, অন্তত অবশ্যম্ভাবী। তারপর হঠাৎ থেকে থেকে চমক লাগতে শুরু করে; বিমূঢ় আশঙ্কার সংগে আপনি লক্ষ্য করেন, ওতে আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এত অভ্যস্ত যে দুর্দশার উপস্থিতি আপনার দৃষ্টিতে আর ধরাই পড়ে না...। এশিয়া যতই ঔৎসুক্যজনক হোক, অধিককাল বোধ হয় কারুরই এখানে বাস করা উচিত নয়—পাছে হারিয়ে ফেলতে হয় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হওয়ার ক্ষমতা, পাছে মনুষ্যের চরম অসহায়তা ও ভয়াবহ দুর্দশাকেও মেনে নেবার নিষ্ক্রিয় মনোভাব আপনাকে পেয়ে বসে।"

এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা সম্বন্ধে ক্রোদিনের অভিমত : "কলকাতা, আঁকড়ে-ধরা, দানবিক মোহিনী কলকাতা—যেখানে বেঁচে থাকাটাই এক মহাশ্চর্য, সেখানে তার এই দুর্মর প্রাণশক্তি আমার চোখে এক ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগায়।"

দুঃখ হয়, এমন একজন সংবেদনশীল তরুণী সময়, সুযোগ ও পরামর্শের অভাবে কলকাতার আর একটা রূপ চিনে উঠতে পারেনি, যে কলকাতা অনেক বিদেশী প্রবাসীর চোখে ভারতের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হার্দ্য আর প্রাণস্পন্দিত নগরী।

নেহরু

নিজের কাজের খাতিরে দিল্লীতে পার্লামেন্টে ঘন ঘন যেতে হত ক্রোদিনকে। ভারতীয় সংসদের পরিচালনা-পদ্ধতি ও বাগ্‌বিতণ্ডা তার কাছে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে ঠেকেছে—একমাত্র আনন্দজনক ব্যতিক্রম নেহরু। ভারতীয় রাজনীতিক ও বক্তাদের মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত তিনিই, আশাতীতের আঘাত হানেন, অপ্রত্যাশিতের আকস্মিকতা আনেন। তাঁর বক্তব্য আপনার মনোমতো হোক না হোক, তাঁর বিষয়বস্তু আপনাকে আকৃষ্ট করুক না করুক, তাঁর কথা আপনাকে শুনতেই হবে —একাগ্র অভিনিবেশে। নেহরু মার্কিন মুলুকে গেলে ক্রোদিন লেখে, "নেহরু যখন অনুপস্থিত, সারা ভারতবর্ষে যেন সুপ্তির ঘোর।"

নেহরুর ক্রোধ অল্প প্রায় কিংবদন্তীর মতো। ক্রোদিনের ভাষায় "অহিংসার এই প্রতিভূ ব্যক্তিত্ব...কত তুচ্ছ একটি ঘটনা তাঁর অসন্তুষ্টির উদ্রেক করতে পারে! আর তা তিনি প্রকাশও করেন তীব্র ভঙ্গিতে। কিন্তু না, তাঁর গলা চড়ে না কখনও, ক্রোধেও তিনি আত্মমর্যাদাবোধ হারান না, শুধু তাঁর গলার স্বর ও মুখের ভাব বদলে যায়...আর সংগে সংগে প্রত্যেকে ঠিক।"

নববর্ষের চুম্বন

নেহরুকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আসে একবার। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিদর্শনান্তে ট্রেনে চেপে ফিরে আসছেন চৌ আর নেহরু, দিনটা নববর্ষের পূর্বদিন। সাংবাদিকেরাও সে যাত্রার সঙ্গী রয়েছেন। আগে থেকেই তাঁরা ক্রোদিনকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন : "প্রধানমন্ত্রী চৌকে নববর্ষের চুম্বন দিন না দেখি—ফ্রান্সে তো ওটাই প্রথা।" রাত্তির বারোটা যখন বাজল, ফোটোগ্রাফারেরা উচ্চকণ্ঠে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, চৌ-এর দিকে ক্যামেরা ফোকাস করে...এমন সময় আকস্মিকভাবে, সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে ক্রোদিনকে টেনে নিয়ে তার বাঁ গালে

সস্নেহে একটি চুম্বন এঁকে দিলেন নেহরু! ফোটোগ্রাফারেরা বিমূঢ়, চট করে ক্যামেরা ঘুরিয়ে নিয়ে এই বিরূপ দৃশ্যটাকেও ধরে রাখবার অবকাশ পেল না বেচারীরা। খবরের কাগজে এক ফরাসী তরুণী সাংবাদিকাকে নেহরুর চুম্বনের সংবাদ পড়ে বাবা-মা চিঠি লিখলেন ক্লোদিনকে, "এ মেয়েটি কি তুমিই?"

আর ডায়েরিতে নেহরুকে উদ্দেশ ক'রে ক্লোদিন লিখলেন, "ডিয়ার মিঃ নেহরু, আমার ডান গালটি কিন্তু বঞ্চিত রয়ে গেল।"

দেখা-শোনা-জানা

তার সেই ডায়েরিতে লেখিকা তার দৈনন্দিনকার অভিজ্ঞতার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

ভারতনাট্যম তার কাছে ঠেকেছে বিস্ময়কর..."কি ক'রে মুখমণ্ডলের এতটুকু বিচ্যুতি না ঘটিয়ে, কাঁধের সমান্তরালে, অমন অপরূপভাবে ওরা ঘাড় দুলিয়ে যায়?" ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সে কিন্তু বোঝাপড়ার আসতে পারে নি; কণ্ঠসঙ্গীতকে তো রীতিমতো 'কর্কশ প্যানপ্যানানি' বলেই বোধ হয়েছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের কোনো প্রদর্শনীতে উপস্থিত হবার সুযোগ তার ঘটেনি; ফলত 'ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ আর অহেতুক চাঁচা-মেচিতে ভরা' হিন্দী ফিল্ম ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাকে বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। অবাক হয়ে ভেবেছে, "আনন্দের বা দুঃখের যা-কিছুই ঘটুক না কেন, নায়িকারা অমন যখন তখন নাচে কিংবা গানে কিংবা দুটোতেই মেতে ওঠে কেন!...প্রেম, হিংসা, হতাশা—সবেরই প্রকাশের বাহন গান...। পুরুষ কণ্ঠ তবু সহনীয় কিন্তু মেয়েদের কণ্ঠস্বর যেন আগাগোড়াই সপ্তমে বাঁধা—যত চড়ে, তত বাড়ে প্রেক্ষাগৃহে করতালির বহর।" আর হ্যাঁ, য়ুরোপীয় দর্শক হিসেবে ভারতীয় ছবিকে তার মনে হয়েছে "অতিমাত্রায় chaste; চুম্বনের দৃশ্য একেবারেই বরদাস্ত করা হয় না।"

বোম্বাইয়ের রঙিন ছবি ক্লোদিনের মনোরঞ্জন করতে পারেনি, ভারতের রঙের উৎসব হোলি কিন্তু তার মন রাঙাতে পেরেছিল। ভালো লেগেছিল তার এই উৎসবের সামাজিক সাম্যবাদী চরিত্র, প্রভু-ভৃত্যের পারস্পরিক ব্যবধান ঘুচিয়ে রঙ-বিনিময়: "ফিরে যখন এলাম, আমার মাথাটা একেবারে লাল, চোখ হলদে, আর নাকের উপরে গাঢ় হয়ে বসেছে সবুজ রঙের ছোপ।"

এদেশের বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা সে ভুলতে পারেনি; দশ গুণ বেশি লোক নিয়ে বাসগুলির নির্বিঘ্ন চলাচল, উপরন্তু একই সঙ্গে গাদাগাদি ঝুড়ি-চুপড়ি-মুর্গি, আর বাচ্চারা মায়ের পিঠে; মেয়েরা দাঁড়িয়ে, আর তবু পুরুষদের নির্বিকার বসে থাকা—ক্লোদিনের বিস্ময়; এক বুড়ির জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে ক্লোদিনের গাত্রোত্থান—সহযাত্রীদের বিস্ময়। আর ট্রেনেও পুরুষেরা পুরোদস্তুর বিছানা পেতে শয়ান, বউ-মেয়ের জন্য স্রেফ একটা চাদরের বন্দোবস্ত।

দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায় বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো ছবি, চলচ্ছবির সমারোহ: উত্তাপ, অবসন্ন ক'রে দেওয়া দুঃসহ উত্তাপ, ঘাম, বৃষ্টির জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা; পনেরোই জুনের মধ্যে মনসুন এসে না পৌঁছোলে সর্বব্যাপী উদ্বেগ; বারো তারিখে বিদেশীরা টিকে নিয়ে প্রস্তুত; সতেরো তারিখে টিকাদানের কেন্দ্র

মণিরত্নের রাজ্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হীরে জগৎ-বিখ্যাত "হোপ ডায়মন্ড" যে ভারতীয় তা আমার জানা ছিল না। ওয়াশিংটনের যাদুঘরে হোপের যাদু দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য গভীর নীল রং কি অপরূপ জ্যোতি। যাদুর মতই হোপ হীরের বিচিত্র ইতিহাস। ১৭২৮ সাল পর্যন্ত হীরের জন্মভূমি হিসাবে ভারতবর্ষ দুনিয়ায় প্রধান ছিল। সেই যে শুনেছি গোলকুণ্ডার হীরের খনি,

> ঝর্ণা ভরা চুনিমণি,
> সাগর সেঁচে, মাণিক বেছে,
> পরে কেন লয়?

অদ্ভুত ব্যাপার। ভারতবর্ষের কোহিনূর, গ্রেট মোগল, হোপ ডায়মণ্ড কোনটাই আজ আর দেশে নেই। কোহিনূরের কত কাহিনী ইতিহাসের করুণ ক্রন্দনের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার হোপের আকর সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয়েও কোন পথে কি ভাবে সে এমন পরবাসী হয়েছে জানা যায় না। ১৬৬৮ সালে ফরাসী সম্রাটের মুকুটে যে French blue নামক দ্যুতিমান হীরেখানা যোগ করা হয়, সেই French blue চতুর্দশ লুই এর কাছে এসেছিল ভারত থেকে। ভারতের দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ করা আজ ধনী দেশের উপজীব্য কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী একদিন দরিদ্র ছিল না। তাদের সব সম্পদ লুটেছে বলেই আজ সে দরিদ্র। ১৭৯২ সালে হোপ হীরে আবার চুরি হয়ে যায়। কতদিন যে তার হদিস হয়নি তার ঠিকানা নেই। আটতিরিশ বছর পরে ১৯৩০ সালে বাজারে একটি গভীর নীল হীরে দেখা দিল। হীরেটি ওজনে ফ্রেঞ্চ ব্লুর সমান নয়। কিন্তু তার মতই সুন্দর। নানাভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে French blue চুরি হবার পর তাকে টুকরো করা হয়েছে। এটি একটি বড় টুকরো। ইংলণ্ডের হেনরি টমাস হোপ নামে এক ভদ্রলোক এটি কেনেন। তাই নাম হলো হোপ ডায়মণ্ড। হোপ সাহেবের হাতেও হীরে রইল না। হীরে ঘুরতে ঘুরতে চলে এল ধনী মার্কিন রাজ্যের নিউ ইয়র্কে। Mrs Evaly Walsh Mclean নামে এক মহিলার সম্পত্তি থেকে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হীরেটি সংগ্রহ করলেন ও পরে মিউজিয়ামকে উপহার দিলেন। আজ

ওয়াশিংটনের যাদুঘরে রক্ষিত হোপ ডায়মণ্ড

মিউজিয়ামের কক্ষে স্থান পেয়েছে ভারতের অতীত ঐশ্বর্য।
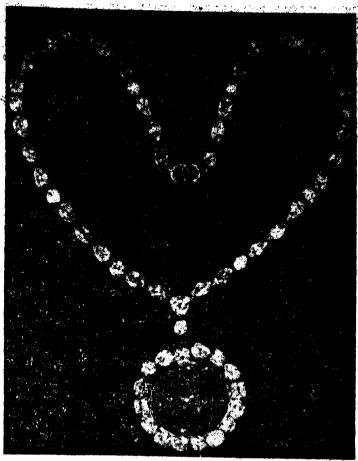
কেবল যে হোপই দেখলাম তা নয়। ভারতের রত্নমণি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। হীরে মাপকাঠি মাত্র। ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়ে যেদিন হোপ হীরের জনক ফরাসী সম্রাটকে দিয়ে নাম দিয়ে ছিলেন French blue সেদিন কজনইবা জানতো তার জন্ম কোথায়। বৈচিত্র্যে আর সৌন্দর্যে আজও হোপ হীরের তুলনা নেই। আকারে বড় অবশ্য কিম্বার্লির কলিনান। কালিনানের নাম হয়েছিল স্যার টমাস কালিনানের নাম থেকে। এ হীরের খনিটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। পরে অবশ্য ট্রান্সভাল সরকার সপ্তম এডওয়ার্ডকে হীরেটি উপহার

জ্যোতিষ গণনার ভুল প্রমাণ করে দিল? কি জানি। হয়তো বা এমন সব ঘটনা থেকেই নীলার নামে আপনার আমার মত সাধারণ মানুষও সাবধান হয়। মণিরত্নের মাঝে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ চিরকাল এক রোমাঞ্চকর ইঙ্গিত পায়। আছে আর কিছু হউক বা নাই হউক, মণিরত্ন ধারণ আরও মোহময় হয়।

ওপাল পাথর বা Opal শব্দটিও প্রাচীন ভারতীয় শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত উপল বা পাথর কথা থেকে Opal-এর উৎপত্তি। কবে কোথায় প্রথম মূল্যবান উপল খণ্ডকে এই নাম দেওয়া হয়েছে জানি না, তবে রোমান আমলে পূর্ব ইউরোপে ছিল Opal-এর আদি অবস্থান। সে সময় ভারতে এই উপল এসে এই নাম হয়তো পেয়েছিল। সেদিন থেকে জ্যোতিষ মতে ওপাল আশার বাহক। শুভাদৃষ্ট আশা করে এই উপল ধারণ করা হত, তাই তার নামই হয়ে গেল উপল বা ওপাল। উনবিংশ শতাব্দীতে অস্ট্রেলিয়াতে কালো ওপাল আবিষ্কার হয়। সাধারণত ওপাল বলতে আমরা সাদা ওপালই বুঝি। অগ্নি উপল-এ একটু কমলা লেবুর আভা আসে এবং পৃথিবীর কোন কোন দেশে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যে লক্ষ্য করে থাকবেন অলংকারের অনেকাংশই মুক্তা হয়। শুক্তিগর্ভজাত এ রত্নও একদিন বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে প্রচুর পাওয়া যেত। পাশ্চাত্ত্য জগতে পারস্যের মুক্তা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ—Oriental pearl। কিন্তু পারস্যোপসাগরের মুক্তার প্রায় সমকক্ষ মুক্তা ভারতীয় ডুবুরি তুলতো একদিন সাগর সেচে। মূল্য পেত সামান্য। সেকালের ভারতবর্ষে পুকুরে মুক্তার জন্ম হত। এখনও ঢাকার পুকুরে পাওয়া কালো মোতি অমূল্য সম্পদ। মিসিসিপি নদীতে যে মিঠে জলের মুক্তো মেলে তার চেয়েও অমূল্য ঢাকার পুকুরের গোলাপী মুক্তো। কালোর তো কথাই নেই।

এতক্ষণ মণিরত্নের আলোচনা করলাম কেবলমাত্র ভারতের অতীত ঐশ্বর্য স্মরণ করে। সাধারণ মানুষের অলংকরণের জন্য ৩,০০০ বছর আগেও স্বর্ণমুক্তোর বিকল্প ছিল। সৌন্দর্যরসিকের বিকল্পের ভাণ্ডার বেড়েছে বই কমেনি। ভূষণপ্রিয়া ভারতীয় মেয়েও আজ আর মহামূল্য রত্নের আশায় অলংকার ধারণ বাদ দেয় না। তবে সব ঐতিহ্যের মত অলংকারও ইতিহাস, ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের অংশ। দুঃখ এই যে, সে ঐশ্বর্য এখন অতীত গৌরব, অন্তত বহুলাংশে। ঘরের সম্পদ পরের দেখার মত কষ্ট কি আর আছে?

টুকিটাকি

দুধ সংগ্রহ করাই একমাত্র শক্ত কাজ নয়। বাড়িতে দুধ যত্ন করে রাখা খুব দরকার। সংগ্রহস্থলে হয়তো দুধ বীজাণুমুক্ত রইল কিন্তু ঘরে সাবধান না হলে বীজাণুমুক্ত থাকবে না।

এজন্য প্রথমত দরকার দুধ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও ঢাকা অবস্থায় রাখা। যদি রেফ্রিজারেটর না থাকে তবে ঠাণ্ডা জলে দুধের পাত্র বা বোতল রেখে মুখে পাতলা কাপড় ঢেকে দেবেন।

রোদে বা গরমে দুধ ফেলে রাখবেন না। দুধ নষ্ট হবার ভয় তো থাকবেই, তা ভিন্ন সূর্যরশ্মিতে দুধের কিছু ভিটামিন নষ্ট হয় এবং দুধের স্বাদ ও ঘ্রাণের পরিবর্তন হয়।

দুধ সহজেই অন্য জিনিসের ঘ্রাণ গ্রহণ করে। কাজেই উগ্র গন্ধের সামনে না ঢাকা দুধ রাখা কোনওক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুধ যদি বোতলে আসে, কখনও সে বোতল দুধ ভিন্ন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করবেন না। দুধ ঢেলেই বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে দেবেন।

বোতল থেকে দুধ ঢেলে আর সে বোতলে ফেরৎ রাখবেন না। দুধের পাত্রটি যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখবেন। একদিনের দুধ অন্য দিনের সংগে মেলাবেন না।

রেফ্রিজারেটর না থাকলে যেখানে দুধ রাখবেন তাতে যেন হাওয়া চলাচল করে ও অন্ধকার কোণ হলে ভাল হয়।

চায়ের জন্য বা কফির জন্য যে দুধদানি ব্যবহার হবে তার মুখ প্রশস্ত হওয়া দরকার ও নীচ অবধি ভাল করে হাত পৌঁছানো দরকার।

এখনও পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকায় দুধ প্রধান। দুধের এতটুকু ফেলা যায় না। দই থেকে নিয়ে পান করা দুধটুকু পর্যন্ত অন্তত সহজ পাচ্য। টানাটানির সংসারে মেঠাই না বানিয়ে দুধটুকু দুধ হিসাবে খরচ হলেই বোধ হয় উপকার বেশী হয়।

শ্রীমতী

Cadbury's
MILK
CHOCOLATE

সন্ধিক্ষণ, জনক ইনসানের বলিষ্ঠ চরিত্র বিভূতিভূষণ ও দীনবন্ধু মিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কয়েকটি জায়গায় লেখক যেন একটু অসঙ্গতি এনে ফেলেছেন। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে দু' এক জায়গায় গরমিল দেখা যায়। ছোট ছোট টুকরো ছবি সংযোজনের ক্ষেত্রে লেখক আর একটু সচেতন হলে খুশী হবো।

মোহাম্মদ মুরসালিন,
জগন্নাথ নগর, ২৪ পরগণা।

॥ ৩ ॥

৬ই ভাদ্রের 'দেশ' এ প্রকাশিত আবদুল জব্বারের 'বাংলার চালচিত্র'র জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। গ্রাম বাংলার একটি দরিদ্র চাষীর জীবনালেখ্য লেখক যে ভাবে এঁকেছেন তা' সত্যই তুলনারহিত। এর পূর্বে আমরা নানাভাবে বাংলার চাষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু এমনভাবে একটি সাধারণ চাষীর সঙ্গে সহজে একাত্ম হতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

একটি রগচটা প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যে একটি শাশ্বত পিতৃ হৃদয় রয়েছে, ইনসান চরিত্রটি সেই কথাই প্রকাশ করতে পেরেছে। আর পরীবানুর দুঃখ। সেতো গ্রাম বাংলার প্রতিটি মায়ের দুঃখ। শিক্ষিত মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারনা কিন্তু একেবারেই অমূলক নয়। গ্রামের একটি মূর্খ ছেলের মুখে লেখক একটি বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই জব্বার সাহেবকে।

তপনকুমার মিত্র
জলপাইগুড়ি

॥ ৪ ॥

'দেশ'-এর পাতায় সম্প্রতি প্রকাশিত তরুণ সাহিত্যিক আবদুল জব্বার লিখিত নিয়মিত ফিচার 'বাংলার চালচিত্র'র প্রতিটি লেখাই মনোযোগ সহকারে পড়ছি। বেশ লাগছে। একটি রচনা পড়ে সাধারণত কোনো লেখক সম্পর্কেই মন্তব্য করা যায় না। তাই কয়েকটি লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ৪১ সংখ্যার 'চাষী বাড়ির সাদিয়া'য় লেখক নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণভাবে উজাড় করে দিয়েছেন। রচনাটির মধ্যে ছোট গল্পের স্বাদ প্রতি ছত্রে বর্তমান। ৪৩ সংখ্যার 'জনক' রচনা সম্পর্কেও ওই একই কথা উচ্চারণ করা যেতে পারে। বস্তুত লেখকের প্রতিটি ফিচারের মধ্যেই গল্প-রসের উপাদান রয়েছে। উপরন্তু বাংলা দেশের নিম্নবিত্ত মুসলিম শ্রমজীবী-কৃষক পরিবারের এমন খুঁটিনাটি বাস্তব চিত্র ইতিপূর্বে কোনো লেখকের লেখাতেই দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এ ধরনের রচনা প্রকাশের জন্য 'দেশ' সম্পাদক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের পাত্র।

আবদুল জব্বারের লেখার গুণ এই যে, তাঁর রচনা ও ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে যাঁদের বিশেষ পরিমাণে পরিচিতি আছে, তাঁরাই জানেন যে, লেখকের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতা-রসে ভরপুর। আর সেই অভিজ্ঞতার বাইরে এক পা-ও বাড়ান না তিনি তাঁর লেখায়।

নুরুল ইসলাম মোল্লা
মুর্শিদাবাদ

ক্যানসারের ওষুধ

৬ই ভাদ্র সংখ্যার "দেশে" শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তীর "কুড় থেকে ক্যানসারের ওষুধ" নামক প্রবন্ধের উপর কিছু মন্তব্য করতে চাই। তিনি বলেছেন যে "তারা (চাম্বা জেলার লাহুলীরা) জানে না অতশত কুড় কোন কাজে লাগে।" এ প্রসঙ্গে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে আমি লাহুলস্পিতিতে সড়ক নির্মাণের কাজে যাই এবং সেখানকার হেড-কোয়ার্টার "কেলং"-এ বেশ কিছুদিন থাকি। তখনই আমার কুড়-এর (আমি অনেককে "কুট" উচ্চারণ করতেও শুনেছি) সহিত পরিচয় ঘটে। এই উপত্যকার লোকেরা কুড় নানা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এমনকি কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী এবং কুলুমানালীর লোকেরা গেঁটে বাত, পিত্তশূল এবং নানারকম ব্যথা বেদনায় কুড় হামেশা ব্যবহার করে থাকে। ওদের দেখাদেখি আমিও আমার মায়ের গেঁটে বাতের জন্য কিছু কুড়ের মূল পার্শেল করে পাঠাই। তার ব্যবহার প্রণালী গেলারাম বলে ওই অঞ্চলের একজন চাষী আমাকে বলে দেয়। তাতেই বুঝা যায় যে ক্যান্সার প্রতি-ষেধক হিসাবে ব্যবহার না জানলেও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক যে কুড়—তা ওদের ভালভাবেই জানা আছে। লাহুলস্পিতি অঞ্চলে এখন ব্যাপকভাবে কুড়-এর চাষ হয়, হয়ত অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু অনেক দিন থেকেই কুড়-এর কিছু কিছু ব্যবহার ওদের জানা আছে। আর অন্য একটি আগ্রহের উত্তরে আমি বলব—কুড়-এর ব্যবহার কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচলের কবিরাজদের বিশেষ জানা আছে এবং তাঁদের নিকট কুড়-এর বিশেষ সমাদর। তবে কুড়-এর উপর নানা বাধানিষেধ থাকায় হয়তো ওরা পরীক্ষা সুযোগ পান না।

পুলিনবিহারী চক্রবর্তী
শিলং-৪

বিদেশের চোখে পথের পাঁচালী

গত ৬ই ভাদ্রের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'বিদেশের চোখে পথের পাঁচালী' নামক রচনাটি পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম। শ্রীচিত্ত-রঞ্জন ঘোষ ঐ প্রবন্ধে বিদেশে বাঙলা উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতকে বাংলার

হো চি মিন

সারা পৃথিবীতে [illegible] ছিলেন [illegible] নিরবিচ্ছিন্ন অক্লান্ত [illegible] এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

হো-চি মিন প্রকৃত অর্থে কবি ছিলেন। লণ্ডনে প্যারিসে যখন তিনি হোটেল বয় কিংবা অন্যান্য ছোট কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন (অনেকদিন খাবার জোটেনি), তখন থেকেই লিখতেন কবিতা, তাতে ছিল রোমান্টিক সুর—পরবর্তীকালে রণাঙ্গনে ব্যস্ত থেকেও তিনি কবিতাকে বিস্মৃত হননি। তিনি উদ্দীপনার কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি নিছক শ্লোগান নয়, তা আন্তরিকতার স্পর্শে সঞ্জীবিত। হো-চি-মিন শেষ কবিতা রচনা করেছেন গত বছর।

বস্তুত, হো-চি-মিনের চেয়ে ব্যস্ত মানুষ অল্প পৃথিবীতে কমই ছিল, কিন্তু কখনো তিনি রসিকতার বোধ কিংবা শিল্প প্রীতি হারাননি। নিজের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেও তিনি 'ঘরে বসে' ছিলেন, শুকনো সন্ন্যাসী হননি।

একটি নাটক নিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড

লণ্ডনের 'মে ফেয়ার' থিয়েটারে দেখানো হচ্ছে নাটকটি, নাম "দা স্পায়েলস অব পয়েন্টন"। এই নাটকের মূল নাট্যকার একদিনও নাটকটি দেখতে যাননি, তাঁর দুই ভাই আমেরিকা থেকে সস্ত্রীক লণ্ডনে এসে-ছিলেন বিশেষত এই নাটকের উদ্বোধন রজনীতে উপস্থিত থাকার জন্য, তাঁদেরও যেতে দেননি, এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে দেখতে বারণ করেছেন।

নাটকটির প্রত্যেক অভিনয়ের আগে ম্যানেজারকে এসে বাধ্যতামূলকভাবে নাট্যকারের একটি বিবৃতি শোনাতে হয় দর্শকদের। নাট্যকারের নাম অধ্যাপক রবার্ট ম্যানজন মায়ার্স। তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন: "আমার নাটক" দা স্পয়েলস অফ পয়েন্টন"-এর রিহার্সাল গত ৩১শে [illegible] এই নাটকটি এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে সত্যিকারের অর্থে এটাকে আর আমার লেখা নাটক বলা যায় না।"

এই বিবৃতি প্রোগ্রাম-বইতেও ছাপানো হয়েছে, দেওয়া হয়েছে প্রাচীর পত্রে। আইনগত ও আর্থিক চুক্তির জটিলতায় নাট্যকারের পক্ষে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, নাটকটিকে জমানোর জন্য, পরিচালক মশাই নাট্যকারের অনুমতি বিনা হেনরি জেমসের নভেল থেকে যথেষ্ট সংলাপ ও দৃশ্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন।" এবং এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, ব্যস্ততার জন্য তিনি নাট্যকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাননি। এবং মজা হচ্ছে এই সব সত্ত্বেও নাটকটি দারুণ জমে গেছে, দর্শকরা ঘন ঘন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে-ছেন অভিনেতাদের।

কলকাতা

জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত "কলকাতা" পত্রিকার নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে। এই পত্রিকাটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, কারণ ইদানীংকালের গুজব প্রিয়তা, যুক্তিহীন মাতামাতি উন্মাদনার মধ্যে

সাংস্কৃতিক পরিচয় : উত্তরবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড)। অশোক মিত্র (সম্পাদনা)। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৬১। দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশানস, সিভিল লাইনস, দিল্লি। দাম ৯·৫০ টাকা। পৃঃ ৩২০।

ভারতের জনগণনা দপ্তর উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৪১৮টি গ্রামের পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে তথ্য সমন্বিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গই একমাত্র স্থান, যেখানে ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভাষী অধিবাসীরা এসে নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালীদের পাশাপাশি বসবাস করছেন। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় মোট ৫৮ থানার বিভিন্ন মেলা, পূজা-পার্বণ ও ধর্মস্থানের বিবরণ মেলার সময়, কেমন করে এই সব জায়গায় যেতে হয় প্রভৃতি তথ্য বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কোন স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানকার পুরাতন ইতিহাসও বলা হয়েছে। ১৫৭৭ সালে শেখ ভীক নামে মালদহের এক ব্যবসায়ী তিন জাহাজ রেশমী বস্ত্র নিয়ে রাশিয়া যাত্রা করেছিলেন, তিস্তায় কতবার বন্যা হয়েছে, কেমনভাবে তিস্তা ধারে খাত পরিত্যাগ করে নূতন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, বাংলার মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মালদহের আদিনাতে মিলবে—এমন বহু তথ্য বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পূর্তমন্ত্রী প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের কোথায় কোন মসজিদ, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, এই বই থেকে তা অনায়াসে জানা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটক-দপ্তরও এই বইটি কাজে লাগাতে পারেন। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারগুলির স্থান সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা হলে পর্যটকেরা দার্জিলিং শহরের বাইরে ঐসব স্থানে যেতে পারবেন এবং তখন স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে কিছু অর্থাগমের সুযোগ হবে। ফরাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধের কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং তখন নিম্নবঙ্গের অধিবাসীরা খুব কম খরচে যাতে মালদহের দর্শনীয় মসজিদগুলি দেখতে পারেন, সেজন্য পর্যটক দপ্তরকে এখন থেকেই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের একটি মূল্যবান বই প্রতিটি লাইব্রেরিতেই রাখা উচিত। মালদহের পাঁচটি মসজিদ, দার্জিলিংয়ের সাতটি বৌদ্ধ বিহার, দুইটি হিন্দু মন্দির ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আলোকচিত্রও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মালদহের 'গম্ভীরা' সম্পর্কে দুটি অধ্যায় বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। কলকাতার যে-২৩টি দোকানে বইটি পাওয়া যাবে, শেষের দিকে আরও একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই বইটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান ও সংকলনের জন্য শ্রীঅরুণকুমার রায় এবং তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসুকুমার সিংহ কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। শ্রীবীরেন সিংহের আলোকচিত্রগুলিও সুন্দর।

(২২৯/৬৯)

প্রাপ্তি স্বীকার

পোস্টার। পোস্টার॥ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শতাব্দী বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ৯এ, নেপাল ঘোষ লেন, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৩·৫০।

জাতির প্রদীপ। যদুপতি ঘোষ। প্রকাশকঃ রোড নম্বর ২৯, হাউস নম্বর ৪, গর্দানীবাগ, পাটনা—৪। মূল্য ৩·০০।

প্রত্যাবর্তন। মনোরঞ্জন ঘোষ। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দিরঃ ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·৫০।

হোমিও-শিক্ষা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। জামতাড়া, এস পি। মূল্য ৪·০০।

চার্লি চ্যাপলিন। অশোক সেন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীঃ ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ৭·৫০।

কালের নির্মম দৃশ্য। কৃষ্ণ ধর। দেবকুমার বসু : ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২·০০।

তারার আলো। সমর দত্ত। মীন প্রকাশনী : ৩৯বি ভেস্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ২·০০।

চৈত্ররথ। শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী। শ্রীমিত্রা দেবী : ৪৭।২ মহেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। মূল্য ৩·০০।

কুটিমলের আইন কানুন। রবীন সরকার। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী : ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

কালীঘাট। বিমল সেন। বিচিত্রা প্রকাশনী : ৫ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

হৃদয় দর্পণে। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। সেবা-ভারতী : পোঃ কাপগাড়ী, জেলা মেদিনীপুর। মূল্য ২·০০।

মেক্সিকো অলিম্পিক হকিতে পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, গঠিত - তথ্যানুসন্ধান কমিটির মন্তব্য ও সমালোচনাকে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা বলীন্দার সিং অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, মেক্সিকোর ব্যর্থতায় আই ও এ-র সভাপতি দায়ী করেছেন সরকার এবং সরকার স্থাপিত নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদকে।

উপেক্ষার অভিযোগ

রাজা বলীন্দার সিং স্বার্থহীন ভাষায় বলেছেন, সাধারণভাবে খেলাধুলোকে এবং বিশেষভাবে হকিকে সরকার ও ক্রীড়া পরিষদ উপেক্ষা করার ফলেই মেক্সিকোতে ভারতীয় হকি দলের পরাজয় ঘটেছে। অভিযোগের সমর্থনে বলীন্দার সিং বলেছেন, হকি খেলোয়াড়দের কোচিং এবং দল গড়ার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে পাকিস্তান যেখানে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে সেখানে নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থা ভারতীয় হকি দলের জন্য ব্যয় করেছেন মাত্র মেক্সিকো যাওয়া-আসার ভাড়া।

অভিযোগ খুবই গুরু ধরনের। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? না, সরকার ও সরকার স্থাপিত ক্রীড়া পরিষদের বিরুদ্ধে, দেশে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য যে পরিষদ গঠিত। কার অভিযোগ? না, স্বয়ং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির। যুক্ত ফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলের মতই ক্রীড়া পরিচালক ও সংগঠকদের এই দলীয় কোন্দল। কিংবা বলা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজা সরকারের রেষারেষির আর এক চিত্র। কেননা, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়েই নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল। অবশ্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার বাইরের কিছু সদস্যও আছেন স্পোর্টস কাউন্সিলে। তাঁরা হয় অতীত দিনের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, না-হয় খেলাধুলোর বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। সুতরাং সমস্ত জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে গঠিত অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, আর ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার। উভয় সংস্থার উদ্দেশ্যও খেলাধুলোর উন্নতি ও প্রসার। কোন পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের প্রতি অভিযোগ বা দোষারোপ খেলাধুলোর বদলে খেলাধুলোর অবনতিকেই ডেকে আনবে।

আমি আগের সপ্তাহেই বলেছি, যতদিন ভারতের হকি খেলোয়াড়রা নৈপুণ্য ও দক্ষতার জোরে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে এসেছেন ততদিন কোন কথা ওঠেনি। ওঠবার কথাও নয়। আজ অন্যান্য দেশ হকি খেলায় অনেক এগিয়ে গেছে। ভারতীয় হকির মধ্যে এসেছে সাময়িক দুর্বলতা। পরাজয়ে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হলেও সেই পরাজয়কে কেন্দ্র করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেশের খেলাধুলোর পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

আই ও এ-র সভাপতি রাজা বলীন্দার সিং ঠিক কথাই বলেছেন। চিরদিন কারো আধিপত্য বজায় থাকে না। বিরাট সাম্রাজ্যের যেখানে পতন ঘটে সেখানে ত্রিশ-চাল্লিশ বছর ধরে বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা হিসাবে বিরাজ করবার পর বিজয় গৌরব হাতছাড়া হবে, এটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। তবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই।

উত্তর কলকাতায় স্টেডিয়ামের দাবি

কলকাতায় বড় আকারের স্টেডিয়াম আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রচিত দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন ছোট আকারের স্টেডিয়ামই শহরের একমাত্র ক্রীড়ানিকেতন। ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতায় স্টেডিয়ামের দাবি উঠেছে। তার জন্য উত্তর কলকাতার ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া পরিচালকদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। কমিটি তাঁদের প্রথম প্রকাশ্য সভায় টালা পার্কে স্টেডিয়াম তৈরির দাবি তুলেছেন। সন্দেহ নেই, সংগত দাবি এবং এ দাবি বড় আকারের স্টেডিয়াম গড়ার প্রতিবন্ধকও নয়। পূর্ণাঙ্গ বড় স্টেডিয়ামের প্রয়োজন অবশ্যই প্রথম। কিন্তু এত বড় শহরে একটি বড় স্টেডিয়াম খেলাধুলোর প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাই উত্তর কলকাতায় কেন, পূর্ব কলকাতায়ও ছোট আকারের স্টেডিয়ামের প্রয়োজন আছে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের, আঞ্চলিক যুবক-যুবতী-দের খেলাধুলোর উন্নতি ও প্রসার এই সব স্টেডিয়ামের মাধ্যমেই হতে পারে। ইউরোপে কলকাতার চেয়ে অনেক ছোট শহরেও তিন চারটি করে স্টেডিয়াম আছে। আর কলকাতায় সবে ধন নীলমণি ওই দক্ষিণ কলকাতার স্টেডিয়াম! খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আমরা সব সময় হাহুতাশ করি। কিন্তু খেলাধুলো করার যথেষ্ট সুযোগ ছাড়া যে খেলাধুলোর উন্নতি হতে পারে না এ কথাটা দেশের কর্ণধারদের মগজে ঢোকে না।

ছায়া পূর্বগামী

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারতের চার দিকের ফুটবল আসরের মধ্যে পূর্ব দিকের আসর অর্থাৎ কলকাতায় ফুটবলই ছিল সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ। এবার কলকাতার ফুটবল লীগ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে, শীল্ডও শেষ হবার পথে। কিন্তু কলকাতার ফুটবলের গণ্ডগোল সরে গেছে আরও পূর্ব দিকে—আসামে। বরদলুই ট্রফির ফাইনাল খেলা পুরোপুরি শেষ হয়নি, যদিও অসমাপ্ত ফাইনালের বিজয়ী হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ট্রফি দেওয়া হয়েছে।

গৌহাটি স্টেডিয়ামে অত্যধিক দর্শক সমাগমই খেলা শেষ না হবার প্রধান কারণ। গতবারের বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল ও গতবারের রানার্স মহমেডান স্পোর্টিং-এর মধ্যে এবারের ফাইনাল খেলা দেখার জন্য এত দর্শক সমাগম হয়েছিল—প্রতিযোগিতার ১৮ বছরের ইতিহাসে যা হয়নি। গ্যালারির সমস্ত আসন ছাপিয়ে দর্শক মাঠের মধ্যে নেমে এসেছিল এবং টাচ-লাইন ও গোল-লাইন অতিক্রম করে ক্রীড়াঙ্গনের চৌহদ্দির

[illegible] হয়ে আয়োজন।

খেলা আরম্ভের পর প্রথমার্ধে মহমেডান দল একটি গোল করে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরা যখন আর একটি গোল করে তখন ইস্ট বেঙ্গল খেলা ছেড়ে নিশ্চিন্তভাবে মাঠের মধ্যে বসে ছিল। কারণ, দর্শক মাঠে ঢোকার আগে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক অশোকলাল(?) দর্শক মাঠ থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত খেলতে অস্বীকার করেছিলেন।

রেফারীর অবশ্য কলরবের আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। বল দিয়ে খেলা আরম্ভ করেছেন এবং বিনা বাধায় মহমেডানের [illegible] গোলও গ্রাহ্য করেছেন। তারপর আর খেলায় প্রশ্ন ওঠে না। ওখানেই খেলা শেষ।

মাঠে দর্শক ঢোকার জন্য সুবিধা অসুবিধা অবশ্য দু' পক্ষেরই সমান ছিল; তবু প্রশ্ন ওঠে, টাচ-লাইন এবং গোল-লাইন অতিক্রম করেও যদি দর্শক ক্রীড়াঙ্গণে ঢুকে পড়ে তবে খেলা চালানো উচিত কিনা। আইনত উচিত নয়। কিন্তু অবস্থা যেখানে হাতের বাইরে এবং যার জন্য দায়ী প্রতিযোগিতার পরিচালকবৃন্দ, সেখানে খেলার পরিচালক সম্ভবত অসহায় হয়ে পড়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে, বরদলুই ট্রফিতে যে নজির সৃষ্টি হল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো! ছায়া যে পূর্বগামী, তাই সন্দেহ।

মার্সিয়ানোর মৃত্যু

কৃতী টেনিস খেলোয়াড় রাফেল ওসুনার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর গত ৩১ আগস্ট বিশ্বজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা রকি মার্সিয়ানোর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিঃসন্দেহে বিমান যাত্রীর অনিশ্চিত জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মহাকালের ডাক কে খণ্ডন করতে পারে! মহামুষ্টিযোদ্ধা মার্সিয়ানোর এটাই ছিল অদৃষ্টের লিখন।

মার্সিয়ানো ছিলেন হেভিওয়েটে অপরাজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিরাট দেহ এবং শালপ্রাংশু বাহুর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের জন্য লোকে তাঁকে 'রক' বলে ডাকত। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত জীবনের ৪৯টি লড়াইয়ের মধ্যে রকি কোন লড়াইতে পরাজয় স্বীকার করেননি এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর নিয়েছেন। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে বিশ্ব থেকেই অবসর নিলেন অদৃষ্টের বিধানে।

ইস্পাত ফুটবল

ছুটির দিন রবিবার (৭-৯-৬৯) ময়দানে তিনটি মাঠে আই এফ এ শীল্ডের ঠাসা খেলোয়াড় [illegible] বল খেলতে নামলেও ওস্তাদ [illegible]। কারণ, ঢাক পাল্টানো বা মন ভোলানো—না খোক কিছু। গিয়েছিলাম রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে হিন্দুস্থান স্টীলের অন্তর্ভুক্ত দুই ইস্পাত কারখানার ফুটবল লড়াই দেখতে। একদিকে অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট, অন্য দিকে দুর্গাপুর স্টীল। কাজকারবারের খাতিরে দুটিই গায়ে গায়ে লাগোয়া ইস্পাত সংস্থা। একটি খোদ দুর্গাপুরে, অপরটির কারখানা পরের স্টেশন ওয়ারিয়ায়।

খেলা দেখতে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়নের সামনে ট্রাক ঘিরে বেশ কিছু দর্শকের ভিড় ছিল। তা ছাড়া অন্যান্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্টেডিয়ামের উঁচু সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তেইশটি চাকুরিয়া বাঙালী খেলোয়াড়ের ফুটবল খেলার বিচারের ভূমিকায় ছিলেন বর্ষীয়ান রেফারি প্রতুল চক্রবর্তী। নব্বুই মিনিটের এই ফুটবল আসরের মান কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসন লীগের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তবে বর্ষায় বেড়ে ওঠা লম্বা ঘাস, মাঠের দই-কাদা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপসর্গগুলিও খেলার গতিকে রুখবার চেষ্টা কম করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোটামুটি ছবি হিসাবে বলা যায়, মিশ্র ইস্পাতের ফরোয়ার্ডেরা মুহুর্মুহু বিপক্ষ গোলে হানা দিয়ে তিনটি গোল করেছে। এরই ফাঁকে দুর্গাপুর একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়েছে। দু' দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কলকাতার ময়দানে বহু পরিচিত মুখ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি ও সুখেন কুণ্ডুকে দুর্গাপুরের হয়ে খেলতে দেখা গেল। তবে দুজনের খেলার সেই আগের ঔজ্জ্বল্য আর নেই। এ ছাড়া উঠতি খেলোয়াড়দের ঝাঁকে মিশ্র ইস্পাতের অন্যতম স্তম্ভ সৌরেন রায় ও খর্বকায় লেফট উইং ফরোয়ার্ড কমল মুখার্জি দর্শকদের মন কেড়েছেন। কলকাতা ময়দানের বাইরে থেকেও এঁদের ফুটবল তৎপরতায় এত পালিশ সত্যিই প্রশংসনীয়। অ্যালয় স্টীলের অধিনায়ক বিবেচিত বেস্ট প্লেয়ার করুণা মুখার্জি তো ভাল খেলেছেনই।

ও'দের উন্নত ক্রীড়ারীতির খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুটি দলই প্র্যাকটিসড সাইডস। তবে অ্যালয় স্টীলের তৎপরতা আরো একটু বেশী। কারণ, তাঁদের ফুটবল উৎসাহের বয়স মাত্র দু' বছর। এরই মধ্যে খেলোয়াড় যোগাড়, কোচিং চালিয়ে এক পক্ষকাল আগে তাঁরা আসামের লোকপ্রিয় বরদলুই ট্রফিতে কলকাতার শক্তিশালী ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে প্রায় সমানে যুঝেছেন। বড় কথা, উভয় দলের খেলার মেজাজে এমনি একটা প্রাণবন্ত ছাপ ছিল, যা কলকাতার দুই অফিস লীগ নক-আউট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব সময় দেখা যায় না।

একলব্য

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

১২। যদি ভুলবশত যে খেলোয়াড়ের সার্ভিস করার কথা সে সার্ভিস না করে অন্য খেলোয়াড় সার্ভিস করে, কিংবা যে সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস হয় এবং সেই সার্ভিসের পর র‍্যালিতে 'ইন সাইড' পয়েন্ট পায় তবে পয়েন্ট গণ্য হবে না। আবার সার্ভিস করে খেলা আরম্ভ হবে যদি পরের সার্ভিস করার আগেই ভুল খেলোয়াড়ের সার্ভিস বা ভুল কোর্ট থেকে সার্ভিস করার জন্য 'লেট'-এর দাবী করা হয় কিংবা আম্পায়ার 'লেট' অনুমোদন করেন।

যে কোর্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস রিসিভ করার

সার্ভিস করার সময় সাটল কোমরের লাইনের উপরে থাকাতে যদি র‍্যাকেটে ও সাটল-এর সংঘাত হয় তবে 'ফল্টস' হবে

কথা সে কোর্টে না দাঁড়িয়ে ভুল কোর্টে দাঁড়িয়ে যদি কোন খেলোয়াড় সার্ভিস রিসিভ করে এবং তারপর র‍্যালিতে 'আউট সাইড' পয়েন্ট পায় তবে একইভাবে সে পয়েন্টও বাতিল হয়ে আবার সার্ভিস দ্বারা খেলা আরম্ভ হবে যদি পরের সার্ভিসের আগেই 'লেট'-এর দাবী করা হয় বা আম্পায়ার 'লেট' অনুমোদন করেন।

ভুল খেলোয়াড়ের সার্ভিস, ভুল সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস করা এবং ভুল কোর্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস রিসিভ করার এই সব ক্ষেত্রে যাদের ভুল হবে তারা যদি র‍্যালিতে পয়েন্ট না পায় তবে ভুল ভুল হিসাবেই থেকে যাবে এবং গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলোয়াড়দের ভুল অবস্থান সংশোধিত হবে না।

যদি অনবধানতাবশতঃ কোন খেলোয়াড় সার্ভিস কোর্ট বদল করে এবং পরের সার্ভিস হবার আগে সে ভুল ধরা না পড়ে তবে এ ক্ষেত্রেও খেলোয়াড়ের ভুল অবস্থান ভুল হিসাবেই থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে 'লেট'-এর দাবী করা যাবে না, আম্পায়ারও 'লেট' অনুমোদন করবেন না। গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলোয়াড়ের অবস্থানও সংশোধন করা হবে না।

১৩। সিঙ্গলস-এর খেলায় ৯ নম্বর আইন এবং ১২ নম্বর আইন-এর সকল ধারাই প্রযোজ্য হবে। ব্যতিক্রম শুধুঃ

(এ) যখন পয়েন্ট থাকবে শূন্য বা কোন জোড় সংখ্যায় তখন খেলোয়াড় তাঁর ডান সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস করবেন এবং যিনি সার্ভিস রিসিভ করবেন তিনিও তাঁর ডান সার্ভিস কোর্টে দাঁড়িয়ে সার্ভিস রিসিভ করবেন। আর যখন পয়েন্ট থাকবে বিজোড় সংখ্যায় তখন খেলোয়াড় সার্ভিস করবেন তাঁর বাম সার্ভিস কোর্ট থেকে, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় সার্ভিস রিসিভও করবেন তাঁর বাম সার্ভিস কোর্টে দাঁড়িয়ে।

(বি) দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীই প্রতি পয়েন্ট সংগৃহীত হবার পর সার্ভিস কোর্ট বদল করবেন। অর্থাৎ পয়েন্টের সংখ্যা অনুসারে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাবেন, না হয় বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাবেন।

ফল্টস বা আইনগত ভুল

১৪। 'ইন' সাইডের (সার্ভিসে বা খেলায়) যদি আইনগত ত্রুটি বা ভুল হয় তবে সার্ভিস করার অধিকার চলে যাবে। যদি 'আউট' সাইডের খেলায় আইনগত ভুল-ত্রুটি হয় তবে 'ইন' সাইড পয়েন্ট পাবে।

আইনগত ভুল-ত্রুটিঃ—

● (এ) সার্ভিস করার সময় যখন র‍্যাকেট ও সাটল-এর সংযোগ হবে, অর্থাৎ যখন সাটলে আঘাত করা হবে তখন সাটল যদি খেলোয়াড়ের কোমরের উপর থাকে, কিংবা (সার্ভিসের বেলায় সাটল আঘাত করার সময় যদি র‍্যাকেটের মাথা হাতের (যে হাতে র‍্যাকেট ধরা থাকে) কোন অংশের উপরে উঠে যায় তবে আইনগত ভুল অর্থাৎ 'ফল্টস' হবে।

(বি) সার্ভিস করার পর সাটল যদি ভুল কোর্টে পড়ে (অর্থাৎ যিনি সার্ভিস করছেন তার কোনাকুনি বিপরীত কোর্টে না পড়ে), কিংবা সাটল যদি শর্ট সার্ভিস লাইনের আগে পড়ে অথবা লং সার্ভিস লাইন পেরিয়ে গিয়ে পড়ে বা যে সার্ভিস কোর্টে সাটল পড়বার কথা সেই সার্ভিস কোর্টের সাইড বাউণ্ডারি লাইনের বাইরে সাটল পড়ে তবে ফল্টস হবে।

(সি) পয়েন্টের সংখ্যা অনুযায়ী যে সার্ভিস কোর্ট থেকে সার্ভিস করার কথা, সার্ভিসের সময় সেই সার্ভিস কোর্টের মধ্যে যদি সার্ভারের দুই পা না থাকে কিংবা ওই কোর্টের কোনাকুনি বিপরীত কোর্টে দাঁড়িয়ে যাঁর সার্ভিস রিসিভ করার কথা—সার্ভিস

দুটি চিত্রের উপরের চিত্রে সার্ভিস করার সময় র‍্যাকেটের মাথা হাতের লাইন থেকে উপরে উঠে গেছে, এটা ভুল সার্ভিস, অর্থাৎ 'ফল্টস'। নীচের চিত্রে র‍্যাকেটের মাথা হাতের কোন অংশের উপরে ওঠেনি। এটা ঠিক সার্ভিস

না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুই পা যদি ওই কোর্টের মধ্যে না থাকে তবে ফল্টস হবে।

(ডি) যদি সার্ভিস করার আগে বা সার্ভিস করার সময় কোন খেলোয়াড় ভড়কি দেবার চেষ্টা করে বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করে তবে 'ফল্টস' হবে।

(ই) যদি সার্ভিসের সময় বা খেলার সময় সাটল কোর্টের বাউণ্ডারির বাইরে পড়ে কিংবা জালের নীচ দিয়ে অথবা জালের মধ্য দিয়ে যায় বা জাল অতিক্রম করতে অসমর্থ হয় অথবা হলের ছাদ বা দেওয়াল স্পর্শ করে কিংবা স্পর্শ করে কোন খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়ের পোশাক তবে 'ফল্টস' হবে। (সাটল যদি লাইনের উপর পড়ে তবে কোর্টের মধ্যে পড়েছে বলে ধরতে হবে। সার্ভিসের সময় সার্ভিস কোর্টের বাউণ্ডারি লাইনও ওই কোর্টের অন্তর্ভুক্ত)।

মুকুল

অরণ্যদেব
লী ফক

ভুতুড়ে টিপিকে রেড-ইনডিয়ানরাও এড়িয়ে চলত .....

পরে, নবাগত সাদা মানুষদের কানেও নানান কথা পৌঁছতে লাগল।
রেড-ইনডিয়ানরা বলে, ওই টিপিটা ভুতে-পাওয়া।
তাহলে ওটার কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।

এই বিশ শতকেও -
ওই টিপির উপর দিয়ে উড়তে চাইনা।
না-ওড়াই ভাল, ক্যাপটেন!

ভুতুড়ে টিপির উপরে অরণ্যদেব ও ডায়না - - -
কথা দিয়েছিলে, কী করে এই প্রাচীর গড়া হল, আমাকে বলবে। তাহলে চুপ করে আছ কেন?
আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক ডায়না।

এ-গল্পের সূচনা প্রথম - অরণ্যদেবেরও জন্মের আগে।
বলো কী!

'স্পেনের তখন স্বর্ণযুগ। তার নাবিকরা তখন সাত-সমুদ্র চষে দিয়ে ফিরছে'
আমি জাহাজের কাজ করতে চাই।
ওই জাহাজটায় লোক নেবে।
অদ্ভুত ছেলে!
?
1/9

পাগলা ক্যাপ্তানের কাছে ওকে পাঠালে কেন? বাচ্চা ছেলেটাকে মারতে চাস নাকি?
বিদেশী ছেলে! মরুক গে!

শুনলুম আপনার জাহাজে লোক নেওয়া হবে। আমাকে নেবেন?
তা নিতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা বড় বিপজ্জনক।

আমি বিপদকে ভয় পাই না, ক্যাপ্তান।
সাবাশ! কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভিনদেশী। তা হোক গে, তোমাকে আমি কাজ দিলুম। কিন্তু মনে রেখো, আমরা হয়ত নাও ফিরতে পারি!

আপনার নামটা আমি জানতে পারি, স্যার?
ক্রিস্টোফার কলম্বাস। এবারে কাজে লেগে যাও।

'আধ কালো' (পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি) ছবির একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও ছায়া দেবী

॥ চিত্র-সমালোচনা ।

প্যার কা সপনা

'প্যার', শব্দ বিশিষ্ট নামের হিন্দী চিত্র মাত্রই যে রুটিন-মাফিক প্রেম ও ভিলেনির ব্যাপার হবে এমন নয়। অন্তত হৃষীকেশ মুখার্জি'র প্যার কা সপনা তাই প্রমাণ করে। তবে "প্যার" বস্তুটির এমন দশা হয়েছে হিন্দী ছবিতে যে হৃষীবাবুর ছবির নামেও "প্যার" দেখে আর কেউ না হোক রুচিবান দর্শকরা প্রথমে ঘাবড়ে যেতে পারেন। অবশ্য মডার্ন পিকচারস-এর এই ছবির কাহিনী-বস্তু যে খুব আধুনিক বা জীবনসম্মত তা নয়। তবে হিন্দী সিনেমার "প্যার"-জগতে কিছুটা তো নতুন বটেই। তা ছাড়া, হৃষীকেশ মুখার্জি'র পরিচালনার গুণ তো অস্বীকার করা যায় না। অবাস্তবতার মধ্যেও রস-সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর আছে।

ছবির আরম্ভ এমন নায়িকাকে নিয়ে যে সিনেমারই মেয়ে, মাটির জগতের নয়। এযুগের তরুণী, রোজ গীতা পাঠ করে, সংস্কৃত কাব্যও সে অধ্যয়ন করেছে, এক কথায়, সংস্কৃত সাহিত্যই তার পাঠ্যবস্তু, ইংরেজী বলতে "ইয়েস" ও "নো" ছাড়া আর কিছু জানে না। অথচ সে এ যুগেরই মেয়ে, জ্ঞানের স্পৃহা কিংবা সাহিত্যপ্রীতি থাকলেও সে সংস্কৃতের বাইরে কোন কিছু অধ্যয়ন করতে বুঝি নারাজ। অর্থাৎ নায়িকা সুধাকে তৈরি করা হয়েছে ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শের ছাঁচে। তার বিয়ে হয়েছে রমেশের সঙ্গে—যে বিলেতের মোহে অন্ধ, আলো মডার্ন মেয়েই তার পছন্দ। রমেশের বাবা জোর করে তাকে বিয়ে দিয়েছেন সুধার সঙ্গে। সে কোনদিন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়নি, শুধু গলার স্বরই শুনেছে। দু'একদিনের মধ্যেই সে বউকে ছেড়ে লণ্ডনে পালিয়ে যায় (আসলে বিলেত যাবার টাকার লোভেই সে বাবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল)। চিরকুটে লিখে যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদেও তার আপত্তি নেই।

এর পর সুধার জীবনে একের পর এক নাটকীয় পরিস্থিতি। সুধা হয়েছে সুষমা—অর্থাৎ পিতৃপ্রতিম আশ্রয়দাতার (অশোককুমার) শিক্ষা-দীক্ষায় সুধা একেবারে পুরোপুরি আধুনিকা সুষমা হয়ে উঠেছে। রমেশের খোঁজে সুষমা গেছে লণ্ডনে। সুষমার রূপ-গুণ দেখে তার প্রতি রমেশ প্রথম দৃষ্টিতেই আসক্ত। তারপর অনুভব করেছে, এমন মেয়ের অপেক্ষাতেই সে ছিল। তাদের মিলন হয়েছে অবশ্য দেশে ফিরে। সুধা তথা সুষমার আশ্রয়দাতা অভিভাবক চেয়েছিলেন, রমেশকে বাড়িতে এসে সুধাকেই গ্রহণ করতে হবে, সুষমাকে নয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছেও তাই, এর মধ্যে কিছুটা 'সাসপেনস'-এর আমেজ আছে।

সুধা ও সুষমা তথা নায়িকার দুই রূপ ও পরিচয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে কি? সামান্য আভাস অবশ্য আছে, কিন্তু সুরূপা চিত্রাঙ্গদার মত সুষমাকে তো আর বিড়ম্বিত হতে হয়নি তাই ধার-করা রূপ ও গুণ তার কাছে বোঝাও হয়ে ওঠেনি। বরঞ্চ চিত্রকাহিনীর এই অংশে পিগম্যালিয়ন-এর প্রভাব বেশী। আর মূল বস্তু যেটা—বাইরের আকর্ষণে তাড়িত নায়ক আর অন্তরের সৌন্দর্যে স্থিত নায়িকা এবং পরিণামে কল্যাণের পথে বিভ্রান্ত নায়কের প্রত্যাবর্তন—গল্প-সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে তাও বহু পুরনো। তবু সাহিত্যের উপাদান কিছু পরিমাণে ইতস্তত ছবিতে ছড়িয়ে রয়েছে। হিন্দী ছবির কতকগুলি মামুলি নিয়ম সেগুলি নিয়ন্ত্রিত না হলে কিংবা মোটা দাগের নাট্যরসের বস্তু না হয়ে উঠলে ছবির ঘটনাপুঞ্জ ততটা অবাস্তব মনে হত না। তা ছাড়া বহুসংখ্যক দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান (প্লেন লণ্ডন ও ভেনিতাতেও বাদ যায়নি) এবং অতিরিক্ত চরিত্র ও ঘটনা সাজাতে হয়েছে। তাই বহু অংশে ছবিটি গতানুগতিকতার অধীন, সাহিত্যের উপাদান সত্ত্বেও কাহিনী হয়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য। তবে হৃষীকেশ মুখার্জি'র পরিচালনা যে তাতে কোন কোন মুহূর্তে ভিন্ন মাত্রা বা 'ডাইমেনশন' এনে দিয়েছে তা আগেই বলেছি। উল্লেখযোগ্য, প্লেনে নায়িকার দ্বিতীয় বিয়ের সেই দুঃস্বপ্ন। এটা মামুলি ফ্যান্টাসি নয়, নায়িকার মনোবিশ্লেষণ। আসল কথা, ছবিতে নাটক জমেছে, এবং তাই, ছবিটিও উপভোগ্য। হিন্দী ছবির নিয়মিত দর্শককে "প্যার কা সপনা" নতুন স্বাদ তো দেবেই। ইস্টম্যান কালারে বিদেশের বহির্দৃশ্যও চমৎকার তোলা হয়েছে।

অভিনয়ও সকলেরই ভাল। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও মালা সিংহ, অশোককুমার, হেলেন (নতুন ধরনের চরিত্রে) বিপিন গুপ্ত প্রমুখ সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছেন। অনেক দিন পর জনি ওয়াকারকে ভাল লাগবে। সংগীতপরিচালক [illegible] চিত্রগুপ্ত—দু'একটি গান শুনতে ভাল।

আনমল মোতী : রাজেন্দ্রনাথ ও অরুণা ইরানি

আনমল মোতী

যে-সব অসম্ভব কাজ "আনমল মোতী"-র পাত্রপাত্রীরা সম্পন্ন করেছে তা, পরিচালক এস ডি নারং ভাল করেই জানেন, একমাত্র অঘটনঘটনপটীয়সীর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। তা-ই ছবির শুরুতেই মন্দিরে দুর্গা মাতার মূর্তি দেখানো হয়েছে, এবং মহামায়ার অনুগ্রহপ্রার্থী গোকুল নামে যে ব্যক্তিকে (নায়িকার ঠাকুরদা) দেখানো হয়েছে সে বৃদ্ধ বয়সে এক একবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে এবং জলের তলা থেকে সকল বিপদ তুচ্ছ করে আনমল মোতী নিয়ে ফিরে আসছে। ডুবুরি সম্প্রদায়ের নেতা গোকুল (জয়ন্ত) সমুদ্রের নীচে গেলে আর ফিরবে না এই আশঙ্কার কথাই ডাক্তার বলেছিলেন। তার অসুস্থতাও আগে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গোকুল দেবীর কৃপায় অবলীলায় সমুদ্রতল থেকে মোতি কুড়িয়ে এনে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। বিপদের এই ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছে তার নাতনি রূপার (ববিতা) সঙ্গে জমিদারপুত্র বিজয়ের (জীতেন্দ্র) বিয়ের অসম্ভব শর্ত পালনের জন্য। জমিদারবাবু জানতেন, বৃদ্ধের পক্ষে এই শর্ত পূরণ একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু যখন তা সম্ভব হল তখন তিনি অন্য এক ফাঁদ পাতলেন। বিয়ের দিন গোকুলের মোতি চুরি হল, প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বিয়ের পণ যোগাতে সে অক্ষম। মায়ের নাম ভরসা করে সমুদ্রে আবার ঝাঁপ দিল গোকুল, এবং আবার মোতি নিয়ে ফিরল। জীতেন্দ্র-ববিতার মিলন হল। পরে অবশ্য নীতিকথা রয়েছে যে, আনমল মোতী আসলে সাচ্চা মনুষ্যত্ব—যা গোকুলের আছে। কুচক্রী ও লোভী জমিদারও এই সত্য মেনে নিয়েছেন।

ভারতের প্রথম "আণ্ডার ওয়াটার ছবি", অর্থাৎ জলের তলের ঘটনাই বেশী। অতএব পরিচালক এস ডি নারং যদি একটি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাতে দোষ কী। যে-সব ঘটনা স্থলে ঘটতে পারত—যেমন, নায়ক-নায়িকার প্রেমবিলাস অথবা মেয়ের সঙ্গে মেয়ের ও পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মারামারি কিংবা শেষ সময়ে অক্টোপাস বধের ভিতর দিয়ে নায়কের বীরত্ব—সে-সব কিছুই জলে ঘটেছে। কারণে-অকারণে নায়ক-নায়িকা জলে ঝাঁপ দিয়েছে; অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছাড়াই তারা জলে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে। কী স্বাভাবিক আর কী অস্বাভাবিক, কী সম্ভব আর কী অসম্ভব ইত্যাদি বিচারের কোন বালাই রাখেননি পরিচালক। জলের তলের ব্যাপার, তাই নির্জলা 'সেক্স' দেখাবার সুযোগও পেয়েছেন তিনি খুব।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, আনমল মোতীর ডুবুরিরা যত অসাধ্য ব্যাপারই সাধন করে থাকুক, আসলে অসাধ্য সাধন পরিচালকেরাই। "আণ্ডার ওয়াটার" দৃশ্যের টেকনিক্যাল কাজ এদেশের দর্শকদের অবাক করবে। ছবির টেকনিক্যাল কর্ম আগাগোড়াই উঁচুদরের, ক্যামেরাম্যান ও চিত্র-সম্পাদকের কাজও বিস্ময়কর। প্রশ্ন এই, এত সব কৃতিত্ব কিসের জন্য? কাহিনী কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত না? অন্যদিকে, ববিতাকে ডুবুরির কন্যা (পরে ওরা হয়েছে জেলে) বলে মেনে নেওয়া যায় কি? এই রূপ, সফিসটিকেশন, বেশবাস (তাঁর গায়ে আধুনিকার ব্লাউজ), কথা বলার ভঙ্গি ও প্রেম নিবেদনের ধরন কি কখনও ডুবুরি-কন্যার পক্ষে মানানসই? অনেক কিছুই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে হিন্দী চিত্রে 'এনটার-টেনমেনট' বলতে যা বোঝায় তা "আনমল মোতী"-তে প্রচুর আছে। আর রয়েছে সুন্দর সুরের গান—যে-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সংগীত-পরিচালক রবি।

চলচ্চিত্রে "রজদা"

রূপদর্শীর বহুপঠিত রসরচনা "রজদার গল্প-সমগ্র"-র নায়ক রজদা ছবিতে আত্ম-প্রকাশ করছেন। "গল্প-সমগ্র"-র চিত্রস্বত্ব কিনেছেন সংগীতশিল্পী মান্না দে। এটাই হবে তাঁর প্রথম চিত্রপ্রযোজনা।

টলি-টিপ্পনী

অনেক দিন বাদে আবার ছবিতে গান গাইলাম", বললেন পাহাড়ী সান্যাল, "মানিকের (সত্যজিৎ রায়) ছবি, অরণ্যের দিন রাত্রি।" উত্তমকুমারের বার্থ-ডে পার্টিতে আচমকা কথাটা উঠল। গত ৩ সেপ্টেম্বর উত্তমবাবুর জন্মদিন উপলক্ষে সুপ্রিয়া দেবী তাঁর ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে এক রাজকীয় পার্টির আয়োজন করেন। পার্টিতে একজন পাহাড়ীবাবুকে গান করতে অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে পাহাড়ীবাবু ঐ কথা বললেন। "শেষ গান কোন ছবিতে গেয়েছিলেন?" জিজ্ঞাসা করলাম। স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে শ্রীসান্যাল জবাব দিলেন, "দূর ছাই। সেকি আর মনে আছে?" "বোধ হয় 'শাপমোচন।'" মন্তব্য করলেন উত্তমকুমার।

ছবিতে পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া গান একদা লোকের মুখে মুখে ফিরত। অনেক কাল উনি গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি সত্যজিৎবাবুর অনুরোধে আবার গান করলেন "অরণ্যের দিন রাত্রি"-তে। "কী গান?" জিজ্ঞাসা করলাম। "অতুল প্রসাদের "সে ডাকে আমারে...।" পাহাড়ী সান্যাল জানালেন, "কোন যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতা ছাড়া স্রেফ খালি গলায় গাইতে হয়েছে।"

পার্টিতে পাহাড়ী সান্যাল ছাড়া ছবির জগতের বিশেষ কেউ ছিলেন না। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া বাইরেরও কেউ ছিলেন না বললেই হয়। তবে বাইরে থেকে উপহার এসেছিল প্রচুর। ফুলে ফুলে সারা বাড়ি ছেয়ে গিয়েছিল। উত্তম হাসছিলেন, সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে গল্প করছিলেন, ওঁকে ভীষণ স্বাভাবিক লাগছিল। একজন একটা মালা নিয়ে ঢুকলেন। মালাটি উত্তমবাবু "ভরত মুনিস্ম (দিল্লীর অ্যাওয়ার্ড) স্ট্যাচুর গলায় পরিয়ে দিলেন।

রাত দশটার পর পার্টি অ্যাটেন্ড করতে এলেন তরুণকুমার ও সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুব্রতার সেদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্টারে শো ছিল। শোয়ের পর পার্টিতে এলেন। তরুণ এসে তাঁর দাদাকে বললেন, "ওঃ কী দিনই তুই জন্মেছিলি? শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। প্রযোজক দিলীপ ভট্টাচার্য ও অসীমা ভট্টাচার্য এলেন আরো পরে। তখন হারমোনিয়ম খোলা হল। অসীমা দেবী গান ধরলেন। 'চৌরঙ্গী'র গান। পর পর তিন খানা গানের পর সকলে উত্তমকুমারকে গাইতে অনুরোধ করলেন। রাত্রির তৃতীয় যামে উত্তম গাইলেন, "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।"

*

ডিস্ট্রিবিউটারদের অফিসে কত গল্পই না হয়। ইন্ডাস্ট্রীর যাবতীয় মুখরোচক গল্প হামেশাই এখানে শোনা যায়। তিলকে তাল করে কত কথাই না আলোচিত হয়। আলোচনার রীতি নীতিও বড় অভিনব। সেদিন অনৈক ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে বসে শুনছিলাম, অনেকা নায়িকার হাতে কেন কম ছবি তার কারণের কথা। একজন বললেন, নায়িকাটি দাম্ভিক। দাম্ভিকতার জন্যেই নাকি ঐ নায়িকাকে নিয়ে কেউ কাজ করতে চায় না। "ফিল্মে কাজ পেতে হলে শিল্পীকে ঘরে-বাইরে সর্বত্র অভিনয় করতে হবে। কাউকে ভালো না লাগলেও তার সঙ্গে হেসে কথা বলতে হবে।" একজন দাবি করলেন। অবাক হয়ে বললাম, "অর্থাৎ একটা মুখোশ পরে চলতে হবে বলছেন?" পরিবেশক মহাশয় হেসে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ মুখোশ। ভদ্রতার মুখোশ।" "ভদ্র বলেই অমুক নায়িকার হাতে এখন অনেক কাজ।" আরেকজন মন্তব্য করলেন।

—বিদূষক

কিশোরকুমারের 'প্রেম বিভ্রাট'

কিশোরকুমার একটি বাংলা ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সংগীত পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্বও তাঁর। গত ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কিশোরকুমারের প্রথম বাংলা ছবি 'প্রেম বিভ্রাট'-এর মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কিশোরকুমার, অপর্ণা সেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রবি ঘোষ, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ ছবির প্রধান শিল্পী। ছবির কিছু দৃশ্য বোম্বাইয়ে গৃহীত হবে।

"প্রেম বিভ্রাট" ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে জহর রায় ও তরুণ ব্যানার্জিকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক কিশোরকুমার

মেঘ কালো

পি এস ফিল্মসের "মেঘ কালো" ছবিটির প্রথম পর্বের শুটিং শেষ হয়েছে। এখন চলছে বহির্দৃশ্য গ্রহণের তোড়জোড়। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল মুখার্জী। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : সুচিত্রা সেন, বসন্ত চৌধুরী, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, মঞ্জিনা দেবী, বনানী চৌধুরী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, শিশির মিত্র, বেচু সিংহ, রবীন ব্যানার্জী, দীপিকা ব্যানার্জী, অসীম চক্রবর্তী প্রভৃতি। এ ছবির প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই বিচিত্রা

খোসলা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সুরের গুঞ্জন উঠেছে। দেশের শতকরা নব্বইটি ছবিই সেন্সরের কাঁচির শিকার হয়, সুতরাং 'সেন্সর বোর্ড একটু উদার হবে' এ ঘোষণা শুনে সবচেয়ে উৎফুল্ল যম্বের চিত্র নির্মাতরাই হয়েছেন। একদল তো সোজা বলছেন যে, "এবারে সেন্সরের কাঁচি ভোঁতা হয়েছে আর আমাদের পায় কে। অন্যদল বলছেন, "সেন্সরের কাঁচি মোটেই ভোঁতা হয়নি, ওরা এবার কাঁচি ধারিয়ে ধরেছে, ভাল করে খোসলা রিপোর্ট পড়ে দেখ, ওপর ওপর উদারতা দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে তারা শক্ত হয়েছে সেন্সর বোর্ড। ঐ সব একটি কথা প্রযোজক ঘোষে চুম্বন ও নগ্নতা, যা অন্য কিছু [illegible] পাবে' ঐ 'প্রয়োজন হলে, কদাচিৎ পেতেছে সেন্সরের

হবার নমন্ত [illegible]। [illegible] কি [illegible] আর কি [illegible] এখনো [illegible] হবার [illegible]।"

এ [illegible] অভিনেতা অভিনেত্রী বিরজিত। এই অভিনেতা অভিনেত্রীরা চিত্রজগতের অধিবাসী হলেও তবুও তাঁদের ইমেজকে কলঙ্কের ছোঁয়ায় নষ্ট করতে চান না। বেশ কয়েকজন নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী রূপালী পর্দায় চুম্বনের বিরুদ্ধে, নগ্নতার বিরুদ্ধে। বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে খোসলা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর আর এক নতুন স্টার সিসটেমের জন্ম হল। এই নতুন স্টার সিসটেমের নাম নগ্নতা, যৌন উত্তেজনা। যাঁদের বর্তমানে নাম এবং দাম আছে- তাঁরা এই নগ্নতা এবং যৌন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকতে চাইছেন, আর যাদের দাম কম এবং নাম নেই তারা এই নগ্নতা এবং যৌন উত্তেজনার সিঁড়ি বেয়ে অর্থ-লক্ষ্মীর চিলে কোঠায় ওঠার স্বপ্ন দেখছেন। ছোটদের এই স্বপ্ন বড়দের কাছে দুঃস্বপ্নের মত।

কয়েকজন নায়ক/নায়িকা যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের ব্যাপারটা অন্যরকম। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে যতই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থাক, কথায় কথায় বাড়িতে যতই ককটেল পার্টির আয়োজন হোক— যখন পাবলিক ইমেজের প্রশ্ন আসে তখন প্রায় সকলের মুখেই ঐ এক কথা, "হাম উস দেশকে বাসী হৈ জিস দেশ মে গঙ্গা বহতী হ্যায়।" সুতরাং বুঝতেই পারছেন।

দুষ্ট লোকেদের মুখে শুনলাম খোসলা কমিটির উদার রিপোর্ট পাঠ করে সবচেয়ে বেশী আশাহত হয়েছেন, অভিনেতা-লেখক-প্রযোজক-পরিচালক-নেতা শ্রী আই এস জোহর। সিনেমা লাইনের খবর যাঁরা মোটামুটি রাখেন তাঁরা সবাই জানেন যে শ্রীজোহর 'দ্য কিস' বা চুম্বন নামে একটি শর্ট ফিল্ম তুলতে শুরু করেছেন কিছুদিন যাবত। এই ছোট্ট ছবিটির তৈরির কথা শ্রীজোহর মুখ্যত ভেবেছিলেন ভারতীয় সেন্সর পদ্ধতির সঙ্গে এক হাত লড়বার জন্য। এখন শ্রীজোহরের মনে হচ্ছে যে ভারতীয় সেন্সর বুঝি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, সুতরাং ভিফাই করার সেই চার্ম আর রইলো না। সেই কারণে শ্রীজোহর নাকি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন।

মিনার্ভা সিনেমায় "ব্রুস্ লী" এখনও চলছে—ছবিতে ডার্লিনা ব্যাকলো

সরল শর্মা

গোদরেজ অনুষ্ঠানে চিত্রপ্রদর্শনী ও নৃত্যনাট্য

মহাত্মা গান্ধী এবং গোদরেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা আরদেশির বি গোদরেজের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ৩ সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে এক অনুষ্ঠান হয়। তাতে দুটি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র- 'এমারজেনস অব গান্ধী' (গান্ধীর আবির্ভাব) এবং 'দি গোদরেজ স্টোরি'—দেখানো হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আগমনের পর থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত গান্ধীজীর কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার ভিত্তিতে গান্ধী-চিত্রটি নির্মিত। কিন্তু এই চিত্রে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিচয়টি পাওয়া যায়। স্টীল কটোর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সম্পর্ক যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে তেমনি ভারতের মুক্তি-আন্দোলনপর্বের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা এতে রয়েছে। এক কথায়, সুপরিচালিত এই ছবিটি দর্শকের মনকে দেশাত্মবোধে আপ্লুত করে। মহাত্মাজীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে জানবার অবকাশও দেয়।

"দি গোদরেজ স্টোরি"-তে গোদরেজ-নগরীর বিরাট উৎপাদনযজ্ঞের পরিচয় রয়েছে। সেখানকার কর্মীরা এবং তাঁদের পরিবার কী-ধরনের সুযোগ-সুবিধায় জীবন নির্বাহ করেন তাও দেখানো হয়েছে।

চিত্রপ্রদর্শন ছাড়াও "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্য ছিল ওই দিনকার অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। "চণ্ডালিকা" সম্পূর্ণ মঞ্চস্থ হয়নি; হলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ নৃত্য-নাট্যটি সকলেরই মন জয় করে। চিত্রা মুখোপাধ্যায় (আনন্দ), সুশীল মল্লিক (দই-ওয়ালা ও চুড়িওয়ালা), কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃতি), সেবা ভট্টাচার্য (মা) প্রমুখ শিল্পীরা দরদের সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র গান করেন। আনন্দের মুখে গান 'জল দাও' শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। নাচও খুব প্রশংসনীয় হয়। বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ঈপ্সিতা চট্টোপাধ্যায় (প্রকৃতি)। অন্যান্যদের মধ্যে শুভকমল কুণ্ডু (মায়া), শান্তিরঞ্জন (দইওয়ালা) ও পদ্মনাভন থাম্পি (চুড়ি-ওয়ালা) উল্লেখযোগ্য।

"বন্দে মাতরম" সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী এস পি গোদরেজ। প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় গান্ধীজী ও নেতাজীর আদর্শের কথা বলেন।

রবীন্দ্র সদনে যাত্রা

রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতি নিছক ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র সদনকে ব্যবহার না করে শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মান উন্নয়নকল্পে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে তাঁরা নাট্যোৎসব, শিশুনাট্য উৎসব, নজরুল জন্মোৎসব ও রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেছিলেন। এবারে উদ্যোগী হয়েছেন যাত্রা উৎসবে।

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী যাত্রা উৎসবে যোগ

গোদরেজের অনুষ্ঠানে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

দিচ্ছেন বাংলা দেশের ১৬টি বিশিষ্ট দল। উৎসব শুরু হচ্ছে তরুণ অপেরার "হিটলার" দিয়ে। তারপর যথাক্রমে জনতা অপেরার "ফাঁসীর মঞ্চে", শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর "পথের ছেলে", নবরঞ্জন অপেরার "মাইকেল মধুসূদন", নিউ প্রভাস অপেরার "বারুদ", সত্যম্বর অপেরার "দিগ্বিজয়", অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর "চন্ডীতলার মন্দির", নিউ আর্য অপেরার "নেতাজী সুভাষচন্দ্র", ভারতী অপেরার "মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন", মাধবী নাট্য কোম্পানীর "আগুন নিয়ে খেলা", সুশীল নাট্য কোম্পানীর "রক্তে রাঙা হাঁসুলিডাঙা", নিউ গণেশ অপেরার "মরেও যারা মরে না" বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের "পতিঘাতিনী সতী", নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার "এক টুকরো রুটি", নাট্য ভারতীর "আন্দোলন", এবং শেষ দিনে নট্ট কোম্পানীর "শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি"।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানালেন রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীনেপাল নাগ, শ্রীমতী অমল শংকর, প্রমুখ।

পীযূষ বসুর পরিচালনায় "দুটি মন"-এর শুটিং আরম্ভ হয়েছে—একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন ফটো—দেশ

রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও আলোচনা

সুরঙ্গমার বার্ষিক উৎসব

'রবীন্দ্রসংগীত সংগীতের শেষ কথা নয়, বরং তা হল ভাবীকালের বহু গানের একটি সুবিশাল উৎস'—রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে অনুষ্ঠিত সুরঙ্গমার বার্ষিক অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের সময়োপযোগী ভাষণের অন্তর্গত উদ্ধৃত মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটির পরে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কোনো ইঙ্গিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা যৌবনে যেমন শিখেছিলেন, যেভাবে পরিবেশন করতেন, তার উল্লেখ করে রবীন্দ্র-সংগীতকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রাখবার সমস্যার প্রতিই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভাষণের পরে সুরঙ্গমার শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রসংগীত-সহযোগে একটি 'বর্ষামঙ্গলে'র অনুষ্ঠান উপহার দেন। গানে নীলিমা সেন এবং নৃত্যে পূর্ণিমা ঘোষ তাঁদের সুনাম অনুযায়ী দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু বেশ কয়েকটি নৃত্যগীতে, সম্ভবত কিছুটা বোঝাপড়ার অভাবেই, সংগতি ছিল না বলে সমগ্রভাবে অনুষ্ঠানটি যেন রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। সুরঙ্গমার কাছে কিন্তু আরও উন্নত পর্যায়ের অনুষ্ঠান প্রত্যাশিত ছিল।

বৈতানিকের উৎসব

বৈতানিক এবারে ৩১ আগস্ট থেকে পক্ষ দিবসব্যাপী যে অনাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করেন তার দ্বিতীয় দিনে স্বরলিপি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের অনুপস্থিতিতে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতা।

দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙালীচরণ সেন প্রমুখ স্বরলিপিকারগণ কর্তৃক কৃত স্বর-লিপিসমূহের যদৃচ্ছ পরিবর্তনের কঠোর সমালোচনা করে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিবিধানের সংকল্প গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রানুরাগী সংগীতজ্ঞদের আহ্বান জানান। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা বর্তমান স্বরলিপি-পদ্ধতির কয়েকটি অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভাপতির বক্তব্যের সমর্থন করেন। স্বরলিপিতে উপযুক্ত লয়-নির্দেশের অভাব, আবার তাল-বর্জিত গানেও চার-মাত্রার ব্যবধানে তালজ্ঞাপক চিহ্ন ব্যবহার প্রভৃতি অসংগতির উল্লেখ করেও তিনি বলেন, সংগীত আসলে গুরুমুখী বিদ্যা—স্বরলিপির সাহায্যে প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রসঙ্গত, সভার মধ্য থেকে 'ছিন্নপত্র' ছন্দ প্রভৃতি সাহিত্য-গ্রন্থেরও পুনর্সম্পাদনার অভিযোগ আসে এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় ঔদাসীন্য সম্পর্কে সভায় একটা তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

আনন্দবর্ধন

রাজধানীতে রঙ্গশ্রী

বেনোজ্য, আমেন ও এলেম নতুন দেশে নাটক তিনটি প্রযোজনা করে রঙ্গশ্রী সংস্থা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। নয়া-দিল্লীর চেনামহল নাট্য সংস্থার আমন্ত্রণে ও উদ্যোগে ১৯, ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী নাট্যোৎসবে রঙ্গশ্রী সংস্থা ঐ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করবেন স্থানীয় ফাইন আর্টস হলে। নাটক, নির্দেশনা ও অভিনয়ে আছেন রমেন লাহিড়ী।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তের পরলোকগমন আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীসেনগুপ্ত বেশ কিছুদিন যাবত নানা রোগে ভুগছিলেন। গত সোমবার—১ সেপটেমবর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। ৪ সেপটেমবর বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে তিনি উক্ত হাসপাতালেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। নিঃসন্তান শ্রীসেন স্ত্রী, ৮৪ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা এবং অন্যান্য বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন। এই দিনই সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বরিশাল জেলার ভারুকাটি গ্রামে ১৯০২ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন ছ' ভাই। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা দেশে প্রথম ছাত্র আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয়। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। তার পূর্বে তিনি কয়েক বছর বিনা বিচারে আটক ছিলেন। আন্দামান থাকাকালে তিনি কমিউনিসট মতবাদে বিশ্বাসী হন। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিসট পারটির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি আইনসভার সদস্য। কিছুকাল তিনি কমিউনিসট পারটির মুখপত্র জনসংঘের সম্পাদক ছিলেন।

দেশী সংবাদ

১ সেপটেমবর—আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৩০টি কাপড়ের কলের ৫০ হাজার কর্মী দশ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। যন্ত্রচালিত সুতাকলগুলিকে ধর্মঘটের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এগুলির সংখ্যা দশ-বার হাজার।

কলকাতার পৌরসভার স্টোর, গ্যারেজ, লরি এবং জঞ্জাল বিভাগে চরম অব্যবস্থার সেই ট্রাডিশন সমানেই চলছে বলে কমিশনার সহ ফ্রনট নেতারা উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন স্ট্যানডিং কমিটির চেয়ারম্যান, ফ্রনটের প্রতি-গোষ্ঠীর নেতা এবং কমিশনারকে নিয়ে অর্থ-কমিটির যে বিশেষ বৈঠক বসে তাতে এই অবস্থা ধরা পড়ে। এজন্য যথাশীঘ্র সমগ্র বহির্বিভাগীয় পৌর কর্মধারাকে ঢেলে সাজার সিদ্ধান্ত হয়।

২ সেপটেমবর—যুক্তফ্রনটের আজকের বৈঠকে সি পি আই-এর কোন প্রতিনিধি যোগ দেননি। বরাহনগরে স্থানীয় নেতা শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্যের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সি পি আই-এর রাজ্য-পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী ওই সিদ্ধান্ত নেন।

নেপালের উত্তর সীমান্ত বরাবর ভারতের যে সতেরটি বেতারঘাটি আছে সেগুলোকে আগামী বছরের শেষ নাগাদ সরিয়ে আনতে ভারত রাজি হয়েছে, তবে ওইসব ঘাটির কয়েকটি এ বছরের শেষ নাগাদই সরাতে হবে। তা ছাড়া নেপালে ভারতীয় সামরিক সংযোগরক্ষাকারী মিশনও ভারত গুটাতে রাজি।

৩ সেপটেমবর—বরাহনগরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রনটে যে সংকট দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে আজ একদিকে যেমন একটা মিটমাটের চেষ্টা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সি পি আই ছাড়া আরও কয়েকটি দল সি পি (এম)-এর বিরুদ্ধে "হামলাবাজি এবং দলীয় স্বার্থে পুলিস ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।"

দুর্গাপুরে ইসপাত কারখানার ক্যানটিনে ভুয়া কুপনের মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতের এক অভিযোগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সি বি আই তদন্ত করছেন বলে জানা যায়। ক্যানটিনে আরও নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগে দুজন গ্রেফতার হয়েছে।

৪ সেপটেমবর—মধ্যপ্রদেশে 'বেকারী সেনা'

নামে এক নতুন সেনা গঠন করা হচ্ছে। এই নতুন সেনা হবে বেকার যুবকদের বাহিনী। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের কর্মীরা এর সংগঠক। ২ অকটোবর থেকে বেকারী সপ্তাহ পালন করা হবে।

রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন কত হবে এ নিয়ে বেতন কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। কমিশনের একদল সদস্য মনে করেন ন্যূনতম বেতন ১৭৫ টাকা হওয়া উচিত। আর একদল মনে করেন ১৬০ টাকা হলেই চলে।

৫ সেপটেমবর—আজ বিকালে নারকেলডাঙ্গার মোঘলবাগান রেল কোয়ারটারস ও মহেশ বারিক লেন এলাকায় ডাকাতির ব্যাপারে সন্দেহভাজন পলায়মান দুই ব্যক্তি এবং গোয়েন্দা পুলিস-বাহিনীর মধ্যে মুহুর্মুহু গুলি বিনিময় চলে। পল্লীর বিজয় রাই নামে একটি ষোল বছরের ছেলে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত সন্দেহভাজন ওই দুই ব্যক্তি শ্রীহিরণ্ময় গাঙ্গুলী (ওরফে হেনা, ওরফে ঠান্ডাদা) ও শ্রীসোমনাথ ব্যানারজি গুরুতর আহত অবস্থায় জনতার হাতে ধরা পড়ে। অপরাহ্ণ পাঁচটায় মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে শ্রীগাঙ্গুলী মারা যান।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত দেশে লুকানো সম্পত্তি বা কালো টাকার খোঁজ করতে গিয়ে ৪১১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছেন। একটি সরকারী রিপোরট থেকে এই খবর জানা গিয়েছে।

৬ সেপটেমবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন আজ নয়াদিল্লি বিমানবন্দরের স্পেশ্যাল লাউনজে বসে শ্রীগান্ধীর সঙ্গে একঘণ্টা আলোচনা করেন। এই বৈঠকে পাক-ভারত প্রশ্নও ওঠে। বৈঠক শেষে শ্রীকোসিগিন সাংবাদিকদের কাছে বলেন : উভয় দেশের সমস্যাবলী ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে তুলেছে, সেগুলি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। তিনি বলেন—ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তোলার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবেন।

আজ খড়দহে সি পি আই ও সি পি আই (এম) সমর্থক দুদল শ্রমিকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। দু' পক্ষের ৮ জন আহত হন। পুলিস পাঁচ রাউনড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিরোধ বাধে মূলত ওই কারখানার—ইনডিয়ান অকসিজেন মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করার দাবি নিয়ে।

৭ সেপটেমবর—পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিসে বড় রকমের রদবদল আসন্ন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সাজানোর জন্যই এই রদ বদল করা হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জানা গিয়েছে।

আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে এক বিরাট সমাবেশে সি পি আই এম নেতৃবৃন্দ বলেন : কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে যখন মানুষের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে সি পি আই সেই সময় যুক্তফ্রনট ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। তাঁরা আগুন নিয়ে খেলার বিরুদ্ধে সি পি আইকে হুঁশিয়ার করে দেন।

বিদেশী সংবাদ

১ সেপটেমবর—রবি ও সোমবার দু'দিনে পৃথিবীর দুটি রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছে—দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ায় জঙ্গী শাসন কায়েম হয়েছে।

২ সেপটেমবর—বি বি সি-র সংবাদে জানা যায়, চীনের নেতারা সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশে উত্তর-ভিয়েতনামের চেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে।

৩ সেপটেমবর—আজ হানয়ের এক ইশতাহারে বলা হয়, কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রেসিডেনট হো চি মিনের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা সারাদিন-রাত্রি ধরে তাঁকে দেখাশোনা করছেন। প্রেসিডেনট হো চি মিন এই বছর ১৯ মে ৭৯ বৎসরে পদার্পণ করেন।

৪ সেপটেমবর—ভিয়েতনামী কমিউনিজমের স্রষ্টা ইন্দোচীনের মুক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা প্রেসিডেনট হো চি মিন গতকাল ভারতীয় সময় রাত ৭টা ১৭ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

৫ সেপটেমবর—উত্তর ভিয়েতনাম সম্পর্কে হানয় থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে জানা যায়:—২৬ জনের একটি কমিটি দেশ চালাবেন এই ২৬ জনের প্রথম ১০ জনের ৬ জন মনে হয় মসকো পন্থী ও ৪ জন পিকিং ঘেঁষা।

৬ সেপটেমবর—হানয়ে ডঃ হো চি মিনের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অথচ চৌ এন লাইয়ের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য যে চীনা প্রতিনিধিদল হানয়ে গিয়েছিলেন গতকাল তাঁরা পিকিংয়ে ফিরে গিয়েছেন। কোসিগিনের নেতৃত্বে এক সোভিয়েট প্রতিনিধিদল হানয়ে গিয়েছেন। চীনা প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এড়াতে চান বলেই হয়ত সদলবলে স্বদেশে পাড়ি দেন।

৭ সেপটেমবর—রাশিয়া যুগোস্লাভিয়াকে তার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত বছর চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার পর থেকে যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে এই আশ্বাস চেয়ে আসছিল।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীমতী গান্ধীর কলকাতা সফর		... ৭৩৭
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		... ৭৩৮
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত		... ৭৩৯
বৈদেশিকী—দেবরাজ		... ৭৪১
সুনন্দর জার্নাল—		... ৭৪৩
ল্যাম্পুন (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র		... ৭৪৫
মধ্যভূমির ছড়া (কবিতা)—শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত		... ৭৪৫
আমি ভাণ্ডায় গড়া মানুষ (কবিতা) —শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়		... ৭৪৫
কোন দিন কেউ শর্তহীন (কবিতা) —শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়		... ৭৪৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শান্তিনিকেতনের হাওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ	—শ্রীঅশোক রুদ্র	৭৪৭
অদূরের দিল্লি	—দরবেশ	৮০৯
কবিতা	—বনফুল	৭৬৩
জীবন যে-রকম	—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৬৫
বিশ্ববিজ্ঞান	—শ্রীসমরজিৎ কর	৭৭১
পাত্রাপাত্র	—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৭৭৭
গানের আসর	—শার্ঙ্গদেব	৭৮৫
বাংলার চলচ্চিত্র	—শ্রীআবদুল জব্বার	৭৮৯
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা	—ফাদার দ্যতিয়েন	৭৯৭
আর্থিক ভারত	—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	৮০১

অতি গোপনীয়!

একমাত্র নতুন **বিনাকা টপ** এমন একটি গোপন সম্প্রসারণশীল উপাদান দিয়ে তৈরী যা টুথপেস্টকে আপনার মুখের গুপ্ত আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিয়ে লুক্কায়িত জীবাণুর সাথে সংগ্রাম করে। ফলে আপনার মুখের স্বাস্থ্য বজায় থাকে—মুখ সারাদিন পরিষ্কার ও তাজা থাকে।

এখন আপনি নিজেই দেখতে পারেন। ল্যাবরেটোরীর পরীক্ষা আজ বাড়ীতেই করে দেখুন।

বিনাকা টপ... মুখের পূর্ণ পরিচর্যার গোপন কথা।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	...	৮০৫
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	৮১১
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৮১৩
আলোচনা—	...	৮১৭
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৮২১
পুস্তক পরিচয়—	...	৮২৩
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৮২৫
ব্যাডমিন্টনের আইনকানুন—মুকুল	...	৮২৮
রঙ্গজগৎ—	...	৮২৯
অরণ্যদেব—	...	৮৩৫
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৮৩৬

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

(সি ৮৩০৬)

ভালবাসার টান
একান্ত
কাছাকাছির...)
একান্ত
আরাম বোধ।
অপরূপ আকর্ষণ
অপরূপ সেঞ্চুরি
শাড়ি কাপড়ে।
সেঞ্চুরি
ADROIT/CM/B

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৭
শনিবার ৩ আশ্বিন, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীঅশোককুমার সরকার
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক — ২৫·০০
ষাণ্মাসিক — ১২·৫০
ত্রৈমাসিক — ৬·২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক — ৩০·০০
ষাণ্মাসিক „ — ১৫·০০
ত্রৈমাসিক „ — ৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক — ৩০·০০
ষাণ্মাসিক „ — ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক „ — ৮·০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক — ৫২·০০
ষাণ্মাসিক „ — ২৬·০০
ত্রৈমাসিক „ — ১৩·০০

আকাশ ডাকে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — ৩৯·০০
ষাণ্মাসিক — ১৯·৫০
ত্রৈমাসিক — ১০·০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

DESH

Saturday 20 Sept. 1969.

শ্রীমতী গান্ধীর কলকাতা সফর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কলকাতা সফর শেষ করে ফিরে গেছেন। এই সফরকে কেন্দ্র করে একসময় বাংলা কংগ্রেসের রাজনীতিতে যে রকম জট পাকিয়ে উঠেছিল তাতে আশঙ্কা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রীর সফর সামরিকভাবে বাতিল হয়ে যায়। তা অবশ্য হয় নি, কোনো রকমে একটা মিটমাট করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে নির্বিঘ্ন করা গিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এতে মিটে গিয়েছে এমন মনে করাও ভুল। আপাতদৃষ্টিতে যে বোঝা পড়া দেখা যাচ্ছে—সে-রকম বোঝাপড়া আজ কংগ্রেসের ওপর মহলেও। একে যথার্থ-ভাবে মিলন বলা যায় বলে মনে হয় না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীরা কিছুটা উৎফুল্ল। কিন্তু এই খুশির ভাব বজায় রেখে নিশ্চিন্তে বসে থাকতেও তাঁদের সাহস হয় না। কেননা অন্য পক্ষ সক্রিয় নয় এমন কোনো কথা নেই। কাজেই, শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সমর্থনকারীরা চান—যে সুযোগ তাঁদের হাতে এসেছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সে চেষ্টা পূর্বেই শুরু হয়ে গেছে এবং ইন্দিরাজীর কলকাতা সফরকে সেদিক থেকে বিচার করাই ভাল।

একথা ঠিক, কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল হিসেবে আবার পুরোনো গৌরবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার পুনরুজ্জীবন দরকার। এটা আদপেই সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন আলাদা, তবে কংগ্রেস নিশ্চয় সে-চেষ্টা করতে পারে—এবং যদি তা করে তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই। শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যায়, এ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

কলকাতায় শ্রীমতী গান্ধী অনেকগুলি সভা সমাবেশে যোগদান করেছেন। প্রতিটি সভাতেই তিনি যা বোঝাতে বা বলতে চেয়েছেন তার মর্ম হল—কংগ্রেসের কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি নিঃসন্দেহ ঘটেছে, আর এর ফলে জনগণ থেকে কংগ্রেস কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন কংগ্রেস চেষ্টা করবে সেই ত্রুটি শুধরে নিতে। ব্যাংক জাতীয়করণ তারই অন্যতম একটি ছোট পদক্ষেপ মাত্র। কংগ্রেসের আসল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সামাজিক সুবিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। এর জন্যে শ্রেণী-সংগ্রামে কংগ্রেস বিশ্বাসী নয়; অহিংসার পথে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, বহুসংখ্যক লোকের সমর্থনে এই আদর্শ সফল করা যেতে পারে। দারিদ্র্য রাতারাতি দূর করা যায় না, এক একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ দ্বারা ক্রমশ তা দূর করা দরকার।

শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য এমন কিছু জটিল নয় বা নতুন নয় যে, ইতিপূর্বে তা শোনা যায় নি। যদি ধরে নেওয়া যায় তিনি এই পথেই কংগ্রেসকে আবার জন-মনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তবে আমরা তাঁর সদিচ্ছার প্রশংসা করতে পারি, তাঁর উদ্যমের সাফল্য কামনাও করতে পারি।

ঠিক এই মুহূর্তে আরও একটি বড় প্রশ্ন রয়েছে এবং সেটি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সম্পর্কে। অন্যত্রও না আছে এমন নয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে খুবই প্রকট। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পায়ের মাটি ক্রমশই এমন আলগা হয়ে এসেছে যে, একে আবার শক্ত মাটিতে দাঁড় করানো কষ্টসাধ্য। এই মুহূর্তে যদি সে চেষ্টা শুরু করা না যায় তবে পরিণাম কী হবে কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়। মনে হয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কলকাতায় এনে অন্তত কংগ্রেসের কিছু নেতা সেরকম একটি চেষ্টা করতে চেয়েছেন। কলকাতায় শ্রীমতী গান্ধী যেরকম বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন—কিংবা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় যে বিশাল জনতা দেখা গিয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কিছুটা লাভবান হয়েছেন। নিতান্ত কৌতূহল ছাড়া যদি মানুষের মনে আবার কংগ্রেস সম্পর্কে সামান্য মাত্র উৎসাহ দেখা দিয়ে থাকে তবে তাও শুভ লক্ষণ। এখন প্রশ্ন হল, দলীয় রাজনীতির লাভ-ক্ষতির হিসেব ভুলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতা এবং উপনেতারা কি সত্যিই একত্র হতে পারবেন? তাঁদের কী বাস্তবিকই শুভবুদ্ধি হবে? কাগজ-কলমে ঐক্যের প্রস্তাব কিছু না, কর্মের ঐক্য দেখা গেলে তবেই নিশ্চিত হতে পারা যায়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা সফর সেদিক থেকে কিছুটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মহামায়ার কৃপায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণরূপী ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করে পশ্চিমবঙ্গের ছত্রভঙ্গ ও ভগ্নহৃদয় কংগ্রেসীগণ দেবীর আবাহনের নিমিত্ত মহোৎসাহে আবার মিলিত হলেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে দেবী আরাধনার মহামণ্ডপে পৌরোহিত্য করার অধিকারী কে—প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অথবা প্রদেশ কংগ্রেসের নতুনদার মনোনীত কেউ—এই প্রশ্নে পুনরায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। যুযুধান দুই পক্ষের তাপ উত্তাপ নিনাদ নির্ঘোষে জল স্থল অন্তরীক্ষ পূরিত হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় একদিন সাতিশয় বিভ্রান্ত কয়েকজন কংগ্রেসী নতুনদার ভবনে গমন করলেন। গিয়ে দেখেন একজন গৃহভৃত্য নতজানু হয়ে নতুনদার পাদুকাযুগলে পালিশ লাগিয়ে আয়নার ন্যায় ঝকঝকে করে তুলছে। আর নতুনদা একদল দর্শনপ্রার্থীকে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতি বিশ্লেষণ করছেন।

নতুনদা বললেন, সমাজবাদের মর্মার্থ আমাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ভারতবর্ষ আজ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী এবং অগণিত বঞ্চিত—এই দুই শিবিরে বিভক্ত। এক দল প্রভু আর অন্য দল ভৃত্য। (গৃহভৃত্যটি এবার নিবিষ্টচিত্তে নতুনদার সুচিক্কণ পট্টবস্ত্রে গিলে করতে লাগল।) কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তাকে রূপ দিতে পারলে মানুষে মানুষে এই বিভেদ ঘুচবে। অতএব কায়মনোবাক্যে আমাদের এখন প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করতে হবে। এর জন্য চাই নতুন প্রাণ, নতুন রক্ত, নতুন ইমেজ।

অনুগত কংগ্রেসী : হে নূতন, হে অনেক-বাহু-উদর-নেত্র-শালী অনন্তরূপ, তোমাকে সর্বত্র দেখছি। কখনও দেখছি তুমি কারবারজীবীরূপে সুবিধাভোগী কায়েমী-স্বার্থের স্বার্থরক্ষার জন্য দিল্লি দিল্লি ছুটে বেড়াচ্ছ, কখনও দেখছি সমাজবাদের কর্মসূচী নিয়ে নতুন বন্যায় আমাদের ভাসিয়ে দিতে চাইছ। তুমি কংগ্রেসের উজ্জীবন চাইছ, আবার কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছ। হে সর্ব, তোমাকে সর্বত্র দেখছি, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখতে পাচ্ছি না। তোমার অজস্র মুখসকল দেখে দিক জানতে পারছি না। তোমার আদিস্বরূপ প্রকাশ কর।

নতুনদা : আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত ও উপাসক হও, আমি তোমার মোহ বিনাশ করব। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। খবরদার, সিন্ডিকেট-ওয়ালাদের খপ্পরে পড়ো না। ওদের ইমেজ ভাল নয়। তাই তো দেবী আরাধনার্থে [illegible] [illegible] যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করছি তার ত্রিসীমানায় সিন্ডিকেটপন্থীদের ঘেঁষতে দিচ্ছি না। ওদের নেতা অতুল্য ঘোষকে আমন্ত্রণই জানাব না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকেও প্রথমে আমার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, তবে তাঁকে এই যজ্ঞে পৌরোহিত্যের অধিকার দেওয়া হবে।

অনুগত কংগ্রেসী : বাক্‌পতি, কূট-বুদ্ধিতে এ মহীমণ্ডলে তুমিই তোমার তুলনা। আমরা অতি মূঢ়মতি। মহত্তর রীতি নীতি সবিশেষ জানি না। হৃতরাজ্য ফিরে পেলেই আমরা তুষ্ট। দাদা, আমাদের শত্রু কে, মিত্রই বা কে? সিন্ডিকেট অথবা যুক্ত ফ্রন্ট?

নতুনদা : ওহে, শত্রু মিত্র ভেদাভেদ তত্ত্ব নিতান্তই আপেক্ষিক। উদ্দেশ্য সিদ্ধিই ধ্রুব। হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব ওইটেই ধ্রুব। যে পথে যে বিঘ্ন সেই আমাদের শত্রু, যে সহায়ক সেই আমাদের মিত্র। অতএব কৃতনিশ্চয় হয়ে গাত্রোত্থান কর।

অনুগত কংগ্রেসী : মহাভাগ, বিস্মিত এই যে, পিতামহ এবং অতুল্য ঘোষই আপনার এই নব উত্থানের সহায়ক। তাই আপনার পক্ষে তাঁদের পথে বসানো কি এক অনুচিত নজির সৃষ্টি করবে না? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, কোনও কংগ্রেসীই কংগ্রেসের সমাজবাদী কর্মসূচীর বিরোধী নন। অথচ আমরা আমাদের ইমেজ উজ্জ্বল করার জন্য আরেক দল কংগ্রেসীর ভাবমূর্তি এই বলে মসীলিপ্ত করছি যে, তারা সমাজতন্ত্রের অন্তরায়। দাদা, এরূপ মিথ্যাচরণ কি অনুচিত নয়?

নতুনদা : ওহে, রাজনীতির তত্ত্ব অত চট করে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ বড় শক্ত ঠাঁই। সত্য বলাই ধর্মসম্মত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, এও ঠিক; কিন্তু জানবে যে, সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা দুরূহ। যেখানে মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর সেখানে মিথ্যাই বলা উচিত। দলচক্রে অতুল্য ঘোষের ভাবমূর্তি আজ কুজ্ঝটিকাতে পর্যবসিত। অতএব বৎস, তোমরা এখন ধর্মাধর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির কর। সেইটেই আমাদের পক্ষে এখন উচিত কাজ হবে।

[illegible] অনুভব করলেন, হাওয়া গরম। একদল কর্মী গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্য প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগে উদ্যত। দেবীর অকালবোধনের আয়োজন প্রস্তুত, কিন্তু এত দ্রুত অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে, অনুষ্ঠানই বুঝি পণ্ড হয়।

পিতামহের কক্ষে প্রবেশ করে নতুনদা দেখলেন, একদল কংগ্রেসকর্মী মহাকোলাহলে ব্যাপৃত। পিতামহ আরামকেদারায় সমাসীন।

পিতামহ বললেন, কোলাহলে কর্মনষ্ট হয়, তোমরা শান্ত হয়ে ঐক্য স্থাপনের উপায় বার কর। নতুবা আমাদের বিনাশ অনিবার্য।

প্রবীণ কংগ্রেসী : পিতামহ, কিসে আমাদের শুভ হবে সেই চিন্তা করুন। এখন বলুন আমাদের কর্তব্য কী?

পিতামহ : দেবী আরাধনার মহাযজ্ঞে পৌরোহিত্য করার যে প্রথা আছে, এ ক্ষেত্রেও তাই রক্ষিত হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিই পৌরোহিত্য করবেন।

নতুনদা : কিন্তু তিনি তো প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তাঁর কটূক্তি প্রত্যাহারে সম্মত হননি।

পিতামহ : বৎস, তোমার [illegible] সখা এবং [illegible] [illegible] মিত্রের কুপরামর্শে মতিভ্রম হয়েছে। তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করছ। ওয়ার্কিং কমিটির ঐক্য প্রস্তাবের পর এসব অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে বৃথাই জল ঘোলা করছ। তোমার অভিমান প্রচুর, তোমার অভিলাষ উচ্চ, কিন্তু দলের প্রতি তোমার আনুগত্য সংশয়রহিত নয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর টেক্কা মারা তোমার কর্ম নয়। তাঁকে স্বেচ্ছায় আহ্বান জানিয়ে তুমি মূর্খতাই প্রকাশ করেছ। তুমি রাহুর ন্যায় বৃথাই চন্দ্রকে গ্রাস করতে চাইছ। রাহুগ্রাসে চন্দ্রকে প্রভাহীন হতে কে কবে দেখেছে?

নতুনদা ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। উনি জীবিত থাকতে আমি অস্ত্র ধারণ করব না।

পিতামহ : অর্বাচীন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ হওয়া অনুচিত, তাই তুমি টিকে রইলে। তুমি যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ না কর, তবে আমি আর কোনও ব্যাপারেই নেই। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

অতঃপর পিতামহের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা কংগ্রেসমহলে রটে যাওয়ার পর এমন চাপ সৃষ্টি হল, যে, নতুনদা পূর্ণচন্দ্রের মহিমাকে সাদরে বরণ করে নিলেন। এবং অনুগত জনদের এই উপদেশ দিলেন : “সন্ধি-অভিসন্ধিতে সমান হয়ে কর্ম কর”— ভগবানের এই বাণী অনুসরণ করাই এ যুগের [illegible]

[illegible]

শা স্ত্রে বলে, দেবী যদি ঘোড়ায় আসেন তাহলে ফল হয় ছত্রভঙ্গ। সে যুগে এরোপ্লেন ছিল না, সুতরাং দেবীর আগমন ঘটলে ফল কী হতে পারে শাস্ত্রে তাও লেখা নেই। কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে, দেবীর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বিমানে আগমনের নীট ফল "ছত্রভঙ্গ"।

আমি বলছি না, পশ্চিমবঙ্গ ছত্রভঙ্গ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু কংগ্রেস দল সম্পর্কে কথাটা প্রযোজ্য—ইন্দিরা দেবীর আগমনের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়েছে কংগ্রেস দল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেও বিরোধ দেখা দিয়েছিল; কিন্তু এবারের মত ঝগড়া সেবারেও হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে এত কলহ, এত নির্লজ্জ লড়াই, এত পারস্পরিক দোষারোপ হাতাহাতি আর কখনও হয়েছে বলে আমার অন্ততঃ মনে হয় না।

দেবীর গমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সে বিরোধ মিটে গিয়েছে তেমনও নয়। বরং নতুন পর্যায় ঝগড়া শুরু হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এই পর্যায়ের বিরোধ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এখনও কেউই তা জানেন না। দু'পক্ষ কি সম্মুখ সমরে নামবেন? প্রতাপবাবুরা কি সিদ্ধার্থবাবু-দের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে কোনও ব্যবস্থা নিতে এগোবেন? না, শেষ মুহূর্তে আবার সব মিটমাট হয়ে যাবে? প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতারাও এখনই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

*

আমি আগেও যা বলেছি, এখনও তাই বলছি—কংগ্রেসের ভেতরে যে লড়াই চলছে, সেটা আদর্শের সংঘাত নয়, নেতৃত্বের লড়াই। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের এবারের ঝগড়া আবার সেই বক্তব্যকেই সমর্থন জানাল।

কী নিয়ে এবারের ঝগড়াটা হল? কোনও আদর্শ নিয়ে? না। ঝগড়া হলো জনসভার সভাপতিত্ব নিয়ে, অতুল্যবাবুর সভায় উপস্থিতি প্রসঙ্গে। এর সঙ্গে নীতি

বা আদর্শের যোগাযোগ কোথায়?

প্রথম বিরোধটা যদি বা মিটল, দ্বিতীয় ঝগড়াটা কিন্তু থেকেই গেল। প্রফুল্ল সেন সিদ্ধার্থবাবুকে যে চিঠি দিয়েছেন তার রেশ এখনও চলছে। মহানগর অতিক্রম করে, প্রদেশ কংগ্রেস ভবন ডিঙিয়ে এখন সে বিরোধ গিয়ে পৌঁছেছে জেলায় জেলায় কংগ্রেসীদের মধ্যে।

সভাপতিত্বের ঝগড়াটা যেমন ছেলে-মানুষী ছিল, জনসভায় অতুল্যবাবুর উপস্থিতির বিরোধটাও তেমনি ছেলে-মানুষী। প্রতাপবাবু প্রদেশ কংগ্রেসে সভাপতি থাকতে পারবেন, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেসী জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করতে পারবেন না! অতুল্যবাবু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন, কিন্তু কংগ্রেসের ডাকা জনসভায় ধারে কাছে যেতে পারবেন না! কোনও সুস্থ রাজনৈতিক দলে এমন ঝগড়া কেউ কখন কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু কংগ্রেসে এমন ঝগড়া হয়, হচ্ছে এবং আরও হবে। কারণ কংগ্রেসের নেতারা এখন আর সুস্থ নেই; দলীয় ক্ষমতা দখলের ঝগড়ায় তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

অথচ, ঝগড়াঝাটি যদি না করতেন, যদি সুষ্ঠুভাবে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচী রচিত হত, তাহলে কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর এই পশ্চিম-বঙ্গ ভ্রমণকে তাঁরা ভালভাবেই কাজে লাগাতে পারতেন। তাঁরা আরও বহু জনসভা করতে পারতেন, দলে যে নতুন নতুন ছেলেরা আসছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের একটা ব্যাপকতর বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারতেন, দলীয় দৈনিক সংবাদপত্রটি পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সবাই মিলে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু সে পথে কেউ গেলেন না। কিছু ব্যবসায়ীকে, কিছু আইন-জীবীকে, বস্তিবাসী সাজিয়ে কিছু বস্তির মালিককে, তরুণ চিন্তাশীলরূপে জেপাল জনদের এবং বিশিষ্ট নাগরিক বেশী কিছু "চাঁদা দেনেওয়ালাকে" প্রধানমন্ত্রীর দরবারে ডেকে এনে কংগ্রেসকে যে কতটা পুনরুজ্জীবিত করা গেল বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কতটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল কেবল দুর্জ্ঞেয়।

*

বাংলাদেশে আর যাই হোক শুধু ব্যক্তি ভিত্তিক দল যে শক্তি অর্জন করতে পারে না, এটা রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের পরিষ্কার বোঝা উচিত। শ্রীমতী গান্ধী যে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান ভারতের অন্য সকল কংগ্রেস নেতার চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু শ্রীমতী গান্ধীকে দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দল হবে না। যদি নেতার বা নেতাদের ব্যক্তিগত পপুলারিটির উপর পশ্চিমবঙ্গে দলের শক্তিবৃদ্ধি নির্ভর করত তাহলে এ রাজ্যে সি পি আই (এম) এত শক্তিশালী হতে পারত না।

এখানে দলের শক্তিবৃদ্ধি করতে হলে প্রথমেই চাই একটি শক্তিশালী আদর্শবাদ স্বার্থত্যাগী কর্মীবাহিনী যাঁরা প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিপুল কর্মী-বাহিনীর সঙ্গে সমানতালে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত চাই পরিষ্কার আদর্শ—যে আদর্শে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে। মানুষকে বোঝান চাই, হ্যাঁ, কংগ্রেসীরা ওই আদর্শে নিষ্ঠাবান, তাঁরা সত্যিই ওই পথে এগোতে চান। শুধু কথার ফুলঝুরিতে এ রাজ্যে লোক ভোলানো যাবে না।

তৃতীয়ত চাই, শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র। নিজস্ব পত্রপত্রিকা পুস্তিকা ছাড়া এ যুগে কোনও সত্যিকারের রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। ব্যবসায়ী সংবাদপত্রে নেতার বা নেতাদের বক্তৃতা বা ছবি ছাপলেই যে দলের ভালো হতে পারে না পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা কি এখনও তা বোঝেন নি?

চাই নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু; কিন্তু এই তিনটি জিনিস সবার আগে প্রয়োজন। কংগ্রেসের নেতারা যদি এখনও দল গড়ার কাজে হাত না দেন, যদি শুধু আত্মকলহে মত্ত থাকেন, তবে হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন— সুযোগ আর নেই, ঝগড়া করতে করতেই সকলে গয়াপ্রাপ্ত হয়েছেন। তখন দিল্লি থেকে শ্রীমতী গান্ধী বা শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে ডেকে এনেও আর বাঁচা যাবে না।

নবারুণ গুপ্ত

'লোকটা মরছে'

পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ল। পাড়ার ঠাকুর-দালানে প্রতিমার কাঠামোতে মাটি পড়েছে।

পুজো এসে গেল নাকি? এত তাড়াতাড়ি?

আমি যদি বাংলাদেশের সাহিত্যিক হতুম, তা হলে তক্ষুনি আমাকেই শারদীয়ার জন্যে লিখতে বসে যেতুম; যদি সম্পাদক হতুম, তা হলে বৈশাখ থেকেই আটখানা

যেখানেই মরণে বিষাদমগ্নতা প্রকাশ করা যায়

উপন্যাসের অন্তর্বর্তীকে পাকড়াও করতুম; যদি ব্যবসায়ী হতুম, তা হলে এর মধ্যেই দোকানে পুজোর স্টক আনতে শুরু করত; যদি বারোয়ারীর কর্মকর্তা হতুম, তা হলে চাঁদার ব্যাপারে পরিকল্পনা আরম্ভ হয়ে যেত; যদি পাইয়ে-টাইয়ে হতুম, তা হলে এখন থেকেই বায়নাপত্র নিতে—

কিন্তু আমি এ-সব কিছুই নই, নিতান্তই কলমবাজ সুনন্দ। প্রতিমার কাঠামোতে মাটি পড়তে দেখে আমার পুজোর খরচার কথা মনে এল, বোনাসের ভাবনা এল।

শ্রাবণের আকাশ ছিঁড়ে কখনো কখনো উঁকি দিচ্ছে শরতের নীল, কিন্তু মেঘ বর্ষণের উৎসব শেষ হয়নি এখনো। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি। জল জমেছে ওই গগনের নীল নয়নের কোণে? চোখের জলের পালা এখনো মিটল না।

পথে প্যাচপেচে কাদা—মধ্যে মধ্যে বিরাম দিয়ে বৃষ্টির পশলা। হাতে ভারী ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে চলেছি। পুজোর কথা মনে পড়ছে, কতদিন কলকাতার বাইরে যাইনি তা মনে পড়ছে, ছুটির গ্রামের দু'ধারে শরতের সোনালি মাঠে রোদে-হাওয়ায় সেতার বাজছে—সে কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ভাবনায় তাল কাটল। কলেজ স্ট্রীট আর কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে—ফুটপাথের ওপর মানুষ মরছে একটা।

কালো লম্বা লোকটা—শরীরে কটা হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। বয়েস বত্রিশ থেকে বাহান্ন—যা কিছু হতে পারে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে ফুটপাথের ওপর। পরনে একটা লেংটির মতো রয়েছে, শেষ লজ্জাবস্ত্র। মাথার কাছে দলামোচা ন্যাকড়ার মতো কী একটা জলে কাদায় তাল পাকিয়ে আছে, বোধ হয় গায়ের জামা ছিল ওটা, কোনো অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় টেনে খুলে ফেলেছে। আপাতত একেবারে নিরাসক্ত—খোলা চোখ দুটো ওপরের হিমার্দ্র আকাশে ছড়ানো—শুধু স্বগতোক্তির মতো কিছু বলছে মনে হয়—ভাঙা চোয়াল দুটো নড়ছে একটু—কদাকার এই নোংরা লোকটার দাঁতগুলো অস্বাভাবিক সাদা, যেন মেলে রয়েছে হাসির ভঙ্গিতে। বোধ হল, মরবার আগে যেন কী একটা রসিকতা মনে পড়ছে লোকটার।

মরছে। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—বড়ো জোর আধঘণ্টা। লোকটা মরছে।

একটা ছোট ভীড় তাকে ঘিরে—যেমন

অনাহারে মৃত্যুর ছবি তুলতে বিদেশীরা আসে, আমাদের আসে বৈদেশিক মুদ্রা

হয়ে থাকে। কিন্তু একবার তাকিয়েই আমাকে সরে যেতে হল।

ওর ওই হাসিটা আমি সইতে পারলুম না—মনে হল, আমাকেই বিদ্রূপ করছে।

ব্যাগের ভারে ক্লান্ত হয়ে, হাতের ছাতা দিয়ে চলতে চলতে ভাবলুম—মরবার আগে নিশ্চয় অ্যাম্বুলেন্স আসবে না, আর এলেই বা কী হবে? পৃথিবীর কাছে শেষ রসিকতাটা ওর শেষ হয়ে গেল—অথবা

অনাহারে অসহায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কবিরা কবিতা লিখে আসর জমান

ল্যাম্পুন

হরপ্রসাদ মিত্র

কালের রাখাল?
  নাকি কম্পিউটার?
  যে হও, সে হও,—
আমিও খুঁজেছি মানে।
  তুমি তবু নিরুত্তর রও।

অন্ধের অধিক অন্ধ তুলনায় কম্পিত কল্যাণ।
এতো দেখেছিল কেউ — নড়াচড়া সকল প্রমাণ?
সমস্ত পিঁপড়ে পোকা কানামাছি কাগমাছি সব
কুমাড়ে-খণ্ডাতে এক,—আমিও কি জানি না সে-সব?

অন্ধের আলোকবর্ষে যতো কিছু প্রদীপ প্রতীতি,
খাঁড়িতে খাঁড়িতে ধরা অগণন নিখুঁত শাসনে।
পরিণামে রূপ রস! কেন? সে কি কালের ইশারা?
  ঘটনায় অভিকর্ষে আমিও কি মানিনি নিয়তি?

বোধ হয় হৃদয় এক মায়িক ব্যাপার,
  সে কেবলি বাধা দেয়।
    হে ঈশ্বর,
  তুমি কম্পিউটার।

কেউ কি আছেন জেগে? কেউ চেনা শোনে?
তোমার ইস্পাত হাতে খাঁটি খাঁটি লিখছে ল্যাম্পুন।

বধ্যভূমির ছড়া

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ঘাতক হতে চাইছো, হও ঘাতক,
আমি কিন্তু হইনি মহাপাতক।

মিথ্যে? যদি বাতিকের কাজ হয়—
মিথ্যে তুমি ছড়াবে নিশ্চয়,

জমিজমা, খেতখামার, বাড়ি,
বিকেলবেলা হাঁটু-আড়াল শাড়ি

সবই যদি উলটো চালে আসে—
কী হবে আর মূর্খ অবিশ্বাসে?

খুন করতে চাইছো, হও খুনী,
বাঁকিয়ে দিই জীবন একখুনি॥

আমি ভাণ্ডায় গড়া মানুষ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মায়াবী এই আলোয় ওড়ায় যারা ভাণ্ডার ফানুস
যে জন ছিল গোড়ায়, তাকে মাড়িয়ে মারে মানুষ
আর যারা সব পথিক, শুধু তার পিছনে চলে
মানুষ গিয়ে কী মারে সেই এক মুঠি সম্বলে—
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতায়, তার মানে ঐদিকে
কাড়তে কথা বহু; যেমন করেছেন বাল্মীকি!

মানুষ কাকে বাঁচায়?
  যদি এমনি করে বাঁচায়
পোরে পাখির চেয়েও খালি
  নিবিড়, নরম গেরস্থালি?
আমার ভয় করে, ভয় করে
কেবল ভয় করে, ভয় করে
  যদি নিজেই তাকে মারি...
এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাণ্ডায় গড়া মানুষ॥

কোনদিন কেউ শর্তহীন

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

হাজার বছর ধরে বেঁচেছিল এই মানুষটি
মাটিতে চিবুক গুঁজে,
মাটি খুঁড়ে পাবে কেরোসিন
তারপর জ্বালাবে বাতিকা, পৃথিবীর ভাস্বর প্রদীপ।

হাজার বছর পরে কোন একদিন
পৃথিবীর শর্ত ভেঙে
ঠেলে নিয়ে দু হাতে পর্বত
সরে এল সূর্যের হঠাৎ কাছাকাছি,
বলে উঠল,
হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে বশ্যতা দিয়েছি
এইবার আমি দাঁড়ালাম
অন্য গ্রহে, এই একবার।
তোমাদের অশেষ আরাম
কলঙ্কে ভরেছে এ শরীর হাজার বছর ধরে
পার্থিব সেসব পাপ
ধ্বংস হোক এই প্রথম নির্ভুল নিয়মে

এই বলে সে মানুষটি গ্রহান্তরে খুলে ফেলল
  রক্তের পোশাক।

সমাজজীবনে যে বর্তমানে কোথায় আছে তা আগেই আলোচনা করেছি। সুতরাং প্রশ্নটা না উঠেই পারে না, এত খরচ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে টিকিয়ে রাখার কোন সার্থকতা আছে কি?

প্রশ্ন ওঠা উচিত এই বলে শুরু করেছি, কিন্তু উঠেছে কি? বিশ্বভারতীর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁরা অবশ্যই এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু আমি বলছি বাঙালী সমাজের কথা। বাঙালী শিক্ষাবিদ, বাঙালী শিল্পী সাহিত্যিক, বাঙালী রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক নেতা—অর্থাৎ বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের মধ্যে কি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কখনও আলোচিত হয়েছে? হয়নি। খুবই আশ্চর্যের কথা এই যে বিশ্বভারতী সম্পর্কে বাঙালীর মনোভাব সম্পূর্ণভাবে ধারণা চেতনাহীন। একদিকে কান্দ ছড়া যেমন গীত নেই তেমনি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই, আমাদের কাব্য চর্চার পরিধি সংকীর্ণ, আমাদের গান বলতে সুরে হোক বেসুরে হোক রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্রমেলা করছি,

---

আলোচনা করব, সেই শিক্ষাকেন্দ্রের আকৃতি এবং প্রকৃতি কি রকম হতে পারে।

শিক্ষার তিনটি অঙ্গ। এক হল যাকে বলা হয়ে থাকে সাধারণ শিক্ষা—শিশু ও বালক-বালিকাদের মন ও চরিত্র গঠনের কাজ। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা বলা হলেও অন্যান্য অধিকতর অগ্রসর দেশের হাইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যা শেখে তা আমাদের দেশের বি এ পাস কোর্সের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তুলনীয়। সাধারণ শিক্ষা বলতে এই ধারণাই মনে রাখছি।

এর পরের ধাপে আসে সেই শিক্ষা যার মূল লক্ষ্য হল অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর প্রস্তুতিকরণ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় professional training। আজকাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আলোচনায় human rewources planning বলে একটা বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষির জন্য সারের প্রয়োজনকে যেভাবে দেখা হয় কৃষিবিজ্ঞানকেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করা হয়, সারের জন্য

নিরাপদ থাকুন
নিশ্চিন্ত থাকুন সবসময়
একশিশি কাছে রাখুন
GRIPE WATER
উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটার
শতাধিক বছর ধ'রে
বুদ্ধিমতী মায়েরা
ব্যবহার করছেন

সকাল থেকেই ভাবছিলাম কি নিয়ে কবিতা লিখি। মাথায় কিছুই আসছিল না। দু কাপ কফি খেলাম, অনেকবার নস্যি নিলাম, চোখ বুজলাম, চোখ খুললাম, জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম সামনের মাঠে একটা কাদামাখা মহিষ চ'রে বেড়াচ্ছে। তাকে নিয়ে দু লাইন লিখলামও—হে যমবাহন মহিষ, আছে কি তোমার সাহস। ভাল লাগল না। ছিঁড়ে ফেললাম কাগজটা। তারপর ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। খানিকক্ষণ পরে তন্দ্রা এল একটু। কিন্তু উঠতে হল, দুয়ারে কড়া নড়ছে। ইলেকট্রিক বেলটাও বেজে উঠল।

কপাট খুলে দেখি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ববকরা চুল, গালে রং, ঠোঁটে রং, চোখে কাজল। পেট কাটা ব্লাউস, পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, নাভির নীচে কাপড়। গলায় পাউডার। পায়ে ছুঁচলো লাল স্যান্ডাল। হাতে রিস্টওয়াচ।

কিন্তু ভারি রোগা মেয়েটি। চোখের কোলে কালি, গালের হাড় উঁচু, চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

"কে আপনি?"

"আমি কবিতা। আমাকে তো ডাকছিলেন আপনি—"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বললে—"বড় খিদে পেয়েছে। বাড়িতে খাবার আছে কিছু?"

"বিস্কুট আছে—"

"তাই দিন।"

মেয়েটি আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

খাবার টেবিলে বসালাম তাকে।

বিস্কুটের টিনটা এগিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে ঢাকনিটা খুলে হ্যাংলার মতো খেতে লাগল। টিনে খান দশেক বিস্কুট ছিল। সব খেয়ে ফেললে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—"দু দিন খাইনি। খুব খিদে পেয়েছিল।"

"খান নি কেন?"

"পয়সা নেই।"

"কিন্তু আপনার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তো মনে হয় না আপনি গরিব—"

"পোশাক পরিচ্ছদ একটাও আমার নয়, সব ধার করা।"

"ধার দিলে কে—"

"উর্বশী। ওর অনেক পয়সা। আমি কিন্তু উর্বশী হতে পারি নি, তাই খেতে পাচ্ছি না। আর কিছু খাবার আছে আপনার?"

"হয়তো পাঁউরুটি আছে ও ঘরে। দেখি। জ্যামও আছে হয়তো—"

"নিয়ে আসুন—"

পাশের ঘর থেকে পাঁউরুটি আর জ্যাম নিয়ে এসে দেখি মেয়েটি টেবিলের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। অঝোর ঝরে কাঁদছে—।

—তোমার বাবা দিতে চাইলেও তোমার দাদা দেবে না।

—দেবে না কেন? আমার রাইট আছে—

—তোমার দাদা যদিও বা দিতে চায়, আমি বারণ করে দেবো। আমি কিছুতেই দিতে দেবো না।

মাধুরীর গলার আওয়াজে কঠিন দৃঢ়তায় দীপুর এত ভালো লাগলো। বউদি একেবারে হীরের টুকরো মেয়ে। সুভ্রা হলে এমনভাবে বলতে পারতো?

—তা হলে পাবো না পাঁচ টাকা? ঠিক আছে, দাদা আসুক, দাদার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।

মাধুরী এবার মুচকি হেসে বললো, সেই তো ভালো। অর্থাৎ মাধুরী জানেই, দীপু কোনোদিন মুখ ফুটে দাদার কাছে পয়সা চাইতে পারে না। যত হম্বিতম্বি সব তার বউদির কাছে।

সুভ্রা বললো, মাধুরী সিনেমায় যদি যাস তো, বল, তৈরী হয়ে নে। পরে গেলে আর কি টিকিট পাওয়া যাবে?

মাধুরী উৎসাহিত হয়ে বললো, ঠিক আছে চল তা হলে। দীপু, তুমি থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও, তোমাকে চা দিচ্ছি। ড্রেসিং আছে, পাউডারটি নিয়ে যাবে? তোমার দাদা এসে যদি খাবারের কথা বলে, বলো দোকান থেকে কিছু আনিয়ে নিতে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরা যাও না।

—শুভ্রা, তুই আগে বাথরুমে যাবি? তোর পর আমি গা ধুয়ে নেবো।

—এখন আর গা ধুতে হবে না। এসে ধুস। এখন শাড়ীটা শুধু একটু বদলে নে। আমি তো তাই করবো।

—না ভাই, আমি একটু গা না ধুয়ে বেরুতে পারবো না। এক্ষুনি হয়ে যাবে। আমি দীপুকে খাবারটা দিয়ে যাচ্ছি—তুই জলটা গরম হলে চা-টা করে দিস?

—ঠিক আছে, তুই গিয়ে বাথরুমে ঢোক তো। এক ঘণ্টা লাগাস নি আবার।

মাধবী ঢুকে গেল বাথরুমে, শুভ্রা গেল নিজের ঘরে কাপড় বদলাতে। দীপু চামচ দিয়ে পুডিংএর শেষ দানাটা পর্যন্ত খুঁটে খেল। গেলাসটা একেবারে খালি করে চুমুক দিল জলে। এখন একটা সিগারেট খেলে মন্দ হয় না। দীপু পকেটে সিগারেট দেশলাই রাখে না। বউদির ঘরে ঢুকে খুঁজলো, দাদার কোনো সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে কিনা। নেই। বরঞ্চ টোব্যাকো পাকিয়ে খায়, শুভ্রার ঘরে গেলে হয়তো টোব্যাকো আর কাগজ পাওয়া যেতে পারে। দীপু গেল না। শুভ্রা নিজেও এক সময় সিগারেট খেত দু একটা, দীপুর কাছ থেকেই খেয়েছে। শুভ্রদের বাড়ির ছাদে চিলেকোঠার পাশে দুপুরবেলা পা ছড়িয়ে বসে সে আর শুভ্রা একটা সিগারেটই টেনেছে দুজনে। শুভ্রা দীপুর একটা হাত কোলের ওপর নিয়ে খেলা করতো। যেদিন প্রথম ব্লাউজ খুলে শুভ্রার বুক দুটো দেখেছিল দীপু....কি দুর্দান্ত একটা ভয় মেশানো ভালো লাগা...শুধু তাই না, কৃতজ্ঞতাবোধও কি কম ছিল! শুভ্রার কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, তার মনে হয়েছিল, শুভ্রা সামান্য একটু দয়া করলেই দুপুরবেলার প্রচণ্ড গরমও চন্দনের মতন মোহময় হয়ে যায়!

দীপু আবার বারান্দায় এসে মোড়ায় বসলো। দেখতে লাগলো রাস্তায় মানুষের স্রোত। শুভ্রা এখনও চা বানিয়ে দিল না। না দিক, ব্যস্ততা কিছু নেই। এখনো অনেক সময় আছে। ওদের তো আর সিনেমায় যাওয়া হচ্ছে না আজ! একা একা বাড়ি পাহারা দেবার ছেলেই নয় দীপু। তা হলে কত আগেই কেটে পড়তো। কিন্তু সে জানে, ওরা আজ সিনেমায় যেতে পারবে না, শুধুই তাড়াহুড়ো করছে। হ্যাঁ, দীপু জানে। পরমেশ কি করছে এখন চাইবাসায়? অফিস থেকে খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরবে। কেননা, বাড়ি ফিরেও তো কিছু করার নেই। সামনে একটা বিশাল সন্ধে ও রাত পড়ে আছে। পরমেশ কি একা একা রোরো নদীর পারে বেড়াতে যায়? অথবা ছুটির নাম করে পরমেশ হয়তো টাটানগরেও চলে যেতে পারে। আহা, এই রকম নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যই হয়তো পরমেশকে টপ করে বিয়ে করে ফেলতে হবে। এখন পর্যন্ত যে-মেয়েটি পরমেশের অচেনা, তাকে তখন কি ভালোই না বাসবে!

শুভ্রার ঘরের দরজা খুলে গেল। এরই মধ্যে সব বদলে নিয়েছে শুভ্রা, অবশ্য মুখের পাউডার এখনো ভালো করে মোছেনি, ব্লাউজের সব বোতাম লাগায়নি। কালো ব্রা-র স্ট্র্যাপটা দেখা যাচ্ছে। দীপু চোখ ফিরিয়ে নিল। শুভ্রার বুক দেখে এক সময় তার বুক কাঁপতো, এখন আর তা দেখতে ইচ্ছে করে না। শুভ্রা আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি করে।

দীপু ডাকলো তাকে বললো, এই, চা বানিয়ে দিলি না?

—দিচ্ছি, বাবুর তর সয় না! দেখিস, রাতের ট্রেনটা ফেল না যেন!

—তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয়। তোদের আর বেশী সময় নেই।

এই এক রহস্য। শুভ্রা আর রঞ্জনদার মধ্যে গাঢ় ভালোবাসা। বউদি বলেছে একথা, দীপু নিজেও দেখে বুঝতে পারে, তবু শুভ্রা এমন অসভ্যতা করতে চায় কেন তার সঙ্গে। বিয়ের আগে তার বন্ধু ছিল বলে? কিন্তু বিয়ের পাঁচ দিন আগে রেস্তোরাঁর ক্যাবিনে বসে শুভ্রা যখন কান্নাকাটি করেছিল, তখন দীপু কি তাকে কথা দেয়নি যে সে আর কোনোদিন শুভ্রার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না? এখন দাদা-বউদির সঙ্গে দেখা করতে এসে যদি শুভ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেটা কি তার দোষ?

চায়ের কাপ দীপুর হাতে দিয়ে শুভ্রা একেবারে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। নিতান্ত তরল কণ্ঠ হিসেবেই যেন বললো, এই, তুই এখন কার সঙ্গে প্রেম করছিস রে।

—তা দিয়ে তোর দরকার কি?

প্রত্যেক মানুষেরই গায়ের গন্ধ আলাদা। শুভ্রার গায়ের গন্ধ আগে খুব ভালো করে চিনতো দীপু, সেই আঠেরো বছর বয়স থেকে। কিন্তু এখন সেই গন্ধটা পাচ্ছে না, এখন একটা উগ্র সেন্টের গন্ধ।

—তোর বুঝি এখন [illegible] সঙ্গে খুব ভাব?

শুভ্রার [illegible] কাঁধটা ছুঁয়ে আছে দীপুর কাঁধ। সিল্কের কাপড় পরেছে শুভ্রা। সিল্কের কাপড়ের [illegible] এমনিতেই একটু [illegible] আজকাল একটু [illegible]।

—হ্যাঁ। বেশ দেখা হয়।

[illegible] শুভ্রার [illegible] একটুও [illegible] নেই।

—[illegible] দীপু, [illegible] কি [illegible] বেশী সুন্দর [illegible]?

শুভ্রার [illegible] দীপু [illegible] চেয়ে তুই অনেক বেশী সুন্দরী।

শুভ্রা [illegible] চোখে [illegible] দীপুর দিকে। [illegible] দীপু [illegible] সম্পর্ক [illegible] একটা [illegible] তুই এখনও [illegible] সুন্দর [illegible]।

—বাঃ, বললে না [illegible]

ঠিক [illegible]

[illegible] একটু [illegible] কিছু [illegible]

—ঠিক!

হঠাৎ দীপুর লজ্জা করতে লাগলো। মনে মনে ঠিক করে ফেললো, সে আর কোনোদিন এই সময় এ বাড়িতে আসবে না। এখন এ প্রাইভেট শুধু মেয়েদের জগৎ। এখন এখানে সে অত্যন্ত বে-মানান। মেয়েদের মুখে ব্লাউজ কিংবা ব্রা—এইসব শব্দগুলো শুনলে তার কি রকম লজ্জা করে। কোনো জায়গা নেই, সে এখানে বসে থাকলে ওদের জামা কাপড় বদলাতে অসুবিধে।

দীপু উঠে দাঁড়ালো জানলার দিকে মুখ করে। গলিটা নির্জন [illegible] সুবিধে হলো না এখানে।

শুভ্রা আবার ফিরে এসে বললো, দীপু, আমি তোকে খুব জ্বালাতন করি, না রে?

—হ্যাঁ। বউদি যদি জানতে পারে—

—সত্যি খুব জ্বালাই? তুই বুঝি আর আমাকে একটুও ভালোবাসিস না?

—তোকে কি কখনো আমি ভালোবাসতুম নাকি?

—বাসতিস না?

—দূর, ভালোবাসা কি রে? কারুর জন্য মন-কেমন করা, না কারুর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দেবার ইচ্ছে? কোন্‌টা?

—ছিঃ দীপু—

দীপু হো-হো করে হেসে উঠলো। দীপুর চোখের দিকে তাকিয়ে শুভ্রা সেই হাসির অর্থ বুঝতে পারলো। একটু লাজুকভাবে বললো, সত্যি এখন আর ওসব কথা বলার কোনো মানে হয় না। কিন্তু দ্যাখ, তুই আমার চেয়ে এক বছর বয়সে ছোট, তোর সঙ্গে কি আমার বিয়ে হতে পারতো?

—আবার পাগলামি? আমি তোকে কোনোদিনও বিয়ে করতুম না। রঞ্জনদা কত ভালো লোক

—আমি কিন্তু তোকে এখনো—

মাধুরী বাথরুম থেকে বেরুতেই শুভ্রা একটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, দীপু, তুমি আর একটু চা নেবে?

—না।

দুজনেরই সাজগোজ শেষ, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে, তবু দীপুর কিছুতেই হচ্ছে না। ওদের তো আজ সিনেমায় যাওয়া সম্ভব নয়। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাধুরীর মুখের দিকে। বউদিরও কি কোন আগেকার প্রেমিক আছে? আহা, থাকলেও সে বেচারা এখানে আসার সুযোগ পায় না।

মাধুরী আর শুভ্রা বেরুতে যাবে, এই সময় নীলরঞ্জন বাড়িতে ঢুকলো।

(ক্রমশ)

॥ সংবাদ ॥

সম্প্রতি ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রযুক্তি-পদার্থ বিভাগের বিজ্ঞানীরা একটি ঝালাই করার যন্ত্র তৈরি করেছেন। ঝালাই-এর জন্যে এই যন্ত্রে ইলেকট্রোন রশ্মিকে কাজে লাগান হবে। মহাকাশ গবেষণা, পারমাণবিক চুল্লি, বিমাননির্মাণ এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির যে সমস্ত অংশকে গলিয়ে ঝালাই করার জন্যে প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন অথবা যে সমস্ত পদার্থ ঝালাই-এর সময় উন্মুক্ত আবহাওয়ার সঙ্গে সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, তাদের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র যথেষ্ট সাহায্য করবে। উপরন্তু, পরমাণু শিল্পের অগ্রগতি এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঝালাই-এর কাজে ইলেকট্রোন রশ্মির প্রয়োগ দিন দিন বাড়তে শুরু করেছে। পরমাণু চুল্লিতে প্রচুর তাপসহ বা অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল পদার্থের প্রয়োজন হয়। ঝালাই করার সময় যদি এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে সামান্যতম বাতাসের বুদ্বুদ থেকে যায় তা হলে শুধু চুল্লিটিরই যে ক্ষতি হতে পারে তা নয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোন দুর্ঘটনাও ঘটা অসম্ভব নয়। সাধারণত যে সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়ে থাকে তা হল, জারকোনিয়াম, কলাম্বিয়াম, টাইটেনিয়াম, বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়াম-সংকর ধাতু, প্রভৃতি।

যন্ত্রটির কার্য প্রণালী তেমন জটিল নয়। এর জন্যে টাংস্টেনের একটি তারকে অত্যন্ত গরম করে নেওয়া হয়। তখন ঐ তার থেকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রোন প্রবাহ। যার নাম ইলেকট্রোন রশ্মি। এখন যে বস্তুটিকে ঝালাই করতে হবে সেটি এবং এই টাংস্টেনের তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি করলেই ঐ রশ্মি বস্তুটির উপর গিয়ে পড়ে। বস্তুর উপর ইলেকট্রোনের আঘাতের ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাতেই ঝালাই-এর কাজ খুব কম সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব। ইলেকট্রোন রশ্মিকে ঝালাই-এর মুখে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে সাধারণত স্থির তড়িৎ বা তড়িৎ চুম্বক ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি এই যন্ত্রে ইলেকট্রোন রশ্মি-প্রক্ষেপক অর্থাৎ ইলেকট্রোন গান এবং ঝালাই-এর বস্তুটি একটি বায়ুহীন কক্ষে রেখে দেওয়া হয়। যন্ত্রটির মূল অংশ ৬১০ মিলিমিটার ব্যাসের স্টেইনলেস স্টিলের একটি কক্ষ। বাইরে থেকে ঝালাই-এর কাজ দেখা ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে। কক্ষের চাপ এক মিলিমিটারের দু' লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তড়িৎ বিভব তিরিশ কিলো ভোল্ট।

যন্ত্রটি তৈরি করতে মোট খরচ পড়েছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। বাইরে থেকে আনতে গেলে এই খরচ দু' লক্ষ টাকার উপরে গিয়ে দাঁড়াত।

ইতিমধ্যে নানা রকম তাপসহ এবং বিক্রিয়াশীল পদার্থের উপর পরীক্ষা করে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এক মিলিমিটার পুরু স্টেইনলেস স্টিলের নল, টাইটেনিয়ামের নল, প্রভৃতি যথেষ্ট সূক্ষ্মতা বজায় রেখে ঝালাই করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এই রশ্মির তীব্রতা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে দশ কোটি ওয়াট পর্যন্ত তোলা সম্ভব হওয়ায় যে স্থানটি ঝালাই করা হয় তার আশপাশের অংশ হঠাৎ খুব বেশি উত্তপ্ত হতে পারে না।

এই সাফল্য ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা খোয়ার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সাহায্য করবে।

*

ব্রিটেনের কয়েকজন জীববিজ্ঞানী একটি অদ্ভুত ধরনের রোগ বীজাণুর আসল স্বরূপ জানতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। রোগটি 'ভেড়ার চুলকানি'। এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে ভেড়ারা বেপরোয়াভাবে গা চুলকাতে থাকে। আশপাশে যা কিছু পায় তারই সঙ্গে গা ঘষতে শুরু করে দেয়। এর ফলে অনেক সময় তাদের গায়ের লোম উঠে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। ওঁদের ধারণা ছিল রোগটির মূল কারণ এক ধরনের ভাইরাস। কিন্তু আণবিক জীববিদ্যার সূত্র ধরে গবেষণা চালিয়ে এখন ওঁরা মত পাল্টাতে শুরু করেছেন। ওঁদের বক্তব্য, জীব-কোষের সৃষ্টি এবং তার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ডি এন এ-র ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। অথচ ভেড়ার ঐ চুলকানি-ভাইরাসে আদৌ ডি এন এ আছে কিনা সে কথা নিশ্চিত করে বলা এখনও সম্ভব হয়নি। ওঁদের অভিমত, বর্তমান শতকে জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রে এত বড় চাঞ্চল্যকর সমস্যার নজির নেই বললেই চলে।

ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়েছিল ১৯৬৭তে। ঐ সময় ব্রিটেনের কৃষি গবেষণা সংস্থার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পশু রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নতুন ধরনের এই ভাইরাসের ব্যাপারে আগ্রহী হন। এঁরা দেখলেন, শুধু ভেড়ার চুলকানি রোগই নয়, ঐ একই ভাইরাস মানুষের কিছু কিছু জটিল স্নায়বিক রোগেরও কারণ। আক্রান্ত ভেড়ার দেহ থেকে তাঁরা ঐ ভাইরাস

। ট্রম্বের কুশলীরা যে ঝালাই-যন্ত্রটি তৈরি করেছেন

কার্যটিকে বদলে করা খুবই কঠিন। যদি এই তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়, হয়ত মানুষের নানা রকম জটিল স্নায়বিক রোগ উপশমের ব্যাপারটিকে সহজতর করা সম্ভব হবে।

কিন্তু তারও চাইতে বড় প্রশ্ন : তা হলে ডি এন এ বা আর এন এ ই-কি জীবন অস্তিত্বের মূলে কথা নয়? জীবন সংকেত সম্পর্কে অতি সম্প্রতি যে সমস্ত তত্ত্বকে অবধারিতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে কে জানে, হয়ত সেটা একটি পূর্ণ প্রক্রিয়ার অংশ মাত্র। নতুন এই ভাইরাস হয়ত তারই একটি নতুন অনুচ্ছেদ।

*

প্রতি বছর মহাকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত উল্কা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, এই বর্ষণ প্রতি তেত্রিশ বছর অন্তর একবার করে প্রবল আকার ধারণ করে। তখন মনে হয় যেন রাতের আকাশে আলোর ফুলঝুরি দিয়ে কে দেওয়ালী খেলছে। গত ১৯৬৬তে ঐ ধরনের বর্ষণ হবার কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে যতটা জমকালো করে প্রচার করা হয়েছিল, বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। তবে এ ব্যাপারে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণটিতে কিন্তু যথেষ্ট চমৎকারিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বছর দুঘণ্টার টুকরোর মত আকাশ থেকে জ্বলন্ত উল্কা অবিরত ঝরে পড়েছিল। জনৈক শিল্পী সেই দৃশ্য তুলির টানে চিত্রায়িত করে গেছেন। এ ধরনের উল্কা বৃষ্টির জন্য আমাদের ১৯৯৮ পর্যন্ত আবার অপেক্ষা করতে হবে।

*

তাপ ও নিউট্রন রশ্মি উৎপাদন ছাড়াও সম্প্রতি কোন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থকে এখন খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে কাজে লাগান হচ্ছে। কার্যকারিতার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অন্যতম ক্যালিফোর্নিয়াম-২৫২। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই পদার্থটির সাহায্যে শুধু ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থই নয়, সমুদ্রের নীচেও যে সমস্ত খনিজ পদার্থ আছে তাদের স্বরূপ এবং পরিমাণ দুই-ই জানা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এই পদার্থের পরিমাণ কিন্তু খুবই নগণ্য।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ক্যালিফোর্নিয়াম-২৫২কে যখন সোনা বা রূপোর কাছাকাছি আনা হয় তখন তার বিচ্ছুরিত নিউট্রোন কণিকার আঘাতে তারা তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং বিকিরণ ক্ষমতা লাভ করে। বিশেষ এক ধরনের গ্রাহক যন্ত্রে ঐ বিকিরণ ধরে নিয়ে পরীক্ষা করে বলা সম্ভব ঠিক কোথায় সোনা বা রূপো অবস্থান করছে এবং তাদের পরিমাণ কত। দেখা গেছে এক টন আকরিকে যদি তিনের দশ আউন্স পরিমাণ সোনাও মিশে থাকে এই পরীক্ষায় সহজেই তা ধরা

শিল্পীর তুলিতে ১৮৩৩-এর উল্কা বৃষ্টি

পড়ে যায়। আর রূপোর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ টন প্রতি অর্ধ আউন্স। বিশেষজ্ঞরা বলেন সোনা এবং রূপো ছাড়াও আরও তিরিশটি পদার্থকে এর দ্বারা সন্ধান চালিয়ে বের করা যেতে পারে। এই পদার্থগুলির মধ্যে আছে ইউরেনিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ফ্লুওরিন, টিন, সিলিকন, লোহা এবং সোডিয়াম। অনেকের মতে ভূগর্ভস্থ জল বা তেলের সন্ধানও যোগাতে পারবে ক্যালিফোর্নিয়াম ২৫২। বর্তমানে এর প্রতি পাউন্ডের দাম ৪৫০০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩,০৭৫,০০০,০০০ টাকা। ভবিষ্যতে এক গ্রামের এক কোটি ভাগের এক ভাগের দাম পড়বে সাড়ে সাত শ টাকার মত। ওতেই অনুসন্ধানের কাজ চালান সম্ভব হবে।

সমরজিৎ কর

মজবুত ও চকচকে

ইয়েরা গেলাসগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে সৌন্দর্য এনে দেবে। নিখুঁত গেলাসগুলি বিচিত্ররকমের বাহারী নানা রঙে ও ডিজাইনে পাওয়া যায়। গেলাসের ধারগুলি অতি মসৃণ এবং প্রতিদিনের ব্যবহারেও ঠোকাঠুকিতেও ফাটল ধরে না। দেরী না ক'রে ইয়েরা গেলাস বেছে নিন—নিঃসন্দেহে সবার সেরা।

সবরকমের উপলক্ষের জন্য মানানসই ইয়েরা কাচের জিনিস:

প্রস্তুতকারক :
অ্যালেম্বিক গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড,
বরোদা-৩।
ভারতের সর্ববৃহৎ সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিত কারখানা।

অস্বস্তি বোধ করে ললিত বলল, গাড়িভাড়াটা।

—আচ্ছা, শোন মীরা, আমি যাচ্ছি তোর বাসায়, আর আধ ঘণ্টা পর, মিউজিক ক্লাসে যাওয়ার পথে।...ইস, তুই আজই লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিস আগে বলিসনি তো! হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল?...ফোন করে ভাল করেছিস, পি এস-এর নোটটা না হলে একদম প্রিপারেশন হত না...

ললিত হঠাৎ বুঝতে পারল মেয়েটা তাকে সময় দিচ্ছে। এবার তাকে একটা জায়গার নাম বলতে হবে। সে দ্রুত চিন্তা করে বলল—হিন্দুস্থান মার্টের ভিতরে যে চায়ের দোকানটা আছে—ঐখানে। সাড়ে চারটে।

—ইস, তোকে কি আর চিনতে পারবো, যা মুটিয়ে ফিরবি লক্ষ্ণৌ থেকে!

ললিত ইঙ্গিত বুঝল, বলল—আপনার পোশাকটা বলুন। আমিই আপনাকে চিনে নেবো।

—পরশুদিন মা একখানা শাড়ি কিনেছি না রে, দেড়শো টাকাও বেশি সস্তা। জামদানির ওপর পিংক বাটিকের কাজ। আজ পরে যাবো, দেখিস।...আচ্ছা ছাড়ছি... কেমন!

টেলিফোন রাখার পর ললিত টের পেল তার কপাল ঘামছে।

আরো আধঘণ্টা সময় আছে। কিন্তু একটু যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে ললিতের সে সাধ্য নেই। তাই সে আস্তে আস্তে হেঁটে হিন্দুস্থান মার্টের নির্জন চায়ের দোকানটায় এসে বসল। এক কাপ চা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল একজনের একটা পাওনা সে এখনো চুকিয়ে দেয়নি। ঠিক সময়ে সে ঠিক মেয়েটিকে পেয়ে গিয়েছিল টেলিফোন করার জন্য, আর অপর্ণার কলেজের নামটাও মনে পড়েছিল ঠিক সময়ে। মৃদু একটু হাসল ললিত আপন মনে, তারপর একদম ফাঁকা রেস্টুরেন্টটায় একটু চোখ বুলিয়ে অনুচ্চ ফিসফিস স্বরে বলল—ধন্যবাদ, তুমি খুব ভাল।

উত্তেজনাটা বড় চমৎকার লাগছিল ললিতের। এখন তার ইচ্ছে করছে আরো বহুবার ঐরকম রহস্যময়ভাবে সাঙ্কেতিক ভাষায় অচেনা মেয়েদের ফোন করে দুপুর-বেলায় এরকম রোজ এসে বসে থাকে এরকম রেস্তরাঁয় কারো জন্য অপেক্ষা করে। এরকম কত কিছু হতে পারত জীবনে—ঠিক যেন অলৌকিক কাণ্ড সব!

একটু অন্যমনস্ক ছিল ললিত। হঠাৎ সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলে দেখল চমৎকার শাড়ি পরা একটি রোগা ফর্সা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মুখখানা লম্বাটে একটু কিশোরীর মতো সুশ্রী। চোখ দুটো বড়, কিন্তু একটু ভারী—খুব কাঁদলে যেমন চোখের চেহারা হয়। তবে এ মেয়েটি কাঁদেনি—চোখ দুটোই ওরকম। মুখের হাসিটুকু দেখে মনে হয় এ খুব বেশী হাসে না কখনো। আঁচল জড়ানোর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীরটা ঢেকেছে।

একটু হেসে বলল—আপনিই ললিত?

ললিত মাথা নেড়ে বলল—বসুন।

বসল। তারপর একটু বিব্রত হেসে বলল—টেলিফোনে আমার কথা শুনে খুব হেসেছেন, না? কী করবো বলুন, আমাদের বাড়ির ঐরকম নিয়ম।...কই, চিঠিটা দেখি।

দেড় দুই লাইনের চিঠি, শুধু খামের কাছে তুলে দিয়ে ললিতের চোখের আড়াল করে গভীরভাবে পড়ল অপর্ণা। মুখখানা হঠাৎ বড় ম্লান হয়ে গেল। চিঠিটা ধরে রইল একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—আপনি ওর কিরকম বন্ধু—পুরোনো?

[illegible]

—ও! ওকে কেমন দেখলেন?

—খুব ভাল।

—কেন? মেয়েটা হঠাৎ খুব ভীষণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—একটু [illegible]

[illegible]

[illegible]

মেয়েটা চোখ নামিয়ে [illegible] টেবিলের নুনের কৌটোটা একটু নাড়াচাড়া করে, বলল —কী জানি! আমার কেমনই মনে হয় আমাদের যেন একটা বিপদ আসছে—

(ক্রমশ)

গীতিতে যেভাবে যারা গদীন তাঁরা সেভাবে গোনেন না। যাঁরা যথার্থ কীর্তন-গায়ক তাঁদের কাছে এর চেয়ে বেশী দাবি করতে গেলে ভুল হবে। এইটেই প্রচলিত কীর্তনের ভঙ্গী। কীর্তনের কাঠামো না দিয়ে এঁদের না হয়—এঁদের নিয়েই বাধা হল—সব রঙ্গকেই তো আর কঠিন কালো কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায় না?

এটা নিশ্চিত যে পদাবলী কীর্তন সম্বন্ধে গবেষণা হলে বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাসের একটা অধ্যায় পরিষ্কার হবে। পদাবলী কীর্তন যখন পরিকল্পিত হয় তখনও বাংলায় ধ্রুপদের ঢেউ আসেনি বলেই আমার বিশ্বাস কেননা পশ্চিম ভারতের সঙ্গে তখনও বাংলার তেমন সংযোগ ঘটেনি। কীর্তনের তালগুলি এবং মাত্রাগণনাপদ্ধতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এত দীর্ঘ বিলম্বিত তাল অথবা সংক্ষিপ্ত এবং বিভিন্ন প্রকৃতির তাল আর কোনও সঙ্গীতে নেই। এর মাত্রা গণনার পদ্ধতিও প্রাচীন পদ্ধতিরই নিদর্শন। কারণ, মাত্রা অনুসারী হাতফেরা এবং তালের প্রসারণগুলি ধ্রুপদ বা খেয়ালের তালে প্রচলিত নেই। প্রাচীন মার্গসঙ্গীতে এই ধরনের নানা পদ্ধতি ছিল। প্রচলিত তালের সঙ্গে কীর্তনের তালের পার্থক্য, কীর্তনের বিভিন্ন তালের নাম কিভাবে প্রবর্তিত হল—এগুলি সবই বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। এ ছাড়া কীর্তনের এস্থেটিকস একটি স্বতন্ত্র বিষয়।

অন্য দেশ হলে এই রকম একটি সঙ্গীত-শিল্প নিয়ে যথেষ্ট চর্চা এবং আলোচনা হত কিন্তু আমাদের দেশে [illegible] অন্য রকম। বহু দেখছি তাই মনে হচ্ছে সে চিন্তায় আমাদের নিজের দেশটাই যেন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরলোকগত সেতারী, শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমার প্রথম সংগীত শিক্ষাগুরু ও [illegible] উপ-মহাদেশের অন্যতম সেতারবাদক ওস্তাদ বিপিনচন্দ্র দাস দীর্ঘকাল ক্যান্সার রোগ ভোগের পর গত ১০ই আগস্ট '৬১ বুধবার তাঁহার নিজ বাটী গৌরীপুর ময়মনসিংহ পূর্ব পাকিস্তানে ৬৩ বৎসর বয়সে মারা গেছেন। উনি তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতারী ওস্তাদ এনায়েত খাঁ সাহেবের প্রিয় ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেব যখন গৌরীপুরে জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন তখন থেকেই অর্থাৎ বালক বয়স থেকেই তিনি সংগীতবিশারদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর সহিত তালিম নিতে থাকেন। তারপর একে একে 'ওস্তাদ [illegible] ব্যানার্জী, ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ২০।২৫ বছর সারা ভারতের নানা স্থানে, রাজা জমিদারের বাড়িতে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও সেতার বাজনা পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। [illegible] আকাশবাণী কলিকাতা ও ঢাকা থেকে আকাশবাণীর শিল্পী হিসাবে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যান। তারপর দেশ ভাগের পর স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করেন, ঢাকুরিয়ায় তাহার নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও। আজীবন প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে জীবনের শেষ দিনে নিঃস্ব অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় তিন মেয়ে, চার ছেলে ও অগণিত তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রেখে তিনি চলে যান।

গত ২৫শে আগস্ট '৬১ তারিখে নিজ বাটীতে শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ওস্তাদ বিপিন দাসের চরিত্র ও জীবনের নানা দিক আলোচনা করেন। তন্মধ্যে ওস্তাদ বিপিন দাসের [illegible] সংগীত বিশারদ ও প্রখ্যাত সেতারবাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত রায়চৌধুরী অন্যতম।

নীহাররঞ্জন দাস
কলিকাতা-০১

বড়ে গোলাম আলি স্মরণে

একটি বছর অতিক্রান্ত। বড়ে গোলাম আলির উদার ব্যাপ্ত কণ্ঠ স্তব্ধ হয়েছে। কয়েক বছর আগে ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপলব্ধি করেছিলাম, রসঘন শিল্পীর ওজস্বী কণ্ঠ বার্ধক্যের জীর্ণতাকে তুচ্ছ করে কীভাবে নানা রঙের রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত ঘরে। গত ৩০শে আগস্ট রবীন্দ্রসদনে এই অবিস্মরণীয় শিল্পীর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিল্পীর গানবাজনার ফাঁকে ফাঁকে সেই কণ্ঠই যেন অলক্ষ্যে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল বার বার। বিশেষত, তাঁর আত্মজ ওস্তাদ মুনাব্বর আলি খানের হংসধ্বনির খেয়াল এবং সেই সুপরিচিত ঠুংরি, আয়ে না বালম স্মৃতির প্রদীপটিকে যেন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করে দিয়েছিল।

দুটি সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে [illegible] বাজনা এবং [illegible] ভাষণ ছাড়াও ষোলজন শিল্পী কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত পরিবেশন করেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এঁরা প্রত্যেকেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত শিল্পী প্রভাতী মুখোপাধ্যায়ের মালকোষের খেয়াল বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে ভাল গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ('গাওতি' রাগে খেয়াল এবং ঠুংরি), ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগর (দরবারী কানাড়ায় আলাপ ও ধামার), মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (আড়ানা), প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেহাগ) এবং কুমার মুখোপাধ্যায় (নন্দ)। যন্ত্রসংগীতে ভি জি যোগের রসবোধের চেয়ে শ্রোতৃসচেতনতা কিছু বেশী ছিল বলে মনে হল। তিনি হাততালিও পেয়েছেন ভালই। বাহাদুর খাঁর দরবারী কানাড়ার আলাপটি বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু তার পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটিয়ে অন্য একটি রাগ (কিরবাণী) বাজালেন কেন বোঝা গেল না। ওস্তাদ ইমরৎ খাঁর সেতারে মালকোষ খুবই মর্মস্পর্শী লেগেছে তবে তাঁর বাজনায় মিষ্টত্ব যতটা ছিল, বৈচিত্র্য ততটা ফুটে ওঠেনি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেরামতুল্লা খাঁ, আফাক হোসেন, চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বসু প্রমুখ শিল্পীরা সঙ্গত করেন।

আনন্দবর্ধন

এই কৌটোতে কী আছে?

সৌন্দর্যসুষমাময় ত্বকের রহস্য !

ত্বক সাধারণত দুরকমের হয়। এক হ'ল স্বভাব-জাত সৌন্দর্যময় ত্বক, একটানা অম্লান থাকে যার সুষমা। অন্যটি ঠিক-তত-সুন্দর-নয় শ্রেণীর এবং এই ত্বকের সৌন্দর্যসুষমা ক্রমশ আরো বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। নিভিয়া ক্রীম বিশেষ করে উভয় শ্রেণীর উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। নিভিয়াতে রয়েছে আশ্চর্য ইউসেরাইট, একটি বিশিষ্ট উপাদান, যা আপনার দেহত্বকের স্বাভাবিক তৈলভাগ জোগায় এবং তাকে কোমল ও লাবণ্যময় করে তোলে। আপনি যদি রূপবতী হন, তাহলে নিভিয়া আপনার ত্বককে মসৃণ ও তারুণ্যমণ্ডিত রাখবে। যদি আপনার ত্বক হয় শুষ্ক ও রুক্ষ, নিভিয়া সেই শুষ্কতাকে দূর করে আপনার দেহত্বককে আরো সুস্থ, কোমল ও লাবণ্যময় করে তুলবে। আপনার দেহত্বক যেমনই হোক না কেন, নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করুন।

নিভিয়া –তারুণ্যমণ্ডিত লাবণ্যময় দেহত্বকের গোপনকথা !

স্মিথ ও নেফিউ-র তৈরী

MILKMAID
SWEETENED

FERRADOL
A VITAMIN NUTRITIVE TONIC
PARKE-DAVIS

কাঁচা ['অম্লকতে']। গল্প জমছিল বেশ। হঠাৎ দেখি, কালি আমার হাতে হাত বুলিয়ে মামদুকে কি যেন বলছে। বললাম, "কি বলছ?" দ্বিধা করল না, লজ্জা পেল না, শুধু বলল, "কি ফরসা!" বাক্যটের বিস্ময়সূচক চিহ্নটা স্পষ্টই শোনা গেল।

"হিংসে করছে বুঝি?"

এবার কিন্তু মেয়েটি দ্বিধাও করল একটু, লজ্জাও পেল সামান্য; চোখ না তুলে যেন কোন্ রসাতল থেকে উঠে-আসা গলায় বলল, "হ্যাঁ"।

তবে শোন: কালো চামড়া হল ঠিক দুধের দাঁতের মতো। দুধের দাঁত যেমন ভাঙলে নতুন দাঁত গজিয়ে ওঠে, তেমনি কালো চামড়াকে সাদা সাবান মেখে জোরে জোরে ঘষলে যে নতুন চামড়া ওঠে সেটা কিন্তু সাদা চামড়া; বিদেশের মায়েরা কায়দা জানে যে..."

"ইস্!" চোখেমুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাস ফুটে উঠল দুজনের, "একেবারে গুল!"

"না, গো, গুল না, বিলকুল সত্যি। পরখ করেই দেখ না!"

"ঠিক আছে, আজকে এখন চেষ্টা করে

কল্পনার প্রথম বছরের কাজ শুরু হয়েছে গত এপ্রিল মাসে; এই কয়টি মাসে যদি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিচয় আমরা দেখতে পেয়ে থাকি, তবে তার প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্থিতিশীলতা অর্জন।

কৃষি-খামার আধুনিকীকরণ সম্পর্কে সেন কমিটির প্রতিবেদন

পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব এবং খ্যাতনামা কৃষি-অর্থবিজ্ঞানী ডক্টর এস আর সেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি সম্প্রতি কৃষি-খামার আধুনিকীকরণ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছেন। কমিটির মতে কৃষি-খামারগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত করে তোলার প্রয়োজন খুবই বেশি। কৃষির উন্নতি অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এই উপাদানগুলির মধ্যে যদি অন্তত একটি উপাদানও দুষ্প্রাপ্য অথবা অপর্যাপ্ত হয় তবে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়। তাই সেন কমিটি মনে করেন কৃষির আধুনিকীকরণ অব্যাহত রাখার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দরকার, এবং এই কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন ধরনের কারিগরি উপাদান সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা দরকার। [illegible] আধুনিক খামারগুলি যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কমিটির ভাষায়:

"What is needed is to organise a system or a process for continued agricultural modernisation which uses new components of development as they become available, and adapts itself to the changing needs of the developmental process at the local level".

কমিটি কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছেন। কমিটির মতে কৃষি কর্মসূচীর [illegible] দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকারগুলির। কিন্তু কৃষির উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্য সরকারগুলি যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী হয়নি। টাকার অভাব তো আছে-ই। তা ছাড়া আছে উপযুক্ত কারিগরিক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীর অভাব। কৃষির উন্নতির জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কতিপয় প্রকল্প কার্যকর করায় অনেক অসুবিধা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির সর্বস্তরে সহযোগিতা না থাকলে কৃষিব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা আছে তার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজে। কারিগরি কর্মসূচীর নিরূপণ এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী রাজের ভূমিকা সীমিত রাখা উচিত হবে না। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে প্রজেক্ট অফিসারের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বজায় রাখা উচিত।

কৃষিব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ করলে নতুন সমস্যাদি প্রবর্তিত হবে। অনেকে আশঙ্কা করেন হয়তো এজন্য বেকার সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যদি পর্যায়ক্রমে কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয় এবং পতিত জমি উদ্ধার করে ও বছরে একাধিক-বার ফসল উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো হয় তবে বেকার সমস্যার চিন্তা কৃষি-খামারের আধুনিকীকরণের পথে বাধার সৃষ্টি করবে না। কৃষির উন্নতি এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির মধ্যে যোগসূত্র থাকা দরকার; ক্ষেত্রবিশেষে একটি অপরের পরিপূরক উপজীবিকা হতে পারে। জাপানে যেভাবে কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে, এবং যেভাবে একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরাও অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারি। ভারতে কৃষি-ব্যবস্থাকে আধুনিক করার ক্ষেত্রে সেন কমিটির প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হবে।

সুব্রত গুপ্ত

আধুনিক গঙ্গাযাত্রা

মেজর ম্যাকেঞ্জি কানাডার অন্টারিও প্রদেশের উইলিয়ম নামক গ্রামে থাকেন। ও'র বয়স নব্বই-এর কাছে। প্রথম দেখলে মনে হয় খুবে সবল শক্ত মানুষ কিন্তু দুদণ্ড কথা বললে বোঝা যায় বয়সের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ছোট্ট বাড়িখানায় একাই থাকেন। নিজের কাজ নিজে করতে হয়, কাজেই দেহখানাকে কিছু চেষ্টা করেও বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেই আমাদের দেশের বুড়ো মানুষের মতই মানুষকে আঁকড়ে ধরতে চান। বয়সের ভার, বয়স যাদের হয়নি তাদের কেমন করে জানাবে প্রয়াসে কেমন যেন [illegible]।

অনেক খোঁজাখুঁজি টেলিফোনের পর ম্যাকেঞ্জি সাহেবের দরজা খুললো। মনে হলো মনখুশীই [illegible] কিন্তু আমাদের দেখে খুশীতে, আনন্দে দন্তহীন [illegible] করে হেসে উঠলেন। ভারতীয় রেজিমেন্টের [illegible] কাটিয়েছেন প্রথম মহাযুদ্ধে। যে বন্ধুদের সঙ্গে [illegible] একজন হয়ে উঠলেন, "তুমি না [illegible]" একেবারে [illegible] ম্যাকেঞ্জি সাহেবের [illegible] হয় না। [illegible]

[illegible]

মাও করে উজিন্টের আলায় ঘোরাফেরা করছে। তবু আপ্যায়নের অভাব নেই। কফি খাওয়ালেনই। অন্তত কফির পেয়ালার আকর্ষণে আগন্তুক যদি দুদণ্ড বসে যায়।

গল্প করতে গুলিয়ে যায় কথা তবে স্কটল্যান্ডের কোন বিখ্যাত বংশ তাঁদের— এই ছিল কাহিনীর মূল উপজীব্য। দেওয়ালের গায়ে সেঁটে রেখেছেন স্কটিশ সব বংশের পোশাকের নমুনা, তার পাশে বংশের দলপতির সম্মান চিহ্ন বা Coat of Arms। সবার পাশে যা কিছু আছে, তাও ঐ একই বংশ গাথা। মনে হলো সবই গঙ্গাযাত্রার মন্ত্র মাত্র। হরিনারায়ণরূপ কাল অতীতের পারে নেয় [illegible] খেলা। তবু তো এদেশের বহু নিশ্চিত গঙ্গাযাত্রাও আপনজন আশেপাশে থাকতো। ম্যাকেঞ্জি সাহেব হচ্ছে একা ঘরে রাণীর ছবি, চার্চিলের আর স্কটল্যান্ড পতাকার মাঝে মহানিদ্রায় মগ্ন হবেন একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই তো মানুষ দেখলেই জড়িয়ে ধরেন। উঠে আসতে মনটা কেমন করে। নিষ্প্রভ দুই চোখে ছল ছল সজল দৃষ্টি, দুই হাতে সবাইকে করমর্দন করে চেয়ে রইলেন যতদূর দেখা গেল আমাদের।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব তবু এই ভালবাসেন। পয়সার অভাব নেই। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের আগারে ভর্তি হওয়ার চেয়ে একা মরাও ভাল। অন্তত ও'র তাই বিশ্বাস। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একত্র রাখার যেসব সামাজিক আয়োজন আছে তাকে এমন আতঙ্কের ব্যবস্থা মনে করতে দুর্বলতায় শেষ বয়সে আপনজনহীন একাকী জীবন বরণ করেও ম্যাকেঞ্জি সাহেব কাল কাটাতে রাজী, কিন্তু ছাঁচে ফেলা খাঁচার মত বন্দী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতিষ্ঠানমূলক ব্যবস্থায় তাঁর আস্থা নেই।

প্রতিষ্ঠানমূলক ব্যবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখা আমার বহুদিনের আগ্রহ। যখনই সুযোগ পেয়েছি পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা আর সমাজ বার্ধক্যের জন্য কি উদ্যোগ করছেন দেখবার চেষ্টা করেছি। আয়োজনে সম্পন্ন দেশের প্রাচুর্যের প্রকাশ বর্তমান লক্ষ করেছি। কিন্তু আমার মধ্যবিত্ত বাঙালী দৃষ্টিতে তার চেয়ে বেশী চোখে ঠেকেছে আয়োজনের প্রাণহীনতা আর যান্ত্রিকতা। বুড়ো মানুষগুলো যেন অনাথ

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গে

সুবোধ পুরকায়স্থের "রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে" দেশ (১০ ভাদ্র) মনোজ্ঞ রচনাটি রবীন্দ্রসংগীতের একটি সামগ্রিক সমালোচনা সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখক দিয়েছেন তার মূল্য অনস্বীকার্য।

তবে লেখকের বিবরণটুকু যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কথা যেখানে সারা, সুরের সেখানে শুরু—এ কথা রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রসংগীত একান্তভাবেই স্পর্শ করে আমাদের হৃদয়কে। সুতরাং তার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাও অনুভূতিসাপেক্ষ। অতএব লেখকের রচনাটিকে অনুভূতি দিয়েই বুঝতে হবে. It is more suggestive than expressive।

বাঙালী সংগীতপ্রিয় জাত—তার আকাশে চাঁদ উঠেছে অথচ [illegible] উঠেনি এমন কখনো ঘটেনি। [illegible] দেশের সংগীতসাধনায় রবীন্দ্রসংগীত একটি অপূর্ব সংযোজন। [illegible] সঙ্গে তার প্রাণের যোগ [illegible]। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] একটি কারণ। এ সম্বন্ধে [illegible] সচেতন ছিলেন। [illegible] তারা গান পড়তে পারে। [illegible] তারা গান বুঝতে পারে, কিন্তু [illegible] বাঙালীর পাইতেই হবে [illegible] রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে [illegible] বেজে উঠেছে—'সহজ কথা [illegible] সহজ হইল গান।'

পরিশেষে এ কথাই বলব, রবীন্দ্র-সংগীতের যে সমাদর হওয়া উচিত [illegible] তা হতে পারেনি। এ পথে [illegible] লেখা দীপবর্তিকা হোক।

সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় (৪৪ সংখ্যা [illegible] ১৩৭৬) প্রকাশিত শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ রচিত "রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে" প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে যেভাবে আলোকপাত করেছেন তা সুচিন্তিত। কিন্তু এই আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের প্রথমাংশে লেখক ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও সংযম-হীনতার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে।

প্রত্যেক শিল্পেরই একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে—সংগীতের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্র-সংগীত তার নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল। রাগসংগীতও তার স্বকীয় মাধুর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর একটির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্যটির প্রতি কটাক্ষ করা অপ্রয়োজনীয়। এবং এই প্রসঙ্গে সর্বজনস্বীকৃত কোন শিল্পের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ অমার্জনীয়।

ভারতীয় রাগসংগীতের যে-কোন শ্রোতাই জানেন যে, এর রসবৈচিত্র্য অতুলনীয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও এর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অথচ লেখক যখন বলেন—"সাধারণত ওস্তাদী গান মাধুর্যলেশহীন, এমন কি বিরক্তিকর", তখন একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রতি লেখকের এই অশ্রদ্ধা প্রকাশকে বেদনাদায়ক মনে হয়।

যন্ত্রের মাধ্যমে যে সংগীত প্রকাশিত হয় তাই 'যন্ত্রসংগীত', তেমনি কণ্ঠের মাধ্যমে যে সংগীত প্রকাশিত হয় তাই 'কণ্ঠসংগীত', তার মধ্যে কথার প্রয়োগ আছে

কি নেই, তার উপর কণ্ঠসংগীতের আদর্শ নির্ভর করে না। এ কথা সত্য হলে কণ্ঠসংগীতের আদর্শ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, বরং "কথার প্রতি হেলাফেলা প্রকাশ যেন ওস্তাদী সংগীতের চরিত্রলক্ষণ"—লেখকের এ উক্তি আপত্তিকর। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে ভারতীয় বেদের সাম্য সম্বন্ধে লেখক যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা অত্যন্ত হাস্যকর, এবং এই প্রসঙ্গে ঠুংরী, টপ্পা ও খেয়াল গানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেমন "তান ও গানকে মর্মার্থবোধক করে তোলার বেপরোয়া খেয়ালই, বোধ করি, খেয়াল সংগীতের বৈশিষ্ট্য"—ইত্যাদি মন্তব্যের ভিতর দিয়ে লেখকের অস্বাচ্ছন্দ্য ও সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

কারুর ব্যক্তিগত রুচি ও মতামত সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু তার বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যখন একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও শিল্প-গোষ্ঠীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়—তখন সেই অসংযমী রচনাটির সম্পাদকীয় ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

মৃণাল ঘোষ
সোদপুর

অপু ও বিভূতিভূষণ

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অপু ও বিভূতিভূষণ' পড়লাম। লেখাটি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মূল্যবান রচনাটিতে প্রচুর অজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশে লেখকের পরিশ্রমের স্বাক্ষর প্রকাশিত। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' গ্রন্থ দুটি বিভূতিভূষণের অসামান্য সৃজনীশক্তির নিদর্শন। এই গ্রন্থ দুটির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের এক সুগভীর সহৃদয়তার সম্পর্ক বহুকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার নিগূঢ় বাস্তব জীবনচিত্র এই গ্রন্থ দুটিতে পরিস্ফুট। তিরিশের লেখক সম্প্রদায় যখন বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে রবীন্দ্রবিরোধের সূচনা করেছিলেন তখন বিভূতিভূষণ অনায়াসে দুই শিবিরের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। বাস্তবতার সঙ্গে অপূর্ব কবি-কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন বলেই তাঁর রচনা সার্থক হয়েছিল। আলোচ্য রচনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের বিখ্যাত এই গ্রন্থদ্বয়ের সুচিহ্নিত চরিত্রগুলির বাস্তব ভিত্তি উদ্ঘাটন করেছেন। বাস্তবকে সাহিত্যে কী উপায়ে একজন শক্তিমান লেখক স্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন তার পরিচয় পেয়ে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়।

তবে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই লেখায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র 'লীলা' প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত থাকায় কিছুটা অতৃপ্তি থেকে যায়। যে শক্তিমান লেখক প্রত্যেকটি চরিত্র-চিত্রণে বাস্তব উপাদান ব্যবহার করেছেন—তিনিই লীলার মত একটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টিতে বাস্তবের সহায়তা নেন নি, তা বিশ্বাস করা শক্ত; বিশেষত, যেখানে লীলা-চরিত্রের প্রতি লেখকের সুগভীর সহানুভূতি ও দুর্বলতা অপরিজ্ঞাত থাকে নি। সুতরাং এ বিষয়ে সম্ভাব্য তথ্যের ইঙ্গিত থাকলে তা আলোচনায় অন্তর্গত হতে পারে।

ডালিয়া কর
নতুন দিল্লি-

ক্যানসারের ওষুধ

৬ই অগ্রের 'দেশ'-এ প্রাণেশ চক্রবর্তী লিখিত "কুড় থেকে ক্যানসারের ওষুধ" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লাম। কুড় সম্বন্ধে ভেষজ-বিজ্ঞানীরা অনবহিত নন। কুড় বা Saussurea lappa. C. B. Clarke নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে গত শতাব্দী

আছে, রবীন্দ্রনাথ কোনো বিখ্যাত দোকানের বই চাখছেন, হাতে নতুন লেখকের একটি বই। রবীন্দ্রনাথ দু' বার বললেন ভালো, ভালো! সেক্রেটারি বইয়ের দোকানে ও গ্রন্থকারের কাছে দু' খানা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভালো!)

সমালোচকদের হাতে পৌঁছচ্ছে যে সব বইয়ের সমালোচনা হবে, তার কোনো মানে নেই। সমালোচকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন সমালোচক জন লেনার্ড নিজের মুখে স্বীকার করেছেন, তাঁর প্রথম ছেলে জন্মাবার দু চার মাস আগে তিনি শুধু 'পিপ্‌ল্‌ পাওয়ার' জাতীয় গ্রন্থের সমালোচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এ ছাড়া, ওদের দেশে আছে, প্রকাশকদের পক্ষ থেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানো; কিংবা বন্ধুর টেলিফোন, আমার বন্ধুর লেখা লেটেস্টটির বই সম্পর্কে একটু ভালো করে লিখে দিও হে! এ সবের ফলে, সমালোচক বড় জোর বইটি পড়ে দেখবেন, তার মানেই যে প্রশংসা করবেন, তা নয় অবশ্য।

এইভাবে কি সমালোচনা বিভাগ চালানো উচিত। নিশ্চয়ই না। প্রত্যেক বইয়েরই ভালো বা খারাপ সমালোচনা পাওয়ার অধিকার আছে। তবে, যদিও বই শেষ পর্যন্ত সমালোচিত হয় না, তাঁরা ভাবেন, এখানে বুঝি কোনো ষড়যন্ত্র চলছে! এ সম্পর্কেও জন লেনার্ড বলেছেন "সমালোচনার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র-টন্ত্র কিছু নেই। স্রেফ জায়গা আর অব্যবস্থা।" নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য বন্ধুবান্ধবদের উপরোধ এড়াবার জন্য, আর একজন সমালোচক জন সাইমন সুপারিশ করেছেন, সমালোচক নিজে থেকে যে বইটি চাইবেন, সেটা নিশ্চয়ই, তাঁকে দেওয়া উচিত নয়। বন্ধুদের লেখার প্রতি [illegible] দুর্বার লেখায় এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

এর পরেই অ্যানেকডোটে, আমাদের দেশের সঙ্গে ওদেশের কোনোই মিল নেই। ওদেশে অনেকেই শুধু পুস্তক সমালোচনা লিখে জীবিকা নির্বাহ করেন। শুধু নিউইয়র্ক টাইমস অর্জন করেছেন, এর জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। লাইফ ম্যাগাজিন আজও একটি সমালোচনার জন্য দেড় হাজার টাকার মতন। সানডে টাইমস দেড়শ থেকে দুশো টাকা। দু' চারজন নামকরা সমালোচক অবশ্য বেশী পান। হারপার্স ম্যাগাজিনের আর্থার মিলার মাঝে মাঝে একখানা বইয়ের সমালোচনা লেখার জন্য পান পাঁচ হাজার টাকা। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা নিজে কত দেন, তা অবশ্য জানাননি।

আমাদের দেশে পুস্তক সমালোচনার জন্য টাকা দেওয়াই একটা আশ্চর্য ঘটনা। অনেকের ধারণা, ফ্রি বই পাওয়াই যথেষ্ট। তবে কোনো পত্রিকা কুড়ি পঁচিশ টাকা দিলে সেটাকেই সৌভাগ্য হিসেবে গণ্য করাই প্রথা!

ত্রুটি স্বীকার।

দু সপ্তাহ আগে বিষ্ণু দে সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর নতুন বইটির নাম ভুল লেখা হয়েছিল। বইটির নাম 'সংবাদ মূলত কাব্য'। ভুল ছাপাখানার নয়, আমার।

সনাতন পাঠক

ছিল ?" এবং বিষ্ণু দেবের "স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত" থেকে জেনেট্‌ সম্পর্কে প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে লোপামুদ্রার সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ এবং কবির রচিত একটি কবিতা সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রভৃতির কবিতা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প সাহিত্যরসিক পাঠক মহলে পত্রিকাখানিকে সমাদৃত করে তুলবে।

খড়্গপুর কলেজ পত্রিকা। সম্পাদিকা : ভবানী বসু। সাহিত্য সমিতি : খড়্গপুর কলেজ, খড়্গপুর।

যে কোন শিক্ষায়তন থেকে প্রকাশিত পত্রিকাবলীর মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে। রচনাবলীর মানের দিক থেকে এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবে পত্রিকাখানি ওই কলেজের সাহিত্য সমিতির কৃতিত্বের পরিচায়ক।

প্রাপ্তি স্বীকার

লোকায়ত বাংলা। সুনীল চক্রবর্তী। কল্যাণী প্রকাশন : ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য : ৮·০০।

Occupational Mobility and Caste Structure in Bengal by P. K. Bhowmick. Indian Publications: 3 British Indian Street, Calcutta-1. Rs 15.00.

নয়া চাঁদে এক চক্কর। ইবরাহিম খাঁ। আহমদ পাবলিশিং হাউস : ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১। মূল্য ৫·০০।

রক্তে রাঙা রাজপথ। তারকনাথ ভট্টাচার্য। রাজেন্দ্র লাইব্রেরী : ১৩২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ৩·৫০।

মায়ের দুলাল। ইবরাহিম খাঁ। ১৬২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা। মূল্য ১·২৫।

মহাসংগ্রাম। বিমলেন্দু চক্রবর্তী। কথায়ন : ২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য ৫·০০।

রাজার ঘরে যে ধন নেই। ডাঃ কল্যাণী দেবী। ত্রিভুজ পাবলিশিং কোম্পানী : ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ২·০০।

মোটরগাড়ী চালাতে চাই। ননীগোপাল চক্রবর্তী। ত্রিভুজ পাবলিশিং কোম্পানী : ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ৩·০০।

বিবেকানন্দ-শিলা স্মারক-গ্রন্থ। সম্পাদনা : অমিয়কুমার মজুমদার, প্রণবরঞ্জন ঘোষ। বিবেকানন্দ-শিলা স্মারক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ : ৬০।২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

(পি ৭৩০৬)

বাসু ভট্টাচার্যের হিন্দীচিত্র "অনুভব" এখন শেষ পর্যায়ে—ছবির একটি দৃশ্যে সঞ্জীবকুমার ও তনুজা

ইন্দ্রজিৎ' ও বল্লভপুরের রূপকথা, এ দুটি নাটকই স্থানীয় দশকদের মনে গাঢ় দাগ কেটেছে। দুটি নাটকই সুপরিচালিত এবং অভিনীত। দুটি নাটকই নাট্যকার বাদল সরকার লিখিত। বল্লভপুরের রূপকথা শুনলাম এখনো বাংলা ভাষাতেও অভিনীত হয়নি। এবং ইন্দ্রজিৎ', কোলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ভাষায় মঞ্চস্থ হয়েছে, যাঁরা বিভিন্ন সংস্থার "এবং ইন্দ্রজিৎ" দেখেছেন তাঁদের মতে শ্যামানন্দ জালান পরিচালিত এবম ইন্দ্রজিৎই নাকি শ্রেষ্ঠ। অত্যন্ত আনন্দের কথা। হিন্দী নাটকও যদি কোলকাতা থেকেই রসোত্তীর্ণতার দিকে এগোয় তাহলে কোলকাতার গর্ব বাড়বে বই কমবে না।

বিখ্যাত নাটক 'অল মাই সান্‌স্'-এর হিন্দী নাট্যরূপ 'মেরে বাচ্চে'। যদিও রাজস্থানী মহিলা মণ্ডলের দেওয়া কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, এটা "মেয়েদের এবং বাচ্চাদের জন্য" লিখিত বিশেষ কোন হাল্কা নাটক। "মেরে বাচ্চে" নাটকটি আসলে কি সেটা না জেনেই এরা আন্দাজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন এই বলে যে "মেরে বাচ্চে" কেবলমাত্র মহিলা এবং বাচ্চাদের জন্য। এবং বিশ্বাস করুন নাটকের দিন দেখলাম সাত-আটশ দর্শকের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশজনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নেই। সত্যিই এদেশে সবই সম্ভব।

'অনামিকা'র সদস্যদের অভিনন্দন জানাতে স্থানীয় মারাঠী সাহিত্য সংঘ নিজেদের সম্মেলন হলে অনেককে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই জমায়েতে বম্বের নাট্য আন্দোলনের প্রথম সারির একজন সত্যদেব দুবে অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বললেন যেটা বলে আমিও শেষ করব।

"অনামিকা এবার বম্বে এসেছেন রাজস্থানী মহিলা মণ্ডলের গৃহ নির্মাণকল্পে চাঁদা তোলায় সাহায্য করতে। তাই মোটা চাঁদা দিতে অপারগ নাট্যামোদীরা এদের নাটক দেখতে পেলেন না। আশা করি, আবার অনামিকা বম্বে আসবেন এবং চাঁদা তোলায় সাহায্য করতে নয়, নাটক করতে আসবেন।" সবাই হাততালি দিল।

সরল শর্মা

'শ্যামা' আবৃত্তি পদ্মেতার মৃত্যাপারকল্পনা প্রশংসনীয়।

উৎসবে সভাপতি এবং প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রেমেন্দ্র মিত্র।

আনন্দবর্ধন

রেকর্ড সমালোচনা

বাইশে শ্রাবণ স্মরণে গ্রামোফোন কোম্পানি যে-কয়টি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বের করেছেন, তার মধ্যে বনানী ঘোষ ও গোরা সর্বাধিকারীর গান রয়েছে। বনানী ঘোষের গানের সম্বন্ধে নতুন করে বিশেষ বলবার নেই। রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর পারদর্শিতা ইতিপূর্বে প্রমাণিত। এবার তাঁর গাওয়া দুটি গান (আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে/সুখে আছি, সুখে আছি) চিত্তাকর্ষক হয়েছে আর বেশী এই কারণে যে শিল্পী দুটি গানেই অনুভূতির স্পর্শ ছা[...] দিতে পেরেছেন। একথা নবাগত রেক[...] শিল্পী গোরা সর্বাধিকারীর গান (পর[...] চলে এসো ঘরে/হাসি কেন নাই ও নয়[...] সম্পর্কেও অনেকটা বলা চলে। তবে শিল[...] যিনি কর্মজীবন এবং সংগীতসাধনার [...] নিষ্ঠাবতীর সঙ্গে যত্ন, গানের গায়কি[...] ব্যাকরণের প্রতি অধিক মনোযোগী [...] হন। এটা ভেবের নয়, যদি তাঁর সা[...] প্রাণের যোগ থাকে। তাঁর গলা [...] ভবিষ্যতেও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বলা চলে।

আধুনিক গান

উৎপলবরণের আধুনিক গানের রেক[...] (শ্রীমতী নাচে মধুবনে/ওই দুটি নীল চোখ[...] সব বেরিয়েছে। নিয়মমাফিক একটি [...] হাল্কা সুরের, অপরটি রাগাভিত্তিক। [...] বাহুল্য, শেষের গানটি—শ্রীমতী নাচে মধুব[...] —রসজ্ঞ শ্রোতার বেশী ভাল লাগবে। [...] গলায় উৎপলবরণ গানটি গেয়েছেন। সু[...] তাল দিয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

অরণ্যদেব

লী ফক

২রা অগাস্ট, ১৪৯২ খ্রীঃ
আজ রাতটা সরাইখানায় ঘুমোও, বাল ভোরে আমরা যাত্রা করব।

এই ছুঁড়ির বাচ্চাটা কিনা পাগলা কাপ্তানের পাল্লায় পড়ল!
এটাও পাগলা! নির্ঘাত মারা পড়বে!

ভুতুড়ে টিপির উপরে বসে ডায়ানাকে অরণ্যদেব এক পুরনো কাহিনী শোনাচ্ছেন…
ধৈর্য ধরে সবটা শোনো, ডায়ানা। পরদিন সকালে ওরা তো যাত্রা করল—

৩রা অগাস্ট, ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ…স্পেনের পালোস বন্দর
ব্যাটারা মরতে চলেছে!

৮০ জন মাল্লা…তিনটি পালতোলা
(৫০টন), নিনা (৪০টন)……
মাদ্রে, কেননা, পৃথিবী গোলাকার!
1/26

"সেকেলের লোকেরা মনে করত, পৃথিবী চ্যাপটা থালার মতো, আর সেই থালার ধারে রয়েছে ভয়ংকর সব প্রাণী।"

"পাঁচ সপ্তাহ পরে দেখা গেল ডাঙা!"
ডাঙা
ডাঙা! ডাঙা!

আমার পূর্বপুরুষ—প্রথম অরণ্যদেবের বাবা……
৪

কোসিগিন চু এন-লাই সাক্ষাৎকার এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য ঘটনা। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ১১ সেপটেম্বর হ্যানয় থেকে মসকো যাওয়ার পথে আকস্মিকভাবে পিকিংয়ে গিয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ খোলামনে আলোচনাও হয়েছে। সোভিয়েট ও চীনের বর্তমান রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি যেমন আকস্মিক, তেমনি নাটকীয়। মসকো থেকে সরকারীভাবে এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোভিয়েট প্রস্তাব অনুযায়ীই হঠাৎ এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানা যায় নি। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, রাশিয়া-চীন সীমান্ত বিরোধ এবং ভিয়েতনামই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়। পর্যালোচকদের মতে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যেই পিকিং বৈঠকে রাশিয়া উদ্যোগী হয়েছিল। এই আলোচনা দুই দেশের পক্ষেই কাজের হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সোভিয়েট-চীন বিরোধ শুরু হওয়ার সাড়ে চার বছর বাদে আবার দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পরস্পরের মুখোমুখি হলেন আলোচনার টেবিলে।

দেশী সংবাদ

৮ সেপটেম্বর—প্রায় পাঁচঘণ্টা আলোচনার পর আজ যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু শরিক দলগুলিকে আশ্বাস দিয়েছেন, বরাহনগরের ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতার করা হবে। বরাহনগরে ঘটনার প্রতিবাদে সি পি আই গত মঙ্গলবার ফ্রন্টের বৈঠক বর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত বরাহনগর নিয়ে আলোচনার জন্য জরুরী বৈঠক ডাকা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র যে বিবৃতি তৈয়ার করেছেন তার বক্তব্য : প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় আমার সভাপতিত্ব করা উচিত কিনা তা নিয়ে এক তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি চাই তাঁর সভা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক। তাই স্থির করেছি, ওই সভায় আমি সভাপতিত্ব করবো না, উপস্থিতও থাকবো না।

৯ সেপটেম্বর—গুণ্ডামী, মেয়েদের উপর হামলা, লুটপাট ইত্যাদি অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে গতকাল রাত্রে দিল্লিতে রবীন্দ্র রঙ্গশালায় প্রথম কমনওয়েলথ যুব উৎসবের শোচনীয় সমাপ্তি ঘটে। একদল দুর্বৃত্ত কয়েকজন ছাত্রীর উপর হামলার চেষ্টা করে। এই থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। পুলিস লাঠি চার্জ করে বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোটে জানান, নিজেরা অধিকার অর্জন করেননি এমন জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ করে যে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র ভূমিহীন পরিবার বসবাস করছেন, সরকার তাঁদের উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করেছেন।

১০ সেপটেম্বর—আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদীয় পার্টি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং আর এক রাউণ্ড আলোচনার পর দলের বহু এম এল এ ও নেতার উপস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করলেন : সকলের অনুরোধে এবং দলের ঐক্যের স্বার্থে আমি প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত।

দিল্লির রঙ্গশালায় মেয়েদের উপর হামলার প্রসঙ্গ নিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুদলে কদ-প্রতিবাদ, চিৎকার, শেষে ধস্তাধস্তি-ধাক্কাধাক্কি চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] ধিক্কার জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবনের

পদত্যাগও দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত দলীয় [illegible] পনের মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতুবী করে দেন।

১১ সেপটেম্বর—চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে পশ্চিম বাংলায় ২ হাজার ৮ শত ২৫ জন আত্মহত্যা করেছে। এই রাজ্যে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ হাজার ৬ শত ৮২ এবং ৩ হাজার ৮ শত।

কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ১৯৩৬ সালের মামলা এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে। এখানে জমে থাকা মামলার সংখ্যা বর্তমানে ১৬ হাজার। আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিটি সিভিল কোর্ট (সংশোধন) বিলের উপর বক্তৃতাকালে বিচারমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল এইতথ্য প্রকাশ করেন।

১২ সেপটেম্বর—আজ বিকালে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারত থেকে "দারিদ্র্য" সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সকল শ্রেণীর লোককে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণই কংগ্রেসের শক্তির মূল উৎস। [illegible] কংগ্রেসের বিভক্তি [illegible] ঘটেছে। "জনগণই কংগ্রেসে জনগণ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।" একথা স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

১৩ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ কলিকাতায় পরিষ্কার ঘোষণা করেন, এখন বা ১৯৭২ সালে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কংগ্রেসই ভারতের জাতীয় দল। সুতরাং কংগ্রেস পরিচালিত সরকারই ভারতের জাতীয় সরকার। যাঁরা তাঁদের সমচিন্তাভাগী, প্রধানমন্ত্রী বরং তাঁদেরই কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি এলাকায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ কিছু শিথিল করার জন্য তিনি ভাবছেন।

১৪ সেপটেম্বর—ভারতীয় সংবিধান সংশোধন না করেই সমাজতান্ত্রিক নীতি কার্যকরী করা সম্ভব বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী আজ সকালে কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য এবং পৌরসভায় নতুন আয়ের সংস্থানের জন্য শহরে প্রান্তিক কর বসাবার প্রস্তাবটি বিচার বিবেচনা করবেন বলে মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূরকে আশ্বাস দিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

৮ সেপটেম্বর—হো-চি-মিনের প্রয়াণে তিন দিনের জন্য যুদ্ধ সংবরণ আজ মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনী শর্ত সাপেক্ষে মেনে নিয়েছে। [illegible] কমিউনিস্টদের শক্তি সমাবেশ চলতে দেখলে প্রয়োজনবোধে গুলি চালানো হবে।

৯ সেপটেম্বর—ভিয়েতনাম [illegible] এন [illegible] আজ জানা গেল উত্তর ভিয়েতনামের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট [illegible]। এঁর বয়স ৮১ বৎসর। তিনি বহুদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

১০ সেপটেম্বর—পিকিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সীমান্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদেশী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

১১ সেপটেম্বর—সিনাই এবং [illegible] এলাকায় ইজরায়েল বাহিনীর উপর ট্যাঙ্ক [illegible] বিমান থেকে বিমানবিধ্বংসী গোলা বর্ষণ করে। মোট ৩৬ ঘণ্টার এই বিমান আক্রমণে ইজরায়েলের [illegible] সদর দপ্তর, একটি রাডারের স্টেশন এবং একটি [illegible] বিধ্বস্ত হয়েছে।

১২ সেপটেম্বর—[illegible] [illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] [illegible] কমিউনিস্ট পার্টি [illegible] একটি নয়া পার্টি গড়ার চেষ্টা করছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ফৌজের প্রভাব দূর করে।

১৩ সেপটেম্বর—[illegible] ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী [illegible] গুজরাল এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের জাতীয় নির্দেশমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ ফায়েকের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে, সংবাদ সংস্থা ও বেতারের কাজ সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতে জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে মিশর যোগ দেবে।

১৪ সেপটেম্বর—ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলতে থাকায় [illegible] সরকার সমগ্র দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং তৈল ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির রাষ্ট্রপক্ষে কেন্দ্রসমূহ দখল করতে সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চক্রবেড় রেল—	...	৮৪৯
ব্যঙ্গচিত্র—	...	৮৫০
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	৮৫১
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	৮৫৩
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	৮৫৪
সুনন্দর জার্নাল—	...	৮৫৫
এই দস্যু চিঠিগুলি (কবিতা)—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী	...	৮৫৭
ভুল (কবিতা)—শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৮৫৭
অন্ধকারে-রাগে (কবিতা)—শ্রীতুষার রায়	...	৮৫৭

দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি...
সকল রকম ধকল
সইতেই তৈরি
বাটার ছোটদের জুতো
পায়ের আকারে ও জুতোর গড়নে যখন যথার্থ মিল,
জুতো তখনই হয় আরামের আধার, আর
রীতিমতো টেকসই। বাটার ছোটদের জুতোর
যে নকশা তার মূলে আছে এই আরামনীতি।
তাই স্কুলের পথে বা খেলার মাঠে ছোটদের পায়ে
বাটার জুতো আজীবন খুশি পায়ে চলার সহায়।
সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা,
খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর
ঘন নমনীয় তলি—বাটার জুতোর এইসব বৈশিষ্ট্যের
গুণেই সুঠাম গড়নে বেড়ে ওঠে ছোটদের পা।
রঙদার বাহারে নকশার অসংখ্য জুতো এখন মজুত
বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন
আপনার বাচ্চাদের, এদের খুশি পায়েই
শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
Bata
১৪.৯৫—১৮.৯৫
১২.৯৫—১৪.৯৫
ইভা
১১.৯৫—১৭.৯৫
শিশু
৬.৮০—১২.৯৫
সুপারটাফ
১৩.৯৫—২২.৯৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
খোলামকুচি	শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়	... ৮৫৯
অদূরের দিল্লী	দরবেশ	... ৮৬৯
সুয়োমির চিঠি	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	... ৮৭৩
জীবন যে-রকম	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	... ৮৭৭
বিশ্ববিজ্ঞান	শ্রীসমরজিৎ কর	... ৮৮৩
পারাপার	শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	... ৮৮৯
ঘরে-বাইরে	শ্রীমতী	... ৮৯৭
আর্থিক ভারত	শ্রীসুব্রত গুপ্ত	... ৯০১
বাংলার চালচিত্র	শ্রীআব্দুল জব্বার	... ৯০৩
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা	ফাদার দ্যতিয়েন	... ৯১৩
চিত্র প্রদর্শনী	চিত্রপ্রিয়	... ৯১৭

সূচিপত্র

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৯১৯
আলোচনা—	...	৯২১
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৯০১
পুস্তক পরিচয়—	...	৯৩৩
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৯৩৭
ব্যাডমিণ্টনের আইনকানুন—মুকুল	...	৯৪০
রঙ্গজগৎ—	...	৯৪১
অরণ্যদেব—	...	৯৪৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৯৪৮

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীদিলীপকুমার দাশ

তা হ'লে মারফি মিউজিসিয়ানই কিনতে বলছেন
একশোবার! কোথায় পাবেন মশাই এমন ট্রানজিষ্টর?
আওয়াজ কেমন?
যেমন আপনি চান। আস্তে চালান কানে কানে গুন গুন করবে, বাড়িয়ে দিন গমগমে শব্দে ঘর ভরে উঠবে. আরও বাড়ালে অবশ্য পাড়া ছাড়তে হবে!
পরিষ্কার শোনা যায়, না ঘড় ঘড় শব্দ করবে?
ধরুন না যে ষ্টেশন হচ্ছে, মনে হবে রেডিও ষ্টেশনের স্টুডিওর মধ্যে বসে আছেন. এত পরিষ্কার।
ব্যাটারী খুঁজতে হয়রাণী হবে না তো?
চারটে টর্চ-ব্যাটারীতে চলে মশাই - পাড়ার দোকানেই পাবেন।
কিন্তু দামটা যে একটু বেশী?
ঐ দেখুন। সিল্টীর দামে খাঁটি সোনা কোথায় পাবেন মশাই। ভাল জিনিষের দাম বেশীই হয়।
তা হ'লে তো আজই মারফি মিউজিসিয়ান বাড়ী নিয়ে যাব।
দাম ঃ ১২৫৲
মারফি — বাড়িতে আনন্দের নির্ঝর
মারফির আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ট্রানজিষ্টর :
দাম ঃ ১১০৲
মিনি মাষ্টার দাম ঃ ২২০৲
মুসাফির দাম ঃ ২৮৩৲
NAS-4294

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৮
শনিবার ১০ আশ্বিন, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীঅশোককুমার সরকার
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২২-২২৮০ ২২-৪৩৬১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 27 Sept. 1969

চক্রবেড় রেল

রেল-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ জানিয়েছেন, কলকাতায় চক্রবেড় রেলের কাজকর্মের জন্যে তিরিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে দফায় দফায়, মাস কয়েক অন্তর চক্রবেড় রেল সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা, কিংবা সিদ্ধান্ত আমরা এতবার শুনেছি যে, এই ধরনের সংবাদে আর উৎফুল্ল হয়ে উঠি না। গত ন' মাসেই—অন্ততঃ বার তিনেক কলকাতার চক্রবেড় রেল সম্পর্কে কোনো না কোনো সরকারী ঘোষণা আমরা শুনেছি —কিন্তু এযাবৎ তার সামান্যতম কাজও শুরু হয়েছে বলে জানি না।

কলকাতা মহানগরীতে চক্রবেড় রেল স্থাপনের কল্পনা বা পরিকল্পনা নতুন নয়। শুনলে অবাক হতে হবে, সেই কবে—১৯১৪ সালে, দুই সাহেব—মার্ক্স আর ম্যাকলেলান শিয়ালদহ-কাঁচরাপাড়া সেকসানের সার্ভে শেষ করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত রেলপথ বাড়ানো এবং রেলপথ বিদ্যুতিকরণের সুপারিশ ছিল। ১৯২৪ সালে আবার এই দুই সাহেব সুপারিশ করেন, রেলপথকে কলকাতা মহানগরী পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। ১৯২৭ সালে এই ব্যাপারে রেল-দপ্তরও বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে চক্ররেলের চিন্তা বা পরিকল্পনার গোড়া তখন থেকেই। এবং ১৯৫৭ সালে টার্মিনাল ফেসিলিটি কমিটির অনুসন্ধান ও প্রস্তাব মতনই চক্রবেড় রেলের কথাটা সাধারণভাবে চালু হয়ে যায়। এর পর ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন, এবং সেই কমিটি পূর্ব কমিটির অনুরূপ মতামত দেন। সামান্য সংশোধন অবশ্য ছিল। এরপর আরও পনেরো-ষোলো বছর কেটে গেছে, দফায় দফায় কমিটি হয়েছে, খসড়া তৈরী হয়েছে, প্রস্তাব ইত্যাদির কথাও শোনা গেছে কিন্তু কলকাতা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে।

কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের যাত্রী-সমস্যার একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। চিত্রটিতে বলা হয়েছিল—বছরে অন্ততঃ ১৩ কোটি যাত্রী এই শহরে যাতায়াত করেন। অর্থাৎ অফিস-আদালতের দিনে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মতন যাত্রীর আসা-যাওয়া হয়। কলকাতার উপকণ্ঠে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে যাত্রীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ভবিষ্যতে পাবে তাতে অনুমান করা যায় আগামী বছর এই সংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তার বেশিও হতে পারে। এই অবস্থা যেখানে সেখানে আগামী দশ বছর পরে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

সরকারি মহলে এই সব তথ্য থাকা সত্ত্বেও কলকাতার চক্রবেড় রেল নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানা চলেছে। এই টালবাহানা নিষ্ফল। কাজেই রেল রাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণায় আমরা বিশেষ পুলকিত হতে পারছি না।

এখন শোনা যাচ্ছে, রেল দপ্তর এবার নাকি বাস্তবিকই কাজে হাত লাগাচ্ছেন। এর প্রমাণ টাকার কথা ঘোষণা করা ছাড়াও রেল স্থাপনের জন্যে রেল-দপ্তর নাকি জমি সংগ্রহের কাজে এগিয়েই হাত দেবেন। প্রথম বছর জমি সংগ্রহ ও রেল-লাইনের স্থান নির্বাচন করতে কেটে যাবে। তারপর কাজ শুরু হবে আশা করা যাচ্ছে, বছর তিনেকের মধ্যে তা শেষ হবে। জমি সংগ্রহের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর। জমি সংগ্রহের ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ কাজ নয়, এবং এ কাজে সময় লাগে। তা সত্ত্বেও আমরা আশা করব, রাজ্য সরকার জমি সংগ্রহে তৎপর হবেন।

একটি কথা বলা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা শুনেছিলাম—আপাততঃ চক্রবেড় রেলের বদলে অর্ধ-চক্রবেড় রেল স্থাপনেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রীঘোষের সাম্প্রতিক উক্তি থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। আমরা ধরে নিচ্ছি পূর্ব সিদ্ধান্ত মতনই কাজ হবে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা যে কিছুটা ভাল তাতে আর সন্দেহ কি!

কলকাতায় চক্রবেড় রেল স্থাপনের সুবিধার জন্যে, যতদূর মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন একটি প্রস্তাব করেছিলেন যাতে তাঁরা বলেছিলেন যে, পোর্ট কমিশনার্সের কিছু কিছু লাইন—এবং চালু কিছু লাইনকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ করতে পারলে কাজটি সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ ডক ইয়ার্ডের এবং এখনকার চালু রেলপথ যদি ব্যবহার করা যায় তবে কম সময়ে এবং কম খরচে আপাততঃ একটি সারকুলার রেল চালু করা সম্ভব। জানি না—নতুন পরিকল্পনায় রেল-দপ্তর কী ব্যবস্থা নিয়েছেন। যে ব্যবস্থা নিয়ে থাকুন চক্রবেড় রেলের কাজ যত শীঘ্র সম্ভব শুরু হলেই আমরা কিছুটা স্বস্তি পাব।

রয়াল বেঙ্গল টাইগার!
সিদ্ধার্থ রং

মহামান্য রাজ্যপাল

আমাদের নতুন রাজ্যপালের জন্য আমি দুঃখিত—ভদ্রলোক কলকাতায় পা দিতে না দিতেই এমন কতকগুলি কথা বলেছেন যার জন্য হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হবে। ধওয়ান সাহেব যদি আর একটু অপেক্ষা করে নিতেন, আরও কিছুটা দেখে শুনে বুঝে তারপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলতেন তাহলে বোধ হয় ভবিষ্যতে পস্তাবার আশঙ্কা কম থাকত।

বন্ধু বান্ধবের কাছে শুনেছি শ্রীশান্তিস্বরূপ ধওয়ান বেশ ভাল লোক। পণ্ডিত মানুষ, ঝুট ঝামেলা পছন্দ করেন না এবং পড়াশুনা নিয়েই নাকি বেশি থাকেন। এমন মানুষ ভাল করে না জেনে শুনে কতকগুলি কথা বলে বিপদে পড়তে বসেছেন ভাবলেই কষ্ট হয়। বিশেষ করে নতুন রাজ্যপালকে নিয়ে যখন ইতিমধ্যেই দিল্লিতে বেশ কিছুটা হইচই হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য দিল্লিতে নতুন রাজ্যপালকে নিয়ে যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছে আমি মনে করি না তার মধ্যে খুব বেশি যৌক্তিকতা আছে। দিল্লিতে কেউ কেউ বলেছেন, ধওয়ান সাহেব কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন — তাই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মত একটি রাজ্যের রাজ্যপাল করা উচিত হয় নি। এই বক্তব্য খুব বেশি জোরালো ঠিক না। ধরলাম না হয় তিনি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। কিন্তু ধওয়ান যদি হাইকোর্টের বিচারপতি হতে পারেন, যদি তাঁকে লণ্ডনে রাষ্ট্রদূত করা যায় তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হতে পারেন না কেন?

রাজ্যপাল পদে বসে তিনি কমিউনিস্টদের একটু বেশি [illegible] দেবেন [illegible] সরকার ঠিক করলে দিল্লীকে সে খবর জানাবেন না? এইসব কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভুলে যান কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন না পেলে রাজ্যপালের তেমন কিছু করারই ক্ষমতা নেই। যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন রাজ্যপাল ঠিকমত চলছেন না তবে তাঁরা তাঁকে সরিয়ে দিতে পারেন। রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি; আইনে স্পষ্ট করে কথাটা না বলা থাকলেও রাজ্যপাল মোটামুটিভাবে কেন্দ্রের নির্দেশেই চলেন। ধর্মবীর এ রাজ্যে যা যা করে গিয়েছেন তার কোনওটাই প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তিনি করেন নি।

রাজ্যপাল খবরাখবর ঠিক ঠিক মত দিল্লিকে জানাবেন না? এটাও অহেতুক ভয়। দিল্লি শুধু রাজ্যপালের মাধ্যমেই খবর সংগ্রহ করেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের সবচেয়ে বড় সূত্র কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর। আর, রাজ্যপাল যদি তেমন সুপারিশ নাও করেন, তেমন 'রিপোর্ট' নাও দেন তাহলেও রাষ্ট্রপতি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারই পরামর্শে) কতকগুলি আশংকায় যে কোনও রাজ্য সরকারকে খারিজ করে দিতে পারেন।

আমি বলছি না, রাজ্যপাল পদের কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি নন। রাজ্যপাল আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। তাঁর বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা আছে বইকি; কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে চলতে বাধ্য। তবে হাঁ, ইচ্ছা করলে যে কোনও রাজ্যপাল কতকগুলি পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলতে পারেন।

আর একটি কথা, যাঁরা রাজ্যপাল পদের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চান তাঁরা ভুলে যান গণতন্ত্রে নির্বাচিত সরকারই প্রধান। আমাদের সংবিধানের সূত্রও তাই বলে। এ রাজ্যে শ্রীজ্যোতি বসু [illegible] দিয়ে [illegible] কমিউনিস্ট-দেরই সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে মনে করেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর দফতরে এমন একটা গোপন ব্যবস্থা করলেন যে সি পি এম-এর লোক ছাড়া আর কেউ সরকারী জমি পেলেন না, অথবা যদি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শুধু সি পি আই-র লোকের সুপারিশ মতই টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করেন তবে [illegible] শ্রীধর্মবীর বা শ্রীদীন [illegible] পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করলেও কোনও সুরাহা হবে না। এর সুরাহা করতে পারেন একমাত্র জনগণ। গণতন্ত্রের বিধানে এর প্রতিকার হতে পারে একমাত্র ভোটে।

রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শে চলতে বাধ্য।

*

কিন্তু নতুন রাজ্যপাল কলকাতা এসেই যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শে বলেন নি। তিনি নিজে যেমন ভাল বুঝেছেন তেমনি বলেছেন এবং আমার মনে হয় কতকগুলি কথা তিনি একটু বেশিই বলেছেন। ধওয়ান সাহেব সব জেনে শুনে বললে বোধ হয় ভাল করতেন।

নতুন রাজ্যপাল কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক বলায় বা জাতিবাদকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ায় আমি মোটেই ক্ষুব্ধ নই। নিশ্চয়ই তিনি এমন কথা বলতে পারেন—যদি তেমন সৎ বিশ্বাস সেই কথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর নিশ্চয়ই থাকা উচিত।

এ রাজ্যের বহু মানুষও কমিউনিস্টদের দেশের শত্রু বলে মনে করেন না। যদি তা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই কমিউনিস্টরা এত ভোট পেতেন না। কেউ যদি মনে করেন যে সি পি এম সি পি আই সম্পর্কে যে সব অভিযোগ আনেন (যেমন সি পি আই প্রায়ই [illegible] নির্দেশে চলে) অথবা সি পি আই সি পি এম এর বিরুদ্ধে যে কথা বলেন (যেমন, ওরা চীনা পার্টির নির্দেশেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙেছিল) সেগুলি সবই ভুল ও অসত্য তাহলে আমি তাঁর সেই বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই না। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন, [illegible] বিবেচনা [illegible]—বিদেশের কথায় কখনও চলেন না।

[illegible] 'সাংবাদিক [illegible]', [illegible] আত্ম-[illegible] কোথায় তার অনেক

নি"— এসব কথা ক্যালকাটা ক্লাবে, আলিপুরে বা চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটে ঘেরা সাহেব পাড়ায়ও হামেশা শোনা যায়। ধওয়ান সাহেব লণ্ডনেও তাই শুনেছেন। তিনি মুখেও সেই কথা বলেছেন। এতে অন্যায় কিছু করেন নি, আশ্চর্যেরও কিছু নেই।

ধওয়ান সাহেব কলকাতার ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের মানুষের সঙ্গে কথা বললে যে জ্যোতিবাবু সম্পর্কে আরও বেশি ইমপ্রেসড হবেন আমার তাতেও সন্দেহ নেই। ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের নীলাভ পুলে শ্রীরাম চ্যাটার্জি কিছু সাঁওতালকে সাঁতার কাটতে নিয়ে যাওয়ার পর জ্যোতিবাবু যখন ওই ক্লাবে দাঁড়িয়েই প্রকাশ্যে রামবাবুকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তখন ক্লাবে সমবেত ইংগ-বংগ সমাজের ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের মধ্যে যে জ্যোতি বসু প্রশস্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিল ধওয়ান যদি তা শুনতেন তাহলে নিশ্চয়ই আরও চমৎকৃত হতেন। তাহলে তাঁকে আর লণ্ডনে শোনা কিছু ইংরেজ ব্যবসায়ী বা ব্যাংকারের কথার উপর ভরসা করতে হত না।

রাজ্যপাল নিশ্চয়ই কিছুদিনের মধ্যে ক্যালকাটা সোসাইটিতে শুনতে পাবেন যে এই দুর্দিনেও জ্যোতিবাবুর মত মানুষকে পাওয়া কত সৌভাগ্যের ব্যাপার; দেখাতে পারেন, ওঁরা প্রফুল্ল সেন বা অজয় মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ বা প্রমোদ দাশগুপ্তকে কত অপছন্দ করেন এবং বিমানবাবু-জ্যোতিবাবুদের কত প্রশংসা করেন।

তাই, ধওয়ান সাহেব কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক বলায় বা জ্যোতিবাবুকে বিরাট সার্টিফিকেট দেওয়ায় আমি মোটেই বিচলিত নই। এখানেও অনেকে এইসব কথা বলেন। রাজ্যপালও তাই বলেছেন।

*

রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং পশ্চিমবংগের রাজনৈতিক স্থিরতা বা স্টেবিলিটি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন আমি শুধু সেই জন্য আশংকিত। আমার মনে হয়, সমগ্র পরিস্থিতি বুঝেসুঝে কথা বললে তিনি হয়তো এ মন্তব্য করতেন না যে, "পশ্চিমবংগে রাজনৈতিক স্থিরতা বিরাজমান। যুক্তফ্রন্ট সরকার সুস্থিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জনকল্যাণের কাজে একযোগে চোদ্দটি রাজনৈতিক দলের একাত্মতা জনসাধারণকেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে।"

ধওয়ান সাহেব যদি শুধু তাঁর আশা ব্যক্ত করতেন তাহলে অবশ্য আমি তাঁর জন্য মোটেই চিন্তিত হতাম না। তিনি যে অনেক অনেকটা এগিয়ে বসে আছেন। তিনি যে বলেছেন: "স্টেবিলিটি বিরাজমান" "সরকার সুস্থিত", "১৪টি দল জনকল্যাণে একাত্ম", ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইগুলি কি বাস্তব পরিস্থিতির অনেকটা অতিরঞ্জন নয়? এমন বক্তব্য যে ভুল, ঘটনাপ্রবাহ ধওয়ান সাহেবকে কি অচিরাৎ তা বুঝিয়ে দেবে না? তখন রাজ্যপাল কি কথাগুলি ফিরিয়ে নিতে পারবেন?

স্টেবিলিটি নিশ্চয়ই বিরাজমান। কিন্তু এমন স্টেবিলিটি তো কেরলেও রয়েছে। সরকারী দল বা গোষ্ঠীর বিধানসভা বা লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যদি স্টেবিলিটি বিচারের মানদণ্ড হয় তাহলে নিশ্চয়ই কেরলে এবং দিল্লিতে খুব ভাল স্টেবিলিটি আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন স্টেবিলিটি অন্তত ৭২ সন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গেও থাকবে।

কিন্তু স্টেবিলিটি মানে যদি স্থিরতা হয় তাহলে কি সেটা দিল্লিতে বা কেরলে আছে? না, সেই জিনিস পশ্চিমবংগে আছে ও থাকবে বলে কেউ ভরসা করতে পারছেন? যাঁরা একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন পশ্চিমবংগের যুক্তফ্রন্টও ধীরে ধীরে কেরলের পথে পা বাড়াচ্ছে—এ রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের বড় শরিকরাও ঠিক ওইভাবে এগোবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁরা সকলেই দু পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে আবার দু পা এগিয়ে শরিকি প্রতিপক্ষকেই ঘায়েল করার লড়াইয়ে ব্যস্ত। যিনি সদ্য বিলাইতি ডেমোক্রেসি দেখে এসেছেন তিনি কি বলবেন এইটা স্টেবিলিটি—এই সরকার "সুস্থিত"?

ধওয়ান সাহেব বলেছেন, "চোদ্দ দল কেমন জনকল্যাণে একাত্ম" এবং তিনি পশ্চিমবংগের জনগণকেও এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আমি বলব, দোহাই ইওর একসেলেন্সি, আর যাই করুন, জনসাধারণকে আপনি এই ১৪ দলের "একাত্মতা ও জনকল্যাণের আদর্শে" উদ্বুদ্ধ হতে বলবেন না! রাজ্যের সব মানুষ যদি এই দুই ব্যাপারে ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করেন তাহলে আর আপনার রাজ্যে মানুষ টিকতে পারবে না!

ওদের "একাত্মতা" মানে কি জানেন ধওয়ান সাহেব? আপনারই মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের ভাষায় "আমরা মারপিট করি, কাটাকাটি করি [illegible] সব [illegible] ফেলি"। ভাবুন তো [illegible] রাজ্যের সবাই যদি এমনি [illegible] মারামারি কাটাকাটি করে এবং [illegible] [illegible] পশ্চিমবংগের [illegible] কি হবে?

[illegible]

আমি অবশ্য এই সাত মাস ধরে দেখছি, ওঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন যে, সে যার পারটিকল্যাণই করে যাচ্ছেন, জনকল্যাণ কিছুই হচ্ছে না।

রাজ্যপালের কাছে তাই আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি দয়া করে ব্যাপারস্যাপার একটু বুঝে নিন—তারপর সার্টিফিকেট দিতে নামুন। না হলে হয়তো ঠকবেন— আপনার মত একজন ভাল মানুষ মনে দুঃখ পাবেন।

নবারুণ গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের উত্তমপুরুষ কমরেড জ্যোতি বসুকে ইওরোপ এবং আমেরিকার পুঁজিপতি, শিল্পপতি এবং ব্যাংকপতিরা বেশ লাইক করেন, আমাদের নতুন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের জবানিতে এ কথা জানতে পেরে এই রাজ্যের জনগণের নিশ্চয়ই খুব আহ্লাদ হবে। কেন-না, সাহেবেরা যে লোক চেনে, সে কথা বাঙালীদের চেয়ে ভাল আর কে জানে? সাহেবেরা রামমোহনকে চিনেছিল, বিদ্যাসাগরকে খাতির করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকে চাকরি দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে প্রাইজ দিয়েছিল, তারপর আমরাও রামমোহনকে চিনলাম, বিদ্যাসাগরকে খাতির করলাম, বঙ্কিমকে ঋষি এবং রবীন্দ্রনাথকে গুরু বানালাম। আমরা যে আর্ষ, সত্যজিৎ রায় ভাল ফিলিম তুলতে পারেন এবং রবিশঙ্কর ভাল সেতার বাজান, সেটাও আমরা সাহেবদের মুখে শোনবার পর থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

আমাদের কূটনীতিজ্ঞ রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে ধন্যবাদ যে, তিনি মোক্ষম সময়ে মোক্ষম বার্তাটি জানিয়ে দিয়ে দেশবাসীর সবিশেষ উপকার করে দিলেন। কেন বলি। বর্তমানে কমরেড জ্যোতি বসুর সময়টা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। যুক্ত ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে পুঁজিপতি (মানে দিশী পুঁজিপতি), প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থ, কংগ্রেস এবং সি আই এ-র চর ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এইসব চক্রান্তকারী শয়তানেরা যুক্ত ফ্রন্টের অতিশয় ভালমানুষ শীর্ষ-নেতাদের বিভ্রান্ত করে একাকে অন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে। এবং যেহেতু নেতারা ভালমানুষ তাই তারা অতিশয় সরল মনে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। পরে সকলের যখন সংবিৎ ফিরে আসছে, এবং ফলাফল খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লড়াই হচ্ছে সি পি এম বনাম অন্যান্য শরিকে। এবং পুলিস যেহেতু কমরেড জ্যোতি বসুর হাতে (এবং তিনি নিরপেক্ষভাবেই পুলিসকে পরিচালনা করছেন) সেই হেতু অন্য শরিকদের ভালমানুষ নেতারা অতিশয় সরল মনেই পুলিসপতি কমরেড জ্যোতির পুলিসবাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তুলছেন। যুক্ত ফ্রন্টের শরিকেরা, বিশেষ করে সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, এস এস পি প্রভৃতি বুঝতেই পারছেন না যে, এই বিরোধের আসল কারণ কী! যুক্ত ফ্রন্টের অনেক শরিকই নিজ নিজ জমিদারি ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না। সি পি এম সুবিধাজনক শর্তে অন্যান্য শরিকদের এইসব আন-ইকনমিক হিস্যাগুলো বরাবরের মত লিজ নিয়ে নিতে চাইছেন। দেশের স্বার্থে, সাচ্চা সোস্যালিজমের স্বার্থে এবং জনগণের স্বার্থে যুক্ত ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের উচিত অবিলম্বে নিজ নিজ হিস্যা সি পি এমকে মৌরসী পাট্টায় কবুলিয়তে পত্তনি দিয়ে দেওয়া। তা হলেই ল্যাঠা চুকে যায় অর্থাৎ যুক্ত ফ্রন্টে শরিকী দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুঁজিপতি (অর্থাৎ দিশী পুঁজিপতি), প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থ, কংগ্রেস, বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং সি আই এ-র চরেরা এই সহজ সমাধানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত চক্রান্ত করে যুক্ত ফ্রন্টের শরিকী ঝগড়াকে জিইয়ে রেখেছে। শুধু জিইয়েই রাখেনি, ক্রমাগত নানা কৌশলে এর তীব্রতাও বাড়িয়ে চলেছে। এবং পুলিসপতি কমরেড জ্যোতি বসুকে ফ্রন্টের বৈঠকে অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর আক্রমণ সহ্য করতে হচ্ছে।

এইরকম নানা ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তমপুরুষটির ভাবমূর্তিখানির জ্যোতি যে সময় কিঞ্চিৎ স্তিমিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল, ঠিক সেই সময় সাগরপার থেকে ধাবমান বার্তা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিল, ইওরোপ ও আমেরিকার পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও ব্যাংকপতিগণ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পুলিসপতিকে দেখে আত্মহারা। বিনোদ সুন্দরকে দেখে বর্ধমানের পুরবাসিনীদের যে দশা হয়েছিল—'রূপ দেখি রামাগণ বলে হায় হায়। আহা মরি রূপের বালাই লয়ে মরি॥ কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান। কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥' —সাহেবদেরও নাকি অবিকল সেই দশা! পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা (সি-পি-আই এবং সি-পি-আই-এম-এল সহ) কমিউনিস্ট হলে কি হয়, মূলে তো বাঙালী, তাই তাঁরা সাহেবদের কথা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তাই আশা হয়, কমরেড জ্যোতি যে পশ্চিমবঙ্গেরই জ্যোতি, সাহেবদের এই মত মেনে নিতে তাঁরা আর দ্বিধা করবেন না এবং "কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে" বলে বন্দনাগীতি গাইতেও আর তাঁদের বাধা থাকবে না।

বিনামূল্যে দাঁত ও চশমা

আর যে বিষয়েই মতভেদ থাক না কেন, যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রীদের সরকারী খরচে দাঁত ও চশমা যে অবিলম্বে দেওয়া প্রয়োজন, এই বিষয়ে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা নাকি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বত্রিশ দফা কর্মসূচীর জয় হোক। যুক্ত ফ্রন্টে যে পরিমাণ কামড়াকামড়ি চলেছে, তাতে মন্ত্রীদের দাঁত ভোঁতা হয়ে যেতেই পারে এবং ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা ও পালটা আক্রমণ—এই উভয়বিধ প্রয়োজনেই বত্রিশ পাটি ধারাল দাঁত অতিশয় আবশ্যক। সে বিষয়ে অবশ্য বলার কিছুই নেই। কিন্তু তাঁরা যে এত শীঘ্র চোখের মাথাও খেয়ে বসে আছেন, এটা ঠিক বুঝতে পারা যায় নি।

কেরালের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যেখানে মাত্রই বেকার ভাতা চালু করেছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট সরকার জনগণের মন্ত্রিবর্গকে সরকারী খরচে দাঁত ও চশমা যোগান দেবার ব্যবস্থা করে বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে যে কত ধাপ এগিয়ে দিলেন, নিজেদের যে কতটা জনপ্রিয় করে তুললেন তা ভাবা যায় না।

পুনশ্চ : 'যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের জংগী কর্মীদের জন্য সরকারী খরচে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরবরাহ করা হোক'—যুক্ত ফ্রন্টের আগামী কোনও বৈঠকের জন্য আগাম প্রস্তাব।

বিউটি

"আমরা যুক্ত ফ্রন্টে ঝগড়াও করছি, আবার ভাবও করছি, এইটেই আমাদের বিউটি"—ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার।

তালপাতার সেপাই

দেবরাজ

সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখে ব্রেজিলের রাজধানী রিও ডি জানেয়িরোতে মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে চারজন লোক যখন সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস্ বার্ক এলব্রিককে দিনের বেলা দিব্যি চুরি করে নিয়ে গেল আর গুম করে রাখলো তাঁকে ওই শহরেই তাদের গুপ্ত ঘাঁটিতে, কেউ তখন অবাক হয়নি। আবার ৭৭ ঘন্টা পরে যখন সেই শহরেরই এক ট্যাক্সি ড্রাইভার রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলো তাঁর বাড়িতে, তখনও অবাক হয়নি কেউ। এমন ধরনের ব্যাপার দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে এত হামেশাই হচ্ছে যে কী স্বদেশে কী বিদেশে তাতে কারুর চোখ কপালে ওঠে না। এলব্রিক তো বেঁচে ফিরে এসেছেন—কপালটা খানিকটা কেটে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও চোটও লাগেনি। কাজেই বলতে হবে তাঁর বরাত ভালো। তেমন বরাত কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সব কূটনীতিকেরই হয়নি। ঠিক এক বছর আগে গুয়াটেমালার মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন গর্ডন মাইনকেও অমনিভাবে গুম করার চেষ্টা হয়েছিল। সুবোধ বালকের মত তিনি আততায়ীদের হাতে ধরা দেননি যেমন দিয়েছিলেন এলব্রিক। পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের কাছ থেকে। সংগে সংগে গুলির আঘাতে তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে।

সে কাহিনী এলব্রিকের মনে ছিল বলেই তিনি না করেছেন ধস্তাধস্তি না চেয়েছেন কাউকে খবর দিতে। রাষ্ট্রদূত মাইনের শোচনীয় হত্যার পর দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যে সব মার্কিন কূটনীতিক আছেন তাঁদের নিরাপত্তার অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের বিরাট ক্যাডিল্যাক গাড়িতে টেলিফোন বেতারে খবর দেওয়ার যন্ত্র টেপ রেকর্ডার—অনেক কিছুই থরে থরে সাজানো আছে অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই কারুর কারুর আবার সশস্ত্র দেহরক্ষীও আছে। এলব্রিকের ঠিক আগেই ব্রেজিলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন জন টাটহিল। বডিগার্ড তিনিও রেখেছিলেন। ওপাট তুলে দেন এলব্রিকই।

এলব্রিককে যারা বন্দী করে রেখেছিল তারা অবশ্য তাঁকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেয়নি। দিলে সমস্ত ব্যাপারটা পাগলামি হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু তাঁকে যারা গায়েব করেছিল তারা পাগল নয়—তারা হচ্ছে ব্রেজিলের শহুরে গেরিলা। রাষ্ট্রদূতকে তারা যখন জোর করে ধরে নিয়ে যায় তখনই তারা রেখে গিয়েছিল তাঁর খালি মোটরে নিজেদের পরিচয় আর তাঁকে মুক্তি দেবার তাদের শর্ত। কাজটা করেছিল ব্রেজিলের দুটো বামপন্থী সংগঠন এক হয়ে। তাদের একটির নাম ন্যাশনাল লিবারেশন অ্যাকসান গ্রুপ অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি সাধক গোষ্ঠি. অন্যটি মুভমেন্টো রেভলুচিয়োনারিও ৮ আগস্ট ১৯৬৭, সংক্ষেপে এম আর ৮, অর্থাৎ ৮ আগস্ট বিপ্লবী সংগঠন। ওই ৮ আগস্ট ১৯৬৭ সনে বলিভিয়াতে প্রাণ হারিয়েছিলেন কিউবার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা চে গুয়াভেরা। নামেই প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদেরই দল ওই এম আর ৮। এলব্রিককে মুক্তি দেওয়ার শর্ত ছিল দুটি। এক, ১৫জন রাজবন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে আর তাদের পাঠিয়ে দিতে হবে মেক্সিকো, চিলি আর আলজিরিয়া এই তিন দেশের যে কোনওটিতে। দুই, সরকার বিরোধী ৯৫০ কথার একটা ইস্তাহার ব্রেজিলের সব খবরের কাগজে বের করতে হবে আর প্রচার করতে হবে সমস্ত বেতার আর টেলিভিসন কেন্দ্র থেকে।

কিল খেয়ে কিল হজম করলেন ব্রেজিল সরকার। মেনে নিলেন ওই সব শর্ত। আর না করেই বা উপায় কী? ওয়াশিংটনের প্রচণ্ড চাপ উপেক্ষা করার সাধ্য তাঁদের নেই। আমেরিকার কাছে তাঁদের টিকি বাঁধা, তারই তাঁদের বল ভরসা। তাঁরা পড়েছিলেন উভয় সংকটে। যদি ওয়াশিংটনের নির্দেশ তাঁরা অগ্রাহ্য করেন তা হলে বিপ্লবীরা এলব্রিককে মেরে ফেলে হয়ত, হুংকার আমেরিকা হয়ে উঠবে খাপ্পা। টাকাকড়ি অস্ত্রশস্ত্র খাবারদাবার কিছুই তার কাছ থেকে আর পাওয়া যাবে না, আর দেশের হবে ঘোর দুর্দশা। আর তাঁদের কাছে যেটা আরও বড় কথা—দেশে হয়তো ঘটবে রাষ্ট্র বিপ্লব যে বিপ্লবে তাঁরা হারাবেন গদি। কাজেই আমেরিকাকে না ঘাঁটিয়ে তাঁরা তার হুকুম তামিল করলেন—মেনে নিলেন বিপ্লবীদের শর্ত। তাতে লোক হাসলে কী হয়, তাঁদের গদি তো রইলো। ৪৮ ঘন্টা সময় দিয়েছিল তাঁদের গেরিলারা শর্ত পালনের, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন বন্দী। ব্রেজিলের কাগজে কাগজে বেরোলো তাদের ইস্তাহার, তা শোনা গেল বেতার আর টেলিভিশন মারফত। তারপর একটা সুপার মার্কেটের একটা বাক্সে পাওয়া গেল পনেরোজন রাজবন্দীর নাম। তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সামরিক বিমানে মেক্সিকোতে। চার ঘন্টা পরেই ছাড়া পেলেন এলব্রিক।

কেন এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো ব্রেজিলে? কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে? এত দেশ থাকতে তাদের সব রাগ গিয়ে কেন পড়লো আমেরিকার ওপর? যাঁদের ছেড়ে দিতে ব্রেজিল সরকার বাধ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রাশিয়াপন্থী কম্যুনিস্ট আছেন, আবার কাস্ত্রোপন্থী বিপ্লবীও আছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বদেশ প্রেমিক। এঁরা অনেকেই ছাত্র বা অধ্যাপক। তাঁদের অপরাধ তাঁরা চান ব্রেজিলে গণতান্ত্রিক শাসন। সেখানে এখন চলছে আছে ফৌজীতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি মার্শাল আর্থার দা কস্টা এ সিলভা জাঁদরেল জেনারেল। তিনিও আবার এখন অসুস্থ। সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন তাঁর অসুস্থতার দোহাই দিয়ে তিন সামরিক প্রধান। সংবিধান অবশ্য ব্রেজিলের একটা আছে, কংগ্রেসও আছে কিন্তু তার অধিবেশনই হয় না, নির্বাচন তো দূরের কথা। সেখানে না আছে লোকের নাগরিক অধিকার না আছে কারুর নিরাপত্তা। আইনের কিংবা বিচারের কোনও বালাই নেই। যাকে খুশি ধরে জেলে পোরা হচ্ছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এলব্রিককে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা যা করেছিল সেই কাজই করছেন সরকারও, তবে তাঁদের একটা ক্ষমতার তকমা আছে, বিপ্লবীদের নেই।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে যারা চুরি করে [illegible] দেশীয় ভাগাই [illegible] এক কাণ্ড [illegible] [illegible] দেখাবার [illegible] খবরের [illegible] একেবারে [illegible] এক [illegible] একজন [illegible] পুলিশের আর [illegible] ওপর দিয়ে চুরি [illegible] বন্দী নেতারা [illegible] সেপাই ছাড়া যে আর কিছুই [illegible] দেখিয়ে দিয়েছে। [illegible] অধ্যাপক ও অনেক বুদ্ধিজীবীও। কেন না তাঁদেরও কোনও স্বাধীনতা নেই, নেই অপ্রিয় সত্য বলার অধিকার। তাঁদের অনেকেই স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন অনেককে আবার তাড়িয়েও দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার ওপর তাদের রাগ এই জন্য যে সেই হচ্ছে ফৌজীতন্ত্রের খুঁটি। ১৯৬৪ সনে যখন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তার পেছনে ছিলেন তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিংকন গর্ডন বলেই অনেকের সন্দেহ। সে সন্দেহ আরও পাকা হয়েছে ব্রেজিলের জংগী হুকুমতের সংগে মার্কিন সরকারের দহরম মহরম দেখে। নতুন রাষ্ট্রদূত এলব্রিকের ভোগান্তির মূলে আছে ফৌজীতন্ত্রের কর্ণধারদের সংগে তাঁর দেশের মাখামাখি।

'শরৎ সেতু'

কলকাতা-বম্বে হাইওয়ের ওপর রূপ-নারায়ণের সেতুটির নতুন নামকরণ হল 'শরৎ সেতু।' এই উপলক্ষে বাংলাদেশের কিছু কিছু সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মনে হচ্ছে, অবশ্য সবাই-ই বোধ হয় নন, তা হলে সমবেত লেখকদের নামের তালিকা আর একটু বড়ো হতে পারত।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সব বাড়ী কিনে ফেলুন স্যার

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখা—এ তো মহৎ কাজ, কেবল বাঙালী নন, যে কোনো ভারতীয়ই এতে খুশি হবেন। কারণ সারা ভারতবর্ষে (এবং পূর্ব পাকিস্তানে তো বটেই—সেখানে সম্প্রতি নতুনভাবে 'দেবদাস' উপন্যাসটির ফিল্ম তোলা হচ্ছে) শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বোধ হয় আর কেউই পান নি, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রেমচাঁদও নয়। আধুনিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ দাবিতে পূর্বগামী লেখক কিছু ম্লান হবেনই, তা নিয়ে কেউ ক্ষোভ করবেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই ভাগ্যবান লেখকদের একজন—যাঁরা পুরোনো হয়েও দুর্নিবার, যাঁর বিমুগ্ধ পাঠকেরা বয়ে আসছেন বংশানুক্রমিক ধারায়। তিনি প্রথম শ্রেণীর লেখক কিনা, এ নিয়ে বাংলা দেশেই আমরা অতীব মননশীল আলোচনা করে থাকি, কিন্তু আমি মননহীন কমনম্যান সুনন্দ—ভারতীয় পাঠক সম্পর্কে সামান্য যেটুকু খবর রাখি, তাতে জানি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ভাষাতেই শরৎচন্দ্র মৌলিক স্রষ্টার মতো আপন—হিন্দীতে তাঁর কোনো-কোনো বই ষোলো-সতেরো জনে পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন, তা-ও শুনেছি।

সুতরাং শরৎচন্দ্র সর্বভারতীয় লেখক। জাতীয় সড়কে জাতীয় সেতু তাঁর নামে চিহ্নিত হবে, এ তো স্বাভাবিক। আর এই-ভাবেই তো শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের হৃদয়ে সেতু বেঁধেছেন।

কিন্তু আমি ভাবছি, দ্রুতগামী মোটরে যাঁরা দীঘার সমুদ্র সৈকতে বেরিয়ে পড়বেন অথবা আরো দূর-দূরান্তের ডাকে উল্কার গতিতে ছুটে চলে যাবেন, 'শরৎ সেতু' নামটা তাঁদের ভালো করে চোখে পড়বে তো?

বিবেকানন্দ সেতুকে দায়ে পড়ে চিনতে হয়—কারণ টোল-ট্যাক্স দেবার জন্যে বাধ্যতা-মূলকভাবে দাঁড়াতে হয় সেখানে। তবু বালী ব্রিজ চিরকালই বালী ব্রিজ। হাওড়া ব্রিজের নাম নাকি রবীন্দ্র সেতু—এইরকম একটা জনশ্রুতিও যেন কানে এসেছিল। কিন্তু এই রুদ্ধশ্বাস সাঁকোটিকে ধীরে-সুস্থে পর্যবেক্ষণ করে এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য যাচাই করার উৎসাহ আমি অন্ততঃ খুঁজে পাই না। মোটরে শান্তি-নিকেতন যেতে আমি কয়েকবারই অজয়ের ওপর মনোরম সেতুটি পার হয়েছি, তারও একটা নাম আছে বোধ হয়, কিন্তু মোটরের গতির সঙ্গে সঙ্গে সে নামটিও পাক খেতে খেতে শালবনের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

না না, তাঁর বইয়ের সুলভ সংস্করণ করবেন না। বই কেউ পড়বে না, পোকায় কাটবে। যারা পড়বে তারা অধঃপাতে যাবে।

রূপনারায়ণ ব্রীজ যা ছিল তাই থাকবে, পোশাকী নামটা লেখা থাকবে ফলকে এবং কাগজপত্রে। যাঁরা দু' বেলা পায়ে হেঁটে সাঁকো পেরুবেন তারা নামটা অবহেলায় ভুলবেন—যাঁরা কখনো গাড়ী থামিয়ে রূপ-নারায়ণের ছবি তুলবেন, তাঁদের হয়তো কারুর কারুর হঠাৎ মনে হবে, এর নাম শরৎ সেতু—তাই নাকি?

এসবও কিনে নিন স্যার, তাঁর প্রতি সম্মান জানানো হবে।

শরৎচন্দ্র ভাগ্যবান, এই সেতু তাঁকে অমর করবে কিনা, তা নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা নেই। তাঁর সেতুবন্ধন সারা ভারতবর্ষের হৃদয়ে হয়েছে। তবু তাঁর সম্পর্কে একটা কর্তব্য করা গেল, এই আত্মপ্রসাদটুকু আমরা অন্ততঃ ছাড়তে যাই কেন?

আমার আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। 'শরৎ সেতু'র মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে ডানদিকে দূরে তাকালে চরের ওপারে যে দূর একটি গ্রামের আভাস মিলবে, তারই একদিন নাম সামতাবেড়। এইখানে শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক-গুলো স্নিগ্ধ দিন কেটেছে—দেবানন্দপুর

এই দস্যু চিঠিগুলি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

এই দস্যু চিঠিগুলির হাত থেকে আমার উদ্ধার নেই।
সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুদ্ধশ্বাস, আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড চুপ,
সমুদ্র-ধোয়া নীল খাম লেটারবক্সে এসে দাঁড়ায়,
আমার কাছে কী যেন চায়, প্রার্থনা করে না ভয় দেখায় জানি না।
আমি জেদী মেয়ে, ভাবি, খুলবো না, শুনবো না, কথা বলবো না;
ভাবি, ময়দানের মুক্তমেলায় কুটি কুটি ক'রে উড়িয়ে দিয়ে আসবো;
ইচ্ছে করে, লিখি—এইসব উচ্ছ্বসিত বিশেষণ আমি বিশ্বাস করি না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কে যেন নীল আকাশ ছুঁয়ে নোটিস জারি করে,
সীলমোহর-করা সমন লটকে দেয় আমার দরজায়;
বসন্তঋতুর ভলান্টিয়াররা জিদ ধরে, আমার মনকে দুর্বল করতে চায়,
চেরীর ডালে মঞ্জরী, বেড়ায় বোগেনভিলিয়া, কার্নিসে মৌমাছি
যেন অগণিত পতাকা ও নিরবধি স্লোগান,
আমার মনের ওপর দখল নিতে ওরা ক্রমাগত এগোয়।
আমি জেদী মেয়ে, ভাবি, দেখবো না, শুনবো না, 'হ্যাঁ' 'না' কিছুতেই আমি নেই।

সব দস্যুতাই এক, এক ছাঁচে গড়া।
চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করে—এসব মুখোশপরা শব্দকে আমি ভয় করি,
'বসন্ত', 'ভালবাসা', 'হৃদয়', 'যদিদং হৃদয়ং মম', এইসবে আমার আদৌ
বিশ্বাস নেই।

ভাবতে ভাবতে সপ্তাহ কাটে, আবার লেটারবক্স খুলি,
আবার সেই অবিশ্বাস্য ভয়ানক ব্যাপারগুলি ঘটতে থাকে,
সমুদ্রের ঢেউ-লাগা তোলপাড় কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে মাথা রাখে,
আমার কাছে কী যেন চায়, প্রার্থনা করে না ভয় দেখায় জানি না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব।
রাতের করোক্ষ অন্ধকারে গলা ডুবিয়ে মনে মনে খসড়া করি।
ছাদের কার্নিসে মৌমাছি, বেড়ায় বোগেনভিলিয়া—
দস্যু চিঠিগুলির হাত থেকে আমার বুঝি উদ্ধার নেই।

ভুল

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এক জ্যোতিষী ছোটবেলায় জানিয়েছিল : যৌবনে তুই
এমন একটা ভুল করবি, মারাত্মক, যে-ভুলের মাসুল
সারা জীবন শুধতে হবে।

যৌবনে সে জ্যোতিষীকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেললাম।
(সেইটা কি ভুল? অবশ্য না।)
তারপর তো প্রতি পদক্ষেপ ফেলেছি ভেবেচিন্তে,
হাসার সময় ঠিক হেসেছি,
যখন কান্না ঢিলের মতন গলার মধ্যে উঠে এসেছে
তখন চোখের জল ফেলেছি—দু-এক ফোঁটা,
(সেইটা কি ভুল?)
যখন ইচ্ছে হয়েছে—এবার চরম একটা আঘাত হানবো
তক্ষুনি বন্দুক ছুঁড়েছি,
যখন ক্ষমা চাওয়া উচিত বিনা দ্বিধায় পায়ের ওপর
শক্ত দুটো হাত রেখেছি—ক্ষতির কথা ভেবে দেখি নি,
(সেইটা কি ভুল! সেইটা কি ভুল!)

হে জ্যোতিষী, কতো মাসুল শুধতে লাগে সারা জীবন?

অন্ধকারে-রাগে

তুষার রায়

আমি, সীমান্ত-চেরা অন্ধকার দেখে ফুসে উঠি রাগে,
ক্রমশ এগিয়ে আসে অন্ধকার, ঘুষি মারি, টলে না ফাটে না
ভাল্লুকের মতো অন্ধকার ক্রুদ্ধ নাচে লাফায় হাসে
বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে চারিপাশে,

স্বল্প সোডা-মেশানো মদের মতো অন্ধকার ঝাঁকায়
কুঁচো কুঁচো হয়ে ওড়ে এবং ছুঁচোর মতো গর্তে সেঁধোয়
লাফায় নাচে ঠোকাঠুকি ধর্ষণ বলাৎকার বমি
অন্ধকার বমি করে অন্ধকারে কন্ধকাটা ঘোড়ায় চড়ে
কলার পাকড়ে গলা চেপে ধরে অন্ধকার অন্ধকার
আমি কিভাবে যুদ্ধ দেবো ভাবতে জোনাকিকে দেখি
আহা ওরা প্রভুর বাঁধের জন্য বালি বইছে কাঠবেরাল
আমি তো জোনাকি নই হে অন্ধকারে স্বয়ম্প্রভ কিংবা
কোনো জ্বালামুখও নই যে আগুন ওগরাবো
আমি তো প্রদীপও নই যে প্রণামের মতো জ্বলবে
আমি কেবল দেশলাই জেললে গাছ পাতা কাঠ ও
শেষকালে নিজের শরীরকেই জেলে দিতে পারি,

আমি তো দীপ্ত সূর্যকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি

খোলাম কুচি

মিহির মুখোপাধ্যায়

সবশেষে গোপীনাথ এল। সকলের শেষে গোপীনাথ দেখতে পেয়েছিল।

সবার আগে দেখেছেন সুরুজঠাকুর। তেনার নজর সবদিকে, সবখানে। গোপীনাথ বলে, নজর। তেনার নজর কারো ফাঁকি দেবার সাধ্যি নেই। ছোট বেলা থেকে বাংলা মুলুকে এসে বাংলা বুলি শিখে নিয়েছে গোপীনাথ।

কিন্তু এ যাত্রা তেমন সুবিধে হয়নি সুরুজদেবের। আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার।

কদিন ধরে ঝুমঝুম বিষ্টি আর বিষ্টি। মাঠ-ঘাট, ডোবা পুকুর সব জলে থইথই।

এর মধ্যেই একবার মেঘের পর্দা ছিঁড়ে এক চিলতে উঁকি মেরেছিলেন। তখন বেলা দুপুর।

তারপর আবার যেমন-তেমন। সেই একঘেয়ে ঝিরঝিরানি। এক এক দমক দামাল হাওয়ার সঙ্গে এক একবার ঝেঁপে আসে, তারপর আবার সেই টিপিস টিপিস। একেবারে কমতি নেই কখনো। এরপর এই জলের মধ্যে, এই ধোঁয়াটে বেলার মধ্যেও যাদের নজর পড়েছিল তারা খুব জানাশোনা গোপীনাথের। তাদের ওড়াউড়ি দেখেই মালের হদিস পাওয়া যায়।

অনেক উঁচুতে উঠলেও তাদের নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে।

সেই শকুনিদের কয়েকটাকে জলাজমির উপর চক্কর মারতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল গোপীনাথ। কাছেপিঠে জনমানুষ নেই। জলে ভেজা কালো কুচকুচে একটা সাপের মত বনগাঁ রোড।

দু' পাশে নাবাল জমি। সেই জমিতে জল জমেছে। কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর।

কাঁচ ধানের চারা সব জলের তলায়, পাটের মাথাও ডুবুডুবু।

এই বড় জলের মধ্যেও পথে নেমেছে গোপীনাথ। নামতে হয়েছে। ঘরে দানাপানি নেই।

নিজের জন্য ভাবে না সে। মেয়েটার জনাই ভাবনা। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

বটুবাবুও সেই কথা বলেন—বউ মরলে কি পেটের জ্বালা কমে রে গুপী, বউ-এর খরচা না হয় কমেছে, নিজে খাবি কি, মেয়েটাকে খাওয়াবি কি, পয়সা না কামালো কি চলে—

—হামারা দিল টুটে গেছে বাবুজী—

বুকে হাত রেখে জবাব দিয়েছিল গোপীনাথ।

—অমন ঠুনকো দিল রাখিস কেন, তোর বউটা তো বারো মাস ভুগত, অমন হাড্ডিসার রোগা বউ-এর জন্য যদি তোর মত একটা জোয়ান মরদের দিল টুটে যায় তা হলে তো দুনিয়ার কাজকাম কিছুই চলে না, মন গুমরে থাকিস না, দরকার হয় আরেকটা বিয়ে কর—

—ফের সাদি—এবার যেন একটু হাসি ফুটেল গোপীনাথের শুকনো ঠোঁটে। দুঃখের হাসি।

তোবড়ানো গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মরা মাছের মত চোখ।

লছমিয়া মরেছে আজ এক মাস। এ সময় অন্য কেউ সাদির কথা বললে চটে যেত গোপীনাথ।

কিন্তু বটুবাবুর কথা আলাদা। বটুবাবু তার রুজি-রোজগারের মালিক। তার পাইকার।

রোগা হোক আর যাই হোক, লছমিয়া ঘরের কাজকাম করত। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে মেয়ে আগলাতো। ঘর পাহারা দিত। আর

সেই সকাল মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে বটুবাবুর জন্য মাল খুঁজে বেড়ায় গোপীনাথ।

বটুক বুঝো হাড় চালান দেয়। মরা জানোয়ারের হাড় নৌকো বোঝাই হয়ে বেলেঘাটার খাল ধরে হাড়ের কারখানায় যায়। গোপীনাথের মত আরো কয়েকজন আছে বটুবাবুর এজেন্ট।

মরা জানোয়ারের লাশ খুঁজে বেড়ায়। শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করার আগেই হাড় কুড়িয়ে চটপট বোঝা ভর্তি করে বটুবাবুর গুদামে নিয়ে আসে। মাল ওজন দিয়ে হাতে হাতে দাম নিয়ে যায়।

বাকি-বকেয়ার কারবার নেই বটুবাবুর। দর কিছু কম দেবেন, কিন্তু সব নগদানগদি।

—ইতনা হাড্ডি কোন কাম্ লাগে বাবুজী—একবার জিজ্ঞেস করেছিল গোপীনাথ।

—ফসফেট তৈর হয়—

—ফসফিট ক্যা চীজ বা—

—তোর অত খোঁজে দরকারটা কি, আর বকাসনে বাপু, এখন ওজনটা দ্যাখ—

হাড়ের ওজন মত দাম হয়। শুখা হাড়ের দাম বেশী, ওজন কম। ভেজা হাড় ওজনে ভারী বটে, কিন্তু বটুবাবু গালাগালি করবেন। ভেজা হাড় নেবেন না তিনি।

বিষ্টির ছাট বাঁচাবার জন্য রাস্তার পাশে একটা সেগুন গাছের নিচে দাঁড়াল গোপীনাথ।

মাঠের মধ্যে উঁচু একটা ডাঙা জমি। জমির উপর বাঁশ ঝাড়, কাছেই একটা জারুল গাছ।

সেই বাঁশঝাড়ের পাশে জারুল গাছটার কাছাকাছি জলের কিনারায় কিছু একটা পড়ে আছে।

গরু কিংবা মোষের লাশ মালুম হচ্ছে। কাছে না গেলে সমঝনা মুশকিল।

বাঁশঝাড়ের উপর দুটো শকুন পাক খাচ্ছে। আরো দু-তিনটে নিচে নেমেছে। কয়েকটা কাকও এসে জুটেছে। কিন্তু ওখানটায় পোঁছুতে হলে অনেকটা জল ভাঙতে হবে। মাঠ ভর্তি জলের মধ্যে কোথায় ডোবা, কোথায় খানাখন্দ, কিছুরই হদিস মিলছে না। একা হলে ভাব তো না গোপীনাথ।

কোলের মেয়েটার জন্যই ভাবনা। চার বছরের মেয়ে আদুরে নেড়া মাথা, হাড় জিরজিরে চেহারা। দলাপাকানো ভেজা একটা পুঁটুলির মত বাপের বুকের সঙ্গে মিশে আছে। মাথায় একটা গামছা চাপা দেওয়া। গামছার সঙ্গে একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে খানিকটা ছাতু বাঁধা। সেটা ঝুলছে আদুর পিঠের উপর। গোপীনাথের পরনে খাকি রঙের তালিমারা হাফপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া।

মাথার উপর ভাঁজ করা একটা চটের থলি। কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো আরেকটা থলির মধ্যে গোপীনাথের যন্তরপাতি। ছোট বড় ছুরি দু' তিনখানা। একটা কাটারি, কয়েকটা গজাল লোহা, পাটপাকানো দড়ি, আধপোড়া মোমবাতি। ছেঁড়া বর্ষাতির টুকরোয় জড়ানো দু' বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ডান হাতে বুক সমান উঁচু একটা বাঁশের লাঠি।

গেল পরশুদিন এসেছিলেন বটুবাবু। গোপীনাথের অবস্থা দেখে পাঁচটা টাকা আগাম দিয়েছেন। আফসোস করে বলেছেন

—হ্যাঁ রে, গুপী, বউ কি আর কারো মরে না, বউ মরেছে বলে হাত-পা গুটিয়ে কেউ কি বসে থাকে তোর মত, আর তোরা যদি কাজে না নামিস, মাল সাপ্লাই না দিস, তা হলে আমার তো ব্যবসা তুলে দিতে হয়—

তারপর বটুবাবুর দেয়া সেই টাকা দিয়ে চাল ডাল কিনে এনেছে গোপীনাথ। বাপ-বেটিতে খিচুড়ি খেয়েছে। তারপর ঘরে শেকল তুলে দিয়ে কাল পরশু দুটো দিন এই বিষ্টি মাথায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঝড়জলে শেয়াল-কুকুরও পথে নামতে চায় না। আর গোপীনাথ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে। মেয়েটাকে কারো কাছে রেখে আসা যায় না। মেয়েটা তাকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে থাকতে চায় না।

সেই থেকে দুজনে ভিজছে। ঝিরঝির জলের মধ্যে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কখনো জোর চেপে এলে কোন গাছের নিচে কিংবা কোন দোকান ঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়িয়েছে।

আবার সাঁঝ বরাবর ঘরে ফিরেছে। আজ তিন দিন। এই তিন দিনের দিন দুপুর

কেবল বুঝি রামজীর কিরপা হল। আর একটি টিক্কা দেশলাই-এর বাক্সের মধ্যে টিকে আছে। আলো কিছু না জুটলে মুশকিল হত। কিন্তু এখন জল ভেঙে ওই বাঁশঝাড়ের কাছে যাওয়া যায় কি করে।

সেগুন গাছটার বড় বড় পাতার নিচে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোপীনাথ।

তখন বিষ্টির জোর একটু কমেছিল। এখন ইলশেগুঁড়ির মত অল্প অল্প পান ধরেছিল।

হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কুকুর জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছে। ওই লাশের গন্ধে গন্ধে ওই দিকে চলেছে।

গোপীনাথও কুকুরটার পেছন পেছন জলে নামল। সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে পা বাড়াল।

কুকুরটা আগে আগে সমস্ত শরীর ডুবে গেছে। শুধু সাদা আর বাদামী রঙের মাথাটা জেগে রয়েছে। জলের মধ্যে পা দিয়ে টের পেল গোপীনাথ, একটা আলপথের মত ডুবে রয়েছে।

পায়ের নিচে পথের হদিস পাবার পর আর তেমন অসুবিধে হল না। তবে জল বাড়ল।

এক পা এক পা করে এগোচ্ছিল গোপীনাথ আর একটু একটু করে জল বাড়ছিল।

আগে আগে কুকুরটা প্রায় সাঁতার কেটে চলে গেল। উঁচু ডাঙায় উঠে গা ঝাড়া দিল।

তারপর ভুকভুক করে শকুন কটাকে তাড়া করল।

গোপীনাথ তখন মাঝ পথে। জল ছাড়িয়ে জল উঠেছে কোমরের কাছাকাছি। প্যান্ট ভিজে গেছে। আনুকে তুলতে হয়েছে কাঁধের উপর। কাছাকাছি আসতে মালুম হল বাঁশ ঝাড়ের পাশে জলের কিনারায় আস্ত একটা মোষ। ছাল ছাড়ানো। ছালখানা বোধহয় মুচিরা নিয়ে গেছে। আজ সকালের দিকেই হয়তো ফেলে গেছে। কারণ টাটকা লাশ। এখনো পচ ধরেনি। মাংস পচা গন্ধ ছোটেনি, ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠেনি। তবে জোলো হাওয়ায় একটা ভ্যাপসা ভারভার গন্ধ। একরাশ মাছি জুটেছে। পেটমোটা নীল নীল মাছি। চারদিকে জল থই-থই। এর মধ্যেই কেমন কেমন করে টের পেয়েছে ওরা। তাজ্জব কি বাত।

তিনটে শকুনি ঠিক নাচের কায়দায় লাফিয়ে লাফিয়ে পাশবনটা সরে গেল। তার একজন পেসিডেন্ট মোষটার থলথলে পেটের উপর। পেটের অনেকখানি ফুটো করে নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে টেনে বার করছিল। সেটা কিন্তু নড়ল না। দড়ির মত মোটা মস্ত একটা নাড়ি ঠোঁটে চেপে ধরে মুখ তুলে কুকুরটার দিকে তাকাল। নাড়িটা ঝুলে রয়েছে ঠোঁট থেকে, ঝুলে পড়েছে ঘাসের উপর। কুকুরটা ছুটে

গিয়ে সেদিকটা কামড়ে ধরল। শকুনিটাও সহজে ছাড়বে না। দড়ি টানাটানির মত এই আজব ব্যাপারটা কয়েক পলক অবাক চোখে দেখল আন্দু। ততক্ষণে জলের কিনারায় উঠে এসেছে গোপীনাথ। মাথার উপর লাঠিটা ঘুরিয়ে হাঁক দিল—ভাগ্ ভাগ্ শালা, হুস হুস—

এবার পালালো শকুনিটা। লাফিয়ে মাটিতে নেমে নেচে নেচে সরে গেল। কুকুরটাও নাড়ি টানাটানির লড়াই ছেড়ে কয়েক পা পেছোল। লাঠি হাতে মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুকের মত অল্প অল্প লেজ নাড়তে লাগল। কাকগুলো জারুল গাছের ডালে বসে চেঁচাচ্ছিল। কয়েকটা এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছিল। সকলের শেষে গোপীনাথ এসে দাঁড়িয়েছে।

সূর্যদেব অনেক আগেই মেঘের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। শকুনির দল, কাকের পাল আর কুকুরটাও পিছু হটলো। শুধু গোঁয়ার মাছিগুলি, পেট-মোটা নীল নীল মাছির ঝাঁক চারপাশে ভনভন করছিল।

আন্দুকে জারুল গাছের নিচে বসিয়ে দিল গোপীনাথ। এখানে পানির ছাট কম লাগবে। গামছার পুঁটুলিটা খুলে ছাতুর ঠোঙা

সামনে রাখল। এক টুকরো আমের আচার, খানিকটা নুনও রয়েছে। কিছু একটা খাবার সামনে না রাখলে ঘ্যান ঘ্যান করবে মেয়েটা। কোন কাজ করতে দেবে না।

চারদিকে একবার তাকাল গোপীনাথ। ওপাশে বাঁশঝাড়টার ভেতরে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। আর তিন দিকেই জলে ডোবা ক্ষেত। ভেজা ঘাসের উপর বসতে পারছে না আনু। উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে ভয়ে শকুনি কাঁটার দিকে তাকাচ্ছে।

গোপীনাথ একবার বললো—ডরো মত্ বেটি বৈঠ যা—

তারপর কি ভেবে জলের কিনারা থেকে বড়গাছের একখানা কচুপাতা ছিঁড়ে আনল।

ছাতুর পুঁটুলিটা রাখল কচুপাতার উপর আর গামছাখানা পেতে দিল জারুল গাছটার গুঁড়ির কাছে সামান্য একফালি ঘাস জমিতে। শান্ত হয়ে বসল আনু।

এবার অস্তরপাতি বার করল গোপীনাথ। মোষটার চারপাশ একবার দেখে নিল।

তারপর বরাবর যেমন করে বড় ছুরি দিয়ে [illegible] পেটের কাছটা লম্বালম্বি কেটে দিল। নাড়িভুঁড়ি সব টেনে টেনে বাইরে আনল। মস্ত একটা থলির মত পাকস্থলি, মোটা মোটা দড়ির মত ছোট বড় অন্ত্রের রাশি দুই হাতে তুলে জলের কিনারায় রেখে এল। একবারে সবটা পারল না। দুবারে [illegible] আসতে হল। হাত উপচে নাড়িগুলি মাটিতে ঝুলতে ঝুলতে গেল। পেছন পেছন এগিয়ে এল কুকুরটা। শকুন কটাও নড়েচড়ে উঠল।

[illegible]

বংশীলোচনের [illegible] যেমন [illegible] কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে থাকে। বসে বসে [illegible] কাঁপায়। ঠিক অমনি বসে আছে শকুনিটা। একটু একটু মাথা নড়ছে।

[illegible] কাজ হাসিল করবি, [illegible] পয়সা পাবি, আমার [illegible] নেই—

ঠিক [illegible] পয়সা দুটো কম দেবেন, কিন্তু সব হাতে হাতে। বাকি ফেলে রাখেন না। বরং ঠেকার সময় দু-চার টাকা আগাম দেবেন। ওঁর [illegible] কাজ করেও আরাম।

কিন্তু একরোখা মাছির ঝাঁকটা বড্ড ভন-ভন করছিল।

জলদি হাতে ছুরকত কাজ হাসিল করতে করতে আপনমনেই গুনগুনালো গোপীনাথ— ইতনা মাক্‌খি কাঁহাসে আগইল রে—

কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে পেছনের পা দুটো কেটে আলাদা করে নিল।

হাড় থেকে মাংস চেঁছে সাফসুতরো করে গুছিয়ে রাখছিল। সব একসঙ্গে ঝোলায়

ভরবে। মাংসের টুকরোগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেই এপাশ-ওপাশ থেকে কয়েকটা কাক ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জঙ্গলে গাছের মাথা থেকে দুটো শকুনি হুসহুস করে নেমে এল। মাটিতে যে ক'টা বসেছিল, নড়েচড়ে উঠল। আবার ভয় পেল আনু। ভয়ে ভয়ে ডাকল—বাবুজী—

—আরে ডরো মত্, বেটি—মোলায়েম সুরে কথা বললেও চোখ তুলে তাকাবার ফুরসৎ নেই গোপীনাথের। দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই কাজ হাসিল করতে হবে।

এত বড় লাশের কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা লেগে যাবে।

কাটারি দিয়ে কেটে কেটে পাঁজরার হাড়গুলি আলাদা করল। সমস্ত লাশটা নড়ছে, কাঁপছে।

মাথাটা কাত হয়েছিল ঘাসের উপর। একটা চোখ খোলা। ওই আঁখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল কেমন আনমনা হয়ে গেল গোপীনাথ। শেষ সময়ে লছমিয়ার আঁখ দুটো অমনি খোলা ছিল। হাতে পায়ে তখন সেঁক দিচ্ছিল গোপীনাথ। তখন রাত দুপুর। একটা কেরোসিনের ডিবরি জ্বলছিল। বংশীর মা বলেছিল, হাতে পায়ে সেঁক দিতে। একটা মাটির ভাঁড়ে করে গুলের আগুন এনেছিল বুড়ি। সারারাত ঠায় বসেছিল। ঘরের বাইরে নিমগাছটার তলায় বসে বংশী, মতিয়া, বুধন গুজগুজ করছিল। পাড়া-পড়োশী অনেক আওরৎ আরো দু-চারজন এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। গোপীর বউ-এর গতিক সুবিধের নয়। আজ রাতটা কাটবে কিনা সন্দেহ। গোপীনাথ কিন্তু অতটা বুঝতে পারেনি। একটা মরা বাচ্চা হবার পর থেকে বছর দেড়েক ধরে অমনি প্রায়ই ভুগতো। দু-চার দিন শুয়ে থাকত। তারপর আবার উঠে ঘরের কাজকর্ম করত। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিত। কাঠকুটো কুড়িয়ে উনুন ধরাত। ভাত রাঁধত কিংবা রোটি পাকাত। গোপীনাথ তখন কাঁচা কাঁচা মুলুক ঘুরে বেড়াত। ঘুরে ঘুরে বাটবাড়ুয়ে গোলোকের জন্য মাল যোগাড় করে আনত। ভুট্টাপোড়া খেতে ভালবাসত লছমিয়া। গোপীনাথ কখনো ভুট্টা নিয়ে এলে বড়ো খুশী হত। সেই মানুষটা এমন হুড়-হুড়ি চলে যাবে বুঝতে পারেনি গোপীনাথ। [illegible] পাঁজালি করে হাতে পায়ে সেঁক দিচ্ছিল। পাশে বংশীর মা।

দুজনের ছায়ায় যে দিকটা অন্ধকার ছিল, সেদিকে ছেঁড়া কাঁথার উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল আনু। তখন জোরে জোরে এক একবার শ্বাস টানছিল লছমিয়া। ছিটের জামাটার বুক খোলা। পাঁজরার হাড়গুলি ফুলে ফুলে উঠছিল। ভুগে ভুগে বুক শুকিয়ে আমসি মেরে গেছে। শুধু বুকের মাঝখানে তামার মাদুলিটা ওঠানামা করছিল।

হঠাৎ আনুর চেঁচানি শুনে চমকে উঠল গোপীনাথ। বেইমান কুকুরটা একখানা হাড় মুখে নিয়ে পালাচ্ছে। এত মাংস পেয়েও আশ মিটছে না, শালা হারামির হাড্ডির লালচ। তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলে পেছনে ছুটল। চারপাশে জল, জলে ডোবা ক্ষেত। কোথায় আর পালাবে বদমাশটা। নিরুপায় কুকুরটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পিঠের উপর এক ঘা বসিয়ে দিতে পারল গোপীনাথ। জলের কিনারায়

হাড়টা ফেলে কেউ কেউ করে লেজ গ্নুটিয়ে পালিয়ে বাঁচল কুত্তার বাচ্চা। একেবারে চলে গেল না। জারুল গাছটার ওপাশে. দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। হাড়খানা কুড়িয়ে ফিরে এল গোপীনাথ। এই ফাঁকে গিন্নি শকুনিটা এগিয়ে এসে মোষের চোখটা খুবলে নিয়েছে। তা' নিক। চোখ খা, কান খা, নাক খা, চর্বি মাংস সব খা। শুধু হাড় ক'খানা পেলেই খুশী গোপীনাথ।

কিন্তু এই হাড় শুকুতে সময় নেবে। সাতটা রোদ খাবে, তবে মাল ওজনে উঠবে।

শুধা হাডডি ছাড়া মন ওঠে না বটুবাবুর। হরেকরকম ফইজৎ তাঁর।

—হ্যাঁরে, গুপী, মজ্জী শুকোয় নি, তেলোতাব কাটেনি, কেমন মাল আনলি তুই, আমি চাই খড়খড়ে, এতকাল কাজ করেও আমার পছন্দটা বুঝলি না, কোম্পানী কি আমাকে এমনি এমনি পয়সা দেবে—

ভালো এক কম্পানি শিখে লিয়েছেন বটুবাবু। কথায় কথায় কম্পানি কা কিরিয়া। একটা বিড়ি ধরালো গোপীনাথ। মুখে বিড়ি কিন্তু হাতের কামাই নেই। আবার লাশের পেটের মধ্যে হাত ঢোকাল। পাঁজরার হাড়গুলি সাফ করতে করতে মনে হল এই মোষটার পেটের মত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল লছমিয়ার হাত পা পেট বুক। বংশীর মা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠার পরও কেমন যেন বিশোয়াস হয়নি গোপীনাথের। লছমিয়া নেই। আর কোনদিন দেখা হবে না। কোন কথা বলবে না। দরজার সামনে বসে ভুট্টাপোড়া খেতে খেতে লাজুক মুখে একটু হাসবে না। বংশী, মতিয়া, বুধন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর এসেছিল। তখনো তাকিয়েছিল লছমিয়া। ঠান্ডা আঁখদুটো খোলা। কে যেন শেষে দুটো তুলসীপাতা এনে ঢেকে দিয়েছিল। তারপর নতুন কাপড়, খাটিয়া, দড়ি যোগাড় হয়েছিল। কিছু ফুলও এসেছিল। বংশী, মতিয়া, বুধন, হীরালাল—ওরাই সব ব্যবস্থা করলো। কেমন আচ্ছন্নের মত চুপ-চাপ ওদের পেছন পেছন হালিশহরের শ্মশানে গিয়েছিল গোপীনাথ। সেই শেষ-রাত্রির অন্ধকারে আগে আগে যেতে যেতে ওরা একসঙ্গে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিল—রাম নাম সত্ হ্যায়, রাম নাম সত্ হ্যায়—

আনু আবার ডাকল—বাবজী, পিয়াস—

ছাতু খাবার পর পিয়াস লেগেছে আনুর। কিন্তু এখানে আর পিনেকা পানি কোথায়।

ওই মাঠের জলই আঁজলা করে দু'ঢোক খেয়ে আবার এসে গাছতলায় গুটিশুটি মেরে বসল আনু।

সমানে হাত চালাচ্ছে গোপীনাথ। সমানে মাথার মধ্যে নানান কথা কিলবিল করছে।

আচ্ছা, লছমিয়ার হাডডির ওজন কত ছিল? হালিশহরের শ্মশানে সব ছাই হয়ে গেছে। মানুষের হাড় ওজন দরে কেনা-বেচার রেওয়াজ নেই। কেউ পোড়ায়, কেউ মাটি চাপা দেয়। মানুষের হাডডি কেনা-বেচার রেওয়াজ থাকলে শালা বটুবাবু অনেক নাফা কামাত। আর গোপীনাথের মত এজেন্টরাও কিছু পয়সা পেত। রাম, রাম, এসব কি ভাবছে সে। থুক করে একদলা থুথু ফেলে আরেকটা বিড়ি ধরাল

গোপীনাথ। এক পাশের পাঁজরার হাড়গুলি সাফসুতরো করে ঝোলায় পুরল। আরেক পাশের কাজে এবার হাত লাগাবে। বিষ্টিটা যেন আবার চেপে এল।

কাক-শকুনির দল ঠায় বসে আছে। কুকুরটা নেই। কখন কোনদিকে চলে গেছে খেয়াল করেনি গোপীনাথ। মেঘে মেঘে তেমনি অন্ধকার। দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে।

জারুল গাছের নিচে ভেজা গামছার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে আনু। ঝিরঝির বৃষ্টি মাথায় করে তুরন্ত হাত চালাচ্ছে গোপীনাথ। প্যান্ট কতুয়া ভিজে জবজবে। সকালবেলা খানিকটা ছাতু পেটে পড়েছিল আর এক কাপ চা। এখন কিছু খাবার কথা ভাবতে পারছে না সে। অন্ধকার হবার আগেই কাজ হাসিল করতে হবে। কাছেপিঠে জনমানুষের সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পর পর এক একটা মোটর লরী কিংবা বাইশ নম্বর বাস বনগাঁ রোড ধরে এধার-ওধার ছুটে যাচ্ছে। অন্ধকার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা করে শকুনি জলার উপর দিয়ে উড়ে যেতে শুরু করল। কয়েক ধাপ ছুটে গিয়ে ডানা মেলে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে। দূরে মোহনপুর বাজারের দিক থেকে একটা-দুটো আলো টিপটিপ করছিল।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে জোনাকির খেলা শুরু হয়েছে। মেঘের আড়ালে আড়ালে ডুবে গেলেন সূরজদেব।

এ সময় এক কাপ চা পেলে বহুত আচ্ছা হত। চা-এর কথা ভাবতেই গোপীর গলার ভেতরটা যেন আরো শুকিয়ে উঠল। আরেকটা বিড়ি ধরাল। আধ মাইলটাক দূরে মোহনপুর বাজার।

সেখানে মদন সাহার চা-এর দোকান। আর যেটুকু কাজ আছে আধ ঘণ্টায় হয়ে যাবে। তারপর মদন সাহার চায়ের দোকানে গিয়ে আগুন দিয়ে এক কাপ চা খেতে হবে।

এক কাপ চায়ের দাম দশ পয়সা। সব জিনিস মাগ্গি হচ্ছে। কিন্তু বটুবাবু মালের রেট বাড়াবেন না। কিলোর দাম পুরনো দু আনা ছিল, এখন পনের পয়সা। অথচ কোম্পানীর কাছে মাল বেচেন আঠার পয়সা কিলো। সারা দিন বিষ্টিতে ভিজে এক কাপ চায়ের কথা ভেবে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল গোপীনাথের। দুপুর বেলা লাশের হদিস পেয়ে মনটা খুশ ছিল। তখন ভেবেছিল বটুবাবুর মত মানুষ হয় না। সাচ্চা আদমী। একটা পয়সা ফাঁকির কারবার নেই। দরকার হলে অগাম দেন। আর এখন এই সাঁঝ বেলার ছমছমে অন্ধকারে সারা দিন বিষ্টিতে ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে বটুবাবুটা মক্ষিচুষ। একটা পয়সা বাড়াতে চেনেন না। বেটে খাড়াতে চাইলে মোলায়েম করে বলেন— হারে গোপী, খুব তো পয়সা চিনেছিস আমার পয়সাটাই তো বেশী দেখলি তোদের আর কি। [illegible] মাল তুলে দিয়ে হাতে হাতে পয়সা [illegible] তারপর আমার কত [illegible] নৌকো ভাড়া [illegible] লোক খাটি [illegible] কাগজবাবুকে [illegible]

সব [illegible] এই [illegible] —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সারা দিন [illegible] দুই হাতের [illegible] সাধ [illegible] এমন [illegible] যে [illegible] না।

এখন [illegible] কাক [illegible] মাস [illegible] সমস্ত হাড় ঝোলায় পুরল গোপীনাথ। এখন শুধু শিরদাঁড়াটা বাকি।

বড় কাটারিটা হাতে নিয়ে শিরদাঁড়া কুপিয়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল গোপীনাথ।

প্রথমে মাথাটা আলগা করে নিল। হঠাৎ নজরে পড়ল বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে কি

একটা বেরিয়ে আসছে। ঘাড়ে-গর্দানে ধুমসো চেহারার লেজমোটা একটা শেয়াল। আঁখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পেছনে আর একটা, তার পেছনে আরো গোটা তিনেক।

বিড়বিড় করে বকলো গোপীনাথ—শালা, গিদ্ধড় আ গিয়া—

দুটো ধাড়ি, তিনটে ছানাপোনা। জারুল গাছটার ওপাশে বাঁশঝাড়ের কিনারায় ঘুর-ঘুর করছে। একটু একটু করে এগোয় আর মানুষটা এক একবার মুখ তুলে তাকালেই পিছিয়ে যায়।

ধাড়ি দুটোর সাহস বেশী। অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। এমনিতেই মেজাজ খাট্টা হয়েছিল। এখন এই গিধড়গুলোকে দেখে আরো খিচড়ে গেল।

লাঠিটা হাতে তুলে হাঁক দিল গোপী—ভাগ্ ভাগ্ শালা—

একটু পেছিয়ে গেল ওরা। তারপর আবার গুটি গুটি ফিরে দাঁড়াল। বাঁশঝাড়টার ভেতর থেকে আরো কয়েকটা বেরিয়ে এল। মোট সাত-আটটা শেয়াল জারুল গাছটার এপাশ-ওপাশে, বাঁশঝাড়ের আনাচে-কানাচে ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে করতে লাগল। কোনদিন যা হয় না। এই সাঁঝ বেলাতেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে শেয়ালগুলোকে দেখে গোপীর গা কেমন ছমছম করে উঠল। কুকুরটা এখন থাকলে ভাল হত। কুকুরের ডাকাডাকি শুনলে শিয়ালগুলো কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না।

জারুল গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছে আনু। রোগা দুবলা মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে।

এখন ওকে উঠাতে গেলে শেষ কাটাকুটি গুছিয়ে নিয়ে ডাকবে। শিরদাঁড়ার টুকরো গুলি ঝোলার মধ্যে নিল গোপীনাথ। ঝোলার মুখ বন্ধ করল। মোষের মথাটা নিয়ে কি করা যায়। একবার ভাবল ফেলে রেখে চলে যাবে। কিন্তু এই গিধড়গুলো তাহলে পারলে নিয়ে যাবে। এই শালাদের কিছু দেবে না সে।

মোষের মুখটা হাঁ হয়ে আছে। কালো জিভটা ঝুলে রয়েছে। মাথাটার ভেতর ঘিলু আছে, মজ্জা আছে। সেসব সাফ সুতরো করতে সময় লাগবে। এখন সময় নেই। এরপর অন্ধকারে আর নজর চলবে না। চারপাশে অন্ধকার চুপ চেপে আসছে। নসীব ভাল যে এখানে জোঁকের উৎপাত নেই, সাপও নজরে পড়েনি। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে গিধড়গুলো আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। অগত্যা ঠিক করলো গোপীনাথ, মোষের মথাটা জলের নিচে পাঁকের ভেতর পুতে রেখে যাবে। কাল সকাল সকাল এসে তুলে নেবে। জায়গাটা নেহাৎ অচেনা নয়। আধ মাইলের মাথায় মোহনপুরের বাজার। আরো মাইল তিনেক গেলে রেল লাইনের ধারে তাদের বস্তি। মাটির দেয়াল, বাঁশের খুঁটি আর খাপরার ছাউনি দেওয়া তাদের বস্তির ঘর।

মাথাটা দুই হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল গোপীনাথ। জলের কিনারায় এসে সবে দাঁড়িয়েছে, আচমকা আনুর আর্তনাদ শুনে ঘুরে তাকাল। ধাড়ি শেয়ালটা আনুর একখানা পা কামড়ে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গিধড়ের দঙ্গলটা ওকে প্রায় ছেঁকে ধরেছে। একটা হিংস্র হাঁক ছেড়ে ছুটে এল গোপীনাথ। দুই হাতের সমস্ত জোর দিয়ে মোষের মথাটা ছুঁড়ে মারল। ধপাস করে মাথাটা পড়লো দলটার মধ্যে। ওরা একটু পিছিয়ে গেল বটে। কিন্তু ধাড়িটা তখনো আনুর পা ছাড়েনি। বড় কাটারিটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোপীনাথ। মার শালেকো, মার শালেকো। ঘাড়ের উপর পয়লা কোপটা দিতেই আনুর পা ছেড়ে দাঁত খিঁচোল শেয়ালটা। একসার ঝকঝকে দাঁত। মুখের ভেতরটা যেন লাল মালুম হল, বোধ হয় আনুর রক্ত।

মার শালেকো। আর একটা কোপ মারল সোজা মুখের উপর। এবার পিছু হটলো বদমাশ গিধড়।

বাঁশঝাড়ের দিকে সরে গেল পুরো দঙ্গলটা। আনুর ডান পা দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছিল। মেয়েকে বুকে তুলে নিল গোপীনাথ। রক্তে হাত ভিজে গেল, বুকের কাছে ফতুয়া ভিজে গেল।

মোহনপুর বাজারের কাছে বনমালী ডাক্তারবাবুর দাবাখানা। যত তাড়াতাড়ি হোক যেতে হবে সেখানে।

তার আগে একমুঠো ঘাস চিবিয়ে থেতো করে ভেজা গামছার ফালি দিয়ে মেয়ের পায়ে জড়াল গোপী।

ভাঙা গলায় বারকয়েক ডাকল—আনু, আনু, আনু বেটি—

আনু বেহুঁশ হয়ে গেছে। গোপীরও যেন কোন হুঁশ নেই। ঝোলা ভর্তি হাড়, অস্তরপাতি, লাঠি, গামছা, ছাতুর পোটলা—সব পড়ে রইল। মেয়েকে বুকে নিয়ে এক কোমর জল ভেঙে কেমন কেমন করে যে পাকা রাস্তায় উঠে এল গোপীনাথ, নিজেও যেন খেয়াল করতে পারল না।

মানুষটাকে পালিয়ে যেতে দেখে শেয়াল-গুলো যেন একসঙ্গে ঠাট্টার সুরে চেঁচিয়ে উঠল—ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া—

আর গোপীনাথ তখন পাগলের মত ছুটছে। তার পায়ের নিচে কালো কুচকুচে ভেজা সাপের মত বনগাঁ রোড। মাথার উপর অন্ধকার আকাশ আর ঝিরঝির বিষ্টি।

সেই আকাশজোড়া মেঘ আর অন্ধকার আর বিষ্টি মাথায় নিয়ে গোপীনাথ ছুটছে, ছুটছে।

অদূরের দিল্লী

কনট প্লেস থেকে কার্জন রোড হয়ে যে প্রশস্ত রাজপথটি সোজা ইণ্ডিয়া গেট অঞ্চলের দিকে নাকবরাবর গিয়েছে, সেই রাজপথের এদিকে জনবিরল, কিন্তু জনরব-বহুল হেলি রোড। এই হেলি রোডে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের যে বঙ্গভবন নামের অতিথিশালা তারই ক্ষুদ্র একটি কুঠরিতে "বেঙ্গল এসোসিয়েশন" নামে প্রতিষ্ঠান।

বেঙ্গল এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো উদ্যোগ নয়, না কি বেঙ্গল এসোসিয়েশন অবসর যাপনের জন্য "উচ্চ-শ্রেণী" বাঙালীদের কোনো ক্লাব। এমনকি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলতে সচরাচর যা বোঝায় তাও নয়, এই বেঙ্গল এসোসিয়ে-

দরবেশ

শন। প্রতি সন্ধ্যায় তাই বেঙ্গল এসোসিয়েশন নামধারী কুঠুরিতে বসে না কোনো গাল-গল্পের আসর। পারতপক্ষে কোনো বাঙালীই এখানে তার পায়ের ধুলো তেমন দেন না; এমন কি এই এসোসিয়েশনের যিনি সাধারণ সম্পাদক নামে অভিহিত তিনি নিজেও এখানে সপ্তাহের একটি দিন মাত্র আসেন, তাই আমায় তিনি বললেন জীবিকার ধান্দায় আরো দশটা কাজে তিনি ব্যস্ত।

এমন কি দিল্লীবাসী বাঙালীদের মুষ্টিমেয় জনাকয়েক ভাগ্যবান যাঁরা এসোসিয়েশনের প্রকাশিত মুখপত্র "দিল্লীর বাঙালী" ষাণ্মাসিক পত্রিকাটি বিনামূল্যে পান, তাঁরা ছাড়া অনেকেই এই এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, খুব খোলাখুলিভাবেই আমি বলছি, দিল্লীর বাঙালী এবং বৃহত্তর বাঙলার অনেকে না জানলেও এই বেঙ্গল এসোসিয়েশনের স্থায়িত্ব আর এর সুষ্ঠু কর্মসূচী, ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্য, এবং পরিচালনার উপর নির্ভর করছে দিল্লীবাসী বাঙালীর সমাজ-জীবন; অবশ্য দেহটা যাঁদের শুধু বাঙালীর, চিত্তের যোগ ইউরোপের সঙ্গে তাদের কথা আলাদা। আর, বাঙালীর জনসংখ্যা দিল্লীতে নেহাত কিছু কম নয়। দক্ষিণ, যে কোনো প্রদেশীয় মানুষের চাইতে আমরা লক্ষ্যণীয়-ভাবে সংখ্যাধিক। দক্ষিণী বলতে মালয়ালম তামিল আর তেলেগুভাষীদের আমি বোঝাতে চাইছি। মারাঠী, গুজরাতী, ওঁরা তো সংখ্যায় আরো অনধিক।

কথাটা কিঞ্চিৎ গুছিয়ে বলছি।

লর্ড কার্জনের কালে কলকাতা আর ঢাকা শহর থেকে তুফান মেলে সোজাসুজি পার্মা-নেন্ট চাকরি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট বা মাট্রি-কুলেট বাঙালীবাবু দিল্লী ইস্টিশনে এসে পৌঁছুতেন সরকারের তিনি পদানত ভৃত্য হলেও দিল্লী পদার্পণমাত্র ললাটে তার তোলা থাকতো বলতে গেলে জামাই আদর। দিল্লী জংশনে এসে তিনি পৌঁছুলেন "পাণ্ডব-বর্জিত" ইন্দ্রপ্রস্থে। একটিই মাত্র তখন প্ল্যাটফর্ম ছিল রেলস্টেশনে। ইস্টিশন থেকে তল্পিতল্পাসমেত বেরুলেন বাঙালীবাবু। তাকে দেখে অমনি বাজল পুলিসের হুইসল। সেই হুইসল শুনে মুসলমান গাড়োয়ান ঘোড়ায় টানা তার টাঙ্গাগাড়ি নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির। হাজির হয়ে মাল-পত্তরসমেত বাঙালীবাবুকে, যদি সঙ্গে বউ-বাচ্চা-বোঁচকাছানা-টিয়েপাখি থাকে, তাদের সকলকেই তুলে নিয়ে সটান পৌঁছে দিল কাশ্মীরী দরওয়াজার ভেতর-ভেতর যমুনা-তীরে তিমারপুরে নির্দিষ্ট সরকারি কোয়ার্টারে। কোয়ার্টারের নিকটে সেক্রে-টারিয়েট; ছেলেমেয়েদের জন্য বাঙলাভাষার মাধ্যমে ইস্কুল, বড়দের জন্য ক্লাব, যাত্রাপার্টি, কালীমন্দির। বাঙালীবাবুদেরই বোলবালাও তখন ভারত সরকারের রাজধানীতে। অন্যান্য প্রদেশবাসীর অনুপ্রবেশ তখনো বাঙালীদের স্বপ্নাতীত।

মোগলাই দিল্লীর শেষ চিহ্ন, কেবল মুসলমান গাড়োয়ান এ-কথা আমি বলছিনে। কিন্তু তথাপি ঐতিহাসিক কারণে বাস্তবিকই মোগলাই দেহলী যেমন গায়েব হয়ে গেছে বিশেষ কোনো এক স্বপ্নরাজ্যে, কার্জন-কালের দিল্লীও বিলকুল হারিয়ে গেছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে গেছে বাঙালী-মহলে রায়[illegible] রায়-বাহাদুরদের প্রাধান্যও। ওরাই [illegible] ছিলেন বাঙালীসমাজের একছত্র ধারক [illegible] বাহক। আপিসে ক্লাবে কালীবাড়িতে [illegible] সাহিত্য-বাসরে বিয়েবাড়িতে পুজোমণ্ডপে [illegible]স্থলে, এমনকি শ্মশানেও তখন ওদের [illegible]পস্থিতি বাঙালীসমাজকে ধন্য করে [illegible] কানায় কানায়। যুদ্ধোত্তর রাজধানী[illegible]গোলে দিল্লীর তৎকালীন চরিত্রটা, [illegible]টিস দিয়ে, একদম পাল্টে গেল। স্বাধীনোত্তর দিল্লীর এই তৃতীয় দশকে দিল্লীবাসী বাঙালীকে রীতিমত টিঁকে থাকতে হচ্ছে অন্যান্য বিশটা প্রদেশী দিল্লীবাসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। সেই প্রতিযোগিতায় ক্রমশ আমরা যাঁরা বাঙালী, তাঁরা হতাশ-জনকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি। আত্মচেতনা চারি-দিকেই তীব্র। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের পারস্পরিক অভিঘাতে বাঙালীয়ানা আর সেকালের বাঙালীয়ানা থাকছে না। অথচ তা আমরা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কলহ-প্রিয়তা এতই আমাদের মোহান্ধ করে রেখেছে। পরশ্রীকাতরতা এখনো অকাতর-ভাবে আমাদের চারিত্রিক প্রসাধন। ঘৃণায় এখনো আমাদের মুখ বেঁকে যায় অন্য মানুষের অন্য প্রদেশের অন্য দেশের সৌভাগ্যে। কোঅপারেটিভ মনুষ্যত্ব কাকে বলে, তার ব্যবহার এখনো আমাদের অজানা। আর, এই বিষয়ে মস্তবড় একটি তথ্য হলো, বাঙলাভাষীদের চাইতে দক্ষিণীদের সমাজগত জীবন ঢের বেশি উন্নত মানের কোঅপারে-টিভ। বাঙলাদেশের অপ্রবাসী বাঙালীরা একা একা থাকতে চাইলেও হয়ত একা একা থাকতে পারেন। দিল্লীর প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে সেটা আত্মকেন্দ্রিকতার সুস্পষ্ট এবং ঘৃণ্য পরিচয়। মানুষ যে একা একা কোনো নিরালা দ্বীপবাসী হতে পারে না, তা দিল্লীপ্রবাসী দক্ষিণীরা নিত্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। সমাজ-জীবনে দক্ষিণী দিল্লীবাসীরা দিনকে দিন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন, স্বচ্ছ পরিকল্পনা অনুসারে। যেমন ধরা যাক ওদের ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল পরিচালনার ব্যাপারটা। ওদের ইস্কুলগুলো সুপরিচালিত। [illegible] [illegible] সেগুলো [illegible] [illegible] যাচ্ছে না। [illegible] দিল্লী প্রশাসনের [illegible] [illegible] মিডিয়ামে শিক্ষা [illegible] ওদের, দক্ষিণীদের ছেলেমেয়েরা দিব্যি শিক্ষা পাচ্ছে। ওদের দেশের [illegible] চাকরির সন্ধানে দিল্লীতে এসে [illegible] একা একা দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয় না। ওদের দায়িত্ব দিল্লী-বাসী ওদের সমাজের স্বেচ্ছাব্রত দায়িত্ব। প্রত্যেক ভাষাভাষীদের [illegible] করে গেস্ট হাউস আছে। সেগুলি প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায়। নামমাত্র অর্থব্যয়ে তাতে নবাগন্তুকের মাস খরচ চলে যায়। এই সব [illegible] বিশ্বখ্যাত শুভলক্ষ্মীর মতন কোকিলকণ্ঠীরা সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ওদের হাতে সানন্দে তুলে দিয়ে যান। এই ধরনের নানাপ্রকার সুখসুবিধের সুন্দর ব্যবস্থা দক্ষিণীরা আপন-আপন সমাজের সুবিধের জন্য করতে পারেন। যা দিল্লীবাসী বাঙালী আমরা এযাবৎ করতে পারিনি, করবার কথা নিয়ে খুব বেশি যে ভাবতে বসি তাও নয়। তর্কা-তর্কি বিস্তর হয়, শেষ-পর্যন্ত সব বান-চাল হয়ে যায়. 'সভামণ্ডপে বহু জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনা যায়, কিন্তু কর্মস্থলে লোক পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর,' এই ব্যাপারে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের কথাটাই আমি উদ্ধৃত করে দিলাম। অরুণ-কুমার ঘোষ বলেছেন, 'সভা-সমিতিতে লোকের অভাব হয় না, কর্মস্থলেই শুধু

তাদের অনুপস্থিতি দেখি। বস্তুত, কর্মীর অপেক্ষা নেতা আমরা সংখ্যার ঢের বেশি, যেমন 'শিক্ষিতের' চাইতে 'শিক্ষকের' সংখ্যা জয়াবহ, এও তেমনি। সমাজজীবন? তা নিয়ে দিল্লীবাসী আমরা পারতপক্ষে মাথা ঘামাইনে। বস্তুত নিজ নিজ সন্তানসন্ততির গণ্ডির বাইরে যে বাঙালীসমাজ তার জন্য আমাদের কোনো টান আছে, আসল সময়ে, তা বুঝবার জো নেই। মুশকিল, এ জিনিস শেখানো যায় না, আপনি শিখতে হয়।

বাঙালী ক্লাব দিল্লীতে আছে তা চল্লিশেরও অধিক। ওদের মধ্যে বেশির ভাগই শুধু নাট্যাভিনয় নিয়ে থাকেন। কারো বা শুধু একটি ক্যারমবোর্ড বা পাঠাগার একমাত্র আকর্ষণ। দুর্গাপুজো, বাণীঅর্চনা, রবীন্দ্র জন্মতিথি, এই ধরনের পুণ্যকর্মে সকলেই খুশমেজাজে একত্র হন। তবে চার-পাঁচটি ক্লাব এখনো আছে, যেগুলি যে-কোনো সমাজসচেতন বাঙালীর পক্ষে গর্ব করার মতো প্রতিষ্ঠান। নাট্যাভিনয় বাঙালী সাংস্কৃতিক জীবনের স্পষ্টতই একটি অঙ্গ। তা ছাড়াও সমাজসেবার—দশের কাজে আসার কাজটাও এই কটি প্রতিষ্ঠানের অবশ্য পালনীয় কর্ম যাতে মনুষ্যের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বাঙালীদের সবরকম আশা ভরসা, সুখদুঃখ ও আনন্দবেদনার ভাগী হন মাত্র এই চারটি কি পাঁচটি বাঙালী ক্লাব। এদের মধ্যে সবচেয়ে যেটি প্রাচীন তার নাম বেংগলী ক্লাব, কাশ্মীরী গেট। আর সবচাইতে যেটি নতুন অথচ সবার সেরা তার নাম করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ। সামগ্রিকভাবে সমাজগঠনমূলক সমস্ত কাজেকর্মে এরা সদা-সর্বদা এক পা এগিয়েই রয়েছেন। এই ক্লাবের পরিধি সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছুঃ এতেই মিলবে, প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা এরা বাড়িভাড়া দেন ক্লাবের, এবং ক্লাব সংক্রান্ত ব্যাপারে, যেমন ইস্কুলবাড়ি, অতিথিশালা। খুলেছেন এবার এরা ফ্রি ডিসপেনসারী।

তবে মূলত নানান বাধাবাধকতার জন্য প্রত্যেকটি ক্লাবই পাড়াকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এদের না আছে উপযুক্ত অর্থবল, না তেমন জনবল। এদের বর্তমান কর্মসূচী থেকে একটু এগুতে গেলেই অর্থবল জন-বলের অনিবার্য প্রশ্ন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেভাবে দিল্লীবাসী বাঙালীদের বসবাস তাতে সকলের পক্ষে সর্বত্র এগিয়ে আসাও প্রায় অসম্ভব। এইসব ভেবেচিন্তে বেঙ্গল এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা, যে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের প্রসঙ্গ আমি এই নিবন্ধের গোড়াতেই তুলেছি। ছোট-বড় সমস্ত বাঙালী ক্লাবগুলি এই এসোসিয়েশনে এসে ওদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত সকলে এক হয়েছে, ছোট-বড় সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি যেমন এক হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এসে। বেংগল এসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্য, ওদের কর্ম-পদ্ধতি দেখে তাই মনে হয়, অনন্তকেও সম্ভব করে তুলবেন। কেন এই বোধ তা ওদের কর্মসূচীর একটি বিষয় দিয়ে উদা-হরণ দিচ্ছি।

দিল্লীতে আটটি ইস্কুলের শিক্ষার মাধ্যম বাঙলাভাষা। এই ইস্কুলগুলি দিল্লী প্রশাসনের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পায় যেমন অন্যান্য ভাষাভাষীদের ইস্কুলগুলি নিয়মিত পেয়ে থাকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের আইনানুসারে। কিন্তু সেই অর্থসাহায্যটুকু এতই হাস্যকরভাবে অল্প যে, বর্তমানে বাঙলাভাষা মিডিয়াম ইস্কুলগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার চরম অবস্থা। বাঙালী জন-সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে কোনো-প্রকারে কর্তৃপক্ষরা ওদের আয়ব্যয়ের হিসেব মিলোন। কিন্তু এইরকম নাভিশ্বাস দুরবস্থায় আর কতদিন যে বাঙালীদের এই ইস্কুলগুলি টিকে থাকতে সমর্থ হবে তা এখন বলা দুষ্কর। খুব সম্ভব অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত এই আটটি বাঙালী ইস্কুলই একে একে দিল্লী প্রশাসনের হাতে চলে যেতে বাধ্য হবে। তখন দিল্লীর বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষার একদম বারোটা বেজে যাবে। হিন্দী ভাষায় পড়তে হবে অ-আ-ক-খ। রবীন্দ্রনাথ অচল হয়ে যাবে। পাগলা দাশুকে আর চিনতে পারবে না আমাদের শিশুরা। দিল্লী প্রশাসন বঙ্কিমকেও চেনেন না। কেন্দ্রীয় জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী মহাশয় সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা সভায় বললেন, 'বঙ্কিমের পূর্বে বাঙলাভাষা ছিল একটি ট্রাইবাল ল্যাংগুয়েজ।' মালুম হায় জী?

বেঙ্গল এসোসিয়েশন এই ইস্কুলের ব্যাপারে একটা ট্রাস্ট গড়ে তুলতে চান। আর এই ট্রাস্টের হাতে সেইসঙ্গে ইস্কুলগুলির সমস্যাগুলোকেও ধরিয়ে দিতে চান। অথচ ট্রাস্ট বানানোর জন্য চাই অর্থ, কর্মী। টাকার প্রয়োজন তা প্রায় এক্ষুনি কুড়ি-পঁচিশ লক্ষ টাকা। এতে ইস্কুলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বেঙ্গল এসোসিয়েশন-এর সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে উঠে পড়ে লেগে সর্বদিক দিয়ে তদ্বির করছেন বলে শুনেছি। আর আপাতত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য যা পাচ্ছেন এসো-সিয়েশন সেই অর্থ দিয়ে ইস্কুলগুলিকে টায়টোয় টিঁকে থাকার সাধ্যমত রসদ যোগাচ্ছেন, যে রসদ নামমাত্র।

বেঙ্গল এসোসিয়েশন নানাভাবে সদা-সর্বদা দিল্লীর বাঙালী সাংস্কৃতিক সংগঠন-গুলিকে প্রেরণা দিচ্ছেন। বাঙলাদেশের রবীন্দ্র-ভারতীর ধরনে বঙ্গ-ভারতী নামে এরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি বিদ্যালয় খুলেছেন। এই বিদ্যালয়টি অদূর-ভবিষ্যতে সম্ভবত রবীন্দ্রভারতীর সংগে যুক্ত হলেও

হতে পারে। বর্তমানে এর দুটি শিক্ষাকেন্দ্র। শহরের দক্ষিণে বিনয়নগর ইস্কুল, আর পশ্চিমে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের শিশু-ভারতী। স্বাধীন একটি সমিতির উপর সংগীত বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব, যার সভাপতি দীপালি নাগচৌধুরী। যাঁকে কলকাতার সংগীতপ্রিয় মানুষমাত্রই চেনেন।

বেঙ্গল এসোসিয়েশন একদিকে গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা যেমন করছেন, অন্যদিকে এরা তেমনি করতে চাইছেন অসচ্ছল যুবকযুবতীদের হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা।

শুধু কি এই? আরো অনেক। এবং যে কথাটা এবার আমি বলছি তাতে প্রবাসী-অপ্রবাসী বাঙালীমাত্রেরই উৎসাহবোধ হবে। বেঙ্গল এসোসিয়েশন শিগ্‌গিরই ইংরেজী ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যার উদ্দেশ্য পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতিকে 'বিশ্ববাসীর নিকটে' তুলে ধরা। এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করবেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। অবশ্য এই প্রচেষ্টারও সবকিছুই নির্ভর করছে কার কতখানি ভেতরের তাগিদ তার উপর।

এখন বুড়ো হয়েছি—একথা অকপটে স্বীকার করি যে, মেয়েদের দেহের কটিদেশের নীচ থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত অংশটুকু কিশোর বয়স থেকেই খুব রহস্যময় লাগত। বোধ হয় সব পুরুষেরই তাই লাগে। কেবল সুরূপা, সুগঠনা মেয়ে নয়, যে-কোন কৈশোরোত্তীর্ণার পায়ের গোছ (calf) দেখতে পেলেও শরীর শিউরে উঠত। আমাদের ভারতীয় মেয়েরা শাড়ি পরে বলে এখনও তাদের হাঁটুর কারোর দৃষ্টিগোচর সচরাচর হয় না। আমার যৌবন পর্যন্ত দেশের মেয়েদের মুখ, হাত ও পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। যৌবন যখন যায় যায়, তখন বাংলা দেশে বুক পর্যন্ত ঢাকা চোলি ও নাভি থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা শাড়ি পরার চল হল। এই পাঁজর থেকে কোমর (midriff) দেখান স্টাইল বেশ পুরুষচিত্তচাঞ্চল্যকারী মনে হত। ছবিতে বিদেশী মেয়েদের বিকিনি (bikini) পরা মূর্তির চেয়েও মিডরিফ দেখানো শাড়ি-চোলি পরা ভারতীয় মেয়েদের চেহারাই বেশী টীস্টিং লাগত এবং এখনও লাগে। আজকাল অবশ্য ভারতীয় আধুনিকারা বুকের ভাঁজ ও নিতম্বের খাঁজ সাধারণের দৃষ্টিগোচর করতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ। জানি না, এতে ভারতীয় তরুণদের 'বক্ষ মাঝে রক্ত আত্মহারা' হয় কিনা, আগে আমাদের যেমন তরুণীদের পায়ের গোছ দেখতে পেলেই হত। আমার ধারণা নারীদেহ যত দৃশ্যমান হয়, ততই তার পুরুষ-চিত্ত-চঞ্চল করার শক্তি কমে আসে।

১৯৫৩-তে তো বটেই, ১৯৫৭তেও সুয়োমি দেশে মেয়েদের ফ্রক বা স্কার্ট হাঁটুর নীচেই ছিল। ১৯৬৩তে দেখলাম, হাঁটুর ইঞ্চি খানেক উপরে তা উঠেছে। এবারে দেখছি স্কার্ট বা ফ্রক ঊরুর মাঝামাঝি উঠেছে। কোন কোন সাহসিকার স্কার্ট কেবলমাত্র নিতম্ব ঢেকেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাঞ্জাবির যা ঝুল তার চেয়ে এদের স্কার্ট বা ফ্রকের ঝুল বেশী নয়। দারুণ শীতেও সীমলেস্ ট্রান্সপারেন্ট নাইলনের মোজা ছাড়া নীচের দিকটা সম্পূর্ণ অনাবৃত। কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করেছি, ওপর দিকে ত ফারের মোটা ওভারকোট পরেছ, নীচের দিকে শীত করে না?" তারা বলে—"সয়ে গেছে। খুব ঠান্ডা লাগলে আর একটা পাটি ও হাঁটুর নীচে পর্যন্ত আর একটা মোটা মোজা পরে নিই। আমার তো পথে-ঘাটে ক্যাম্পাসে মেয়েদের রম্ভোরু দেখে দেখে চোখ এমনি অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, নারীদেহের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল জাগে না। তরুণদের জাগে কিনা জানি না। কিন্তু মনে হয়, যার আভাস মনে চাঞ্চল্য আনে, তা অনাবৃত হলে মনকে আর নাড়া দেয় না। এদেশী মেয়েরা ফ্যাশনের অনুসরণ করতে গিয়ে নারীদেহের রহস্যময়তা হারিয়েছে। ফ্যাশন নারীদেহকে লোভনীয় করে দেখাতে গিয়ে পুরুষদের চোখে কড়া (callous) পড়িয়ে দিচ্ছে। এর চেয়ে পাঁজর-দেখান স্টাইল বেশী লোভনীয়। তবে দেশে যে সব স্থূলাঙ্গিনী ঐরকম সাজেন, তাদের মিড্‌রিফের জায়গায় মোটরের টায়ার বাঁধা বলে মনে হয়।

এদেশে যোগ শেখাতে এসে আমার জন্মান্তরে বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। যে ছবি কটা পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে তার মধ্যে দুটোতে আমার একটি ছাত্রী (নাম—রাইয়া) কর্ণপীড়াসন ও পদ্মাসন করছে। এ মেয়েটি বদ্ধ পদ্মাসনও করতে পারে, যা আমি আজও পারি না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় জিমন্যাস্টিকের বেশ চল আছে। সর্বাঙ্গাসন, শীর্ষাসন, হলাসন এরা চট করে শিখে নেয় অনেকেই। পদ্মাসন শেখানই কঠিন, কারণ এরা হাঁটু ভাঁজ করতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। বরং বজ্রাসনে বসতে পারে, কিন্তু অর্ধ-পদ্মাসনও করতে পারে না। এ মেয়েটি মাত্র

রাইয়া-পদ্মাসন

৩ সপ্তাহ আসন শেখার পরে এই ছবি তোলা হয়েছে। ওকে বললাম, "তুমি আগের জন্মে নিশ্চয় যোগিনী ছিলে। তা না হলে এসব আসন এত অল্পদিনে এত ভাল করে কি করে করছ?" আমার গুরু "কালিপদ গুহরায় "প্রারব্ধ" কথাটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন। মানে জিজ্ঞেস করতে এক-দিন বলেছিলেন, "পূর্বজন্মে অর্জিত বিদ্যা বা পটুত্ব।" এ মেয়েটিও প্রারব্ধের জন্যই হয়ত এত অনায়াসে এত কম সময়ে এই আসনগুলো করেছে। তিব্বো নামে একটি ১৮।১৯ বছরের তরুণ ছাত্রও এসব আসন করতে পারে। অথচ হ্যানে-ক্রনেশের ধড়ল্ল (আমার অন্যতম ছাত্র) একটা পা লম্বা করে বসে আর একটা পা উরুর ওপরে তুলতেও পারে না।

ভারতে দেখেছি ১০টি যোগ-শিক্ষার্থীর মধ্যে বড় জোর একটি মেয়ে পাওয়া যায়, বাকি ৯ জনই পুরুষ। এদেশে তার বিপরীত। এই ৯ মাসে প্রায় হাজার জনকে আসন শিখিয়েছি তার মধ্যে ৩৫০ জনই মেয়ে। কারণ জিজ্ঞেস করলে এরাও ঠিক বলতে পারে না। এদেশে জুদো ও কারাতে নামক দুরকম জাপানী ব্যায়াম বেশ

রাইরা-কর্ণপীড়াসন

প্রচলিত। তাতে কিন্তু পুরুষদের খুব ভিড় দেখলাম। ফিনল্যান্ডের জুদো এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ম্যাক্স য়েনসেন একদিন একটা কারাতে ট্রেনিং কেন্দ্র দেখাতে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলাম এক জাপানী এক্সপার্ট পর পর দুটো দলকে প্রাথমিক ও এডভান্সড কারাতের লেশন দিলেন। প্রায় ৫০।৬০ জন দু দলে শিখল—সবাই পুরুষ। আমি ছাড়া ৫।৭ জন দর্শক ছিল, তার মধ্যে ২।৩টি মেয়ে। য়েনসেনও এডভান্সড গ্রুপে কারাতে শিখলেন। ইনি 2.dan জুদো এক্সপার্ট, এখন এদেশের প্রধান জুদো শিক্ষক। জুদোর থ্রোতে এঁর মেরুদণ্ড ও ডান হাটু জখম হওয়ায় হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। তারপরেও পিঠের ও হাটুর আড়ষ্টতা না সারায় আমার কাছে আসেন যৌগিক প্রথায় যদি আড়ষ্টতা সারে। মাস দুই আসন করার পর সেরে গেলে তাঁর লেখা একটা বই আমায় উপহার দিয়েছেন, বইটার নাম—Judo। উপহার দিতে লিখেছেন, "To my Yoga teacher Mr. Dhiren Dutta thanking for the cure of my back." ইনি I. C. I.-র Synthetic fibre-এর সেলস্ অর্গানাইজার ও এঁর স্ত্রী এলিজাবেথ ইংরেজ মহিলা। এলিজাবেথ ১৯৬৩-তে কিছুদিন আমার কাছে যোগাসন শিখেছিল। তারপর এর তৃতীয় সন্তানটি জন্মায়। তার প্রসব এত সহজে ও বিনাকষ্টে হয়েছিল যে এবারেও সে আমার ক্লাসে নিয়মিত আসে, যদিও যে সব আসন ক্লাসে শেখাই, ছয় বছর আগে তার অধিকাংশই এ শিখেছিল। এরই প্রভাবে ম্যাক্স পিঠ সারাবার জন্য আমার কাছে প্রথম আসে। পিঠ সারার পরে বলে, "ধ্যান করা শিখতে চাই" বললাম, "ধ্যানের সময় প্রাণায়াম করে মন্ত্র জপ করতে হয়। আমি ত গায়ত্রী মন্ত্র জপি, সংস্কৃত ত তুমি বুঝবে না। "Our father which art in heaven" মনে মনে জপ কোরো"। ম্যাক্স বলল, "গায়ত্রী উচ্চারণ করতে শিখিয়ে দাও আর মানে বলে দাও"। ওর আগ্রহ দেখে তাই করলাম। ও এখন মাঝে মাঝে আমায় চিঠি লেখে ও নাম সই করার আগে লেখে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। আমি হেলসিংকিতে রাত্রে থাকলে ম্যাক্স ভোর ছটায় আমার ঘরে এসে আসন করে ও আমি আপত্তি করা সত্ত্বেও যেদিনই আসে ২০ মার্ক (=৪০৲) দিয়ে যায়।

এদেশে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এই ষোল বছরের মধ্যে যথেষ্ট বেড়েছে। প্রতি ছয়জন লোকের একটা মোটর কার আছে। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরেও একাধিক রেডিও ও একটি টেলিভিশন সেট আছে। এদেশে ফার্মগুলো সাধারণত বেশী বড় নয়, কিন্তু ট্র্যাক্টর দেখছি প্রায় সব ফার্মেই আছে। ১৯৬৩-তেও দেখেছিলাম ৪টের মধ্যে ১টা ফার্মে ট্র্যাক্টর। প্রায় সব শহরেই বড় বড় অফিস, ব্যাংক প্রভৃতিতে এস্কেলেটার এবারে এসে দেখছি। ১৯৬৩-তে হেলসিংকিতে গোটা দুই দেখেছিলাম। অন্য শহরে দেখিনি। পৃথিবীর ধনবান দেশগুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড এখন ত্রয়োদশ।

এদেশের বড় শহরগুলোকে বলে কাউপুংকি, ছোট শহরগুলোকে বলে কাউপ্পালা ও গ্রামকে বলে কুল্যা। কয়েকটা প্রদেশে এদেশ ভাগ করা। প্রদেশের গ্রামাঞ্চল আবার কুন্তা (Parish)-তে বিভক্ত। প্রত্যেক প্যারিশে অন্তত একটি কান্সাকৌলু বা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যে সব বাড়িতে এসব স্কুল সেরকম বাড়ি আমাদের বাংলা দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অন্তত ৮ বছর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এই স্কুলে পড়তেই হয়। ইংল্যান্ডের ইটন, হ্যারোর মত কোন প্রিভিলেজড ক্লাসের স্কুল এদেশে নেই। কান্সাকৌলুতে পড়া শেষ হলে—অধিকাংশই যায় আম্মাত্তিকৌলু (Technical স্কুল)-তে, আর যারা হাইয়ার এডুকেশন নেবে তারা ওপ্পিকৌলু বা লাসিওতে যায়। এ দুটো আমাদের হাই স্কুল ও হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের সমপর্যায়ের। তিন বছর এই স্কুলে আরো পড়ার পরে স্টুডেন্টশিপ বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হয়। সে পরীক্ষা পাশ করলে বিশ্ববিদ্যালয় বা হাইয়ার টেকনলজিক্যাল স্কুলে

ঢোকার অধিকার হয়। এই স্টুডেন্টদের মশাল-মিছিলের কথা আগের বারে লিখেছি। পয়লা মে-তে দিনের বেলাতেও স্টুডেন্টরা তাদের টুপি পরে মিছিল বের করে। এতে পুরোনো স্টুডেন্টরাও অনেকে যোগ দেয়।

অন্ধ, কালা, বোবা, খোঁড়া ছেলেমেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক। কিন্তু তাদের জন্য ভিন্ন বিদ্যালয় আছে। শারীরিক অক্ষমতা ছাড়া, যারা mentally retarded অর্থাৎ বয়স অনুপাতে যাদের বুদ্ধি বিকশিত হয়নি, তাদের জন্যও ঢালাও ব্যবস্থা। প্রতি প্রদেশেই এইসব ক্রেটিন, মোঙ্গোলদের জন্য একটা করে প্রতিষ্ঠান আছে। পাশের প্রদেশ কুমেনজ্যানির প্রতিষ্ঠানের মেট্রন মিসেস অর্ভোঝি নেডালাইনেন ১৯৫৭-তে জীভাকিডি ইণ্টারন্যাশনাল ফোক হাই স্কুলে আমার ছাত্রী ছিল। যোগ শেখেনি কিন্তু। আমি আবার এদেশে এসেছি শুনে আমায় তার বাড়ি গিয়ে ক'দিন থাকার জন্য বারবার চিঠি লিখছিল। মার্চের মাঝামাঝি কুসানকোস্কি কাউপ্পালাতে গেলাম তাদের বাড়ি। ১৯৬৩-তে দেখে গিয়েছিলাম অর্ভোঝি এক জাহাজের এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে এনগেজড্। নিজে তখন হ্যামেনলিন্না শহরের মানসিক হাসপাতালের অন্যতম নার্স। এবার দেখলাম তার বিয়ে হয়েছে ও দুটি ছেলেও হয়েছে (বয়স—৪ বছর ও ১½ বছর)। সে ও তার স্বামী ১০ কিলোমিটার দূরে রেল স্টেশনে নিজেদের গাড়ি নিয়ে এসেছিল আমায় রিসিভ করতে। দেখলাম তার স্বামীটি চমৎকার যুবক, অর্ভোঝির চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। নিজেদের সুন্দর তিনতলা বাড়ি—সেণ্ট্রাল হীটিং আছে। পরদিন অর্ভোঝির প্রতিষ্ঠান দেখাতে নিয়ে গেল। ৭৫ হেক্টারে ছড়ানো ১৬টা বড় বড় বাড়িতে ৫০০ মেণ্টালী রিটার্ডেড ছেলে-মেয়ের আবাসিক প্রতিষ্ঠান। তখন ৪০০র কিছু ওপরে পেশেণ্ট ছিল—২০০-র ওপরে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক ও অন্য কর্মী। পেশেণ্টদের অনেকেই আবার physically handicapped। ১৫।১৬ বছরের ছেলে-মেয়ে দেখলাম ১৫ দিন বয়সের শিশুর মত অসহায়। এদের মধ্যে যারা একটু ভাল, তাদের ছবি আঁকা, পুতুল করা, হাতের তাঁত চালান প্রভৃতি শেখান হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বজেট সওয়া কোটি মার্কের ওপরে অর্থাৎ আড়াই কোটি টাকা। বিশ্বভারতীতে প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। তার বাজেটের চেয়েও বেশী। এই প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭৫ জনই কোনদিন স্ব-নির্ভর হতে পারবে না, অর্ভোঝি বলল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সারা ফিনল্যাণ্ডে কি এই একটাই এরকম প্রতিষ্ঠান?" সে বলল, "না, এগারোটা ল্যানি বা প্রদেশের প্রত্যেকটাতে এরকম একটা করে আছে।" অর্ভোঝির স্বামী মার্চে এই প্রতিষ্ঠানে চীফ এঞ্জিনিয়ারের কাজ করছিল। মাইনে ও perquisites অনেক বেশী বলে সে মে মাসে আবার জাহাজের চীফ এঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়েছে।

জুলাই মাসে দিন পনেরোর ছুটি ছিল। অর্ভোঝি আবার তার বাড়িতে যেতে নিমন্ত্রণ করায় ১০ দিনের জন্যে গিয়েছিলাম। তার স্বামী তখন তার জাহাজ নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ৭টার মধ্যে অর্ভোঝি কাজে চলে যেত, বিকেল ৪টা নাগাদ ফিরত। আমি সারাদিন তার ছেলে দুটিকে নিয়ে থাকতাম। একটি মেইড ঘরের কাজকর্ম, রান্না, ছেলে সামলানো সব করত। বাড়ির গিন্নী ফিরলে চলে যেত। তারপরে ডিনার খেয়ে কোন কোনদিন বেড়াতে বেরোতাম—ভারতীয় সাধু, ফিনিশ মেয়ে ও দুই নাতি। সন্ধ্যা ৭টা থেকে T V দেখা ছিল আমাদের বাঁধা প্রোগ্রাম। তার আগেই ছোট ছেলেটি ঘুমোতে যেত।

এদেশের সভ্যতা একদিকে নীতিজ্ঞানহীন আর এক দিকে permissive। সুইডেনে বেশী পরিমাণে এবং এ দেশেও কিছুটা অবাধ যৌন-মিলন এখন প্রায় খোলাখুলিই হয়। কাগজে পড়লাম সুইডেনে বছর ২।৩ আগে এক হলিডে-রিসর্টে গ্রীষ্মকালে সকলের দৃষ্টির সামনে মেয়েদের ছাত্রের ওপরে নূতন যৌন-ক্রীড়া সম্পাদন করেছিল। যুগল এক্সিবিশনিজমের চূড়ান্ত নিদর্শন। সুইডেনে প্রতি দশটি নবজাত শিশুর মধ্যে একটির মা অবিবাহিতা। সে বর্থকণ্ট্রোল সম্বন্ধে সব কিছু জানা সত্ত্বেও গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে স্বেচ্ছায়। কারণ, সে দেশে অন্য দেশের মত অবিবাহিতা মা বা জারজ সন্তানকে সমাজে হীন হয়ে থাকতে হয় না। স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখা গেছে সুইডেনে দশটি বিবাহিতা মহিলার মধ্যে আটটিরই প্রাক্-বিবাহ যৌন অভিজ্ঞতা হয়। সুয়োমিতে এরকম অভিজ্ঞতা কিছু কম হলেও খুব কম নয়। আমি যেখানে আছি সেখানেই রয়েছে এরকম একটি মা ও ছেলে। ছেলেটির বাবা এখানকার এক প্রাক্তন কেনিয়ান ছাত্র। এখন সে স্টকহল্মে অধ্যয়ন করছে। ফাঁক পেলেই সে এখানে আসে। এবারে আমি আসার পরে সে দুবার এসেছে—দ্বিতীয়বার, এক ইণ্টারনাশনাল সেমিনারে। পরের চিঠিতে সেই সেমিনার সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছে রইল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাধুরী কলস্বরে বলে উঠলো, ওমা, তুমি আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

নীলাঞ্জন মুচকি হেসে বললো, কেন, এসে তোমাদের কোনো অসুবিধে ঘটালুম নাকি?

মাধুরী মাঝে মাঝে উল্টো পাল্টা কথা বলে ফেলে। মনে মনে ভাবছে এক রকম, কিন্তু বলার ধরনে অন্যরকম হয়ে যায়। রীতিমতন অনুযোগের সুরে সে বললো, যেদিন তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলবো, সেদিন কিছুতেই ফিরবে না। আর যেদিন নিজেই বলবে দেরী করে ফিরবো, সেদিনই...।

নীলাঞ্জন প্রচ্ছন্ন কৌতুকে রীতিমতন অভিমানের ভাণ করে বললো, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যখন অন্যায় করে ফেলেছি, তখন আবার চলে যাচ্ছি! এত সাজগোজ, বেরুনো হচ্ছে বুঝি কোথাও?

শুভ্রা বললো, নীলাঞ্জনদা, আপনি যখন এসে পড়েছেন আপনিই আমাদের নিয়ে চলুন সিনেমায়।

—সিনেমায়?

—হ্যাঁ। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি। চলুন, চলুন।

—তোমরা খবর শোনোনি বুঝি? হাতিবাগানের মোড়ে দারুণ গন্ডগোল হচ্ছে। টিয়ার গ্যাস চলেছে, এতক্ষণে গুলিও ছোড়া হয়েছে কিনা ঠিক নেই।

—যাঃ! সত্যি?

—হ্যাঁ—! বাস ট্রাম সব ঘুরিয়ে দিচ্ছে, আমি তো বাসে বসে বসেই টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া খেলাম। এখনও চোখ জ্বালা করছে। ভাগ্যিস তোমরা বেরিয়ে পড়ো নি। আমি ভাবলাম, তোমরা রানী রোডে প্রণব-শ্রাবণীদের ওখানে যাচ্ছো।

—না, শ্রাবণী তো বাপের বাড়ি গেছে। আজ আবার কি নিয়ে হলো?

—প্রথমে হকারদের সংগে ছাত্রদের লেগেছিল কি যেন যেন গন্ডগোল। তারপর যা হয়, জনতা ভার্সাস পুলিস।

শুভ্রা নীরস ভাবে বললো, ধুৎ! রোজ রোজ এই এক ঝামেলা!

নীলাঞ্জন বললো, তোমরা সাজগোজ করে ফেলেছো যখন, তখন চলো কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

—যাঃ, আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি মাধুরীকে নিয়ে ঘুরে আসুন।

মাধুরী বললো, তা হলে আমিও আর বেরুবো না। দীপু এসেছে।

বারান্দায় বসে বসেই দীপু শুনতে পাচ্ছিল সব কথা। বউদিদের শেষ পর্যন্ত সিনেমায় যাওয়া হবে না শুনে সে নিশ্চিন্ত হলো। ওরা সিনেমায় গেলে দীপুর যে কোনো আপত্তি ছিল, তা তো নয়, শুধু কেন জানি না তার মনে হয়েছিল, ওরা আজ সিনেমা দেখবে না। সেই মনে-হওয়াটা মিলে যেতেই দীপু খুশি।

নীলাঞ্জন বারান্দায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললো, মেজদি কেমন আছে?

বছর সাত-আট আগেও ওরা দু' ভাই ছিল দুই বন্ধুর মতন। দীপু ছিল দাদার অন্ধ ভক্ত। বড় হয়ে কি হবি দীপু? তখন এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো তাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই মনে মনে বলতো, দাদার মতন হবো। যদিও হীরো হবার মতন তেমন কোনো গুণ নেই নীলাঞ্জনের, পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু কখনো ফার্স্ট হয়নি, খেলাধুলোর দিকে কোনোদিনই তেমন মনোযোগ ছিল না। একটি মাত্র গুণ ছিল তার, সেটাও এমন কিছু নয়, লোকের চোখে পড়বার মতন নয়, কিন্তু সেটাই কম বয়সে দীপুকে সবচেয়ে আকর্ষণ করতো। নীলাঞ্জনকে কেউ কখনো মিথ্যে কথা বলতে শোনে নি। তার অনমনীয় সততা ছিল অনেকেরই কাছে একটা অস্বস্তির ব্যাপার। খবরের কাগজওয়ালা মাসের প্রথমে দাম চাইতে এসেছে। মা তখন

হয়তো গল্প করছিলেন মেসোমশাই'র সঙ্গে, উঠে গিয়ে আলমারি খুলতে হবে এই আলসেমিতে মা দীপুকে বললেন, যা-তো দীপু, ওকে বল আর সামনের রবিবার আসতে, আজ খুচরো নেই! কিন্তু কাছাকাছি নীলাঞ্জনকে দেখেই আবার বলতেন, আচ্ছা ঠিক আছে, বলতে হবে না, দেখি আছে কিনা, বাজার থেকে যে ভাঙিয়ে আনলো...। মা জানতেন, সবাই জানে, না হলে নীলাঞ্জনে তক্ষুনি বলতো, আমাকে দাও আমি ভাঙিয়ে আনছি। কোথা থেকে যে নীলাঞ্জন এই স্বভাবটা পেয়েছিল কে জানে! দাদার মতন আর কাউকে দীপু বা চেনাশুনো লোককে এমন কঠোর সত্যবাদী হতে দেখেনি দীপু। নীলাঞ্জন যে নিজেই শুধু মিথ্যে কথা বলতো না তাই নয়, তার সামনে অন্য কারুর কাছেও ছোটখাটো মিথ্যে বলবার উপায় ছিল না।

যতদিন দীপু মনে মনে ঠিক করে ছিল সে ও দাদার মতন হবে, ততদিন সে খুব সাবধান অবশ্য হয়। কিন্তু একটা সময় থেকে সে সব ব্যাপারকেই সত্যি-মিথ্যে দু ভাগে ভাগ না করে বাছাই করতে শুরু করলো। সেই থেকেই সম্ভব

সঙ্গে তার একটা দূরত্ব তৈরী হয়ে যেতে লাগলো। তা ছাড়া নীলাঞ্জনও বাড়ির বাইরের ব্যাপারে এত বেশী জড়িয়ে পড়তে লাগলো যে দীপুর সঙ্গে তার দেখাশুনোও হতো কম। এখন শুধু তাই-ই সুজনের কাছে একটু আকৃষ্ট। যে নীলাঞ্জন বাইরে রাজনীতি করে, যে-নীলাঞ্জন মাধুরীর স্বামী, সে-ই দীপুর দাদা হিসেবে কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজটা একটু বদলে ফেলে।

দীপু উত্তর দিল, ভালো আছে।

—রণুদা আর কোনো চিঠি দিয়েছে?

—বোধ হয় দেয় নি, দিলে জানতে পারতুম।

—রণুদা যে এমন অমানুষ হবে, ভাবিনি কখনো।

—হয়তো রণুদার পুরো দোষ নয়। মেজদিকে যদি তখন পাঠানো হতো—

—কি করে পাঠাবো? টুলটুলের তখন ছ মাস বয়েস। তা ছাড়া টাকা পাঠান নি।

মেজদির স্বামী রণেন হঠাৎ একটা স্কলারশিপ পেয়ে চলে গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানি। মেজদি তখন সন্তান-সম্ভবা। কথা ছিল, বছর খানেকের মধ্যেই রণেন নিজের স্ত্রীকেও নিয়ে যাবে। কিন্তু টাকা পাঠাতে পারে নি, ওখানে ভয়ঙ্কর খরচ, স্কলারশিপের টাকায় নিজেরই চলে না—এই সব লিখেছিল। অবশ্য, প্রথম প্রথম রণেন খুব লম্বা লম্বা কাতর চিঠি লিখতো, একা থাকতে একদম ভালো লাগে না, মেয়েকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে হয় এক্ষুনি দেশে ফিরে যাই—এইসব। বছর দেড়েক বাদে চিঠি কমাতে শুরু করে এবং কানাঘুষো শোনা যায়, নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য রণেন একটি মেম সাহেবকে বিয়ে করেছে। মেসোমশাই যেবার বিলেত যান, সেবার জার্মানি ঘুরে আসার সময় নিজের চোখে দেখে এসেছেন। তার পরও রণেন চিঠি দিয়েছে অবশ্য, এবং বিয়ের কথা অস্বীকার করেছে, কিন্তু মেজদিকে নিয়ে যাবার কথাও কিছু বলে নি। সাত বছর হয়ে গেল, আর তাকে ফিরে পাবার আশা খুবই কম।

নীলাঞ্জন বললো, যাক গে! টুলটুল ইস্কুলে যাচ্ছে তো? দেখিস ওর পড়াশুনো যেন ঠিক মতন হয়।

—টুলটুল এবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।

—তাই নাকি? অনেকদিন দেখিনি। একদিন ওকে নিয়ে আসিস এখানে। মেজদি আপত্তি করবে? মেজদি এখানে এখনও আসতে চায় না?

—না।

নীলাঞ্জন একটু উদাস হয়ে গেল অন্যমনা হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার কথার কথা হিসেবে বললো, ছোট মাসীরা আসে-টাসে?

দীপু জানে, দাদা নিজে থেকে কিছুতেই বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে না। প্রতীক্ষা করছে, কখন দীপু নিজে থেকে বলবে। দীপু ভাবছিল, এখনও বলার সময় হয়নি, আরও কিছুক্ষণ ভণিতা চলার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সময় হয়ে গেল।

নীলাঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, তুই তাহলে এখন কি করবি ঠিক করেছিস? উত্তরটা এড়াবার জন্য দীপু সঙ্গে সঙ্গে বললো, বাবার অসুখ হয়েছিল, তুমি খবর পাওনি?

নীলাঞ্জন সচকিত হয়ে বললো, না তো। কি হয়েছিল?

—পরশুর আগের দিন রাত্তিরবেলা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

—স্ট্রোক?

—ঠিক স্ট্রোক নয়। একটা স্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে উঠতে গিয়ে

—স্বপ্ন দেখে? কি স্বপ্ন?

বানাতে এক মুহূর্তও সময় লাগলো না দীপুর। অম্লান মুখে বললো, বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ময়দানে খুব গুলি চালাচ্ছে পুলিশ, তুমি সেখানে...একটা মাউণ্টেড পুলিশের সামনাসামনি...

পুরো এক মিনিট চুপ করে রইলো নীলাঞ্জন। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললো, কি মাধুরী, চা দিলে না? ঘরের ভেতর থেকে মাধুরী জানালো, দিচ্ছি! নীলাঞ্জন আবার বললে, কিছু খাবার-টাবার দিও, খিদে পেয়েছে।

এইটুকু সময় নেবার ফলে, নীলাঞ্জন বাবার স্বপ্নে একটা খুঁত ধরে ফেললো। বললো, পলিটিক্যাল মিটিং ভাঙবার জন্য মাউণ্টেড পুলিশ পাঠায় না—

—বাবা তো ভিড় বলতে খেলার মাঠের কথাই ভাবেন এখনো। তাই স্বপ্নে

—এখন ভালো আছেন?

—অনেকটা। আমিও তখন কলকাতায় ছিলাম না।

—মেজদি আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতো না?

—তুমি আমাকে বকছো কেন? সে কথা মেজদি জানে। আমি তো ছিলাম না কলকাতায়।

—বাবা বুঝি এখনও ইচ্ছে মতন যা-তা খাবার খেয়ে বেড়াচ্ছেন!

—মনে তো হয়। আমার কথা কি আর শুনবেন?

—মিষ্টি খাওয়া কমান নি?

—যদ্দুর জানি, বেড়েছে।

—তা হলে কি করে কি হবে? নিজে যদি নিজেরটা না বোঝেন এখনও...ময়দানে গণ্ডগোল হলেই তোকে আজেবাজে স্বপ্ন দেখে!

স্বপ্নের কথাটা শুনে নীলাঞ্জন বেশ খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু দীপুকে সেটা বুঝতে দিতে চাইছে না। দীপু অবশ্য তন্নতন্ন করে দেখছে দাদার মুখ। দুজনে একটা খেলা চলছে।

তারপর, দুজন বয়স্ক পুরুষ একজন শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমনভাবে আলোচনা করে, সেইভাবে ওরা বাবা সম্পর্কে কথা বললো কিছুক্ষণ। দু প্লেট লুচি নিয়ে এসে মাধুরী দীপুকে বললো, দ্যাখো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে লুচি খাওয়ালুম ঠিক।

দীপু বললো, ইস, আমার জন্য তো আর করো নি!

বাথরুমে খ্যাসখ্যাস শব্দে বাসন মাজছে ঝি। শুভ্রার ঘরটা নিঃশব্দ, আজো জানলাও হয় নি। মাধুরী আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো, বৃষ্টিটা নামবে নামবে করেও নামছে না!

একটু বাদে নীলাঞ্জন বললো, তুই আজ এখানে থেকে যা দীপু। রাস্তায় গণ্ডগোল হচ্ছে—নাকি, মেজদি চিন্তা করবে! পাশের বাড়িতে একটা ফোন করে দিতে পারিস?

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, আমি চলেই যাই।

মাধুরী বললো, যাবে কি করে? যদি এখনো গণ্ডগোল চলে?

দীপু হাত দুখানা উঁচু করে কৌতুকের সঙ্গে বললো, এক লাফ দিয়ে সমস্ত গণ্ডগোল পেরিয়ে চলে যাবো! চলি আজ!

নীলাঞ্জন বললো, বাবা কেমন থাকে, একটা খবর দিস! অফিসে টেলিফোন করতে পারিস।

একদিন দাদার এখানে রাত্তিরে থেকে গিয়েছিল দীপু। একখানা মাত্র ঘর, বেশ অসুবিধে হয়। অসুবিধে যে কিছু হচ্ছে না—সেইটা বোঝাবার জন্য বৌদি এমন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েন যে সেটাই হয় একটা অস্বস্তির ব্যাপার!

রাস্তায় বেরিয়ে দীপু কান খাড়া করে একবার শোনার চেষ্টা করলো, বারান্দা থেকে বৌদি তাকে ডাকছে কি না। ডাকে নি, দীপু হনহন করে এগিয়ে গেল। বৌদির এখনও মনে পড়ে নি, যখন মনে পড়বে, তখন কি রকম আফশোস যে করবে, সেই ভেবেই দীপু মজা পেল। ঠাট্টা করে যা-ই বলুক না কেন, দীপু পাঁচটা টাকা চাইলে দেবে না—এমন মেয়েই নয় মাধুরী। নির্ঘাৎ ভুলে গেছে, যখন মনে পড়বে, তখন লজ্জায় একেবারে জলে-পড়া মানুষের মতন ছটফট করবে। বৌদিকে সেই লজ্জার ফেলার জন্যই দীপু তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পেরিয়ে চলে গেল। তার পকেটে এখন মাত্র দশ পয়সা।

মোড়ের স্টেশনারি দোকানটায় শুভ্রা কি সব কিনছে। দীপুকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, চললি?

—হ্যাঁ।

—শোন্, একটু দাঁড়া

—আবার কি?

—দীপু, তুই শান্তার সঙ্গে আমার একদিন দেখা করিয়ে দিবি?

যখনই কোনো কথার মানে বুঝতে পারে না, দীপুর শরীরের সমস্ত স্নায়ু একাগ্র হয়ে ওঠে, যেন সে শরীর দিয়ে কথাটার মর্ম বুঝতে চায়। সেই রকম সজাগ ভঙ্গিতে সরু চোখে তাকিয়ে বললো, কেন, শান্তার সঙ্গে তোর কি দরকার?

—কিছু না, এমনিই?

—এমনি মানে?

—যে মেয়ে তোকে এখন ভালোবাসে, তার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে।

—শান্তার কথা তোকে কে বলেছে বল্ তো?

—আহা, লুকোচ্ছিস কেন? সে না হয় একদিন দেখা করিয়ে। এমনি একটু গল্প করবো। তুই তো আর আমাকে ভালোবাসিস না! তুই এখন যাকে ভালোবাসিস্, আমিও তাকে ভালোবাসবো—

—আর বকিস্ না! বাড়ি যা তো!

—ভয় নেই, আগেকার কথা শান্তাকে কিছু বলবো না।

দীপু এবার হাসলো, বললো, তুই আর কি বলবি! আমি নিজেই তো সব বলে দিয়েছি! কিন্তু আমি যদি রতনদাকে বলে দিই!

—বল্ না, তোর সাহস হবে?

—তুই বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঠিক একদিন বলে দেবো। যা বাড়ি যা, রতনদা এক্ষুণি আসবে

—ইস্, ওর তো ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা

শুভ্রাকে ছাড়িয়ে দীপু চলে গেল ট্রাম রাস্তায়। ট্রাম-বাস সবই তো চলছে। কলকাতার গোলমাল, কখন ফুস্ করে থেমে গেছে। দীপুর কাছে দশ পয়সা, এতে পুরো রাস্তা যাওয়া যাবে না। শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলে...ধুৎ এসব হিসেব করতে এত বাজে লাগে!

হাঁটতে শুরু করেছে দীপু, ব্রিজের ওপর একটি অন্ধ ভিখিরিকে দেখলো। বাচ্চা ছেলে, দুটি চোখই বোজা, সামনে একটা ন্যাকড়া বিছিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। আগেকার ভিখিরিরা গান শিখতে বাধ্য হতো। এখন এই ব্রিজের ওপর ট্রামের কর্কশ আওয়াজে কেই বা গান শুনবে। দীপু দশ পয়সাটা পকেট থেকে বার করে দু-একবার টুসকি মেরে ফেলে দিল ভিখিরিটার সামনে। যাক্, নিশ্চিন্ত! এখন পুরো রাস্তাটাই অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যাবে। কালকের দিনটা কিভাবে চলবে, তারও ঠিক নেই। তবু দীপুর শরীরটা হাল্কা লাগছে। পকেটটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলে বেশ লাগে কিন্তু। শেষ পয়সাটায় বাসের টিকিট কেনার বদলে কারুকে দিয়ে দেওয়া অনেক ভালো। কি একটা মেলায় রাজা হর্ষবর্ধন নিজের জামা-কাপড় পর্যন্ত দান করে দিতেন না! অপরকে দান-টান আসলে গালভারী কথা, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নিঃস্ব হবার নেশায় পড়ে গিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আসছেন। স্মৃতির অস্তিত্ব এবং তার কার্যকরণ সম্পর্কে তত্ত্বও তৈরী হয়েছে সূত্র। যাবতীয় সেই তত্ত্বকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সম্প্রতি কয়েকজন জীব-রসায়নবিদ যা বলতে চান তার সার কথা ঃ স্মৃতি পুরোপুরিভাবে কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক যৌগের মধ্যে প্রাণীর যে-কোন অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত করা সম্ভব। ব্যাপারটা শব্দ বা ছবি রেকর্ড করার মত। প্রয়োজনে সেই স্মৃতি একের থেকে অন্যের মনোজগতে স্থানান্তর করাও যেতে পারে, কারুর কোনরকম ক্ষতি না করে। এও ঠিক একটি রেকর্ড থেকে আর একটি রেকর্ড তৈরির মত। আর এই স্থানান্তর শুধু একই শ্রেণীর প্রাণী নয়, এক শ্রেণী থেকে ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও করা যেতে পারে। বড় জাতের এক ধরনের ইঁদুরের স্মৃতি ছোট এক জাতের ইঁদুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এই মতবাদের সত্যতার কিছুটা আভাস তাঁরা পেয়েছেন।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী বিজ্ঞানী রিচার্ড সেমন একটি তত্ত্বে বলেন, আমাদের যাবতীয় স্মৃতি পৃথক পৃথক কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে তৈরী। তা যদি হয়, মগজ থেকে ঐ সূক্ষ্ম অংশগুলির কিছু কিছু ছেঁটে বাদ দিলে নিশ্চয় কোন কোন স্মৃতি আমরা হারিয়ে ফেলব? হার্ভার্ডের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল এস. ল্যাসলে ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি লক্ষ্য করলেন, অপারেশন চালিয়ে স্মৃতিশক্তি ধ্বংস করা যায়। কিন্তু সেমনের বলা স্মৃতি সংরক্ষণকারী সেই পদার্থের কোন হদিস কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এটাও তিনি লক্ষ্য করলেন, মগজের কিছু অংশ কেটে বাদ দিলেও পরিষ্কার করে বলা কঠিন, কেটে ফেলা সেই কোষ ঠিক কোন ধরনের স্মৃতি ধরে রাখার কাজে নিযুক্ত ছিল। চোখে দেখা বস্তুর স্মৃতি, কানে শোনা শব্দের স্মৃতি, না অন্য কিছুর? তাঁর মনে হল, যদি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার স্মৃতি ধরে রাখার মত কোন কণিকা থাকেও, তারা কখনই মগজের কোন বিশেষ অঞ্চলকে অধিকার করে বসে থাকে না। মগজের সমস্ত স্নায়ুকোষেই তাদের অবাধ গতি।

অল্প দিনের মধ্যে জীবকোষের গঠন এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া গেল। [illegible] প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবের বংশগতি, [illegible] প্রভৃতির ব্যাপারে সাহায্য করে। আবিষ্কৃত হল ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন এ। বলা হল, এই ডি এন এ-ই প্রাণের মৌলিক উৎস। এরই ভেতর দিয়ে জীবজগৎ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত করে চলেছে। শুধু এই নয়। এঁরা আবিষ্কার করলেন, জীবকোষের আরও এক ধরনের অমূল্য সম্পদ তৈরির চাবিকাঠি পড়ে আছে ডি. এন. এ-র হাতে। সেটা রিবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর. এন. এ। এই আর. এন. এ-ই দেহের জারক রস, অন্তঃস্রাবী নিঃসৃত রস বা হরমোন এবং নানারকম প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ তৈরি করতে সাহায্য করে। কোন কোন জীব-রসায়নবিদ এখন মনে করছেন, আর. এন. এ. বা আর. এন. এ-র তৈরী প্রোটিনই স্মৃতিশক্তিকে সংরক্ষিত করে রাখে।

এঁদের বক্তব্য, আমরা যা করি, যা দেখি, যা শুনি বা অনুভব করি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রথমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই বিদ্যুৎ স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে
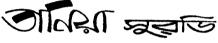
প্রবাহিত হয়ে উপস্থিত হয় মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে। অবশেষে সেখানে কতকগুলি রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে ধরা পড়ে থাকে আর. এন. এ. অথবা আর. এন. এ.-র তৈরী প্রোটিন কণার মধ্যে। অভিজ্ঞতা তখন রাসায়নিক বস্তুরূপে আমাদের মধ্যে থেকে যায়। তারই নাম স্মৃতি। বলা চলে আমাদের ব্যক্তি জীবনের অর্জিত স্মৃতি। বাইরের কোন উদ্দীপনা এই রাসায়নিক স্মৃতিকে যখনই বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে তখন আগের অভিজ্ঞতাগুলি আমরা সচেতন মনে ফিরে পাই।

এই প্রসঙ্গে ডি. এন. এ.-র ভূমিকার উপরও এঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁরা মনে করেন, প্রাণী তার বংশগতির মধ্য দিয়ে যে সহজাত প্রবণতা বা প্রবৃত্তি পেয়ে থাকে সম্ভবত তাদের ধরে রাখাই ডি. এন. এ.-র অন্যতম একটি দায়িত্ব। স্নেহ, মমতা, আত্মরক্ষা করার চেষ্টা প্রভৃতির মূলে রয়েছে বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক। অতীতের প্রাণিজগৎ নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝেছিল পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে এদের প্রয়োজন আছে। এই অভিজ্ঞতাই যেন এক জটিল ছাপের হরফের মধ্য দিয়ে থেকে গেল তাদের দেহকোষে। বংশগতি সেই ছাপকে মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ এবং সংস্করণের মধ্য দিয়ে কিছুটা মৌলিক, কিছুটা সংশোধিত সংস্করণের মত বয়ে নিয়ে চলেছে দেহ থেকে দেহান্তরে। এই ছাপই হল পুরনো অভিজ্ঞতার স্মৃতি। যার আর এক নাম সহজাত প্রবণতা বা প্রবৃত্তি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সেই স্মৃতিকে ঐ ডি. এন. এ.ই প্রাণীদেহের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করছে পুরুষানুক্রমে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন, যদি সাঁরা সত্যিই ঐ ধরনের জটিল রাসায়নিক পদার্থ আমাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে, তা হলে একজনের দেহ থেকে অন্য কারুর দেহে ঐ রাসায়নিক পদার্থ ঢুকিয়ে দিলে সেই সঙ্গে তার স্মৃতিটিও সে পেয়ে যাবে?

এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার খবর পাওয়া যায় ১৯৫৩তে। গবেষক টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জেমস ভি ম্যাককোনাল এবং রবার্ট টমসন। এঁরা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্ল্যানারিয়াম নামে এক ধরনের জলজ প্রাণীর উপর। এর জন্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি আলো রাখা হয় তাদের সামনে। মাঝে মাঝে সেই আলো জ্বালান হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাদের গায়ে লাগান হয় বৈদ্যুতিক শক। শক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কুঁকড়ে যেতে লাগল। সমস্ত কিছু এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে করে যখনই আলো জ্বলে শুধু তখনই তারা তড়িতাহত হতে পারে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর দেখা গেল প্ল্যানারিয়ামগুলি অদ্ভুত একটি অভ্যেস রপ্ত করে ফেলেছে। শেষের দিকে তড়িতাহত করার আর প্রয়োজন হত না। আলো জ্বালানর সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই তাদের দেহ কুঁকড়ে যেত। কতকটা প্যাভলভের কুকুর নিয়ে পরীক্ষার মত। এরই নাম কনডিশনড রিফ্লেকস বা প্রতিবর্তী প্রক্রিয়া।

ম্যাককোনাল এবং টমসন অবশেষে ঐ প্ল্যানারিয়ামদের দু খণ্ড করে কেটে ফেললেন। এতে তাদের মৃত্যু ঘটে না। বরং অর্ধাংশগুলি এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায়। ওঁরা লক্ষ করলেন, ল্যাজ বা ডগা, যে অংশ থেকেই তাদের জন্ম হোক না কেন, নতুন প্ল্যানারিয়ামগুলির মধ্যেও আগের প্ল্যানারিয়ামের প্রতিবর্তী প্রক্রিয়া ধরা পড়েছে। শক না দিয়ে শুধু আলো জ্বাললে এরাও কুঁকড়ে ওঠে।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে শক খাওয়ার যে অভিজ্ঞতা, সেটা প্ল্যানারিয়ামদের দেহের কোন বিশেষ অঞ্চল জুড়ে নিশ্চয় বাস করে নি। সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিল। তাই টুকরোগুলির মধ্যেও তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

ম্যাককোনাল এবং টমসন এবার নতুন কয়েকটি প্ল্যানারিয়াম সংগ্রহ করলেন। আলো এবং বিদ্যুতের শক খাওয়ার কোন অভিজ্ঞতাই এদের ছিল না। ওঁরা ঐ পুরনো প্ল্যানারিয়ামদের দেহের টুকরো টুকরো অংশ ফেলে দিলেন এদের সামনে। এবার রীতিমত চমক! দেখা গেল নতুনেরা তাদের শুধু খাবার হিসেবেই খেল না। সেই সঙ্গে খাবারের মধ্যেকার স্মৃতিও। কারণ, খাবার খাওয়ার পরই দেখা গেল আগেকার প্ল্যানারিয়ামদের মত একেবারে সম্পূর্ণ এই প্ল্যানারিয়ামরাও আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে শক না খেয়েও নিজেদের দেহ কুঁকড়োতে শুরু করেছে।

এই ঘটনা থেকে ওঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, মগজ ছাড়াও সম্ভবত কোন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যেও স্মৃতিশক্তিকে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব। এবং প্রয়োজনে সেই স্মৃতি অন্যের মধ্যে প্রবেশ করান যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী অ্যালেন এল. জেকবসন মাত্র বছর তিনেক আগে চালিয়েছিলেন আর একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা। একটা বড় জাতের ইঁদুর রাখলেন তিনি একটি বাক্সের মধ্যে। বাক্সটির কোণে রইল একটি পাত্র। ঠিক হল, ক্লিক করে একটি শব্দ
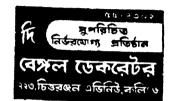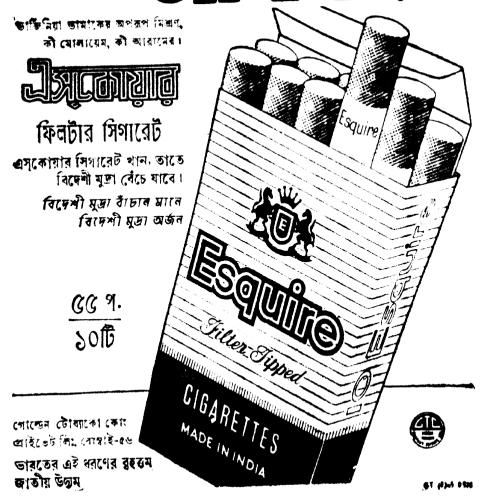
করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো খাবার গিয়ে পড়বে পাত্রের মধ্যে। আর তখনই ইঁদুরটি ছুটে এসে তা খেয়ে নেবে। ব্যবস্থামত কাজও চলল কিছুক্ষণ। শেষে দেখা গেল, শব্দ শুনেতে শুনতে ইঁদুরটি এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, খাবারের টুকরো না ফেলে শুধু শব্দ করলেই সে পাত্রের কাছে ছুটে যেতে শুরু করেছে। একই ভাবে আরও কয়েকটি ইঁদুরকে শিক্ষিত করে তুললেন জেকবসন। তারপর হত্যা করে তাদের মগজগুলি বের করে নিলেন। ঐ মগজগুলি স্নায়ুকেন্দ্র বেটে এক ধরনের রাসায়নিক নির্যাস তৈরি করা হল। এর মধ্যে আরও অনেক পদার্থ ছাড়াও আর. এন. এ.-র ভাগ রইল বেশী। অবশেষে সেই নির্যাস সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি ইঁদুরের পেটে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এবারও প্রচণ্ড চমক! নতুন ইঁদুরের মধ্যে পুরনো ইঁদুরের অভিজ্ঞতা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কোনরকম অনুশীলন ছাড়াই ক্লিক শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে এরাও খাবারের পাত্রের দিকে ছুটে গেল। জেকবসন পরে শব্দ ব্যবহার না করে আলোর সংকেতের সাহায্যে এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন। দেখা গেল, যারা আলোর সংকেত দেখে খাবারের কাছে ছুটে যায় তাদের মগজের নির্যাস নতুন কোন ইঁদুরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তারা শুধু আলোর সংকেত ধরেই কাজ করতে শেখে। তাদের কাছে ক্লিক শব্দ নিরর্থক। অর্থাৎ বোঝা গেল, ইঁদুরের মত যথেষ্ট উঁচু ধরনের প্রাণীর মধ্যেও ইচ্ছেমত কোন স্মৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। অনেকে পায়রার ক্ষেত্রেও এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। এমন কি, এক ধরনের প্রাণীর স্মৃতি অন্য ধরনের প্রাণীর মগজে স্থানান্তরিত করাও সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটা করে দেখেছেন বড় এক জাতের ইঁদুরের স্মৃতি ছোট এক জাতের ইঁদুরের মধ্যে ঢুকিয়ে। মগজের নির্যাসের সঙ্গে কিছুটা যকৃৎ-এর নির্যাস মিশিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

আর. এন. এ. বা প্রোটিন-জাতীয় কণা যে স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্যাপারে কাজ করে সেটা জানার জন্যে নানা পরীক্ষা চালাচ্ছেন জীব-রসায়নবিদরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন বার্নারড অ্যাগ্রানফ। ইনি এক দল সোনালী মাছ নিলেন একটি জলের আধারের মধ্যে। আধারটির মধ্যে রইল দুটি অংশ। মাঝ-খানে সরু পথ। তারা সেই পথ দিয়ে একটি অংশ থেকে যখন আর এক অংশে সাঁতার কেটে ঢুকতে গেল সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আলো। তারপরই বৈদ্যুতিক শক। কয়েকবার চেষ্টা করবার পরই তারা শিখে নিল আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে শক খেতে পারে। শিখে নিল কিভাবে সেই বাধা কাটিয়ে অন্য অংশে যাওয়া যায়। সাধারণত পুরো ব্যাপারটা শিখতে তাদের সময় লাগত প্রায় এক দিন। এবং কিভাবে শক এড়ান যায় সেটা স্মরণে আনতে সময় লাগত তিন দিন। দেখা গেল, অনুশীলনের ঠিক পরমুহূর্তে ওদের চোয়ালের মধ্যে ইনজেকশন করে যদি খানিকটা পিউরো-মাইসিন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সেই অনুশীলনের কোন কিছুই তারা মনে রাখতে পারে না। অথচ অনুশীলনের এক ঘণ্টা পর ঢোকালে ঠিক আগের মতই তিন দিন পর সমস্ত স্মৃতি তারা মনে করতে পারে। পিউরোমাইসিন নামে এই রাসায়নিক যৌগটি আর. এন. এ. বা প্রোটিন তৈরি হতে বাধা দেয়। এ থেকে মনে হয়, স্মৃতির যাবতীয় রেকর্ড ঐ আর. এন. এ.-র পক্ষেই করা সম্ভব। কোন কোন গবেষক মনে করেন শিক্ষিত কোন প্রাণীর মগজ থেকে আর. এন. এ. সংগ্রহ করে অনভিজ্ঞ কোন প্রাণীর মগজে তা ঢুকিয়ে দিলে ঐ প্রাণীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে শিক্ষিত প্রাণীটির স্মৃতি। আর কি কি ধরনের প্রোটিন কোন কোন অভিজ্ঞতার স্মৃতি ধরে রাখে সেটা যদি জানা সম্ভব হয় তা হলে তো কথাই নেই। যদি কেউ কবি হতে চান, যে অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে কাব্য সৃষ্টি হয়, কোন কবির মগজ থেকে তার কিছুটা সংগ্রহ করে নিলেই কাজ শেষ। যদি আর কিছু হতে চান হয়ত সেটাও সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক জীবের উপর মোটামুটিভাবে এমন পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে।

তবু প্রশ্ন : তা হলে আর. এন. এ.-ই কি মানুষের জীবনের যাবতীয় স্মৃতি সংরক্ষণের চাবিকাঠি? না, অন্য কোন প্রোটিন-কণা? হয়ত নিকট ভবিষ্যতে এর উত্তর আমরা পেয়ে যাব। হয়ত ইচ্ছে করলে গবেষণাগারেই তাদের আমরা তৈরি করে নিতে পারব। আর তা যদি হয় বহু জটিল মানসিক রোগ নিরাময় করা তখন মোটেই শক্ত হবে না। সেই সঙ্গে মনো-বিজ্ঞানের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কে জানে, তখন নানারকমের স্মৃতির রঙ-বেরঙের বোতল ওষুধের দোকানেও আপনি পেয়ে যেতে পারেন। কারুর গায়ে লেখা সাইকেল চালানর স্মৃতি, কারুর বা ক্যালকুলাসের। তা থেকে কয়েকটা বড়ি খেয়ে নিন। অমনি দেখবেন, কোনরকম অনুশীলন না করেই হয়ত তখুনি দক্ষ চালকের মত আপনি সাইকেল চালাতে পারছেন। অথবা ক্যালকুলাসের সমস্ত জট বই না পড়তেই আপনার মাথায় জলের মত সহজ হয়ে যাচ্ছে।

সমরজিৎ কর

(পঁচিশ)

ললিত একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল —কিসের বিপদ?

অপর্ণা প্রথমে উত্তর দিল না। নতমুখে টেবিলের কাচে তার সাদা প্রায় রক্তশূন্য একটি আঙুল দিয়ে কয়েকটা গোল চিহ্ন আঁকল। তারপর তার বয়সের তুলনায় ভারিক্কি বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলল—কয়েকদিন ধরে দেখছি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা কালোমতো ছেলে ঘুরে বেড়ায়। যেতে যেতে আমাদের বাড়ির ব্যালকনি কিংবা খোলা জানালার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। আমি যখন কলেজে যাই তখন দেখি সে চৌরাস্তার দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কয়েকদিন তাকে কলেজের গেট-এর সামনেও দেখেছি।

চা খাওয়ার পর ললিতের অস্বস্তির ভাব বেড়ে যাচ্ছিল। ব্যথা করছিল বুক আর পিঠ। কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

অপর্ণার কথা শুনে সে একটু হাসল, বলল—তাতে কী? ওরকম কত ছেলে পিছু নেয় মেয়েদের, তারপর বোধবুদ্ধি হলে আবার সরেও যায়। ওকে বেশী পাত্তা দেবেন না।

একথা যখন বলছিল ললিত তখন তার অমোঘভাবে মিতুর কথা মনে পড়ছিল। মিতুও হয়তো নিজের বাবা মার কাছে বলত সে একটা ফর্সামতো রোগা ছেলে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে থাকে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো চেয়ে থাকে তাদের বাড়ির দিকে।

মেয়েটি ললিতের উপদেশ শুনল কিনা বলা যায় না, বলল—পিছু-নেওয়া ছেলে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ ছেলেটা ভীষণভাবে আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। একদিন দেখি আমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে সিগারেট ধরাল, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী একটু কথাও বলে গেল। পরে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম। ছেলেটা নাকি তার কাছ থেকে কয়েকটা ফুলের চারা চেয়েছিল। আমি দারোয়ানকে বারণ করে দিয়েছি ওর সঙ্গে কথা বলতে।

ললিত সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল—তাতে কী? ওতে ভয় পাবেন না।

মেয়েটির মুখে চোখে একটু রক্তাভা দেখা যায়; নিঃশ্বাস চেপে খুব আস্তে আস্তে বলল—ছেলেটি আমাকে লক্ষ্য করে আমাদের মোটরগাড়ির মধ্যে একটা কাগজের দলা ছুঁড়ে দেয়। খুলে দেখি চিঠি। ভুল বানানে লেখা অজস্র আজে বাজে কথা। আমি কাউকে বলিনি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এই ছেলেটাই টেলিফোন করেছিল আমার বাবাকে। আমার কেমন যেন ভয় করে। এমন অবস্থা যে বাড়ি থেকে একা বেরোতে পারি না, ছেলেটা ভীষণ ডেসপারেট—কী জানি কী করে বসে! টেলিফোনে বাবাকে বলেছিল যে ওর বাসার কাছেই নাকি থাকে, একই পাড়ায়। সেটা জানার পর থেকে আমি আর ওর কাছেও যাই না।

পেটের মধ্যে কল্‌কল্‌ শব্দ হচ্ছে। ছুঁচের মুখের মতো গলার কাছে খোঁচা দিচ্ছে অনবরত। হঠাৎ পেটের মধ্যে শব্দটা এত জোরে হল যে ললিতের ভয় হচ্ছিল মেয়েটি শুনতে পাচ্ছে।

ললিত উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—আমিও ঐ পাড়ায় থাকি। যদি একা যেতে ভয় করে তবে আমার সঙ্গে চলুন, কোনো ভয় নেই। আপনি গেলে বিমান খুশি হবে।

মেয়েটা ম্লান হেসে বলল—কিন্তু ও যে বারণ করেছে।

ললিত বলল—কিন্তু একটু আগেই ও আমার কাছে এসেছিল। তখন দেখেছি ও নর্মাল। কথাবার্তা ভালই বলছিল। এখনো ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি একটু চিন্তা করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চলুন।

অপর্ণাই তার অভিজাত ভঙ্গীতে কেবলমাত্র একটি তর্জনীর সংকেতে খালি ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল।

দুজন দু কোণে বসল। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। অপর্ণা বাইরের দিকে তাকিয়ে। আর ললিত তার বুক আর পেটের অস্বস্তিটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটু গা এলিয়ে সীটের পিছনে মাথা রেখে। বমিটা হয়তো হবে। এক গ্লাশ জলের পর এক কাপ চা খেয়েছে ললিত। খাওয়াটা ঠিক হয়নি।

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে ললিতকে দেখে বলল—আপনার কি শরীর খারাপ?

—না।

একটু অনামনে চুপ করে থেকে অপর্ণা বলল—এখন আমাদের সময় ভাল যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেই বাবার কারখানার কর্মচারীরা বাড়ির সামনে এসে জমায়েৎ হয়েছিল একদিন, বোনাস আর কাজের সিকিউরিটির জন্য। ইউনিয়নের লীডার এক ছোকরা এল বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

সে আমাদের বৈঠকখানায় বসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর সামনেই সিগারেট খাচ্ছিল। ফলে বাবা সেদিন ভীষণ রেগে যান, আর নার্ভাস হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার পরেই বিকেলের দিকে বাবার ব্লাড-প্রেসার অসম্ভব বেড়ে যায়। রাত্রে একটা স্ট্রোকের মতো হয়—

ললিত বলে—সে কী। ছেলেটা সিগারেট খেয়েছিল বলে?

অপর্ণা মৃদু একটু হাসল—উনি পুরোনো আমলের লোক। কর্মচারীরা সামনে সিগারেট খাবে এটা উনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

ললিতের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে বলল—কিন্তু এরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল পেটমোটা, অসৎ, অতিরিক্ত মুনাফাখোর মালিকদের সম্মান করতে করতে ওরা এই ম্যান্দারিজমকে আর বিশ্বাস করছে না—

এই অপ্রিয় কথাগুলো একজন মালিকের মেয়েকে তার বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কথাগুলো এমনিতেই বেরিয়ে এল। তাই একটু লজ্জা করছিল ললিতের।

অপর্ণা বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল। ট্যাক্সিটা একটা ডবলডেকারের পিছু পিছু আস্তে আস্তে যাচ্ছে। অপর্ণা মুখ না ঘুরিয়েই বলল—ইউনিয়নের ঐ ছেলেটা আমাদের এক জ্ঞাতির ছেলে। যখন সে চাকরি চাইতে এসেছিল তখন বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস সে সিগারেট খাওয়ার দরকার বলেই সিগারেট খায়নি, সে খেয়েছিল ইচ্ছে করে, বাবাকে চটিয়ে দেওয়ার জনাই—

ললিত একটু উত্তেজনা বোধ করে বলে—কিন্তু আমি কাগজে ছবি দেখেছি কুড়ি একুশ বছরের বাচ্চা নিগ্রো ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের দাবীদাওয়ার কথা বলছে—তার হাতে সিগারেট, সামনে মদের গ্লাস—খুব ইজি ভঙ্গী—

অপর্ণা হাসল, বলল—আমি ওসব জানি না। আমি ছেলেবেলায় আমাদের কারখানার কর্মচারীদের কাকা কিংবা দাদা বলে ডেকেছি, তারাও বাবাকে কখনো জ্যাঠামশাই কখনো অন্য কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কে ডেকেছে। আমাদের মধ্যে খুব একটা দূরত্ব ছিল না। কিন্তু ঐ ছেলেটা বাবার সামনে সিগারেট খেয়ে সেই দূরত্ব তৈরী করে দিল—

ললিত ভিতরে উত্তেজিত হয়েছিল, সেই উত্তেজনা তার গলার স্বরকে অজান্তে তীব্র করে দিল। বলল—দূরত্ব ছিলই। হয়তো বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। দুটো শ্রেণী, তাদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ—কী করে তারা পরস্পরের কাছের লোক হয়?

অপর্ণা এ কথার উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিষন্ন মুখখানা ফিরিয়ে বলল—হলে ভাল হত।

ললিত হাসতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে তার পেটের ভিতর থেকে একটা 'ওয়াক' উঠে আসছিল। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। বড় সুন্দর দেখায় তাকে। বলে—আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?

ললিত বলল—না, না। আপনি কথা বলুন।

অপর্ণা বলল—বাবাকে নিয়েই আমার ভয়। এখন বেশী উত্তেজনা তাঁর পক্ষে ভাল

এ কথা হয়তো ওর নয়। সে মৃদু গলায় বলল—ব্যক্তিগত মালিকানার ওটাই তো দোষ। মালিকানা যদি রাষ্ট্রের হাতে যায়—যে রাষ্ট্র সকলের স্বার্থে কাজ করে—তবে সেই রাষ্ট্রে এ ব্যাপার হবে না।

অপর্ণা হাসল—আপনি কি কমিউনিস্ট?

ললিত উত্তর দিল না।

অপর্ণা মৃদু গলায় বলল—কমিউনিস্ট কিনা এই প্রশ্ন করলে আজকাল অনেকেই চুপ করে থাকে। কিন্তু আমি জানি আপনি কমিউনিস্ট।

ললিত হাসল—কী করে জানলেন?

অপর্ণা বলল—অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। তবু মনে হয় অনেকদিন আগে আপনার নাম, বিমানের কাছে আপনাদের কয়েকজনের কথা শুনতাম।

ললিত কৌতূহলের সুরে বলল—তাই নাকি?

অপর্ণা মৃদু হাসল—এক সময়ে ও আমাকে পড়াতো। তখন ও কলেজের ছাত্র। খুব ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত না। বাবা ওকে অনেক বলে কয়ে আমাকে পড়াতে রাজি করিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ও পড়াতো না, চুপচাপ বসে থাকত। [illegible] করে উঠে যেত। কিন্তু আমি তখন ছোট মেয়ে, ফ্রক পরি, [illegible] আমাকে ও বেশীদিন লজ্জা করল না। আমাকে অনেক কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু পড়ার কথা নয়। তখন ও মাঝে মাঝে ললিত নামে একজনের কথা বলত—[illegible] ছিল কমিউনিস্ট ইউনিয়নের [illegible] ছেলে। তাই তখন ট্যাক্সিতে আপনি নাম বললেন, তখনই আমার সেই ললিতের কথা মনে পড়েছিল। তাছাড়া আপনিও তো ওর কলেজের বন্ধু—কাজেই মনে হচ্ছে আপনি সেই ললিত। না?

ললিত একটা অদ্ভুত [illegible] আনন্দ বোধ করল। অপর্ণা [illegible] কোথায় ঢেকে গেছে [illegible]। এই মেয়েটিও মনে রেখেছে তাকে। ললিতের বড় জানতে ইচ্ছে করে আরো কত দূরে। আরো কোথায় কোথায় লোকে তাকে মনে রেখেছে!

অপর্ণা ঘাড় হেলিয়ে তাকে একটু দেখল। তারপর রহস্যময় একটু হেসে বলল—আপনার বন্ধু এক সময়ে আপনার খুব প্রভাবে পড়েছিল। প্রায়ই ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে রাষ্ট্রগত মালিকানার কথা বলত। আমাকে বলত—তোমাদের কারখানার সব ক্যাপিটাল শেয়ারে ভাগ করে শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। নইলে একদিন শ্রমিকদের রাষ্ট্রে তোমাদের বিচার হবে...এইসব কথা। আমি তখন ছোট মেয়ে, ওর কথা শুনে কখনো হাঁ করে চেয়ে থাকতাম, কখনো হাসতাম। কিন্তু মনে মনে ওর সব কথাই আমার সত্য বলে মনে হত—

—কেন? ললিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

অপর্ণা সামান্য একটু রাঙা হয়ে বলে—খুব ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে একবার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। ওরা আমাদের জ্ঞাতি, দেশে আমাদের বাড়ি ছিল ওদের বাড়ির পাশে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে যেমন হয়—বাবা-মায়েরা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করে রাখেন—আবার বড় হলে ভুলে যান—অনেকটা তেমনি। কাজেই ও যখন পড়াতে এল তখন আমি জানতাম যে এই লোকটাই একদিন আমার যথাসর্বস্ব—

বলেই চুপ করে গেল অপর্ণা।

ললিত হাসি চেপে বলল—বলুন।

অপর্ণা একটু ঘোর লাগা চোখে চেয়ে থেকে বলল—তাই ওর সব কথা আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিতাম। কিচ্ছু ভুলতাম না। দেখলেন না, আপনার নাম আমি আজও মনে রেখেছি।

—ঠিক। ললিত ঘাড় নাড়ল।

অপর্ণা মৃদু হাসি হেসে বলল—আপনাকে দেখে ও একেবারে কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে আমার বাবার নিন্দে করত। বলত, আমাদের রক্তের মধ্যে বিষ থেকে যাবে এই মালিকি স্বার্থের। তাই একদিন নাকি আমাদের মেরে ফেলা হবে।

—শুনে আপনি রাগ করতেন না?

অপর্ণা মাথা নাড়ল—না। বরং ভয় হত খুব। ভাবতাম ও যা বলছে ঠিকই বলছে। আমার ইচ্ছে হত বাড়ি ছেড়ে, মা-বাবা ছেড়ে ওর কাছে চলে যাই। ও যেন আমাকে বাঁচায়। কিন্তু ওর এই মনোভাব বেশীদিন রইল না।

টালিগঞ্জ রেলব্রীজ পার হয়ে ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফেরাল—কোন দিকে যাবেন?

ললিত বলল—আর একটু ভাই, তারপর আনোয়ার শা রোড—

অপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—তারপর?

অপর্ণা বলল—ও তখন আর একজন বন্ধুর প্রভাবে পড়েছে। সেই বন্ধুটি ছিল জমিদার—পূর্ববাঙলার কোথাকার যেন—পার্টিশানের পর সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে—তার নামটা কী যেন—

ললিত আগ্রহে বলল—রমেন? রমেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী?

—ঠিক। অপর্ণা উজ্জ্বল মুখে বলল—রমেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর একদিন আমাকে এসে বলল—দেখ, আমার এই বন্ধুটি বড় অদ্ভুত। কলকাতায় ওর যে সব প্রজা-ট্রজা আছে তারা এখনো ওকে খুব সম্মান করে, ওর বাসায় যায়, ওর খোঁজ খবর নেয় ঠিক যেন আত্মীয়ের মতো। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে প্রণাম বা

নমস্কার করে উঠে বাসে সীট ছেড়ে দেয়। অথচ ওরা পরম্পরাক্রমে প্রজাদের শোষণ করে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করতাম—তাতে কী হল? ও উত্তরে বলত—হয় ওর প্রজাগুলো দীর্ঘকাল ওদের সম্মান করতে করতে নিজেদের একেবারে দাস বানিয়ে ফেলেছে, নয়তো ওরা সত্যিই ওকে ভালবাসে। তারপর রমেন এসে বলল না, ওর প্রজারা ওর সংগে আন্তরিক ব্যবহার করে। ওটা ঠিক ম্যানার্স নয়। মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে ও যখন একটা হাড় ভেঙেছে, সেই শুনে ওর এক প্রজা মা কালীর কাছে কালো পাঁঠা মানত করেছে। কোন স্বার্থে সেটা সে করবে? এখন তো আর ওর জমিদারী নেই যে সেই প্রজার একটু সুবিধে করে দেবে! ওরা সত্যিই ভালবাসে ওকে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কী করে দুটো শ্রেণী তাদের স্বার্থ ভুলে—এবং সমাজ বিপ্লব ছাড়াই একে অন্যকে ভালবাসছে!

ললিত সামান্য গম্ভীরমুখে বলল- ওটা হয়ত একটা এক্সেপশন। হয়তো রমেনরা বেশী চালাক ছিল, প্রজাদের প্রিয় হয়ে তাদের আরো বেশী এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করেছিল।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলল—সে যাই হোক। ও কিন্তু আপনার প্রভাব কাটিয়ে উঠল। আমাকে বোঝাতো—মালিক ও মালিকানা জিনিসটা খারাপ নয়। যদি এরকম ভাবে দুটো শ্রেণী একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, যদি তারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়—আর যদি ভালবেসে ভালবাসা পায়—তাহলে জমিদার আর তার প্রজা চমৎকার কমিউন গড়ে তুলতে পারে। আমি তখন ওর কাছ থেকেই কথা বলতে শিখেছি, বললাম—আর রাষ্ট্রের মালিকানার কী হবে! ও ঠোঁট উল্টে বলল, দূর, রাষ্ট্র তো একটা যন্ত্র। যন্ত্র কি কখনো ভালবাসতে পারে! মানুষ ভাতকাপড়ের চেয়েও মানুষের ভালবাসা বেশী চায়। রমেন আর তার প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এখনো ওর প্রজাদের কেউ কেউ ছোটো কর্তাকে না বলে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে না। জমি কিনবার সময়ে চাষবাসের ব্যাপারে, রোগ-বালাইতে আগে আসে রমেনের কাছে তারপর উকিল ডাক্তার বা সরকারী লোকের কাছে যায়। রাষ্ট্র কি এতটা ভালবাসতে পারে! জমিদারের জায়গায় একদিন আসবে কমিউন বা ব্লকের অফিসার, কারখানায় আসবে সরকারী ডিরেক্টর—তাতে কি শ্রমিক বা প্রজারা খুশি হবে। [illegible] ছিল।

[illegible] কিন্তু [illegible] ভালবাসা কি [illegible] মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটাই [illegible] একে অন্যকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল—সেই জন্যই আমি এমন একটা স্বর্গ খুঁজছিলাম যাতে আমি আর আমার কর্মচারীরা সেই রমেনের মতো একে অন্যের প্রয়োজন হয়ে উঠি। আমি জোর করে মালিক হবো না, কিন্তু ওরা আমাকে ওদের প্রয়োজনে ভালবেসে মালিক করে রাখবে—আমি ওদের সে রকম স্বার্থ হয়ে উঠতে পারি কিনা—এ রকম একটা ব্যাপারে ইচ্ছে আমার মাঝে মাঝে হয়!

ললিত হাসতে থাকে। বুক থেকে বোঝার ভারটা সরে যাচ্ছে এখন। সে বলল—আপনার খুব মালিক থাকার ইচ্ছে!

অপর্ণা ম্লান হাসে—না। আমার কেবল এটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে যে দুটো শ্রেণীকে

ছুলে না দিয়ে একে অন্যের স্পর্শ হওয়া যায় কিনা। আসলে আমার এখন ঐ রমেনের মতো একজন হতে ইচ্ছে করে।

অন্যমনে ললিতের বুক জ্বলে যায়। সিগারেটে ডুবে থাকে সে। ট্যাক্সিটা ধীরে ধীরে আনোয়ার শা রোডে ঘুরে ঢুকে যাচ্ছে।

ললিত ধীরে ধীরে বলল—ওটা বোধ হয় আপনার দুর্বলতা। আপনি চাইছেন মালিকানা চলে গেলেও যেন আর এক ধরনের মালিকানা এসে যায় হাতে। একটা শেষ সম্বল রেখে দিতে চান—তাই না?

অপর্ণা একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলে—রমেনও কি তাই চেয়েছিল?

ললিত ঘাড় নাড়ে—বোধ হয় রমেনের ব্যাপারটাও তাই। ওর মধ্যে বংশানুক্রমিক একটা জমিদারীর ভাব থেকে গেছে। ওটা হেরিডিটারি, এড়ানো যায় না। জমিদারী কিংবা মালিকানা চলে গেলে মানুষ তখন নেতা হবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের অনেক নেতাই এসেছেন অভিজাত সমাজ থেকে। মানুষ তাদের ত্যাগের মহিমা কীর্তন করেছে, কিন্তু কখনো ভেবে দেখেনি তারা সেই বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের কাছেই নতুন রকমে মাথা বিকিয়ে দিল।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে—ত কেন? যে ভাল তাকে ভালবাসতে দোষ কী?

ললিত অধৈর্যের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে—তা হবে না। এমন সমাজ হয়তো তৈরী হবে যখন মানুষ মালিক বা জমিদারের এই ভালবাসাকে ঠিক বিশ্বাস করবে না। তাদের কাছ থেকে একটুও সম্মান পাবেন না আপনি। তখন যে কেউ সিগারেট খাবে আপনার সামনে, ইচ্ছে হলে সেই ছোকরা আপনার কাছে—

বলেই থেমে গেল ললিত। সে বলতে যাচ্ছিল 'আপনার কাছে প্রেম নিবেদন করবে নির্ভয়ে।' কিন্তু সে কথাটা বড় নিষ্ঠুর। বলার নয়।

অপর্ণার মুখ এখন নানা রঙে রঙীন। মুখের রেখা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। হঠাৎ সে রুদ্ধশ্বাসে বলল—আমি সব ছেড়ে দিতেই তো চাই। আমার এসব একটু ভাল লাগে না। এই কারখানা, স্ট্রাইক, কর্মচারীদের সঙ্গে শত্রুতা—এসব মনে হলেই আমার বুক কাঁপে। ইচ্ছে করে চলে যাই কোথাও।

ললিত শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

অপর্ণা আস্তে করে বলে—সেই ছেলেবেলায় যেমন ওর কথায় ভয় পেয়ে ইচ্ছে হত ওর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, ঠিক তেমনিই একটা ইচ্ছে হয় আমার। ও আমাকে এই সব গোলমাল থেকে টেনে নিয়ে যাক। কিন্তু ও কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে—ও কেন—বলতে বলতে ঠোঁট কেঁপে গেল অপর্ণার।

ব্যথিত মনে ললিত চুপ করে থাকে। সে নিজে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর। না বললেও হত।

কিন্তু এ কথাটা সে কিছুতেই মনে মনে সহ্য করতে পারছিল না যে এই মেয়েটার রমেনের মতো হতে ইচ্ছে করে। কেন, রমেনের মতো কেন? এ মেয়েটা তো রমেনকে চেনেও না।

হঠাৎ খুব হীনের মতো একটা কাজ করল ললিত—যার জন্য পরে সে অনুতাপ করেছিল। সে হঠাৎ অপর্ণাকে বলল—রমেন তার প্রজাদের কাছে হয়তো দেবতা ছিল। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে? আপনি কি জানেন যে ওর বউ পালিয়েছিল বলে ও হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে?

ভীষণ অবাক হল অপর্ণা, বলল—নিশ্চয়ই বাজে মেয়ে! নইলে ও রকম লোকের কাছ থেকে পালায়!

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সেই বটগাছটার তলায় যার চারদিকে বাঁধানো বেদী—যেখানে বিমান কাল ছেলেদের পাল্লায় পড়েছিল। ট্যাক্সি এই পর্যন্ত আসে, এরপর হেঁটে যেতে হয়। ললিত ভাড়া দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়েছিল, অপর্ণা ভীষণ রাঙা হয়ে বলল,—না, না, ট্যাক্সিটা আমিই ডেকেছিলাম...খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গে বাধা দিয়ে অপরাধীর মতো নিজেই ভাড়াটা দিয়ে দিল।

করুণা! ললিত মনে মনে হাসল।

বিমান শুয়ে ছিল। ললিতকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল চিঠিটা দিয়েছো?

ললিত দরজায় দাঁড়িয়ে, পিছনে অপর্ণা। হেসে বলল—দিয়েছি। আর উত্তরটাও নিয়ে এসেছি।

—কই? বলে হাত বাড়াল বিমান।

ললিত সরে গেল, তারপর জোরে হেসে উঠল।

কিন্তু ললিত বুঝতে পারল হাসিটা ওদের স্পর্শও করেনি। ধীর পায়ে অপর্ণা ঘরে এসে দাঁড়াতেই বিমানের সঙ্গে অপর্ণার চোখ পরস্পর গেঁথে গেল। নিস্পন্দ হয়ে রইল দুজনে। কিন্তু সেই নিথরতার মধ্যেও তাদের মুখে যেন কয়েকটা রূঢ় কর্কশ রেখা কোমলতায় বেঁকে গেল। ইঙ্গিতময় ভাববাহী হয়ে গেল ঘরের বাতাস। ললিত বুঝল ওরা কথা না বলে, চেষ্টাহীনভাবে পরস্পরকে গভীর ভালবাসা জানাতে পারে।

ঈর্ষা হল ললিতের। বিমানটা পাগল। আর এ একজন কারখানা-মালিকের মেয়ে। কিন্তু মনে হয়, ওরা দুজনেই ভিখিরি—অকিঞ্চন। ওদের দুজনের ওরা দুজন ছাড়া আর কিছু নেই। দুটোই পাগল।

তার ইচ্ছে হল অপর্ণাকে ডেকে বলে—যদি কোনোদিন ভাবিষ্যতের সমাজ মালিক পক্ষকে অবলুপ্ত করতে চায়, সেদিন আপনাকে ক্ষমা করা হবে, কেননা আপনি এই পাগলকে ভালবেসেছিলেন।

ললিত দুজনকে ঐ অবস্থায় রেখে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে দরজাটা আলগোছে টেনে ভেজিয়ে দিল।

ক্রমশ

নিরাপত্তা
যখন একটি তালা'র
ওপর নির্ভর করে
তার জন্যে একটিমাত্র
তালা আছে—

শিশুর নিরাপত্তা

শিশু মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, ছোটদের জীবনযাত্রা নিরুপদ্রব হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, শিশুদের মনে নিরাপত্তার অভাব বোধ জাগতে দেওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়। নিরাপত্তার অভাবের দুটো দিক আছে, আর্থিক তো বটেই, মানসিক নিরাপত্তার গুরুত্বও কম নয়। তত্ত্বটার গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ সত্যিই তো, শিশু যদি আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ হয় তাহলে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটবে। শিশু যদি অনবরত তার চোখের সামনে অবাঞ্ছনীয় বা অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে দেখে তাতে মানসিক প্রতিক্রিয়া ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। আজকাল আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে আমরা এই 'সাইকোলজী' নিয়ে কথায় কথায় বড় বেশী মাথা ঘামাই। অনেক সময় এইসব 'তত্ত্ব' নিয়ে যে খুব বাড়াবাড়ি বা বেশী মাথা ঘামানোও না হয় তা নয়। অভাবের দিক দিয়ে নিরাপত্তার কথাই ধরা যাক। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন মত খেতে পরতে দেবার সামর্থ্য মোটামুটি আমাদের সকলের আছে। এই 'প্রয়োজনমত' কথাটার মধ্যে কিন্তু অনেক মারপ্যাঁচ আছে। একটা ভিখিরীর ছেলের প্রয়োজন দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। তার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট। পরনে একটা কিছু থাকলেই হল।

কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা তো আর ভিখিরীর ঘরে জন্মায়নি! কাজেই তাদের "প্রয়োজন"-এর মাত্রার কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা আমরা নিজেরাই গুলিয়ে ফেলি। ভাত ডাল থেকে শুরু করে খাদ্য তালিকায় আইসক্রীম, কোকাকোলা, চকোলেট, মাখন, চীজ, আপেল, কমলা কোনোটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। এই তালিকাভুক্ত যে কোনো একটি বস্তুর অভাবই শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব ঘটিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন ছারখার করে দিতে পারে, এই আশঙ্কা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তা বিচার করে দেখা উচিত। পরিধানের বস্তুর তালিকা নিঃসন্দেহে খাদ্য তালিকাকে দৈর্ঘ্যে অনেক পিছনে ফেলে যাবে। সাধারণ সুতী বস্ত্র থেকে শুরু করে টেরিলিন, টেরিকটন, নকল খোঁপা, নকল চুল, পরচুলা ইত্যাদি বহুবিধ উপকরণ পড়ে। এর কোনটির অভাব কি বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম, তা বলা শক্ত। যেসব পিতামাতার প… ছেলেমেয়েদের এ জাতীয় সর্ব "অভাব" মিটিয়ে পরিপূর্ণ মানসিক নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের পারিবারিক আয় বা পৈতৃক আয় যা তাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনে চিন্তার কিছু নেই। সুতরাং আকাশের চাঁদের বায়না মিটিয়ে তাঁরা ছেলেমেয়ের 'আদৎ' খারাপ করেন না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাছাড়া তাঁদের যুক্তি হল, সারা পৃথিবীতে যখন জীবনযাত্রার মান উঁচু করার চেষ্টা চলছে, সেই ক্ষেত্রে খায়োকা ছেলেমেয়ের বেলায় এত কড়াকড়ি করার কি দরকার? কিন্তু প্রশ্নটা শুধু অর্থের সচ্ছলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সত্যিই চিন্তার কিছু থাকতো না। ছেলেবেলা থেকে না চাইতেই সব কিছু পাবার যে অভ্যাসটা মা বাবা তৈরী করে দেন তার ফলে ছেলেমেয়ে কখনো না পাওয়ার দুঃখ বুঝতে শেখে না। জীবনটা শুধুই যে 'পাওয়া' নয়, 'না পাওয়া'ও এর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা তাদের বুঝতে দেওয়া হয় না। আসলে তারা কোনোদিন 'মানিয়ে নিতে' শেখে না। এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা অনেক অপ্রত্যাশিত আঘাত খায়। চোখের সামনে বাঞ্ছিত চাকরীটা যখন যোগ্যতর ব্যক্তি অর্জন করে তখন আশাভঙ্গজনিত আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এইভাবে জীবনটার ওপর তার বিতৃষ্ণা ধরে ধীরে ধীরে। কিন্তু এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মা বাবা। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে আইসক্রীমের অভাবজনিত শোক পেয়ে যদি তার মনটা তৈরী থাকত, বড় হয়ে, যা চাওয়া যায় সব পাওয়া যায় না—এটাকে সে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই মনে করত। আমাদের দেশে আর্থিক সচ্ছলতাবিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু অনেকের মনেই এই তত্ত্বগত আশঙ্কা বদ্ধমূল। ছেলেমেয়ের মনে যেন কোনোমতে নিরাপত্তার অভাব না জাগে! এই কারণে তাঁরা ছেলেমেয়ের কাছে সব কিছু লুকিয়ে চলতে চান। আইসক্রীম আর পাস্ট্রীর জোগান দিতে, গ্রীষ্মের ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে যাবার খরচ জোগাতে, আর ছেলেমেয়ের নিত্য নতুন 'ড্রেস' আর 'পার্টি'র বায়নাক্কা মেটাতে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তো শূন্য হয়ই,

উপরন্তু বাজারে প্রচুর ধার দেনা হয়ে পড়ে। কিন্তু ছেলেমেয়েকে তাঁরা কখনো এসব জানতে দেন না। তাদের কাছে মা বাবার প্রকৃত আর্থিক অবস্থাটা অজ্ঞাতই থেকে যায়। ফলে, মা বাবার দুঃখ ছেলেমেয়ে কোনদিনই বোঝে না। তারা আত্মকেন্দ্রীক আর স্বার্থপর হয়ে ওঠে, শুধু নিজের সুখ সুবিধেটাই বুঝতে শেখে। জীবনের অভাব অভিযোগ, ব্যথা বেদনা এবং সহানুভূতির দিকটা তাদের কাছে একেবারে অন্ধকার থেকে যায়। ছেলেমেয়ে বাবা মার আর্থিক সঙ্গতি বুঝতে পারলে কখনো অন্যায় আব্দার করে না বলেই আমার বিশ্বাস। অন্তত তাদের সেইভাবে শিক্ষা দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েকে সুখ দুঃখের সমান ভাগী হতে শিক্ষা দিতে হবে। তবে তার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে। অযথা লুকোচুরির ভাব, সব ব্যাপারে একটা ফিসফাস আর গোপনীয়তা রক্ষা করার মনোভাব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ছেলেমেয়ের সামনে অনেক মা বাবা কথা কাটাকাটি করেন না। ছেলেমেয়ের মনে তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। এটা বোধহয় ভুল ধারণা। জীবনে কথা কাটাকাটি, মনোমালিন্য তো হতেই পারে। সর্বক্ষেত্রে যদি এটা সম্ভব তবে শুধু মা বাবার বেলাতেই নয় কেন? কথা কাটাকাটির পর আবার মা বাবাকে যখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে, সব কিছু করতে দেখবে তখন ছেলেমেয়ে বুঝবে, এটাও জীবনের ধর্ম। ছেলেমেয়েকে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে মানিয়ে নিতে শেখানো উচিত। জীবনের শুধু আনন্দের দিকটা তাদের দেখতে দিলে জীবনে সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হবে তাদের মনে। সমস্যা আসুক, বাধাবিঘ্ন আসুক, সেগুলোর মোকাবিলা করতে হয় কিভাবে তা শেখাবার দায়িত্বও মা বাবার। সমস্যাকে আড়াল করলে ছেলেমেয়ের জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে না, কোনোদিনই তাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগবে না। অপূর্ণ, পঙ্গু মন নিয়ে জীবন যুদ্ধে তারা সহজেই পর্যুদস্ত হবে। মা বাবার দায়িত্ব ছেলেমেয়েকে শেখানো, জীবনটা গোলাপের বিছানা নয়, এতে কাঁটার খোঁচাও আছে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আগুনে পুড়লে তবে তো সোনা খাঁটি হবে!

টুকিটাকি

১। সাদা কাপড় ফ্যাকাশে বা লালচে হয়ে গেলে সাবান জলে ১২ ঘণ্টার মত ভিজিয়ে রাখবেন। সাবান জলে টার্পেণ্টাইন মিশিয়ে নিতে হবে, অনুপাত ১ গ্যালন জলে ১ কাপ টার্পেণ্টাইন।

২। 'লেস' কিংবা 'নেট'-এর পরদা কেচে ধুয়ে ফেলার সময় জলে এক চামচ মেথিলেটেড স্পিরিট মিশিয়ে নিন। কাচার পর দেখবেন পরদার নেতিয়ে পড়া ভাব থাকবে না, বেশ কড়া মনে হবে।

৩। ইস্ত্রি করা কাপড়চোপড়ে অনেক সময় জায়গায় জায়গায় ইস্ত্রির চকচকে দাগ চোখে লাগে। এই সব জায়গার ওপর খানিকটা খবরের কাগজ রেখে তার ওপর গরম গরম ইস্ত্রি বুলিয়ে নিন। চকচকে দাগ তক্ষুনি মিলিয়ে যাবে।

৪। পিতলের জিনিস 'মেটাল পালিশ' দিয়ে পরিষ্কার করার পর কাপড় ঘষে পালিশ তোলার সময় সেই কাপড়ে কয়েক ফোঁটা কেরোসিন মিশিয়ে নিন। পিতলের ওপর আঙুলের দাগ পড়বে না তাছাড়া জিনিসটাও বেশীদিন ঝকঝকে থাকবে।

৫। টালি বসানো বা মোজেইক করা মেজে ধোবার সময় জলে এক চামচ কেরোসিন মিশিয়ে নিলে দেখবেন মেজে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

৬। রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘরের দরজার ফাঁকে ফাঁকে, তাকের খাঁজে আর আনাচে কানাচে টার্পেণ্টাইন ছিটিয়ে দিলে বা স্প্রে করলে পোকামাকড় এবং আরশোলার উপদ্রব কমবে।

৭। মার্বেল বসানো মেজেতে লোহার মরচের দাগ ধরলে পাতিলেবু কেটে ঘষলে সাধারণত সেই দাগ উঠে যায়।

৮। স্টিলের কলম, কালির অ্যাসিডে ক্ষয়ে যায়। কালির দোয়াতে বা শিশিতে কয়েক টুকরো লোহার পেরেক ফেলে রাখলে, কলম রক্ষা পাবে।

শ্রীমতী

শহর-অঞ্চলে সম্পত্তির পরিমাণ সীমিত রাখার তোড়জোড়

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। জানা গেছে পরিকল্পনা কমিশন শহর-অঞ্চলের সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকায় সীমিত রাখার সুপারিশ করেছেন। ১৯৬৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গুণ্টুর অধিবেশনে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার উপায় হিসেবে শহর অঞ্চলের সম্পত্তির পরিমাণের উপর সীমা আরোপ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। বিগত পাঁচ বছর ধরে এই প্রস্তাবটি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব চিরকাল প্রস্তাব হিসেবেই থাকবে, বাস্তব রূপ পাবে না, এই ভরসায় যাঁরা নিশ্চিন্ত মনে দিনাতিপাত করছিলেন, তাঁরা আজ সচকিত হয়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার নীতি গ্রহণ করেছেন তার অন্যতম কর্মসূচী হচ্ছে শহর অঞ্চলে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা। পাঁচ লক্ষ টাকার উপর সম্পত্তির অধিকারী যদি কেউ হন, তবে তাঁর উদ্বৃত্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন এবং এ জন্য শতকরা ৫-২৫ ভাগ সুদে তিশ বছর মেয়াদী বণ্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হবে। নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়তে পারে, এই আশংকায় বণ্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন পরিকল্পনা কমিশন। বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ যে জনসমর্থন পেয়েছে তা-ই প্রধানমন্ত্রীকে শহর অঞ্চলে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার প্রেরণা দিয়েছে বলে মনে হয়। ভারতে প্রায় ৪০০০ কোটি কালো টাকা আছে বলে অনুমান করা হয়। এই কালো টাকার একটি বিরাট অংশ শহর অঞ্চলের সম্পত্তির মধ্যেই নিহিত আছে।

যদি এই কালো টাকার ক্রমবর্ধমান পরিমাণ সরকার নিজের হাতে আনতে না পারেন, তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠন করা সম্ভব হবে না, আয় ও ধনের বৈষম্য কমানো যাবে না, এবং দেশও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের একটি সুনিশ্চিত উৎস থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষিক্ষেত্রেও জোতদারদের সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির সীমা নির্ধারিত হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমি গরীব জমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও যখন বিশেষ একটি ক্ষেত্রে আয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণের উপর পরোক্ষভাবে একটি সীমা আরোপিত হয়েছে, শহর অঞ্চলেও অনুরূপভাবে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা পরোক্ষভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন হয়েছে; কারণ একটি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে অপর অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়নি। অবশ্য সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সীমিত করে দেওয়ার অর্থ আয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া নয়; কারণ সম্পত্তি ছাড়াও আয়ের অন্য উৎস থাকতে পারে এবং অন্যান্য উৎসের গুরুত্ব বর্তমানে বেড়েই যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী চলতে গেলে এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য। তবে হয়ত কোন কোন ব্যক্তি মনে করবেন যে, এই ব্যবস্থা চালু হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার পরিমাণ সম্পত্তিও তো কম কথা নয়। অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকার পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে যে উদ্যম, অধ্যবসায় এবং চেষ্টার ত্রুটি হবে না, এটাই স্বাভাবিক। বরং এ কথা বলা চলে, সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হবার পর যে কালো টাকা প্রকাশ্য হবে এবং যে সম্পদ সরকারের হাতে আসবে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা আরও জোরদার হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যদি এই ব্যবস্থা চালু হয়, তবে যে পরিমাণ সম্পত্তি ভারত সরকারের হস্তগত হবে তার সুষ্ঠু বণ্টন যাতে হয় সে ব্যবস্থা কে করবেন?

মনোপলি কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর জানা গেছে ভারতের মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন, এবং তার পরিমাণ দিন-দিনই বাড়ছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে শহর-অঞ্চলের সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পত্তি ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে সীমিত থাকতে হবে।

ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে ঋণদান নীতির পরিবর্তন:

ব্যাংক জাতীয়করণ নিয়ে অনেক হইচই হয়ে গেছে। কিন্তু যে জাতীয় কংগ্রেস ব্যাংক জাতীয়করণ প্রসঙ্গ নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে, সেই জাতীয় কংগ্রেসই ১৯৩৩ সালে করাচি অধিবেশনে ব্যাংক জাতীয়করণ করা সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার ১৪টি বড় বড় ব্যাংককে জাতীয়করণের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার সূচনা হওয়া উচিত ছিল আরও আগে। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে দেশের কতটা সুবিধা হবে অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে তা বহুলাংশে নির্ভর করবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তার উপর। আমাদের কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানি শিল্পের উন্নতির জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত দেখা গেছে বাণিজ্য-মূলক ব্যাংকগুলির মোট দাদনের মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগেরও বেশি পেয়েছে বৃহদায়তন শিল্পগুলি; অথচ কৃষিক্ষেত্র পেয়েছে মাত্র শতকরা ২ ভাগ। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ব্যাংকগুলির ঋণদান নীতির পরিবর্তন হবে বলে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত সরকারের অর্থদপ্তর মনে করেন, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে মোট ১৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ হিসেবে পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে যে অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ পাওয়া যাবে রাজ্য সরকারগুলিও তার অংশীদার হবে। ব্যাংকগুলির মোট আমানতের যে শতকরা ৩০ ভাগ নগদ টাকায় রিজার্ভ হিসেবে থাকার কথা, তার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ থাকবে অনুমোদিত সরকারী সিকিউরিটির মাধ্যমে, এবং এই সিকিউরিটির কিছু অংশ হবে রাজ্য সরকারের সিকিউরিটি। ব্যাংকগুলির নতুন ঋণদান নীতি অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার যে আমানত বাড়বে বলে আশা করা যায় তার থেকেই কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া হবে। যদি এই নীতি কার্যকরী হয়, তবে ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের শতকরা ২০ ভাগ যাবে কৃষিক্ষেত্রে, শতকরা ১৫ ভাগ করে যাবে যথাক্রমে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের অর্থনৈতিক সংস্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে স্টেট ব্যাংক কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নে অর্থসংস্থানে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছে; আশা করা যায় ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও স্টেট ব্যাংকের পথ অনুসরণ করবে।

সুব্রত গুপ্ত

ছাড়েনি। জঙ্গলে প্রতি বছর সে দুবার করে যাচ্ছে আজ বিশ বছর হল। এর মধ্যে বাঘের হাতে, নোনা জলের ভেদবমিতে, সাপে কেটে আর কুমীরের মুখে প্রাণ হারিয়েছে তার বহরের জন পঁচিশেক মানুষ। তবু মন নরম, হৃদয় দুর্বল, শরীর কাহিল হয়নি তোরাব রফাদানের। সমুদ্র পাড়ি আর জঙ্গল বিলাস যেন তার এক রকমের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু শার্দুলকে সে মেরেছে গুলি করে। ভয়ঙ্কর চরিত্রের 'সেদো' আর 'বাউলী', মাঝি-মাল্লারা তাকে ভয় করে। শ্রদ্ধা করে। তোরাব মিয়া কথা বলে কম। টাকা পয়সাওয়ালা ভারী লোকেরা যেমন গম্ভীর প্রকৃতির হয়।

ফ্রেজারগঞ্জ থেকে এবার জোয়ার ভাটা না মেনেই বহর ছাড়তে হয়। তীরের কোল ঘেঁষে বহর চলে। সমুদ্রের ভীম গর্জনে নৌকোগুলো মোচার খোলার মতন দুলতে থাকে। আকাশে চৈত্র-শেষের কালো মেঘের চুড়ো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। তিরিশজন মানুষ সাগরের বৃহৎ পটভূমিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতোই মনে করে। বিশাল প্রকৃতির কাছে তারা কত অসহায়!

মাস পেরোলেই সাল বদল। বৈশাখের প্রথম দিনে বহর পূবদিকে সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, ভাঙাদুনি, গোসাবা নদী পার হয়ে এসে গোনা নদীর মুখে ঢুকে নিবিড় জঙ্গলভরা দ্বীপের মধ্যে চলে এল। এই দ্বীপের পূবে হরিণভাঙা নদী। তারপরে খুলনা জেলা, পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা। ঠাকুরান নদী আর মাতলা নদী সবচেয়ে চওড়া। দুইয়ের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। সবুজ অরণ্যানী। মাতলার তীরে বাসন্তী, ক্যানিং পোর্ট। বালিগঞ্জ থেকে সোনারপুর হয়ে ক্যানিং পর্যন্ত রেল লাইন আছে। মাতলার আর এক শাখা বিদ্যাধরী নদী। হরিণভাঙার শাখা নদী রাইকমল আর কালিন্দী।

২৪ পরগনার বড় ম্যাপ খুলে মহাজন সবাইকে দেখায় তাদের অবস্থানস্থলটা। কম্পাসের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখে।

সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলের মধ্যে নদীর বাঁকে বহর নৌকোগুলো নঙ্গর করে। সরু নদী। জোয়ারের বেগ তবু প্রচণ্ড। কেবলই একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ঢেউ আছাড় খাচ্ছে নৌকোর গায়ে।

পানি-পায়রা, বনমুরগ, শামুক খোল, মানিকজোড়, জল ডাহুক উড়ে চলে জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে সন্ধ্যা সমাগত দেখে। পাখির ডাকে মাত হয়ে আছে জঙ্গল। কালবৈশাখীর ঝড় ওঠার পর বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। সবুজ অরণ্য ক্রমে ছায়াচ্ছন্ন হতে হতে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তীরে শুয়ে পড়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় কুমীর। দীর্ঘ করাতে সাপ বেয়ে চলেছে জলের ওপর দিয়ে।

ঝড় জল থেমে যায় একটু পরেই। গাঢ় অন্ধকার। নতুন লোকেরা ভয় পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বু-বু করে কাঁপতে থাকে। যদি কুমীর কিম্বা সাপ নৌকোর গলুই বেয়ে উঠে আসে?

টিমটিম করে আলো জ্বলছে নৌকোয়। ক্রমাগত ঢেউয়ের গর্জন। বৈশাখের মাঝরাতেও কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিতে হয়। গরানকাঠের মহাজন তোরাব রফাদান দু-নলা বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে পাশে রেখে খাতা লিখছে। রেডিওতে কলকাতা সেন্টারের সুললিত কণ্ঠের পবিত্র কোরআন পাঠ হচ্ছে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহে। ধারালো তলোয়ার, বল্লম, সড়কি, ছোরা, টাঙি, কাটারিগুলো ছড়ানো মানুষজনের পাশে পাশে রয়েছে। ছ-আনা ফেউয়ের তিরিশজন মানুষ মহাজনের বন্দুক আর বীরত্বের ওপর ভরসা রেখে প্রাণ হাতে করে ঘুমোচ্ছে। চার পাঁচদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সবাই অবসন্ন। এই গভীর রাতের সুষুপ্তিতে বহু বছরের সুদক্ষ অভিজ্ঞ মহাজন তোরাব রফাদানের চোখদুটোতে যদি ঘুমের ঘোর লাগে তাহলে সকালে খাতায় হাজিরার সময় দেখা যাবে একজন লোক কম পড়ছে!

সেদো অর্জুন কয়াল বলে, "জানিস তোরাব, শালারা সবাই জেগে আছে। শুধু শের আলিটা নিদ যাচ্ছে গাল হাঁ করে। বেচারা! ওর মা কী 'কান্দেছ্যালো' বলো! ষোল বছরের 'চিগনে' ছোঁড়া। ওর বাপজীকে গত সনে বাঘে নিয়ে গেল! তবু ছেলেটা কেম্পানীতে চিতিয়ে পড়েছে! অ্যার নাম 'প্যাটের' দায়"

অর্জুন কয়াল সবাইকে 'তুই' বলে। সুন্দরবনের মানুষেরা তাই বলে। জাতিতে অর্জুন মুসলমান।

পাঁচ সেলের ফ্ল্যাশ লাইট মারে রফাদান। জঙ্গলে জড়াজড়ি নিবিড় গাছপালা। মোটা মোটা লতা। ফণী মনসা, হেঁতাল, হরকোচ,

ভেকটাল বন ঝাঁঝা, লঙ্কাশিরে, মনসা, বাজবরণ, পান শিউলী, জল ডুমুরে, ম্যাড়া মারা, সেঁয়াকুল, বঁইচির কাটাভরা ঝোপ-ঝাড়। আলো দেখে ভয় পেয়ে গরুর কানের মতো নরম নধর সাদা খরগোশগুলো তুড়ুক তুড়ুক করে ছুটে পালায়। বিভ্রান্ত হয়ে কেউ-বা জলের মুখে এসে পড়ে। মুখে আড়-টাংরজর যন্ত্রণা নিয়ে কুমীর তার লেজ সাপটায় বেলাভূমির ভিজে বালিমাটিতে।

সুন্দরবনের মধ্যরাত্রির শব্দ বড় ভয়ঙ্কর! ঢেউ আছড়ানির শব্দ, জঙ্গল-জোড়া গভীর তানের ঝিঁঝির ডাক, মাঝে মাঝে বন-মোরগের চিৎকার, শিয়াল-খট্টাশের ডাক, পাখিদের কল-কাকলি, হনুমান-বাঁদরের চিৎকার, বাঘের গর্জন, গোসাপের ফটফট শব্দ এবং কোনো আক্রান্ত পশুর ভয়ঙ্কর আর্ত-চিৎকার—সব মিলিয়ে ভয়াবহ, রোম-হর্ষক! জঙ্গলের ঘাস-লতা-গাছ-জীবজন্তু-পোকা - মাকড়-সাপ - কুমীর-মাটি - কাদা-শিকড়-কাঁটা - জল-মাছ-আকাশ-মেঘ-তারা-জোয়ারভাঁটা - থাঁড়ি-অসুখবিসুখ - ঠাণ্ডা-গরম—সমস্ত কিছুর নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া দুঃসাধ্য। এর জন্য কয়েক বছরের পরিশ্রম প্রয়োজন। আর পরিসর চাই মহাভারতের চাইতেও বেশি। সে অলিখিত মহাকাব্যের জনক একমাত্র বিধাতা, যিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন সুন্দরবনকে সুন্দর আর ভয়ঙ্কর করে। সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে উপভোগ করবার সাধ্য কী ক্ষুদ্র মানুষের অনুভূতি দিয়ে! বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ভোরাব মহাজনই-বা তার কতটুকু জানে! তার কাছেও তো সেই অনাদি অরণ্য আজো তেমনি চিরন্তন। চির দুরন্ত দুর্দম!...

হঠাৎ কাছেই বাঘের গর্জন শোনা গেলে সবাই উঠে বসে। অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে তৈরি থাকে। মহাজন বন্দুক ধরে ফ্ল্যাশ লাইট ফেলে। সেদো ক্যানাস্তারা পিটতে বলে। অর্জুন কয়াল গালের মধ্যে পেট্রল ভরে নিয়ে হুপ্কা আতস-বাজির মতো রক্তাভ আগুন ছেড়ে দেয় বার কতক।

আলো বা আগুন দেখে বাঘ ভয় পায়। আর গর্জন শোনা যায় না। ফাঁকা দুটো বন্দুকের আওয়াজ করে মহাজন। তার চোখ চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তীরভূমি ধরে। সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত ধড়েল। ধীর-স্থির তার গতি। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কোথায় কোন্ গোলপাতা শরথাড় আর হোগ্লা হেঁতালের জঙ্গলের মধ্যে লুটি মেরে লুকিয়ে পড়ে, কারো সাধ্য নেই খুঁজে বার করে। নৌকোর সবাই ঘুমিয়েছে বুঝলে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে জলে নামে। চোখ কানটুকু জাগিয়ে সাঁতরে এসে নেয়ো বাড়িয়ে ধরে নৌকোর গলুই। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সব দেখে নেয়। মহাজন তন্দ্রায় ঢুলছে

দেখলে সট করে একটু উঠেই কাছের মানুষটার গলার নালীতে কামড়ে দিয়ে টুঁ শব্দ করবার আগেই টেনে জলে নামিয়ে এক ডুব দিয়ে ওঠে গিয়ে অনেক দূরে—তারপরে পিঠে করে তুলে নিয়ে চলে যায় জঙ্গলের ভিতরে।

তাই রাত্রে মহজন বা সেদোর ঘুমোনো নিষেধ। রাত জাগার জন্যে 'বাউলীদের' (যারা মধু সংগ্রহ করে) মধ্যে একজন মাথায় বাবরি চুল, বাহুতে রুপোর পদক, গলায় বাঁধা রুপোর তক্তি, লখিন্দর গাজি—অপূর্ব সুরেলা গলায় পুঁথি পড়ে। সবাই মন দিয়ে শোনে। তার কাছে এক সুটকেস পুঁথি আছে। 'কাসাসল আম্বিয়া,' 'হাতেম তাই,' 'জঙ্গে শাহানামা,' 'জঙ্গে বদর', 'জঙ্গে অহোদ', 'খয়রল হাসার', 'গোলসানে রূম কেচ্ছায় দীল খোশ'—কতরকমের পুঁথি। পুঁথির গল্পের মতো গল্প আর হয় না। বাঙলার মুসলমান সমাজের মধ্যে 'পুঁথি-সাহিত্য' নামে একটি উদার কল্পনা এবং অপূর্ব মজাদার কাহিনীর জগৎ আছে যার খোঁজখবর অনেকেই (বাঙলা-সাহিত্যের পণ্ডিতেও) রাখেন না। গরাণ কাঠের মহাজন, গণ্ডা-গণ্ডা বাঘ-মারা নির্ভয় নিষ্ঠুর

প্রত্যেকের মানুষেও তার কেউ ও নয় [illegible] চুপ করে বসে পাঁতির কাহিনী শোনে আর সিগারেট ফোঁকে একটার পর একটা।

ভোর হয়ে এলে মোরগের চিৎকার শোনা যায়। পাতলা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা।

[illegible] ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সকাল হলে সেদো মন্তর পড়ে জল ছিটিয়ে প্রথমে মাটিতে নামে একলা খালি হাতেই! সে চিৎকার করে [illegible] পাইতে পাইতে ঢুকে যায় জঙ্গলের [illegible] জায়গার মধ্যে গাছকাটা [illegible] সেই [illegible] ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে [illegible] তখন মহাজন [illegible] ফিরে [illegible] যায়। সেদো [illegible] :

বনদেবী মা—
তোমার ভরসায় এলাম মাগো
যেন বাঘে ছোঁয় না।
জগদম্বা দেবী মা—
তোমার কোলে এলাম মাগো
যেন কাঁটা ফোটে না।
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মহাজন বন্দুক হাতে নিয়ে বেড়ে যায় সেদোর পিছনে পিছনে—তখন নৌকোর লোকগুলো অসহায় বোধ করে। সবাই অস্ত্র নিয়ে খাড়া থাকে। সেদো পড়ছে শার্দূলের থাবার পড়েও হয়, তার মন্ত্রে বিশ্বাস নেই বলে মহাজন তাকে পাহারা দেয়। ব্যাপারটা কিন্তু সেদো জানতে পারলে মহাজনের ওপরে ক্ষেপে যায়। গালাগালি করে। মহাজন চুপ করে থাকে। হাসে।

কুয়াশা থাকলে জঙ্গলে গরাণ কাটতে নামতে দেরি হয়। বেলা দশটা বেজে যায়। তার আগে খেয়েদেয়ে নেয় সবাই। তারপর কালোস[illegible] পেটে। করাত-কাটারী, কাঠি-সড়কি, বন্দুক নিয়ে সকলে [illegible] আসে আস্তে আস্তে দল বেঁধে। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ী চোরাবালির দহ। সুন্দরীর ভয়ঙ্কর জঙ্গল চারদিকে। সেদো আর মহাজন চলে সবার আগে আগে। নদী পথে নামবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আগাছা কাঁটা গাছ ঝোপঝাড় সমস্ত কাটারী চালিয়ে কেটে ফেলা হয়। পঁচিশ ত্রিশ হাত উঁচু ভীষণাকার ভীমরুল চাক। তিনটে ভীমরুল কামড়ালে একটা কেউটে সাপের বিষের সমান যন্ত্রণা হবে। বড় বড় চক্রাকার বোলতার চাক। গাছের ডালে ডালে মধুর চাক। 'বাউলী'রা আগুন জ্বালে। ভীমরুল বোলতা মৌমাছি ভোঁ ভোঁ শব্দে আকাশ ছেয়ে উড়ে পালাতে থাকে তাদের বাসা ছেড়ে ডানা পুড়ে যাবার ভয়ে। পীরআলি আর লখিন্দর গাজি 'বাউলী' দুজন মধু সংগ্রহ করে বালতি ভরে নৌকোয় পাঠায়। সবাই মধু খায় যে যতটা পারে। বেশি খেলে আবার গা-হাত জ্বালা করবে।

গরাণ গাছ কাটা শুরু হয়ে যায়। দমাদম কুড়ুল চলে। সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা ছিঁড়িয়ে ফেলে কাঁধে কাঁধে নৌকোয় উঠে যায় সেই গাছ। সেদো বিরাট ফলার চকচকে

বাদাম হাতে নিয়ে চারদিকে ঘোরাফেরা করে। মহাজন বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কড়া মোটা গাছে করাত টানতে হয়। তবে গরাণ গাছ বেশি মোটা হয় না। অনেক জায়গা তখনো জলে ডোবা। সেখানে মোটা মোটা হিজল আর সুন্দরী গাছ। তলায় চুঁপি গাছ আর তেউড়ভরা। হিজলের সরু সরু ঝালর ফুলে তার তলার মাটি লাল হয়ে আছে। জংগল জলে জলময় হয়ে গেলেও হেঁতাল, জলডুমুর, হরকোচ, সুঁদরি, গরাণ, পানশিউলী তেঁকাটাল, গেঁয়ো, বাজবরন, লঙ্কশিরে, ফণীমনসা বনঝামা, ম্যাড়ামারা, বইঁচি, ঢোল সমুদ্র, শ্যাওড়া—এসব গাছ মরে না।

গরাণ খুব শক্ত কড়া গাছ। এর খুঁটি হয় ডালপালা জ্বালানি হয়, তাই গরাণের কদর বেশি। সুঁদরি আর গরাণই সুন্দরবনে বেশি। শতকরা ৮০ ভাগ।

বেলা চারটের পর জঙ্গলে ছায়া নামলে সকলে কাজ ছেড়ে নৌকোয় চলে এসে বালাত করে জল তুলে গা-হাত ধুয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। লালু খানসামা আগেই রান্না করে রাখে। দুপুরে যখন একঘণ্টার জন্য সকলে কিছু জলখাবার খেতে এসে বিশ্রাম করে, তখন হরিণ শিকারের সুযোগ আসে। তাই সেদো আর মহাজন সবুজ ফতুয়া সবুজ লুঙ্গি পরে কাটা গাছের পাতা খেতে আসা হরিণের দলের অপেক্ষায় হেঁতাল অথবা শরখাঁড়ির বনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। সিগারেট বিঁড়ি খাওয়া বা গন্ধ তেল সাবান মেখে হরিণ শিকারে আসা নিষেধ। হরিণের ঘ্রাণশক্তি ভয়ঙ্কর তীব্র। কিছু গন্ধ পেলে হরিণ মুহূর্তেই পালাবে। জলডোবা অংশ বা বালিয়াড়ি খাঁড়ির মধ্যে সুন্দরবনে প্রচুর মাছ থাকে। সাপ, 'গোহাড়গেল' ঘুরে বেড়ায়। যেখানে মাছ সেখানেই সাপ। মাছ খাবার লোভে আসে 'কেঁদো বাঘ'। বড় বাঘ সেই ডোবার ধারে জল-খেতে আসা হরিণের জন্যে ওৎ পেতে থাকে শরখাঁড়ি বা হেঁতালের জঙ্গলে। বাঘ এত সতর্ক যে দখিনে হাওয়া বইলে সে থাকবে উত্তরে। কেন না সে জানে তার গায়ের উগ্র গন্ধ বাতাসে ভেসে গেলে হরিণ সেই গন্ধ পেলেই পালাবে।

কথা বলাও নিষিদ্ধ। করাতে, শাখামুঠি, গোখরো, গোঁড়ভাঙ্গা কেউটে বেয়ে চলেছে—চলে যাক—কোনো সাড়া করো না। সাপে নেউলে যুদ্ধ লাগলে বসে দেখো। নেউলের তীক্ষ্ণ নখের ধারে যদি লাফ দিয়ে যাবার সময় সাপটা দু টুকরো হয়ে যায়, তবে লেজের দিকের অংশটা নিয়ে সে ছুটে মারবে। নাভির পরে কাটলে সাপটা পালাবে। 'সাপ কামড়ে দিলে নেউল ছুটে গিয়ে 'ঈশরমূলে', 'হরকোচ', 'মণিরাজ' অথবা 'গন্ধলতা' জাতীয় একরকমের লতাগাছের মূল খুঁড়ে বার করে চিবোতে থাকবে।' এ সেদোর কথা। এ কথায় মহাজন হাসে।

কাঁচা কচি পাতা খাবার জন্যে হরিণ আসে বকের মতন টিক-টিক করে অল্প অল্প জল পার হয়ে। পাঁচটি-দশটি, মুখে পাতা নিয়ে চনমনে চোখে তাকিয়ে থাকে। কান খাড়া করে রাখে। [illegible] রফামান বন্দুক সোজা করে ধরে হরিণের বুক লক্ষ্য করে। তাদের পিছনে অনিবার্য বাঘ থাকবে বলে সেদো লক্ষ্য রাখে সেদিকে। বাঁদর হনুমানের দল এসে লাফালাফি করে বড় হিজলগাছের ডালে ডালে।

হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ হয়। অব্যর্থ লক্ষ্য রফমানের হরিণটা লাফ দিয়ে ছিটকে পড়ে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্য হরিণগুলো চকিতে কোথায় উধাও হয়। হঠাৎ দেখা যায় তাদের পিছনে বাঘ ছুটে যেতে। কাছেই কোথাও ওৎ পেতে ছিল। [illegible] বনের খানিকটা ফাঁকা জায়গায় [illegible] [illegible] শিকার [illegible] না দেখেছে তাকে [illegible] কঠিন।

কিছুক্ষণ পরেই [illegible] হরিণটার কাছে আসে [illegible] ধরে সেদো। পকেট থেকে ছুরি বার করে জবাই করে ফেলে রফামান। মায়াময় বড় বড় চোখ দুটো বার করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় হরিণটা। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসে সেদো।

হরিণের মাংস, মাছ, ভাত, মধু, মুরগির ডিম যে যতখানি পারে খেয়ে নিয়ে সবাই সন্ধ্যার সময় শুয়ে পড়ে। একটু ঘুমিয়ে নেয়। মহাজনও ঘুমোয়। সেদো তখন প্রহরী। রাত নটার পর মহাজন জেগে উঠে রেডিও চালায়। সকলে গল্প করে।

পুঁথি পড়ে লখিন্দর গাজি। সবাই মন দিয়ে শোনে পায়ের হাতের কাঁটা বার করতে করতে। কার আমাশা ধরেছে কার-বা সর্দি-মহাজন ট্যাবলেট দেয়। নোনা জলের আব-হাওয়ায় হঠাৎ কলেরা ধরবার ভয়ে সবাই তেঁতুল গোলা জল খায়। রাত্রে শীত করলে কাঁথা কম্বল মুড়ি দেয়।

দিন দশেক পরে এক রাত্রে আসে ফরেস্ট অফিসের জলপুলিসের লঞ্চ। মহাজন দু-হাত গালের কাছে এনে জোরে চিৎকার করে তাদের ডাক দেয়—'ও-ও-ও-ও-ও-ও—হেই-ই-ই-ই-ই? সার্চ লাইট ফেলে তারা আঁতি-পাঁতি করে দেখে নিয়ে কাছে আসে। সিগারেট খায়: মধু, হরিণের মাংস, কচ্ছপের ডিম, বনমোরগ ইত্যাদি নিয়ে চলে যায়।

জংগলে কুড়ি দিন থাকবার কথা। পনেরো দিনের দিন সবাই যুক্তি করে কাজ বন্ধ করলে। সেদো অজুন করাল মহাজনের তরফের লোক। তার রোজ সাড়ে তিন টাকা খোরাকি সমেত এবং কাঠগোলায় পৌঁছে পঁচিশ টাকা উপরি। সে কাজ করে না, গল্প-গল্প মেরে আর পাহারা দেয়—জংগল বন্দনা গায়। হাজার দু-হাজার লাইন তার মন্তরের ছড়া! কিন্তু যারা প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে কাঁটা - জোঁক - ডাঁস - ভীমরুল-সাপের কামড় খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে তাদের রোজ আড়াই টাকা থেকে তিন টাকায় বাড়াতে হবে। সেদো প্রথমে অরাজি ছিল। পরে সেও ঘুরে গেল। সে-ই যেন আগে 'পায়ে পা-তুলে দিয়ে' ঝগড়া বাধাতে চাইলে। পীর আলি, লখিন্দর গাজি, লখাই করাতি, বলাই সেখ, ইসমাইল ঘরামি, লালু খানসামা, পরাণ ঢেঁকি, বনমালী ঘোড়া, বিশু হাজরা, নন্দমাঝি, এবাদত সরদার সবাই এক ঐক্য।

সেদো বললে, 'কাঠের দাম বেড়েছে, সকলের রোজ বাড়াতে হবে, নইলে আজ থেকে সবাই কাজ বন্ধ করবে।'

মহাজন বললে, 'অসম্ভব। হিসেব কর, তিরিশজনের রোজ তিন টাকা করে হলে দিনে নব্বুই টাকা। আর খোরাকি। নৌকো ভাড়া, লাইসেন্স ফি, ঘুষ, তোমার উপরি পাওনা, এসব খতিয়ে দেখে তবে কথা বলো। আমার লোকসান করতে চাও কি তোমরা? হঠাৎ তোমাদের যদি সাপে কাটে কিম্বা বাঘে ধরে নামখানা না হয় ক্যানিং হয়ে কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে খরচ দেবে কে?'

সবাই নীরব। মহাজনের টাকার বাক্সটার দিকে লক্ষ্য। তাদের গতর-মাটি-করা টাকা। মহাজন লাখোপতি টাকার মানুষ।

মহাজন মনে মনে সব হিসেব করে। দেড় হাজারী বোটে ছ-খানায় ন-হাজার মণ মাল ধরবে। এক হাজার মণ শুকনো হলে কমবে। দু-নৌকো খুঁটির দাম আলাদা। চার নৌকো গরাণের সাড়ে তিন টাকা মণ।

নরম, পুরু ও ভারি আরামের
এই বিনীর তোয়ালে—সুতী-পশমের
মত মোলায়েম লাগবে।
স্নানের পর গায়ে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই
জল টেনে নেয়। ঢের বেশী দিন
টেঁকে, রঙও পাকা—আপনার বাথরুম
রঙের আভায় ঝলমলে করে তুলবে।
রকম রকম রঙে, সাইজে
ও ডিজাইনে পাবেন এই তোয়ালে—
পয়সা দিয়ে কেনার মত।
এ হেন তুলতুলে নরম তোয়ালে
বিনীই পারে বানাতে!
বিনীর
তোয়ালে
যেমনটি চাই বেছে নিন:
স্নানের টার্কিশ তোয়ালে
মুখ মোছার তোয়ালে
জ্যাকার্ড তোয়ালে
হাত মোছার তোয়ালে
বাচ্চাদের ন্যাপকিন
AUTHORISED STOCKIST OF BINNY FABRICS
আপনার প্রয়োজন মত বিনীর কাপড় এই সাইনবোর্ড লাগানো অনুমোদিত স্টকিস্টের দোকান থেকে কিনুন।
বিনী—বস্ত্রশিল্পে একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম
BY 50106

ঝাড়াই চেরাই আছে। তবু ইচ্ছে করলে ওদের জিম্মা টাকা করে দেওয়া যায়—তবুও লাভ থাকবে।' বললে, 'আচ্ছা, ভেবে দেখ, কাজ করো সব।'

সেদো বললে, 'আমাদের এক কথা।'

মহাজনের ক্রুর চোখে কেউটে খেলা করল। সেদো তা বুঝল না। মহাজন নিম-রাজি হয়ে কথা দিলে যেন। কাজ চলল। দুপুরে মহাজন বললে: 'আজ একটা হরিণ শিকার করব মনে করছি। চল অর্জুন—যাই।'

সেদোর হাতে ধারালো বল্লম। মহাজনের হাতে বন্দুক। দুজনে গেল তারা জঙ্গলের ভিতরে। একটা জলাশয়ের পাশে দুজনে বসল। সাপ বেয়ে চলছে জলের ওপর দিয়ে। কথাবার্তা নেই। আধঘণ্টা পরে এল তিনটে হরিণ। পিছনে গোটা পাঁচেক। জল খেতে নামল তারা। দূর থেকে ছুটে আসার পর ক্লান্তিতে সব ধুঁকছে। একটু করে জল খায় আর আনচান করে চারদিক তাকায়। কী অপূর্ব সুন্দর চোখ আর চাহনি তাদের! মায়া হয় মারতে। একটা গুলি ছুঁড়লে তোরাব রহমান। মোক্ষম লাগল। ঘুরপাক খেয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল। অন্যগুলো পালিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। মহাজন ইসারা করলে সেদোকে ছুটে গিয়ে হরিণটাকে আনতে, মরার আগেই যেন জবাই করা যায়।

সেদো ছুটে গেল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। হাতে তার বল্লম। হরিণটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যখন সেদো আসছে মহাজন হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে। বললে 'ঐ অর্জুন—বাঘ তোর পেছনে!' সেদো চিৎকার করে উঠে খানিকটা ছুটে এসে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। সে মরে গেলে তাকে টেনে তুলে ফণীমনসার জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিলে তোরাব রহমান। সেদোর রক্তের চিহ্ন যা তার গায়ে লেগেছিল জবাই করা হরিণের রক্তে তা একাকার হয়ে গেল। হরিণটাকে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এল মহাজন। বললে: 'দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেদো অর্জুন কয়ালকে বাঘে নিয়ে গেছে!' শিকারের পর সে যখন হরিণ আনতে একা ছুটে গিয়েছিল, হঠাৎ তার ওপরে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি গুলি করলাম বটে, কিন্তু বোধ হয় লাগে নি। বাঘটা তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে সাঁ করে জঙ্গলে ঢুকে গেল। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে!...যাবে নাকি তোমরা?'

সবাই নীরব। শুধু লখাই গাজি বললে, 'চলো যাই—দেখি শালাটাকে'... কিন্তু কেউ নড়ল না। মহাজন একবেলার ছুটি ঘোষণা করে দিলে।

মহাজন সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'কোনো-মতে হরিণটাকে নিয়েই পালিয়ে এসেছি।

সেদোর হাতে ধারালো বল্লম। মহাজনের হাতে বন্দুক

কী ভয়!...আমার ভয় করল, তোরা হলে তো কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলতিস কিম্বা জঙ্গলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতিস।'

অতএব দামকাড়ি বাড়াবার আর প্রশ্ন নেই। দুঃসাহসী সেদো ছাড়া কে আর কথা তুলবে? নিমরাজি হলেও মহাজন আর কি দেবে? সেদো নেই, কিন্তু তার জঙ্গল-বন্দনার ছড়াগুলো সবাইয়ের মনে প্রভাব বিস্তার করে রইল।

পাঁচদিন পরই—বিশ দিনের দিন—নৌকো ছাড়া হল। ছ-খানা গাদা বোট বোঝাই মাল। একখানা পানশি নৌকোর মালপত্তর মহাজন আর লোকজন। সবারের বাড়ি ফেরার আনন্দ। দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ ঝপাঝপ শব্দে। সমুদ্রের ফেনাভাঙা গর্জমান ঢেউ ঠেলে হলদে পাল তোলা নৌকোর বহর চলছে তীর ধারে পশ্চিমে। আকাশে মেঘের বিচিত্র পাহাড়।

মহাজন সাজানো কাঠের মাথায় এসে বসে আছে ছবির মতন। মুখে তার সুন্দর দাড়ি। মাথায় টুপি। কোলের ওপরে কোরআন শরীফ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে...

কালবৈশাখী কালো মেঘ উঠছে আকাশে।

ঝড় হতে পারে দেখে মহাজন তাড়া লাগায়। গোসাবা থেকে দুদিনের পথ নামখানা। ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, বজবজ, বাগান্ডা, নলদাঁড়ি হয়ে শ্যামগঞ্জের কাঠ-গোলায় পৌঁছতে তাদের আরো দুদিন লাগে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করে করে আসতে। গোলায় মাল তুলে দিয়ে সবাই দামকাড়ি নেবার জন্যে বসে থাকে। দরিয়ার ধারে এসেছে সবাইয়ের মা-বউ-মেয়ে-বোনরা। শুধু সেদো অর্জুন কয়াল ফিরতে পারে নি। সবাইয়ের গায়ে বিষাক্ত জলের 'পানটিপ' (ফুসকুড়ি) হয়েছে। গায়ের রঙ পোড়া কাঠের মতো হয়ে গেছে নোনাজলের আবহাওয়ায়। মেয়েরা সবাই কড়িভাব আর মানসিকর বাতাসা এনেছে।

সেদোর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সবাই গুজগাজ করছে দেখে মহাজন বুঝতে পারে সেদোকে বাঘে নিয়ে যাবার ঘটনাটি ওরা বিশ্বাস করে নি বোধ হয়। তাই চার আনা করে প্রত্যেককে বেশি দেয়। সেদোর উপরি পাওনা যেটা। নইলে আগামী বছরে আবার লোকজন পাওয়া যাবে না!...

দামকাড়ি ট্যাঁকে খুঁসে নিয়ে সবাই চলে যাবার সময় শুধু অনেক পুঁথির পাঠক লখিন্দর গাজি বলে, শালা, গরাণ সংগ্রহকারী সুন্দরবনের মহাজনের চরিত্র সুন্দরবনের বাঘের চাইতেও ভয়ংকর!'

আবদুল জব্বার

শকুন্তলা

গীতার সাংখ্যযোগেই ইতি টানলাম, ধরলাম কালিদাসের শকুন্তলা। প্রতীচ্য মনীষীদের অকৃপণ স্তুতি নিবেদন পড়েছিলাম; ঔৎসুক্য ছিল খুব। লামার্তিন্-ই না লিখেছিলেন, ঐ নাটকে ঘটেছে বাইবেলের রাখালিয়া (Pastoral), আস্কিলাস-এর কারুণ্য আর রাসিন্-এর মমতার ত্রিবেণী সঙ্গম?

প্রথমে একটু আশ্চর্য লাগল বটে; আমরা তো পাশ্চাত্য নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত, পঞ্চাঙ্ক নাটকের ত্রি-ঐক্যে অভ্যস্ত। আর এখানে দেখছি সব ওলট পালট। স্থান কাল দুটোই চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এক একটি অঙ্কের ফাঁকে মাস, বছর, যুগ কেটে যেতে পারে : তৃতীয় অঙ্কে সবেমাত্র শকুন্তলার বিয়ে দেখলাম, পঞ্চমেই সে গর্ভিণী, আবার সপ্তম অঙ্কে তার ছেলে বেশ ডাগরটি হয়ে দিব্যি সিংহের সঙ্গে খেলা করছে! আর স্থান? বোধ করি ত্রিভুবনব্যাপী তার ব্যাপকতা : তপোবন থেকে রাজপ্রাসাদ, রাজপ্রাসাদ থেকে স্বর্গ। তার ওপর দৈব ঘটনা-ই বা কত! রাক্ষসদের বিঘ্নসৃষ্টি, কণ্বের উদ্দেশে অশরীরী বাণী, শকুন্তলাকে তপোবন-দেবতাদের বস্ত্রদান, শকুন্তলার স্বর্গোন্নয়ন...। এদিকে গতিকে তো পদে পদে বিঘ্নিত করে বর্ণনাত্মক যত শ্লোক, ঠিক হিন্দি ফিল্মে যেমন গান।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম কথাবার্তার ঢঙে। মার্জিত, শৌখিন, একটু বা কৃত্রিমই ঠেকে স্থূলে পাশ্চাত্য কানে. অনসূয়া যখন রাজাকে 'কোত্থেকে আসা হল?' কিংবা 'দেশ কোথায়?' বা অর্ধানি কোনো কিছু প্রশ্ন না করে প্রতিসম্ভাষণ অলঙ্কৃত ভাষায় জিজ্ঞেস করেন, 'কতমঃ আর্যেণ রাজর্ষিবংশ অলংক্রিয়তে?' আর রাজাও ছোট্ট সহজ 'ভালো আছেন তো?'-র বদলে শুধোন, 'অপি তপো বর্ধতে?' [উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা পড়ে মালবিকার সাদামাটা প্রশ্নে বিস্মিত হয়েছিলাম : শিপ্রাতীরবাসিনী মালবিকা কাঁধের পরে হস্ত রাখি/নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি/'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?'] খুব কৌতুক লাগত এই কথা ভেবে যে ইহুদীরা যেখানে 'শান্তি' গ্রীকেরা 'আনন্দ' আর লাতিনেরা 'স্বাস্থ্য' কামনা করে অভিবাদন জানায়, ভারতীয়েরা সেখানে তপোবর্ধনের কথা তোলে!

আর ওদের বৌ-এরা কর্তাকে আর্যপুত্র বলে ডাকে! এখনও মনে আছে বঙ্গদেশ-ফেরৎ আমাদের অধ্যাপকের মন্তব্য : আজকালকার দিনে ওরা আর্যপুত্র আর বলে না, শুধু বলে 'ওগো'; তবে দেবরকে বলে ঠাকুরপো।

"উদকান্তং স্নিগ্ধো জনো অনুগন্তব্যঃ" শার্ঙ্গরবের এই উক্তির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, গ্রামবাসী রাজশক্তিরাও আগন্তুককে 'সরস্তীর' অর্থাৎ পুকুরপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। নিয়মটা ভালো, আর আমিও আজকাল তা-ই করি; আমাদের বাড়ির সামনে যে গঙ্গাজলের চাপা কলটা আছে, সেখান পর্যন্ত আমি আমাদের বিদায়ী অতিথিদের প্রত্যুদ্গমন করে আসি।

অলৌকিক আবেদন

নাটকটির নাট্যগুণে যতই খোলা-মেলা লাগুক না কেন, তার মধ্যে আমরা এমন এক রহস্যের ভাব লক্ষ্য করেছিলাম যা প্রকৃতই কিম্বদন্তীর। কত শ্লোক আমাদের মুখস্থ করেছিল, সংস্কৃত না জানা বন্ধুদের সামনে আবৃত্তি করতে ভালোবাসতাম [ওরা অবশ্য আমাদের ঠাট্টা করত, বলত, "তোমাদের ঐ দেবভাষায় অ-আ ছাড়া আর কোনো স্বরবর্ণ নেই!"]; আর আমি যার স্মৃতিশক্তি মধুসূদনের তুলনায় মতো ["ছোট বেলায় আমার টিকটিকি ছেল, প্রাণের বন্ধুর নাম পর্যন্ত বার বার ভুলে যেতাম"] সেই আমি কাশ্যপের দুটি শ্লোক হুবহু মুখস্থ করেছিলাম : 'যাস্য-ত্যদ্য শকুন্তলেতি' এবং 'শুশ্রূষস্ব গুরূন...'। দুটি শ্লোকই আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। সংস্কৃত নাট্য-

"অপি তপো বর্ধতে?"

জনায় বিশেষজ্ঞ ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি যখন লেখেন, 'শকুন্তলা-নাটকটিতে ভারত তথা মানব সমাজই প্রতিবিম্বিত' তার মূলেও নির্ঘাৎ প্রেরণা জুগিয়েছিল ঐ দুটি শ্লোক।

সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার সুযোগও কিছুটা পেয়েছিলাম। পড়েছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্য যত সমৃদ্ধ হোক না কেন, তবু 'রাজা ইদিপাস' প্রভৃতি ট্রাজেডির মতো কোনো বিয়োগান্ত নাটক ভারতবর্ষে নেই; গ্রীক কিংবা লাতিন ঐতিহাসিকের সঙ্গে কোনো ভারতীয় লেখককে তুলনা করা যায় না। আর একটা অভাব কিন্তু আমি নিজে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম: দিমোস্থিনিস কিংবা সিসেরোর ভাষণের মতো কোনো ভাষণ কি কোনো যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে অলংকৃত করেছে? জনায় জনায় কোলাকুলি।

আমাদের পড়াশোনা এগিয়ে চলল, পড়লাম উত্তর রামচরিত ও রত্নাবলী, মেঘদূত ও ঋতুসংহার—আমাদের সংস্কৃত পুস্তকাগারে সাহিত্য নিদর্শন বলতে এ-কটিই ছিল সম্বল। অন্যান্য ক্লাসে একটু

ফাঁকি দিতাম, আর সেই চুরি-করা সময়ের ফাঁক-ফোকরকে কাজে লাগাতাম মনে মনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার প্রতিতুলনায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা ও সাহিত্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিষ্কাশনের নানারকম মজাদার খেলায়।

এমনি এক খেলার কথাই বলি।

সংস্কৃতের বিভিন্ন 'ন্যায়ের' একটি তালিকা হাতে এসেছিল, কিছু কিছু প্রবাদও ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে শিখে উঠছি। হঠাৎ একদিন মাথায় এল, ফরাসি প্রবাদ প্রবচনের পাশাপাশি এগুলোকে মিলিয়ে দেখলে কেমন হয় [তখন অবশ্য বাংলা জানতাম না; বাংলা ভাষা যে অঢেল প্রবাদ-প্রবচনে কত ঋদ্ধিমান, ফরাসির তুলনায় কত সরস ও সুন্দর—তা ছিল কল্পনার বাইরে] বলা বাহুল্য এমন অনেক ফরাসি প্রবাদ আছে যার কোনো সংস্কৃত প্রতিরূপ আমি পাইনি, যেমন ধরুন—

খেতে খেতে খিদে আসে; পিটতে পিটতে কামার হয়; সাপ মরে তো বিষও মরে; খিদের কান নেই; বিড়াল গেলে ইঁদুরে নাচে; ঠিমে বৃষ্টিতে ঝড় থামে; ভোরের বৃষ্টিতে যাত্রা আটকায় না;

বাতাস বীজ, ঝড় ফসল; এক বার, দশ আসে; যথা কাল তথা বিধি; ধরতে যাবে ধরা পড়বে; যৌবন যদি জানত, বার্ধক্য যদি পারত; টাকার আবার গন্ধাগন্ধ;

লক্ষ্য যে চায়, চায় সে উপায়; দূরে যেতে চাও ঘোড়াকে বাঁচাও; ওমলেট গড়াতে হলে ডিম ভাঙতে হয়; যত অসুখের তত ওষুধ; নেই খবর তো ভালো খবর, প্রথম পদক্ষেপই কষ্টের; অন্ধদের রাজ্যে

কানারাই রাজা; মরা সিংহের চেয়ে জ্যান্ত কুকুর ভালো; সাচ্চা মদের বিজ্ঞাপন লাগে না [বাংলায় আছে বটে 'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না']; নেকড়ে নেকড়েকে খায় না [বাংলায় নাকি আছে 'জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না']।

এমনি সব যোলো-আনা ফরাসিয়ানার মধ্যে বিচরণ করতে করতে প্রথম আলোক-বিন্দু দেখা দিল সাধুজোর : টেকোর চিরুনি!... সিন্ধুতীরবর্তী প্রপিতামহেরা একই কথা আরো মার্জিত ঢঙে বলেছিলেন: অন্ধদর্পণন্যায়।

সাহিত্যাঙ্গনে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতেরই জিৎ। ফরাসিতে বলে 'একই ছড়ির আঘাতে দুই আখরোট'; সংস্কৃতে 'আম্রসেকপিতৃতর্পণ'। অন্ধ ও পঙ্গু উভয়ে উভয়ের সাহায্যে দিব্যি চলতে পারে, ফরাসিতে সাদামাটাভাবে 'অন্ধ ও পঙ্গু' রূপেই প্রবাদটা চলে আসছে: সংস্কৃতে ব্যাপারটাকে আরো চিত্রধর্মী করে তোলা হল 'পঙ্গ্বন্ধবদন্ধরথের' সহাবস্থানে [অবশ্য, সংস্কৃতেও 'পঙ্গ্বন্ধ' আছেই]।

প্রবাদমালায় পশুপক্ষী

প্রতিটি ভাষার প্রবাদে পশু পাখির একটা বিশেষ স্থান আছে। সংস্কৃত 'গড্ডালিকা-প্রবাহ' ফরাসী চোখে নেকড়ের সার: 'উষ্ট্র লগুড়ন্যায়ের' ফরাসী প্রতিরূপ: ফোকলা সিংহ, আর 'অশ্বতরী গর্ভ-নিহিত অক্ষতবাতে'কে ফরাসীরা বলে থাকে 'মুর্গির দাঁত।'

কোনো কোনো প্রবাদে আবার শুধু ফরাসীতেই জন্তুর উল্লেখ। 'ভালুক মারার আগেই ভালুকের চামড়া বেচা' মানবিক রূপ নিয়েছে সংস্কৃতে 'অজাতপুত্রনামোৎকীর্তন' [বাংলায় গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল]। ভিন্ন দিয়েছ, বলদ পাবে' স্বল্পদানের বহুগুণিত প্রতিদানের এই আশাবাচক প্রতি-শ্রুতিটি সংস্কৃতে তণ্ডুলার্থী 'দত্ত্বৈকধা সহস্রগুণোমুপলভাতে'। নিষ্ফল প্রয়াস ফরাসীদের কাছে 'হাঁসের পিঠে জল', সংস্কৃতে একেই বলে 'ঊষর বৃষ্টি।' আর 'শনৈঃ শনৈঃ পর্বত উল্লংঘনের' ধৈর্যধীর পরিশ্রমবোধক বহুচালিত সংস্কৃত ধরতাই বুলিটি ফরাসীরা উপস্থাপিত করে বিহঙ্গ দৃষ্টান্তে 'পাখি অল্পে অল্পে নীড় গড়ে।'

এদিকে আবার 'বরমদ্যকপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ' [অর্থাৎ কিনা, কালকের ময়ূরের চেয়েও আজকের কপোত-ই প্রার্থনীয়। ফরাসীতে পুরোদস্তুর অমূর্ত : "দুই 'পারে পাবে'র চেয়ে এক 'এই নাও' শ্রেয়।" ইংরেজী রূপটি অবশ্য পাখির উল্লেখে সংস্কৃতানুসারী: ঝোপে দুটি পাখির চেয়ে হাতে একটি পাখিও ভালো।

সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

হুবহু অনুবাদ মেলা ভার, কিন্তু মানতে হবে কিছু সাদৃশ্য ভাবগ খুঁজে পাওয়া যায়, 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' আর 'যে কিছু বলে না, সে রাজি'; 'তপন্তং তাপেতন সংবধাতে' আর 'মিল যাদের তারা-ই মেলে', 'ফলেন পরিচীয়তে' আর 'শিল্পেই শিল্পীর বিচার'; 'চিন্তামণিং পরিত্যজ্য কাচমণি গ্রহণম্' আর 'ছায়ার জন্য কায়া ছাড়া'—বলার ভঙ্গিতে এরা বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ নয় কি?

'মরণাত্তরং ব্যাধি': মৃত্যুর চেয়ে ব্যাধিকেও শ্রেয় মানার এই মনোভাবকে ভাবিত করে ফরাসীরা যখন বলে 'ভালো মোকদ্দমার চেয়ে খারাপ মীমাংসাও ভালো', কিংবা 'দগ্ধগৃহমর্দ ইব স্বপ্ন'-এর নিশ্চিন্ত সুষুপ্তি যখন ফরাসীতে দুকান পেতে ঘুমোনোর ছবিতে ধরা পড়ে, অথবা 'সর্বঃ কার্যমদ্য কুর্বীত'-এর উপকারী উপদেশ যখন ফরাসী ভাষায় 'আজকের সাধ্য কালকের কৃত্য করে ফেলে রেখো না' উপদেশাকারে অভিন্নার হয়, তখন অনেক হয়তো মেলে না, কিন্তু পারস্পরিক সাধর্ম্য নিশ্চিত হওয়া যায়।

সংস্কৃত 'উপজীবীকানাং [illegible]' এর পাশাপাশি পড়ুন 'হাসপাতালই [illegible]' এই ফরাসী প্রবাদটি। মোটা তফাৎ এতটুকুই যতটা তফাৎ [illegible] তুলনাধ্যায়ের।

আর তা, যতটা দেখুন, সংস্কৃত যখন বলে 'সদৃশাৎ সদৃশজন্মঃ', ফরাসী তাকেই বলে 'যেমন বাপ তেমন বেটা'—আবার উল্টো কথাটিও বলে, 'কৃপণ পিতার অপব্যয়ী পুত্র'। 'অজ্ঞ [illegible] [illegible] বক্তো সাধনযোগাঃ'; ফরাসীতে [illegible] 'নিকেল দুটোর ভুবনপুরের কোঁক', [illegible] পরস্পরের বেলায় খুব সহজেই যথোচিত ঘোষণা করে প্রবাদে মুড়ে রাখে। আর ফরাসীতে ক্রোদেলের প্রসিদ্ধ উক্তি 'পরমেশ্বর বাঁকা রেখায় সোজা আঁকেন।'

বাইবেলে

বাইবেলে চাঁড়ও সংস্কৃত শ্লোকের সাথে কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ: 'নিরাময়স্য [illegible]'/ 'সুস্থ লোকের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই'; 'সর্বদা জলদর্শিনং ন পুনঃ পাদয়োর্বধঃ'/ 'ভাইয়ের চোখে কুটো দেখছ, নিজের চোখে কড়িকাঠ দেখছ না'; 'ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে'/ 'জাতির বিনাশের চেয়ে একজনের মৃত্যু শ্রেয়'; 'বালস্য প্রদীপকলিকা কীটস্যৈব নগরদাহঃ'/ 'কতটুকু অগ্নি কত বড় এক অরণ্যে জ্বালিয়ে দেয়।'

একদিন লাইব্রেরিতে প্রবাদ সংকলন খুঁজছিলাম, হঠাৎ দেখলাম—বাংলা ভাষার এক ব্যাকরণ...

(ক্রমশ

'পাপু'! বাপমা'র অতি আদরের ডাকনাম; পোশাকী নাম সুব্রত সরকার। দুটি চোখে তার রামধনুর মায়া, বুকে দুর্দমনীয় আশা, হাতে পেন্সিল ও কলমের যাদুকাঠি। প্রজাপতির মত সে চঞ্চল—খেলে বেড়ায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, সেই সঙ্গে লেখাপড়া করে। অথচ মাত্র ৮ বছর নয় মাসেই সেই পাপু তার বাপমা'র কোল শূন্য করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল! মাত্র কয়েকদিন আগেই সে মোটর গাড়ির দুর্ঘটনার একখানি ছবি এঁকে, নীচে লিখেছিল—পাপু! অদৃষ্টের পরিহাস, নিজের বাড়ির সম্মুখেই সেই মোটর দুর্ঘটনাতেই সে চিরদিনের মত চোখ বোজে। শোকগ্রস্ত পিতা নিখিল সরকার বললেন—কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ মারাত্মক কোনও চোট লাগেনি। হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলে বাড়ি যাবার জন্য বার বার কাকুতি জানায়। পরে সব শেষ হয়ে গেল—ব্রেন হেমারেজ! এবং সেই সঙ্গেই অকালে পরিসমাপ্তি ঘটল সুনিশ্চিত সম্ভাবনাময় একটি শিশু-প্রতিভার!

আকাশের বুকে স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল চাঁদ,

নীল চাঁদ শিল্পী : পাপু

শুভ্র আলোকচ্ছটায় চারিদিক ভরে গেছে, তিনটি ছোট নৌকা হেলেদুলে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছে, পুরোভাগে পতাকা উড়িয়ে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে...বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলি নতুন নয়, যে কোনও শিশু-চিত্রপ্রদর্শনীতে এ জাতীয় ছবি দেখা যাবে। তবে অ্যাকাডেমি আয়োজিত প্রদর্শনীতে পাপুর আঁকা যে সব ছবি ও স্ক্রিবলিং দেখা গেল সেগুলি ভিন্ন শ্রেণীর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও এগুলির মধ্য দিয়ে সমগ্র-ভাবে যেন পাপুর বিশেষ ও একান্ত মনোজগতের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাপু ছয় বছর বয়স থেকে ছবি আঁকতে শুরু করে এবং এখানে-ওখানে ছড়ানো ওর ছবির সংখ্যা হবে ৫০০-রও অধিক। তাদের মধ্য থেকে ৮০ খানি নির্বাচিত ছবি, তার আঁকা ছবি ও কবিতা সম্বলিত প্রকাশিত 'পাপুর বই' ও তার একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে রাখা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। পাপুর ছবি, কলম ও পেন্সিলে আঁকা—অধিকাংশই ডুড্লজাতীয়। তার রেখা সূক্ষ্ম ও অনেক ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ, ভাষা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট। মাত্র কয়েকটি টুকরো রেখা বা বিন্দুর সাহায্যে পাপু জটিল ও সমসাময়িক বিষয়বস্তুগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, রীতির দিক থেকেও এই শিশুশিল্পীর কাজে সমকালীন চেতনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষ করে নৃত্যরত দুটি মূর্তি ও সিঁদুর রঙের লাল ত্রিশূল-এর কোলাজে। 'স্বপ্ন' ছবিটির পরিকল্পনা ও বলিষ্ঠ রেখাটান দেখে বিস্মিত হতে হয়। বিভিন্ন ছবি দেখে মনে হয় সমকালীন পরিস্থিতি পাপুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং এটিকে সে মেনে নিয়েছিল। মিছিলের পর মিছিল চলেছে, ট্রাম বাস পুড়ছে, খেলার মাঠে গোলমাল শুরু হয়েছে, যাত্রীর আশায় রাস্তার পাশে সারি সারি রিক্শ দাঁড়িয়ে আছে বা ছোরা হাতে কোনও ডাকাত তেড়ে আসছে—এগুলির সবই যেন তার পরিচিত। তার সঙ্গে ছিল প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত শিশু-কবিমন ও ভগবানের ওপর অগাধ বিশ্বাস। নীল আকাশে চাঁদ দেখে সে মুগ্ধ হত (দি মুন অ্যান্ড ফ্লাওয়ারস), সংগীতের মূর্ছনা তার প্রাণে সাড়া জাগাত (অর্কেস্ট্রা—রবীন), আবার মহাকালীর বিচিত্র রূপ তাকে অভিভূত করত। পাপুর আঁকা কয়েকটি কালীমূর্তি অপূর্ব। 'পাপুর বই' প্রকাশ করে প্রকাশক সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং পাপুর আঁকা ছবি সকলকে দেখার সুযোগ দান করে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর পূজ্যপাদ ঋষভদেবের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে ইন্দু দুগার অঙ্কিত প্রাচীর চিত্র।
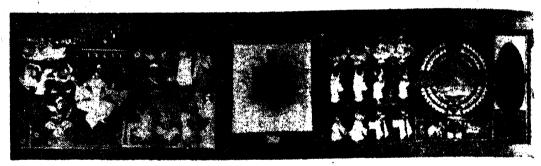
ভারতের অন্যান্য শহরে পর পর চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে তার স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হবে বলে আমার বিশ্বাস।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী বি আর পানেশর তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। গত কয়েক বছর বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যোগদান করে এই শিল্পী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্প-শিক্ষা না করলেও শিল্পের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ফলে তিনি স্থানীয় শিল্পীসমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করার পরে অবসর সময়টুকু তিনি নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চায় নিয়োজিত করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা তাঁর ২৩টি ছবি দেখা যায়।

পানেশরের সাম্প্রতিকতম রচনা দেখে বোঝা যায় যে, তিনি বিভিন্ন জলরঙ অঙ্কন-পদ্ধতিতে নানা পরীক্ষা করে গেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছেন। শিল্পীর রচনায় তিন শ্রেণীর নিদর্শন দেখা যায়—ইমপ্রেশানিস্টিক স্কেচ, স্টাডি ও বিমূর্ত এবং সমবিমূর্ত জাতীয় কাজ। প্রয়োজনীয় রঙে তুলি ভরে নিয়ে কাগজের ওপর সেই তুলিকাস্পর্শের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন ইমেজারীর সৃষ্টি করেছেন—যেমন প্রোসেশন ও পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে লস্ট বোটের উল্লেখ করা চলে। নীল, সবুজ ও কোনেনী রঙ সংমিশ্রণ দ্বারা শিল্পী সুন্দর একটি নিসর্গালোকের অবতারণা করেছেন। কয়েকটি ছবিতে শিল্পী ধ্বংসাবশেষ বা বিশেষ কোনও স্থানের বাসস্থান আঁকার চেষ্টা করেছেন। মুখ্যত স্টাডি জাতীয় হলেও কয়েক স্থলে স্বতঃপ্রণোদিত রূপায়ণের আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে ৫, ১৪ ও ২৩নং-এর নাম করা যায়, যদিও প্রথমোক্তটি কৃত্রিমতা-দোষে আড়ষ্ট। বিভিন্ন রঙ কম্পমান তুলি রেখা সাহায্যে ফুটিয়ে তুলে শিল্পী বিমূর্ত রচনা করেছেন—রীতির দিক থেকে দু'একটি মন্দ লাগে না। তবে কয়েক ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিকতা দোষ ধরা পড়ে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলে শিল্পী লাভবান হবেন। কয়েকটি কাজে রঙীন কাচের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। পাতলা রঙ ব্যবহার করে বা অনেক সময়ে ঢেলে দিয়ে শিল্পী রেখাবহুল কয়েকটি বিমূর্ত ইমেজারীর সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে সবুজ, নীল ও কালো রঙ প্রধান ১৫নং এ কয়েকটি কোনেনী ও হাল্কা সবুজ রঙবহুল মাকড়সার জাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বড়বাজারে জৈন সম্প্রদায়ের বিখ্যাত শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দিরে একটি সম্পূর্ণ রচিত প্রাচীরচিত্রের উদ্বোধন করা হয়। প্রাচীরচিত্রটি এঁকেছেন সুপরিচিত শিল্পী ইন্দু দুগার।

ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা [illegible] জন্য ইন্দু দুগার শিল্পজগতের এক শ্রেণীর কাছে বিশেষ [illegible]। ক্লাসিকধর্মী [illegible] তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মাতৃ জঠরে জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ, ধর্মপ্রচার এবং নির্বাণলাভ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী শিল্পী তিনটি প্রাচীরচিত্রের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। জৈন কল্পসূত্র অবলম্বনে রচিত সুদীর্ঘ প্রাচীরচিত্রখানি তিনটি প্যানেলে বিভক্ত। প্রথমটিতে ঋষভদেবের জন্মগ্রহণ, তাঁর মাতার স্বপ্নদর্শন ও নানা প্রতীক, সিংহাসন আরোহণ ও দীক্ষাগ্রহণ, দ্বিতীয়টিতে নির্বাণলাভ ও তৃতীয়টিতে [illegible] শিষ্যদের শিক্ষা ও উপদেশদান এবং ধর্মপ্রচার বিধৃত হয়েছে। সুদীর্ঘ প্রাচীরচিত্রটি অলঙ্কৃত উঁচু চৌপায়া মাধ্যমে আঁকা ও [illegible] অবকাশ, রঙ অনুলেপন ও প্রকাশভঙ্গিমাগুণে শিল্পী তিনটি প্যানেলের মধ্য দিয়েই ভগবান ঋষভদেবের পরম পবিত্র জীবনের প্রধান ঘটনাবলী রূপায়িত করেছেন। স্বভাবতই শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলা-রীতিতে প্রাচীরচিত্র পরিকল্পনা করেছেন ও এঁকেছেন এবং বিশেষ করে নির্বাণলাভের পর ঋষভদেবের ছবিতে তিনি পরম পবিত্রভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা জৈন মন্দিরে যাবেন, তাঁরা শিল্পীর আঁকা প্রাচীরচিত্রটি দেখে আনন্দলাভ করবেন।

পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস। —বি আর পানেশর

চিত্রপ্রিয়

ন্যাকামো

প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠশালার মাস্টার-মশাইদের দুরবস্থা, দেশ থেকে কেন নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না এই নিয়ে বিরাট বিরাট মীটিং হয়, বিস্তর চেল্লাচেল্লি হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয়। তারপর সারা বৎসর নিশ্চুপ।

এ যেন কঞ্জুস শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার মত। নিতান্ত না করলেই নয় বলে। তারপর সম্পূর্ণ একটি বৎসর কিপটে শ্বশুর নিশ্চিন্দি।

উঁহু, তুলনাটা ঠিক ঠিক মিলল না। শ্বশুর যতই হাড়ে [illegible] হোক না কেন, এবং জামাই যতই হতভাগা দুঃখী হোক না কেন, সে বেচারী অন্তত এক-বেলার মত পেট ভরে খেতে পায় এবং শুনেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একখানা কাপড়ও পায়। আমি সঠিক বলতে পারবো না কারণ আমি মুসলমানী বিয়ে করেছি। [illegible] সম্পর্কে [illegible] কাহিনী [illegible] এই কলকাতা শহরেই [illegible] পার্টির মত [illegible] একাধিক [illegible] শালা সম্পর্কে [illegible] আমি [illegible] গালাগালাজ করছি সে (১)—শব্দটি লেখাতে পাচ্ছেন, ব্যাটা সম্পর্কে আমার বড়কুটুম—শ্যালক) আমাকে জামাইষষ্ঠীর দিনে স্মরণ করে না। কারণ তার পিতা—আমার ঈশ্বর শ্বশুরে মহাশয় তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে যাওয়ার পর এই শ্যালকটি তার পিতার তাবৎ সব গ্রহণ করেছেন নৃত্য করতে করতে (সেতোর খাতিরে অনিচ্ছায় বলছি, দাতাকর্ণ শ্বশুরমশাই বিশেষ কিছু রেখে যান নি, এবং সামান্য যেটুকু ভদ্রাসন রঙপুরে রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও পার্টি-শনের ফলে শ্যালকের হস্তচ্যুত হয়। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে!!) কিন্তু পিতৃদেবের দায়দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গেছে। তাই সে (সম্পাদক মহাশয়, অপরাধ নেবেন না, প্রতিবারেই আমার গালগালাজ করতে ইচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার পত্রিকার সম্মান আছে, প্রতিষ্ঠা আছে আপনি এ-সব ছাপাবেন কি করে?—অন্যে আপনাকে এ-কদুপদেশ দেব না) জামাইষষ্ঠীর একমাস আগের থেকে এড়িয়ে চলে। হিন্দু কায়দা-কানুন আমি জানিনে, কিন্তু আমি যে অঞ্চলের মুসলমান সেখানে রীতি, শ্বশুর গত হওয়ার পরই তাঁর পুত্র জামাইয়ের শ্বশুর হয়ে যান। হয়তো হিন্দুদের ভিতর এ-রেওয়াজ নেই। আমি জানবো কি করে? কিন্তু আমাদের এই হিন্দুমুসলমান, ভারতীয় ঐক্যবিধান নিয়ে যখন সব্বাই মাথা ঘামাচ্ছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি কিঞ্চিৎ লেনদেন গিভ্-অ্যান্ড-টেক্ করা উচিত নয়?

এই দেখুন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় আমার দু তিনটি হিন্দু বোন আমাকে নেমন্তন্ন জানায়—'নেতন্তন্ন' কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমাকে তখন তারা ডাক দেয়—হক হিসেবে, অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ রাইট। আমি তখন বিশ, পচিশ টাকার সাড়ি নিয়ে যাই।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, ফিরোজ মিঞা বড্ডই ঘোর আত্মাভিমানী। সে নিমন্ত্রণ পায় তার তিন চার হিন্দু বোনদের কাছ থেকে। আমি বিলক্ষণ বুঝি, সেই সরলা হিন্দু কুমারীরা মনে মনে ভাবে, সব হিন্দু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরব করছে, আর এই ছোট্ট ভাইটি একা একা দিন গোঁয়াবে? তদুপরি একথাও তো সত্য, এই কুমারীদের কোনো কোনো হিন্দু ভাই মুসলমান ফিরোজের চেয়ে কোনো গুণে শ্রেষ্ঠতর নয়। আমার মনে পড়লো, ঐ ফিরোজই তার কোন এক দিদির জন্ম-

---

(১) আমার দু'টি অকৃত্রিম সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আমার [illegible] ভালোবাসেন তাঁদের কাছে অন্ততঃ একটি ঘটনার উল্লেখ। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ছোট একটি মহকুমায় অনারারি হাকিম। একদিন আদালত থেকে ফিরে আমায় বললেন, "সিতু, আজ আদালতে কি হয়েছিল জানিস? এক মুখ্য অন্যেক [illegible] বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছে, ঐ দোস্তটা নাকি তাকে সদর রাস্তায় 'শালা' বলে গালাগাল দিয়েছে। (এতদিন পরে আমার আর মনে নেই সেটা এব্যুজিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না ডিফেমেশন ছিল—লেখক)।" তার পর বাবা বললেন, আসামী পক্ষের মোক্তারের বক্তব্য, যাকে সে 'শালা' বলেছে সে সম্পর্কে সত্যিই তার শালা; অতএব কোনো অপরাধ হয় নি। বিপক্ষ কিন্তু বলছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আসামী যখন শালা বলেছে তখন মধুভরা সোহাগ-পোরা সে শালা বলেনি; বলেছে অপমান করার জন্য।" ইতিমধ্যে বাবার মগরিবের (সন্ধ্যার) নামাজের জন্য ওজুর জল এসে গিয়েছে। আমি তাই তড়াতাড়ি শুধালুম, "আপনি কি রায় দিলেন?" বাবা বললেন, "দুই পক্ষকে আদালত থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, মস্করা করার জায়গা পাওনি?"...আমার মনে এখন সন্দেহ জাগে, বাবার এই হুকুম ঠিক আইনসম্মত হয়েছিল কি না। তবে এ কথা জানি, দুই পক্ষই কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা ছিলেন রাশভারী, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ। আসামী ফরিয়াদী দোঁহাকার সবাইকে দেখেছেন উলঙ্গাবস্থায় আমাদেরই বাড়ির আঙিনায় খেলাধুলো করতে।

দিনে তার প্রিয় ফুল কেয়া আনতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে গোয়ালপাড়ার কেয়াবনের মধ্যিখানে গোখরো সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

অতএব বাবু ফিরোজ আমাকে বললেন, "আব্বু! আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে দিদিদের জন্য কিছু শাড়ি কিনতে হবে। আমি দালাল কোম্পানিতে যাচ্ছি।"

সর্বনাশ! দালাল কোম্পানি অকাতরে সব দেবে। অবশ্য, বাচ্চা ফিরোজ কেন, ওরা কাউকেই ঠকায় না। তবে কি না, আমি ওদেরকে একবার ঠকিয়েছি।

কত টাকার বিল এসেছিল, জানেন? ১৮০ টাকা!

*

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম। বুঝিয়ে বলি। এ-লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হলো আপনাদের সঙ্গে দু দণ্ড রসালাপ করি, একটু খানি জমজমাট আড্ডা জমাই। অবশ্য সম্পাদকমশাই যদি এ-রকম হালকামী পছন্দ না করেন, তবে সেটি তিনি ছাপবেন না। ফাঁসীর দড়ি তো তাঁর হাতেই! তবে কি না সেটা একটা রেকর্ড ব্রেক করা হবে। কারণ গত কুড়িটি বচ্ছর ধরে তিনি আমার কোনো লেখা "পত্রপাঠ" ফেরত পাঠাননি।

ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই সেই রুদ্ররসে।

*

আমাকে যদি কেউ শুধোয়, আমি কোন্ জিনিসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি তবে নির্ভয়ে বলবো,

শিক্ষা।

কোন্ শিক্ষা?

প্রাইমারি স্কুল, অর্থাৎ পাঠশালা।

তারপর?

হাইস্কুল। তারপর? কলেজ, বি এ, এম এ। তারপর? পি এচ ডি। আমার মনে সবচেয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়, যখন ডক্টরেট করার জন্য কেউ আমার কাছে এসে সাহায্য চায়।

পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি এ-স্থলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মজীবন প্রকাশ করি।

বঙ্গসাহিত্যে আমার যেটুকু সামান্য লাস্ট বেঞ্চের আসন জুটেছে (অর্থাৎ আমার প্রথম পুস্তক "দেশে বিদেশে" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে) আমি একটি অতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, মরহুম হুমায়ূন কবীর সাহেবের "চতুরঙ্গে" ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটির নাম "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম, যে যাই বলুক না কেন, আখেরে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাঙলাই হবে। কিন্তু এহ বাহ্য। আমি তখন প্রাইমারি এডুকেশনের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলি:

"আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা মাঝে মধ্যে থাকে, কিন্তু সে অতি সামান্য, নগণ্য। কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে জীবন যাপন করেন সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করার মত ভাষা ও শৈলী আমার নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে এবং অনেক স্থলেই উত্তম বিদ্যার্জন করেছেন, যেটা আমার শহরে বসে' সঠিক বুঝিনে—গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় অনেক বেশী। মহাজনের রূঢ় বাক্য, জমিদার জোতদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়মনে আঘাত দেয় ঢের ঢের বেশী। এবং উচ্চ-শিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চ-শিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ট্র্যাজেডি। "ইত্তেফাক" "আজাদ" (পশ্চিমবঙ্গের বেলায় বলবো, "আনন্দবাজার", "দেশ"—এটা এখানে জুড়ে দিচ্ছি—লেখক) মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে, যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহু ক্ষেত্রে নিরাময় হয়, হয়তো তার সচিত্র আশাবাদী বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর অর্থাভাবে চিকিৎসাভাবে পুত্র অথবা কন্যা যখন যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমার জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছা যায়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ অল্প'। পাঠশালার গুরুমশাইয়ের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না, স্বাস্থ্যনিবাস (সেনেটোরিয়াম) সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মা-রোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলে মেনে নিয়ে নিজকে সান্ত্বনা দিতে পারে। হতভাগা পণ্ডিত পারে না।"

*

কিন্তু প্রশ্ন, প্রবন্ধের গোড়াতেই জামাই-ষষ্ঠীর কথা তুলেছিলুম কেন?

শুনেছি, সঠিক বলতে পারবো না, গাঁয়ের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে বছরে একদিন শহরে এনে ঐ যে বিরাট বিরাট সভা করা হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয় তখন জামাইষষ্ঠীর দিনের মত তাদেরকে এক পেট খেতেও দেওয়া হয় না।

এবং তৎপর ৩৬৪ দিনের গোরস্তানের নীরবতা।

*

এই শেষ নয়। দাঁড়ান না। সুযোগ পেলে আরেকদিন আরেক হাত আমি নেবই নেব।

স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু মেনে, সাক্ষী মেনে॥

অল আকসা

৪৬ সংখ্যা দেশ-এ 'পঞ্চতন্ত্র' শীর্ষক 'অল-মসজিদ-উল্-আক্সা' প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের পবিত্র কোরআনের ১৭ নম্বর সুরার ১ নম্বর আয়াতটির কোটেশন দিয়ে তোলা বাংলা অনুবাদটি পড়ে বিস্মিত হলাম। এই অনুবাদ ঠিক নয়। তাঁর উদ্ধৃতি:

"সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাতেই তাঁর অনুচর সহ মসজিদ-উল্-হরম্ (অর্থাৎ মক্কার কা'বা থেকে) একই রাতে মসজিদ-উল্-আক্সা পর্যন্ত (জেরুজালেম) ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।" [১৭:১]

... এই উদ্ধৃতি কার? এক রাতেই—একই রাতে দুবার কেন? আর অনুচর সহ কোথা থেকে এলো? ... আমরা পূত করেছি, 'আমরা তাঁকে 'আমাদের'—এসব শব্দের আল্লার ভাষায় পবিত্র কোরআনে কোথাও আছে কি? আল্লার বহুবচন আদৌ হতে না। এসব গুরুতর ব্যাপার ডক্টর আলীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির চোখ এড়িয়ে গেল কেমন করে? আর এমন কাঁচা অনুবাদ তিনি গ্রহণ করলেনই বা কিভাবে? অনুবাদটি হবে এইরকম:

"মহিমা তাঁর যিনি তাঁর দাসকে এক রাতে নিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ (মক্কা) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (জেরুজালেমে), যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন আমি তাকে দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।" [১৭:১] অনুবাদ: কাজী আবদুল ওদুদ।

অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: কুরআন শরীফে জিবরাঈলের উল্লেখ নেই। এটি ঠিক নয়। জিব্রিল শব্দটির উল্লেখ নেই কিন্তু জিব্রিলের উল্লেখ নিশ্চয়ই আছে। ৫৩ নম্বর 'সুরা আন্-নজ্‌ম' (নক্ষত্র) পাঠ করুন:

'যা (প্রত্যাদেশ) তাঁকে (মোহম্মদকে) শিখিয়েছে এক প্রবল শক্তির অধিকারী, (জিব্রিল)—[৫৩:৫]

'একজন বীর্যবন্ত, তারপর সে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়েছিল', [৫৩:৬]

'তারপর সে ছিল চক্রবালের উচ্চতম স্থানে।' [৫৩:৭]

'তারপর সে কাছে এসেছিল আর অবতরণ করেছিল' [৫৩:৮]

'যে পর্যন্ত না সে ছিল দুই ধনুক দূরে অথবা তার চাইতে কাছে, [৫৩:৯]

'আর তিনি প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন তাঁর দাসকে যা প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন।' [৫৩:১০]

'হৃদয় মিথ্যা বলে নি যা তা দেখেছিল (সে সম্বন্ধে), [৫৩:১১]

'তবে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছিল সে সম্বন্ধে?' [৫৩:১২]

... ... অনুবাদ: কাজী আবদুল ওদুদ

ডঃ আলী সুলেমানের 'মন্দির' বলেছেন। মসজিদ বলতে বাধা কি ছিল? 'কুরআন বেদ-এর মতো শ্রুতি এবং হাদিস স্মৃতি-জাতীয়' এই তুলনা না দিয়ে বলা যেত 'কোরআন' আল্লার বাণী যা হজরত মোহম্মদের কাছে স্বর্গীয় দূত জিব্রিল এনেছিল এবং 'হাদিস' তা-ই যা হজরত নিজে বলেছেন। এতে অমুসলমান পাঠকদের বুঝতে আদৌ কষ্ট হত না। তবু আলী সাহেবকে ধন্যবাদ যে, তিনি আল্-আক্সা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনেক কিছু আমাদের জানিয়েছেন।

আব্দুল জব্বার

হিজলের তৃণভূমি

৪৭ সংখ্যা দেশের 'বাংলার চালচিত্র' ফিচারে জনাব অবদুল জব্বার 'হিজলের অবাধ তৃণভূমি' বাক্যটি প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করেছেন। প্রথমে স্বীকার করা ভালো, বাক্যটি এই বেচারার কলমে ইতস্তত লেখা হয়েছে এবং খুব প্রিয় বাক্যও বটে। 'হিজল মানে তৃণ নয়' সেটা অনেকেই জানেন। হয়ত 'তৃণ মানে ঘাস' তা কারুর জানা ছিল না। এ গুরুমেশাইগিরির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে জব্বার সাহেব একটু ভুল করেছেন। 'হিজল' শব্দের আরেকটি ব্যবহার আছে। নদীর অববাহিকার নীচু বা নাবাল মাঠকেও হিজল বলে। মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় দ্বারকা নদীর অববাহিকায় বিস্তীর্ণ নাবাল এলাকার নাম হিজল মৌজা। কিছুকাল আগে হিজল এলাকা একটি পঞ্চায়েতী 'অঞ্চল' হিসেবে সরকারী নথিভুক্ত হয়েছে এবং তার যথরীতি একজন অঞ্চলপ্রধানও নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিনও আনন্দ-বাজারে 'কান্দী মহকুমার হিজলের গ্রামে সংঘর্ষ' শীর্ষক খবর বেরিয়েছিল এবং এ অধম ওই পত্রিকাতেই সে বিষয়ে সামান্য ফিচার লিখেছিল। শুধু কান্দী মহকুমা কেন, বাংলা দেশের বহু অঞ্চলে নদীর অববাহিকার নাবাল মাঠ—যা সহজেই জলে ডুবে যায়, তাকে হিজল বলে। কবি জীবনানন্দ দাশও কবিতায় 'দূরের

হিজলে' কথাটি ব্যবহার করেছেন একই অর্থে। যে হিজলের কথা মনে রেখে আমি 'হিজলের অবাধ তৃণভূমি' বাক্যটি ব্যবহার করেছিলাম, তা একান্ত বাস্তব। তবে এখন সেইসব হিজলগুলো বাঁধ বা ঘের দিয়ে বন্যামুক্ত করা হয়েছে—সে তৃণভূমিও এখন অনেকটা মুছে গেছে, সেখানে জেগেছে ফসলের মাঠ। এবং এ সবই বাস্তব ঘটনা; কাল্পনিক নয়। তবে হিজলে প্রচুর হিজল-গাছ জন্মায়। হিজল ফুলের মালা গাঁথা সম্ভব না হলেও পুরনো গানে তার মালার দেখা মেলে। মোট কথা 'হিজল' শব্দটার একটা রোমান্টিক ব্যাপার আছে। পাড়াগাঁয়ে বেপরোয়া দুরন্ত মেয়েকে মা-মাসীরা গাল দেন 'হিজলকন্যে' বলে।

শুধু একটা ব্যাপারে ধাঁধা লাগে। জব্বার সাহেব ফিচারটি ভালোই লিখছেন। কিন্তু লিখতে লিখতে দুম্ করে সাহিত্য-সাহিত্যিক নিয়ে অনাবশ্যক বাচালতা করেন কেন? শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে কিছুকাল আগে তাঁর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য কানে বেজেছিল। শুধু বাংলার চন্দ্রবোড়া সাপ নয়, সব অঞ্চলের চন্দ্রবোড়াই ডিম পেড়ে শিস্ দিতে পারে। তা ছাড়া চন্দ্রবোড়ার বাঁশে চড়ে বসার মধ্যে অবাস্তব কী আছে? এটা লেখকের বাক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে। আমরা তো বটেই—এমন কি, যাদের সাপ নিয়ে কারবার, তারা কে কতবার চন্দ্রবোড়া সাপের বাঁশে চড়ে বসা নিয়ে গবেষণা করে দেখেছে? জীবজগতে সবই সম্ভব। তা ছাড়া বাংলা দেশটাও অনেক বড়। কেবল বজবজ অঞ্চল নিয়ে বাংলা দেশ নয়। এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র একটি বাস্তব চন্দ্রবোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে নেই—সে সাপটি কাহারকুলের প্রাগৈতিহাসিক কালের বহমান অন্ধকার সংস্কারের জীবন্ত ও জান্তব স্রোতধারা—সেটি একটি প্রতীক। নতুন কাল তার উৎসকে হনন করতে চাইল—সেই লড়াই নিয়ে লেখা হয়েছে উপন্যাসটি। কাজেই বাস্তবে চন্দ্রবোড়া কী করে না করে, পাঠক হিসেবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না। আমরা একটা ভয়ঙ্কর প্রতীককে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তার তীব্র শিসধ্বনি শুনে ভয় পেয়েছিলাম।

'বাংলার চালচিত্রে পাড়াগাঁয়ের অনেক ইনফরমেশন জব্বার সাহেব রাখছেন। আমরা স্বীকার করছি, তাঁর রচনাটি ভালো। কিন্তু অতীতে কারো প্রতি ভদ্রতাবোধ বর্জিত গ্রাম্য মূর্খামির চেষ্টা তোমার পর আধ লাইন লেখায় বোঝা গেল তুমি আদৌ জানো না গ্রামবাংলাকে। ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ—বিশেষ করে সম্বোধন পদটি কবিয়াল ও কবির লড়াইয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উপদেশ দেবার সাধ্য নেই। তবে আশা করছি, জব্বার সাহেব ভালো বোঝেন যে, সাহিত্য আর ইনফরমেশন এক নয়। কত রকম বাঁশ আছে, কত রকম ধান ইত্যাদি না জেনেও যাঁরা 'ধানকাটা হল সারা' বা 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' লিখেছেন, তাঁরা বাংলা সাহিত্যেরই শিশু-পুরুষ; লক্ষণ বাগ বা আবদুল জব্বার কিংবা এ অভাজন পত্রলেখক কোথায় আছেন? একজন ডিহোর বা ডোম যেমন অনেক বাঁশের খবর রাখে, তেমনি জানে কাটারি তুলে কেমন করে কোপ দিতে হয় যাতে হাত না কাটে। কিন্তু জব্বার সাহেব কি তাঁর কলমের গতি সম্পর্কে সচেতন আছেন?

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা নিবেদন করছি। বাংলা সাহিত্যের এ-যাবৎকাল স্মরণীয় বরণীয় সৃষ্টিগুলি প্রধানত গ্রামের পটভূমিকায় লেখা। এবং সেই স্রষ্টাদের আমরা সিংহের আসনে রেখেছি। তাঁরা হয়ত বাঁশ-ধান-মাছের খুঁটিনাটি তথ্য জানতেন না—কিন্তু যা না জানলে বাংলা সাহিত্য হয় না অর্থাৎ বাঙালী মানুষের ব্যক্তিসত্তা, সেটাকে বিলক্ষণ জানতেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশী যে একজন ডাক্তার, ওষুধ বা রোগের খুঁটিনাটি তথ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় না জানালেও আমরা তাকে স্বীকার করেছি। শহরের একজন

কেরানী কি সেলসম্যানও বিস্তর তথ্যে জব্বার সাহেবকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। কাজেই, প্রবীণ বাঙালী সাহিত্যিককে 'একমুঠো করে ধান নিয়ে দেখিয়ে শুধোও, এটা কি ধান বলো তো হে বাপু—বাপু তো চোখে সর্ষের ফুল দেখবেন'—এ মন্তব্য এক অর্বাচীন তামাশা! কিছু না জানলে তো চলেই না, নিশ্চয় জানা দরকার সাহিত্যিকের। কিন্তু সেটাই সব নয়। তা ছাড়া বর্তমান সময়ে সাহিত্যের দৃষ্টি শুকনো ঝরা ধানে নয়, জীবন্ত ধানগাছের গভীরে—তার দুর্গম হৃদয়ে। মানুষের পেশাগত খুঁটিনাটি বিস্তর জানা হয়ে গেছে, দেখা হয়ে গেছে তিলাতিল বহিরঙ্গ, অজ্ঞ সাহিত্য ডুবেছে ব্যক্তিমানসের জটিল গভীরতায়—তা সে শহরের মানুষ হোক বা গ্রামের। গ্রাম বলতেই কেন ধান-বাঁশ-মাছ হুড়মুড় করে আসবে? প্রকৃতি জীবজগৎ মানুষ ইতিহাস সময়: এই তো সাহিত্যের বিষয়! গ্রামকে পটভূমি করে যে মহারথীরা লিখেছেন, তাঁরা এই মূল বিষয় নিয়ে লিখেই আমাদের নমস্য পুরুষ হয়েছেন। জব্বার সাহেব লক্ষণ ব্যাধের মুখ দিয়ে তাঁদের সবাই 'কচু লেখে' বলিয়ে ছেড়েছেন। এটা অশোভন বাড়াবাড়ি মনে করি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, ওঁরা যখন কচুর কারবারী, জব্বার সাহেব তখন ওঁদের দেখাদেখি শেষ অবধি এতকাল পরিত্যক্ত ও অলক্ষ্যলালিত বন জঙ্গলের বুনো কচুর কারবারে মেতে উঠেছেন যেন। এই শেষোক্ত প্রকার কচু অভক্ষ্য, কারণ গলা চুলকোয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

হিন্দীর দৃষ্টিতে বঙ্গদেশ

বাংলাদেশ ও বাঙালীর প্রতি হিন্দী প্রকাশকদের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল, দিল্লীর 'রাজপাল' কোম্পানীর প্রকাশিত 'কী সুন্দর আমাদের এই দেশ' নামক পুস্তকে।

ঐ কোম্পানীর মূল বই, ভগবৎশরণ উপাধ্যায় লিখিত 'কিতনা সুন্দর দেশ হমারা' থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন হংসকুমার তেওয়ারী, এবং ঐ কোম্পানীই বইটি বাংলায় প্রকাশ করেছেন। বইটি বাংলাদেশেরই এক সরকারী গ্রন্থাগারে পেয়েছি। ছাপা, ছবি এবং প্রচার সবই ভালো। শনৈঃ শনৈঃ তাঁরা কত দূর অগ্রসর হচ্ছেন, তারও প্রমাণ এতে মিলবে।

বইটিতে ভারতের নানা প্রদেশের গৌরবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের। আসাম ও বাংলা নিতান্ত অবহেলিত। সমস্ত বইটিতে বাংলাদেশের কোনও যুগের কোনও

মানুষের পরিচয় নেই। বাংলার কোনও শিল্প সংস্কৃতি ধর্মের কথাও নয়।

এভারেস্ট বিজেতা তেনজিং-এর নাম বলা হয়েছে 'তেন সিংহ'। বলা হয়েছে—"কোর্তা আচকান আর পায়জামা—এই পোষাকটি রাজপুত দরবারেরই দান। আজ সেই হল আমাদের জাতীয় পোষাক।" (পৃঃ ২৬)। রবীন্দ্রনাথের 'হেথায় আর্য' হেথা অনার্য' ইত্যাদি কয়েকটি লাইন একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম কোথাও নেই। বাংলাদেশ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা হয়েছে—"বিহারের আগে বাংলাদেশ। কলিকাতা তার রাজধানী। ভারতের সবচেয়ে বড় শহর কলিকাতা। পশ্চিমের মেয়েরা বাংলাদেশকে বরাবর ভয় করত। বলত, পূবের দেশ বাঙ্গালা। তাদের বিশ্বাস যে সে দেশের মেয়েরা যাদু জানে। আজও অনেক লোকগীতিতে শোনা যায় যে মেয়েরা নিজের স্বামীকে সাবধান করে দিচ্ছে—দেখ, যেন বাংলাদেশে চলে যেও না। সেখানকার মেয়েরা যাদু জানে। ভেড়া করে রাখবে।"—(পৃঃ ৩০)।

এই বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য না করে, বাংলার সুধীসমাজের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম মাত্র। এর প্রতিকার করার চেষ্টা উচিত কি না, এবং কীভাবে করণীয়, তা তাঁরাই বলুন।

মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
কলিকাতা-১৯

অদূরের দিল্লী

৬ই সেপ্টেম্বর "দেশ" পত্রিকায় "দরবেশ" লিখিত "অদূরের দিল্লী" শীর্ষক কলমে প্রকাশিত দুইটি নিবন্ধের ওপর 'জনৈকা অধ্যাপিকা'র মন্তব্য পড়লাম। মাননীয়া অধ্যাপিকা অনেক মন্তব্য করেছেন, যার সংগে নীতিগতভাবে আমার কোন বিরোধ নেই। তবে তিনি "দরবেশ"কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করলেন কেন বোঝা গেল না। সমাজের ভাল জিনিস রিপোর্ট করা উচিত না সমাজের খারাপ জিনিস রিপোর্ট করা উচিত এ নিয়ে তর্ক লেগেই আছে। তবে দেখা যায় যে সকল লেখক সমাজের ভাল জিনিস নিয়ে লেখেন তাঁদের লেখা কেউ পড়েন না এবং যে সকল পত্রিকা serious বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সেগুলো উপযুক্ত জন-সমর্থনের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকা এবং ইংলনডে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি পত্রপত্রিকা বন্ধ হয়েছে তাদের নাম পড়লেই এ বক্তব্যের যথার্থ্য সম্পর্কেও সন্দেহ থাকবে না। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। অস্বাভাবিকতার প্রতি জনমানসের এই ঝোঁকের কারণ কি তা মনে বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। তবে আমি এই সত্যটির প্রতি মাননীয়া অধ্যাপিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সুতরাং "দরবেশ" যদি দিল্লীর অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে আলোকপাত করে থাকেন। তবে তাঁর "পাত্তিবিধি" সম্পর্কে কটাক্ষ করার কোন কারণ থাকে না। তা ছাড়া যদি ব্যক্তিগত জীবনে কে কি করেন সেই মাপকাঠি দিয়ে সাংবাদিক অধ্যাপক, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী এবং রাজনীতি-বিদদের বিচার করা হয় তবে তাঁদের ক'জন তাঁদের নিজ নিজ পদে বহাল থাকতে পারবেন? এই পার্লামেন্টেই একজন অধ্যাপক

[illegible] বাড়িয়ে টাকা দিয়েছেন—এরা পড়েও তার [illegible] হয় নি—দু'জন অধ্যাপক ছাত্রদের [illegible] ফেল করিয়ে দিয়েছেন তাদের [illegible] শাস্তি হয়নি; একজন ভাইস্-চ্যান্সেলার তাঁর নিজেরই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন—আর একজন অধ্যাপক শুধু তাঁর আত্মীয়দেরই কাজ দিয়েছেন; আরও একজন অধ্যাপক মহিলা ছাত্রদের অন্যায়ভাবে নির্যাতিত করেছেন; আরও একজন অধ্যাপকের জুলুমের বিরুদ্ধে একটি মহিলা ছাত্রী hostel-এর ছাত্রীরা অনশন ধর্মঘট করেন—এরকম আরও কত কি! বলা বাহুল্য এত সব ব্যক্তিগত ত্রুটি সত্ত্বেও এঁরা সকলে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন।

বিচার্য বিষয় "দরবেশ" যা লিখেছেন তা সত্য কিনা। আমি দিল্লীতে থাকি না। তাই দিল্লীর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে অনুচিত। তবে অনেক দেখে শুনে এটুকু বোধ হয় বলতে পারি যে, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কি করে তা অধ্যাপকদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখানকার কোন একটি মহিলা কলেজের কয়েকটি ছাত্রী নিয়মিত কোন একটি হোটেলে যেত—কয়েকজন বহিরাগতের সাহচর্য করার জন্য। হঠাৎ খবরটি ফাঁস হয়ে শহরময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার পূর্বে না কলেজের অধ্যক্ষা, না অভিভাবকগণ এ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিলেন! সুতরাং মাননীয়া অধ্যাপিকার জ্ঞানবহির্ভূত বলেই যে কোন ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক তা নাও হতে পারে।

আমাদের অনেকের মধ্যে এমন একটা মনোভাব রয়েছে যে, পাপকে না দেখলেই পাপ থাকবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এ অপরিমেয় ক্ষতিকারক। কারণ দেখা এবং না দেখার সঙ্গে পাপের অস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নেই। বরং অন্যায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তাকে উৎখাতের চেষ্টা করলেই হয়তো সমাজের আংশিক কল্যাণ হতে পারে। মাননীয়া অধ্যাপিকা মহাশয়ার সঙ্গে আমি একমত যে, ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই পাপ এবং নেশা-মুক্ত। কিন্তু সমাজের উপর ছাপ পাড়ে যারা সক্রিয় তাদের। নির্বিরোধী এবং নির্দোষ ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই নিষ্ক্রিয়। কাজেই মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতিকারী ছাত্রছাত্রী সহজেই তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে।

মাননীয়া অধ্যাপিকার সঙ্গে আমি একমত যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদপত্রগুলিতে যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল। কিন্তু এখানেও বিবর্তনের অমোঘ বিধান অনুযায়ী আমরা ক্রমেই বহির্মুখী হচ্ছি আমাদের জীবনে privacy ও তাই কমছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৃটিশ রাণীর [illegible] সম্ভাবনা-সম্ভব না হওয়ার মত নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘটনাও বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়। পত্নী যখন সংসার ছেড়ে চলে যান স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তখন তা খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা হউক, বা তা নিতান্ত [illegible] ঘটনা হলেই, [illegible] malice [illegible] থাকতে পারে। [illegible] কোন factual error আছে কি না আমি বলতে পারব না। [illegible] সংশোধন হওয়া উচিত [illegible] [illegible] "দরবেশ" [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনী খাড়া করেছেন।

সুভাষচন্দ্র সরকার
পাটনা-৩

॥ ২ ॥

'অন্দরের দিল্লী'র লেখক দরবেশকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁর নির্ভীক সমালোচনার জন্য। 'আলোচনা' বিভাগে জনৈক অধ্যাপিকার পত্রের প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস, দরবেশ যেসব 'তথাকথিত ভুল ও কুৎসা' রটনা করেছেন তার জবাব দরবেশই দেবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, পত্রলেখিকা তাঁর এই পত্রে 'দেশে'র মতো পত্রিকার কিছুটা মর্যাদা-ক্ষুণ্ণ করেছেন। কারণ, 'দেশে'র মতো একটি

প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় ভিত্তিহীন কোন তথ্য প্রকাশ নিশ্চয়ই হয় না এবং এই পত্রিকা কোন সস্তা বাহবা কুড়ানোর মাধ্যম নয়। অপ্রিয় সত্যকে সহ্য করা যায় না, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা যায় কি?

'দেশে'র আমি নিয়মিত পাঠক। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি পরবর্তী সংখ্যার জন্য। রাজধানীর যেসব বাঙালী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা দরবেশের লেখা পড়ার সময় পান না তাঁরা নিশ্চয় আদপেই 'দেশ' পড়ারই সময় পান না।

পত্রলেখিকার অবগত্যর্থে জানাই যে, শ্রীমতী কল্পনা নাইডুর অন্তর্ধানের খবর আমরা কলকাতায় অনেক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় দেখেছি। ব্লিৎস পত্রিকায় (যথাযথ সংখ্যাটির উল্লেখ করতে পারলাম না, সেজন্য দুঃখিত) শ্রীমতী নাইডুর ছবি ও তাঁর পত্রের চিঠিখানি দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল।

ইলা চৌধুরী
বিজ্ঞান কলেজ (উদ্ভিদ বিভাগ)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার চালচিত্র

দেশ পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে 'বাংলার চালচিত্র'র অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্পাদক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই প্রথমে। আর লেখককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিবাদন।

আমাদের জনজীবনের প্রায় উপেক্ষিত বহু সম্প্রদায়ের যে অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র লেখক যেরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখেছেন এবং লিখছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই সব লোক যারা "চিরকাল টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল" আর "মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পকা ধান কাটে"—এদের সম্বন্ধে আমরা জানিই বা কতটুকু। এদের সঙ্গে আমাদের নিত্য সাক্ষাৎ, কিন্তু আন্তরিক পরিচয়ের লেশটুকুও নেই। লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি লাভে, হৃদয়ের প্রসারতায় সাহায্য করছেন। জীবনকে ঘিরে যে সাহিত্য তিনি লিখে চলেছেন, তাতে রূপ, রস, গন্ধ কোন কিছুরই অভাব নেই। নির্মল হাস্যরসের পাশেই করুণ অশ্রুজলের রেখা। এর মধ্যে কোন অসত্য নেই—দিবালোকের মতোই তা উদ্ভাসিত—তাই গ্রামবাংলার এই রূপ আমাদের আপ্লুত করে নতুন রূপে, নতুন আনন্দে। আমাদের সব সাহিত্য যখন শহরাশ্রয়ী হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত মানবের চিন্তার সমস্যার যন্ত্রণার বিবরণে আকীর্ণ হয়ে পড়ছে, সেই সময় সকল শ্যামল বাংলার মাটির মানুষদের যে সুনিপুণ ছবি পেলাম লেখকের ভাষায় তা ভাবিত করে মনকে। আর যা সবচেয়ে করুণ বোধ হলো তা বিগত কিশে ভাদ্র সংখ্যার চালচিত্রটি। সমাজের বোধ করি সবচেয়ে অবহেলিত এবং ঘৃণিত এই বহুরূপীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি একটুও পাল্টাবে না এই রচনাটি পড়বার পরও? নির্মম অথচ মর্মান্তিক এ কাহিনী আজকের নয়, বর্তমানের এবং হয়ত ভবিষ্যতেরও। আশা করব নিছক অদৃষ্টের পরিহাসে যারা আজ এরকমভাবে অপাংক্তেয় সমাজে তাদের জন্য আমাদের অন্য ধরণের

অনুভূতি জাগুক, চিন্তাধারা আরো স্বচ্ছ হোক,—[illegible] আরমনের বড়ো ছেলে পাথর [illegible] অমৃতের সন্ধানে ছুটে চলেছেন, সে অমৃত তিনি বিতরণ করে চলুন পাঠকদের—

প্রণব চক্রবর্তী
বাঁওতালদি, পুরুলিয়া

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকায় আবদুল জব্বারের 'বাংলার চালচিত্র' পড়ে খুবই ভালো লাগে। জব্বার সাহেব তাঁর প্রতিটি রচনায় গ্রামীণ বাংলার সত্য, শিব আর সুন্দরের বৈচিত্র্যমাখা যে ছবি আঁকেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

গত সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় (২০শে ভাদ্র) 'বৃহন্নলা সংবাদ' আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। ঝুপো, ময়না, বাঁশির মুখে এমন সংলাপ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চরিত্র বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

"আমাদের মন্ত্রী নেই, দল নেই, সমাজ নেই, সংসার নেই, বাপ নেই, মা নেই, স্বামী নেই, বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আমরা হিজড়ে।...কিন্তু আমাদের পেট আছে, খিদে আছে, রোগ আছে, তাপ আছে, বাসনা-কামনা আছে।" ঝুপো, বাঁশি, ময়না এদের জীবনের ট্র্যাজেডি যেন অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর খেয়াল। ব্যক্তিজীবনের এই নিদারুণ অসহায়তা দেখে সহানুভূতিতে আমাদের মন ভরে ওঠে—তাদের কাজকে বিচার করতে ইচ্ছে হয় না। বেঁচে থাকবার জন্যে তাদের নিজেদের এই বড় নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা [illegible] কাছে মনুষ্য ভগবানেরই আশীর্বাদ বলে মনে হয়।

লক্ষ যুগের হাসিকান্না আর সুখ-দুঃখের সঙ্গীতে গাঁথা এই পৃথিবীর মানুষের জীবনে কত বৈচিত্র্য কত [illegible], কত শ্রেণীবিন্যাস। মানুষ চায় [illegible] মধ্যে [illegible] অসীমের সুর। জীবনে যা পাওয়া [illegible] তাই সে খুঁজে ফেরে।

ঝুপো, বাঁশি, ময়নার জীবন [illegible] বেদনা, বিভূতির বিশ্বাসের যে [illegible] আমাদের সমাজে [illegible] ধরার জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। [illegible] সাহিত্যের মুক্তা [illegible] ও [illegible] আছে তা নিয়ে [illegible] চলবেই তর্ক বচসা। কিন্তু [illegible] কালের লেখকদের মধ্যে [illegible] জীবনপ্রবাহের [illegible]। আশা করা অসংগত নয়।

পার্থসারথি [illegible]
[illegible]

সংবাদভাষ্য ও [illegible]

[illegible] সংবাদভাষ্য ও [illegible] আলোচনা করে [illegible] নিরপেক্ষ বক্তব্য [illegible] করলেও সংবাদভাষ্যে [illegible] কোনো বক্তব্য রাখেন নি। [illegible] সচেতন তিনটি উদ্ধৃতি পাঠকদের উপর [illegible] দিয়েছেন। তাই সংবাদভাষ্য [illegible] অমিতাভবাবুর অভিযোগ অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ-প্রসূত বলেই মনে হয়।

সংবাদভাষ্যের মতই দৃশ্যপটকেও তিনি সত্যের সাথে বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই এবং আজেবাজে কথায় ভর্তি' বলে অভিযোগ তুলেছেন। কোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তি নিশ্চয়ই এরূপ মন্তব্য করার আগে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন। অমিতাভবাবু সে চেষ্টা

করেন নি হয়ত সম্ভব নয় বলেই। উপরন্তু তিনি নবারুণবাবু এবং রূপদর্শীর উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়ে অন্যায় ও অসহিষ্ণু বিদ্বেষী মনের পরিচয় দিয়েছেন।

নবারুণবাবু দুর্নিয়ার সংবাদপত্র সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব নেন নি বা বক্তব্য রাখেন নি। কাজেই অমিতাভবাবুর রাসেল, রবীন্দ্রনাথ এবং রম্যাঁ রলাঁর নাম প্রসংগ-বহির্ভূতভাবে উত্থাপন করে পাঠকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা অনুচিত। মনে রাখতে হবে নবারুণবাবুর আলোচনা একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার শ্রেণী বিভক্ত পত্রিকা নিয়েই। অমিতাভবাবু যুক্তিসংগত কাজ করতেন, যদি তিনি নবারুণবাবুর শ্রেণী বিভক্ত বিশেষত আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গোটা কয়েক ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা বিকৃত সংবাদের নমুনা দিতে পারতেন। প্রমাণহীন অভিযোগ অভিযোগের ভিত্তিহীনতাই প্রমাণ করে। Free Press নেই কোনো কালে ছিল না এবং Free Press কথাটাই 'ধাপ্পা' এত বড় দামী সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি তিনি দিয়েছেন? নাকি Press সম্বন্ধে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে? আসল কথা Free Press সম্পর্কে অমিতাভবাবুর ধারণাটাই বিচিত্র সম্ভবত কথাটির অর্থ জানা নেই বলেই। তবুও একথা বলা দরকার কোনো সংবাদপত্রের মিথ্যা বা বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের সাথে Free Press-এর মতবাদের কোনো যোগ নেই।

বিকৃত ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার নিয়ে 'দলীয়' এবং 'নিরপেক্ষ' পত্রিকার মধ্যে তুলনা না চলার কি কারণ থাকতে পারে বোঝা গেল না। বরং দলীয় পত্রিকা হলেই যে তার মিথ্যা বা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন ও তদ্দ্বারা দলীয় লোকেদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করা উচিত তার এই বক্তব্যটাই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল। এটা জানা ভাল যে, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিশ্লেষণ হতে পারে ঘটনা তৈরি হতে পারে না। তাই দলের স্বার্থ দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির জন্য ঘটনাকে বিকৃত করলে দলীয় 'মার্কা' থাক নেই থাক সমানই অপরাধী হতে হবে দলীয় পত্রিকাকেও।

অমিতাভবাবুর কথা অনুযায়ী যদি তুলনা করতে হয়, তবে তো কোনো পত্রিকার সাথেই অন্য আরেকটার তুলনা চলে না। কারণ তার আগে আধুনিক পৌরাণিক, ছোটমাপের বড়মাপের প্রেস, মূলধনের পরিমাণ এবং কর্মচারী সংখ্যা তা আবার পুরো, আধা বা অবৈতনিক কিনা ইত্যাদি মেপে দেখতে হবে। সংবাদ দিয়ে সংবাদপত্রের বিচার না করে তার অন্য গুণ দিয়ে তা করতে হবে এর চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ আর কি হতে পারে! এই কারণে কলকাতায় যারা কম্যুনিস্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছিলেন তারাও গণশক্তি কেনেন না, কারণ গণশক্তি খবর প্রচার করে না।

মানিক সেনগুপ্ত

দুর্গাপুর-৪

হেমচন্দ্র বাগচী

'দেশ'-এর ৩৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের লেখা 'হেমচন্দ্র বাগচী' পড়ে সাহিত্যিকেরই একজন

বিদগ্ধ কবির প্রায়বিস্মৃত কথা নতুন করে আমাদের মনকে আলোড়িত করলো। কবি হেমচন্দ্র বাগচী যে কল্লোলযুগের শ্রদ্ধেয় ও প্রথিতযশা কবি, ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থেকে আপন সৃজনী প্রতিভায় ও ভিন্নতর রচনাশৈলীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন সে কথা সেই যুগের অনেকের জানা থাকলেও এখনকার অনেকেরই সে সম্বন্ধে জানবার তেমন কোনো সুযোগ এ পর্যন্ত হয়নি। অসুস্থমস্তিষ্ক এবং রোগজীর্ণ কবি আজও যে বর্তমান থেকে পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করছেন—এটা ভগবানের করুণা আর আমাদের পরম ভাগ্য। কিন্তু তিনি আজ বিদ্রোহী কবি নজরুলের মতই স্তব্ধ ও নীরব। তাঁর লেখনী আর সেই পূর্বের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে না। এর কারণ শ্রীযুক্ত সিংহরায় মশায় তাঁর লেখায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরেছেন এবং প্রতিকারের সময় এখনও যে উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি—এ কথাও আমাদের ও সর্বোপরি লোকপ্রিয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে স্মরণ করিয়ে, সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়ে গ্রামবাংলার একজন একদা-বিখ্যাত কবিকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন। মাত্র ৭৫ টাকার সরকারী মাসোহারা যে কতোখানি সাহায্যে আসতে পারে—এ কথা বোধ করি কাউকেই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আশা রাখি, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যানুরাগী জনগণ এবং সরকার এ বিষয়ে উপযুক্ত আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাবেন, কবির প্রতি তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে গুণগ্রাহিতার পরিচয় রাখবেন ও তাঁর প্রতিভাকে সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত করে তাঁকে পাদপ্রদীপে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস পাবেন।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রাউরকেল্লা-৯

পূর্ব বাংলার কবিতা

"আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাত্রে গাছের
পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো
কখনও মৃদুস্পর্শ, হঠাৎ কখনও বেহাল —
এক সময় বাঁশির সুর
যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙে
অনবরত কোমল কোলাহলে
স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায়
শব্দকে দেখি।"

এই কবিতা লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব বাংলার কবি। কিন্তু এমন কবিতা বাংলা ভাষার যে-কোনো কবিই লিখতে পারতেন, নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা সবারই প্রিয়। সেজন্য আমার মতের কাছে তারপর রাতের "স্বপ্নের প্রতিমা" বলা গ্রন্থটি নেই সেই জন্য উদ্ধৃতি দিতে পারছি না. তাঁর সেই গ্রন্থেও পূর্ব বাংলা বিষয়ক এমন বিমুগ্ধ আবেগময় কবিতা বেশ কয়েকটি আছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সদ্য বেরিয়েছে "পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা" তিনি নিশ্চিত আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন, আমাদের তিনি এক সঙ্গে এতগুলি পূর্ব বাংলার কবিতা পড়ার সুযোগ করে দিলেন। দিল্লী-রাওয়ালপিণ্ডির কলা-কৌশলে আমরা ঘরের পাশের দুই বন্ধুদের মুখ দেখতে পাই না, কণ্ঠস্বর শুনি না। ফ্রান্স জার্মানিতে এক সময় শতবর্ষ-ব্যাপী নিরন্তর যুদ্ধ হয়ে গেল, আজ তাদের সম্পর্ক স্বচ্ছন্দ আর স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও আমাদের মধ্যকার দেয়াল আরও কঠিন হচ্ছে।

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার কবিতার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যগত রূপের বলতে গেলে কোনো তফাৎ-ই নেই। আমেরিকা ও ব্রিটেন যেমন দু রকম ইংরেজি সাহিত্য গড়ে উঠেছে কিংবা স্পেন ও লাটিন আমেরিকায় যেমন আলাদা ধরনের স্প্যানিশ সাহিত্য— তেমন কোনো ব্যবধানও নেই এখানে পূর্ব বাংলার কবিতাগুলি আমাদের খুবই আপন এবং প্রিয় বলে মনে হয়।

এ কথা স্বীকার করা উচিত যোগাযোগের অভাবে, কিংবা পত্র পত্রিকা ঠিক মতন পাওয়া যায় না বলে পূর্ব বাংলার অনেক কবিরই বই পরিচয় আমাদের কম জানা। জানি না অনেকেরই বয়েস বা লেখার নিজস্ব ধারাটি কি। আমি শুধু কবিতা নয়, কবিদের সম্পর্কে এই সব খুঁটিনাটি জানার ব্যাপারেও আগ্রহী। অবশ্য, এই সংকলনে এমন বেশ কয়েকজন কবি আছেন, যাঁরা শুধু পূর্ব বাংলার কবি হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত নন। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁদের আসন অনেক আগেই সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। যেমন জসীমউদ্দীন বন্দে আলী মিয়া শামসুর রহমান প্রমুখ। তবে, পরিচিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত আশরাফ সিদ্দিকী এবং প্রফুল্লকুমার রায়। অবশ্য, এখান থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিতা সংগ্রহ করা যে কত দুরূহ কাজ তা সহজেই অনুমান করতে পারি এবং সম্পাদক সে কথা বারবার স্বীকার করেছেন।

পূর্ব বাংলার আধুনিক কবিদের মধ্যে আল মাহমুদ একটি বিশিষ্ট নাম। এই কবি দুর্দান্ত তেজী এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কবিতা লেখেন, তাঁর অনেকগুলি কবিতা পেয়ে খুব ভালো লাগলো। এর কয়েকটি কবিতা থেকে কিছু কিছু লাইন উদ্ধার করছি।

"—বাতাসে ভেসেছে খোঁপা, মুখ তোলো,
হে দেখন হাসি
তোমার টিকলি হয়ে হৃৎপিণ্ড নড়ে
দুরু-দুরু

সন্দ্যা ঝুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনে ঝিঁঝির খৈ, বিছানায় আতর অগুরু।
(সোনালি কাবিন)

নীল বইচা মাছের মতো চোখ
স্বপ্নে আমায় কুশল পুছে রোজ—
'ভালো কি আছো?' হায়রে ভালো থাকা
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ!

ফিরতে চাই, পাবো কি সেই পথ
তরমুজের খেতের পাশে ঘর;
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থরথর!

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত্ত বরণ রূপসী সেই পরী...
আমার তো পুরো কবিতাটাই উদ্ধার করতে লোভ হচ্ছে, এত চমৎকার। এই সংকলনের একটি মুখবন্ধ লিখেছেন সেবাব্রত চৌধুরী, যিনি কিছুকাল আগেও পূর্ব বাংলায় ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, এই দুই দশকে পূর্ব বাংলার কবিতায় চারটি পর্যায়ের কথা। প্রথম পর্যায়, স্বাধীনতার আনন্দ উদ্দীপনা ও সর্বাঙ্গীন লোকায়ত কল্যাণের সম্ভাব্য স্বপ্নদর্শনের আশাবাদ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ, মুসলিম মানসের সঙ্গীয় ঐতিহ্য অন্বেষণ, তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য স্বীকার করে তারই অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস, চতুর্থ পর্যায়ে বিশ্ব সাহিত্যের নানা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতি আধুনিক সাহিত্য প্রয়াস। সুখের বিষয়, এই সংকলনে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের কবিতাই স্থান পেয়েছে।

শামসুর রহমান এক সময় "কবিতা" পত্রিকায় অনেক কবিতা লিখেছেন, আল মাহমুদ, আবুল ফজল সাহাবুদ্দিন লিখেছেন "কৃত্তিবাসে"। এখানকার কবিতা অনুরাগীদের কাছে এঁরা অনেকখানি পরিচিত। শামসুর রহমানের কবিতাগুলি বড় অভিমানের, বড় গাঢ় বেদনার। তাঁর কয়েকটি লাইন থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

'মাচায় অর্পিত লাউ জানে যার প্রীত
পরিচয়,
ভুলবে কি তার নাম? দূরে কাছে একই
হাওয়া বয়?
প্রসারিত ধুলোর নিঃসঙ্গ পথ রেখা
কাকে দেখে ঘুরে ঘুরে উঠোনে কুকুর
কাঁদে একা?
খাঁচার পাহাড়ি পাখি সেও বেছে চায়
অজানা কোথাও—
গাছে গাছে মূর্ত ভাষা, পৃথিবীর সমস্ত
আকাশে
বেলা পড়ে আসে।
(ছিল সে-৩)

খবরদার থোকা তুই কোনোদিন শিল্পের
মুখকে
দিবিনে ঘেঁষতে চিসীমায়। বরং ডিঙিয়ে
বেড়া
ভাবা, টীকা, দর্শনের মহানন্দে নিশ্চিন্তির
ডেরা
বাঁধিস মনের মতো।
(আমার ছেলেকে)

খুব বেশী উদ্ধৃতি দিতে গেলে আয়তন অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এই রচনার। অনেক কবিতাই সমগ্রভাবে সুন্দর, মাঝখান থেকে দু' চার লাইন উদ্ধৃতি দিতে গেলে সে-গুলির প্রতি অবিচার করা হয়। তবে, শহীদ কাদরী, যাঁর মাতৃভাষা উর্দু এবং পূর্ব বাংলার একজন বহু আলোচিত কবি, তাঁর কয়েকটি লাইন না দিয়ে উপায় নেই।

শীতার্ত নিঃসঙ্গতায় কিছুই বাঁচে না কেবল
বেঁচে থাকা ছাড়া;
(এই শীতে)

ভালোবাসায় আরম্ভ মাকড়
জাল রাখে খুব আস্তে এই সর্বেসর্বা মাংস,
রক্তোচ্ছ্বাসে।
লাবণ্যে বিস্ফোরণ এনে দিল ক্ষুধা;
সম্ভাবনার হিরণ্ময় মেঝেয়
এই ক্ষণে ছিন্ন মাথার দ্যুতি, উরুর
অরুণিমা, দুরন্ত পা
চক্ষে মাধুরী জোগায়, ভরে দেয় অশান্ত
নিষ্ঠুর জাগরণে।
(মোহন ক্ষুধা)

সনাতন পাঠক

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি

বাংলায় বিপ্লববাদ। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থখানির সংগে বাঙালী পাঠকের পরিচয় সুদীর্ঘকালের। গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। তারপর, প্রতিটি সংস্করণে নতুন নতুন তথ্য ঘটনা এবং ব্যাখ্যা সহযোগে পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে সম্প্রতি গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালী জাতীয় চরিত্রের সাহসিকতা এবং দুর্মর প্রাণচেতনার কথা সর্বজন বিদিত। লেখক প্রভূত শ্রম নিষ্ঠার সংগে বাঙালী বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ এবং প্রয়াসকে ক্রমবদ্ধ করে বিবৃত করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান পর্যন্ত— সুদীর্ঘকালের বাংলার বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চালচিত্র রচনায় লেখক প্রয়াসী হয়েছেন। এবং এ বিষয়ে লেখকের নিষ্ঠা এবং মনস্কতা প্রশংসার্হ। প্রায় দীর্ঘ একশত বছরের ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির তথ্য সমৃদ্ধ রূপরেখা চিত্রণে লেখক তৎপর হয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ, [illegible] বৈপ্লবিক প্রয়াস, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং বাংলার বিপ্লবী প্রয়াস, [illegible] বিপ্লব ও [illegible] বৈপ্লবিক উদ্যোগ, [illegible] ষড়যন্ত্র মামলা, [illegible] বৈপ্লবিক [illegible] ও চেতনার [illegible] অভিযান—প্রভৃতি [illegible] বাঙালী বিপ্লব প্রয়াসের [illegible] ছোট ছোট বৈপ্লবিক [illegible] সম্পর্কে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক আলোকপাত করেছেন। যেমন, স্বদেশী সংগীত, বোমার হুমকি, ডাকাতির কথা, পুলিসী তৎপরতা, সূর্য সেনের ফাঁসির পর তদন্তের নমুনা, একবার কয়াইবার [illegible] যাহারা প্রাণ দিল কিন্তু কেহ মনে রাখিল না —ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ। শ্রীযুক্ত গুহ স্বয়ং বাংলার বিপ্লবী প্রয়াসের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলে, এমন কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে যা এ জাতীয় অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে একান্তই দুর্লভ। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মত ঘটনাগুলি লেখকের রচনা গুণে সজীব চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে তিনি এক অনন্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তা হল কোথাও বাঙালী বিপ্লব প্রয়াসের ঘটনাগুলিকে অতিরিক্ত আবেগে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলেন নি। অথবা তথাকথিত ঐতিহাসিকের নৈব্যক্তিক বর্ণনা এবং তথ্য ধারায় প্রাণহীন করে ফেলেননি। খুব অনায়াসে, সাবলীলভাবে ঘটনার সরস বিবরণ দান করেছেন। ফলে, গ্রন্থখানি সর্বত্র উপন্যাসের মত সুখ পাঠ্যতা পেয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক সবিনয়ে স্বীকার করেছেন, তিনি মূলত তথ্য নির্ভর নন। বিপ্লবী আন্দোলনের বিশদ এবং যথাযোগ্য ইতিহাস রচনা তাঁর অভিপ্রেত নয়। বস্তুত, বাংলা দেশের বিপ্লবী প্রয়াসগুলি রাজনৈতিক কারণেই অনেকক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং, সঠিক তথ্য খুঁজে বের করা দুষ্কর। তথাপি এ ক্ষেত্রে লেখকের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা উচিত। তথ্য সমাবেশের ব্যাপারে তিনি খুব পরিশ্রমী হবার সুযোগ না পেলেও প্রত্যেকটি অধ্যায় লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বর্ণনাগুলি ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। বস্তুত, বিপ্লবের ইতিহাস রচনা নয়, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেপথ্য রচনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এবং এ বিষয়ে তিনি এক বিরল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন [illegible] এই বিপ্লবের এই অন্তর্জীবন বিচারে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে নানা ঘটনা ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। এ ব্যাপারে লেখকের বিষয় উপস্থাপন নৈপুণ্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। আরও একটি বিষয়ে লেখক প্রশংসা দাবি করতে পারেন। তাহল, বাংলার বিপ্লববাদের আলোচনা প্রসংগে তিনি কখনও প্রাদেশিক মনোভাবের পরিচয় দেন নি। পরাধীন ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনের দূরে বিস্তৃত প্রচেষ্টাগুলিকে সর্বদা পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে, বাংলার বিপ্লবী প্রয়াস আরো গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছে। আর গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কোথাও তিনি আবেগতাড়িত হয়ে রচনাকে অযথা বাস্তবতার ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত করেন নি। রাজনৈতিক বিবেচনা এবং বিচার সূক্ষ্মতার সাহায্যে প্রত্যেকটি বিপ্লবী প্রয়াসের ভালমন্দ বিচার করেছেন। ফলে, গ্রন্থখানি একাধারে ইতিহাস এবং বাংলা দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের জীবন্ত আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

২১৪/৬৯

গোলরক্ষকদের। শীল্ড ফাইনালের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় একটি গোলই যেখানে একটি দুর্ধর্ষ দলের মনোবল ভেঙে দিতে যথেষ্ট সেখানে তিনটি গোলে পিছিয়ে পড়লে দলের আর কিছুই থাকে না। তবু প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে পশ্চাৎগামী ইস্ট-বেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে প্রাণপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। শেষদিকে একটি গোলও শোধ দিয়েছে। তবে এ গোলও মোহনবাগান গোলরক্ষক বলাই দে-র একটু ভুলের ফল। যাই হোক, দোষত্রুটির কথা ছেড়ে দিয়ে মুক্ত কণ্ঠেই বলা যায় মোহনবাগানের ৩-১ গোলে জয় যোগ্যের যোগ্য সম্মান, ব্যর্থ ভূমিকায় ইস্টবেঙ্গলের মরসুমের প্রথম পরাজয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এবার নিয়ে মোহনবাগান ৯ বার শীল্ড জয় করল। ৯ বছরের মধ্যে পাঁচবার পেল চ্যাম্পিয়ন এর সম্মান।

মরসুম সমাপ্ত

গত বছর—লীগের খেলা এবং পরপর দুই বছর শীল্ডের খেলা অসমাপ্ত থাকার পর এ বছর নানা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে কলকাতার ফুটবল মরসুম শেষ হল। এর জন্য আই এফ এ-র নতুন সভাপতি বিচারপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জী এবং পরিচালক সমিতির প্রতি সভ্যেরই গর্ববোধের কারণ আছে। গর্ব-বোধের কারণ আছে কলকাতার রেফারি-দেরও। ফুটবল খেলার সুষ্ঠু সমাপ্তিতে যাদের অবদান অনস্বীকার্য অথচ যাদের করণীয় বিষয় একাদশী ব্রত পালনের মত। একাদশী করলে পুণ্য নেই, না করলে পাপ। রেফারিদেরও সেই অবস্থা। ভালভাবে খেলা পরিচালনা করলে কেউ ধন্যবাদ দেবার জন্য এগিয়ে আসে না। পরিচালনায় পান থেকে চুন খসলে তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

স্থানাভাব বশত শীল্ড খেলার সামগ্রিক পর্যালোচনা সম্ভব হল না। সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল :

প্রথম রাউণ্ড

কুমারটুলি—৫ : হুগলী জেলা—২
২৪ পরগণা—১ : চন্দননগর—০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—৩ : কুমারটুলি—২
দিল্লি একাদশ—৩ : বি এন আর—১
রাজস্থান—৩ : বালী প্রতিভা—০
মহঃ স্পোর্টিং—৩ : জামসেদপুর—১
কালীঘাট—২ : ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স—১
গোর্খা সেন্টার—৩ : বাটা—১
ইস্টার্ন রেল—১ : ২৪ পরগণা—০
বার্ণপুর ইউনাইটেড—৩ : খিদিরপুর—১
মধ্যপ্রদেশ—৪ : এরিয়ান—৩
পোর্টকমিশনার—১ : এ এস সি সেণ্টার—০
কটক কম্বাইণ্ড—২ : উয়াড়ি—১
জর্জ টেলিগ্রাফ—১ : হরিয়ানা—০

তৃতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান—৬ : স্পোর্টিং ইউঃ—১
রাজস্থান—২ : দিল্লি এফ এ—০
মহঃ স্পোর্টিং—১ : কালীঘাট—০
গোর্খা সেণ্টার—৩ : বোম্বাই স্টেট ব্যাঙ্ক—১
ইস্টার্ন রেল—২ : পাঞ্জাব এফ এ—১
মধ্যপ্রদেশ—২ : বার্ণপুর—১
কটক কম্বাইণ্ড (ওঃ ওঃ)
পোর্ট কমিঃ (স্ক্র্যাচড)
ইস্ট বেঙ্গল—৪ : জর্জ টেলিগ্রাফ—০

চতুর্থ রাউণ্ড

মোহনবাগান—৪ : রাজস্থান—০
মহঃ স্পোর্টিং—২ : গোর্খা সেণ্টার—০
ইস্টার্ন রেল—৩ : মধ্যপ্রদেশ—০
ইস্ট বেঙ্গল—১ : কটক কম্বাইণ্ড—০

সেমি ফাইনাল

মোহনবাগান—৩ : মহঃ স্পোর্টিং—২
ইস্ট বেঙ্গল—০ ; ৪ : ইস্টার্ন রেল—০ ; ০

ফাইনাল

মোহনবাগান—(৩) ইস্ট বেঙ্গল—১ (কানন)
(পি গাঙ্গুলী—২ ও
এস ঘোষ দস্তিদার)

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

ব্যাডমিণ্টনের ১৪ নম্বর আইনের 'এইচ' উপধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভায় এই আইনের রদ-বদলের কথা ওঠে।

এই আইনের ধারায় আগে ছিল—যদি পরিষ্কারভাবে র‍্যাকেট দিয়ে সাটল হিট করা
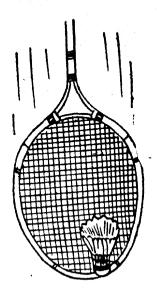
উডশট এখন আইনগ্রাহ্য। ছবিতে যেমন দেওয়া আছে এইভাবে র‍্যাকেটের ফ্রেমের পরিষ্কার হিটে সাটল চালিত হলে ফল্টস হয় না

না হয়, কিংবা সাটল-এর বেস র‍্যাকেটের ফ্রেম, শ্যাফট বা হ্যাণ্ডেল দিয়ে আঘাত করা হয় তবে ফল্টস হবে। অর্থাৎ আগে উড-শট ফল্টস হিসাবে গণ্য হত। উডশটকে আইনগ্রাহ্য করার জন্য মালয় ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত পর পর চার বছর প্রস্তাব পেশ করেও সে প্রস্তাব পাস করতে পারেনি। কারণ, আগেই বলেছি, আন্ত-র্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া কোন আইন পাস হয় না। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে উডশটকে আইন-গ্রাহ্য করার জন্য মালয়ের পঞ্চমবারের প্রস্তাব ৬০—৩০ ভোটে পাস হয়ে যায়। তখন থেকে র‍্যাকেটের যে কোন অংশ দিয়ে পরিষ্কারভাবে সাটল হিটও আইনগ্রাহ্য। এমন কি, পরিষ্কারভাবে সাটল-এর বেস এবং ফেদারে আঘাত করলেও ফল্টস হয় না।

১৪ আইনে ফল্টস-এর অন্যান্য বিষয়

(আই) যদি খেলার সময় কোন খেলোয়াড় ঠিকভাবে সাটল মেরে ঠিক মত ফিরিয়ে দিতে না পারেন, কিংবা সাটল যদি খেলোয়াড়ের গায়ে লাগে তবে ফল্টস হবে। খেলোয়াড় কোর্টের মধ্যেই থাকুন অথবা কোর্টের বাইরেই থাকুন, সাটল তাঁর গায়ে বা শরীরের যে কোন অংশে লাগলেই ফল্টস হবে।

(জে) যদি কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করেন তবে ফল্টস হবে।

(কে) ১৬ নম্বর আইন যথাযথ পালিত না হলেও ফল্টস হবে।

১৫ নম্বর আইন

প্রতিপক্ষ প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সার্ভারের সার্ভিস করা উচিত নয়। তবে সার্ভিসের পর প্রতিপক্ষ যদি সাটল মারবার চেষ্টা করে তবে খেলোয়াড়কে প্রস্তুত বলে ধরতে হবে।

১৬। সার্ভিস করার সময় যে খেলোয়াড় সার্ভিস করছে এবং যে খেলোয়াড় সার্ভিস রিসিভ করছে দুইজনকেই সার্ভিস না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ নির্দিষ্ট সার্ভিস কোর্টের মধ্যে দুই পায়ের কোন না কোন অংশ মাটির সঙ্গে নিশ্চলভাবে লাগিয়ে রাখতে হবে। লং এবং শর্ট সার্ভিস লাইন, সেণ্টার লাইন এবং সাইড লাইনের দ্বারা পরি-বেষ্টিত কোর্টই সার্ভিস কোর্ট। সার্ভিস হবার আগে যদি সার্ভার অথবা রিসিভারের পায়ের কোন অংশ সার্ভিস কোর্টের লাইন স্পর্শ করে তবে পায়ের অবস্থান সার্ভিস কোর্টের বাইরে বলে ধরতে হবে। সার্ভার ও রিসিভারের সঙ্গী খেলোয়াড় নিজেদের দিকের যে-কোন জায়গায় দাঁড়াতে পারেন। তবে তাঁদের এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে প্রতিপক্ষের দৃষ্টির ব্যাঘাত না হয়, কিংবা অন্য কোনভাবে প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি না হয়।

ব্যাখ্যা—সার্ভিস করার সময় পা নিশ্চল অবস্থায় থাকবে বলে যে নির্দেশ আছে তা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। ইংরাজী আইনের বয়ানে আছে—'সাম পার্ট অব বোথ ফিট অব দিজ প্লেয়ার্স মাস্ট রিমেন ইন কণ্টাক্ট উইথ দি গ্রাউণ্ড ইন এ স্টেশনারী পজিশন অনটিল দি সার্ভিস ইজ ডেলিভার্ড'।

পা এর এই স্টেশনারী পজিশনের ব্যাখ্যা কি? দুই পা কি নিশ্চল অবস্থায় থাকবে? না, ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সার্ভিস করার সময় পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে উঠে গেলেও পায়ের আঙুল যদি মাটির সঙ্গে লেগে থাকে তবে ফল্টস হবে না। সমভাবে পায়ের আঙুল মাটি থেকে উঠে গিয়ে গোড়ালি মাটির সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। কোর্টের উপর দুই পায়ের কোন না কোন অংশ অবশ্যই মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং পা-এর মুভমেণ্টও করা যাবে। কোন পা মাটি থেকে একদম উঠে যাবে না।

ফুটবল খেলার থ্রো-ইনের আইনের সঙ্গে এই আইনের অনেকখানি সঙ্গতি আছে। থ্রো-ইনের আইনেও দুই পায়ের কোন না কোন অংশ মাটির [illegible]

সাটল কোর্টের বাউণ্ডারী লাইনের উপর পড়লে কোর্টের মধ্যে পড়েছে বলে ধরতে হবে, ফল্টস হবে না

[illegible]

১৭ নম্বর আইন

[illegible]

১৮ নম্বর আইন

[illegible] হবে।

মুকুল

ইন্দর সেন পরিচালিত "প্রথম কদম ফুল" ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি, তনুজা, সুব্রতা চ্যাটার্জি ও অনুভা ঘোষ।
ফটো—দেশ

সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো কিংবা জীবনের অর্থ খোঁজার অধিকার সকলেরই আছে। তরুণ ও জ্যোতিরও আছে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার যদি কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা যুক্তি বা প্রতিক্রিয়া এবং নৈরাশ্য থেকে উদ্ভব হয় অর্থাৎ জিজ্ঞাসু বা সত্যসন্ধানী যদি আগে থেকেই যে-কোন ভাবনা বা যন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত থাকেন তবে সদুত্তর মেলে কি? যন্ত্রণা থেকেও জিজ্ঞাসার জন্ম হয় মানি। সেক্ষেত্রেও সঠিক উত্তর মেলে না। এর জন্য চাই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন। অতএব জীবন-সংক্রান্ত প্রশ্নের দিক থেকে নাটকে কী পেলাম সেটা বড় কথা নয়। এবং এই ক্ষেত্রে দর্শককে মাথাও ঘামাতে হয়, কারণ একেবারে বলা হয়েছে প্রলাপের মত পর-পর টানা। যখন কথা বলছে তখন নাকি তারা যুক্তিহীন— তাদের কথাগুলি নাকি বিক্ষিপ্ত "অ্যাকশন"-এর মত। তবে দর্শকের মগজের উপর চাপ পড়লেও প্রযোজনার দিক থেকে যে নাটকটি আনন্দ দিয়েছে তা আবার জানিয়ে রাখি।

"প্রলাপ"-এর অন্য গুণ শিল্পীদের টিম-ওয়ার্ক। অভিনয় প্রত্যেকেরই উল্লেখের—বিশেষ করে নন্দন সরকারের (মৈনাক), বিজয়া সরকারের ছায়া এবং শান্তনু মুন্সীর ফটিক দুটি স্বাভাবিক চরিত্র। দুই শিল্পীরই চরিত্রচিত্রণ বিশেষ প্রশংসনীয়। বিবেকানন্দ দাশ (তরুণ) এবং দেবেন গাঙ্গুলি (জ্যোতি) বিজ্ঞানীর নির্লিপ্ততায় মানুষের জীবনের অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন। কখনও বা তাঁদের মধ্যে অস্থিরতা ও জ্বালার প্রকাশ। তাঁদের চিত্রসৃষ্টিও চমৎকার।

বার্তিক অভিনীত "নষ্টনীড়"

আজকাল শৌখিন মঞ্চে অনেক ধরনের নাটক অভিনীত হয়। অধিকাংশেরই না থাকে কোন অর্থ, না থাকে কোন বক্তব্য। সেদিক থেকে বার্তিক-গোষ্ঠী যে রবীন্দ্রনাথের একটি ক্লাসিক রচনা মঞ্চাভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন সেজন্য সাধুবাদ তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য। এবং এই সাহস সকলেরই অনুসরণের যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" উপস্থিত করেছেন বার্তিক সম্প্রদায় ১৯ সেপ্টেম্বর, রঙমহলে। নাট্যরূপ দিয়েছেন শম্ভু বসু। "নষ্টনীড়"-এর সবটুকু রস এই নাটকে মিলেছে কি? না, পুরোপুরি মেলেনি; অন্তত শেষের দিকে তো নয়ই। কিন্তু "নষ্টনীড়"-এর স্বাদ যতটুকু পাওয়া গেছে তাতেই দর্শক অভিভূত। প্রথম ভাগ প্রায় সম্পূর্ণ মূলানুগ, এই অংশে রবীন্দ্রনাথের সংলাপও অটুট। মূল সংলাপ যথাসম্ভব পুরো নাটকেই রক্ষা করা হয়েছে। তবে শেষের অংশে নাটকে কেমন যেন মোটা আঁচড় এসে গেছে। যা প্রায় অনুক্ত কিংবা অস্পষ্ট থাকতে পারত তা অতিমাত্রায় ব্যক্ত ও স্পষ্ট—যেমন চারুর অনতিস্পষ্ট ভালবাসা রীতিমত রোমান্টিক প্রেমে পর্যবসিত। অবশ্য চারু ও অমলের অন্তরঙ্গতার মুহূর্তগুলি নাটকে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে ভূপতির মনের শূন্যতাবোধ।

অভিনয় নাটকের আকর্ষণ অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছে। প্রধান তিনটি চরিত্রের (ভূপতি, চারু ও অমল) রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ও সোমেন চক্রবর্তী। এঁরা তিনজনেই চরিত্রের মর্মলোকে পৌঁছুতে পেরেছেন, তবে এক্ষেত্রে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সোমেন চক্রবর্তী। তাঁদের কথাবার্তায়, আচরণে, চেহারায় এবং আভিজাত্যের লক্ষণে রবীন্দ্রকাহিনীর চরিত্র অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় চারুকে শেষের অংশে বিপ্রলব্ধা করে তুলেছেন, যেখানে শোক ও আবেগের চিহ্ন বেশী। উমাপদ ও মন্দাকিনীর ভূমিকায় যথাক্রমে শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় ও ইরা বসু মন্দ অভিনয় করেননি। সামগ্রিকভাবে সুপরিচালিত এই নাটকে পাত্রপাত্রীদের বেশভূষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

রবিমল্লার-এর "শাপমোচন"

দক্ষিণ কলিকাতার প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন দক্ষিণীর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংগীত সংস্থা "রবিমল্লার"-এর দ্বিতীয় বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩রা অক্টোবর ১৯৬৯ সন্ধ্যা সাতটায় "রবিমল্লার"-এর শিল্পীরা রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে কবিগুরুর "শাপমোচন" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। প্রবীণ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় সংগীতে যোগ দেবেন ঐ সংস্থার শিল্পীরা। অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যপরিচালনায় অরুণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় রূপদান করবেন শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বয়ং ও অলকানন্দা চাকলাদার। গ্রন্থনা ও আবহসংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে অমিয় চট্টোপাধ্যায় (আকাশবাণী) ও দীনেশ চন্দ্র।

"মুক্তিস্নান" (পরিচালনা: অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়

অরণ্য কন্যা—ছবির সংগীত গ্রহণ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে "অরণ্য কন্যা" ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জি ও কাজী অনিরুদ্ধ। "অরণ্য কন্যা" পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। দিলীপ ঘটক সংগীতপরিচালক।

অ.র ত বনফুলের "চৈতালি" (পরিচালনা : সুধীর মুখার্জি) ছায়াছবিতে বিশ্বজিৎ ও অনুভা। ফটো—দেশ

টলি-টিপ্পনী

এখন মনে হচ্ছে, সেটা ছিল শাপে বর। ফিল্ম ফিনান্সের টাকা নিয়ে শেষ অবধি মৃণাল সেন নিজেই ভুবন সোম-এর প্রযোজক হলেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিজের মনের মত, স্বাধীনভাবে একটি ছবি করলেন। ছবিটি বাংলার পরিচালককেই শুধু নয়, ভারতের চলচ্চিত্রেও মান বাড়াল বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আসরে। অথচ এই "ভুবন সোম"-এর প্রিণ্ট ও এডিটিং-এর কাজ কলকাতায় করা সম্ভব হয়নি। করতে হয়েছিল বোম্বাইয়ে। শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃণালবাবু অপেক্ষা করেছিলেন। কলকাতায় বসে কি আমার ছবির কাজ শেষ করতে পারব না? কে শোনে কার কথা। খাতায় নাম লিখিয়েছ কি? তখন যে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য ভীষণ তোড়জোড়। কলকাতা থেকে নির্জন শিল্পী চলে গেলেন বাইরে। লোকেশানে ছবির কাজ করতেই হত। তবু তাঁর তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে বুঝি ছিল নির্বাসনের সুর। "ভুবন সোম"কে বোম্বাই চিত্র রূপে চিহ্নিত করতে চাননি মৃণালবাবু, "ভুবন সোম" বোম্বাইয়ের নয়ও। তবে মৃণাল-বাবুর ভাগ্য একটু সদয় হল—কিন্তু "ডাবিং"-এর কাজ করবার সুযোগ পেলেন কলকাতায়। কেন? না। "বোম্বাইয়ের প্রেডিউসর" মৃণাল সেন যখন আবেদন করেছেন তখন তাঁকে ডাবিং-এর অনুমতি দেওয়া হোক।

আজ "ভুবন সোম"-এরই জয়। যেমন জয় হল "গুপী গাইন......"এর। দুটি ছবিরই প্রিণ্ট বোম্বাইয়ে তৈরি। "ভুবন সোম" দেখার আগ্রহ সকলের। অসীম দত্ত কিন্তু ভেনিস রওনা হবার আগেই "ভুবন সোম"-এর বিশ্ব-পরিবেশন স্বত্ব কিনেছেন। মাত্র দুটি চরিত্রের ছবি "ভুবন সোম", তার মধ্যে একজন আবার বোবা। শুনলাম, সত্যজিৎবাবু ছবির খুব প্রশংসা করেছেন। যাঁরাই দেখেছেন ছবিটি তাঁরাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকলের মুখেই সুহাসিনী মুলের প্রশংসা। কেউ কেউ আবার বলেও দিচ্ছেন—ও দেশে ছবিতে রবীন্দ্রনাথ, রবিশঙ্কর ও সত্যজিৎ রায়ের ছবি আছে।

*

ঋত্বিক পরিচালিত শেষ ছবি বাংলা "আকাশ কুসুম"। বলাবাহুল্য, ছবিটি তেমন ব্যবসায়িক আনুকূল্য পায়নি। ইতিমধ্যে মৃণালবাবু বসে থাকেননি। একটি ওড়িয়া ছবি করেছেন, "মাটির মনিষ"। ছবিটি যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছে। পুরস্কৃতও হয়েছে। সম্প্রতি ঋত্বিক ভেনিস থেকে বোম্বাই হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে। মৃণালবাবু বললেন, "ভেনিস ফেস্টিভালের অভিজ্ঞতার মূল্য আমার কাছে অনেকখানি।" তিনি জানালেন, "ফেস্টিভালে ভালো-মন্দ সব রকমের ছবিই দেখেছি। ছবির "মডার্ন ট্রেন্ড" সম্বন্ধে নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে এলাম। ফিল্মের যে যন্ত্র, তার স্বাধীন

ব্যবহার আমাকে সব থেকে চমৎকৃত করেছে। অ্যাকচুয়ালিটিকে ধরবার জন্যে ওদেশে এখন স্টুডিওকে বর্জন করা হচ্ছে। অধিকাংশ ছবি দেখে মনে হল, ওদের ক্যামেরায় অবাধ গতি যেন বড়তন্ত্র। সেট তৈরী করে শুটিং করার কথা ওরা এখন ভাবতেই পারে না, ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘরের দৃশ্য ঘরেতেই তোলা হয়। এটা দেখে নিজের ভাবনাং সম্বন্ধে আমি অনেকটা আশান্বিত হয়েছি।

প্রসংগত শ্রীসেন আরো একটি নতুন খবর শোনালেন। চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির হয়ে তিনি একটি ডাবল ভার্সন (বাংলা ও হিন্দী) ছবি করেছেন মাত্র দু মাসে। সম্পূর্ণ ছবিটির শুটিং শেষ হতে সময় লেগেছে মাত্র আঠারো দিন। তার মধ্যে পনেরো দিনই আউটডোর। লোকেশন ছিল বারুইপুরের ছ' মাইল দূরবর্তী এক অজ পাড়াগাঁ। বাকী দুদিনের ইনডোর করেছেন নিউ থিয়েটার্স দুনম্বর স্টুডিওতে। রবীন্দ্রনাথের "ইচ্ছা পূরণ"।

—বিচক্র

পরিচয়

বিমল করের "পরিচয়" কাহিনী অবলম্বনে ছবি হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন নির্মল মিত্র। অসীমকুমার দত্ত ছবিটির প্রযোজক।

ছায়ালিপির "শান্তি" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়

পাঠকের চোখে

ফিল্মে চুম্বন ও নগ্নদেহ

[ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির সুপারিশ এবং সে-সম্পর্কে চিত্রতারকাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের অসংখ্য পত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে। সব পত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে দেওয়া হল।]

মহাশয়,

ফিল্মে "চুম্বন ও নগ্নদেহ" বিষয় যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। শ্রীউত্তমকুমার ও শ্রীমতী সুপ্রিয়ার উক্তিতে বড়ই ব্যথা পেলাম আমরা। বোম্বাই শিল্পের দোহাই দিয়ে দর্শকদের যে কি দিতে চাইছে তা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। সস্তা বাজিমাৎ করে পয়সা রোজগার ছাড়া সোজা কথায় একে আর কিছুই বলা যায় না। হিন্দী ছবি আমরা প্রবাসী বাঙালীরা প্রায় দেখিইনা, সকলের সঙ্গে বসে দেখা যায় না বলে, শুধু বাঙালীদের তোলা ছবি ছাড়া। বাংলা দেশের কি এমনই দৈন্য হয়েছে যে, পয়সার জোর দেখিয়ে বিদেশের স্রেন ঘেঁটে পাঁক তুলে এনে শিল্পের কোটিং দিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করার জন্য যারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাদের অনুকরণ করবে বাংলাদেশ?

আর্ট এগজিবিশন, খাজুরাহো, আর সিনেমা এক নয়। সিনেমার গল্প আমাদের ঘরের পরিবারের সমাজের প্রতিচ্ছবি। সিনেমা মানুষের আচার ব্যবহার রুচি সুন্দর শোভন করতে পারে। নগ্নতার চাবুক মেরে শোধরাতে কাউকে পারবেনা, উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়বে। বাঙালী সিনেমায় এতটুকু অবাস্তবতা সহ্য করতে পারেনা, নদীবক্ষে অরণ্যে নায়িকার গানের সঙ্গে যখন একগাদা বাজনা বেজে ওঠে, কি অসহ্য লাগে। বোম্বাই যা করে করুক, বাংলা দেশের প্রযোজক পরিচালকদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ এ মোহে যেন তাঁরা না পড়েন। ঘরের মা বোনের চরিত্রকে সর্বসমক্ষে নগ্নদেহে উপস্থিত না করলে যদি শিল্পের শর্ত পালন করা না হয়, তবে তা না হোক। ইতি—পুষ্পিতা ঘোষ, প্রতিমা সান্যাল, গৌরী মুখার্জি, কল্পনা ঘোষ। স্বরূপনগর, কানপুর।

মহাশয়,

যাঁরা চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার সুপারিশের বিরোধিতা করে মতামত প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খোসলা কমিটির সুপারিশকে কখনই সমর্থন করা যায় না। কারণ ভারতীয় ফিল্মে যদি চুম্বন ও নগ্নদৃশ্য উপস্থাপনার অবাধ স্বাধীনতা থাকে তাহলে তা সমাজের সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করবে। চুম্বন ও নগ্নদৃশ্য ব্যতীত কি উন্নতমানের ছবি তৈরি করা যায় না?

তিমির দাশগুপ্ত, বেলেঘাটা।

মহাশয়,

সম্প্রতি ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটি ফিল্মে "চুম্বন ও নগ্নদেহ" প্রদর্শনের যে সুপারিশ করেছেন সে সম্পর্কে বিচক্রের "টীকা-টিপ্পনী" (দেশ/১৬ই আগস্ট, '৬৯) মারফত জানা গেল উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখার্জি, সন্ধ্যা রায় ও আরো কয়েকজন চিত্রতারকাদের স্ব-স্ব অভিমত। সুপ্রিয়া দেবীর মতে এটি একটি "বোল্ড স্টেপ", "প্রগতির গতিপথের সঙ্গে সবাইকেই সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে বৈকি!" —অর্থাৎ তাঁর মতানুযায়ী ফিল্মে নগ্নতাই হলো প্রগতির মাপকাঠি; এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের সিনেমায় এই "নগ্নতা"-কে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে না পারছি ততদিন আমরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে দাবী করতে পারবো না। —বিচক্রের লেখা থেকে মনে হলো সুপ্রিয়া দেবী এ কথাই বলতে চান, এবং সুপ্রিয়া দেবীর মত তিনিও একই অভিমত পোষণ করেন।

সাহিত্য-শিল্পে নগ্নতা তথা অশ্লীলতা নিয়ে দেশে দেশে বিস্তর তর্কবিতর্ক

হয়েছে। সে বিতর্কের গোলকধাঁধায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। বক্তব্য শুধু এই যে—সাহিত্যশিল্পে নগ্নতার বাড়াবাড়ি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অবক্ষয়তারই অনিবার্য পরিণতি।

প্রসঙ্গতঃ অনেকেই কোনারক খাজুরাহোর মিথুন মূর্তিগুলোর সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করতে উৎসাহ বোধ করবেন। সেগুলোর হয়তো সত্যই একটি শিল্প-গরিমা আছে। কিন্তু পশ্চাতে যে কি পরিমাণ অন্ধকারময় ইতিবৃত্ত লুক্কায়িত তা একমাত্র অনুসন্ধানী ইতিহাসের ছাত্ররাই জ্ঞাত আছেন। জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের মতে—

"The images help us in forming an idea on the prevalence of corruption in the contemporary society."

হাজার রকমের অশ্লীলতা ও যথেচ্ছ যৌনাচারই আজ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতি-শীলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই "প্রগতিশীল" পথেই একদিন "দেবদাসী", "কুমারী পূজা" আর "ভোগের মাধ্যমে যোগের সাধনা" করতে গিয়ে সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডে যে ক্ষয় রোগের সঞ্চার হয়েছিল তার অনিবার্য পরিণতির কথা আমরা জানি। সমাজে নৈতিক শক্তির অবনতি ঘটলে তার ফল যে কত সুদূর-প্রসারী হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আরো অনেক দেশের প্রাচীন ইতিহাসে।

শ্যামল দাস, কোচবিহার।

মহাশয়,

খোসলা কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বম্বের কয়েকজন শিল্পীর মন্তব্য থেকে সাধারণভাবে এটাই মনে করা যেতে পারে যে, মহিলা শিল্পীরা এই সুপারিশকে স্বাগত জানাতে পারছেন না কিন্তু পুরুষ শিল্পীরা এটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এটা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে, সিনেমায় নগ্নদেহ বলতে সাধারণভাবে মহিলাদেরই প্রায়-নগ্ন দেহ দেখা যায়। বিদেশী ছবিতে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, একদিকে পুরুষের পোশাকের অতিশয্য আর তার পাশেই মহিলার পোশাকের অস্বাভাবিক স্বল্পতা—একটা দৃষ্টিকটু বৈষম্য। পুরুষ প্রভাবিত সমাজে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক নিয়ম। এমনিতেই হয়ত মুনাফালোভী প্রযোজক পরিচালকরা মহিলা শিল্পীদের স্বল্প পোশাকের ওপর জোর দেন। সেন্সর বোর্ডের ভয়ে তাদের ইচ্ছা পুরোপুরি সফল করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু একবার যদি সিনেমায় নগ্নদেহ দেখানোর অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে অর্থলোভী প্রযোজক পরিচালকরা মহিলাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে

শরৎচন্দ্রের "অরক্ষণীয়া" অবলম্বনে তৈরি "মা ও মেয়ে" (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে মৌসুমী চ্যাটার্জি ফটো: দেশ

মহিলা শিল্পীদের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের পক্ষে আশঙ্কিত হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক। এই সকল চিত্রে অভিনয়ের জন্য কোন কোন মহিলা হয়ত এগিয়ে আসবেন, কিন্তু বহু গুণী শিল্পী আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সিনেমা জগৎ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন। এর ফলে আমাদের বেশ বড়রকমের একটি ক্ষতি হবে। মনে হয় না এই সুপারিশ কার্যকরী হলে মহৎ শিল্পসৃষ্টির পক্ষে কিছু অবদান যোগাবে। শুধুমাত্র কিছু নীচ সমাজদ্রোহী ব্যবসায়ী লোকের স্বাধীনতা বাড়বে, প্রকৃত শিল্পের কোন উৎকর্ষ লাভ হবে না।

অনেক সময় শোনা যায় যে বাহিরের সেক্সপ্রধান নগ্নদেহ সিনেমার দর্শকরা আমাদের দেশের সিনেমার মধ্যে একটি পৃথক সুর খুঁজে পায় এবং সেগুলোর প্রশংসা করে। এই বিশেষত্বই আমাদের সিনেমার স্থান বিশ্বের আসরে তুলে ধরেছে। ভারতীয় সমাজ জীবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় না রেখে এবং শিল্পের সৌন্দর্য-বোধকে আঘাত করে শুধু বিদেশী জীবনের পঙ্কাঘাতদুষ্ট দিকটি তুলে ধরলে আমাদের ছবি বিশ্বমানচিত্রে স্থান হারাবে। সর্বোপরি দেশের যুবসমাজকে পঙ্গু করার পক্ষে এটা এক দারুন অস্ত্র সে বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

—সত্যব্রত চৌধুরী, কলিকাতা—৩১

মহাশয়,

দেশ-এ প্রকাশিত [illegible] "শিল্পের স্বার্থে চুম্বন, নগ্নদেহ" বিষয়ক আলোচনাটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। যেমন ধরুন—আপনার আশঙ্কা "স্বাধীনতার অপব্যবহার না ঘটে", কারণ "এদেশে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের সঙ্গে যথেচ্ছাচারের সংযোগ বড় নিবিড়"। এছাড়া আজ ভারতবাসীর স্বাভাবিক "সংস্কার ও রুচি এবং সর্বোপরি দেশের ঐতিহ্য"। আমাদের দেশে সমাজের বা দেশের কল্যাণের কথা কজন ভাবেন? যদি বা কেউ ভাবেন তা দুদিনের জন্য। দুদিন বাদে ব্যক্তি-স্বার্থই তাঁর একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের সংস্কার, ঐতিহ্য একান্তই আমাদের নিজস্ব। তা যেন চলতি [illegible] বাহাদুরী কিছু নেই। সমাজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে প্রচলিত কতকগুলি রীতি-নীতি তথা দেশের আইন-কানুনের মতই মেনে চলতে হয়। নিজের গুণের মূল্যায়ন [illegible] নির্দেশও কোনদিন কারো নিজের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণেই ভিন্ন ব্যক্তিকে বিচারকের আসনে বসতে হয় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাও তাই সীমাবদ্ধ।

ইতি—কাঞ্চনবরণ ঘোষ

কমললতার মুক্তি আসন্ন

শরৎচন্দ্রের বহু পঠিত উপন্যাস "শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব" অবলম্বনে তৈরি "কমললতা"র শুটিং শেষ। ছবিটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন। উত্তমকুমার হয়েছেন শ্রীকান্ত। নির্মলকুমার গহর। পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী গঙ্গেই ব্যানার্জি, জহর রায় প্রমুখ ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্র শিল্পী। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

অরণ্যদেব

লী ফক

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অকটোবর তারিখে নতুন দুনিয়ায় পদার্পণ করলেন কলম্বাস।
স্পেনের সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ফারডিনান্ড ও ইসাবেলার নামে আমি নতুন দেশের দখল নিচ্ছি!

??!!

ভুতুড়ে টিপির উপরে বসে পুরনো কাহিনী শোনাচ্ছেন অরণ্যদেব -----
আশ্চর্য! তোমার পূর্বপুরুষ — প্রথম অরণ্যদেবের বাবা - তাহলে কলম্বাসের সহযাত্রী ছিলেন?
হ্যাঁ, ডায়না।

'১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেই ১২ই অকটোবর তারিখে কলম্বাস আসলে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে নেমেছিলেন'
আমি এ-জায়গার নাম রাখলুম সান সালভাডর!

?
!!!

'জাহাজে করে তিনি এগিয়ে চললেন। পথে একটা বিরাট দ্বীপ পড়ল। তিনি ভাবলেন, জাপান। নাম রাখলেন চিপাংগো। আসলে সেই দ্বীপ হচ্ছে কিউবা।'
'প্রাসাদ তাঁর চোখে পড়ল না। শুধু কুঁড়েঘর আর জংলী মানুষ।'

তরুণ ওয়াকার চটপট স্থানীয় ভাষা রপ্ত করে নিল। সেই হল দোভাষী।
মানুষ... মানুষ
মানুষ! আমি!

O×コ∪Λ艹?
আমি জানি না।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মহাত্মা গান্ধী— ... ১৫৭
ব্যঙ্গচিত্র— ... ১৫৮
দৃশ্যপট— ... ১৫৯
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য— ... ১৬২
বৈদেশিকী— ... ১৬৪
সুনন্দর জার্নাল— ... ১৬৫
এখন তোমাকে (কবিতা)—শ্রীপিনাকেশ সরকার ... ১৬৭
ছেলেবেলার ঘাতক (কবিতা)—শ্রীঅরুণেশ ঘোষ ... ১৬৭
অসাড় (কবিতা)—শ্রীমতী সুচেতা ভট্টাচার্য ... ১৬৭
এই নির্মল খাঁচায় (কবিতা)—শ্রীমতী দীপ্তা সেন ... ১৬৭
পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ... ১৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাঙলা, বাঙালী ও গান্ধীজী—শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		৯৭১
পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	৯৯৩
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর	...	১০০১
বাঙলার চালচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার	...	১০০৫
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	...	১০১১
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	১০১৫
জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০১৯
আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	...	১০২৫
চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	১০২৭
অদূরের দিল্লী—দরবেশ	...	১০২৯
আলোচনা—	...	১০৩৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সাহিত্য সংবাদ—শ্রীসনাতন পাঠক ... ১০৩৯

পুস্তক পরিচয়— ... ১০৪১

খেলার মাঠে—একলব্য ... ১০৪৫

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন—মুকুল ... ১০৪৮

রঙ্গজগৎ— ... ১০৪৯

অরণ্যদেব— ... ১০৫৫

সাপ্তাহিক সংবাদ— ... ১০৫৬

প্রচ্ছদ ফটো : শ্রীবীরেন সিংহ

অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ...
হাকোবা
এমব্রয়ডার্ড কাপড়

আট দিনের দিন আমার মুখখানি আশ্চর্য কোমল ও লাবণ্যময় হয়ে উঠল!

পণ্ডস-এর '৭-দিনে রূপলাবণ্য' পরিকল্পনা

এই অঘটন ঘটিয়ে দিল

আমার কালো বিবর্ণ মুখ নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, অথচ সুনীলের সঙ্গে বিশেষ ডিনারে বসতে হবে আর মোটে ৮ দিন বাকি। ভেবে কূল পাইনা, এমন সময় সুনীতার কথা মনে পড়ে গেল। ও বলেছিল, পণ্ডস-এর ৭ দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনায় ও দারুণ কাজ পেয়েছে; ঠিক করলাম, আমিও তাই করব।

পরিকল্পনা ও তার কাজ

এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাত্তিরে একবার নয়, দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলাম। প্রথমে ওপরকার ময়লা ও মেক-আপ উঠে গেল।

দ্বিতীয়বার ক্রীম লাগানোর সময়ই ফুটে উঠল রূপ!

দ্বিতীয়বার মুখে ক্রীম মাখলাম—রূপলাবণ্যের যেন ঘুম ভাঙল! এই ক্রীম চামড়ার খুব ভেতরে গিয়ে এমন সব লুকনো ময়লা বের ক'রে দিল, জল ও সাবান যার নাগাল পায়না। মুখশ্রী হ'য়ে উঠল কমনীয় উজ্জ্বল!

বিশেষ সন্ধ্যাটি আমার স্মরণীয় হ'য়ে রইল... সুনীল বলল, আমার মুখের দিকে চেয়ে নাকি পলক পড়ে না।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম আমি রোজ রাতে দুবার মাখি।

আজ রাত থেকেই পণ্ডস-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা কাজে লাগান—আপনার মুখখানিও হয়ে উঠবে আশ্চর্য কোমল আর লাবণ্যে ভরা!

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম—পৃথিবীর এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই কাটতিতে সবার ওপরে

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

J 4958A

জনপ্রিয়

মারফি

মুসাফির

অন্যান্য জনপ্রিয় মারফি মডেল

মডেল বি-বি ০৮১৬
৩ ব্যাণ্ড ৪১৫ টাকা

২ ব্যাণ্ড ২২০ টাকা

২ ব্যাণ্ড ১৭৫ টাকা

মিডিয়াম ওয়েভ ১২৫ টাকা

মূল্য এক্সাইজ ডিউটি সমেত। অন্যান্য কর আলাদা।

- ছিমছাম, সুন্দর, সংবেদনশীল ৩-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর— পৃথিবীর যে কোন স্টেশন স্পষ্ট ধরা যায়।
- টেলিস্কোপিক অ্যান্টেনা ও বিল্ট-ইন এরিয়্যাল।
- বড়-সাইজ সহজ-লভ্য টর্চ সেল ব্যবহার করে।

প্রত্যেক মারফি ট্রানজিস্টর ভারতের সর্ববৃহৎ অতি আধুনিক ট্রানজিস্টর ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত এবং এর পেছনে আছে ২০ বছরের গবেষণা, বিশেষ জ্ঞান ও কারিগরী নৈপুণ্য।

সুমধুর ধ্বনি, দেখতেও অনুপম, ন্যায্য দাম

প্রকাশিত হল

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নাম কে না জানে! বিশেষ করে বাংলা দেশে। পরিচালনা ছাড়াও চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে — যেমন, চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সংলাপ রচনা, চিত্রনাট্য নির্মাণ, সংগীত পরিচালনা প্রভৃতি — তাঁর অধিকার ও নৈপুণ্যও সর্বজনস্বীকৃতিধন্য। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে তিনি তো নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। এ ছাড়াও কিশোরসাহিত্য সৃষ্টিতে এবং পত্রিকা-সম্পাদনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভা যে শ্বাসরোধকারী গোয়েন্দা-উপন্যাস রচনায়ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তা কে জানতো! বিশেষ করে সেই গোয়েন্দা-উপন্যাস যখন আবার শুধুই শ্বাসরোধকারী নয়, দস্তুরমতো সাহিত্যগুণান্বিতও বটে! একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের কলম থেকে আজ পর্যন্ত যা বেরোয়নি!

সত্যজিৎ রায়ের

অনন্যসাধারণ গোয়েন্দা উপন্যাস

বাদশাহী আংটি

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনী "বাদশাহী আংটি" সত্যি সত্যি এমনই এক জিনিস। যদিও এটি কিশোরদের জন্যে লেখা, তবুও মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে যে-কোনও বয়সের মানুষের কাছেই এটি একটি পরম লোভের বস্তু।

একে তো রোমাঞ্চকর ও বুদ্ধি-ধাঁধানো ঘটনাসন্নিবেশ হেতু এ কাহিনীর আকর্ষণ প্রচণ্ড, এবং আশ্চর্য সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ এর রচনাভঙ্গি, তার ওপর রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের নিজের আঁকা বহুরঙা অপরূপ প্রচ্ছদ এবং বারোটি পুরো-পাতা ইলাসট্রেশন; সুতরাং বোঝাই যায়, নিজে পড়ার এবং অপরকে পড়ানোর মত এমন বই, এবং উপহার দেবার মতও, শুধু এ পুজোয় কেন, আগামী কয়েক পুজোয়ও বেরুবে কিনা সন্দেহ।

দাম ৪·০০

শহর-ইয়ার

সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ দাম ৮·০০

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান সমাজের পটভূমিকায় রচিত লেখকের এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিরও কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর প্রথম উপন্যাসের মতই, এক অসামান্যা রমণী—নাম তার শহর-ইয়ার। সদ্য প্রকাশিত।

কুবেরের বিষয় আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ১০·০০

বাউণ্ডুলে ও পাক্কা ভবঘুরে কুবের সাধুখাঁ বৈভবের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিল। কিন্তু বিষয়ে মগ্ন হতে হতেও সেই প্রকৃতিপ্রেমিক বুঝেছিল আগের মতই মাথায় কোনও শেড নেই তার। সদ্য প্রকাশিত।

নুনের পুতুল সাগরে

ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ দাম ১০·০০

তাৎপর্যহীন কর্তব্যকৃত এবং জীবনজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক সৎ সাহিত্যিকের আত্মানুসন্ধানের এক মহান আলেখ্য জনপ্রিয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ধনঞ্জয় বৈরাগীর সম্প্রতি প্রকাশিত এই বৃহৎ উপন্যাসটি।

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু ॥ দাম ১২·০০

যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ভাঙন মধ্যবিত্ত সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, এক রক্ষণশীল পরিবারের একটি ভীরু মেয়ে কেমন করে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল তারই অপূর্ব উপাখ্যান।

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান

মতি নন্দী ॥ দাম ৪·০০

এই সদ্য প্রকাশিত অনন্যসাধারণ উপন্যাসটি বর্তমান কালের নিম্ন-মধ্যবিত্ত নাগরিক-জীবনের চরম ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে হারতে হারতেও হার না-মানার এক অনবদ্য আলেখ্য।

অসংলগ্না

বনফুল ॥ দাম ৩·০০

'অসংলগ্না' নতুন রীতিতে লেখা এক অদ্ভুতপূর্ব উপন্যাস। জীবনের কতকগুলি ভাব ও কল্পনাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে সেগুলি অবলম্বনে সৃষ্ট এই উপন্যাস একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করবে।

পূর্ণ অপূর্ণ

বিমল কর ॥ দাম ১০·০০

উপন্যাসে নতুনতম চিন্তা ও পরিশীলিত শৈলীর উদ্ভাবকরূপে বিমল করের খ্যাতি আজ বহুবিদিত। নতুন পটভূমিকায় এ-যাবৎ অপরিচিত কয়েকটি চরিত্র নিয়ে রচিত 'পূর্ণ অপূর্ণ' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

বনপলাশির পদাবলী

রমাপদ চৌধুরী ॥ দাম ৮·৫০

সরল অথচ বলিষ্ঠ কাব্যময়তার, গভীর মমতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বাংলা দেশের যে-কোনও সাধারণ গ্রামের মতই একটি গ্রামকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে লেখকের এই সুবিখ্যাত উপন্যাসটি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৯
শনিবার ১৮ আশ্বিন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫·০০
ষান্মাসিক	... ১২·৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষান্মাসিক "	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩৫·০০
ষান্মাসিক "	... ১৭·৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২·০০
ষান্মাসিক "	... ২৬·০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩·০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯·০০
ষান্মাসিক	... ১৯·৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০·০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

DESH

Saturday, Oct. 4, 1969

মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কীর্তিমান বিরাট পুরুষ, মহাশক্তিধর রাজনৈতিক নেতা অথবা মানবহিতৈষী কর্মী-পুরুষ অবশ্যই আছেন; সংখ্যায় এঁরা একেবারে নগণ্যও নয়। তবু গান্ধীজী আধুনিক মানবসভ্যতার এমন এক অমূল্য নিধি যাঁর জন্যে সমগ্র বিশ্ব নিভৃতে এক শ্রদ্ধার আসন গেঁথে রেখেছে। ইনি সেই মানুষ যিনি বিদ্বেষ, ঘৃণা, মিথ্যা ও ছলনা দিয়ে সংগ্রামে বিজয়ী হন নি, কোথাও মালিন্য ও কলঙ্ক রেখে বিজয়মাল্য পরেন নি। এই কারণেই তিনি মহাত্মা।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিগত একশোটি বছর নিতান্তই ক্লান্তিকর নয়। বিশেষ করে গত শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। গান্ধীজীর আবির্ভাব, রাজনৈতিক অর্থে, এই শতকের একেবারে গোড়ায়। তবু হয়ত বলা যায়, তাঁর প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র স্বদেশ নয়, বিদেশ এবং তাও তত প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু এই সময় থেকেই গান্ধীজী তাঁর নৈতিক, চারিত্রিক এবং নিজস্ব মনোভঙ্গিকে এমন করে গড়ে তুলছিলেন যাতে মনে হয় তিনি কোনো একটি বিরাট আরব্ধ কর্মের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই কর্মভার তিনি স্বদেশে ফিরে এসে তুলে নিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর পর। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক সূর্যোদয়। তারপর পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর অবিশ্বাস্য সংগ্রাম শেষ হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর। কিন্তু সর্বজনেই জ্ঞাত আছেন, নিছক স্বাধীনতা লাভ গান্ধীজীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না, তিনি আরও সঙ্গত, স্বাভাবিক মানবাধিকার চেয়েছিলেন সকলের জন্যে, যেখানে মানুষ নৈতিক দিক থেকে উন্নত, রাজনৈতিক দিক থেকে নির্ভয়, জীবনযাপনের দিক থেকে স্বাভাবিক ও সুন্দর। গান্ধীজীর এ আশা নিশ্চয় সফল হয় নি। কিন্তু সে ব্যর্থতা তাঁর নয়, আমাদের।

মহাত্মাজীকে কেউ কেউ ভারতীয় আত্মার মূর্ত প্রতীক বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিভীষিকা ও উত্তেজনার জগতে, যেখানে বিত্ত ও ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভ মানুষকে হৃদয়হীন ও অন্ধ করে দিচ্ছে সেখানে গান্ধীজী এক বিরাট বিদ্রোহ, আত্মিক বিদ্রোহ। এই আত্মিক বিদ্রোহে তিনি বিশুদ্ধ অর্থে নৈরাজ্য-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা অন্যান্য রাষ্ট্রনেতার অনুরূপ নয়। রাষ্ট্রের শক্তি অপেক্ষা তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি—তার শুভবোধ, চরিত্রগুণ, সত্য-বাদিতার ওপরেই বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। এবং এই আত্মিক শক্তি যে কত বলবান তা তাঁর অহিংস প্রতিরোধ নীতি বারে বারে প্রমাণ করেছে। আজ এই অহিংসার শক্তি জগতে স্বীকৃত সত্য।

মহাত্মাজীর শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি অথবা করি নি সে প্রশ্ন আলাদা; তাঁর শিক্ষার বিষয়গুলি কিন্তু আজও আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে। এর মধ্যে প্রধান হল : মানবপ্রেম, সর্বমানুষের জন্যে ভ্রাতৃত্ববোধ: ধর্মবোধ বা সেই ধর্মভাব যা মানুষকে আত্মিকভাবে উন্নত ও মার্জিত করে। গান্ধীজী কখনও সেই লৌকিক আচরণীয় সংকীর্ণ ধর্মবোধের কথা বলেন নি, যা প্রায়শই মানুষকে গোঁড়া ও উগ্র করে তোলে। তিনি তাঁর শিক্ষায় বলেছেন : অহিংসা, সত্য, শারীরিক শ্রম, নম্রতা, সর্বধর্মে সহিষ্ণুতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন—ইত্যাদি আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য সাধু হলে উপায়কেও সৎ হতে হবে, অসৎ পথ দিয়ে উত্তম দ্রব্য লাভ করা যায় না।

বর্তমান ভারতের যে অবস্থা তাতে মহাত্মাজীকে অনুধাবন করার মতন লোক খুবই কম। এমন কি মহাত্মাজীর সেই জাতীয় কংগ্রেস আজ কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে তাও আমাদের অজানা নয়। গান্ধীজী নিজের শেষ জীবনে কংগ্রেসের এই অধঃপতন, তার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও লোভ দেখে এই দলের প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই বর্তমান কংগ্রেসের সঙ্গে মহাত্মাজীকে জড়িয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কংগ্রেস যাই বলুক, গান্ধীজী কংগ্রেসের সম্পত্তি নন—সকল মানুষের। তাঁর জীবনসাধনার কথাগুলি যদি আজ আমরা ধৈর্য ধরে শোনার চেষ্টা করি তাতে উপকৃতই হব। গান্ধী জন্মজয়ন্তীর শতবর্ষ পূর্তিতে আমরা এই মহামানবকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করি।

তোমারি নামে প্রভু......
উপায়ে কী আসে যায়
ক্ষমতার লড়াই

নেতারা আরও বলে দিলেন, যে সব হিন্দু পাকিস্তান থেকে বেরোতে বাধ্য হলেন তাঁরাও পাকিস্তানকে নিজের দেশ বলে মেনে নিতে পারবেন!

দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি যে এই উপমহাদেশে কী বিষ ছড়িয়ে রেখে গেছে তা এখনও আমরা সকলে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এবং সেই বিষের ক্রিয়া আমাদের আরও বহু ক্ষতি অবধারিত বলেই আমি আশঙ্কা করি।

*

নেতারা খুব জোর গলায় বলেন, ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে একজন খৃষ্টানের পক্ষে এই জিনিসটা মেনে নেওয়া যত সহজ একজন মুসলমানের পক্ষে বক্তব্যটা গ্রহণ করা কি তত সহজ? আর সংবিধানে বা আইনে সেকুলারিজম থাকলেই কি দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল হয়ে যায়?

ধরুন, অজিত সোম নামক একজন ভারতীয় খৃষ্টান বললেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকা বড় ভাল রাষ্ট্র। অধিকাংশ হিন্দু কি বলবেন? কেউ মনে করবেন, ওই রাষ্ট্র দুটি খৃষ্টান প্রধান বলেই সোম উপাধির এই ভারতীয় খৃষ্টানের মুখে তাদের এত প্রশংসা? অথবা ধরুন, তিনি বললেন, পাকিস্তান বড় ভাল রাষ্ট্র। কেউ বলবেন, লোকটা পাকিস্তানের চর? কিন্তু এই কথাটা যদি মুজিবর আহমদ নামক [illegible] কোনও মুসলমানের মুখে শুনি? আপনারাই ভেবে দেখুন, কে কি বলবেন।

এমনিভাবে আমি নবারুণ গুপ্ত যদি বলি কাশ্মীর সত্যিই পাকিস্তানকে যাওয়া উচিত তাহলে কেউ আমার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে আবিষ্কার করবেন বা কেউ আমার ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবেন? কিন্তু কথাটা যদি হাওড়ার কোনও রফিক তরফদারের মুখে শুনি? ভেবে দেখুন, আমরা অধিকাংশ কি বলব।

অথবা ধরুন, কোনও এক পাদ্রি সাহেব ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে গিয়ে হিন্দু ধর্মকে গালিগালাজ করলেন। আমরা অধিকাংশই ধরে নেব, পাদ্রি পাগল। দুচার জন দুচারটে চড়চাপড়ও বসিয়ে দিতে পারেন। খুব বেশি উগ্র কেউ সামনে থাকলে একটা খুনও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ও নিয়ে কলকাতায় হিন্দু-খৃষ্টানে দাঙ্গা লাগতে পারে কি? কিন্তু যদি লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা কোনও ভদ্রলোক আল্লা আল্লা বলতে বলতে ঠনঠনেতে ওইরূপ আচরণ করেন? ফলাফল কি হতে পারে ভেবে দেখুন।

ভারত সেকুলার রাষ্ট্র—কিন্তু ভারত সরকার হিন্দুদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন, মুসলমানদের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে পারেন কি? সরকার হিন্দু কোড বিল পাশ করেছেন। কোনও হিন্দুর একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মুসলিম কোড বিল এখনও হয় নি কেন? মুসলমানদের ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ বেআইনী করতে সরকার এগিয়ে আসেন নি কেন? এর পেছনে একটি মানসিকতাই কাজ করছে না কি, নিজের ছেলেকে মারা যায়, কিন্তু পরের ছেলেকে শাসনও করা উচিত নয়?

আমরা [illegible] মুসলমানদের [illegible] প্রাণ বলিদান দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি ভারত সেকুলার রাষ্ট্র। আমাদের সরকার হাতে-পায়ে ধরে ঐস্লামিক শীর্ষ সম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্র আদায় করেন। কিন্তু এই সরকারই কি কোনও হিন্দু মহাসম্মেলন হলে তাতে প্রতিনিধি পাঠাবেন? না, কিছুতেই পাঠাবেন না। কারণ, ভয় আছে। নেতারা মনে করেন, তাহলে ভারতের সাত কোটি মুসলমান, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন কোটি ভোটদাতা মনে করবেন, ভারতের সেকুলারত্ব গেল!

কিন্তু এত চেষ্টা করেও সরকার ভারতের কত লক্ষ মুসলমানের মনে এই ভরসা জাগাতে পেরেছেন যে, তাঁরাও এই ভারতের একজন খৃষ্টান বা হিন্দুর মতই সমান অধিকারের নাগরিক?

*

পাকিস্তানের প্রসঙ্গ আমি ইচ্ছা করেই আলোচনা করলাম না। কারণ ওটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মতই ঐস্লামিক রাষ্ট্র—বিধর্মীর প্রতিপক্ষ সেখানে কাফের। কাফেরের চরিত্র মনে হয়, পাকিস্তানে অ-মুসলমান সকলেই সেকেণ্ড ক্লাশ সিটিজেন।

কিন্তু ভারতে তা নয়। ভারতের খৃষ্টান, শিখ, পার্শি, বৌদ্ধ, জৈনরা কেউ ভাবেন না এ দেশের একজন হিন্দুর সমান অধিকারের নাগরিক তিনি নন। হিন্দুরা অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক হলে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গেও তাদের হানাহানি হত। কিন্তু তা হয় না।

এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের দুর্ভাগ্য, বিদেশী শত্রু এবং স্বদেশী নেতারা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন, এমন বিষ ছড়িয়ে রাখা আছে যে দুই ধর্মের মানুষের পক্ষে এই উপমহাদেশে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া কঠিন। বিশেষ করে, ধর্মের ভিত্তিতে গড়া রাষ্ট্রটি যতদিন সেই ধর্মীয় ভিত অটুট রাখছে।

হাল ছেড়ে দিলে অবশ্য চলবে না। এই উপমহাদেশে যাতে সকলে সকলকে মুক্ত মানুষ হিসাবে দেখতে এবং বুঝতে শেখে সেজন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। যদি আমরা তা না করতে পারি, যদি হিন্দু ও মুসলমানের আলাদা বিচারে মানুষকে দেখতে থাকি তাহলে আমাদের হানাহানি কেউ কোনওদিন বন্ধ করতে পারবে না। উভয় সম্প্রদায়ের দুর্গতি এবং দুর্দশা আরও বাড়বে।

নবারুণ গুপ্ত

● গ ল্প লি খ ছে ন ●

অন্নদাশঙ্কর রায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নরেন্দ্রনাথ মিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিভা বসু প্রমথনাথ বিশী বনফুল বিমল কর রমাপদ চৌধুরী শিবরাম চক্রবর্তী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

● প্র ব ন্ধ ও র ম্য র চ না লি খ ছে ন ●

কাবেরী বসু মৃণাল সেন শান্তি ভঞ্জ সাধনকুমার দত্ত সৈয়দ মুজতবা আলী।

● ক বি তা লি খ ছে ন ●

অজিত দত্ত অমিয় চক্রবর্তী অরুণকুমার সরকার কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জসীমুদ্দীন দিনেশ দাস নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিষ্ণু দে শক্তি চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুশীল রায় হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি।

● উ প ন্যা স ●

রাজা বদল ঃ বিমল মিত্র

[illegible]

অনেক দূর ঃ শংকর

[illegible]

নিশীথ ফেরি ঃ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]

● বি শে ষ র চ না ●

রবীন্দ্রনাথের প্রথম হিন্দী বক্তৃতা

[illegible]

শব্দছক ঃ সত্যজিৎ রায়

[illegible]

● না ট ক ●

পুনর্মিলন ঃ বুদ্ধদেব বসু

[illegible]

● ছো ট উ প ন্যা স ●

মানুষ ঃ সমরেশ বসু

[illegible]

০ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ০

রঙিন আর্ট প্লেট ঃ মহিষমর্দিনীর প্রাচীন চিত্র । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । প্রকাশ কর্মকার

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে দাম ৪·০০ ॥ রেজিস্ট্রি ডাকে ৫·০০

রাবাতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ ঐসলামিক সম্মেলনে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের যোগদান নিয়ে নানা মহলে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, তা যে অবান্তর এবং এ নিয়ে বেশী কচলালে আমাদের ভাগ্যবিধাতৃ প্রধানমন্ত্রীর সদ্য-উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত ভাবমূর্তিখানি যে মলিন হয়ে উঠতে পারে, এ পোড়া দেশে এ কথা বিবেচনা করার মত লোকের এত অভাব ঘটেছে, সেইটাই আশ্চর্য। বলি হয়েছেটা কি? ভারতকে নেমন্তন্ন না করা সত্ত্বেও সে রাবাতে গিয়েছে? তাকে সম্মেলন থেকে পাক চক্রে বাদ দেওয়ায় তার অপমান হয়েছে? এ কি একটা হইচই বাধাবার বিষয় হল!

ভারতকে নেমন্তন্ন জানান হয়নি এ কথা ঠিক নয়। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ জানান হয়নি। পত্র দ্বারা আপনজনকে নিমন্ত্রণ আর কে কবে করেছে? এ রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই। সেই কারণেই নেমন্তন্নর ছাপা চিঠির নীচে পষ্টো পষ্টো করে লিখে দিতে হয়, "পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনীয়।" কাজেই রাবাত থেকে চিঠির মারফতে বরাত আসেনি। *ঐসলামিক সম্মেলনের কর্মকর্তাগণ ভারতীয় আদবকায়দা সম্পর্কে কতটা খবর রাখেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধা যে কত গভীর এটা জেনে কোথায় আমরা আহ্লাদ করব, তা নয় চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় তুলছি। কেউ কেউ এমন ফাকিড়াও তুলেছেন যে, ভারত যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছে। আরে এ কি একটা কথা হল! ভারত আদৌ যেচে নেমন্তন্ন নেয়নি। সে শুধু এই কথাটা জানিয়ে দিয়েছে যে, কোথাও নেমন্তন্ন পেলে তার যেতে আপত্তি নেই। ভারতের রাষ্ট্রদূতের মুখে এই সংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐসলামিক সম্মেলনের কর্মকর্তারা তাকে "আস্তাজ্ঞে হোক, আস্তাজ্ঞে হোক" বলে ডেকে নিয়েছেন।*

কেউ কেউ এমনও বলেছেন, সম্মেলন থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ চক্রান্ত করে ভারতকে বাদ দেওয়ায় ভারতের অপমান হয়েছে। এর উত্তরে বলতে হয়, ভারতকে কেউ বাদ দেয়নি, ভারত আমন্ত্রণ-কারীদের মান বাঁচাতে নিজেই বেরিয়ে এসেছে। এবং অতিথির এই প্রকার বিবেচনা-পূর্ণ আচরণে আমন্ত্রণকারীরা অতিশয় আনন্দ লাভ করেছেন। এতে তার ভাবমূর্তি আরব দেশের মরীচিকার মত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আর পাকিস্তানের কথায় ও কাজে কবে ভারত অপমানিত বোধ করেছে!

ঐসলামিক সম্মেলনে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের যাওয়ারই বা দরকার কী ছিল? এইরকম আজেবাজে প্রশ্নও অনেকে তুলেছেন। যেখানে ধর্ম নেই সেখানে যেমন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, ভারতও তেমনি যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই, সেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। এই মিশনারি স্পিরিট ভারত অশোকের আমল থেকে দেখিয়ে আসছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মটা লোককে বোঝাতে হবে তো, না কি!

দুর্গাপুজোর ভাসানের জন্য যদি চার দিন ট্র্যাফিক জ্যাম করতে হয় তো মহরমের জন্যও চার দিন, পরেশনাথের মিছিলের জন্য চার দিন। *এছাড়া তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর আবাহন বিসর্জন এবং বত্রিশ কোটি অবতার ও মহাত্মাগণের আবির্ভাব তিরোভাব, পূতাস্থি বিসর্জন এবং আরও অশেষ প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাস্তাঘাটের যানবাহন বিপর্যস্ত করার জন্য দিন বরাদ্দ করেই বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মহিমা প্রচার আমাদের অবশ্যকরণীয়।*

বিবেকের মার

পলিটিকসে বিবেক বস্তুটি যে অতিশয় গুরুপাক এবং দলের লোককে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ দিলে তা যে হজম করা শক্ত হবে, এমন একটা আশংকা গোড়াতেই করা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বিষবৃক্ষের ফল যে এমনভাবে ফলবে এবং এত শীঘ্র তা বোধ হয় পলিটিক্যাল বিবেকের অধিষ্ঠাত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিকমত পরিমাপ করতে পারেননি। এই বিবেক পথিকের ইমফল সফরের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে, তাঁর সান্নিধ্যে আসার জন্যেই কি না কে জানে, নরজন কংগ্রেসী এম এল এ-র বিবেক হঠাৎ চাগাড় মেরে ওঠে, এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর সৃষ্ট নজির অনুসরণ করে তাঁরা দলীয় শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেন। অতঃপর মণিপুরে রাজনীতির আসরে বিবেকের প্রবেশ ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ও মূর্ছা। এই সংবাদটি পাবার পর প্রধান-মন্ত্রীর মনের ভাব কেমন হয়েছিল, তিনি "ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখিনি রে", এই গানটি গেয়ে উঠেছিলেন কিনা, অথবা এই নরজন বিবেক-বীরকে "ভারতের বিবেক" জাতীয় কোনও প্রকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য কোনও প্রস্তাব বিবেচনা করেছেন কিনা, সংবাদে তা জানা যাচ্ছে না। পি টি আই শুধু এইটুকু থেকে যে সংক্ষিপ্ততম সংবাদ প্রচার করেছেন, তাতে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মণিপুরের কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদের ফলেই কৈরেন সিং মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। (কি গভীর দূরদর্শিতা!) শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন, এ বিরোধের মীমাংসা আগেই হওয়া উচিত ছিল। (এবং কি আশ্চর্য সমাধান!)।

এদিকে ইমফলের খবরে দেখা যাচ্ছে, প্রদেশ কংগ্রেস বিবেকবাদী ওই নরজন কংগ্রেসী এম এল এ-কে পত্রপাঠ দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের এইরূপ অ-কংগ্রেসজনোচিত ব্যবহারে বিবেকবাদী কংগ্রেস মহলের কোমল এবং স্পর্শকাতর হৃদয়ে যে সবিশেষ আঘাত লাগবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। ওয়ার্কিং কমিটির ঐতিহাসিক শান্তি প্রস্তাবকে কি এর দ্বারা অবমাননা করা হল না? কংগ্রেসে সম্প্রতি যে-সব আসর-গরম যাত্রার পালা রচিত হয়েছে, তার ধরনটা এইরকম : একজন সদস্য দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি কদলীমুদ্রা প্রদর্শন করবেন। তারপর দুই দলে হুলুস্থুলু বাধাবেন। তারপর উচ্চ মহল থেকে শান্তি প্রস্তাব পেশ করা হবে। উভয় পক্ষই তা মেনে নেবেন। কেউ কংগ্রেস ছাড়বেন না। তারপর ব্যক্তিগত স্তরে কটূকাটব্য শুরু হবে। তারপর প্রধানমন্ত্রী জনসংযোগ সফরে বের হবেন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য একটা অ্যাড-হক অভ্যর্থনা সমিতি তৈরি হবে। তাতে প্রথমে প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও সরকারী প্রতিনিধি থাকবে না। এই নিয়ে ঘোঁট হবে। তারপর আবার শান্তি প্রস্তাব, তারপর......রেকারিং ডেসিমেল পদ্ধতিতে কংগ্রেসের বিরহ-মিলন পালা চলতে থাকবে। এই তো প্রথা।

কিন্তু মণিপুরে এ কী! এইরূপ প্রথা-বিরুদ্ধ কাজ কি করা উচিত। ছিঃ।

দেবরাজ

হামেশা বিপ্লব

দক্ষিণ আমেরিকায় বিপ্লব হামেশা লেগেই আছে। আর বলিভিয়া বোধ হয় এ ব্যাপারে সকলকে টেক্কা দিতে পারে। দেশটা স্বাধীন হয়েছে ১৪৪ বছর। কিন্তু এরই মধ্যে সেখানে বিপ্লব হয়েছে ১৮৯টা। কাজেই বিপ্লব ঘটেছে শুনলে সেখানকার লোকেরাও আঁতকে ওঠে না, ভিন দেশের লোকেরাও তেমন চমকায় না। তার কারণ হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে বিপ্লবগুলির সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবেরও তুলনা চলে না, রুশ বিপ্লবেরও নয়। চীনের বিপ্লবের সঙ্গে এদের কোনও মিল নেই, এমন কী মিল নেই ও-অঞ্চলের যে বিপ্লব নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে সেই কাস্ট্রোর কিউবা বিপ্লবেরও। অন্য দেশে যা হয়ে থাকে, নির্বাচন করে ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে তাই হয় বিপ্লব ঘটিয়ে। নির্বাচনে হয় সরকার বদল। এক রাষ্ট্রপতি যান, আর একজন আসেন। এক প্রধানমন্ত্রী হেরে গদি ছেড়ে দেন, আর একজন জিতে সে গদি দখল করেন। তবে তফাতের মধ্যে এই, নির্বাচন হয় শান্তিতে, সরকার বদল হয় নির্বিঘ্নে। জোর জবরদস্তির কথা সেখানে ওঠে না। আর দক্ষিণ আমেরিকার বৈপ্লবিক সরকার বদল সবটাই গায়ের জোরের ব্যাপার।

ল্যাটিন আমেরিকায় "বিপ্লব বিপ্লব" খেলার খেলুড়ে হচ্ছেন ফৌজী প্রধানেরা। স্থলসেনা, নৌবাহিনী কিংবা বিমান বহরের যাঁরা অধ্যক্ষ তাঁরাই হচ্ছেন বিপ্লব নাটকের নায়ক, জিত হয় প্রায় তাঁদেরই। আর খলনায়ক হচ্ছেন গণতন্ত্রী নেতারা। এঁদের শায়েস্তা করে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্যই বিপ্লবের ঠাট। সে বিপ্লবে গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের জয় হয় না, হয় ফৌজীতন্ত্রের। কখনও একা, কখনও বা আর দু'তিনজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গদি দখল করেন ফৌজী প্রধান। তারপর তাঁর স্বৈরাচারী শাসন চলে যতদিন না তাঁর কোনও জঙ্গী প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশকে হাত করে তাঁকে গলা ধাক্কা দিয়ে গদি থেকে নামিয়ে সেটা দখল করে বসে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে তাই ক্ষমতার চাবিকাঠি মিলিটারি আর পুলিশের হাতে। ক্ষমতার লড়াইয়ের ফয়শালা সেখানে হয় ব্যালটে নয় বুলেটে। তবে বুলেট খরচাও তেমন বেশী সাধারণত হয় না। দুচারটে ছুঁড়লেই প্রায় কেল্লা ফতে হয়। রক্তপাতও কদাচিৎ বেশী হয়। সবটাই যেন যাত্রাদলের সাজানো লড়াই। অধিকারীর বাঁশী বাজলেই একজন আসর ছাড়ে, আর একজন ঢুকে বসে।

জঙ্গী হুকুমত এখন দক্ষিণ আমেরিকার অন্তত ৮টি রাষ্ট্রে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ২৬ সেপ্টেম্বর বলিভিয়া। তার ডাইনে পেরু, বাঁয়ে ব্রেজিল আর প্যারাগুয়ে, মাথার ওপরে ব্রেজিল আর তলায় আর্জেন্টিনা। ওই চারটে দেশেই চলছে ফৌজী শাসন। বলিভিয়া এবার ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিললো। সেখানকার সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রপতি লুইস আডোলফো সাইলস্ সিলাসকে হটিয়ে দিয়ে একনায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছেন জেনারেল আলফ্রেডো কান্ডিয়া। একদিন পরে তাঁর অভিষেকও হয়ে গিয়েছে। বলিভিয়াতে কায়েম হয়েছে মিলিটারি শাসন। তবে ফৌজী সরকার বলিভিয়াতে কিছু নতুন নয়, জেনারেল আলফ্রেডো ওভাণ্ডো কান্ডিয়ারও দেশের কাণ্ডারী হওয়াতে কিছু নতুনত্ব নেই। শেষ সামরিক অভ্যুত্থান দেশে ঘটেছিল পাঁচ বছর আগে। রাষ্ট্রপতি ভিক্টর পাজ এসটেন্সসোরো তখন পালিয়ে বাঁচেন। ফৌজী নেতাদের তরফ থেকে যুগ্ম রাষ্ট্রপতি হলেন জেনারেল রেনে ব্যারিয়েন্টস অরটুনো আর জেনারেল আলফ্রেডো ওভাণ্ডো কান্ডিয়া। পাঁচ বছর পরে ওই ওভাণ্ডো কান্ডিয়াই ফিরে এসেছেন বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ভবনে একা।

কদ্দিন তিনি গদিতে থাকবেন তা বলা শক্ত। তবে তাঁর দেশের যা ইতিহাস তাতে খুব বেশী দিন তিনি যে টিকতে পারবেন সে ভরসা কম। আটচল্লিশ বছরে বলিভিয়া প্রেসিডেন্ট পাল্টেছে এই নিয়ে বিশ বার। গড়ে দু বছরের কিছু কম গদিতে ছিলেন এক একজন। এর মধ্যে দিন কতক ছিলেন দুজন ক্ষমতা ভাগাভাগি করে এক সঙ্গে যুগ্ম রাষ্ট্রপতি হিসেবে। একজন ও [illegible] অধিকারী হয়েছেন দুবার তবে শেষ বার তাঁর কাছ থেকে গদি কেড়ে নিয়েছিলেন ফৌজী প্রধানেরা। অস্বাভাবিকভাবে গদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও পাঁচ জন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। তাঁদের একজনকে উন্মত্ত জনতা মেরে ফেলে। এ ছাড়া একজন করেছেন আত্মহত্যা, একজন দিয়েছেন কাজে ইস্তফা। বিমান দুর্ঘটনাতেও প্রাণ হারিয়েছেন একজন। দুজন আবার ছিলেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে কাঁটার মুকুট যদি কোনও রাষ্ট্রপতির থাকে তো তিনি হচ্ছেন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট। এমন অভিশপ্ত গদি বোধ হয় দুনিয়াতে দুটি নেই। তবুও আশ্চর্য, ওই গদির লোভে মারামারি হানাহানির আর শেষ নেই।

তিন বছর আগে মনে হয়েছিল বলিভিয়ার বরাত বুঝি ফিরলো, গণতন্ত্র বুঝি সে দেশে শেষ পর্যন্ত ফিরেই এলো। ১৯৬৪ সালে যে বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রপতি এসটেন্সসরো গদিচ্যুত হন তার নাটের গুরু ছিলেন জেনারেল ব্যারিয়েন্টস অর্টুনো আর জেনারেল ওভাণ্ডো কান্ডিয়া। ১৯৬৬ সালে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল বলিভিয়াতে। তাতে জেতে জেনারেল ব্যারিয়েন্টসের বলিভিয়ান বৈপ্লবিক ফ্রন্ট। ১৯৬৭ সালের [illegible] গণতান্ত্রিক সংবিধান আবার চালু হলো। জেনারেল ব্যারিয়েন্টস হলেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। গোটা দেশে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল খুব। সেনাবাহিনীও তাঁর বশে ছিল, দেশের লোকেরাও তাঁকে ভালবাসতো। জেনারেল ওভাণ্ডো কান্ডিয়া যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুগ্ম রাষ্ট্রপতি তিনি ফিরে গেলেন ফৌজী শিবিরে, তাঁকে দেওয়া হলো প্রধান সেনাপতির পদ। ক্ষমতার লোভ তাঁর নিশ্চয় ছিল। তবে তাঁকে চুপচাপ থাকতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েন্টসের দেশের উপর প্রভাব দেখে। কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন। বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন রাষ্ট্রপতি ব্যারিয়েন্টস এপ্রিল মাসের শেষ দিকে।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির গদি দখল করলেন উপরাষ্ট্রপতি সাইলস সালিনাস। তিনি ফৌজী নেতা নন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, জেনারেল ওভাণ্ডোর [illegible] তিনি বাতিরের লোক এই [illegible] [illegible] নিয়েছিল তিনিও নির্বাচনে [illegible] করতে পারবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রকম। দুর্জনে বলে সে বিধাতা হচ্ছেন মার্কিন দেশ। কি জানি এর চক্রান্তেই নাকি এবারে বলিভিয়াতে সামরিক বিপ্লব ঘটলো। এ গুজব সত্যি কি মিথ্যা তা যাচাই করার উপায় নেই। তবে বলিভিয়াকে আমেরিকার বড় ভয়। কাস্ট্রোর সহকর্মী চে গুয়েভারার ঘাঁটি ছিল বলিভিয়ার জঙ্গলেই। গেরিলা বাহিনী তৈরি করে কিউবার মতো সেখানে বিপ্লব ঘটাবার সংকল্প তার ছিল। কিন্তু সে সাধ তাঁর অপূর্ণ রইলো। [illegible] ১৯৬৭ সালে তিনি প্রাণ হারালেন বলিভিয়াতে। তাঁর দল গুঁড়িয়ে গেলেও বেঁচে রইলেন গাইডো ইনতি পেরেদো। এ সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন নতুন করে গেরিলা লড়াই শুরু করার অভিপ্রায়। তার সূত্রপাত এখনও হয়নি বটে কিন্তু অনেকের ধারণা তাতেই বেসামাল হয়ে আমেরিকা গোপনে উস্কে দিয়েছে জেনারেল ওভাণ্ডো কান্ডিয়াকে। বলিভিয়াতে গেরিলা লড়াই রুখতে গেলে তাঁর মত লোকই চাই— আমেরিকার এই বিশ্বাস। সেজন্যই নাকি সে গণতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে বলিভিয়াতে।

'শরৎচন্দ্রের কথায়'

শরৎচন্দ্রের ভাবনাই মনে আসছিল। তাঁর চাইতে শক্তিমান ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে আসেন নি এবং আসবেন না, কেউই একথা কোনোদিন বলবেন না। কিন্তু সমস্ত ভারতের হৃদয়ের মধ্যে এমন করে আর কোন্ বাঙালী লেখক ছড়িয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া! একালের অনেক বাঙালী লেখকই ভারতবর্ষের নানা ভাষায়

কি নাম? চরিত্রহীন? না, সরকারী পয়সায় ওসব নোংরামী ছাপতে পারব না

অনূদিত হয়েছেন জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, অবাঙালীরাও তাঁদের সকলকে বিমুখ করেন নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

মাসের তালিকাটি শেষ করার পর দিল্লীর সেই বিখ্যাত হিন্দী পত্রিকা সাপ্তাহিক হিন্দুস্থানের ২৯শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যাটি হাতে এল। সেই পত্রিকাখানাতে সাম্প্রতিক এক বিতর্কিত সমালোচনা ছাপা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় নাটকের কাঠগড়ায় উঠিয়ে হয়েছিল দিল্লী [illegible] শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রের কল্যাণে। ছাপাতে ছাপায় অতি মনোরম এই পত্রিকাটি বোধ হয় হিন্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। এই কাগজেই মনীষী শ্রীযুক্ত বিষ্ণু প্রভাকর লিখছেন : 'শরতকে রহস্যময় জীবনকা অনাবরণ পরিচয়।' কী নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম নিয়েই শ্রী প্রভাকর শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের রহস্য সন্ধান করতে চেয়েছেন, প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'অনাপ চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অপবাদ-গাথা কত অসত্য, কত অতিরঞ্জিত। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয়

ছিল, দেশের সেইসব জীবিত এবং মৃত মানুষগুলির কাছ থেকে সাক্ষী-প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। তাঁর মধ্যে রয়েছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দার, বি রক্ষিত রায় এবং আরো অনেকে।

কিন্তু প্রবন্ধটির কথা থাক। প্রশ্ন হল, এতদিন পরেও হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কেন এত জিজ্ঞাসা, এত কৌতূহল? উত্তর একটিই। শরৎচন্দ্র বাঙালীর একলার নন—তিনি সারা ভারতবর্ষের প্রাণের মানুষ। তাই একান্ত প্রিয়জনের অপযশ-ক্ষালনের জন্য আজও শ্রীবিষ্ণু প্রভাকরকে কলম ধরতে হয়েছে।

অথচ—এই বাংলা দেশেই শরৎচন্দ্রের বই নিয়ে একটা বিচিত্র অবস্থা চলছে। এক সময় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন তাঁর প্রধান প্রকাশক, আর আমাদের মতো মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে থাকত বসুমতীর গ্রন্থাবলী। এখন সে গ্রন্থাবলী আর পাওয়া যায় না। আর গুরুদাসের পক্ষপুট থেকে বেরিয়ে শরৎচন্দ্র বিস্ময়ময় পরিব্রাজক—আজ এই প্রকাশকের ঘরে—কাল ও'র আস্তানায়। বইগুলোর দাম বেড়েছে, ছাপায় অযত্ন—একখণ্ড দ্বিতীয় পর্ব 'শ্রীকান্ত' কিনে মাঝখানে তিন ফর্মা তৃতীয় পর্ব উপহার পাওয়া গেল—অবশ্যই দ্বিতীয় পর্বের তিন ফর্মার বিনিময়ে। আর শরৎচন্দ্রের রচনা সংগ্রহ বলে যে বস্তুটি প্রকাশিত হয়েছিল। (বা হয়—ঠিক জানি না), তাতে বৈষয়িক বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো বোধ আছে বলেই আমার মনে হয় নি।

শরৎ-সাহিত্যের যে সুষ্ঠু, শোভন এবং সতর্ক মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়া কত দরকার,

তার ছিল পথের দাবী, আমরা সেতুর দাবী মিটিয়েছি, সেতুও তো একরকম পথ

দেবদাস? সেই মাতালের গপ্পো? না, বাপুর সেন্টেনারীতে মাতালের কান্ড ছাপতে পারব না

এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদা শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' বইটি বোধহয় স্কুল-ফাইনালের পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছিল। যাঁরা নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা বোধহয় জানতেন না যে বইটির ভেতরে 'পথনির্দেশ' রচনাটিও ছিল, সুতরাং ওটিও পাঠ্য হয়ে গেল। তা হোক, বাংলা দেশের বালক-বালিকারা যদি 'পথনির্দেশ' পড়ে হৃদয়ঙ্গম করে, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু প্রকাশক ভাবলেন, সুকুমারমতিদের জন্য বইটি 'এডিট' করা দরকার। সে কঠোর কাজটি কে করলেন জানি না, কিন্তু খুঁজে পেলেন দারুণ একটি আপত্তিকর শব্দ : 'শালা।'

শব্দটি অবশ্য আমাদের ওষ্ঠাগ্রে সদা-প্রস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মহাপুরুষ মুচিরাম গুড় প্রথম বাকস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতাকে ওই শব্দেই সম্ভাষণ করেছিলেন। যাই হোক, যিনি 'এডিটর'—তিনি শব্দটিকে উৎপাটন করলেন রত্নের সমষ্টির একটি ক্লাসিক বাক্য থেকে—সেটি

উচ্চারণ করেছিলেন নীলমণি ডাক্তার রামের শাসানির পর, সমবেত রোগীদের কাছ থেকে সাক্ষী দেবার ব্যাপারে সহযোগিতা না পেয়ে, পৃথিবীর যেটি 'সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্য'—"দুনিয়ায় কোন শালার ভালো করতে নেই!"

রসবোধ না থাকলেও চলে, কিন্তু এক বিন্দু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়—ওখানে "শালা" শব্দটির কোনো বিকল্প নেই থাকতেই পারে না—ওটি ওখান থেকে সরালে সমস্ত উপভোগটাই পণ্ড। অথচ "শালা" এডিটেড্ হল, তার বদলে এল, "দুনিয়ায় কোন ব্যাটার ভালো করতে নেই।" এবং কিমাশ্চর্য—'পথ নির্দেশ' সম্পূর্ণ মোলায়েম বলে বিবেচিত হল।

"ব্যাটা" ওই পর্যন্ত থামলেই ভালো ছিল। কিন্তু তারপর এল 'রামের সুমতি'র নাট্যরূপ, সেখানেও "ব্যাটা"। বোধ হয় নাট্যকার ভাবলেন, "শালা" শব্দটি সুকোমলহৃদয় মঞ্চরসিকদের রুচিতে আঘাত দেবে!

একটা সাধারণ শব্দ—কিন্তু এরও গুরুত্ব আছে বলে আমার ধারণা। একদা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 'আট আনা সিরিজে'র কিছু বই ছেপে বাঙালী পাঠকের প্রভূত কল্যাণ করেছিলেন, প্রচুর সৎসাহিত্য অতি সুলভে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সিরিজে শরৎচন্দ্রের অন্ততঃ দুটি বই (আরো ছিল বোধ হয়) আমার মনে পড়ছে—একটি "অরক্ষণীয়া", অপরটি "পল্লী সমাজ।"

আট আনার কস্টিংয়ে আনবার জন্যে পাতা কমাতে গিয়ে প্রধানতঃ "পল্লী সমাজে" প্যারাগ্রাফের কোনো বালাই নেই বললেই চলে। সংলাপের ঘাড়ে সংলাপের ঠাসাঠাসি। বিরক্তি লাগে পড়তে, লাগে বিশ্রীরকম দৃষ্টিকটু। কিন্তু "সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে।" যেমন গ্রন্থাবলীতে, তেমনি বইতে। এইটুকু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান কি আমাদের নেই যে একটু প্যারাগ্রাফ ভাগ করে দিই? গুরুদাসকে দোষ দিই না, কিন্তু এখন তো আর আট আনা মূল্যে "পল্লী সমাজ" বিক্রী হয় না?

বাজার-চলতি শরৎচন্দ্রের বইগুলোর পাতা ওলটালে অজস্র ভুলের নিদর্শন পাওয়া যাবে; ভাষা আর বানানের এমন দৃষ্টান্তও মিলবে যার কৃতিত্ব শরৎচন্দ্রের নয় বলেই সন্দেহ জাগে।

আর শরৎচন্দ্র কেন? সুকুমার রায়ের বইগুলো যে সুখ্যাত প্রকাশক ছেপেছিলেন, তাঁরাই কি বইগুলোর ওপর সে লক্ষ্য রাখেন আর? ছাপার ভুল চোখে পড়ছে, 'ঝালাপালা'র সর্বশেষ মুদ্রণ খুলতেই, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল একটি ব্লক: 'লক্ষণের শক্তিশেল।' কী যে কষ্ট লাগল বলবার নয়। ওই ব্লকটা বদলে 'লক্ষণ'কে 'লক্ষ্মণ' করতে কি খুব বেশি পয়সা খরচ হয়?

কিন্তু সুকুমার রায়ের কথা থাক। শরৎচন্দ্রের তিরানব্বুই জন্ম-বার্ষিকী তো উদ্‌যাপন করা গেল, সেটুও নামাঙ্কিত হল. কিন্তু শরৎচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর সুলভ-সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব কি সরকার নেবেন? সূচনা দেখে তো আশা হয়।

যদি রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব তাঁরা নেন—শতবর্ষের আগেই নেন, তা হলে একটি বিনীত নিবেদন জানাতে পারি কি? তাঁরা কি এর জন্যে একটি উপযুক্ত কমিটি, একটি যোগ্য সম্পাদকমণ্ডলী গড়বেন? নিছক সরকারী পদাধিকারী নয়, নিতান্ত ডিগ্রিধারী প্রোফেশনাল পণ্ডিতও নয়, সাহিত্যিক আর কিঞ্চিৎ রসবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এ কাজের ভার দেবেন তাঁরা?

শরৎচন্দ্র বাংলা দেশে ব্যাকডেটেড্ কিনা, সে আমি জানি না। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে আজো অফুরন্ত কৌতূহল। বাঙালী হিসেবে সে কথাটা আমাদের মনে রাখলেই ভালো হয়॥

এখন তোমাকে

পিনাকেশ সরকার

ঘন কুয়াশার ভিতর হাত ডুবিয়েই
এখন তোমাকে
সব খুঁজতে হবে তন্ন তন্ন করে, পৌরাণিক স্বর্ণমুদ্রা, হেয়ারপিন
সিঁড়ির নীচে পায়ের নীচে
হাড়জিরজিরে লেটারবক্স।

এখন তোমাকে!
খুব স্বচ্ছন্দে বাসী উনুনের নীচে
আঙুল ফেরাতে হবে,
বোধিদ্রুমের ডাল ভেঙে
নিজের জমিটুকু দিনে দিনে ঘিরে নিতে হবে,
সময়মাফিক
দর্জীর কাছে গিয়ে কলার বদলে আসতে হবে।

এখন তোমাকে
ধ্বস্ত দালানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে
হাত বাড়িয়ে সর্বাঙ্গীণ আবিষ্কারে
টেনে তুলতে হবে
রক্তাক্ত অন্য হাত
চূতমঞ্জরী ॥

ছেলেবেলার ঘাতক

অরুণেশ ঘোষ

কে ওখানে ঘুমিয়েছো বালির চড়ায়
শিয়রে শাণিত খড়্গ
পরচুলা উড়ে যায়
রাতের হাওয়ায়
এঞ্জিন সমেত ট্রেন ছুটে আসে নদীতীরে
পান করে জল
হাটুরেরা ফিরে যায় দল বেঁধে
দু-একজন প্রশ্ন করে, 'কে ওখানে ঘুমিয়েছে'

ঘুমিয়েছে আমার ঘাতক
কষ বেয়ে লালা ঝরে
দুই হাত জড়ো করা
কোমরের কাছে
সমস্ত শীতের রাত পালাগানে জেগে
এখন চৈত্রের রাতে নদীতীরে বালির উপর
শিথানে খড়্গ রেখে ক্লান্ত
দীর্ঘশ্বাস ভেসে যায়
মধ্যরাতে হাওয়ায় হাওয়ায়

অসাড়

সুচেতা ভট্টাচার্য

বুকের ভেতরটা দেখতে পাও না কেন যে
কেন যে
রক্তের দানা আলগা করে দিলেও
স্পর্শ করো না
আমার বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাগুলি
কোন ভবিষ্যতে?

বুকের ভেতরটা দেখতে পাও না কেন যে
কেন যে চক্ষুষ্মান
তুমি তো অন্ধ নও
বধির নও
কেন যে
আলগা রক্তের স্পর্শ নিতে পারো নি হাতে।

এই নির্মল খাঁচায়

দীপা সেন

মৃত্যু মানেই হিমশীতল স্তব্ধতা
শীতের রিক্ত গাছের মতো
অথবা শূন্য ঘর। ভাড়াটেরা গতকাল
অন্যত্র চলে গেছে।

এখন ধূসর স্মৃতির কুয়াশা
মাঝে মাঝে মনে পড়ে অবয়ব স্মৃতি
অতীতের শব
দক্ষিণের বারান্দা পেরিয়ে কার পদশব্দ থামে।

নির্জন সাঙ্কেতে অস্তিত্বের শ্যাওলা সরে যায়।
'কেউ ছিল এইখানে,—এই নির্মল খাঁচায়।'

সম্পাদিকা ছিলেন খুব সম্ভব সরলা দেবী কিংবা তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। এই উপন্যাসগুলো সম্পাদিকা সানন্দে লুফে নেন এবং বহু বহু গুণী এগুলোর সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। এ যেন হঠাৎ এক কলাক গাঁয়ের মিঠে মেঠো হাওয়া শহরে ঢুকে শহরের নিয়ুদ্ধ নিশ্বাস বাতাসকে মোলায়েম করে দিল। এই চিত্রগুলো ঐ সময়ে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এর পরের ইতিহাস আমি সঠিক কালানুক্রমিক বলতে পারবো না। যতদূর মনে আছে সেই নিবেদন করি।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরি নিয়ে বাঙলা দেশে লিখে পাঠান, তাঁকে বাঙলা শেখাবার জন্য যেন একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যে দীনেন্দ্রকুমারকেই পাঠানো হয়, এর থেকেই আজকের দিনের পাঠক বুঝে যাবেন, সে-দিন বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আসন কতখানি উচ্চ ছিল। এবং হয় তো যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেন তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণটিও যেন খাঁটি নদের মিষ্টি উচ্চারণ হয়।*

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় খুব বেশী কাল থাকেন নি।

কারণ ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা, শ্রীঅরবিন্দ, অন্যতম বরোদা-প্রধান খাসে রাও যাদব, এবং (বোধ হয়) দেশপাণ্ডের মধ্যে কি-সব গুপ্ত মন্ত্রণা হয়, সে-সম্বন্ধে আমি সঠিক জানিনে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু এটি ভিন্ন কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার বাঙলায় ফিরে এলেন।

এর পর তাঁর জীবন-কাহিনী আমার কাছে আরো অস্পষ্ট।

তবে আমার মনে সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক বোধ হয় তখন অর্থ কষ্টে ছিলেন। এ-কালেও যখন বাঙালী সাহিত্য স্রষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে জঠর-জ্বালা শান্ত করতে পারে না,** তা হলে, তখন ১৯১৫, এ-রকম সময়, দীনেন্দ্রকুমার গত্যন্তর না দেখে ডিটেকটিভ স্টোরি ইংরিজী থেকে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। তারই নাম "রহস্য লহরী"। সঠিক অনুবাদ বললে বোধ হয় একটু ভুল হয়। যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ 'অবস্থোপযোগী' বাঙালী ধরনধারন ঢুকিয়ে দিতেন।

এই "রহস্য লহরী" যে এ-দেশে তখন কি উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ণন আজ কেবে কে? সাধ্যবান সব বলি, "দেউ-বুক" তার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছেন।

কিন্তু এই উন্মাদনার প্রধান কারণ কি?

আমি দৃঢ়প্রত্যয়, সর্বান্তঃকরণে যে-ভাষাতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর "রহস্য লহরী" লিখলেন, ও-রকম ঝরঝরে, ছিমছাম সরল স্বচ্ছ শীতের নদীস্রোতের মত শান্ত প্রবাহমান বাঙলা ভাষা এই দেড়শ বছরের ভিতর অতি অল্প লোকই লিখেছেন।

তা না হলে বলুন তো, বারো বছরের বাঙাল বালক তার সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা বিলাতের গল্প পড়ে অর্ধযামিনী অবধি বিনিদ্র অবস্থায় শিহরিত, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে রইল কেন?

ভাষা, ভাষা, ভাষা! ভাষা বহু, বিলি-সমাং, বহু মিরাকল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

---

* "বরোদাতে বাঙালী" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যায়। ঔপন্যাসিক, বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত রমেশ দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে সত্যব্রত মুখুয্যে, রবীন্দ্রনাথের নাতি সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরো উত্তম উত্তম বাঙালীকে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও কর্ম দেন। ...এস্থলে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আমার আছে। আমার প্রতি দরদী পাঠক ভিন্ন অন্যেরা যেন বাকিটুকু না পড়েন। ১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে মুসলিম শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন ঐ সয়াজী রাও আমাকে 'পাকড়ে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন। মহারাজা একদিন আমাকে রমেশ দত্ত, শ্রীঅরবিন্দের অনেক কাহিনী বলার পর আমি দুঃখ করে বলেছিলুম—"Your Highness! I am your latest and worst choice!" মহারাজ তখন গুন গুন করে সে-কালের একটি song-hit গান, "you are not my first love, but you could be my last love!" ....
...এর কিছুদিন পরেই মহারাজ গত হন। এ-বাবদে শেষ কথা, ঐ সর্বগুণে গুণী মহারাজ ভারতের নানা জাতের ভিতর সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন বাঙালীকে।

** নবীনেরা হয়তো জানেন না এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে কি কি মন্তব্য বাঙলা এবং সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থকষ্টে যখন মাইকেল মারা যান তখন হেমচন্দ্র লেখেন,

"হায় মা ভারতী,
চিরদিন তোর কেন এ-কথাটি ভবে,
যে-জন সেবিবে ও-রাঙা চরণ
সেই সে দরিদ্র হবে!" এবং বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃতে বলছেন, "অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥"

অধমের তার অক্ষম অনুবাদ "ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি
ঘরে ঘরে॥"

শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা বিভাগে গান্ধীজী

বাঙলা বাঙালী ও গান্ধীজী

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আঠার শ' ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসের মোহরম শেষ দিনটিতে বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলেন গান্ধীজী। তাঁর তখন বয়স সাতাশ। ভারতীয় কুলি [illegible] সেইবার দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী সম্পর্কে দেশের জনগণ ও জননেতাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসছিলেন। জাহাজ-যোগে কলিকাতা বন্দরে আসার সময় হুগলী নদীর শোভা তাঁকে মোহিত করেছিল। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই তিনি কলিকাতা এবং বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বাংলা দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়নি। কয়েক মাস পরে এই উদ্দেশ্যে আবার তিনি আসেন কলিকাতায়। ওঠেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এবং প্রথমেই সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন আশার কথা তাঁকে শোনাননি। বলেছিলেন, আমরা কি কিছু করতে পারব? দেখছেন না আমরা নিজেরাই কত সমস্যায় জড়িয়ে রইছি। তবে চেষ্টা আপনাকে করতে হবে। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁরা উদার-চেতা মানুষ, জনসেবাতেও তাঁরা অংশ নিয়ে থাকেন।

তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয় নিয়ে জনসভা ডাকা সম্ভব হয়নি। তারপরই তাঁকে হঠাৎ ফিরে যেতে হল দক্ষিণ আফ্রিকায়। বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পেল না।

কয়েক বছর পরে উনিশ শ' এক সালে গান্ধীজী আবার এলেন কলিকাতায়। কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করাই এবার তাঁর এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য। এবার অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি উঠলেন তদানীন্তন রিপন কলেজে। নিছক প্রস্তাব নয়, বক্তৃতা নয়, কাগজে লেখালেখি নয়, ভারতবর্ষে দীর্ঘ-দিন গান্ধীজী দেশসেবামূলক কাজ করেছেন এখানে এবং এখানেই তার সূত্রপাত হয়। প্রতিনিধি-আবাসের অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ দেখে এবং

স্বেচ্ছাসেবকদের সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে কোন ফল না হওয়ায় গান্ধীজী নিজেই ঝুড়ি আর ঝাঁটা হাতে সেকাজে লেগে যান। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস অফিসেও কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল তাঁকে অফিসের চিঠিপত্র লেখার কাজ দেন। পরে গান্ধীজীর পরিচয় পেয়ে এই সামান্য কাজ দেবার জন্য লজ্জিত হন তিনি। গান্ধীজী তাঁকে এই কথা বলে তাঁর লজ্জা দূর করে দেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সামনে আমি কী? কংগ্রেসের কাজে আপনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, বয়সেও আমার চেয়ে আপনি বড়। আমি এক অনভিজ্ঞ যুবক। এই কাজ দিয়ে আপনি আমাকে বাধিত করেছেন। আমি কংগ্রেসের কাজ করতে চেয়েছি আর এই সব কিছু জানার দুর্লভ সুযোগ আপনি আমাকে করে দিয়েছেন।"

শ্রীযুক্ত ঘোষাল এই কথায় খুশী হন এবং বলেন যে, সেবা করার এইটিই প্রকৃত মনোভাব হওয়া উচিত। তবে দুঃখের বিষয়, আজকের যুবকদের মধ্যে এই মনোভাব দেখা যায় না।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল। গান্ধীজী থেকে গেলেন এক মাসের জন্য কলিকাতায়। এই বারই তিনি বাংলা দেশকে ভাল করে জানার সুযোগ পেলেন। প্রথমে ইণ্ডিয়া ক্লাবের একটি ঘরে উঠেছিলেন গান্ধীজী। গোখেল সেখানে বিলিয়ার্ড খেলতে আসতেন। একদিন গান্ধীজীকে সেখানে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান তপস্বী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে গোখেলের সখ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই গোখেলের কাছে আসতেন। একদিন আচার্য রায়কে তিনি গান্ধীজীর কাছে এই ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনি হলেন অধ্যাপক রায়। এঁর মাসিক বেতন আটশ টাকা, নিজের জন্য চল্লিশ টাকা রেখে ইনি বাকি সবটাই জনসেবার কাজে দান করেন। ইনি বিবাহ করেননি, আর করতেও চান না।"

প্রায় কুড়ি বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্রের উল্লেখ করতে গিয়ে গান্ধীজী লিখেছিলেন, "আজকের ডঃ রায়ের সঙ্গে সেদিনকার ডঃ রায়ের কোন পার্থক্যই আমি দেখতে পাই না। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ প্রায় একই রকম সাদাসিধা, তফাৎ শুধু এই যে, এখন এগুলি খাদি আর তখন ছিল ভারতীয় মিলজাত।"

বস্তুত আচার্য রায়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকারেই দুজনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দুজনের অমলিন সখ্যতা চিরদিন বজায় ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের সরলতা গান্ধীজীকে মুগ্ধ করেছিল এবং গান্ধীজীর কর্মধারার মধ্যে দেশের মুক্তির পথ প্রফুল্লচন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পর্কে গান্ধীজী একবার লিখেছিলেন, "একজন বৈজ্ঞানিক রূপে ডঃ রায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তিনি ভাল সাবান তৈরী করতে পারেন বলে তাঁকে মনে করবে না, এমন কি তিনি যে বহু বাঙালী যুবকের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যও তাঁকে মনে করবে না। তারা তাঁকে এই বলে জানবে যে, তিনি তাদের দীন কুটিরে খদ্দরের মাধ্যমে সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এনেছেন।" প্রফুল্লচন্দ্রের খদ্দর-প্রিয়তাকেও গান্ধীজী মনে করেছিলেন তাঁর দুর্বল শরীর নিয়েও অনেকদিন বেঁচে থাকা ও কাজ করার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে, গান্ধীজীর কর্মধারার প্রতি, চরখা আন্দোলনের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের এত বিশ্বাস ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ তা পুরোপুরি সমর্থন করতেন না বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

এবারে আর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গান্ধীজীর মনে দাগ কেটেছিল। তিনি রেভারেণ্ড কালিচরণ বন্দোপাধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টান বন্ধুদের গান্ধীজী কথা দিয়েছিলেন যে ভারতীয় খৃষ্টানদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করবেন। কালিচরণবাবুর নাম তিনি শুনেছিলেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গেই দেখা করা মনস্থ করলেন। বললেন সে কথা গোখলেকে। গোখেল বললেন, "কী হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে? তিনি খুবই ভাল লোক, তবে আপনাকে খুশী করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমি তাঁকে ভালভাবেই জানি। যাই হোক, ইচ্ছে করলে নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।"

গান্ধীজী দেখা করলেন। কালিচরণবাবু তাঁকে ধুতি ও শার্ট পরিহিত দেখে তাঁর ভাল লাগল। কিন্তু আলোচনা শেষ পর্যন্ত যে দিকে গড়িয়ে গেল গান্ধীজী তাতে সায় দিতে পারলেন না। কালিচরণবাবু

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোকসভায় আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে গান্ধীজী ফটো : কাঞ্চন মুখার্জি

তাঁকে বললেন যে, মানুষ যে পাপের বোঝা নিয়ে জন্মায় তার মূল্য মৃত্যু। বাইবেল বলছেন যে, যীশুর কাছে আত্মসমর্পণই এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। গান্ধীজী তা মানতে পারলেন না। তিনি গীতায় নিষ্কাম ভক্তিমার্গের কথা বললেন। সুতরাং আলোচনা শেষ হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে, কিন্তু উপকৃত হয়েই ফিরে এলেন গান্ধীজী।

কথা প্রসঙ্গে কালিচরণবাবু গান্ধীজীকে কালী মন্দিরের কথা বলেছিলেন। বইতেও এসম্পর্কে তিনি কিছু পড়েছিলেন। সুতরাং একদিন তিনি চললেন সেখানে। রাস্তায় দেখলেন কাতারে কাতারে ছাগল যাচ্ছে কালীর কাছে বলি দেবার জন্য আর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বসে আছে ভিখারীর পাল। দুটি দৃশ্যই গান্ধীজীর ভাল লাগল না; দুটিতেই তিনি ব্যথিত হলেন। তিনি ভেবে পেলেন না, যে-বাংলায় এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও ভাবাবেগ আছে তা এই জাতীয় পশুবলি কি করে সহ্য করে!

ধর্মের নামে দেবতার কাছে এই পশুবলি বাঙ্গালীর জীবন জানার জন্য গান্ধীজীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে। ব্রাহ্ম সমাজের কথা তিনি শুনেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী সংগ্রহ করে গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেটি পড়েন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি সভায় তিনি যোগদান করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু মহর্ষি তখন অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হলনা। তবে তাঁর বাড়িতে ব্রাহ্ম সমাজের যে উৎসব হচ্ছিল তাতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগ দেন। এই প্রথম তিনি বাংলা গান শুনলেন এবং প্রথম শ্রবণেই তিনি বিমোহিত হলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হওয়া সম্ভব এবং কেউ কেউ মনে করেন যে, সেদিন হয়ত উৎসবে রবীন্দ্রনাথই সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে পরম আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন গান্ধীজী। পরস্পরকে না জেনে, না চিনে অদৃশ্য ইঙ্গিতে সেইদিনই হয়ত তার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার আগেই উনিশ শ' চৌদ্দ সালের ডিসেম্বর মাসে মগনলাল গান্ধীকে ইংলণ্ড থেকে রোগশয্যায় শুয়ে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা বশত এবং তোমাদের উৎসাহিত করার জন্য আমি শুয়ে শুয়ে বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছি।...আমি দেখছি একজন গুজরাটীর পক্ষে বাংলা শেখা সহজ। তোমাদের সকলের এটি শিখে নেওয়া উচিত।"

বাংলা গানও অনুরূপভাবে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শান্তি-নিকেতনের অভ্যর্থনা লাভের পর, উনিশ শ' সতের সালের ডিসেম্বর মাসে অখিল ভারত সমাজ সেবা সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি গান শিখতে চাই তবে আমাকে বাংলায় যেতে হবে। আমি যদি কবিতা শুনতে চাই তাহলেও আমাকে বাংলায় যেতে হবে। বাংলা দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যত্র বাংলা দেশ পড়ে নেই। আমি কয়েকটি মারওয়াড়ী ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। অর্থ-হীন বাক্য বলে যাওয়ার মত তা শোনাচ্ছিল। আমি তাদের বাঙ্গালীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম।"

আরও পরে উনিশ শ' আঠার সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগদান

করতে কলিকাতায় এসেছিলেন। এবং সেই সময় রবীন্দ্র কবিকৃত 'ডাকঘর' অভিনয় দেখেছিলেন। তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অধ্যাপক সুশীলকুমার রুদ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, কলিকাতায় এবার তাঁর বেশ ভালভাবে কেটেছে। কিন্তু তা কংগ্রেসের মঞ্চে নয়, তার বাইরে। রবীন্দ্রনাথকৃত 'ডাকঘর' তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং সুন্দর বালকের অভিনয় তখনও যেন তাঁর কানে বাজছে।

ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন না করে কি থাকা যায়! আগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে এবং শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে গান্ধীজী বেলুড়ে পৌঁছলেন। মঠের পরিবেশ তাঁর ভাল লাগল। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আসা তা সফল হল না। শুনলেন স্বামীজী অসুস্থ হয়ে কলিকাতায় আছেন, দেখা হবে না। ফিরে এলেন গান্ধীজী। কলিকাতা থেকেও চলে যাবার সময় সমাগত। ভারতবর্ষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবার তিনি পাড়ি দিচ্ছেন এবং যাত্রা করছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। গোখেল এবং প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বারণ শুনলেন না। এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে ট্রেনে তুলে দিতে তাঁরা এলেন হাওড়া স্টেশনে। গোখেলকে প্লাটফরমে ঢুকতে কেউ বাধা দিলেন না। কিন্তু বাঙ্গালী পোশাক পরিহিত প্রফুল্লচন্দ্রকে টিকিট কালেক্টর আটকালেন। গোখেলের বলায় অবশ্য তাঁকে যেতে দেওয়া হল। গাড়ির সময় হল, তাঁদের শুভেচ্ছা নিয়ে গান্ধীজীর যাত্রা হল শুরু।

দুই

কিন্তু বেশিদিন ভারতবর্ষে থাকা হল না, গান্ধীজীকে আবার চলে যেতে হল দক্ষিণ আফ্রিকায়। এবারে ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে আরও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তবু তাঁর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের দিকে। বাংলা দেশের জন চেতনা এবং গণনায়কেরা তাঁকে আকৃষ্ট করছিল। তিনি অনুভব করছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামরত মানুষেরা বাংলা দেশ থেকে তাঁদের সংগ্রামের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এবং বাংলা দেশের নেতৃত্বে ভারতবর্ষও তাঁর আন্দোলনে সাহায্য করবে।

উনিশ শ' তিন সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন লালমোহন ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল কি না সে কথা জানা নেই। কিন্তু তাঁর নির্বাচনে গান্ধীজী খুশী হয়েছিলেন। আর সেই মনোভাব তিনি ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন: "তাঁর শৌর্য ও যোগ্য দেশসেবা এবং তাঁর অনুপম বাগ্মিতা যে বিরাট জনতাকে আকৃষ্ট করবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। লালমোহনবাবু রাজনীতিতে প্রবীণ, কি করে দেশবাসীর ও পার্লামেন্টের সহানুভূতির উদ্রেক করান যায় তা তিনি জানেন। [illegible] করবেন।"

[illegible]

[illegible] লিখলেন: "... সেদিন নতুন [illegible] প্রতিষ্ঠা করলেন বাঙালীরা সেদিন [illegible] হরতাল করলেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ করে একটি সঙ্ঘ করলেন ও [illegible] ছবি স্থাপনা করলেন।" বাঙালী ঐক্য এবং কেবল স্বদেশী দ্রব্য

কেনার জন্য তাঁদের যে-সংকল্প তার কথাও উল্লেখ করতে গান্ধীজী ভুললেন না।

অতদূর থেকে সেই যুগে এত খুঁটিনাটির দিকে গান্ধীজীর যে দৃষ্টি ছিল তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বাংলা দেশে এই যে স্বদেশী আন্দোলন সার্থকতা লাভ করছে তার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। গান্ধীজী সে কথা বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন না যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হঠাৎ জেগে ওঠা কোন আলোড়ন মাত্র। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জীবনী প্রকাশের রীতির তিনি প্রচলন করেছিলেন। 'বীর বাংলা' প্রবন্ধ লেখার কিছু দিন আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সফলতার উল্লেখ প্রসঙ্গে তাতে তিনি লিখেছিলেন, "বাংলা দেশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের যে আন্দোলন চলছে তার তাৎপর্য কম নয়। এই জাতীয় আন্দোলন যে সেখানে সম্ভব হয়েছে তার কারণ হল সেখানে শিক্ষা বেশি বিস্তৃত এবং সেখানকার জনগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বেশি সচেতন। স্যার হেনরী কটন বলেছেন যে, বাংলা কলিকাতা থেকে পেশোয়ারকে দোলা দেয়। এর কারণ কী তা জানা দরকার।"

গান্ধীজী নিজে এর কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি জাতির উত্থান-পতন সেই জাতির মহৎ লোকেদের উপর নির্ভর করে, যে জনগণ তাঁদের সঙ্গে বাস করে তারাই আবার তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাই ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "বাংলা দেশের যে বিশেষ মর্যাদা আমাদের চোখে পড়ে তার কারণ হল এই যে, সেখানে গত শতাব্দীতে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এক একজন বীরোচিত ব্যক্তি বাংলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উন্নীত করে গিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।"

বিদ্যাসাগরের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে—যার সব কিছু আজও হয়ত অনেকের জানা নেই—উপসংহারে গান্ধীজী লিখলেন, "এই পৃথিবীতে তাঁর মত খুব অল্প লোকই আছেন। বলা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করতেন তবে ব্রিটিশেরা যেমন নেলসনের জন্য এক চিত্তাকর্ষক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন তাঁর জন্যও তেমনি এক স্মারক নির্মিত হত। যাই হোক, বাংলা দেশের ছোট বড় ধনী নির্ধন সকলের অন্তরেই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য প্রস্তর সৌধ ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গিয়েছে। এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, বাংলা দেশ কিভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে।"

১৯৪৬ সালে সোদপুরে গান্ধীজী

ফটো: কাঞ্চন মুখার্জি

বাংলা দেশের ঐ বৈশিষ্ট্যের কথা গান্ধীজীর মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে ছিল। উনিশ শ একুশ সালে নতুন কর্মসূচী নিয়ে তিনি যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তরুণ বাঙালী বন্ধুদের আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন, "বাংলার বিরাট বুদ্ধি আছে, তার হৃদয় মহত্তর, আমাদের দেশ যে পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত তার অংশও এখানে বেশি। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের চেয়ে আপনাদের ভাবপ্রবণতা, বিশ্বাস এবং আবেগ বেশি। আপনারা একাধিকবার কাপুরুষতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং বাংলা দেশ আগের মত এখনও কেন নেতৃত্ব করবে না তার কোন কারণ নেই।"

এই সুরেই ধ্বনিত হয়েছিল গান্ধীজীর কণ্ঠ আর একবার। রাজনৈতিক ঘূর্ণি তখন সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। দেশ বিভাগের করুণ অন্ধকার তখন ধীরে নেমে আসছে দেশের বুকে। গান্ধীজী নোয়াখালিতে নিজের বিশ্বাসকে আর একবার পরখ করে নিতে ব্যস্ত। সেই সময় একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, বাংলা দেশকে কি রাজনৈতিক দাবা খেলার বোর্ড রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না। গান্ধীজী এ কথা অস্বীকার করে বললেন, "বাংলা বাংলা বলেই আজ পুরোভাগে এসে গিয়েছে বাংলা দেশ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে, দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রকে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরেরা—আমার চোখে তাঁরা যতই ভ্রান্ত হন না কেন—এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" সুতরাং বাংলা যদি ঠিক পথে চলে তবে সারা ভারতের সমস্যার সমাধান সে করে দেবে।

বাংলার গণচেতনার পিছনে যেমন রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের মত লোকের অবদান তেমনি বাঙালীকে স্বদেশ ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে 'বাংলা দেশের বীরোচিত সংগীত' বন্দেমাতরমের প্রেরক শক্তির কথাও উল্লেখ করতে হয়। গান্ধীজী তাঁর ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের পাতায় সেই কাজ করেছিলেন। আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে তিনি অনুভব

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লিলুয়া স্টেশনে গান্ধীজী

করতে পেরেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই বাংলা গানের জনপ্রিয়তা তাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগীতে পরিণত করে দেবে। তিনি লিখেছিলেন, "অন্যান্য জাতির গানগুলি অপেক্ষা এটি ভাবের দিক থেকে মহত্তর ও বেশি মিষ্টি। অন্য সব গানে অপরের প্রতি অপমানসূচক ভাব দেখা যায়, কিন্তু বন্দেমাতরম এই জাতীয় ত্রুটিমুক্ত। এর একমাত্র লক্ষ্য হল আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত করা। এই গানে ভারতবর্ষকে জননীরূপে দেখা হয়েছে এবং তার প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে।"

সাম্প্রদায়িকতায় অভিশপ্ত রাজনীতি একদিন বন্দেমাতরমকেও কোণঠাসা করতে চেষ্টা করেছিল। সাম্প্রদায়িক একতায় একান্ত বিশ্বাসী গান্ধীজী, যিনি পরবর্তীকালে এই সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান করেছিলেন, তিনি কিন্তু বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে এই অপচেষ্টাকে সমর্থন করেননি। চারদিকের সেই কোলাহলের মধ্যে গান্ধীজী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, বন্দেমাতরমের মধ্যে কোন রকম সংকীর্ণতা নেই। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি যখন বালক, আনন্দমঠ অথবা তার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যখন তিনি কিছুই জানতেন না, তখন থেকেই বন্দেমাতরম তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে। একবারও তাঁর মনে হয়নি যে, বন্দেমাতরম হিন্দু সংগীত অথবা তা কেবল হিন্দুদের জন্য রচিত হয়েছে। এই জন্যই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যত দিন জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন বন্দেমাতরমের মৃত্যু হবে না।

তিন

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা করলেন গান্ধীজী। তার মধ্য দিয়ে যে গণচেতনার উন্মেষ হয়েছিল তাকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন কী এনে দিয়েছিল দেশবাসীর কাছে? বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল ঠিকই। সেটিও কম বড় কথা নয়। কিন্তু তার অতীতের বাঙালীর পণ্য, বাঙালীর আশা সত্য হয়ে কি উঠতে পেরেছিল? চরখা আন্দোলন নিয়ে গান্ধীজী যখন বাংলা দেশ পর্যটন করছেন তখন এবং তার আগেও তাঁর মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়েছিল। বাংলা দেশে বিদেশী পণ্য বর্জনের যে-আন্দোলন তখন হয়েছিল তা পরবর্তীকালে স্বদেশী ব্রত বলতে যে-আদর্শ গান্ধীজী তুলে ধরেছিলেন তার সমার্থবোধক ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, "ডঃ রায়ের এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে ম্যাঞ্চেস্টার অথবা জাপানের পরিবর্তে বোম্বাই অথবা আমেদাবাদ থেকে কাপড় এনে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশ কিছুই লাভ করেনি। স্বদেশীর সম্পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ লাভ পেতে হলে চারিদিকে ছড়ানো লক্ষ লক্ষ ঘরগুলিতে আমাদের সুতো ও কাপড় প্রস্তুত করে নিতে হবে।" গান্ধীজীর ধারণায় এই স্বদেশী আন্দোলনেও যে বাংলা দেশ পিছিয়ে থাকবে না সে সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না, অন্ততঃ উনিশ শ' পঁচিশ সালে যখন বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন।

সেই সময় বাংলা ভ্রমণ শুরু করার কিছু দিন আগে তিনি লিখেছিলেন যে, খাদি, চরখা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজের জোয়ারই তাঁকে ফরিদপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদানে উৎসাহিত করেছে আর এই জোয়ারই তাঁকে বাংলা দেশে অন্যত্র টেনে নিয়ে যাবে। এই জোর থাকলেও এতটা ভরসা বাংলা দেশের উপর আগে তাঁর ছিল না। বাংলায় কিছুদিন ভ্রমণ করার পর এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, "বাংলা দেশে খাদির বিস্তৃতি আমি যা দেখতে পেয়েছি তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফরিদপুরে যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল তা যত না অন্য কিছুর প্রদর্শনী ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল খদ্দরের প্রদর্শনী।... প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে যে সুতা কাটার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ঐচ্ছিক কাটুনীরা যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যাবে না।... ফরিদপুরের প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার মত মির্জাপুর পার্কে খাদি প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। নকীপুরের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং বিখ্যাত কবি শ্রীমতী কামিনী রায় এতে অংশ গ্রহণ করেন। বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সতীশবাবু এবং সর্বোপরি ডঃ রায় নিজে এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডঃ রায় ইতিমধ্যে ভাল সুতা কাটছেন, তাঁর সুতা বার নম্বরের নিচে নয়। তিনি আমাকে বলেছেন যে চরখা ক্রমেই তাঁর প্রিয় হয়ে

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় গান্ধীজী বাঁয়ে মহাদেব দেশাই, কামরার বাইরে সুভাষচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার

উঠছে এবং সুতো কাটায় তিনি আনন্দ পান। প্রায় ১৮০ জন কাটুনী প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। আমার তো মনে হয় না যে, ভারত-বর্ষের আর কোথাও উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এতগুলি পুরুষ ও নারীকে এই রকম প্রদর্শনীতে যোগ দিতে এবং তাঁদের সঙ্গে সুতো কাটতে দেখা যাবে।"

সেদিনও সুতো কাটার বিরুদ্ধতা করেছিলেন বাংলা দেশের কয়েকটি তরুণ ছাত্র। তাঁদের অভিযোগ ছিল অন্য কোন কারণে নয়, তা ছিল সুতো কাটার মধ্যে রোমান্সের অভাব আছে বলে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গান্ধীজী তাঁর বাংলা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, এই ভ্রমণের সময় তাঁর অনেক বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং তার মধ্যে অন্যতম হল কোন দলের পক্ষ থেকেই সুতো কাটার বিরোধিতা না করা। তাঁর আহ্বানে মাত্র তিন জন চরখার প্রতি তাঁদের অনাস্থার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন খাদি পরিহিত। বলেছিলেন, "বাঙ্গালী ছেলেরা যদি তাঁদের পরীক্ষায় রোমান্সের অভাব আছে এই অভিযোগ উত্থাপন না করেন তবে সুতাকাটার জন্য সেই অভিযোগ করার কোন কারণ তাঁদের নেই।"

ভারতবর্ষের রাজনীতি তখন বিশেষ করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দল যাঁরা অসহযোগের পন্থায় বিশ্বাস করতেন অন্য দল চাইতেন কাউন্সিলে প্রবেশ করে পদে পদে বিদেশী সরকারকে পর্যুদস্ত করতে। প্রথম দলের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন গান্ধীজী এবং দ্বিতীয় দলের অর্থাৎ স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বাংলা দেশে স্বরাজ্য দলের প্রাবল্য ছিল বেশি। সেজন্য স্বভাবতই গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে, বাংলা দেশে চরখার বিরোধিতা তিনি বেশি করে পাবেন। তা না পেয়ে তাঁর মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। বস্তুত চরখার বিরোধিতা তো নয়ই, বরং বহু স্বরাজ্যবাদীকে তিনি সুতো-কাটায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে দেখে-ছিলেন।

কর্মসূচী অনুসরণের প্রশ্ন নিয়ে গান্ধী অনুগামীদের সঙ্গে অর্থাৎ তদানীন্তন 'নো-চেঞ্জার'-দের সঙ্গে স্বরাজ্য দলের যে-বিরোধ দেখা দিয়েছিল গান্ধীজী নিজেই তার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। গান্ধী-জীবনের বৈশিষ্ট্যই ছিল গতিশীলতা। একবার একটি কিছু নির্ণয় করে নিলে তাতে চিরকাল অনড় অচল হয়ে থাকতে হবে এমন জড়বাদী মন তাঁর ছিল না। মৌল সত্যে অটল থেকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি নিজেকেও পরিবর্তিত করে নিতে পারতেন। আর এই মনোভাবকে তাঁর অভিনব রণ-কৌশল বলেও অভিহিত করা হয়। তাই বিরোধ যখন অনুগামীদের মধ্যে প্রচণ্ড তখন নেতা নিজেই সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং তার ফলে বিরোধিতাকে সহযোগিতায় রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন।

স্বরাজ্য দলের পক্ষে দেশবন্ধু এবং মতিলাল নেহরু, আর অন্যদিকে গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে এই মীমাংসার চুক্তিপত্রে

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে গান্ধীজী

স্বাক্ষর করেছিলেন। আর তার কিছুদিন পরেই তিনি লিখেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে সেই শক্তি দিয়েছেন যাতে আমি আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা আত্ম সমর্পণ স্বরাজ্য দলের কাছে করতে পেরেছি। স্বরাজীরা যে আমাকে গ্রহণ করেছেন তার জন্য তাঁদের কাছে আমি আমার ঋণ অবশ্যই স্বীকার করব। আমি জানি যে, কর্মসূচীর গঠনমূলক কাজের দিকে আমি যতটা জোর দেই তাঁদের অনেকে তা দেন না। অনেকের কাছেই ভোটাধিকারের ব্যাপারটি প্রত্যাহারকরণ করা শক্ত ছিল। শুধু একতার খাতিরে এবং দেশের জন্য তাঁরা তা করেছেন। তা করার জন্য তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র।"

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের কর্ম-সূচীকেও গান্ধীজী প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হননি। বলেছেন, "বঙ্গীয় বিধান পরিষদের কাজের মাধ্যমে দেশবন্ধু দেশকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্টের পিছনে জনগণের সমর্থন নেই।" অন্যত্র আবার বলেছেন, "বঙ্গীয় বিধানসভায় দেশবন্ধু দাশ যে-নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়েছেন তা ফলপ্রদ হবে।"

চার

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর স্বভাবের মধ্যে যে অপরের গুণ গ্রহণের আকুলতা ছিল দেশবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রথম পরিচয় থেকেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে যে মত-বিরোধ ছিল না, বা গান্ধীজী তা স্বীকার করতেন না, তা নয়। তিনি নিজেই বলেছিলেন, "তিনি মনে করেন যে, দ্রুত রাজনৈতিক কাজের দ্বারা যতক্ষণ না আমরা স্বাধীনতা অর্জন করছি ততক্ষণ আমরা কোন কাজ করতে পারব না। কেবল এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার মত বিরোধ আছে।" কিন্তু এই জাতীয় মত বিরোধ পরস্পরকে আত্মবন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রথম দিনেও যেমন বাধা সৃষ্টি করেনি তেমনি শেষ দিনেও তা কেবল পরম বিশ্বাসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। উনিশ শ উনিশ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর অনুসন্ধানের কাজে গান্ধীজী সর্বপ্রথম দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। দূর থেকে তিনি চিত্তরঞ্জনের নাম শুনেছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ব্যবসা ও দানশীলতার জন্য তাঁর প্রতি মনে মনে উচ্চ ধারণা গান্ধীজী পোষণ করতেন। চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন আইনজ্ঞের চতুরতার দ্বারা মামলা লড়ে নষ্টামী প্রকাশ করে দিতে। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল অন্য। সুতরাং প্রথম বৈঠকে তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্তী বৈঠকে এই পার্থক্যও বিশ্বাস ও প্রেমের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গান্ধীজী লিখেছিলেন "আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক আমাকে নিশ্চিন্ত করে এবং আমার ভয়কে অপসারিত করে। তিনি সব সময় যুক্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন এবং আমি যা বলেছিলাম তা শুনেছিলেন। এই প্রথম আমি ভারতবর্ষের একজন লোক-নায়কের সংস্পর্শে আসি। আমরা পরস্পরকে দূরে থেকে জানতাম। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কোন কাজেই তখনও আমি অংশ গ্রহণ করিনি। তাঁরা আমাকে কংগ্রেসের একজন যোদ্ধা বলেই জানতেন। কিন্তু আমার সকল সহকর্মীই আমাকে তৎক্ষণাৎ আপন করে

লেন। আর ভারতবর্ষের এই মহান নেতাকের চেয়ে বেশি আপন কেউ আমাকে করেননি। আমার এই সমিতির সভাপতি হবার কথা হয়েছিল। যেখানে আমাদের মত পার্থক্য হবে সেখানে আমি আমার কথা বলব কিন্তু আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব—তাঁর দিক থেকে স্বেচ্ছায় এই প্রতিশ্রুতি দেবার ফলে আমরা পরস্পরের এত কাছে এসেছিলাম যে তাঁর সম্পর্কে আমার পূর্ব মতসংশয় প্রকাশ করার সাহসও আমার হয়েছিল। তাই যখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন এই রকম একজন বিশ্বাসী সহকর্মীর জন্য আমি গর্ববোধ করেছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি কিছু অপ্রস্তুতও বোধ করেছিলাম। কেননা আমি জানতাম যে, ভারতীয় রাজনীতিতে আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র এবং এই জাতীয় সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসের অধিকারী নই। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠা তাদের বিবেচনা করে না। যে রাজা এই নীতি স্বীকার করেন তিনি তাঁর সেই অনুচরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন যাকে তিনি কোন বিষয়ের একমাত্র বিচারক নিয়োজিত করেছেন। আমার অবস্থা ছিল ঐ অনুচরের মত। এবং আমি সকৃতজ্ঞ গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি যে যেসব বিশ্বাসী সহকর্মীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসী কেউ ছিলেন না।"

তাঁদের এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা মাত্র ৫ বছর টিকেছিল। তারপরেই মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত দেশবন্ধুকে ছিনিয়ে নেয়। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগেও গান্ধীজী দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর অতিথি হয়েছিলেন। এবং এখানে দেশবন্ধুর আন্তরিকতার যে স্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন তার স্মৃতিকে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গান্ধীজী বর্ণনা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তবু গান্ধীজীর যত্নের দিকে তিনি ব্যক্তিগত নজর রেখেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মসূচী ও গঠনমূলক কর্মপন্থা—সব বিষয়েই তাঁদের আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বানের কথা হচ্ছিল। এই সম্মেলনে গান্ধীজীই হতেন প্রধান নেতা। এ সম্পর্কে তিনি দেশবন্ধুর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। দেশবন্ধু বলেন যে লর্ড বার্কেনহেডের কাছ থেকে দেশ শাসন সম্পর্কে তিনি বড় কিছু আশা করছেন তাই সেই মুহূর্তে ঐ জাতীয় সম্মেলন তিনি চান না। গান্ধীজীর মনে এই ভরসা ছিল না। তবু তিনি বলেন যে, দেশবন্ধু এবং মতিলাল নেহরু না চাইলে তিনি এই সম্মেলন আহ্বান করবেন না। পক্ষান্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন, "লর্ড বার্কেনহেড যদি হতাশ করেন তবে কাউন্সিলে আমরা কী করব তা জানি না। তবে এ কথা আমি জানি যে, আপনার চরখার পরিকল্পনা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং গ্রামগুলিকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। সম্ভব হলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিয়ে আর প্রয়োজন হলে তা ছাড়াই আমাকে দেখাতে হবে যে হিংসা না করেও স্বরাজ লাভ করা সম্ভব। দেশের মুক্তির জন্য আপনার কাছে অহিংসা যেমন অন্তিম নীতি আমার কাছেও তেমনি।"

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে গান্ধীজী ফটো : কাঞ্চন মুখার্জি

সত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ যা তাঁকে একই সঙ্গে আপন বিশ্বাসে অটল এবং অপরের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে দিয়েছিল—তার ফলে গান্ধীজী এমনিভাবে সকল বিরোধিতাকে নিঃশমিত করে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীজীর কাছে 'আইডল অব বেঙ্গল', অর্থাৎ বাংলার প্রতিমূর্তি। প্রথম দর্শনে কিন্তু তিনি গান্ধীজীকে কোন আশার কথা শোনাতে পারেননি। পরবর্তীকালে গান্ধী পন্থার সঙ্গেও তিনি সহমত হতে পারেননি। তার জন্য তদানীন্তন গান্ধী-অনুগামীদের কাছ থেকে তাঁকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয়নি। নির্বাচনে তিনি পরাজিত তো হয়েছিলেনই উপরন্তু সভা-সমিতিতেও তাঁকে অপদস্থ করা হচ্ছিল। বরিশালের এক সভায় এই রকমভাবে তাঁকে

এই অভিযোগ গান্ধীজী আর একবার খণ্ডন করেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁর বাড়িটি জনসেবার কাজের জন্য দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেখানে একটি মেয়েদের হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হয়। তখন কোন কোন মহল থেকে এই কথা ওঠে যে, বাঙ্গালীরা প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন, সুতরাং দেশবন্ধুর স্মারক হিসাবে যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হবে তাও সঙ্কীর্ণ হবে। গান্ধীজী হাসপাতালটির ভিত্তি স্থাপন করার সময় এই দোষারোপ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গালীরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঙ্গালার মধ্যে গ্রহণ করে নেয় তবে আমি কিছু মনে করব না। কেননা তাহলে যুক্তপ্রদেশের বৃদ্ধ পণ্ডিতজী এবং গুজরাটের এই বৃদ্ধ বেনিয়াকে বিশ্রাম নেবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। যে-বাংলা রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে—যে-বাংলা চৈতন্যের পূত পদধূলিতে পবিত্র এবং যে-বাংলা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা বিধৌত সেই বাংলা যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করে নেয় তবে আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু এই আশঙ্কা মিথ্যা। কেননা ট্রাস্টীদের পক্ষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেছেন যে, দেশবন্ধু যে মহান আদর্শ নিয়ে মাতৃভূমির সেবা করেছেন, হাসপাতালটি সেই আদর্শে পরিচালিত হবে। প্রতিষ্ঠানটি যাঁর অন্তরে যেসব নিপীড়িত নারী আমাদের কামনা ও যৌন আবেগের শিকার তাদের বন্ধন মোচনের আকুতি ছিল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এটি কোন এক ট্রাস্টিদের সম্পত্তি নয়, এটি সমগ্র জাতির।"

অহিংসার নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী গান্ধীজী বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁদের বীর্য ও সাহসের প্রতি তাঁর যে সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল না তা নয়। একাধিকবার তিনি সে কথা ঘোষণা করেছেন। বলেছিলেন তাঁদের সততা, সাহসিকতা, তাঁদের আত্মত্যাগ তাঁদের দুঃখবরণ ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত প্রদেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি নোয়াখালি দাঙ্গায় হিন্দুরা যে কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছিল তার বদলে আত্মরক্ষার জন্য সাহসের সঙ্গে অস্ত্র গ্রহণকেও তিনি অধিকতর কাম্য মনে করেছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত একজন সাক্ষাৎকারীকে তিনি বলেছিলেন, "আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, বর্তমান আলোচনায় আমি আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করার কথা বলছি না। আমি নিজে আপনাদের অস্ত্র দিতে পারি না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোকেদের অস্ত্র সরবরাহ করার কাজও আমার নয়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোকদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি দুঃখের কথা হল যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারেননি। তাঁদের সাহসিকতা ছিল একপেশে। তা তাঁরা অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারেননি।" আরও বলেছিলেন, "তাঁদের এতগুলি লোক এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছেন, এটি আমার কাছে খুব দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় তাঁরা যে তরুণ্যতা ও সাহস দেখিয়েছিলেন এই সঙ্কটের সময়েও তাঁরা যদি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য তা দেখাতে পারতেন তবে ইতিহাসের পাতায় তাঁরা বীর বলে গণিত হতেন। তাঁরা যা করেছিলেন তার ফলে তাঁরা এখন ইতিহাসের পাদটিকাই হয়ে রয়েছেন।" গান্ধীজী সেই সাক্ষাৎকারীর দলটিকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের অস্ত্রের ব্যবহার ভুলে যেতে বলছেন না, অথবা তিনি যে-ধরণের সাহসের কথা বলেন তাও অনুসরণ করতে বলছেন না। তিনি তাঁদের তরুণো হবার কথাই বলছেন—তা যদি অহিংসভাবে না হয়, তবে অস্ত্রের সাহায্যেই হতে হবে।

এমনি যুক্তিবাদী মনই ছিল গান্ধীজীর। নীতির দিক থেকে যা হয়ত সমর্থনযোগ্য নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা চিন্তা না করে তাকে কেবল নিন্দা করার মধ্যে তিনি কিছু সার্থকতা খুঁজে পেতেন না। এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল নোয়াখালিতে। তিনি তখন শ্রীরামপুর গ্রামে। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাঙ্গালী সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এবং স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম রয়েছেন। গান্ধীজী নির্মলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি মাছ খাচ্ছেন কি না। নির্মলবাবু উত্তর দিলেন যে, তিনি নিরামিষাশী নন, তবে সেখানে পরশুরামের অসুবিধা হবে বলে তিনি তা খাচ্ছেন না। একথা শুনে জনৈক বন্ধু গান্ধীজীকে প্রশ্ন করলেন, মাছ খাওয়া কি হিংসা নয়? গান্ধীজী বললেন, "বাংলা দেশে মাছ হল সাধারণ খাদ্য। এটা জলের দেশ। সুতরাং মাছ খেতে আপত্তি কী?"

বন্ধুটি আবার প্রশ্ন করলেন, তার দ্বারা কি জীবনহানি হয় না?

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "হাঁ, তা হয়; কিন্তু ভেজাল খাদ্য বিক্রি করে মানুষ লোকেদের যে ক্ষতি করে এ তার চেয়ে কম ক্ষতিকর।"

এই যুক্তিবাদী মন ও গুণ গ্রহণের মনোভাব নিয়ে গান্ধীজী উনিশ শ' সাইত্রিশ

সালে এসেছিলেন কলিকাতায়। বাংলা দেশের বন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টা ছিল তাঁর এবারে কলিকাতা আসার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলার তদানীন্তন গভর্নর অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তিনি ব্যারাকপুরে দেখা করলেন। বন্দীরা মুক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদের পথ নেবেন এই অজুহাত দেখিয়ে গভর্নমেন্ট তাঁদের মুক্ত করতে ইতস্তত করছিলেন। গান্ধীজী হলেন তাঁদের গ্যারান্টি। ফলে সেবার তিন হাজার বিচারাধীন বন্দী মুক্তি পেলেন। কিন্তু আরও কিছু বন্দী রয়ে গেলেন। তাঁদের মুক্তি প্রচেষ্টা চলতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু গভর্নমেন্টের অসহযোগী মনোভাব দেখে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সেই সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন এবং একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে লেখেন, "এখন সমস্যা হল বাকি বন্দীদের মুক্তি আদায়ের জন্য আমাদের কী করা উচিত। আমরা কিভাবে অগ্রসর হব তার জন্য আপনার উপদেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

এই মুক্তি আদায়ের ব্যাপার নিয়ে বন্দীরা তখন অনশন করবার কথা চিন্তা করছিলেন। শরৎবাবু গান্ধীজীকে জানান যে, বন্দীরা অনশন করলে সমগ্র পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠবে, অথচ তাঁদের যে কী আশা দেবেন তাও তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। এই চিঠিটি উদ্ধৃত করে গান্ধীজী বন্দীদের মুক্তি দাবি করলেন। ঐরকম পরিস্থিতিতে শরৎবাবুর পদত্যাগ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না সে কথা স্বীকার করে নিয়ে গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানালেন যে, তাঁরা যেন আবার শরৎবাবুকে বন্দী-মুক্তি উপদেষ্টা সমিতিতে আহ্বান করেন। পরিশেষে লিখলেন, "আমি আশা করি বন্দীরা অধীর হবে না এবং অনশন বা ঐ জাতীয় কোন কাজের দ্বারা বাধা সৃষ্টি না করে বন্ধুদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে সুযোগ দেবেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করব যে, এতদিন তাঁরা যে মর্যাদাপূর্ণ সংযম বুদ্ধিমানের মত দেখিয়ে এসেছেন তা যেন বজায় রাখেন।"

ছয়

জীবনের দুটি সিদ্ধান্ত, একটি ব্যক্তিগত আচরণের এবং অন্যটি আদর্শ রূপায়ণের ক্ষেত্রে, গান্ধীজী এই বাংলা দেশে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকের কথা। গান্ধীজী একবার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসুর অতিথি হয়েছিলেন। তখন তিনি মূলত ফলাহার করতেন। সেজন্য ভূপেনবাবু বাজারে যত রকম তাজা ও শুকনো ফল পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলি বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে গান্ধীজীকে খেতে দিয়েছিলেন। এ দেখে গান্ধীজী ভীষণ বিব্রত বোধ করেছিলেন এবং প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "করেছেন কী? আমি সাদাসিধা ভাব পছন্দ করি, আর আপনারা আমার জন্য এত পরিশ্রম করেছেন!"

ঘটনাটি গান্ধীজীকে এমন নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি সেই দিনই দিনে মৌলিক পাঁচটির বেশি খাদ্য গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা নেন।

আর একটি ঘটনা ঘটে উনিশ শ' চল্লিশ সালে। 'গান্ধী সেবা সংঘ'-র অধিবেশনে যোগদানের জন্য গান্ধীজী পূর্ব বাংলার মালিকান্দায় এসেছিলেন। বাংলা দেশ তখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। সেজন্য গান্ধীজী যখন মালিকান্দায় পৌঁছান তখন শত শত দর্শনপ্রার্থীদের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে একটি জনতার 'গান্ধী ফিরে যাও' 'গান্ধীবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি মুখরিত হতে থাকে। দু তিন বছর আগে থেকে যে চিন্তা তাঁর মনকে আলোড়িত করতে থাকে তা এখানে বলবতী হয় এবং গান্ধীজী 'গান্ধী সেবা সংঘ' প্রতিষ্ঠানটি তুলে দেন। তিনি বলেন, "আমি জানি যে, আমরা যদি প্রতিষ্ঠানটি তুলে দেই তবে আমরা কিছুই হারাব না...... 'গান্ধীবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি নিরর্থক নয়। কেননা গান্ধীবাদের অর্থ যদি হয় যন্ত্রবৎ চরখা চালিয়ে যাওয়া তবে তা ধ্বংস হওয়া উচিত।...আমাদের অহিংসা যদি বীরের অহিংসা না হয়ে দুর্বলের অহিংসা হয় এবং তা যদি হিংসার সামনে নতজানু হয় তবে গান্ধীবাদের ধ্বংস হওয়া উচিত।"

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। 'গান্ধী সেবা সংঘ' রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু এই মালিকান্দার সম্মেলনেও বাংলা দেশ তার বৈশিষ্ট্য হারায়নি। পদ্মার তীরবর্তী এই গ্রামের পরিবেশ গান্ধীজীসহ সকলকেই যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি সম্মেলনের ব্যয়ের ক্ষেত্রেও নূতনত্ব ছিল। সাধারণত সম্মেলনে ব্যয়ের অঙ্ক আয়ের অঙ্ককে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু মালিকান্দার ব্যয় যেমন তুলনায় কম হয়েছিল তেমনি উদ্বৃত্তও হয়েছিল ব্যয়ের অধিক। গান্ধীকে সেই টাকা দেওয়া হয় এবং তিনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং পঞ্চানন বসুকে ট্রাস্টী করে সেই টাকা বাংলা দেশে খরচ করার জন্য দিয়ে যান।

বাংলা দেশের এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যেই গান্ধী জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে যায়। সেটি ঘটে শান্তি নিকেতনে। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বোধহয় অন্তরে মৃত্যুর হাতছানি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর

অবর্তমানে শান্তিনিকেতনের অবস্থা কী হবে সে সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল। গান্ধীজীর হাতে শান্তিনিকেতনের ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। উনিশ শ' চল্লিশ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী যখন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন, "এক সঙ্কটময় অবস্থায় আপনি একে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং একে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। আর এখন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার আগে আমি আপনাকে সাগ্রহে আবেদন জানাচ্ছি। বিশ্বভারতীকে আপনি আপনার রক্ষণাধীনে গ্রহণ করুন। আর আপনি যদি একে জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচনা করেন তবে একে স্থায়িত্বের আশ্বাস দিন।"

এই চিঠিতে গান্ধীজী অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "যখন আমরা বিদায় নিচ্ছিলাম তখন যে-মর্মস্পর্শী চিঠিটি আপনি আমার হাতে দিয়েছিলেন তা সোজাসুজি আমার হৃদয়ে পৌঁছেছে। বিশ্বভারতী জাতীয় সংস্থা বটেই। নিঃসন্দেহে এ আন্তর্জাতিকও। এর স্থায়িত্বের আশ্বাসের জন্য আমরা সমবেতভাবে যা করতে পারি তার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।"

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি আবার লিখেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনকে রক্ষণাধীনে গ্রহণ করার তিনি কেউ নন। বিশ্বভারতী ভগবান রক্ষা বহন করছে। কেননা তা আগ্রহশীল হৃদয়ের সৃষ্টি। কোন লোকদেখান জিনিস নয়। গান্ধীজী লিখেছিলেন, গুরুদেব নিজে আন্তর্জাতিক মানুষ, কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানুষও। তাই তাঁর সব সৃষ্টিই বিশ্বজনীন আর বিশ্বভারতী সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

এই বিশ্বভারতীকেই গান্ধীজী একবার অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারই উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠিতে। চার বছর আগের কথা। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে দিল্লি যান। তাঁর বয়স তখন সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি গান্ধীজীর অসহ্য মনে হয়। তিনি শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লাকে বিশ্বভারতীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দিতে বলেন। কয়েকদিন পরে গান্ধীজীর একান্ত সচিব শ্রীমহাদেব দেশাই ষাট হাজার টাকার একটি ড্রাফট ও 'গুণমুগ্ধ দাতাদের' একটি স্বাক্ষরহীন পত্র রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসেন। এই

[illegible]

সঙ্গে গান্ধীজী একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, "আমার সামান্য প্রচেষ্টায় ভগবান আশীর্বাদ করেছেন। এর সঙ্গে টাকা আছে। এখন আপনি আপনার অর্থনৈতিক কর্মসূচী বন্ধ করে দিয়ে জনগণের মনকে নিশ্চিন্ত করবেন। ঈশ্বর আপনাকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখুন।"

টাকা এবং চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, "আমার প্রয়োজনে অগ্রসর হয়ে আসার জন্য এবং আমায় যে-স্বধর্ম থেকে আমি পতিত হয়েছিলাম তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ব্যর্থ হয়ে যায়।"

এমনিই ছিল রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সম্পর্ক। বহু বিষয়ে তাঁদের মতান্তর ছিল, কিন্তু কখনই তাঁদের মনান্তর হয়নি। গান্ধীজী নিজেই সেকথার উল্লেখ করেছিলেন। আচার্য রায়ের সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে চরখা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তার কিছুদিন পরে নিখিল ভারত দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অর্থ-সাহায্যের আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই আবেদনে লেখা ছিল, "চরখা ও খদ্দরের সর্বজনীন প্রচার করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোন স্মৃতির কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না, আর সেজন্য ঐ উদ্দেশ্যেই আমরা অর্থ চাইছি।" রবীন্দ্রনাথ এই আবেদনে স্বাক্ষর করে পাঠাবার সময় গান্ধীজীকে চরখার ঐ সমালোচনাটি উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে, লেখাটি পড়ে গান্ধীজী হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন।

কিন্তু গান্ধীজী এই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হননি। উনিশ শ' পঁচিশ সালের পাঁচই নভেম্বর 'কবি এবং চরখা' নামে তিনিও একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে-ছিলেন। আর তাতে প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন, "কেবল মতে অমিল আমাকে ক্ষুব্ধ করবে কেন? প্রত্যেক মতানৈক্যই যদি অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তবে যেহেতু দুজন মানুষ সমস্ত বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারে না, সেই হেতু জীবন অপ্রীতিকর ভাবাবেগের সমষ্টি হয়ে উঠবে? আর সেজন্য জীবন হবে এক সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা? পক্ষান্তরে স্পষ্ট সমালোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।"

বস্তুত নিজের বিশ্বাসে অটল থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে গান্ধীজী বরাবর এই মূল্য দিয়েই দেখে এসেছেন। পাঁচ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আর একবার গান্ধীজীর কর্মধারার সমালোচনা করে-ছিলেন। তার উত্তরে গান্ধীজী তাঁকে 'মহান প্রহরী' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি কবিকে সেই প্রহরী বলে মনে করেন, যিনি আমাদের গোঁড়ামি, উদাসীনতা, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা,

নিশ্চেষ্টতা এবং সমজাতীয় অন্যান্য শত্রুদের আগমন সম্পর্কে সাবধান করে দেন।

গান্ধীজী যেমন মতান্তরকে মনান্তরে পর্যবসিত হতে দেননি, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, "মহাত্মাজীর সঙ্গে কোন বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক, তাকে নিজের মনে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক—এই আমার কামনা।"

গান্ধীজীর কাছে রবীন্দ্রনাথের এই যে বিরাট কামনা এটিকেও তিনি যথাযথ সম্মান
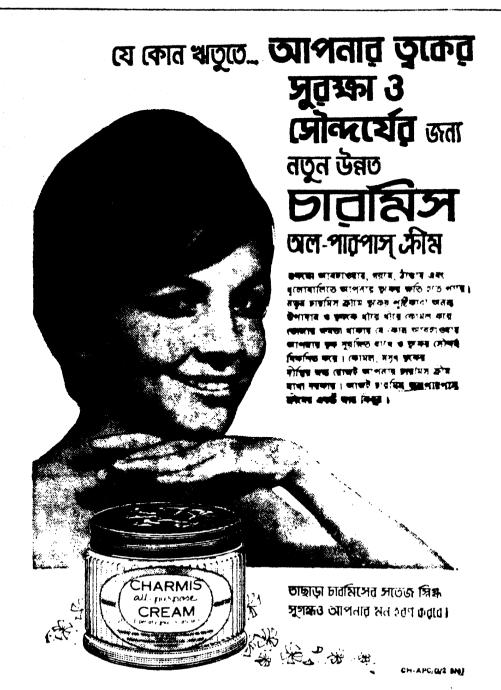
দিয়ে এসেছেন বরাবর। উনিশ শ' বত্রিশ সালের বিশে সেপ্টেম্বর। ভারত শাসনের নতুন বিধানে তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও অনুন্নত শ্রেণীর পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যারবেদা জেলে গান্ধীজী তার প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করার আগে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন, "এখন মঙ্গলবারের ভোর তিনটে। দুপুরে আমি প্রজ্বলিত দ্বারপথে প্রবেশ করছি। আমার এই প্রচেষ্টায় আপনার পক্ষে আশীর্বাদ করা যদি সম্ভব হয়, তবে আমি তা প্রার্থনা করি।" আরও লিখলেন, "আপনি আমার একজন প্রকৃত বন্ধু, কেননা আপনি স্পষ্টবক্তা বন্ধু রূপে রয়েছেন আর প্রায়ই আপনার চিন্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। আমি আপনার যে কোন সংকটের মতামতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কিন্তু আপনি সমালোচনা করতে অস্বীকার করেছেন। এখন তা কেবল আমার অনশনের মধ্যে হলেও যদি আপনার হৃদয় আমার কাজকে নিন্দা করে তবু আমি আপনার সমালোচনাকে মূল্য দেব। আমি যদি নিজেকে ভ্রান্ত দেখি তবে সে কথা ঘোষণা করলে ফল যাই হক না কেন, তা ঘোষণা না করার মত আমি অতি-গর্বিত নই। আমার কাজকে আপনার হৃদয় যদি সমর্থন করে তবে আপনার আশিস আমি চাই। আপনার আশীর্বাদ আমাকে পতন থেকে রক্ষা করবে।"

রবীন্দ্রনাথের হৃদয় সমর্থন করেছিল গান্ধীজীর এই অনশন। তিনি লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষের ঐক্য এবং সামাজিক পূর্ণতা রক্ষায় বহুমূল্য জীবনের বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের ব্যথিত হৃদয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তাঁর মহান প্রায়শ্চিত্তের অনুগমন করবে। রবীন্দ্রনাথের কথা সার্থক হয়েছিল। সমগ্র দেশ জেগে উঠেছিল গান্ধীজীর অনশনে এবং অবশেষে গান্ধীজীর প্রতিবাদ সফলতা লাভ করেছিল। বিদেশী সরকার হিন্দুদের মধ্যে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনকেও গান্ধীজী আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বলেই গণ্য করতেন। তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রমের তুলনায় শান্তিনিকেতনে নিয়মের কঠোরতা কম ছিল এ কথা তিনি জানতেন। রবীন্দ্রনাথকে সে কথা বলেও ছিলেন তিনি। সে কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর সমালোচনা তিনি মেনেও নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি হলেন কবি আর শান্তিনিকেতন হল তাঁর চিত্ত বিনোদনের বস্তু। কিন্তু গান্ধীজীর এই মন্তব্যকে নিয়েই নানান জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল একদিন। এমন কি বোম্বের একটি পত্রিকায় এ কথাও প্রকাশিত হয়েছিল যে, গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন যে,

শান্তিনিকেতন হল কেবল ভৌতিক প্রগতির কেন্দ্র আর সত্যাগ্রহ আশ্রম আধ্যাত্মিক প্রগতির। এই লেখাটি পড়ে গান্ধীজী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং একটি লেখায় শান্তিনিকেতন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আর একবার স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "প্রকৃত আধ্যাত্মিক কবিতার যিনি স্রষ্টা তিনিই যখন শান্তিনিকেতনের আধিপত্য বিস্তারী চেতনা তখন তা আধ্যাত্মিক ছাড়া আর কী হতে পারে? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে বাস করেছেন সেই জায়গায় আধ্যাত্মিকতার অভাব থাকতে পারে বলে মনে করার মত মূর্খ আমি নই। ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠকেরা জানেন যে, আমি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে বড় দাদার প্রেরিত আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করি। তিনি নিরন্তর আমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন এবং আমার ব্রতের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছেন।...আমি পাঠকদের আরও জানাতে চাই যে, আমাদের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলাকেই আমি সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক বলে মনে করি।... সমপ্রকৃতির কিন্তু অভিন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তুলনা করা যায় না। কিন্তু তা যদি করতেই হয় তবে সত্যাগ্রহ আশ্রমের দ্রুত উন্নতি ও নিয়মানুবর্তিতা সত্ত্বেও আমি যথার্থভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পক্ষে ভোট দেব। বয়সে ও বড় আর আমি জানি জ্ঞানেও ও বড়।"

অন্তরের ভিতর ব্যক্তিগত পরিচয়ের

অপেক্ষা রাখে না এ কথা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মিলিত জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। পরিচয় যখন হয়নি তখনই গান্ধীজী গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। আবার ব্যক্তিগত পরিচয় যখন বারংবার সাক্ষাতের দ্বারা গভীর হয়নি তখনই সেই উনিশ শ' কুড়ি সালের মার্চ মাসে লেখা একটি চিঠিতে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় কোথায় থাকতে চান তা জানতে চেয়ে গান্ধীজী এ কথাও লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রমে থাকেন তবে তা তাঁকে খুবই আনন্দ দেবে। কেননা তাঁর আশ্রমকে রবীন্দ্রনাথ জানেন, বুঝেন এর জন্যও যেমন তাঁর আগ্রহের শেষ নেই তেমনি তাঁর অবস্থানের দ্বারা আশ্রমের অনেকে লাভবান হক তাও তিনি চান।

রবীন্দ্রনাথের আগমনে গুজরাটীদের কর্তব্য কী হবে সে কথাও গান্ধীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তাঁকে যদি আমরা শান্তি দিতে পারি এবং তাঁর কাছ থেকে যা আমাদের শেখা উচিত তা যদি শিখে নিতে পারি তবে তাঁর অবস্থান থেকে আমরা লাভবান হতে পারব।... তাঁকে আমরা কী ভাবে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে পারি? তাঁর কাজে অর্থ সাহায্য করে। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতি গভীর-ভাবে অনুরক্ত। তাঁর বাবা এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছেন তিনি নিজে। এগুলির ব্যয়, তিনি যে দান সংগ্রহ করেন তা থেকে মেটান। এই কাজের জন্য তিনি তাঁর নিজের টাকাও লাগিয়েছেন। গত বছর তিনি যখন মাদ্রাজে গিয়েছিলেন তখন যেখানেই তিনি যান সেখানেই দান গ্রহণ করেন। আমরা মনে করি যে গুজরাটেও যদি সেই রকম কিছু করা যায় তবে তার দ্বারা একটি কাজ দেখান হবে।"

শান্তিনিকেতনও এমনিভাবে আপন করে নিয়েছিল গান্ধীজীকে। প্রথম দিনের ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁকে যে অভ্যর্থনা শান্তিনিকেতনবাসী দেখিয়েছিলেন তা গান্ধীজী কোনদিন ভুলতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গান্ধীজী শেষ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখনও তাঁরা তাঁর কাছে অকপটে মনের কথা খুলে বলেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে শেষ বারে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে-সম্ভাষণ পেয়েছিলেন তাকে তিনি তাঁর ভিক্ষার ঝুলির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বর্ণনা করে-ছিলেন। শান্তিনিকেতন তাঁর কাছে শান্তির নিকেতন বলেই পরিগণিত হয়েছিল, এটি

ছিল তাঁর দ্বিতীয় গৃহ। আর এখান থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক আলোক পেতেন। তা পেতেন রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে।

সাত

বাংলা দেশ গান্ধীজীকে চায় না এ কথা গান্ধীজী মনে করতেন না। অসহযোগের প্রথম দিকে বাংলা দেশ তাঁকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল, যেভাবে অনুসরণ করেছিল তাতে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল। সেই সময় তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন, "এ কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব যে, অন্য কোন প্রদেশ, এমন কি গুজরাটও বাংলা দেশের চেয়ে বেশি স্নেহ আমাকে দেখায়নি। আমার সৌভাগ্য যে, কোন প্রদেশেই আমি নিজেকে 'বিদেশী' বলে অনুভব করিনি, বাংলা দেশে এই রকম অনুভূতি তো একেবারেই হয়নি।" জীবনের সায়াহ্নে নোয়াখালির বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে অশেষ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বৃদ্ধ বয়সে আবার নতুন করে বাংলা ভাষার পাঠ নিচ্ছেন এবং ঘোষণা করছেন যে তিনি নিজেকে বাঙালী করে নিয়েছেন তখনও বাংলা দেশের মানুষ তাঁকে একান্ত আপন করে নিয়েছিল। আর বড়দাদার মত মানুষের তো কোন কথাই নেই। তাঁর স্নেহ এবং তাঁর বিশ্বাস গান্ধীজীকে অভিভূত করে দিয়েছিল। বয়সে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বয়সের এই পার্থক্যকে অতিক্রম করে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘও তিনি তুলে ধরেছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর পরম বিশ্বাস রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে তাঁর গান্ধীজীর প্রতিও। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরেই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এ কথার দাম কম নয়। গান্ধীজীর প্রতিটি কাজের পিছনে তিনি যেন তাঁর যুক্তিটি খুঁজে বেড়াতেন। অসহযোগ ও চরখার প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। একটি চিঠিতে তিনি গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, "যাঁরা জটিল নীতি-শাস্ত্রের চাক তাঁদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কানে অসহযোগ কথাটি আঘাত করতে পারে। কিন্তু ভাল-ভাবে খেয়ে পরে আছে এমন গৃহস্থের কাছে আমরা যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আর সে উপহাস করে আমাদের উপর পাথর ছোঁড়ে এবং সেই পাথরকেই রুটি মনে করে গ্রহণ করার জন্য আমাদের যে মানসিকতা থাকে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান হল এই অসহযোগ।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিও গান্ধীজীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উনিশ শ' পঁচিশ সালে তিনি যখন শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন তখন প্রতি দিন তিনি বড়োদাদার কাছে গিয়ে বসতেন এবং ছেলে যেমন বাবার কথা শোনে তেমনিভাবেই তাঁর কথা শুনতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ আগ্রহ করেছিলেন গান্ধীজীকে তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে। কিন্তু গান্ধীজী চেয়ারে না বসে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়েছিলেন; বলেছিলেন, "অন্যদের কাছে আমি যাই হই না কেন অন্তত এখানে আমি আমার শিখর থেকে নেমে আসব এবং আমার মহাত্মা ভাবকে দূরে সরিয়ে রাখব।"

আর এক জ্ঞানতপস্বীর মনেও গান্ধীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধা-প্রীতি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। উনিশ শ' সাতাশ সালের কথা। গান্ধীজী অসুস্থ হয়ে মহীশূরে অবস্থান করছিলেন। একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এলেন। গান্ধীজীই ভাবছিলেন মহীশূর ছেড়ে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। যাই হোক দেখা হল; দুজনেরই তাতে আনন্দের সীমা নেই। বয়সে বড় ব্রজেন্দ্রনাথ। গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে আপনি কত বছর দেবেন। মৃত্যুর আগে সার সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন আমি দেখা করি তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। তিনি একানব্বই বছর বেঁচে থাকার আশা করেছিলেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "যিনি অমর, অমরতার আস্বাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকে আমি কী দিতে পারি?"

আলোচনা শেষ হল। এবার বিদায় নেবার পালা। গান্ধীজী বিছানায় শুয়ে। ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যে গান্ধীজীর কাছে আসতে পেরেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। আর তারপরেই অবনত হয়ে গান্ধীজীর পদস্পর্শ করলেন তিনি। অভিভূত হয়ে পড়লেন গান্ধীজী। বলে উঠলেন "দোহাই আমাকে অপদস্থ করবেন না।" এবং তারপরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি প্রণাম করলেন ব্রজেন্দ্রনাথকে।

গান্ধীজীর এই গুণগ্রাহিতা কেবল দুজনকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়নি, সংসারে যাঁরা সাধারণ মানুষ, সমাজের উচ্চ শিখরে যাঁরা তাঁদের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তাঁদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের

প্রতিও তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বিশ্বকোষের রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসুর কাজের কথা যখন তিনি শুনেছিলেন তখন থেকেই তিনি তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করার কথা ভেবেছেন। তারপর একদিন সোদপুর যাবার পথে আগে থেকে কোন খবর না দিয়েই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে। এটিকে তিনি তাঁর তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করেছিলেন। বলেছিলেন, সেখানে যেতে পারায় তিনি ধন্য হয়েছেন, নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তিনি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রায় আসবাব শূন্য ঘরে বিছানায় শায়িত নগেন্দ্রনাথের পাশে টুলে বসে কথা বলতে বলতে গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন যে, এই সাক্ষাৎকার বাদ দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই উচিত হত না।

হুগলী জেলার ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন সাগরলাল [illegible] নামে অখ্যাত এক কর্মী। তাঁরই কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী লিখেছিলেন যে, কোন দেশই তার এইসব সন্তানদের নামের হিসাব রাখতে পারে না, সাগরলাল সেই জাতীয় মানুষ যাঁরা মানুষের দিক থেকে অপরিচিত থেকে [illegible] যাঁদের সেবা ও যাঁদের মৃত্যু দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তেমনি নীরব কর্মী ছিলেন [illegible] জেলার যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি অসহযোগের আহ্বানে চাকুরী ত্যাগ করে সত্যাগ্রহের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল পুরাতন মসলিনকে পুনরুজ্জীবিত করা। তার জন্য অসীম শ্রম তিনি করেছেন এবং এই শ্রম যে এক অখ্যাত স্বদেশহিতৈষী কর্মীর প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা অনুভব করতে পেরেছিলেন গান্ধীজী।

ফরিদপুরে এক অনুন্নত শ্রেণীর উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল গান্ধীজীর। অস্পৃশ্যতা এবং অন্য গঠনকর্ম সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং গান্ধীজীর উপদেশ নেবার জন্য তিনি তাঁর কাছে এসেছিলেন। গান্ধীজী তাঁর অনুরোধ এবং কোন রকমের [illegible] অর্থ গ্রহণ করার [illegible] দেখে খুশী হয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে এই সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের [illegible]।

সত্যিই বাংলা দেশের এই বিশালতা, এই ত্যাগ এবং এই প্রাণপ্রাচুর্য গান্ধীজীকে মুগ্ধ করেছিল। অকপটে তিনি তাই বলেছিলেন, "বাংলা দেশ অনেক কিছু করেছে। সে বিস্ময়কর কাজ করেছে। সে যথেষ্ট যন্ত্রণাভোগ করেছে, এখনও করছে এবং প্রচন্ড সংযমের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছে। বলেছিলেন যে, বাংলা দেশে সুন্দর কল্পনা শক্তি রয়েছে, বাংলা দেশের যুবকরা খুবই বুদ্ধিমান, তাঁরা আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত।

এই মুগ্ধতার ভাব নিয়ে, এই শ্রদ্ধাপ্রীতির মন নিয়ে এবং বড় কিছু পাবার আশা নিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমি চাই ভারতবর্ষের মত বাংলা দেশের অন্তরে পৌঁছতে।" বাংলা দেশ তাঁকে হয়ত স্বীকার করেনি, কিন্তু তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করেছিল।

যেন—এমন কিছু সুন্দর নয় সে—বিয়ের বাজারে চালাতে গেলে নগদ দু' তিন হাজারের ধাক্কা—তবু তার জন্যই ক্ষেপে গেল পাগলা আদিটা! দূরে শালা। রিনিকে বরং দেখে যা—দেখে যা উঁচু নীচু কাকে বলে—কী রকম মোলায়েম ফর্সা চামড়ায় বাঁধানো আমার বউ, দেখে যা। ঐ কালো মেয়েটার জন্য কি খুব বেশী হুজ্জৎ করা যায়! তবু মাইরি তুই কতকালের সব পুরোনো দোস্তদের না হক মাস্তানী দেখিয়ে গেলি! কোনো মানে হয়? লালিত বাগড়া দিচ্ছে? তো দিয়ে দে না ঐ আধমড়া ছেলেটাকে ঐ কালো মেয়েটা! দু-চারদিন ভোগ করে নিক। তারপর তো মরেই যাচ্ছে ও। ও মরে গেলে—মানুষের তো তখন আর কোনো স্বত্ব থাকে না—তখন ওর স্থাবর অস্থাবর আমরাই তো পাবো রে! একটু উদার হলে দ্যাখ, কত ঝগড়া কাজিয়া এড়ানো যায়। তোরা কী রে!

রিনি এগিয়ে গিয়ে গ্রীল ধরে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাঁকা রাস্তা। হিন্দুস্থান পার্কে এ সময়টায় ভূত নামে। কেবল ওধারে একটা গ্যারাজের সামনে খাটিয়া পেতেছে এক বুড়ো দারোয়ান. নিশুত রাত চিরে পাতকুড়ুনীদের অপার্থিব চীৎকার ভেসে আসে—মা গো—।

রিনি মুখ ফিরিয়ে বলে—শুনছো?

—কী?

—ঐ যে চীৎকার! বড্ড ভয় করে।

রিনি অপ্রস্তুত হাসি হেসে। তারপর বোধ হয় একটু চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলে—কী রকম যেন শাপ শাপান্তের মতো শুনতে লাগে। এমন বিচ্ছিরি গলা করে ডাকে যেন সর্বস্ব চলে গেছে—

খামোখাই দামী লিপস্টিক মাখে রিনি। বাজে খরচ। সঞ্জয় জানে গীটার শেখানের মাস্টারের সঙ্গেও রিনি প্রেম করে না।

অঙুলে আঙুলে ছুঁইয়ে দেখে সতীত্বের ভয়ে গুটিয়ে যায়। ধুস্!

সঞ্জয় সামান্য হেসে বলল—আমি এক সময়ে ওদের কাছাকাছি থাকতাম। কত রাত চিৎপুরের ফুটপাথে শুয়ে কেটেছে বইয়ের দোকানের তক্তার তলায়। দুই একবার অনেকটা ভিক্ষের মতো করে লোকের কাছে হাত পেতেছি। ওর একটা মজা আছে।

—কী মজা?

—আছে। এখন আর সেটা বোঝাতে পারি না। তবে সর্বস্ব চলে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে।

রিনি চুড়ির রুমুন্ শব্দ করে রাস্তায় মুখ ফেরাল। তারপর হঠাৎ বলল—আবার ওরকম হতে পারো?

সঞ্জয় মাথা নাড়ল—না।

রিনি মৃদু হাসি-মুখ ফিরিয়ে বলে—পারো না? তবে যে বললে মজা আছে! আমাকে খ্যাপানো অত সোজা—না?

সঞ্জয় বলল—এখন পারি না তার কারণ অন্য। এখন যদি একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে গিয়ে ফুটপাথে মাদুর পেতে শুয়ে থাকি, তবু মনে হবে, রাতে চোর এসে আমার কী একটা চুরি করে নেবে। কী একটা যেন খোয়া যাবে আমার। কিছু খোয়া না গেলেও ঐরকম মনে হবে। সর্বস্ব পারবো না। কিন্তু যদি কোনোদিন সত্যিই সর্বস্ব চলে যায়, তাহলে—

রিনি হাই তুলল। তারপর পরিপূর্ণ শরীরখানা একটু আলস্যে জড়ানো ভঙ্গীতে মুচড়ে সঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। যার একখানা প্রীত লাবণ্য কাড়লাও। তার অলো পড়ল ওর গায়ে। সাধু সন্ন্যাসীর মতো পবিত্র মুখ করল সঞ্জয়, বলল—তোমার গীটারটা একটু বাজাও না, শুনি! নতুন কী শিখেছ।

—ঘুম পাচ্ছে।

—ওঃ! তাহলে বরং গিয়ে ঘুমোও।

সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে রিনি—বাবা, আমি ঘুমোতে চাইলাম, আর উনি ঘুমোতে দিলেন। কেন, হুকুম করতে পারো না—না, আমি এক্ষুনি গীটার শুনতে চাই, নিয়ে এসো গীটার, আমার পায়ের কাছে বসে বাজাও—

সঞ্জয় হাত তুলে বলল—আস্তে। এ সময়ে জোরালো শব্দ শুনলে নেশা কেটে যায়।

অভিমানী মুখ করে রিনি বলে—যাও, বাজাবো না।

শান্ত গলায় সঞ্জয় বলল—গীটারটা আনো।

সামান্য একটু আদর কাড়া ঝগড়া করল রিনি। কিন্তু এতকাল পরে এই প্রথম সঞ্জয় তার বাজনা শুনতে চেয়েছে বলে সে চাপা আনন্দে একটু ঝলমলে মুখে সত্যিই গীটার নিয়ে সঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসল। পিকগুলোকে

যেমন কোনো দেয় রিনি তেমনিই বেজে দিল বল্লখানাকে।

—কী বাজাবো?

—দেহাতী গান জানো?

রিনি হাসে—গাইয়া কোথাকার!

—তাহলে যা খুশী বাজাও।

একটু টুংটাং করে রিনি সত্যিই বাজাতে লাগল। বিভোর হয়ে।

একটু আশ্চর্য হয়ে সঞ্জয় শুনছিল। সেই ওঠাপড়াহীন বিজন মেয়ে কামার সুরে গান—ঠিক যেমন দেহাতী গান হয়। রিনি তাই বাজাচ্ছে। সঞ্জয় গানটা একটুও ধরতে পারল না। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় এক পাহাড়ী নদী পার হয়ে রঙচঙে কাপড় পরে মানুষ মেলায় যাচ্ছে। সাজপরা গরু টেনে নিয়ে যাচ্ছে রঙীন গাড়ি। এরকম দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠছিল।

রিনি থামলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি হিন্দী ছবির গান?

—দূর!

—তবে?

—ছেলেবেলায় গানটা শুনেছিলাম। সেবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে। সুরটা মনে ছিল, সেই থেকে বাজালাম।

—কথাগুলো কী বলো তো!

রিনি হাসল।

—গার্ডবাবু, গার্ডবাবু, সিটি না বাজা না, ঝাণ্ডি না দিখানা প্লাটফারম মে রহ গৈল গাঁটরিয়া...গুন গুন করে গাইল রিনি।

হাসতে হাসতে সঞ্জয় টের পাচ্ছিল পেটের নীচে একটা ভারী বস্তু ঝুলছে। তলপেটটা। প্ল্যাটফর্মে গাঁটরি পড়ে রইল—হায় ঈশ্বর, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে! হে গার্ডবাবু, তোমার পায়ে পড়ি—সর্বস্ব পড়ে আছে আমার প্ল্যাটফর্মে—

—রিনি!

—উঁ!

—আজ আর কিছু বাজিও না। শুনতে ভাল লাগবে না। তুমি খুব সুন্দর শিখেছো, খুব সুন্দর—

রিনি হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল—তবে প্রাইজ দাও।

প্রাইজ দিতেই যাচ্ছিল সঞ্জয়, হঠাৎ রিনি মুখ আচমকা সরিয়ে নিয়ে বলল—ইস, ছাই পাঁশের গন্ধ! কী স্বাদে যে খাও—

রিনি উঠে চলে গেলে একা একা একটা ডিঙি নৌকোর মতো চেতনা ছেড়ে অচেতনতার দিকে ভেসে গিয়েছিল সঞ্জয়। কাল রাতে।

গাঢ় ঘুম হয়েছিল রাতে কিন্তু তৃপ্তি হয়নি। ঘুম ভাঙল সাতটায়। খুব আশ্চর্য হল সঞ্জয়। এরকম কখনো হয় না। ছটার মধ্যে তার ঘুম ভাঙবেই। সে নিয়মের অনুশাসন মেনে চলা মানুষ।

বিরক্ত হয়ে সঞ্জয় রিনিকে জিজ্ঞেস করল—সকালে ডেকে দাওনি কেন?

—কত ডেকেছি! তুমি কেবল উঁ উঁ করে এ-পাশ ও-পাশ ফিরলে।

শরীরটা বুড়িয়ে গেছে অনেক। পায়ে পায়ে জড়তা আর আলসেমির ভাব। বিছানা ছাড়ার পর কোনোদিনই ঘুমের জড়তা থাকে না তার, কিন্তু আজকাল শরীর পাল্টাচ্ছে।

অফিসে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় পানের

দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সঞ্জয়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরে রইল। দোকানদার এক প্যাকেট সিগারেট হাতে দৌড়ে আসে।

গাড়িটা ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দেখল বাস স্টপে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-চেনা মেয়ে, এক সময়ে একই এক্সপ্রেস বাসে অফিসে গেছে। গাড়িটা দিয়ে তাকে ডেকে ফেলল সঞ্জয়। চোখে চোখ পড়তেই হাসল—চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

মেয়েটা একটু অবাক হয়। এই প্রথম আলাপ। কিন্তু এক সময়ে বাসে অফিস-যাওয়ার একঘেয়ে দূরত্বটুকু সঞ্জয় পার হত এই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। মেয়েটা প্রথম প্রথম চোখ সরিয়ে নিত। তারপর মাথা নীচু করে লজ্জায় ভান করল কিছু দিন। তারপর একদিন—হঠাৎ থেকে যেন—চোখে চোখ রাখতে শুরু করল। অবশ্য বাকী সময় কেটে যেত। খেলা খেলা একটা ব্যাপার, প্রেমের মতোই—অথচ প্রেম নয়—একটা ব্যাপার।

বহু দিন হয় সঞ্জয়কে আর খুঁজে পায়নি মেয়েটা। আজ গাড়িসুদ্ধ দেখে খুব অবাক হল। ভদ্রলোক কোনোদিন কথা বলতে সাহস

বয়েসটা তার অল্প, কিন্তু এখন শাড়ি হওয়াতেই বোধ হয় সাহস বেড়েছে। মেয়েটি ইতস্তত করে বলল—বাসেই যেতে পারবো।

—দূর! আসুন না।

বাঁ হাতে সামনের দরজাটা খুলে ধরে সঞ্জয়। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসে।

শরৎকালের মতো ঋতু নেই। এমন উজ্জ্বল রোদ! সেই আলোতে মেয়েটি বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। সুডৌল সুন্দর মুখখানা, যাকে একটা পাথর বসানো মাকড়াবি ঝিকিয়ে উঠছে। ডান হাতে সাদা ব্যাগ, বাঁ হাতে ভাঁজ করা রোদ-চশমা। ভাগিস চশমাটা পরেনি! অমন সুন্দর চোখ দুখানা—তাতে ভয়, সংশয় আর ইচ্ছার যে খেলাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো দেখাই যেত না।

মেয়েটি উঠে এল। সঞ্জয় গাড়ি ছেড়ে দিল।

নিঃশব্দে বসে থাকে মেয়েটি, অস্বস্তি বোধ করে বোধ হয়। সঞ্জয় সেদিকে তাকালই না, আলতো হাতে স্টিয়ারিং ধরে অলস ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে। মেয়েটি একপলক তাকে দেখল নিঃশব্দে—এতকাল কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে কত খুঁজেছি!

ট্রাফিক জংশনে লাল আলো দেখে সঞ্জয় গাড়ি থামায়। সিগারেটের প্যাকেট খুলতে খুলতে মেয়েটির দিকে তাকায়। না, মেয়েটির শরীর কিংবা মুখ দেখে না। কেবল সিঁথিটা লক্ষ্য করে। সিঁদুরের চিহ্ন নেই। লুকোয়নি তো! ঠোঁটে আবছা লিপস্টিক, কপালে টিপ নেই। কিছুই বুঝতে পারে না সঞ্জয়। আজকাল বাঙালী মেয়েরা জনসাধারণকে ফাঁকি দিতে শিখেছে। সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে —কোথায় আপনার অফিস?

—নিউ সেক্রেটারিয়েটের কাছে, ম্যাক-কাফিজম।

ঝামেলা। এখন আবার সেই নিউ সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত গিয়ে তারপর পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে আসতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সঞ্জয় ঘড়ি দেখল। এখনো মিনিট পনেরো সময় আছে, কিন্তু তাতে হবে না। এখন পর্যন্ত এই অফিসে তার এক দিনও দেরি হয়নি। যদি হয়, আজই প্রথম হবে। এই মেয়েটির জন্যই। তাছাড়া আজ সকালে সাতটায় উঠেছে সে। সময় ছিল না বলে দাড়ি ঠিক মতো কামানো হয়নি, গালে ক্ষুর পড়েনি ঠিকমতো, হাত দিলে খর খর করছে। অগোছালো হয়ে আছে সে। খামোখা জিজ্ঞেস করল—চাকরি করেন?

—হুঁ।

—কোন ডিপার্টমেন্ট?

—পাব্লিসিটি।

তাকে কথা শেষ করতে দেয় না সঞ্জয়, বলে—আমাকে আপনার মনে আছে?

বাজে কথা ছেড়ে চট করে কাজের কথায় চলে আসে।

মেয়েটা লজ্জা পায় বোধ হয়। উত্তর দেয় না।

হাজরার মোড় পেরিয়ে সঞ্জয় গাড়ি ছোটায়। গতি বাড়াতে থাকে। যদি সময়টাকে বাঁচানো যায়!

মেয়েটা বলল—গাড়ি কিনলেন!

—ঐ একরকম কেনাই।

—খুব সুবিধে এখন, না? বাসে যা ভিড় বাড়ছে দিন দিন—

সঞ্জয় মৃদু হাসল, বলল—যখন গাড়ি ছিল না তখন একদিনও লেট হয়নি। আজই প্রথম লেট হবে বোধ হয়।

—গাড়ি কি অনেক দিন কিনেছেন। কদ্দিন আপনাকে দেখি না তো! বোধ হয় বছর খানেক—

—না। গাড়ি তো সদ্য হল। মাঝখানে কিছু দিন ট্যাক্সিতে যেতাম।

মেয়েটা বলে—বেশ গাড়িটা। ছোটোখাটো, কোজি—

ঘুরেফিরে গাড়ির প্রসঙ্গ। সঞ্জয়ের বিরক্তি লাগে। আমাকে দেখছো না কেন সেই আগের মতো? তখন একশো জনের চোখের সামনে বিহ্বল হয়ে দেখতে, এখন একা গাড়িতে আমরা দুজন, তুমি শুধু কেবল গাড়িতে মনোযোগ রেখেছো! গাড়িটা কি আমার চেয়েও বেশী!

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাকেন?

—পাতিপুকুর। আপনি?

—হিন্দুস্থান পার্ক।

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে—একা?

সঞ্জয় মিটমিটে জ্ঞানের মতো হাসে, মাথা নেড়ে বলে—না, আমার লোকজন আছে।

মেয়েটা ঠিক বুঝতে পারে না লোকজন কথাটার মানে কী। মেয়েটাকে ভাবতে দেয় সঞ্জয়, নিজের থেকে সে বলবে না যে তার বিনি আর পিকলু আছে। মেয়েটা সারা দিন ভেবে মরুক। কেন আমি বলব? তোমরা কেন আজকাল সিঁদুর লুকোও? কেন জন-সাধারণকে ফাঁকি দাও? এই যে আমি তোমার সাদা সিঁথি দেখেও কিছুতেই সিওর হতে পারছি না, যেমন আজকাল বিনিকে দেখেও বাইরের লোকজন বুঝতে পারে না—এই যন্ত্রণা কেন দাও?

ঘড়ি দেখে সঞ্জয়। মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা ভুল হয়েছে। একদম ভুল। চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, সে এই মাত্র সার্কুলার রোডের ক্রসিং পেরোলো। ঘড়িতে আছে আর মাত্র ন দশ মিনিট সময়। সে কেন গাড়িতে তুলে নিল মেয়েটাকে! হ্যাঁ, কেন তুলেছিল? কী উদ্দেশ্য তার? বুঝলে অচেনা মহিলা, মেয়েদের আমরা মাত্র একটিই ব্যবহার জানি। মাত্র একটিই।

তোমাকে আমার গাড়িতে কেন তুলেছি তা চোখ বুজে একটু ভাবলেই দেখা যায়, দূরে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখা যায়। আমি রোজ ঐ বাস্-স্টপে গাড়ি থামাবো, তুলে নেবো তোমাকে। তারপর আস্তে আস্তে......। আমি অতদূরে চরিত্রহীন। বুঝলে! কিন্তু একটা সময়ে আমার গোটাকয় জিনিস ছিল—সততা, নিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা। আমি শূন্য থেকে বোস অ্যান্ড কোম্পানী তৈরি করেছিলাম। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিখিরির মতো ঘুরেছি, ঝুলিতে ছিল ঐ তিনটে জিনিস। ঐ তিনটে জিনিসই আমাকে সব দিয়েছে, তারপর তারা ঝরে গেছে আস্তে আস্তে। শেষটা ছিল কর্মদক্ষতা। কাল পর্যন্তও ছিল সেটা। আজ সকাল সাতটায় ভেঙেছে ঘুম, দৌড়তে যাচ্ছি অফিসে, শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আলসেমিতে। শেষ গুণটাও ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে। আর কি চাই! হুররে!

এসে গেছি। ম্যাককারিয়নের অফিস ঐতো দেখা যাচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে কী বলো? জানি তো, একদিন অসময়ে গার্ড নিশান উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দেবে, প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে গাটরি—আমোখা ভেবে কী হবে বলো! তার চেয়ে আমাদের ঘন ঘন দেখা করা ভাল।

দুপুরে ফোন করছিল সঞ্জয় ম্যাককারিয়নের মুখার্জিকে। অনেক কালের চেনা লোক।

—আরে মশাই, আপনাদের পাবলিসিটিতে একটা মেয়ে আছে না! নাকে নাকছাবি?

—ওঃ, মিস্ সান্যাল!

—মিস্। আর ইউ সিওর যে মেয়েটা মিস্?

মুখার্জি হাসে—কী ব্যাপার?

—কিছু না। শুধু জানতে চাইছিলাম যে মেয়েটা সত্যিই মিস্ কিনা, আজকাল তো বোঝা যায় না......

—জেনেই বা লাভ কী? মিস্ হলে সুবিধেটা কোথায়? ওর অনেক ভক্ত।

—আমার এক শালা সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে—ইঞ্জিনীয়ার, ভাবছিলাম তার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! ভক্তের কথা কী যেন বলছিলেন?

মুখার্জি গলার ঠাট্টার ভাবটা পাল্টে বলে—না, ও কিছু না। মেয়েটা সত্যিই ভাল। কাউকে পাত্তা দেয়না। দেখতে পারেন। আমি পরশু টরশু আরো খোঁজ নিয়ে জানাবো।

—পরশু কেন? কাল—কালকেই জানাবেন।

—কাল বাঙলা বন্ধ—মনে নেই।

—ওঃ হো। ঠিক আছে, তবে পরশুই—

ফোন রেখে দেয় সঞ্জয়।

আর কিছু না, মেয়েটাকে এর পরদিন তার নাম ধরে ডাকবে সঞ্জয়, মুখার্জি আর যা যা জানাবে সব বলে দেবে মেয়েটাকে। ভীষণ অবাক হয়ে যাবে মেয়েটা। খুশী হবে। ভাববে সে কত ইম্পর্ট্যান্ট সঞ্জয়ের কাছে। একটা মেয়েকে নষ্ট করা কত সোজা!

আজ যেন কেমন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। দুটো লোক পরশু থেকে পেমেন্টের জন্য ঘুর ঘুর করছে। দুই একটা সইয়ের ব্যাপার। কিন্তু তাও করল না সঞ্জয়। বলল, পরশু নেবেন।

কলমটা চোখের সামনে আড়াআড়ি তুলে ধরে অন্যমনে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা প্রোডাকশন্ দেখতে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়ায়। ওপরওয়ালাকে ইন্টারকম টেলিফোনে বলল, পরশু যাবে। সব পরশুর জন্য ফেলে রাখছিল সঞ্জয়। বহুকাল পর আজ তার দুপুরে একটু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

নাকে নাকছাবি পরা একখানা মুখ হঠাৎ লক্ষ মানুষের ভিড় থেকে তাকে পেখে তুলছে। মেয়েদের মধ্যে একটা কিছু আছে—একটা রহস্যময় কিছু। অন্তর্বাস

খোলার পর যা দেখা যায়, যা স্পর্শে টের পাওয়া যায় সেটুকুই সব নয়। হলে কারো জন্যই কারো এত স্পৃহা থাকত না। রিনি কি কিছু কম দিতে পারে? তবু কেন যে মনে হয় রিনির যা পেয়েছে তার অনেক বেশী রিনির আছে—যা তাকে দেয়নি। মাঝে মাঝে দেখা যায় রিনি বাবু হয়ে বসে পিকলুকে কোলে নিয়ে ঝুঁকে ওর মুখ দেখছে, পিকলু হাত পা ছুঁড়ে প্রবল ঔ-ঔ শব্দ করছে। তখন সমস্ত শরীর জুড়ে যে নম্র এক শ্রী ফুটে ওঠে রিনির—ওটা, ওটুকুই কি মেয়েদের রহস্য? বোধ হয় চিরকাল প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েরা গোপন ষড়যন্ত্র করে আসছে—ঠকাচ্ছে পুরুষদের। তাদের যেটুকু দেওয়ার—সেইটুকু সেই তুচ্ছ শরীরটুকু সামনে ছুঁড়ে দিয়ে গোপন করছে মূল্যবান কিছু। পুরুষেরাও এর বেশী মেয়েদের বোঝে না। কিন্তু সে কেমন অতৃপ্ত থেকে যায়। যেমন রিনির কাছে যা পেয়ে সঞ্জয় এখন অফিসের কাজ ভুলে নাকছাবি পরা একটা মেয়ের মুখ ভাবে। কিন্তু পাবে কি সঞ্জয়? পাবে না। আরো পাগল-পাগল লাগবে, আরো খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করবে। বারবার অন্তর্বাস ছিঁড়ে ফেলে সেই একই অতৃপ্তি। না হে, এখানে নেই। এইরকম অতৃপ্তি থেকে যায়, মানুষ বলে—আমি ঠিক এ জিনিস চাইনি, আরো কিছু—আরো কিছু যেন ছিল পাওয়ার। কী সেটা? ধরি-ধরি করেও ধরা যায়না। যেমন রমেন। কী দরকার ছিল ওর সন্ন্যাসী হওয়ার? ইরা এমন কি মেয়ে ছিল? কিছু না হবু, বোধ হয় রমেনের মনে হয়েছিল, তাকে ঠকিয়ে কী যেন নিয়ে গেল ইরা, হয়তো তাকে দিলনা, অন্য পুরুষকে দিল। এই আক্ষেপ এই ক্ষোভ পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। রমেন তো পাগলই হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জয় কতবার রিনিকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছে—তোমার স্বরূপ কী? রিনি ঝুম কাচুরে গলায় সাজিয়ে বলিয়ে বলেছে তুমি। সঞ্জয়ের হাসি পেয়েছে—তুমি আর আমি কি এক!

কে জানে এখন রিনির পাঁচিটের দেখার মাস্টার এসেছে কিনা! কী করছে এখন রিনি? সঞ্জয়ের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সেই পাঁটিতরের মাস্টার হয়ে রিনির কাছে যায়, পিকলু হয়ে দেখে নেয় রিনির স্বরূপ। কী ভাবে যে দেখা যাবে কে জানে!

নাকছাবি পরা ঐ মেয়েটা ওর কী আছে? ওকে নিয়েই বা কী করবে সঞ্জয়? তবু ওকে যদি জানার অনেক উপায় আছে সঞ্জয়ের হাতে। মাঝে মাঝে মনের অবস্থা ভাল না, সে বেলে সবাই উঠে যেতে পারে কোম্পানী, ওখানকার কর্মচারীরা কেউ স্বস্তিতে নেই। সঞ্জয় জানে। ওই রন্ধ্রপথে ঢোকা যায়। না, কিছুই করবে না সঞ্জয়, কেবল এই আলমোমিটুকু কাটানোর জন্য, এই একঘেয়েমী টাকা-রোজগার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটু টীজ করবে—

কিংবা তাই কি? সে কি একটি মেয়েকে নিয়ে আজ খুব বেশী ভাবছে না?

ঘরে একা ছিল সঞ্জয়। হঠাৎ দুটো আঙুল গোল করে জিবের তলায় দিয়ে তীব্র সিটি দিয়ে উঠল। একবার দুবার তিনবার। শরীরে ঝাঁকি লাগে। মনে ঝাঁকি লাগে। সে গাছের মতো ঝড়ের হাওয়ায় দোলে।

বেয়ারাটা হঠাৎ গ্লাস ডোর ঠেলে ঘরে ঢোকে। স্লিপ রেখে দাঁড়ায়। সঞ্জয় দেখে স্লিপের ওপর সুন্দর বাংলা হরফে লেখা—রমেন।

কে রমেন! কোন রমেন!

লোকটা ঘরে এলে সে অবাক হয়ে দেখে। সেই দুর্দান্ত চেহারা, পাঞ্জার বখের জোরওয়ালা ছেলেটা এখন একজন এমন লোক—যার গায়ে ফতুয়া, পরনে ধুতি।

আর কিছু মনে পড়ার আগে তার কেবল মনে পড়ে যে রমেন তার কাছে টাকা পায়। দু হাজার টাকা।

ক্রমশ

অ্যানড্রোমেডার ছায়াপথ। সামনের দিকে যে সাদা ছড়ান বিন্দু দেখা যাচ্ছে তারা আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্র

আরসা মেজর-এর এম-৮১ ছায়াপথ চাকতির মত আবর্তিত হয়ে চলেছে।
ছবি : মাউণ্ট উইলসন এবং প্যালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে

আপনার গতিবেগ কত?

আপনাকে কোন বাঁধার সম্মুখে ফেলবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন কেউ করে বসলে ঠিক করে তার উত্তর যোগান আপনার পক্ষে কঠিন হলেও হতে পারে। যদি ঐ সময়টায় আপনি কোথাও চুপ করে বসে থাকেন, অথবা, যিনি প্রশ্ন করলেন, তাঁর বাড়ীটা ঠিক নিয়মে চলেছে। যদি কোন গাড়ির মধ্যে বসে থাকেন, তাহলে হয়ত আন্দাজ বলবেন, কত আর? ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলেছি। কারণ আপনি জানেন, তখন গাড়ির যা গতিবেগ, আপনারও তাই। গাড়ি তখন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগেই ছুটেছিল।

বেশ, তাই যদি হয়, গাড়ির মধ্যে বসে থেকেও, গাড়ির গতিবেগকে আপনি নিজের গতিবেগ বলে চালাতে চান, তাহলে বলব, পৃথিবীতে কেউই আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। আপনি সব সময় কোন না কোন একটা গতির মধ্যে রয়েছেন। এক, এই কলকাতায় বসেই পৃথিবীর মেরু-অক্ষের চারপাশে আপনি ঘুরে চলেছেন ঘণ্টায় প্রায় ন শ মাইল গতিবেগে। দুই, ঐ একই সময়ে পৃথিবী তার চাঁদকে সঙ্গে করে সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ করছে ঘণ্টায় প্রায় সত্তর হাজার মাইল বেগে। পৃথিবীটাকে গাড়ির সঙ্গে তুলনা করলে সূর্যের চারপাশে আপনিও নিশ্চয় ঐ গতিবেগ নিয়ে ঘুরে চলেছেন। এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনের মধ্যে যেতে গিয়ে সিগন্যাল বা অন্য কোন কারণে গাড়ির বেগটাকে যেমন একটু আধটু কম বেশি করতে হয়, চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের ফলে সূর্যের চারপাশে ঘোরার সময় পৃথিবীর গতিও অনুরূপভাবে কিছুটা এদিক সেদিক হতে পারে। সেই সঙ্গে আপনারও গতি। তিন, এবার সূর্যের কথা ভাবুন। সূর্য মাঝারি ধরনের একটি নক্ষত্র। রাতের পরিষ্কার আকাশে আমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাই তেমনি একটি ছায়াপথের মধ্যে সূর্যও ঘুরে চলেছে অবিরাম। জ্যোতির্বিজ্ঞানী-রা বলেন, এক একটি ছায়াপথ যা পাশাপাশিকে দেখতে কতকটা চাকতির মত। অসংখ্য নক্ষত্র এবং বিপুল পরিমাণ হাল্কা গ্যাসের ধোঁয়ায় তৈরি এই চাকতি তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। আমাদের ছায়াপথের ব্যাস প্রায় ষাট হাজার আলোক বছর। সূর্য এই ছায়াপথের চাকতির প্রায় প্রান্তের কাছাকাছি থাকায় ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব অনেকটা বেশি। আর পৃথিবী এবং অন্য সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহকে সঙ্গে করে একবার তার চারপাশটা ঘুরে নিতে তার সময় লাগে প্রায় কুড়ি কোটি বছর। গতিবেগ? প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল-এর মতে, ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে সূর্য ঘুরে চলেছে ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ মাইল গতিবেগ নিয়ে। অর্থাৎ সেকেণ্ডে দাঁড়াল প্রায় একশ সাড়ে পঁয়ত্রিশ মাইল। তাহলে ভেবে দেখুন, ঐ ছায়াপথ রূপী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আপনিও সূর্যের সঙ্গে ছুটে চলেছেন সেকেণ্ডে সাড়ে পঁয়ত্রিশ মাইল গতিবেগে। এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: আপনি পৃথিবীর মেরু-অক্ষের চারপাশে লাট্টুর মত ঘুরছেন। সেই সঙ্গে সূর্যের চারপাশেও। মাঝে মাঝে গ্রহ-উপগ্রহের টানে আপনার গতিবেগের কিছুটা পরিবর্তন। আর ঐ একই মুহূর্তে ছায়া-পথের কক্ষপথে বিচরণ।

ব্যাপারটা আমাদের কাছে অলস কল্পনার মত মনে হলেও, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সব কিছু দেখে বেশ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের মানুষ যখন এক নক্ষত্র জগৎ থেকে অন্য নক্ষত্র জগতের দিকে পাড়ি দেবে, তখন এর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই তাল রেখে তাকে চলতে হবে। পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়ার সময় মোটামুটিভাবে তাল

রাখা হয়েছিল পৃথিবী এবং চাঁদের পারস্পরিক গতির সংগে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাকে ভাবতে হবে পৃথিবী, সূর্য, অন্য কোন নক্ষত্র এবং তার গ্রহের গতির সংগে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। নিশ্চয় সেটা সহজ ব্যাপার হবে না।

পরা-মনোবিদ্যা

মৃত্যুর সংগে সংগেই কি জীবনের সমস্ত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়? একই জীবনের সংকেত কি দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করতে পারে না? অথবা স্থূল ভৌতশক্তি, যেমন আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠান সম্ভব, ঠিক তেমনি মানুষের পক্ষে কি সম্ভব তার ইচ্ছেকে স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠান? অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে কতকটা এই রকম : উত্তাপ, আলো, শব্দ বা চুম্বকের মত ইচ্ছেটাও কি এক ধরনের শক্তি? ঐ সমস্ত শক্তির মত ইচ্ছেশক্তিরও কি অস্তিত্ব, কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখান সম্ভব? মনোজগতের এই জটিল রহস্যকে নিয়েই গড়ে উঠেছে পরা-মনোবিদ্যা বা প্যারা-সাইকোলজি। ভারতে একমাত্র রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টির উপর নিয়মিত গবেষণা চালনার জন্যে একটি পৃথক বিভাগ খুলেছেন। এর অধ্যক্ষ ডঃ এইচ এন ব্যানার্জি। এ ছাড়া সোভিয়েত দেশে এ নিয়ে দারুণ গবেষণার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণার মতই পরা-বিজ্ঞানের উপর নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। ডঃ ব্যানার্জি ভারত এবং পৃথিবীর অনেকগুলি দেশে এমন কিছু কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যাদের মধ্যে পূর্ব জন্মের বহু স্মৃতি কোন রকম বিকৃত না হয়ে একই ভাবে অবস্থান করছে। ইনি জন্মান্তরে বিশ্বাসী। এঁর মুখ্য গবেষণার বিষয়ও জন্মান্তরবাদ।

তবে ইচ্ছে শক্তির সাহায্যে যে সাধারণ কাজকর্ম করে নেওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছে সোভিয়েত দেশের অন্যতম সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস'। বলা হয়েছে, নেলিয়া মিখাইলোভা নামে চল্লিশ বছর বয়স্কা এক মহিলা শুধু ইচ্ছে শক্তির ক্ষমতায় সাধারণ বস্তুকণাকে সরিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন। একটি পরীক্ষায় দেখান হয়, মিখাইলোভা বসে রয়েছেন একটি টেবিলের সামনে। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে এক টুকরো রুটি। মনে হল তিনি যেন ঐ রুটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন কিছুক্ষণ। এক কি দুই মিনিট অতিক্রান্ত হল। হঠাৎ দর্শকরা অবাক হয়ে দেখলেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রুটির টুকরোটি টেবিলের উপর যেন নড়ে উঠল। মিখাইলোভা একটু ঝুঁকে পড়লেন। আর অমনি পাখীর দেশের গল্পের মত রুটির টুকরোটি টপ করে গিয়ে ঢুকল তাঁর মুখের ভেতর। আর একটি পরীক্ষাতে এই ভদ্রমহিলা পাঁচটি সিগারেট দাঁড় করিয়ে রাখেন একটি টেবিলের উপর। সুতো দিয়ে তাদের গোড়াগুলি আটকে রাখা হয়। পরে দূর থেকে শুধু ইচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করেই তিনি তাদের নাচাতে শুরু করেন। হাতের স্পর্শ বা কোন কিছু নেই। সাধারণ ক্ষেত্রে একটু টান পড়লেই সিগারেটগুলির পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি।

শুধু এই নয়। নেলিয়া মিখাইলোভা ঐ একই পদ্ধতিতে কখনও ঘড়ির থেমে থাকা পেণ্ডুলামকে দোলান বা তার চলাকে থামিয়ে দেওয়া, ছোট ছোট প্লাস্টিকের বাক্স, ম্যাচ বাক্স, কল প্রভৃতিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরান এমন অনেক কিছুই করা সম্ভব হয়েছে।

কোন বস্তুকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে সরান মানেই কিছুটা কাজ করা। আর এই কাজের জন্যে প্রয়োজন তাপ বিদ্যুৎ প্রভৃতির মত কোন ভৌতশক্তি সে কথাও সকলের জানা আছে। এ ক্ষেত্রেও ম্যাচ বাক্স সরান বা পেণ্ডুলাম থামান মানেই কিছুটা কাজ করা। আর যেহেতু এই কাজ শুধু মানসিক ক্ষমতা দিয়েই সম্পন্ন করা হয়েছে, তা হলে কি ধরে নিতে হয় মানুষের ইচ্ছেটাও এক ধরনের শক্তি?

আর সবচাইতে মজার ব্যাপার এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে নেলিয়াকে কখনও

কখনও আধ ঘণ্টারও বেশি সময় মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়েছে। তখন তাঁর দেহের ওজন কমে গেছে প্রায় কয়েক কিলোগ্রাম। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মন্থর হয়ে এসেছে। নেলিয়ার বক্তব্য শুধু মানসিক শক্তি দিয়ে এই ভাবে কাজ করার ক্ষমতা তিনি পান তাঁর মা'র কাছ থেকে। এই ক্ষমতা তিনি তাঁর নিজের ছেলের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ইয়েভজেনি স্নিতকোভসকি বলেছেন, এটা ঠিক অতিপ্রাকৃতিক নয়। বরং ভোত-শারীর বিষয়ক কোন ব্যাপার। কেন এমন হয় তার উপর আরও অনুসন্ধান চালান দরকার।

ডঃ এইচ এন ব্যানার্জি'র গবেষণাও ইতিমধ্যে পৃথিবীর বহু দেশে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এঁর বক্তব্য, পরা-মনোবিজ্ঞানের মূল রহস্যগুলির সমাধান করতে পারলে অতি সহজে আমরা বহু জটিল মানসিক ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারব।

স্থাপত্যে যন্ত্রগণক

সুষ্ঠুভাবে ঘরবাড়ির পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে কোন স্থপতিকে হাজারো কথা ভেবে নিতে হয়। তাঁকে ভাবতে হয় বাড়ি যেখানে তৈরি করা হবে সেখানকার মাটির উপাদানের কথা। জানা দরকার কি ভাবে কাঠামোটি তৈরি করলে ঐ মাটিতে বাড়ি বসে যাবে না, স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। অথবা কি কি ধরনের মালমসলা কতটা দরকার, মোট খরচই বা কত পড়তে পারে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও। এতগুলি ব্যাপার একসঙ্গে মনে রেখে ঘরবাড়ির নকশা তৈরি করতে সময়ও লাগে প্রচুর। বিশেষ করে কোন কোন শহরের পরিকল্পনা করার সময় যানবাহন চলাচল, পথঘাট, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে যে কোন স্থপতিকে আরও অনেক সতর্কতার সঙ্গে ভেবে নিতে হয় বলে সেখানে কাজ শেষ করতে আরও বেশি সময় লাগে।

সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনজন গবেষক যন্ত্রগণকের সাহায্যে একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন যার দ্বারা খুব কম সময়ে স্থাপত্য বিষয়ক যে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। ওঁরা ইচ্ছে মত কোন ছক আঁকার কাগজ এবং কলম না নিয়ে সরাসরি একটি কাচের প্লেটের উপর মনোমত বাড়ির নকশা এঁকে নিতে পারেন। সেই সঙ্গে মালমসলার হিসেব বা খরচ এবং অনেক তথ্য। উপযুক্ত নকশা বা তথ্যাবলী পরে যন্ত্রগণকের মগজেই রেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ইচ্ছে মত সেই তথ্য মগজের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ চালান যেতে পারে। আপাতত ঘর-বাড়ির পরিকল্পনা রূপায়ণে এই যন্ত্রটি কাজে লাগান হচ্ছে। কিছুটা সংশোধন করতে পারলে এর সাহায্যে ভবিষ্যতে আরও অনেক জটিল পরিকল্পনাকে সহজে এবং অনেক কম সময়ে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।
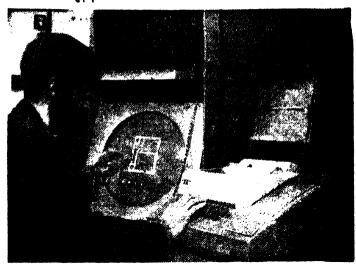
জনৈক কুশলী যন্ত্রগণকের সাহায্যে একটি বাড়ির নকশা তৈরি করছেন

অভিনব আবিষ্কার

সুইডেনের প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ ওললে ব্জোরকম্যান-এর পরিচালনায় একদল গবেষক খুব কম সময়ের মধ্যে গাছপালাকে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত সাধারণ অথচ চমকপ্রদ একটি উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এঁর জন্যে তাঁরা কোন ওষুধ বা অতিরিক্ত সার ব্যবহার করেন নি। যা করেছেন সেটা হল গাছের চার পাশের বাতাস থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া।

প্রথম দিকে ডঃ ব্জোরকম্যান পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন সিম এবং মিমিউলাস কারডিনালিস নামে এক জাতীয় ফুল গাছের ওপর। এদের শেকড়ের অংশ সাধারণ বাতাসের মধ্যে রেখে দিয়ে বাকি অংশ তিনি রেখে দেন কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে। এই আবহাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা পাঁচ থেকে আড়াই ভাগ। উল্লেখ করা যেতে পারে মাটির উপরের বায়ুস্তরে সাধারণত শতকরা একুশভাগ অক্সিজেন থাকে। দেখা গেল সাধারণ বাতাসের থেকে নতুন এই পরিবেশে সিম গাছের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। ফুল গাছকে রাখা হয়েছিল শতকরা পাঁচ ভাগ অক্সিজেন মেশান বাতাসের মধ্যে। ছয়দিন পর দেখা গেল, ঐ সময়ে মুক্ত বাতাসে সেই গাছের ওজন যতটা হওয়া উচিৎ, নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেনের পরিবেশে তা আরও নব্বই ভাগ বেড়ে গেছে। আর শুধু এই গাছগুলিই নয়, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতির চারার উপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকদলটি প্রমাণ করেছেন, বাতাস থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে নিলে তাদেরও খুব কম সময়ে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। ডঃ ব্জোরকম্যানের বক্তব্য, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে উদ্ভিদ আরও সহজে সূর্যের আলোর স্পর্শে তার আলোক-সংশ্লেষণের কাজটি সেরে নিতে পারে। ফলে খুব কম সময়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে বেশি পরিমাণ শর্করা পদার্থ তৈরি করা সহজতর হয়।

সমরজিৎ কর

সারা ভারতে তারিফ পেয়েছে পানামা

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ
বোম্বাই-৫৭

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম
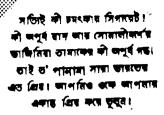
থানার দালাল

আল্লাকে পেতে গেলে যেমন পীরের দরকার তেমনি দারোগাকে ধরতে গেলে চাই থানার দালাল। যদি বলেন, কি দরকার এই মাধ্যমের? তাহলে বলতে খোদ কর্তা সন্তুষ্ট হয় সে ভাষা, ইঙ্গিতে দা ব্যাপার আপনার জানা থাকা চাই। তাছাড়া আপনি অপরিচিত, দারোগারা পদাধিকার বলে কিছু পেয়ে থাকে, সেটা আপনার কাছে চাইবে কেন?

তাই সংসারে মাধ্যমের দরকার। থানার সেই এক মাধ্যমমণি হল এ অঞ্চলে নবকৃষ্ণ দাস। অশ্বধরার থানায় আসলে সে বড় দারোগা। তার ক্রিয়াকলাপ থাকে গোপনে। তার মতো আরো অনেকে আছে কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছর প্রত্যেক নতুন নতুন দারোগাকে বশীভূত করে আধাআধি বখরা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে একমাত্র নবকেষ্টরই। গুরুতর অপরাধ করেও যদি নিস্তারের আশা থাকে তবে তখন একমাত্র রক্ষাকর্তা নবকেষ্ট। মানুষ খুন করে ছুটে যাও তার কাছে সে বাঁচিয়ে দেবে।

সে তখন বলবে, শেখ রহমান, জগতের সার হল টাকা। টাকার জন্যে মানুষ সব নিয়ে (সোজা। হাত্ব বাবা। তাও চোখের উপর ছেলেকে দেখলুম। তুই এখন চাচ্ছিস অনেক টাকা চাই। আমার পাঁচ সো বড়বাবুর পাঁচ সো। বাস— লোকে জানে বাঁচিয়ে দেবো। কেস হালকা করে দেবো। নবকেষ্ট পারে না এমন কাজ নেই। এই তো তিন বছর আগে সিংটি, সাতকড়ার অমুক পাড়ার খুন করলে— হাঁসুয়া দিয়ে পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিলে সেখানে। অমুক বাবু চুপচাপ ছুটে এসে আমার দুটো পায়ে জড়িয়ে ধরলে, ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচাও। সিংটিকে খুন করে এসেছি। বললাম, এতো ভয়ানক কথা। তোকে যে খাইয়ে ধুইয়ে মানুষ করেছে বলতে গেলে। তুই তার কন্ট্রোলের মাল মারতিস। তোর চরিত্র নষ্ট, তার সুন্দরী বাঁজা বউয়ের সঙ্গে গোপনে ‘আসনাই’ করিস জেনে তোকে কন্ট্রোল থেকে বার করে দিলে বলেই তাকে খুন করলি? আমি বাপু সিংটির অনেক টাকা খেয়েছি, তার শত্রুতা করতে পারব না। তখন সে পায়ে ধরে কি কান্না। এক ছড়া সোনার হার দিলে। তবু স্বীকার নই। তখন একশো টাকা বার করে দিলে! তখন বললুম, এক বিঘে জায়গা দিতে হবে। বললে, এই তো ডাক্তারবাবু, ঐ এক বিঘে তিন কাঠা পৈতৃক জায়গা মাত্তরে। মাগছেলে আছে—ভেসে

যাবে! তখন তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিনু। চার টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়নু। তখন ছুটে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতন উভরায়, কী

আমার পাঁচ সো—বড়বাবুর পাঁচ সো

কান্না তার। মানুষের অনুশোচনা, দুঃখ, পাপ, কান্না, বাঁচার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা এসব আমি যত দেখেছি কেউ দেখেনি। ভুরে তখন বললে, জায়গা দোব ডাক্তার, আমাকে প্রাণে বাঁচাও। তখন ডেমি কাগজ এনে তার একটা টিপ সই করে নিলুম। তবে বেইমানী করিনি, তিন কাঠা বাদ দিয়ে তার এক বিঘে জমি লিখে নিলাম। বললাম, পালিয়ে যা। পরশুদিন বেলা চারটের পর থানায় হাজির দিবি। তাই বলছি রহমান, কাশেমকে খুন করেছ, বাঁচতে চাও, এখন টাকা, গয়না না হয় জমি ছাড়ো—কেস হালকা করে দোব দারোগাকে বলে?

রহমান বাধ্য হয় তার বাস্তুভিটেটুকু লিখে দিতে।

এমনি বহু লোকের জমি আজ থানার দালাল নবকৃষ্ণ দাসের কবলে। যে জমির দিকে তার লোভ পড়বে সে জমি সে নেবেই। পাশের আটনের লোককে ফুসলে দিয়ে মারামারি খুন জখম বাধিয়ে মামলা লাগাবে। মামলা দেখাশোনা করবে নবকেষ্ট। তার খরচ যোগাবে কোথা থেকে? জমি বেচে ফেল। খদ্দের তখন নবকেষ্ট। নগদ টাকায়? রামো! তারই তো পাওনা তখন হাজার খানেক। উকিলের ফি, মুহুরী, পেশকার, হাকিম, কোর্ট-ফি, টেলিফোন, ট্যাক্সি, রসগোল্লা, হোটেল, সিনেমা, মা-কালীর পুজো—এ সবের খরচ দিলে কে?

তাই নবকেষ্টকে সবাই ভয় করে। সবাই তোয়াজ করে। আজ সে আড়াই লাখ তিন লাখ টাকার মালিক। একশো বিঘে সম্পত্তি। দোতালা পাকাবাড়ি। মাটির দেওয়াল খোলার চাল ফেলে দিয়ে এখন করেছে পাকা বৈঠকখানা। ভিতরে ভাল চেয়ার টেবিল বিছানা। একদিকে অ্যালোপাথিক ডিসপেনসারি। বৈঠকখানার সামনে জোড়া জোড়া চারটে শিব মন্দির। দশবারো হাত করে উঁচু। বাড়ির সামনে খালের উপরে পুল। রঙিন বাদাম গাছ, পাতাবাহার আর ঝাউয়ের ঝাড়। মস্ত চেহারা নিয়ে সে কার্পেটের ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে আর চুরুট টানে। লোকজন ‘জনধন’ কথা বলে। নারকেল, বাঁশ, উলু, পাট, প্যাকাটি, ধান, সুপারি ইত্যাদি

বিক্রির দাম নেয়। মাথাপিছু দেড় টাকা রোজের বাগ্দি জনেরা দিনের বেলা তার পাট কাটে, ধান রোয়, কোপায়, হাল-লাঙল করে আর রাত্রে পার্শ্বচর হয়ে হ্যারিকেন লাঠি আর বাব্রুর ক্রিজ ঢোকানো হাড়ি ধরে নিয়ে সঙ্গে যায়। কলকাতা থেকে একটা অ্যাটাচি ব্যাগ আর ডায়েরি বই কিনে এনেছে নবকেষ্ট। কার কবে মামলার দিন—কত বাজার মজলা চলছে সব লিখে রাখে। পালিত পদ্ম মোহন বি-এ পাশ করেছে। নবকেষ্টর দুটো বিয়ে তবু একটাও বাচ্চা তারা দিতে পারে নি। মা শেতলা দাসী মাজাভাঙা বুড়ি পঁচিশটা ছাগল খাসি নিয়ে মাঠে বের হয়। তার ছাগলের পাল বেড়ে চলেছে। নবকেষ্ট একটাও খাবে না বা বিক্রি করতে দেবে না। হাঁসমোরগও তাই। বুড়ি শেতলা জড়িবটি বেচে রোজগার করে। পাড়ার মেয়েরা তাদের ছেলেদের পিলেজ্বর, ন্যাবা, আমাশা, 'রসতাড়েপ্পা' স্বামীবশ, মেয়ে ধারকরা 'ছিটে' ইত্যাদির ওষুধ নেয় দু-পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে। ঘুঁটে, কাঠ-কাঁপ, ছোবড়া এসব বেচেও বুড়ীর অনেক পয়সা জমে।

তার পয়সাতেই নাকি জীবন চলছে হয়েছে। বাবা পিতাঠাকুরের মাথায় জল পড়েছে।

অথচ কি ছিল ঐ নবকেষ্টর? যা শেতলা ছ-মাসের পোয়াতি অনূঢ়া-কুমারী বেলায় নবকেষ্টকে পেটে নিয়ে এসে গলায় পড়ল দুখীরাম দাসের। দুখীরাম জাতে ধোপা ছিল, কিন্তু জাত ব্যবসা ছেড়ে সে মানুষের ঘর ছাইত, ঢেঁকি চাঁচত, গরুর গাড়ির 'জাপর', 'ছাপা', 'ঠেকনো', 'শুকাঠ', 'পাকি' এসব তৈরি করত। বাঁতা শিল কাটাত। চাষে জন খাটত, জেলেদের লোকের টান পড়লে দুখীরামকে 'টানকোর' নিয়ে যেত। তার বউ ছিলনা। খোবড়া একটা কুঁড়ের থাকত। শেতলা থাকল তার কাছে। বিয়ে হয়েছিল কিনা কেউ জানে না। তবে তখনকার সমাজ-কর্তাদের যে ধর্মপরায়ণতা বোধ ছিল তাতে শেতলা তাদের শেতল করেছিল নবকে পেটে নিয়েই—তারপর মুচিকোয়োম্পার ভগা বামুন ডেকে তারাই হয়তো চন্দন গঙ্গাজল তুলসী ছিটিয়ে দুখীরামের দুখ শেতলার হাতে তুলে দিয়েছিল। সে মাসোক একটা হবে। কিন্তু চার মাস পরেই শেতলার ছেলে হল কেমন করে? আওর ভিমা! শেতলা খলখল করে হাসত: ভগমান দিয়েছে! শুনে দুখীরামের পিত্তি জ্বলে যেত। সেই শেতলার চুল পেকেছে মাজা ভেঙেছে তবু এখনো কোনো পীরিতের নাগর যদি তার কাছে কোনো মেয়েকে বার করে নিয়ে পালাবার জন্যে 'ছিটেমারা' ওষুধ চায়—তবে শেতলা তিন সন্ধ্যে একটা তুলসী মূলে মাটির পিদিম জ্বালিয়ে 'সন্ধ্যে' দেবে। চার দিনের দিন সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে হামাগুড়ি খেয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে তুলসী গাছের শিকড় তুলতে হবে। শেতলা বলে, 'ভারি শক্ত কাজ! ভূতে ঘাড় মোচড়াতে পারে। গাছের গোড়ায় আখামুটি সাপ জড়িয়ে থাকতে পারে।' সেই শিকড় এনে ভোমরার মাথা, গঙ্গাজল, যমচাঁড়ালের পাতা বেটে একটা শিশিতে করে নিয়ে গিয়ে মনোমোহিনীর আঁচলে পিছন থেকে ছিটিয়ে দাও। ব্যাস! পরদিনই তোমার সঙ্গে পালাবে! এর জন্য দক্ষিণা দিতে হবে পাঁচ টাকা।

কিন্তু যদি কাজ না হয়? শেতলা দুলোদাঁড়া কালো দাঁতে খলখল করে হাসবে। তার আর কি করবে তুমি! এমন দুই-মন্তর বিড়বিড় করে নিয়ে একমুঠো ধুলো ছিটিয়ে দেবে সে যে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে! তাছাড়া বাড়াবাড়ি করলে থানার টাউট নবকেষ্ট আছে তার!

নবকেষ্ট এই মায়ের পিতৃপরিচয়হীন সন্তান। অবশ্য স্কুলে সে বলত আমার বাবার নাম দুখীরাম দাস। কিন্তু ছেলেরা বলত, দুস্ শালা, তোর বাপ হল সেই ভগবান, ঐ নীলনাল আকাশের নিচের দিকের অন্ধকারে তার বাস। শম্ভু মাস্টার বললে তার নাকি ইয়াবড় বেরন্দো বেরন্দো গোঁফ। সেই গোঁফ দিয়ে সে জমিদারের ঘোড়ার আস্তাবল ছাট দেয়!...তারপর ছেলেরা হাহা করে হাসত। খুব অপমান বোধ করত নবকেষ্ট। তার শরীর ছিল ভাল। এসব বললে সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মারামারি করে মার খেয়ে বাড়ি ফিরত। ক্লাস এইট উঠে তার পড়া ছেড়ে গেল। দুখীরাম মারা গেল। একজন ডাক্তারের কাছে কম্পাউন্ডারী শিখলে সে বছর পাঁচেক। তারপর ডাক্তারী করতে শুরু করলে। স্বাধীন ব্যবসা। তবে তার হাতে রোগী সবাই মরতে থাকলে লোকজন ডাক্তারী বিদ্যেটা তার ভুল করে ফলাতে দিলে না। এক বিধবা মেয়ের গর্ভপাত করতে গিয়ে ধরা পড়ে বেদম মার খাবার পর সে ফাঁড়ির 'তাড়ি-ধরা পুলিসে' নাম লেখালে। দারোয়ানের মতো তারা খাকি রঙের কাটা পোশাক দিলে। হাতে একটা রুলবাড়ি! সে হরদম কেস দিতে লাগল। তাড়ি মদ ধরে মারধর করাতে কী আরাম! উপরি দু-এক টাকা। নবর জন্যে খেজুর খেজুর গাছ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। রস একটু ঘোলা হলেই ধরবে সে ফাঁড়ির পাহারা নিয়ে পুলিস। ভাড় খুলে আনবে তারা। কুয়াশা পড়লে রস ঘোলা হয়

—তা বলে এত? লেখ ওর নামে কেস? তোমার কি তাড়ি কাটার 'পাস্' আছে? তাড়ি খেতে চাও? আমরা 'পাস্' করে দোব, খেজুর গাছে মেরে দোব—দাও টাকা দাও!'

সব 'উপরি-পাওয়ার' পেয়ে গেল। সে মাথা খাটিয়ে ফন্দি বার করলে। যারা বড় বড় সমাজকর্তা, তাকে নিন্দে করে, তাদের জব্দ করতে হবে। রাত্রে সে দু-এক বোতল মদ নিয়ে গিয়ে লোকের ঘরের পাশের খড়ের চালের মধ্যে কিম্বা গোয়ালে লুকিয়ে রেখে এসে সকালে পুলিসের জ্যান নিয়ে গিয়ে হাজির হত। মদের বোতল তার গোয়াল থেকে বের হতে দেখে তো গৃহকর্তার গাল হাঁ! বুকভ এ নবকেষ্টর কারসাজি! হয় টাকা দিয়ে মান বাঁচাও নয়তো চলো থানায়!

এই রকম করতে থাকলে একদিন কয়েক-জন যুবক তাকে অন্ধকারে ধরে বেদম মার দিয়ে অজ্ঞান করে মোড়ের মাঝখানে ফেলে রাখলে। তার মা ছেলের অবস্থা দেখে ফাঁড়ির পুলিসের কাজ ছাড়ালে।

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, 'ইল্লত যায় না ধুলে!' থানায় যাতায়াত করতে লাগল নবকেষ্ট। তখন ইংরেজ আমল। লাল পাগড়ি দেখলেই ভয়ে লুকোত সব। পুলিসের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে দেখে থানার কাজ তাকে দিয়ে করাতে লাগল সবাই। নবকেষ্টর কথা দারোগা শোনে। তাকে কিছু দিতে হয়। বড় পোনা মাছ, ডাব নারকোল, ডিম, মোরগ এসব দারোগা বেশি করে পেতে লাগল নবকেষ্ট যে কেস আনে তা থেকে। কাজেই থানার দালালদের মধ্যে এক নম্বর হয়ে গেল সে। যেই বড় দারোগা আসুক,

তোমার কি তাড়ি কাটার পাশ আছে

তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে জমাদাররা। প্রথম আলাপেই বড় দারোগা মুগ্ধ হবে নবকেষ্টর আইন আদালতের জ্ঞান দেখে। কোন কেস কত ধারায় পড়বে সব তার মুখস্থ। থানার লোক নিয়ে গিয়েই সে বলবে, 'বড়বাবু, ৩২৬ ধারার একটা কেস এনেছি! এই সিগারেট আর একশো টাকা নিন। আসামীকে বাঁচালে পাঁচশো টাকা পাব—হাফ আপনার হাফ আমার।' অন্যদিন হয়তো একটি কান ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ে রক্ত মাখা মেয়েকে সঙ্গে করে এনে বললে, 'এ বেটি বললে নিমাইদের কুকুর আমার বাড়ি নোংরা করেছিল, সেই নিয়ে গালাগালি। আমাকে মারলে। আমি বলি এ-কেস হালকা হবে। তাই পট্ করে কানের মাকড়ি ছিঁড়ে দিনু। দিন ছিনতাই কেস করে। তার সঙ্গে মারপিট।'

কাল গড়িয়ে চলল। নবকেষ্টর বয়েস বাড়ল। দেশ থেকে ইংরেজ চলে গেল। নবকেষ্ট খদ্দর কিনে গায়ে চড়ালে। মণ্ডল কংগ্রেসের মেম্বর হল। তার হাতে বাগদি পাড়া, জমাদার পাড়া, অধিকারীপাড়া বশ। ভোটের সময় কত কত টাকা পেলে সে।

কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বার হেরে গেল সে। মনে তার ক্ষোভ রয়ে গেল। আজ তার এক-শো বিঘে জমি—দোতলা বাড়ি—বন্দুক, কিন্তু লোক তাকে ভোট দেয় না।

শেষে এল পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতে যে পঁচিশ ত্রিশজন জিতবে তারা ভোট দিয়ে কয়েকজন অঞ্চল পঞ্চায়েত মেম্বর করবে। কাজেই তাদের পাঁচ সাত জনকে বশ করে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মেম্বর হল নবকেষ্ট। শেষে এক রূপশালী তরুণ গ্রাজুয়েট ছোকরাকে প্রধান করে সে উপপ্রধান হয়ে গেল। সে কয়েক-খানি গ্রামের সিংহাসনে বসল। তারপর কংগ্রেস তাকে জেলা কংগ্রেসে নিলে। পরি-বারের সম্পদ সম্ভার দিলে। যারা বি ডি ও-কে সাহায্য করবে।

কিন্তু কপাল মন্দ। উপপ্রধান হয়ে চিৎকার দম্ভ অহংকার শুধু মাত্রা ছাড়াল। কন্ট্রোলের মাল এম-আর ডিলারদের সঙ্গে যুক্তি করে ব্লাক করতে লাগল। যত

হারেটার সময় নিজের লোকদের সেই মাল পাচার করার সময় জনসাধারণ ধরলে। অপমান করাল নবকেষ্টকে। পরদিন অঞ্চল অফিসে এসে শত শত লোক তাকে ঘেরাও করলে। সে মাল অথবা টাকা ফেরত দেবে বললে কিন্তু কসুর মানতে নারাজ। জনসাধারণ অঞ্চল অফিসে ইট পাটকেল ছুঁড়লে কিন্তু নবকেষ্ট বসে ছিল না—সঙ্গে সঙ্গে থানায় লোক পাঠিয়েছিল। পুলিস এসে সবাই বলে ডাণ্ডা দিলে। কয়েকজনকে ধরপাকড় করালে। সাতাশজন। সবাই জামিন নিলে।

রাতে কণ্ট্রোলে মাল দেওয়া নিষিদ্ধ। মাল দেওয়ার সময় দেখালে ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক্টরবাবুকে। সে খাতাপত্র কেড়ে নিয়ে গেল। ঘুষ নিলে না। লোকে মনে করলে ফাঁদে পড়েছে এম-আর ডিলার। কিন্তু এম-আর ডিলার দু'দিন পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে হাসতে লাগল। বললে, 'শালা আবার ঘুষ নেবে না।'

নবকেষ্ট খালি খামোখা আবার আসামীদের ধরপাকড় করাতে থাকলে তাকে মোড়ের মাথায় একজন খ্যাতিমান তরুণ তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কর্কশ ভাষায় আক্রমণ করলে। সে বললে, 'মন দেশে কটাশ রাজা হয়েছ, না? জানো তোমাকে আমি সিকনির মতো আঙুল মারতে পারি! অন্যায় করবে আবার চোখও রাঙাবে? মহেশ্বরকে অ্যারেস্ট করালে কেন, তার বউ ছেলেমেয়ে কেঁদে কেঁদে খাচ্ছে! শয়তান, জুতো মেরে তোমার মুখ ভেঙে দেব।'

সেদিন নবকেষ্ট বেশি বড় ফট্টাই করে নি তরুণটির সামনে যদিও কয়েকবার গাঁক গাঁক করে উঠেছিল। এম-আর ডিলার তাকে চেপে দেয়। কারণ তরুণটির পিছনে নাকি সেন্ট্রালের মিনিস্টার পর্যন্ত ছিলেন। তবু তার নামে থানায় ধান চুরি করবার অভিযোগ দিয়ে ডায়েরি দেয় নবকেষ্ট। কিন্তু তরুণটি থানায় গিয়ে তার পরিচয়পত্র ইত্যাদি দেখালে নতুন দারোগা—যিনি মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের লোক—সৎ এবং অমায়িক—অভয় দেন, ঐ নবটা কিছু করতে পারবে না—ওর বিরুদ্ধে অনেক কেস আছে আমার পকেটে—আপনার সঙ্গে লাগলে আমি ওকে জেলা-ছাড়া করে দেব।'

খ্যাতিমান তরুণটির দ্বারা এই অপমানের পর নবকেষ্ট তার অঞ্চলের গদি হারাল।

তার বিরুদ্ধে সকলে অনাস্থা দিলে। উপ-প্রধান হল একজন তরুণ স্কুল মাস্টার।

এরপর আর বেশি দম্ভ নেই যেন নবকেষ্টর। তবু ভারি ভারি খুন জখমের কেস সে এখনো দেখাশোনা করে। দু-তরফ থেকে টাকা খায়। সে হল শাঁখের করাত।

হঠাৎ কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কোন্ থানায় এ সব লোক নেই।

আমি তেমন থানার একটিও নাম বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ক্ষমা করবেন। কেন না অন্ধকারে থানার অন্তরালে আর একটি থানা আছে—যেখানে যাত্রা দলের নায়ক (নবকেষ্ট খুব ভাল যাত্রা অভিনয় করতে পারে) দুর্যোধনের বীরদর্পে তাদের সসাগরা মেদিনী কাঁপিয়ে গুরুনিনাদে এখনো বলছে : 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী!'

একজন বিঘা মেদিনীর রাজার হাতে ক্লিকভরা ছড়ি থাকে, থাকে পাশ্বচর, আইনের হাতীকে তারা মাহুতের মতো লোহার খোঁচা মেরে রাজপথে ঘোরায় ফেরায়, মা শেতলা দাসী খলখল করে হাসে, ছেলে আমার এখন লাখ লাখ টাকার মালিক, অতএব এসব লোকের আসল পরিচয় দেওয়া মানেই কেউটে সাপের মুখে পা দেওয়া!

ভগবান এইসব থানায় দালাল নবকেষ্টদের শতায়ু করুন, নইলে এদেশে খুন জখম বন্ধ হয়ে যাবে! বন্ধ হয়ে যাবে অনেক হোমরা চোমরাদের বাঁ হাতের উপায়।

আবদুল জব্বার

আমার বাংলা ভাষা

পাঠ্যপুস্তকটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত; প্রকাশকাল ১৯২০। লেখকের নাম জে ডি অ্যাণ্ডারসন, ডি লিট, আই সি এস, বঙ্গীয় তথা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সদস্য, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক।

রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মাধুর্যের বিচারে এ এক বিলম্বিত ও ... আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি...। মূল প্রেরণা হিন্দুধর্মীয় হলেও, মানবিকতা, করুণা ও সমসাময়িকতায় এ-সাহিত্যের ... কথা মানতেই হয়, মানতে হয় এর ... বৈচিত্র্য, নব্য রীতিকলা এবং গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে প্রকাশশৈলীর বহুমুখী ঐশ্বর্য...। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ-বাহন হিসেবেও সমস্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতা অবশ্য-স্বীকার্য।"

ফরাসি ও বাংলা

আগ্রহের সঙ্গে পড়ে চললাম। লেখকের মতে বাংলা ও ফরাসি ভাষার মধ্যে মিল আছে। ফরাসি ভাষার আদি শব্দকোষ গোল-প্রবাসী রোমীয়দের অর্বাচীন লাতিন থেকে গৃহীত; পরে রেনেশাঁসের সময় ক্লাসিকাল লাতিন ও গ্রীক থেকে বহু শব্দ আমদানি করা হয় [ওই শব্দগুলো ফরাসি ভাষায় প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় কিন্তু ভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত] —যার ফলে বাংলা যেমন ফরাসিও তেমনি তৎসম ও তদ্ভবের মিলনক্ষেত্র। দৃষ্টান্ত-রূপ: Moutier (মুতিয়ে) Monastere (মোনাস্তায়ার); অর্থ দুয়ের এক: মঠ [লাতিনে Monasterium]।

উচ্চারণের ক্ষেত্রেও লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য: শব্দান্তে বাংলা অ-কার তথা ফরাসি E অনুচ্চারিত থাকে [যেমন Chaise]। এ ছাড়া বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ ফরাসির মতো বিশুদ্ধ—ইংরেজি দ্বিস্বর-ঘেঁষা স্বরবর্ণের মতো উচ্চারিত হয় না।

দন্ত্য ত, মূর্ধন্য ট

ব্যঞ্জনের কথা লিখতে সর্বাগ্রে T আর D-র কথা লিখতে হয়। ইংরেজরা বলে ট, অনেকটা বাংলা ট-এরই মতো; ফরাসিরা বলে ত। ইংরেজিতে কোনো 'দ' নেই, ফরাসিতে 'ড' নেই। তাই ইংরেজরা যখন ফরাসি বলে, ফরাসিরা তাদের ভুল উচ্চারণ ধরতে পারে না, ফরাসিরা যখন ইংরেজি বলে ইংরেজরাও তাদের ভুল উচ্চারণ ধরতে পারে না, বাঙালীরা কিন্তু পারে!

বাংলা নাটকে ইংরেজ চরিত্রের মুখে শুনি, "টেমার ভড্, টাকে কোথায়?" ফরাসী নায়ক কিন্তু বলত, 'তিক উল্‌তো': "দিমের দাতানা আর দাঁতা-চচ্চড়ি দিয়ে তপাতপ্ ভাত খেয়ে নাও!" ইংরেজরা বলে: টটিনী, ডকাট, টোটা পাখি; ফরাসীরা বলে: ততিনী, দাকাৎ, তিয়া পাখি।

বেচারী সাহেব! তারা অনেকে—যেমন ধরুন এই আমিই—ট আর ত ব্যঞ্জনের পৃথক উচ্চারণ করতে পারি বটে, কিন্তু বাঙালীদের মুখে এই দুটি বর্ণের পার্থক্য ধরতে পারি না। আর যেহেতু ফরাসীতে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন বলে কিছু নেই, চলিত ত্বরান্বিত কথাবার্তায় ফরাসীদের কানে ট ঠ ত থ একেবারে এক শোনায়। শুধু ব্যাকরণ জানি বলে 'বালকাটি' কথাটা শুনে 'বালকাতি' কথাটা লিখব না; শুধু পুরাণ পড়েছি বলে 'কার্তিক' শুনে 'কার্টিক' লিখব না।

একদিন আমার ডায়েরিতে ডুবুর কথা লিখেছিলাম; মেয়েটির কি দুঃখ! ওর নাম নাকি ধুবু। আর আমাদের বাড়ির একতালায় কাজলের সেই সদ্য-বিবাহিত দিদির নাম টুটুল কি তুতুল, তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন: জিগ্যেস করতে লজ্জা করে। করবে না কেন? আপনারা কি চান লোকে জানবে আপনাদের দাঁত বাঁধানো, আপনাদের চুল পরচুলা, আপনাদের ডান চোখ কাঁচের? আর আমরাই বা আমাদের কানের দৌর্বল্য ধরা দিতে যাব কোন্ দুঃখে? একদিন অবশ্য সাহস জোগাড় করে জিগ্যেস করেছিলাম, "শোন, কাজল, তোমার বড়দিদির নামটা আসলে কি—টুটুল না তুতুল?" তৎক্ষণাৎ উত্তর

এল, "কেন ফাদার, টটুটল" [কিংবা 'তুতুল' আমার তো বোঝার কোনো উপায় নেই]। "না, এবার ভালো করে শোন, লক্ষ্মীটিঃ ইংরেজী টটুটল না ফরাসী তুতুল?" "ধ্যেৎ......আপনি কি সব বলছেন? বাংলা টটুটল [কিংবা তুতুল]। সুধী পাঠক যদি কোনো দিন আনন্দবাজারের স্তম্ভে দেখেন ফাদার দ্যাতিয়েন নামে এক সাহেব লুম্বিনী পার্কে ঘর ভাড়া নিয়েছেন, বুঝবেন—কেন।

ভারতীয় কান ইউরোপীয় কানের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম—আর সেইজন্যই হার্মনি ভারতীয় সঙ্গীতের ধাতে সয় নাঃ 'সা, গা, পা' কিংবা 'রে, কড়ি মা, ধা' ধরনের যৌগিক সুর বাজালে, য়ুরোপীয়েরা আনন্দ পায় [তাদের কর্ণেন্দ্রিয় অপেক্ষাকৃত স্থূল বলে] ভারতীয়েরা কানে তুলো দেয়। কর্ণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতার জন্য বাঙালীরা দন্ত্য ত এবং মূর্ধন্য ট-এর পার্থক্য বোঝে, কিন্তু এই দুটি স্বরের মধ্যে তো আরও অসংখ্য স্বর থাকতে পারে—যেমন ইংরেজী t। কোনো কোনো রাগ-রাগিণীতে যেমন অতি কড়ি মা কিংবা অতি কোমল জা থাকে, কোনো কোনো ভাষায় তেমনি অতি দন্ত্য ত এবং অতি মূর্ধন্য ট থাকতে পারে। ওই ধরনের চারটে-t-সম্বলিত ভাষা শিখতে হলে আমার কোনো বাঙালী বন্ধুর বোধ হয় আর বেচারী সাহেবের উচ্চারণ নিয়ে উপহাস করার প্রবৃত্তি থাকত না।

ব-য়ে শূন্য র, ড-য়ে শূন্য ড়

আর একটা সর্বনেশে ব্যঞ্জন হল ড়। বাঙলা ভাষায় নাকি র আর ড়-এর উচ্চারণ এক। সেদিন পরানবাবু চিঠিতে জানালেন তিনি তাঁর "বড়ো বাড়ি ভারা" দেবেন। ফরাসীদের কাছে ড-য়ে শূন্য ড়-এর উচ্চারণ সহজ নয়, তবে বঙ্গসরস্বতীর কাছে অযথা নালিশ করব কেন, ড়-শব্দটা আমাদের মুখ থেকে বেরোয়—কিছুটা বিকৃত অবস্থায় হবু বেরোয়; শুধু মনে রাখতে হবে তার উচ্চারণটা অনেকটা থুথু ফেলার ভঙ্গিতে। কিন্তু ব-য়ে শূন্যর'...ফরাসী r হল কণ্ঠ্য। আমরা বলি র, শ্রোতারা বোঝে হ—বিশেষ-ভাবে সেই র যখন শব্দের প্রথম অক্ষর; ফরাসীর মুখে Rome, বাঙালী কানে Home।

অ্যান্ডারসন সাহেবের মতে ড়-এর উচ্চারণ স্কটদের r-এর মতো; সুনীতি-বাবুর মতে স্কটদের r হল বাংলা র। খুব ভালো কথা, অতি মূল্যবান উৎকৃষ্ট কথা: ধরা যাক সুনীতিবাবুর মতই ঠিক; শুধু মুশকিল এই যে স্কটরা (কিংবা আইরিশেরা কিংবা রেড ইন্ডিয়ানেরা) কেমন করে r উচ্চারণ করে তা আমরা কি উপায়ে জানব? আর জানলেও তাদের উচ্চারণ নকল করতে পারতাম কি না, সে আর এক কথা।

যাক, একদিন [illegible]

[illegible] flash-back [illegible] flash forward [illegible]

[illegible] এমনি দিলাম এর স্কুলের নাম, [illegible] জানেন ফাদার, স্কুলের মেয়েরা [illegible] এক নীলাম্বরার কথা লিখেছেন।" [illegible] দেবীর বিরিয়ানি চাখতে চাখতে [illegible] জিজ্ঞেস করলাম, "[illegible] রবিকাকা [illegible] পেয়েছেন?" [illegible] বলল, "[illegible] সে আবার কে?"

সেদিন থেকে স্থির করলাম রবীন্দ্রনাথ আর বলব না, বলব গুরুদেব।

সুধী পাঠকের কাছে কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার প্রলোভন সামলাতে পারি না; আপনারা যখন ভাল আর মাল, টলটল আর তুলতুল, বিড়াল আর বেরাল দিব্যি বলতে পারেন, আমরা কেন ভাব আর যাব,

(সি-৮৮৫১)

টিকটিকি আর তিকতিকি, ভেড়া আর ভেরা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকব?

ব্যাকরণের হালচাল—পরভাষীর বেড়াজাল

অনেকের ধারণা, বিদেশীর পক্ষে বাংলা শেখার অন্যতম প্রধানতম অন্তরায় হল have-ধাতুর অভাব : সে আছে he is তার আছে, he has। সদ্য-বঙ্গানবীশী মাথায় হাত দিয়ে ভাববেই—he মানে সে না তার? আছে মানে has না is?...আমার কাছে কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত লাগল ফেলে দেওয়া, বসে পড়া, উঠে পড়া, খেয়ে ফেলা ধরনের যুগল-ক্রিয়াপদগুলি। ফেলেছি তো ফেলেছি; যা ফেলেছি কেমন করে আবার দিতে পারব? আর মেঝেতে বসেছিই যখন, তখন কি আরো নীচে পড়ে যেতে পারি? উঠে পড়া ব্যায়ামের কসরৎ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর খেয়ে ফেলা নিশ্চয়ই বাঁধ করার এক অনতিভদ্রোচিত প্রতিশব্দ!

বাংলা ভাষার আরও আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য শিখলাম অ্যান্ডারসনের কাছে : বহুবচনের বিভক্তির ব্যবহারে তার একান্ত কৃপণতা। যে-কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় লোকে "অনেক ছেলে আম খেয়েছে" না বলে বলে অনেক ছেলেরা আমগুলো খেয়েছে"...। আর সেই ই আর ও স্বরবর্ণেরই বা কি রকম যাদু! কি সহজে বাক্যার্থের দুমদাম পরিবর্তন ঘটায়—যেমন ধরুন : "আমার চোখে তুমি দোষী; আমারই চোখে তুমিও দোষী; আমারও চোখে তুমিই দোষী।" অনুগামী অব্যয়ের বাহুল্যও আমাদের চোখে নতুন : পদে পদে postposition (তোমার জন্য, আকাশের নীচে) এবং post-conjunction (তুমি আস নি বলে)-এর দেখা মেলে। আর অস্বাভাবিক লাগে relative clause-কে বাক্যের পূর্বভাগে বসানোর বিধি—ঠিক যেমন লাগে ডাচ্ আর জর্মান ভাষার infintive-কে বাক্যের পশ্চাদ্ভাগে বসানোর অনুশাসন।

অ্যান্ডারসনের পাঠ্য পুস্তকের শেষাংশে ছিল বাংলা পদ্য-গদ্যের এক সঙ্কলন। তাতেই হল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এখনও খুব মনে আছে।... কিন্তু না, ইতিমধ্যে আমার ঘরের দরজায় সপ্তবর্ষীয়া শম্পুর মুখ উঁকি দিল। এক মুখ চানাচুর চিবোতে চিবোতে সে আমাকে জানিয়ে গেল, তার বোন তিতিরের বয়স মাত্র এক বছর হল এই আশ্বিনে—কিন্তু এর মধ্যেই সে অনেক কথা বলতে শিখেছে : মাছকে বলে জিজি, বাবাকে বলে আব্বা, দুধকে বলে দুদু আর নিজের নামটাকে বলে টিটি...।

দুদু?...টিটি...খাস বিলিতি উচ্চারণ? আগের জন্মে শম্পুর বোন ছিল মেমসাহেব। (ক্রমশ)

সৌন্দর্যের
আবরণে রোমান্টিক
করে তুলুন আপনার
প্রিয়তমের
শয্যা-বিলাস।
পছন্দ করে বেছে নিন বম্বে ডাইংএর রকমারি
ডিজাইন—রোজ, পেইসলে, প্যাস্টেল,
রঙ-বেরঙের ডোরাকাটা চাদর থেকে। রঙ
ও কারুবিহীন সাদা চাদরের ব্যবহার সেকেলে
ফ্যাশন হয়ে গেছে। তাছাড়া, শুধু চাদরের
উৎকর্ষের জন্যেই আপনি দাম দিচ্ছেন, প্রিন্ট
ও রঙের জন্যে আপনাকে অতিরিক্ত কিছুই
খরচ করতে হচ্ছেনা। এসব চাদরের
প্রিন্ট ও রঙ আপনার শোবার
ঘরকে সৌন্দর্যে শোভিত রাখবে—যা
দেখতে নয়নাভিরাম, স্পর্শ
করে আনন্দ, সর্বদা কোমল।
বম্বে ডাইং

গানের আসর

ওস্তাদ ওমর খাঁ

ওস্তাদ ওমর খাঁ

সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রে ওমর খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষে কিছু কিছু ফার্সী বই লেখা হয়েছিল যাতে প্রাচীন আরবীয়, ইরানীয় এবং গ্রীক সঙ্গীতের কথা আছে। এই তথ্যগুলি জানা দরকার অথচ বই পড়ে পাঠোদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। সাধারণ মৌলভীরা এসব গ্রন্থের অর্থভেদ করতে পারেন না। কারণ, এমন বহু শব্দ আছে যা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত সঙ্গীত সাহিত্যেও এই অসুবিধা ঘটে। সাধারণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে এসব গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে না। এর কারণও ওই একই, বহু শব্দ আছে যা পণ্ডিতদের জানা নেই, এমনকি বিরাট বিরাট অভিধানেও পাওয়া যায় না। অতএব এমন ব্যক্তির সাহায্য এই সব গ্রন্থ পাঠে দরকার যিনি এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ আবার গান বাজনাতেও দক্ষ। বলা বাহুল্য এমন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। ওমর খাঁ এইরকম বিরল গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম। এই আলোচনায় তাঁর সহায়তাই যে প্রচুর লাভ করেছি তা নয়, উর্দুতে রচিত অনেক গ্রন্থ এবং নিজেদের সাক্ষ্য দিয়েও তিনি আমার অনেক সন্দেহ দূর করেছেন। আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস নির্ণয় করতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের সাঙ্গীতিক ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। ফার্সী এবং উর্দু বইতে তার পরিচয় কিছু কিছু আছে। সেগুলি অচিরে বাংলায় উদ্ধার করা দরকার। এ ছাড়া রয়েছে বিরাট আরবীয় সঙ্গীত সাহিত্য। তার অতি সামান্য পরিচয় কেবলমাত্র ইংরেজী কয়েকটি আলোচনা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। কবে যে এই তিমির দুয়ার খুলবে কে জানে। ওমর খাঁ সাহেবের পারিবারিক একটি পুঁথি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেটি তাঁদের কাছ ছাড়া করবার উপায় নেই। তাঁদের অপর একটি গ্রন্থ নগমাতে নিয়ামৎ তথা ইস্রারে কেরামৎ খুবই মূল্যবান। এটি উর্দুতে লেখা। এই আলোচনায় আমাদের অপর সহযোগী তথা [illegible] আবদুস্ সালাম সাহেবের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করি। এই বিদগ্ধ সজ্জন ব্যক্তিটির অভিজ্ঞতা এবং অনুসন্ধিৎসাও কম নয়। ব্যারিস্টার হওয়াতে স্বভাবতই তিনি ইতিহাসের নামে গল্প বা প্রচলিত কাহিনীকে গ্রহণ করতে নারাজ। প্রতিটি বিষয় নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে তবেই তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। বলা বাহুল্য এই পর্যবেক্ষণটির গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, বারে বারেই তিনি এমন কোনও কোনও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা এড়িয়ে গেলে যথার্থ তথ্যে পৌঁছানো যেত না।

ওস্তাদ ওমর খাঁ কনফারেন্স বিজয়ী বিষম জনপ্রিয় শিল্পী নন, সংবাদপত্রেও তাঁর প্রচার, প্রতিপত্তি নেই অথচ উচ্চতর সঙ্গীত মহলে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বনামধন্য গায়ক-বাদকদের মধ্যে অনেকেই নানা প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং উপকৃত হন। এই একান্ত বিনীত ব্যক্তিটিকে প্রচার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত বলে মনে হয়নি, বরঞ্চ এদিকে একটু বেশী মাত্রায় লাজুক বলেই মনে হয়েছে।

ওস্তাদ ওমর খাঁ প্রখ্যাত সরোদী ঘরের

অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই এই সংযোগ সাধিত হয়েছে। বাদক হিসাবে তাঁরা শাজাহানপুরের ঘরানাদার কিন্তু মায়ের দিক থেকে লখনউ ঘরানার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। লখনউ ঘরের প্রখ্যাত ওস্তাদ নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তাঁর প্রমাতামহ। ইনি নাকি তানসেন বংশীয় জনাব খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদের সঙ্গীত ধারায় সেনী ধারার কিছুটা সংযোগ সাধন করেছিলেন। ওমর খাঁ সাহেবের কাছে যোধ কবি বালাৎ খাঁর লেখা একখানি পুঁথিও রয়েছে।

ওমর খাঁ সাহেবের পিতা ওস্তাদ সাখাওয়াৎ খাঁ তিরিশ বছর ধরে লখনউ-এর ম্যারিস কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর উপদেশে পরে কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি যাঁদের কাছে কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন ওস্তাদ রজব আলী খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, নত্থন খাঁ, আহম্মদ খাঁ, খলিফা, বাকর আলী খাঁ এবং নাসীর খাঁ। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে এঁরা সকলেই কৃতী। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরী—এই সব বিভাগেই খাঁ

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১

এক একদিন এরকম হয়, দুপুরবেলা অকারণ মেঘ করে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছে, রাস্তায় জল জমবে নির্ঘাৎ, সারাদিন এবং সন্ধেটা মাটি হবার কথা, কিন্তু ঠিক বিকেল পাঁচটা আন্দাজ অরূপের জন্য বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। অরূপের জন্য এক একটা বিকেলে গুমোট গরমও কেটে গিয়ে ফুরফুরে হাওয়া দেয়। যে-সব বিকেলে তার স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হবার কথা থাকে।

অরূপ যে শুধু চাইলেই মার কাছে টাকা পায় তাই নয়; শুধু যে তার বিশেষ দরকারের সময় ছোট কাকাকে বলে রাখলে বাড়ির গাড়িটাও পায় তাই নয়—সে শীত-কালে চমৎকার রোদ্দুর পায়, বর্ষাকালে পরিষ্কার আকাশ পায়, ঠিক সময়ে ঠিক দোকানটা খোলা পায়। এসবই অবশ্য স্বপ্নার জন্য। তা বলে কি অরূপ কখনো বৃষ্টিতে ভেজে না, কখনো রাস্তার কাদা ছিটকে তার গায় লাগে না, কাকেরা কি তার জামার ওপর টিপ করে পুরীষ ফেলে না? কিন্তু তখন স্বপ্না সঙ্গে থাকে না।

লেডি ‘ব্রেবোর্ন’ কলেজের গেট থেকে একটু দূরে গাড়িতে বসে আছে অরূপ। বৃষ্টি থেমে গেছে মিনিট পনেরো আগে। পার্ক সার্কাসের ময়দানের ঘাসগুলো এখন বেশী সবুজ, রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে তলোয়ারের মতন। অরূপ এখনও ড্রাইভিং লাইসেন্স পায়নি তাই একা একা তার গাড়ি নিয়ে বেরুনো বারণ। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই অরূপ ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, বলে দিয়েছে, আবার ঠিক সাতটার সামনে বাড়ির কাছাকাছি গলির মোড়ে অপেক্ষা করতে। পার্কিং-এর সময় শুধু একটু অসুবিধে হয় এ ছাড়া অরূপ ভালোই চালাতে পারে।

দলে দলে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে, অরূপ তাকিয়ে আছে সেদিকে। কোনো মেয়ের মুখেই তার দৃষ্টি বেশীক্ষণ নিবদ্ধ হচ্ছে না, কারুকেই সে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে না, সে শুধু খুঁজছে স্বপ্নাকে। স্বপ্না এমন ভাবে তার মন জুড়ে আছে যে অন্য কোনো মেয়ের দিকে মনোযোগ দেবার সময় হয় না তার।

স্বপ্নার জন্যও বাড়ি থেকে গাড়ি আসে। স্বপ্না আজ একটা আকাশী-নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে, তার ব্লাউজের রং নীল, হাত ব্যাগের রং নীল। কপালে নীল টিপ। স্বপ্না নিজেদের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দূর থেকে অরূপ হর্ন দিল। চেনা হর্ন, স্বপ্না উৎকর্ণ হয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। অরূপকে দেখতে পেয়েই ঠোঁট চোখ সারা মুখ ছড়িয়েই হাসলো। তারপর বাড়ির ড্রাইভারকে বললো ফিরে যেতে। দু’ বাড়িতেই জানাজানি হয়ে আছে, গোপনতার কিছু নেই। স্বপ্না ড্রাইভারের সঙ্গেও আপনি বলে কথা বলে, বললো, মাকে বলবেন, অরূপবাবু আমাকে পৌঁছে দেবেন।

অরূপ গাড়ি ঘোরালো বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে। স্বপ্না বললো, তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো? ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। আমাদের আর একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস হবার কথা ছিল।

অরূপ বললো, ইস্, সাড়ে চারটের পর তোমার ক্লাস। অত ক্লাস পড়াশুনো করতে হয় না।

—বাঃ, গত সপ্তাহে দু’ দিন স্ট্রাইক গেল না?

—এরপর তো আর আমি তোমার কাছে এরকম আসতে পারবো না।

—কেন ?

অরূপের মুখখানা ভারী উৎফুল্ল। ওপরের ঠোঁটে খানিকটা গর্বের ভাবও ফুটে উঠেছে। বললো, সামনের সপ্তাহ থেকে বাবা আমাকে মিশন রো-র অফিসে বসতে বলেছেন। অন্য সবার মতন আমাকেও দশটা থেকে পাঁচটা অফিস করতে হবে। বাবা বলেছেন, হাতে কলমে কাজ না শিখলে আমি কিছুই বুঝতে পারবো না।

—দুপুরে খাবে কোথায় ?

—মা বলেছিলেন বাড়ি থেকে খাবার পাঠাবেন। আমি রাজী হইনি, আমি বলেছি, বাইরে লাঞ্চ খাবো।

—বাঃ, বেশ ভালোই তো হলো। আমিও কলেজ পালিয়ে তোমার সংগে লাঞ্চ খেতে যাবো।

—সীতা আসবে ?

এমন সহজেই একটা সমাধান পাওয়া গেল বলে দু'জনেই খুশী। অরূপ বাঁ হাতটা রাখলো স্বপ্নার হাতে। স্বপ্না কোলের ওপর থেকে বই খাতা পাশে সরিয়ে রেখে বললো, এই জন্যই তুমি চাইবাসা থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি ?

—না, না, সে অন্য কারণে।

—ওখানে গিয়ে খুব জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলে? একটাও পাহাড়ে উঠেছিলে? আমাকে একবার নিয়ে যাবে ওখানে?

—জঙ্গলে জঙ্গলে মোটেই ঘোরা হয়নি শেষ পর্যন্ত। তোমার চাইবাসা ভালো লাগবে না!

—তা হলে হেসাডি না কি আর একটা জায়গা?

—বিয়ের পর আমরা কাশ্মীরে যাবো।

—ধ্যাৎ, গত পুজোর আগের পুজোর আমরা বাড়ির সবাই মিলে কাশ্মীর গেলুম না? ওসব জায়গায় যেতে আমার ভালো লাগে না! আমার ইচ্ছে করে নতুন জায়গায় যেতে—কেউ যায় না। বেশ পায়ে হেঁটে ঘুরবো। এই, এদিকে কোথায় যাচ্ছো?

—কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বসে একটু কফি খাবো।

—জানো, আজ দুপুরে ভাঁড়ের চা খেলাম। সাড়ে বারোটায় একটা অফ পীরিয়ড ছিল, আমরা তিনজন বন্ধু মিলে বেরিয়ে ছিলুম, পার্ক সার্কাস ময়দানে ঝাল মুড়ি আর ভাঁড়ের চা।

অরূপ হাসতে হাসতে বললো, তুমি বুঝি ভাঁড়ে করে চা এই প্রথম খেলে?

স্বপ্না একটু লাজুক ভাবে বললো, হ্যাঁ, আগে আমার কি রকম ঘেন্না ঘেন্না করতো। আজ খেয়ে দেখলুম, খুব খারাপ লাগে না কিন্তু। চা-য়ে একটা অন্যরকম গন্ধ হয়।

—এবার চাইবাসাতে গিয়ে আমিও অনেক বার ভাঁড়ে চা খেয়েছি। ঐ সব মফঃস্বলের ছোট ছোট দোকানে গেলাস কিংবা ভাঁড়ে চা দেয়, কাপ রাখে না। গেলাসে যা শ্যাওলা শ্যাওলা দাগ, তার চেয়ে ভাঁড়ই ভালো। কাপ কেন রাখে না কে জানে!

—আমি বলতে পারি। কাপের হ্যাণ্ডেল-গুলো তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় কি না।

—আহা, গেলাস বুঝি ভাঙতে পারে না? অরূপ আর স্বপ্নার কাছে এখনও পৃথিবীর অনেক কিছু অজানা। অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেই ওরা বিস্ময় বোধ করে। মিনিট খানেক যে ওরা চুপ করে রইলো, তাতে মনে হতে পারে—মফঃস্বলের দোকানের কাপ গেলাস ও ভাঁড়ের সমস্যা নিয়ে দু জনেই বিব্রত।

যথারীতি রেস্তোরাঁটার সামনে গাড়ি পার্ক করতে অরূপের একটু অসুবিধে হচ্ছে। ট্রাম স্টপে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়লো স্বপ্নার। সঙ্গে সঙ্গে সে অরূপের বাহু ছুঁয়ে বললো, এই, এই, দ্যাখো, ঐ মেয়েটিকে চেন?

অরূপ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললো, না তো!

স্বপ্না চোখে ঢেউ খেলিয়ে হেসে, চোখ দুটো নাচিয়ে বললো, তোমার বন্ধু দীপাঞ্জনের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

অরূপ আগে মনোযোগ দেয়নি, এবার আমার সচকিত হয়ে তাকিয়ে বললো, কে, শুভ্রা? ভালো করে মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। না, শুভ্রা নয়তো, এর রং তো কালো।

স্বপ্না বললো, কালো কোথায়? কি সুন্দর গায়ের রং। বেশী ফর্সা রং আমার মোটেই ভালো লাগে না। এর নাম শান্তা রায় চৌধুরী।

ট্রাম স্টপের মেয়েটি হাতের ব্যাগটা খোলার জন্য একটু ঘুরে দাঁড়াতেই অরূপ তাকে ভালো করে দেখতে পেল। মাজা মাজা গায়ের রং, বিশাল দুটি টানা চোখ—টিকোলো নাকটি দেখলেই মনে হয়—এ মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী। হালকা গোলাপী রঙের ফুল ভয়েলের ছাপা শাড়ি পরে আছে, অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা—কিন্তু শরীরের সুন্দর গড়নের জন্য তার দৈর্ঘ্য চোখে পড়ে না, সব মিলিয়ে একটা ঝক্‌ঝকে তকতকে ভাব। হাত ব্যাগ খুলে একটা কালো ফ্রেমের চশমা বার করে এই মাত্র পরলো, বোঝা যায়, মেয়েটি সব সময় চশমা পরে না।

অরূপ বললো, বেশ সুন্দর দেখতে তো মেয়েটিকে।

স্বপ্না বললো, কি দারুণ স্মার্ট। নৃপেনকে তো তুমি চেনো, নৃপেনের বন্ধু। আমার সঙ্গে আলাপ হলো গত সপ্তাহে। একা একা কি রকম ফ্রিলি ট্রামে বাসে যাতায়াত করে।

অরূপ হেসে বললো, ট্রামে বাসে অনেক মেয়েই যায়। সেটা এমন কিছু স্মার্টনেস নয়। তবে মেয়েটিকে দেখেই মনে হচ্ছে স্মার্ট। তা না হলে দীপুর সঙ্গে বেশীদিন বন্ধুত্ব থাকতেই পারে না।

—ওকে ডাকবো?

—ডাকো না।

স্বপ্না চেঁচিয়ে ডাকলো না। গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেল। ফিরে এলো মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। অরূপও ততক্ষণ গাড়ির দরজা লক্ করে নেমে দাঁড়িয়েছে।

স্বপ্না বললো, আলাপ করিয়ে দিই, শান্তা রায় চৌধুরী, আর এ হচ্ছে অরূপ ঘোষাল।

বুকের সামনে যুক্ত কর রেখে শান্তা বললো, আপনিই তো দীপুদার সঙ্গে চাইবাসা গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। আসুন, একটু কফি খাওয়া যাক্।

মণিবন্ধের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে শান্তা বললো, আজ না, আর একদিন ভালো করে আলাপ হবে আপনার সঙ্গে। আজ আমাকে একটু কলেজ স্ট্রীট যেতে হবে।

প্রথম আলাপে কোনো মেয়েকে একবারের বেশী দু'বার অনুরোধ করতে নেই, অরূপ এইরকম জানে। তাই সে চুপ করে রইলো। স্বপ্না বললো, একটু বসুন না। আমরা আপনাকে কলেজ স্ট্রীট পৌঁছে দেবো।

—না, না, আপনারা পৌঁছে দেবেন কেন? আপনাদের কি কলেজ স্ট্রীট যাবার দরকার আছে কোনো?

—আমাদের কোথাও যাবার দরকার নেই। এমনিই বেড়াবো। কলেজ স্ট্রীটের দিকেও অনায়াসে যেতে পারি।

—তা হলে চলুন না, কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে গিয়েই কফি খাওয়া যাক্?

অরূপ জিজ্ঞেস করলো, স্বপ্না যাবে?

স্বপ্না বললো, না, কফিটা এখানেই খাওয়া যাক্। ওখানে বড্ড চেঁচামেচি হয়।

শান্তা সামান্য হেসে বললো, অনেকে আবার ঐ চেঁচামেচির লোভেই ওখানে যায়। আমার আবার খুব বেশী শান্ত জায়গা তেমন ভালো লাগে না। চলুন, একদিন দেখা যাক্।

রেস্তোরাঁর ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার, বড় বেশী শান্ত। সবাই কথা বলছে ফিসফিস করে। বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ে বসে আছে, তাদের অধিকাংশ কথাই চোখে-চোখে। এখানকার বেয়ারারাও অরূপকে চেনে, একজন সেলাম জানিয়ে চেয়ার টেনে দিল।

স্বপ্না বললো, আপনাকে এখানে দেখতে পাবো, আশাই করিনি। আপনি তো নর্থে থাকেন।'

শান্তা ঘাড় ঘুরিয়ে সমস্ত জায়গাটা দেখছে, উত্তর দিল, এদিকে আমার এক মাসীমার বাড়ি। আমি এ দোকানটায় একবার মাত্র এসেছিলাম আগে, আমার বাবার সঙ্গে।

অরূপ হেসে বললো, আজকাল আর কোনো মেয়ে এখানে বাবার সঙ্গে আসে না!

—বাঃ, তখন আমি বেশ ছোট ছিলাম। ফ্রক পরতাম। অন্তত সাত আট বছর আগে।

—আপনার বাবা সেই নর্থ থেকে এতদূরে খেতে আসতেন?

—আমার বাবার শখ ছিল নতুন নতুন রেস্তোরাঁয় আমাদের খাওয়াতে আনা।

—এখন নিশ্চয়ই আর বাবার সঙ্গে যান না?

—আমার বাবা বেঁচে নেই।

এক মিনিট স্তব্ধ থেকে ওরা শান্তার বাবার জন্য শোক পালন করলো। অরূপ কফি আর স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিল। অরূপ জানতো, শুভ্রা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে দীপুর খুব ভাব ছিল, তার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় দীপু ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে আছে। এই মেয়েটির সঙ্গে আবার কবে ভাব হলো? স্বপ্না ভাবলো শান্তার বয়েস তো প্রায় আমারই সমান এর মধ্যেই ওর বাবা মারা গেছে? ইস, ভাবাই যায় না।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে,—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ধানা - নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি - কিছু আর বাকি থাকবে না - অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় - যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে - যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি না, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন সমস্যা

কলকাতার আর্থিক সংকট শুধু রাজ্য সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতার পরিচায়ক নয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিরই একটি বিশেষ সমস্যা। কলকাতা বাঁচলে সমগ্র পূর্ব ভারত বাঁচবে; দেশের অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিছুদিন যাবৎ কলকাতার সমস্যা নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিযোগের বহুমুখী প্রকাশ নাগরিক জীবনের অস্থিরতা যে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে তা-ই সূচিত করে। বিভিন্ন রাস্তাঘাটে যানবাহন চলাচল অবরোধ করা এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কৌতুকপ্রদ নামধারী বাসগুলির ঘেরাও এই অস্থিরতার একটি দিক মাত্র। কলকাতার পরিবহণ সমস্যা নিয়ে আমরা আগে অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু এটাই তো কলকাতার একমাত্র সমস্যা নয়। পরিবহণ সমস্যা ছাড়াও আছে আবর্জনা পরিষ্কার, জল নিষ্কাশন এবং গৃহ-নির্মাণ ও বস্তী উচ্ছেদের সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার সমস্যার সমাধানের জন্য শুধু গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ এবং অর্ধ-চক্রাকৃতি রেল চালু করা ছাড়া অন্য কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করেননি। শুধু অর্ধ-চক্রাকৃতি রেল কলকাতার পরিবহন সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। হয়তো এ ব্যবস্থায় উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের পথ চলার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। তবে কলকাতার অধিকাংশ লোক এ-ব্যবস্থায় খুব উপকৃত হবেন না। শোনা যাচ্ছে সরকার আমাদের পাতাল প্রবেশ অথবা [illegible] রেলপথে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে সম্পর্কে শীঘ্র অনুসন্ধান চালাবেন। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি কী হবে, এবং যুদ্ধোত্তর কলকাতার নাগরিকগণ প্রতিনিয়ত যে কৃচ্ছ্রসাধন করে যাচ্ছেন তার বিনিময়ে কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ হবে কিনা আমরা তা এখনও জানিনা। তবে এটুকু জানি, সমগ্র কলকাতা মহানগরীতে ভূগর্ভস্থ রেলপথ চালু না হলে পরিবহণ সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। ইউরোপের বড় বড় শহরে যেভাবে পরিবহণ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, কলকাতা শহরের সমস্যার সমাধানও সেভাবে করতে হবে; পরিবহণ সমস্যার মোকাবিলা তো করতেই হবে; কিন্তু, তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে মহানগরীর আবর্জনা দূর

করার সমস্যা। ভারতের সবচেয়ে বড় মহানগরীর আবর্জনার দুঃসহ নগ্ন রূপ বিদেশের টেলিভিশনে দেখার দুর্ভাগ্য অনেকেরই হয়েছে এবং এজন্য যাঁরা বিদেশে আছেন তাঁদের এককালের ভারতের গৌরব এই মহানগরীর জন্য উপহাস সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু বোম্বাই বা নয়াদিল্লীর তো এই অবস্থা হয়নি। ময়লা দূর করার যে ব্যবস্থাই করপোরেশন বা রাজ্য সরকার করতে চান তার জন্য শুধু যে টাকার অভাব আছে তা-ই নয়; পৌরপিতাদের আবর্জনা দূরীকরণে দৃঢ়তার অভাবও পীড়াদায়ক। কলকাতা শহরের বড় বড় রাস্তার উপরে প্রকাশ্যভাবে যে ভাবে নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকে এবং শৌচাগারগুলিকে যে কদর্য অবস্থায় থাকতে দেখা যায় তা দূরে করার জন্য পৌরপিতাগণ কি করছেন? নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হয়েই তাঁরা মহানগরীর পৌর জীবনের সব দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জনস্বাস্থ্য যাতে দূষিত না হয়, এবং নাগরিকগণকে বড় বড় রাস্তায় নাকে রুমাল চাপা না দিয়ে যাতে চলতে হয় তার ব্যবস্থা তাঁরা কতটা করতে পেরেছেন? এখনও যদি পৌর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন না হন তবে এমন একদিন আসবে যখন নাগরিকগণও তাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।

মহানগরীর সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন আরও অর্থের। জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হলে এবং রাস্তাঘাট মেরামত করতে হলে যে টাকার প্রয়োজন তা যে কলকাতা কর্পোরেশনের নেই, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তাই আজ অনতিবিলম্বে কলকাতায় যাঁরা কাজ করতে আসেন তাঁদের উপর Terminal Tax চাপানো প্রয়োজন। কলকাতায় যাঁরা থাকেন না, অথচ এই মহানগরীই যাঁদের কর্মক্ষেত্র এবং অর্থোপার্জনের উৎস, তাঁদেরও এই মহানগরীর জীবনযাত্রা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে; শুধু মহানগরীর সব সুবিধাটুকুই তাঁরা ভোগ করবেন, অথচ তার উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব নেবেন না, এটা বোধ হয় তাঁরা নিজেরাও চান না। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র তাঁর অনুমতি চেয়েছিলেন এই মহানগরীতে Terminal Tax বসাবার জন্য। কিন্তু এই অনুমতি এখনও মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি রাজ্য সরকারের স্বারস্থ হবার জন্য কর্পোরেশনকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে এগিয়ে আসতে হবে, কলকাতার স্বার্থ দেখাটাই এখন তাঁদের বড় কর্তব্য হওয়া উচিত, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলির কোন সুরাহা হবে না।

বিদেশী পর্যটকদের কাছে কলকাতার

শিল্পী মহিম রুদ্র সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পীর অংকনরীতি বিমূর্ত, প্রদর্শনীতে তাঁর সাম্প্রতিকতম কয়েকটি রচনা দেখা যায়।

মহিম রুদ্র তরুণ শিল্পী সমাজে পরিচিত। তিনি নিয়মিতভাবে ছবি এঁকে থাকেন ও বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন। যাঁরা তাঁর অংকনরীতির সংগে পরিচিত, তাঁরা শিল্পীর আধুনিকতম রচনায় পরিবর্তন লক্ষ করবেন। শূন্য স্থানের মধ্যে বিভিন্ন আকারকে সুসম্বদ্ধভাবে স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পটভূমি সাধারণত শূন্য রেখে তারই মধ্যে প্রায় জ্যামিতিক স্বর্ণবিন্যাসে তিনি নানা আকার স্থাপনা করতেন ও বিভিন্ন রঙে শূন্য স্থান ও আকার ভরে ফেলতেন। তাঁর এই বাস্তব-রীতির সাহায্যে, অর্থাৎ পরিমিত স্থানের মধ্যে তিনি বহুসংখ্য রূপের চিত্র ফুটিয়ে তুলতেন। তবে এই রচনাগুলিতে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যেত। বিভিন্ন রঙের সংযোগে সমন্বিতরূপে তাঁর কয়েকটি রচনা বিশেষভাবে চোখে পড়ত।

সাম্প্রতিকতম রচনায় শিল্পী শূন্য স্থানকে বিভক্ত করেছেন, অর্থাৎ রচনাক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প শূন্য স্থান রেখে তিনি সমস্তটুকু ছোট-বড় নানা আকারে ভাগ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিভিন্ন আকারগুলি নানা সূক্ষ্ম রেখায় ও উজ্জ্বল রঙ দিয়ে ভরে ফেলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন। এই ভাবে কাজ করার ফলে কয়েকটি ছবিতে নতুন কাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—যেমন ১৫নং রচনা। আকারে পরিপূর্ণ রঙের পর্দা ব্যবহার করলেও শিল্পী প্রধানত হলুদ ও সবুজ রঙের স্তরভেদের উপর প্রাধান্য দিয়ে রঙের বৈচিত্র্য এনেছেন। এটি সবকটিতেই চোখে পড়ে। নীল, হলুদ ও সবুজ—এই তিনটিই শিল্পীর প্রিয় রঙ মনে হয় এবং দেখা যায়, মোটামুটি এই তিনটি রঙই বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ৯ ও ১৪নং-এর উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে শেষোক্তটিতে মধ্যভাগে সাদা অংশের পরিপ্রেক্ষিতে গাঢ় নীল রঙের ব্যবহার-কৌশলের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর ও স্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। হলুদ রঙের সূক্ষ্মকৌশল ব্যবহারের দিক থেকে আকার-প্রধান ৮নং রচনার নাম করা চলে। তবে কয়েকটি সংকেতপ্রধান রচনায় শিল্পীর পূর্বেকার রীতির পরিচয় পাই, যেমন ৭ ও ১১নং। সম্ভবত এগুলি পুরানো রচনা। মনে হয়, আধুনিকতম রচনায় শিল্পী অধিক সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে একথাও ঠিক যে, আকার ও রঙবৈচিত্র্যই এই জাতীয় রচনার মূল কথা। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে কাজ করলে শিল্পীর সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত।

'কম্পোজিশন' —মহিম রুদ্র

*

পশ্চিম বাংলার হাতে-তৈরী বোর্ড ও কাগজ প্রস্তুতকারক সংস্থা ও শিল্পায়ন-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে প্রথম সংস্থার তৈরী নানাপ্রকার কাগজ ও দ্বিতীয় সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার, অভিনন্দন-পত্র ইত্যাদি দেখা যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যেমন রেশমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, লিখনক্ষেত্রেও হাতে-তৈরী কাগজের বিশেষ মূল্য আছে। এই দুটি জিনিস ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। হাতে-তৈরী কাগজ বাজারে প্রচলিত কাগজের মত সাদা বা মসৃণ নয়—কিন্তু

হাতে-তৈরী কাগজের একটি বিশিষ্ট সৌষ্ঠব আছে, যেটি অন্য কাগজে দেখা যায় না। অবশ্য সে-সৌষ্ঠব চোখে পড়বে তাঁদেরই, যাঁদের নিজস্ব রুচিবোধ আছে। অনেকের ধারণা আছে যে, হাতে-তৈরী কাগজে চিঠিপত্র লেখা বা মুদ্রণ-কাজ চলে না। সে ধারণা যে ভুল, তা প্রদর্শনীতে গেলেই বোঝা যায়। হাতে-তৈরী বোর্ডে অফসেটের কাগজ ছাপার উপযোগী যে ব্লক (Block) প্রদর্শনীতে রাখা আছে, তা দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। রোটারী মুদ্রণের উপযোগী বিবেচিত হলে ও অনুরূপ অর্থসাহায্য পেলে হয়ত হাতে-তৈরী ব্লকই এক সময়ে ব্যাপকভাবে দেশে ব্যবহৃত হবে। কাঁচা মাল থেকে শুরু করে মণ্ড তৈরী করা তথা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। সেই সংগে সাদা ও নানা রঙের বিভিন্ন কাগজের নিদর্শনও দেখা যায়। বিশেষ করে ব্লটিং কাগজ, কলাপাতার খোসায় তৈরী বানানা পেপার ও গৃহসজ্জার উপযোগী বিভিন্ন রঙীন কাগজ দেখে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তবে কর্তৃপক্ষ যদি এজাতীয় কাগজের সহজলভ্যতা বিষয়ে অধিক সচেতন হন, তা হলে জনসমাজে হাতে-তৈরী কাগজের চাহিদা অবশ্যই বেড়ে যাবে।

শিল্পায়ন একটি পরিচিত সংস্থা। এই সংস্থা প্রকাশিত চিত্রকলা বিষয়ক নানা বই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে এই সংস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অভিনন্দন-পত্র —শিল্পায়ন

প্রদর্শনীতে হাতে-তৈরী কাগজের পত্র, অভিনন্দনপত্র, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির নানা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যায়। পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জার দিক থেকে এগুলি খুবই সুন্দর। এগুলি পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে উপহার দেবার উপযুক্ত। বিশেষ করে প্যাড কভারের ওপর ভারতীয় ক্যালিগ্রাফিক ও অলংকারিক অঙ্কন-নিদর্শন দেখে সকলেই আকৃষ্ট হন। সমস্ত ডিজাইনই শিল্পী সভ্যগণ কর্তৃক সিল্ক স্ক্রীনে ছাপা। শিল্পায়নের সভ্যগণ যে প্রগতিবাদী, তার পরিচয় পাওয়া যায় অ্যাপোলো অভিনন্দনপত্রে। কয়েকটি অভিনন্দন-পত্র ও কার্ডে অজন্তার সুপরিচিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি সিল্ক স্ক্রীনে ছেপে শিল্পায়ন গোষ্ঠী সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আগামী বছরের দেওয়াল ক্যালেণ্ডার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] নিজেও ক্যালেণ্ডারের সিল্ক স্ক্রীন ছবিখানি বহুদিন যাবৎ যে-কোনও ঘরের শোভাবর্ধন করবে। শিল্পায়ন সংস্থা কর্তৃপক্ষ এজাতীয় নিদর্শনগুলির উপযুক্ত প্রচার তথা বিক্রয়ের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন জানি না। তবে কেবল প্রদর্শনীতে কয়েকজনকে দেখার ও কেনার সুযোগ দেওয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষ যদি তাঁদের সংস্থার তৈরী নিদর্শনগুলির ব্যাপক প্রচার ও বিক্রয়ের জন্য যথাযোগ্য পন্থা অবিলম্বে গ্রহণ করেন, তবেই তাঁরা লাভবান হবেন এবং তাঁদের সংস্থায় তৈরী উপহার দেওয়ার উপযোগী বিভিন্ন পত্র তথা কার্ড শৌখিন সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

চিত্রপ্রিয়

রঙ্গশ্রী নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত "এলেম নতুন দেশে" নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন ফাইন আর্টস হল-এ। ফাইন আর্টস হল দিল্লীর একমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার নাট্যমঞ্চ যার জন্য সমস্ত ভাষাভাষী দিল্লীবাসী নিখিল ভারত

দর্শক

চালু করা সমিতির কাছে চিরঋণী থাকবে। সমানে প্রায় তিন দশক ধরে এই সমিতির কর্ণধার এবং প্রাণ ছিলেন [illegible] উকিল। বলতে গেলে প্রায় তিনিই এই ফাইন আর্টস হলটি দিল্লীবাসীর উপহার দিয়েছেন বলেই রাজধানীতে পাকা [illegible] নিয়মিত এমন একটা নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হচ্ছে। এর পরেও অবশ্য আরো দুয়েকটি ছোটোখাটো নাট্যমঞ্চ অবশ্য পেয়েছি বটে তাদের কোনটিই এই ফাইন আর্টস হলের মতন সর্বাধুনিক আলোক সম্পাতযুক্ত নাট্যমঞ্চ নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফাইন আর্টস হল। [illegible] বাইরে সারা ভারতে এই হলটিই বোধহয় প্রথম পাবলিক প্রেক্ষা— স্বর্গত শিল্পী বরোদা উকিলের বহুকালের স্বপ্ন যা আজ বাস্তব। সংগঠনমূলক সাংস্কৃতিক কাজে অবিশ্রাম খাটাখাটির বেলায় বরোদা উকিল ছিলেন যাকে বলে অতুলনীয়। রীতিমত একটি মহামানব। রঙ্গশ্রী-র "এলেম নতুন দেশে" শুরু হবার পূর্বাহ্ণে আমি ফাইন আর্টস হলে গিয়েছিলাম। রবিবার ২১শে সেপ্টেম্বর। হলের বাইরে সবুজ ঘাসের লনে অপেক্ষা করতে করতে শুনলাম স্থানীয় "সাহিত্য কলা পরিষদ"-এর আগামী নাটক প্রতি-যোগিতা সম্পর্কে টক-ঝাল আলোচনা চলছে। আলোচনা মানে কথায় পিঠে কথা আর কি, যাতে ছিলেন জনাকয়েক নাটকপ্রেমী বাঙালী তরুণ-তরুণী। প্রসঙ্গটির কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আগাম দিয়ে দিই, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। —এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের দিল্লী প্রশাসন "সাহিত্য কলা পরিষদ" গালভরা নামের পাকাপাকি একটি সংগঠন চালু করেন হঠাৎ করে। চালু করার সময় সাড়ম্বরে জনসমক্ষে সগৌরবে ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল: এই সাহিত্য কলা পরিষদ ভারতের রাজধানীতে শিল্প এবং সাহিত্যের উন্নতিসাধনে ব্রতী হবে। ভালো কথা। পরিষদের ১৮ জন অজ্ঞাত কিভাবে যেন নির্বাচিত সদস্যদের সর্বাগ্রে রয়েছেন দিল্লী প্রশাসনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনসংঘী পলিটিশিয়ান ভি কে মালহোত্রা, একমাত্র যাঁর নির্দেশে এই সেদিন ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি হলেও হতে পারত এতই ইনি সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন পুরুষ। পরিষদের অন্যান্য "নির্বাচিত" সদস্যদের মধ্যে আছেন হিন্দী ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকুমার, পাঞ্জাবী কবি অমৃত প্রীতম, সমাজ সেবিকা সরল রাণী, আর জনৈক বি এন মুখার্জি। আবার বলছি, পরাক্রান্ত দিল্লী প্রশাসনের উদ্দেশ্য অলবৎ প্রশংসনীয়। "সাহিত্য কলা পরিষদ"-ও অভিনন্দনীয়। তবে পরিষদের আগামী নাট্য প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন বাঙালী এবং দক্ষিণ ভারতীয় দিল্লীবাসী (সকলেই দিল্লী প্রশাসনের অনুগত প্রজা)

প্রত্যেক শিল্পীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম "বেনজু" নাটকটি দেখবামাত্র, যেহেতু "বেনজু" আমার চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করেছিল। অপ্রতিহত সেই বেনজু যে ভেতরকার আমারও মানুষ, এবং আরো-আরো অনেকের। নাটকটি আমি সেই দৃষ্টিতেই দেখেছিলাম। রাত পোহাতে, যা আমার পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক, রমেন লাহিড়ীর আস্তানায় গিয়ে হানা দিয়েছিলাম। হানা দিয়েছিলাম বাস্তুর মতন দেখতে রেগড়পুরার সেই ঘিঞ্জি গলিতে। হানা দিয়ে যেচে যেচে পরিচিত হয়েছিলাম রঙ্গশ্রী নাট্যগোষ্ঠীর প্রত্যেকের সঙ্গে। কি আর করব, আমার যা খুঁট-উ-ব ভালো লাগে তার শেষ পর্যন্ত দেখতে চাওয়ার অভ্যাসটা আমার আশৈশব ব্যাধি বলা যায়; লাগাম-ছাড়া এইভাবে শেকসপীয়রিয়ান অভিনেতা সার লরেন্স অলেভিয়র-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিঃস্ব ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম লণ্ডন শহরে। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী ভিভিয়েন লে'র সঙ্গেও। নাটক দেখতে ভালোবাসি, কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসি আবিষ্কার করতে নাট্যকারকে, বাস্তব ভিত্তিক নাটককে যাঁরা রক্ত-মাংসের অবয়ব দেন সেইসব শিল্পীদেরকে। রমেন লাহিড়ী, তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী অঞ্জলী লাহিড়ী, দুজনেই; এবং ওঁদের গোষ্ঠীর আর-আর যাঁরা তাঁদের শিল্পীস্বত্বা দিয়ে আমাকে অভিভূত করলেন। ওঁদের সবাইকে বেশ খানিক নিকট থেকে দেখলাম। কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আজকে আবার আমাকে আসতে হলো "এলাম নতুন দেশে" দেখবার বাসনায়। নাটক দেখতে ভালো লাগলেও দিল্লীতে নাটক কিন্তু আমি অল্পই দেখি। কেননা অস্বাভাবিকতা দেখে দেখে স্থানে-অস্থানে বারংবার হতাশ হওয়া তেমন আর সয় না।

মঞ্চের পর্দা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিধিবদ্ধ রীতির বাইরে আলো-আঁধার-ফ্যান্টাসির পরিবেশে আমি চলে গেলাম অন্য এক জগতে, ভুলে গেলাম আমি এখন দিল্লীতে। "বেনজু"-তে দেখেছিলাম সৎ-বিবেকী এক সৈনিকের হত্যা। হত্যা, কেন না মড়ার গন্ধ-ভরা যুদ্ধক্ষেত্রকে সে সহ্য করতে আর না পেরে নিজেরই অজ্ঞাতে সে বুঝি পালাতে চেয়েছিল। ধরা-পড়ে সামরিক সুবিচারে তার হয় মৃত্যু-দণ্ড। এই সুবিচারে আমিও অসম্ভব কষ্ট পেয়েছিলাম। বলতে লজ্জা নেই, সুবিচারের ঠেলায় চোখে জল ভরে গিয়েছিল বিদেশে-বিভুঁয়ে বেনজু নামের সরলচিত্ত তরুণের নির্মম হত্যায়। ভাগ্যিস আজকের এই "এলাম নতুন দেশে" নাটকে কোনো সুবিচারের হত্যা নেই। আছে

পৃথিবীরেক মানুষের নতুন এক দেশে আসতে পারায় এক অসীম খুশীর তীব্রতা। সেই নতুন দেশটা কোথায় তা আমি জানিনে, সেই দেশটা যেখানে সেখানে নেই নাটকে চিত্রিত মরবিড্ দিল্লীর বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের দুর্নীতিপূর্ণ আণ্ডার সেক্রেটারি, যিনি উপরঅলা সাহেবের কোনো ব্যবসায়ী বন্ধুকে দেখলেও গদগদ নতশিরে পদলেহন করতে সাজহাত এগিয়ে আসেন, অথচ বিবেকবান যুবতী সেলস গার্লকে চপেটাঘাত করতে হন সাক্ষাৎ সিংহ,—সেই দেশে নেই সেই সিংহমশায় বসন্তবাবু; নেই চৌকস কনট্র্যাক্টর মিস্টার সিকদার, নেই বিবেক-হারানো মিস্টার মুখার্জি—এই পক্ককেশ পরিণত বয়সে সহসা যাঁর একবার ছেলে-বেলাকার কথা মনে পড়ে গেল; নিজেরই ভাষাতে যিনি আমাদেরকে বলেছেন,—তখন তিনি ইস্কুলে পড়াতেন। বাবা মা ছিলেন ইউরোপে। একা একা প্লেনে চড়ে তাদের কাছে যাচ্ছিলেন। প্লেন থেকে নীচের শহর নগর নদীনালা সবকিছু অদ্ভুত আর আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল। খুব ছোট ছিলেন তো, খুব বোকা ছিলেন, তাই একটুতেই মনটা নেচে উঠেছিল। জীবনে তখন সেই একটিবারই, একটিবারই, সত্যিকার সুখী হয়েছিলেন মিস্টার মুখার্জি। —বাস, অতঃপর অসৎ ব্যবসা-বাণিজ্য পদমন্ত্রী ইত্যাদি এইসবের ঝামেলায় যেই উনি খুব ধূর্ত হয়ে গেলেন, জায়গায়-জায়গায় দানধ্যানের পৃষ্ঠপোষকতায় পুণ্য করতে লাগলেন, তখন থেকে বিবেক গেল একদম লুকিয়ে, এমন কি একমাত্র সন্তান বিজয় বাপকা-ব্যাটা পরিচয় না রেখে সেও তাকে পরিত্যাগ করে এখন কি না চলে যেতে চাইছে, আর চলে সে সত্যিই গেলও, নতুন এই অবাক বিস্ময়ের দেশে যেখানে মর্তধামের এই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাটা নিছক পুরাতত্ত্ববিদদের মাত্র একটি গবেষণার বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ অমন অবাক দেশেও যার অভাব মর্তবাসী আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত হৃদয়-হৃদয় অনুভব করি, শেষ পর্যন্ত জাহাজের কর্মী কুশল সেখানে থাকে না, একই সূত্রে গেঁথে যাওয়া সেলস্ গার্ল কাজরীকেও (অঞ্জলি লাহিড়ী) সে যেতে দিল না। কেন না এই অভাব-অনুযোগের দেশে থেকেই ওরা ওদের অনন্যাপন্ত জীবনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে চায় সেই গান-গন্ধ-ভালোবাসা ভরা আশ্চর্য দেশের কথা যেখানে ওরা দুজন মাত্র একটিবার একটি দিনের জন্য গিয়ে এমনই চমক-পুলকিত হয়ে গিয়েছিল যে, এখন সেখান থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে এসে জগৎ-বাসীকে ডেকে ডেকে বলতে চায় সেই দেশের মানুষ বন্ধ আর নাকি অর্থের দাস নয়, সেখানে ব্যক্তিগত লোভ নাকি নেই, বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সুবিচারে সুশাসনে সেখানে সকলে বসবাস করে; মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকশিত হবার সব সুযোগ-সুবিধে আছে সেখানে। প্রতিজ্ঞার তাপে তপ্ত হয়ে কুশল (রমেন লাহিড়ী) সদ্য চাকরির ছেড়ে দেওয়া সেলস্ গার্লকে বলল, 'এসো কাজরী, আমাদের এগিয়ে চলা শুরু হোক এখান থেকেই।' নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের উদ্ভাসে যেন প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত হয়ে উঠল। নাটকের শুধু কাহিনীটুকু নয়, চোখ দিয়ে দেখে মন দিয়ে ভেবে এবং রসতত্ত্বের বিচার করে আমি বলছি, প্রত্যেকটি চরিত্রের মর্মস্পর্শী অভিনয় বাস্তবিকই যেন ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল নতুন সেই দেশে, যে দেশ কোথায় তার ঠিকানা আমি জানিনে, অথচ জানতে চাই খুব ভাবে, আর খুব সম্ভব একদিন না একদিন তা জানবই জানব, কেন না কুশল আর কাজরীর মতন নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা মিথ্যে বলতে পারে না।

জে বি প্রিস্টলের 'দে কেম টু এ সিটি' নাটকের ছায়ায় এই নাটকটি লিখেছেন নিছক প্রচারসর্বস্বতায় অবিশ্বাসী নাট্যকার রমেন লাহিড়ী। নিন্দুক-অবিশ্বাসের এই কথাটা উনি না বলে দিলেও আমি টের পেতাম যেহেতু এই নাটকের কোথাও প্রচারকর্ম বা স্লোগান-এর রঙীন ফুলঝুড়ি আমার নজরে পড়েনি। জে বি প্রিস্টলের নাটকেও তা ছিল না। কিন্তু প্রিস্টলে থেকে গেছেন নিশ্চয়ই তাঁর ইংরেজী বইয়ে। "এলেম নতুন দেশে" নাটকের নিজস্ব যে মৌলিকতা আছে তাতে নাট্যকার হিসেবে রমেন লাহিড়ীর কোনো কম কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নয়। এ নাটকটিকে দেখে শুধু চুপ করে বসে থাকতে হয়। চুপ করে, কেন না নাট্যাভিনয়ের শিল্পীরা, তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুভববোধের ইন্দ্রিয়বোধের অভিজ্ঞতার সংবাদটিকে দর্শকের মনের মধ্যে যে মন তাতে যে একেবারে সোজাসুজি পৌঁছিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন তা আমি বলবই বলব।

পূজো সংখ্যা

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনে ও দেয়াল-পোস্টারে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার পূজো-সংখ্যার বিজ্ঞপ্তিতে ছোট বা বড় অক্ষরে লেখক-তালিকায় আমার নাম যুক্ত থাকতে দেখেছি। নিতান্ত দশভুজ না হলে একজনের পক্ষে এত লেখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার মতন আলসে-প্রকৃতির লোকের পক্ষে তো তা একেবারেই অসম্ভব।

যা'হোক আসল খবর সংগ্রহের পর জানতে পারা গেল যে ওই সব পূজো সংখ্যায় আমার পুস্তকাকারে প্রকাশিত পুরোন লেখাগুলোই আমার বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বা হচ্ছে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকাবর্গকে আমি এ-

বিষয়ে সবিনয়ে জানাতে চাই যে আমি মাত্র নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি ছোট গল্প—বড় গল্প—উপন্যাস লিখেছি : দেশ, গল্পভারতী, রমাবাণী, প্রসাদ, উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ ও জলসা। বাকি সমস্ত পূজো-সংখ্যায় প্রকাশিত আমার রচনাগুলি হয় আমার লেখার পুনর্মুদ্রণ, নয় তো কোনও অসাধু ব্যক্তির অভিসন্ধিমূলক ব্যবসায়িক কারসাজি।

ইতিমধ্যে বাজারে আমার নামে প্রায় দশটি জাল উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে বিশদ আলোচনা আগেই হয়ে গেছে। এবার তাদের আক্রমণ শুরু হয়েছে পূজো-সংখ্যার ওপর। এ-ব্যাপারে বিশেষ উপরোধ ও উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে দুটি পত্রিকাকে আমার পুরোন লেখা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিতে হয়েছে (সুন্দরী ও শ্রীময়ী) কেবল একটি মাত্র মৌখিক শর্তে যে সে-সম্বন্ধে পত্রিকায় লিখিত স্বীকৃতি দিতে হবে। এ-ছাড়া যৌন-বিষয়ক পত্রিকায় আমি সজ্ঞানে লিখবো এমন কল্পনাও যেন আমার পাঠকবর্গ না করেন।

অন্যান্য প্রদেশের লেখকদের কথা জানি না, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি এ একেবারে প্রবঞ্চনা। গত কয়েক বছর ধরে এ-প্রবঞ্চনা চলে আসছে। গত বছরে এই ব্যাপারে একটি যৌন বিষয়ক পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে অ্যাটর্নীর একটি চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। ৪৮ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় 'যৌবন' নামক একটি যৌন বিষয়ক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে উপন্যাস লেখক হিসেবে আমার নাম ঘোষিত হয়েছে দেখলাম। এতে আমি কী উপন্যাস লিখছি তা জানি না।

সব দেখে মনে হচ্ছে এবারে এই প্রবঞ্চনা যেন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। তাই অতিষ্ঠ এবং অনন্যোপায় হয়ে আমাকে এই পত্রাঘাত করতে হলো। ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত এ-দেশে কোনও লেখক-সমিতি থাকলে হয়ত এর কিছু আইনগত প্রতিবিধান হতো। তা যখন নেই তখন আমাদের মত স্বল্পবিত্ত স্বল্প অবসরযুক্ত লেখকদের আর কী করণীয় থাকতে পারে তা জানি না। একমাত্র ভরসা বোধ হয় পাঠকসম্প্রদায়। তাঁদের ওপর আমার অশেষ শ্রদ্ধা। তাই তাদের কাছেই আমার এই বক্তব্য পেশ করলাম। এ-বিষয়ে তাঁরা কি সচেতন হবেন?

বিমল মিত্র

॥ ২ ॥

কিছু দিন ধরে দেখতে পাচ্ছি, শারদীয় এমন সব পত্রিকা আমার নাম বিজ্ঞাপিত করছে, যেসব পত্রিকায় আমি কোন লেখা দিইনি। ব্যাপারটা একদিক থেকে আশ্চর্যজনক, অন্যদিকে ক্ষোভের। কোন ব্যাপারেই কি আর এ দেশে, সামান্য সততার আশা করা যায় না। মিথ্যাকে নিরন্তর ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা হবে।

যাই হোক, অন্তত আমার পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, এখনো পর্যন্ত নিম্নলিখিত শারদীয় পত্রিকাগুলোতে আমি আমার রচনা দিয়েছি। দেশ, উল্টোরথ, প্রসাদ, সিনেমা জগত, উত্তম ও অপসরা।

অন্য কোন পত্রিকা যদি আমার কোন পুরনো লেখা পুনর্মুদ্রণ করে বা করে থাকে, তাও আমার বিনা অনুমতিতেই।

সমরেশ বসু

২৭-৯ ৬৯

এই নয় যে শান্তিনিকেতনে বিশুদ্ধ গবেষণা বা শিল্পসাধনা চলতে পারে না: নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু ততটুকুই, যতটুকু এখানকার অবচেতন পরিবেশ অনুমোদন করে। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে academic কতকগুলো দাবি থেকেই যায়, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ক্ষেত্রে তাদের পূরণ হবে এখানকার প্রাথমিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরসমূহ বহু-আলোচিত হলেও, তা আরোও সুষ্ঠু সমাধানের অপেক্ষা রাখে। পেশাদারী শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপকে শান্তিনিকেতনে অপ্রধান করে রাখার প্রস্তাব অনেকটা যুক্তি সংগত হলেও কোনো রকমেই মেনে নেওয়া যায় না। এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে 'পেশাদারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তথাকথিত উপযোগিতা হয়তো বিশ্বভারতীর নেই, কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে গবেষণা ও সাধনার ক্ষেত্র উর্বর করে তুলতে হলে শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীরুদ্র এ প্রয়োজন সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদাসীন। আমাদের মনে হয় এই দ্বিতীয় ধাপের সার্বিক উন্নতির চেষ্টাই এখন শ্রীরুদ্রের 'ধরে নেওয়া' 'বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ-শিক্ষাবিদ সমিতির' প্রধানতম করা উচিত। না হলে এখানকার সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশে অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা ইতিমধ্যেই অনেকাংশে প্রকট। পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় কলকাতা-দিল্লীর অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে এখানকার স্বাধীন নৈতিক পরিবেশে যে চাপ পড়ছে, তার ফল সম্বন্ধে আমাদের এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। গবেষণা ও শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীরুদ্র যে রকম অভিনব [illegible] বর্তমান ভারতীয় শিক্ষার অভিশাপে। [illegible] কথা বলেছেন, পেশাদারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সে রকম কোন অভিনব ও নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন কি বিশ্বভারতীতে [illegible]? শ্রীরুদ্র প্রমুখ বিশ্বভারতীর প্রকৃত হিতৈষীদের এই বিষয়ে ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি।

নির্মলাংশু মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

—

॥ ২ ॥

অধ্যাপক রুদ্র বলেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উচ্চমানের শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মত স্থানগত উৎকর্ষতা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনেরই আছে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই মূল্যায়নে গর্ব বোধ করছি।

প্রবন্ধটি পড়ে প্রথম পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে যে অধ্যাপক রুদ্র 'বর্তমান বিশ্বভারতী' সম্পর্কে মন্তব্য এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু কতকগুলি অসুযোগ তিনি প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করেছেন অবশ্যই

মূল্যায়ণ প্রাদেশিকতা ও অন্য দোষ মুক্ত! যদি বিশ্বভারতীতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা তুলেই দেওয়া হয় এবং দিল্লী থেকে কেন্দ্রটিকে শান্তিনিকেতনে সরান যায় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকদেরকে কিভাবে সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে? যদি অধ্যাপক রায়ের বক্তব্য এই হয় যে, এম-এ পড়ানোর জন্যে অন্য বিভাগ আর খোলা হবে না, এবং বর্তমান বিভাগগুলিকে বাড়ানো হবে না তাহলে প্রবন্ধে তার কোন ইঙ্গিত নাই।

আমার সর্বশেষ জিজ্ঞাস্য অধ্যাপক রায় পরিকল্পিত পরিবর্তনেও কি বিশ্বভারতী সম্পর্কে সমস্ত অনুযোগগুলিই অপরি-বর্তিত থেকে যাচ্ছে না?

এই প্রশ্ন এবং নিজস্ব মন্তব্যের বদলে আমি অধ্যাপক রায়ের কাছ থেকে জানতে চাইবো প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের [illegible] সম্পর্কে উঁচু পর্যায়ের অধ্যাপকদের অভিমত কি? অধ্যাপকরা কি মনে ভাবেন যে [illegible] [illegible] যদি বিশ্বভারতীতে [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বভারতীর মান উন্নয়নে সহায় [illegible] করবে

শ্রীধর হাজরা
নিউদিল্লী

(৩)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে [illegible] কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] [illegible] জানি না কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

এই ক্ষেত্রে লেখক এই ধরনের মান নির্ণয় করতে গিয়ে ছাত্রদের চিন্তার মধ্যে সংকীর্ণ গণ্ডীর সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের কর্ম-জীবনে প্রবেশের রাস্তাকে আরো পঙ্কিল করেছেন। লেখকের তথাকথিত প্রথমশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন অংশই কম নয়—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সর্বভারতীয় প্রতি-যোগিতার ফলাফল দেখলেই বোঝা যাবে। এ ছাড়াও গবেষণার ক্ষেত্র কতো প্রসারিত তা প্রতি বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুধাবন করলেই লেখকের মন্তব্য কত অযৌক্তিক তা পরিষ্কার হবে। পরিশেষে লেখককে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাই, তিনি নিজে এসে এখানকার পঠনপাঠন এবং গবেষণার মান নির্ণয় করেন এবং আশা করছি লেখক পরবর্তী কালে তাঁর বক্তব্যকে আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করবেন।

নৃপেন্দ্রকুমার দে
ইন্দ্রকুমার গায়েন
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের
পক্ষ থেকে

অদূরের দিল্লী

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯-এর দেশে শ্রীযুক্ত দরবেশ মহাশয় লিখেছেন "দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মালয়ালম সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ওঁর (কিশোর মধুবনের) কবিতা নিয়ে এবার ক্লাসে আলোচনা করবেন। সেখানে কবি নিমন্ত্রিত। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এমন হয়? ভালো জিনিসেরও বুঝি অনুকরণ করতে নেই?"

দরবেশ মহোদয়ের রচনার অন্তঃ-সারশূন্যতা অপাঠ্য ভাষা ও ন্যাকামির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম কিন্তু তথ্যের বিকৃতি, মিথ্যা তথ্য-উদ্ভাবন ও বাংলাদেশের বাইরে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের পঠন পাঠনে যুক্ত তাঁদের প্রতি অক্ষম বিদ্বেষের পরিচয় পেয়ে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ নামে একটি বিভাগ আছে। সেই বিভাগে নটি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে মালয়ালাম একটি, বাংলাও একটি। যিনি মালয়ালাম শাখার পরিচালক, তিনিই বাংলা শাখার পরিচালক। অতএব "বাংলা বিভাগের" পক্ষে "মালয়ালম সাহিত্য বিভাগের" "অনুকরণের" প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর।

দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত কিশোর মাধবন নিমন্ত্রিত হননি। এ খবরটি মিথ্যা। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। শ্রীযুক্ত দরবেশ নিজস্ব কল্পনাশক্তির বলে আরো বলেছেন এবার ক্লাসে কিশোর মাধবনের কবিতা মালয়ালামের অধ্যাপক আলোচনা করবেন। মালয়ালাম ভাষায় দিল্লীতে এম-এ বা বি-এ পড়ানো হয় না। এখানে মালয়ালাম ভাষায় এক বছরের সার্টি-ফিকেট কোর্স আছে। কাজেই কোন ক্লাসে এই আলোচনা হবে? মালয়ালাম ভাষায় যাঁরা বর্ণ পরিচয় শুরু করবেন সেই ক্লাসে? আমি মালয়ালাম ভাষার অধ্যাপক সহকর্মী শ্রীযুক্ত ও এম অনুজনকে এই খবর দিলে তিনি শ্রীযুক্ত দরবেশের সংবাদ-উদ্ভাবনী কৌশলে চমৎকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়ত, "দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এমন হয়?" কী হয়? আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা? সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ? শ্রীযুক্ত দরবেশ মহাশয়ের অবগতির জন্য জানাই—হয়। কী হয় তার লম্বা তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা এম. এ সিলেবাস দেখলেই দেখতে পেতেন আধুনিক সাহিত্যিকরা পাঠ্যতালিকাভুক্ত কিনা! শ্রীযুক্ত শংকর কুরুপ, শ্রীযুক্ত উমাশংকর যোশী, শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখো-পাধ্যায় আমাদের বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, কবিতা পড়েছেন, কবিতা আলো-চনা করেছেন। গত ৮ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এই বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত দরবেশ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা বা নিমন্ত্রণ করাই যে কবিকে সম্মানিত করার একমাত্র পথ নয় তা জানি। কিন্তু সাংবাদিক প্রবর দরবেশ মহাশয়ের অপূর্ব সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেবার জন্য এই নীরস পত্রের অবতারণা করতে হল। সে জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

শিশিরকুমার দাশ
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী-৭

কুজনেৎসভের দেশত্যাগের কারণ

রুশ লেখক আনাতোলি কুজনেৎসভ কিছু দিন আগে লণ্ডনে বেড়াতে এসে হঠাৎ ব্রিটিশ সরকারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দারুণ শোরগোল তুলেছিলেন। বর্তমানে তিনি নতুন নাম নিয়েছেন এ আনাতোল এবং লণ্ডনের দি ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে তাঁর দেশত্যাগের প্রকৃত কারণ সবিস্তারে লিখেছেন। আমরা তার থেকে অংশ বিশেষ লেখকের নিজের জবানীতে এখানে তুলে দিলাম ঃ

"দশ বছর আগে আমি ছিলাম মস্কোর লিটারারি ইনস্টিটিউটের একজন অত্যন্ত অখ্যাত ছাত্র। একজন তরুণ যুবকের সাইবেরিয়াতে কাজ করতে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখে "ইউনোস্ট" পত্রিকায় পাঠালাম। (আমি নিজে সাইবেরিয়ার গৃহ নির্মাণ উদ্যোগে কাজ করেছি।) সাইবেরিয়ার জীবন কি রকম তা আমি হুবহু দেখাবার চেষ্টা করেছি, সেখানকার কষ্ট ও দারিদ্র্যের কথা সমেত— যদিও একজন তরুণের এই দৃঢ় বিশ্বাসও তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল যে অবস্থার উন্নতি একদিন হবেই—এবং একদিন এই সব ব্যাপার থেকে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে।

"ইউনোস্ট" পত্রিকার সম্পাদকরা আমার লেখাটি খুবই পছন্দ করেছিলেন। যদিও তাঁরা নিলেন, এটা প্রকাশ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! উপন্যাসটি ছাপা হলে কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটি বন্ধ করে দেবেন, আমাকে গ্রেফতার করা হবে—এবং লেখক হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সাইবেরিয়ার জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে দেখাতে হবে লেখার মধ্যে, যাতে তরুণ যুবকরা সেখানে গিয়ে কাজ করার প্রেরণা পায়।

"কিন্তু সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই যে, আমার উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে পশ্চিমের প্রচারবিদরা এটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তারস্বরে চেঁচাবে, "দ্যাখো দ্যাখো, এই একজন সৎ লেখক কি রকম সত্যি কথা লিখেছে—দ্যাখো, রাশিয়ার জীবন কি ভয়ংকর!"

"তাঁরা বললেন যে, এটুকু শুধু সম্ভব আমার উপন্যাস থেকে যদি কয়েকটি বিষণ্ণ এবং রূঢ় পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়া যায়—এবং সেখানে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা এবং কিছু শ্লোগান ঢুকিয়ে এতে কমুনিস্ট আশাবাদ ফুটিয়ে তোলা যায়, তা হলে ছাপা যেতে পারে।

"অভিজ্ঞ লেখকরাও আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, এটা করাই আমার পক্ষে উচিত। তাহলে আমার লেখার কিছুটা অংশও অন্তত পাঠকদের কাছে পৌঁছুবে। এবং রাশিয়ার পাঠকরা জানে ও বুঝতে পারে, একজন লেখক কতখানি সৎ বিশ্বাস থেকে লিখেছেন আর কতখানি কর্তৃপক্ষকে খুশী করার জন্য যোগ করেছেন। সবাই এরকম করে তাঁরা বললেন।

"কিন্তু আমি তা করতে রাজী হইনি। বেশ কিছু দিন উপন্যাসটা পড়ে রইলো। তারপর আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো কয়েকটা পরিচ্ছেদ লিখলাম—এবং সেগুলো এতই অবান্তর হলো এবং তার আশার বাণী এতই কৃত্রিম শোনালো যে কোনো পাঠকেরই সেটা মনে ধরতে পারে না। কিন্তু আমি তখন ছিলাম তরুণ ও অনভিজ্ঞ এবং সম্পাদকরা আমার সে উপন্যাসটিও, ছাপতে চাইলেন না।

"অন্তহীন যন্ত্রণার মধ্যে আমার দিন কাটছিল, আমি সবার সঙ্গে ঝগড়া করতাম, প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠছিলাম—শেষ পর্যন্ত মস্কো ছেড়ে চলে গেলাম। তারপর একদিন আমি হঠাৎ এক কপি 'ইউনোস্ট' পত্রিকা কিনে খুলতেই আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না! আমার উপন্যাসটা ছাপা হয়েছে! পত্রিকার স্টলে দাঁড়িয়েই আমি সেটা সম্পূর্ণ পড়ে ফেললাম —এবং পড়তে পড়তে আমার চুল খাড়া হয়ে গেল!

"আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, কে যেন

হিমালয়ের লোক প্রকৃতি

Land and People of the Himalayas: S. C. Bose: Indian publications, 3 British Indian Street Calcutta-1. : Price Rs. 30.00.

হিমালয় না থাকলে আজকের ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হত না। আমাদের সভ্যতা প্রধানত হিমালয়কেন্দ্রিক। কালিদাস, বিবেকানন্দ, নেহরু সবাই সাধ্যমতো হিমালয়-কীর্তন করেছেন। কিন্তু সেজন্যও নয়, দেশের মানুষের যুগ-যুগান্তের ধর্ম-বিশ্বাস, ভূমি-ব্যবস্থা, আধুনিক কালের জল বিদ্যুৎ প্রকল্প সবই এই হিমালয়কে ঘিরে। হিমালয়ের চেয়ে বড় পাহারাদার আর কেউ নেই, বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশ, শত্রুর আক্রমণকে রুখে দিয়ে অনন্তকাল অনিদ্র দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়। সবদিক থেকে হিমালয়ের গুরুত্ব অনেক; হিমালয়-রহস্য আমাদের আরো অনেককাল আচ্ছন্ন করে রাখবে। তবু এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভাসা-ভাসা। আধা ভ্রমণকাহিনী, আধা উপন্যাস জাতীয় এক ধরনের মনুমেন্দ লেখা থেকেই আমরা যেটুকু হিমালয় সম্বন্ধে জানতে পারি। অথচ এর এক প্রামাণিক, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক আছে।

কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় ক্যান্সারের প্রতিষেধক কুৎ-এর (কথাটা 'কুট' নয় দেখা যায়; স্থানীয় লোকেরা 'কুৎ'-ই বলে) কথা বেরিয়েছিল। এই আলোচক স্বচক্ষে দেখে এসেছে, মণ মণ 'কুট' বিদেশে যাচ্ছে রপ্তানী হয়ে। এইরকম আরো অজস্র গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল হিমালয়ের দিকে দিকে। বনবিভাগ এবং উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্ররা প্রচুর গবেষণা চালাচ্ছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস বহু রোগের প্রতিষেধক এক হিমালয়েই রয়েছে। ইতি-মধ্যে যে-সব ওষুধে হিমালয়ের গাছ-গাছড়া ব্যবহার করা হচ্ছে তার এক দীর্ঘ তালিকা দেখেছিলুম চৌবাটিয়ায়। তারপর, পশমের আড়ত হচ্ছে হিমালয়; এক এই ব্যবসা থেকে ভারত সরকার প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পান। আমাদের সেনাবাহিনীর লোকেরা হিমালয় অঞ্চলের কোথায় কোথায় কি দারুণ কষ্ট করে চলেছেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আছে গাদ্দোলী, গদ্দী, গুজ্জার আর পাহাড়ীরা, যারা জীবনধারার তাগিদে শুধু পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ায়। ঘর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পাল পাল ভেড়া নিয়ে তারা চলে যায় পীর পাঞ্জাল থেকে লাহুলে, কখনো বা আখউ-ঠাটু-এ। আমরা সমতলের লোকেরা তাদের সম্বন্ধে খুব কমই জানি। শুনলে অবাক লাগে, কিন্তু খবর

নিয়ে জেনেছিলুম, হিমালয় অঞ্চলে এখনো মহাভারতের কোন কোন লৌকিক রীতি-নীতি চালু আছে। যেমন, খুঁজলে বহু দ্রৌপদী মেলাও অসম্ভব নয়।

ডঃ সুবোধচন্দ্র বসু এক হিমালয় নিয়েই মেতে আছেন বহুকাল; সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় এই নেশায়। এ-সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সব সময় আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু আলোচ্য বইটি তেমন বড়সড় নয়, আস্ত হিমালয়কে এই পরিধিতে এঁটে ওঠা শক্ত। কিন্তু ডঃ বসু যেহেতু একই সঙ্গে ভূগোলবিদ্ এবং হিমালয়-সাধক সেহেতু সারা বইতে তাঁর যত্নের অভাব নেই। এই অল্প আয়তনের মধ্যেও হিমালয় অঞ্চলের উত্থান থেকে বিস্তৃতি, স্থানিক পরিবেশ থেকে স্থানীয় বেশভূষা, লোকাচার সবই যথাযোগ্য মর্যাদায় আলোচনা করেছেন। দুটি খণ্ড এবং তেইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বইটিতে আর বহু মানচিত্র, ফোটোগ্রাফিক অবদান—বিশেষত লেখকের নিজ থেকে হিমালয়ের গুরুত্ব সবই স্পষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। সংক্ষেপে হলেও লোক প্রকৃতি এতে উদ্ঘাটিত। আলোচনা গ্রন্থের দাম সাধারণত একটু বেশী হয়। তবু, এক্ষেত্রে বইয়ের তুলনায় দাম একটু বেশীই মনে হচ্ছে।

৩৭০।৬৮

উপন্যাস

কিংবদন্তীর নায়ক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। কথাশিল্প। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের চোখ দিয়ে সব

ফসলের মাঠ। ফসলের পাহারাদার ফকুলালরা, ধানকুড়ুনি মেয়েরা, গরু-মোষের মালিক গয়লারা, মাছচোর জেলনীরা, কৃষি-বিজ্ঞানী শরদিন্দু,—সবাই এই মাঠের সংগে নিজেদের অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়েছে। তাদের বেঁচে থাকার ও ভালবাসার কষ্ট ও সুখ নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী বোনা হয়েছে সন্দেহ নেই। তথাপি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন-রূপে উপস্থাপিত চন্ডিলিকার মাঠই মূলে থাকেন। বইটি পড়বার সময় এবং পাঠ শেষ করার পরও সেই বিপুল ফসলের মাঠ পাঠকের মন অধিকার করে থাকে। মনে হয়, সেই মাঠ যতটা জীবন্ত, ততটাই লেখকের সার্থকতা।

বাঙলা উপন্যাসের পটভূমি প্রসারিত করার সচেতন প্রয়াস বইটিতে প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। শহর ঘেঁষা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চেনামহল থেকে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চল ও সেখানকার মানুষ, বলা বাহুল্য, বাঙলা উপন্যাসে নতুন নয়, কিন্তু সারা রাত জেগে এবং দিনের বেলায় বিপুল মাঠের ফসল যারা পাহারা দেয় সেই জাগাল সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি বাঙলা উপন্যাসে নতুন। তবে এই নতুনের সংগে উপন্যাসটিতে সামগ্রিকভাবে মৌলিকতার প্রশ্ন জড়িত। এই প্রসংগে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, বইটিতে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকখানি উপন্যাসের প্রভাব বড় স্পষ্ট। একে হয়ত উত্তরাধিকার বলা ভাল।

লেখকের গদ্যরীতি লক্ষ্য করলে, বাক সংযমের অভাব, উচ্ছ্বসিত আবেগের স্রোত বিস্মিত করে। বিস্ময় অবশ্য কিছুটা কেটে যায় যখন ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস এবং দশ বছর আগের রচনা।

বইটিতে মালথাসের সংগে কয়েকবার মার্কসের নাম উচ্চারিত হয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত ভূমিকার কথা মৃন্ময়ী ও শরদিন্দুর সম্পর্কের মধ্যে শ্রেণী সমন্বয়ের ইংগিত রয়ে গেছে।

প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ—'অন্তিমের এক দ্বারকেশ' ও 'আমেন, আমেন'—উপন্যাসটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে দুটি সুন্দর ছোট গল্প মনে হয়।

১৭৮।৬৯

প্রাপ্তি স্বীকার

রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন। নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১, শংকর ঘোষ লেন কলিকাতা-৬। মূল্য ১৬·০০।

গিরিশ রচনাবলী (১ম খণ্ড)। সাহিত্য সংসদ : ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২০·০০।

পরলোকে মধু বসু

"বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" ছবির সেটে মধু বসু—এটাই তাঁর শেষ কাহিনীচিত্র

মধু বসু নেই। গত বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই নিদারুণ খবর। সেদিন কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড়বাদল। কিন্তু শহরের সংস্কৃতি-রাজ্যে ও চলচ্চিত্রলোকে আরও বড় এক দুর্যোগের মত এল এই মর্মান্তিক সংবাদ: মধু বসু নেই। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেকেই এলেন শ্রীবসুর কারনানি এস্টেটের বাসভবনে। ওই দিন সকালে তিনি ৬১ বছর বয়সে কয়েক মাস রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। নিঃসন্তান মধু বসুর মৃতদেহের পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু; নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী শ্রীমতী বসু তখন শোকে স্তব্ধ, কাঠের মত ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন মধু বসু (আসল নাম সুকুমার)। গানে অভিনয়ে একদিন সকলকে মাতিয়ে রাখতেন, খেলাধুলায় এগিয়ে যেতেন সকলের আগে। তার কিছুকাল পরেই কলকাতার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর আগমন ধূমকেতুর মত। নিজে অভিনয় করতেন, গান গাইতেন, নাটক প্রযোজনা করেছেন, সিনেমার পরিচালক হিসাবে তো স্বনামধন্য ছিলেনই—বহু গুণের আধার শ্রীবসু বাংলা সিনেমা ও নাটকের জগতে যে নতুন প্রাণের বন্যা এনে দিয়েছিলেন পুরনো আমলের রসজ্ঞ ব্যক্তিরা আজও তার সাক্ষ্য দেবেন।

ইংরেজীতে যাকে বলে "কালারফুল লাইফ", মধু বসুরও ছিল তাই। বিজ্ঞানের ছাত্র এলেন শিল্পের ক্ষেত্রে। নিজেই নাটকের দল গড়ে ফেললেন—"ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স" (সি-এ-পি)। মঞ্চে অভিনয় করলেন "দালিয়া" ও "আলিবাবা"। সি-এ-পি'র পরের নাটক "বিদ্যুৎপর্ণা", "ঘরে-বাইরে"। তাঁর ফিল্মের কাজ শুরু হয়েছিল আগে। ১৯২৬ সনে চলে যান বিলাত, সেখানে আলফ্রেড হিচককের সঙ্গে কাজ করেন কিছুকাল। তার আগে (১৯২৪ সনে) তিনি সিনেমায় ফটোগ্রাফারের কাজ করেছেন কিছুকাল। বিলাত থেকে ফিরে ছবি করলেন রবীন্দ্রনাথের "গিরিবালা" (নির্বাক)। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা এল "আলিবাবা"-র পর। ওই ছবিতেই তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বাংলা সিনেমার আরও কয়েকজন কৃতী চলচ্চিত্রকারের পাশে তিনি স্থান করে নিলেন। কিন্তু তবু তিনি যেন ছিলেন আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র—নিজস্ব মেজাজ, রুচি ও প্রাণপ্রাচুর্যে। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ত্রিশটি ছবি তিনি তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে "অভিনয়", "কুমকুম" ও "রাজনর্তকী" "ফিল্ম এন্টারটেনমেন্ট"-এর ধারাই প্রায় পাল্টে দিয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য উর্দু ছবি "সেলিমা"। পরবর্তীকালে "মাইকেল মধুসূদন", "শেষের কবিতা" ও "মহাকবি গিরিশচন্দ্র"-র স্রষ্টা মধু বসু বাংলার দর্শকদের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন।

বাংলা সিনেমা ও থিয়েটারে মধু বসুর

সাধনা বসু ও মধু বসু (১৯৬৬)

কাছে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের আরও অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। মধু বসুও তাঁদেরই একজন ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রমথনাথ বসু। মাতামহ ছিলেন ঔপন্যাসিক স্বর্গত রমেশ-চন্দ্র দত্ত। মধু বসুর মত শিল্পীরা নাটক-সিনেমাকে কী মর্যাদা দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়ত একদিন হবে। আজ অবশ্য তাঁর বর্ণময় জীবনের অনেক ঘটনাই জানা। তিনি নিজেই তা লিখে গেছেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে—"আমার জীবন"-এ। শ্রীবসু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে যে এসেছিলেন তা এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। আরও জানা যায় বাংলা সিনেমা ও থিয়েটারের একটি যুগের ইতিবৃত্ত, এবং তাতে শ্রীবসুর ভূমিকা। শ্রীবসু পরিচালিত শেষ ছবি "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ"। (১৯৬৪)।

শেষ জীবনে শ্রীবসু ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিনেমা কর্মী ও কলাকুশলীদের আন্দোলনের নেতৃত্বও তিনি করেছেন। এক কথায়, মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে চলচ্চিত্রলোকের নানা সমস্যার নিষ্পত্তির কাজে তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হত। উত্তরসূরীরা তাঁর উপদেশ ও সুপরামর্শের মূল্য দিতেন। শ্রীবসুর মৃত্যুতে আজ অনেকেই অভিভাবকহীন, বাংলা থিয়েটার ও সিনেমা বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত, বাংলা নাটক-সিনেমার পুরনো ও নতুন যুগের একটি যোগসূত্র আজ ছিন্ন।

"গুপী গাইন..."-এর আন্তর্জাতিক সম্মান

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি অ্যাডিলেড ও অকল্যান্ড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও মৌলিকতার জন্য সত্যজিৎ রায় পেয়েছেন দুটি পুরস্কার। তা ছাড়া ছবিটি পেয়েছে সিলভার ক্রস। প্রযোজক নেপাল দত্ত ভারতের চলচ্চিত্র প্রতিনিধি হিসাবে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

পুজায় "অগ্নিযুগের কাহিনী"

বাংলার বিপ্লবযুগের ভিত্তিতে তৈরি "অগ্নিযুগের কাহিনী" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে। ভূপেন রায় পরিচালিত এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, সুখেন দাস প্রমুখ শিল্পী। গোপেন মল্লিক সুররচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

'আলিবাবা' নাটকে মধু বসু ও সাধনা বসু

মন নিয়ে ও ননহা ফরিস্তা

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী [illegible] ভূমিকায় অভিনীত এস এম [illegible] "মন নিয়ে" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরি-চালনা করেছেন সলিল সেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী তরুণকুমার জহর রায়, নিমু ভৌমিক, রোমি চৌধুরী নমিতা বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পী।

টি নাগি রেড্ডির ননহা ফরিস্তা আসছে আগামী সপ্তাহে। ছবির সহজ মানবিক রসের কাহিনী জনসমাদৃত হবে বলে খবরে প্রকাশ। সংগীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী। লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে, মান্না দে ও কিশোরকুমার ছবির গানগুলি গেয়েছেন।

পঞ্চপ্রদীপ অভিনীত 'এরাও মানুষ'

নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা পঞ্চপ্রদীপ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ত্যাগরাজ হলে "এরাও মানুষ" (রচনা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) অভি[illegible] করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। সং[illegible] প্রথম প্রযোজনা হিসাবে "এরাও মা[illegible] অভিনয় ত্রুটিমুক্ত অবশ্যই ছিল না। [illegible] অভিনয়ের আন্তরিকতায় শিল্পীরা [illegible]দের খুশি করতে পেরেছেন। অজয় ব[illegible] পাধ্যায়ের নাট্য-পরিচালনাও [illegible] তিনি কমলের ভূমিকায় সু[illegible] করেছেন। রত্না দত্ত (অঞ্জলি), [illegible] রায় (অমিতা), চৈতালী [illegible] (মাধুরী), গৌরদাস গঙ্গোপাধ্যায় ([illegible] রূপককুমার ঘোষ (মিণ্টু), সুদীপ্তেন [illegible] (বিন্দুকাকা) প্রমুখ শিল্পীরাও [illegible] অভিনয় করেছেন।

প্রারম্ভে রঞ্জনা রায়ের [illegible] উপস্থাপনা হয়। নাটক অভিনয়ের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ [illegible] কুমার পাল পঞ্চপ্রদীপ সম্পর্কে উজ্জ্বল উন্নতি কামনা করেন।

রূপায় অভিনীত "দেবদাস"

[illegible]

শারদ অর্ঘ্য সংগীতানুষ্ঠা[illegible]

[illegible] কোম্পানির উদ্যোগে কণ্ঠশিল্পীদের [illegible] যে জলসা হয় তাতে এবার [illegible] বাড়ি আমন্ত্রিত হন।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর [illegible] আয়োজন হয়েছিল কলামন্দিরে। [illegible] গ্রামোফোন রেকর্ডে যে শিল্পীরা গান [illegible] কবিতা আবৃত্তি করেছেন তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেদিন আসরে। জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে [illegible] মিত্র ছিলেন অনুপস্থিত, অসুস্থতার [illegible] তিনি আসতে পারেননি। ধনঞ্জয় ভট্টা[illegible] হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপা[illegible] চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপা[illegible] মান্না, গুপ্ত, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] লালচাঁদ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, [illegible] মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগু[illegible] প্রমুখ শিল্পীরা পুজার গান শোনান। [illegible] সব্যসাচী করেন কবিতা আবৃত্তি। [illegible] পুজো এইচ-এম-ভি পুজো রেকর্ডে [illegible] নতুন শিল্পী হলেন : বিশ্বজিৎ, রুমা [illegible] ঠাকুরতা ও রাণু মুখোপাধ্যায় (হেম[illegible] কুমারের কন্যা)।

[illegible]

[illegible] দেবী [illegible]দের কাছে [illegible] আর অজানা নয়। [illegible] নির্মলেন্দু চৌধুরী এই [illegible] বাড়-বাড়ীর [illegible] লোকসংগীতে ভারত সরকারের [illegible] আনবেন। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীত কতখানি আয়ত্ত করেছেন তার পরিচয় মিলেছে গত ২৪ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে লোক-ভারতীর বর্ষপূর্তি-অনুষ্ঠানে।

নৃত্যগীত-অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে প্রবীণ লোকসংগীতশিল্পী শ্রীসুরেন্দ্র চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র এবং বস্ত্র উপহারের পর সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীচক্রবর্তী বলেন,

"একদা সংগীতময় ছিল পল্লীবাসীর জীবন। ধর্মে, কর্মে নানা অনুষ্ঠানে সংগীতই ছিল নিত্য সাথী। সংগীত-প্রিয় বাঙালীকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্ত করতে হলে আবার তাঁকে সংগীতের কাছেই টেনে আনতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অপরাপর সংগীত অপেক্ষা লোকসংগীতই জনমানসকে সহজে স্পর্শ করে এবং প্রভাবিত করে"। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম-বাংলার সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীভট্টাচার্য বাংলার লোকসংগীতের সমস্যা ও ঐতিহ্যের কথা বলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় আবেদন জানান, লোকসংগীত যেন বিদ্রোহের সুরে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত লোকভারতীর শিল্পী গীতা চৌধুরী ও গৌরী ভট্টাচার্যকে এবং নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্যকে সম্মান জানানো হয়। পরিশেষে লোকভারতীর তরফ থেকে সকলকে ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ।

ভূপেন রায় পরিচালিত "অশ্বত্থের কাহিনী"-তে দিলীপ রায়—ছবিটি মুক্তি আগামী সপ্তাহে

অনুষ্ঠানে প্রায় সব কয়টি গানই ছিল সম্মেলক। নির্মলেন্দু চৌধুরী উদাত্ত কণ্ঠে গান শুরু করেন, সহশিল্পীরা তাতে যোগ দেন। প্রথমে একটি উদ্দীপক গানের সঙ্গে সম্মেলক নৃত্যের ভিতর দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা। তারপর একে একে গান ও নাচ সহযোগে পরিবেশিত হয় বৌ-নাচ, ছাদ-পেটা, গাজি, মাঝি, বেদে-বেদেনীর গান প্রভৃতি। নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকেই লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গ পরিকল্পিত। নাচ ও গান দর্শকদের মুগ্ধ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। এবারের বৈশিষ্ট্য আরও বেশী প্রকাশ পেয়েছে নৃত্যনাট্য পরিবেষণের আঙ্গিকে। মাঝিদের গানের সময় অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েন নানা দিকে। মঞ্চে যিনি গান ধরলেন, তারই গানের সুর ও রেশ ধরে হলঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে একাধিক শিল্পীর কণ্ঠে গান ধ্বনিত হয়ে ওঠে। নদীর বুকে একজন মাঝি গান ধরে, অনেক দূরে ওই গানেরই রেশ ধরে গান ধরে অন্য মাঝি—নদীর বুকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ভিতর দিয়ে সুরের যে মায়াজাল সৃষ্টি হয় তারই চিত্রটি শহরের প্রেক্ষাগৃহে অনেকখানি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন লোকভারতীর শিল্পীরা। নদীবক্ষে মাঝিদের গান গেয়ে তরী বেয়ে চলার সেই চিত্রটি দর্শকের মনে যেন মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেছে। অবাক করেছে বেদে-বেদেনীদের নাচ-গানের দৃশ্যটি—

লোকভারতীর অনুষ্ঠানে (বাঁয়ে) ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত গৌরী ভট্টাচার্য, (মাঝখানে) বেদে-বেদেনীদের নাচ (ডাইনে পরিচালক নির্মলেন্দু চৌধুরী

ফটো:—দেশ

নৃত্যের ভঙ্গিমা অদ্ভুত স্বাভাবিক, তেমনি তাঁদের বেশভূষা। বেদের ঝাঁপির ভিতর থেকে হঠাৎ করে সাপ যেমন ফণা উঁচিয়ে ওঠে তেমনি হঠাৎ ওই ভঙ্গিতে (যেন সত্যিকারের সাপ) আঁকা-বাঁকা, সর্পিল গতিতে হঠাৎ ফণা উঁচিয়ে উঠলেন এক শিল্পী। দর্শক ওই মুহূর্তে রোমাঞ্চিত।

নৃত্যপরিচালনার কৃতিত্ব শম্ভু ঘোষের, সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও সংগীত পরিচালনা নির্মলেন্দু চৌধুরীর। দরদ ভরা কণ্ঠে গান গেয়েছেন (নির্মলেন্দু চৌধুরী ছাড়া) গীতা চৌধুরী, বলাই চক্রবর্তী, সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পী। নৃত্যপরিবেশক শম্ভু ভট্টাচার্যও একাধিক নৃত্যাংশে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাপস সেনের আলোক-সম্পাতও চমৎকার। সব মিলিয়ে লোক-ভারতীর লোকগীতি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান দর্শককে দু' ঘণ্টার জন্য মুগ্ধ করে রেখেছে।

সাধন গুহ ও শীলা গুহ মমুয়ার একটি দৃশ্যে নাচলেন। আরও নাচ তাঁদের ছিল। শিল্পী যুগলের নৃত্যকুশলতার পরিচয় আবার নতুন করে পেলেন দর্শকরা। সেই সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন।

শঙ্কর মুখার্জি পরিচালিত 'অহল' চিত্রের নায়িকা আশা পারেখ—ছবির মুক্তি আসন্ন

"কমললতা" এ-সপ্তাহে

শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র "কমললতা"-র মুক্তি এ-সপ্তাহেই হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। "শ্রীকান্ত"র চতুর্থ-পর্বের কমললতার চরিত্রের শিল্পী সুচিত্রা সেন, শ্রীকান্ত হয়েছেন উত্তমকুমার। গহর সেজেছেন নির্মলকুমার। হরিসাধন দাশগুপ্তের পরিচালিত এ-ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র সদনে "ছিটমহল"

আগামী ৬ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্র সদনে তরুণ অপেরার শিল্পীরা "হিটলার" অভিনয় করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শম্ভু বাগ রচিত এবং শান্তিগোপাল অভিনীত (নাম ভূমিকায়) "হিটলার" ইতিমধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

দক্ষিণী
বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব

আগামী ১২ অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটায় 'ত্যাগরাজ হলে' দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে শ্রীশৈলজা-রঞ্জন মজুমদার ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের যোগ্যতা-পত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে।

বোম্বাই বিচিত্রা

সেদিন এক সান্ধ্য মহফিলে কয়েকজন চলচ্চিত্র সাংবাদিকের সঙ্গে প্রায় আচমকা কিছু সিরিয়াস কথাবার্তা হয়ে গেল। বম্বেতে প্রায় এক যুগ থেকে আছি, ফলে এই সাংবাদিকদের অধিকাংশকেই চিনি। প্রাণে ভালভাবেই চিনি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মনের কোন এক নিভৃত কোণে চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনী বা চিত্রনাট্য লেখার অভিলাষকে সযত্নে লালন করেন। কিন্তু সুযোগ, সামর্থ্য এবং সৌভাগ্যের প্রতিকূলতায় এঁরা শেষ পর্যন্ত চিত্র-সাংবাদিক হয়ে গেছেন। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রচার বিভাগের সঙ্গে যাঁদেরই যোগাযোগ, তাঁরা সকলেই উদ্ভাবনী শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। এঁদের সকলেরই তিলকে তাল এবং তালকে তিল করার ক্ষমতা অসামান্য। এক কথায়, এঁদের গল্প বানানোর যোগ্যতা আছে। চলচ্চিত্রের সংবাদ ছাপার মহলে বিচিত্র মশলা সহযোগে খবর পরিবেশন করবার জন্য এঁদের নামী, দামী তারকা ও সঙ্গীত নির্দেশকের সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎকার করতে হয়। আর ঘন ঘন সাক্ষাৎকারের কল্যাণে কৃচিৎ কদাচিৎ উক্ত মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ঘটে যায় অনিবার্য কারণে। এবং এই ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে এঁদের কাহিনীকে ছবি করে চিত্র-নির্মাতাদের চিন্তাও জাগে। ফলে প্রযোজক বনাম সাংবাদিকের মধ্যে চড়চড় করে চড়া দেয়। বিশেষজ্ঞদের গভীরে ডুব দিলে আরো অনেক কথাই বলা যায়। সুতরাং বাকিটা পাঠকের কল্পনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এখন ওপরের ভূমিকা থেকে এটা অন্তত জানা যাবে যে, চিত্র-সাংবাদিকদের মধ্যে কোথাও না কোথাও সুপ্ত কাহিনীকার, চিত্র-নাট্যকার বা প্রযোজক সাংবাদিকতার আড়ালে আত্মপ্রকাশের সুযোগের প্রতীক্ষা করছে। এই প্রতীক্ষার সঙ্গে প্ল্যানিং চলছে সামর্থ্যমত। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, চিত্র-সাংবাদিকতা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য অন্য কিছু। অবশ্য সকলের সম্বন্ধেই এসব খাটে না।

সান্ধ্য মহফিলের আলোচনায় ফেরা যাক এবার। এক নবীন আদর্শবাদী সাংবাদিক সেদিনের সেই সান্ধ্য বৈঠকে এক প্রশ্ন তুলে আমাদের সকলকেই যৎপরো-নাস্তি বিস্মিত করে তুলেছিলেন। নবীনের বক্তব্য ছিল যে, বম্বের চলচ্চিত্র-সাংবাদিকতা নিতান্তই বাজে এবং তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বম্বের সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ করেন না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্দেশিত সংবাদ সরবরাহ করেন, এবং হাতে হাতে পাওয়া সংবাদকেই কখনো একটু আধটু হেরফের করে বা কখনো হুবহু সেই অবস্থাতেই সাংবাদিকরা পরিবেশন করেন পাঠকদের কাছে। নবীনের দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা অতীব অন্যায় কাজ। এই ধরনের কাজ যাঁরা করে থাকেন, তাঁরা আর যাই হোন, সাংবাদিক পদবাচ্য নন। নবীনের এই উগ্র মন্তব্যে উপস্থিত অনেকেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, কারণ, এই সত্য কথনের তেজের ছিটেয় অনেকের গায়েই ফোসকা পড়ার কথা। নবীনকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, তিনি 'চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা' বিষয়ের ওপর গবেষণা করছেন এবং সেই সঙ্গে ফ্রীলান্স সাংবাদিকতাও। আসছে বছর উক্ত গবেষণার ফল এক থীসিস হয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জমা পড়বে। শ্রোতারা আশ্বস্ত হলেন। কারণ, 'ছোকরা এখনো ছাত্র'। 'অধ্যয়নের সময় এমন আদর্শ অবশ্যই আচরণীয়'। 'শেখার সময় সব শিখতে হবে, ঠিক যেমনটি শেখা উচিত', 'কিন্তু কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর ঠিক তেমনটি করতে হবে, যেমনটি করলে চাচার আপন প্রাণ বাঁচে।' এলোমেলো এই ধরনের উক্তির পর আবার আলোচনা একটা সিরিয়াস 'টার্ন' নিলো যখন যুবক প্রশ্ন করলেন যে, বর্তমান চিত্র-সাংবাদিকতার এমন অবস্থা কেন হল, সেটা জানার চেষ্টা করলে কেমন হয়। তার উত্তরে একজন বললেন যে, চিত্র-সাংবাদিকতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে একটা সূক্ষ্ম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অন্যজন বললেন, সবই সময়। আর-একজন বিরক্ত

সত্যজিৎ রায়-কৃত "অরণ্যের দিনরাত্রি" ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও কাবেরী বসু
ফটো—দেশ

যাদুকর প্রদীপ সরকার—জুনিয়র সরকার—(বাঁয়ে) গত ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব ঘোষণা অনুসারী বাক্সবন্দী হয়ে বংগোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—ডাইনের বাক্সটিতে ছিল খালি. জলে তারই ভিতর বন্দী হয়ে ছিলেন যাদুকর পাঁচ থেকে দশ মিনিট—তারপর বহু আশঙ্কিত ব্যক্তির দুর্ভাবনার মধ্যে সকল বন্ধন মোচন করে তিনি ভেসে উঠলেন
ফটো—দেশ

তারে বললেন, এই ধরনের আলোচনা একটা বিড়ম্বিতজ্ঞান, কমপিটিশনের ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছি আর উনি এসেছেন লেকচার ঝাড়তে। প্রায় প্রাজ্ঞ (কিন্তু পরাজিত) একজন বললেন, দেখছ বাবা, তোমরা দু'দিনের যোগী, পান্তাকে, বলো পেরসাদ, সাংবাদিকতারও আর একটা নাম জীবিকা সঞ্জাত জীবিকার পেছনেই একটা করে পেশা থাকে, সুতরাং নিজেদের প্রতি কোনরকম ভক্তকতা না করে এসো চিত্র-সাংবাদিকতাকে আমরা ব্যবসা বলি। পেশা থাকলেই বাজার থাকবে আর বাজার থাকলেই ক্রেতা থাকবে, বিক্রেতা থাকবে, ডিম্যান্ড থাকবে, সাপ্লাই থাকবে। আমরা যারা আজকাল কিছু পপুলার পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এঁটে আছি, নামকরা সাংবাদিক এবং আমাদের সংখ্যা কম। আমাদের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে যাঁদের সংবাদ পরিবেশিত হয়, তাঁদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশী। সুতরাং 'উই আর ইন ডিম্যান্ড' সেইজন্যে আমরা পরিশ্রম কম করি খবরের খোঁজে যাই না, খবর আমাদের খোঁজে আসে এবং লাইন লাগিয়ে প্রতীক্ষা করে। এই রকমই চলবে, যতদিন আমাদের ডিম্যান্ড থাকবে।' নবীন প্রশ্ন করল: "আপনাদের ডিম্যান্ড, তবু আপনারা যা করা উচিত, তা করছেন না কেন? চিত্র-সাংবাদিকতাকে প্রশ্বের করে তুলতে চেষ্টা করছেন না কেন? প্রাজ্ঞের উত্তর: "চিত্র-সাংবাদিকতাকে প্রশ্বের করতে গেলে নিজেদের প্রশ্বের করে তুলতে হবে। সাংবাদিকতা কী জানতে হবে। সময় নেই। তবু যদি এ অসাধ্য সাধন করা যায় তাহলে যাঁদের সংবাদ পাঠকদের কাছে পরিবেশন করে থাকি, তাঁরা এক টেলিফোনে চাকরি খেয়ে দেবে। আমরা বর্তমানে ইমপরট্যান্ট কিন্তু অপরিহার্য নই। নামী কাগজের সাংবাদিক বলে আমি দামী। কাগজের সারকুলেশনের জন্য আমার দাম। কাগজ চলে, তাই চলি। আমার জন্য কাগজ চলে না। সুতরাং........!"

সরল শর্মা

"শাপমোচন" নৃত্যনাট্যাভিনয়

শিল্পী গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে এবার রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" মঞ্চস্থ হয়। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত নির্দেশনায় এবং সুধাংশু পালের নৃত্য-তত্ত্বাবধানে "শাপমোচন" গানে ও নাচে বেশ উপভোগ্য হয়। নৃত্যে মহিলা শিল্পীরা যোগ দেন। অরুণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় যথাক্রমে শক্র দাস ও জয়শ্রী ভট্টাচার্য এবং গানে সুধাংশু পাল ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইরা রায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

শাপমোচনের আগে সুভাষ বসু রচিত একাঙ্ক নাটক "মিছিল" অভিনীত হয়।

মৃণাল সেন পরিচালিত চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির "ইচ্ছাপূরণ" (রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে) ছবিতে সুরজিৎ নন্দী

'ত্রিনয়না মা' ছবির সংগীত গ্রহণ

অনিল বাগচীর সুরে গত সপ্তাহে "ত্রিনয়না মা" ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়। শ্যামল গুপ্ত রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখার্জি। এ মাসের শেষ সপ্তাহে মান্না দে এবং সন্ধ্যা মুখার্জির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হবে। ছবিটির পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী।

শচীমাতার সংসার ছবির শুটিং শুরু

পরিচালক ভূপেন রায়ের নতুন ছবি "শচীমাতার সংসার"-এর শুটিং শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবির কয়েকটি গান টেক করা হয়েছিল। "শচীমাতার সংসার"-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অনন্ত চ্যাটার্জি। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসীমকুমার, সন্ধ্যারানী, মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, দিলীপ রায়, শমিতা বিশ্বাস ও তরুণকুমার। ছবিটির পরিবেশক এস বি ফিল্মস।

নিউ এম্পায়ারে 'অজাতক'

এন বি এন্টারপ্রাইজের জনপ্রিয় নাট্য-প্রযোজনা "অজাতক" (রচনা: সন্তোষ-কুমার ঘোষ) আবার অভিনীত হচ্ছে নিউ এম্পায়ারে, ৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায়। দুই চরিত্রের এই নাটকের শিল্পী নিরু ভৌমিক ও মমতা চট্টোপাধ্যায়। নাট্য-নির্দেশনা অশোক মিত্রেও সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রয়েছে মঞ্চে। সংগীত পরিচালনা করছেন। ভাস্কর মিত্র। আলো ও মঞ্চ পরিকল্পনায় রয়েছেন যথাক্রমে স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও সুরেশ দত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি জামসেদপুরে এই নাটকাভিনয় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শ্যাডো মুভীজ-এর "সন্যাস্তরাজ" (পরিচালনা: পূর্ণেন্দু বাগচী) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও অজিতা চট্টোপাধ্যায়

মরক্কোর রাবাত শহরে ঐসলামিক শীর্ষ সম্মেলন বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুখ্যত জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদের অগ্নিকান্ড সম্পর্কে আলোচনার জন্য মরক্কোর রাজা এবং সউদি আরবের রাজা রাবাত-এ এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ৬৫ কোটি এবং তন্মধ্যে ৪৫ কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে ২৫টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ১৪০০ বৎসরের মুসলিম ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। ভারত যোগ দিলে পাকিস্তান এই সম্মেলন বর্জন করবে—এই হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে ভারতকে বাদ দিয়েই প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন বসে। অবশেষে সউদি আরবের রাজা ফয়জলের প্রস্তাবে ভারত আমন্ত্রিত হয়েছিল। অবশ্য ভারতকে বাদ দিলে আলজিরিয়া ও সংযুক্ত আরবও সম্মেলন বর্জনের হুমকি দিয়েছিল। সম্মেলনে আরব চরমপন্থীরা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানায়। পাকিস্তানের হুমকিতে সম্মেলন বানচাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আপস রফার প্রস্তাব হিসাবে ভারতীয় প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষক হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিতে বলা হলে প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। ইজরায়েলের আরবভূমি জবর দখলের বিরুদ্ধে ঐসলামিক রাষ্ট্রগুলিকে সংহত করাই এই সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। ২২ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন আরম্ভ হয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর শেষ হয়।

দেশী সংবাদ

২২ সেপ্টেম্বর—আজ রাণীগঞ্জের অমর-নগর সিলেকটেড কোলিয়ারিতে দুই দল শ্রমিকের প্রচণ্ড সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হন। সমগ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা গুরুতর। ওখানকার অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ। পুলিস-টহল চলছে। এই কয়লাখনিতে ১৬০০ লোক কাজ করে। তার মধ্যে ৯০০ জন সি পি এম সমর্থক।

মধ্যপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি বাসে করে যাওয়ার সময় ৩৪ জন যাত্রী আজ জলে ডুবে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বাসটি গোয়ালিয়র থেকে ভূপালে যাওয়ার পথে বন্যায় স্ফীত পার্বতী নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ে। বেসরকারী খবরে জানা যায় বাসের ৭০ জন যাত্রীই মারা গিয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর—চণ্ডীগড় ও চাকলা-নাগাল্যান্ডে [illegible] জানা যায় সেজন্য আকালী দল কর্তৃপক্ষ ও [illegible] ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে আকালী দল সন্ত ফতে সিংকে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ক্ষমতা দিয়েছেন। আকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটি আজ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন।

আজ সন্ধ্যায় ইম্ফলের পোলো ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের সময় একদল লোক মণিপুরের জন্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দাবি করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিস তাদের উপর কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। ফলে তিনজন নিহত এবং ৩০ জন আহত হন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এখানকার কর্মসূচী বাতিল করে দিয়েছেন। শহরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি করা হয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রশাসিত মণিপুরের আট মাসের পুরানো মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের ৯ জন সদস্য বিরোধী পক্ষে যোগ দেওয়ায় মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে। ৩০ জন সদস্য-বিশিষ্ট বিধান-সভায় এক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা ১৯—১১ ভোটে গৃহীত হয়।

দীর্ঘ সাড়ে নয়ঘণ্টা আলোচনার পর আজ

রাত ১টা নাগাদ মহাকরণে শ্রমমন্ত্রীর কক্ষে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের বিরোধের অবসান হয়। এ-সংক্রান্ত চুক্তিপত্র আজ স্বাক্ষরিত হবে।

২৫ সেপ্টেম্বর—ডঃ শিপ্রা মুখোপাধ্যায় পরাগের রেণু থেকে কৃত্রিম উপায়ে আস্ত একটি ধানের চারা সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান জগতে এর নজির নেই। পরাগের একটি রেণু থেকে চারা সৃষ্টি এতদিন অসম্ভব ছিল।

আজ বাংলা মন্ত্রিসভা স্টেটবাস এবং ট্রাম কর্মীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্টেটবাস কর্মীরা অতঃপর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সমান হারে মহার্ঘভাতা পাবেন। ট্রামকর্মীরা পাবেন তাঁদের বর্তমান মহার্ঘ ভাতা থেকে ১০ টাকা করে বেশী। দুটি ক্ষেত্রেই এই বর্ধিত হার ১ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে।

২৬ সেপ্টেম্বর—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, রাজ্যগুলির জন্য মোট বরাদ্দ (৩৫০০ কোটি টাকা) বেশ কিছু না বাড়ালে তাদের বিশেষ করে সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে চতুর্থ যোজনা শেষ করা সম্ভব হবে না।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সি পি আই সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন : ওরা বুর্জোয়াদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। শোধনবাদীরা চিরকালই এইভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও সি পি আই (এম) প্রসঙ্গে বলেছেন : আসলে ওরা মাওবাদের নীতি নিয়ে এগোতে চান; সেটাকে ঢাকার জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুৎসা রটাচ্ছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর—শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সংসদ সদস্য ও সিন্ডিকেট নেতা শ্রীকে কামরাজ সম্পর্কে চক্রান্তের অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ [illegible] শ্রীকামরাজ শ্রীচবনকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি (চবন) যদি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অপসারণ করার জন্য সিন্ডিকেটকে সমর্থন করেন তা হলে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী করা হবে।

নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে আজ স্থির হয় যে, বর্তমানে কলকাতা বোম্বাই [illegible] যে রেশন ব্যবস্থা রয়েছে তা চালু থাকলে তবে ক্রেতাদের গমের জন্য বেশি দাম দিতে হবে, কারণ বেশি দামেই গম খাওয়াতে [illegible] হচ্ছে।

২৮ সেপ্টেম্বর—বাংলায় [illegible] আজ [illegible] দুটির নিম্নাঞ্চল [illegible] বন্যায় [illegible] গিয়েছে। তিনটি বাড়ি [illegible] বাসী এলাকায় বহু বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। এদিন মুষলধারে বৃষ্টি [illegible] হয়নি।

[illegible] ১ [illegible] এক চরমপত্র দিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২২ সেপ্টেম্বর—[illegible] চীনা মুখপাত্র বলেন, [illegible] প্রথম [illegible] উপর [illegible]

২৫ সেপ্টেম্বর—[illegible] নির্বাচিত [illegible] জন [illegible] ঘোষিত হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর—[illegible] একটি [illegible] ছিল।

২৬ সেপ্টেম্বর—[illegible] বলিভিয়ার প্রধান সেনাপতি [illegible] প্রেসিডেন্ট সিলিনাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে [illegible] ভিয়ায় এক নতুন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বলিভিয়া সেনাবাহিনীর জেনারেল [illegible] বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করা হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর—চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট লুডভিক সাবোদা আজ প্রধানমন্ত্রী ওলড্রিচ সার্নিক ও [illegible] সরকারের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করেছেন। পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরই প্রেসিডেন্ট সবোদা শ্রীসার্নিককে নতুন [illegible] গঠনের দায়িত্ব দেন।

২৮ সেপ্টেম্বর—সংযুক্ত আরব [illegible] সংস্কৃত, হিন্দী এবং [illegible] শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি [illegible] চেয়ার" স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ ॥

শিশু ও কিশোর পাঠ্য

লীলা মজুমদারের

নেপোর বই ৩॥

সুখলতা রাও-র

নূতন নূতন গল্প ২,

গল্প আর গল্প ৪॥
দুই ভাই ২॥
সোনার ময়ূর ২॥
বনে ভাই কত মজাই ২,
কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

মন্মথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুরদার ঝুলি ৪॥
ঠাকুরমার ঝুলি ৪॥
কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥
দাদামশাইয়ের থলে ৪॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥
বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন
১ম—৩, ২য়—৩,
দেশবিদেশের লেখাপড়া ১,

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কঙ্কাবতী ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও
সুমথনাথ ঘোষ সম্পাদিত

ঐতিহাসিক গল্প সঞ্চয়ন (নূতন মুদ্রণ) ৩॥

আশাপূর্ণা দেবীর

সেই সব গল্প ৬॥

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মজুতকর বিরল

গান্ধীজীবনী ১॥

নূতন বই

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

ত্রিনয়ন ৪,

বিমল করের উপন্যাস

সঙ্গিনী ৪,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মুক্তোসম্ভবা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

কন্যাকুমারী

নির্মলকুমারী মহলানবিশের

কবির সঙ্গে য়ুরোপে ১০,

বাসুদেব বসুর

নেফা, সুন্দরী নেফা ৪॥

লীলা মজুমদারের

সুকুমার রায় ৪॥

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গান্ধীজীর গঠন কর্ম ৪॥

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫॥

মহাত্মা গান্ধীর

গান্ধীরচনাসম্ভার

১ম খণ্ড—৫, ২য় খণ্ড—৫,

মহাত্মা গান্ধীর

আমার ধর্ম ৫,
আমার স্বপ্নের ভারত ৪॥
ছাত্রদের প্রতি ৫॥
সত্যাগ্রহ ৭,

শারদীয়া কথা-সাহিত্য অন্যান্য বারের মতো এবারও সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইতেছে।

॥ মূল্য তিন টাকা ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

রাজাউজীর ৮,

নলিনীকান্ত সরকারের

হাসির অন্তরালে ৬,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

গৌরাঙ্গ পরিজন ১০,

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ৮,

শচীন্দ্রলাল রায় অনূদিত

জাহাঙ্গীর নামা ৮,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যাত্রাগানে রামায়ণ ৯,

ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

গান্ধী পরিক্রমা ১৫,

ডঃ রাধাকৃষ্ণন, রাজাগোপালাচারী, বিনোবা ভাবে, কালেলকর, কৃপালনী, সতীশ দাশগুপ্ত, রতনমণি চট্টো, বিজয় ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, রেজাউল করিম, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ভূপেন দত্ত, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রমথ বিশী, ভবানী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টো, দিবাকর, ঢেবর, হুমায়ুন কবির, অরুণ গুহ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অন্নদা দত্ত, নির্মল কন্দ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ ৫০ জন চিন্তাবীরের মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন।

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৬১২ ৩৪-৮৭৯১

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
জীবনে গান্ধীর ভারত দর্শন—	...	১০৬৯
ব্যঙ্গচিত্র—	...	১০৭০
দৃশ্যপট—শ্রীনারায়ণ গুপ্ত	...	১০৭১
রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য—	...	১০৭৩
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	১০৭৪
লন্ডনের জার্নাল—	...	১০৭৫
নির্বোধ—শ্রীনিশীথ দে	...	১০৭৭
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী	...	১০৮৭
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	১০৯১
জীবন যে-রকম—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০৯৩

বলতে পারিস্,
মায়ের
বাজার ফর্দে
প্রথম নামটি
কি?
কুসুম
ছাড়া
আবার কি!
KUSUM
VANASPATI
খেতে ভালো আর পুষ্টিকর
—এমন খাবার রাঁধতে হলে চাই
কুসুম
বনস্পতি
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর ... ১০৯৯

বাঙলার চালচিত্র—শ্রীআবদুল জব্বার ... ১১০৩

আর্থিক ভারত—শ্রীসুব্রত গুপ্ত ... ১১১৩

পারাপার—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ১১১৫

পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ... ১১২৩

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন ... ১১২৫

অদূরের দিল্লী—দরবেশ ... ১১২৯

ক্যানাডার চিঠি—শ্রীনীলাদ্রি চাকী ... ১১৩৫

আলোচনা— ... ১১৪১

সাহিত্য সংবাদ—শ্রীসনাতন পাঠক ... ১১৪৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পুস্তক পরিচয়—	...	১১৪৭
খেলার মাঠে—একলব্য	...	১১৪৯
ব্যাডমিণ্টনের আইনকানুন—মুকুল	...	১১৫১
অরণ্যদেব—	...	১১৫২
রঙ্গজগৎ—	...	১১৫৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	১১৬০

প্রচ্ছদ : শ্রীজ্যোতিকান্ত চক্রবর্তী

এখন পাবেন পুরোপুরি জল শুষে নেবার মত তোয়ালে:

ডি সি এম-এর ফ্লিমগ্লো তোয়ালে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনার গা থেকে প্রতিটি বিন্দু জল শুষে নেয়—কারণ, অতি চমৎকার শুষে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন সূক্ষ্ম তুলোর মিশ্রণে এই তোয়ালেগুলো হয়ে ওঠে প্রচণ্ড পিপাসার্ত! আর, টেকেও অনেক বেশীদিন। ফ্লিমগ্লো তোয়ালে সুন্দর সুন্দর রঙে এবং অপরূপ রকমারি ডবি ও জ্যাকার্ড ডিজাইনে পাবেন। পৃথিবীর ৬০টি দেশে তাইত' ছড়িয়ে পড়েছে ওদের অকুণ্ঠ প্রশস্তি।

ডি সি এম স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন

প্রিয়পছন্দ শোভন জুতো
সব মেজাজের সকল সাজে
সমান শোভন
Bata

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫০
শনিবার ২৫ আশ্বিন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষান্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৭.৫০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষান্মাসিক „	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	—	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩১.০০
ষান্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 11 Oct 1969

সীমান্ত গান্ধীর ভারত দর্শন

গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকীর শুভ মুহূর্তে আমরা এমন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে এদেশের মাটিতে অভ্যর্থনা করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারছি যিনি গান্ধীজীর আর-এক প্রতিমূর্তি; আমাদের কাছে যিনি সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত। গান্ধীজীর এমন যোগ্য শিষ্য—কী জীবন সাধনায় কী বা আদর্শে আর বড় দেখি না। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক বাদশা খাঁ বা খাঁ আবদুল গফফর খাঁ আজকের দিনের ভারতবাসীর কাছে প্রায়-বিস্মৃত পুরুষ হয়ে এসেছেন; অথচ ইনি যে স্বাধীনতা যুদ্ধের কত বড় সৈনিক ছিলেন তা আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি ভারত ভূমি ত্যাগ করেন, তখন পাকিস্তানের জন্ম হয় নি। তিনি ভারত ছেড়ে চলে যান পাখতুনদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। সে-সংগ্রাম এখনও চলছে।

বাদশা খাঁর ভারতে আগমন আমাদের পক্ষে প্রিয়জনকে পাওয়ার মতন। অবশ্য তিনি মাত্র দু মাস ভারতে থাকবেন। প্রধানত গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্যে তিনি ভারতে এলেও সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে আসেন নি। তিনি এসেছেন শান্তি, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শ নিয়ে, আমাদের মধ্যে সেই আদর্শের কথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিতে।

এদেশে দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে তিনি কী দেখছেন? বাদশা খাঁর নিজের কথায়: 'এদেশের মানুষ গান্ধীজীর শিক্ষা ভুলে গেছেন।' কাজেই তিনি ব্যথিত হয়ে বলেছেন, গান্ধীজীর শিক্ষা যারা ভুলে গেছে তারা তাঁর কথা শুনবে এ বিশ্বাস তাঁর কী করে হতে পারে! গান্ধীজীর পথ থেকে সরে আসার এমন ভ্রান্তি দেখে সত্যিই তিনি উদ্বিগ্ন, ব্যথিত।

একথা বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, প্রায় আশি বছর বয়সের এই বৃদ্ধ মানুষটি আজ ভারতে এসে কী কী দেখতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এই মানুষ নবাগত নন—বা ইনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আদর্শ, আশা-ভরসার কথা জানেন না। তিনি সবই জানেন, কেননা তিনি বাইরের লোক ছিলেন না। অথচ আজ—বাইশ বছর পরে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তিনি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছেন তাঁদের স্বপ্নের ভারতের মূর্তি এটা নয়। এখানে আজ রাজনীতির সর্বপ্রকার কলুষতা প্রবেশ করেছে, দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস্য হিংসার চেহারা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা! এই কী সেই ভারত যার জন্যে গান্ধীজী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন? স্বভাবতই সীমান্ত গান্ধী যে বেদনা ও আঘাত অনুভব করতে পারেন তা আমরা হয়ত অনুমান করতে পারব। কিন্তু ওই মানুষটির প্রকৃতিই এমন যেখানে রূঢ়তা, অবিনয়, মালিন্যের কোনো স্থান নেই। মুখে তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নি, শুধু ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার কিছু পরে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিন দিনের জন্যে। এ অনশন কেন? ভারতে যে ঘৃণা ও হিংসাত্মক পরিবেশ দেখা দিয়েছে তার প্রতিবাদে এবং গান্ধীজীর পথ জনসাধারণ বর্জন করেছেন—এই ক্ষোভে। বাদশা খাঁ স্পষ্টই বলেছেন যে, তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্যে এখানে আসেন নি, আসেন নি পাখতুনিস্তানের আন্দোলনে ভারতের সাহায্য চাইতে; তিনি এসেছেন গান্ধীজীর শিক্ষা ভারত-বাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে। মহাত্মাজীর স্মৃতি এবং ভারতের জনসাধারণের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে এদেশে টেনে এনেছে।

দুঃখের হলেও একথা হয়ত বলা যায়, সীমান্ত গান্ধীর ভারত দর্শনের পর তাঁর স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। তবু তিনি গান্ধীবাদী—তাঁর আশা এত দুঃখেও ভাঙার নয়। হয়ত তিনি তাঁর স্বপ্নপূরণের আশা নিয়েই আবার ফিরে যাবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাঁকে আশ্বাস দেবার কিছু কী থাকবে? মৌখিকভাবে হয়ত থাকবে, কার্যত হয়ত কিছুই নয়।

ভারতের বহু মানুষ আজ সীমান্ত গান্ধীকে সশ্রদ্ধায়, সাদরে অভ্যর্থনা করেছে, করবে। এই অভ্যর্থনার মধ্যে ফাঁকি বোধ হয় নেই, ভাবপ্রবণতা কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই অভ্যর্থনা থেকে একটি জিনিস বেশ বোঝা যায়: যদি ভারতে বাদশা খাঁর অনুরূপ আদর্শবান মহান কোনো নেতা দেখা দেন ভারতের জনসাধারণ তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

দয়া করে আমারে অর্থদপ্তরসহ
মন্ত্রীত্বটা ফিরিয়ে দিন।

শরতের অনিশ্চয়তা

কেন যেন পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরৎ কালটা তেমন ঠিক সহ্য হয় না। শরতের হাওয়া গায়ে লাগলেই কেন যেন এ সরকারের বিপদ ঘনিয়ে আসে। কেন যেন এ রাজ্যের নায়করা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

১৯৬৭-র কথা ভাবুন। ২ অক্টোবর কাটল, কিন্তু নভেম্বর মাসটা আর পার হওয়াই গেল না। অজয়বাবু যদি বা একেবারে শেষ মুহূর্তে ফিরলেন, ডঃ ঘোষ এবং অধ্যাপক কবিরকে কেউই আর ফেরাতে পারলেন না।

এবারও যেন সেই শরতের হাওয়া গায়ে লাগতে না লাগতেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভিত কেঁপে উঠেছে। আবার ঠিক সেবারের মত গোপন চলাফেরা শুরু হয়েছে, ঠিক তেমনি প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে আবার সেবারের মত চাপা গুঞ্জন উঠেছে—টিকবে তো সরকার! তাবৎ দিল্লি কলকাতা ছোটাছুটি শুরু হয়েছে।

এবার আর সেবারে অবশ্য দু'টিক ফারাকগুলি তফাৎ আছে। সেবার বিধানসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৭; এবার মাত্র ৫৫। সেবার বিকল্প মন্ত্রিসভা হতে পারত এবং হতে পেরেছিল অতি সহজেই; এবার বিকল্প সরকার গঠন অত্যন্ত কঠিন। সেবার কারুর চোখের সামনেই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল ছিল না; এবার রয়েছে।

কিন্তু এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও, পরিস্থিতি এত ভিন্ন হলেও শরৎ আসতে না আসতেই গোপন চাঞ্চল্য বন্ধ রীতি বেড়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সেবারের মত গোপনে গোপনে নানা পরিকল্পনা রচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। নেতারা প্রকাশ্যে যা বলছেন পর্দার আড়ালে ঠিক তার উল্টো পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিপদ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

জনগণ দূরের কথা, ফ্রন্টের নেতারা সকলেও তাঁদের এই বিপদের কথা জানেন না। দু'একজন সবটা জানেন, কেউ কেউ কিছুটা শুনেছেন, অনেকেই আবার কিছুই জানেন না। কিছু আবার এমনও আছেন যাঁরা অনেক শুনেও সামান্যও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আমার কাছে কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার,—ফ্রন্ট সরকারের বিপদ খুব দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

এইভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসার জন্য কিন্তু ফ্রন্টের কয়েকটি শরিক দল এবং কয়েকজন নেতাই বিশেষভাবে দায়ি। এবার গোড়া থেকেই পরিস্থিতি তাঁদের অনেক অনুকূলে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এবারের এই সাত মাসেই তাঁরা যে কর্মতার পরিচয় দিয়েছেন, সেবারের মোট নয় মাসেও মানুষকে ততটা হতাশ করে তোলেন নি। এবার খাদ্য পরিস্থিতি ভাল, ঘেরাও-র আতংক তেমন নেই বললেই চলে এবং বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা ভাবতেই হচ্ছে না। এবার সেবারের তুলনায় কাজও হয়েছে অনেক বেশি। কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর যথেষ্ট আর্থিক লাভ হয়েছে, বহু সহস্র একর বেনামী জমি উদ্ধার পেয়েছে।

কিন্তু এবার যেটা সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে সেটা হল ওদের নিজেদের হানাহানি। প্রতিদিনই যেন শারীরিক মারামারি লেগে আছে, প্রতি সপ্তাহেই একাধিক রাজনৈতিক এবং অন্য রাজনৈতিক খুনের খবর আসছে। এত বৈঠক হচ্ছে, এত কথা হচ্ছে, এত রফা হচ্ছে, এত প্রস্তাব হচ্ছে—কিন্তু সংঘর্ষ, খুনোখুনি যেন কিছুতেই কমছে না, থামছে না।

থামছে তো নাই এবং ওকে নিজেরও যেন থামাতেই চাইছেন না। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে যেসব খবর আসছে তার মূল সুর একই—যে যতটা পারছেন তৈরী হচ্ছেন যে যেমন পারছেন সমাজ বিরোধীদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে দলগত শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন এবং শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণকে সশস্ত্র করার নামে প্রত্যেক দলই একে অপরের বিরুদ্ধে নিজের লোকদের অস্ত্র-সজ্জিত করে তুলতে চাইছেন।

প্রত্যেক দলই প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে দলগত স্বার্থে সরকারী ক্ষমতা অপ-ব্যবহারের অভিযোগ আনছেন। ওরা নিজেরাই বলছেন, দফতরগুলি যেন মন্ত্রীদের দলগত খাসতালুকে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে সবচেয়ে মজার স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়েছে আর এস পির কাছ থেকে। অতি সম্প্রতি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "আমরা প্রত্যেকেই দলগত স্বার্থে দফতরগুলি ব্যবহার করছি।" দলগত স্বার্থে দফতরগুলি চলছে এই কথা অনেকে শুনিয়েছে এবং কিছুটা দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের মনেও ধারণাটা প্রায় বদ্ধমূল গিয়েছে। ফলে অবস্থাটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, পুলিসের কোনও সাহায্য চাইতে হলেই অনেকে সি পি আই (এম)-এর লোক খোঁজেন; তেমনি ফ্ল্যাটের জন্য ধরতে যান সি পি আই'র লোক, হাসপাতালের কাজের জন্য আর এস পি'কে পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাপয়েনটমেন্টে ফরওয়ারড ব্লককে, শিল্প লাইসেনস পেতে বাংলা কংগ্রেসীকে।

এত গেল প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনার কথা। রাইটার্স বিল্ডিংসের আনাচে কানাচে বা রাজনৈতিক মহলের গোপন আলাপ-আলোচনায় কান পাতলে শোনা যায় আর একটা ভয়াবহ জিনিস—সেটা হল টাকার খেলার কাহিনী। বিচিত্র একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে : প্রত্যেক পার্টিই মনে করছেন অন্যদল প্রচুর টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাঁরা প্রায় খোলা-খুলিই আলাপ-আলোচনা করেন। শুধু, একটা জিনিস স্বীকার করেন না, সেটা হল তাঁর বা তাঁদের দল কি করছে। ভিন্ন দলের অর্থ উপার্জনের যে কোনও কাহিনীতেই কিন্তু প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন।

এই ব্যাপারটা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে আজ যে জিনিসটা একটু আড়ালে আবডালে চলছে কাল সেটা প্রকাশ্যে আসবেই। এবং প্রকাশ্যে যে মুহূর্তে একটি অভিযোগ আসবে সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা একেবারে কেরলের মত হয়ে দাঁড়াবে। দেখা যাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন। যেমন এখন এখানে শোনা যাচ্ছে দলীয় স্বার্থে দফতর পরিচালনার অভিযোগ বা সমাজবিরোধী ও প্রাক্তন কংগ্রেসীদের নিয়ে দলগত শক্তি বৃদ্ধির নানা কাহিনী।

একদিকে যখন এই পারস্পরিক হানাহানি কাটাকাটি, অন্যদিকে তখন কিন্তু পশ্চিম বাংলার মৌলিক সমস্যাগুলি যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই থেকে গিয়েছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বেড়েই চলেছে, বেকারী বর্ধমান, জনজীবনে দুর্নীতির প্রচণ্ড প্রভাব অব্যাহত এবং আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতা যথাপূর্ব জাগ্রত। কেউ আশা করে না, একদিনে বা একমাসে বা এক বছরে কোন সুরাহা হবে। কেউ মনে করে না, ফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই ভেবে-ছিলেন ফ্রন্ট সরকার একটা কিছু করার চেষ্টা করবেন। অন্ততঃ কাজে হাত দেবেন। কিন্তু হতাশ হয়ে সাধারণ মানুষ দেখছেন, তেমন কোনও চেষ্টা পর্যন্ত নেই—ফ্রন্টের কোনও বড় শরিকের, অর্থাৎ যাঁরা তা করতে পারেন, যেন তেমন ইচ্ছাও নেই।

*

এই অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ যতটা হতাশ ও আতঙ্কিত তার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত ও হতাশ যুক্তফ্রন্টেরই নায়ক। এই কথাটা শুনে হয়ত অনেকে আশ্চর্য হবেন। কিন্তু এ মূল্যায়ন বাস্তব সত্য। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ যতটা আতঙ্কিত, আশংকিত ও চিন্তান্বিত আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনে কোনওদিন তাঁকে তেমনটি দেখিনি।

কতকগুলি সত্য যুক্তফ্রন্টের বহু নেতাই ভুলে যান। প্রথম সত্য : অজয়বাবু এখনও যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রধান ঐক্য সূত্র। আজ যদি অজয়বাবু সরে দাঁড়ান তাহলে জ্যোতি-বাবু যতই বড় দলের বড় নেতা হোন নিরঙ্কুশ কোনও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন তাঁর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব কাজ। সাত মাস আগেও ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দল জ্যোতিবাবুকে যে চোখে দেখতেন আজ তা দেখেন না। ওঁদের অনেকের চোখেই আজ জ্যোতিবাবু শুধু সি পি আই (এম)-এর নেতা। অজয়-বাবুকে কিন্তু এখনও কেউ শুধু বাংলা কংগ্রেস নেতা বলে মনে করেন না।

দ্বিতীয় সত্য : অজয়বাবু নাম্বুদ্রিপাদ নন। অজয়বাবু গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী নন। তেভাগা সংগ্রাম, শ্রেণী বিপ্লব, সর্বহারা একনায়কত্ব প্রভৃতি কথাগুলিতে অজয়বাবুর কোনও আস্থা নেই। এমনকি ওঁদের দলের [illegible] যে কোনও [illegible] প্রেম মনে করেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকার [illegible] দশকের মধ্যে যে কোনও মূল্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখার [illegible] অজয় মুখোপাধ্যায় একা [illegible] অজয়বাবু চান যুক্তফ্রন্ট [illegible] একটি সৎ এবং পরিচ্ছন্ন সরকার চালাতে। তিনি চান সৎ সরকার সুশৃঙ্খলিত থাকুক এবং দেশের মানুষের ভাল হোক। মন্ত্রীদের কেউ যেন সহজে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান—অজয়বাবু এই নীতির ঘোরতর বিরোধী। নাম্বুদ্রিপাদ বা সি পি আই (এম) যে দৃষ্টিতে কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দেখেন, অজয়বাবু বা তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস সে দৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টকে দেখেন না। যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুপক্ষের বিচার সমান নয়। অজয়বাবু বরং এখনও প্রধানমন্ত্রীর মতই মনে করেন, অজয়বাবুরা সরে গেলে কংগ্রেসই শ্রেষ্ঠ দল—জনগণও তখন কংগ্রেসকেই চাইবে।

তৃতীয় সত্য : অজয়বাবু একবার একটা জিনিস ভাল বুঝলে সে পথে এগোতে সামান্যও ভয় পান না। সবাইকে ছেড়ে একা এগিয়ে যেতে পারেন। যেমন গিয়ে-ছিলেন কংগ্রেস ছাড়ার সময়।

অজয়বাবু যদি আবার তেমনি মনে করেন, একা সবাইকে ছেড়ে কংগ্রেস ফিরে যেতে পারেন।

অজয়বাবু চলে গেলে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকবে কি?

নবারুণ গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতা ঘোর বিপ্লবী কমরেড জ্যোতি বসু ২ অকটোবর রাণীগঞ্জে বণিক সভা এবং খনি-মজুরদের বিশাল জনসভায় যে নিরখাসা দুখানি ভাষণ দিয়েছেন, সে দুটি এক দিকে বুর্জোয়া মালিক সম্প্রদায় ও অন্য দিকে বিপ্লবী শ্রমিক সম্প্রদায়, এই উভয়েরই যুগপৎ স্বেদ কম্প হর্ষ ও পুলক সঞ্চার করবে। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, চিন্তার মৌলিকত্ব বিষয়ে কমরেড জ্যোতি বসু "আবোলতাবোল"-এর প্রখ্যাত কবি সুকুমার রায়েরই মারকসবাদী সংস্করণ। অভিনব চিন্তার উদ্ভাবক হিসাবে 'সুকুমার রায় এবং কমরেড জ্যোতি বসু একে অন্যের যে কতটা নিকট প্রতিবেশী, তার প্রমাণ নিচের এই তুলনামূলক উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে।

কমরেড জ্যোতি বসুর রাণীগঞ্জের (বণিক সভার প্রদত্ত) ভাষণ : "যুক্ত ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে এমন কিছু নেই যাতে মালিকরা ভয় পেতে পারেন।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ৪২) :

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না
তোমায় আমি মারব না—
সত্যি বলছি কুস্তি করে
তোমার সঙ্গে পারব না।

কমরেড জ্যোতি বসুর বণিক সভার ভাষণ (রাণীগঞ্জ ২ অকটোবর) : "সেই ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে মালিকরা সহযোগিতা করবেন অথবা বিরোধিতা করবেন তা জানা দরকার।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ঐ) :

মনটি আমার বড় নরম,
হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব
এমন আমার সাধ্য নেই।

কমরেড জ্যোতি বসু (বণিক সমাবেশে, ২ অকটোবর) :

"ব্যক্তিগতভাবে আমি কমিউনিস্ট। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্ট নানা দল নিয়ে গঠিত। সেখানে কমিউনিস্টরূপে আমি যা চাইব, তা পেতে পারি না।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল পৃঃ ঐ) :

মাথায় আমার শিং দেখে ভাই
ভয় পেয়েছ কতই না—
জানো না মোর মাথার ব্যারাম,
কাউকে আমি গুঁতোই না।

কমরেড জ্যোতি বসু (বণিক সমাবেশে, দিন ঐ) :

"নতুন সরকারের আমলে মালিকদের যা ন্যায়সঙ্গতভাবে দেওয়া কর্তব্য তা যেন তাঁরা শ্রমিকদের দিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ঐ) :

এস এস গর্তে এস,
বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর করে শিকেয় তুলে
রাখব তোমায় রাত্রিদিন।

কমরেড জ্যোতি বসু (শ্রমিক সমাবেশে, ভাষণ রাণীগঞ্জ ২ অকটোবর) : "কারখানার শ্রমিকেরা তাঁদের পাওনা আদায়ের জন্য ধর্মঘটের দিকে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় মালিকরা কেন আলোচনায় বসছেন না? তাঁদের (মালিকদের) সমস্যা থাকলে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ঐ) :

হাতে আমার মুগুর আছে
তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হালকা এমন
মারলে তোমায় লাগবে না।

কমরেড জ্যোতি বসু (শ্রমিক সমাবেশে) : "মালিকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থাকে স্বীকার করে নেন। তাঁদের জানা প্রয়োজন যুক্ত ফ্রন্ট সরকার জনতার সরকার। তাই মেহনতি মানুষের ন্যায্য পাওনা যেন বিনা সংঘর্ষে তাঁরা মিটিয়ে দেন। নইলে মেহনতি মানুষ সংগ্রাম করবেন এবং তাঁদের ফ্রন্ট সরকার মদত দেবেন।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ঐ) :

অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে?
ধরব নাকি ঠ্যাং দুটো?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে
বুঝবে তখন কাণ্ডটা।

কমরেড জ্যোতি বসু (শ্রমিক সমাবেশে, দিন ঐ) : "যুক্ত ফ্রন্টে অনেক দল, মতবিরোধ আছে। কিন্তু লাঠির জোরে তার মীমাংসা করা চলবে না।"

সুকুমার রায় (আবোলতাবোল, পৃঃ ঐ) :

আমি আছি, গিন্নী আছেন,
আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব
মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

"রোজ রোজ ধর্মঘট ও হরতাল চাই না। চাই পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠুক, উৎপাদন বাড়ুক, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্ম-সংস্থান হোক।"—কমরেড জ্যোতি বসু, রাণীগঞ্জ, ২ অক্টোবর।

শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থ

ওঁদের (অর্থাৎ সি পি এম-এর) কাছে "তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম" অর্থ তীব্র শরিকী বিরোধ।—কালকেতু সেন, সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ২।

দেবরাজ

ক্ষণবসন্ত

কম্যুনিস্ট দলের সভাসমিতি এখন দেশে দেশে হামেশাই হচ্ছে। তা নিয়ে দলের বাইরে লোকে বিশেষ মাথা ঘামায় না, বিদেশে তো নয়ই, দেশেও নয়। চীন আর রুশিয়ার কথা অবশ্য আলাদা, কেন না তারা হচ্ছে কম্যুনিস্ট দুনিয়ার দুই মহানায়ক। ইদানীং ব্যতিক্রম হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়া। বসন্তের যে ছোঁয়াচ সেখানে লেগেছিল গেল বছরের শুরুতে, তাকে ঢেকে ফেলেছিল শীতের ঘন কুয়াশা আট মাস না পেরুতেই। তবুও তার আমেজ বুঝি পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি আজও। রুশিয়া আর পূর্ব ইউরোপে তার অনুগামী চারটি দেশের সেনা সামন্তেরা চেকোস্লোভাকিয়াতে কম্যুনিজমকে বাঁচাবার ছুতো করে যেদিন সে দেশের ভেতর ঢুকে পড়েছিল সে দিনই সেখানকার নব যুগের সূচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দফায় দফায় কম্যুনিস্ট দলের বৈঠক বসেছে। আর একে একে সেই ক্ষণবসন্ত নাটকে যাঁদের ছিল প্রধান ভূমিকা তাঁদের বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে। তার নায়ক ডুবচেককে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসানো হয়েছে মাস পাঁচেক আগে হুসাককে, যিনি মস্কোর ঠিক পেয়ারের লোক না হলেও তার বিরোধীও নন।

তখন থেকেই রটেছিল ডুবচেকের খোয়ারের ওই শেষ নয়, কপালে তাঁর আরও অনেক দুঃখ আছে—মান তো তাঁর যেতে বসেছে, যেটুকু আছে তাও থাকবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো জান নিয়েই টানাটানি হবে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় পর্ষদের যে বৈঠক বসেছিল তার ওপর তামাম দুনিয়ার নজর ছিল এই জন্যে হয়তো বা ডুবচেক আর তাঁর সহধর্মীদের ভাগ্য ওখানেই ঠিক হয়ে যাবে। হুসাকের হাতে ক্ষমতা আসার পরই তিনি নিন্দে করেছেন ডুবচেকের নীতির, অভিযোগ করেছেন তাঁর ভুলের দরুনই চেকোস্লোভাকিয়ার বুকের ওপর বসে আছে ওয়ারশ চুক্তি জোটের দেশগুলির সৈন্য সামন্ত। তিনি তো তবু খানিকটা রেখেঢেকে বলেছেন। যারা সাবেকী কট্টর কম্যুনিস্ট উগ্র মস্কোভক্ত তারা বলতে কিছু বাকী রাখেনি। ডুবচেককে তারা বলেছে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী, বিপথগামী নেতা এবং শেষ পর্যন্ত দেশদ্রোহীও। পার্টির কেন্দ্রীয় পর্ষদে তাঁর গর্দান নেওয়ার হুকুম না হলেও অমনি একটা কিছু হবে এই ছিল লোকের বিশ্বাস। তা অবশ্য হয়নি। ক্ষমতার সিঁড়িতে তাঁকে ঠেলে আরও কয়েকটি ধাপ নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তাঁকে জেলে পোরা কিংবা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। গোড়ায় তাঁকে দলের পয়লা নম্বর সচিবের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবারে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের অধ্যক্ষের পদ আর দলের প্রেসিডিয়াম থেকে। সে সংসদের সদস্য কিন্তু তিনি রইলেন আর পার্টির সদস্য তো বটেই। কেন্দ্রীয় পর্ষদের তরফ থেকে বলা হয়েছে কমরেড ডুবচেক বিস্তর ভুল করলেও তাঁকে শোধরাবার আর একটা সুযোগ দেওয়া হলো। কেননা নেতারা তাঁর ওপর আস্থা এখনও হারাননি। তাঁদের আশা ডুবচেকের মতিভ্রম দূর হয়ে যাবে, তিনি ভুল পথ ছেড়ে ঠিক পথে আবার ফিরে আসবেন। আপাতত জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে কোনও একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁদের আছে। সে কাজ যে কী ধরনের হবে তার কোনও আশ্বাস দেওয়া দরকার বলে তাঁরা মনে করেননি।

চাবুক একা ডুবচেকের পিঠের ওপরই পড়েনি, পড়েছে তাঁরই অন্তরঙ্গ আর অনুগামীদের ওপরও। অনেকে অবশ্য তোবা তোবা বলে নিজের ভুল কবুল করে রেহাই পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পড়েন প্রধানমন্ত্রী চার্নিক। এত টালমাটালের মধ্যে তিনি তাঁর গদি বজায় রাখতে পেরেছেন। বলতে গেলে হুসাকও ওই দলে পড়েন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের বৈঠকে অন্তত জনাবিশেক মানবিক কম্যুনিজমে বিশ্বাসী নেতাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কারুর নাম কাটা গিয়েছে প্রেসিডিয়াম থেকে, কারুর পার্টির কেন্দ্রীয় পর্ষদ থেকে, কারুর বা চেক অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভা কিংবা আইনসভা থেকে, আবার কারুর স্লোভাক অঙ্গরাজ্যের সরকার কিংবা পরিষদ থেকে। এঁদের জায়গায় যাঁদের নেওয়া হয়েছে তাঁরা সকলেই গোঁড়া রুশপন্থী, উদারতা কিংবা মানবিকতার ধার তাঁরা ধারেন না। কী যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা কিংবা আইনসভা, কী অঙ্গরাজ্য দুটির মন্ত্রিসভা কিংবা আইনসভা সর্বত্রই পুরোনো দিনের উগ্রপন্থীরা ফিরে এসেছেন। গোটা চেকোস্লোভাকিয়া আবার দিব্যি মস্কোর তাঁবে এসে গেছে।

রুশীরা যেমন কলকাঠি নাড়ছে তেমনই চলছে সব কিছু বিগতবসন্ত চেকোস্লোভাকিয়াতে। তবুও যাই যাই করেও সে বসন্তের রেশ এখনও যায়নি। অন্তত রুশীদের তাই বিশ্বাস। নইলে তারা এমন পা টিপে টিপে চলতো না, এত আস্তে আস্তে এগুতো না। চেকোস্লোভাকিয়ার উগ্র মস্কোভক্তদের কেউ কেউ চেয়েছিলেন ডুবচেক আর তাঁর দলবলকে হাজির করা হোক আদালতে, হোক তাঁদের বিচার। তাঁদের যদি কঠিন সাজা হয় তা হলে মানবিকতার ভূত চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্টদের কাঁধ থেকে চিরদিনের জন্যে নেমে যাবে, দ্বিতীয় ডুবচেক সেখানে কখনও আর দেখা দেবে না। চেক পার্টির নেতা শীমানের এই ছিল মত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি মস্কোপন্থীদেরও অনেকে। ভাসিল বিলাকের মত কট্টর কম্যুনিস্টও ওতে সায় দেননি। মস্কোও বিস্তর বিবেচনা করে মধ্যপন্থাই বেছে নিয়েছে। কী ডুবচেক, কী স্মরকোভস্কি কাউকেই চরম শাস্তি দেওয়া হয়নি, বিচারের আয়োজনও কারুর হয়নি। ছুনোপুঁটি ছাড়া বুই কাতলা কাউকে আপাতত জনরোষের বঁটিতে কাটতে ক্রেমলিন দেখা যাচ্ছে নারাজ।

তাই বলে চেকোস্লোভাকিয়াতে দুঃখপর্বের এই শেষ পালা নয়। ১৯৬৮ সনের আগস্টেই রুশীরা বুঝতে পেরেছে জোর যার মুলুক তার বটে কিন্তু "মুলুকীরা" তার নয়। চেকোস্লোভাকিয়ার মনের মানুষ এখনও ডুবচেক আর তাঁর অনুগামীরা, রুশীদের বাধ্য হাতের পুতুল তারা নয়। বিদ্রোহ অবশ্য দেশ জুড়ে দেখা দেবে না, দিলে গত বছরের আগস্টেই দেখা দিত। কিন্তু যদি পনেরো আনা লোকই মনেপ্রাণে সরকার বিরোধী হয়—তা হলে শাসনের ঠাট থাকে, সুশাসন চলে না। বাড়াবাড়ি বেশী হলে তো দেশে কম্যুনিজমেরই ভিত্তি টলে যাবে। এমনিতে তো ওয়ারশ জোটের অভিযানের পর থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার আর্থিক দুরবস্থার আর শেষ নেই। রপ্তানি কমছে, আমদানি বাড়ছে, বিদেশী মুদ্রার তহবিলে টান পড়েছে। শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতেও। গোটা দেশই যদি গুম হয়ে থাকে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য চলে কেমন করে?

চে গুয়াভেরার মৃত্যুর তারিখ বৈদেশিকীতে ভুল বেরিয়েছে। ওটা হবে অক্টোবর ৮ ১৯৬৭, আগস্ট ৮ নয়।

'অযাচিত উপদেশ'

কেবল কলম ধরে লিখতে শুরু করেছি : শিলাই নদীর ওপর বিদ্যাসাগর সেতু তো হল, কিন্তু কলকাতা-মেদিনীপুরের বড়ো রাস্তাটা থেকে বীরসিংহা যাওয়ার পথটার কী হবে? সেটা আমি যা দেখেছিলুম—

এই পর্যন্ত লিখতেই কে যেন কানের কাছে চাপা গলায় বললে, 'খুব হয়েছে,

মস্তো মাছ কিনে নাও। ভেরী দখল ন্যায় কি অন্যায় সে ব্যাপারে নাক গলানো কেন বাপু?

তোমাকে আর পণ্ডিতী করতে হবে না। তুমি কে হে বাপু?'

বেশ তো ধমকটা যে দিলে, গলার স্বরেই আমি চিনতে পারলুম তাকে। সে লোকটা আমার ভেতরেই থাকে, প্রায়ই অকারণে মুরুব্বিয়ানা করতে চায়—যদিও তাকে বিশেষ পাত্তা দিই না আমি। সে আমার শ্রীমান বিবেক।

উত্তরে বললুম, 'আমি একজন কমনম্যান। সব ব্যাপারেই আমার মতামত দেবার মৌলিক অধিকার রয়েছে। আর সে অধিকার ভারতীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত।'

চুপ করো—বেশি বোকো না। তোমার মতামতের কী মূল্য হে? একটা ভোট দিতে পারো, মিছিলের সঙ্গে একটা গলা মিলিয়ে দিতে পারো। আলাদা করে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই—কেউ তোমার কথা শুনতে যাচ্ছে না। আসলে বাঙালী চরিত্রই ভেতর থেকে রাত দিন কুটুর-কুটুর করে কামড়াচ্ছে তোমাকে। অযাচিত উপদেশ না দিলে তোমার পেটের ভাত—আই মীন পেটের রুটি—সেটাই তুমি বেশি খাও—হজম হচ্ছে না। এই তো সেদিন কোন্ একটা ইংরিজি কাগজে চিঠি লেখবার জন্যে মুসাবিদা করছিলে—এখনো পাঠাও নি, কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিলে, কিন্তু তার পেছনে কী মতলব ছিল তোমার? উপদেশ দিতে যাচ্ছিলে কিনা?'

'উপদেশ মানে? একটা নিউজে কী ছাপা হয়েছে' জানো?' —আমি চটে বললুম, 'লিখেছে, লখনউয়ের কে'ন্ এক দৌড়বাজ ছিচল্লিশ মিনিট ক'সেকেণ্ডে এক হাজার ছ'শো কিলোমিটার দৌড়ে স্থানীয় রেকর্ড ভেঙেছেন। এক হাজার ছ'শো কিলোমিটার ছিচল্লিশ মিনিট দৌড়ে! সুপারসোনিক স্পীড কোথায় লাগে এর কাছে। কটা প্লেন যেতে পারে ছিচল্লিশ মিনিটে কলকাতা থেকে দিল্লিতে? ইয়ার্কি পেয়েছ? এ সব যা তা ছেপে—'

'দ্যাখো সুনন্দ, সব ব্যাপারে নেংটি

—গরীব মজুরদের এক্সপ্লয়েট করে আপনার ঠাকুর্দা রোয়াক বানিয়েছিলেন তাই এখন এই জবর দখল

ইঁদুরের মতো তুমিই বা নাক গলাতে যাও কেন? কয়েক লাখ লোক ওই কাগজটা পড়ে। তারা জানে, মিটারের বদলে কিলো মিটার ছাপা হয়েছে, কেউ কিছু মাইণ্ড করেনি, কোনো প্রতিবাদ করেনি। তুমি কে হে বাপু নিউজ এডিটরকে উপদেশ দেবার? যাকে চাকরি করছ তাই করো—স্রেফ জীবনটাকে দেখে যাও এবং মেনে যাও।

চাঁদা দিয়েছ বেশ করেছ। কিভাবে চাঁদার টাকা খরচ করব সে উপদেশ না দিলেও চলবে

একালে কে কার উপদেশ শুনতে চায় হে? এই তো গত কাল গান্ধীজীর শতবার্ষিকী গেল, তাঁকে তোমরা বলো "জাতির জনক", কিন্তু তাঁর কোন্ উপদেশটাকে কাজে লাগালে? রবীন্দ্রনাথের স্বর এখনো তোমাদের চারদিক ঘিরে সমুদ্রের মতো গর্জাচ্ছে, কান পেতে কোনোদিন তা শোনো? তুমি কোন্ এক কাঁটা ঝাড়ের ঝিঁঝি পোকা —শুধু ঝাঁ ঝাঁ করে লোকের মাথা ধরিয়ে দেবে! ভালো চাও তো চুপ করে যাও—নইলে একদিন ঠাণ্ডানি খেয়ে—'

ধমকে বললুম, 'থামো—' সে লোকটা মুচকি হেসে থেমে গেল। কিন্তু যা লিখতে যাচ্ছিলুম, বেমালুম গুলিয়ে দিলে তাকে। হুঁ, অযাচিত উপদেশ। কে চায়, কেনই বা চাইবে? একালে প্রত্যেকেই আত্মসচেতন, স্বয়ং উপদিষ্ট। কে কার কড়ি ধারে?

এই তো দিন কয়েক আগে। আমার বাড়ির কাছে কিছুদিন ধরেই থাকেন এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক। লোকটিকে চিনি,

ঠিক মাঝপথে বৃষ্টি নামলো। আর একটু জোরে হাঁটলে বাসে কিংবা ট্রামে উঠে পড়তে পারতো। কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল নির্মল। শেষ পর্যন্ত গাড়ি-বারান্দার নিচে আরও অনেকের সঙ্গে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক'দিন ধরে বৃষ্টি নেই। সারা শহর যেন দাবদাহে হাঁসফাঁস করছিল। স্বস্তি, নগরবাসী ক্ষণিকের মুক্তি পেল। মুষল ধারে বৃষ্টি নেমেছে। পাশের মেয়েটাকে লক্ষ্য করে ছেলেটা বলছিল, তুমি না থাকলে আমি বাসে উঠে যেতুম। যা গরম! খুব ভিজতে ইচ্ছে করছে।

নির্মলেরও বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগে। ছেলেবেলায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বইখাতা জামার তলায় নিয়ে কতদিন ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজেছে। কিন্তু এখন আর পারে না। বন্দনার জন্যে পারে না। না, শুধু বন্দনার জন্যে নয়। অনেকের জন্যে, অনেক কিছুর জন্যে পারে না। নির্মল নিজেই সংশোধন করে নিল।

বন্দনার কথা ভেবে জল-কাদা, ঘামের দাগ, বাসের ধুলো বাঁচিয়ে চলতে হয়। অফিসের জামা কাপড় একটু ময়লা হলেই কাচতে বসে যায় বন্দনা। একটা রুমাল এক দিনের বেশি ব্যবহার করতে দেয় না। সাবান কাচার সময় বন্দনা কেমন যেন হাঁপাতে থাকে। জামা কাপড় ইস্ত্রি করার সময় ঘামে ওর সারা শরীরটা ভিজে ওঠে। এখন বন্দনার জন্যে খুব কষ্ট হয় নির্মলের।

মেয়েটা বলছিল, এ বৃষ্টি সহজে থামছে না। বাড়ি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। মুন্নি নিশ্চয় জানলার ধারে বসে ভিজছে। যমুনার আজকাল কাজে একেবারে মন নেই। এমন হয়েছে সব। একটা বিশ্বাসী লোকও পাওয়া যায় না। মুন্নিকে যমুনার কাছে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

ওরা স্বামী-স্ত্রী। আন্দাজ করে নিল নির্মল। বন্দনা এখন হয়ত রিন্টুকে বকছে। কিংবা ছেঁড়া বই, ভাঙ্গা পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রুটি গড়তে বসেছে। তাই হবে। মনে হল, ও যেন বন্দনাকে রোজ এই সময় টেলিভিশনে দেখতে পায়। দু' বছর না হতেই রিন্টুটা কি দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

ছেলেটা বলল, চল না এইটুকু ভিজলে তোমার কিছু হবে না। ফ্যানের হাওয়ায় চুল শুকিয়ে নেবে।

খুব বললে! জ্বর হলে কে দেখবে? তোমার তো মাসের মধ্যে পনের দিন ছুটি। ভাবনা কি!

নির্মল এতক্ষণ বন্দনা, রিন্টু আর বৃষ্টির কথায় ভুলেছিল। হঠাৎ চাকরির কথা শুনে অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এস কে মিত্রের রাশভারী চেহারাটা ভেসে উঠলো। ওই চেহারাটা মনে হলে একটা ছবিই ভেসে ওঠে।

ইউনিয়নের পান্ডারা বিপদের সময় থাকবে না। সেটা মনে রেখে চলবেন। যান নিজের সিটে যান।

বিপদ! অস্ফুট স্বর বেরিয়েছিল নির্মলের গলা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাশভারী লোকটা যেন গর্জে উঠলো।

হ্যাঁ, বিপদ। সিকিওরিটি অব সার্ভিস। ভেবেছেন, টেমপোরারি থেকে সেমি-পার্মানেন্ট হয়েছেন বলে......ইউনিয়ন কি প্রোটেকসান দেবে আপনাকে?

ইউনিয়ন! সত্যিই নির্মল তখনও জানত না ইউনিয়ন কেন এস কে মিত্রর চিন্তার কারণ।

লোকটা হাসছে। ডেসপ্যাচের সেই পবিত্র সেন। ধবধবে ফর্সা, রোগা, বাইরে থেকে হাড় গোনা যায়। আদ্দির পাঞ্জাবি পরলে গলার হাড় দুটো ঠেলে ওঠে। করিডরের সামনে দাঁড়িয়ে একটানা চিৎকার করে যাচ্ছে লোকটা। পবিত্র সেনের সেই ছবিটা ভেসে উঠলে ভয় পায় ও। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোভও লাগে।

বন্ধুগণ, আমাদের যদি বাঁচতে হয়, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইউনিয়নকে জোরদার করতে হবে। শেষ কথা, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের মত ধ্বনিত হল, এ লড়াই......আপনারা শ্লোগান দিন। এ লড়াই, বাঁচার লড়াই। লড়াই করেই বাঁচতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

ও মশাই। ও নির্মলবাবু, শ্লোগান দিচ্ছেন না কেন? একসঙ্গে দু-তিনজন

ওকে যেন জেরা করল। কে একজন বলল, দালাল।

একটু ইতস্তত করছিল নির্মল। হঠাৎ তিন-চারজন বলে উঠলো, ওই যে শালা এস কে মিত্তির জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে। ডিরেকটরের দালাল।

ওপর থেকে দেখছিস কি রে শালা। ডিরেকটরকে পুলিস ডাকতে বল।

ইউনিয়নের নেতা পবিত্র সেন আবার চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালো। বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হন। মালিকপক্ষের প্ররোচনায় উত্তেজিত হবেন না। আপনারা শুনুন, বন্ধুগণ এ লড়াই সবে শুরু। শুনুন, বাঁচার লড়াই—এ আমাদের জিততেই হবে। দালালদের চিনে রাখুন। শ্লোগান দিন, এ লড়াই......

একটানা বৃষ্টিতে রাস্তাটা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছিল। ছেলেটা অস্বস্তি প্রকাশ করলো, কখন বৃষ্টি থামবে তার কি ঠিক আছে।

বৃষ্টি থামলেও বাসে যা ভিড় হবে। উঠতে পারলে হয়। মেয়েটা বলল, ট্রাম তো আজ আর চলবে না। এর চেয়ে একটা

রেস্টুরেন্টে ঢুকতে পারলে......অন্তত দু কাপ চা তো খাওয়া যেত।

নির্মলেরও এই সময় চা খেতে খুব ইচ্ছে করছিল। রাস্তার ওদিকে একটা চায়ের দোকান আছে। কিন্তু ওদিকে যেতে হলে বৃষ্টিতে স্নান করে যেতে হবে।

অফিস থেকে বাড়িতে ঢুকে জামা কাপড় ছাড়তে দেখেই বন্দনা উনুনে জল চাপায়। আগে এক কাপ চা। তারপর থলি নিয়ে পয় তাগাদাতে যেতে হয়। নয়তো অন্য দু একটা ফরমায়েস থাকে। উপায় নেই। বাইরের সব কাজ ওকেই করতে হয়। বন্দনা ঘরের কাজ নিয়ে থাকে। ও এখনও সেকেলে মেয়ে। দোকানে গিয়ে জিনিস কিনে আনার কথা ভাবতেই পারে না।

এক এক সময় বন্দনার মধ্যে কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় না নির্মল। সেই সময়টা পূর্ব পরিচিত কয়েকটা মুখ ভেসে ওঠে। মনে মনে একটা আক্ষেপ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়।

কলেজে পড়ার সময় বেশ কিছুদিন কবি হবার বাসনা হয়েছিল নির্মলের। অতি আধুনিক কবিতার বইয়ের পাতায় ডুবে থাকার নেশায় পেয়ে বসেছিল ওকে। তখন ও কবিতা গিলতো। এখনও অনেক কবিতার দুটো স্তবক মুখস্থ বলতে পারে ও। অনেকদিন ভেবেছে, বন্দনার সেকেলে ভাব লক্ষ্য করে সেই কবিতাটা শুনিয়ে দেবে। 'যখনই তোমাকে ডেকেছি প্রেয়সী কিংবা প্রিয়ে, অমনি বসেছো ধোপার হিসেব নিয়ে। কুড়ি না পেরুতে হয়ে গেছ পাকা গিন্নি, মাঝে মাঝে দাও সন্তানেরে সিন্নি।'

শেষ পর্যন্ত কোনদিনই হয়ে ওঠে নি। নিজেও দু-চার ছত্র কবিতা লিখেছে ও। সেগুলো মনে করলে নিজেরই হাসি পায় নির্মলের। একটু পরেই অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকে ও। কলেজ জীবনটা বেশ ছিল। যদিও দু বেলা টিউশনির ওপর কলেজে পড়া নির্ভর করতো। নিতান্তই নিঃসম্বল। তবুও ওই সময়টা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন দেখার অবকাশ ছিল। ওই রকম তাজা স্বপ্ন দেখতে বেশ লাগতো নির্মলের। কলেজে পড়ার সময় ধরেই নিয়েছিল ও নিজেও একদিন অধ্যাপক হবে। কিংবা আরও বড় কিছু।

বরাবরই নির্মল একটু লাজুক। আসলে 'পেটে খিদে মুখে লাজ' স্বভাবের। অথচ দেখলে মনে হয়, নিতান্ত নিরীহ প্রাণী। তার ওপর প্রচণ্ড ভীতু। মনটা মাঝে মাঝে সাহসী হয়ে উঠতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি।

কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে প্রেমাস্পদ হওয়ার তীব্র বাসনা যেন কিছুতেই দমন করতে পারছিল না। দীপ্তি সোম ওর কল্পনার জগৎ জুড়ে বসেছে। অথচ, পুরো এক বছর ক্লাস করে একটি দিনও প্রকাশ দেবার সাহস হয়নি। ইতিমধ্যে মনোযোগী ছাত্র বলে ওর সুনাম ছড়িয়েছে। তার ওপর দীপ্তি সোমের কাছ থেকে কমপ্লিমেন্ট পেয়ে প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। অতি সন্তর্পণে একদিন দীপ্তি সোমের স্বল্প করবীর ভাঁজে এক টুকরো চিরকুট রেখে এসেছিল। নির্মল তখন সংশয়হীন। ও নিশ্চিত ছিল, বিনিময়ে একটুকরো চিরকুট পাবে ও। কিন্তু দীপ্তি সোম ওর চেয়ে অনেক বেশি সাহসের সঙ্গে ওকে অবজ্ঞা করলো। আসলে দীপ্তি সোম যে ওকে কত নির্বোধ ভাবতো, নির্মল কোনদিনই তা জানতো না।

এর পর যা হয়। নির্মল কলেজের পাঠ মাঝপথে চুকিয়ে দিয়ে চাকরির জন্যে ধর্না দিতে দিতে এসে ঠেকলো এই আধা সরকারী অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের দায়িত্ব গেলো বেড়ে। রোজগেরে ছেলের বিয়ে না দিলে নাকি বয়ে যায়। বিবাগী হতেই বা কতক্ষণ! তাই চাকরির তিন মাস যেতে না যেতেই বুড়ো জ্যাঠামশাই বাতের যন্ত্রণা নিয়েই পাত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অষ্টাদশী বন্দনা যেন ওর জন্যেই দিন গুনছিল।

নির্মল মাঝে মাঝে ভাবে, সাড়ে তিন বছরেও কি ওর বাস্তব জ্ঞান পুরো হয়নি। বন্দনা ওর জন্যে বেদনাহত হয়। কিন্তু নিজের কষ্টটুকু নির্মলকে জানতে দেয় না। এক একদিন ভাবে, আজ বন্দনাকে বলবে, তুমি কি সংসার ছাড়া অন্য কোন আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাও না? কিন্তু সেই পর্যন্তই। ভয় পিছিয়ে আসে।

বিয়ের পরদিন শাশুড়ী ঠাকরুন আড়ালে ওর হাত দুটো ধরে প্রায় ধরা গলায় বলেছিলেন, একটু মানিয়ে নিয়ে চলবে বাবা। মেয়ের আমার সংসারের কাজের জুড়ি নেই। কিন্তু বড্ড একগুঁয়ে। ওই এক দোষ। আর মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যায়। চোখেমুখে একটু জল দিও, তাহলেই সেরে যাবে।

বন্দনা ফিট হয়ে যায় শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। কিন্তু কি আশ্চর্য! বিয়ের পর বন্দনাকে কোনদিন ফিট হতে দেখে নি। বন্দনা...না না বন্দনা, দীপ্তি সোম—এ সব পুরনো কথা ভাবছে কেন! হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল নির্মল। কটা বাজলো কে জানে! ঘড়িটা দোকানে সারতে দেওয়া আছে। এক তারিখে মাইনে না পেলে আনা যাবে না।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সেই ছেলেটার হাত ঘড়িটার দিকে ঝুঁকে পড়লো। ছটা বেজে গিয়েছে। বাড়ি পৌঁছতে আজ অনেক দেরি হয়ে যাবে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায়ও নেই।

একটু অন্যমনস্ক হতেই আবার বন্দনার কথা মনে হচ্ছিল। সেই সময় মেয়েটার ফিস ফিস শব্দ কানে এল, জহানারার রোল

আমি ভালই পারি। আমাদের অফিসে এবার দত্তগুপ্তের লেখা 'শয়তানের মৃত্যু' অভিনয় হবে। আমাকে বলছিল......

তোমাদের তো লেফ্‌ট সি পি আই-এর ইউনিয়ন? সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করল ছেলেটা।

সেই জন্যেই তো। পরের দিনই সেক্রেটারির কনফিডেনসিয়াল ফাইলে নাম উঠে যাবে।

নাম উঠে যাবে মানে। ক্ষতিটা কি হবে। বরং কাজ না করে ইউনিয়নের দৌলতে তোমার বস তোমাকে সমীহ করে চলবে।

আহা। তোমাদের অফিসেই বা কি। তুমি নিজে কোনদিন সাড়ে দশটার মধ্যে অফিসে গিয়েছো? বাড়ি থেকেই বের হও সাড়ে দশটায়। আমাদের অফিসে ওসব চলবে না। অবশ্য ইউনিয়নের কয়েকজনের কথা আলাদা, কোম্পানির সঙ্গে কি সব এগ্রিমেন্ট হয়েছে। গত বছরই তো সাতজন ছাঁটাই হল। এখনও কেস চলছে।

ওদের কথা শুনে নির্মলেরও ইচ্ছে করছিল, ওর অফিসের কথা তুলতে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা দমন করলো। বৃষ্টিটা কমছে মনে হল। খোলা ম্যানহোলের মুখে জলের স্রোত দেখে আন্দাজ করে নিল নির্মল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বাসে উঠতে পারলে হয়।

নির্মল যে ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছে, তা বোধ হয় এস কে মিত্র জেনে গিয়েছে। নইলে বিপদের কথা তুলবে কেন! ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সুকোমল রায় সেদিন অফিস ছুটির পর ওর কাঁধে হাত দিয়ে নামতে নামতে কথা বলছিল। ওদিক থেকে এস কে মিত্র হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে। ক্রমে ক্রমে সন্দেহটা প্রবল হল নির্মলের।

পরের দিন এস কে মিত্র ওকে নিজের ঘরে ডেকে ওদের সেকশনে ইউনিয়নের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আসলে নির্মল ইউনিয়নের সমর্থক কি না সেটাই জানতে চেয়েছিল। কী করা যায়! নির্মল যেন লোটানায় পড়েছে। সুকোমলও মাঝে মাঝে সন্দেহ করে, নির্মল হয়ত এস কে মিত্রের চর। কী আশ্চর্য। ওরা বিশ্বাস করে, নির্মলের মত একটা সাদা-মাটা লোক চর হতে পারে!

তাহলে আপনি সেদিন ক্যানটিন হলের মিটিং-এ যান নি কেন? ইউনিয়নের আর একজন নেতা কিরণ সেন যেন জেরা করছিল ওকে। সুকোমল রায় ওর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলল, এস কে মিত্রকে আপনি এত ভয় করেন কেন!

নিজেকে কাপুরুষ বলে স্বীকার করতে লজ্জা হল নির্মলের।

নির্মল কাপুরুষ নয়, কাপুরুষ হতেই পারে না। আসলে ও বেপরোয়া হতে পারে না। বার বার নিজেই নিজের কাছে প্রতিবাদ জানালো ও। নির্মল কাউকে ভয় করে না। অথচ...তাহলে বেপরোয়া হয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। গতকাল দুপুরে পবিত্র সেনের আহ্বানে ওর অনেক সহকর্মী যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। পবিত্র সেন শুধু বলেছিল, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কিসের ষড়যন্ত্র। কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা-ও সবাই জানে না। সবাই ধরে নিয়েছিল, এ ডিরেকটারেরই ষড়যন্ত্র।

সেদিন দুপুরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিলডিংয়ের সামনে হঠাৎ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। নির্মলও সিট ছেড়ে উঠে পড়েছিল। কিন্তু শশধর, মনোজ, বিজন, বিভূতিবাবু, বরদাবাবুদের সঙ্গে আবার ফাইল টেনে নিয়ে বসলো ও। বরদাবাবু অবশ্য সব ব্যাপারেই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ওকে খুব একটা পছন্দ করে না নির্মল।

পরে জেনেছিল নির্মল, এ লড়াই সত্যিই চলবে। পবিত্র সেনরা যতদিন ইউনিয়নের নেতা ততদিন এ লড়াইয়ের বিরতি নেই। আর ইউনিয়ন শুনলেই এস কে মিত্র তৎপর হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে যায় নির্মল।

আচ্ছা, এস কে মিত্র আগে তো এমনভাবে পরোক্ষে ভয় দেখাতো না ওকে। আজকাল কথায় কথায় বলে, পরশুদিনও বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ বিপদ। সিকিওরিটি অব সারভিস। টেমপোরারি থেকে সেমি পার্মানেন্ট...।

না আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এ রকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি আজ আর থামবে না।

কিন্তু যাবে কি করে? ট্রাম তো বন্ধ। বাসে উঠতে পারবে? যে করে হোক যেতে তো হবেই। মুন্নিটা কি করছে কে জানে। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাঁধালে কাল আবার অফিস কামাই। মেয়েটা বিরক্তি প্রকাশ করলো।

রাস্তায় জল ঠেলে লোক চলতে শুরু করেছে। চটি জোড়া হাতে নিয়ে নির্মলও ফুটপাত থেকে পা ঘসে ঘসে জলের নিচে রাস্তা খুঁজতে লাগলো।

সেদিন আর জামা কাপড় বাঁচাতে পারেনি ও। হাঁটুর ওপর জল। মরা কুকুর, মৃত রোগীর বিছানা, ডাবের খোলা, ডাস্টবিনের আবর্জনা—সব একাকার। হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে গর্তে পা পড়ে যাচ্ছিল। বাস চলে গেলে জলটা হাঁটু ছাড়িয়ে কোমরে উঠে আসছিল। নির্মল এখন দু পায়ে আঙুলে-গুলোর ওপর ভর করে টান হয়ে নিজেকে দীর্ঘকায় করার চেষ্টা করছিল।

নির্মলের অবাক লাগলো রিকশাওয়ালা-

দের দেখে। সওয়ারি নিয়ে যেন দৌড়চ্ছে। সামনে ভাঙ্গা কাঠের পেটি, ফুলে ঢোল মরা বিড়াল, জলের নিচে চোরাবালির মত খানা খন্দ কেমন বাঁচিয়ে চলেছে। ওদের পায়ের নিচে কি চোখ আছে!

যাঃ! একেবারে মনেই পড়েনি। বেরুবার সময় মন্দিরা বার বার বলে দিয়েছিল, বাড়ি ফেরার সময় যেন বিস্কুট নিয়ে ফেরে। রাত থাকতে উঠে ছেলেটা বায়না জুড়ে দেবে।

এক মাইল রাস্তা হাঁটু জল ঠেলে আসতে হাঁপিয়ে উঠলো ও। ওয়েলিংটনের কাছাকাছি আসতে চোখ গিয়ে পড়লো একটা বিজ্ঞাপনের ব্যানারের দিকে। হিন্দী সিনেমার বিজ্ঞাপন। একটা বড় ডন্ত মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে কাগজের ওপর ছাপা সেই ছবিটা ফুলে উঠে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ক্ষুধা অনুভব করলো নির্মল। অন্তত এক কাপ খেতেই হবে। পকেট হাতড়ে, হিসেবের সঙ্গে রফা করে পনেরটা পয়সা নিয়ে ছোট্ট একটা দোকানে ঢুকে পড়লো।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার জল ঠেলে বেলেঘাটার দিকে চলল নির্মল। হঠাৎ পুরনো কথা মনে হচ্ছিল ওর। বিয়ের আগে

বন্দনার বাবা নির্মলের সম্বন্ধে কত খোঁজ খবর নিয়েছিল। প্রায় গোয়েন্দাগিরি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, পাত্র হিসাবে নির্মলই উপযুক্ত। রোজগেরে ছেলে। মেয়ের সাধ আহ্লাদ মিটবে।

বিয়ের পর বন্দনাও মনের সাধ মিটিয়ে সব বাসনার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। অথচ, কি আশ্চর্য। তারপর থেকে বন্দনা শুধু আশা করেছে আর নির্মল ওকে আশান্বিত করেছে। সত্যি বলতে কি, নির্মল তখনও জানতো না, হিসেবের সঙ্গে সামর্থ্যের এত অসমঞ্জসা। ও নিজেও তো কত আশা করেছিল, কিন্তু কেউ আশান্বিত করতে পারে নি।

ঠিক যা আন্দাজ করেছিল নির্মল। উনুনে কয়লা দিয়ে পাখা টেনে চালাচ্ছে বন্দনা। আর রিন্টু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভিজছে। নির্মলকে ভিজে বাড়ি ঢুকতে দেখে বন্দনা যেন ফেটে পড়েছিল, সারা শহরে তোমার জন্যে একটু দাঁড়াবার জায়গা ছিল না? শরীর তো কত চাঙ্গা! কাল যদি টিং হয়ে পড়ে থাকো...যা বলেছি তাই। একটু চোখের আড়াল হয়েছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কি রকম ভিজে এল। কোন দিকে যাই বলতো... । বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল বন্দনা। হয়ত ভাবছিল, [illegible] [illegible] [illegible] বাবাকে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এনে [illegible] নির্মলকে [illegible] কাপড় ছেড়ে চৌকির ওপর [illegible] [illegible] [illegible] বসিয়ে দিই।

ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পকেটে অবশিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] জল কাদা মুছতে [illegible] [illegible] হবে।

চা আনতে দেরি হচ্ছিল বন্দনার। রিন্টু বাবার কাছে এসে আবার বায়না ধরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ও আন্দাজ করে নিয়েছিল, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাবা ওর জন্যে কিছু আনে নি।

রিন্টুর জন্যে মায়া হতে এস কে মিত্রর ছবিটা ভেসে উঠলো। হ্যাঁ, বিপদ। সিকিউরিটি অব সারভিস। সঙ্গে সঙ্গে গর্জনের মত ধ্বনিত হল, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। আপনি কি এস কে মিত্রকে ভয় করেন? সুকোমল রায়ের কেরাটাও প্রতিধ্বনিত হল।

ভয়! সত্যিই কি ভয় করে নির্মল? কিন্তু কাকে ভয়! এস কে মিত্র, না পবিত্র সেন?

পবিত্র সেনের মিটিং-এ বার নি বলে বটে গিয়েছিল, নির্মল এস কে মিত্রর দালাল। বটকৃষ্ণবাবু খুন হয়েছেন। কেউ প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করতে সাহস পায় নি। বটকৃষ্ণবাবু দালাল ছিল। অথচ, এস কে মিত্র ধরেই নিয়েছে নির্মল পবিত্র সেনের লোক। এস কে মিত্রর এই সন্দেহটা ক্রমশই পুরনো হয়ে উঠছে।

বেশ কয়েকবার সুযোগ খুঁজেছে নির্মল, ভুলটা ভেঙে দিতে হবে। পবিত্র সেন একদিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে। কী ভাবে ওরা? নির্মল কোম্পানীর দালাল। পবিত্র সেনের সব কথায় না সায় দিলেই দালাল। পাশের টেবিলের মৃণাল-বাবু ওর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, দেখছেন তো, এখানে সবই অদ্ভুত ব্যাপার। ডিসিপ্লিন মানবো না, ইচ্ছে মত পেন ডাউন স্ট্রাইক করতে হবে। পাবলিকের ক্ষতি করতে না পারলে নাকি ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস খোয়া যাবে।

সেদিন সাধারণ সভায় পবিত্র সেনের প্রতিবাদ জানিয়ে ও বলতে চেয়েছিল প্রত্যেক কর্মীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার আছে। ইউনিয়নের একজন নেতার কথা শুনে সিট ছেড়ে উঠে আসাটা ইন-ডিসিপ্লিন...। ঠিক সেই সময় চারদিক থেকে বিদ্রূপবাণ যেন ওকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। দালাল, শালা দালালী করতে এসেছে!

বেরিয়ে আসার পর কে একজন ফিস ফিস করে বলল, ওসব ঝামেলার মধ্যে যাবেন না মশাই। মৃণালবাবু বলল, আপনি তো আচ্ছা নির্বোধ। ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে...। কিন্তু আমি তো ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বলছি না। বলছি আমাদের পুতুল হিসাবে...।

আরে মশাই ওরা অত যুক্তি শুনবে না। রাস্তায় পকেটমার বলে কাউকে ধরিয়ে দিলে জনতার রেষবহ্নি কি রকম হয় দেখেছেন তো। আপনারও একই অবস্থা হবে। জানেন, বটকৃষ্ণবাবু কেন খুন হয়েছিল?

অফিসের চিন্তায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল

নির্মল। বন্দনা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রিণ্টু তখনও বায়না ধরেছিল। আজ আর বৃষ্টি থামবে না। আর এই এক হয়েছে। কিছুতেই আঁচল ছাড়বে না। চা খেয়ে একটু ভুলিয়ে দাও।

নির্মল ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল। ওর চোখেমুখে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করল বন্দনা। রিণ্টুকে কোলে নিয়ে আরও গা ঘেঁষে দাঁড়াল ও।

বিস্কুট ফুরিয়ে গিয়েছে। কাল সকালে আমার মাথা চিবিয়ে খাবে।

একদম ভুলে গিয়েছি। দেখি বৃষ্টিটা থামুক।...

না, আজ আর বেরুতে হবে না তোমাকে। বাধা দিল বন্দনা।

নির্মল আবার নীরবতার মধ্যে অফিসের চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল। বন্দনা অসন্তোষ প্রকাশ করলো, দিনরাতই তোমার অফিসের চিন্তা, তুমি কি অফিসের বড় বাবু নাকি!

না, মানে অফিসে ক'দিন ধরে খুব গোলমাল চলছে, নিজেকে যেন হালকা করতে চাইল নির্মল। কিন্তু একটা চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করল। সত্যি তোমার মত ভীতু মানুষ আর দেখিনি। আরও তো কত লোক চাকরি করে। তারা সবাই তোমার মত। তা ছাড়া তুমিই তো বল গোলমালের মধ্যেই থাকো না। তাহলে অফিসের গোলমালে তুমি ভয়ে ভয়ে থাকো কেন?

সেই জন্যেই তো। গোলমালের মধ্যে থাকি না বলেই তো অনেকে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। বন্দনাকে বোঝাতে চাইল নির্মল। ইউনিয়ন করলে এই ভয় হত না। পাঁচজন চেনে বলেই নিয়েছে যে আমি এদের [illegible] চর। অথচ এদের কে [illegible] রোজ খাটিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নির্মল। একটু পর [illegible] পড়ুক ও মানুষের অকারণ ভাবে চিন্তা করবার কোন অধিকার নেই। অথচ এরাই আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সব বড় বড় কথায় পৃথিবী কাঁপিয়ে ফেলছে।

বন্দনা বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। জামার পকেট থেকে একটা আধ ভেজা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল নির্মল। শেষ পর্যন্ত ধরাতে না পেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বন্দনা বলল, অত ভাবছো কেন। যা হবার হবে।

তার মানে? বিস্ময় প্রকাশ করল নির্মল।

তাই বলে সব ছেড়ে দিন রাত চাকরির ভাবনা ভাববে নাকি। মানুষ কি চাকরির জন্যেই জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে নাকি!

কিন্তু চাকরি গেলে তুমি, আমি, রিণ্টু...

তোমার মত অত তলিয়ে ভাবতে পারি না আমি। ছেলেটাকে একটু ভুলিয়ে দাও। ওদিকে উনুনটা খালি যাচ্ছে।

রিণ্টুকে কোলে নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল নির্মল। রিণ্টু ওর চিবুক ধরে ধরে বলছিল, বাবা বিত্তি বিত্তি...।

বাইরে তখন একটা রিকশওয়ালা সওয়ারি নিয়ে হাঁটু জল ঠেলে রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। নির্মলের মনে হল, অফিস ফেরত সেই দম্পতি।

কাগজের তৈরী কাবুকী পুতুল

জাপানের ঘরণী

আশ্চর্য দেশ জাপান! তার চেয়েও আশ্চর্য জাপানের মেয়ে। কে বলবে ক'বছর আগে হিরোসিমা আর নাগাসাকির বীভৎসতা এদেশের বুকে কি তাণ্ডব জাগিয়েছিল! সমস্ত জাপান ঝলমল করছে। রূপে, রসে, সমৃদ্ধিতে অপূর্ব সমন্বয়। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের অদ্ভুত মিলন। শুনেছিলাম জাপান নাকি যন্ত্র-কেন্দ্রিক পশ্চিমকে বেমালুম অনুকরণ করছে। একেবারে ভুল। উন্নত বিজ্ঞান কোনও দেশের একার নয়। আজকের বিজ্ঞানের উন্নতির কোন আকর ভারতে ছিল, ভাস্করাচার্যের লীলাবতী গণিতকে কি দিয়েছিল অথবা শূন্য অর্থাৎ '0'-র পরিকল্পনা ভারতবর্ষ না দিলে জগতের ইতিহাস অন্য হতো এমন কথা তো কই পশ্চিমী মানুষগুলি স্বীকার করেন না। কাজেই উন্নত বিজ্ঞানের বিকাশে তার সার্থকতা, নানা রূপে তার প্রকাশই হলে সত্য। তাই যদি হয়, তবে বলবো জাপান পশ্চিমের যান্ত্রিক সভ্যতাকে আপন করেছে আর তাতে আরোপ করেছে আপন বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বৃহত্তম শহর টোকিওর পথেঘাটে ঘুরে বেড়ান, সহজ স্বচ্ছন্দগতি সাবলীলভাবে সবাই পথ চলছে। যদি যান মার্কিন দেশের কোন মস্ত শহরে, মনে হবে যেন আসন্ন মৃত্যুকে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছেন। হাঁপ ধরে যাবে জীবনযাত্রার গতি সামলাতে। সেই গতিই জাপানী পথেও আছে, কিন্তু গতিতে নেই আকণ্ঠ জর্জরতা। বাজারে গেলে পাবেন হাজার হাজার টেলিভিশন, কাপড়-ধোবার কল, রেডিও, ট্রানজিস্টার ক্যামেরা কত কি।

সুমি

পথের ধারে মেলা মিলিয়ে বসে আছে শত শত দোকানী। পসরা তাদের আধুনিক সমাজের উন্নততম পণ্য রাশি। দামে কম, গুণে দুনিয়ার সেরা। তবু জাপানী ঘরে তাদের স্থান মিলেছে আপন ঐতিহ্যের এক কোণায়। যন্ত্র তাদের জয় করে নি। মানুষ যন্ত্র হয়ে যায়নি। যন্ত্র মানুষের দৈনন্দিন ওঠাবসার সহায় হয়েছে মাত্র।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে জাপানী মেয়ের দান অনেক। যে সামান্য

সময় এদেশে কাটাতে পেরেছি, তাতে বহু মেয়ের সাক্ষাৎ মেলেনি সত্য, কিন্তু যাদের দেখেছি তারা সবাই একই ছাঁচে ঢালা। গোল বেধেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আওতায় আসা যুব সমাজের এক অংশকে নিয়ে। তারা মিনি স্কার্টের মায়ায় মজেছে। এটুকু জাপানের পরাজয়। যন্ত্রজগতকে সামলে নিয়েছে, প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের চেয়ে উঁচু টোকিও টাওয়ার গড়েছে, কিন্তু এবার বাঁধনবিহীন বেপরোয়া ছেলেমেয়ে তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। ছাত্র বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয়কে কাবু করেছে। তাতে কেবলমাত্র ছেলে নয়, মেয়েরাও বেশ ভালরকম বিদ্রোহী।

বিদ্রোহী মেয়েদের বাদ দিয়েই আমরা জাপানী মেয়েদের কথা বলছি। বলছি ঘরণীদের কথা। যে জাপানী সংসারে অতিথি হবার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে সংসারের কর্তা শ্রীযুক্ত সুতোমু হিরাই কলকাতায় ছিলেন কয়েক বছর আগে। বাংলা শিখবেন বলে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে ভর্তি হয়েছিলেন। শিখে-ছিলেনও বেশ ভাল বাংলা। দেশে ফিরবার আগে কোন বাঙালী পরিবারে দিন কতক কাটালে ভাষাটি বেশ মেজে ঘষে নিতে পারবেন ভাবছিলেন। সেই সুবাদেই আমাদের অতিথি হয়েছিলেন। জাপান আসছি শুনেই তাঁর অতিথি হবার নিমন্ত্রণ জানালেন। হিরাই সাহেবকে জানতাম, কিন্তু তাঁর ঘরসংসার দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

টোকিও শহরের উপকণ্ঠে এক পাড়ায় ওঁদের বাড়ি। পাড়াটির সুন্দর শান্ত পরিবেশ, মোটামুটি জাপানীই সব অধিবাসী। ফুলফলের গাছে ঢাকা স্বল্প-পরিসর পথের বাঁকে জাপানী ধরনের কাঠের গৃহ। সদর ফটক পার হতেই শ্রীমতী হিরাই এসে অভিবাদন করে অভ্যর্থনা জানালেন। এমন অভিবাদন জাপানী মেয়ে ভিন্ন কেউ করতে পারে না। বারে বারে নীচু হয়ে অভিবাদনের এক ভিন্ন আপ্যায়িত করবার ধারা সে যুগে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলে-ছিলেন, একদল জাপানী মেয়ে যখন এক সঙ্গে অভিবাদন জানায় মনে হয় রাশি রাশি ফুল। হিরাই সাহেবের গৃহিণীর নাম স্যুমি। স্যুমি আমাদের ঘরে ব্যবহার করবার পাদুকা এগিয়ে দিয়ে, পায়ের চটি জোড়া খুলে নিলেন। অতিথির পায়ের জুতোয় অত সহজে হাত লাগাতেও সম্ভবত জাপানী মেয়েই পারে। জুতো অপবিত্র নয় এ সহজ কথাটি অন্য কোথাও কেউ বোঝে না। আর পাঁচটা ব্যবহার্য জিনিসের মতই পাদুকাও কাজের জিনিস মাত্র। পায়ে পরা হয় বলে কি তার পদমর্যাদা নেই? অথচ স্যুমোর সম্বন্ধে জেনে সারা দুনিয়া সরগরম।

এক পাশে জুতোর রাশি। সবাই বাইরে থেকে এসে জুতো খুলে রাখে। তারই অন্যদিকে এক সৌন্দর্য রচনার নূতন নমুনা রয়েছে। নুড়ি পাথরের সাজানো ছবি। কালো আর সাদা পাথর। দুধারে কালো পাথর, ছোট বড় নানা আকারের, আর তার মাঝে সাদা সাদা পাথর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী রচনা করা হয়েছে। নদীর এঁকেবেঁকে চলার পথ রয়েছে, নেই তাতে জল! মজা নদীর মায়া।

বসবার ঘরটি বেশ। চারদিকে পাতলা কাঠের দেওয়াল। কোথাও বা রঙীন কাগজ দিয়ে ঢাকা, আবার কোথাও বা নকশা কাটা কাপড়ে মোড়া। কাগজেও কোথাও চমৎকার ফুলকাটা নমুনা। ঘরের ফরাস মাদুরের।

ছোট ছোট মাদুর, একেবারে পাশাপাশি রাখা যাতে দরকার হলে তুলে পরিষ্কার করতে অসুবিধা না হয়। মাঝে রাখা নীচু টেবিল। চারপাশে বসবার জন্য রেশমের ছোট ছোট কুশন। কুশন একটি ফ্রেমের মত জিনিসে রাখাও যায়। ফ্রেমের সঙ্গে পিঠের আরামের জন্য একটু অংশও থাকে। তবে ফরাসে বসাই আসল কায়দা। ঘরের কোণায় একটি পুষ্পসজ্জা। তিনটি চন্দ্রমল্লিকাকে ঘিরে রচিত হয়েছে জাপানী রচনা। জাপানী ফুল সাজানো তাদের নিজস্ব পটভূমিকায় মানায়। বোম্বাই বৈঠকখানায় বিশাল গালিচা আর মস্ত চেয়ার-টেবিলের মাঝে এমন কখনও মনে হয়নি।

সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সুমির রান্না-ঘরখানা। তাতে অধুনিক সরঞ্জাম সব আছে। মস্ত বড় রান্নার গ্যাস-রেঞ্জ, বাসন ধোবার কল, ফল-সবজির রস করার মেশিন কত কিছু।

তবে তার মাঝে সুমি আদর্শ জাপানী গৃহিণী। ক্ষিপ্রহস্তে কাজ করেন। কিন্তু ক্ষিপ্রতার গতি বোঝা যায় না। চলেন নিঃশব্দে, পরিবেশন করেন, বসেন, কথা বলেন যেন সবেতেই ছন্দ আছে, সৌন্দর্য আছে। অথচ কি দারুণ তাঁর নজর বলি। রান্না ঘরের পাশেই স্নানাগার। জাপানী ধরনের ছোট চৌবাচ্চা আছে আবার ঠাণ্ডা-গরম জলের কল আছে, ফোয়ারা আছে। পথশ্রমে ক্লান্ত আমি, কোন রকমে তেলসাবান গুছিয়ে কলঘরে ঢুকেছি, অমনি রান্নাঘর থেকে সুমির অস্থিরতা শুনলাম। বিদেশী অতিথি। যদি ঠাণ্ডা-গরম জল ঠিক না মেলাই, যদি সর্দি লাগে। খুলতে হলো দরজা। আপন হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলের জল সামনে দিয়ে তবে শান্তি হলো সুমির। না, পুরোপুরি শান্তি তাতেও নয়। সুমির মেয়ে কেকো। কেকো কলেজে পড়ে। অষ্টাদশী তরুণী। সুমি তাকে ধরে নিয়ে এলো আমার পিঠে সাবান ঘষে দেবে! সর্বনাশ! এমন তো কখনও শুনিনি। অতি কষ্টে আবার কলঘরের খিল বন্ধ করলাম। উদ্ধত শেতাঙ্গকায় সমাজ বাদ দিন। আমাদের কলেজে পড়া মেয়েকে কি বলা চলে অতিথির পিঠে সাবান ঘষে দাও! সুমি আমাকে অনেক বোঝালো। এ যে জাপানী আতিথেয়তা মাত্র!

সুমিকে নিয়ে বিপদ হয়েছিল ভাষা বিভ্রাটে। আমাদের দুজনের মাঝে হিরাই সাহেবকে দোভাষীর কাজ করতে হতো সারাক্ষণ। কিন্তু হিরাই সাহেব তো বাইরে কাজে যেতেন। তখন বাঁধতো বিষম গোল। কেকো বিদেশী ভাষা হিসেবে শিখেছে স্প্যানিশ, একমাত্র ছেলে নাম তার হিরোওকি, সে পড়ে বিজ্ঞান। তারা ইংরেজি বলে না। মা ও দুই ছেলেমেয়ে সদা ব্যস্ত কেমন করে অতিথিকে আদর করবে। আপ্যায়নের অন্ত নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে কথাবার্তা গুলিয়ে গিয়ে একেবারে একাকার কাণ্ড। তবু কি চমৎকার একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো। জল বললে দুধ, মাথার তেল চাইলে কেকো আনে জাপানী চায়ের পেয়ালা। কুছ পরোয়া নেই। মনের ভাষা তো এক।

একটা কথা নেহাৎ চুপি চুপি বলি। স্বামীসেবায় জাপানী মেয়ের তুলনা নেই। চিরকাল তাই চলেছে। যদি বা কখনও দুর্দান্ত পুরুষ বেপরোয়া হয়েছে, নারী ভারসাম্য রেখেছে সেবা আর কোমলতা বিলিয়ে। বাইরে থেকে ঘরে এলে জাপানী স্ত্রী স্বামীর পায়ের জুতো খুলে ধুয়ে দেবে পা, আবার বাইরে যাবার সময় হলে সেই জুতোই চকচকে পালিশ করে তুলে দেবে পদযুগলে, পরিয়ে দেবে কোটখানা সযত্নে। হিরাই সাহেবের সৌভাগ্যের কথা তুলতে তিনি হেসে বললেন, 'এ তো তবু আজকের যুগ। আগে তো জাপানী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে পথ চলতে তিন পা পিছিয়ে থাকতেন।'

সুমি সুগৃহিণী বলে যে বাইরের কাজ করেন না তাও নয়। বিবাহের আগে অফিসে সেক্রেটারীর কাজ করতেন। ঘর সামলিয়ে, শিশু মানুষ করে দশটা-পাঁচটা করতে চান না বলে শিখেছেন পুতুল তৈরীর কাজ। কি অপূর্ব যে হাতের তৈরী পুতুল বর্ণনা করা যায় না। সরঞ্জামের আতিশয্য নেই। ঘরের কোণে একটি দেরাজে সব কিছু গুছিয়ে রাখা যেমন গুছিয়ে রাখা আর এক দেরাজে কোবি আর কিমোনো। কোবি যেদিন কিনেছিলেন তার কাগজের মোড়কটি পর্যন্ত সযত্নে রাখা। তাতেই সাজানো কোবিখানা। কেনাও তো আজ নয়। সুমির বিয়ের সময় এসেছিল সাজ। কত বছর আগে। ঠিক ঐভাবে রাখা পুতুল তৈরীর জিনিসপত্র। অবান্তরের আবর্জনা নেই অথচ যা প্রয়োজন সব পরিপাটি সাজানো।

পুতুল তৈরীও তো ফুলসাজানোর মত ঐতিহ্যের ব্যাপার। তার অনেক ধারা, অনেক নিয়ম। শিখতে হয় সযত্নে, বহু অধ্যবসায়ে। সুমি টোকিও স্কুল অফ ডল মেকিং-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রী। এখন সে নিজেই শেখাতে যায় এক স্কুলে। কেউ কখনও অনুরোধ করলে অর্ডার মাফিক পুতুল বানিয়ে দেয়, তবে বিক্রী করার গরজ তার কম। বলেন, পুতুল তৈরী করলে কেমন যেন মায়া হয় বেচে দিতে। ঘরে ঘরে তাই অজস্র নানারকমের পুতুল সাজানো। সুমির হাতচলার কামাই নেই, তাই বন্ধুবান্ধব সবাই এর ভাগে তার শিল্প-স্বাক্ষর একটু-আধটু মিলে যায়। সুমি অবশ্য বলেন, দরকার যদি কোনদিন হয়, তবে ঘরেই ক্লাশ আরম্ভ করবেন পুতুল তৈরী শিক্ষার। ঘরও দেখবেন, ক্লাশ করে কিছু উপার্জন হবে আর তাঁর শিল্পসাধনার পথে নূতন থেকে নূতনতর রচনা হবে নিত্য।

শ্রীমতী

প্রদর্শনীতে তাঁর একটি কাজ আমার চোখে পড়ে। তবে এই প্রদর্শনীতে তাঁর বিভিন্ন রচনা দেখে মনে হল যে, তিনি এখনও শিক্ষার্থী এবং সেই হিসাবে তাঁকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। ইতিপূর্বেও বলেছি, যাঁরা নতুন শিক্ষার্থী তাঁরা যেন শিক্ষা-সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কখনও কোনও একক প্রদর্শনীর আয়োজন না করেন—কারণ দুর্বল বা অতি সাধারণ শিক্ষার্থী সুলভ ছবি আজকাল দর্শক সাধারণের সমাদর লাভ করে না। শিল্পীর ড্রয়িং দুর্বল, রঙ ব্যবহার প্রণালীও আশানুরূপ নয়। প্রদর্শনীভুক্ত ছবির মধ্যে দুটি—প্রচেষ্টা হিসাবে মন্দ লাগে না—উত্তম্যান ও গাজন উৎসব। শিল্পীর প্রতি অনুরোধ তিনি যেন নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করেন ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ভবিষ্যতে একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আছে, কিন্তু প্রয়োজন আছে ধৈর্যের। ধৈর্যসহকারে ও নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করলে তিনি যে একদিন সাফল্য লাভ করবেন যে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিত্রপ্রিয়

॥ ১০ ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে গাছটার নিচে দাঁড়াবার কথা, কিন্তু অরূপেরা পৌঁছে দেখলো, দীপু তখনও আসেনি। খুব মনোযোগ দিয়ে, সাবধানে অরূপ মোটামুটি ফুটপাথ ঘেঁষেই পার্ক করলো গাড়ি, তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, দেখলেন তো আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিলেন, আমি জানি, দীপুর একদম সময় জ্ঞান নেই!

স্বপ্না আর শান্তা দুজনেই বসেছে পেছনের সিটে। শান্তা বললো, ঠিক আছে, আমি একটু দাঁড়াচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো কাজ থাকে—

স্বপ্না বললো, না, না, আমাদের কোনো কাজ নেই—

অরূপ বললো, আমি দীপুর সঙ্গে একটু দেখা করে যাবো। বেশীক্ষণ থেকে আপনাদের ডিসটার্ব করবো না অবশ্য—

স্বপ্না বললো, আমার সঙ্গেও দীপাঞ্জনবাবুর অনেকদিন দেখা হয়নি!

শান্তা ব্যস্তভাবে রাস্তায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। ও-রকম কোনো অস্থিরতা তার নেই। একটু হেসে বললো, আপনি বুঝি দীপাঞ্জনবাবু বলেন ওকে! দীপুদাকে কেউ বাবু বললে আমার কি রকম হাসি পায়।

—বাঃ, আপনি যে ওকে অরূপবাবু বললেন?

—হ্যাঁ, আপনি আমাকে শুধু অরূপ বললেই আমি খুশী হবো।

—আচ্ছা এবার থেকে তাই বলবো।

অরূপ গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। নেমে এলো ওরা দুজনও। অরূপ শান্তাকে খানিকটা ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করলো, দীপু বুঝি আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে প্রায়ই এ-রকম দেরী করে?

—দীপুদার সঙ্গে তো আমার বেশী দেখা হয় না।

স্বপ্না একটু অবাক হয়ে দেখছে শান্তাকে। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সঙ্গে সাড়ে পাঁচটায় দেখা হবার কথা দিয়ে অরূপ এ-রকম দেরী করলে সে কি শান্তার মতন এমন নিরভিমান থাকতে পারতো? খুব বেশী দেখা হয় না—এর মানে কি? বিকেলবেলা তাহলে ওরা দুজনে আলাদাভাবে থেকে কি করে? অরূপ প্রত্যেক দিন কখন কোথায় থাকে—তাতো তার সবই জানা। উত্তর কলকাতার মেয়েদের ভালোবাসার ধরন বুঝি অন্যরকম। কিন্তু উত্তর কলকাতার অনেক মেয়েই কি রকম যেন একটু ভিজে ভিজে হয়—শান্তা কিন্তু মোটেই সে ধরনের নয়।

অরূপ বললো, এসো স্বপ্না, পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো একটু দেখা যাক।

এদিকে দীপু রাস্তায় আটকে পড়েছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে সিটি কলেজের পাশ দিয়ে দীপু ঠনঠনের সামনে এসে পড়তেই পাড়ার ক'জন ছেলের মুখোমুখি হয়ে গেল। ওদের কয়েকজনের সঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে দীপু, ধনঞ্জয় আর সুকুমার ছিল কলেজেও এক সঙ্গে। কাছাকাছি একটা হল্ থেকে একটা সিনেমা দেখে ফিরছিল ওরা। দীপুকে একেবারে ঘিরে ধরলো।

দীপুর হাতে দু-খানা মোটা বই ছিল, সেই জন্য একজন বললো, কি রে দীপু, আবার কি ল' কলেজে ভর্তি হলি নাকি?

আর একজন বললো, আবার বাপের পয়সা ধ্বংস করবি?

দীপু বললো না না, মাথা খারাপ! আবার কে পড়াশুনো করবে?

—দীপু, চা খাওয়া মাইরি! চা খাওয়া!

—পয়সা নেই ভাই।

—হাত তোলো, পকেট সার্চ করবো।

—ঠিক আছে হাত তুলছি, কিন্তু পয়সা না পেলে কি হবে?

—কি আবার হবে! নাচবো! এক পাক্কড় নাচ দেখিয়ে দেবো!

দীপু শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়ালো। ওরা দুজন হাত দিয়ে থাবড়ে দেখলো তার সার্ট ও প্যাণ্টের পকেট। কিছুই পেলো না, দীপু আজ একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতন কাঞ্চন শূন্য।

দীপুর পকেটে পয়সা না পেয়ে ওরা ক্ষুণ্ণ হলো না, বরং ওকেও নিজেদের সমান ভেবে খুশী হলো। ওদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে এখন গেলে ওরা প্রত্যেকে চা খেতে পারে, কিন্তু এক সঙ্গে ছ'জনের চা খাবার কোনো উপায় নেই, এই যা! কারুরই বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নিয়ে গিয়ে আড্ডা বসানোর অবস্থা নেই। এর মধ্যে অবশ্য সুকুমারের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, সুকুমারের দাদা মারা যাবার পর, তাদের বাড়িতে হয়তো এখন আর দু-বেলা চাও জোটে না।

দীপু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। এদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলতে হয়, দীপু ওদের বন্ধু নয়, ওদের সঙ্গে তেমনভাবে মেশে

না—কিন্তু ওদের একটা দাবি আছে। পাড়ার ছেলে হয়ে পাড়ার ছেলের সঙ্গে মিশবে না—এ কখনো হতে পারে? এগারো নম্বর বাড়ির ইন্দ্রজিৎ খুব ভাটিয়াল—সে কারুকে পাত্তা দেয় না—তাই ইন্দ্রজিৎকে দেখলেই ওরা আওয়াজ দেয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে একদিন ওরা ইন্দ্রজিৎকে ল্যাং মারবে, দীপু জানে।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা যখন জটলা করে, দীপু ওদের সঙ্গে মিশতে চায় না, কিন্তু একেবারে এড়িয়ে যেতেও পারে না, দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলতেই হয়। ওরা সিগারেট অফার করলে দীপু প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, পকেটে পয়সা থাকলে ওদের চা খাওয়াতে হয়। এইটুকুর জন্যই দীপুর মেজদি স্বাধীনভাবে রাস্তা দিয়ে চলাফেরার ছাড়পত্র পেয়েছে ওদের কাছ থেকে।

দীপু মনে মনে এ ছ-জনের দলটার নাম দিয়েছে ছয় রিপু। এদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় খুব সাবধানে। পথে এই ছয় রিপুর সঙ্গে দেখা হলে দীপুর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ আত্মরক্ষার জন্য সজাগ হয়ে ওঠে, কিন্তু মুখের হাসিটা ঠিক রাখতে হয়।

সুকুমার বললো, দীপু, কাল যাচ্ছিস তো? এগারোটা আন্দাজ তোকে আমরা ডাকবো।

—ডাকতে হবে না। আমি নিজেই যাবো। ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে বেরুবে তো?

—হাঁ, আমি যাবার সময় তোকে ডেকে নেবো এখন!

—ঠিক আছে, ডাকিস্। এখন চলি।

—কোথায় যাচ্ছিস?

আগামীকাল রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান হবে, ওরা সবাই যাবে চাকরি অথবা বেকার-ভাতার দাবিতে। দীপুকেও ওরা নিজেদের একজন মনে করে। দীপুর অবশ্য নিজের ও-রকম কোনো দাবি নেই, তবু সে ওদের জন্য মিছিলে যোগ দেবে ঠিক করেছে। ওদের সত্যিই চাকরি পাওয়া দরকার।

—এখন একটু কলেজ স্ট্রীট যাচ্ছি ভাই।

—চল্, আমরাও ওদিকে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে দীপুর আফশোস হলো। কেন কলেজ স্ট্রীটের কথা বলতে গেল। শিয়ালদা বললেই হতো! এরা কি সহজে ছাড়বে? শান্তাকে দেখলেই যদি রে-রে করে চেঁচিয়ে ওঠে! কিছু বিশ্বাস নেই। ওদের সঙ্গে তো কোনো মেয়ের পরিচয় নেই। কিংবা ওরা হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করতে চায়ও না—দূর থেকে কোনো মেয়েকে দেখলেই যদি চেঁচিয়ে কোনো মন্তব্য করে, তাহলে তার কাছে আসবে কি করে? সুকুমারের মুখটা এক সময় যথেষ্ট সুন্দর ছিল, এখন কি রকম যেন নিষ্ঠুরের মতন দেখায়। ধনঞ্জয় কেন হাতে একটা লোহার বালা পরেছে, ও কি জানে না, ওতে খুব খারাপ দেখাচ্ছে ওকে? ইচ্ছে করে কেউ ও-রকম খারাপ সাজে!

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, কলেজ স্ট্রীটে কোথায় যাবি? কফি হাউসে? চল্ আমরাও গিয়ে দেখি কোনো কফি খাওয়াবার পার্টি-ফার্টি পাওয়া যায় কি-না।

—আমি কফি হাউসে যাবো না।

—তাহলে কোথায় যাবি?

এতটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন দীপু নিজে আর কারুকে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু ওরা করবেই। আর গোপন করে কোনো লাভও নেই।

—একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

—একজন মানে? ও, সেই মেয়েটো!

—কোন্ মেয়েটা?

—যে-মেয়েটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে শ্যাম পার্কের কাছে থাকে? একদিন দেখেছিলুম তোর সঙ্গে, বেশ ভালো মাল্!

দীপু এক গাল হেসে বললো, তুই বলছিস মালটা ভালো?

সুকুমার দীপুর হাসিটা লক্ষ্য করলো না। বললো, আমি যখন ভালো বলছি, বুঝবি কোয়ালিটি মাল ছাড়া আমি...... তবে তুই সহজে ম্যানেজ করতে পারবি না। আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দে না। দিবি?

—কেন দেব না? আজই দিচ্ছি, চল না!

—সত্যি দিবি? মাইরি বলছিস্?

—নিশ্চয়ই! আমি শান্তাকে বলবো, তুই বলেছিস্ ও খুব ভালো মাল!

অন্যরা হাসলো, সুকুমার সরু চোখে তাকালো দীপুর দিকে। আমতা আমতা করে বললো, তাতে আমার আর কি। তোরই কেস কেঁচে যাবে।

—আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না! তুই শান্তার সামনে দাঁড়িয়ে ও কথাটা আর একবার বলবি, পারবি তো বলতে?

—কেন পারবো না! আমার শালা মরে যাবে। যা হবে তোরই—আমি কোনো বন্ধুর ইয়েকে কখনো ইনসাল্ট করি না।

—তুই মেয়েদের মাল বলিস কেন রে?

—বেশ করি। কাকে কি বলতে হয়, তুই আমায় শেখাবি?

দীপু তো ঠিক করেই রেখেছে যে, সে রাগ করবে না। ওরা তো তাই চায়, দীপু যদি একবার রেগে কথা বলে, একটু অবজ্ঞার ভাব দেখায়—তাহলেই ওরা দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দীপুর আলগা-আলগা ব্যবহার কি আর ওরা বুঝতে পারে না? ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটছে, কিন্তু আসলে ওরা দীপুকে ঘিরে আছে।

ধনঞ্জয় আর একটু রুক্ষভাবে বললো, তোর মালের আর বন্ধু-টন্ধু নেই? তাদের দু-চারটের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দে না?

জুতোর দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা, দীপু থমকে দাঁড়ালো। রীতি-মতন কাতর অনুনয়ের সুরে বললো, শোন ধনঞ্জয়, ঐ কথাটা আমার শুনতে ভালো লাগছে না।

—কোন্ কথাটা?

—যেটা তোরা বার বার বলছিস্?

ধনঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে বললো, এই শোনো, তোমরা, এখন থেকে তোমরা আর কেউ মালকে মাল বলবে না। কানাকে কানা বলবে না, খোঁড়াকে খোঁড়া

বলবে না। কারণ, দীপুর সেটা শুনতে ভালো লাগছে না।

সবাই মুখ মচকে হাসছে। সে হাসির মধ্যে কোনো উপভোগ নেই। সবাই যেন প্রতীক্ষা করছে, দীপু এতেও রাগবে না? একবার মুখ ফস্কে বলে ফেলুক না, ইডিয়েট, কিংবা ছোটলোক। তারপর যা হাতের সুখ হবে।

ধনঞ্জয় দীপুর দিকে ফিরে বললো, কি হলো তোর? আর কেউ বলবে না। এবার আলাপ করিয়ে দিবি বল?

—আমার চেনা মেয়েটির সঙ্গে তোদের আলাপ করিয়ে দিতে পারি। তার বন্ধু-টন্ধুর কথা আমি জানি না।

—কেন আবার কথার খেলাপ করছো চাঁদু?

সুকুমার দীপুর হাতের বই দুখানা ধরে টান দিয়ে বললো, দেখি দেখি, তোর ইয়ে, মানে বো—ন—ধু কি বই পড়ে! গ্রামার অফ পলিটিকস, বাই হ্যারল্ড ল্যাস্কি! পলিটিকস করা মেয়ে নাকি রে? আর এ বইটা? জিওগ্রাফিকাল ডিকশনারি—

ধনঞ্জয় দীপুর বাহু ছুঁয়েছে, দীপু ঘুরে দাঁড়ালো। তিনজনের সঙ্গে মারামারি করে সে পারবে না। তাছাড়া পাড়ার ছেলে-দের সঙ্গে মারামারি করে কোনো লাভও নেই। আজ না হোক, কাল ওরা শোধ নেবেই। দীপু হাসলো। ধনঞ্জয়ই বেশী গুন্ডা ধরনের, তার উদ্দেশ্যে বললো, চা না পেয়ে তোদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, নারে?

—মেজাজ বেশ ভালো আছে ভাই। কে বললে মেজাজ খারাপ।

—তাহলে আমার সঙ্গে লাগছিস কেন? তোরাও বেকার, আমিও বেকার, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কিছু লাভ আছে?

—বেকার হলেও আমাদের তো আর তোমার মতন ইয়ে নেই। তুমি তো সারা সন্ধ্যে এখন মজা মারবে।

—তা নয়। আর শান্তার সঙ্গে তোদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—তারপর আমরা সবাই কোথাও এক সঙ্গে বসে গল্প করবো।

—শুকনো মুখে গপ্পো? কিছু খাওয়া দাওয়া হবে না?

—দেখি, যদি শান্তার কাছে পয়সা থাকে! চা খাওয়া যাবে নিশ্চয়ই—

ওরা মনঃস্থির করতে পারছে না। দীপুকে ওরা কিছুতেই কায়দা করে ফেলতে পারছে না জালে। দীপু যদি ওদের এড়িয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতো, তাহলেই সবচেয়ে বেশী সুবিধে হতো ওদের। ওরা হই-হই করে দীপুর পেছনে তাড়া করে যেতে পারতো, ইঁদুরের মতন খেলা করতো দীপুকে নিয়ে।

মহাত্মা গান্ধী রোড পেরিয়ে আসার পর সুকুমার বললো, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। রাস্তা পেরুতে গিয়ে দীপু ওদের সহাস্যে আমন্ত্রণ জানালো, আয়!

কাঁধের ওপর একটা ভারী বোঝার মতন দীপু ওদের তিনজনকে নিয়ে এলো রাস্তার এপারে। অরূপ আর স্বপ্না পুরোনো বই দেখতে দেখতে একটু দূরে সরে গেছে, তাই দীপু ওদের নজর করেনি। দীপু বললো, শান্তা, আলাপ করিয়ে দিই আমার বন্ধুদের সঙ্গে। এই হচ্ছে সুকুমার দাস, ধনঞ্জয় সেন, রবীন দাশগুপ্ত—

শান্তা হাত তুলে নমস্কার করলো। দীপু বললো, এভাবে তো আলাপ হবে না, চলো কোথাও গিয়ে একটু বসি। শান্তা, তোমার কাছে টাকা পয়সা কিছু আছে?

—আছে।

সুকুমারই বললো, না, না, আজ থাক। আমরা এমনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দীপু বললো—

শান্তা বললো, কেন, চলুন না।

ধনঞ্জয় এক-পা বাড়িয়ে বললো, না, আজ নয়। আর একদিন, আজ আমরা একটু কাজে যাচ্ছি—চল, রবীন—

ব্যস্তসমস্তভাবে হুড়মুড়িয়ে ওরা আবার রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। পেছন থেকে অরূপ এসে বললো, কি রে দীপু?

[ক্রমশ]

বসু বিজ্ঞান মন্দির : সেই রসায়ন গবেষণাগার

"I dedicate today this Institute—not merely a Laboratory but a Temple........
Thirty-two years ago I chose teaching of science as my vocation. It was held that by its very peculiar constitution, the Indian mind would always turn away from the study of Nature to metaphysical speculations. Even had the capacity for inquiry and accurate observation been assumed present, there were no opportunities for their employment; there were no well equipped laboratories nor skill mechanicians. This was all too true. It is for a man not to quarrel with circumstances but bravely accept them; and we belong to that race and dynasty who had accomplished great things with simple means."

নভেম্বর ৩০, ১৯১৭ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে এই কথাগুলি বলেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র স্বয়ং। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার মূলে সঠিক অন্তরায় কি এ কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। আবার সেই বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েই তিনি কাজ করে গেছেন এখানে বসেই তখনকার দিনের অতি আধুনিক বিষয়গুলির উপর। কাজ করেছেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের জটিল সমস্যা নিয়ে। তার সমাধানও বহু ক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছেন এই গবেষণাগারেই। সে সময়ের শ্রেষ্ঠ-পদার্থবিদ লর্ড কেলভিন, লর্ড রেলি প্রভৃতি সেই সমস্ত কাজের নবীন প্রশংসা করে গেছেন।

দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক, [illegible] গবেষণা চালানো। দুই, [illegible] প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞান [illegible] তাঁদের উদ্দেশ্যে [illegible] বিভিন্ন গবেষণার উপর বক্তৃতা [illegible] ব্যবস্থা। ঠিক সেই সময়ে এ ধরনের প্রচেষ্টা ভারতে প্রথম। আচার্য নিজেও এই বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করতেন। সংক্ষেপে বলা চলে, বিজ্ঞানকে তিনি শুধু চর্চা নয়, সাধনারূপেও গ্রহণ করেছিলেন। যে সাধনা মানুষকে নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তি পেতে সাহায্য করবে। ক্ষমতা যোগাবে নিজেকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার। তাই এটি নিছক একটি গবেষণা কেন্দ্র নয়। উত্তরকালের বিজ্ঞানীদের কাছে এর পরিচয়, এটি একটি মন্দির। শিক্ষা এবং সাধনক্ষেত্র। মন্দিরের অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে থেকেই এখানে উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন আমাদের বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। সেই সঙ্গে যুগের সঙ্গে তাল রাখার জন্য সীমিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেও এর সম্প্রসারণের ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াস নিঃসন্দেহে যথেষ্ট উদাহরণেরও বটে।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ থাকা কালে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-শারীর বিদ্যা এবং উদ্ভিদ-রসায়ন ছাড়াও এখানে আরও তিনটি বিষয়ের উপর মৌলিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণার ব্যবস্থা করে যান। এরা হল পদার্থ, প্রাণী এবং নৃ-বিদ্যা। ১৯৩৭-এ আচার্য পরলোক গমন করেন। তারপর থেকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালনার ব্যাপারে নিয়মিত সরকারী সাহায্য আসতে থাকে। সেই সঙ্গে পদার্থ, রসায়ন জীববিদ্যা, [illegible] বিদ্যা এবং প্রাণী বিদ্যার বিভিন্ন শাখার উপর কাজ শুরু হয়ে যায়। আজও এটি গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব কারখানায় গবেষকদের প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি এখানে তৈরি করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, একটি বড় আয়তনের মেঘকক্ষ, যা পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণায় প্রয়োজন হয়; আট হাজারওয়াট ক্ষমতার একটি তড়িৎ-চুম্বক; যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, নিউট্রন তৈরির যন্ত্র প্রভৃতি। মূল গবেষণা চালান হয় কলকাতার ৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের উপর অবস্থিত মূল কেন্দ্রে। এ ছাড়া বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ চালান হয় ফলতা এবং দার্জিলিং-এর মায়াপুরীর গবেষণা কেন্দ্রে। এ জায়গাটির উচ্চতা ৭২০০ ফুট। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভূ-পদার্থ বৎসর কার্য-সূচীর আংশিক সহযোগিতায় এঁরা এখানে মহাজাগতিক রশ্মির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অর্থাৎ আজকের বসু বিজ্ঞানমন্দির আয়তনে বিরাট কিছু না হলেও এখনকার কাজের পরিধি যথেষ্ট বড়। যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম সাধারণ হয়েও এখানে যে ধরনের গবেষণা চালান হচ্ছে তুলনায় কিছু কিছু তার অসাধারণও।

আর এই জন্যই গত ২০ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত এক দুর্ঘটনায় এখানকার রসায়ন-গবেষণাগারটির পুড়ে যাওয়ার সংবাদে বিজ্ঞানী মাত্রেই শোকে অভিভূত না হয়ে পারেন নি। দুর্ঘটনায় বাস্তব ক্ষতি কতটা হল, অর্থাৎ কত টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হল অথবা অন্য কিছু সম্পত্তির দিক দিয়ে, এটা যেমন একটি প্রশ্ন, তার চাইতেও বড় যে কথাটা এই মুহূর্তে আজ অনেককে স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারেনি সেটা হল, দীর্ঘ কয়েক বছর এখানে বসেই নীরব সাধকের মত কাজ করে গেছেন বেশ কয়েক জন বিজ্ঞানী, যাঁদের স্পর্শ এই গবেষণাগারকে অনেক বড় করে তুলেছিল।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এই রসায়ন বিভাগটির অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন অধ্যাপক এস. সি. নাগ ১৯৭৭ পর্যন্ত। এখানে বসেই অধ্যাপক নাগ মটর এবং [illegible] খাদ্য-বস্তুর উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ করেন। মটরের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন প্রজনন-নিরোধক সামগ্রী।

গোড়ার দিকে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উপর এই বস্তুটির সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে ডঃ এস সান্যাল এর উপর দীর্ঘকাল পরীক্ষা চালান। এখানে কৃত্রিম উপায়ে পাট পচানর উপর সুন্দর কাজ করে গেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ এইচ কে বসুরা। চাষীরা পাটের আঁশ বের করার আগে পাট গাছ পচিয়ে নেন। এর ফলে কাচার সময় আঁশ সহজে বের হয়ে আসে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাট পচানর মত জল পাওয়া একটা মস্ত বড় সমস্যা। ডঃ বসুরা অ্যাসপারজিলাস নাইগার নামে এক ধরনের ছত্রাক আবিষ্কার করেন যা মাঠ থেকে কেটে নেওয়া পাট গাছে ছড়িয়ে দিলেই তার পচিয়ে নেওয়ার কাজটি সেরে ফেলা যায়। এর জন্যে জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না।

এই গবেষণাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম ডঃ বাসুদেব বন্দোপাধ্যায়। এই পড়ে যাওয়া ঘরেরই এক কোণে বসে তিনি সর্বপ্রথম পাট গাছের পাতা থেকে কৃত্রিম উপায়ে সংগ্রহ করেছিলেন ক্রোরোডিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। পরে

ডাঃ পি কে বসু এই ভেষজটির উপর গবেষণা চালান। অবশেষে ১৯৬১-তে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি বার্টন এবং ডাঃ রবার্টসন এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির সাহায্যে ঐ বস্তুটির রাসায়নিক গঠন বের করেন। ক্রিমিনাশক ওষুধ হিসেবে ক্লোরোডিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এই কারণেই আমাদের কবিরাজি চিকিৎসায় ক্রিমি রোগের উপশমের জন্যে ভাটিপাতার অত প্রচলন।

এ ছাড়াও ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লজ্জাবতী লতার সংবেদনশীলতার উপর যে পরীক্ষা চালান তাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতীর সংবেদন-স্বভাবের মধ্যেই একদিন প্রাণীজ অনুভূতির ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন। প্রাণী দেহের যে কোন অংশ স্পর্শ করলে যেমন সেই অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে তার মস্তিষ্কে গিয়ে হাজির হয় এবং প্রয়োজনে সাড়া দেয় তেমন কোন সূক্ষ্ম ব্যবস্থা কি উদ্ভিদের মধ্যেও নেই? বাইরের আঘাতে উদ্ভিদ দেহ যে সাড়া দেয় লজ্জাবতীর মধ্যে পরিষ্কার তা দেখা যায়। এই গবেষণাগারে লজ্জাবতীর দেহ থেকে এক ধরনের প্রোটিন সংগ্রহ করেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা। প্রাণী দেহের পেশীর সংকোচন বা সম্প্রসারণে যে ধরনের প্রোটিন কাজ করে এই প্রোটিন কতকটা তারই অনুরূপ। বর্তমানে ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর অধীনে কয়েকজন গবেষক লজ্জাবতীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, বছর চারেক আগে জনৈক তরুণ সোভিয়েত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের পদ্ধতি অনুসরণ করে উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এঁর অভিমত, প্রাণী দেহের সমস্ত অনুভূতি যেমন স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করে, তেমনি উদ্ভিদের মধ্যেও বাইরের অনুভূতি তাদের দেহের এক অংশ থেকে আর এক অংশে এগিয়ে যায় এক ধরনের প্রোটিন কোষের মধ্যে দিয়ে। তবে এতে সময় লাগে অনেক বেশী। মিনিটে কয়েক ইঞ্চি মাত্র অগ্রসর হয়।

১৯৪৫-তে এই গবেষণাগারের ভার নিয়ে আসেন ডাঃ পি কে বসু। ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে এখানে তিনি যে ধরনের কাজ করে গেছেন ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানে তা নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতী সম্পন্না বিজ্ঞানী ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি তাঁর ছাত্রী। ডঃ বরুয়া এবং এই গবেষণাগারের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীও তাঁর ছাত্র ছিলেন। সোরোলিন গোষ্ঠির এক ধরনের ভেষজের উপর এখানে বেশ কিছুদিন গবেষণা চালান হয়। [illegible] রোগের উপশমের ব্যাপারে এই ভেষজটির
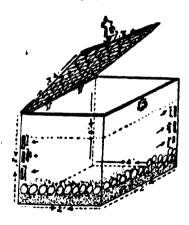
বাক্সে ডিম সাজান রয়েছে

কার্যকারিতা লক্ষ্য করার মত। কার্বাজল নামে এক জাতীয় উপকারের সন্ধান প্রথম পাওয়া গিয়েছিল এখানেই। সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ দুই পদ্ধতিতেই এখানে তাদের যৌগিক গঠন বের করা হয়েছিল। এদের কোন কোন যৌগ চর্ম-রোগের প্রতিরোধক হিসেবে যথেষ্ট সক্রিয় হবে বলে অনেকে মনে করেন। কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণুর কার্যাবলীর উপর এখানে ভাল কাজ হয়েছে।

১৯৫৩-তে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগের বর্তমান প্রধান হয়ে আসেন ডঃ অমিতাভ সেন। দুগ্ধজাত প্রোটিনের উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর বক্তব্যঃ কিছু কিছু ভাল কাজ এখানে হয়েছে। জনৈক অধ্যাপক বললেন, ছোট গবেষণাগার। অসুবিধে আছে অনেক। তবে একটা ব্যাপারে এখানে আমরা নিশ্চিন্ত। এখানে কাজ করার স্বাধীনতা আছে।

ডিম সংরক্ষণ ব্যবস্থা

গরমের দিনে পচার হাত থেকে ডিমকে রক্ষা করা এদেশের একটি বিরাট সমস্যা। কারণ অতিরিক্ত গরমে পাঁচ থেকে ছয় দিনের পরই যে কোন ডিম পচতে শুরু করে। অথচ এই সময়েই ডিমের চাহিদাও কমে যায় অত্যন্ত বেশী। আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ হিমঘরের সাহায্য, যার তাপমাত্রা কখনই পঞ্চাশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি হবে না। অথবা অপর কোন রাসায়নিক পদার্থ যা ডিমকে পচে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। কিন্তু যাঁরা গ্রামে পশুপালন করেন, তাঁদের পক্ষে এই দুটি পথই যে খুব সহজ তা বলা চলে না। হিমঘরের জন্যে চাই বিদ্যুৎ। অথচ সব জায়গাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা এখনও করে ওঠা সম্ভব হয়নি। দুই, রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা এবং তা নিয়ে কাজ করার অসুবিধে অনেক। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের মহও-এর পশু চিকিৎসা কলেজের পশুপালন বিভাগ পচনের হাত থেকে ডিম রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সহজ অথচ প্রায় নিঃখরচায় করা যেতে পারে, এমন একটি পদ্ধতি বের করেছেন যা গ্রামাঞ্চলের মানুষদের খুবই উপকারে আসবে।

এর জন্যে একটি চৌকো গর্ত করে নেওয়া হয়; লম্বা, চওড়ায় এবং উচ্চতায় দু ফুট। ঘরের কাছে ঠাণ্ডা কোন জায়গায় গর্তটি করতে হবে যাতে সহজে তার উপর লক্ষ্য রাখা যায়। এর ভেতরের দেওয়াল সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করে নেওয়া হয় ইঁদুরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে। উপরে বাক্সের মত ধাতব ঢাকনা দেওয়া থাকে। বাক্সের মত এই গর্তটির মেঝে পাতলা করে বালি দিয়ে ঢেকে সার দিয়ে ডিমগুলি তার উপর সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি সারির ঐভাবে সাজান হয়ে গেলে তার উপরটা আবার পাতলা বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং ঐ বালির উপর সাজান হয় আর এক স্তর ডিম। ঢাকনার নিচে দুটো ডিমের মত ফাঁক রাখা দরকার। সাধারণত এইভাবে একটি বাক্সে ১৮০০টির মত ডিম রাখা যেতে পারে। নাড়াচাড়ার সুবিধের জন্যে ১৬০০টির বেশী না রাখাই ভাল। বাক্সটি দুই ফুটের বড় না করার উদ্দেশ্য হল, এতে করে সহজে এটিকে পরিষ্কার করা বা প্রয়োজনে এটির বালি পালটান সহজ হবে। দরকার হলে বড় আয়তনের বাক্সও করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে যে কোন ডিম পনের থেকে কুড়িদিনের মত ভালভাবেই সংরক্ষিত করা চলে।

সমরজিৎ কর

আপনার...
আমেজভরা আনন্দে
আপনার!

ভার্জিনিয়া তামাকের অপরূপ মিশ্রণ,
কী মোলায়েম, কী আরামের।

এসকোয়ার

ফিলটার সিগারেট

এসকোয়ার সিগারেট খান, তাতে
বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে।

*বিদেশী মুদ্রা বাঁচান মানে
বিদেশী মুদ্রা অর্জন*

৫৫ প.
১০টি

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং
প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬

**ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম
জাতীয় উদ্যম**

কান্না/কবর/কিয়ামত

সাঁঝবাতি জ্বালবার সময়ে হঠাৎ কাজী-বাড়িতে কান্নাগোল পড়ে গেল। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে চারদিকে। কাজী দৌলত হোসেন 'ইন্তেকাল' করেছেন। মেয়েরা চিৎকার করে আসমান ফাটিয়ে কাঁদছে। পাড়ার যে যেখানে ছিল ছুটে গেল। যে শুনল সেই বললে : 'ইন্ না লিল্লাহে... রাজেউন'—তাঁর আত্মার শান্তিলাভ হোক।

কাজী সাহেব ছিলেন বি-এ পাশ, সৌম্য-দর্শন, মদালাপী, মিষ্টভাষী। সমগ্র পবিত্র কোরআন তাঁর ছিল মুখস্থ। আরবী ফারসী উর্দু বাংলা ইংরেজী জানতেন তিনি। নামাজ পড়তেন—রোজা করতেন

কাজী সাহেব তাঁর শখের গোলাপবাগানে বসে সাদা পালকের কলমে কি সব লিখতেন

মিথ্যেকথা বলতে তাঁর ভীষণ অস্বস্তিবোধ হত। সুদখোর, মামলাবাজ, চরিত্রহীনদের তিনি দেখতে পারতেন না। যেসব ভাষা তিনি জানতেন সেসব ভাষার কবিরা ছিলেন তাঁর প্রিয়জন। যেমন সেখ শাদী, হাফিজ, খৈয়াম, ইকবাল, রুমী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, সেকসপীয়র, শেলী, কিটস, বায়রন। কাজী সাহেব তাঁর শখের গোলাপ-বাগানে বসে সাদা পালকের কলমে জাফরানের লাল কালি দিয়ে সুন্দর করে কিসব লিখতেন। অনেক সময় দেখা যেত তিনি বুঁদ হয়ে ইজি চেয়ারে পড়ে আছেন চক্ষু মুদে আর কোরআন শরীফের বাংলা তর্জমা পড়ে শোনাচ্ছে তাঁর কলেজে-পড়া নাতনী। বড় মেয়ের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন। ছবিটি বড় স্নিগ্ধ মধুর।

কাজী দৌলত হোসেন যৌবনে নাকি থানার দারোগা ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে গ্রাম-গ্রামান্তের পথ পাড়ি দিয়ে বেড়েন থানার জরুরী কাজে। কখনো ঘুষ নিতেন না। সেসব অভিজ্ঞতা তাঁর বিচিত্র। খুনের কেস, আসামী থানায় এসে পায়ে ধরত, ঘুষ নিয়ে কেস হালকা করে দেবার জন্যে জোঁকের মতন পায়ে-হাতে জড়িয়ে ধরত। তিনি ভয় দেখাবার জন্যে বাতাসে চাবুক আন্দোলিত করতেন। কিন্তু অন্য সব দারোগা পুলিসরা বিরক্ত হত। তারা ঘুষ নিত। আর হাত কচলাতে কচলাতে অনুরোধ করত, 'দয়া করে স্যার, বেচারীর কেসটা একটু 'মিসটিক' করে। মানে 'ধোঁয়াটে' করে।' একটি নারী-ঘটিত ব্যাপারে তিনি দারোগাগিরী ত্যাগ করেন। নারীটি যুবতী বধূ। স্বামী আবেদন করে তার স্ত্রীকে যেন তার বাপের বাড়ি থেকে পুলিস উদ্ধার করে এনে দেয়। স্ত্রীর বাপ কন্যাকে আটক করে রেখেছে। পুলিস গিয়ে উদ্ধার করে এনে মেয়েটিকে থানায় একরাত্রি রেখে দেয়। তার স্বামীর বদলে দেবর মেয়েটিকে চিনিয়ে দেবার জন্যে গেলেও তার হাতে ছাড়া হয়নি এই জন্য যে আবেদনে স্বামীর হাতে সোপর্দ করার কথা ছিল। স্বামীকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল লিখিত-ভাবে যে সে যেন আগামীকাল তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়।

কাজী সাহেব সেদিন থানায় ছিলেন না। কোর্টে গিয়েছিলেন একটি সেসন মামলায় ব্যাপারে। রাত এগারোটায় ফিরে তিনি প্রহরী পুলিসের কাছে শোনেন একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা। যুবতী নারীটির উপরে নাকি যৌন অত্যাচার করা হচ্ছে মুখে কাপড় বেঁধে কয়েদখানার মধ্যে!

কাজী সাহেব তাঁর চেম্বারে ঢুকেই শঙ্করমাছের ছড়িটি নিয়ে প্রহরীকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনজন অত্যাচারীকে এমন চাবকালেন যে তাদের গা-হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিকে মুক্ত করে দিতে সে কাজী সাহেবের পায়ে ধরে কেবলই কাঁদতে থাকল। 'তুমি আমার ধরম বাপ। আমার গলায় পা তুলে দিয়ে মেরে ফেল।...এ জীবন আমি বার করে দোব। আমাকে ছেড়ে দাও, নদীতে ঝাঁপ দোব। আমার স্বামী যখন জানবে তখন আমার কি হবে?...অন্য পুরুষরা আমাকে নষ্ট করেছে...আমার তালাক হয়ে গেছে... এখন সেই স্বামীর ঘর আমি কেমন করে করব'...

এমন চাবকালেন যে তাদের গা-হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল

কাজী দৌলত হোসেন কাঁপছেন তখন, উত্তেজনায় আর ক্ষোভে দুঃখে। তাড়া দিলেন তিনি : 'চুপ করো। তালাক তোমার হবে না, এটা তোমার ইচ্ছাকৃত পাপ নয়। তুমি স্বামীকে কিছু জানাবে না। তুমি আমাকে 'ধরম বাপ' সম্বোধন করেছ, কাজেই বাপের হুকুম মানতে হবে। নচেৎ তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মেয়েটি সারারাত কাঁদার পর সকালে স্বামী আসতেই চোখমুখ মুছে ফেলে বললে, 'আমি যাব।'

কাজী সাহেব খুশী হলেন। মেয়েটি 'কদমবুসী' (মাথা হেঁট না করে বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম) করে উঠলে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন : 'এস মা!' তারপর কাজী সাহেব থানার কাজ ছেড়ে দিলেন

নিজের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা দেখিয়ে। কেননা তাকে খুন করার চেষ্টা চলছিল।

এরপর তিনি কয়েকটি উর্দু পত্রিকার মুন্সীজীর কাজ করতেন। লিথোয় ছাপার আগে তিনি তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে নকশা লিখে দিতেন। আর বাকি সময় আরবী ফারসী পড়াশুনো করে কলকাতায় দিন কাটাতেন।

তাঁর পৈতৃক লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল এক শো ষাট বিঘে। শাদি করেছিলেন দুটি। সন্তান-সন্ততি তাঁর মোট বারোটি। অনেক আত্মীয়স্বজন—পাড়া-প্রতিবেশী। সবাই আহা জারী করতে লাগল তাঁর মৃত্যুতে। কয়েকদিন থেকে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। জ্বর—পদ্মপলাশ চোখ দুটি লাল কুঁচের মতন হয়েছিল। তিনি যখন মারা যান তাঁর বুকের ওপরে পবিত্র কোরআন খোলা ছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় কেউ কাছে ছিল না। এক হাতে কাঁচের রঙিন বাতি আর এক হাতে গরম দুধ নিয়ে আম্বিয়া খাতুন ঘরে এসে ডাকলেন, 'দাদু'...

কোনো সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ আলোপড়া মুখটা দেখে তার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা পড়ে গেল।

তারপর থামলেন। সন্ধ্যাবাতি জলে উঠেছে সবে তখন ঘরে ঘরে।

কাজী দৌলত হোসেনের সবচেয়ে বড়োর মতো মা এখনো বেঁচে। তিনি কাঁদছেন ঃ

'আমার বাছার সকল এল
সাত আসমান,
সাত সাগরের পারে থেকে রে...
আকাশ ভেঙে বাজ নামল
'আজরাইলে'র
সোনার ডানার ভর করে রে...
আমার বাছার 'রূহ্' যাবে
'কোহ্‌কাফে' চড়ে
মামদূতের পাহাড় পার হয়ে রে...
ও আল্লা, তোমার বিচার কেমন হল—
মা রইল চাঁদের বুড়ী
অশথ তলায় বসে,
ছেলে গেল আঁচল ফেলে
সদাগরীতে রে...
ও আল্লা, তোমার 'আজরাইল'
ভুল করেছে রে—
তুমি আমাকে আমার দৌলত কাজীর
সঙ্গের সাথী করো রে'...

কাজী দৌলত হোসেনের বড় স্ত্রী কাঁদছে ঃ

'আমার হাতের চুড়ি কে ভাঙলে গো
কে উদোম করলে গো
আমার দুনিয়ার 'লেবাস!' (পোশাক)
কে আমাকে করলে রাতের বিবাগী,
তার নামাজ রোজার সোনার সাঁকো বেয়ে
সে চলে গেল।
আর 'অভাগী' 'কমবখ্‌ত' পড়ে
রইল দুনিয়াদারীর 'বালা-মসিবত'
ভোগের জন্যে গো—
আল্লা আমাকে তুমি নিলে না কেন গো—'

কাজী সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী কাঁদছে ঃ

'ওগো আমার দেহের মালিক
মনের মানুষ ওগো—
ওগো আমার এই যৌবনের বাগানের মালি
আমার মালাকর—
কোথায় গেলে আর তোমাকে পাবো—
আমার মনের আঁধারে ঘাই ঠেকিয়ে
আকাশে উঠব আর শয়তান বেহেস্তের
সে-মই কেড়ে নেবে গো—
আমার বিচার কি এই হল?
এই সব বাচ্চাদের মুখ চাইবে কে?
তোমার পালকের কলম, তোমার কোরআন,
তোমার পীরহান আর কে 'ব্যাবার' করবে?
তুমি ছিলে মহৎ
কখনো পাঁচটা আঙুল বসাওনি গায়ে...
তোমার সাথী হতে পারি যেন বেহেশ্‌তে...'

বলা বাহুল্য কাজী বা সৈয়দ-বাড়ির ভাষা অনেক মার্জিত গ্রামের চাষীবাসী গেরস্থদের চাইতে।

কলেজে-পড়া-মেয়ে আম্বিয়া খাতুন সাপ খেলানো সুরে তেমন করে কাঁদা শেখেনি। তার লজ্জা পায়। সে শুধু খাটের বাজু ধরে বসে আঁচলে চোখ মুছে মুছে কাঁদছে। তার মুখটা লাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হাঁ-করে শ্বাস ফেলছে। সুতো কেটে যাচ্ছে তার দুটো ঠোঁটের মাঝে। মনে হচ্ছে সেই সব চাইতে দুঃখ পেয়েছে। সে দাদুকে বুঝত, সব কথা জানত। দাদু মায় গতকাল তাকে তিন হাজার টাকা, একটা হীরের আংটি আর একটা নেকলেস দিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'এসব তোমার বিয়ের উপহার। আমি হয়তো আর বেশি সময় বাঁচব না। দীপ নিবে আসছে।'

আম্বিয়া দাদুর বুকে মাথা রেখেছিল। তখন তিনি অদ্ভুত একটি ব্যবহার করেছিলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে

মুখটা তার টেনে এনে চুমো খেয়েছিলেন। একেবারে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে, মধু পানের মতো।

আম্বিয়া বাধা দেয়নি। দাদুর ব্যবহার কখনো অশালীন ছিল না। হয়তো মধুর এক স্নেহের দান এ তার জীবনে! এ চুম্বন ছিল পবিত্র—নিষ্কাম।

সেই কথাই তো ভুলতে পারছিল না আম্বিয়া। চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যাচ্ছিল।

কিন্তু মৃত্যু বড় নিষ্ঠুর!

দুজন লোক এসে বুক থেকে কোরআন শরীফখানা তুলে তাতে চুমো খেয়ে তুলে রাখলে লাল কাপড়ে জড়িয়ে আলমারির মধ্যে। মেয়েদের সরিয়ে দিলে। বারান্দায় চার-পাঁচ আঁটি খড় এনে তার বাঁধন খুলে বিছিয়ে কাজী সাহেবের মৃতদেহ তুলে এনে পশ্চিম দিকে মাথা করে সেই খমঘাসের ওপরে শুইয়ে একটি চাদর ঢাকা দিয়ে দিলে তাঁর আপাদমস্তক।

থানায় অত্যাচারিতা ধর্ষিতা মেয়েটি এল তার পুত্রকন্যা আর স্বামীকে নিয়ে। সে খুব কাঁদতে লাগল। এল জামাই মেয়েরা। সকল ছেলে, ছেলেদের শ্বশুর শাশুড়ি।

আম্বিয়া তার বাপের হাতে দিলে একটি কাগজ। দৌলত কাজীর দলিল। কাকে কতখানি সম্পত্তি বা জিনিসপত্র ঘর-দুয়ার দিতে হবে তার নির্দেশ। আম্বিয়াকে যা দেওয়া হয়েছে দেখলে তারও উল্লেখ করা আছে। এটি গতকাল পর্যন্ত ছিল না। আম্বিয়াকে দেওয়ার পর কখন লেখা হয়েছে। তাঁর নিজের হাতে লেখা। ছড়ানো অক্ষর। বাকি সবটা আম্বিয়ার হাতের লেখা। এক সপ্তা আগে এটি লেখা হয়। তাঁর বালিশের নিচে কাগজটি থাকত।

ভাগচাষে অনেক জমি বেরিয়ে গিয়েছিল শুধু পাঁচশ পাঁচশ পঞ্চাশ বিঘে জমি তিনি দুই স্ত্রী, আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বখরা করে দিয়ে গেছেন। কাউকে হতাশ করেননি। সুবিচার করে গেছেন। একশোটি গিনি সোনা ছিল—সেগুলো সবাইকে বখরা করে দেবার কথা বলে গেছেন। এসব করবে বড় জামাই।

পাড়ায় কারো মৃত্যু হলে সংবাদ শোনামাত্র আহাদ আলী আর রহমত সেখ আসে কবর খুঁড়বার জন্যে। তারা কোদাল কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়ালে গোরস্থানে গেল বড় জামাই আনোয়ার আলী। সেখানে এল হ্যাজাক লাইট। আনোয়ার আলী পায়ের জুতো খুলে দাঁড়িয়ে দোওয়া-দরুদ পড়তে লাগল। সে যা বললে তার অর্থ : 'হে কবরবাসিগণ, আপনাদের উপর আল্লার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সুসংবাদ নিন যে 'কিয়ামত নজদিগে' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কাছেই এসে পড়েছে।'

তারপর সে কবর খুঁড়বার জায়গাটা দেখিয়ে দিতে আহাদ আলী তার পায়ের সাত 'পাউড়ী' জায়গা মেপে নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করে কবর খুঁড়তে শুরু করলে। 'সিথেনের' (শিয়রের) মাটি সিথেনের একপাশে রাখলে আলাদা করে 'বিসমিল্লা' বলে প্রথম কোদাল মেরে। পায়ের দিকের মাটি রাখলে পায়ের দিকে। কবরের মাটি কবরেই দিতে হবে। অন্যখানের মাটি দেওয়া চলবে না। রহমত শুধোলে, 'কবর ছোট হবে না তো, কাজী সাহেব যে রকম লম্বা লোক?'

আহাদ বললে, 'যে যার হাতের সাড়ে পোনে মানে সাড়ে তিন হাত। কাজী সাহেবের হাত ছিল আঠারো ইঞ্চি—আমার সমান। ঠিক সাত পা মাপেই হবে।'

আনোয়ার আলী চলে এল।

একটা নতুন মাটির সরায় কুল কাঠের আগুনে 'লোবান' ধুনো পুড়ছে। মোল্লা সাহেব মজুরী পেতে বসে হেঁড় গজ কাফনের নতুন কাপড় কেটে 'খেলকা' 'পীরহান' চাদর তৈরি করছেন মাথায় টুপি দিয়ে। যে সুতো কাফনের কাপড় থেকে সুতো তুলে সেলাই করা হচ্ছে সে সুতো আর ব্যবহার করা চলবে না। কান্নাগোল চলেছে মেয়েদের।

উঠানে কেবলে হিন্দু মুসলমান লোকেরা আসছেন পাশের গ্রাম থেকে। তাঁরা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে যাচ্ছেন। মাটির মধ্যে এই রাতকালেও লোক ধরে না।

ফুলেশ্বর বিরাট তামার দেগ হাঁড়িতে পানি গরম করা হচ্ছে। তাতে দু চারটে কুলপাতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গোসলের মেঝেতে ব্যবস্থা হচ্ছে। কাটারি মেরে বাঁশ কাটার শব্দ হচ্ছে সামনের ঝাড় থেকে।

দহলিজের একদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। যারা গোসল দেবে তারা অজু করে পবিত্র হয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে কাজী সাহেবের লাশটা আঁড় করে ধরে তুলে আনল সেই জায়গার মধ্যে। এর মধ্যে গোসলের সময় শোকবিহ্বল হয়ে চোখের পানি-ফেলা নিষিদ্ধ। কোরান-শরীফ পড়তে থাকে সকলে। পুরুষেরা পুরুষদের গোসল দেবে। মেয়েরা মেয়েদের—এই বিধি। একটি তক্তার ওপরে লাশ শোয়ানো হবে।

কাজী সাহেবের দেহের পোশাক খুলে ফেলা হল। লোটায় করে অল্প একটু গরম-করা পানি আস্তে আস্তে একজন ঢালতে লাগল মাথা থেকে পা পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ' বলতে বলতে। সবাই তাই পড়তে লাগল অস্ফুট-স্বরে গুনগুন করে। সুগন্ধি সাবান মাখানো হল সারা দেহে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় পেটের মধ্যের ময়লা বার করে দিয়ে। পানি ঢালা হতে লাগল। মোল্লাজী কয়েকটি ছোট ছোট টুকরো কাপড়ে মাটির ঢেলা বেঁধে 'কুলুপের নুড়ি' (পায়খানা প্রস্রাবের পর মোছার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য) পাঠালেন। এমনভাবে শরীর পরিষ্কার করতে হবে যেন এতটুকু একটু ময়লা কোথাও না থাকে। গোসল দিতে ঘণ্টা দুই সময়ও লাগতে পারে। গোসলের নোংরা পানি গড়িয়ে এসে পড়বার জন্য ছাঁচের নিচে কোদাল দিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সেই গড়ানো পানির দিকে তাকালে এক বিষাদভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে।

গোসল শেষ হলে মোল্লাজী কাফনের খেলকা 'পীরহান', চাদর 'তহবন' পাঠিয়ে দেন লোবানের ধোঁয়ায় সেঁকে আতর, গোলাপপানি ছড়িয়ে-মাখিয়ে দিয়ে। খুব সাবধানে নোংরা পানির স্পর্শ বাঁচিয়ে লাশ তুলে ধরে 'খেলকা' 'পীরহান' টুপি পরানো হবে। তারপর চাদরে ঢেকে কোল পায়ের দিকে একজন এবং মাথার দিকে আর একজন ধরে তুলে এনে অন্দরের উপর রাখা খাটের মধ্যে শুইয়ে দিলেই মেয়েরা শেষ বিদায়ের কান্নায় ফেটে পড়বে। হাদের দেশে 'জানাজা' (সমাজের) বাঁধানো কাঠের খাট থাকে না তারা আনে কাঁচা বাঁশের খড় দিয়ে বাঁধা খাটুলি। ছেলে জামাই ভাই ভাগনে ভাইপো যারা থাকে, গোসল করে, 'অজু' করে, ভাল কাপড়চোপড় পরে এসে খাটে কাঁধ দেয়। দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে লাশ নিয়ে চলে যায় পুরুষেরা সকলে কবরস্থানের উদ্দেশ্যে। একজন লোক মৃতের বুকের উপর হাত দিয়ে চলতে থাকে।

কবরস্থানের সন্নিকটে কোনো পরিচ্ছন্ন জায়গায় খাট থেকে লাশ মাটিতে নামিয়ে রাখা হয় উত্তর দিকে মাথা করে। মোল্লাজী 'জানাজা' পড়ান মৃতের কোনো নিকট আত্মীয়ের অনুমতি পেয়ে। প্রবাদ এই যে, কোনো জ্যান্ত মানুষকে শুইয়ে এই 'জানাজা'-র নামাজ পড়া হলে তার প্রাণ-পাখি উড়ে যাবে।

এরপর কবরের কাছে আনা হবে লাশকে। কবর খোঁড়ার কাজ শেষ হলেও শূন্য কবর ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। যারা কবর খুঁড়বে

জরুরী দরকারে
একটি 'এভারেডী' টর্চ হাতের কাছে রাখুন।

তারা স্নান করে না আসা পর্যন্ত জানাজা পড়া হয় না। লাশ এলে দু'জন লোক নেমে যায় কবরের মধ্যে। কবরের ভিতরটা চমৎকার মসৃণ। এক বুক নিচু। লাশ ধরে নিয়ে নামিয়ে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেওয়া হলে হাতের ওপর ভর রেখে পায়ের দিকের লোকটি উঠে আসে। মাথার দিকে লোকটিকে মোল্লাজী 'মুর্দা'র মুখের কাফন খুলে ফেলতে বলেন। তারপর পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত পাঠ করেন তিনবার। লোকটিকে তা আবৃত্তি করতে হয় আর প্রতিবার মৃতের মুখের কাপড় খুলে আবার চাপা দেওয়া হয়। একে বলে 'শেষ মুখ-দেখানো।' আয়াতের ভাবার্থ সম্ভবত : এই পৃথিবীর আলো বাতাস, যেখানে তুমি ছিলে, আজ তা ছেড়ে তুমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছ!

তারপর মুখটি যেদিকে মক্কার কাবা শরীফ (ভারতে পশ্চিমদিকে) সেদিকে ঈষৎ হেলিয়ে চাপা দিয়ে উঠে এলেই কাঁচা বাঁশের 'পাড়ন' বা পাটাতন বিছিয়ে দেওয়া হবে কবরের উপর-মুখে লম্বালম্বি। তারপর এড়ো বাঁশের ফালি দিয়ে তার উপর দিতে হবে কাঁচা তালপাতা মাদুর অথবা খড় বিছিয়ে। কোথাও যেন ফাঁক না থাকে।

এরপর সবাই এক মুঠো মাটি হাতে করে ধরলে মোল্লাজী পবিত্র কোরআনের ২০ নম্বর সুরা 'তা হা'-র তৃতীয় অনুচ্ছেদের ৫৫ নম্বর আয়াতটি তিন অংশে ভাগ করে করে বলাবেন : 'মিনহা খালাকনাকুম [এই (মাটি) থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি] সকলে মাটি দেবে এই কথাটি বলে প্রথম।

আবার মাটি নিয়ে দ্বিতীয়বার বলবে, 'অ-ফিহা নোয়িদোকুম' [আর এতেই (এই মাটিতেই) তোমাদের ফিরে পাঠাবো] বলে মাটি দেবে কবরে।

তৃতীয়বার বলতে হবে : 'অ-মিনহা নোখরেজোকুম তারাতান ওখরা' [আর এর (এই মাটি) থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার তুলব]।

তারপর শিয়রের মাটি শিয়রে, পায়ের মাটি পায়ের দিকে বসিয়ে দিয়ে কবরের উপর মাটি টেনে দেওয়া হবে। কোদাল ধরে মাটি টেনে দিতেও দোষ নেই। কবর উঁচু হলে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে এক ঘড়া বা এক বালতি পানি মাথার দিক থেকে পায়ের দিক পর্যন্ত আস্তে আস্তে ঢেলে দিতে হবে। নারীর কবর হলে বুকের সোজা একটা ছোট ঢিপি করে দেওয়া হয়। মেয়ে-দের কাউকে কবর দিতে আসতে নেই। এরপর চারটে খেজুর পাতা ধরবে চারজন। সুরা ফালাক, সুরা কাফেরুন, সুরা নাস, সুরা ইখলাস (যেকোনো চারটি সুরা) থেকে একটি করে আয়াত ৫ বার বা ৭ বার পড়ে কবরের চার মাথায় সেই খেজুর পাতা পুঁতে দিয়ে তাদের জটা বেঁধে দিয়ে যে যার বাসে দোওয়া-দরুদ পড়ে 'মোনাজাত' বা প্রার্থনা করে সারা কবরস্থানে গোলাপপানি ছড়িয়ে দিয়ে চলে আসবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে ফিরে এলে তিন দিন পর্যন্ত কবর দেওয়া যাবে।

মৃতের বাড়ির লোকজনকে গোসল করিয়ে খাওয়া-দাওয়া করানোর জন্যে আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীরা ধরে নিয়ে যাবে।

সাত দিন একুশ দিন বা একচল্লিশ দিন পরে 'ছোলা পড়ানো'। 'কাঁধিকে বালো' খাওয়ানো। কবরের ব্যবস্থা বাদশা থেকে ফকিরের পর্যন্ত ইসলামে একই বিধি—সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য। 'ছোলা পড়ানো' হল কিছু ছোলা আগের দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। 'দাওয়াত' (নিমন্ত্রণ) দেওয়া মোল্লা বা মৌলভীরা এসে কয়েকজন সেই ছোলা একটা একটা নিয়ে 'লা ইলাহা' বলে পড়তে থাকেন। আগে ক'হাজার ছোলা আছে গুনে নিয়ে কতবার পড়লে তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়া হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। কেননা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর গত হয়েছেন হজরত আদম থেকে হজরত মোহম্মদ পর্যন্ত। এরপর আর পয়গম্বর হবেন না। ছোলা পড়বার সময় শুধু 'লা ইলাহা' বলা না-জায়েজ। কেননা

এর অর্থ 'নাই আল্লা'। বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্-লাল্-লা'—বাকিটা মাঝে মাঝে বললেও চলবে।

মৌলভীরা আগেই কোরআন শরীফ পড়ে 'খতম' করে রাখেন। পড়তে বাকি থাকলে এসে পড়ে নেন। ৩০ সেপারা পাঁচ সাতজনে ভাগ করে নিয়ে পড়েন। এ সব কাজ শেষ হলে কবর 'জিয়ারত' করতে যেতে হয়। তারপর 'খানা' খাওয়ানো হয়। যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে ব্যয় করে।

দৌলত কাজীর ছেলেরা তাঁর খানার জন্যে রেখে যাওয়া তিন হাজার টাকা ব্যয় করে। পাড়ার লোককে খানা খাওয়ায়। খতম পড়ায়। 'মিলাদ মহফিল' দেয়। অতিথি 'মিস্কিন'দের কাপড় টাকা-পয়সা দেয়। মৌলভী মোল্লাদের টাকা দিতে হয়। যদিও তাঁরা তা চান না।

মৃতের আত্মা 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জিন' দুই স্থানের যেখানে হোক লটকানো থাকে। প্রথমটি পুণ্যাত্মাদের, দ্বিতীয়টি পাপীদের জন্য।

আল্লা বলেছেন, আবার আমাদের কবর থেকে তোলা হবে।—আমাদের আত্মা এসে

সেহ [illegible] দেবে। কিয়ামতের ময়দানে বিচারের [illegible] ভোগের জন্য সকলকে দাঁড়াবে। পৃথিবী তার আগেই ইস্রাফিল ফেরেশতার শিঙ্গা বাজালে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পাহাড় পর্বত তুলোর মতন উড়তে থাকবে। সর্বত্র সমতল হয়ে যাবে। মাথার ওপরে সূর্য নেমে আসবে। আর তার হাজার মুখ খুলে দেওয়া হবে। ঘামের দরিয়া বয়ে যাবে। যে যত পাপ করেছে তার হাত পা ইন্দ্রিয় সব সাক্ষী দেবে। আত্মা সঠিক উত্তর দেবে যখন প্রশ্ন করা হবে। পাপীষ্ঠদের মূর্তি হবে বিকৃত। মাথা থাকবে উল্টো দিকে। পুণ্যাত্মাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। এ সব বর্ণনা আছে 'খয়রুল হাসার' নামক বাংলা পুঁথিতে। রোমহর্ষক বর্ণনা। কোরআন শরীফের সূরায় বহু স্থানে পাপীদের প্রতি কিরকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে আর 'মোমিন' বা পুণ্যাত্মাদের শীতল নদী, সরাবন তহুরা বা সুরা, কিশোরী বা যুবতী, রেশমের পোশাক, স্থির যৌবন, প্রবাল মণিমুক্তার প্রাসাদ আর আঙুর খেজুর দান করা হবে তার বর্ণনা আছে। কিয়ামতের বিচারের পর পাপীদের উদ্ধার করবেন সে সময় একমাত্র ব্যক্তি তাঁর সানুনয় রোদন আর সুপারিশের দ্বারা—তিনি চিরদুঃখী দরিদ্র অসহায় পাপাত্মা মানুষের বন্ধু—আল্লার পিয়ারা দোস্ত হজরত মোহম্মদ (তাঁর উপরে আল্লার করুণা বর্ষিত হোক)।

পাপী আর পুণ্যাত্মাদের সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লা বলেছেন :

'অপরাধীদের সেদিন চেনা যাবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, আর ধরা হবে তাদের চুলের ঝুঁটিতে আর পায়ে।' [৫৫ : ৪১]

'এই সেই জাহান্নাম অপরাধীর দল যাকে মিথ্যা বলত।' [৫৫ : ৪৩]

'ছুটোছুটি করবে তারা এর (আগুনের) আর টগবগ করে ফোটা পানির চারদিকে।' [৫৫ : ৪৪]

*

'(বেহেশতবাসীরা) তাকিয়া হেলান দিয়ে বসবে ফরাশে, আর ভিতরের আস্তরণ জরিখচিত রেশমের; আর দুই উদ্যানের ফল সব হাতের নাগালে।' [৫৫ : ৫৪]

'সে সবের মধ্যে থাকবে নতনয়নাগণ—স্পর্শ করেনি তাদের এর পূর্বে মানুষ অথবা জিন।' [৫৫ : ৫৬]

'তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।' [৫৫ : ৫৮]

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় কাজী দৌলত হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পক্ষ থেকে—যে তার কান্নার 'মনের আঁধারে মাই ঠেকিয়ে বেহেশতে উঠতে চায়'—যদি শেষ বিচারের পর বেহেশতে যেতে পারে তবে সে কি পাবে? বহু নারীই বেহেশতে যাবেন—তারা কি পাবেন তার পুরস্কার কোনো নির্দেশ আমরা পাইনি। 'হুর'-'গেলমান' কথাটি পাওয়া যায়। 'হুর' যদি নারী হয় (যাদের মানুষ অথবা জিন ছোঁয় নি কখনো। বলা বাহুল্য পৃথিবীর কোনো নারীই 'হুর' হতে পারবেন না) তাহলে 'গেলমান' কি পুরুষ-জাতীয়? যারা লীলা করবে আপনার স্ত্রী আমার বোন অন্যের মায়ের সঙ্গে! বেহেশতে কি কাণ্ডটাই না হবে তাহলে। প্রার্থনা করি, সেদিন যেন আমরা জ্যোতির্ময় চেহারা পেয়ে কেউ কাউকে চিনতে না পারি! কিন্তু কিয়ামতে যখন সারাজীবনের পাপপুণ্যের হিসেব দিতে হবে তখন আমাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হবে কেন?

তাহলে?

তাহলে আপনার কালো স্ত্রী আলোময় হবেন বেহেশতে গিয়ে আর রূপবান 'গেলমান' (কিশোর?) পাবেন আপনি তা সইতে [illegible] বলেননি। কেননা আমাদের মনের খবর তিনি তো জানেন।

আবদুল জব্বার

ব্যাঙ্ক, কারখানা আর গুদামে ব্যবহার হয়—কেন না এটি নির্ভরযোগ্য।

সূক্ষ্ম এর কারিগরী, প্রতিটি তালা'র জন্যে আলাদা আলাদা রকমের চাবী তৈরি হয়, তাছাড়া নব-তাল এমন ভাবে ডিজাইন করা— যাতে, খুলে বা ভেঙে চুরি করা [illegible] যায়, তাই [illegible] বেশী নিরাপত্তা। পেতল আর ইস্পাতের ডবল খোল থাকে ব'লে এটি দারুণ মজবুত।

এটি তৈরি করছেন গোদরেজ—নিরাপত্তার সরঞ্জাম তৈরি করতে যাদের আছে ৭০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা।

নব-তাল

তিন সাইজে পাবেন :
৫০ মিলিমিটার (৬ লিভার)
৬৭ মিঃ মিঃ (৭ লিভার)
৮৫ মিঃ মিঃ (৮ লিভার)

Godrej গোদরেজ [illegible]

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশন এবং নতুন শিল্পোন্নয়ন নীতি

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের যে অধিবেশন হয়ে গেল তার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ" সম্পর্কে গত বছর অধ্যাপক গ্যাডগিল যে দলিল প্রস্তুত করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশের সুষম শিল্পোন্নয়ন হবে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে যোজনা কমিশন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। একটি হচ্ছে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ শহরের ১০০ মাইলের মধ্যে নতুন কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ না দেওয়া এবং অপরটি হচ্ছে নয়টি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যকে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া।

কলকাতা শহরের ১০০ মাইলের মধ্যে নতুন কলকারখানা স্থাপনে নিরুৎসাহ করে যোজনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে সুপারিশ পাঠিয়েছেন তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই সুপারিশের প্রতিবাদ এসেছে সব দিক থেকে; পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী, উন্নয়নমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী যেমন তার প্রতিবাদ করেছেন, অনুরূপভাবে প্রতিবাদ করেছেন বিভিন্ন বণিক সভা। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারস অব কমার্সের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেছেন, এই সুপারিশ কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির কণ্ঠরোধ করা হবে। একেই এই রাজ্যের অর্থনীতি একটি অচল, অনড় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে; এই অবস্থায় যোজনা কমিশনের উক্ত সুপারিশ কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও দুস্তর হবে। এই সুপারিশের ফলে অনুন্নত এলাকাগুলির শিল্পোন্নয়নেও খুব সুবিধা হবে তা নয়। শিল্পোন্নয়নের শর্ত হচ্ছে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহ, আর্থিক সম্পত্তি, শ্রমিকের যোগান এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। যদি কোন অঞ্চলের স্বাভাবিকভাবেই এই সুবিধাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তবে শিল্পপতিগণ ঐ অঞ্চলের প্রতি এমনিতেই আকৃষ্ট হবেন। এজন্য বড় বড় শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বঞ্চিত করে অনুন্নত অঞ্চলে জোর করে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার নীতি অর্থশাস্ত্রের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য যে আর্থিক সম্পদ থাকা দরকার তার সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থা করার দরকার এবং কোন বিশেষ এলাকায় শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে কোন প্রশাসনিক বা আর্থিক নিয়ন্ত্রণ জারি না করেই এটি করা দরকার। কলকাতা শহরের শিল্পোন্নয়ন হয়েছে প্রধানত হুগলী নদীর এবং রেল-পথের ধারে ধারে; কিন্তু এখনও সমগ্র মেট্রোপলিটন জেলাতেই সমানভাবে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে তা নয়। এইসব জায়গায় এখনও শিল্পোন্নয়নের সুযোগ রয়ে গেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের জন্য যে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা ঠিকভাবে খরচ করা হলে শিল্প-সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। তা ছাড়া কলকাতা শহরের পশ্চাদভূমি (hinterland) যথেষ্ট ব্যাপক। এজন্য কলকাতা শহরের আশেপাশে শিল্প-সম্প্রসারণের এখনও যথেষ্ট সুযোগ আছে। বৃহত্তম কলকাতা যে "স্যাচুরেশন পয়েন্টে" পৌঁছে গেছে এ কথা বলা যায় না। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে রাজ্যের যোজনা ও উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন যে, কলকাতা-কেন্দ্রীয় শিল্প-সম্প্রসারণের প্রভূত অবকাশ আছে। সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা অনুচিত। মহানগরগুলির আশেপাশে শিল্পপ্রসার বন্ধ করলেই যে অনগ্রসর এলাকাগুলিতে শিল্প-সম্প্রসারণ হবে এ ধারণা ভুল। যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রদত্ত এই সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকেই আসেনি, মহারাষ্ট্রও এই সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। বলা বাহুল্য, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি এই সুপারিশ বিবেচনা করেননি।

যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপ ভারতের নয়টি রাজ্যকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বলে ঘোষণা করেছেন। অনগ্রসর এই রাজ্যগুলি হল—অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, আসাম, উত্তর-প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং নাগাভূমি। এই রাজ্যগুলিতে নতুন কোনও শিল্প স্থাপন করতে হলে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে, কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকি (Subsidy) হিসাবে তার এক-দশমাংশ দেবেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি-ই এটি স্থির করেছেন। অনগ্রসর রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে দুইটি জেলায় শিল্পোন্নয়নে বিশেষ উৎসাহ দিতে হবে। যেসব রাজ্য অনগ্রসর বলে উল্লেখিত হয়নি সেইগুলির প্রত্যেকটিতে একটি জেলায় শিল্পোন্নয়নে বিশেষ উৎসাহ দিতে হবে। অনগ্রসর রাজ্যগুলিতে শিল্প স্থাপনে আর কিরকম আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে যোজনা কমিশন তাও ঠিক করবেন। রাজ্য-সরকারগুলির মতামত জানার পরই এই প্রকল্প চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে। অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে ভরতুকি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পশ্চিমবঙ্গ ও মহা-রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় এটিকে প্রভেদমূলক ব্যবস্থা বলে আখ্যা দেন এবং তার বিরোধিতা করেন। অনগ্রসর রাজ্যগুলির শিল্প-সম্প্রসারণে যে শতকরা দশ ভাগ ভরতুকি সরকারের দিক থেকে দেওয়া হবে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার বেশী হবে না বলে স্থির হয়েছে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক

ভারত সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা বোর্ড চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে রপ্তানির পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ হারে বাড়াবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অনেক আগেই শতকরা সাত ভাগ হারে রপ্তানি-আয় বাড়াবার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। যদি এই কর্মসূচী কার্যকর হয়, তবে ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে রপ্তানি-আয় হয়েছে প্রায় ১৩৪০ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে তা হবে ১৯০০ কোটি টাকা। রপ্তানি বাড়াবার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই যাতে অবলম্বিত হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য বাণিজ্য উপদেষ্টা

বোর্ডের আন্তর্জাতিক বৈঠক সম্পাদিত করেন। ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ৫৭টি নতুন জিনিসের উপর বাণিজ্য-শুল্কের কাটছাঁট হ্রাস করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থাও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রপ্তানির পরিমাণ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদিত সামগ্রীর মান আরও উন্নত করা, উৎপাদন-খরচ কমানো, জাহাজে জিনিস বোঝাই করার আগে তার মান ঠিকভাবে পরীক্ষা করা এবং নতুন নতুন জিনিসের চাহিদা যাতে আরও বিস্তৃত হয়, তার চেষ্টা করা প্রভৃতি ব্যবস্থা অনতি-বিলম্বে কার্যকর হওয়া দরকার। অবশ্য উপর্যুক্ত সব ব্যবস্থাই সরকার গ্রহণ করেছেন: কিন্তু গৃহীত ব্যবস্থাগুলি যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয় সেইজন্যই বাণিজ্য উপদেষ্টা বোর্ড নতুন করে এ জিনিসগুলির উল্লেখ করেছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তত্ত্বাবধায়কদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্পপতি, সাধারণ মানুষ, সবাই যাতে ব্যাংকের কাছ থেকে উদার শর্তে ঋণ পেতে পারেন এবং ব্যাংকগুলিও যাতে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারে তার উপর প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে জোর করে একীভূত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই, এ কথা প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে ঘোষণা করেন। তবে বিভিন্ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়কগণ প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সবগুলি শাখার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংহতি আনার জন্য একটি নতুন যৌথ সংস্থা গঠন করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে সকল ক্ষেত্র এতদিন ব্যাংক সাহায্যের আওতা থেকে বাইরে ছিল, যেমন খুচরা ব্যবসায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ছোট-খাটো মেরামতকারী শিল্প, ক্ষুদ্র চাষ-বাস প্রকল্প এবং খেটে কাজ করার ক্ষেত্র প্রভৃতিকে ব্যাংক কতটা আর্থিক সাহায্য দিতে পারে সেজন্য একটি কর্মসূচী তৈরি করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ঋণদান নীতির একটি নতুন দিক উদ্ঘাটিত হবে।

—সুব্রত গুপ্ত

([illegible])

পরদিন বাংলা বন্ধ। বেলা করে উঠে বিষ্টু তার নতুন কেনা টেরিলিনের শার্ট, টেরিকটনের গাঢ় রঙের প্যান্ট, আর ভারী সোলের জুতো জোড়া পরে নিল। এখন তার নাম হয়ে গেছে। কলকাতার গুণ্ডা মহলে নাম করে নিচ্ছে বিষ্টু। দুর্গাপুর থেকে ফিরে আসার পর আদিলের চায়ের দোকান থেকে খবরটা ছড়িয়ে গেছে। বিষ্টুর একটা বেশ মজা। শরীরটা শক্ত হয়ে যায়, বুক ঠেলে ওঠে। সাফল্যের কেমন এক ধরনের আনন্দ আছে।

রোদ-চশমা পরে একটা টহল দিয়েই পাড়ার অনাচকানাচ থেকে একজন দুজন সঙ্গ নিতে থাকে। তোষামোদকারী। বিষ্টু ঠোঁটে হাসে। রাজার মতো হাঁটতে থাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে দেয় এদিক ওদিক বিষ্টু মাস্তান।

আদিল এখন খাতির করে খুব। পর পর দুবার চা খাওয়াল সবাইকে। সসম্ভ্রমে ধরছে কাপ।

—বন্ধ রে?

কী একটা হিসেব বলল আদিল, বিষ্টু বুঝলই না। পাঁচ টাকার একখানা নোট দুমড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বিশুকে জিজ্ঞেস করল—আজ হরতাল কিসের?

—খাদ্য সমস্যা। কমিউনিস্টরা ডেকেছে।

কথাটা ভাল করে কানে গেল না বিষ্টুর। সিগারেট ধরানোর সময়ে হঠাৎ তার মনে হল অনেকদিন হয় তার সঙ্গে হরতাল-টরতালের আর যোগাযোগ নেই। তবু যখন দেখা যায় হরতালের দিন সব অফিস-দোকান বন্ধ, কলকারখানার চাকি চলছে না, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া নেই তখন কেমন যেন বুক ভরে ওঠে। মিছিল দেখলে চনমন করে শরীর।

পাড়ার হরিণ তার পানের দোকানের একখানা তক্তা খুলে চোরের মতো সিগারেট বেচছে, সেখানে ভিড়। বিষ্টু দলবল নিয়ে গিয়ে তার দোকান ঘিরল।

—বন্ধ করে দে।

হরিণ ভয় পেয়ে বলে—বন্ধই তো। কেবল চেনা লোক দেখে দিচ্ছি—

—না একদম বন্ধ। শালা দেশের লোক না খেয়ে আছে আর তুমি পয়সা লুটবে!

বিষ্টুর সঙ্গীরা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে।

বিষ্টু টহল মারে পাড়ায়। বড় রাস্তায় ফুটবল খেলা হচ্ছে, গলির মধ্যে ক্রিকেট। ওরা খেলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু তেলে-ভাজার দোকান কেন খোলা? মিষ্টির দোকানের ভিতর থেকে কেন আসছে জিলিপির গন্ধ? বন্ধ, সব বন্ধ করে দে। দেশের মানুষ না খেয়ে আছে—

বিষ্টুর গা গরম হয়ে যায়। বন্ধ, সব বন্ধ আজ।

দুর্গাপুরের লোকটা কোন দলের ছিল কে জানে! অত খবর বিষ্টুকে দেয়নি ওরা। কিন্তু ব্যাপারটায় রাজনীতি আছে, বিষ্টু জানে। টালিগঞ্জের শঙ্কু তাকে কাজটা ধরে দিয়েছিল, বলেছিল, তুই-ই যা-নতুন উঠছিস, হাত পাকবে। এখন সে লোকটার বালবাচ্চা বউ কিংবা মা বাপ কাঁদছে হয়তো। ওরা তো জানে না বিষ্টু আঠা দিয়ে বোমা বাঁধে, আঠা শুকোলে ছোট্ট আর কড়কড়ে হয়ে আসে মারাত্মক জিনিসটা, যত শুকোয় ততই যে-কোনো সময়ে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমনও হতে পারত যে বিষ্টুর হাতেই ফেটে গেল বোমাটা—তখন কোথায় থাকত বিষ্টু? বোমা তো আর কারো পোষা নয় যে বিষ্টুকে চিনে রাখবে! পরশুদিন গাড়ির সেই লম্বা লোকটা বলেছিল যে তাকে দেখলে নাকি মনে হয় তার কোনো প্রিয়জন মারা গেছে। কথাটা ঘুরিয়ে বলা; আসলে লোকটা বুঝতে পেরেছিল যে বিষ্টু খুনে। না, দুর্গাপুরের সেই লোকটা বিষ্টুর প্রিয়জন ছিল না, শত্রুও নয়। কোন্ দলের যে তাও বিষ্টু জানে না। তবু সে লোকটার জন্য তেমন দুঃখও নেই বিষ্টুর। ভারতবর্ষে যদি এতদিনে তেমন কোনো যুদ্ধ হত, তবে বিষ্টু যেত সৈন্যের খাতায় নাম লেখাতে। কত অচেনা মানুষ মারা পড়ত তার হাতে। এও অনেকটা সেরকমই, টাকা খেয়ে মানুষ মারা। তবে আর দুঃখ কিসের। নিজের মতো করে বিষ্টুও একজন সৈন্য। কেবল একটা ব্যাপারেই খটকা লাগে তার। দুটো খুনের বেলাতেই সে সেই কবেকার ছেলেবেলার কেউটে-তাড়া-করা বিকেলের দৃশ্যটা দেখেছে। পিছনে আলের ওপর দাঁড়িয়ে একটা মুসলমান লোক লম্বা লাঠি তুলে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে—ভাইরে-এ-এ। কে

ঐ লোকটা? কেন সে দু দুবার বিল্টুকে আক্রমণ করেছে ?

ভাবতে ভাবতে মাথা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে।

মৃদুলাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে বিল্টু দেখে বাইরের ঘরে মৃদুলার বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছে। আজকাল আমাকে চোখ পড়লেই কেমন অসহায়ভাবে তাকায় লোকটা, বিড় বিড় করে ঠোঁট নড়ে। যেন বলে—আমাকে মেরো না। কদিনেই লোকটা বুড়িয়ে গেছে অনেক। দুশ্চিন্তা। মৃদুলার বিয়ের খবর পেয়ে দুবার বুড়োটাকে ধরেছিল বিল্টুরা। বুড়ো ওদের পায়ে ধরেছে। বাঁচান! হায় ঈশ্বর! ক'দিন সারা রাত ঢিল পড়েছে ওদের বাড়িতে, সদরে ফেলে দিয়েছে গু, সন্ধ্যারাত্রে ছোরার ওপর টর্চ ফেলে বাইরে থেকে ছোরা চমকে ভয় দেখিয়েছে। এত কিছুর পর বুড়োটা নিস্তেজ হয়ে গেছে। মৃদুলার ভাই আজকাল খুব ভয়ে ভয়ে রাস্তায় হাঁটে তাদের মুখোমুখি হলে ভয়ে মুখ সাদা হয়ে যায়। দিনরাত্তির এখন জানালা বন্ধ থাকে ওদের বাসার। বিয়ের পর মৃদুলা আর আসেনি। ভয়! কিন্তু তাতে লাভ নেই,

বিষ্টু একদিন পেয়ে যাবে মদ্দোকে। খোলা দরজাটার মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ায় বিষ্টু। বুড়োটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে—চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না—যেন সম্মোহিত।

বিষ্টু একটু হাসল। তারপর দলবল নিয়ে হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তা দিয়ে আলো ঢাকা কালো একটা পুলিস-ভ্যান চলে যাচ্ছে। আধখানা ইঁট তুলে নিয়ে বিষ্টু ছুঁড়ে মারল—শালা! ধং করে পিছনের কাচে লাগল ইঁটটা। ভ্যানটা থামল না।

পালা, পালা, পালিয়ে যা। হারামী! এই রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি চলবে না আজ। সব বন্ধ—সব—।

বিশু কানের কাছে মুখ এনে বলে—খামোকা হুজ্জুত করিস না, তোর গন্ধ ছুটে যাবে চারধারে।

হ্যাঁ। বিষ্টু জানে। গন্ধ ছুটবার আগেই তাকে পালাতে হবে। এইখানে বেহালার কোন কোণে বিষ্টু ফুল ফুটে উঠেছে তা টের পেতে মানুষের দেরি হবে না। ইতিমধ্যেই পাড়ার ভদ্রলোকেরা একবার কারেন্ট পিটিশানের মুসাবিদা করেছিল বিষ্টুর নামে। তার আগে ও সির সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ওরা। বিশুরা চুপচাপ করে সেটা বুঝেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা থাকাই ভাল বিষ্টুর। খুনের গন্ধ বহু দূর যায়। সারাজীবন গায়ে লেগে থাকে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বড় গরম হয়ে যায়। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফ্যাল। মাঝে মাঝে ডবল ডেকারে এক নম্বর বা আটের বি কিংবা দু নম্বর বাসে যেতে যেতে বড়োলোকদের অন্দরমহলে চুঁকতে চোখে পড়ে কী সুন্দর পর্দা ওড়ে হাওয়ায় কী সব বিছানা, কিংবা কেমন স্বপ্নের মতো আলো জ্বলে, কেমন গান! নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়ায় ছোটো ব্লাউজ আর আঁচলখসা শাড়ি পরা আপেলের মতো মেয়েরা—তাদের ঘুম ঘুম চোখ—যেন এ-দেশের এ জগতের কেউ নয়। মন্দিরের আশেপাশে প্রকাণ্ড গামলায় গাম আর মাংসের ঝোল খাচ্ছে চকচক করে। ফুর-ফুর করে চলছে এয়ারকন্ডিশনের ঠাণ্ডা ঘরে অকাতরে ঘুমোয় আপসহোলা। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফ্যাল। মার বোমা, উড়ে যাক কলকাতা। লুট করে আন ঐ মেয়েদের, ভিখিরিদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যা ঐ এয়ারকন্ডিশন ঘরের ভিতরে—সামনে সাজিয়ে দে রুটি-মাখন আপেলের টুকরো। ভাঙ শালা, ভেঙে ফ্যাল। মাঝে মাঝে বড় গরম হয়ে যায় বিষ্টুর। ফুলের মালায় সাজানো প্রকাণ্ড গাড়িতে যাচ্ছে বর-বউ, বিষ্টুর ইচ্ছে করে লাফিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায় গাড়ি আটকে বলে—নামো নেমে হেঁটে যাও। এইরকম কত কী ইচ্ছে করে বিষ্টুর। ইচ্ছে করে সুভাষ বোস হয়ে পালিয়ে যেতে, ইচ্ছে করে অস্ত্রাগার লুট করতে, ইচ্ছে করে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গলায় দড়ি পরে 'বিদায় দে মা' কিংবা 'বন্দে মাতরম' গাইতে গাইতে মরে যেতে। কিন্তু বস্তুত শত্রুর দেখাই পায় না বিষ্টু। ইংরেজ আমলে হিসেবটা সোজা ছিল, হীরো হওয়া কঠিন ছিল না। শত্রুকে ছিল চেনা। কিন্তু এখন কেবল মাথাটা গুলিয়ে যায় বিষ্টুর। কে যে শত্রু তা বুঝতেই পারে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বটে একজন দুজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কি একজন দুজন নেতা-ফেতাকে শেষ করে আসি। কিন্তু তাতে কী লাভ? দু-তিনটে দারোগা কি ম্যাজিস্ট্রেট মারলে কেউ তার প্রশংসা করবে না। নেতাকে মারলে নির্ঘাত জনতা তাকে লাথি মেরে শেষ করবে। এখন আর ক্ষুদিরাম হওয়া অত সহজ নয়। সুভাষ বোসও হওয়া যায় না আর। ছেলেবেলায় 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচালে কখনো সখনো পুলিস তাড়া করত, চন্মন করে উঠত আশে-পাশের লোকজন। কিন্তু এখন চেঁচালে লোকে ভেড়ার মতো তার দিকে একটু চেয়ে নিজের কাজে চলে যাবে। ঈশ্বরের বিধানে সব সময়েই তো আর শত্রুর গায়ের রঙ সাদা নয়! সব সময়ে চেনাও যাবে না তাকে যে মুখোমুখি লড়ে যাবে।

তবু বিষ্টুর ভিতরটা জেগে ওঠে। পিচের ওপর আছড়ে ইঁট ভাঙে সে। মিত্তিরদের প্রকাণ্ড বাড়ির একতলায় ঝক-ঝকে ঘষা কাচের সুন্দর জানলা বিষ্টুর ইঁট লেগে মড়াৎ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। 'কে? কে?' বলে কারা ছুটে আসে বারান্দায়। বিষ্টু দৌড়ে চলে যায় অলি-গলির মধ্যে, দু হাত তুলে চেঁচায়—বন্ধ—আজ সব বন্ধ—সব বন্ধ করে দে। একটা ঝাঁপও যেন না খোলে।

রাস্তার চলন্ত লোকজন দ্রুতপায়ে হেঁটে সরে যায়। বন্ধ হয়ে যায় কাছাকাছি জানালার পাল্লা।

বিশু হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে বলে—তুই কি নকশালাইট, না তুই কী? হরতাল তো তাতে তোর কী?

—আমি! আমি! ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে না বিষ্টু। কিন্তু হঠাৎ ভিতরটা টগবগ করে ফোটে।

—হুজ্জুত করিস না। তোর এ সবে মাথা গলানোর কী? তোর পকেটে টাকা আছে, তোর বাবার পয়সার অভাব নেই...

আই। বিষ্টু দাঁড়িয়ে যায়। বাবা! বাবার কথা মনেই ছিল না। তিন-চারটে গরুর দুধ আর তার সঙ্গে মিল্ক পাউডার, সরাদিন আর কী সব যেন মিশিয়ে তৈরী হয় দুধ, ছানা। কী এক অদ্ভুত উপায়ে

টালিগঞ্জ খালপারে চলে যাবার মিষ্টির দোকান। মনে পড়তেই ঝিমিয়ে যায় বিভু। এককালে বাবা লেগে নিজের হাতে চাষ করত। এখন অকস্মাৎ ফিরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

যদি যাপকেই মারি তা হলেই কি শহীদ হওয়া যাবে? দূর! তাই কখনো হয়। লোকে শুধু দেবে পারে।

না, শত্রু চেনা এখন আর সহজ নয়। সকলেই সকলের শত্রু। মানুষ মারলে এখন আর বাহবা নেই। সেই ভোররাত্রে উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে গীতা পড়তে পড়তে হঠাৎ ফাঁসিতে চলে যাওয়া—জেলখানার বাইরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোক কাঁদছে—ফিসফিস করে বলছে 'অমর শহীদ বিভু ঘোষ জিন্দাবাদ'—এরকম একটা ছবি স্বপ্নের মতোই থেকে যাবে। অলীক।

তার চেয়ে যদি কখনো যুদ্ধ হয়! বিভু চলে যাবে। তারপর ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের শেষে একদিন তার দেহ নির্জন নদীর ধারে পড়ে থাকবে, বুটসুদ্ধ পা দুখানা অন্ত-জলিতে জল ছুঁয়ে আছে, মুখে হাসি—আমি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি।

শুনলে হা-হা করে হেসে উঠবে লোকজন।

না, ওসব কিছু আর হবে না। বিভু আস্তে আস্তে ভাড়াটে হয়ে যাবে। শুধু গোপনে তার অন্তরে এক না-হওয়া শহীদের, বিপ্লবীর, দেশপ্রেমিকের রক্ত ফুট-ফুট করে ফুটে ফুটে ক্রমে শীতল হয়ে আসবে।

মৃদুলাদের বাড়িটাকে ভরদুপুরেও পোড়ো বাড়ির মতো দেখায়। লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে যেন।

ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে বিভুর। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে। কোনো দিন বিভু একটা খুব মহৎ কাজ করে মরে যাবে। তার সেই কীর্তির কথা মৃদুলা যেন জানতে পারে, হে ভগবান! যেন তার জন্য মৃদুলাকে একদিন কাঁদতে হয়।

কাল মাঝ রাতে রিনি হঠাৎ ঠেলে তুলেছিল সঞ্জয়কে—শুনছো, আমার বড্ড ভয় করছে।

হুইস্কির গভীর আচ্ছন্নতা থেকে আঠায় লাগানো দু চোখের পাতা খুলে সঞ্জয় বলে—কিসের ভয়! স্বপ্ন দেখেছো?

কী যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনল রিনি, বলল—ঐ শোনো। এত রাতেও রাস্তায় কারা চিৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাবার চাইছে।

সঞ্জয় কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে শুনল। এ তার চেনা চিৎকার। 'মা গোঃ, মা গোঃ' বলে গলিতে গলিতে, রাস্তায়, বড় রাস্তায় কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গলার ঐ অপার্থিব চিৎকার। কলকাতার আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এরা পাড়-কুড়ুনী। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলে রাস্তায় বেরোয়।

রিনির ভীতু সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঘুম-চোখেও সঞ্জয়ের হাসি গেল। বলল—এ তো রোজকার ব্যাপার। আজ নতুন করে শোনার কী?

রিনির মাথা নড়ে উঠল। ইয়ারিং ঝলসে ওঠে ম্লান আলোয়। বলল—রোজ শুনি। তুমি তো ঘুমোও, আমার যেন কেমন গায়ে কাঁটা দেয়, ঘুম আসে না। কত মেয়ে মদ্দ রাত জেগে পথে পথে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন করে।

সঞ্জয় হাসে।

রিনি বলে—হেসো না। এরা আগে এত বেশী ছিল না। দিনকে দিন বাড়ছে।

—ভিখিরিকে ভয় কিসের রিনি? বলে পাশ ফেরার চেষ্টা করে সঞ্জয়।

রিনি আস্তে করে বলে—ওরা সবাই কি ভিখিরি?

—না তো কী? গাঁয়ে যখন খরা কি বন্যা হয় তখন দলে দলে চলে আসে শহরে। এবারও হয়তো কিছু একটা হয়েছে কোনো জেলায়। প্রতি বছরই হচ্ছে তো!

—কী হয়েছে?

—কী জানি! কাগজে লিখছে এবারকার ফলন ভাল নয়।

রিনি শ্বাস ফেলে বলে—কাল দেখলাম আমাদের পায়ের দিকের জানালার শার্সিতে একটা ছায়া। ঘোমটা মাথায় একটা বউ, তার কোলে বাচ্চা ছেলে। এমন চমকে উঠেছিলাম! মনে হল জানালার কাছে গিয়ে দেখব যে, ওখানে কেউ নেই, কেবল ছায়াটাই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাতেও বোধ হয় কেবল চিৎকারগুলোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক এরকম অদ্ভুত মনে হয় আমার—

—তা হলে ভূতই হবে বোধ হয়।

—আচ্ছা গো, এই যে দিনরাত জুড়ে দেশময় ভিখিরিরা হাঁটছে, তার মানে কি ভিখিরিরা অনেক বেড়ে গেছে?

—অনেক।

রিনি একটু চুপ করে থাকে। অন্ধকারে তার ঘন শ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

—বড় ভয় করে গো!

—ভয় কিসের?

মনে হয় এরা শীগগীরই দলে ভারী হয়ে যাবে খুব। আর এরা দল বাঁধলে—

সঞ্জয় নিঃসাড়ে হাসল। রিনি একটা আঙুল দিয়ে ওর বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটল।

তারপর বলল—দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে
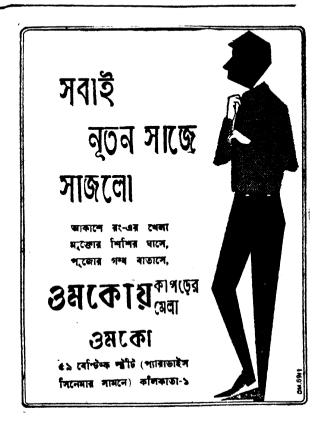
না-খাওয়া খিদে-পাওয়া লোক, দিনরাত জুড়ে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। আমার বুক কাঁপে। আমি যেন টের পাই, আমাদের এই ছোট্ট একটু ঘর-সংসারের দিকে, আমাদের এক ফোঁটা পিকলুটার দিকে চারদিকের খিদে-পাওয়া মানুষের শাপ-শাপান্ত ছুটে আসছে। আমার বিধবা ঠাকুমা মার সঙ্গে ঝগড়া হলে মাটিতে লাথি মারতে মারতে বলত—তোদের অবস্থা যেন আমার মতো হয়—আমার মতো হয়। ঠিক সেইরকম বুঝলে, ঠিক সেইরকম আমি চারদিকে মাটিতে লাথি মারার শব্দ শুনি। আমার বুকের মধ্যে ধুপধুপ শব্দ হয়। কারা যেন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—তোদের অবস্থা যেন আমাদের মতো হয়—আমাদের মতো হয়—আমাদের মতো হয়। অনেক সময়ে শাপ-শাপান্ত ভীষণ ফলে যায়, জানো?

শুনতে শুনতে সঞ্জয় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, ও বাচ্চা মেয়ের মতো সঞ্জয়ের বুকের মধ্যে মিশে রইল। আধফোটা গলায় বলল—তুমি এসবে বিশ্বাস করো না, না?

সঞ্জয় আস্তে করে বলল—মিছিল দেখেছো রিনি, শুনে দেখো মিছিলের স্লোগানেও কত অভিশাপ থাকে। সব কি ফলছে? ভেবে দেখলে আমাদের সকলেরই মন-ভরা অভিশাপ। কাকে দিতে হবে তা জানি না।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সঞ্জয়।

আজ সকাল থেকেই আবার গড়িমসি করছিল সঞ্জয়। বেলায় ঘুম ভেঙেছে আজ। তারপর রিনির নরম সাদা বুকের মাঝখানে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ। চন্দনের গন্ধ পেয়েছে গা থেকে। জিজ্ঞেস করেছে—কাল তোমার গীটারের মাস্টার এসেছিল?

—হুঁ।

—কী শিখলে?

—বাব্বাঃ, আজকাল যে খুব খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে! ব্যাপার কী?

সঞ্জয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে বলেছে—শেখো, খুব ভাল করে শেখো। আমি জীবনে সিটি দেওয়া ছাড়া আর কিছু শিখিনি। পিকলুকে তুমি গানবাজনা কিংবা সাহিত্য ফাহিত্য কিছু একটা শিখিও। ওরকম একটা কিছু জানা থাকলে মানুষের একটা কিছু থাকে।

পিকলু তখন উপুড় হয়ে প্রাণপণে হামা টানার চেষ্টা করে গর্জন করছিল চারদিকে উঁচু বালিশের বেড়া পার হতে পারছিল না। রিনি তার গাল টিপে দিয়ে বলল—শোনো পিকু, বাবু কী বলছে! তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

সঞ্জয় আস্তে বলল—যদি বাঁচে।

—ফের!

সঞ্জয় হাসে। ভিখিরির অভিশাপ ফলে যায়, রিনির এ বিশ্বাসও আছে। না, সিঁদুর লুকিয়ে, সেজেগুজে, গীটার শিখেও রিনি কোথায় যেন থেমে আছে।

সঞ্জয়ের মন ভাল নেই। কাল রমেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মন খারাপ হয়েছিল। আহা, বেচারা রমেন। এখন ওর আর কিছু নেই। চক্রবৎ সুখ দুঃখ আসে। এ তো জানা কথা। তবু কি তা ভাবতে ভাল লাগে? রমেন যখন গঙ্গার ধারে তার প্রকাণ্ড বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে পিয়ানো বাজাত, যখন পুরোনো মোটরখানা দাবড়ে চষে বেড়াত কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার, তখন সঞ্জয় সামান্য মোটর মেকানিক ভূতের মতো খাটে আর পয়সা জমানোর বৃথা চেষ্টা করে। আর গতকাল তার এয়ার-কণ্ডিশনড অফিস ঘরে মুখোমুখি বসে

ছিল রমেন যার কিছুই নেই। আবার কি কখনো এই অবস্থা পাল্টে যাবে? উল্টো হয়ে যাবে ছবিটা? ঐশ্বর্যবান এক রমেনের পাশাপাশি একই সমাজে বাস করবে ভিখিরি সঞ্জয়! দেখা যাচ্ছে কোনো কিছুরই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব নেই। রিনির ঐ যে ভয়, ওটাও একদিন সত্যি হতে পারে—জোট বাঁধতে পারে ভিখিরি আর অকিঞ্চন মানুষেরা।

এক এক সময়ে মনে হয় যখন তার কিছুই ছিল না তখনই সঠিক ঐশ্বর্যবান ছিল সঞ্জয়। তিনটে গুণ ছিল তার। সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। তখন সে কত রাত চটের বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে। তার কোলের মধ্যে শুয়ে থাকত একটা বেড়াল, মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেত ইঁদুর। কখনো বা ফুটপাথে শুয়ে থেকে সে শুনেছে গায়ের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে মাতালের পা, ঘুম ভেঙে কখনো দেখেছে রাতের আকাশ থেকে সহস্র চোখে কে একজন তাকে লক্ষ করছে। সুন্দর ছিল সেইসব রহস্যময় অনুভূতি। খোলামেলা মানুষ ছিল সে। সে স্পষ্টই জানত, বুঝতে পারত একদিন তার অবস্থা ফিরবে। যে চায়ের দোকানে সে বয়গিরি করত সেটা উঠে গেছে এখন, তার মালিক মারা গেছে লিভার সিরোসিসে, ছেলেমেয়েগুলো এতদিনে রাস্তায় নেমে গেছে বোধহয়। হাজরার মোড়ের কাছে সেই মোটর সারাইয়ের কারখানা যেখানে সে ছিল মেকানিক তা সেরকমই ছন্নছাড়া রয়ে গেছে। পরশুদিন সেই কারখানার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল সঞ্জয়—বুড়ো হয়ে গেছে বাদু মিঞা—কালো একটা মোটর গাড়ির বনেট-খোলা ইঞ্জিনের মধ্যে ঝুঁকে গাড়ির মালিকের সঙ্গে দরাদরি করছে বোধ হয়। ইচ্ছে হয়েছিল গাড়িটা একবার থামায়। কিন্তু লজ্জা করেছিল। সে তো সেই ছেলেবেলাতেই জানত যে একদিন সে মোটর দাবড়ে ঘুরে বেড়াবে, বাড়ি করবে বালিগঞ্জে। কেননা তার তিনটে গুণ ছিল—অসম্ভব তিনটে গুণ। যা ওদের নেই। সে গাড়ি থামায়নি।

সত্য বটে, গুণগুলো এখন আর সঞ্জয়ের নেই। তবু সে নিজের চেষ্টাতেই উঠেছে এতদূর। তাই এখন যদি দুম করে একটা কিছু হয়, যদি জোট বাঁধে ভিখিরিরা; যদি বিপ্লব হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনায় হঠাৎ পঙ্গু হয়ে যায় সে, যদি মারা যায়, তবে আবার সব চলে যাবে। কেন যাবে? কেন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই সংসারে? যদি এখন কেউ এসে তার কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বলে—আবার গোড়া থেকে শুরু করো দেখি। কেমন পারো শূন্য থেকে তৈরি করতে বাড়ি, ঘর, ফ্রিজিডেয়ার, মোটর গাড়ি। তাহলে কিছুতেই পারবে না সঞ্জয়। কিছুতেই না। কেবল ভয় করে এখন। অকারণে মাঝে মাঝে ভয় করে।

যেমন ভয় করেছিল কাল, রমেনের মুখোমুখি বসে থেকে।

ভুলেই গিয়েছিল সঞ্জয়, রমেনের চিন্তায় মনে পড়ল রমেনকে সে নিমন্ত্রণ করেছে। একদিন রমেন আসবে বাসায়।

মুখ তুলে রিনির ছেলেমানুষ মুখখানার দিকে চেয়ে বলল—রিনি, তুমি নিরামিষ রান্না কেমন রাঁধো? ভালো?

—কেন?

—একদিন আমার এক বন্ধু খাবে।

—কে গো?

—রমেন ব্যাটা হাফ-সন্ন্যাসী।

—কোন্ রমেন? যার বউ পালিয়েছিল?

—হ্যাঁ—

কলিং বেলটা টুংটাং করে বেজে উঠলে বিছানা ছেড়ে উঠল সঞ্জয়। দরজা খুলে দেখল পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাজী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

লোকটা বাংলায় বলল—আপনার টেলিফোন।

সঞ্জয় এখনো নিজের টেলিফোন পায়নি, অ্যাপ্লাই করেছে অনেকদিন। এই লোকটার টেলিফোনে তার কাজ চালাতে হয়।

টেলিফোন ধরতেই চমকে গেল সঞ্জয়। অজয়ের গলা।

—কে! সঞ্জু? শীগগীর আয়—মার স্ট্রোক।

হঠাৎ হাত পা হিম হয়ে আসে, গলা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বলে—কিসের স্ট্রোক?

—জানি না। অবস্থা ভাল না। জ্ঞান নেই। চলে আয়।

—কী করে যাবো? আজ তো সব বন্ধ!

—পুলিসের গাড়ি ধরার চেষ্টা কর, ওরা অনেক সময়ে নেয়। দেরী করিস না।

সঞ্জয় ঘরে ফিরে আসে। তার পা সামান্য কাঁপছে। কিছুক্ষণ অর্থহীনভাবে সে রিনির দিকে চেয়ে রইল।

রিনি জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে?

সঞ্জয় উত্তরে বলল—বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা হেঁটে যাওয়া যায়? তোমার কোনো আইডিয়া আছে কতক্ষণ লাগবে?

রিনি উঠে বসে—কী হয়েছে বলো তো!

সঞ্জয় অন্যমনস্কভাবে বলল—যদি পুলিসের গাড়িতে না নেয় তবে রাস্তাটা আমাকে হেঁটেই পেরোতে হবে।

কেমন লাবণ্যহীন হয়ে গেছে মুদুলার মুখ। ঠোঁট শুকনো, চোখের কোল কালো, হনুর হাড় দুটো জেগে উঠছে। কাল রাতে খাওয়ার পরই বমি হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে বিকেলে দুটো চপ এনেছিল তুলসী। মশারির মধ্যে বসে সেই চপ দুটো খাচ্ছিল যখন তখনই মুদুলাকে খারাপ দেখাচ্ছিল। আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল মুদুলা, মুখখানা হাঁ করা, গাল বসা, শরীরটা যেন মুচড়ে আছে ব্যথা-বেদনায়। ওর খোলামেলা বিশৃঙ্খল শরীর দেখে একটুও কাম জাগেনি তুলসীর। বরং বড় উদোম মাঠের মধ্যে যখন হাওয়া বয়ে যায় তেমনি হা-হা করে উঠেছিল তার বুক—মুদুলা কি বাঁচবে?

তুলসী ঠিক করল এবার থেকে সে ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে, যথাসম্ভব ভাল কাজ করবে রোজ দু একটা, পবিত্র থাকবে। ধর্ম দরকার। মাঝে মাঝে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবে মুদুলাকে।

হরতালের দিন সকালে উঠেই সে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক করল হেঁটে হেঁটে আনোয়ার শা রোড ধরে চলে যাবে ললিতের কাছে। একটা ভাল কাজ করবে আজ। ললিতটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে আসবে।

মুদুলার কথা ভাবতে ভাবতে তুলসী হাঁটছিল।

সকালে প্রথম যার মুখ দেখল বিমান, সে রমেন। সঙ্গে ললিত।

আজ সকালে বিমানের চোখ অনেকটা ঘোলাটে লাল হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কথার তাল থাকছে না।

সে জোর করে মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল। ওদের বসাল বিছানার ওপর, তারপর নিজের হাতে চা করতে বসল। অনেকবার চায়ের বাসন-কোসন, কেটলি, চামচ, দুধের কৌটো গোলমাল করে ফেলছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টার চেষ্টায় সে তিন কাপ চা বানিয়ে ফেলল। চা বানাবার সময়ে অনর্গল কথা বলছিল সে, কাকে বলছে তা সব সময়ে খেয়াল ছিল না। মাঝে মাঝে হাসছিল।

রমেন তাকে জোর করে পাশে বসাল, কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে বিমান?

বিমান কথার তাল রাখতে পারছিল না। কেবল অতি কষ্টে বলল—সব ব্যাপারই কেমন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে—না?

—কী ব্যাপার?

বিমান সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল—অথচ কত সুন্দর হতে পারত সব কিছু!

একটু চুপ করে থেকে বিমান বলল—এবার আমার একদম ইচ্ছে করছে না।

—কী! ললিত আকুল প্রশ্ন করে।

—এই প্যাগল হয়ে যেতে।

(ক্রমশ)

জেফ্রি ম্যানার্স অ্যান্ড কোং লিঃ

হিন্দুদের মত প্রচলিত নয়; তদুপরি তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর বঙ্গে, যেখানে আহারাদির ব্যাপারে, বঙ্গের তুলনায় তেতোর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

নওয়াব আলী তাতে উচ্ছেতে প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই আঁতকে উঠে মুখ বিকৃত করে বললেন, "ওঃ! কী তেতো! এটা কি করে এল?"

গৃহকর্তা হকচকিয়ে গদগদ হয়ে মৃদু-কণ্ঠে নিবেদন করলেন, "আজ্ঞে—জী—এই তেতোটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ভালো।"

নওয়াব আলী বুঝতে পেরে আমার রাশান গল্পেরই মত মৃদু হাস্য করে বললেন, "স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো? তা হলে তেতো ওষুধ খেলেই হয়। আহারাদির বেলা এ-উৎপাত কেন?"

✲

অর্থাৎ আমার রাশান গল্প যা বলেছিলেন টায় টায় তাই।

খেতে বসেছি, ক্ষুধা নিবারণ তথা আনন্দের জন্য। তখন ঐ তেতোর উৎপাত কেন? আমার গল্পেও তাই বলেছিলেন। "উপন্যাস পড়তে বসেছি, আনন্দের জন্য। সেখানে আবার সাইকলজি, সাইকো-এনালিসিস, সসিয়লজির তিক্ত উৎপাত কেন?"

নিন্দনাসিক সরল পাঠক, তুমি আদৌ ভেবো না যে, আমার ঐ রাশান গল্পেই একমাত্র পণ্ডিত ফিন পূর্ণদিবস, ত্রিযামা-যামিনী কঠিন কঠিন শাস্ত্রাধ্যয়ন গবেষণা করার পর টিকটিকি উপন্যাস পড়তেন। আরো বিস্তর বিস্তর আছেন। কিন্তু এ-স্থলে স্থানাভাব।

আমি মূল বক্তব্যে ফিরে যাই।

ইংরেজ জাত উন্নাসিক, তথ্য সে তথ্য আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।

কিন্তু এস্থলে [illegible] অভিজ্ঞতার আমাকে আরেকটি তথ্য নিবেদন করতে হচ্ছে: সেই যে টিকটিকি-নভেলের লেখক এডগার ওয়ালেস,—তাঁর [illegible] মধ্যে ছিলেন [illegible] এবং ঐ শ্রেণীর আরো [illegible] "উন্নাসের" সাহিত্যিক, [illegible], চিত্রকর, সাহিত্য সমালোচক [illegible]। এঁরা ওয়ালেসকে [illegible] পেলে কৃতকৃতার্থ [illegible] করে জমে উঠতো। [illegible] তাঁর [illegible] তাঁর বিখ্যাত [illegible] ইংল্যাণ্ডেশ্বরের হাতে নাইট উপাধি পেয়েছেন।

✲

আর [illegible] বাঙালী [illegible] স্বীকার করতে চাইনে।

এ-স্থলে কেমন যেন একটা [illegible], উন্নাসিকতা, এমন কি সামান্য ভণ্ডামিও রয়েছে।

ছেলেবেলায় রূপকথা পড়েছি—বই, আজ তো সেগুলোকে অস্বীকার করিনে। বাল্য ও কৈশোরে পড়েছি টিকটিকি উপন্যাস, যৌবনারম্ভে পড়েছি সেক্সপীয়র—এমন কি পর্ণগ্রাফি পর্যন্ত (মূল আরবী "আরব্য রজনী"তে যে কী বিকট বিকট যৌন লীলার বর্ণনা আছে তার সামনে শ্রীযুক্ত সমরেশ বসু শিশু, শিশু!!)। তবে উন্নাসিকরা টিকটিকি ও যৌনলীলার বই অস্বীকার করেন কেন?

উন্নাসিকতার বেলায়ও কনসিসটেন্সি থাকা উচিত, সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এই পরস্পর-বিরোধী আচরণ কেন?
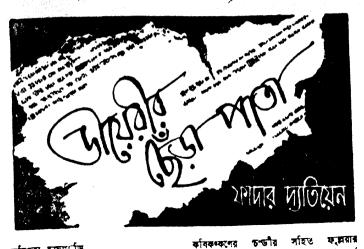
সাহিত্যে হামাগুড়ি

আন্ডারসনের পাঠ্যপুস্তকেই বাংলা সাহিত্যের অন্দরে আমার প্রথম পদক্ষেপ।

মনে আছে বিদ্যাসাগরের 'পথিকগণ ও বটবৃক্ষের' সংস্কৃত-ঘেঁষা সরল গদ্য: "একদা গ্রীষ্মকালে কতিপয় পথিক মধ্যাহ্ন সময়ে রৌদ্র আতিশয্যে তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত..."। মনে আছে কৃত্তিবাসের 'সীতা-হরণে রামের বিলাপের পয়ার: "শুন, পশু পক্ষী মৃগ শুন, বৃক্ষ লতা/কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা"। মনে আছে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ'-এর ত্রিপদী: "এরূপ যৌবনে/ছাড়িয়া ভবনে/কেন আইলা পরবাস?"

শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'র এবং রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র এক উদ্ধৃতি ছিল। শরৎচন্দ্রের "কলেজ, মিনিট, টেবিল, চেয়ার" এবং রবীন্দ্রনাথের "মেডেল,ব্যারিস্টার ফেল, ট্রেন" শব্দগুলো আমাকে আহত করেছিল। সে আবার কি ভাষ, ট্রেন বলতে যে ট্রেন-ই বলে? সংস্কৃত দেবভাষা যার মাতামহী, তার এ কি রকম দারিদ্র্য শব্দসম্ভার?

একদিন কথাবার্তায় আমি 'বিমানে আসা' কথাটা ব্যবহার করেছিলাম সবাই হেসে ফেলেছিল, বলতে হয় নাকি 'প্লেন এ আসা'। পরের দিন 'প্লেন-এ আসা' লিখলাম খাতায়, মাস্টার কেটে দিলেন, লিখলেন, 'বিমানে আসা'। বাঙ্গালীরা, বুঝলাম, বলে এক, লেখে আর এক।

ভালো লেগেছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুনা-অনাদৃত 'স্বর্ণলতা'; যে-কপিটা গত সপ্তাহে সাধারণ পুস্তকাগারে দেখলাম, সেটার প্রায় প্রতিটি পাতায় বিভিন্ন হাতের লেখায় লেখা আছে: বাজে বই। কি শ্যামার সেই কথাটা কিন্তু আমার কানে এখনও বাজে: "আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেব বলে এসেছি?...আমি গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

আর একটা উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি ছিল—আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্'। রিপুদল বারিণী মায়ের সন্তানদের দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃত খরকরবাল আমাকে স্মরণ করিয়েছিল 'লা মার্সেইয়েজ'-এর রক্তপিপাসু ফরাসি "মাতৃভূমির সন্তানদের" কথা। "কলপ্রহরণধারিণী" যে কাকে বলে তা অবশ্য বাংলাদেশের দুর্গাপূজায় প্রতিমা দর্শন করার আগে বুঝিনি।

সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক লেগেছিল মেঘনাদ-বধের উদ্ধৃতি: "নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারে...নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ...কি বলে বুঝাব উর্মিলা বধূরে আমি?" পরে মধুসূদনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়ল যখন দেখলাম তাঁর হেকটর-বধের গদ্যে নামধাতু চালানোর দ্বিধাশঙ্কিত প্রয়াস। আমার পেন্সিলের মাথাটা কামড়াতে কামড়াতে কত-না ভেবেছি, নামধাতু অবাধে চললে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য আরও কত বাড়ত। বাংলা শব্দকোষে পঁচাত্তর হাজার শব্দের মধ্যে নাকি মাত্র ছশো-টি সত্যকার ক্রিয়াপদ আছে; বাকি সব ক্রিয়াপদ—করা, দেওয়া, হওয়া প্রভৃতি শব্দের সহযোগে তৈরি: প্রেরণ করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, পতিত হওয়া...। আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে যে ময়দান থেকে আমরা কার্জনের মূর্তি তুলে দিয়েছি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের নাম মুছে দিয়েছি, মনুমেন্টের আখ্যা পাল্টিয়েছি, আর তবু দেখুন আমাদের ব্যাকরণ থেকে সেই 'বর্বিসক বাংলা' এখনও নির্বাসিত হয়নি, এখনও বলতে পারি না "ছেলেটি মেয়েটিকে [কিংবা, আধুনিক

ভঙ্গিতে, মেয়েটি ছেলেটিকে] পাঠাইল, মানাইল, বিবাহিল।" অসুবিধা আছে অবশ্য একটা : বাংলা ক্রিয়াধাতু হয় একস্বর [কর্, দেখ্...], নয় আকারান্ত দ্ব্যস্বর [দৌড়া, ঘোরা...]। মাইকেলীয় অধিকাংশ নামধাতু কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত দ্ব্যস্বর [উত্তর্, জিজ্ঞাস্...] যার ফলে সাধু ভাষায় তাদের কেমন মধুর শোনায় [উত্তরিব, জিজ্ঞাসিলাম], চলিত রূপে তত নয়; উত্তরব, জিজ্ঞাসলাম ধরণের ধ্বনিতে কান-কে কি অভ্যস্ত করে তোলা যায়?

এ-তুমি কোন্ তুমি?

পাঠ্যপুস্তকটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ছিল। মধুর লেগেছিল 'আজি ঝড়ের রাতে'-র ছন্দ : "সুদূর কোন্ নদীর পারে/গহন কোন্ বনের ধারে/গভীর কোন্ অন্ধকারে/হতেছ তুমি পার?" এবং আজও বেতারের আশীর্বাদে যখন কানে আসে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া সেই 'মেঘের পরে মেঘ' গানটা, তখন মনে পড়ে যায় সুদূর বেলজিয়ামে বিগত দিনের কথা—বাংলা ভাষার আমার হাতে খড়ির কথা।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান আমি এক

পত্রিকায় অনুবাদ করেছিলাম, তিনের বহু প্রশংসিত অনুবাদ পাশাপাশি ছাপিয়ে। পাঠকেরা লক্ষ্য না করে পারল না জিদের অনূদিত ইংরেজী গীতাঞ্জলি মূল বাংলার চেয়ে বেশ কিছুটা সরলীকৃত। সেই ধরনের সরলীকরণের কথা স্মরণ করেই টমসন সাহেব একদা লিখেছিলেন : তাঁর স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে যেন প্রতীচী পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন।

উপর্যুল্লিখিত দুটি গান পূজা-সংকলনে নয়, প্রকৃতি-সংকলনেই স্থান পেয়েছে। তাহলে এমনও কি হতে পারে যে কবিকে যিনি বসিয়ে রাখেন একা ঘরের পাশে, তিনি ঈশ্বর নন? ঝড়ের রাতে অভিসারে যিনি আসেন, তিনিও বোধ হয় ঈশ্বর নন? রবীন্দ্রনাথের কলমে তুমি সর্বনামের মধ্যে দ্ব্যর্থকতা থেকে যায়। "এস, এস আমার ঘরে" গানটা আমি গীর্জায় গাইতে শুনেছি; গানটা কিন্তু পূজার নয়, প্রেমের। কারও কারও মতে এই দ্ব্যর্থকতাই রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাইস্কুলের ছাত্র ছিলাম যখন, তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুবই পড়তাম, এমন কি প্রার্থনার সময়ও তাঁর ব্যবহৃত শব্দযোগে ভগবান ঈশ্বরকে ডাকতাম। এমন দ্ব্যর্থকতার ইঙ্গিত পেলে তো আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হত। এ ধরনের সন্দেহ আমাদের কল্পনার দূরতম কোণেও কখনো স্থান পায়নি। শুধু একদিন, মনে আছে, আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন, আমি জানি না, কিন্তু জিদ যা বুঝেছেন সেটা আমি বুঝি, আর সেটা খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসারী নয়।" কথাটা তখন আমার কাছে হেঁয়ালির মতো শুনিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

আন্ডারসন তাঁর পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিরও এক নমুনা দিয়েছেন—পুরস্কারপ্রাপ্তির তিন মাস পরে শিলাইদহ থেকে তাঁর কাছে লেখা কবির এক পত্রের প্রথম কয়েকটি লাইন :

শ্রীপ্রবরেষু,

আপনি যখন আমাকে ইংরেজীতে পত্র লেখেন তখন আমার কর্তব্য আপনাকে বাংলা ভাষায় তাহার উত্তর দেওয়া, নহিলে ঠিক পাল্টা জবাব হয় না। আপনার দেশে আমার যত বন্ধু আছেন সকলকেই আমার ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখিতে হয়। ভাগ্যগুণে একটি লোক পাইয়াছি যাহার কাছে আমার আপন ভাষায় মনের কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা নাই—এমন সুযোগ বৃথা নষ্ট করিব কেন? ইংরেজী ভাষার কাছে পদে পদে আমি যে কত অপরাধ করিয়া থাকি তাহার আর সংখ্যা নাই; কলমের মুখে আপনাদের ব্যাকরণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিই, কত অব্যয়ের অন্যায় অপব্যয় করি, কত articleকে বিনা দোষে বর্জন এবং বিনা কারণে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আপনাদের ইংরেজী ভাষা-সরস্বতী তাঁহার এই অধম সেবকটিকে যে এত দয়া করিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা ভারতীকে যখন আমার কাব্যপুষ্প দিয়া পূজা করিয়াছি, তখন তাহা আমি আমার সাধ্যমত যত্নপূর্বক চয়ন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রসাদও পাইয়াছি, কিন্তু আমার এই শুষ্ক পত্রগুলো যখন তাঁহার পায়ে গিয়া পড়ে তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। অতএব যেখানে সম্ভব সেখানে এ অপরাধ আর বাড়াইব না, পত্র আপনাকে বাংলাতেই লিখিব।"

সাধু ভাষায় লিখিত এই চিঠির প্রথম বাক্যে রবীন্দ্রনাথ—বোধ হয় অন্যমনস্কভাবে —মিশ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন : "লেখেন... লিখিলে।" 'শ্বেতভুজা'—এই মাইকেলীয় বিশেষণটা সম্ভবত ইলিয়াদ কাব্য থেকে গৃহীত : হোমার মিনের্ভা-দেবীকে Leukolelos Athene নামে অভিহিত করেন। চিঠিটার উপলক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার ছন্দ নিয়ে আন্ডারসনের গবেষণা। এ ক্ষেত্রেও তিনি বাংলা ও ফরাসি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন : এই দুটি ভাষায় শব্দের ওপর স্বরাঘাত নেই যত আছে বাক্যের; বাংলায় অবশ্য বাক্যের প্রথম অক্ষর দীর্ঘায়িত, ফরাসিতে বাক্যের শেষ অক্ষর।

স্বরাঘাতের অভিঘাত

"ছন্দ সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করিতেছেন, আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী কোন কথা কহে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল কিছু লিখিব, কিন্তু আমার কলম অলস হইয়া আসিয়াছে, এখন সে আর নিজের বেগে চলে না, তাহাকে ঠেলিয়া চালাইতে হয়। মোটরগাড়ির কল যখন বিকল হয়, তখন তাহাকে ঠেলা গাড়ি করা সহজ নহে, তখন তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়াই ভাল।

"আপনি বলিয়াছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা আরম্ভে পড়ে; ইহা আমি অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরেজীতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে; সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষায় ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের মাত্রা বৈচিত্র্য আছে। তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে, যথা—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা। উক্ত বাক্যের বেখানে যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে, সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়, সেই বাধার আঘাতে হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

"যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষত্ব আছে, সে ভাষার মস্ত একটি সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য যখন একটা বাক্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার উচ্চ-নীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গে অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলিয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মত। বাড়ির কর্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।"

আপাতত মুলতুবী

কিন্তু থাক এসব তাত্ত্বিক আলোচনা। আসল কথাটা হল আমার বাংলা দেখার গল্প। সবে তো মুরোল বেলজিয়াম-পর্ব... তারপর আছে বাংলাদেশে পদার্পণ, শান্তি-নিকেতন, দক্ষিণ বাংলার বাসন্তী গ্রাম, দক্ষিণ কলকাতায় তিন বছর, আরো কত কি। কিন্তু সে আরেক কাহিনী।

(ক্রমশ)

অদূরের দিল্লী

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণটা ছিল বানান করে করে ত্য-য-ফলা আকার-আর-গ ত্যাগ। সেই ত্যাগ-এর আর এক মহাপুরুষ খান আবদুল গফফার খান। রাজধানী দিল্লীর নিত্য নতুন গড়ে ওঠা বিরাট বিরাট প্রাসাদগুলোর দিকে তাকালে, তার রাজপথের নতুন নতুন অজস্র জল ধারার ফোয়ারাগুলোর দিকে তাকালে, তার ঠাটবাটপূর্ণ হঠাৎ বড়লোকি চালচলনের

দূরাংশ

দিকে তাকালে ওই "ত্যাগ" নামের কথাটিকে রাজধানীর চরিত্র থেকে মুছে দিয়ে তবে অন্য কথা বলতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও খান আবদুল গফফার খানকে দিল্লীবাসী অবশ্যম্ভাবিতা যে সাদর উল্লাসে গ্রহণ করেছে তাতে শুধু নতুন করে প্রমাণ হয়, মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে দুটো চেতনা আছে। একটা ত্যাগের কীর্তন করবার থামোকা ইচ্ছা আর একটা ভোগের পেছনে ছোটা-ছুটির বিকট লালসা। কাজেই মানুষের উৎকট বার্বরতা। আমাদের না আছে গান্ধীজীর মতো ত্যাগ করার ক্ষমতা, না তাঁর আত্মনিগ্রহের ক্ষমতা। তাই গান্ধীজীরই প্রতিমূর্তি বাদশাহ আবদুল গফফার খানকে সামনে পেয়ে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠি। আর সেই চঞ্চলতাকে ঢেকে ফেলবার উদ্দেশে দিল্লীতে অনন্ত উচ্ছ্বাসের বিরাট আয়োজন করি। কেন্টাকেন্টুদের কেউই ভক্তির অশ্রু ঝরিয়ে উঠতে ছাড়ছেন না। কাক-শকুনির দলের ভক্তিবৃত্তটা এখন দেখবার মতো। গভীর গম্ভীর ভাবে দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে। তাই গভীরে কিছুই না দেখে "গান্ধী দর্শন প্রদর্শনী"-তে ঢুকে পড়লাম। বারংবার এই প্রদর্শনীতে আমি আসবই আসব; তার যথাযথ বিবরণও অতি অবশ্যই বারান্তরে এক সময় দেব। চলবে তো এই প্রদর্শনী সমানে এখন পাঁচ মাস ধরে।

আমি সভ্য; সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আমি, অতি মূর্খেরও এই বিশ্বাস। [illegible] বললাম তা আমার মধ্যে [illegible] ছুতো দেখবার যে প্রবৃত্তি হয়ত তারই তাড়নাতে বললাম। ছুতো বের করার মতন এমন সহজ কাজ বিশেষ বুঝি দ্বিতীয়টি আর নেই। কাজেই অমন যে গান্ধীশিষ্য জওহরলাল নেহরু, তাঁরও অদৃশ্য স্কন্ধে নানান রঙের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকেও যৎসই ভাবে চাপিয়ে

দিল্লীর পাশে মিরাট শহরের দুর্গাবাড়ি

দিয়ে নিশ্চিন্ত হই, তাতেই আমরা যে জ্ঞানবান তা যেন প্রমাণ হয়ে গেল, আর যাস, তাতেই আমাদের দায়িত্বের খালাস। কলকাতাকে জওহরলাল নেহরু "মিছিল নগরী" বলে বদনাম করে একদা বাঙালীর হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছিলেন ও দিল্লী চিত্ত-অলিন্দের পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কলকাতা যে ভবিষ্যৎ সমগ্র ভারত ভূমির প্রতিভূ, আগাম চিত্র, তা নেহরুজীর দৃষ্টিভূত হয়েছিল কি না ঈশ্বর জানেন। তবে এক দিকে যেমন ইতিহাসের চুলচেরা বিচারে জওহরলালের জীবিতাবস্থাতেই দিল্লী মিছিল নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা এমন কি কানা অন্ধ বিবেকবান বিবেকহীন দিল্লীবাসী মাত্রই হাড়ে হাড়ে জানে, উপরন্তু জানা গেছে অন্য দিকে যুবশক্তির নির্মম অ প ব্য ব হা রে মস্তানগিরি—রবীন্দ্র সরোবরের ও রাজধানীর রবীন্দ্র রঙ্গশালায় হুবহু, কপি-টু-কপি, অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম নারীধর্ষণ। পটাপট বাতি নিবে যাওয়া। শাড়ি ব্লাউজ পটাং পটাং করে খুলে নেওয়া। গাঁটুলিতে কচলানি। হাত ধরে অন্ধকারে হিড়হিড় করে টানাটানি। বীরোচিত এই সব কীর্তির এই সব চক্ষুষ্মান আমরা সকলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানি; আর রবীন্দ্র রঙ্গশালা আমার বাসা থেকে বেশি দূরেও নয়। আমরা এও জানি জনদরদী জনসংঘী প্রশাসন এতে নিরপেক্ষ থেকেছেন, ওদের নেতাদের গরম গরম বক্তৃতা শুনে টের পেতে অসুবিধা হয় না রাজধানীতে একান্ত-ভাবে এখন [illegible] চন। অতঃপর ছাত্ররা, —দিল্লীতে [illegible] পোড়াতে পারে [illegible] সড়ক বাস পর [illegible] বাস-যাত্রীদের প্রতি [illegible] নীয় ইতর ব [illegible] পেসের শেষে নার [illegible] গেছে: এ স [illegible] আর এই সব অবর্ণনীয় [illegible] হেতুগুলিও আগে থেকে মজ্জায় মজ্জায় আমাদের জানা হয়ে আছে যার একটি হলো উদ্দেশ্যহীন যুবশক্তি, এনার্জির অপচয়। সংখ্যায় অনধিক এক শ্রেণীর ছাত্রদের একপ্রকার মনোবৃত্তির জন্য রাষ্ট্রনায়কগণ আর সমাজ কতখানি দায়ী তাও চক্ষুষ্মানদের অজানা থাকার কল্পিত কাহিনী নয়। আর এই সমাজটা যে রাতারাতি ফুসমন্তরে বদলে যাবে তারও লেশমাত্র আভাস দিল্লী-দিগন্তের কোথাও ফুটে উঠতে আপাতত দেখছি না। দিল্লীর সচ্ছল "বয়স্ক" সমাজের হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। তবে তার সর্বাধুনিক স্টাইলটা না বলে কয় হঠাৎ বাস স্ট্রাইকের প্রথম ঝটকাতেই বিকটভাবে প্রকট হয়ে পড়ল।

অতীতকালে বাস ধর্মঘটের সময় বহু সহস্র আপিসযাত্রী, নারী ও পুরুষ, অসহায়ভাবে পথে স্ট্র্যান্ডেড হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের চোখের উপর দিয়ে লেটেস্ট মডেলের ঝকঝকে গাড়িঅলা শত শত সচ্ছল দিল্লীবাসী দিব্যি একা একা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল হাসিমুখে। শত অনুরোধেও, বহু কাকুতি-মিনতিতেও ওদের হৃদয় গলেনি। শুনি, এরাই নাকি আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকারক। ভগবান যমরাজ নিশ্চয়ই এই অনুকারকদের ক্ষমা করবেন, তবে ওদের নির্দয়তাটা এতই মর্মান্তিক দৃষ্টিকটু (মনে পড়ে?—ম্যানস ক্রুয়েলিটি টু ম্যান?) লাগছিল যে কমবয়েসী ছাত্রদের চিন্তাহীন লাম্পট্য এর চেয়েও ঢের ঢের সহনীয় বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের দেখাদেখি জন দুই সোমত্ত ছাত্রী, তাদের কোনো বেচারী অধ্যাপিকার আগাম অনুমতি না নিয়েই, ছিঃ ছিঃ, দিল্লীর "স্টেটসম্যান" পত্রিকার মতন বেরসিক দৈনিক সংবাদপত্রেও চরস খাওয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানিয়ে সোজাসুজি ফাঁস করে দিল কি না চরস নামক বস্তুটি খেলে 'এই ইন্দ্রিয়গত

তা হলে মারফি মিউজিসিয়ানই কিনতে বলছেন
কোথায় পাবেন মশাই এমন ট্রানজিস্টর ?
আওয়াজ কেমন?
যেমন আপনি চান। আস্তে চালান কানে কানে গুন গুন করবে, বাড়িয়ে দিন গমগমে শব্দে ঘর ভরে উঠবে. আরও বাড়ালে অবশ্যি পাড়া ছাড়তে হবে!
পরিষ্কার শোনা যায়, না ঘড় ঘড় শব্দ করবে?
ধরুন না যে স্টেশন ইচ্ছে, মনে হবে রেডিও স্টেশনের স্টুডিওর মধ্যে বসে আছেন. এত পরিষ্কার।
ব্যাটারী খুঁজতে হয়রাণী হবে নাতো?
চারটে টর্চ-ব্যাটারীতে চলে মশাই - পাড়ার দোকানেই পাবেন।
কিন্তু দামটা যে একটু বেশী?
ঐ দেখুন। গিল্টির দামে খাঁটি সোনা কোথায় পাবেন মশাই! ভাল জিনিষের দাম বেশীই হয়।
তা হলে তো আজই মারফি মিউজিসিয়ান বাড়ী নিয়ে যাব।
দাম : ১২৫৲
মারফি — বাড়িতে আনন্দের নির্ঝর
মুন্না দাম : ১১০৲
মিনি মাস্টার দাম : ২২০৲
মুসাফির দাম : ২৮৩৲
NAS-4294

আসবে। পশ্চিমের এইসব শহরে দিল্লী থেকে ঘনঘন যাচ্ছে ট্রেন, যাচ্ছে পাবলিক বাস; নিজস্ব গাড়ি যাদের আছে তাদের তো সোনায় সোহাগা। ইংরেজদের আমলে দিল্লী আগ্রা আর মিরাটের বাঙালী-সমাজের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল তা অবশ্য আজকাল গল্প কথায় এসে ঠেকেছে। তুমি কে? —বাঙালী? —বস। অমনি সমস্ত বাঙালী বাড়ির সদর দরজা তোমার খাতিরে হাট করে সব সময় খোলা। স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত রেলযোগে দিল্লী থেকে মিরাট শহরের অবাধ রিটার্ন রেলওয়ে টিকিট মিলত মাত্র একটি, খালি একটি টাকায়। তাজমহল দেখতে চাও? —আগ্রার রিটার্ন টিকিট ছিল তিন টাকায়। বর্তমানে ডি-লাক্স বাসের দিলদরিয়া যন্ত্রণায় ওসব খোলা দরজা-টরজা অস্পষ্ট ইতিহাস। অথচ ঐতিহাসিক ১৮৫৭-র আগেকার এ-অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীদের অতি আবশ্যিক সামাজিক কর্মে কর্মদক্ষতার পরিচয় তো এখনো ধুয়ে মুছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। দৃষ্টান্তের জন্য যেমন ধরা যাক, মিরাট শহরের বাঙালী-সমাজের প্রসঙ্গটা।

অর্ধমৃত মোগল সাম্রাজ্যের ম্লান সায়াহ্নে দিল্লীতে বাঙালী বলে কোনো সমাজের যখন অস্তিত্ব পর্যন্ত অচিন্তনীয় ছিল, পরস্পরে মেলামেশার তাগিদে তখন সেই ১৮০৭ সাল থেকে প্রতিটি বছর মিরাট শহরে দুর্গোৎসব হয়ে আসছে। হ্যাঁ, তা বলতে পারা যায় একরকম সাড়ম্বরে। প্রবাস জীবনে সেই মেলামেশার দুর্দমনীয় তাগিদেই সিপাহী বিদ্রোহের কত পূর্বেই তো ওখানে "বাঙালী দুর্গাবাড়ি সোসাইটি" নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি কত না আশায় স্থাপিত হয়েছিল সেদিন। যখন সুশাসন সুবিচার সংক্রান্ত এধরনের বিমূর্ত শব্দগুলি নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাতাম না, সেই তখনকার দিনে পুজো-পার্বণের গন্ধ না পেলে ব্রিটিশ শাসক-মশাই কোনো সমিতি বা সোসাইটিকেই খাতাপত্রে রেজিস্ট্রি করতে চাইতেন না। আর বিনা রেজিস্ট্রি করে কোনো সমিতি টমিতির কাজ করার যে কি ঠ্যালা তা সেদিনকার ভুক্তভোগী কে না জানেন। ওসব ছিল সর্বোতভাবে বে-আইনী, ইল্লিগ্যাল ব্যাপার। কাজেই, হুকুম মাফিক মিরাটবাসী বাঙালীরা "দুর্গাবাড়ি" শব্দটা জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ওদের "সোসাইটি" শব্দের আগেভাগে। আসলে মিরাট দুর্গাবাড়ির মুখ্য উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্তমানেও অটুটভাবে জারি আছে,—স্থানীয় বাঙালী কচিকাচা ছেলেমেয়েদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে ইস্কুলে পড়াশোনো, বড়দের জন্য বাংলা বইয়ের পাঠাগার। ভাবতে অবাক লাগে, এমন কি ঘটনাবহুল দিল্লীর কোনো পাঠাগারেও সংখ্যায় এত বাংলা গ্রন্থ নেই যত আছে মিরাট দুর্গাবাড়ি সোসাইটির গত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে। ওদের মূল্যবান সংগ্রহে তা আছে কম করেও কোন না দশ হাজার বাংলা বই। বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় অবাঙালীরা পর্যন্ত এই পাঠাগারের সাহায্য নিতে নিয়মিত আসেন। তাঁদের বাংলা শেখার উৎসাহ দেখে বাংলা শেখানোর ইস্কুল খোলা হয়েছে বাঙালীদের এই পাঠাগারে। বাংলা দেশের বাইরে সুদূরের এই প্রান্তীয় ক্ষুদ্র নগরে মাতৃভাষাকে জিইয়ে রাখবার যে অতুলনীয় প্রাণপণ প্রচেষ্টা তা উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে তো নেই-ই, নেই বলেই জানি উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর কানপুরে বা তথাকথিত সাংস্কৃতিক রাজধানী বারাণসীতে, বা উকিল ব্যারিস্টারের শহর এলাহাবাদে। সুদূর সেই অতীতের মিরাট-বাসী নমস্য বাঙালীরা স্থিরনিশ্চয় বুঝে নিয়েছিলেন বাংলাভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা না করলে কয়েক দশকের মধ্যেই প্রবাসী বাঙালীদের বাঙালীত্বটুকুও আর বজায় থাকবে না। কাজেই বৃহত্তর বাঙালা দেশের অলক্ষিত নিশব্দে ওঁরা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনার একটি ইস্কুল খুলেছিলেন এই মিরাট-এ। অনুমান করা শক্ত নয়, ক্ষুদ্র এই ছাউনি-শহরের তখনকার নামহীন গুটিকয়েক প্রবাসী বাঙালী দৈনন্দিন কর্মজীবনে ব্যস্ত থেকেও কীপ্রকার ব্যাপকভাবে খেটেছিলেন এই বিদ্যালয়ের পেছনে, শতাব্দীকাল পরে আজ সেটা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, যে কলেজ সমস্ত উত্তর প্রদেশে "দুর্গাবাড়ি অ্যাংলো বেঙ্গলী গার্লস ইণ্টার কলেজ" নামের উচ্চমানের একটি শিক্ষাকেন্দ্র বলে খ্যাত। বহু [illegible] এই কলেজের বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ১২৪০; শিক্ষয়িত্রী ৪০ জন। কলেজ ভবনটা এদের নিজস্ব সম্পত্তি, যে গৌরব—ভাবলে লজ্জিত হতে হয়—রাজধানী দিল্লীর বৃহত্তম বাঙালী ইস্কুলেরও, নেই। অথচ এই ইস্কুলটিকে নিয়েই দিল্লীবাসী বাঙালীদের কতই না গরিমা। দুর্গাবাড়ি অ্যাংলো বেঙ্গলী গার্লস কলেজের শিক্ষা-দীক্ষার মান এমন উচ্চস্তরের যে গত তিন বছর ধরে সমানে এই কলেজটিকে উত্তর প্রদেশ সরকার পক্ষ থেকে ওদের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ বলে ঘোষণা করে চলেছেন। আর সেই কারণে এই কলেজের ছাত্রদের কয়েক হাজার টাকা সানন্দে বৃত্তি দিচ্ছেন। সরকার দেবেনই বা না কেন প্রতি বছর এত টাকার বৃত্তি। হাই স্কুলের পরীক্ষায় [illegible] হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট সাকসেসফুল; ইণ্টার ক্লাসের শতকরা নিরানব্বুইজন।

শুধু কি পড়াশোনায় উৎসাহ মিরাট দুর্গাবাড়ি সোসাইটির? ওদের "বান্ধব নাট্য সমিতি" কম কিছু নয়। প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় তিনদিন, বাণী পুজোয়, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে, নববর্ষে উপযোগী উপস্থাপনায় নাট্যাভিনয় নৃত্য সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীন আয়োজন ওঁরা করেন। এ ছাড়া ওঁদের খেলাধুলায় বিভাগটিও যথেষ্ট সজাগ। এ ছাড়া বয়স্কদের অবসর যাপনের উপাদান তাস তো আছেই, যেমন অনিবার্যভাবে আছে "আনন্দবাজার পত্রিকা", "দেশ", আছে নারীবর্জিত নাটকের রিহার্সেল, আর প্রাণবন্ত আড্ডা যেখানে আমরা যে বাঙালী তার সুস্পষ্ট অথচ বিদগ্ধ পরিচয়।

FERRADOL
A VITAMIN NUTRITIVE TONIC
STANDARDIZED
PARKE-DAVIS

ক্যানাডা থেকে বিদায় নেবার অবব্যাহত পূর্বে অটোয়া বিমান বন্দরে জেনারেল শ্রীজয়ন্তনাথ চৌধুরী

ফটো—শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী

সেদিন একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন থেকে অ্যান আর সুজ্যান। চিঠিটার এক জায়গায় রয়েছে "...কলকাতাতে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সময়টুকু একটা আবেগের মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো। তার মাঝে কখন যে শহরটাকে ভালোবেসে ফেলেছি বুঝতে পারিনি। কোন শিল্পী যেন উগ্র রঙের সাথে স্নিগ্ধতা মিশিয়ে কলকাতাকে রাঙিয়েছে। মানুষের ভিড়, বেলফুলের মালা, অন্ধকার গলি থেকে আলোকোজ্জ্বল রাজপথ সব কিছু নিয়ে কলকাতা আমাদের কাছে সুন্দর—আন্তরিক। যদি এই কর্মবহুল জীবন থেকে ছুটি পাই তবে আরেকবার যাবো কলকাতাকে দর্শন করতে।"...চিঠিটা পড়ে সত্যিই খুশী হলাম। কারণ, এগারো হাজার মাইল দূরের প্রবাস-জীবনে কলকাতার প্রশংসা যে কোন বাঙালীর মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

অ্যান আর সুজ্যানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় টরন্টোতে রবিশংকরের সেতারের অনুষ্ঠানে। এবং প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম ওরা আমার নিতান্তই সমগোত্রীয় অর্থাৎ "তাসের দেশ"-এর সেই নাসকজাতির মতো "কিছুতেই স্থির থাকতে পারিনে।" চার দেওয়ালের মাঝখান থেকে বারবার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে পিঠে বোঝা বেঁধে দেশ থেকে দেশান্তরে নানা জাতি নানা ভাষার মাঝে মুক্তির আনন্দটুকু পেতে—মহাবিশ্ব মহাকাশতলে একাকী মানবের ভ্রমণের বিস্ময়টুকু উপভোগ করতে। কার না ভালো লাগে জার্মানীর কোলন-এ বসে কবিগুরুর সেখানে লেখা "চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি" গানটি বারবার শুনতে! আর পূরবীর অনেক কবিতা তো তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনাস এয়ারিসে লিখেছিলেন—তাঁর সেই কবিতাগুলো হাতে নিয়ে সেখানে কোন অলস উইলো গাছের নিচে "আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে মন্থর মুহূর্তগুলো লীলাভরে ভাসিয়ে দিতে" কার না ইচ্ছা করে?

তাই সেবার যখন মনে হলো, নাঃ, অনেক দিন এক জায়গায় বন্দী হয়ে রয়েছি—এবার দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক। আর তাহিতি হাওয়াই না দেখলে তো পৃথিবী দেখাই সম্পূর্ণ হলো না। তাছাড়া সর্বতীর্থসার কলকাতাকেও তো অনেক দিন দর্শন করিনি। তখন অবুঝ মনটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, "শখের প্রাণ গড়ের মাঠ—পকেটে নেই ফুটো পয়সা—উনি যাবেন পৃথিবী দেখতে!"—কি আর করি। নিতান্ত দার্শনিকের মতো মনটাকে বোঝালাম, "বাপু, চিরটাকাল কি বুক-পকেটে ডলারে হাত রেখেই কাটাবে! তার একটু নিচেই যে হৃদয় বলে অকিঞ্চিৎকর বস্তুটি রয়েছে, তার খোঁজ রাখ কি?" মনটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে আর কথা বাড়ালো না। আর আমিও বেরিয়ে পড়ে সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলস, হাওয়াই হয়ে জাপানে গিয়ে পৌঁছিয়ে অনেক দিন পর এশিয়ার মাটিতে পা দেওয়ার রোমাঞ্চটুকু অনুভব করলাম। সেখানেই আবার দেখা অ্যান এবং সুজ্যানের সঙ্গে। আমি তখন হোটেলের ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে কিমনো পরা জাপানী মেয়েটিকে বোঝাতে চাইছি যে, Night Club দেখতে আমি জাপানে আসিনি—তার জন্যে তো প্যারিসই রয়েছে। সুতরাং Night Club-এর ঠিকানা না দিয়ে কিভাবে কাবুকী থিয়েটারে যেতে হয় তাই বলো—কোথায় গেলে শুনতে পাবো হাইকু কবিতা—দেখতে পাবো ইকেবানা। হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠে কে বলে উঠলো, "তুমি এখানে কি করছো?" তাকিয়ে দেখি অ্যান

আর সন্ত্যান। বহু দিন পর ওদেরকে টৌকিওতে দেখে সত্যিই খুশি হলাম এবং পুলকিত হলাম ওরা কলকাতাতেও যাবে শুনে। যে-কোন কারণেই হোক, কলকাতা ভারতের বাইরে একটি বিশেষ পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে Ladies of Calcutta গানটি এবং একই পরিচিত সুরে গাওয়া জার্মান ভাষায় Kalkutta liegt am Ganges গানটি তার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। (এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে New York-এ বহু-আলোচিত Oh-Calcutta নামে যে নগ্ন-নাটকটি অভিনীত হচ্ছে, তার বেশ কয়েকটি সমালোচনা পড়ে দেখেছি। নামের তাৎপর্য কোথাও খুঁজে পাইনি।) কিন্তু ভারতের বাইরে ভারত সরকারের টুরিস্ট দপ্তর-গুলির কলকাতার প্রতি বৈমাতৃক ব্যবহার সর্বজনবিদিত। তাছাড়া, বিভিন্ন বিমান কোম্পানীর বইগুলিতে কলকাতার বিষয়ে পরেশনাথ আর কালীঘাটের বিবরণ ছাড় আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কিছু দিন আগে একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাতে দেখলাম যে, কোন নোংরা শহরের বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Clean by Calcutt

Standard"। এইসব কারণে অস্বীকার করা যায় না যে, কলকাতা বিদেশী ট্যুরিস্টদের কাছে নিতান্তই আকর্ষণহীন।

সব রকম সেন্টিমেন্ট বাদ দিয়ে একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, কলকাতা দারিদ্র এবং নোংরা। কিন্তু আমি প্যারিস, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি পৃথিবীর বড় শহরগুলোতে যা দেখেছি তার সঙ্গে কলকাতার তুলনা করলে শুধু এ কথাই মনে হয়, দারিদ্র্য যদি কলকাতার পক্ষে অভিশাপ হয়, তবে ওইসব বড় শহরের দারিদ্র্য এক মহা-অপরাধ। ধনীর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি শহরগুলোতে খুঁজলে কলকাতার মতো অনেক জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর "Could you spare a dime for me— আমার জন্যে ১০টি সেন্ট কি তুমি খরচ করতে পারবে? ভদ্র ভাষায় এই কথাটাকে Below the Poverty line এইসব গাল-ভরা নাম না দিয়ে বোধ হয় ভিক্ষা বলাই ভালো। কারণ, কোদালকে কোদাল না বলে খনিত্র বললেও ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে মার্টিন লুথার কিং-এর [illegible] রেভারেন্ড ডেভিড আবার-নেথির কথাটা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের জন্যে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তা না করে যুক্তরাষ্ট্রের গরীব জনসাধারণের জন্যে সেটা খরচ করলে ভালো হতো। চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম অবতরণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন সারা বিশ্ববাসী যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসায় মুখর, তখন সে দেশের একজন নেতৃস্থানীয় লোকের মুখে এ ধরনের কথা দারিদ্র্যের বেদনাপ্রসূত বলেই মনে হয়।

এই কানাডাতেও দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা চোখে পড়বার মতো। প্রধানমন্ত্রী Treudeu-র নির্বাচনকালীন ইস্তাহারে একদা যে Just Socity-র কথা বলা হয়েছিল, তার সামান্য অংশও বোধ হয় সফলতা লাভ করেনি। সেদিন কাগজে দেখলাম একজন নেতৃস্থানীয় লোক মন্তব্য করেছেন,—

"Treudeu has made the Just Society only for the Rich—not for the Poor".

কথাটা যুক্তিসঙ্গত কিনা, সে আলোচনা তুলতে চাই না। কিন্তু এ ধরনের উক্তি এই ক্যানাডার জনসাধারণের একটা বড় অংশের। তাই বলছিলাম, দারিদ্র্য কমবেশি পৃথিবীর সব দেশেই আছে। কোন Ism-এর দেশ হয়তো তার থেকে মুক্ত নয়। আর পৃথিবীর সব কটি বড় শহরের সমস্যা কলকাতার চাইতে কম নয় কোন অংশেই। সেই কারণেই কলকাতার বিষয়ে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরগুলির নীরবতা এবং অধিকাংশ বিদেশী প্লেন কোম্পানী-গুলির অজ্ঞতা সত্যিই পীড়াদায়ক।

"গন্দা শহর" কলকাতা নোংরা। সে কথা সত্যি। কিন্তু কলকাতার যে আরও একটি রূপ আছে, সেটার খোঁজ তারা কোনদিনও রাখে না। কলকাতার মানুষের জীবনের হাজারটা দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনা সবকিছু ছাপিয়ে কিন্তু গোয়ালার গলির ছোট্ট আকাশের ফালিটুকুতে অনাদিকালের বিরহ-বেদনার রঙ লাগিয়ে সিন্ধু বারোয়াঁর সুর বেজে ওঠে বার বার—সে সুর কান পেতে শোনার মতো মানসিক প্রস্তুতি ক'জনের থাকে?

সে কথাই বলছিলাম অ্যান এবং সুজ্যানকে আমাদের দূর-প্রাচ্যের দেশ-গুলো পরিদর্শনের শেষ পর্যায়ে ব্যাংকক থেকে প্লেনে উঠে। আর বলেছিলাম, যদি পারো তবে কলকাতাকে তথা ভারতবর্ষকে হৃদয় দিয়ে দেখো। দুশো বছর ধরে শোষিত দেশটির জরাজীর্ণতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করো।

তারপর ওদের জব চার্নকের কলকাতার গোবিন্দপুর, সুতানুটি, কালীঘাটের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, দেশবিভাগের পর হাজারটা সমস্যা, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক চেতনার পটভূমিকায় কলকাতার সাহিত্য, চলচ্চিত্র প্রভৃতির বিবরণ ওদের দিয়েছিলাম। কারণ, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান কলকাতার বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন যে, কলকাতার মতো এমন শহর খুব কমই আছে, যেখানে যে-কোন ভালো নাটক হাজার রজনী অভিনয় করে, যে-কোন উচ্চাঙ্গের সংগীত সম্মেলন সারা রাত ধরে হয়, আর এত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় প্রতি মাসে।

প্রথম দিনটা ওরা কলকাতা দেখেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরের ভ্রমণসূচী অনুযায়ী। তার পরের ক'টি দিন ওদেরকে কলকাতা দেখানোর ভার নিয়েছিলাম আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু। শিয়ালদা স্টেশনের অফিস-ফেরতা জনতার ভিড় থেকে আরম্ভ করে নতুন এবং পুরানো কলকাতা সবকিছু ওদেরকে দেখিয়েছিলাম। তার সঙ্গে ছিল শিশু রঙমহলের অনুষ্ঠান, মুক্তাঙ্গনের থিয়েটার, রবীন্দ্র-সদনে কবিগুরুর গীতিনাট্য, অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টসের চিত্র প্রদর্শনী, প্রভৃতি। যদি ওদেরকে সত্যিই কোন নতুন ধরনের সুন্দর জিনিস দেখিয়ে থাকি, তা হল ময়দানমেলা। বিদেশে এ ধরনের কিছু সমাবেশ দেখেছি লণ্ডনের হাইড পার্কে, প্যারিসের মমার্তে, নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজে। কিন্তু একই অঙ্গে এত রূপ আর কোথাও চোখে পড়েনি। কলকাতার জীবনের অগণিত সমস্যার সঙ্গে ময়দানমেলার মুক্তির স্বাদটুকু সত্যিই আমাকে বিস্মিত করেছে। সারাটা দিন আমাদের কিভাবে কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। শুধু ফেরার সময় অ্যান আর সুজ্যানের খুশিতে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কলকাতার মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

অবশেষে একদিন যখন ওদের কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হলো তখন দমদম বিমানবন্দরে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেমন লাগলো আমাদের কলকাতাকে?" তার উত্তরে অ্যান বলেছিল, "মনের ইজেলে কলকাতার ছবিটা যেভাবে আঁকা ছিল, কোন নিপুণ শিল্পী যেন কয়েকটি তুলির টানে তাকে এক অসামান্য রূপ দিল।"

ওরা চলে আসার পর কলকাতায় আমার আরও দুটো মাস কেটে গেলো বন্ধুদের সঙ্গে কফির কাপ সামনে নিয়ে সাহিত্য আর রাজনীতির দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে মহাবিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে, বান্ধবীর বিয়েতে বাসরঘরে ফুলবনে মত্ত মাতঙ্গের মতো সবার সঙ্গে "বাজেরে বাঁশরী বাজো" গান গেয়ে, কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে শুয়ে আকাশের বিরাটত্বকে অনুভব করে। কিন্তু চলে আসার দিনটাতে দেখলাম আরও কত ইচ্ছা ছিল, তার কিছুই হল না। সবগুলো ইচ্ছাকে আরও তীব্রতর করে দিয়ে জেট প্লেনটা আমাকে নিয়ে যখন মাটি ছেড়ে

যৌবনের কমনীয়তা...কোমল লাবণ্য
জয় সৌন্দর্য সাবান আপনাকে এনে দেবে তরুণ কমনীয়তা ... আপনার গায়ের রঙে ফুটিয়ে তুলবে সজীব আভা! ওর মোলায়েম ফেনা আপনার গায়ের চামড়া অতি সযত্নে পরিষ্কার ক'রে দেবে ... আর চামড়া নরম করবার তেলগুলিকেও ভেতরে পৌঁছে দেবে। আপনার ভাল লাগবে এই সাবানের অপূর্ব চামেলীর গন্ধ—আর ওই গন্ধ থাকে সাবানের শেষ পর্যন্ত। মনে রাখবেন, একমাত্র জয় সাবানই আধুনিক কয়েল মোড়কে সযত্নে রক্ষিত।
জয়—এই অতি বিশেষ সৌন্দর্য সাবানটির দাম আপনি যা ভাবছেন তার চাইতে কম!
কোমল লাবণ্যের জন্য
জয়
সৌন্দর্য সাবান
আপনার প্রিয় সুগন্ধযুক্ত
Jai
BEAUTY SOAP
টাটার
তৈরী

উপরে উঠলো, জানলা দিয়ে দেখবারের মতো দেখলাম কলকাতাকে। সবটুকু বিষণ্ণতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাজার আলোর মালা পরে হেসে উঠলো কলকাতা। ......আশ্চর্য অম্লান রূপ তার।

অ্যান আর সুজ্যানকে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম চারিদিকের জরাজীর্ণতা আর রুক্ষতার মাঝে কলকাতার আন্তরিক প্রসন্নতার ভরা রূপটি। বোঝাতে গিয়েছিলাম কলকাতার সাধারণ মানুষের শিল্পীমনের রোমান্টিকতার কথা। জীবনের ধূসরতার মাঝে কবিতার স্নিগ্ধতা, কাব্যের পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে গিয়ে যাদের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে ওঠে— আবার তাদেরই সামনে "সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামে", পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন এসে দাঁড়ায় বারবার।

তখন মনে দ্বিধা ছিল, হয়তো সফল হইনি। কিন্তু এতদিন পর চিঠিটা পেয়ে মনে হচ্ছে আমাদের কলকাতাকে ওদের ভালো লেগেছে। ওরা ভালোবেসেছে আমাদের শহরটাকে। সত্যি, বড় ভালো লাগছে চিঠিটা পেয়ে।

*

[illegible] আমাদের [illegible] প্রথম কথাটাই ও বলল, [illegible] বই নেই [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] গান [illegible] করে বই।

[illegible] সেই দেশের মানুষ যেখানে পদ্মা, [illegible] আর [illegible] মতো [illegible] ছিল একদিন। আজ আর নেই। [illegible] শ্যামল বনস্পতিভূমি [illegible] বর্ষার সিক্ত [illegible] বেদনার স্মৃতি। মনে ফকিরের উদাস করা গান

"[illegible]
[illegible]
[illegible]"

আমাদের [illegible] আমরা চলে এসেছি।

কিন্তু সেদিন [illegible] মনে হলো সব বদলে [illegible] কোথায় যেন একটা [illegible] সেই [illegible] বাংলা [illegible] দাঁড়াবে একদিন। [illegible] আশীর্বাদের [illegible] দিন আসবে। এর পরেরটা [illegible] সাদরে কাছে টেনে নেবে। বাঙলার মাটি বাঙলার জল একাকার হয়ে মিশে গিয়ে অপরূপ প্রসন্ন রূপে হেসে উঠবে ভুবন মনোমোহিনী বাংলা মা।

এখানে সম্প্রতি Tagore Society-র রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠানের দিন সে কথাই ভাবছিলাম। যে নামের আকর্ষণ সীমান্তের ওপারের জামালকে আমাদের কাছের মানুষ করে তোলে, তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করার যে প্রচ্ছন্ন দায়িত্বটুকু আমাদের উপরে রয়েছে, তা পালন করে এই সোসাইটির কর্মকর্তারা সবার ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় শিল্পীরা এবং সবার শেষে দেখানো হয় কবিগুরুর জীবনী নিয়ে সত্যজিৎ রায় রচিত চলচ্চিত্রটি। একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী চিত্রা মুখার্জি, সুলক্ষণা ব্যানার্জি, প্রতিমা মুখার্জি, সুপ্রিয়া ব্যানার্জি এবং শ্রীসন্তোষ মুখার্জি, রবীন মুখার্জি ও ডক্টর দীপক মুখার্জি। "কত অজানারে প্রাণের প্রদীপ" গানটির সঙ্গে একক নৃত্যে ছিলেন শ্রীমতী দীপ্তি সরকার। এ-দেশীয় দর্শকদের কাছে গানটির ভাবার্থ বর্ণনা করেন ডক্টর শ্রীঅমূল্য সরকার। অনুষ্ঠানটিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল ডক্টর শ্রীঅমিয় ঘোষালের রবীন্দ্র-প্রতিভা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনাটি।

এখানে সাম্প্রতিক কালের আরেকটি স্মরণীয় সন্ধ্যা হলো State University of New York-এর ভারতীয় নৃত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভিজিটিং অধ্যাপিকা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের একক নৃত্যানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন এখানকার India-Canada Association। অভারতীয় দর্শকদের জন্যে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের রঙিন স্লাইডের সাহায্যে প্রতিটি নৃত্যের ভাবার্থ বর্ণনা করেন নিউ ইয়র্কের শ্রীনিকোলাস কারণ্যাক। তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বর অনুষ্ঠানটিকে আরও সুন্দর করে তোলে। অনুষ্ঠানটির প্রথম অংশে ছিল মণিপুরী ও ভারতনাট্যম। দ্বিতীয় অংশে ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে বর্ষা ও বসন্তের বিভিন্ন রূপ। প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টার সুসংবদ্ধ অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্যমাধুর্য এ দেশী দর্শকদের মুগ্ধ করে।

গত জুলাই মাসের এক তারিখে জেনারেল শ্রীজয়ন্তনাথ চৌধুরী কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তাই রাজধানী অটোয়াতে গিয়েছিলাম তাঁকে বিদায় জানাতে। প্রাণোচ্ছল, দীর্ঘকায়, সৌম্যদর্শন মানুষটি গত তিন বছর ধরে কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের একান্ত আপনজন ছিলেন। মনে পড়ছে, কিছু দিন আগে একটি কানাডিয়ান দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, "তোমাদের হাই-কমিশনারকে আমরা Expo '67-এর মেলায় দেখেছি—
One of the most impressive personality we have ever meet",
কথাটা আমাদের কাছেও ঠিক তেমনই সত্যি। শুনেছি, বিদায় নেবার কিছু দিন আগে অটোয়াতে একটি অনুষ্ঠানে উনি সবার সঙ্গে গান গেয়েছিলেন "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"। গানটি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু শুনতে পেলে নিশ্চয়ই ভালো লাগতো। জেনারেল শ্রীজয়ন্তনাথ চৌধুরীর কণ্ঠে গানটির কোন নতুন ভাবার্থ হয়তো খুঁজে পেতাম।

এ দেশের 'প্রিয় সামার'-এর বিদায়-লগ্ন উপস্থিত। এখন শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে শরৎরাণীর আসার সময় হলো। মাঝে মাঝে পথিক মেঘের দল আকাশটা ছেয়ে ফেলে শেষ বর্ষার ধারা অকৃপণভাবে ঢেলে দেয় পপলার, পাইন আর মেপলের পাতায় পাতায়। আর তার বর্ষণ-সংগীত বেদনার ছায়া ফেলে মনে করিয়ে দেয় স্মৃতি-বিস্মৃতির পথটুকু পেরিয়ে জন্মান্তর সৌহৃদ্যের কথা।

এখানে এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের কাহিনী। আর আমি ভাবি একটি স্বপ্নের শেষ হলো। চাঁদমামা আর আসবে না কপালে টিপটুকু দিতে—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে চাঁদের বুড়ী আর চরকা কাটবে না। শৈশবের সেই মধুর কল্পনা বুঝি Sea of Tranquillity-তে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল।......সত্যি, বিজ্ঞান বড় নিষ্ঠুর।

নীলাদ্রি চাকী

বাংলার চালচিত্র

॥ ১ ॥

'দেশ' ৪৮ সংখ্যা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'হিজলের কুলভূমি' প্রসঙ্গে প্রতিবাদপত্রটি পড়লাম। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অবশ্য 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বাংলার চালচিত্র'র লেখক আব্দুল জব্বার তাঁর 'ধানের নাম লক্ষ্মী' রচনাটিতে গাজীর মোড়ল লক্ষ্মণ বাগের মুখ দিয়ে 'হিজল' সম্বন্ধে যে তথ্যগত বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা ভুল সামান্যীকরণ দোষে দুষ্ট এবং সত্যিই দুঃখজনক। এখানে 'লক্ষণ বাগ' তথা লেখক জব্বার সাহেব 'হিজল' অঞ্চলের ব্যাপক লোকজনের কথা না ভেবেই সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ লেখার ব্যাপারটিতেও তাঁর আঞ্চলিক জ্ঞানের [illegible] অভাব ঘটেছে। [illegible] এই প্রসঙ্গে হিজল অঞ্চলের বিচিত্র গাছপালা ও জীবজন্তুর সব কথা জানা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব তথ্যগত কিছু কিছু বিকৃতি সত্ত্বেও জব্বার সাহেবের লেখার মধ্যে কোন লেখকের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন উত্তাপ বা তিক্ততা ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে হয় না। লেখকের [illegible] এর প্রধান কারণ 'বাংলার চালচিত্রের' অন্তর্গত রচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিত দেখে মনে হয়, লেখক গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখ দিয়ে বর্তমান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের [illegible] ও মানসিক প্রতিক্রিয়া [illegible] চরিত্র [illegible] উঠেছে। [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] সেই সঙ্গে এদের মধ্যে পাই পল্লীগন্ধী সরলতার মাধুর্য, মৌন অকৃত্রিম আবেগানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। আর

এইজন্যই এদের এত ভাল লাগে। এমন কি এরা যখন বলে, বাংলাদেশের লেখকরা 'কচু লেখে' কারণ তারা হিজল আর তাদের তফাৎ জানে না, কোন সাপে বিষ দেয় না দেয় তা জানে না, শহরের শিক্ষিত সমাজ ধান চেনে না—তখনও এদের ভাল লাগে। এদের ভাষা অমার্জিত, বিচারের মাপকাঠিটা স্থূল, মনের আঁশটা ছোট আর অনচ্ছ তবু এরা অকপট।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, লক্ষণ বাগ জব্বার সাহেবের কল্পনার সৃষ্টি নয়, তার মুখ দিয়ে তিনি নিজের কথা চালান নি। আমি যতদূর জানি, তিনি [illegible] জেলার অন্তর্গত কোন এক গাঁয়ের বয়োবৃদ্ধ মানুষ। তিনি স্বল্পশিক্ষিত হলেও পল্লীভিত্তিক যে কোন রচনা আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। তাঁর কথা অমূলক না অযৌক্তিক হলেও সহানুভূতির সঙ্গে তা শোনা উচিত। কেন একথা বলছেন তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয় বাংলাদেশের শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজের প্রতি অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাঁর মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে। আসলে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের মতো লক্ষণ বাগও চান, বাংলার যে সব সাহিত্যিক গাঁয়ের কথা লিখেছেন, [illegible] লিখছেন [illegible] মানুষের [illegible] দুঃখের কথা জানুন। মাঝে মাঝে বাংলার বাইরে গিয়ে পাহাড় সমুদ্র দেখবার জন্য ছুটি নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পরিমাণ অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করেন, বাংলার বিভিন্ন জেলায় গিয়ে [illegible] ধানের শীষ দেখার জন্য তার এক কণাও যদি বছরে একবার তাঁরা ব্যয় করতেন! লক্ষণ বাগের ক্ষোভ হয়ত সেইখানে। তবে শুধু বজবজ নিয়েই বাংলা দেশ নয়, লক্ষণ বাগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। আর জব্বার সাহেবও বজবজ ছাড়া আরও কয়েকটি অঞ্চলের কথা লিখেছেন এবং আশা করি লিখবেন। তাঁর 'বাংলার চালচিত্র' বিচিত্রতর ও ব্যাপকতর পটভূমির জন্য প্রতীক্ষা করব।

'ফিচার' তথ্যভিত্তিক রচনা বলে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু কেউ যদি তাঁর দরদী মনের মিষ্টি ছোঁয়া ও জীবনবোধের গভীরতা দিয়ে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন যে রচনাকে, তাহলে ক্ষতি কি? (এই ধরনের সাহিত্যরসসমৃদ্ধ গ্রামবাংলার উপর লেখা ফিচার সিরাজ সাহেবের কাছ থেকেও আমরা পেয়েছি।)

জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুটো নিয়েই সাহিত্যের কারবার। কিন্তু এই বহিরঙ্গ তিল তিল দেখা হয়ে গেছে, মানুষের পেশাগত খুঁটিনাটি বিস্তর জানা হয়ে গেছে—সিরাজ সাহেবের এ কথা মানতে পারলাম না। এই দুটো অঙ্গ

ADOL 327 BEN

নিয়েই জীবনের সত্য। কোন এক বিশেষ যুগের সীমার মধ্যে জীবনের সত্য যেমন আবদ্ধ হয়ে থাকে না, তেমনি কোন বিশেষ যুগের মানুষ জীবনের বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গকে জানার কাজ শেষ করে ফেলতে পারে না। আজ সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে ও শহরে মানুষের জীবন জগিমার যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তাতে জীবনের বহিরঙ্গকে জানার কাজ বেড়ে গেছে। সাহিত্য ব্যক্তি মানসের জটিল গভীরতায় প্রবেশ করুক ক্ষতি নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যক্তিজীবনের বহিরঙ্গকে জানা ছাড়া সেখানে প্রবেশ করার অন্য কোন পথ নেই। নিজের মন দিয়ে অন্য মনকে জানার Introspective রীতি আজকের মনোবিজ্ঞানে অচল। আজ কারো মনের গতি প্রকৃতিকে জানতে হলে তার বাইরের আচরণ কথাবার্তা ও তার সঙ্গে সম্বন্ধর মেলামেশার মধ্য দিয়েই তা জানতে হবে। যদি কোন সাহিত্যিক মনে করে থাকেন, মানুষের জীবনের বাইরেটা অনেক জানা হয়ে গেছে বলে এবার তার মনের ভিতরটাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করে সাহিত্যিক উপাদান যোগাড় করতে হবে, তাহলে বলতে বাধ্য হব, আজকের দিনে আমাদের সমাজ ও জাতির জীবনের বহিরঙ্গটা খুব বেশী উত্তাল বলেই তিনি সেটাকে এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে মনের গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা করছেন; তাহলে বলব, তিনি শহরকেন্দ্রিক Sophisticated আত্মাভিমানে ভুগছেন।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
হাওড়া

॥ ২ ॥

৪৮ সংখ্যা 'দেশ'-এর আলোচনা বিভাগে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'বাংলার চাষীদের'র লেখক আফজল জব্বারের যে সুন্দর সমালোচনা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। জব্বার সাহেব গ্রাম বাংলাকে অনেক জেনে শুনে তার লেখনি ধরেছেন, এবং অন্যলোকে না জেনে লেখার জন্য তাঁদের প্রতি কটাক্ষপাতও করেছেন। কিন্তু তাঁর ৪৭ সংখ্যার লেখার একটা লাইনের জন্য তিনিও সে সমান দোষে দোষি হয়ে পড়েছেন তা তিনি বোধহয় খেয়াল করেননি। অর্থাৎ না জেনে তিনি একটা লাইন লিখে ফেলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কৃষি বিষয়ক এম-এ ডিগ্রী তো আমাদের দেশেই হতে পারে', এ লাইনটা কেন তিনি লিখলেন বুঝলাম না। কারণ এম এস-সি (এগ্রিঃ) ডিগ্রী এমন কি কৃষি বিষয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী তো এদেশেই দেওয়া হয় এবং বাংলা দেশের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও দেওয়া হয়। এখন তো তাহলে লক্ষ্মণ বাগের ভাষাতেই বলতে হয় তোমার ঐ আধ লাইন লেখায় বোঝাই গেল তুমি আদৌ জানো না' এদেশের শিক্ষার খবর।

তিনি আরো লিখেছেন—'একটা শহরে ছেলেকে এগ্রিকালচার অফিসার করে দিলেই হবে? কত ধানে কত চাল হয় তারা তা জানে?' এ প্রসঙ্গে আমি বলি, যে কোন ছেলেই, সে শহুরে হোক বা গ্রাম্য হোক না কেন, এগ্রিকালচার অফিসার হতে গেলে তাকে অবশ্যই এগ্রিকালচার নিয়ে ডিগ্রী কোর্স পাস করতে হবে। সুতরাং কোন শহুরে ছেলে'র এগ্রিকালচারে ডিগ্রী কোর্স পাস করার পর এগ্রিকালচার অফিসার হতে বাধা কোথায় বুঝতে পারলাম না। কত ধানে কত চাল হয় না জানলেও জমিতে ধান উৎপাদন কি করে বৃদ্ধি করতে হয় তা তারা জানে। ধান সম্বন্ধে না জেনেই ধান নিয়ে কবিতা লেখার জন্য কয়েকজন কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। এবার আমি—একজন শহরের ছেলে—সবিনয়ে লক্ষ্মণ বাগের কাছে জানতে চাচ্ছি যে ধান চাষ করতে নিশ্চয়ই সারের দরকার হয়, সেই সব সার—যথা এ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, মিউরিয়েট অফ পটাস, বোন অ্যাশ প্রভৃতি সারে কত পার্সেণ্ট নাইট্রোজেন, পটাশ, বা ফসফেট আছে তা লক্ষ্মণ বাগ জানে? এবং না জেনে ব্যবহার করলে সেটা ফসলের প্রতি আদৌ স্বাস্থ্যকর হয় না এটাও তার জানা উচিত। কিন্তু এতশত লক্ষ্মণ বাগদের জানবার দরকার হয় না। কারণ সারের নাম মনে রাখলেই তাদের কাজ চলে যায়। তেমনি ঐসব কবি বা সাহিত্যিক গ্রাম-বাংলার কতটুকু জানার দরকার তা জেনেছিলেন তার বেশি তাদের দরকার হয়নি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমালোচনার পর আশা করব আমাদের জমাদার তাঁর গুরুমশাইগিরি একটু কমাবেন।

সুব্রত ভৌমিক
হাওড়া—৪

॥ ৩ ॥

'বাংলার চালচিত্র'-এ গ্রাম-বাংলার কতক-গুলি উপভোগ্য ছবি পাওয়া যাচ্ছে। ১০ আশ্বিন তারিখের লেখায় দুটো ভুল চোখে পড়ল। সংশোধন আবশ্যক।

(১) 'জোয়ার উঠতে তিন ঘণ্টা আবার নামতে তিনঘণ্টা।' জোয়ার ও ভাটার স্থিতিকাল প্রায় ছয় ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা নয়। জেলে-মালো মাঝি-মাল্লা সওয়ারি সবাই জানে, পাঁজিতেও আছে।

(২) 'বাউলীদের (যারা মধু সংগ্রহ করে)...।' যারা মধু সংগ্রহ করে তাদের 'মউল' বা মউলে' বলে। বাউলী (বাওয়ালী), বলতে গেলে, বাদাবনের গাইড। তুকতাক, মন্তোরতন্তোর, চলাচলের বিধিনিয়ম তাদেরই জানা। কাঠুরে, মউলে, শিকারি সবাই বাউলে সঙ্গে নিয়ে বসে থাকে। আগেকার দিনে অন্তত এই রেওয়াজ ছিল।

অনিলকুমার দাস
কলকাতা—২১

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

উপর্যুপরি কয়েক সংখ্যা ধরে 'দেশ'-এ প্রকাশিত ফাদার দ্যতিয়েন-এর 'ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা' আমায় আকর্ষণ করেছে। তাঁর লেখার বৈঠকী মেজাজ সহজেই মন টানে। 'দেশ'-এর পাতায় ফাদারের প্রথম পর্যায়ের লেখাগুলো পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তখন আমি নেহাতই ছোট ছিলাম। কিন্তু দ্যতিয়েন তাঁর এবারকার মনোরম রচনা-সম্ভারে আমার ক্ষোভ মিটিয়েছেন। একজন বিদেশী লেখকের এমন সরস বাংলা রচনা আমাদের আশাতীত। সর্বাগ্রে ফাদার এবং রচনাপ্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্য 'দেশ' সম্পাদককে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

মন্দিরা রায়
মেদিনীপুর

নরম-নরম
ইডলী তৈরী
করুন
প্রীত
PREETT
স্টীম-ইট-এ
ঠিক ৭ মিনিটে
আপনার রান্নাঘর আধুনিক ক'রে তুলবে
PREETT
সসপ্যান
সেদ্ধ-করার জন্য
স্ট্যু তৈরী করতে
স্কিলেট
ভাজতে, পোচ তৈরী করতে
আর সেদ্ধ করতে
দেশের ক্রেতাদের জন্য
বিদেশে রপ্তানীর জন্য
বিনামূল্যে আপনার সুবিধার জন্য, একটি বাড়তি প্লাগ ও পিস্টল আর রন্ধন প্রণালীর একটি বই প্রত্যেক প্রেস্টিজ প্রেসার কুকারের কার্টনের ভেতর ভ'রে দেওয়া আছে।
তৈরী করেছেন :
টি টি (প্রাইভেট) লিমিটেড
বাঙ্গালোর-১৬

জীবনী

শিবনাথ শাস্ত্রী। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ বিধান সরণি কলিকাতা-৬। পঁচাত্তর পয়সা॥

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি স্মরণীয় নাম। বাংলা দেশ এবং বাঙালির কল্যাণে তাঁর অবদান বহু-ব্যাপক। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, দেশানুরাগ, সমাজ সংগঠন,— জাতীয় আত্মবিকাশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য পদচারণা এবং সাফল্যের কথা শিক্ষিত বাঙালিমাত্রের কাছেই সুপরিচিত। এই মহাপুরুষের জীবনালেখ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরই ভক্তশিষ্য এবং একদা বাংলাদেশের আদর্শ-শিক্ষক শ্রীসতীশ চক্রবর্তী। শিবনাথ শাস্ত্রীর পরলোকগমনের অব্যবহিতকাল পরে তৎকালের 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় শ্রীচক্রবর্তী ধারাবাহিকভাবে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। অতি সম্প্রতি সেই প্রবন্ধমালা গ্রন্থবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর বাঙালী পাঠকের কাছে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছে, এটা আমাদের কাছে শুভ সংবাদ সন্দেহ নেই। যে কোন কারণেই হোক, শ্রীচক্রবর্তী নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিবনাথ শাস্ত্রী বিষয়ক প্রবন্ধমালাকে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কিন্তু তাতে শ্রীশাস্ত্রীর চরিত্রের বিশালতা অনুধাবনে অসুবিধা হয় না। কেননা, শ্রীচক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের আনু-পূর্বিক ঘটনা এবং ক্রমিক বর্ণনা এবং [illegible] গ্রন্থকর্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে, অসংখ্য দৃষ্টান্তের মত শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক ধরনের [illegible] শিবনাথ শাস্ত্রীর মানুষের প্রতি অনুরাগ, মানবতাবোধ, তাঁর চরিত্রে বিনয়, [illegible], [illegible], সহৃদয়তা ও সহানুভূতি, [illegible] এবং আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন গ্রন্থকর্তা। সাধারণ ব্রাহ্মসভার অন্যতম নেতা শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈতিক জীবনের মহত্ত্বের আলোকে তাঁর চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন লেখক। এই ব্যাখ্যা এবং আলোচনা দৃষ্টান্তযোগে যেমন সরস এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তেমনই লেখকের শ্রদ্ধাবান অনুরাগে আবেগঘন হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি রচনার ভিতর দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের নব নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, যা আমাদের অগোচর ছিল।

গ্রন্থ শেষে শিবনাথ শাস্ত্রী বিষয়ক আরো চারখানি প্রবন্ধ সংযুক্ত হয়েছে। এই সব প্রবন্ধের রচয়িতা যথাক্রমে রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুহ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল গুপ্ত। এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য চরিত্রের অবধারণে নতুন আলোকপাত করেছে। সব মিলিয়ে আকারে গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হলেও, বিষয় গৌরবে, বিশেষকরে শিবনাথ শাস্ত্রীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে প্রভূত সাহায্য করবে।

১০৪/৬৯

পত্রিকা

কথা সাহিত্য। (রাধারাণী দেবী-নরেন্দ্র দেব সংবর্ধনা সংখ্যা)। সম্পাদক : গজেন্দ্র-কুমার মিত্র ও প্রথমনাথ ঘোষ। ১০ কেশব-চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

কবি দম্পতী নরেন্দ্রদেব ও রাধারাণী দেবীর পরিচয় বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী-দের কাছে নতুন করে দেবার কিছু নেই। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী নিরলস সাহিত্য সেবায় এঁরা সর্বজনের শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছেন। সাহিত্য প্রতিভা ছাড়াও এঁদের ব্যক্তিত্বের এমন একটি মাধুর্য আছে যা সাহিত্যসেবী মাত্রকেই তাঁদের অনুরক্ত করে তোলে। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে বাঙলার বহু সাহিত্য সেবীর এঁদের সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ সেই অনুরাগের নিকটই ব্যক্ত করে। এই কবি-দম্পতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার পক্ষে সংখ্যাখানি খুবই কাজে লাগবে। সংখ্যাখানি সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই সংগ্রহযোগ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

অবধ্য মাটি। ব্রজগোপাল বর। জনসংযোগ প্রকাশনী : ৫৫-এ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·০০।

মার্টিন লুথার কিং। রথীন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়। ইন্দ্রনাথ প্রকাশনী : ১৪ স্টেশন রোড, কলিকাতা-৩১। মূল্য ১·৭৫।

বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তন। শিবানী পাল (গুহ)। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ১৭০/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

মঙ্গলের দিন। নিমাইকুমার ঘোষ। মোহন

লাইব্রেরী : ৩৫এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

অজর মনের বাঁকে। অশোক সেনগুপ্ত। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ১৭০/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

পুষ্পবাসর। শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ১৭৩/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·৫০।

লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা। আনন্দ পাবলিশার্স : ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২৫·০০।

পূর্ব বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পাদনা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী : ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

কালতীর্থ কামারপুকুর। শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ১০·০০।

যোগিকথামৃত। পরমহংস যোগানন্দ। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া : যোগদা মঠ, কলিকাতা-৫৭। মূল্য ১৫·০০।

ঋষির প্রেম-কথা। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী। গ্রন্থ পরিষদ : ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭·০০।

বিশ শতকের বাংলা কবিতা। সম্পাদনা : মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। মণি প্রকাশনী : ৩৯বি, ডেণ্টমিশন রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৫·০০।

নাগর স্মৃতি। গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। নাভানা : ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-১৩। মূল্য ২·৫০।

সংবাদ মূলত কাব্য। বিষ্ণু দে। সাহিত্যপত্রগ্রন্থ : ৯ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

ত্রিবরন। সন্তোষকুমার ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

কলিঙ্গনী। বিমল কর। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

ছোটদের সেরা গল্প। সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

বাংলার বিদুষী। শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী প্রতিমা তালুকদারের কাছ থেকে রাণার্স'র পুরস্কার সতীন্দ্র স্মৃতি কাপ গ্রহণ করছেন 'পেন অ্যান্ড ইঙ্ক' ক্লাবের অধিনায়ক শ্যামসুন্দর ঘোষ। শ্রীমতী তালুকদারের বাঁদিকে আই এফ এ-র সভাপতি বিচারপতি শ্রীনিখিল তালুকদার, তাঁর ডান দিকে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারত ও নিউজিল্যান্ডের এই সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের ৬০ রানে জয় ১৯৬৯-৭০ ক্রিকেট মরসুমের শুভ সূচনা বলা যেতে পারে।

যদিও নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট শক্তি সাধারিয়ানার মধ্যে বাঁধা, দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড় বয়সে তরুণ তবু তিনজন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ভারতীয় দলের জয় একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস উজ্জীবিত হবার সহায়ক, অপরদিকে তেমন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আসন্ন টেস্ট-যুদ্ধে বাড়তি প্রেরণার খোরাক।

ব্যাট-বলের লড়াই

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টকে আশা-নিরাশায় দোলায় দোলানো ব্যাট-বলের লড়াই বললে মোটেই অন্যায় হবে না। এ টেস্টে কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেনি, হাফ সেঞ্চুরি করেছেন দু' দলের দুজন, নিউজিল্যান্ডের বিভান কংডন এবং ভারতের নবাব পাতৌদি। বোলিং-এ কেউ অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারেননি একমাত্র বিষেন সিং বেদী ছাড়া। তাও শেষ দিনের টার্নিং উইকেটে। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলার আকর্ষণ কখনো কমে যায়নি। দুই দলই আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে ব্যাট-বলের লড়াই চালিয়েছে। প্রথমে মাত্র ১৫৬ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ। ব্যাটের উপর বলের প্রাধান্য। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের বলের বিক্রমে ভারতের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থ ভূমিকা। শুধু অজিত ওয়াদেকারের কিছুটা আত্মবিশ্বাসী খেলা। পরে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ২২৯ রান। এখানেও প্রধানত বোলারের প্রাধান্য। তবে নিউজিল্যান্ডের বিভান কংডন এবং অধিনায়ক ডাউলিং-এর প্রশংসনীয় খেলা। কংডনের ৭৮ রানের মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্যের পর্যাপ্ত পরিচয়।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭৫ রানে পিছিয়ে পড়বার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ২৬০ রান প্রধানত পাতৌদির নবাবের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং-এর ফল। তবু জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের যেখানে প্রয়োজন মাত্র ১৮৮ রানের দরকার সেখানে মাত্র ১২৭ রান করে ৬০ রানে তাদের পরাজয় স্বীকার কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ভারতের দুই স্পিন বোলার বিষেন সিং বেদী এবং এরাপল্লী প্রসন্নর প্রশংসনীয় বোলিংই

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

ব্যাডমিণ্টনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝে বিশ্রাম সময় দেওয়া না-দেওয়া জাতীয় ব্যাডমিণ্টন সংস্থার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। কিন্তু পুরুষ এবং মহিলাদের আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনেরই অনুমোদিত। সুতরাং যে দেশেই খেলা হোক আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝে ৫ মিনিট বিশ্রাম দিতেই হবে।

আইনে বলা হয়েছে বিশ্রাম সময় ৫ মিনিটের বেশী হবে না। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—তা হলে ৫ মিনিটের কম হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে আইন নির্মাতাদের ভাষা : ৫ মিনিটের বেশী নয় অর্থে ৫ মিনিটই ধরতে হবে। ফুটবল খেলাতেও দুই অর্ধের মাঝখানের বিরতি সময়ের বিধানে একই ভাবে বলা আছে—বিরতির সময় ৫ মিনিটের বেশী হবে না।

আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খেলা বা [illegible] খেলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝে বিরতির ব্যবস্থা জাতীয় ব্যাডমিণ্টন সংস্থার [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের কাছে এই বিরতির কথা [illegible] বিরতির ব্যবস্থা [illegible] ইংল্যাণ্ডের [illegible] বিরতির ব্যবস্থা [illegible] ইংল্যাণ্ড [illegible] বিরতির [illegible] আছে [illegible] ডেনমার্ক ও সুইডেন [illegible] সিঙ্গলস এবং খেলায় আছে ৫ মিনিট বিরতির [illegible] ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডে সিঙ্গলস ও ডাবলস এর খেলায় ৫ মিনিট বিরতি আছে কিন্তু [illegible] সিঙ্গলসে বিরতির ব্যবস্থা [illegible] কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আমেরিকাতেও [illegible] সিঙ্গলসে [illegible] দেশ যেমন ভারত, [illegible] সিংহল [illegible] ইন্দোনেশিয়া, জাপান মালয়, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সিঙ্গলস এবং ডাবলস দুই রকমের খেলাতেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝে ৫ মিনিট বিরতির নিয়ম আছে।

অন্যান্য খেলায় ব্যাডমিণ্টন ও ফুটবলের আইন সম্পূর্ণ আলাদা। ফুটবল খেলা শেষ হতে যদি এক মিনিটও বাকি থাকে এবং সেই এক মিনিট বাকি থাকতে কোন দৈবদুর্ঘটনায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়, এক মিনিট শেষ করা সম্ভব না হয় তা হলে পরের দিন আবার পুরো সময় খেলাতে হবে। কিন্তু ব্যাডমিণ্টনে অসমাপ্ত খেলার পয়েন্ট নাকচ হয় না। সেই দুর্ঘটনায় যদি খেলা বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা খেলার নির্ধারিত দিনে খেলা শেষ করা সম্ভব না হয় তবে পরে খেলা আরম্ভের সময় অসমাপ্ত গেমের পয়েন্ট থেকে পয়েন্ট গুনতে হয়। অর্থাৎ খেলা বন্ধের সময় যার যে পয়েন্ট থাকে সেই পয়েন্ট থেকে পয়েন্ট গোনা আরম্ভ হয়। তদনুযায়ী যার সার্ভিসের সময় খেলা বন্ধ হয়েছিল পরে সার্ভিসের দ্বারাই খেলা আরম্ভ হবে।

একটি ম্যাচের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে প্রথম সার্ভিস শুরু থেকে ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলার ছেদ পড়বে না। অবশ্যই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমের মাঝের বিরতি বাদ থাকবে। এখানে ম্যাচ কথাটির অর্থ তিনটি গেম বা একপক্ষ পরপর দুটি গেমে জয়ী হলে দুটি গেম।

আইনে আরও বলা হয়েছে : কোন খেলোয়াড়ের শ্রমক্লান্তি লাঘবের জন্য বা দম ফিরানোর জন্য কোন মতেই খেলা বন্ধ হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন খেলোয়াড় যদি শ্রমক্লান্তি লাঘবের জন্য আহত হবার বা অচৈতন্য হবার ভান করেন তবে আম্পায়ার কি করবেন? অবশ্যই অবস্থা অনুযায়ী নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। যদি সত্যি সত্যিই খেলোয়াড় আহত বা সাময়িক অচৈতন্য হন এবং প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে সময় দিতে রাজি থাকেন তবে আম্পায়ার সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় যদি সময় দিতে স্বীকৃত না হন তবে আম্পায়ারের পক্ষ এখানেই খেলার যবনিকা টানা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেহেতু খেলোয়াড়ের আহত বা অচৈতন্য হবার ভান সম্পর্কে আম্পায়ারের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় নেই সেহেতু প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মনোভাবের উপর সব কিছু নির্ভর করে। মোটের উপর এসব ক্ষেত্রে আম্পায়ারের নিজ বিচারবুদ্ধিমত সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন খেলোয়াড়ের আম্পায়ারের অনুমতি ছাড়া কোর্ট ত্যাগের বিধান নেই। খেলার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে যদি কোন খেলোয়াড়কে হঠাৎ কোর্ট ত্যাগ করতে হয় সে ক্ষেত্রে আম্পায়ারের অনুমতি দেওয়া উচিত। তাছাড়া খেলার প্রয়োজনে কোর্টের সীমার বাইরে তো খেলোয়াড়দের যেতে হয়ই। সুতরাং কোর্ট ত্যাগ অর্থে এই কথাই বুঝতে হবে—বিনা প্রয়োজনে খেলোয়াড়রা কোর্ট ত্যাগ করবেন না বা দুটি গেমের মাঝে কোনরকম বিশ্রাম নেবেন না।

দোষী খেলোয়াড়দের খেলা থেকে নাকচ করে দেবার যে অধিকার আম্পায়ারের আছে সে কথা স্মরণ রেখে খেলার সময় খেলোয়াড়দের শালীনতা বজায় রাখা উচিত এবং উচিত বিনা প্রতিবাদে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

মুকুল

অরণ্যদেব

'যে বিজয়ী, সকলের গহনা সে ছিনিয়ে নিচ্ছে। সেইটেই নিয়ম...'

'কিন্তু, কারিবোকে দেখবামাত্র প্রহরীরা তাকে ঝাপটে ধরল। একটা বেদীর উপর দিয়ে যাওয়া হল তাকে। বলি দেওয়া হবে।'

"কমললতা"/উত্তমকুমার, নির্মলকুমার (শায়িত) ও সুচিত্রা সেন

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

কমললতা

বাংলার কীর্তন ও বাউল গানের উন্মাদনা এবং সহজিয়া ও মধুর-রসের ভাবনা—এই দুইয়ের সংযোগ 'কমললতা'-য় [illegible]। সেদিক থেকে 'কমললতা' বাংলার সুর ও জল-মাটির ছবি হয়ে একটি বিশিষ্ট মৃত্তিকাশ্রয়ী অবস্থানে আছে। তাছাড়া 'অ্যাটমসফিয়ার'-সৃষ্টির কাজ ছবিতে অসাধারণ। 'অ্যারোমেটিক' রসও মনকে আচ্ছন্ন করে, এবং এইখানেই ছবির শক্তি এবং রসজ্ঞ দর্শকের কাছে প্রধান আবেদন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব নিয়ে যে ছবি তার নাম যখন 'কমললতা' রেখেছি। তখন ধরে নিতেই হবে মূল রচনার কিছু অংশ ও পরিস্থিতি এই ফিল্মে থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ চরিত্রও ছবিতে অনুপস্থিত। রাজলক্ষ্মী-বর্জিত শ্রীকান্ত-কাহিনী এই 'কমললতা', আবার প্রকৃতপক্ষে 'শ্রীকান্ত'ও নয়, শুধুই কমললতার গল্প। এক কথায়, মুরারিপুর আখড়ায় আদ্যন্ত কমললতাকে নিয়েই ছবির চিত্রনাট্য। অবশ্য এতে গহর ও শ্রীকান্তের ভূমিকা আছেই, নইলে কমললতা থাকে না। তবে শ্রীকান্তর যতক্ষণ ও যতটুকু জায়গা জুড়ে থাকবার কথা, অর্থাৎ এই কাহিনীতে তার যতটুকু অংশ তা অটুট কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শ্রীকান্ত দ্রষ্টা, কিন্তু একেবারেই 'প্যাসিভ' চরিত্র কি? শ্রীকান্তর পর্বে পর্বে যত কিছু নাট্যক্রিয়া, সে তো তারই প্রভাবে ও সান্নিধ্যে।

ছবিতে কমললতার জীবনের মানসিক বিপ্লব শ্রীকান্তর উপস্থিতিতেই ঘটেছে, যখন শ্রীকান্ত আখড়ায় অতিথি। তবে এর প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে কমললতার পূর্ব-রাগে, বৈষ্ণব মধুররসতত্ত্ব অনুসারে শ্রীকান্ত নবশ্যাম; কানের ভিতর দিয়ে নাম মরমে গিয়ে কমললতার মনপ্রাণ যখন প্রায় আকুল করে তুলেছে তখনই গহরের সঙ্গে শ্রীকান্তর আগমন। পরের অধ্যায়ে শ্রীকান্তের প্রতি কমললতার প্রেম বর্ণিত। এই প্রেম নিকষিত হেম কিনা অথবা কী পরিমাণে মধুররসাশ্রয়ী তা অবশ্যই বিবেচনার বস্তু। ঘটনার বিকৃতি যে ছবিতে বিশেষ ঘটেছে তা নয়, তবে স্বাদ পালটেছে, রঙ অনেক বেশী গাঢ় হয়ে উঠেছে। কমললতার আচরণ ও কথা-বার্তা রাজলক্ষ্মীর মতই—অর্থাৎ এমন ব্যবহার যা রাজলক্ষ্মীর পক্ষেই শোভা পায়। আরও শোচনীয় বিষয় এই, তাদের সম্পর্ক ছবির শেষে প্রায় রোমান্টিক কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত।

গোড়াতেই বলেছি, 'কমললতা' কমললতারই গল্প। কমললতার অস্তিত্বের বাইরে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পরিচয় ছবিতে সামান্য। শ্রীকান্ত-চরিত্রকথা কিছুটা পাওয়া গেছে পুঁটুরাণীর বিয়ের প্রসঙ্গে। বাল্য-বন্ধু গহরের সঙ্গেও শরৎবাবুর শ্রীকান্তকে, কমললতার পরিমণ্ডলের বাইরে, কিছুক্ষণের জন্য দেখতে পেলাম। বর্মায় রওনা হবার আগে আখড়ায় ফিরে এসে কমললতাকে খুঁজে না পেয়ে (ছবি তখন প্রায় শেষ) শ্রীকান্তর অস্থিরতা ও উত্তেজনা, এবং সাক্ষাতের পর স্টেশনে তার প্রেমকাতরতার মধ্যে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তকে খুঁজে নিতে কষ্ট হয়।

বৈষ্ণবী কমললতা ও তার পূর্বপ্রেমের কাহিনী সম্বলিত এই চিত্রটি নামভূমিকার চরিত্রকেও যেন ছাপিয়ে উঠেছে আখড়ার পরিবেশ ও জীবনধারা—যা অতি চমৎকার-ভাবে দেখিয়েছেন পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। আখড়াবাসী বৈষ্ণবের জীবন-যাপন এবং আরও গভীরে তাদের নৈষ্ঠিক রসসাধনার পরিচয়টি পদাবলী গানের কথায় ও সুরে, কখনও বা আশ্রমিক কাজ কর্মের সঙ্গে ওই কথা ও সুরের আবহ ব্যবহারে, পরিচালক অদ্ভুত কল্পনাশক্তির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অষ্টপ্রহর যেন বৈষ্ণব-অন্তরে রসের খেলা চলছে, কখনও বা ভক্তি-প্রেমের সাধনা—এই চিত্রটি অতুলনীয়। সত্যি বলতে কী, এমন পরিবেশের মাধুর্য বাংলা ছবিতে কমই দেখা গেছে, এর সূত্রপাত প্রথম দৃশ্য থেকেই যেখানে মাঠের উপর দিয়ে বিভিন্ন দিক

থেকে কীর্তনের দল আখড়ায় আসছে—একটি অসাধারণ বৈষ্ণব চিত্ররূপ। তাছাড়া, পরিচালনার কাজ আগাগোড়াই পরিচ্ছন্ন।

তবে পরিচালক সম্ভবত ইচ্ছা করেই কমললতার কাহিনীকে 'মিউজিক্যাল' ছবি করে তুলেছেন, বৈষ্ণব জীবন ও সমাজ এবং সহজিয়া সাধনার সমগ্র রূপটি দেবার জন্য। ছবিটি হয়েছেও তাই, কিন্তু 'শ্রীকান্ত'র সংগে এর সুর-সংগতি রক্ষা পেয়েছে কি? যাই হোক, ওই পরিবেশে কমললতার বেশবাস ও মেকআপ দৃষ্টিকটু লেগেছে। কমললতাকে শহুরে বৈষ্ণবী মনে হয়েছে। 'কমললতা' ছবির সাফল্য যে নাম-ভূমিকার শিল্পীর অভিনয় বা চরিত্র ইনটারপ্রিটেশন-এর উপর অনেকখানি নির্ভর করে তা বলাই বাহুল্য। সুচিত্রা সেন হয়েছেন কমললতা। তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা সর্বজন স্বীকৃত। এবং যে-ভাবে তিনি ফিল্মে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে এসেছেন তাঁর কমললতা চরিত্রচিত্রণ তা থেকে যে খুব ভিন্নধর্মী হয়েছে তা নয়। অর্থাৎ কমললতার চরিত্রাঙ্কনও বেশ সফিসটিকেটেড, কথা বলার ধরনে ও তাকানোতে। কমললতার সেই সহজিয়া মানসিকতা, রহস্যময়ী রসিকা নারীর সেই উচ্ছলতা সুচিত্রা সেনের কমললতায় পেলাম কই! তবে কমললতার অন্তরের জটিলতা ও গভীরতার আভাস শ্রীমতী সেন অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন; কমললতার পূর্বজীবনের অভিনয় আরও বেশী অবাক করে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে, সুচিত্রা সেনের কমললতা, যদি সম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রের [illegible] হয়, দর্শকদের কাছে শ্রীমতী সেনের [illegible] শিল্পী-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি মনে হবে।

শ্রীকান্ত [illegible] এই প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] লক্ষণ [illegible] ও [illegible] পরিচালকের [illegible]

গহরবেশী [illegible] কোন নালিশ থাকবার কথা নয়। [illegible]-কুমারের গহর কবি, ভাবুক, [illegible] সন্ধানী, নীরব প্রেমিক—এই চরিত্রচিত্রণ দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য [illegible] চৌধুরী, কাটু বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] রায়, ছায়া দেবী, বীরেন চ্যাটার্জি, [illegible] প্রমুখ বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। [illegible] [illegible]

সংগীত পরিচালক হিসাবে এই ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] যোগ্য। ছবিটি [illegible] হয়ে উঠেছে যেমন [illegible] সংগীতের সুরে। মহাজন পদাবলীর সুর [illegible] নিয়ে সবটাই [illegible] পৌঁচেছে। [illegible] কখন কখন যে শেষ গানটির সুর চমৎকার। গান শোনার জন্য ছবিটি কয়েকবার দেখা চলে।

অন্যদিকে অন্যান্য প্রয়োগ-গুণেও ছবিটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কোন কোন অংশের ফটোগ্রাফি মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত; দুলাল দত্তের চিত্রসম্পাদনাও উঁচুদরের।

"মন নিয়ে" ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস ও নিমু ভৌমিক—ছবির মুক্তি এ-সপ্তাহে

টীকা-টিপ্পনী

বেশ কিছুকাল ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ফিল্মে বঙ্কিম উপেক্ষিত। রবীন্দ্র-নাথের কাহিনী নিয়ে আগেও যেমন অনেক ছবি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অরুন্ধতী দেবীর "মেঘ ও রৌদ্র"; মৃণাল সেনের "ইচ্ছা পূরণ" ও স্বদেশ সরকারের "শাস্তি" এখনও মুক্তির প্রতীক্ষায়। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্রের কোন কাহিনী নিয়ে এক যুগের মধ্যে কোন ছবি হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। ফিল্মে একটা সময় গেছে যখন বঙ্কিম কাহিনীর কদর ছিল খুব। বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, রজনী, আনন্দমঠ, কপাল কুণ্ডলা প্রভৃতি সেই সময়ের ছবি। এখনো পুরনো হিট "রি-মেক" হচ্ছে, কিন্তু বঙ্কিমের কাহিনীর প্রতি অনীহা কেন? সম্ভবত বঙ্কিম কাহিনীর অধিকাংশই ইতিহাসমূলক, ছবির ট্রেনড্ এখন মডার্ন। অবশ্য ইতিহাসমূলক কাহিনী নিয়ে মডার্ন ট্রেন্ডের ছবি করা যায় কিনা তা বিতর্কমূলক। ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়েও নিশ্চয়ই মডার্ন ট্রেন্ডের ছবি করা যায়। "মহাভারত" নিয়ে, ছবি করবার ক্ষমতা থাকলে, নিশ্চয়ই ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের ছবি হতে পারে। কথা সেটা নয়। মুস্কিল বোধ হয় অন্যত্র। ইতিহাস মূলক কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন স্বভাবতই খরচ সাপেক্ষ। এবং বাংলা ছবির ব্যবসার চৌহদ্দী নাকি কলকাতা থেকে বর্ধমান। অতীতে বাংলা ছবির ব্যবসা ক্ষেত্র এতটা ছোট ছিল না। অবিভক্ত বাংলায় পূর্ব-পশ্চিমের দুই দেশেই তখন বাংলা ছবি চলত। তাছাড়া আসামেও ছিল বাংলা ছবি একচেটিয়া। উপরন্তু ছায়াছবির "টেকনিক্যাল" মান তখন এখনকার মত উন্নতও ছিল না। নাটককে প্রাধান্য দিয়ে ছবি করলেই চলে যেত। "মাউন্টিং" এর ওপর জোর দেওয়া হত না বলে ছবিতে খরচও হত অনেক কম। বলা বাহুল্য, ছবি এখন অনেক সাবালক হয়েছে। দর্শকরাও অনেক পরিণত। স্বভাবতই ছবির মাউন্টিংকে এখন আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ পরিচালকই এখন এমন গল্পের কথা ভাবছেন, যে গল্পে আড়ম্বর কম। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে সেই কারণেই ইদানীং কোন ছবি হচ্ছে না বলে মনে হয়।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় অবশ্য ইতি-পূর্বে "দেবী চৌধুরানী"র চিত্ররূপ দেবার মনস্থ করেছিলেন। নায়িকাও ঠিক করে ফেলেছিলেন সুচিত্রা সেনকে। কিন্তু অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়েও শ্রীরায় বঙ্কিমের "রাজ-সিংহ"কে সেলুলয়েডের বুকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রুপোলি পর্দায় "রাজ সিংহ" জীবন্ত হতে পারল না। প্রসংগত মনে পড়ে, ছবি তখন কথা বলতে পারত না, ফিল্মের সেই নির্বাক যুগে ম্যাডান কোম্পানী একবার "রাজসিংহ"র চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার "ব্যান্ড" করে দিয়েছিলেন সেই ছবি। বঙ্কিমের কাহিনী নিয়ে সেই বোধ হয় প্রথম ছবি।

ইদানীং একাধিক পরিচালক আবার বঙ্কিম-কাহিনী নিয়ে ছবি করার কথা

"অগ্নিযুগের কাহিনী"/দিলীপ রায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়—ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

জানাচ্ছেন। সত্যজিৎবাবুর এখনো ইচ্ছে আছে [illegible]-ক্লাসিকের চিত্ররূপ দেবার। অরুন্ধতী দেবী ভাবছেন "দুর্গেশ নন্দিনী" নিয়ে। পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় অনেক ভেবেচিন্তে "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর চিত্রনাট্যও তৈরী করে ফেলেছেন। শীঘ্রই শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা। শোনা যাচ্ছে, নায়ক গোবিন্দলাল-এর চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার। রোহিনী হবেন কে? ভ্রমর? মাধবী মুখোপাধ্যায়ের কথা ভাবা যেতে পারত। রোহিনীর বেশে। কিন্তু এখন করবেন কি করে? মাধবী যে মা হতে চলেছেন। "রোহিনী" তবে অপর্ণা সেন কি? অবশ্য কার্তিকবাবু এ-বিষয়ে কিছুই মন্তব্য করেননি। ছবি হবে একথাই শোনা যাচ্ছে, শিল্পী নির্বাচন হয়নি।

বিচক্র

তরুণ অপেরার হিটলার—নামভূমিকায়
শিল্পী : শান্তি গোস্বামী

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "চলাচল"

[illegible] আগামী ডিসেম্বরে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে [illegible] 'চলাচল' দেখানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, [illegible] এই ছবি মুক্তিলাভের পরই দর্শক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। [illegible] সঙ্গীত [illegible] দিয়েছেন [illegible]। এই সপ্তাহে পূর্ণ সিনেমায় ছবিটি পুনর্মুক্তি হয়। [illegible] পরিবেশনায় শহরে ও শহরতলীতে 'চলাচল' আবার নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে।

অরুন্ধতী দেবী, অসিতবরণ, নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ এঁদের প্রধান শিল্পী। গত সপ্তাহে কলকাতায় এই ছবির মুক্তি (নতুন প্রিন্ট) আগের মতই দর্শক মহলে আগ্রহের সঞ্চার করে। ছবিটি কাহিনী ও পরিচালনার বৈশিষ্ট্যে এখনও জনপ্রিয়।

আন্তর্জাতির চিন্তা এবং জীবন দর্শন কাঠামোর বিরুদ্ধে কোন কিছু করতেই সায় দেয় না কাউকে। 'ইমপেক' ক্রমশ পপুলার হয়ে উঠছে, ফলে বিদেশী মুদ্রার অপচয় খানিকটা হয়ত বন্ধও হবে, কিন্তু 'ইমপেক' হওয়ার ফলে অনেক আশা করেছিলেন যে, বিদেশে রপ্তানির জন্য ভারতে উন্নত মানের চলচ্চিত্রও হয়ত তৈরী হবে ইমপেকের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ আশা এখনো অন্ধকারে। এর ওপর ইমপেক এখনো আলোকসম্পাত করেনি। ভবিষ্যৎ সেহেতুই ভবিষ্যতের গর্ভে, সুতরাং এখন কিছু বলা মুশকিল।

সরোজ শর্মা

বিদেশে "গুপী গাইন..."

অ্যাডিলেড ও অকল্যান্ড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ফিরে এসে "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবির প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি সেখানে বিচারক-মণ্ডলী ও সমালোচকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। শ্রীএরিক উইলিয়মস এক পত্রে শ্রীদত্তকে জানান,

"A number of the scenes such as the ghost sequence" could well pass into history to be compared and considered alongside the famed Eisenstein 'Odessa st eps' sequence from "Battleship Potemkin".

কোন্টিভালে মোট পঁয়ত্রিশটি ছবি দেখানো হয়। শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালনা, মৌলিকত্ব এবং অসাধারণ গুণের জন্য আলাদা "সিলভার রুপ" পুরস্কার পেয়েছে "গুপী গাইন..."। জাপানের "ইনফারনো অব ফার্স্ট লাভ" এশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। স্পেশাল জুরি পুরস্কার পেয়েছে হাঙ্গেরির "দি রেড অ্যান্ড দি হোয়াইট"।

কোন্টিভালের কর্মকর্তারা প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্তকে এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানান। তা ছাড়া, নিউজিল্যান্ড টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীদত্ত ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প এবং বিশেষ করে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকর্ম সম্পর্কে বলেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দুর্গোৎসব ১১৭৩

ব্যঙ্গচিত্র ১১৭৪

দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত ১১৭৫

রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ১১৭৭

বৈদেশিকী ১১৭৮

সদানন্দর জার্নাল ১১৭৯

জলে নামলে (কবিতা)—শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ১১৮১

আমার জন্য ভেবো না (কবিতা)
—শ্রীফিরোজ চৌধুরী ১১৮১

প্রতিদিন একই ঘরে (কবিতা)—শ্রীঅঞ্জন কর ... ১১৮১

পায়রা—শ্রীআশিস ঘোষ ১১৮৩

পঞ্চতন্ত্র—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ১১৮৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	... ...	১২৪৫
পুস্তক পরিচয়	... ...	১২৪৭
খেলার মাঠে—একলব্য	... ...	১২৪৯
ব্যাডমিণ্টনের আইনকানুন—মুকুল	...	১২৫১
অরণ্যদেব	... ...	১২৫২
রঙ্গজগৎ	... ...	১২৫৩
সাপ্তাহিক সংবাদ	... ...	১২৬২
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র	... ...	১২৬৩

প্রচ্ছদঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনার সৌন্দর্যকে
ধ'রে রাখা
কি কষ্টকর ?
একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার
প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল
ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী
আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে।
ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে
তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই রুক্ষ
ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়।
বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা
থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে
পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর
ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত
মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার
মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।
Basant Malati
বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

জনপ্রিয়

মারফি

মুসাফির

অন্যান্য জনপ্রিয় মারফি মডেল

মডেল টি-বি ০৮-১৬
৩ ব্যাণ্ড ৪১০ টাকা

...মুসাফির ৩
২ ব্যাণ্ড ২২০ টাকা

২ ব্যাণ্ড ১৭৫ টাকা

মিডিয়াম ওয়েভ ১২০ টাকা

মূল্য এক্সাইজ ডিউটি সমেত।
অন্যান্য কর আলাদা।

- ছিমছাম, সুন্দর, সংবেদনশীল ৩-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর—পৃথিবীর যে কোন স্টেশন স্পষ্ট ধরা যায়।
- টেলিস্কোপিক অ্যান্টেনা ও বিল্ট-ইন এরিয়্যাল।
- বড়-সাইজ সহজ-সুলভ টর্চ সেল ব্যবহার করে।

প্রত্যেক মারফি ট্রানজিস্টর ভারতের সর্ববৃহৎ অতি আধুনিক ট্রানজিস্টর ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত এবং ওর পেছনে আছে ২০ বছরের গবেষণা, বিশেষ জ্ঞান ও কারিগরী নৈপুণ্য।

সুমধুর ধ্বনি, দেখতেও অনুপম, ন্যায্য দাম

ভালো চা
কম খরচা
Brooke Bond Tea
Red Label
রেড লেবেলের প্রতি
প্যাকেট থেকে পাবেন ঢের বেশী
কাপ ভালো চা। এই দামে
এমন চা আর পাবেন না। ব্রুক বণ্ডের পাকা হাতের
ব্লেণ্ড—খেয়ে পরিতৃপ্তি, আর পয়সাও বাঁচে।
ভারতে যেসব পাতা চা বিক্রী হয় তার মধ্যে রেড লেবেলের
বিক্রীই তাই আজ সবচেয়ে বেশী।
ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল—প্রতি প্যাকেট থেকে পাবেন
আরও বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১
শনিবার ১ কার্তিক, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩৩.০০
ষাণ্মাসিক „	১৬.৫০
ত্রৈমাসিক „	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩৩.০০
ষাণ্মাসিক „	১৬.৫০
ত্রৈমাসিক „	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ত্রিপুরায় ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 18 Oct. 1969

দুর্গোৎসব

বঙ্গদেশে দেবীদুর্গার আরাধনা শুরু হয়ে গেছে। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে এই দেবী শুধুমাত্র আরাধ্যা নন, ইনিই বোধ করি প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র নানা দিক থেকে বিচার করে বলেছিলেন, কৃষ্ণভক্তি এবং দুর্গাভক্তি এদেশের লোকের সর্ব-কর্মব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মেকর্মে, অভ্যাসে আমরা দুর্গাকেই স্মরণ করি বারে বারে। আমাদের প্রধান উৎসবই তাই দুর্গোৎসব। আমাদের সবার বড় আনন্দও তাই দুর্গোৎসব। অথচ, খুবই আশ্চর্যের কথা, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এই প্রধান আরাধ্য দেবী নাকি ঠিক ততটা প্রাচীন নন যতটা প্রাচীন ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, বায়ু, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা। বরং দেবী দুর্গার প্রাচীন পরিচয় খুঁজে বার করতে গেলে দেবী কিছু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেন, ইনি কখনও রাত্রির প্রতিশব্দ মাত্র, কখনও নাকি মহাদেবের ভগিনী, কখনও ব্রহ্মবিদ্যা। সে যাই হোক, আমাদের কাছে "দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ—"।

আমাদের বিপদে দেবী দুর্গা মঙ্গলার্থে আসুন—এই প্রার্থনা যদিও আমাদের আত্মিক তবু ধর্মাচরণ বাদ দিলেও দেবীর একটি সামাজিক রূপও আমাদের মনে মনে গড়ে উঠেছে। সেই রূপে দেখি, ইনি আনন্দময়ী, ইনি বর্ষণ শেষে স্নিগ্ধ শ্যাম বঙ্গদেশে সুখ ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন।

বলা বাহুল্য, দেশাচার ও লোকাচার অনুযায়ী দেবী দুর্গাকে আমরা হৃদয়ের এমন জায়গায় স্থান দিয়েছি যেখানে তিনি আমাদের অতিবড় আত্মীয়, কখনও কন্যা, কখনও জননী, কখনও বা সর্বপ্রকার দুর্গতির দুর্গতিনাশিনী। কমলা-কান্তর কথায় ইনি 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা', সম্ভবত এটিই সত্য কথা, দেবী দুর্গা বঙ্গপ্রতিমা, বাঙ্গালী সমাজেই এঁর যথার্থ স্থান।

সেকাল এবং একালের দুর্গোৎসবে একটা পার্থক্য অবশ্যই ঘটে গেছে। কমলাকান্ত সেকেলে লোক, দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে তিনি পূজার যে ধুম দেখতেন সে ধুম এখন আর কতটুকু আছে। এখনও ঢাকী আছে বটে তবে তারা ঢাক ঘাড়ে করে 'বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—' এমন সুযোগ বড় পায় না। বা কত 'ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধুম বাঁধবে—' এমন তো আর দেখি না। একালের দুর্গোৎসব সেদিক থেকে অনেক নিকৃষ্ট। একালের জাঁকজমক বড় কম নয়, চোখ ধাঁধানো আলো আছে, বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডপ আছে, নিনাদিত মাইক আছে, আধুনিক গান আছে, কিন্তু হায় সে শান্ত নম্র ভক্তিমণ্ডিত পূজা-পাঠ বা উৎসাহ কই! একালের পূজা পথের মধ্যে প্রদর্শনীর অনুরূপ, উগ্র, কখনও কখনও উৎপীড়নতুল্য, স্বাভাবিক আনন্দের স্বাদ তাতে বড় পাওয়া যায় না। এ কথা শুধু শহরের দুর্গা পূজার বেলায় নয়, গ্রামের দুর্গোৎসবের বেলায়ও কম বেশী বলা যায়। দশ পনেরো বছর আগেও গ্রামের দুর্গোৎসবের যে চেহারা অবশিষ্ট ছিল আজ আরও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। হয়ত আমাদের দুর্গোৎসবের এই বাহ্য পরিবর্তন কালের নিয়মেই ঘটে যাচ্ছে। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে এই পরিবর্তন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

উৎসবের ক্ষেত্রে যাই হোক, হৃদয়ের ক্ষেত্রে বোধ করি পরিবর্তনটা তেমন করে দেখা দেয় নি। আজও আশ্বিনের আকাশে রোদ হেসে উঠলে, শিউলী ফুলের গন্ধ ভেসে এলে মন বলে ঃ পুজো আসছে। আগমনীর সুর কানে লাগলে চঞ্চল হয়ে উঠি। দশভুজার চরণে প্রণাম নিবেদনে এখনও হিন্দু সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অভাব বড় দেখি না। বা অবজ্ঞা দেখি না পারিবারিক উৎসব আনন্দের।

পরিশেষে বলা ভাল, দেশ কালের যা অবস্থা তাতে নিরুদ্বিগ্ন মনে কোনো উৎসব আনন্দেই আর মানুষ যোগ দিতে পারে না। দুঃখ দুর্গতি তো আছেই, ক্রমাগত যেন বাড়ছে—তার উপর শত রকম সমস্যা আমাদের মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে পঙ্গু করে তুলেছে। এমন একটা অবস্থায় মানুষ যদি প্রাণ খুলে এই উৎসবের সঙ্গে মিশে যেতে না পারে তবে দোষ দেবারও বিশেষ কিছু নেই। তবু, আমরা প্রার্থনা করব, শত দুঃখ দুর্গতির মধ্যেও যেন বঙ্গবাসী এই দুর্গোৎসবে ক্ষণিক শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পেতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তামিলনাড়ু ঘুরে এসেছেন।
সংবাদে প্রকাশ—বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি।
তামিলনাড়ু কংগ্রেস

দেবরাজ

সুমতি

যত দিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে পিকিঙে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আর চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের মোলাকাত বৃথা যায়নি। সেখানে তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে তার বৃত্তান্ত কোনও সরকারী দলিলে প্রকাশ করা হয়নি। সে খবর দু দেশের সরকারী মহলের ওপর তলার লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানে না। কানাঘুষোয় শোনা গেছে সে বৈঠকে দুই প্রধান তিনটে ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তার এক নম্বর হচ্ছে, দু দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে ঝগড়া-ঝাঁটি, এমন কী যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত চলছে তা বন্ধ করে সরাসরি আলাপ-আলোচনার মারফত তাদের নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে। দু নম্বর হচ্ছে, দু দেশের মধ্যে ব্যবসা যা ইদানীং খুবই কমে গিয়েছে তা আবার বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আদর্শ কিংবা নীতি নিয়ে মতভেদ থাকে তো থাকুক, কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্কে সে জন্যে ঘুণ ধরবে কেন? তিন নম্বর হচ্ছে, দু দিকপাল কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে সম্বন্ধটা আবার স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। তার মুখপাত হিসেবে রেডিও, টেলিভিসন, খবরের কাগজ আর প্রচার পুস্তিকায় যে কুৎসার বান ডেকেছে তা থামাতে হবে।

সত্যি যে এ সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। তবে দেখা যাচ্ছে, কী মস্কো কী পিকিং, মেজাজ কারুর আর সপ্তমে চড়ে নেই। গালাগাল দেওয়াও কমে এসেছে, দিলে তার ঝাঁজও কম। লাল চীনের দু দশক পূর্তি উপলক্ষে পিকিঙে অবশ্য হোমরা চোমরারা কেউ যাননি মস্কো থেকে, যদিও তার প্রথম দশক শেষ হলে যে উৎসব হয়েছিল তাতে হাজির ছিলেন তখনকার রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চফ নিজে। তবে মস্কো থেকে লম্বা এক টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল চেয়ারম্যান মাওকে। তার বয়ান আদৌ মামুলি কিংবা নিয়মতান্ত্রিক নয়। অনেকের ধারণা মস্কো-পিকিং সম্পর্কে যে মোড় ঘুরেছে এ তারই ইঙ্গিত। এ ছাড়া আরও দু চারটে ছোট ছোট লক্ষণ অনেকের চোখে পড়েছে। পিকিঙে ওই হঠাৎ বৈঠকের দিন আষ্টেক বাদে মস্কোতে নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির অফিসের বাইরে সদর রাস্তার ওপর কাঁচ ঢাকা শো কেসে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল চু-কোসিগিন মোলাকাতের খানতিনেক বড় বড় ছবি যা সকলের নজরে পড়ে। চীনকে রাশিয়া যে আর কম্যুনিস্ট সমাজে একঘরে করে রাখতে চায় না লোককে এ কথা বোঝাবার জন্যেই বুঝি ওই ব্যবস্থা।

রুশী-চীনি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হবার পর থেকে কেবল খিস্তি খেউড়ই শুরু হয়নি, চিড় ধরেছে দু দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কেও। চীনের বাণিজ্য এখন বারো আনাই এমন সব দেশের সঙ্গে যারা কম্যুনিজমের ধার ধারে না। ১৯৬৬ সনে চীন রুশিয়ায় কুল্লে ১৫০.৮ কোটি রুবল দামের জিনিস বেচেছিল আর কিনেছিল ১২.৮ কোটি রুবল দামের জিনিস। অথচ দশ বছর আগে রুশিয়া থেকে চীনে আমদানি করা জিনিসের দাম ছিল ২১৭.৩ কোটি রুবল আর চীন থেকে রুশিয়াতে রপ্তানি করা জিনিসের দাম ছিল ২৯৫.৩ কোটি রুবল। লোকসান এতে চীনেরই বেশ [illegible] জেদ যখন চাপে তখন হিসেব করে কে আর চলে? লাভ লোকসান খতিয়ে যদি রাজা-রাজড়ারা কিংবা প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টরা লড়াইয়ে নামতেন তা হলে দুনিয়াতে যুদ্ধ আর কটা হতো? যার সঙ্গে মতে মিলছে না তার মুখ দর্শন করবো না, রাজনীতিতে এই বা কেমন ধারা কথা, বিশেষ করে সে রাজনীতি যখন সাম্যবাদী রাজনীতি? এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের নীতি কিংবা আদর্শ নিয়ে মনোমালিন্য হলেই ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ করে দিতে হবে এর কোনও মানে নেই। তাই কিন্তু করেছে দশ বছর ধরে চীন আর রুশিয়া। চাকা উল্টো ঘুরলে লাভ দু শরিকেরই।

সে চাকা ঘোরাক আর নাই ঘোরাক একটা ব্যাপারে কিন্তু দু পক্ষই টলেছে। সেটা হচ্ছে সীমান্ত বিরোধ। চীন নিজেই কবুল করেছে কী করে বিনা যুদ্ধে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে চু-কোসিগিন বৈঠকে সেপ্টেম্বর মাসে। শুধু আলোচনা নয় দু প্রধান সেদিনই ঠিক করেছিলেন আরও কথাবার্তা চালাবার জন্যে বৈঠক বসাতে হবে দরকার হলে দফায় দফায়। প্রথম দফার বৈঠক বসছে আর দুদিন পরেই পিকিঙেই। তবে পয়লা সারির কোনও নেতা সেখানে থাকবেন না—আলোচনা চালাবেন রাজন উপমন্ত্রী। মস্কো থেকে সে বৈঠকে দলবল নিয়ে যাচ্ছেন বৈদেশিক উপমন্ত্রী ভাসিলি কুজনেৎসভ। তাঁরই সম পর্যায়ের কেউ থাকবেন চীনের তরফ থেকে। কেবল যে বৈঠকের ব্যবস্থাই হয়েছে তাই নয়, এ কবছর যেসব জায়গায় লড়াই চলেছে দু পক্ষে সেসব জায়গায় কামান বন্দুকের গর্জন শোনা তো যাচ্ছেই না, দুদলের সেনারাও আর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে না। সীমান্ত থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে চীনারাও, রুশীরাও। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা যে চলছে এ তারই প্রমাণ।

পিকিং থেকে যে ইস্তাহার বেরিয়েছে সীমান্ত আলোচনা সম্পর্কে তাতে আপসে ভাবটা স্পষ্ট। কড়া কথা কিছু বলা হলেও তাতে লাল চীন স্বীকার করেছে রুশিয়ার কাছ থেকে কোনও জমি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি সে তুলবে না যদি এককালে সে জমি চীনের দখলে থেকেও থাকে তা হলেও নয়। এটা কিন্তু নতুন কথা। এতকাল চীন বলে এসেছে তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলি তার বিস্তর জমি দখল করেছে। জারের আমলে রুশিয়া নাকি তার ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল জমি গ্রাস করে বসে আছে। অমনি অভিযোগ তার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেও। ওসব জমির একটা টুকরোও ছাড়তে চীন ছিল এতদিন নারাজী। অন্যদের বেলায় কী হবে তা অবশ্য কেউ জানে না, তবে রুশিয়ার কাছ থেকে "সূচ্যগ্র মেদিনীও" সে ফিরে চাইবে না বলে ঘোষণা করেছে। এই যদি চীনের মনোভাব হয় তা হলে তো সীমান্ত নিয়ে গোলমাল অনায়াসেই মিটে যাবে। বাকী থাকবে শুধু সাড়ে চার হাজার মাইল জুড়ে যে বিরাট সীমান্ত রয়েছে [illegible] তার অবস্থান ঠিক করে দেওয়া। সে আর এমন কী শক্ত কাজ?

হঠাৎ কেন চীন এ রকম আপসে রাজী হলো? তবে কি তার মতিগতি ফিরলো কোন ভয়ে না তার সুমতি হয়েছে বলে? অনেকেরই ধারণা নিশ্চয় ভেবেচিন্তে সে এ কাজ করেছে—রুশীদের দাবি জোরের উপরে বিনা শর্তে মেনে নিয়েছে। মার্চ মাসে উসুরি নদীর মোহনায় সংঘর্ষের পর এ প্রচার [illegible] হয়েছে যে রুশিয়া কেবল ফাঁকা আওয়াজই করছে না, রীতিমত যুদ্ধ করার জন্যে সে তৈরী হচ্ছে। ও ঘটনার পর চীন টেলিফোনে যখন কোসিগিন যোগাযোগের কথা বলতে চান তখন সাড়া কেউ দেয়নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন সীমান্ত সংঘর্ষ বাড়তে লাগলো, ছড়িয়ে পড়লো সিংকিয়াং এলাকাতেও তখন তারা বুঝলো ব্যাপার সুবিধের নয়। গোঁয়ার্তুমি করে তেমন লাভ হবে না। রুশিয়া যে দরকার হলে চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে প্রস্তুত এ খবর পশ্চিমী দেশগুলো যেমন পেয়েছে তেমনি নিশ্চয় চীনও। সে সব যে মিথ্যা গুজব নয় তা চু এন লাইকে বুঝিয়ে দিয়ে থাকবেন কোসিগিন। পারমাণবিক অস্ত্রের তার যা সামান্য পুঁজি তা নিয়ে চীনের পক্ষে রুশিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করা অসম্ভব। তাই বোধ হয় তার গলায় বাজছে আপসের সুর।

'বাড়ি বদল'

বাড়িটা বদলাতে হল। মধ্য কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণে। আগে নিথর রাতে শেয়ালদা থেকে রেলের আওয়াজ কানে আসত, এখন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত দোতলার জানলা দিয়ে দেখি বালিগঞ্জ আর ঢাকুরিয়ার মধ্যে ট্রেনের আসা-যাওয়া।

যে পাড়ায় বোমা ফাটে না, সে পাড়ায় প্রাণ নেই

একটা ছড়ানো ছেটানো সাবেকী বড়ো বাড়ি থেকে ছোট্ট একটুখানি একেলে বাড়িতে। পুরোনো কলকাতার বেহিসেবী বড়ো বড়ো ঘর-বারান্দা তৈরি হত, এখানে প্রতি ইঞ্চি জমিতে তীক্ষ্ণ সতর্কতা। অকাজের (কিংবা দু বছরে একবার কাজে লাগবার) জিনিস ডাই করে রাখবার মতো ফালতু জায়গা এখানে কোথাও নেই। এখানে মনের ভেতরেও বাড়তি জায়গা রাখা বারণ না। নেই প্রতিবেশী সম্পর্কে অকারণ কৌতূহল, গায়ে-পড়া আলাপ, প্ল্যান-করা এককে বাড়ির মতো মনের চেহারাও এখানে মাপা।

ভালো, না মন্দ? এখনো হিসেব করার সময় আসেনি।

তবে কমনম্যান সুনন্দর অস্বস্তি বোধ করবার কিছু নেই। তার কারণ নিজের জানলাটি বাক-স্ট্রেটেই বেছে নিয়েছি আমি। সামনেই আন্ডার-কনস্ট্রাকশন বাড়ির সার—গড়ে উঠছে আটতলা কিংবা নতলা একটা বাড়ির অতিকায় কাঠামো—তার ওপারে গড়িয়াহাট রোড দিয়ে ব্রিজের ওপর ডবল-ডেকারের আসা-যাওয়ার শব্দ। কিন্তু আমার পেছনে দুধারে বস্তির মানুষ—তাদের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের জীবনযাত্রা, মেয়েদের কথালাপ: 'বাজারে গিয়েছিনু, তেল আইনতে ভুলে গেনু।' উলঙ্গ শিশুর কলধ্বনি—বস্তির 'টিপ কলে' স্নান আর জল নেওয়ার শব্দ। এই তো ঠিক হয়েছে। নইলে এই ছোট্ট সামান্য বাড়িটা কি কোথাও মানাতো গড়িয়াহাট রোডের ওপরে?

না—এদিক থেকে বেশ আছি।

আগের বাড়িতে আমার জানলা দিয়ে দেখা যেত খানিক দূরের একটা কলেজের কম্পাউন্ডে কয়েকটা পাম গাছের মাথা। পেছনে বস্তিতে ছিল করুণ চেহারার একটা নিম গাছ—সেখানে কয়েক শো কাকের আস্তানা—চিলকেও দেখেছি বাসা বাঁধতে। তবু সে ভরা সবুজ হয়ে উঠত বর্ষার ছোঁয়ায়, শীতের হাওয়ায় তার শুকনো পাতা উড়ে উড়ে এসে পড়ত আমার ঘরে, বসন্তে তাকে আলো করে দিত গুচ্ছ গুচ্ছ রাঙা মঞ্জরী। ওখানে আমার প্রকৃতি ছিল এইটুকুই কৃপণ মুঠির মধ্যে বাঁধা। এখানে চেয়ে দেখছি সবুজ—সবুজ, উদ্ধত তালের ধ্বজা, নারকেল গাছের সার দুলেছে হাওয়ায়, একটা শিশু গাছ বস্তির টিনের চালে মেলেছে ছায়াছত্র, ঘন নিবিড় তেঁতুলের গাছ দেখছি মাঝে মাঝে; ও পাশে একটা তরুণ অশ্বত্থ তার পাশে—মনে হচ্ছে মাদার, আর বড়ো একটা টোপা কুলের গাছ। এ ধারে দুটো ভাগ করা খালি প্লট পড়ে রয়েছে—এ কালের প্ল্যাস্টিক বিউটি নিয়ে দুটো বাড়ি হয়তো অচিরেই উঠবে—কিন্তু আপাতত আমার চোখ জুড়িয়ে প্লট দুটিতে ঘন ঘাসের মখমল।

আর—আর কাল সারাটা রাত কেটেছে হাওয়ায় আর বৃষ্টিতে। জানলার কাছে দুলেছে গাছের ছায়া, রবীন্দ্র সংগীতের সুর

যে পাড়ায় চাঁদার উপদ্রব নেই সেপাড়ায় প্রাণ নেই

[illegible] বস্তির সেতারে: 'অশ্বত্থপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া মর্মর শব্দে নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া' আর কী অবিশ্বাস্য মনে

হয়েছে, যখন কানে এসেছে একটানা ব্যাঙের ডাক।

এতদিন যেখানে কাটিয়েছি সেখানে রাত দুটোর আগে কলকাতা ঘুমোয় না—আবার ভোর চারটেতেই সে জাগে। এখানে নটা বাজতে না বাজতেই চারদিক ঝিমিয়ে আসে। আগে কত রাত পর্যন্ত শুনতে পেতুম মানুষের বৈষয়িক কোলাহল, এখানে চারদিকে স্তব্ধতা নামলে রেডিয়োর আওয়াজ—ট্রেনের শব্দ, গড়িয়াহাট রোডে ট্র্যাফিকের শব্দ, হাওয়ায় পাতার শব্দ। চোখ বুজে মনে আসে জলপাইগুড়ির নির্জন গাড়িতে নিশিযাপন, মনে আসে হিমালয়ের বুকে ডাগদার সেই নিঃসঙ্গ বাংলো—যেখানে সারা রাত বন থেকে অবিচ্ছিন্ন পাইন পাতার মর্মর আর একটা ঝর্নার কলরোল; মনে পড়ে ওয়ালটেয়ারের পোড়ো বাড়ির মতো সেই হোটেলটা—যেখানে আমরা ছাড়া আর একটিমাত্র ইতালীয় অতিথি—আর সমস্ত রাত—সমস্ত রাত ভরে শুধুই সমুদ্রের স্বর আর নারকেল বনের আকুতি।

আপাতত এই সবুজ, এই বিস্রান্তি। এ তো লাভের খাতা। কিন্তু তারপর?

সেই পুরোনো চেনা মুখগুলোকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না। ভুলতে পারছি না সেই কয়েকটি বিষণ্ণ চোখকে: 'চলে যাচ্ছেন পাড়া ছেড়ে? সত্যিই চলে যাচ্ছেন?'

কী কী ঋণ জমা করে এলুম, তাই ভাবছি। পাড়ার ছেলেদের পুজোর চাঁদা দেওয়া হয়নি, বলা হয়েছিল, 'খুব কষ্টে আছি, দুএকদিন পরে এসো।' চাঁদা দিতে কখনো খুব ভালো লাগে না, এখানেও দাবিদার পৌঁছে গেছে কিন্তু দূরে সরে এসে পাড়ার ছেলেদের কথা মনে পড়ে কোথায় যেন বেদনা বিঁধছে একটা। মনে আসছে, মণিহারী দোকানের সেই হাসিমুখ ছেলেটিকে—অকারণেই আমার ওপর অসীম শ্রদ্ধা ছিল তার, ভিড়ের মধ্যেও সব খরিদ্দারকে সরিয়ে দিয়ে বলত: 'দাঁড়ান—দাঁড়ান, দাদার জিনিসগুলো আগে দিয়ে দিই।' মনে পড়ছে বাড়ির বুড়ো জমাদারকে—পুজোর সময় মাইজীর কাছ থেকে একখানা লাল পাড় ধুতির বায়না থাকত যার; মনে আসছে তাকেও—পুরোনো খবরের কাগজ কিনতে এসে যে মধ্যে মধ্যে টাটকা ডিমের যোগান দিত; মনে আসছে সেই মুন্সীজীকে—ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে যার প্রতিদিন নালিশ: 'কী হইল না পাকিস্তান হইয়া? মাঝখান দিয়া খালি হিন্দু-মোছলমানেরাই মারা পড়লাম আমরা।' ভাবছি সেই ছেলেদের: 'আটকে ভাঙলে আমাদের ফাংশন প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে, আপনাকে থাকতেই হবে।'

ধুলো ছিল, কোলাহল ছিল, নানাবিধ উপদ্রব ছিল; সামনের পৌর প্রতিষ্ঠানের পাহারাজে কখনো কখনো বুড়োদের চণ্ডী কুঁচ মাস্তানদের সঙ্গীত-সাধন আসার এবং রাস্তার কখনো সারা রাত চমক উঠত, পেছনের মুসলমান পাড়ায় কোথায় যেন বসছে কাওয়ালীর আসর—হারমোনিয়ামের সুরে সুরে আসত অপূর্ব মনোহর শিক্ষিত মাজিদ গলায় সুরবন্দি। নিরালায় পড়িরেন পাড়া—জলী ডিস্কো পাওয়া যেত না, কিন্তু একবার দিলে—ঠিক পাশের দোকানে একবার দোকান থেকে চীনে লণ্ঠন পান কাবলী মাটি আমার নিরন্ত পাঁচ টাকার ফুল যমনা—নদের সঙ্গে গড়ের মুড়ির আসর জমে উঠত। সন্ধ্যায় কি, পথেরা বেরে পোড়া তুলা কমলায় দাঁড়িয়ে ছিল হয়ে আসা সব দিয়ে ক্যাম্প লেপিটার যেতো না মুর্শিদের সঙ্গে গোটা চাদরে আসবরাতে পথ পরিক্রমা করা যেতো।

এখানেও আমার পেছনে, পাশে বস্তি। আমার চেনা দরিদ্র মানুষের পরিজন। কিন্তু কী করে জানি, অপরেই পরিচয়হারা রোদ, দু পা বাড়ালে ভোর পাকা, আর একটু এগোলেই বাসবিহারীর মোড়ের ঝকঝকে দোকান আর ঝলমলে মানুষ?

ভিড়ের মধ্য থেকে চোখ-কান-মনের বিশ্রাম চেয়েছিলুম। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা চেয়েছিলুম কি?

সামনে পুজোর আনন্দ। এই জানলা দিয়ে পৌঁছুবে সেই উৎসবের মাধুর্য। অনেকেই তো বাইরে চলেছেন, আমার পুজোর ছুটিতে বেরুবার পথ নেই; এবারে এই আমার ভেনু, মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণের এই উপান্তে।

কিন্তু ভেনুতে গিয়ে—চোখ-মন জুড়িয়ে মানুষ ফিরে আসে। আমি যে আর ফিরব না, সেই বেদনাটুকুই ভুলতে পারছি না কোনোমতে।

আমার জন্যে ভেবো না

ফিরোজ চৌধুরী

মণিবন্ধে লুকিয়ে রেখেছো স্বর্গ
খুব লোভের সেই পরমার্থ
আর আমি হা পিত্যেশ বসে আছি আমরণ তপস্যায়
আমায় কষ্ট দিতে তোমার খুব ভাল লাগে, না?

টানাপোড়েনে সারাক্ষণ বিধ্বস্ত ক্লান্ত
তুমিই বলো রুটিন-মাফিক কতদিনই বা চলা যায়
কতদিন বা গৈরিক পতাকার নীচে নিজেকে অবনত রাখা যায়
কতদিনই বা
অবশিষ্ট যা কিছু কবিতা কবিতা করে চীৎকার
সে তো আলো বীভৎস
তবু মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে এখন অনেক দাবি

তবু এখানে শ্বেত পাথরের ছায়া স্নিগ্ধ কোমল
খুব সহজ হওয়া
এখানে মার্থ পুরুষের কদর্যতাহীন বিকেল কাটানো
নিজেকে উজাড় বিছিয়ে সব গোপনতা ছুঁয়ে দেখা
কী লাভ বলো বিমর্ষ থেকে
আমার জন্যে ভেবো না
দেখো আমি ঠিক পার হয়ে যাবো।

জলে নামলে

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

জলের আয়নায় শরীরের রহস্য
অসম্ভব স্পষ্ট এবং সুন্দর দেখায়। তুমি
মিথ্যে-মিথ্যি শুধু এতো কাছে গিয়ে ফিরে এলে।

মনে পড়ে, সেই শাপলা পুকুর? যখন
আমরা দুজনে সোনালী-রুপোলী মাছের মতো
অনেক কাছে কখনো আবার দূরে ভেসে যেতুম।

জলে নামলে: এখনও: তুমি আমি এক—
স্রোত অথবা বদ্ধ জলে; বিষম একটা কাণ্ড
বাধাতে পারি। দেখ,

জলের আয়নায় শরীরের রহস্য কেমন স্পষ্ট এবং
সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ। তুমি
মিথ্যে-মিথ্যি শুধু এতো কাছে গিয়ে ফিরে এলে।

জলে নামলে
সেদিনের বয়েসটা আবার অনেক কাছে পেতে।

প্রতিদিন একই ঘর

অঞ্জন কর

প্রতিদিন একইভাবে ঘরের সম্মুখে যাওয়া অপরাধ
প্রতিদিন একই ছন্দ, ভুল চেনাচেনি, নীতি ও শিক্ষার
ফিসফাস্
মাঝে মাঝে ওলটপালট
হওয়া ভালো, রিভিশন লেশন পেলে দেহমন সুস্থ হয়ে
ওঠে, পাখির ঠোঁটের মতো কথা বলা যায়, কিংবা
বর্ষার কোমর ধরে খেলা ভালো লাগে—
মাঝে-মধ্যে তাই
পুরনো বন্ধন ভেঙে স্বেচ্ছাচার ভালোবেসে ফেলি

অথচ সময় যেন সময়ের খোঁজ ধরে আছে—
রক্তের শরীর
থেকে চুষে নিচ্ছে রস, সম্বলহীন পরজীবী ভিখারি যেন
বসে আছি, দ্যাখো
রুগ্ন লেখকের মতোন কাঁপে চল
জলোচ্ছ্বাস, অনন্য ফেস্টুন—
যেন প্রতিবিম্ব
একই ঘর এ-ঘর ও-ঘর হয়ে যায়!

নিতু ওপরে উঠছে। আবছা অন্ধকারে সিঁড়িগুলো প্রায় অস্পষ্ট। একবার ফসকে গেলে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে নিচে। হাত-পা ভাঙবে কিংবা অতটা না হলেও মচকে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। রেলিং ধরে খুব সাবধানে উঠছে নিতু। হাতের আলোটা কাঁপছে। ছায়াটা কখনো বড়ো, কখনো বা ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েকটা ধাপ উঠতে পারলেই একটা দরজা আর তারপরেই ছাদ। একবার ছাদে যেতে হবে। পায়রার খোপগুলো বন্ধ করা হয়নি, একদিন যদি ভুলে যায় তো পরদিন আর একটাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলছে নিতু। অনেকদিনের পুরোন বাড়ি, সিমেন্ট-বালি খসে খসে মাঝে মাঝে দেয়ালের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ইঁদুর-আরশোলা-টিকটিকি কেমন যেন স্যাঁত-সেঁতে। হাতের আলোটা একটু নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো নিতু। গরম মোমের ফোঁটা পড়তে থাকায় হাত জ্বালা করছে। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকে নিতু। সামনেই ছাদের দরজা। দরজাটা বন্ধ। দরজার ওপাশেই ছাদ, এক হাতে মোমটা ধরে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ফেললো নিতু। আর দরজা খুলতেই দমকা হাওয়ায় আলোটা নিবে গেল। অন্ধকার, সামনে পেছনে ওপরে নিচে। সিঁড়িতে অন্ধকার, ছাদে অন্ধকার, কেমন যেন হকচকিয়ে গেল নিতু। দৌড়ে নিচে যাবে কিংবা ছাদে। কি করবে ঠিক বুঝতে না বুঝতেই এক লাফে ছাদে চলে গেল।

ছাদে অন্ধকার, ফুলের টবগুলো থেকে গন্ধ আসছে। বেলফুল, হাসনুহানা, রজনী গন্ধা আরও কত কি। অন্ধকারে সব একাকার। এরিয়েলের তারে সাদা এক টুকরো কাগজ নড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত-পা সিরসির করছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিতু। তারপর পায়রার বাকসোটার দিকে এগিয়ে যায়। পায়ের শব্দে ডানা ঝটফট করতে থাকে পায়রাগুলো। ঘুলঘুলিতে হাত দিতেই ভেতরে যেন ঝড় বইতে থাকে। একটু বিরক্ত হয় নিতু। এক একটা খুপরিতে হাত দিয়ে দেখতে থাকে। লক্কা, লোটনা, পক্ষীরাজ, নরম শরীরগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে ধুকপুক করছে। একটু জোরে টিপে ধরলেই শেষ হয়ে যাবে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। উত্তেজনায় চোখ-মুখ জ্বালা করছে। নিতু একবার ভাবলো পায়রাগুলোকে সব বাইরে নিয়ে আসে। কোনদিন অন্ধকারে পায়রা উড়তে দেখেনি। যদি একবার হাততালি দিয়ে পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যেত। ওপর দিকে তাকায় নিতু। ধোঁয়া আর কুয়াশায় আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে। মন্টুদের ছাদের ঘরটায় আলো জ্বলছে। ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাতেই গলির মোড়ের কিছুটা দেখতে পেল। শুধু আলো আর আলো। লাল-নীল-সবুজ-সাদা-হলদে, ধোঁয়া আর কুয়াশায় বাড়িগুলোর স্পষ্ট চেহারা চোখে পড়ছে না। ডান পাশে সরে গিয়ে আবার ঝুঁকতেই পাশের বাড়ির বুলাকে জানলায় দেখতে পেল নিতু। জানলায় দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। ওর ফরসা হাত দুটো, ফ্রকের নিচে বেরিয়ে থাকা হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অংশটুকু, পিঠের কিছুটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, লাল ফ্রক পরা শরীরটা মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে চলে যাচ্ছে। আবার জানলার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। বেশ মজা পাচ্ছিল নিতু। কেমন যেন নেশায় ধরেছে। বুলাদের বাড়ির ছাদটা অন্ধকার। ভাল করে একবার দেখলো নিতু। কেউ নেই। দড়িতে কি সব জামা-কাপড় ঝুলছে। সামনের দিকে আর একটু ঝোঁকার চেষ্টা করলো নিতু। সিমেন্টে ঘষা লেগে বুকের কাছটা জ্বালা করছে। কার্নিস ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল নিতু। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পায়রা-গুলো আবার ডানা ঝটপট করতে শুরু করলো। কার্নিসের পাশ থেকে সরে এলো নিতু। শীত করছে। খোপগুলো বন্ধ করে এবার নিচে যাওয়া দরকার। একবারে

আঙুলে ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়তেই টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের দিকে হেলে পড়লো, আর বুক থেকে হাতটা সরে যেতেই পায়রাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। আচমকা পড়ে যেতে প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল নিতু। কিন্তু পায়রাটা হঠাৎ উড়ে যেতেই হুঁশ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। পায়রাটা এরিয়েলের তারে বসেছে। অন্ধকারে নিঃশব্দে দুলছে। কী করবে ঠিক বুঝতে পারলো না নিতু। ঢিল ছুঁড়লে, হাততালি দিলে কিংবা এরিয়েলের খুঁটিটা ধরে দু'একবার নাড়লেই পায়রাটা উড়ে যেতে পারে। অন্ধকারে যে-কোন দিকে যেতে পারে। দিনের আলো থাকলে তবু কথা ছিল, কিন্তু এই অন্ধকারে একবার উড়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। কি করবে ঠিক বুঝতে পারলো না নিতু। শীতে হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে সরে গেল। পায়রাটা একবার ব্যোমের ওপর গিয়ে বসলো, তারপর নিচে নেমে এলো। নিতু নড়লো না। শব্দ করলো না। আবছা অন্ধকারে পায়রাটা ছাদে ঘুরতে থাকলো।

বুলাদের বাড়ির ছাদে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। অস্পষ্ট খানিকটা আলো এদিকে ছিটকে এলো। লাল চাদর গায়ে কে যেন ওবাড়ির ছাদে ঘুরছে। পায়রাটা একবার কার্নিসের দিকে উড়ে যাচ্ছে আবার নিচে নেমে আসছে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে নিতু। অতর্কিতে ধরে ফেলতে হবে। আর একবার ধরতে পারলে—

পায়রাটা হাঁটিতে হাঁটিতে সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একবার নিচে নামছে আবার চৌকাঠের ওপর বসছে। এদিক থেকে তাড়া দিলে সিঁড়ির দিকে চলে যাবে। আর তারপর দরজাটা একবার বন্ধ করতে পারলে,—ধরতে অসুবিধে হবে না। "—হুঁস্—" পায়রাটা সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই দরজাটা এক ঝটকায় বন্ধ করে দেয় নিতু। শব্দ শুনে বুঝতে পারে পায়রাটা অন্ধকারে এদিক-ওদিক উড়ছে, ডানার ঝাপটা লাগছে মাথায়, কিন্তু ধরতে পারলো না। অন্ধকারে ঘাটের সিঁড়ি, ভাঙা চেয়ার [illegible] কোথায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিতু। অন্ধকারে খটখট [illegible] নিচে-সামনে-পাশে। কোথাও ঠিক থেমে থাকছে না। ইচ্ছে হচ্ছে যে-দিকে খুশি ঝাঁপ দিয়ে সবকিছু তোলপাড় করে দেয়। ধরতেই হবে। আর একবার ধরতে পারলে ডানা দুমড়ে দেবে একেবারে।

শক্ত মতো কি যেন একটা পায়ে লাগতেই একটু পেছনে সরে গেল নিতু। ইঁট কিংবা হবে হয়তো। ডান দিকে হাত বাড়াতেই ঘুঁটের বস্তাটা হাতে ঠেকল। শব্দটা আবার শুনতে পেল। অন্ধকারে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করলো, সাদা মতো কিছু চোখে পড়ে কিনা। কী যেন একটা নড়ছে খস্‌খস্ করে। অন্য কিছু নয়তো? কী করবে ঠিক বুঝতে পারলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর আস্তে আস্তে শব্দটার দিকে এগুতে থাকলো।

আর ঠিক তখনি কাছে কোথাও কে যেন খুব জোরে চিৎকার করে উঠলো। হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকতে গিয়ে, টাল সামলাতে না পেরে বস্তাটা ধরার চেষ্টা করলো নিতু। কিন্তু পা ফসকে বস্তা সমেত নিচের দিকে গড়িয়ে গেল। দুড়দুড় করে কয়েক ধাপ গড়িয়ে পড়তে পড়তে, নড়বড়ে রেলিংটা ধরে কোনমতে নিজেকে সামলে নিল নিতু। বাঁ পায়ের হাঁটুটা টনটন্ করছে। বুক-পিঠ ছড়ে গিয়ে ভীষণ জ্বালা করছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিতু। রাগে দেওয়ালে ঘুঁষি মারতে ইচ্ছে করছে। "—একবার যদি ধরতে পারি—" ভাবতে ভাবতেই পায়রাটা হঠাৎ একেবারে গায়ে এসে পড়লো। দু'হাতে জাপটে ধরলো নিতু, আবার উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই একেবারে দেওয়ালে চেপে ধরলো। নখের আঁচড়ে হাত জ্বালা করছে। গালে মুখে ডানার ঝাপটা লাগছে। হাত-দুটোকে আর একবার মুচড়ে, পায়রাটাকে সিঁড়ির ওপর আছড়ে ফেললো। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বার কয়েক খোঁচা দিতেও এখন আর নড়ছে না। নিচু হয়ে এক হাতে তুলে ধরতেই পায়ের পাতায় গরম কয়েকটা ফোঁটা পড়লো। তাড়াতাড়ি ছাদে ছুটে গেল নিতু। আবছা আলোয় দেখতে পেল পায়রার মাথাটা ঝুলে পড়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, আস্তে আস্তে পায়রার বাক্সোটার দিকে এগিয়ে গেল নিতু। কোন শব্দ নেই। একে একে সব কটা খুপরি বন্ধ করলো। খুললো, আবার বন্ধ করলো। এরিয়েল ছাড়িয়ে পায়রার বোমটা উঁচু হয়ে আছে। বুলাদের ছাদে এখন আর কোন আলো নেই। মণ্টুদের বাড়িটা অন্ধকার। টবের ছোট বড় গাছগুলো হাওয়ায় নড়ছে। এরিয়েলের সাদা ঘুড়িটা আবার দুলতে শুরু করেছে। হাতটা কেমন যেন চটচটে লাগছে। ভিজে লাগতেই কেমন ভয় মনে হলো। এই ঠাণ্ডাতেই সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। হাত-পা কাঁপছে। ইচ্ছে হচ্ছে একবার চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। একটু এগিয়ে পায়রাটার কাছে গিয়ে বসলো নিতু।

আর ঠিক তখনি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন আস্তে আস্তে ওপরে আসছে। শব্দটা থামছে, আবার উপরে উঠে আসছে। নিতু নড়লো না, উঠে দাঁড়ালো না। আবছা অন্ধকারে পায়রাটাকে এক টুকরো সাদা কাপড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

ত্রিমূর্তি

প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক মিখাইল গুস্ একটি বড় খাঁটি তত্ত্ব কথা বলেছেন:—

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর কথা আজ আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এরকম একটা শিক্ষা হল যে, আমাদের যুগে বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের যে কোনো রকম দাবি এক সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হিটলারের পদানুসরণ যারা করতে চায়, তাদের সকলের প্রতি এ হল এক গুরুতর হুঁশিয়ারি।"১

কমরেড পণ্ডিত গুসের কথার পিঠ-পিঠ আমি কোনো মন্তব্য করার দম্ভ ধরিনে। আমি অন্য এক মনস্তত্ত্ববিদের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরেনবের্গ শহরে যখন গোয়েরিঙ, হেস্, কাইটেল প্রভৃতি জনা বিশেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছিল তখন প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার কেলি দিনের পর দিন হাজতে এদের মনঃসমীক্ষণ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে বলেন, "হিটলারের মত ডিকটেটর এবং নাৎসি পার্টির মত পার্টি পৃথিবীর যে-কোনো দেশে যে কোনো সময়ে পুনরায় দেখা দিতে পারে।" তাই আমার মনে ভয় লাগে, কমরেড গুসের "গুরুতর হুঁশিয়ারি" সত্ত্বেও এ-পাপিষ্ঠ পুনরায় যে-কোনো দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু ভাগ্যিস গুস্ এ-হুঁশিয়ারি শুনিয়ে উত্তম কর্মই করেছেন। অন্ততঃ তাঁর আপন দেশের রাজনৈতিকরা যদি এ-হুঁশিয়ারির (অন্তরঙ্গভাবে!) মেনে নেন তবে ক্রমে ক্রমে চীন এমন কি মার্কিনও হয়তো রুশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন—এ-রকম একটা আশা করা যেতে পারে।

*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপের পঞ্চ-প্রধান ছিলেন, হিটলার, স্তালিন, মুসোলিনি, রোজোভেল্ট এবং চার্চিল। এঁদের প্রথম তিনজন ছিলেন কট্টর ডিকটেটর; বাকি দুজন গণতন্ত্রের প্রতিভূ। প্রথম তিনজন রণাঙ্গনে নামেননি বটে, কিন্তু তাবৎ যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি (স্ট্রাটেজি; মায় সূক্ষ্ম ট্যাকটিক পর্যন্ত) ২ সম্বন্ধে তাঁরা পাকাপাকি, কঠিন নির্দেশ দিতেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ জেনারেলদের। রোজোভেল্ট চার্চিল সেরকম করেননি। এঁরা তাঁদের জেনারেলদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বাদবাকী সবকিছু ওঁদেরই হাতে ছেড়ে দিতেন। তবে বলা হয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত জেনারেলদের রুটিন কর্মে নাক গলাতেন (ইনটারফিয়ার করতেন) ডিকটেটরদের ভিতর হিটলার প্রচুরতম ও গণতন্ত্রের প্রতিভূ চার্চিল অনেকখানি।

এই পঞ্চপ্রধানের যে তিন জেনারেল খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা মার্কিন আইজেনহাওয়ার, ইংরেজ মন্টগোমেরি।

---

১ ভারতে অবস্থিত বিদেশী একাধিক দূতাবাস একাধিক ভাষায় বিস্তর প্রোপাগাণ্ডা লেখন প্রকাশ করেন আমার মত স্বল্পজ্ঞাত লোকও অনেকগুলো পায়। এগুলো পড়তে হলে অনেকখানি ধৈর্যের প্রয়োজন, কারণ এদের অধিকাংশই বড় একঘেয়ে। এরই মধ্যে হঠাৎ একখানা উত্তম চটি পুস্তিকা আমার দৃষ্টিকে বড়ই আলোড়িত করেছে। "সোভিয়েট সমীক্ষা": ৯-৯-৬৯ সংখ্যা, সম্পাদক কোলোকোলো; যুগ্ম সম্পাদক [illegible]; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতাবাস প্রকাশিত।

এ সংখ্যায় আছে দুটি সুলিখিত রচনা: (১) মিখাইল গুস্ কর্তৃক "ইতিহাসের শিক্ষা" এবং (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাইস মার্শাল কর্তৃক সোভিয়েট সৈন্যের উদ্দেশে মার্শাল জুকভের গ্রন্থ "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তার" সমালোচনা। বলা বাহুল্য আমি যে সব সময় এদের সঙ্গে এক মত হতে পেরেছি, তা নয়। সান্ত্বনা নিই এই ভেবে, যে, দেশে-বিদেশের একাধিক কমরেডও হয়তো কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। বাঙলা অনুবাদ কে বা কারা করেছেন তাঁদের নাম নেই। অনুবাদ স্থলে স্থলে ঈষৎ আড়ষ্ট হলেও অতিশয় বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গের।

২ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩ অক্টোবর '৬৯)-এ জেনারেল শ্রীমন্ত চৌধুরীর "ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি" শিরোনামায় লিখিত একটি অতুলনীয় অনবদ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এটির বাঙলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে হয়ত বলবেন, সাধারণজন (সিভিলিয়ানরা) যতই সংগ্রামশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে মারমুখো হয়ে পদে পদে লড়াই করতে চাইবে—মিলিটারিস্ট্ বনে যাবে। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার বিশ্বাস রাজনীতি কোনসময় সমরনীতিতে পরিণত হয়, এ জ্ঞান সাধারণ জনের যতই বাড়বে ততই যুদ্ধ সম্বন্ধে তার বৈরাগ্যবোধ বাড়বে। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন, এ দুনিয়ায় বহু শত বার সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ানরা লড়াই করার জন্য যখন হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন সৈন্যবাহিনীর জেনারেল, অফিসারেরা (প্রফেশনাল সোলজাররা) তাদেরকে ঠেকিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দেননি এবং পরে দেখা গেল, ঐ করে জেনারেল অফিসারেরা দেশ দশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। অথচ সাধারণজন ভাবে, এরা কথায় কথায় লড়াই শুরু করে দিয়ে পদোন্নতি, মেডেলের জন্য মুখিয়ে আছেন॥

ডিকটেটররা সর্বদাই সর্বকৃতিত্ব সম্পূর্ণ পেতে চান বলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর কোনো সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তৎসত্ত্বেও ডিকটেটরের অধীনে থেকেও যিনি বিশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি যুদ্ধের জঙ্গীলাট মার্শাল গিওর্গি জুকভ।

এই তিন জঙ্গীলাট সম্মুখ সংগ্রামে নেমেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই মার্কিন আইজেনহাওয়ার ও ইংরেজ মন্টগামেরি যুদ্ধক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতা সবিস্তর বর্ণনা করে গ্রন্থ লেখেন। তৃতীয় বীর জুকভ এ-তাবৎ কিছুই লেখেননি।৩ (হয়তো স্তালিন চাননি যে জুকভ কোনো-কিছু লেখেন যাতে করে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুন্ন হয়। আমার মনে হয় সেখানে তিনি করেছিলেন ভুল। সে কথা পরে হবে।)

এই তিনজনই হিটলারের সৈন্য-বাহিনীকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন ইংরেজ (ফরাসীও) জনাপ স্বীকার করতে রাজী হন না, আমার নিজের বিশ্বাস হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকভের। সুতরাং শেষ বিশ্বযুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাস—জুকভের বিবরণীহীন ইতিহাস—যেন হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক।

স্তালিনের মৃত্যুর পর জুকভ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থ লিখতে পারতেন। কিন্তু তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্তালিনের চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন। রুশের বড় কর্তারা তখন যে-প্রোপাগান্ডা আরম্ভ করলেন, তার মূল কথা, 'স্তালিন ছিল সংগ্রামনীতিতে একদম আনাড়ি। তার ভুল নির্দেশের ফলেই লক্ষ লক্ষ রুশ সে যুদ্ধে মারা যায়। নইলে রুশ অনেক পূর্বেই জয়ী হতে পেত।'

মৃত্যুর পর স্তালিন বিরোধীরা জুকভকে নানাপ্রকারে নিপীড়ন করেন কারণ, তিনি এই প্রোপাগান্ডাতে সায় দিতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই সে সম্বন্ধেও তিনি কোনো-কিছু লিখলেন না।

এরপর স্তালিন স্মৃতিবিরোধীরাও ক্ষমতাচ্যুত হলেন।

ধীরে ধীরে স্তালিন সম্বন্ধে রাশার জনসাধারণও সত্য কথা বলতে লাগলো।

তাই যুদ্ধের চব্বিশ বৎসর পর জুকভ তাঁর "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তা" প্রকাশ করেছেন ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে। (এক নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ শেষের এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর আইজেনহাওয়ার, মন্টগমেরি ও জুকভ এই ত্রিমূর্তির কল্যাণে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাতেকলমে এঁরা কোন্ কোন্ রণনীতি রণকৌশল অবলম্বন করে অবশেষে জয়লাভ করলেন তার পূর্ণতর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হবে—কোনো যুদ্ধেরই পূর্ণতম ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি, এ-বেলাও হবে না।

*

জুকভের রুশ গ্রন্থ বা তার পূর্ণ অনুবাদ আমার হাতে কখনো পৌঁছবে না। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত রুশ মার্শাল ভাসিলেভস্কি ঐ গ্রন্থের যে পরিচিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়েছেন একমাত্র তারই উপর নির্ভর করে—কথায় বলে অভাবে পড়লে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—মৎস্যমুখো বাঙালীকে রক্তমুখো সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা শোনাবার চেষ্টা দেব। একেবারে নিষ্ফল হবে না। কারণ "রক্তমুখো" না হলেও বাঙালী যে ইতিমধ্যে বেশ "মারমুখো" হয়ে উঠেছে সে-তত্ত্ব কি কলকাতা কি মফস্বল সর্বত্রই স্বপ্রকাশ। শুনতে পাই, এরপর তারা নাকি "রক্তমুখো" হয়ে লড়াই করে এদেশে "প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র" প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটা আ লা রুস্ (রুশ পদ্ধতিতে রান্না স্যালাড) না, আ লা শীন্ (চীন পদ্ধতিতে রান্না ফ্রাইড রাইস) হবে সেটি নিয়ে মতভেদ আছে।

রুশ রাজনীতি তথা চীন রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞানগম্যি নেই।

কিন্তু কিঞ্চিৎ রসানুভূতি আছে উভয়ের সুরস খাদ্যাদি সম্বন্ধে।

তাই ভালোবাসি রাশান স্যালাড, রাশান ক্যাভিয়ার, রাশান বর্শসুপ, রাশান পানীয় (আমি কড়া ভোদকা সইতে পারিনে; পছন্দ করি—এবং স্তালিনও ঐ খেতেন—উত্তম ওয়াইন, তা সে স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ারই হোক বা ককেশাসেরই হোক)

সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করি চীনা ফ্রাইড রাইস (চীনা হোটেল-বয় বলে "ফ্লাইড লাইস" অর্থাৎ ভাজা ইঁদুর), শ্রিম্প চিকেন, ব্যাঙের ছাতার অমলেট, ইত্যাদি।

*

কলকাতার রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা একটা বড় মারাত্মক ভুল করছেন। ওঁদের উচিত এ-শহরে অন্তত দু গণ্ডা রাশান রেস্তোরাঁ বসানো।

কারণ "Love does not go through heart, but through stomach—" "প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না; সঞ্চারিত হয় উদরে"—আপ্তবাক্যটি বলেছেন একটি ফরাসিনী সুরসিকা নাগরিক।

(ক্রমশ)

৩ কয়েকজন জর্মন জেনারেল লিখেছেন বটে, কিন্তু এঁদের কেউই সর্ব রণাঙ্গনের পূর্ণাধিকার কখনো পাননি। আর ইতালিয়ানরা "কাপোরেত্তো" সম্বন্ধে "নীরবতা হিরণ্ময়"।

সামান্য কদিন আগের ঘটনা। ভারতী আর বাসুদেব আমাদের পিকাডিলি সার্কাসের টিউব স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে শুভরাত্রি বলে ঘরে গেলেন। খই-চন্‌চন্‌ খই-চন্‌চন্‌ করে দূর থেকে খঞ্জনির আওয়াজ ভেসে আসছিল; চৌগোকে বললাম, "ব্যাপারে, নগর-কেত্তন বার হয়েছে নির্ঘাৎ জন্মাষ্টমীর মরশুমে যখন—" এবং আমার পরিহাস যে এমনভাবে লণ্ডনের পথে সত্যি হবে আশা না করলেও কিছু মুণ্ডিত কেশ এবং গৈরিক বেশ তরুণ সায়েব, সঙ্গে কিছু মেম-সাহেব তরুণীও (একজন তাঁর দুধে-পোষা সন্তানটিকে প্র্যামে চড়িয়েই) 'হ্যারে খৃষ্ণ, হ্যারে খৃষ্ণ' গাইতে গাইতে ফুটপাথের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছেন, স্বচক্ষে দেখলাম। বিশ্বাস করুন। যে মার্কেটের প্রবেশ-পথে আমার পাঁড়া, এখানি আসছি বলে চৌগো নিরুদ্দেশ। ফিরে এল মিনিট-দশেক বাদে। সায়েব বোষ্টম-বোষ্টুমীর দল এদেশে শান্তির মঠ গড়তে চান বলে প্রতি সন্ধ্যায় নগর-সংকীর্তন করে চাঁদা তুলছেন। চৌগোকে ভারতীয় দেখে তার ভক্তিরসে গাঁজ তুলে ওদের একজন ওকে পাকড়াও করে বহু অমৃত-বাণী শুনিয়ে চাঁদার প্রস্তাব করেছিল—সোজা কথা।

কিন্তু আমার বক্তব্য অন্য। চৌগো যখন সংসঙ্গ করছিল, আমি তখন বেবাক সামনের ফুটপাথের ঝিলিমিলি কোকাকোলা বিজ্ঞাপন দেখে হয়রান হয়ে পথচারী-দ্বীপে (ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে) সমবেত আন্তর্জাতিক হিপি মহাসভার রূপ-গন্ধ-বর্ণে একমেবাদ্বিতীয়ম পুলক-মেলার দিকে তাকিয়ে মন জাগাবার চেষ্টা করছি। এমন সময় মার্জিত হাসির টর্চবাতি আমায় উদ্ভাসিত করল: অন-ইংরেজ যুবক একজন। প্যারীর টুরিস্ট-অধ্যুষিত এলাকায় এমন দালাল বহু দেখা যায়। জানি জিগ্যেস করবে, "সার্ডাল ফোটো স্যার?" তাই কাঁপা সরে দাঁড়ালাম। চাপা গলায় প্রশ্ন হল, "ইন্ডিয়া?"—কবুল করলাম।—"আই, ইরান!" শুনে কৃতার্থ হওয়া উচিত কিনা স্থির করবার আগেই কানের ভিতর দিয়ে গরমা-গরম প্রবেশ করল যে উক্তি তার যথার্থ দাঁড়ায়, "জানা, হদিস দিতে পার কোথায় আজ ছিলিমের বৈঠক হবে?" আমা দেখলেই যে জাহান্নম সম্বন্ধে অজ্ঞ হতে হবে, এমন কথা আগন্তুকটির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনো বিশ্বাস করেনি হৃদয়ঙ্গম করলাম। এবং ছিলিমের সঙ্গে কেন, সবরকম ধোঁয়ার ব্যাপারেই আমার অনীহা যে অবিমিশ্র তা মেনে নেবার আগে আমায় প্রবীভূত করবার শেষ অস্ত্র, "আপনারা বাপু বেড়ে ইজিরি বলেন। আপনাদের আর কি ভাবনা। আমি এসেছিলাম এদেশে ইজিরি শিখতে। কিচ্ছু হল না। এই সব ছিলিম-টিলিমের আড্ডাতেই যা দেশোয়ালি বিশেষ ভারত-পাকিস্তানের ভায়েদের দেখা সাক্ষাৎ মেলে বলে তার খোঁজ করছিলাম।"

ক্লেস্ডন হাউসে আমার বক্তৃতা ছিল ১৩ই অগাস্ট। অনুষ্ঠানের শেষে দাঁড়িয়ে বলল এসে ইয়োহুস্ট ম্যুনিং। তরুণ জার্মান লেখক। বছর পনেরো আগে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন অধ্যয়ন করতে পণ্ডিচেরীতে এসেছিল। "লণ্ডনে কি করছ?" "অনেক কিছু। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, তরুণদের মধ্যে, বিশেষত যারা নেশা-ভাং দিয়ে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে চাইছে, তাদের মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার বার্তা এবং শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের সার প্রচার করছি।" "ফল পাচ্ছ?" "না পেলে কষ্ট করে বিদেশে আসবই বা কেন এবং লেগেই বা আছি কেন?"—ডিক ব্যাটস্টোন, তরুণ ইংরেজ কবি এবং লণ্ডনে শ্রীঅরবিন্দ সেন্টারের প্রধান সচিব, আমায় বলল, "ইয়োহুস্ট সত্যি নতুন আশার আলো এনে দিচ্ছে এই সব সন্ধানীদের সামনে। জান তো, স্টকহাউসেন ওর উৎসাহেই শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী পড়তে শুরু করেন। শীঘ্র উনি পণ্ডিচেরী যাবেন।"—স্টক-হাউসেন এখন পশ্চিমের সঙ্গীত-জগতে বিরাট এক আলোড়ন জাগিয়েছেন, এ কথা অনেকেই জানেন। কারো কারো মতে ওঁকে সুরস্রষ্টা আদৌ বলা চলে কিনা সন্দেহ; আবার নির্ভরযোগ্য বিখ্যাত সঙ্গীত-সমালোচকদের বলতে শুনেছি যে, বীটোফেনের পরে এত বড় প্রতিভা আর জন্মায়নি।

আজকের রেডিও শুনে লণ্ডনের এই দুটি প্রসঙ্গ মনে এল। রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম: ফরাসী সরকার অত্যন্ত কড়া হাতে এই সব গাঁজা, আফিম, চরস, চণ্ডু এবং প্রভৃতি সেবনের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছেন। এদেশী নাগরিক কেউ ধরা পড়লে সশ্রম কারাদণ্ড না কি-সব যেন হবে; বিদেশীদের জন্য অর্ধচন্দ্র তৎক্ষণাৎ।

মনে পড়ল, লোয়ার নদী অঞ্চল থেকে আমরা বন্ধু জেরার বাত্রেল'এর বিবি-জামাইবাবুকে তাঁদের গাড়িতেই জেরার ও আমি প্যারী দেখাচ্ছিলাম। জেরারের ধারণা, প্যারীকে চিনতে হলে তাকে দেখা প্রয়োজন দরদী বিদেশীর চোখে। জানিনে তার এই ধারণা কত দূর সত্য এবং সর্বত্র প্রযোজ্য কিনা। ঘুরতে ঘুরতে লুভ্‌র্‌-এর বাড়ি-ঘরো দেখিয়ে তারপরে ওদের নিয়ে গেলাম প্যারী-র বৃন্দাবনে। প্যারীর প্রাচীনতম পুল যেটা, নাম তার নতুন পুল: ফাইন আর্টস কলেজ প্রভৃতি নদীর বাঁ ধারে; উলটো দিকে লুভ্‌র্‌, শাতলে প্রভৃতি: আর তার মধ্যে, পঁ-নাফ পুল থেকে শুরু হয়েছে দ্বীপ, যাকে ফরাসীরা বলে 'সিতে' (নগর)! এই দ্বীপেই বিখ্যাত নত্রদাম গীর্জা। এবং দ্বীপের অন্য মুড়োয়, পঁ-নাফের লাগোয়া, নিরিবিলি, তরু-বীথিতে শ্যামল (তালের বদলে চেস্টনাট গাছ, তমালের বদলে আইভিলতা সেখানে প্রচুর) প্রকৃতির কোলে দেখা যায় পরম লাস্য এবং আলস্যের সম্ভ্রম স্বর্গে টং হয়ে অধিষ্ঠান করছেন নন্দী-ভৃঙ্গীর ভাই-বেরাদর গোষ্ঠী, আধুনিক ভাষায় "বিনিরা" কিনা হিপি বা বীটনিক নামে যশস্বী। দেখে হঠাৎ দৃষ্টি-বিভ্রম বলে সন্দেহ হলেও, জটাজুটো, গোঁপ-দাড়ি, তুলসী-মালা নয়তো রুদ্রাক্ষ, নামাবলী কিংবা ব্লু-জীন্‌স সম্বলিত ন্যাড়া-নেড়িরা এখানে কেউ বা নিসর্গের ঘাড়ে বিসর্গের মতো জোড়ায় জোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে, কেউ দু' হাত পাশে ছড়িয়ে ত্রিশূলাকৃতি, কেউ আবার ভাবাবিষ্ট ব-কারের মতো জলের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ত্রিনেত্র উন্মীলিত হল কিনা গবেষণা করছেন নিঃশব্দে। এবং এই কমল-কাননে মত্তগজবাহিনীর মতো হুট করে থেকে থেকে যে নীল উর্দিপরা পুলিস দল

ফয়েল দিয়ে মোড়ানো

শতকরা ১০০ ভাগ দেশী সিগারেট

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-৫৬ ■ ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT (TM) 917 BEN

*

ফরাসী চিত্র-পরিচালক ফ্রাঁসোয়া রাইশেনবাক তাঁর নতুন ছবি বানিয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পিয়ানিস্ট আর্তুর রুবিনস্টাইন-কে কেন্দ্র করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর ছবির মুক্তি-রজনীতে রাইশেনবাক উপস্থিত থাকতে পারবেন কিনা জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল। কারণ, পরিচালক কদিন ধরেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে শয্যাশায়ী। পরিচালকের ভাবনার মেঘ ঘুঁচিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন পিয়ানিস্ট, "শুনুন তবে, বলি। আমি তখন মাদ্রিদ গেছি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ধাক্কায় হঠাৎ কুপোকাৎ আমার কনসার্ট-সন্ধ্যার দিন ভোরবেলা থেকে। অবশেষে কনসার্টের একঘণ্টা আগে হন্তদন্ত হয়ে এক ডাক্তার হাজির। ডাক্তার বললেন: নিন, এই বড়ি ক'টা খেয়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন। রাত্তিরে আমি এসে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করব। এখন আমার মরবারও ফুরসত নেই— আমার মেয়েকে নিয়ে রুবিনস্টাইনের কনসার্টে যাচ্ছি!"

পরিচালক ক্ষীণ হেসে বললেন পিয়ানিস্টকে, "ওস্তাদ, আপনারও তো মুখ-চোখ আজ শুকনো দেখছি!"

"ও কিছু নয়। নার্ভাস লাগছে একটু।" রুবিনস্টাইন জবাব দিলেন, "জীবনে কত্মের মধ্যে তো বড় বড় সুরস্রষ্টার শিল্প-কীর্তিকেই আমি মূর্ত করে তুলেছি শ্রোতার জগতে। আপনার এই ছবিতে যে আমি বক্তার ভূমিকা নিয়ে ফেলেছি এবং নিজের কথা বলে ফেলেছি। এ আমার ধাত নয়, কবুল করে বলছি।"

মুক্তি পেতে না পেতে ছবিটা দেখে এলাম। ভাল লাগবে জানতাম। এবং নিরাশ হইনি। রুবিনস্টাইনের অলোকসামান্য অঙ্গুলি-সঞ্চালন যাঁরা কোনোদিন সামনে বসে দেখেননি এবং দেখতে পাবেন না, তাঁদের জন্য এই ফিল্ম যেমন বিরাট সান্ত্বনা, তেমনি ভবিষ্যতের সুরশিল্পীদের সামনে প্রেরণার মতো জেগে থাকবে এই ছবি। এক মহান প্রতিভার জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্ত-গুলি, তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বড় সুন্দর করে চিত্র-পরিচালক তুলে ধরেছেন রঙিন চিত্রে। কিন্তু রুবিনস্টাইনের ইহুদী-সত্তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চিত্র-পরিচালকের শুভবুদ্ধির ফল কিনা সে-বিষয়ে আমার সংশয় থেকে যাচ্ছে। এবং এই ইহুদী-সত্তার উপর তীব্র আলোকপাত করবার পরে রুবিনস্টাইনের মুখে যীশু-সম্বন্ধীয় উক্তি, "খৃষ্টকে আমি দেবতা ব'লে ভাবতে পারি না; আমার কাছে তিনি পূর্ণ মানবতার প্রতীক," শিল্পী সম্বন্ধে খুব সন্তোষজনক ধারণা জাগাতে পারে যদি, আশ্বস্ত হব। বরং ভাল লাগল ছবির যেইসব অংশে যেখানে রুবিনস্টাইনকে পাচ্ছি আমরা বহু ভাষায় (পোলিশ, ফরাসী, ইংরেজি, স্প্যানিশ ও ভাঙা ইতালিয়ান) কথা বলতে দেখছি, ছাত্রদের আদ্যোপান্ত [illegible] শিল্প-বিষয়ে [illegible] সুখী মানুষের [illegible]।

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত যেমনই হ'ক, যতই হ'ক, রুবিনস্টাইন হাসিমুখে সহ্য করতে শিখেছিলেন তাঁর ছেলেবেলা থেকে। উঁর আশাবাদ যে একটানা সফলতার সন্তান নয়, তা জানা যায় উঁর জীবনের ব্যর্থতার

আর্তুর রুবিনস্টাইন

পরিমাণ লক্ষ করলেই। জীবনের প্রতি হাসিমুখে তাকাতে শিখেছিলেন উনি কিভাবে, তা নিজেই উনি গল্প করেছেন, এই ছবিতে দেখলাম।

"বার্লিন থেকে সবে প্যারীতে এসেছি; বড় কাঁচা বয়স; সহজলভ্য এক সাফল্যের ডঙ্কা আমার সামনে ধরা আছে দেখে ইতস্তত করবার প্রবৃত্তিটুকুও তখন ছিল না আমার। নিজের উপরে যেমন সন্তুষ্ট ছিলাম না, অন্য কারো উপরেও না। যেদিকে তাকাই, নিরাশা। যাকে আমি ভালবাসতাম, আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও সে করত না। দিন এনে দিন খেয়েও কাটত না; কোনোদিন বা একখানা আঙুর খেয়ে পিত্তিরক্ষে করতে হত। ঋণ বাড়ছিল। চারদিকে শুধু অন্ধকার। এ জীবন রেখে কি লাভ? জীবনের বুক থেকে নিজেকে মুছে ফেললে কেমন হয়? নিজেকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রয়াসে বিফল হলাম, হাস্যকর হয়ে উঠল আমার আত্মহত্যার চেষ্টা। জীবনও তখন আমার অসীম হাহাকার। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ মনে হল, এঁকি, আমি বেঁচে আছি? যেন নতুন করে এক পৃথিবী ধরা দিল আমার বিস্ময়হত চোখের সামনে। [illegible] ফিরে [illegible] [illegible] [illegible] নিজের [illegible] হেঁটে চলেছে দেখে। হায়, সে [illegible] দৃশ্য, প্রতি মুহূর্তে যার রূপান্তর ঘটছে। এতসব পেয়েও আমি কিসের অপেক্ষায় ছিলাম সুখী হব ব'লে? এ-ই তো সুখ।..."

এবং রুবিনস্টাইন বলেছেন, "দুঃখের দিন আসে বইকি। তারা না এলে জীবন যে বিস্বাদ ঠেকত। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও সুখ উবে যায় না সবটুকু: আর-এক রং সেই সুখের। দুঃখী হলেও তখন সুখী, এ-কথা বলা চলে ..."

জীবনে সুখী রুবিনস্টাইন হাসতে হাসতেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারবেন আশা রাখেন। "আমার গিন্নীকে দিয়ে ছেলে-মানুষের মতো এক অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছি," উনি বলেছেন। "যদি মরবার সময় খুব ঝামেলা না করি, যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি, অর্থাৎ লক্ষ্মীছেলের মতো শেষ যন্ত্রণার দ্বার পার হয়ে যাই, আমার শান্তির জন্য বাজানো হবে যেন—প্রয়োজন হলে গ্রামোফোন রেকর্ডেও—শুবের্ট-এর কুইন্টেট ইন সি থেকে আন্দান্তে অংশটি। মারা যাবার আগের বছর উনি এটি লিখে গিয়েছেন। আমার কাছে এটি হল পরলোকে শান্তির সঙ্গে প্রবেশের ছাড়পত্র। ওটি শুনে মনে হয়, মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত আমি সুখী থেকে যেতে পারব—" এবং ফিল্মে রুবিন-স্টাইন যখন এই বাজনাটি আমাদের শোনান, আমাদের সময়ের বিরাট এক শিল্পীর অন্তরের কথা তার মধ্যে পরিগ্রহ করে আনন্দের প্রশান্তির [illegible] [illegible]।

পূর্ণেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়

তরুণ নক্ষত্রের ফাঁকে ফাঁকে টি টাউরি। মাঝে ঘন মেঘের চিহ্ন

টি টাউরি

হ্যাঁ মহাকাশে শুধু আমাদের নক্ষত্র জগতেই নয়, আরও দূরে সুদূর নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যেও ওরা বিচরণ করছে। বড় বড় আলোক পিণ্ডের মধ্যে ওরা যেন সংক্ষিপ্ত আলোক বিন্দু। নক্ষত্র জগতের বাতাস এবং মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত ঐ আলোক বিন্দু আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা। রীতিমত এক রহস্য। আকারে ওরা অনেক ছোট। অথচ ঔজ্জ্বল্যে যেন নক্ষত্রকেও হার মানায়। দেওয়ালির আকাশে জ্বলে ওঠা উজ্জ্বল বাজির চার পাশে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের মত ছড়ান ঐ আলোক বিন্দুগুলি নক্ষত্র বিজ্ঞানীদের মনে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। তাদের আবিষ্কারের কাহিনী এই তো সেদিনের। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫-এ। ঐ বছর 'অ্যাস্ট্রো ফিজিকাল জার্নাল' নামে বিজ্ঞান পত্রে বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলফ্রেড এইচ জয় প্রথম উল্লেখ করলেন তাদের অস্তিত্বের কথা। তাঁর বক্তব্য, আমাদের নক্ষত্র জগতেই তিনি তরুণ নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। মহাকাশের সূতিকাগারে ওরা নবীনের দল। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হয়ত ওরাই একদিন রূপান্তরিত হবে বিরাট এক একটি জ্যোতিষ্কে। কথাটা ঠিক ঐ মুহূর্তে কারোর কারোর কাছে অবিশ্বাস্য বা প্রচণ্ড ধাঁধার মত মনে হলেও এই ঘটনার মাত্র

দশ বছরের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে গেল টি টাউরি নক্ষত্র। জানা হয়ে গেল, আমাদের চার পাশে এই নক্ষত্র জগতেও নতুন তারারা জন্মলাভ করে চলেছে। টি টাউরিরা ওদের সমগোত্রীয়। এক কথায় তারাই নতুন তারার দল। ঐ আলোক বিন্দুই এক একটি টি টাউরি। তবে চিরস্থায়ী নয়।

বস্তুত মাত্র পঁচিশ বছর আগেও বিজ্ঞানীদের কাছে সুদূর আকাশের বুকে শত লক্ষ নক্ষত্রকে মনে হত কতকগুলি খাপছাড়া এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান আলোকপিণ্ড। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে খুব কম কথাই তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। আধুনিক পর্যবেক্ষণ পুরনো দিনের সেই অস্পষ্টতাকে বেশ খানিকটা দূর করতে পেরেছে। মোটামুটিভাবে জানা সম্ভব হয়েছে আকাশ চিত্রের মূল কাঠামো। সেই সঙ্গে নক্ষত্র জগতের সৃষ্টি তত্ত্বের কথা।

সে কাহিনীরও জন্মকাল সম্ভবত তিরিশ বছরও নয়। একটি নক্ষত্রের অত বেশি আলো অথবা উত্তাপের উৎস কোথায়? এই জিজ্ঞাসারই উত্তর আবিষ্কার করতে গিয়ে ধরা পড়ল তার স্বরূপ এবং জন্ম ইতিহাসের কথা। জানা গেল ঐ আলো এবং অবারিত উত্তাপ শক্তির উৎস হাইড্রোজেন। তাপ-পারমাণবিক পদ্ধতিতে নিরত সেখানে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আর এই রূপান্তরের সময় বেরিয়ে আসছে প্রতি এক গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে এক কোটির ছয় হাজার কোটি গুণ উত্তাপ শক্তি। হিসাবটা তৈরি করা হয়েছে অবশ্য সূর্যের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে। জানা গেছে সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে সত্তর কোটি টন হাইড্রোজেন পুড়ে চলেছে। আর এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তার সমস্ত হাইড্রোজেনের সঞ্চয় শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় একশ কোটি বছর। আর সমস্ত নক্ষত্র যারা সূর্যের থেকেও পঞ্চাশ কি একশ গুণ বড় তাদের সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এঁরা লক্ষ্য করেছেন দানবাকৃতি এই নক্ষত্রগুলির সঞ্চিত হাইড্রোজেন অত্যন্ত দ্রুত হারে পুড়ে চলেছে। সূর্যে প্রতি সেকেণ্ড যতটা হাইড্রোজেন পোড়ে তার দশ লক্ষ গুণেরও বেশী। যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের নিঃশেষিত করে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। তবে এ ধরনের নক্ষত্রে সবটা হাইড্রোজেন তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে পুড়ে শেষ হয়ে যায় না। যেটুকু যায় তার পরিমাণ আংশিক মাত্র। অবশেষে তারা অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় কম

সময়ের মধ্যেই একদিন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের তুলনায় ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রের জীবনকাল অনেক বেশী। যদিও তারও একটি সঠিক সীমা আছে। একদিন তাদেরও বুকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ অনির্বাণ দীপ-শিখাটি নিভিয়ে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, সমস্ত নক্ষত্র-জগতেই প্রতিমুহূর্তে ছোট বড় নক্ষত্র জন্মলাভ করছে। দেখা গেছে বড় বড় উজ্জ্বল নক্ষত্রের চারপাশে এই শিশু তারকাদের ভিড়। আর সব চাইতে লক্ষণীয় যেখানেই এরা ভিড় করে থাকে সেখানে মহাজাগতিক বাতাস বা ধূলিকণারও সমাবেশ দেখা যায়। আধুনিক মতবাদ : এই বাতাস বা ধূলিকণাই জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে চলেছে শিশু নক্ষত্র। এক একটি [illegible] তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশ। আর একটি স্তরে বলা হয়েছে, নক্ষত্র জগতে অত্যন্ত কঠিন অদৃশ্য এক ধরনের কণিকা বিচরণ করে। এই কণিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে এক একটি নক্ষত্র-কণা। তবে এমন কোন কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ বা সূত্র তেমন কিছু পাওয়া যায় নি।

১৯৪০-এ অ্যালফ্রেড এইচ জয় মাউন্ট উইলসন এবং প্যালোমার মানমন্দির থেকে বিশেষ ধরনের কতকগুলি নক্ষত্রের উপর পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। এদের বলা হয় ভেরিয়েবল স্টার বা পরিবর্তনশীল নক্ষত্র। সাধারণ তারার যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন সঠিক আয়তন, ঔজ্জ্বল্য, গতিপথ প্রভৃতি, পরিবর্তনশীল এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে তেমন কোন নির্দিষ্ট গুণ চোখে পড়ে না। জয় এদের নাম রাখেন টি টাউরি। আর সবচাইতে মজার ব্যাপার, এদের শুধু সেই অঞ্চলে চোখে পড়ে যেখানে নতুন নক্ষত্র জন্ম হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ যেখানেই নক্ষত্র জগতের ঘনীভূত মেঘ বা বাষ্প দেখা যায় তারই ফাঁকে ফাঁকে ফুটে ওঠে টি টাউরির বিন্দু বিন্দু মুখ। তারা ভিড় করে থাকে এক একটি বড় এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঘিরে। হয়ত বা দূরবর্তী পথে ঘুরে বেড়ানর সময় ঐ বড় নক্ষত্রটির মাধ্যাকর্ষণের টানের মধ্যে তারা ধরা পড়ে যায়। সূর্যের কাছ বরাবর যে সমস্ত টি টাউরি রয়েছে তাদের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মহাকাশে মোটামুটিভাবে কি হারে এরা জন্মায় সেটাও জানা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ তারার মত তাদের চরিত্র হলেও কিছু কিছু অস্বাভাবিকতাও তাদের মধ্যে চোখে পড়ে। আর বেশির ভাগ সময় এরা ভিড় করে থাকে দ্রুত জ্বলে যাওয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল স্বল্পস্থায়ী কোন নক্ষত্রকে ঘিরে। এদের আয়তন এবং ঔজ্জ্বল্য দেখে মনে হয় এরা বয়সে অত্যন্ত নবীন। কেন, সে কথা পরিষ্কার করার আগে নক্ষত্রের জন্মের উপর সর্বাধুনিক তত্ত্বটি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে নিই।

ধরুন সূর্যের যতটা ভর ঠিক ততটা ভরের ধুলো এবং বাতাস একটি নক্ষত্র তৈরির কাজ শুরু করে দিল। ভর এক হলেও হাল্কা এই ধুলো-বাতাস নক্ষত্র জগতের মধ্যে সূর্যের থেকে অনেক বেশী জায়গা জুড়ে অবস্থান করবে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করবে বিরাট একটি ঘূর্ণির। নদী বা সমুদ্রের বুকে ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে যেমন চার পাশের জল ছুটে আসে, ঠিক তেমনি ভাবে সেই ধুলো-বাতাসের ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে চারপাশের আরও ধুলো, আরও বাতাস। ঘূর্ণির প্রচণ্ড চাপে সেই বাতাস জমাট বাঁধতে থাকে। বহু দূর বিস্তৃত সেই ধুলো-বাতাসের মেঘ ক্রমে সংকুচিত হয়। ঘূর্ণির ব্যাসটা তখন দাঁড়ায় আমাদের সৌরমণ্ডলের ব্যাসের অনুরূপ। তাপমাত্রা বাড়লে তখনও তত গরম নয়। চেহারাটা তার এক খণ্ড কালো মেঘের মত। আর সেই মেঘ বন বন করে ঘুরে চলেছে।

ঠিক এই সময়ে মাধ্যাকর্ষণের চাপে হঠাৎ

কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে টি টাউরিদের তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে

ঐ মেঘ আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই সঙ্কোচনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয় সেই শক্তি উত্তাপ সৃষ্টি না করে হাইড্রোজেন অণুদের ভেঙে পরমাণু তৈরি করে এবং সেই সঙ্গে অয়ন। ফলে মেঘের আভ্যন্তরীণ চাপ এত কমে যায় যে তখন তার বাইরের তলের বাতাস বা ধুলো সবেগে কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে এবং সৌরমণ্ডলের মত বিস্তৃত মেঘকে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে একটি বিরাট গোলক। এই গোলকটির ব্যাস সূর্য থেকে প্রায় বুধ গ্রহের দূরত্বের সমান। অর্থাৎ সূর্যের চেয়ে প্রায় একশ গুণ বড়।

এবার সমস্ত বস্তু কণিকা মাধ্যাকর্ষণের টানে আপনা থেকেই এগোতে থাকে কেন্দ্রের দিকে। এ ব্যাপারটা চলে প্রায় ছয় মাস। অবশেষে মেঘের মধ্যে যখন প্রয়োজন মত উত্তাপ এবং চাপের সৃষ্টি হয় তখন এই ছুটে আসাটাও বন্ধ হয়ে যায়। বিরাজ করে একটি সাম্য অবস্থা। অর্থাৎ নক্ষত্র সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের বস্তুকণা বা যে ধরনের অবস্থার প্রয়োজন সেটা তৈরির কাজ পুরোপুরি শেষ। আর তখনই পরিষ্কার একটি শিশু নক্ষত্রের মুখ ফুটে ওঠে আকাশের বুকে। জন্ম গ্রহণ করে একটি নবীন নক্ষত্র। এই সময়ে এর তাপমাত্রা থাকে প্রায় চার হাজার ডিগ্রি কেলভিন। ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের থেকেও প্রায় একশ গুণ বেশী। নক্ষত্রের জন্ম সম্পর্কে এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন নিউইয়র্কের গডার্ড ইনসটিটিউট ফর স্পেস স্টাডিজ-এর অন্যতম গবেষক এ জি ডব্লু ক্যামেরন। নক্ষত্রের জন্মের তাঁর এই ব্যাখ্যাটিকে পরে অনুমোদন করেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী চুসিরো হায়াসি এবং টি নাকানো।

ঠিক এই ধরনের একটি ঘটনা সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল একদল বিজ্ঞানীর। ১৯৩৬-এ ওরিয়ন বা কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ধুলো এবং বাতাস ঘনীভূত হয়ে হঠাৎ একটি নক্ষত্রকে ফুটে উঠতে দেখা যায়। নক্ষত্রটির নাম রাখা হয়েছে এফ ইউ ওরিয়ন। অবশ্য এ কথা ঠিক, এই একটি মাত্র উদাহরণ হলো তত্ত্বের শেষ প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে না। এর জন্যে অন্তত আরও একটি নক্ষত্রের জন্মের জন্যে আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। আর সেই নক্ষত্রকে যাচাই করতে হবে আরও বেশি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

যাই হোক, জন্মের পর শিশু নক্ষত্রটি আরও সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সময়ে তার ঔজ্জ্বল্যও ক্রমে হ্রাস পায়। হায়াসির মতে, তখন তার কেন্দ্রের মধ্যে যে উত্তাপ সৃষ্টি হতে থাকে পরিচালন পদ্ধতিতে তা বাইরের দিকে এগিয়ে যায় এবং বাইরের তাপমাত্রা মোটামুটি একই অবস্থায় রাখার চেষ্টা করে। অবশেষে সঙ্কোচনের ফলে কেন্দ্রের তাপমাত্রা দাঁড়ায় এক কোটি ডিগ্রি কেলভিনের মত। নক্ষত্রের শক্তির তখন অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়ায় হাইড্রোজেন। তাপ-পারমাণবিক পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তখন চলতে থাকে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামের রূপান্তর। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপ বা আরও বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ শক্তির আবির্ভাব। এক সময়ে সঙ্কোচনও যায় বন্ধ হয়ে। নক্ষত্র তখন পরিপূর্ণতা পায়। এটা সম্পূর্ণ হতে সূর্যের মত একটি নক্ষত্রের সময় লাগে প্রায় পাঁচ কোটি বছর। আর বড় নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই সময় অনেক কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, সূর্যের চেয়ে তিরিশ গুণ বড় একটি নক্ষত্র তিরিশ হাজার বছরের মধ্যেই সঙ্কোচনের কাজটি সেরে নিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়।

অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গণকের সাহায্যে ছোট বড় নানান ধরনের নক্ষত্র কি ভাবে তৈরি হতে থাকে, সেই সঙ্গে তাদের ক্রমান্বয় গাঠনিক পরিবর্তন, অবশেষে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, নিয়মিতভাবে তার

অনেক কিছুই আজ হিসেব করে বের করা সম্ভব হয়েছে। এ থেকে যে কোন নক্ষত্রের বয়স কত সেটা জেনে নেওয়া আজকের দিনে খুব বড় একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

আর এই হিসেব মত পরীক্ষা করেই দেখা গেছে পরিবর্তনশীল টি টাউরি নক্ষত্রগুলি এখন তাদের শৈশব অবস্থাতে পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ এখনও তাদের সংকোচনের পালা শেষ হয় নি। সেই সঙ্গে হাইড্রোজেন পুড়ে নগণ্য পরিমাণ শক্তিই তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে চলেছে। মনে হয় যেন এই সবে তাদের জন্ম হল। নাক্ষত্র জগতের বস্তু এই মাত্র জমাট বেঁধে জীবন শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এই নব জাতকের অবস্থা এখন জমাট মেঘ এবং হাইড্রোজেন চুল্লির মত আমাদের সূর্যের অনুরূপ।

ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঔজ্জ্বল্য, আরক্তন, তাপমাত্রা অবস্থান প্রভৃতির কথা চিন্তা করে বিভিন্ন নক্ষত্রদের নিয়ে নানা রকমের ছক এঁকে ফেলেছেন। এক এক জাতের নক্ষত্রকে পুরে রাখা হয়েছে এক একটি ছকের মধ্যে। ১৯৪৫-এ জয় প্রথম লক্ষ্য করেন টি টাউরিরা এমন একটি জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে যে অঞ্চলে সাধারণ নক্ষত্র নেই বললেই চলে। সে সময় অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে খানিকটা উপেক্ষাই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা এটি একটি নিছক ব্যতিক্রম। কিন্তু ১৯৫০এ করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই ই সলপিটার হিসেব কষে প্রমাণ করলেন সত্যিই এরা পরিবর্তনশীল নক্ষত্র। ইতি-মধ্যে আরও কয়েকজন প্রখ্যাত জ্যোতি-বিজ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মেক্সিকোর গুইলারমো হারো, সোভিয়েত দেশের এম লোলিনসে এবং ইন্দোনেশিয়ার পিক-সিন বর্ণালী বিজ্ঞানের সাহায্যে টি টাউরির অনুসন্ধানের কাজে লেগে যান। আপাতত এক হাজারের কিছু বেশি সংখ্যক এ ধরনের নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে অনুসন্ধান চালান হচ্ছে তাদের বিচিত্র চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে।

জানা গেছে টি টাউরি নক্ষত্রের বাইরের স্তরটি সাধারণ তারার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়, উজ্জ্বল এবং জমাট। এই অঞ্চল থেকে প্রতি মুহূর্তে নিজের দেহ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ বস্তু কণা সবেগে এরা মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। দূরে, তাদের মাধ্যাকর্ষণ টানেরও বাইরে। ক্যালি-ফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এল ভি কুছির মতে বিবর্তনের অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় প্রতি তিন কোটি বছরে এক একটি টি টাউরি তার দেহ থেকে যতটা পদার্থ বাইরের জগতে ছুঁড়ে দেয় তার পরিমাণ আমাদের সূর্যের মত। এবং একটি

শিশু টি টাউরির জন্ম হল

পূর্ণ নক্ষত্রে পরিণত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত তার মূল ভরের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ভর সে হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়া এই নক্ষত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য সাধারণ নক্ষত্রের মত কোন নিয়ম মেনে পরিবর্তিত হয় না। কখনও কয়েক ঘণ্টা অন্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। কখনও বা বছরের পর পর একই উজ্জ্বলতা নিয়ে অবস্থান করে। তবে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুনো হফমিসটার-কিছু কিছু টি টাউরির উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে একটি নিয়মিত সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন। এঁর বক্তব্য, এই তারাগুলির কোন অংশ অত্যন্ত বেশী সক্রিয়। ফলে সেখানকার হাইড্রোজেন অতি দ্রুত পুড়ে চলে এবং জায়গাটি অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় অঞ্চল থেকে অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায়। টি টাউরি তাদের অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে চলেছে। যার আবর্তন-বেগ বেশী, তার বুকের ঐ উজ্জ্বলতম অংশটি অল্প সময় পর পর আমাদের চোখে এসে পড়ে। ফলে মনে হয় এই বুঝি তারাটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপরই ফিকে হয়ে গেল। যে-সমস্ত নক্ষত্রের গতিবেগ কম তাদের পিঠের ঐ উজ্জ্বলতম অংশটি একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দীর্ঘ সময় পর। উজ্জ্বলতার এই হ্রাসবৃদ্ধি দেখে বিভিন্ন টি টাউরির কোনটি কত বেগে ঘুরছে তা জানা সম্ভব হয়েছে।

তবে টি টাউরি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি করেছেন জার্মানির কার্ট হাম্পার। এই সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে তিনি প্রচুর পরিমাণ লিথিয়াম ধাতুর উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। পরে মাউন্ট উইলসন এবং প্যালোমার মানমন্দিরের দুজন বিজ্ঞানী জজ কে বোনসাক এবং হেসে এল গ্রিনস্টাইন বর্ণালীর সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন এই লিথিয়ামের পরিমাণ সূর্যের আবহাওয়ামণ্ডলের লিথিয়াম থেকে আশি থেকে চার শ গুণ বেশী।

আমাদের সূর্য একটি মধ্যবয়স্ক নক্ষত্র। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে এক সময়ে তাকেও এই টি টাউরি দশার মধ্য দিয়ে পূর্ণ নক্ষত্রজীবনের দিকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। সমস্ত স্থায়ী নক্ষত্রকেই কোন না কোন সময়ে পরিবর্তন-শীল এই টি টাউরির অবস্থার মধ্য দিয়েই বিবর্তিত হতে হয়। বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন,

সূর্য কি এখনও তার সেই বাল্য অবস্থার স্মৃতি মনে করতে পারে? হয়ত পারে। সূর্যের বাইরের স্তরের কার্যাবলী লক্ষ করলে মনে হয় টি টাউরির অস্পষ্ট চিহ্ন আজও যেন সে বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রবল ঝড়ের দরুণ আজও যে বস্তুকণা সূর্যের বুক থেকে মহাকাশে ছুটে যায়, তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হলেও মনে হয় টি টাউরিরই মূল চরিত্র টিকে রয়ে আজও তার মধ্যে মিশে রয়েছে।

কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন। টি টাউরিই যদি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তা হলে সেই অতিরিক্ত লিথিয়াম গেল কোথায়? প্রচলিত অভিমত: সূর্যের গভীরে প্রোটন কণিকার আঘাতে বেশির ভাগ লিথিয়ামই তার রূপান্তরিত হয়ে গেছে হিলিয়ামে। মহাজাগতিক ভস্ম বা বাতাসের উপর পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় নক্ষত্র সৃষ্টির আদি যুগে এই লিথিয়াম তৈরি হয়ে থাকে।

১৯৬৬তে মেক্সিকোর জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী ইউজেনিও ই মেনদোজা অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা চালিয়ে টি টাউরি থেকে আগত প্রচণ্ড

পরিমাণ অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ আবিষ্কার করেছেন। বলা হয়েছে নক্ষত্রের চারপাশে যে মেঘপুঞ্জ থেকে যায়, সেই তপ্ত মেঘ যার তাপমাত্রা সাত শ ডিগ্রি কেলভিনের মত, সেখান থেকেই এই অবলোহিত রশ্মি বিকীরিত হচ্ছে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে বলা চলে, খানিকটা মেঘ জমাট বেঁধে টি টাউরিতে পরিণত হওয়ার পর অবশিষ্ট যে অংশটি পড়ে থাকে সেখান থেকেই আসে এই বিকিরণ। এঁদের বক্তব্য, একদিন সূর্যের চারপাশেও ভিড় করে ছিল এমন ধরনের মেঘ। সম্ভবত উত্তরকালে সেই মেঘই পৃথক পৃথক অংশে একত্রিভাবে ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডল।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির দুজন বিজ্ঞানী ই ই বেকলিন এবং জি নিউজেবর কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বিস্তৃত মেঘমালা লক্ষ করেছেন। এটি ক্রমেই প্রচণ্ড আবর্তনের মধ্য দিয়ে জমাট বেঁধে চলেছে। সেই সঙ্গে বিকীরিত করছে অবলোহিত রশ্মি। অনেকটা টি টাউরিরই মত। আয়তনে এই মেঘমালা সূর্যের চেয়ে প্রায় পনের শ গুণ বড়। হ্যারিস এবং নাকানো হিসেব করে দেখেছেন এই মেঘ আগামী কুড়ি বছরের মধ্যেই আরও জমাট বেঁধে একটি সুস্পষ্ট নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সময়টা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। দেখতে দেখতে এই কুড়ি বছর কেটে যাবে। আর তার পরিণতি মুহূর্তে হাজারো বদ্ধ-চোখ উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকবে কালপুরুষের সেই রহস্যজনক মেঘপুঞ্জের দিকে। সেই সঙ্গে দিনরাত একটানা কাজ করে যাবে যন্ত্রগণক। বিজ্ঞানীরা প্রতীক্ষা করবেন নতুন এক নক্ষত্রের জন্ম খুঁটিয়ে। আর আগামী দুই দশকের মধ্যে এক ইউ ওরিয়ন-এর মত যদি সত্যি সত্যিই আরও একটি নতুন নক্ষত্র যদি আমরা চোখের সামনে জন্মাতে দেখি, তা হলে ১৯২৫এ জয় টি টাউরিকে আবিষ্কার করে যে যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি করেছিলেন তাকে আমরা অভিনন্দন জানাব। সেই সঙ্গে নক্ষত্রের জন্ম সম্পর্কে আধুনিকতম তত্ত্বটি আরও বলিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি পাবে।

সমরজিৎ কর

গত শনিবার ৭ অক্টোবর বিজ্ঞান বিভাগে একটা ছাপার ভুল থেকে গেছে। আলোকের গতিবেগ কত? সন্দেহ আপনিও ছাপা হয়েছে সেকেণ্ডে সাড়ে পঁয়ত্রিশ মাইল গতিবেগে। এখানে হবে একলক্ষ সাড়ে পঁয়ত্রিশ মাইল।

পারাপার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(আঠাশ)

দিন সাতেক বাদে বিমানের ঘরখানা খালি হয়ে গেল। তার বইগুলো নিয়ে গেল ললিত, আর বাসনপত্রগুলো বস্তার পুরে মুখ বেঁধে রাখা হল বাড়িওয়ালার ঘরে। অপর্ণার প্রকাণ্ড মোটরগাড়িখানা বটতলার অপেক্ষা করছিল, লাগেজ বুট-এর প্রকাণ্ড ডালাটা খোলা। বিমানের বিছানাপত্র আর বাক্স পাড়ার লোকেরাই ধরাধরি করে তুলে দিল গাড়িতে। সুবলকে ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখ লাল, চোখের পাতা বার বার নেমে আসছে, যতবার অপর্ণার দিকে তাকাচ্ছে সে।

বইয়ের র‍্যাক আর চৌকিটা পড়ে রইল। অপর্ণা বাড়িওয়ালার হাতে বাকী ভাড়ার টাকা দিয়ে বলল—ও জিনিসগুলো ইচ্ছে করলে পরে যে ভাড়াটিয়া আসবে তারা ব্যবহার করতে পারে। নইলে আপনি যা খুশী করবেন।

বিমানকে মাঝখানে রেখে দুধারে বসল ললিত আর রমেন। স্টিয়ারিং হুইল ধরেছে অপর্ণা। গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সুবল জানলা দিয়ে ঝুঁকে বলল—ললিতদা, দরকার হলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।

অপর্ণা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল।

ললিত মাথা নেড়ে জানাল—দরকার হবে না।

একটু হতাশা দেখা গেল সুবলের মুখে।

পাড়ার লোক ভীড় করে গাড়ি দেখছে।

দুজনের মাঝখানে নিথর হয়ে বসে আছে বিমান। সে আজকাল আর কিছুই টের পায় না। আকাশে টই-টম্বুর তার মাথা। দিনরাত আকাশ-ডুব। তাকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। মাথার চুল খুব ছোটো করে ছাঁটা। তালুর খানিকটা অংশ চেঁছে ফেলা হয়েছে, সেখানে একটা পুলটিস লাগানো। দুটো কোটরগত চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আগে পাগল হয়ে গেলে শান্ত থাকত বিমান। কিন্তু এবার সে গন্ডগোল করেছে। প্রায়ই লাঠি হাতে লোকজনকে তাড়া করত। রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ত। অচেনা বাড়ির দরজায় নিশুত রাতে গিয়ে কড়া নেড়ে চেঁচাত—টেলিগ্রাম...... টেলিগ্রাম......শম্ভুদের জিমনাসিয়ামে গিয়ে প্যারালাল বার-এ উঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করত মাঝে মাঝে। একদিন পেশীবহুল একটা ছেলে তাকে বের করে দেয়, তাকে ইট নিয়ে তাড়া করেছিল বিমান। বিপুল চেহারার ছেলেটি ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল।

এখন বিমান শান্ত। কোনো অস্থিরতা নেই, কিন্তু কোটরগত দুখানা জ্বলজ্বলে চোখ মাঝে মাঝে চারপাশে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে চিনতে পারছে না এরা কারা এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ললিতের মুখ আর ঠোঁট সাদা। বিমানের একখানা হাত কোলে টেনে নিয়ে তার ওপর হাত রেখেছে সে। ঠান্ডা সেই হাত। ঘামছে। সে কোনো একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিল অপর্ণাকে। পারছিল না।

গাড়ি চলতেই রমেন বিমানের কানের কাছে মুখ এনে ডাকল—বিমান।

বিমান নড়ল একটু। উত্তর দিল না। রমেন বিমানের উঁচু মাথাটা হেলিয়ে দিল সীটের পিছন দিকটায়। অমনি গলার দীর্ঘতা ফুটে উঠল বিমানের। দেখা গেল কণ্ঠাস্থির ওঠা-নামা। বিমান কষ্ট করে শুকনো মুখের বাতাস গিলছে। রমেন ওর কপালের ঘাম মুছে দিল হাতের চেটোয়। বিমান স্নান করতে চায় না, খেতে চায় না। রমেনই ওকে সব করাচ্ছে। একা। রমেনের হাতে পায়ে ওর দাঁত আর নখের দাগ দেখা যায়।

ললিত চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে ব্যাপারটা ঠিক চোখে দেখতে পারছিল না। অপর্ণা আর বিমানের কত সুন্দর বোঝাপড়া ছিল! এখন এই সব বিয়োগান্ত দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। কেননা, শাশ্বতীর সঙ্গে তার ইতিমধ্যে চারবার দেখা হয়েছে। যতক্ষণ শাশ্বতীর সঙ্গে দেখাশোনা হয় ততক্ষণ ললিতের কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু তারপরেই একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে তার মনে পড়ে একদিন—খুব শীগগীরই—তাকে মরে যেতে হবে। বিমানের দিকে তাকিয়ে ঐ রোগা মুরগির গলার মতো সরু আর তেলচিটে ময়লা-বসা গলা দেখে তার মনে

হয় ওরকমই একটা বৃদ্ধ চেহারা নিয়ে সে মরবে।

তিন দিন আগে আদিত্যর একটা চিঠি এসেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছে—এখানে এসে দেখি রমেন নেই। তাই রমেনের ঘর আর বিছানা দখল করে আছি। জানলা খুললেই পাহাড় দেখা যায়। একটা অদ্ভুত উপত্যকা সামনে, ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। দেহাতীরা হেঁটে নদী পেরিয়ে হাটে যায়। কলকাতার সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। উদোম মাঠে দাঁড়িয়ে যখন চারপাশটা খাঁ খাঁ করতে দেখি তখন হঠাৎ নিজেকে খুব মহৎ লাগে—আইরিশ বিশ্বাস কর। একটা পিপুল গাছের ছায়ায় নীচে চেয়ার টেনে বসে থাকি সারা দুপুর—একবারও সতীর কথা মনে পড়ে না। জোলিটা, সতীকে যদি সেদিন ভয়ে বলিস আমি যদি বিয়ে করতাম ওকে তবে সারাজীবন সন্দেহ করতাম। এরকম অদ্ভুত সম্পর্ক মানুষকে ছোটো করে। আমি এখন অনেকদিন এখানে থাকব। সতীকে বলিস আমি ওকে অনেক টাকা দিয়েছি। আর না। সজারুর পেটে লাথি মেরেছিলাম—ওটা কি মরেই গেছে? মরলে পৃথিবীর মহৎ উপকার

হয়েছে। কিন্তু টিক আলি ও মতোসি, অনেক ব্যবসায়ে। যদি প্যারিস এইখানে চলে আয়। রমেনের ঘরে অনেক ধর্মের বই। পড়াচ্ছি। সেই সঙ্গে আছে কার্ল মার্কস আর লেনিনের বই হোমিওপ্যাথি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিদ্যা আর হাজার রকমের পত্রিকা। সময় কাটছে মন্দ না...'

চিঠি পড়ে ললিতের ঠোঁট সামান্য কেঁপেছে। গলার ঠেলা মেরেছে কান্নার ডেলা। শাশ্বতীকে ছেড়ে দিচ্ছে আদিত্য। কিন্তু তাতে কী লাভ?

অলৌকিকভাবে বেঁচে যেতে ইচ্ছে করে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল ললিত। শুনতে পারছিল বিমান গুনে গুনে করে কথা বলছে। কখনো সখনো হঠাৎ বিমান লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে ছুটে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। কখনো চীৎকার করেছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই নিথর হয়ে গেছে। এখন বিমান কী বলছে তা শুনতে পাচ্ছিল না ললিত।

সঞ্জয়ের মা মারা গেছে। পুরুত দলা নিয়েই এসে দু'দিন আড্ডা দিয়ে গেছে। গলায় ধড়া, হাতে কুশাসন, গালে দাড়ি আর একটোকা চুল মাথায়। কী বীভৎস শোকের চেহারা! হিন্দুদের ঐ আর এক দোষ। শোকটাকে বিজ্ঞাপনের মতো নিয়ে বেড়ায়। লোকে চমকে ওঠে—মন খারাপ হয়ে যায়। বরং শোক চিহ্নগুলি লুকিয়ে রাখাই ভাল—মানুষের এমনিতেই দিনে কতবার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে।

অপর্ণা—রোগা ফর্সা মেয়েটা—সুন্দর গাড়ি চালায়। এতবড় গাড়ি কী অনায়াসে চালিয়ে নিচ্ছে! ওর মনের অবস্থা কী তা ললিত বোঝে। তবু ওপরের দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মাঝে মাঝে উড়ন্ত চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে দুটো সহজ হাতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সামনেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম এক ল্যাংটো পাগল, হাতে লাঠি, ললিত চোখ বুজে ফেলে লজ্জায়। গাড়ির গতি ধীর হয়ে যায়। ললিত টের পায় গাড়িটা বেঁকে পাশ কাটিয়ে নিল। পাগলটা রাস্তা ছাড়ল না। পাগল কত বেড়ে গেছে আজকাল। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যাচ্ছে মানুষ। বিড়বিড় করছে হঠাৎ। মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়, গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলে দিচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পরই এটা বেড়ে গেছে খুব। গতবারের আগের বার পুজোর বন্ধুরা সব বেড়াতে গেল বাইরে। ললিত মাকে একা রেখে যেতে পারে না কোথাও। তাই সে রাস্তায় ঘুরে টুরে সময় কাটাতো। সেই সময়ে একদিন ভবানীপুরের ফুটপাথে প্রচণ্ড ভীড়ের ভিতরে একটা লোকের চোখে চোখ আটকে গেল। লাল আঁজি-আঁজি জ্বলজ্বলে পাগলের চোখ। লোকটা হঠাৎ তার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল—তুমি। হঠাৎ চমকে উঠেছিল ললিতের বুক। আমি! আমি কী! আমি কী! এক রাস্তা ভীড়ের মধ্যে অচেনা লোকটা তার দিকে হাত তুলে তাকে চিহ্নিত করছে। থরথর করে কাঁপছে তার আঙুল, লক্ষ লোকের মাঝখানে সে ললিতকেই কিছু একটা বলতে চাইছে—তুমি। হঠাৎ ওরকমভাবে কেউ 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠলে যে কেউ টলে যায়। নিজেকে আজন্ম পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়—আমি কী করেছি! কী করেছি! ললিতের ঠিক তাই হয়েছিল। সেই পাগলটা কেন তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলেছিল—তুমি? হয়তো সে একটা কিছু দেখেছিল যা অন্য কেউ লক্ষ্য করেনি। সে হয়তো লক্ষ্য করেছিল ললিতের অসংগতি। হয়তো কোনো ভাবিষ্যৎ দুর্ঘটনা। কিংবা হয়তো সৌভাগ্যসূচক কিছু। আচমকা বড় নাড়া খেয়েছিল ললিত। পরমুহূর্তেই সে স্বাভাবিক হয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল ভীড়ের মধ্যে। আশ্চর্য, সেই ঘটনার পর দু'বছরও কাটেনি, তার ক্যান্সার হল।

কোনো যোগাযোগ নেই তবু অবচ্ছা-ভাবে মনে হয় যোগাযোগ আছে। পাগলটা হয়তো ওকে সাবধান করেছিল।

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ললিত দেখল, রমেন বসে আছে। জানলার দিকে মুখ। কোলের ওপর জড়ো করা দুটি হাত। নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের ফিকে একটা আলো আসছে। সেই আলোতে ললিত দেখল রমেনের দু চোখ দিয়ে জলের দুটি ধারা নেমে এসেছে। দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। মশারির ওপাশে জানালা—তারপর ধূলিকণার ঝড়ের মতো নক্ষত্রে আকীর্ণ আকাশ। ধোঁয়াটে চাঁদ আকাশে। অপার্থিব মূর্তির মতো রমেন বসে আছে। ললিত বুঝতে পারল রমেনের চেতনা নেই। সে ধ্যান করছে। নিশুত রাতে সেই কুকুরের কান্না, অস্পষ্ট আকাশ, ধ্যানস্থ রমেন—সব মিলেমিশে এমন এক স্বপ্নের মতো দেখছিল ললিত—যেন তা সত্য নয় অথচ হঠাৎ বুকের ভিতরে হু-হু করে ওঠে। কেন যে, ললিত তা জানে না। জানালা দিয়ে ঝরে পড়ছে তারার গুঁড়ো, জ্যোৎস্নার মোম। কুকুর কাঁদছে শূন্যতার দিকে চেয়ে। আদিগন্ত ছায়াপথ পড়ে আছে হিম আকাশে। মানুষ হঠাৎ ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। মূক হয়ে যায়। বিশ্বজগতের কোন রহস্যের সঙ্গে নিবিড় হয়ে আছে মগ্ন রমেন, ললিত তা কোনোদিনই জানবে না।

মাঝে মাঝে নিশুত রাতে উঠে বসে গভীর ধ্যানের মধ্যে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

বিমান গুন্-গুন্ করে কথা বলছে। মুখ ফিরিয়ে ললিত দেখল রমেন নিবিষ্ট ভাবে বিমানের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

—কী বলছেন?

রমেন আস্তে বলল—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ললিত বিমানের দিকে ঝুঁকে বসল। কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না। অসংলগ্ন। মনে হয় বুলি বা কোনো কবিতার লাইন।

—কতোবার গিয়েছি যে ব্যাবিলনে, স্বপ্নের উদ্যানে...কতোবার গিয়েছি যে...

রমেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে সোজা হয়। তারপর অপর্ণার দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে—আপনি পারবেন না। গাড়ি টলে যাচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

অপর্ণা মুখ ফেরায়। মুখখানা অসম্ভব লাল উত্তেজিত। চোখ টল্ টল্ করছে। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল—ঠিক ব্যালান্স থাকছে না।

—গাড়ি থামান।

—চালিয়ে?

—আমি চালাবো।

অপর্ণা একটু থমকে বলে—লাইসেন্স আছে?

রমেন হাসে—ছিল। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

অপর্ণা জিওলজিক্যাল সার্ভের উল্টো-দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সরে বসল। রমেন গিয়ে ধরল হুইল—সামান্য হাঁফাচ্ছিল অপর্ণা, বলল—সার্কুলার রোডের লাল বাতি আমার নজরেই পড়েনি। দিব্যি পার হয়ে এলাম। পুলিশ বোধহয় নম্বর টুকে নিয়েছে।

ললিত দশ বছর পর গাড়ি চালাতে দেখছে রমেনকে। দশ বছর আগে পুরোনো ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা যখন চালাতো রমেন তখন তারা আশেপাশে আর পিছনে বসত। রমেন নিয়ে যেতো শহরের বাইরে। কতবার গাড়ি চালানো শেখার চেষ্টা করেছে ললিত, ঠিকমতো পারেনি। একসঙ্গে এতগুলো যন্ত্র সামলাতে হয় যে তাল থাকে না। রমেন বিরক্ত হয়ে বলত—যন্ত্র-পাতির মধ্যে তোর মনোযোগ নেই।

হঠাৎ ললিত আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে মনে মনে হেসে উঠল। সামনের সীটে ওরা দুজন। রমেন—প্রাক্তন জমিদার, আর অপর্ণা—কারখানা মালিকের মেয়ে। পিছনে সে স্কুলমাস্টার, আর বিমান—কর্পোরেশনের জমাদারবাবু। ঘটনাচক্রে দুটো শ্রেণী আলাদা আলাদা জোট বেঁধেছে। দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানসিক হাসপাতাল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। সামনের দিকে একটু বাগান আছে। ললিত ভিতরে গেল না। গাড়ি থেকে নেমে বাগানের মধ্যে বেড়াতে লাগল। বিমানকে ধরে ধরে নিয়ে গেল রমেন, পিছনে অপর্ণা নত মুখে। দৃশ্যটা এত খারাপ লাগছিল ললিতের! একটু পরে দুজন লোক এসে গাড়ির লাগেজবুট খুলে বিমানের বাক্স বিছানা নিয়ে গেল। হাসপাতালে বাক্স বিছানা রাখতে দেয় কিনা কে জানে! হয়তো মানসিক হাসপাতালের ব্যবস্থা আলাদা, নয়তো রমেন আর অপর্ণা বন্দোবস্তটা করিয়ে নিয়েছে। ওগুলো কোথাও রাখার জায়গা ছিল না।

ওদের ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল। যখন বারান্দার তিনটে সিঁড়ি ভেঙে ওরা দুজন—অপর্ণা আর রমেন নেমে আসছিল, তখনই হঠাৎ বিমানের জন্য সত্যিকারের একটা কষ্ট টের পাচ্ছিল ললিত। সেরে উঠতে বিমানের কতদিন লাগবে কে জানে! ততদিনে ললিত কোথায়?

ফেরার সময়েও গাড়ি চালাচ্ছিল রমেন। রমেনের পাশে ললিত। পিছনে অপর্ণা। এক সময়ে অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—ওরা যত্ন নেবে তো?

রমেন মুখ না ফিরিয়ে বলল—নেবে। ওরা আমার অনেক দিনের চেনা লোক।

অপর্ণা দাঁতে রুমাল কাটল, তারপর আচমকা বলল—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ললিত ভয়ঙ্কর চমকে উঠে ফিরে বলল—সে কী?

অপর্ণা মাথা নুইয়ে চুপ করে রইল একটুক্ষণ, যেন কাঁদবে। কাঁদল না। ম্লান মুখখানা তুলে বলল—বাবা সেদিন আমাকে ডেকে বললেন, অপর্ণা, তুমি বুঝতে পারছ না আমার শরীরের অবস্থা। কিন্তু ডাক্তার কাজকর্ম চালাতেও একদম বারণ করে দিয়েছে। এখন আমার এত সব কে দেখে! আমি ইঙ্গিতটা ধরতে পারলাম। উত্তর দিইনি। কিন্তু বাবা খুব কনসিডারেট, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার যদি পছন্দ মতো কেউ থাকে তো বলো আমি তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিয়ে, উইদিন এ মান্থ। জামাইকে আমার ছেলে হয়ে সব দেখতে হবে।

—আপনি কী বললেন?

অপর্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—আমি কিছু বললাম না।

—কেন?

—ও তো বাবার ছেলে হতে পারত না!

—তাতে কী আসে যায়!

অপর্ণা একটু হাসল। তারপর বলল—কী জানি! আমি তো শুধু রাজী ছিলাম। কিন্তু ও সেদিন আমাকে বলল—আমি তোমাকে নিয়ে কী করব? তোমাকে খাওয়ানোর সাধ্য আমার নেই। তাছাড়া আমি বিয়ে করব কেন, আমি কি সুস্থ? আমার সন্তান যে মাথার দোষ নিয়ে জন্মাবে না তার গ্যারাণ্টি কি? আমার ঠাকুর্দা পাগল ছিল। আমাদের সমাজ যদি মানুষ সম্পর্কে সচেতন হত তাহলে আইনত আমার মতো মানুষকে বিয়ের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে দিত। সমাজ যখন তা করছে না তখন দায়িত্ব আমারই।

ললিত ভীষণ চঞ্চল হয়ে বলল—কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে একা থাকতে পারেন!

গাড়ি ভাল হওয়া মুশকিল। ম্যাজিক্যাল কিওর নেই। থাকলে আমি চেষ্টা করতাম। তথক নিজেটা যাবার দিক থেকে সবটাই প্রয়োজন।

ললিত চুপ করে থাকে। বাস্তবিক ভেবে দেখলে সে নিজেও কি পারে শাশ্বতীকে বলতে—আমি মরে গেলে তুমি একা থেকো। (আজকাল ললিত শাশ্বতীকে 'তুমি' বলছে। শাশ্বতী এখনো 'আপনি' বলা ছাড়েনি।)

রমেন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনাকে কোথায় পৌঁছে দেবো?

অপর্ণা বলে—পরাশর রোড। ওখানে এক বন্ধুর বাসায় যাবো। মাকে বলে এসেছি রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে।

পরাশর রোডে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই ব্যস্তসমস্ত একটি মেয়ে ছুটে এল। অপর্ণা তখন নামছে, তার হাত ধরে ভীষণ উত্তেজিত চাপা গলায় হাসতে হাসতে বলল—মাসীমা একটু আগে ফোনে তোর খোঁজ করছিলেন, ড্রাইভার নিয়ে বেরোসনি বলে চিন্তা। আমি বলেছি তুই আর এক বন্ধুর বাড়িতে একটু গেছিস, এক্ষুণি এসে পড়বি। ইস, সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি—

অপর্ণা মৃদু হেসে রমেনের দিকে ফিরে বলল—গাড়িটা আমার এখন দরকার নেই, আমি তো সেই দু ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরবো। আপনি বরং ললিতবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারেন। ওঁর তো শরীর খারাপ।

ললিত বলল—না, আমি বাসে যেতে পারবো।

রমেন ললিতকে একটু চোখ টিপল, তারপর অপর্ণাকে বলল—সেই ভাল। চলরে ললিত।

বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রমেন।

গাড়ি ছাড়তেই ললিত বলল—তুই আবার গাড়ির ব্যাপারটা ঘাড়ে নিলি কেন? আবার তো তোকে ফিরতে হবে। বেশ তো দুজন দিব্যি কেটে পড়তাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল, গাড়ি চালানোর একটা নেশা আছে। বহুকাল চালাই নি। আর কী ভাল গাড়ি দেখেছিস! বুইকের হাল-মডেল।

ললিত খেঁকিয়ে উঠল—দূর!

রমেন একটু চুপ করে থেকে বলল—মেয়েটা বোধহয় আমাকে কিছু একটা বলতে চায়। হয়তো একা বলবে। তাই গাড়িটা দিল, যাতে আমি ফিরে আসি।

—আমার সামনে বলতে দোষ কী ছিল?

রমেন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাল রমেন। ময়দানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

ললিত বলল—খামোখা পেট্রোল পোড়াচ্ছিস!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বলল রমেন—আয়, ড্রাইভিং সীটে বোস।

—আমি! দূর, আমি ওসব পারবো না। শেখার বয়স চলে গেছে।

—আয় না।

—দূর, অন্যের গাড়ি, কোথায় চোটফোট লেগে যাবে।

কিন্তু রমেন ছাড়ল না।

ললিত বসল ড্রাইভিং সীটে। অনেকদিন আগে একটু আধটু শিখেছিল। শিখিয়েছিল রমেন। রমেন তাকে আবার সব বুঝিয়ে দিল, তারপর বলল—চালা।

স্টার্ট দিতেই গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

রমেন আস্তে করে বলল—তাড়াহুড়ো নেই। আস্তে চালা।

যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ললিতকে। তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিল সে। প্রথমটায় গাড়ি একটু এঁকে বেঁকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে সাঁ সাঁ করে গাড়িগুলো তাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয় করছিল ললিতের—যদি ধাক্কা লাগে! রমেন একটা হাতে ধরে রেখেছিল স্টিয়ারিং।

আস্তে আস্তে জোর আর সাহস বেড়ে যাচ্ছিল ললিতের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে একটা লালচে মুখে প্রবল মনোযোগের সঙ্গে একাই গাড়িটা চালিয়ে নিচ্ছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায় রাস্তায়। পাশে একটু ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুজে বসে আছে রমেন—যেন ঘুমোচ্ছে। একবারও সাবধান করছে না ললিতকে।

সাহস বাড়ছিল। উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল।

চাপা গলায় সে বলল—রমেন!

—উঁ।

—ঐ যে সামনে একটা ছোট্ট গাড়ি যাচ্ছে—দাখ ওটাকে ওভারটেক করছি।

—কর দেখি।

ললিত করল। গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে। এক ঝলক সে প্রকাণ্ড বুইকটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাল। ভীষণ একটা আনন্দ পেল ললিত। এই দেখ আমি ললিত—কত বড় আর কত দামী একখানা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তারপরেই একটু হতাশা আসে। গাড়িটা তার নয়।

ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ চক্কর দিল ললিত। সমস্ত মন প্রাণ সঁপে দিয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। অখণ্ড মনোযোগে।

বোজা চোখে রমেন একটু হাসল।

—রমেন!

—উঁ।

—এবার ফিরি। তুই চালা এবার। ভীড়ের রাস্তায় আমি তো পারব না।

—দূর। ভবানীপুর পর্যন্ত তুই চালা। তারপর আমি দেখব।

আশ্চর্য এই ললিত অনায়াসে ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল। অসুবিধে হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে সে চালাচ্ছিল। ভুল করছিল না।

এলগিন রোডের কাছে গাড়ি থামিয়ে জায়গা বদল করার সময় রমেন চাপা গলায় বলল—সাবাস।

বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক হাসল ললিত। তার কপালে ঘাম। হাত পা কাঁপছে। অনেক—অনেকদিন বাদে আজ সত্যিকারের একটা আনন্দকে সে টের পাচ্ছিল। একটা ছোট্ট সাফল্যের অনাবিল আনন্দ। আমি সব পারি।

প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ লোক গাড়ি চালায় যন্ত্রের মতো নির্ভুলভাবে। তারা হয়তো কোনোদিনই ললিতের এই আনন্দকে টের পায় না। একমাত্র ললিত জানে কেন এই আনন্দ।

রাত সাড়ে আটটায় অপর্ণাকে পৌঁছে দিচ্ছিল রমেন।

সারাক্ষণ তেমন কোনো কথা হল না।

শুধু একবার অপর্ণা প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে বলল—এখন লোকে আমাকে খারাপ ভাববে। আমি সারাজীবন একজনকে ভাল বাসলাম, কিন্তু বিয়ে করছি আর একজনকে। কিন্তু আমি সত্যিই ও চাই না। জানেন! যদি কেউ একজন আমার ভার নিত—যার টাকা পয়সা কিংবা মেয়েমানুষের জন্য একটুও দুর্বলতা নেই তবে কত ভাল হত। কিন্তু সে রকম বোধ হয় কেউ নেই—না?

রমেন উত্তর দিল—আছে। বিমান।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করে—আপনি—আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

আধো-অন্ধকারে রমেন হঠাৎ অপর্ণার দিকে একপলক তাকাল।

ভীষণ চমকে উঠল অপর্ণা। তার মনে হল এ লোকটা জানে যে অপর্ণা আসলে সেই ছেলেবেলার বয়ঃসন্ধিতে কবে যেন বিমানকে ভালবেসেছিল। তারপর ভালবেসেছিল সেই স্মৃতিকে। তারপর কখনো সে ভালবেসেছে অকিঞ্চনকে ভালবাসার মধ্যে তার নিজের যে মহৎ আত্মত্যাগ আছে তাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোনোটাই বিমান নয়। যে বিমান কর্পোরেশনের জমাদারদের বাবু, যে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায় তাকে সঠিক করে ভালবেসেছে অপর্ণা?

এ লোকটা বোধ হয় জানে সব। বুঝতে পারে। তাই সে সারা রাস্তা আর কথা বলল না।

(ক্রমশ)

জিব্রিলের ডানা

['জিব্রিল' বা 'জিবরাইল' হল স্বর্গীয় দূত যে হজরত আদম থেকে হজরত মোহম্মদ পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের কাছে আল্লার বাণী বয়ে এনেছিল বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য। তাঁর ছিল সোনা-রুপো-হীরে-মণি-মুক্তো-চুনী-পান্নার-খচিত বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব সুন্দর 'পর' বা ডানা। সেই ডানায় লাগত মহাকাশের ঝড়। সে আনত লোকালোকের অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীতে আলোর বার্তা নিয়ে।]

চার পাঁচ বছর বেলার স্মৃতি, কত দূরে মনে পড়ে আমার বাবার মূর্তিটা ছিল অনেকটা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতন। তাঁর ব্যবহার ছিল শান্ত মধুর। বত্রিশ বছর হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আজো কেউ ভোলে নি। আমাকে কেউ কেউ বলে : 'যতই চেষ্টা করো, লেখাপড়া শেখো, তোমার বাপের মতন মিষ্টভাষী, সদালাপী, জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিক পুরুষ তুমি হতে পারবে না। তিনি কখনো কাউকে 'তুই' বলতেন না। অশ্লীল কথা বলতেন না। বিড়ি পর্যন্ত খেতেন না। নেশার মধ্যে ছিল পান, জর্দা, চা আর কায়দা-কেতাব পড়া—যে-লোককে সামনে পাবেন ধর্মোপদেশ দেওয়া—সদ্‌বুদ্ধি দেওয়া। তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। রোজা করতেন। মসজিদে ইমামতি করতেন কালো লম্বা পিরহান গায়ে দিয়ে, মাথায় সুন্দর সাদা পাগড়ি জড়িয়ে। মিলাদ শরীফ হলে তিনি সুরেলা 'কেহেনে' কোরআন পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করে দিতেন উর্দু ভাষায় আর বাংলাতে। হাফেজের গজল ছিল তাঁর প্রিয় জিনিস। ভাল ফারসীও তিনি জানতেন। এসব শিখেছিলেন বজবজের চটকলে তাঁতে কাজ করবার সময়—রেল-পোলের পাশেই চটকলের গেটের কাছেই যেখানে ছিল একটা মুসলিম হোটেল, আর বেদী বাঁধানো একটা নিম গাছ, সেই গাছে ছিল রাজ্যের কাকের বাসা, সেখানে বাসা-বাড়িতে থাকতেন তিনি। তাঁর পাশের বাসায় থাকতেন একজন সহকর্মী, তিনি ছিলেন আরবী উর্দু ফারসীতে দক্ষ। তাঁর কাছেই এসব ভাষা শেখেন তিনি। শনিবারে কারখানায় 'সপ্তা' পেলে বাড়িতে আসতেন। রবিবারে তাঁর কাছে ভীড় হত লোকজনের। পাড়ার বিচার, ধর্মের নির্দেশ, সন্ধ্যার দিকে পুঁথি পড়া শোনা, মুরগি খাসী গরু তাঁর হাতে জবাই না হলে নাকি ঠিক 'হালাল' (পবিত্র) হত না। তারপর তাঁর ছিল অনেক বাড়ির 'দাওত' (নিমন্ত্রণ)। শাদি পড়াবেন তিনি। মৃতের 'জানাজা' পড়াবেনও তিনি। তাঁর মুখে ছিল সুন্দর চাপ-দাড়ি। ঠোঁট দুটো পানের রসে রাঙা আর হাসি মাখা। মাথায় ঈষৎ একটু টাক। ছোট ছোট চুল। গায়ের রঙ ফরসা। বুক ভরা লোম। চোখ দুটি বিকশিত, গোলাপী—বুদ্ধির কুটিল তীক্ষ্ণতার চাইতে তাতে ছিল একরকম স্নিগ্ধ সরসতা।'

আমার এই বাবাকে হারাই আমি আমার ছ-বছর বেলাতে। মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম বজবজের চড়িয়াল বাজার আর রেলপোল দেখতে। পথে পাথর আর সোডার বোতলের মুখের ছিপি কুড়িয়ে-ছিলাম পকেট ভরে। বাওয়ালীর বড়পোল

মুগমারির জটামরীতলা পর্যন্ত পিঁড়ের বসে শালুতিতে করে গেলাম

থেকে মাগমারির জটামরীতলা পর্যন্ত পিঁড়ের বসে শালুতিতে করে গেলাম। তখন পাকা রাস্তায় মোটর বাস ছিল না। কি সুন্দর জল চিরে চিরে মানুষ নিয়ে জলের ওপর দিয়ে সেই এদিকে যাওয়া। জেলেদের লোক, খুব কালো, ধুতি-খাটো পরতে শালতি ঠেলে চলে। তোমার সরু ঘটিটার জল ছিটিয়ে লগাল রোদে ঝরেপড়া রুপোর গয়নার মতন। লোকটা তারস্বরে গান করছিল 'জয়কালী জয়কালী বলে ভাসলো তরণী...' শিটের চাল ঝনঝন করতে লাগল। বেলাভর যেন শালতি চলেছে, কখন শেষ হবে যার বার শুধিয়েছি বাবার মুখ ধরে। তিনি বলে-ছিলেন, 'এই তো বাবা, এসে পড়েছি, এবার রেলপোল দেখবে। কলের চিমনি দেখবে!' তারপর বোধ হয় বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমার মায়ের গলায় দোলনায় গাওয়া সেই গানটা শুনতে পেতে লাগলাম :

'কোথায় দিয়ে যাব মাগো
শিবতলার ঘাট
শিবতলার ঘাটে যেতে
গলা হল কাট।
ঘাটে যেয়ে দেখি মাগো
জল থই থই করে,
চাতালে তার শিউলী বকুল
ডালিম ঝরে পড়ে।'...

আগুনে লাল রঙ দেওয়া সেই রেলপোল দেখা ছিল সেদিন আমার এক চরম বিস্ময়! বাবার বাসার ঠিক দুটো বাসা পরেই দোরের ওপরে ছিল একটা জয়ঢাক টাঙানো! হোটেলের মালিক আর দুজন কাবুলি বাবার হাত ধরে কতক্ষণ গুনগুন করে গম-গম ভাষায় কিসব যেন বললেন! কী খুশী তাঁরা। কারা যেন খাবার দিয়ে গেল। সেই নাড়া হাজী সাহেব এলেন, যিনি নাকি আমার নাম রেখেছিলেন! উর্দু আরবী ফারসীর জাহাজ! তিনি আমাকে বুকে চেপে কানে কানে বলেছিলেন যখন আমার বাবা টিউকলের জলে মাথা ধুতে গেছিলেন : 'তোমার বাবাজীর মাথা গরম হয়ে গেছে! তোমরা সাবধানে ওঁকে ছাড়বে!'

মাথা গরম!......সে কি রকম জিনিস?

কখন কেমন করে আমরা বাড়িতে ফিরে-ছিলাম তা সঠিক আমার মনে নেই। পরদিন সকালে দেখি ঘৃতকুমারীর শাঁসওয়ালা পাতা মাথায় দিয়ে বাবা বসে আছেন, আর তাঁর চোখে জল ঝরছে, মা রুষ্ট হয়ে আছে, 'কি করে চলবে সংসার, আমন ধান নিয়েছিলে তোমার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে, তোমার বড় ভাজের কি মুখসাপটা—টাকাটা দেবার কি আজো সময় হয়নি'.....

আমি পাড়ার হানিফ আর তার বোন জিনাত-উন-নিসার সঙ্গে চলে গেলাম রাম গুরুমশায়ের পাঠশালে। এদিকে মা নাকি আমাকে কী খোঁজাখুঁজি! নিজের ইচ্ছায় পাঠশালায় যাচ্ছি দেখে একদিন লাঠি ঠুকে ঠুকে বাবাও গেলেন গুরু মশায়ের কাছে। তিনি যেতেই রাম গুরুমশায় বললেনঃ 'কে রে তাজিম এসেছিস, আয় বস্। তুই কি এখন চোখে দেখতে পাস্‌নে? তোর নাকি মাথা গরম হয়েছে?'

বাবা ছিলেন রাম গুরু মশায়েরও ছাত্র। তিনি নাকি পাঠশালায় এসে মাথা গুঁজে সেই যে লিখতে বসতেন একেবারে 'বড়ুকে' শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা তুলতেন না। রাম গুরু মশায় তাঁকে বড় পছন্দ করতেন। —এসব কথা বলত করিম পাহ্লোয়ান। সে ছিল বাবার সহপাঠি।

আর বড় মামা পাঠশালায় না এলে তাকে রাম গুরুমশায় ধরে আনতে ছেলেদের পাঠাতেন। বড় মামা ভাতের হাঁড়ি জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। হিন্দু ছেলেরা কেউ এগোত না!

আমাদের এদিকের দশখানা গ্রামের লোক

যারা কিছু লেখাপড়া জানে সেই ঠাকুর-দাদা থেকে নাত্নি পর্যন্ত—সবাই ঐ বাম পুরুষশায়ের ছাত্র। সবার পিঠে পড়েছে বাম পুরু মশায়ের তেঁতুলে-বিছের-গায়ের-মতন লাল আর তেলপাকানো মোটা বেতের চাবকানি। তারিই উক্তি, 'তাজিমকে আমি কখনো এক-ঘা মেরেছি বলে মনে পড়ে না। অমন ভাল ছেলে আমি দেখিনি।'

সেই তাজিম সাহেব আজ চল্লিশ বছর বয়সে মাথা গরম হয়ে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেটার হাত ধরে এসে গুরুমশায়ের পায়ের কাছে বসে বলছেন: গুরুমশায় আপনি আমার যে চোখে আলো দান করেছিলেন তার দৃষ্টিশক্তি আজ খোদা কেড়ে নিয়েছেন! আমার মাথার ভিতরটা কন্‌কন্‌ করে। মাঝে মাঝে এত যন্ত্রণা হয় যে মনে করি জীবনটা বার করে দিই! কিন্তু আত্মহত্যা মহা পাপ! তাছাড়া বাচ্চা দুটো রয়েছে—অবলা স্ত্রীটা রয়েছে ঘরে...যাহোক, আপনি আমার প্রথম জ্ঞানগুরু, আমার পিতৃতুল্য, আপনার ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব! তবে আমার এই সন্তানটিকে আপনার পায়ে দান করে গেলাম। এ আমার একটি রত্নকণা। এর ভার আপনার। আমার শেষ প্রার্থনা, একে মানুষ করবেন!'......

বাম গুরুমশায় জাতে বৈষ্ণব হলেও সেদিন বোধ হয় যবন হরিদাসের স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করেছিল—তাই নিজের উড়ানির প্রান্ত দিয়ে আমার রোরুদ্যমান বাবার চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়ে, নিজেও কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, 'আল্লা আল্লা, তাজিম, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার ছেলেকে আমি লেখাপড়া শেখাব—মাইনে-পাতি কোনো কিছুই লাগবে না।'

তারপর বাবা বিচিত্র লাল-কাঁকড়ায়-সুট্‌সুট্‌-করে-গর্তে-ঢোকো—গেঁয়ো, সাঁই-বাবলা, করোঞ্চা, পানিশিউলী, বাঁটার বন ঘেরা সেই খাল ধারের পথ ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে একাই বাড়িতে চলে এসেছিলেন কেমন করে আমি তা জানি না।

আমার কোলের বোনটি, যার নাম নাকি মাজিদা খাতুন, সে কবে মারা যায় তাও আমি জানি না। আর একটি ছোট ভাই ছিল কোলে। তাকে আমি কোনো এক অন্ধকার রাত্রে লম্ফের আলোয় আমাদের সেই মাটির কুঁড়ে ঘরের মধ্যে হতে দেখেছিলাম।

এরপর আমার জীবনে সেই এক চরম ভোরবেলা! কারা যেন চিৎকার করছে! শীত-কাল। কাঁথা খুলে ন্যাংটো তৌবড় হয়ে বাইরে এসে দেখলাম, কী কুয়াশা! ছাঁচের ধারে কতকগুলো পাণ্ডুরপোকা গুড়ুসো (দেওয়ালের) মাটির ঢেলা। বাবা প্রস্রাব করার পর 'কুলুপ' নিতেন এই ঢেলা দিয়ে জল না পেলে। একটা ডাব্বার জোড়া উল্টে পড়ে আছে সমস্ত পৃথিবী-মুখো হয়ে।

চাচাদের বাড়িতে হই-চই! বড় চাচী বললে: 'ওরে, তোর বাপ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে রে! হায়, কি হল রে......তোর মায়ের কাছে যা-না! তোর বেলা তোর বাপ ডেকে দিতে সে তোর মামার বাড়ি ধান 'কুটতে' (ভানতে) গেছে যে রে'......

দেখলাম গোয়ালের 'আড়কাঠায়' সেই

আমার পিঠে পড়েছে বাম গুরু মশায়ের তেল-পাকানো মোটা বেতের চাবকানি

কার যেন মৃত্যুর পর 'জানাজা' পড়ানোর কাপড়টা—যেটা শীতের সময় মা আমার গলায় বেঁধে দিত—সেইটা প্যাঁকিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলে আছেন আমার জ্ঞানদীপ্রণী বাবা। তিনি কখন লুকিয়ে আমাকে ঘুমের ঘোরে আদর করে রেখে কাঁথা চাপা দিয়ে মুখে মাথায় চুমু খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে এসে 'এক কথা' একটা মই খুঁজে নিয়ে উঠে গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়ে মইটা পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়ে ঝুলে পড়েছেন!

যখন তিনি নাকি ছট্‌ফট্‌ করছিলেন তখন দেখতে পায় আমার জ্যাঠতুতো ভাই। সে বলতে, বড় চাচা ছুটে গিয়ে চাগিয়ে তুলে ধরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বড় চাচী তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, যেতে দেয় নি। কারণ, আগের দিন নাকি মা আর বড় চাচীর মধ্যে বিষম ঝগড়া হয়েছিল এক টাকার সেই যে আধ মণ ধান দিয়েছিল ওরা তাই নিয়ে। মা নাকি বলেছিল, আমাদের

কত টাকা গেল ভাসুরের পিঠে আগি কোড়া উঠে যখন তিন মাস শয্যাশায়ী ছিল—আমরা কি টাকা চেয়েছিলুম?' ঝগড়া চরমে উঠতে চাচী ঝাঁটা নিয়ে আমার মাকে মারতে তেড়ে এল! আমার বাবা চুপ করে দেখলেন! বড় চাচাও কিছু বললেন না। বাবা নাকি বলেছিলেন, 'বড় ভাইয়ের খোজ-পরের নিজের বউ! আদুরে। বলবে কী! তার কথায় ওঠে বসে। হায়রে কপাল! সামান্য একটা টাকার জন্য আমার সামনেই আমার স্ত্রীকে ঝাঁটা মারতে এল—আর আমি বেঁচে থেকে সেই দৃশ্য দেখছি—এর চেয়ে না-বাঁচাই ভাল!...কাল তো আমি খোকার হাত ধরে ভিক্ষে করেও এলাম! আমার মরণ ভাল!'...তারপর মাকে তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মেরেছিলেন।

পাশের গ্রামে মামাদের বাড়িতে সেই ভোর বেলা, শীতের সময় কুয়াশা ঠেলে ঠেলে, ছ-বছরের ছেলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, বুকে হাত বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে কেমন করে যে মায়ের কাছে গিয়েছিলুম বাঘ ভূত শিয়াল শাকচুন্নির ভয় ভুলে, আজ আর সেসব কিছু মনে নেই। মনে করতে গেলে ভিতরের চোখের জলে সবটা কেমন যেন লবণাক্ত হয়ে যায়। কুয়াশা আরো ঘন হয়ে ওঠে।...

মা আর বড় মামী ধান ভানছিল। নানী (দিদিমা) ঢেঁকির পড়ে হুমড়ি খেয়ে খেয়ে ঢেঁকি পড়ার পর ফাঁক পেলেই নেড়ো বাড়িয়ে সুটসুট করে ভানা ধান তুলে নিচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আসতে দেখে ঢেঁকি বন্ধ হয়ে গেল। মা বোধ হয় আতঙ্কিত ছিল কোনো কিছু দুর্ঘটনার জন্যে। ছুটে নেমে এল ঢেঁকির 'পেড়েন' থেকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধোলে, 'কিরে, কি হয়েছে বাবা, কাঁদছিস কেন? এঃ! গা একেবারে হিম হয়ে গেছে যে রে... একলা কি করে এলি?'...

আমি মায়ের বুকে লুকিয়ে পড়ে একটু গরম খুঁজতে খুঁজতে বললাম: 'বাবাজী গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে!'

সংবাদটা শোনা মাত্রেই মায়ের চোখের ডিম দুটো যেন ঘুরতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর আমাকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল মাটিতে। নানী চিৎকার করে আকাশে হাত তুলে আমার বাবার উদ্দেশে বলতে লাগল: 'হায় বাবা, একি করলি তুই! আমার কাঁচা মেয়ের যৌবনটা তুই অকালে কোথায় ভাসালি রে! হায় বাবা, তুই ছিলি জ্ঞানবান ব্যক্তি, তুই অপঘাত মরণে কেন মরতে গেলি রে!'...

আমার একটা বড় বোন আছে, তাকে আমি ছোটবেলায় বেশি দেখিনি। কারণ

ব্যাঙ্ক, কারখানা আর গুদামে ব্যবহার হয়—কেন না এটি নির্ভরযোগ্য।

সূক্ষ্ম এর কারিগরী, প্রতিটি তালা'র জন্যে আলাদা আলাদা রকমের চাবী তৈরি হয়, তাছাড়া নব-তাল এমন ভাবে ডিজাইন করা—যাতে, খুলে বা ভেঙে চুরি করা না যায়, তাই নবতাল দেয় সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা। পেতল আর ইস্পাতের ডবল খাপ থাকে ব'লে এটি দারুণ মজবুত।

এটি তৈরি করছেন গোদরেজ—নিরাপত্তার সরঞ্জাম তৈরি করতে যাদের আছে ৭০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা।

নব-তাল

তিন সাইজে পাবেন :
৫০ মিলিমিটার (৬ লিভার)
৬৭ মিঃ মিঃ (৭ লিভার)
৮০ মিঃ মিঃ (৮ লিভার)

গোদরেজ

হুড়্‌কুদাড়ির বদলে নাকি পাঁচ বছর বেলায় তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। 'হুড়্‌কদাড়ি' জিনিসটা কি? মা বলে, 'চারদিকে জোর গুজব রটেছিল 'সরকেশো' একটা আইন করছে ১৪ বছরের কম বয়েসের মেয়েদের এ্যারপর থেকে আর বে দেওয়া যাবে নে! তাই তোর বুবুর বে হয়ে যায় কাঁচ পঁচগুনে বেলাতেই।"

মামাবাড়ির পাশেই ছিল মেসোমের বাড়ি। সেখানেই থাকত আমার বড় বোন। সে বড় কেঁদেছিল বাবার জন্যে।

মামাবাড়ির সবাই এল কেঁটিয়ে। মহা কান্নাগোল পড়ল। লাস তেমনি ঝুলছে। বাবার জিবটা এক পাশে বেরিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে!

মৃত্যু কী ভীষণ! বাবা একবার জাবির মল্লিকের একটা কালো দামড়া জবাই করার সময় তার অমনি সাদা সাদা আমড়া আমড়া চোখ বেরিয়ে পড়েছিল! (আমি ভয়ে চিল-চিৎকার করে পালাতে সবায়ের কী খলখল করে হাসি!)

বড় মামা থানা থেকে পুলিস আনলে। বড় চাচা হাতে ধরে অনুনয় করাতে ঝগড়া ফাসাদের কথাটা আর তুললে না বড় মামা। বললে, 'যে গেছে তাকে তো আর পাওয়া যাবে না। তবে লোকটা যখন নড়ছিল, এমন অমানুষ তোমরা যে তাকে তুলে ধরতেও গেলে না!'...পুলিসকে মেজ মামা বললে, 'মাথা গরম ছিল, যন্ত্রণায় বিষম কষ্ট পেত। আমরা একবার কলকাতার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাচ্ছিলুম, মাঝের হাটে রেলগাড়ি বাঁধলে কিছুক্ষণ। আমি জল খেতে ইস্টিশনে গেলে উনি নেবে যেয়ে কোথায় পালিয়ে যায়—খুঁজে পাইনি। পরের দিন ঘরে আসে। হাসপাতালে দিলে নাকি তারা মাথা কেটে দেবে এই ভয়ে (বোনাই (ভগ্নিপতি) আমার পালিয়ে আসে।'...

পুলিস কবর দেবার হুকুম দিয়ে গেল। কবর হয়ে গেলেও প্রতিদিন মাকে আমি আমাদের ভিটেয় বসে উত্তর দিকের গোর-স্থানের দিকে মুখ করে বসে উভরায় কাঁদতে দেখতাম।

এরপর আমি মামাদের বাড়ি চলে যাই। সেখান থেকে পাঠশালায় যেতাম। মা থাকত ছোট ভাইকে নিয়ে আমার বাপের সেই কুঁড়ে ঘরে। নির্জন বন জঙ্গলের পথ ধরে একাই পাঠশালায় যেতাম। একখানা প্রথম ভাগ দিয়েছিলেন বাম গুরু মশায় মোড়লদের ছেলে হৃষিকেশের কাছ থেকে চেয়ে। আমি তালপাতার দাগা বুলানো ছেড়ে ক-খ লিখতে শিখলুম। মা ছিলেট পেন্সিল কিনে দিলে। তারপরের বছর দ্বিতীয় ভাগ। ঐক্য বাক্য মানিক্য অখ্যাতি।

শাঠ্য জাড্য মূর্খ। লম্বা কলাপাতায় লিখে নিয়ে যেতাম মায়ের গুলে-দেওয়া বেগুনী-সোনালী কালি দিয়ে এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত। বাম গুরু মশায় দুষ্টু ছেলেদের ভীষণ মারতেন। বড় মামার পিঠে এখনো তাঁর বেতের চিহ্ন পড়ে কালসিটে দাগ হয়ে আছে! একটা ছেলে ছিল, নাম তার ভীম—কালো মোষের মতন চেহারা—বড় বড় সাদা চোখ—ভেড়ার গায়ের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল তার মাথায়—সে তার ভাই অর্জুনকে নিয়ে রোজ রোজ পড়ত বিষম বিপদে। অর্জুনকে এক ঘা বেত মারলেই সে তার মাদুরীতে ভড় ভড় করে বাহ্যে করে ফেলত। আর ভীম রোজ, কলাপাতায় লেখা আমরা যেখানে ফেলে দিতাম গুরু মশায় দেখার পর, সেখানে মাদুরীটা ফেলে দিয়ে যেত। পরদিন আবার দু' পয়সাতে একটা মাদুরী আনত সে। আবার তার ভাই মারের ভয়ে পায়খানা করলে ভীম ফেলে দিতে দিতে বলত, 'কালকে আবার যদি বাহ্যে করে, শালার পেটে 'লাত্তি' মারবো!"

কি জানি কি হল বাম গুরু মশায়ের পাঠশালা বিষ্টুবাবুদের বৈঠকখানা থেকে পাশের গ্রামের দুর্গা মন্ডলদের বাড়ির বৈঠকখানায় চলে এল। আমাদের বাড়ি এবং মামার বাড়ির মাঝখানে হল জায়গাটা। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। ছুটির সময় সরস্বতীর স্তোত্র পাঠের পর 'বিদ্যাং দেহি মা সরস্বতী' বলেই যে যার বইপত্র নিয়ে ছুট মারতুম। আমি যেতুম মায়ের কাছে। মা ভাত খাওয়াত আলু আর মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গালে দিয়ে। মা এক আনায় একটা ইলিশ মাছ কিনেছিল। আঃ! কী অপূর্ব স্বাদ ছিল তার।

তারপর একদিন হল কি, মাও আমার ছোট ভাইকে নিয়ে মামাদের বাড়ি চলে এল! কিন্তু কেন এল? সে কথা আমি জানতে পারি অনেক পরে যখন ক্লাশ টেনে পড়ি।

আমার বাবার সেই ঘর ভেঙে ফেললে মামারা। বাবার যত বইপত্র কোরআন কেতাব হাদিস পুঁথি সব দখল করলে ছোট মামা। উলুর ছাউনী চাল কেটে এনে লাগালে তাদের গোয়ালে। মামার বাড়ি মা গোয়াল কাড়ত, গরুর খড় কুঁচোত, রান্না করত। দাসীর মতো খাটত কিন্তু সময়ে খেতে পেত না। দেওয়ালের গায়ে লিখে হিসেব করে রেখেছিলাম, এক বছরের মধ্যে আমি পঞ্চান্ন দিন না-খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলুম! আর মা?

মামাদের বাড়ি যদি- না মা আসত তাহলে পাড়া প্রতিবেশীর ধান ভেনে দিয়ে যে চাল পেত তাতে বোধ হয় একটা দেড়টা পেটের ভাত তার চলে যেত। আর বাস্তুভিটেতে হত ওল, কচু, কলা পেঁপে, বেগুন কত কি!

গরু ছাগল পালত মা। তবে কেন এল?

এল এই জন্যে—যে-কথা আমি ছেলে বলে আমার কথা নয়—মা একদিন বলেছিল যখন মামারা আলাদা হয়ে গেল আর আমি সাময়িকভাবে পড়া ছেড়ে দিয়ে মেটিয়াবুরুজে দর্জির কাজ শিখতে গেলাম ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে—পথে বিদায় দিতে এগিয়ে এসে মা আমার মুখটা চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল : 'তোমরা বড় হ বাবা, আবার তোর বাপের ভিটেয় যাব তখন। তোর মামার বাড়ি কি যেতুম বাবা, একলা মেয়ে মানুষ থাকতুম আর পাশের বাড়ির অমুক লোকটা একদিন রাত্রে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরতে গেল! আমি তোর ছোট ভাইকে নিয়ে সেই রাত্রেই পালিয়ে গেনু তোর আমার মামীর কাছে। তারপর বড় দাদাকে সব বলতে তবে তো তোর বাপের ঘর ভেঙে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল। তোর বড় মামা আবার আমার নিকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তোদের মুখ চেয়ে আমি রাজি হই নি। বড় হয়ে তোরা আবার তোর বাপের ভিটেতে আলো জ্বালিস!"

মা আমার লক্ষ্মী মা, সে-আলো সে নিজেই জেলেছে আমার বাপের ভিটেতে॥

আব্দুল জব্বার

ভারতের আর্থিক সাহায্য দান

মোট টাকার পরিমাণ দিয়ে বিচার করলে ভারত বিদেশ থেকে যত সাহায্য পেয়েছে তত আর কোন দেশ পায়নি। অবশ্য মাথাপিছু বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ভারতের চেয়ে পাকিস্তানে অনেক বেশী। তা যাই হোক, ভারত যে পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে এবং বিদেশে এখনও ভারতের যে পরিমাণ ঋণ আছে, পৃথিবীর আরও কোন দেশেরই আর্থিক অবস্থা সে পর্যায়ে যায়নি, তবুও ভারত এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে—ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। ১৯৬১ সাল থেকেই ভারত অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলিকে টাকা ধার দিচ্ছে। ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত নেপাল ভারতের কাছ থেকে ৮৬·৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বর্তমান বিনিময় হারের ভিত্তিতে ৬৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ধার পেয়েছে। ভুটান পেয়েছে ৫০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ, ৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সিকিম পেয়েছে ২৪ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১৮ কোটি টাকা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত কি তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে যে, নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশকে ধার দিচ্ছে? টাকার অভাবে দেশের ভিতর যখন বন্যা প্রতিরোধ করা অথবা বন্যাক্রিষ্ট নরনারীকে উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন নেপাল, ভুটান ও সিকিমের জন্য ভারতের দক্ষিণ হস্ত সুপ্রসারিত। নেপাল বিদেশ থেকে মোট যে সাহায্য পায়, তার অর্ধেক হচ্ছে ভারত থেকে প্রাপ্ত। টাকার অভাবে কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন সম্ভব হয় না, অথচ ভারতের টাকায় নেপালের রাজধানী সুসজ্জিত হয়েছে, তৈরী হয়েছে সুসজ্জিত ত্রিভুবন বিমানবন্দর। বিদেশকে অর্থ সাহায্য করাও ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি অঙ্গ এবং প্রয়োজন ও নিজের স্বার্থেই এভাবে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু, তার বিনিময়ে ভারত কী পেয়েছে? নেপালের উত্তর সীমান্তে চীনা বাহিনীর উপর দৃষ্টি রাখার জন্য ভারত যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে নেপাল সরকার তা তুলে নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। পি এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারত যে টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ পরিশোধ বাবদ দেয় তার থেকে ২৪৫ জন নেপালী ছাত্রকে ভারতের কৃষি-সহ বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের খরচ দেওয়া হয়। এই তিনটি রাজ্য ছাড়া ভারত আর যা সাহায্য দিয়ে থাকে তা কলম্বো পরিকল্পনার কর্মসূচী অনুযায়ী দেওয়া হয়। আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, ইরান, কোরিয়া, লাওস, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভারতের কাছ থেকে কারিগরি সাহায্য পেয়েছে। অন্যান্য দেশের সহযোগিতায়ও ভারত এই দেশগুলিকে কারিগরি সাহায্য দিয়েছে।

পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে বিচার করলে বিদেশকে সাহায্য করার যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই আছে। ক্ষুদ্র সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ভারত উদারভাবে অন্যান্য দেশের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে এটা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু অন্যান্য দেশ ভারতের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের যেরূপ সদ্ব্যবহার করছে, ভারত কি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের অনুরূপ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে? বিদেশে ভারতের ঋণের বোঝা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কবে যে এই ঋণ শোধ হবে তা কেউ বলতে পারে না। ভবিষ্যতে যে সরকার ভারতে আসবে অর্থাৎ আরও পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হবে এবং তার ফলে আগামী দিনের জনসাধারণ যে নীতি অনুসরণ করবে তার উপরেই নির্ভর করবে ভারত ঋণমুক্ত হতে পারবে কিনা। এখন ভারতের প্রয়োজন বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের সদ্ব্যবহার করা এবং অন্যান্য অনগ্রসর দেশকে সাহায্য দেওয়ার আগে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে সবিশেষ বিবেচনা করা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। একটি দেশ যদি কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, তবে তার এগিয়ে যাওয়ার সুফল অকৃপণ হস্তে অন্য দেশগুলিকেও দান করা উচিত—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে মনে হয়, নগদ টাকায় সাহায্য না করে জিনিসপত্রের মাধ্যমে অথবা বিশেষজ্ঞ প্রেরণের মাধ্যমে যদি ভারত অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিকে সাহায্য করে তবে হয়ত সাহায্য দানের নীতি আরও বাস্তব-সম্মত হবে।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের বিনিয়োগ নীতি

ভারতের যতগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আছে, সেগুলির মধ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনই সবচেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশন ব্যবসায়িক লেনদেনে চূড়ান্ত রেকর্ড স্থাপন করেছে। গত আর্থিক বছরে এই কর্পোরেশনের ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ৯২৯·৩৫ কোটি টাকা; ১৯৬৭-৬৮ সালে তার পরিমাণ ছিল ৮৪৪·৪৭ কোটি টাকা। জীবন বীমা কর্পোরেশন বিভিন্ন খাতে তার বিনিয়োগধারা অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে গৃহনির্মাণ, জমি হস্তগত করা, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জীবন বীমা কর্পোরেশন ১০২ কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ করেছে; তার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এবং ১০ কোটি টাকা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারী ক্ষেত্রে জীবন বীমা কর্পোরেশনের বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ৭৭ ভাগ থেকে ৮১·৭ ভাগ বেড়েছে; আবার বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ২২·৭ ভাগ থেকে শতকরা ১৭·৮ ভাগ পর্যন্ত কমে গেছে। গত আর্থিক বছরে জীবন বীমা কর্পোরেশন আটটি বিদেশী রাষ্ট্রে ৮·৭০ কোটি টাকার ব্যবসায় করেছে। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আছে গ্রেট ব্রিটেন, ফিজি, হংকং, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, উগান্ডা এবং সিংগাপুর। জীবন বীমা কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তার বিনিয়োগ নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে হবে না। জীবন বীমা কর্পোরেশন যখন লাভের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছে তখন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে যাতে এই উদ্বৃত্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়, তার চেষ্টা চলবে বলে আশা করা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণে এবং নতুন শিল্প স্থাপনে অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা সরকারের তা বিচার্য। অন্যান্য দেশের জীবন বীমা সংস্থাগুলির বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা করলে দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রকল্পের অর্থ-সংস্থানে তাদের অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। ব্যাংক ছাড়া বিভিন্ন ঋণদান সংস্থাগুলির মধ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশন অগ্রণী। কিন্তু এই কর্পোরেশনের ঋণদান নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সঙ্গে তার প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেনি। বরং ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-মূলক ব্যাংকগুলি যে ক্ষেত্রে ঋণ দিতে সাহসী হয়নি, জীবন বীমা কর্পোরেশন সে ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।

সুব্রত গুপ্ত

বর্বর অতিথি

আমার লেখার টেবিলের উপর চপেটাঘাতের মতো ঠস্ শব্দে হাতের বইখানাকে ছুঁড়ে দিয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে চিত্তবাবু কাঁপিয়ে উঠলেন, "বাবিশ ! বর্বর! এ রকম বই একখানার বেশি দুখানা পড়লে মাথায় খুন চেপে যায়..."

তাকিয়ে দেখি, বর্বরই বটে। অভিযুক্ত পুস্তকটির নামেই তা প্রকট : "এশিয়ার এক বর্বর"। লেখক আঁরি মিশো বেড়াতে এসেছিলেন এশিয়ায়, ভ্রমণসূচীর মধ্যে ছিল চীন, জাপান, ভারত, সিংহল, মালয়েশিয়া—সেই পর্যটনেরই কাহিনী। অর্ধেকেরও বেশী স্থান জুড়ে আছে ভারতবর্ষের কথা, ১৯৩০ সালের ভারতবর্ষের কথা, মিশো তখন সদ্য ত্রিশোত্তীর্ণ এক যুবক, যদিও বইটি প্রকাশের আগে তিনি বারো বছর অপেক্ষা করেছিলেন।

আঁরি মিশো খ্যাতিমান লেখক, এ বইটির যাঁরা প্রকাশক তাঁরাও ফেলনা নন, কম করে রবীন্দ্রনাথের বারোখানা বই তাঁরা ফ্রান্সে প্রকাশ করেছেন। তবু এই গ্রন্থ সম্পর্কে অভিযোগ আছে অনেক : ভালোর চেয়ে মন্দ দিকটাই লেখক বেশী করে দেখিয়েছেন, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা বড় বেশী প্রস্ফুট, হঠোক্তি ও হঠোক্তি প্রসূত ভুলভ্রান্তি পদে পদে, বোঝাপড়ার অভাব, সহানুভূতি কম।

লেখকের কৈফিয়ত

মিশো নিজেও অগ্রিম আন্দাজ করেছিলেন, তাঁর লেখা সম্পর্কে আপত্তি-সংশয় দেখা দিতে পারে :

"এই কথা ভেবে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়েছে যে, য়ুরোপের এক দেশে তিরিশ-তিরিশটা বছর আমি অবলীলাক্রমে কাটিয়ে এ সব তার বিষয়ে একবারের জন্যও মুখ খুলিনি, আর ভারতে এলাম, চোখ মেলে দেখলাম মাত্র, আর অমনি দিব্যি একটা আস্ত বই লেখা হয়ে গেল! এদিকে, এদের বিস্ময়ই আমাকে বিস্মিত করে। যে-দেশটায় আমি তিরিশ বছর ধরে আছি, যে দেশের সঙ্গে নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুশ্চিন্তা, পরাজয়, অভ্যস্ত দিনপঞ্জীর একঘেয়েমি, বিষাদ ও স্ববিরোধের সূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমি আবদ্ধ, যে দেশে নতুন করে কিছু জানার অবকাশ নেই আর, শুধু আছে দিনযাপনের ছকে-বাঁধা জীবন—তার সম্পর্কে কিছু লেখা কিভাবে সম্ভব? সময় যত বাড়ে, জ্ঞানও তত এগোয়, কোনো দেশকে জানার পক্ষে এ-কথা সত্য নয়। বরং দিন যত যায়, ততই অস্পষ্ট হয়ে আসে নানান ভেদরেখা, পরে সরে যায় সব, নতুন অভিজ্ঞতার অভিঘাত বলে আর কিছু থাকে না। আর এই কারণেই আমি বলব, এশিয়ায় যাঁরা বহুদিন আছেন কিংবা যাঁরা এশিয়াবাসীদের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করেন, এশিয়া সম্পর্কে সত্যদৃষ্টির সন্ধান তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। বরং হয়তো এমন একজন যিনি একেবারেই নবাগত, 'বাইরের লোক', আনকোরা চোখে নতুন দেশ দেখছেন—তিনিই সহজে ঠিক জায়গাটিতে আঙুল দিয়ে বলতে পারবেন : এই এশিয়া।"

আমারও ব্যক্তিগত ধারণা, এর মধ্যে বেশ কিছুটা সত্যের কণা আছে। আমি নিজে যখন ভারতের মাটিতে পা দিলাম, অভিজ্ঞ পূর্ববর্তীরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন : "দেশে মা-বাবার কাছে যখন চিঠি লেখেন, আজকে যা দেখলেন আজই তা লিখে জানাবেন; কাল হয়তো সেটা আর চোখে পড়বে না।" কথাটা কত খাঁটি! এই সেদিন এক য়ুরোপীয় বন্ধু চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন, কলকাতার রাস্তায় এখনো গরু দেখতে পাওয়া যায় কি না। অনিশ্চিতভাবে উত্তর লিখলাম : জানি না। আসলে, আছে হয়তো, কিন্তু মিশে আছে রাস্তার পারিপার্শ্বিকে, আলাদা করে আর আমার নজরে পড়ে না।

...ও হাঁ, আছে বটে, অন্তত একটা তো আছেই; গতকালই হাতিবাগানের বাজারের

থাকে, সাইকেল-বাহনে, আমি একটির বদলে মুখোমুখি দুর্ঘটনায় না পেয়ে [illegible] নিষ্কৃতি পেয়েছি।

[illegible]

"ভারতে দেখবার কিছু নেই, সবই ধুলোবালি ও নোংরাবাড়ি"—এই চমকপ্রদ মন্তব্য দিয়ে শুরু করেছেন মিশো তাঁর ভারত-প্রসঙ্গ। আর এ-ই যাঁর অভিমত, তাঁর কাছ থেকে বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রত্যাশা করা বৃথা, চলতে চলতে মিশো শুধু দেখেন না, দেখার মধ্য থেকে তিনি তত্ত্ব খাড়া করেন, বিশেষ থেকে সাধারণীকরণে চলে যান। আপত্তি প্রকাশ করেন, অসমর্থন গোপন রাখেন না, যা তাঁর অপছন্দ তার প্রতি তিনি শ্লেষে তীক্ষ্ণ হন, বলার কথাটি মর্মে যাতে না লেগে তার জন্য অতিশয়োক্তির আঘাতও হানতে ভোলেন না। ভালো হোক, মন্দ হোক, বলার ভঙ্গিটা তাঁর জোরালো।

মিশোর মতে ভারতীয়েরা মন্থর, নির্লিপ্ত বাহুল্যপ্রবণ।

"ভারতীয়েরা মন্থর, আশ্চর্য রকম মন্থর, মেয়েমনে উতরত...।" তারা যেখানে সেখানে

সুযোগ পেলেই বসে পড়ে, জিরিয়ে নেয়—পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে, বাঁকা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে, নাপিতের সঙ্গে মোলাকাত হলে চুলদাড়ি কামিয়ে নিতে। যত্রতত্র যথেচ্ছ উপবেশন, বিনা দ্বিধায়, বিনা দ্রুক্ষেপে। ভারতীয়েরা—বিশেষ করে বাঙালীরা, যারা নাকি ভারতীয় ব্যক্তির প্রোটোটাইপ— পথে চলে ধীর লয়ে, দৌড়োয় না; তাদের মগজে চিন্তার প্রবাহও অতি-বিলম্বিত, কিছুতেই যেন কোনো তাড়া হুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে এগোলেই হল। মনে মনে তর্কের জাল বোনা ভারতীয় মানসের স্বভাবগত। ভাবনা নিয়ে খেলা করে তারা, কথার পিঠে কথা জোড়ে, সংশ্লেষের জট পাকায়। আর তাই তো সংস্কৃতই তাদের চরিত্রানুগ ভাষা—ঐ বহুবিস্তীর্ণ, জটিলবুনট, বিভক্তিবহুল, সমাস বিজড়িত বিস্ময়কর ভাষাটিই ভারতীয় মননের স্বভাবসিদ্ধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা অবদান।

"ভারতীয়েরা নির্লিপ্ত, অসহনীয়ভাবে নির্লিপ্ত।" জনতার ভাবলেশহীন অনন্ত উদাসীনতা—শুধু গরুরই কাছে যা হার মানে—লেখককে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যেন পৃথিবীর কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না, যেন জগৎ আছে তার মতো, আমি আছি আমার মতো—এমনিভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবেগের কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছে যেন দেশজোড়া মানুষ! কি আত্মসংবৃত তারা! আর সেই জন্যই তো ভারতীয়েরা কুকুর পছন্দ করে না: কুকুরের যে আত্মসংযমের বিলক্ষণ অভাব!

"ভারতীয়েরা বাহুল্যপ্রবণ।" সব কিছুতেই তাদের বাহুল্য-প্রকাশ—স্থাপত্যে, সাহিত্যে, গৃহসজ্জায়। মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা কিংবা দক্ষিণ ভারতের মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি গুণে দেখলে লেখকের এই মনোভাবের কারণ কিছুটা বোঝা যায়। কোনো ভারতীয় ঘরে গেলে "নিছক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, যা চোখে পড়ে তা প্রাচুর্য।" মহাকাব্য কিংবা প্রণয়-সাহিত্য মিশোর "দীর্ঘ, কৃত্রিম, ক্লান্তিকর" ঠেকছে—তার কারণও এই বাহুল্য [এই-জন্যেই বোধ হয় কামশাস্ত্রকে অশ্লীল বলে না কেউ]।

এই কৃত্রিমতা বিভাজন-পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। য়ুরোপীয়েরা বিভাগ করে সাধারণত ২, ৩, ৪-এর ভিত্তিতে; ভারতীয়েরা ৬৪ বা ৩২ দিয়ে মাঝে মধ্যে ৯ দিয়ে, অধিকাংশতই ২০-র বেশী সংখ্যার সাহায্যে [দৃষ্টান্ত: ১৮টি চৌর্য প্রণালী, ১৪টি ধাবনপদ্ধতি, হামাগুড়ি দেওয়ায় ৫৫টি কায়দা]। বিবরটা গৌণ, বিস্তারেই ভারতীয় মনের আনন্দ।

নাপিতের সঙ্গে মোলাকাত হলে চুলদাড়ি কামিয়ে নেয়

এ কেমন দেশ!

ভারতে নাকি "একটিও সত্যিকার সুন্দরী মেয়ে" দেখেন নি মিশো। সাততাড়াতাড়ি তারা বুড়িয়ে যায় [একটি কারণ অবশ্য, প্রসবোত্তর জননীদের উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব]। ভারতীয় নারীর সলজ্জতা বহুবিদিত, কিন্তু তার মধ্যে আছে "পরাজিতের মনোভাব", আত্ম-বিশ্বাসের অনটন।

ভারতীয়রা ঘন ঘন স্নান করে। এক চন্দননগরেই আছে ১৬০০ পুষ্করিণী, আর যখনই যান, ফাঁকা ঘাট চোখে পড়বে না, কেউ না কেউ নাইতে নেমেছেই। গঙ্গাও নিশ্চয়ই একমুহূর্ত শূন্য থাকে না। আর তবু এত নোংরা কেন লোকেরা? অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্যেই কি ভারতীয় চিত্রকলায় পরিষ্কার ঝকঝকে বাড়ি, প্রাসাদ, সৌধ ইত্যাদির সমারোহ? য়ুরোপে উনিশ শতকের চিত্রকলা দেখুন, কুৎসিত বাড়িঘর, হতশ্রী অট্টালিকা—এইসবের প্রতিই চিত্রকরদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। শিল্প কি তবে জীবনের পরিপূরক?

য়ুরোপে মিশো দেখেছেন দরিদ্র অন্ধের প্রতি স্বাভাবিক অনুকম্পা। ভারতে কিন্তু নিছক নিষ্পৃহতা ও অন্ধত্ব যথেষ্ট নয়, "তার উপরে জুড়তে হবে ভাঙা হাঁটু, কাটা হাত, খোঁড়া পা, উপড়ে-নেওয়া নাক"—না হলে ভিখ্ মিলবে না, আর তাহলেও যে মিলবে তার নিশ্চয়তা নেই।

আর সেই সব সাধু-ফকির...চুপচাপ, জানান না দিয়ে, অনুমতি না নিয়ে, গৃহ-প্রাঙ্গণে তাদের নির্বিকার প্রবেশ: চুপচাপ, শিরদৃষ্টি না করে, অভিযোগ না তুলে, তেমনই তাদের নির্বিকার প্রস্থান—তা ভিক্ষা যত অল্পই পাক কি একেবারে কিছুই না পাক। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষ থেকে এতটুকু অসহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হলে আর রক্ষে নেই, তার চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে! সেই অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বটে: পুরো এক ছাগপালের বলিদান।

শ্রী-সুষমা কদাচিৎ চোখে পড়ে মিশোর। চোখে লাগে শুধু কুশ্রীতার আতিশয্য: "এখানে খাদ্য বলতে অভ্যস্ত হতে হয় শুধু ভাতে, ছাড়তে হয় ধূমপান ও সুরাপান, রীতি হয়ে ওঠে স্বল্পাহার..." এটা কিন্তু কিছু নয়, কুশ্রীতায় পরিতৃপ্ত হয়ে থাকাটাই যেন সবচেয়ে বড় কৃচ্ছ্র-সাধনের পরিচয়...। তিন হাজার বছরের পুরোনো এই জাতি—আর তবু আজও

অপরূপ মেইডেনফর্মের জন্য দু'টাকা বেশী দেওয়া এমন কিছু বড় কথা নয়...

আর তা' কাজ দেয় অনেক অনেক দিন !

অনেক মহিলারই ধারণা অন্যান্য ব্রেসিয়ারের চাইতে মেইডেনফর্মের দাম অনেক বেশী। আমরা আশ্চর্য্য হই নি...কিন্তু আমাদের দামগুলি দেখলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। কারণ বাস্তবিক মাত্র দু'এক টাকা বেশী দিয়ে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কাটতির ব্রেসিয়ার কিনতে পাচ্ছেন। আর মেইডেনফর্মে আমেরিকা থেকে আমদানী-করা ইলাস্টিক ব্যবহার করা হয় ব'লে মেইডেনফর্ম ভারতের অন্যান্য ব্রেসিয়ারের চাইতে বেশীদিন টেঁকে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন আখেরে মেইডেনফর্মের দাম অন্য ব্রেসিয়ারের চাইতে কমই পড়ে। তবে আর দেরী কিসের ? আজই কিনে নিন !

৩ কাপ ফিট—এ.বি.সি। অ্যালোরেট ৭.০০ টাকা, চ্যানসোনেট ৮.৭৫ টাকা, লেস চ্যানসোনেট ২১.৭৫ টাকা, লেস চ্যানসোনেট স্ট্রেচ স্ট্র্যাপ ২৫.৭৫ টাকা, প্রেলিউড ৯.৫০ টাকা, লেস প্রেলিউড ২২.৭৫ টাকা, লেস প্রেলিউড স্ট্রেচ স্ট্র্যাপ ২৬.৭৫ টাকা, সুইট মিউজিক ১২.২০ টাকা, সুইট মিউজিক স্ট্রেচ স্ট্র্যাপ ১৭.০০ টাকা, কার্ট স্টার ৪.৫০ টাকা। দামগুলি ট্যাক্সসমেত নয়।

***maidenform*—১৯৬০ সাল থেকে ইন্ডস অ্যাপ্যারেল মেইডেনফর্ম তৈরী করছেন !**

Bensons-2191 R-Ben

এদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের রুচি-অভিরুচি ভুঁইফোঁড় হঠাৎ-নবাবের মতো।"

সারা ভারতে একটি মাত্র জায়গায় বিনুশ সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ লাভ করেছেন মিলো, পেয়েছেন 'সৌভ্রাত্রের উষ্ণতা'—অজন্তায়। আর সবই তাঁর মনে হয়েছে অ্যাকাডেমিক, বড্ডো বেশি কৌশল, বাঁধাধরা, স্থবির প্রতীক ও ব্যাকরণের প্রতি আনুগত্য : নিষ্প্রাণ, সুসজ্জিত যাদুঘর সব, "যেখানে বুড়ো প্রত্নতাত্ত্বিকের দল—যারা কোনো দিন লেখে নি, আঁকে নি, গড়ে নি কিছু—বসে বসে বিধিবিধান রচনা করে এবং ইউরোপীয়দের কানে প্রশংসার আপ্তবাক্য ঢালে।"

তিন হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণকুল অক্লান্ত চেষ্টায় এই পঁচিশ কোটি মানুষকে অবনমিত করে রেখেছে...। "লোকে এত ঘন ঘন আনত হয়ে অভিবাদন জানায়, এই ভঙ্গিটা কিছুতেই আমার সহ্য হয় না। আর রাজা-মহারাজাদের হাবভাবও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই পার্শ্বচর-অনুচরদের মতো হয়ে যায়; কেমন যেন ঠিক স্বাধীন মানুষ বলে মনে হয় না ওদের...।"

কত স্বল্প, কত সংকীর্ণ অধিকাংশের মাথা গোঁজার ঠাঁই! দিওজিনিস নাকি পিপের মধ্যে দিনযাপন করতেন, কিন্তু তিনি তো ওর মধ্যে একা-ই থাকতেন; এদেশে এসে দেখে যান তিনি : গোটা এক পরিবার দিব্যি ঢুকে যাবে ওর অন্দরে! "হোটেলে সে-আকারের ঘর এরা ভাড়া দেয়, তাতে চটিজুতো ছাড়া আর কিছু আঁটার কথা নয়...। কুকুরের পর্যন্ত দম আটকে যাবে, এদেশের মানুষ কিন্তু এতটুকু ঘাবড়াবে না।"

হিন্দু জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন: প্রত্যেকে ভাবছে নিজের কথা—নিজের পুণ্যের ও মোক্ষের কথা। "এক চিন্তা প্রত্যেকের : ধর্ম, জাতি-বর্ণের গরিমা এবং বিধি-অনুশাসন [প্রেম ও চৌর্যের পর্যন্ত অনুশাসনমালা আছে হিন্দু ঐতিহ্যে]।" এদিকে তাদের কাছে প্রয়োজন বলে কিছু নেই যেন। কখনো তারা একবেলা খায়, কখনো তিনবেলা। একদিন আহার করে দুপুরে, পরের দিন হয়তো সন্ধ্যে সাতটায়। আর শয়ন তো যত্র-তত্র, একটি চাদর জোটার অপেক্ষা শুধু।

বাংলা ও বাঙালী

আর তবু কি যাদু আছে বাংলা ভাষা সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্যে যে মিলোর মত হাঁড়িমুখো লোকও প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারেন নি।

"হিন্দুস্তানী ভাষায় আট-নটি ভাষা এসে মিশেছে, কিন্তু শব্দগুলি কানে শুনতে একঘেয়ে লাগে। বাংলা ভাষায় আছে আরো বেশী সুরেলা ছন্দ, আছে বাঁক, ক্রমকনুভব বিপর্যয়, আছে মেজাজী আস্বাদ, মাধুর্য, স্বরবর্ণের সরলতা।"

"গান বলতে আমাকে যা সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে তা হল চৈনিক সঙ্গীত—আর তার চেয়েও বেশী কয়েকটি বাংলা মেলোডি।"

কিন্তু স্তুতিভাষণ সত্যি সত্যি তুঙ্গে উঠেছে সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে। "এত আশ্চর্য আর বহুলাংশেই এত সুন্দর এই বাংলা সাহিত্য, এর জুড়ি নেই। রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন দ্বীপমাত্র নন। রয়েছেন দেদার লেখক, রয়েছে উনিশ আর বিশ শতকের শত শত রচনাকার্য—অনূদিত হওয়ার প্রতীক্ষায়। এই বিস্ময়কর সম্ভারের কাছে ম্লান হয়ে যায় আধখানা য়ুরোপের গোটা সাহিত্য। যখনই কোনো বাংলা লেখা হাতে তুলে নিয়েছি, দশ লাইন পেরোতে না পেরোতে সম্মোহনে বাঁধা পড়ে গিয়েছি। কিছু একটা আছে এই সাহিত্যের মধ্যে, খাঁটি একটা গুণ, যাকে শুদ্ধতা বা সততা বললে সঠিক হয় না, যাকে বলা যেতে পারে অন্তর্জীবনের উন্মীলন। কোনো বাঙালীর লেখা পড়লে তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।"

বাংলা উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য মিলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে : যৌনাবর্তে জটিলতার জাল বোনার প্রতি অপ্রতিরোধ্য এক আসক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি লেখেন: "মেয়েটি তো বলতেই চেয়েছিল 'হ্যাঁ', হাসতেও চেয়েছিল; কিন্তু বলল না শেষ পর্যন্ত, হাসলও না—কে জানে, কেন। এখন পাতার পর পাতা—দু' তিনেক পাতা—লেগে যাবে পুরো ব্যাপারটা সামলে উঠতে। কিম্বাও তা-ই : প্রেম জমে উঠেছে, তবু হাসি ফোটে না মুখে, মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না ভঙ্গিতে-ইঙ্গিতে। এরা সোজাসুজি প্রশ্নের

আর থাকে না; ভালোবাসে রোমন্থন। ক্রমে ক্রমে পানাহারে অরুচি এল, তবু উঠে-পড়ে কিছু করে ফেলাটা এদের ধাতে নেই। একটা, মাত্র একটা, কথা উচ্চারণ করলেই হাজার ভুল-বোঝাবুঝির বিলকুল অবসান ঘটে যায়, আর তবু প্রাণ গেলেও ঐ কথাটা কিছুতেই এরা মুখ ফুটে বলবে না। বরং অসুখী হয়েও এদের তৃপ্তি—জমাট, প্যাচানো পরিস্থিতির প্রতি এতই এদের আকর্ষণ। আসলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত উদ্যমের চেয়ে নিয়তির সর্বশক্তিমান গতিকে অনুভব করাই এরা বেশী কাম্যবস্তু বলে মনে করে থাকে।"

চক্ষুর জ্যোতির্লাবণ্যের জন্য প্রথমে অন্য রকম মনে হলেও ভারতীয় তথা বাঙালীদের দেখতে নাকি মোটেই ভালো নয়, আট থেকে আটের মধ্যে তাদের নাকি কেমন হাবাগোবা-গোছের দেখায়। তবে হ্যাঁ, এদের বুড়োরা সুন্দর বটে; অতুলনীয়ভাবে সুন্দর, যেমন—প্রবীণ গায়কেরা। আট-পেরোনো রবীন্দ্রনাথের কারুকোশিত অপরূপ, অথচ তাঁর কুড়ি বছর বয়সের চিত্র দেখুন—মনে হয়, ঠিক যেন খাপখায় হন নি, বিজয়ী হন নি। "মেয়েরূপে ভারতীয়দের সৌন্দর্য"-সম্বন্ধে

কত স্তুতি শুনেছি, কিন্তু তার কারণই এই যে, যাঁরা সত্যি সুন্দর তাঁরা আশ্চর্য রকম সুন্দর।"

বাঙালীদের শৌর্যবীর্যে মিশো আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। "একজন গুর্খার সামনে দশজন বাঙালী হার মানে, এক গো জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে...। মহান অশোকআমলের আমল থেকে ভারতীয়েরা মার খেয়ে আসছে; আট শ' বছর ধরে তারা স্বাধীনতা-বঞ্চিত। বিজিতের মনোবৃত্তি তাদের মজ্জায় প্রবেশ করেছে: নৃশংস দস্যুটি যেই শক্তিপ্রদর্শন করল, অমনি গোটা বাহিনীটাই নিমেষে ছত্রভঙ্গ।"

বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপারেও ভাবোচিত নির্ভরশীলতা চোখে পড়ে তাঁর। সমগ্র এশিয় সমাজটাকেই তাঁর মনে হয় ছাত্র-ছাত্রের উদাহরণ আর বাংলাদেশে তো ছাত্ররা শিক্ষা শিক্ষ করছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও, তাঁর দৃষ্টিতে মৌলিকতার চেয়ে রোমন্থন বেশি: প্রথমটি পংক্তি যদি লেখকের নিজস্ব হয়, পরের তিন পংক্তি অবশ্যই উদ্ধৃতি। বাংলা দেশে পথে-ঘাটে লোকে শুধোয়: 'কোন্ ডিগ্রী নিয়েছেন?' মিশোর পরামর্শ: "উত্তর দিন, ডক্টরেট। যদি আপনি কসাইও হন, উত্তর দিন 'ডক্টর ইন বুচারি'। পরবর্তী প্রশ্নটি হবে: 'আপনার গুরু কে?' যদি বলেন, 'গুরু, আবার কে? কেউ নয়...' ওরা হতভম্ব বনে যাবে।"

পঁচিশ বছর বয়সের বুড়োধাড়ি বাঙালীদের ঘুড়ি-ওড়ানোর ব্যাপারে মিশো কৌতুক অনুভব করেছেন।

পঁচিশ বছর কালের বুড়োধাড়ি বাঙালীদের ঘুড়ি ওড়ানো

কলকাতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: সবচেয়ে জনবহুল নগর। আর হাওড়া স্টেশন: "পৃথিবীর সর্বাধিক বিশালকায় স্টেশন। প্রকৃত স্টেশন যে কাকে বলে এখানেই তা বোঝা যায়: একমাত্র এই স্টেশনেই লোকে সত্যি সত্যি অপেক্ষা করে।"

বেড়াতে গিয়েছিলেন পুরীতে, দার্জিলিঙে: "কি বিপুল স্বস্তি, বাঙালী ছাড়া যখনই অন্য কোনো জাতের মাঝখানে আসি।" কিন্তু তারপরেই "তবু বাংলাদেশেই থাকতে বরাবর ভালো লেগেছে আমার, বরাবর ভেবে এসেছি ফ্রান্সে ফিরে গেলে এদের জন্যে মন-কেমন করবেই। কি অদ্ভুত! মাত্র দুদিন হল বাংলা ছেড়েছি, এরই মধ্যে কেমন-কেমন লাগছে, বাঙালীদের সংগ ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে।"

দক্ষিণ ভারতে

দক্ষিণে যাওয়ার আগে বাঙালী বন্ধুদের মুখে শুনেছিলেন, দক্ষিণী মেয়েদের মধ্যে হাজারে একজনও নাকি সুন্দরী নয়। গিয়ে দেখলেন মনে হল, 'দশ হাজারে'।

তবে কৌতূহলের তীব্রতায়, ওরা আর্যদেরকে ছাপিয়ে যায়। বিদেশী মানুষ দেখলেই হল, ওরা অমনি উৎসুক হয়ে ওঠে। আপনার সম্বন্ধে নিতান্ত তুচ্ছ একটা কথা জানতে পারা মাত্র স্টেশনের সবাইকে, সমস্ত পথচারীকে ডেকে ডেকে শোনাবে। দূর থেকে প্রশ্ন আসে: 'কে হে লোকটা?' সশীৎকারে উত্তর আসে: 'এর বয়স বত্রিশ, ভারতে বেড়াতে এসেছেন'!... য়ুরোপীয় পর্যটক দেশে ফিরে গিয়ে বলে বেড়ায়, 'ভারতে এই দেখেছি, ওই দেখেছি'। কতু দেখেছেন!...তাঁর গিয়ে বলা উচিত: "আমাকে এরা দেখেছে, ওরা দেখেছে!" আর সত্যি তা-ই, তিনি যত-না দর্শক, তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রষ্টব্য।"

উত্তরের তুলনায় দক্ষিণের মানুষের মশকরাও কম। চলতে চলতে এরা সবাই হাসে না, দাঁড়িয়ে থাকে কেউ কেউ, পথ দৌড়তেও দেখা যায় কাউকে কাউকে। "যদি শুধু পাণ্ডিত্যের কথা ওঠে, য়ুরোপীয়দের সঙ্গে দক্ষিণীদের মিল বাঙালীদের চেয়ে বেশি।"

সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তার ঢং মিশোর কানে আসে নি কোথাও। "এরা দেখছি কথা বলে না, আবৃত্তি করে—তুচ্ছতম কথাটিও বলে এমন ভঙ্গিতে, যেন সারা জগৎ তা শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। উত্তরের মানুষ আবৃত্তি করে, দক্ষিণের মানুষ শুধু চেঁচায়।"

আর গান? সর্বত্র গান: "আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে গান গায়।"

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মন্তব্যের অনেক টুকরো ছড়ানো আছে বইটিতে—আর তাতেও আছে 'বাইরে থেকে' দেখার নানা ভুলত্রুটি এবং 'বাইরে থেকে' দেখার গুণপনা।

হিন্দুরা যে ধর্মপ্রাণ, অতি মাত্রায় ধর্মপ্রাণ, মিশো তা স্বীকার করেন। ডন্ জুয়ান্ যেমন প্রেমেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন, হিন্দুরাও তেমনি পূজারই পূজারী যেন—নিজেদের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত তাদের কাছে পূজনীয়। আর তেমনি সার্বজনীন প্রার্থনার প্রতি তাদের আসক্তি এবং ভক্তিচিন্তা। প্রেমের চেয়েও প্রার্থনাকর্মের স্থান উচ্চে, এবং এমন কি প্রণয়লীলায় পর্যন্ত ঈশ্বরচিন্তা হিন্দুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

আর কত রীতি এই আরাধনার! একটিমাত্র ধর্মের মধ্যে গৃহীত হয়ে আছে সব—একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, জড়োপাসনা, পিশাচপন্থা। মানত করে এরা পদে পদে: "যখনই দেখবেন একজন হিন্দু কিছু একটা করছে, কিংবা কোনো কিছু থেকে বিরত থাকছে, নিশ্চিত থাকবেন, ওটা মানত [অনেকে মানত আছে বলে ডিম খায়, আবার অনেকে মানত আছে বলেই ডিম খায় না]; এমন কি নিরীশ্বরবাদীরা পর্যন্ত মানত করে থাকে।"

আর উপবাস। আহার যেমন স্বাভাবিক, ওদের কাছে উপবাসও তেমনি। কথায় কথায় উপবাস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে—কর্মের সাফল্যে, বাবসার অবনতিতে, গৃহপালিত বাছুরটার অসুখে-বিসুখে...! আর মাংসবর্জন তো আছেই: "শতকরা নিরানব্বই জন হিন্দু মাংস খায় না।"

এই আত্যন্তিক ধর্মাসক্ত মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে ঈশ্বরগাধুত্বে। হিন্দুর সগুয়ী স্বভাব পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ধনসম্পদকে ভারতের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত করেছে

[রাজামহারাজাদের ঐশ্বর্য এবং এদেশে সঞ্চিত মোট স্বর্ণপরিমাণের বিচারেই বোধ হয় মিশোর এই উক্তি। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এই সঞ্চয়লিপ্সা স্পষ্টলক্ষ্য : ভগবানকে তারা যেন 'জোঁকের মতো' শুষে নিতে চায়।

তাই বলি-নিবেদনে ক্লান্তি নেই হিন্দুর : "যদি তাকে একটিমাত্র ছাগবলি দিতে দেখা যায়, বুঝতে হবে তার অধিক দিতে মানা।" আর এই পুণ্যসঞ্চয়ের খাতিরেই ত্যাগের প্রতিও তার দুর্মর প্রলোভন। কোনো কোনো মুহূর্ত আসে প্রত্যেকেরই জীবনে যখন মানুষ অভ্যস্ত জীবনের জীর্ণ কন্থা থেকে জেগে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ছুটে যায় লড়াই করতে, ছিনিয়ে নিতে, জিতে নিতে; হিন্দুর কাছে জেগে-ওঠা মানেই সব কিছু ত্যাগ করে বানপ্রস্থ। সংসারের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে পেরে না উঠলেও বিবাহিত এবং দশ সন্তানের জনক হিন্দু অনায়াসে বলতে পারে, "এ যদি হয় আমি সাধু হয়ে বেরিয়ে যাব কিন্তু..." এবং সত্যিই হয়তো সে ভাইপোর হাতে তার সমস্ত অর্থসম্পদ তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে একদিন।

কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, হিন্দুর সর্বত্যাগ অন্যের কল্যাণের মুখ চেয়ে; উদ্দেশ্য নিজেরই পুণ্যার্জন। নিজের মোক্ষই তার প্রথম চিন্তা এবং একমাত্র চিন্তা। "অবশ্য আছেন হিন্দু মায়েরা—তাঁরা সত্যিই পরার্থে বাঁচেন" আপন সন্তানের জন্য, আপন সংসারের জন্য।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হিন্দুরা ফললিপ্সু, বাস্তবমুখী : "নিছক সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি তার তৃষ্ণা নেই, সে ফল চায় প্রতিদান চায়" [যদিও, অন্য অর্থে, 'মা ফলেষু কদাচন'-ও হিন্দুশাস্ত্রেরই কথা]। এই জন্যেই, মিশোর ধারণা, নব্য হিন্দু ধর্মপ্রচারকেরা মার্কিন দেশে কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। ধর্মকর্মের সঙ্গে ফললাভের এই সংযোগ থেকেই মিস্টিসিজমের আর ম্যাজিকের সংশ্লেষ ঘটে গেছে হিন্দু ঐতিহ্যে, এসেছে মন্ত্রশক্তির উপর নির্ভরতা [সেনাবাহিনী পর্যন্ত মন্ত্র আওড়ায়]। ব্রহ্মচর্য ও কৌমার্যের ব্রত হিন্দুর দৃষ্টিতে শুধু ত্যাগের একটি প্রকরণমাত্র নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি-অর্জনের একটি উপায়। ক্যাথলিক মিশনারীদের কাছে কৌমার্যব্রতের মূল্য অনুরূপ নয় বলে হিন্দুরা—লেখকের মতে—তাঁদের ঐ ব্রত-উদযাপনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।

হিন্দু ও ক্যাথলিক মিস্টিসিজমের প্রতিতুলনা করে মিশো বলেন : "ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে—আয়তন ও আবহগুণে—মনে আসে বিনয় ও বিনতির অনুভূতি। অথচ বৃহত্তম হিন্দু মন্দিরেরও অভ্যন্তরপ্রদেশ (যেখানে দেবতা থাকেন) ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; সেখানে দাঁড়ালে মানুষের মনে জাগে শক্তির অভিভাব, আপন ক্ষমতার বোধ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের দুর্বলতার চেয়ে মানুষের সক্ষমতা প্রদর্শনের দিকেই হিন্দুধর্মের ঝোঁক। ঈশ্বরকে সে 'বাধ্য' করতে চায়, প্রার্থনার আবরণে সে 'হরণ' করে নিতে চায়। সারবস্তুর চেয়ে তাই সঠিক কৌশল জানার প্রতিই তার আগ্রহ...। হিন্দুদের ধর্মভাবের মধ্যে দিব্যভাব সত্যিই কম : সাহিত্য-শিক্ষকের সাহিত্য প্রতিভা যতটা থাকে, ততটা।"

সর্বশেষ উক্তিটি—পূর্বগামী আরও অনেক উক্তির মতোই—নিঃসন্দেহে অধিকার প্রসূত ভ্রান্তি। তবু, এ-ই মিশো। কতটা তাঁর স্পষ্টভাষণ আর কতটা হঠভাষণ, কতটা অব্যবহিত দেখার গুণে সত্যভেদী আর কতটা অব্যবহিত দেখার ত্রুটিতে বিভ্রান্ত, তা বাঙালী পাঠকেরই বিচার্য।

চিত্রবাবু বললেন, "বইটা, দেখছি, আর একবার ভালো করে পড়ে দেখতে হবে।"

ক্রমশ

॥ ১১ ॥

দীপু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোথ্ থেকে এলি?

অরূপ বললো, দ্যাখ্ কি রকম শান্তাকে নিয়ে এলাম!

দীপু তো জানেই না যে শান্তার সঙ্গে স্বপ্নার আলাপ আছে। অরূপকেও সে শান্তার কথা বলে নি। সে একটু প্রশ্ন-চোখে তাকালো শান্তার দিকে। অরূপ আবার বললো, তুই কি রে, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে এসে পরে এলি? আমরা যদি না আসতাম, ও এখানে একা একা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো?

—আমার সঙ্গে যখন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে না, তখন ও বুঝি একা একা বাস ট্রামের জন্য কখনও দাঁড়িয়ে থাকে না?

—বাঃ, সেটা আর এটা এক কথা হলো?

শান্তা হালকা করে হেসে বললো, কল-কাতার বাস অবশ্য দীপুদের চেয়েও দেরী করে আসে।

স্বপ্না অবাক হয়ে দেখছে সেই দুজন ছেলেকে। তারা এখন রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে কফি হাউসের দিকে। দীপুকে ঐ ধরনের ছেলেদের সঙ্গে সে দেখবে, কল্পনা করেনি। ঐ ধরনের ছেলেদের সে দেখেছে মাঝে মাঝে গলির মোড়ে মোড়ে, সিনেমা হলের গেটের সামনে, পুজো প্যাণ্ডেলে—ওদের দেখলেই চোখ মাটিতে নামাতে হয়, আঁচলটা জড়িয়ে নিতে হয় ভালো করে, মনে মনে কল্পনা করে নিতে হয়—সারা শরীরটাতেই বর্ম আঁটা আছে। তবু ওদের দৃষ্টি গায়ে বিঁধে যায়, ওদের কথাগুলো ধাক্কার মতন এসে লাগে। ও রকম একটিও ছেলের সঙ্গে স্বপ্না এ পর্যন্ত মুখোমুখি কথা বলে নি, কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে। সামনা-সামনি দাঁড়ালেও কি ওরা ঐ রকম চেঁচিয়ে অসভ্য কথা বলবে! দীপু নিজের মুখে বললো, ওরা তার বন্ধু। ওদের সঙ্গে দীপুর বন্ধুত্ব হয় কি করে! স্বপ্না এ কথাটা জিজ্ঞেস করবে ভেবেও পারলো না। একটু অতৃপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীপু বললো, স্বপ্না, ওদের মতো ছেলেদের তুমি এ পাড়ার কোনোদিন দেখোনি!

—হ্যাঁ, এদিকে আসাই হয় না।

অরূপ জিজ্ঞেস করলো, তোর হাতে কি বই রে? দেখি! একি, এসব বই নিয়ে ঘুরছিস কেন?

—বিক্রী করবো।

স্বপ্নার আবার অবাক হবার পালা। নিজের হাতে বই নিয়ে কেউ বিক্রী করতে যায়, এসব তার জানা নেই। বইতো বিক্রী করে দোকানদাররা, তাদের কাছ থেকে কিনতে হয়, কেনার পর বই বাড়িতেই থাকে, তারপর কি ভাবে এক সময় আবার হারিয়ে যায়।

অরূপ জিজ্ঞেস করলো, এসব রেফারেন্সের বই, বিক্রী করবি কেন? ক্লাসিকের এই বইগুলো তো এখন সহজে পাওয়া যায় না।

দীপু মুচকি হেসে বললো, আমাদের বইয়ের আলমারিটা ভেঙে গেছে।

—তা হলে আলমারিটা সারিয়ে নে। একদম কেউ এসব দামী বই বিক্রী করে নাকি?

—দামী বই-ই তো বিক্রী করে। সস্তা বই আর কে কিনবে! আমার বাবা বাড়িটা বিক্রী করবেন তো, আমি তাই আগে থেকে টিউশানির জন্যে চেষ্টা করছি।

—আঃ, ও রকম বই বিক্রী করতে তোমার খারাপ লাগে না!

দীপুর হাসিটা এবার চওড়া হলো। স্বপ্নার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে সে বললো, শুধু বই না! বাবার একটা পুরোনো ঘড়ি ছিল— ঠাকুর্দার আমলের, সোনা বাঁধানো—বাবা সেটা আমাদের না জানিয়ে বিক্রী করে দিয়েছেন। এদিকে মেজদিও লুকিয়ে লুকিয়ে দু' একখানা পুরোনো থালাবাটি বিক্রী করে—কোনো কাজে লাগে না তো ওগুলো! আমিও বাবা আর মেজদিকে না বলে বই বিক্রী করছি। আমাদের বাড়িতে এই রকম একটা খেলা চলছে। বেচারা দাদা! দাদাই শুধু কিছু পারলো না!

শান্তা একটাও কথা বললো না। তার মনের ভাব তার মুখ দেখে সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু স্বপ্নার মুখে তার হৃদয়ের ছবি। সে বিস্মিত বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে আছে। দীপু এসব কথা বলছে কেন? ইচ্ছে করে তাদের শোনাবার জন্য? দীপু কি তাদের অপমান করতে চাইছে?

অরূপ সিগারেটের প্যাকেট বার করতেই, দীপু বললো, আমাকে একটা দে তো, সারাদিনে একটাও সিগারেট খাইনি!

অরূপ গম্ভীরভাবে বললো, শোন্ দীপু, তোর সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে। স্বপ্না, তুমি একটু শান্তার সঙ্গে গল্প করো।

খানিকটা সরে এসে অরূপ রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মুখে একটা বাড়তি এনে ফেললো। বললো, জানিস, আমি সামনের সপ্তাহ থেকে অফিসে বেরুচ্ছি।

—তুই নাকি?

—হ্যাঁ। তুই-ও আর না, আমাদের কিসের অফিসে?

—আমি?

—আমি বাবাকে বললেই বাবা রাজী হয়ে যাবে। একটা পোস্টও খালি হয়েছে, একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে কালই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

—আমাকে তুই চাকরি দিচ্ছিস? গ্র্যাণ্ড!

—দুজনে এক অফিসে কাজ করবো।

—কত মাইনে দিবি?

—সে বাবাকে জিজ্ঞেস করে...পাঁচ শো টাকার কম নয়।

—উঁহুঃ, তাতে চলবে না। তুই যত মাইনে পাবি, আমাকেও ঠিক তাই দিতে হবে। তুইও বি-কম্ পাশ, আমিও বি-কম পাশ—আমি বি-এ পড়েছিলাম, পরীক্ষা

তার কাজের কোয়ালিফিকেশন জন্য! তোকে শুধু আমার বন্ধু বলে দেওয়া হচ্ছে না। তোর কোয়ালিফিকেশান আছে। একজন নতুন লোক তো নিতেই হবে।

—যাক্ গে, ও কথা ছেড়ে দে। আমার চাকরির দরকার নেই।

—দরকার নেই? কেন?

—কেন, তা ঠিক বলতে পারবো না। তুই যে আমাকে একটা পাঁচ হাজার টাকার চাকরি দিতে চাইলি—এটা শুনে আমার কোনো আনন্দ হলো না। কেন আনন্দ হলো না, তাও আমি জানি না। আজকাল চারদিকে চাকরি চাকরি রব, সেই ভিড়ভাড়-গুলার আমার যোগ দিতে ইচ্ছে করে না। আমাদের বয়েসী লাখ লাখ ছেলে বেকার, যে-কোনো একটা চাকরি পেলে তারা লুফে নেবে—কাল রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রসেশান যাবে চাকরির অথবা বেকার ভাতার দাবিতে—সেই মিছিলে আমিও যাবো—কারণ ওদের সত্যিই চাকরির দরকার। কিন্তু আমি নিজে কোনো চাকরি চাই না।

—তুই তা হলে কি করবি?

—কি করবো, সেটা পরে ভেবে দেখবো! দাঁড়া, আমাদের বাড়ির জিনিসপত্রগুলো আগে শেষ হোক্!

—যাঃ, এই কি একটা জীবন না কি?

এ কথার কোনো উত্তর হয় না। দীপু তাই নিঃশব্দে হাসলো। অরূপ কেমন একটু অবাক হয়েছে। [illegible] সম্পর্কে তোর যা ধারণা তার সঙ্গে অন্য কারুর না মিললে সে শুধু অবাকই হয় না, [illegible] আমাদের [illegible]। তবে মানুষ সবাই জীবনটা আরও পরিষ্কার সুন্দর সহজ করে তুলতে চাইবে। সে জানে, মানুষ জিনিসপত্র আরও বাড়াতে চাইবে, আরও করতে চাইবে। ইচ্ছে করে কেউ বাড়ির জিনিসপত্র [illegible]। যে মেয়েকে ভালোবাসে তার সামনে একরকম নির্লজ্জের মতন বলতে পারে, বই বিক্রী করতে এসেছি! নিজের [illegible] বিক্রীর অপরাধ। কি ধরনের সংসার ওদের?

অরূপ বললো, আমি প্রোফেসার দাশগুপ্তকে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তো তোর খুব প্রশংসা করলেন!

—তুই কি আমাকে চাকরি দেবার আগে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়াও শুরু করেছিলি নাকি!

—না, না, সে জন্য নয়। কিন্তু প্রোফেসার দাশগুপ্ত তো সেই ব্যাপারে কিছু বললেন না! সেটা কি তুই আমাকে বানিয়ে বলেছিলি?

—কোন্ ব্যাপারটা?

—আমসেদপুরে আমার পথে তুই আমাকে যাসে যা বলেছিলি?

—ওঃ সেই সেই টাকা চুরির ব্যাপার?

না, বানাই নি, সত্যিই করেছিলাম। প্রোফেসার দাশগুপ্ত তোকে সে কথা বলেন নি—তার কারণ যে নিজে চোর সে অন্যদের চুরির প্রসঙ্গও তুলতে চায় না। তবে, তোকে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিচ্ছি, সেই একবারই শুধু—আর আমি জীবনে কখনো কিছু চুরি করিনি। আমার পক্ষে আর চুরি করা সম্ভব নয়।

খানিকটা বিদ্রূপের সুরেই অরূপ জিজ্ঞেস করলো, কেন? আর সম্ভব নয় কেন?

দীপু ঐ বিদ্রূপটা গায় মাখলো না। খানিকটা উদাসীন ভাবে বললো, আমার নার্ভ তেমন শক্ত নয়। আমি কোনো কথা বেশীক্ষণ গোপন রাখতে পারি না। যারা চোর তাদের নার্ভ নিশ্চয়ই খুব স্ট্রং—সারা জীবন একটা গোপনতা বয়ে বেড়ানো—সব সময় ঘাড়ের ওপর একটা দারুণ ভারী বোঝার মতন—আমি তো এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি, টাকাটা একবার বাক্সে রেখেছি, একবার প্যান্টের পকেটে, একবার ছাদের সিঁড়িতে একটা ছেঁড়া বালিশের মধ্যে—ওঃ সে একটা হরিব্ল্ এক্সপিরিয়েন্স। চুরির চেয়ে খুন করা অনেক সহজ। মানুষ খুন করলেও সব সময়ের জন্য এরকম—

—তুই কি খুন করেও দেখেছিস নাকি?

দীপু অরূপের চোখে চোখ রেখে খুব আস্তে বললো, না, আমি মানুষ খুন করিনি কখনো। কিন্তু আমি একজন খুনীকে চিনি। তাকে দেখলে মনে হয় না, সে একজন সাংঘাতিক অপরাধী। কিংবা সব সময় তার মধ্যে একটা পাপ বোধ রয়েছে। কিন্তু চোরদের দেখলেই বোঝা যায়।

—সে ধরা পড়েনি?

—না।

—সে এমনি সাধারণ লোকের মতন ঘুরে বেড়ায়? তুই জানিস সে খুন করেছে, আর কেউ জানে না?

—আরও দু'একজন জানে। কিন্তু কেউ ধরিয়ে দেয় নি।

—তা হয় কখনো? পুলিশ

দীপু ভুরু কুঁচকে কি যেন একটু চিন্তা করলো। তারপর বললো আমাদের পাড়াতেই থাকে লোকটা, তুই যদি চাস, তোকে একদিন দেখিয়ে দিতে পারি। আসল ব্যাপার কি জানিস্, তুই যত লোককে চিনিস—সারা জীবনে যত লোককে দেখেছিস—তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সাংঘাতিক চোর—দু'একজন খুনীও আছে নিশ্চয়ই—তুই ভালো করে লক্ষ্য করিস নি বলে বুঝতে পারিস নি। কিন্তু আমি আজকাল ওদের দেখলেই চিনতে পারি। যে-ছদ্মবেশেই থাকুক।

স্বপ্না দূর থেকে বললো, আপনাদের কথা শেষ হয়নি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ধরে গেল।

দীপু হাত তুলে বললো, আসছি। তারপর আবার অরূপকে বললো, তুই একদম বিশ্বাসই করতে পারছিস না যে প্রোফেসার দাশগুপ্ত নিজেই একজন চোর—কারণ উনি তোর বাবার বন্ধু। কিন্তু আমাদের বাবা-কাকা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব—এই কজন শুধু ভালো, আর বাকি সারা দেশটায় চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডা গিস্‌গিস করছে, এ কখনো হতে পারে?

—যাক্ গে, তুই তাহলে নিবি না চাকরি?

—না, ভাই। আমার ভালো লাগে না। আমি বেশ আছি! স্বপ্নাকে নিয়ে অরূপ গাড়িতে উঠলো। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, চাইবাসায় পরমেশকে চিঠি দিয়েছিস্?

দীপু বললো, না। তুই লিখে দিস একটা। আমার চিঠি লেখা হয়েই ওঠে না।

স্বপ্না শান্তাকে বললো, চলি, একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু! দীপাঞ্জন-বাবুর সঙ্গে

শান্তা বললো, হাঁ, যাবো। দীপুদার সঙ্গে না হোক, আমি একাই যাবো।

গাড়িটা চলে গেলে দীপু আর শান্তা প্রথম পরস্পরের দিকে খোলাখুলি ভাবে তাকালো। এতক্ষণ দাঁড়িয়েও শান্তার মুখে একটুও বিরক্তি নেই। একটা সতেজ টাটকা ভাব। এক ঝিলিক হেসে শান্তা বললো, আমাকে আর এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

—ইস্, এক ঘণ্টা না কাঁচকলা। আমি নটার সময় তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবো!

—না, অত দেরী করতে পারবো না

—খুব পারবে। আর একটু দাঁড়াও, আমি এই বই দুটোকে বিদায় করে দিয়ে আসি।

—আমার কাছে কিন্তু দশটা টাকা আছে।

—থাকুক। শুধু টাকার জন্যই না। বই দুটোকেই আসলে বিদায় করা দরকার।

একটু বাদেই দীপু খালি হাতে ফিরে এসে বললো, চলো—

(ক্রমশ)

অদূরের দিল্লী

জনসাধারণের মোলানা জাহিত চতুষ্পথে সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চতুরতা সমাধা করিয়া পুরকন্যাদের কেউ চুক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে খাল্দাচেতে আমাদের পৌঁছবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ নম্বর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড। কি ভারতীয়, কি অভারতীয় কোনো বে-সরকারি পুরুষের প্রেস-কনফারেন্সে এই নগরীনিয়ীতে কখনো এত সাংবাদিককে এক-সঙ্গে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। কনফারেন্স শেষে মুষ্টিমেয়ী দিশি-বিদেশী সাংবাদক-দের শ্রদ্ধাবনত বিনয় তাও অতুলনীয়।

দর্শক

সবশেষে একে একে সকলে বিদায় নিলেন।

লেকচার উনি কোনোকালেই দিতে পারেন না। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবার মানুষ নন। সব সময় শুধু কাজ। কাজ। আর অবিশ্রামভাবে কেবলই কাজ। সেই কাজ যা একমাত্র ওঁরই দ্বারা সম্ভব।

কথা যখন বলতেই হয় তখন তা উনি খুব স্পষ্ট করে বলেন। "অসত্যের সঙ্গে কোনোপ্রকার আপস করবো না, তার তোমরা আমায় মেরে ফ্যালো, তবু যা একান্ত সত্য বলে জানি তাই আমি বারম্বার বলব।"

উনি বলেন না প্রায় কিছুই। যখন বলেন তখন অম্লান করেই বলেন। উপরের কথাটা উনি বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে।

ওঁর বলা কথায়, ওঁর চিন্তাধারায় আর কাজেতে এতই অসম্ভব সামঞ্জস্য যে অবাক হতে হয়।

মহাশ্চর্য এক পুরুষ। ধীনিবেশ। বাক্যহীন। মৃত্যুভয়হীন। উপবাসব্রতধারী যখন ছিলেন তখন দেখলাম ওঁকে অত্যন্ত নিকট থেকে। সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে।

দেখে প্রথমটা আমার মগজ যেন কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

উপবাসব্রত যেদিন ভঙ্গ করলেন সেদিন চাপা উত্তেজনায় স্তম্ভিত ভীত সকলে স্বস্তির শ্বাস নিয়েছিলাম। দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসছিল। থেমে থেমে ফের নতুন করে

দম নিয়েছিলাম। এবার উনি দিল্লী ছাড়বেন। সেই দিল্লী যেখানে উনি কাচিত এবার এমন মানুষ দেখলেন যিনি দেশ এবং দেশবাসীদের কথা ভাবেন, যেখানে প্রায় প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থই শুধু দেখছেন, যেখানে ভ্রাতৃভাবের একান্ত অভাব, যেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রকাশটাই সবচেয়ে প্রথম নজরে পড়ে। লুকিয়ে ছাপিয়ে নয়, খোলাখুলি এ সব-ই উনি বললেন ৭ই অক্টোবরে ওঁর প্রেস-কনফারেন্সে। পাঁচ নম্বর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড। সেই ওঁর সাময়িক আস্তানায়।

দিল্লী ছেড়ে এক-কালের অতিশয় পরিচিত দেশটাকে এবার উনি ঘুরেফিরে একবারটি দেখবেন। যাদের উনি এককালে নিকট-বন্ধু বলে জানতেন তাদের অধিকাংশই বিদায় নিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে। নতুন দেশের নতুন মানুষ দেখবেন উনি নতুন পটভূমিতে। কিন্তু এরপর?

এই রাজধানী দিল্লীতে বসে এরপর যে কী তা বোধহয় বলা সম্ভব নয়। শুধু চেয়ে চেয়ে বুঝি তাকিয়ে দেখা। ওঁকে আজকে ফের চেয়ে চেয়ে দেখতে এলাম।

জনমনোহারী আঁকড়ানো নাজির পদ্মতীরে দেখতে এলাম যাঁর সঙ্গে বাইশ বছর আগে একদিন আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম; সেই বিশ্বাসঘাতকতায় ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল সেদিন।

সেদিন যাঁকে হিংস্র নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম সেই তাঁকে এখন দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখা।

বাইরে সিঁদুরবর্ণ প্রভাত। ভেতরে উনি।

সেই উনি আবার আমাদের কাছে। আমাদের আকুল ডাকে বুঝি সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

কোনো অভিমান?

বুক ভেঙে যায়। কি ভাবব কি লিখব কিছুই মগজে আসে না। ওঁর সামনে দর্শনাভিলাষী যত নরনারী তারা সকলেই স্তব্ধ ম্রিয়মান।

আমাদের সবার স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কিন্তু ওঁর স্বপ্নের কণামাত্রও তো পূর্ণ হয়নি। জন্মাবধি যা উনি প্রাণপণে চেয়ে এসেছেন তা বুঝি ইহজীবনে অপ্রাপ্য রয়ে গেল! তবু ইচ্ছে করলে এরই মধ্যে নকল কোন্ সিংহাসনেই বা না উনি বসতে পারতেন! তা সত্ত্বেও ওঁর একমাত্র আসন মাটিতে আমাদের মতন সবার সঙ্গে।

পাঁচ নম্বর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের যে বাংলোয় উনি এসে উঠেছেন তার প্রবেশ-দ্বারে আরো আরো অনেক দর্শনার্থীর নিঃশব্দ ভীড়। সকলেই উৎসুক নেত্রে একই দিকে তাকিয়ে।

ভেতরে কে যেন কাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের কী খবর?'

তা কেমন করে যেন শুনতে পেয়ে ধীর ও শান্ত স্মিতমুখে দীর্ঘাঙ্গ উনি জবুথবু-

॥ ২ ॥

আপনার বহুল প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্র' প্রসঙ্গে অনেকেই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। আমিও তাঁদের একজন হতে চাই। আমি বাংলা দেশেরই এক পল্লীতে বাস করি। যদিও কালের উন্নতিতে শহুরে আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ ছোঁয়া এই গ্রামটিতে লেগেছে তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি একান্ত সার্থক পল্লীগ্রাম। গ্রামটিকে আরও সার্থক করে তুলেছে যখন লেখক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার চালচিত্র' পড়ছি—এত বেশী সত্যি করে এখানকার প্রতিটি মানুষকে আর অনুষঙ্গের সার্থক রূপ চিত্রায়িত হয়েছে 'বাংলার চালচিত্রে'। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির পরিচয় লেখক যা দিয়েছেন তা শুধু সার্থকই নয় অনবদ্যকে সম্পূর্ণ করেছে।

'সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি', 'কয়েদীটার তিন', 'তোরেমবেরেন বাঁশের আটন', 'বাসের নাম লক্ষ্মী' পড়তে পড়তে গ্রাম বাংলার সঙ্গে ছিন্নসূত্র মেলাতে থাকি। (২৭শে ভাদ্র, ৪৬ সংখ্যায়) স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় 'সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি' প্রসঙ্গে আলোচনা বিভাগে যে কথাটি বলেছেন 'মন জানার কোন

ক্ষেত্রে নক ভিত্তি থেকে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু গ্রামে এই খাল খানায় জলে বহু মানুষের সর্বনাশ হয়েছে এমন নজীর বহু আছে। লাপ্তুতে চলতি সূত্রের যে প্রবাদগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন সেগুলি সুন্দর এবং সাবলীল। 'বিষ খাইয়ে শত্রু মেরে তার চামড়া নেওয়ার লোভের কথা আমরা গ্রামে প্রায়ই শুনে থাকি'। এটা সত্যিই খুব সার্থক উক্তি হয়েছে বলে মনে করি। আজও ঐ কথাগুলি গ্রামের অধিকাংশ ঘরে শুনতে পাওয়া যায়। 'খানের নাম লক্ষ্মীর' এক জায়গায় লেখক লিখেছেন 'সারাদিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর, পাকা রাস্তার মোড়ে চা দোকানগুলোতে আড্ডা দেয় চাষীবাসীরা। দোকানে রেডিওও বাজে। কেউ কেউ খবরের কাগজ দেখে, গাঁজা বিড়ি খায়।' এই কথাটির সার্থক রূপ সেদিন লক্ষ্য করলাম রাস্তা দিয়ে আসতে চায়ের দোকানটিতে, আর তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল 'বাংলার চালচিত্র'।

নিভৃত পল্লীর একটি গরীব চাষীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস, সাধ-স্বপ্নের কথা, এবং গ্রাম বাংলার মানুষের যে চিত্র লেখক উপহার দিচ্ছেন তা গৌরবের দাবি রাখে। বাংলার চালচিত্রে লেখকের সঙ্গে যে গ্রাম বাংলার নাড়ীর সম্পর্ক আছে বাংলার চালচিত্র পড়লেই বোঝা যায়। স্বপন দিয়ে ঘেরা বাংলার সার্থক চিত্ররূপ হচ্ছে 'বাংলার চালচিত্র'। দারিদ্র্য কঠোরে কোমলের সংমিশ্রণে বাংলার গ্রামের যে ছবি 'বাংলার চালচিত্রে' প্রকাশ পেয়েছে এর জন্য লেখক এবং সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চঞ্চল সিংহ রায়
[illegible], হুগলী

॥ ৩ ॥

প্রথমেই ধন্যবাদ দেওয়া ভালো 'হিজলের ফুলভূমি' নিয়ে জনাব আবদুল জব্বার এবং জনাব মুস্তাফা সিরাজ সাহেব যে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এ অধম তাতে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক। আমি সিরাজ সাহেবের কয়েকটি বাক্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করতে চাই।

তিনি 'দেশ'-এ (৪৮ সংখ্যা) আলোচনা বিভাগে লিখেছেন 'কবি জীবনানন্দ দাশও কবিতায় 'দূরের হিজলে' কথাটি ব্যবহার করেছেন একই অর্থে।' (অর্থাৎ 'নাবাল মাঠ—যা সহজেই জলে ডুবে যায়' অর্থে।)

কবি জীবনানন্দ দাশ বরিশালের মানুষ। যতদূর জানি বরিশালে 'হিজল' বলতে ছোট বড় একরকমের গাছকেই বোঝায় যা সাধারণত জলার ধারে জন্মে। জীবনানন্দের কাছে 'হিজলের' কথায় হিজল বন অর্থেই হয়েছে মনে হয়। সিরাজ সাহেব আরো লিখেছেন 'হিজল ফুলের মালা গাঁথা সম্ভব না হলেও পুরনো গানে তার মালার দেখা মেলে।' বরিশালের হিজল গাছ এ অর্থেই বেশ পরিচিত। সে গাছে লাল রঙের যে ফুল হয় তাতে কিন্তু দিব্যি মালা গাঁথা যায়।

'হিজলের ফুলভূমি' অর্থে সিরাজ সাহেব যা বলতে চেয়েছেন তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই।

জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে যে হিজলের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আশ্চর্য রোমান্টিকতা আছে সন্দেহ নেই। সে হিজলের বাস্তব বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হবে মনে করি।

গোপাল দাস.
হুগলী

অদূরের দিল্লী

৪ঠা অক্টোবরের দেশ পত্রিকায় 'অদূরের দিল্লী' সম্পর্কে শ্রীশিশিরকুমার দাসের পত্রটি পড়লাম। পত্রলেখকের সংযমী ভাষায় অধ্যাপক-সুলভ দক্ষতা বাহবার যোগ্য।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই, এটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অন্যতম শাখা মাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা। তথাপি, অধ্যাপকগণ স্বকৃত রচনায় বা গ্রন্থে 'অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ' লিখে থাকেন। বহু নামী জীবিত অধ্যাপকের নাম এ প্রসঙ্গে করা চলে। 'লেকচারার', 'রীডার', 'প্রফেসর' সবাই তো অধ্যাপকরূপে পরিচিত অনেক রাজ্যেই। এটা কি মারাত্মক অন্যায়? এই জাতীয় ত্রুটির জন্য শ্রীদাসের উষ্মাবহ গোসা তথা জানালেন ভালই লাগলো!

৩১।৮।৬৯ তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস-এর (দিল্লী) একটি সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল।

New Delhi, Aug. 30.—Kerala Club will on Monday hold a reception for the avant-garde Malayalam poet Madhavan Namboodri Paloor, is also an airline coach driver.

Delhi University's Malayalam Department's head will read a paper on the work of the 36-year old poet who had scarcely any formal schooling.

'দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালায়ালাম বিভাগের প্রধান' যদি শ্রীনরবেশ লিখতেন তবে তো শ্রীদাসের হাতে তাঁর মাথা কাটতো! শুধু 'মালায়ালাম বিভাগ' লিখেই এই দশা! কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রীদাসের প্রতিবাদ-পত্র এখনও ঐ সংবাদপত্রে বেরোয় নি কিন্তু!

দ্বিতীয়ত, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি শ্রীমাধবন নিমন্ত্রিত হননি, এই সংবাদটি শ্রীদাস পরিবেশন করেছেন। এই সভা অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে তার দায় কি শ্রীনরবেশের? তিনি লিখেছেন,— 'দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালায়ালাম বিভাগের অধ্যাপক ওঁর কবিতা নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করবেন। সেখানে কবি নিমন্ত্রিত।" যিনি এই কবির কবিতার ওপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই কবির কাব্য পরিচয় উদ্ঘাটিত করলে কি তা অবাস্তব হবে? শ্রীদাস প্রশ্ন করেছেন, "কোন্ ক্লাসে এই আলোচনা হবে? মালায়ালাম ভাষায় যাঁরা বর্ণপরিচয় শুরু করবেন, সেই ক্লাসে?" শ্রীদাস কি মনে করেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হন, তাঁরা নাবালক শ্রেণীর? এঁদের পাঠক্রম কি বর্ণ-পরিচয়েই শেষ? তাঁর হাস্যকর উক্তির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অথ 'নিমন্ত্রণ'—প্রসঙ্গ। এই সম্পর্কে ৩রা অক্টোবরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার ৭৪৮ পৃষ্ঠায় একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালায়ালাম বিভাগ তাঁর ওপর (শ্রী মাধবনের) একটি বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন গত পয়লা সেপ্টেম্বর। আলোচনাটি সীমাবদ্ধ থাকে তাঁর কবিতার আঙ্গিক, বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও সাম্প্রতিক কাব্যান্দোলনে তাঁর ভূমিকার ওপর। কেরালা ক্লাব ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সম্মানে ও অভ্যর্থনায় বিশেষ অনুষ্ঠানের।"

হায় হতভাগ্য শ্রীনরবেশ!

তৃতীয়ত, শ্রীনরবেশ বলতে চেয়েছেন শ্রীমাধবনের মত তরুণ কবিদের বাংলা বিভাগে আমন্ত্রণ করলে তা বিশেষ প্রশংসনীয় হবে। শ্রীদাস বলেছেন, তা করা হয়ে থাকে। তিনি শ্রীকুরুপ, শ্রীউমাশংকর যোশী, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু এঁরা তো প্রখ্যাত প্রবীণ কবি। তবুও সরকারী বা বেসরকারী পুরস্কারের 'আইডেন্টিটি কার্ড' না পাওয়া পর্যন্ত কি তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল? তরুণ কবিরা? তাঁরা প্রবীণ বা পুরস্কৃত না হলে কবে ডাক পড়বে? এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য শ্রীনরবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সৎ-চেতনাটিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন মাত্র এবং এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

শ্রীদাস লিখেছেন, "নরবেশ মহোদয়ের রচনার অন্তঃসারশূন্যতা, অপাঠ্য ভাষা ও নাকামির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম।" এ নিতান্তই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক-প্রবরের ব্যক্তিগত রুচির কথা। এই রুচিবোধ এবং তার প্রকাশকে বাহবা জানাতে ইচ্ছা হয়! তবে, দিল্লীর প্রাণ-স্পন্দন এই 'অদূরের দিল্লী'-তে যথার্থই সোচ্চার, তাই, এত কথা।

সুধাংশুপ্রকাশ সামন্ত
নতুনদিল্লী-১

পূজো সংখ্যায় অনুপস্থিত

নতুন নতুন পূজো সংখ্যাগুলোর টাটকা গন্ধ, এখন কিছুদিন বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা "পুজো সংখ্যা" ছাড়া অন্য কিছুতে মন দেবেন না। যারা বাইরে যাচ্ছেন, পাড়ি দিচ্ছেন দূরে পাল্লার ট্রেনে, তাঁদের সঙ্গী হবে একটি বা একাধিক পুজো সংখ্যা, যাঁরা কোথাও যাবেন না, তাঁদেরও বালিশের পাশে পাতা মোড়া অবস্থায় পড়ে থাকবে ওগুলো, অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলবে এখন, ঘুম এসে গেলে ওর ওপরেই মাথা পড়বে। দু' একখানা পূজো সংখ্যা আকারে এত বড় হয়েছে এবার যে সেগুলো অনায়াসেই বালিশ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পুজো সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্য সংবাদ এখন কানে আসবে বলে মনে হয় না। আমিও পুজো সংখ্যা পড়ছি। [illegible] সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে, [illegible] অনুপস্থিতদের কথা মনে পড়ছে, তাঁদের সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক।

আমি যখন থেকে পূজো-সংখ্যা পড়া শুরু করেছি, তার অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র গত। যদিও শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের দু' একটি গল্প [illegible] পূজো সংখ্যা [illegible], কিন্তু সে সংখ্যা আমি দেখিনি। [illegible] পুজো সংখ্যার [illegible] অনেক [illegible] সংখ্যা [illegible] লেখক—[illegible] রাজশেখর [illegible] নতুন নতুন [illegible] কিছু [illegible] বসুর মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, কিন্তু তাঁর অভাববোধ [illegible] পূজো সংখ্যাগুলি [illegible] নতুন করে [illegible] এখনও প্রথম রচনাটি [illegible] করতে পারেনি। কিন্তু রাজশেখর বসু, জীবিত থাকতে সে প্রশ্নই উঠতো না। তার চেয়েও দুঃখের বিষয়, রাজশেখর বসুর মতন অম্ল-মধুর রসের সাহিত্য রচনায় এখন আর কোনো লেখককে তেমন আগ্রহী দেখা যায় না। অনেকগুলো পত্রিকাতেই, একটাও সরস হাস্যের রচনা নেই, সবই গোমড়া মুখে দীর্ঘশ্বাস লেখা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কিন্তু এখনও তাঁদের অভাব বেশ টের পাওয়া যায়। যদিও এঁদের দু'জনের মৃত্যু অকালমৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত, তবু, যে-কারণেই হোক এঁদের মৃত্যুর আগের দু' এক বছরের লেখা তেমন দানা বাঁধতো না। "আরণ্যক" বা "পথের পাঁচালী"র লেখককে শেষ দিকে তেমন খুঁজে পাওয়া যেত না, যেমন "পদ্মানদীর মাঝি" "জননী", বা "দর্পণে"র লেখককে শেষ দিকে চিনতে বেশ কষ্ট হতো। তা হলেও, এ কথা ঠিক, এঁদের দু'জনের যে-কোনো লেখার দু' এক লাইন পড়লেই বোঝা যেত, মহৎ লেখকের রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিকের অনেক লেখাই খণ্ড ও অসম্পূর্ণ ধরনের হলেও "[illegible] প্রহরী" বা "[illegible]"-এর মতন মূল্যবান গল্প লিখেছিলেন মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে।

আর একজন লেখকের অনুপস্থিতি আমি নিজে অত্যন্ত অনুভব করি এখনো। সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথ ভাদুড়ীও শেষ দিকে বাংলা [illegible] হাস্যরসের গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন, সে দিক থেকে তিনি রাজশেখরের অভাব অনেকখানি পূরণ করেছিলেন—তা ছাড়াও সতীনাথ ভাদুড়ীর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের গল্পও ছিল পুজো সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ। সতীনাথ ছিলেন সেই জাতের লেখক—যাঁর কোনো লেখাই নিম্ন মানের নয়। আমি কখনও তাঁর লেখা পড়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইনি। (প্রসঙ্গত বলতে হয়, শিশু সাহিত্যের হাস্যরস সম্রাট শিবরাম চক্রবর্তী বড়দের জন্য লেখা কেন মনোযোগ দিয়ে লেখেন না—এ আমাদের একটি অভিযোগ। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রত্যেকটি ছোট রচনাতেই চমৎকার সব রসিকতা থাকে—কিন্তু তাঁর প্রায় সব কটি বড় গল্প—উপন্যাসই করুণ রসের। 'শবনম' বা 'দু' হারা' পড়তে পড়তে আমি কান্না সামলাতে পারি নি—কিন্তু কৌতুক [illegible] পাওয়া যায় একমাত্র সাহিত্যেই। সৈয়দ মুজতবা আলী ও বছর-দেড়েক কিছু লেখেন নি।)

অন্যান্যদের মধ্যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ—এঁদের রচনা অনেক কম। আর একজন প্রধান আকর্ষণীয় লেখক, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবার লিখেছেন নাম মাত্র। নরেন্দ্র দেব অনেকদিন বাংলা রচনা ছেড়ে দিয়েছেন, তবু মাঝে মধ্যে পুজো সংখ্যায় তাঁর রচনা দেখা যেত—এখন আর তাও যায় না। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কেও দু' এক বছর আগে বহু পত্রিকায় দেখা যেত, এখন তিনি লেখা কমিয়ে দিয়েছেন। জীবনানন্দের জীবৎকালে অপ্রকাশিত রচনা দু' এক বছর আগেও বেরুচ্ছিল, এখন বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে। ফুরোবে না রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা আরও বহু বছর ধরে বেরুবে, আশা করা যায়।

সনাতন পাঠক

এবং লোচন পণ্ডিত বাংলার লোক ছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। গ্রন্থে বলা হয়েছে "খেয়ালের মন্দ পদ বিন্যাসের রচনাকে সাহিত্য দর্পণ কর্তা নাটারীতি বলেছেন"। সাহিত্য দর্পণে এই রকম কোনও উক্তি নেই এবং মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা না থাকলে কোনও মন্তব্য না করা যুক্তিযুক্ত। এই ধরনের বহু ভ্রান্ত উক্তি গ্রন্থের নানা স্থানেই ছড়িয়ে রয়েছে।

গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসটি চিত্তাকর্ষক। এই অধ্যায়টি বিষ্ণুপুর ঘরানার পরিচয় এবং গায়কী এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থ পাঠে দু'টি বিষয়েই উত্তম ধারণা করবার অবকাশ হবে। ১৪০/৬৯

শারদ-সাহিত্য

শারদীয়া কিশোর ভারতী—১৩৭৬ সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮।০ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

কিশোরদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আয়ু মাত্র এক বৎসর, এরই মধ্যে

বিমারের এখন চলেছে নিখুঁত রেশ। এই জন্য উন্মাদনার প্রান্ত দিচ্ছে চার দেওয়ালের মধ্যে খরচুনো খেলাগুলো, প্রায় বারাবাধি ওই পরিবেশটার বেশি করে মদত দিচ্ছে টেবল টেনিস খেলারায়। কলকাতার মেট্রো-পলিটান, ইনকাম ট্যাক্স, কাশিমবাজার এবং রাজ্য প্রতিযোগিতায় দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে ছোট বড় প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। এইসব প্রতি-দ্বন্দ্বিতার বল, ব্যাট, বোর্ড, পয়েন্ট, সেট, গেম খেলোয়াড়, দর্শক, আম্পায়ার প্রভৃতি উপকরণ ও উপাদের প্রত্যেকের ভূমিকার উপর আলাপ করে আলো ফেললে কাহিনীর স্তূপ পাহাড়ের রূপ নেবে। তাই সব জড়িয়ে যে মোটামুটি ধারণায় পৌঁছতে পেরেছি সেই কথাতেই পরের কথাগুলো সাজাচ্ছি।

বড় আসর মেট্রোপলিটানের ষষ্ঠ অনুষ্ঠানে অন্যবারের মত হাল্‌ফিল ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড়দের একটা অংশ এবারও হাজির থেকে প্রতিযোগিতার জেল্লা বাড়িয়েছে। পরবর্তী এরই পরে ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের টেবলে টেনিস খেলার প্রথম বড় প্রচেষ্টা বেশ ভালো ভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছে। কাশিমবাজারের প্রতিযোগিতায় সেই বাঁধা গৎ-এর সুর এবারও বজায় ছিল। মফঃ-স্বলের আওতায় প্রথম রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা আগস্ট মাসে খাবরের গোলমালে মাঝ পথে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সম্পাদনে বাহবা আছে বৈকি।

তবে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এর মেট্রোপলিটানের খেলায় খেলায় সময় ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড়েরা স্ফূর্তির সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখলেও বাইরে এসে যে কথাগুলি বলেছে তার দ্বারা বোঝায়—"ভারতীয় টেবল টেনিসের আবহাওয়া তেমন সুবিধার নয়। খেলার জন্যে যথাযথ উপকরণের অভাব রয়েছে। অন্য দেশের মত এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখানোর তেমন শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের অভাব যা আছে তা নিয়ে একটা কিছু করার দিকে কর্মকর্তাদের তেমন গা নেই।" মধ্যবয়সী খেলোয়াড় রতীশ চাচাদের মুখে কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে তেমন আশা-ব্যঞ্জক কথা পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেছে পরবর্তী টুর্নামেন্টের খেলায়। মেয়ে পুরুষ দুই বিভাগেই খেলোয়াড়দের খেলার ধরন ধারনে ভারত বিখ্যাত হওয়ার কোন আভাষই নেই। মেয়েদের মধ্যে রূপা মুখার্জির দাপট এখনো এ-রাজ্যে সবচেয়ে বেশী। তবে তাকে অনুসরণ করে উঠতি খেলোয়াড় ইন্দু পুরী যেভাবে এগোচ্ছে তাতে সব কিছু ঠিক ঠিক এগুলো যে কিছুদিনের মধ্যে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ কথাটির অপমর্যাদা মেনে কোন খেলোয়াড়ই ধারাবাহিক ভাবে নিজের আধিপত্য টেঁকসই করাতে পারছে না। কম বয়সীদের চেয়ে যারা বয়সের ভারে কিছুটা ভারাক্রান্ত তারা কিন্তু এখনো তরুণ তরুণীদের ভয়ের কারণ। বর্ষীয়সী মহিলা শান্তি ঘোষের কথাই ধরা যাক। এ বছর নানা প্রতি-যোগিতায় সেমিফাইনালে খেলা ছাড়াও রাজ্য টেবল টেনিসের ফাইন্যাল খেলার ও'র ধৈর্য ও শ্রমশীলতার সঙ্গে হাতের নৈপুণ্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষদের মধ্যে সমীর চ্যাটার্জির তো কথাই নেই। কবেকার খেলোয়াড় সমীর এখনো যে কোন উঠতি খেলোয়াড়ের ত্রাসের কারণ। সরোজ ঘোষ, রণেন ঘোষ বয়সের ভার উপেক্ষা করে তরুণদের সঙ্গে সমানে পাল্লা টানছেন। এ বছরের নানা প্রতিযোগিতায় বর্ষীয়ানদের এই বিক্রম দেখে এই কথাই মনে হয় যে, বাংলার টেবল টেনিসে নতুন যুগ আসতে এখনো দেরী আছে। কিংবা বলা যায় নাচ্চু মুখার্জি, ওমিত মিত্র প্রভৃতিরা যে যুগ আনতে যাচ্ছিল তা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটি আশার কথা দুর্গাপুরে আয়োজিত রাজ্য টেবল টেনিসে কয়েকটি জেলার ছেলে খেলতে নেমেছিল। খেলার দিক দিয়ে তারা কোন সাড়া জাগাতে না পারলেও তাদের অংশ গ্রহণই টেবল টেনিসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

আবার এ কথাও সত্যি, এই জনপ্রিয়তাও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য খেলার উপকরণ এবং পরিবেশের অভাবে। মফঃস্বলের খুব কম স্কুলে এবং ক্লাবে টেবিল টেনিস খেলার সুযোগ আছে। তার উপর এখন বল ও ব্যাটের দামও খুব বেশী। সুতরাং, খেলাটিকে জনপ্রিয় করতে হলে রাজ্য-সরকারের অর্থাৎ স্পোর্টস কাউন্সিলের যথেষ্ট সাহায্য প্রয়োজন।

গ্রীন টেবল

বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল বুলেটিন 'গ্রীন টেবল'-এর প্রথম সংখ্যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। টেবল টেনিস খেলার জন-প্রিয়তা প্রসার, প্রচার এবং সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজীতে প্রকাশিত এই পত্রিকা রাজ্য সংস্থার নতুন এবং প্রথম উদ্যম।

মুখবন্ধে পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক শ্রী জি এন ঘোষ টেবল টেনিস খেলার সংবাদ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ আহ্বান করে বলেছেন, জেলার রাজ্যের ভারতের এবং পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের টেবিল টেনিসের খবরাখবর, গঠনমূলক কাজকর্ম এবং শিক্ষা ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হল।

প্রথম সংখ্যাটি তথ্যে এবং তথ্যে পূর্ণ। বিশ্ব টেবল টেনিসের নানা খবরে সমৃদ্ধ। রাজ্যের খবরাখবর তো আছেই। শ্রীঅসিত মুখার্জি লিখিত 'এ পিপ ইন্‌টু দি পাস্ট' এবং বাংলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন শ্রীসমীর চ্যাটার্জি লিখিত 'ফাইভ লুমিনাস স্টারস' সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ সুখপাঠ্য রচনা। শুধু সাহিত্য রসই নয়, মহত্তের মহত্ত্বের বিশ্লেষণে সমীর চ্যাটার্জির অন্তর্দৃষ্টি সত্যিই প্রশংসনীয়। বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্রের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিশ্ব কাপ ফুটবল

পাঁজির মতে, আসছে সত্তরের একুশ জুন তারিখে বেলা হবে দীর্ঘস্থায়ী। ওই দিনটা এমনিতেই বেশ উষ্ণ বোধ হবে। তবে যে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শক মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে বসে সেদিন জুলে রিমে কাপের ফাইনাল দেখবে, তাদের অবস্থা হবে উষ্ণতম।

ওখানে খেলার যোগ্যতা পাওয়ার জন্যে প্রাথমিক রাউন্ডের খেলাগুলি এখন প্রায় শেষ মুখে। যারা খেলবে তাদের মধ্যে ইংল্যান্ড (গতবারের বিজয়ী), মেক্সিকো ও বেলজিয়ামের নাম নিশ্চিতের স্বর্ণে। ব্রাজিলও তাদের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিতে এনে ফেলেছে। অনেকেই আশা করে, ফাইনালে আটবার ও বারবার বিশ্ব-কাপ বিজয়ী ওই ব্রাজিল এবং ছেনাটির সেরা দল ইংল্যান্ডকে খেলতে দেখা যাবে। উরুগুয়ে ও পেরু দুটি টিমই ব্রাজিলের সঙ্গে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। তবে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের পিছনে এখনো সংশয়ের খাঁড়া ঝুলছে। আয়ারল্যান্ড টিম তুরস্ককে দুবার হারিয়ে খানিকটা আশান্বিত হলেও তাদের আসল ভয় রাশিয়ার বিরুদ্ধে এখনো দুটি খেলা বাকি। ধরে নেওয়া যেতে পারে স্কটল্যান্ড পশ্চিম জার্মানীকে হারাবে। কিন্তু সে চেষ্টা কসরতের কামাই থাকলে চলবে না।

ফাইনাল পুলে যাবে ১৬টি টিম। এই ১৬টি দল ৪ ভাগ হয়ে প্রথমে রাউন্ড রবিন ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গ্রুপের প্রথম দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। এর পরেই শুরু হবে যে হারবে সেই বসবে প্রথায় নক আউট খেলা।

একলব্য

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

ব্যাডমিণ্টনের আইনের মূল ধারা ২৩টি। তা ছাড়া আম্পায়ারের করণীয় ও কর্তব্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সুপরিকল্পিত আইনের অংশ হিসাবে স্বীকৃত। মূল আইনের বয়ানের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য কয়েকটি ভাষ্যও আইনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।

ভাষ্য

১। সার্ভিস করার জন্য এবং সার্ভিস রিসিভ করার জন্য প্রস্তুত হবার পর সার্ভারের কোনরকমের অঙ্গসঞ্চালন বা আচরণে যদি সার্ভিসের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় তবে সে অঙ্গসঞ্চালন বা আচরণ ভাঁওতা দেবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য হবে। (আইন ১৪ 'ডি' দেখুন)

২। ১৪ 'এইচ' ধারা অনুযায়ী র‍্যাকেটের একটি পরিষ্কার হিটে যদি সাটল চালিত না হয় তবে ফল্ট হবে। কিন্তু র‍্যাকেটের যে-কোন অংশ দিয়ে যদি বেস এবং পালকে একটি পরিষ্কার হিট করে সাটল চালনা করা হয় তবে ফল্ট হবে না।

৩। ১৪ 'এফ' আইনের ব্যতিক্রম ছাড়া যদি র‍্যাকেট বা দেহের কোন অংশ কোন-ভাবে প্রতিপক্ষের কোর্টে অনুপ্রবেশ করে তবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের বাধা সৃষ্টি বলে ধরা হবে। (১৪ 'জে' আইনও দ্রষ্টব্য)

৪। ব্যাডমিণ্টন হলের বা ঘরের কাঠামোর কোন অংশে সাটল লাগার ব্যাপারে স্থানীয় ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় ব্যাডমিণ্টন সংস্থার অনুমোদনসাপেক্ষ আইনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপধারা যোগ করতে পারেন।

আম্পায়ারদের প্রতি সুপারিশ

১। খুব ভালভাবে ব্যাডমিণ্টন খেলার আইনকানুন জেনে নিন।

২। খেলার ঘটনায় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অবশ্য আইনঘটিত কোন কারণে খেলোয়াড় রেফারির কাছে আবেদন করতে পারেন।

৩। লাইন্সম্যানের নিজের লাইনের ঘটনায় লাইন্সম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত নাকচ করতে পারেন না। যদি লাইন্সম্যানের দৃষ্টি অবরোধ হয় এবং ঘটনাটি আম্পায়ারের চোখে পড়ে তখন আম্পায়ার সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। অন্যথায় 'লেট' ডেকে আবার খেলা আরম্ভ করা উচিত।

৪। যেখানে সার্ভিস জাজ নিয়োগ করা হবে সেখানে সার্ভিসের সমস্ত ঘটনায় সার্ভিস জাজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (২৭ নম্বর বিধানে এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে) আম্পায়ারের কর্তব্য হবে বিশেষ-ভাবে রিসিভারের প্রতি নজর রাখা (এ সম্পর্কেও ২২ নম্বর বিধানে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে)।

৫। সমস্ত ঘোষণা, পয়েণ্ট গণনা এবং সিদ্ধান্তের কথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে এবং পরিষ্কার উচ্চারণে এমনভাবে বলতে হবে যে, খেলোয়াড় ও দর্শকরা যেন পরিষ্কার-ভাবে শুনতে পান।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'পূজা' উপলক্ষে এক সপ্তাহ ছুটি থাকার দরুণ আগামী ২৫ অক্টোবর 'দেশ' প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১ নভেম্বর।

পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে চটপট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। যদি ভুল হয় সে ভুল স্বীকার করবেন এবং ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ভুল সংশোধন করবেন।
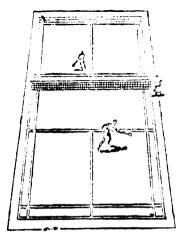
৬। যদি কোন সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব না হয় তবে কি কারণে সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব হল না তা বলে 'লেট'-এর নির্দেশ দেবেন। কখনো দর্শকদের কাছে কিছু জানতে চাইবেন না। দর্শকদের মন্তব্যে কান দেবেন না। অর্থাৎ তাঁদের মন্তব্যে প্রভাবিত হবেন না।

ব্যাডমিণ্টন খেলায় আম্পায়ারের অবস্থান হবে নেটের ঠিক পাশে উঁচু চেয়ারে

৭। যেসব লাইনের জন্য লাইন্সম্যান থাকবেন না সেসব লাইনের ঘটনায় আম্পায়ারেরই দায়িত্ব।

৮। দৃঢ়তার সঙ্গে আম্পায়ারের খেলা আয়ত্তে রাখা কর্তব্য। কিন্তু আম্পায়ার কেউকেটা ভাব দেখাবেন না। আবার আম্পায়ার স্বচ্ছন্দ গতিতে খেলা চালিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আইন পালন করতে গিয়ে অযথা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। কারণ, খেলা খেলোয়াড়দেরই জন্য।

৯। আইন ভঙ্গ হয়েছে কি হয়নি এই বিষয়ে আম্পায়ার বা সার্ভিস জাজের মনে সন্দেহের উদয় হলে 'ফল্ট' ডাকা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে খেলাকে নিজের গতিতেই চলতে দেওয়া উচিত।

খেলা আরম্ভের আগে

১০। রেফারির কাছ থেকে স্কোর প্যাড সংগ্রহ করে স্কোর প্যাডে নাম ইত্যাদির ঘর পূরণ করুন।

১১। নেটের উচ্চতা ঠিক আছে কিনা মেপে দেখে নিন। দেখে নিন নেটের পোস্ট লাইনের উপর আছে তো। নেটের ফিতে ঠিকভাবে খাটানো হয়েছে কিনা তাও লক্ষ করুন (আইন ২ ও ৩)।

১২। লাইন্সম্যান ও সার্ভিস জাজ যথাযথ স্থানে অবস্থান করছেন এবং নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা অবহিত আছেন সেটা নিজে জেনে নিন। (লাইন্সম্যান এবং 'সার্ভিস জাজ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৩। ৪ নম্বর আইন অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষিত সাটল হাতের কাছে আছে কিনা সে বিষয়ে অবহিত হন। খেলার মাঝে যাতে অযথা সময় নষ্ট না হয় সে উদ্দেশ্যে এটা জেনে নেওয়া দরকার।

যদি সাটল সম্পর্কে খেলোয়াড়রা একমত না হন তবে আম্পায়ারের সাটল পরীক্ষা করা উচিত। অথবা প্রতিযোগিতার খেলায় রেফারির উপর ব্যাপারটি ছেড়ে দিন। কিংবা ম্যাচের ব্যাপারে সাটল পরীক্ষার ভার ছেড়ে দিন অধিনায়ক অথবা রেফারির উপর। পরীক্ষার দ্বারা যদি সাটল একবার অনুমোদিত হয় তবে সে সাটলের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সেই সাটল দিয়ে খেলা চলবে, এটা জেনে রাখুন।

মুকুল

অরণ্যদেব ✿ লী ফক

'ইতিহাসেই আছে যে, প্রাচীন মায়ারা এক আশ্চর্য সভ্যতার পত্তন করেছিল। সাত শো বছর তাদের কোনও যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়নি।

'তারপর উত্তর থেকে এল আক্রমণকারীরা। শোখান মুদ্রা---।'

'শোখান নরবলি!'
!

'ক্যারিবোকেও তারা বলি দিতে যাচ্ছিল। ঘাতক প্রস্তুত। এমন সময় হঠাৎ---'
2/23

ক্র্যাক্!

সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমেরিকা-মহাদেশে এই প্রথম গুলির শব্দ শোনা গেল!
!
'ব্যাপার দেখে সবাই স্তম্ভিত।'
??!!?!!

'কিটের মতন মানুষ তারা আগে কখনও দেখেনি---'
?!
!!

'তারা কিংবদন্তী শুনেছিল, একদিন এক স্বর্ণকেশ দেবতা তাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন---'
বেঁচে আছো ক্যারিবো?
নিশ্চয়ই!

'কিংবদন্তীর কথা তো জানতেন না, কিট্‌ তখন তাই পালাতে পারলে বাঁচেন...'
তুমি এ-সব কথা কী করে জানলে?

আমাদের বংশ-পত্রিকায় লেখা আছে।
সে কথা আমিও বিশ্বাস করি। গল্পের বাকীটা এবার বলো।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

শরৎচন্দ্রের "অরক্ষণীয়া" অবলম্বনে তৈরি "মা ও মেয়ে" (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী

মন নিয়ে

সিনেমার গল্পের সাহিত্যিকরা (যতই তাঁরা জনপ্রিয় হোন না কেন) সাধারণত গম্ভীর হন, পরনে জহর কোট সমেত একটা পাঞ্জাবি দেখা যায়। "মন নিয়ে"-র (এস এম ফিল্মস) সাহিত্যিক-নায়ক অমিতাভ একেবারে উল্টো। সে নাম-করা ঔপন্যাসিক তো বটেই, তার উপর শিল্পপতি। এবং সুগায়ক। অমিতাভ বড় ব্যবসাও যেমন চালায়, তেমনি একটার পর একটা উপন্যাসও লেখে। সে যে সুদর্শন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন বাস্তব-দুর্লভ নায়ক যে গল্পে তাতে বাস্তবের স্পর্শ বিশেষ আশা করা উচিত নয়। ছবিতে প্রথমেই দেখানো হয়েছে অমিতাভর লেখা একটি উপন্যাস "মন নিয়ে" যা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ট্রেনে বসে পাঠ করছে নায়িকা সুপর্ণা।

গল্পটি ঐ নায়ক অমিতাভ এবং সুপর্ণা ও অপর্ণাকে (যমজ বোন) নিয়ে। দুই বোনের চরিত্র দুরকম হতে বাধ্য। সুপর্ণা যদি পড়ে সোমেরসেট মমের গল্প পড়ে, অপর্ণা পড়ে ডিটেকটিভ গল্প এবং ক্লাবে ডাকাত সেজে... সুপর্ণা গম্ভীর, অপর্ণা সদা উচ্ছল।

সুশীলকুমারের এই "মন নিয়ে" আসলে নামেই মালুম মনস্তাত্ত্বিক গল্প। অথচ গল্পের বাইরের লক্ষণগুলি তথা চিত্রনাট্যের ধরন-ধারণ একেবারেই সস্তা ও শুধুই দর্শককে ভুলিয়েভালিয়ে আমোদ দেবার জন্য। সুতরাং গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, অর্থাৎ নায়িকা সুপর্ণার মনোবিকার বা মানসিক রোগ যখনই এসেছে তখন সবই যেন কেমন গুলিয়ে পাকিয়ে গেছে। অর্থাৎ এক দিকে পাবলিকের "এন্টারটেনমেন্ট"-এর শর্ত, অপর দিকে মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিচালক চিত্রনাট্যকার সলিল সেন হিমসিম খেয়েছেন। আসলে অপ্রকৃতিস্থ মানসিকতার সঠিক বিশ্লেষণ ছবিতে নেই। যে সুপর্ণা স্বামীকে হারাতে চায় না বলে নিজের পঙ্গু, কিংবা নিজের ননদকে খুন করতে পারে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ইচ্ছা করে বাথরুমে আছড়ে পড়ে গর্ভের সন্তানকে বলি দিতে পারে, সহোদরাকে বিষ দিতে যার হাত কাঁপে না সেই সুপর্ণার মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা কী-ভাবে চলে এবং কী সেই প্রচণ্ড "প্যাশন" ও অধিকারবোধ তার বিশ্লেষণ ওই চরিত্রে অনুপস্থিত। স্বামীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা অবশ্যই দেখানো হয়েছে, সে তো অনেক স্ত্রীর পক্ষেই স্বাভাবিক। সুপর্ণার অন্ধ অধিকার-বোধ ও প্রেমের উগ্রতা দেখিয়েও তার গোপন অপরাধ নিয়ে সাসপেনস রক্ষা করা যেত। বরং অপর্ণার চরিত্র অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। গল্পের শেষে "কোর্ট-রুম ড্রামা", বিচার-পর্ব—যেখানে ভুলক্রমে অপর্ণাই তার দিদিকে বিষ খাইয়ে মারার অপরাধে দোষী। পরে অবশ্য সুপর্ণার ডায়েরিতে তার অন্যায়ের সব স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে, এবং সুপর্ণার মানসিক অসুস্থতার কথাও দর্শক জানতে পেরেছেন। অমিতাভ অপর্ণাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্যালিকার পাণিগ্রহণ সে করেনি। অমিতাভ তার স্বর্গত স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেমের কথাই বলেছে। শ্যালিকা সংক্রান্ত কোন "স্ক্যান্ডাল"-এর আঁচ তার গায়ে পড়তে দেওয়া হয়নি বলে দর্শক স্বভাবতই খুশী।

দর্শককে আরও অনেক পরিমাণেই খুশী করা যেত, সেটা সম্ভব হয়নি গল্প ও চিত্রনাট্যের দোষে। চিত্রনাট্যে অমিতাভ, সুপর্ণা ও অপর্ণা ছাড়া আর সবাই যেন অবান্তর—এমন কি, সীতেশ দত্ত নামক ওই ব্যক্তিটিও যে সুপর্ণাদের পারিবারিক বন্ধু যার উল্লেখও রয়েছে সুপর্ণা-অপর্ণার কথায়, যে সস্ত্রীক সুপর্ণাদের বাড়িতে থেকে অপর্ণাকে খুনের দায়ে ফেলবার ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছে। শুধু নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য বজায় রাখার তাগিদ যেখানে, গল্প সেখানে কখনই সুঠাম হতে পারে না। অবশ্য দর্শককে তুষ্ট রাখার কিছু উপকরণ পরিচালক সলিল সেন সযত্নেই সাজিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে দুয়েকটি জায়গায় সুন্দর কল্পনাবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন—যেমন দিদি-জামাইবাবুর বিছানায় অপর্ণার কিছু সরস কথার সঙ্গে ডলটি শুইয়ে দিয়ে যাওয়া। এমন সুন্দর "সিচুয়েশন" আরও আছে ছবিতে, দুই বোনের গান গাওয়া তার মধ্যে একটি। প্রথম দিকে অমিতাভ ও সুপর্ণার (নেপথ্য কণ্ঠ সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকার) রবীন্দ্র সংগীত (আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি) এবং দুই বোনের গাওয়া "মানিনীর রাত কাটে না" শুনতে খুব ভাল লাগে। গানের সুর রচনায় হেমন্তবাবু তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

অভিনয়ে উত্তমকুমার বিশেষ কোন নতুন ডাইমেনশন যে ছবিতে দিয়েছেন তা নয়। অভিনয়ের যে ক্ষমতা তাঁর অনায়াসলব্ধ তা-ই তিনি আবার দেখিয়েছেন। আদালতে সুপর্ণার স্বীকারোক্তির কথা বলার সময় তাঁর অভিনয় দেখবার মত। যদিও কোর্টে স্বর্গতা অপরাধীর মনো-বিশ্লেষণের কাজ এই চরিত্রের নয়, সে শুধু ঘটনার বর্ণনাই দিতে পারে।

মৃণাল সেন পরিচালিত 'ভুবন সোম' (কাহিনী : বনফুল) এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—
ছবির একটি দৃশ্যে উৎপল দত্ত ও সুহাসিনী মুলে

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সুপর্ণা-অপর্ণার মধ্যে অপর্ণাই তাঁর শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি। অপর্ণা যেন প্রাণের আগুনে টগবগ করে ফুটছে, এই চরিত্রের উজ্জ্বলতা ও চপলতা তিনি চমৎকার প্রকাশ করেছেন। সুপর্ণা যেন বেশী শুকনো, সদা বিষন্ন। যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সুখলালসার প্রচণ্ডতায় সে হঠাৎ করে ঘৃণ্য অপরাধ করতে পারে তার প্রকাশ সুপর্ণা-চরিত্রে নেই। তবুও দ্বৈত-চরিত্রে অভিনয় করার কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন।

এরা ছাড়া আর সব চরিত্রই তো গৌণ। তবু ওইসব চরিত্রের মধ্যে এক দিক থেকে প্রধান দীপেন্দ্র দত্তর ভূমিকায় বেশ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন বিশ্ব ভৌমিক। দর্শককে সুন্দর কমিক চঙের অভিনয়ে তিনি হাসিয়েছেনও একবার। তাঁর স্ত্রী হয়েছেন অমিতা ঘিকাসে, তাঁর অভিনয়ের সুযোগ অল্প হলেও তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। খুব ভাল লেগেছে অমিতাভর পত্নী, যোন বন্ধসেবিকা রমি চৌধুরীকে। খুবই স্বাভাবিক তাঁর চরিত্রাঙ্কন। বড় শিল্পীরা—বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, হরেনকুমার পাণ্ডে সবাই—অভিনয়ের স্বল্প সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

ছবির শব্দগ্রহণ আশানুরূপ হয়নি। ক্যামেরার কাজ (দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-কৃত) আগাগোড়াই উচুস্তরের।

অগ্নিযুগের কাহিনী

বাংলার বিপ্লবীদের যে আমরা ভুলিনি তার প্রমাণ সিনেমারও। তাঁদের মহত্ত্ব ও বীরত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে বহু ছবিতে। ভুলি নাই সম্ভবত এই পর্যায়ের প্রথম ছবি। 'অগ্নিযুগের কাহিনী'ও (দি নিউ এরা পিকচার্স) ওই একই শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে তৈরি।

আজকের দিনে এই ধরনের ছবির বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'অগ্নিযুগের কাহিনী'কে সিনেমা আর্টের কষ্টিপাথরে বিচার করলে চলবে না। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য বিন্যাসের ত্রুটি হয়ত ছবিতে অনেক আছে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য যে ছবিটি দর্শকের মনকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করে রাখতে পেরেছে সেটাই বড় কথা। অর্থাৎ ছবির প্রধান উদ্দেশ্য এখানেই সার্থক।

ছবির কাহিনীতে (বীরেন রায় রচিত 'খেয়ালী' উপন্যাসের ভিত্তিতে) গল্পের উপাদান আছে, মীরা ও সমীরকে (দুজনেই বিপ্লবী দলের সভ্য) কেন্দ্র করে। মীরা জেনেছে সমীর তার ভাই, সৎ ভাই; সমীর সে-সংবাদ জানে না। সমীর প্রথমে মীরার প্রতি অনুরক্ত, পরে আসল সম্পর্ক না জেনেই মীরাকে বোনের মত গ্রহণ করেছে। কিন্তু সমীরের দূরে চলে যাওয়া, অভিমান, মীরাকে ভুল বোঝা ইত্যাদি বিপ্লবী দাদার পক্ষে কি স্বাভাবিক? আর মীরার মনের কথা জানা না থাকলে বাহ্যিক লক্ষণগুলি দেখে অনেক আমরা ভুল বুঝতে পারতাম। আসলে ছবির পশ্চাৎপটে (ক্লাইম্যাক্সে মীরা-সমীরের বাবার কাহিনী সমেত) অতি দুর্বল। তারই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মাস্টারমশাইয়ের (বিপ্লবী দলের নেতা সুধাংশু সরকার) নেতৃত্বে তরুণ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদকল্পে তাঁদের জীবন-মরণ পণ দেখানো হয়েছে। ছবির ক্লাইম্যাক্স মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে—যেখানে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সশস্ত্র লড়াই। ওই সংঘর্ষের দৃশ্যটি পরিচালক তপন রায় চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। দর্শক ওই মুহূর্তে রোমাঞ্চিত, উদ্দীপ্তও বটে। ওই সংঘর্ষেই মীরা ও সমীর পুলিশের গুলিতে নিহত। দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে, সেইখানেই নাট্য আবেগ, নাট্যবেদনা। নাট্যোপকরণের আয়োজন আগেও আরও রয়েছে—একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে (বিপ্লবী নেতা ওর নাম দিয়েছেন 'স্টীল' অর্থাৎ ইস্পাত)। ছেলেটি পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে মারা যায়।

ঐতিহাসিক চরিত্র বা প্রামাণ্য ঘটনা নিয়ে সম্পূর্ণত এই ছবি নয়, প্রায় সবটাই কাহিনী। কিন্তু তবু এর মধ্যে বাংলার বিপ্লবযুগ এবং বিপ্লবীদের মানসিক গঠন, আত্মত্যাগ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা, গোপন সাংগঠনিক কার্যকলাপ ইত্যাদির পরিচয়টি পাই। নেতা মাস্টারমশাইয়ের চরিত্র, আদর্শের জন্য তাঁর নির্মমতা (যেমন অসিতকে

'জিগরী দোস্ত' (পরিচালনা : রবি নাগাইচ) হিন্দীচিত্র জিতেন্দ্র ও মমতাজ : ছবিটি বর্তমান সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

বিয়ে করার জন্য মীরাকে আদেশ দেওয়া), ও কাজকর্ম (কখনও ছদ্মবেশ ধারণ) অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'র সব্যসাচীর আদলে গড়া। গোটা গল্পেই 'পথের দাবি'-র প্রভাব। মীরা, অসিত ও সঞ্জীবের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তাদের চরিত্রের কিছু লক্ষণ 'পথের দাবী'-র কোন কোন দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ, বুদ্ধির লড়াই, মীরার কখনও বাঈজি কখনও বৈষ্ণবী সাজ, ইত্যাদি চমক তো আছেই। ফিল্মে এ-সব সিচুয়েশন আমাদের খোরাক—পরিচালক এই সব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছেন। চিত্রনাট্যটি বৈপ্লবিক

সংগ্রাম ও কাল্পনিক কাহিনীর মাঝখানে যার বাঁধ শিথিল হয়েছে, কখনও বা কক্ষচ্যুত। তবু সব মিলিয়ে যে দেশপ্রেমের ছবি পূর্ণেন্দু রায় তৈরি করেছেন তার আদর্শগত মূল্য অস্বীকার করবার নয়। মহিলা সমিতির ঘরে রাজা রামমোহন থেকে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত অনেক মহাপুরুষ ও দেশনেতার ছবি দেখানো হয়েছে। নেই শুধু বিবেকানন্দের ছবি। ওই যুগে দেশপ্রেমিকদের, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের আদর্শ ও প্রেরণা যে ছিলেন বিবেকানন্দ এই সত্যটি পরিচালক ভুললেন কেমন করে?

বিপ্লবী নেতা মাস্টারমশাই হয়েছেন বিকাশ রায়। তাঁর অভিনয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ, কখনও তাতে তেজস্বিতা। তবুও জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তিনি হয়ে উঠতে পারেননি, ওই যে ভিতরের 'ফায়ার' বা আগুন তার অভাব। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মীরা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি। চরিত্রে দৃঢ়তা ও অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, স্নেহ ও মমতা তিনি সুন্দর ভাবে মিশ্রণ করেছেন। বৈষ্ণবী ও বাইজি রূপেও তিনি স্বচ্ছন্দ। চরিত্রটি কেন মুহূর্তে যদি অবিশ্বাস্য লাগে সে দোষ মাধবীর নয়। দিলীপ রায়ের সমীর একটি কৃতিত্বপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টি, ওই চরিত্রের উপস্থিতির প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। সুন্দর অভিনয় অজয় গাঙ্গুলির, জহর রায়ের, সুলতা চৌধুরীর—এঁরাও দর্শকদের প্রশংসা পাবেনই। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তি দে, স্বপন রায়, সুজেন দাস, সমরকুমার প্রমুখ শিল্পীরাও সুঅভিনয় করেছেন।

কাহিনীচক্রে বাইজির মুখে, বৈষ্ণবীর মুখে মুখে এবং অন্যসময়ে কিছু গানের প্রয়োজন হয়েছে ছবিতে। গানের সুর খুবই ভাল দিয়েছেন গোপেন মল্লিক। আবহসংগীত হিসাবে দেশাত্মবোধক ও রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ব্যবহারের জন্য তিনি প্রশংসা পাবেন। তবে ছবিতে দেশপ্রেমের গান আরও থাকতে পারত ('আমার সোনার বাংলা' এক কলি অবশ্য রয়েছে)। ক্যামেরার কাজ (অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা-কৃত) মোটামুটি সন্তোষজনক।

রেকর্ড সমালোচনা

পূজার গান

পূজার রেকর্ড বেরিয়েছে বেশ কয়েক দিন আগেই। ক্রেতারা সম্ভবত তাদের প্রিয় গায়কের রেকর্ড ইতিমধ্যেই ঘরে নিয়ে এসেছেন। এবং এবার কার গান বেশী ভাল, কার গান কম তা নিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে এখনও চলছে। বিচারক বাংলা আধুনিক

"মনুষ্য কারণম"—টি প্রকাশ রাও পরিচালিত এই ছবির দৃশ্য ও এ সপ্তাহে

বাংলা গানে পাশ্চাত্য সুরের ও অর্কেস্ট্রার যে প্রভাব লক্ষ করছিলাম—যার প্রমাণ গত কয়েক বছরের পূজোর রেকর্ড—এবার তাতে ভাটা পড়েছে। রাহুমুক্তি সম্পূর্ণ না হলেও বাংলা কাব্যসংগীত যে অনেক পরিমাণে আপন স্বভাবে ফিরে এসেছে তার প্রমাণ এই বছরের পূজো রেকর্ডে রয়েছে। মান্না দে-র গানের কথাই ধরা যাক। অর্কেস্ট্রার ব্যবহার সামান্য, সুর দেশীয়, গাওয়া চমৎকার। তাঁর দুটি গানই—বিশেষ করে "ললিতা ওকে যেতে বল না"—শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখবে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় নিজেদের গানের সুর

গ্রামোফোন কোম্পানির শারদ অর্ঘ্য সংগীতানুষ্ঠানে পূজার গান শোনাচ্ছেন রেকর্ড-কন্যা রানু মুখোপাধ্যায়

নিজেরাই দিয়েছেন, এবং তাঁদের গানে মেলোডির উপাদান ও রস যথেষ্ট, যে কারণে গানগুলি (মানবেন্দ্রর "মিথ্যে কাচের আর্শিতে" এবং দ্বিজেনের "ওগো সুন্দরী অজন্তা") জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় বিফল হবে না। প্রথম সারির শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় লতা মঙ্গেশকার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ইলা বসু, আরতি মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীদের মধ্যে কার রেকর্ড কোন্ শ্রেণীর শ্রোতার কাছে বেশী আদরণীয় হবে তার জন্য বিশদ আলোচনার দরকার। শিল্পী হিসবে প্রত্যেকেই নিজস্ব ঢঙ ও বৈশিষ্ট্যে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এঁদের গাওয়ার গুণ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না, তবে তাঁদের কেউ কেউ যদি সমালোচনার ভাগী হন তো হবেন ভ্রান্ত সংগীত পরিচালনার দোষে। যেমন ধরুন আশা ভোঁসলের "এলোমেলো কথা কেন বলি" গানের আগে দীর্ঘ বিরক্তিকর সংলাপ—গানেও পশ্চিমী করবার অপ্রকৃতিস্থতার ইমেজ। বাংলা গানের উপর এই অত্যাচার কেন? আরতি মুখোপাধ্যায়ের "লজ্জা, মরি মরি এ কি লজ্জা" গানের আগে "লজ্জা" কথাটি বলার যে ধরন তা শুনে বড়রা ছোটদের সামনে লজ্জা পাবেন, ছোটরা বড়দের সামনে, অর্থাৎ বাড়ির সকলে একসঙ্গে বসে আর গানটি শুনতে পাবেন না। গানটি বিশেষ এক শ্রেণীর কাছে হয়ত হিট করবে।

বোম্বাইয়ের মহিলা শিল্পীরা—লতা ও আশা—একটি করে সীরিয়াস ঢঙের গানও গেয়েছেন। শুনতে ভাল লাগে। এবার আরও বেশী ভাল লাগল নির্মলেন্দু

চৌধুরীর লোকসংগীত—'ঝিকু ঝিকু কাঁয়রে।' তরুণ বন্দোপাধ্যায়ের "বেশ তো না হয় সপ্তর্ষির" গানটি সম্ভবত খুবই জনপ্রিয় হবে। কিশোরকুমার এবার শ্রোতাদের কতখানি আনন্দ দেবেন বলা কঠিন। রাহুল দেববর্মণ এবার নিজেও গান গেয়েছেন। এইচ-এম-ভি'র এবারকার দুই নতুন শিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা ও বিশ্বজিৎ—মন্দ নয় তাঁদের গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর কন্যা রাণুকে দিয়ে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন—বাংলার পপ গান। উদ্দেশ্য সুন্দরভাবেই সিদ্ধ হয়েছে, রাণুর গানও অল্প বয়সের ফ্যানদের মুখে মুখে ফিরবে।" রাণুকে দিয়ে কি বরাবরের ভাল গান করানো যেত না?

'জুনিয়র' শিল্পীদের প্রত্যেকের গানই কিন্তু এবার চমৎকার। যেমন পিন্টু ভট্টাচার্যের, তেমনি বনশ্রী সেনগুপ্তের: যেমন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের তেমনি শিপ্রা বসুর।

মেগাফোন রেকর্ডে পাঞ্জার গান গেয়েছেন শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

এঁরা, এবারের গানের পর বলতে পারি, প্রথম শ্রেণীতে চলে এলেন বলে। সাধারণভাবে এই বছর গানের রচনা অর্থাৎ লিরিক, আরও উন্নত হতে পারত। গীতিকবিতা সুরের প্রয়োজন যতখানি মিটিয়েছে, কাব্যরসকে ততখানি উপেক্ষা করেছে।

কৌতুকের আয়োজনও এবার মন্দ নয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নায়িকা সন্ধান" বেশ উপভোগ্য। তেমনি মজাদার প্যারডি গান হয়েছে পিন্টু দাশগুপ্তের। হিন্দী ফিল্মের গানের সুর গিটারে বাজিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ই-পি রেকর্ডে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের অতুলপ্রসাদের গান, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত এবং ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন এবার শারদ অর্ঘ্যের বিশেষ সম্পদ। সম্পদ আর একটি রেকর্ড—মঞ্জু গুপ্তের "কী আর চাহিব বল" এবং "রুমুক ঝুমুক রুমঝুম" (অতুলপ্রসাদ)। শচীন দেববর্মণের

গানও আছে ই-পি রেকর্ডে। আর আছে সনৎ সিংহ ও আরতি বসুর শিশুসংগীত—শুনে খুশী হবে শিশুরা। রেকর্ডে কাজী সব্যসাচী ও আবদুল কাসেম রহিমউদ্দিনের আবৃত্তি আর একটি বিশেষ আকর্ষণ।

এল-পি রেকর্ড এবার দুটি—শ্রীরাধার মানভঞ্জন (কীর্তনাঙ্গ গীতিনাট্য) এবং "ফর দি ফেস্টিভ সীজন" (আধুনিক বাংলা গানের সংকলন) দুটি রেকর্ডই উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতপরিচালনায় এবং প্রণব রায়ের গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় রেকর্ডের শিল্পীরা—মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুবোধ রায়—বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কীর্তন গানে প্রাণসঞ্চার করেছেন মান্না দে। "শ্রীরাধার মানভঞ্জন" এমন অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে যে পুজোয় যদি আর কোন রেকর্ড নাও বের হত তবুও শ্রোতারা বঞ্চিত হতেন না। এই প্রযোজনার জন্য অধীর সেন সাধুবাদার্হ।

অন্য রেকর্ড

পুজোর আগে কিছু রেকর্ড প্রকাশিত [illegible] শ্রোতারা [illegible] ভাল গানের সন্ধান পাবেন না। সুপ্রীতি ঘোষের রবীন্দ্রসংগীতের ই-পি রেকর্ড এবং [illegible] দাস, [illegible] সেনগুপ্ত, [illegible] ঘোষাল ও [illegible] পালের রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেকর্ডে আধুনিক গান গেয়েছেন [illegible] মুখোপাধ্যায় ও চন্দনা [illegible]। এঁদের গানেরও প্রতিশ্রুতি আছে।

পুজো রেকর্ডের [illegible] [illegible] বাঁশি ও [illegible] মিত্রের ম্যান্ডোলিনের রেকর্ড। [illegible] লোকসংগীতের ভিত্তিতে, তাঁরা বাজিয়েছেন। শিল্পী সম্পাদিত এই রেকর্ডটি রসিকজনকে আনন্দ দেবে।

মেগাফোন

দুই [illegible] কণ্ঠশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেনের পুজোর গানের জন্য শ্রোতারা অপেক্ষা করে থাকেন। এবার মেগাফোন রেকর্ডে সতীনাথ যে দুটি গান (যেদিন হারাবে কণ্ঠ আমার এবং কত না বাজাব ফুল) গেয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য সুর রচনায় শিল্পীর নিজেরই দেওয়া। তা ছাড়া তাঁর সপ্রাণ গানের আকর্ষণ তো আছেই। উৎপলা সেন গেয়েছেন (ওগো রাত তুমি কাছে ডেকে নাও, এবং আমি তোমার কাছে বারেবারে) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে। উৎপলার কণ্ঠের দরদ এবং হেমন্তের সুরের মাদকতা যোগফল এক কথায়, মনমাতানো।

দিলীপ বসুর পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "কস্তুরীমৃগ" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

টীকা-টিপ্পনী

পূজা বাজারে ছবির বাজারও সরগরম থাকে। অধিকাংশ প্রযোজকই এই সময়ে ছবি রিলিজ করতে চান। বছরের এই সময়টাতে 'হাউস বুক' করতে এক বছর আগে থেকে প্রস্তুতি চলে। আগামী বছরের পুজো রিলিজের জন্যে এখন থেকেই নাকি ধরাধরি চলছে। 'পুজো রিলিজে রিস্ক কম', বলেন অধিকাংশ চিত্রব্যবসায়ী। কারণ, দর্শক এ সময় সিনেমা মাইন্ডেড থাকেন। নতুন নতুন জামা-কাপড় কেনার মত, নতুন নতুন ছবি দেখার ঝোঁকও নাকি বেড়ে যায়। তাছাড়া, অনেক দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে শহরে আসেন। ছুটিতে সময় কাটাতে সিনেমা তখন দেখতেই হয়। স্বভাবতই সাধারণ ছবিও এ সময় ভালো ব্যবসা করতে পারে। এবং যেহেতু অধিকাংশ প্রযোজকই এই সুযোগ হারাতে চান না, হাউসের মালিকরাও তখন বড় ছবি চান। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বড় স্টারের ছবি ছাড়া কোন ছবিই পুজোয় মুক্তি পায় না।

নায়িকাদের মধ্যে সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখার্জি, এমন কি মৌসুমী চাটার্জির ছবিও এবার পুজোয় মুক্তি পেয়েছে। বাদ পড়েছেন অপর্ণা সেন। অপর্ণার '[illegible]' অবশ্য অনেক কাল শেষ হয়ে

"[illegible]" (পরিচালনা : মধু বাগচী) ছবিতে [illegible] চ্যাটার্জি ও অনিল চট্টোপাধ্যায়